লেখক — বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক … বিষয় ও পৃষ্ঠা

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

এক লিপি বহু ভাষা

অমৃতের ২৯শ সংখ্যায় 'জানাতে পারেন' পৃষ্ঠায় আমি দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। তাদের প্রথমটি ভারতের সর্বত্র এক ভাষা প্রবর্তন প্রচেষ্টার আগে এক লিপি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা না করার কারণ কী এবং দ্বিতীয়টি ভারতের আদি ভাষা সংস্কৃত লিপি গ্রহণে কী আপত্তি থাকতে পারে, সেই বিষয়ে। সুখের বিষয় ৩৩শ সংখ্যা অমৃতের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের উদ্বোধনীতে যোগদানকারী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ভাষাতত্ত্ববিদগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রণী হয়েছেন। এখন এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। স্ব স্ব মাতৃভাষা এবং লিপি সকলেরই যে একান্ত প্রিয় এবং অভ্যাসবশত সহজবোধ্য ও সহজলেখ্য, তা কেও অস্বীকার করতে পারেন না। সংস্কৃত ভাষা যে সর্বভারতীয় ভাষা সে সম্বন্ধেও কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। সম্ভবপর হলে এই একটি মাত্র ভাষাই নিরপেক্ষ ভাষা হিসাবে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত কথ্য ও লেখ্য এবং পরিণামে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এই ভাষা এত দুরূহ যে তা সম্ভব নয়। সংস্কৃত লিপির অন্য নামই দেবনাগরী, তা সত্ত্বেও এই নিরপেক্ষ লিপি গ্রহণে যদি কোনো কোনো পক্ষে আপত্তি থেকে যায় তবে ভারতে বর্তমান প্রচলিত সব এবং প্রত্যেকটি লিপিই পাশাপাশি পরীক্ষা করে যে লিপি সহজবোধ্য এবং সহজ লেখ্য সেই লিপি গ্রহণ করলে এক লিপি প্রবর্তন সমস্যার সমাধান হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

এরপর কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাক। মনে করা যাক, যে সর্ববাদীসম্মত একটি মাত্র লিপি গ্রহণ করে ভারতের সর্বত্র প্রচলিত করা হলো। তারপর এলো এক ভাষা প্রবর্তনের সমস্যা। এ বিষয়ে অমৃতের ৩২শ সংখ্যায় "ভাষা নিয়ে আবার তাণ্ডব" সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত "যতদিন বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য পরস্পরের ভাষা শিখে একটি সাধারণ যোগাযোগের ভাষা গড়ে তুলতে না পারছে" কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভারতে বর্তমানে প্রচলিত প্রায় তের-চোদ্দটি ভাষা শিক্ষা করা কী করে সম্ভব হতে পারে তার সমাধানে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন। সামান্য অনুধাবন করলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ছোট ছোট বালক-বালিকাদের আমরা একই সঙ্গে বহু বিষয় শেখাতে আরম্ভ করি, যার ফলে তারা কোনো বিষয়ই ভাল করে শিখতে পারে না। তা সত্ত্বেও যেমনভাবেই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি যাতে তারা বিশ-বাইশ বৎসর বয়সেই পার হয়ে আসতে পারে সেই দিকেই নজর দিয়ে থাকি। এতে নিরক্ষরতা শব্দটির কিছু অর্থ প্রাপ্তি হয়ত হয়, শিক্ষাটা আসলে বহুল পরিমাণে মেকী থেকে যায়। ভাষার অজ্ঞতাও যে এর একটা প্রধান কারণ তা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তারস্বরে অন্য কোনো ভাষার বিরুদ্ধে চীৎকার করলেও আমরা অনেকেই স্ব স্ব মাতৃভাষাই ভালরূপে জানিও না। এমতাবস্থায় আমরা ভারতের অন্য ভাষাগুলি শিখব কী করে? এর একমাত্র উপায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অন্যান্য সব বিষয় বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ভাষা শিখবার জন্য বেশ কয়েক বৎসর সংরক্ষিত রাখা। যখন সব ভাষাই একই লিপিতে পাশাপাশি লেখা থাকবে তখন মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষাগুলি শেখাও সহজতর হয়ে পড়বে, অবশ্য বানান বা ব্যাকরণের অযথা জটিলতা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে। সব ভাষাগুলির প্রাথমিক জ্ঞানলাভের পর অনিবার্য সর্বাঙ্গীণ ভাষা সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য বিষয় শেখান আরম্ভ করা যেতে পারে এবং তখন বালক-বালিকাদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বোধশক্তি বাড়বার ফলে পরবর্তী বিষয়গুলি তাদের অধিকতর সহজগম্য হয়ে পড়বে। ভারতের সব ভাষাগুলির প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি লাভবশত কালক্রমে সব ভাষাগুলির সংমিশ্রণে এমন একটি ভাষা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেবে যে সেইটিই হবে সর্বভারতীয় ভাষা। ভাষা শিক্ষা তা যে কোনো ভাষাই হোক দোষণীয় নয়। ইংরেজি কথা ছেড়ে দিলেও আমাদের দেশের অনেকেই রুশ, জার্মানী, ফরাসী ইত্যাদি বিদেশী ভাষা শিক্ষার দিকে আগ্রহশীল, অথচ স্বদেশের ভাষাগুলি কেন অবহেলিত হবে তার কোনো সদুত্তর নাই। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে আমরা অনেক বিদেশী শব্দ নিজেদের করে নিয়েছি এবং বর্তমানে যতই ইংরেজির বিরুদ্ধে যাই না কেন আমরা কেউ যদি সামান্য দু-একটি ইংরেজি শব্দও জেনে থাকি তবে তার ব্যবহার করতে পশ্চাৎপদ হই না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের প্রতিটি রাজ্যের তথা কেন্দ্রের মন্ত্রী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ একত্রিত হয়ে যত শীঘ্র সম্ভব সর্ববাদীসম্মত এক লিপি গ্রহণ ও ভারতের সব ভাষা শিক্ষণের প্রবর্তন করতে সক্ষম হবেন, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

নিরাপদ চট্টোপাধ্যায়
কোকর, হিনু, রাঁচী।

একাঙ্ক নাটক বিষয়ে

অমৃত ৭ম বর্ষ, ৩ খণ্ড ৩৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের দিকে চোখ পড়ল, দিলীপ মৌলিক রচিত 'বাংলা একাঙ্ক নাটকের গতি-প্রকৃতি' ঐ লেখার বিষয়। এতে সাম্প্রতিক একাধিক কবি ও নাট্যকারের উল্লেখযোগ্য রচনা প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে। ও সাধারণ পাঠকদের হয়তো কাছে সেই সব বই যাতে এমন পরীক্ষামূলক একাঙ্ক নাটক রচিত হয়েছে, তা নাও থাকতে পারে। তাই তাঁরা শুধু ইনফরমেশন পাবেন, যাতে খবর রাখবেন সাম্প্রতিককালে যে সব নাটক লেখা হচ্ছে তার বিষয়ে।

কৌতূহলী হলাম বিশেষ করে যখন কাব্যনাট্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য নিক্ষেপ করেছেন এই লেখক। কাব্যনাট্য রচয়িতাদের মধ্যে নিজের নামটা খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেয়ে গেলাম ইত্যাদিদের মধ্যে। (তাও সম্মানিত নয়) অন্তত কাব্যনাট্য লেখার ব্যাপারে ঠিক প্রথমদের মধ্যে নিজেকে পাব, এটা আশা করিনি। তার কারণ আমার লেখা প্রথম কাব্যনাট্য 'সার্কাস' রচিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে ও "দুই প্রান্ত দুই" দ্বিতীয়টি তার কিছুকাল পরেই। এ দুটি অবশ্য একাঙ্ক নয়। কিন্তু "একটি নায়ক" একাঙ্ক মঞ্চস্থ হয়েছিল প্রথম অনুষ্ঠিত একটি কবিতা মেলায় যেখানে দশ বছরের লেখা একটি নাটকও অভিনীত হয়েছিল। কিছুকাল আগে নান্দীকার গোষ্ঠী মুক্তাঙ্গনে আমার লেখা অন্য একটি কাব্যনাট্য 'প্রস্তাব' অভিনয় করেন এক রাতের জন্য। ঐ নাটকটি 'গন্ধর্ব' নামক নাট্য পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে আমার কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা, "চার চোখ" হয়তো বা শ্রীমৌলিক দেখে থাকবেন। এতে আছে "সংলাপ" নামক একটি ক্ষুদ্র কাব্যনাট্য।

এ বিষয় বিনীতভাবে নীরব না থেকে এই কথাগুলি লিখছি, তার কারণ হয়তো বা কখনো কোনো সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র সঠিক খবর রাখতে চাইবেন কাব্য নাটক বিষয়ে। আমি খুশি হব সম্পাদক মশাই যদি পাঠক সমীপে "অমৃত" মারফৎ এই পত্রটি প্রকাশ করেন।

দিলীপ রায়
কলিকাতা-১৯।

ওয়েলস সম্পর্কে

আপনাদের "অমৃতে" প্রকাশিত (২৯শ সংখ্যা ৭ম বর্ষ, ৩য় খণ্ড) শ্রীঅজয়দেবের 'প্রথম যুগের ওয়েলস' রচনাটি সত্যই অনবদ্য হয়েছে। ওয়েলসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্যের নতুন লেখার মাধ্যমে নবমূল্যায়ন হয়েছে। ওয়েলসের সাহিত্য ও সৃষ্টি সারা বিশ্বে এক নতুন আলোড়ন ও সাড়া জাগিয়েছে। ওয়েলস স্থান ও কালের বহু ঊর্ধ্বে। বার্নার্ড বার্গনজী তাঁর "The Early H. G. Wells" পুস্তকে এই মহৎ উপন্যাসকারের প্রথম প্রভাতের সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তথ্য নিবেদন করেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে শ্রীঅজয়দেব যে রূপ দিয়েছেন তার জন্য অজয়দেবকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জগতে নতুন একটি অবিস্মরণীয় ও বরণীয় নাম।

কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩১।

অমৃত

কবির স্বপ্ন শান্তিনিকেতন

শিক্ষা নিয়ে ও ভাষা নিয়ে যখন সারা দেশে তুমুল কাণ্ড চলছে তখন স্বভাবতই আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম ও বিশ্বভারতীর কথা। ভারতবর্ষে চিরকালের ভাষার বিভিন্নতা ছিল। শিক্ষার প্রসার অবশ্য সর্বত্র ছিল না। কিন্তু তার জন্য অনর্থ বাধবার মতো দুরবস্থা আমাদের কোনোকালে হয়নি। অথচ ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই দুইটি বিষয় নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল বাণী হল "যত্র বিশ্বভবত্যেক নীড়ম্" যেখানে সমস্ত পৃথিবী একত্রে বাস করে। এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি তাকে তাঁর স্বপ্নের বাস্তব প্রতীকরূপে গড়ে তোলেন। মানুষের মিলনের স্থান হল শান্তিনিকেতন। বৃটিশের আমলে এক ধরনের শিক্ষা প্রচলিত ছিল আমাদের দেশে। ইংরেজি ছিল সে শিক্ষার বাহন। দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথ এ জন্য আক্ষেপ করে গেছেন। মাতৃভাষাকে উচ্চতম শিক্ষার বাহন করার জন্য তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আকুল আবেদন জানিয়ে গেছেন। তিনি আবেদন করেছিলেন, শিক্ষার ধারা গ্রামে গ্রামান্তরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। বর্ষার মেঘ যেমন তার বারিধারায় সমস্ত দেশকে স্নান করিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তেমনি শুধুমাত্র শহুরে সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সর্বত্রগামী হবে এই ছিল শিক্ষাবিদ রবীন্দ্রনাথের অন্তরের প্রার্থনা।

কবি তাঁর নিজের সীমায়িত সামর্থ্যে গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বভারতী—একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়। গতানুগতিক শিক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে প্রকৃত মানবিক শিক্ষাদান ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর স্নিগ্ধ ছায়াতলে সমবেত হবার জন্য। সরকারের দাক্ষিণ্য ছিল না তাঁর প্রতি। এই মহৎ ভিখারী দেশবাসীর কাছ থেকে পাওয়া স্বেচ্ছাদানে পরিচালনা করতেন এই বিশ্ববিদ্যালয়। বিদেশের এবং এদেশের মনীষী দার্শনিক, সাহিত্যবেত্তা, বিজ্ঞানীরা এসেছিলেন শিক্ষকরূপে কবির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। তখন অনেক অসুবিধা ছিল, অনটন ছিল কিন্তু অভাব ছিল না আন্তরিকতার, হৃদয়ের উষ্ণতার।

শান্তিনিকেতন আশ্রম শুধুমাত্র একটা গতানুগতিক বিদ্যালয়রূপে কবি দেখেন নি। তার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতবর্ষের মানুষ গড়ার সাধনাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি একবার আশ্রমবাসীদের একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, "শান্তিনিকেতন আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে—ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ, জাতিভেদ, ভুলব। আমাদের দেশে চারিদিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র করে—সঙ্কীর্ণ করে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব।"

তারপরেই দেখি তিনি দুঃখ করছেন এই বলে, "কিন্তু আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটোখাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি।" বিশ্বভারতীর জীবনে তারপর বহু বছর কেটে গেছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সময়ে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রেরণায় এই বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। তার আর্থিক দায়িত্বভারও গ্রহণ করেন স্বাধীন ভারতের সরকার। কবি তাঁর জীবনসায়াহ্নে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের ভবিষ্যৎ কর্ণধাররূপে তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ জওহরলাল নেহরুকে এর দায়িত্ব গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। নেহরু সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

জওহরলাল একথা বহুবার বিশ্বভারতীর সমাবর্তন ভাষণে বলে গেছেন যে, বিশ্বভারতী আর পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো স্নাতক তৈরীর কেন্দ্রে পরিণত হক, এ তিনি চান না। কবি যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে গেছেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আশ্রমের পবিত্রতা রক্ষা করে বিশ্বভারতী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ দায়িত্ব খুবই দুরূহ। শান্তিনিকেতনকে আমরা শুধু একটি দর্শনীয় স্থান হিসেবে রক্ষা করতে চাই না। 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন' এ গান যখন আশ্রমিকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তখন একে শুধু কবির স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখা একটি তপোবন বলেই আমরা গণ্য করি না, এর সুরে সুরে বাজতে থাকে কবির সমগ্র জীবনের আকুলতা—একটি আদর্শ, একটি স্বপ্নের রূপায়ণের জন্য আকুলতা। তিনি যেন বলতে থাকেন, "এই শান্তিনিকেতনে, যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি, এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো-একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পারিনে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য [illegible] সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি, এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে।" এই অভিপ্রায় মানবজীবনের ঐক্য। আমাদের কবির সেই স্বপ্ন যেন সার্থক হয়। আজকের শান্তিনিকেতনের কাছে, বিশ্বভারতীর কাছে এই আমাদের চাওয়া। দেশের নানাদিক থেকে অনৈক্যের সংঘাতে জর্জরিত হয়ে বড় আশায় আমরা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর দিকে তাকিয়ে আছি।

উত্তরাধিকার ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ,
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া সার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুরে রৌদ্রে পায়-পায় ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, শিহরণ—।
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানলার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলক,
শুধু অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা,
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত—
একখানা নদী, দু' তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এসব আমার পুরোনো পোষাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর,
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশী তোমার—
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

কর্ণ ॥ শান্তনু দাস

আবার তুমি পতিত করলে হে মহাজন, কাকেই বলি
মাথা ঠুকলে রথের চাকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
নিজের কাছেই ফিরে আসে ঃ

চেয়ে দ্যাখো পাঁজরগুলো দাপড়েছে কুয়াশায়
অন্ধকারে আর্তজিহ্বা নড়ে উঠলে শব্দ হয় না
দু হাত দিয়ে চাকা ঠেললে ধনুক কাঁপে শব্দ হয় না
রক্তে মেশে ভালবাসা আন্দোলন হৃদয় জুড়ে।

যেন আমি শব যাপনায় সমস্ত দিন তোমার সাথে
যেন আমি হৃদয় দিলাম হৃদয় দিয়ে তাপ পোহাতে
অন্ধকারে মাথা খুঁড়লে স্মৃতি সুন্দর হয়ে যাবে
চাকা ফেটে হৃৎপিণ্ড
দাপড়েছে সহস্র দুঃখ।

আবার তুমি পতিত করলে হায় মহাজন
কাকেই বলি
মাথা ঠুকলে রথের চাকায় ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি
নিজের কাছেই ফিরে আসে।

শতবর্ষের আলোয়-আলোয়

অমৃতবাজার পত্রিকা

সূর্য গ্রহণের ছায়ামণ্ডল

পুলকেশ দে-সরকার

অমৃতবাজার পত্রিকা প্রথমাবধি জনসাধারণের মুখপত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আজকাল যাকে দলীয় মুখপত্র বলা হয় তেমন তো নয়ই, কোন একটা বিশেষ স্বার্থেরও নয়। ভারতের মূক জনসাধারণের বৃহত্তম স্বার্থ সাধারণভাবে মানবিক স্বার্থেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, এখানে নিপীড়ক ও শোষকেরাই ছিল নিন্দনীয়, নতুবা সত্যি কোন জাতিদ্বেষ ছিল না। পরাধীন ভারতকে বিদেশী শাসন-শোষণমুক্ত করতে হবে—এই লক্ষ্য, এজন্য কেবল বিদেশী শোষকের নিন্দা নয়, নির্বীর্য উদাসীন এদেশী শোষিতদের তিরস্কারেও কোন কার্পণ্য বা কুণ্ঠা ছিল না।

কিন্তু প্রথমাবধিই অমৃতবাজার পত্রিকা চাইছিলেন একটি গণসংগঠনও গড়ে উঠুক—কোন একটি রাজনৈতিক সভা, যেখান থেকে ইংরাজদের পাল্টা জবাব হিসেবে এদেশীয়দেরও মর্মকথা উচ্চারিত হতে পারে।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে যখন "জাতি-ঐক্য" বা "সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা" সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখেন তখন অমৃতবাজার পত্রিকার লেখকচিত্তে এই আকুতিই বার বার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তখন উল্লেখ করবার মত একটি মাত্রই সংগঠন ছিল, তার নাম "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা" বা British Indian Association। কিন্তু এর কর্মতৎপরতা অমৃতবাজার পত্রিকা যথেষ্ট কার্যকর মনে করতে পারছিলেন না, সম্প্রদায়নির্বিশেষে এটি সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয় নয় বলেই নয়, এটি তেমন কর্মপটু ছিল বলেও পত্রিকা মনে করতেন না। এই কারণেই লিখেছেন :

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা আমাদের সকল বল, সকল ভরসা কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেমন আমাদের তেমনি সভা। কোন কার্যাকর্মে ইহাদের প্রায়ই উৎসাহ নাই, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকে।"

শুধু তাই নয়। এই প্রসঙ্গেই পত্রিকা বলেছেন, "কেহ কেহ দুটি একটি জাতি কাজের স্থান। রায়বাহাদুর পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন কিন্তু বাহাদুরির কাজ কাহা [illegible] [illegible] হইলে রায়বাহাদুরদিগের টীকি।"

এখানেই স্বার্থপরতাটুকু পরিস্ফুট, এতে কোন এক ব্যক্তি-মাহাত্ম্য অবশ্যই বিকশিত বা প্রকাশিত হয় কিন্তু সর্বসাধারণের অবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। সমষ্টিকে নিয়ে না চলতে পারলে ব্যক্তি-মাহাত্ম্যও ব্যর্থ হয়ে যায়। এ মাহাত্ম্য চিরভাস্বর রাখতে গেলে আর সবাইকেও সঙ্গে উন্নত করতে হবে, তার একমাত্র অবলম্বন কোন সভা, রাজনৈতিক সাহিত্যিক অথবা ধর্মীয়—যাই হোক। তবে একালের মহিমায় যখন রাজনীতিকে এড়িয়ে কোন সংগঠনই সম্ভব নয়, এমন কি উন্নতিও সম্ভব নয়, এই কারণেই পত্রিকা রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজশাসনের সমালোচনায় রাজনীতির কথা বলতে হবে এবং সেটি একা নয় অনেকে বলতে হবে। এজন্য একমাত্র পত্র-পত্রিকাই যেমন যথেষ্ট নয়, একমাত্র সংগঠনও তেমন নয়, দুইয়ে মিলিয়ে এক অখণ্ড শক্তির সৃষ্টি করতে পারে। তাই বলেছেন,

"সম্পাদকেরা বটে সিভিল সার্ভিস, সিভিল সার্ভিস বলিয়া চীৎকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের গলায় জোর কি আছে

করিতে দেয় নাই। এ কথাটি দেশময় রাষ্ট্র বলিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম যদি গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন তবে আমরা কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি।"

তখন যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ জেমস মনরো। তাঁর সঙ্গে শিশির-কুমারের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল; পত্রিকা প্রকাশকাল পর্যন্তও, কিন্তু পত্রিকার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতা কেটে গিয়ে বৈরীভাবে পরিণত হচ্ছিল, সে কথা দ্রুত প্রথম জানা যায় নি; জানা গেল এই ঘটনা উপলক্ষে। মনরো সাহেব এক পত্র লিখলেন—প্রকাশক, সম্পাদক ও অধ্যক্ষের নামে জানতে চাইলেন, কে এই প্রস্তাবের লেখক। সেকালেও সাংবাদিকতার সুস্থ রীতি অনুসারে পত্রিকা থেকে তাঁকে কোন নাম-ধাম দেওয়া হল না। কিন্তু জানানো হল কোথায় কোথায় তিনি এই সংবাদের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারবেন। তাতে অবশ্য পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আটকায় নি।

এই মূল মামলার সঙ্গে আর একটি আনুষঙ্গিক মামলাও ছিল। কেননা, ঐ প্রথম প্রস্তাবের পর উনবিংশ সংখ্যায় "পাঠকগণের প্রতি" নামে আর একটি "প্রস্তাবও" প্রকাশিত হয়। তা নিয়ে পত্র-লেখকের নামে মামলা হয়।

এই মামলা সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন, সে সব কথার মধ্যে সর্বত্র সঙ্গতিও খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সকল তথ্যও সঠিক তারিখ মতো উদ্ধার করা যায় না। কিন্তু পত্রিকার শত বৎসরের জীবনে একেবারে শৈশবকালের এই ঘটনাটি এতই তাৎপর্যপূর্ণ যে সে সব কাহিনীও একত্রে গ্রথিত করা কর্তব্য ও আবশ্যক মনে করি।

মনরোর সঙ্গে শিশিরকুমারের কি রকম ঘনিষ্ঠতা ছিল তার কৌতুককর দৃষ্টান্ত দিয়ে কবি নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে লিখেছেন :

কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—'বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য : স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।' 'অতি' সবই মন্দ। অতি-বন্ধুতায় ইদানীং বিরোধপন্ন হইয়াছে। অমৃতবাজারের এক সংখ্যায় 'ঘোরতর অত্যাচার' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা থাকে যে, কোনও সবডিভিসনাল অফিসার একটি নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে, তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। ফৌজদারী হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন সে কে। রাজকৃষ্ণ বলেন তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি—আমার হুকুম অমান্য! শিখলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, সার হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন, দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট। তাহার পর দুই মিনিট। কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম হইতে সাসপেণ্ড করিয়া তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন যে প্রবন্ধে যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছু বলিতে বাধ্য নন। এবার সাহেবের ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। তিনি তখন অমৃত-বাজারের সম্পাদক বা সম্পাদকগণ, মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরগণ, প্রকাশক বা প্রকাশকগণের নামে যথাশাস্ত্র এক 'অফিসিয়াল' পত্র কাটিলেন। শিশিরকুমার এ পত্রেরও ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন সাহেব চুপ করিয়া থাকিলে কেহ তাঁহার দোষ দিত না। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র নহেন। বিধাতার নীতি টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হুকুম টলিবে না। তাঁহার হুকুম যতই অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ হউক না, তাহার একটি অক্ষর যে পালন না করিবে সে যতই তাঁহার বন্ধু হউক না, যতই নির্দোষী হউক না, তিনি তাহার সর্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি তখন তদন্ত করিয়া জানিলেন যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের লক্ষ্য ঝিনাইদহের সব ডিভিসনাল অফিসার রাইট (Wright) সাহেব। তখন উঁহার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষ রাজকৃষ্ণ মিত্র এবং একজন প্রিন্টারের নামে অপবাদ বা লাইবেল অভিযোগ উপস্থিত হইল। যশোহরে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, যেন একটা খণ্ড প্রলয় হইয়াছে। এ সময়ে আমি সস্ত্রীকে যশোহরে ধর্মাবতারের সিংহাসন আরোহণ করি।" (নবীনচন্দ্র রচনাবলী, "আমার জীবন", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১ম খণ্ড)

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রথম এই সংবাদটুকু বেরোয় :

"১৭শ সংখ্যক পত্রিকায় যে ঘোর অত্যাচারের কথা উল্লেখ করা হয় তাহা লইয়া যশোহরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় আমরা এক্ষণে কিছু লিখিব না, পাঠকগণ অধৈর্য হইবেন না, সময় হইলেই আমরা তাহাদিগকে সমুদয় জ্ঞাপন করিব। যাহা হউক এ ডিভিসনের কমিশনারের প্রজা বাৎসল্য ও ন্যায়পরতায় এ দেশস্থ তাবল্লোকে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন।" (২৭শে আষাঢ়, ১২৭৫। ৯ই জুলাই ১৮৬৮; বিংশ সংখ্যা)

এর পর ২৩নং সংখ্যায় জানা যায় :

"শ্রীযুক্ত রাইট সাহেবের অপবাদ করা মকর্দ্দমা বিচার পর্যন্ত ফৌজদারীর হেড ক্লার্ক সাসপেণ্ড হওয়াতে পেশকার শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসাদ ভাদুড়ি তাঁহার স্থলে একটিন হইয়াছেন।" (১৬ই শ্রাবণ, ১২৭৫; ৩০শে জুলাই, ১৮৬৮; ২৩ সংখ্যা)

অনাথনাথ বসু তাঁর "মহাত্মা শিশির-কুমার ঘোষ" পুস্তকে লিখেছেন :

"পত্রিকার প্রবেশ সময়ের জন্য উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীগণ সুযোগের সন্ধান করিতে লাগিলেন। পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় যশোহর জেলার কোন মহকুমার হাকিম ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক একটি নারীর অত্যাচার সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিসের হেড ক্লার্ক বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র রিপোর্টটি উক্ত কাহিনীটি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অমৃত-বাজার পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। মনরো প্রবন্ধের লেখক কে জানবার জন্য অনুসন্ধান করেন। পত্রিকায় মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটের নাম অপ্রকাশ থাকিলেও ঝিনাইদহের সব ডিভিসনাল অফিসার রাইট সাহেবের দ্বারা মনরো অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে আদালতে এক মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। প্রকৃত লেখক কে তাহা স্থির করিতে না পারায় শিশিরকুমারের সহিত পরিচালক সকলকেই আসামী করা হইয়াছিল। রঙ্গলাল ও একজন মুদ্রাকরকে মুক্তি দিয়া সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই মোকদ্দমার ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে একটা মহা আন্দোলন হইয়াছিল।" (পৃঃ ৫৩)

এই পুস্তকের বিস্তারিত বিবরণে আরও জানা যায়, শিশিরকুমারের অগ্রজ হেমন্তকুমারের কলিকাতা হাইকোর্টে তদ্বির-তদারকের ফলে পত্রিকার প্রতি বৈরীভাবাপন্ন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাত থেকে এই মামলার বিচারভার দায়রা জজের ওপর অর্পণ করা হয়। সেখানেও কিছু জটিলতা ছিল। তৎকালীন "দায়রা জজ লাফোর্ড"ও শিশিরকুমারের প্রতি সদয় ছিলেন না।" (পৃঃ ৫৫) তিনি ছুটিতে গেলে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন Mr. Lewis "রাজনীতিক প্রস্তুত নহে" এই অজুহাতে কয়েক মাস মকোদ্দমা স্থগিত থাকে। মিঃ লাফোর্ড বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মোকদ্দমা আরম্ভ করেন।" (পৃঃ ৫৩) গভর্নমেণ্ট-উকিল দক্ষিণাপ্রসাদ বসু ছিলেন বিপক্ষে এবং ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ছিলেন পক্ষে। "মনোমোহনের এই সব প্রথম মোকদ্দমা। শিশিরকুমার ঘোষ এক হাজার টাকা জামিনে খালাস হলেন।" (পৃঃ ৫৬)

জানা যায়, শিশিরকুমারই যে পত্রিকা-সম্পাদক তা প্রমাণের জন্য মনরোর কাছে শিশিরকুমার কোন কালে যে পত্র লিখেছিলেন তা মনরো আদালতে পেশ করেন। কিন্তু তাতেও কিছু প্রমাণিত হয়নি। (পৃঃ ৫৭) ফলে, "অনেক চেষ্টা করিয়াও শিশির ও তাঁহার সহযোগিগণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, বিচারপতি বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিলেন।" (৬০) মতিলালের সাক্ষ্যে ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষ এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, এ মতির মূল্য পাওয়া ভার। (পৃঃ ঐ)

"শিশিরকুমারের মোকদ্দমার জয়লাভের সংবাদ প্রায় ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। শিশিরকুমার এই মোকদ্দমায় একরূপ সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন; মোকদ্দমার পর হইতেই পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।" (ঐ, পৃঃ ৬১)

অনুবাদ প্রসঙ্গ

সংবাদপত্রের রিপোর্টে দেখা গেল যে একটি লেখক সমবায় গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁরা বাংলা গ্রন্থের ইংরাজী বা অন্য ভাষায় অনুবাদ এবং ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশী ভাষার গ্রন্থকে ভাষান্তরকরণের ব্যবস্থা করবেন। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই। আমরা নিজেদের সাহিত্য-সম্পদ নিয়ে গর্ব অনুভব করি কিন্তু বিদেশীদের কাছে নিজেদের সাহিত্যকীর্তি প্রচারে তেমন উৎসাহী নই। বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে সুরু করে অতি সাম্প্রতিককালের লেখকদেরও রচনা অনূদিত হয়েছে। ইংরাজী এবং হিন্দি ভাষার মাধ্যমে কিছু কিছু বাংলা রচনা বোম্বাই অঞ্চলের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এ ছাড়া যিনি যখন সুযোগ পেয়েছেন তিনি তখনই তাঁর এবং তাঁর পছন্দসই গোষ্ঠীর রচনার অনুবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন।

এলোপাথাড়ি ভঙ্গীতে বাংলা রচনার অনুবাদ হয়েছে। বাংলা গল্পের অনেকগুলি ইংরাজী সংকলন হয়েছে এবং সেই কাজ সুরু হয়েছে চল্লিশের দশক থেকে। লীলা রায়, নীলিমা দেবী, লীলা মজুমদার, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বাংলা গল্প ও উপন্যাসের উত্তম অনুবাদ করেছেন। সুধীন্দ্র দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন প্রভৃতি কবিরা স্বরচিত কবিতার অনুবাদ করেছেন, ডাঃ [illegible] চট্টোপাধ্যায় সুকান্তের কবিতা এবং চিদানন্দ দাশগুপ্ত জীবনানন্দের কবিতার সার্থক অনুবাদ করেছেন।

সম্প্রতি আশিস সান্যাল সম্পাদিত 'বেঙ্গলী লিটারেচার' পত্রিকায় একটি সুপরিকল্পিত অনুবাদ নীতি গৃহীত হয়েছে এবং 'বেঙ্গলী লিটারেচার' ইতিমধ্যেই এযুগের অনেক কবির কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

বিদেশী কবিতা বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে প্রচুর। এলিয়ট, শার্ল বদলেয়ার, নেরুদা, পল এলুয়ার, সাঁ জা পার্স, মায়াকোভস্কি, ইভতুশেংকো, রবার্ট ফ্রস্ট, ল্যাংস্টন হিউজেস প্রভৃতি কবিদের প্রচুর কবিতা সাম্প্রতিককালে বাংলায় অনূদিত হয়েছে। হুইটম্যান হাইনে সেকসপীয়র প্রভৃতির কবিতাও স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে প্রচুর পরিমাণে অনূদিত হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন প্রচুর বিদেশী কবিতা অনুবাদ করে সমকালীনদের অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সাহিত্য থেকে বঙ্গানুবাদ করার কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। উপন্যাস গল্প বা কাব্য-কাহিনী যাতে ঠাকুর বাড়ীর পত্রিকায় প্রকাশের জন্য অনুবাদ হয় সে জন্য তিনি বাড়ির ছেলেমেয়েদের হাতে দিয়ে অনুবাদ করাতেন এবং স্বয়ং তা সংশোধন করে দিতেন।

ঠাকুরবাড়ির লেখকে যে অনুবাদকর্ম বিশেষ উৎসাহ লাভ করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে পুরাতন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায়। টলস্টয় বাংলায় অনূদিত হয়েছেন বহু বছর আগে, তুর্গেনেভ, মঁপাসাঁ, বালজাক, হুগো, চেখভ, প্রসপার মেরিমে, আনাতোল ফ্রাঁস প্রভৃতি বাঙলায় বহু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অনেক বছর আগে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফরাসী থেকে যেমন অসংখ্য সাহিত্য-সম্পদ অনুবাদ করেছেন, তেমনই আবার সংস্কৃত কবিদের নাটক ও কাব্য এবং লোকমান্য তিলকের মারাঠী ভাষায় রচিত গীতারও অনুবাদ করেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা অনুবাদের একটি অবিস্মরণীয় নাম। অনুবাদকের কাজ ঝকমারীর কাজ। কোনো দিকে না তাকিয়ে কোনো প্রত্যাশা না রেখে তাঁকে অনুবাদ করতে হয় পরের ধনে পোদ্দারী করার মত। সাহিত্যজগতে তাঁর আসন কুলীন সমাজে নয়, তিনি ব্রাত্য। মৌলিক রচনার কৃতিত্বের অধিকারী নন বলে তাঁকে কিঞ্চিৎ হীনদৃষ্টিতেই দেখা হয়। কিন্তু এজরা পাউন্ডের মত অনুবাদকদের ভুললে চলে না। এজরা পাউন্ড অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মূল রচনার খোল-নলচে পালটে বা বাদ দিয়েছেন তা সাহিত্যের সমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছে।

বাঙালী অনুবাদকদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বহু অনুবাদ করে গেছেন, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল প্রভৃতি সকলেই বিখ্যাত গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেছেন।

অনুবাদকে জনপ্রিয় করেছিলেন কল্লোল কালের সাহিত্যিকরা।

তবে একটি ইতালীয় প্রবচন এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"traddutore traditore—"

অর্থাৎ অনুবাদকরা বিশ্বাসঘাতক। কথাটি কটু, এবং কটোর হলেও কিছুটা সত্যও বটে।

অনুবাদকরা যদি বিশ্বাসঘাতক হন তাহলেও তাঁরা একেবারে অপাংক্তেয় নন, তাঁদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। খুব কম সংখ্যক লোক দুই বা ততোধিক ভাষার অধিকারী। বিদেশী সাহিত্য বিদেশী ভাষায় পাঠ করে তার যথার্থ রসগ্রহণের বিরল জ্ঞান লোকেরই আছে। তাই সেই বিদেশী সাহিত্য সম্ভার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না থেকে অন্য কোনো উপায়ে আমাদের মর্মলোকে তার অনুপ্রবেশ প্রয়োজনীয়।

বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি বিষয়ক গ্রন্থের অনুবাদ না হলে তেমন ক্ষতি নেই কারণ, নিজস্ব প্রয়োজনে পাঠককে সেই সব গ্রন্থ পাঠ করতেই হবে, পড়াটা সেখানে আবশ্যক, ঐচ্ছিক নয়। এ ছাড়া 'অঙ্কের একটা নিজস্ব আন্তর্জাতিক ভাষা আছে'। এই সব গ্রন্থের অনুবাদক সহজেই ভাবানুবাদ করে যেতে পারেন। কিন্তু সাহিত্যে তা হয় না। মূল গ্রন্থের অতিসূক্ষ্ম রস অনুবাদককে ভাষান্তরকালে তাঁর পাঠকদের সমক্ষে ধরতে হবে।

যে কথা পূর্বে বলেছি সেই কথাই আবার বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুবাদকর্মকে 'হ্যাক-ওয়ার্ক' বলে ধরা হয়েছে। অনুবাদ যাঁরা করেন তাঁরাও 'হ্যাক'। কিন্তু অনুবাদকর্ম সহজ নয়, ভাষার উৎকর্ষের সহায়তা এবং কল্পনা-কুশলতা থাকলে তবেই সার্থক অনুবাদক হওয়া যায়। আর সেই কর্ম সম্পাদনে একটি মোটা রকমের ডিকশনারী হাতের কাছে থাকলে সেইটুকুই যথেষ্ট হাতিয়ার নয়।

এ কথা স্বীকার করতে হয় যে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা অনেক ভালো এবং অনেক প্রবীণ লেখক অনুবাদককে হীনকর্মা বলে মনে করেন না। কিন্তু এই বিভাগে অনেক অযোগ্য ভাগ্যান্বেষীর ভীড় হওয়ায় কিঞ্চিৎ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি বিদেশী দূতাবাসের অর্থানুকূল্যে অনেক অযোগ্য অনুবাদক দিয়ে বিশিষ্ট গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অনুবাদ করানোর ফলে সাধারণ পাঠকের অনুবাদে অশ্রদ্ধা জন্মেছে। আজকালকার [illegible] উপন্যাসের নাকি উপযুক্ত অনুবাদ পাওয়া যায় না।

'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' যৌবনে পাঠ করেন নি এমন মানুষ কম আছেন। কিন্তু সেই উপন্যাসের বীরপুঙ্গবরা পরস্পরকে 'মাই ডীয়ার' বা 'মাই ওল্ড' বলে সম্বোধন করতেন কেন। অনুবাদক ডিকশনারীতে "mon" এবং "cher" শব্দটির অর্থ দেখে সোজাসুজি তাই বসিয়ে গেছেন।

আদর্শ অনুবাদককে ভাষান্তরের সমন্বয় করতে হয়, মূল গ্রন্থের আবহাওয়াকে নতুন মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হয়, দুটি ভাষা বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন। সামাজিক পরিবেশ বিভিন্ন। সেই সমস্যাকে তুলে এনে স্বদেশী পাঠকের চোখের ওপর মেলে দেয়।

—অভয়ংকর

ভারতীয় সাহিত্য

মধুসূদনের জন্মদিবস অনুষ্ঠান ॥

গত ২৪ জানুয়ারী আচার্য জগদীশ বসু রোডে মাইকেল মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্রের সামনে তাঁর জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই জন্মদিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। কলকাতার মেয়র, নাগরিকরা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে। তিনি বলেন, "কবি মাইকেল মধুসূদন কাব্যজগতে এক বিপ্লব এনেছেন। কবি ছিলেন প্রকৃত বাঙালী।" মেয়র কবির মৃত্যু শতবার্ষিকী পালনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রার্থনা করেন, "বাংলা দেশের মনকে মধুহীন করো না মা। বাংলাদেশের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।"

কাউন্সিলর শ্রীনরেন্দ্র সর্বাধিকারী বলেন, "কবির স্মরণে তাঁর কাব্য, নাটক ও সাহিত্যকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে।" শ্রীপ্রফুল্লগোপাল দত্ত বলেন, "কবি ছিলেন ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভারতীয় কলম্বস।"

সভায় কাউন্সিলর শ্রীবিমান মিত্র মাইকেল স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাধিক্ষেত্রটি পুনর্বিন্যাস করবার এক প্রস্তাব দেন। তিনি সমাধিক্ষেত্রের পাশে পৌরসভার জমিতে একটি লাইব্রেরী গঠনেরও দাবী করেন। পৌর কমিশনার শ্রীঅমলাচন্দ্র মুখার্জি প্রস্তাব দেন, কবি আলিপুরের যে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেখানে তাঁর নামে একটি ওয়ার্ড করা হোক।

সভায় ডেপুটি মেয়র শ্রীশশকুমার ধাড়া, শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কে পি ঘোষ, শ্রীজগন্নাথ মুখার্জি, শ্রীপান্নালাল দাস প্রমুখও ভাষণ দেন। কলকাতা পৌরসভার এই প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা সকলের অভিনন্দন লাভ করবে বলে আশা করি।

হিন্দী কবির পরলোকগমন ॥

প্রখ্যাত হিন্দি কবি শ্রীমাখনলাল চতুর্বেদী গত জানুয়ারী ভূপালে পরলোকগমন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। হিন্দি সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু গতবছর সরকারী ভাষা বিলের প্রতিবাদে তিনি তা পরিত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে হিন্দি সাহিত্য একজন সুযোগ্য লেখককে হারাল।

জাতীয় পুস্তক মেলা ॥

গত ১৭ই ডিসেম্বর দিল্লিতে 'জাতীয় পুস্তক মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার উদ্বোধন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন। এই মেলার কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য পায় 'কপি রাইট', 'পুস্তক সমালোচনা' ইত্যাদি ভারতীয় পুস্তক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলী। এইসব আলোচনায় বিভিন্ন পুস্তক ব্যবসায়ী সমালোচক সাহিত্যপ্রেমী যোগদান করেন। উদ্যোক্তাদের এই প্রচেষ্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ডে লুইসের নতুন সম্মান ॥

পোয়েট লরিয়েট হওয়া নিঃসন্দেহেই ব্রিটেনের কবিদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সেরা সম্মান। দীর্ঘ ৩৭ বছর পোয়েট লরিয়েট থাকবার পর জন মেসফিল্ড যখন গত মে মাসে পরলোক গমন করেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন ঐ দুর্লভ সম্মানের পদটির বোধহয় বিলোপ হবে। কিন্তু সম্প্রতি তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গত ১ জানুয়ারি সিসিল ডে লুইস ব্রিটেনের পোয়েট লরিয়েট হন।

সিসিল ডে লুইস

কবি হিসেবে ডে লুইস আজ বিশ্ববিখ্যাত। আধুনিক কবিতার ইতিহাসে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। শুধু কবিই নন, সাহিত্য সমালোচক ও কবিতার অধ্যাপক হিসেবেও তিনি বিশিষ্ট। বর্তমানে ডে লুইসের বয়স হল ৬৩ বছর।

গোর্কি জন্মশতবার্ষিকী ॥

গোটা পৃথিবী জুড়েই এ বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছে ম্যাক্সিম গোর্কির জন্মশতবর্ষ উৎসব। আগামী ২৮ মার্চ হল এই মহান লেখকের জন্মশতবার্ষিকী দিবস। এই উপলক্ষে মস্কো থেকে গোর্কির রচনাবলী বিদেশের নানান ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।

মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স হাউস ২ খণ্ডে বাংলা, হিন্দী, উর্দু, স্প্যানিশ, আরবি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত গোর্কি রচনাবলী প্রকাশ করছেন। গোর্কির নির্বাচিত গ্রন্থাবলী ৬ খণ্ডে ইংরেজিতে বেরুচ্ছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত বিশ্ব-সাহিত্য সংস্থা ৫০ খণ্ডে রুশ ভাষায় গোর্কির এক সুবৃহৎ সমগ্র রচনাবলী প্রকাশ করছে। বলা বাহুল্য এ জাতীয় গ্রন্থাবলী প্রকাশ সোভিয়েতে এই প্রথম হতে যাচ্ছে। সোভিয়েত [illegible] প্রধান প্রজাতন্ত্রগুলিও নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় গোর্কির রচনাবলীর অনুবাদ প্রকাশ করছে।

গোর্কি-সাহিত্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র বসাবারও ব্যবস্থা আছে। মস্কোয় ক্রেমলিন প্যালেস অব কংগ্রেসে অনুষ্ঠিত হবে 'গোর্কি-ঐতিহ্য ও আধুনিক সাহিত্য', আর্মেনিয়ায় হবে 'গোর্কি ও জাতিসমূহের সাহিত্য' এবং জর্জিয়ায় হবে 'সোভিয়েত ও বিশ্ব ভাষায় গোর্কি সাহিত্যের অনুবাদ' সম্পর্কে আলোচনা। এ ছাড়া এ বিভিন্ন সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে গোর্কির নাটক। 'মেলোদিয়া' সংস্থা এই মহান লেখকের নাটকের রেকর্ড করা পুরো সেট বের করবে। কিয়েভের দভ্‌জেঙ্কো স্টুডিও এবং মস্কোয় মসফিল্ম স্টুডিও গোর্কির গল্প ও উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ দিতে নিযুক্ত রয়েছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন যুগ্মভাবে সাহিত্যে ৬টি গোর্কি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। প্রতিটির মূল্য হবে আড়াই হাজার রুবল।

কাফকার চিঠিপত্র ॥

একালের সাহিত্যান্দোলনে তাঁর স্থান [illegible] নতুন করে বোঝার [illegible] মনে হয় না। সম্প্রতি সোভিয়েতে তাঁর নির্বাচিত [illegible]। [illegible]। এবার হল কাফকার চিঠিপত্রের প্রথম প্রকাশ, সোভিয়েতে পশ্চিম জার্মানিতে।

নতুন বই

জপজী ঃ গুরুনানক বিরচিত। অনুবাদ ঃ সুধীর গুপ্ত। পুঁথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, বিধান সরণি। কলকাতা-৬।

প্রতীচ্যের পণ্ডিতরা মধ্যযুগকে তামিস্র বা তমসাচ্ছন্ন যুগ বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যযুগ হচ্ছে ভক্তিধর্মের প্লাবনের যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ভক্তিধর্মের যে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে মানুষে-মানুষে সকল কৃত্রিম ভেদ বিলুপ্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁর পরিবারবর্গের আবির্ভাব মধ্য যুগের বাঙ্গালী সংস্কৃতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্বেই শিখ জাতির আদি গুরু ও শিখ-ধর্মের প্রবর্তক নানক পশ্চিম পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। এই মধ্যযুগেই ভারত-বর্ষের নানা অঞ্চলে শঙ্করদেব মাধবদেব, জয়দেব, সুরদাস মীরাবাঈ দাদু, তুকারাম প্রভৃতি সাধক ও সাধিকার আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা কুসংস্কার ও লোকাচারের বেড়া ভেঙে সর্ব মানবকে মিলনের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন।

ভারত-পথিকদের সাধনা ছিল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধির সাধনা। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'এই ভারত-পথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায় ভেদবুদ্ধির অহঙ্কার থেকে মুক্তি-লাভের সাধনায়।' কিন্তু এই সকল ভারত-পথিকদের মধ্যেও গুরু নানকের পুণ্য চরিত-কথা ও বাণী যে রবীন্দ্রনাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর রচনায় তার প্রমাণ আছে। গুরু নানকের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির ত্রিধারা প্রবাহিত হয়েছিল, এই ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহন করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। তিনি যে নবধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন বাস্তবিক পক্ষে তা ভারতের সনাতন ধর্মেরই যুগোপ-যোগী সংস্কৃত রূপ। ভারতবর্ষের যে সকল ধর্মের উদ্ভব হয়েছে একজন প্রতীচ্য মনীষী তাদের ভারত-ধর্ম আখ্যা দিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, শিখ ধর্ম প্রভৃতিও সনাতন ধর্মের নানা শাখার ন্যায় ভারত-ধর্মেরই অন্তর্গত বলে তাদের মধ্যে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল ধর্ম-সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্কে অনেকাংশে অজ্ঞ এবং এই অজ্ঞতা যে আমাদের জাতীয় সংহতির অন্যতম অন্ত-রায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য, শিখ-ধর্ম ও শিখজাতি সম্পর্কে যে কয়েকজন স্মরণীয় বাঙ্গালী গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন, তাঁরা শুধু বাংলা সাহিত্যকেই পুষ্ট করেন নি, আমাদের মহৎ আদর্শেও অনুপ্রাণিত করেছেন। রজনীকান্ত গুপ্ত, কুমুদিনী মিত্র, শরৎকুমার রায়, রবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় তাঁর জনৈক অনুগামী শিখধর্ম সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে যে 'শ্লোক-সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও শিখ গুরুদেবের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বাণী ও তাদের অনুবাদ (বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী) গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু গুরু নানক বিরচিত জপজীর মূলানুগ পদ্যানুবাদ (মূল সহ) এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি।

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত মহাশয় গুরু নানক-বিরচিত শ্রীজপজী গ্রন্থের মূল ও পদ্যানুবাদ প্রকাশ করে শিখজাতির আদিগুরুর বাণীর সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় সাধন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

'ভগবানে ভক্তি নাম-সংকীর্তন, জীবে-দয়া, মৈত্রী ও করুণার ভাব, সর্ব মানবে সমদৃষ্টি এবং নিরাকার, নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মে সর্ব-সমর্পণ গুরু নানকের প্রচারিত শিখধর্মের মূল মন্ত্র।'

গুরু নানক বিরচিত শ্রীজপজী গ্রন্থের মূল মন্ত্রটি এই—

'ওঙ্কার, পুরুষ কর্তা, নির্বৈর, নির্ভয় সং,
স্বয়ম্ভু, শাশ্বত তিনি, তাঁহারে জানার পথ
শ্রীগুরুপ্রসাদের জপ,—নানক তা ধ্যানে জানে
আদি অন্তে তিনি সত্য—

সত্য তিনি বর্তমানে।

গুরু নানক বলেছেন,—শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করতে পারে না।

'শ্রদ্ধাভক্তি-হীন নর তাঁর কৃপা নাহি পায়,
শ্রেষ্ঠ জন্ম লভিলেও

লোকে তারে ভুলে যায়'।

আবার যাঁরা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে তাঁর নাম-গান করেন, তাঁরা অনায়াসেই ভব-সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন।

'ভক্ত তাঁর নাম-গানে সত্য পথ জানে জন,
ভব-পারে যায়, যারা করে নাম-সংকীর্তন'।

যাঁরা ধ্যান-যোগী, তাঁরাই আত্ম-দর্শন করেন, নিজেদের [illegible] মুক্তি লাভে অধিকারী হন, এ কথাও গুরু নানক উদাত্ত ঘোষণা করেছেন।'

গুরু নানক ঈশ্বরের অনির্বচনীয়তা [illegible] করেছেন। তাঁর মতে 'নাম বিনা বন্ধু নাই এই বিশ্ব-সংসারে'। [illegible] চন্দ্র, তাঁর মহামায়া-প্রভাবে সর্ব জীব বিমোহিত, আর এই মহামায়ার জন্য দুর্জ্ঞেয় সাধকের নিকটও দুর্জ্ঞেয় ও দুর্বোধ্যমায়া। গুরু নানকও বলেন—

'তাঁর মহামায়া-শক্তি পরিমাপ করিবে কে?
কে পারে উদ্ধার হেথা তাঁর মহামায়া থেকে।
নিরঞ্জন-নিরাকার-নির্দিষ্ট যা তা-ই করো,
বিশ্বস্রষ্টা-প্রভু-কার্যে সতত

সুখে পন্থা ধরো'।

নানক বলেন, যাঁরা শ্রেষ্ঠ মানব, তাঁরাও সেই অসীম, অনন্তের সীমা বা অন্ত পান না। জীব অণুচৈতন্য, তাই সে কেমন করে বিভু-চৈতন্যের সম্যক ধারণা করবে? গুরু নানক বলেন—

'নদ-নদী প্রবাহেরা সাগরে মিশায় যায়,
কি ভাবে জানিবে তারা

কী বিশাল পারাবার'।

শ্রীভগবান আমাদেরই কল্যাণের জন্য আমাদের দুঃখ দান করেন, বৈষ্ণবেরা একেই বলেন দণ্ডানুগ্রহ। গুরু নানকও বলেন—
'কত জনে দুঃখে-দাহে মৃতকল্প হয় হায়,
এ দুঃখ যে তাঁরই দান

এ কথা কি বুঝা যায়!

অধিকার-বাদ ভারতীয় সাধনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুরু নানকের রচিত জপজীতে এই অধিকার-বাদ স্বীকৃতি লাভ করেছে। গুরু নানক বলেছেন—

'কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি—এই তিন পথে তাঁরে পায়,
অধিকারী-ভেদে দান দেন তিনি এ ধরায়'।

এখানে গুরু নানকের উপর গীতার প্রভাব অবশ্য লক্ষ্য করি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কত উদার ছিল, উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি হতেও পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক সুধীর গুপ্ত 'জপজীর' ভূমিকায় গুরু নানক ও গ্রন্থ-সাহেব সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও সারগর্ভ। শিখজাতির আদিগুরু-রচিত পদাবলীর মূলানুগ প্রকাশ করে অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও শিখ সংস্কৃতির মধ্যে সেতু-বন্ধন করেছেন। আমরা 'জপজীর' এই সমূল পদ্যানুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি।"

—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

●

অমৃতস্য পুত্রাঃ— (নাটক) তুষার ঘোষ, প্রকাশক ঃ রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ইন্দ্র লাইব্রেরী, কলেজ স্ট্রীট, কলি—১২, মূল্য ২-৫০।

[illegible] আর প্রেমের উন্মাদনায় [illegible] দিন আর রাতের আলোছায়া, মুহূর্তগুলো ছিন্ন করে শিল্পী সমাজের [illegible] বাসা বেঁধেছে অবহেলিত একটি [illegible]। হাতে একটি তুলি, [illegible]

তস্য তস্য অথবা সূর্য কাঁদলে সোনা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হ্যাঁ ঘনরামই সেই আশ্চর্য মানুষ যিনি পিজারোর অভিযানের নীতি বদলাবার মূলে ছিলেন।

কিন্তু পিজারোর সঙ্গে এক জাহাজেই ত তিনি কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন মধ্যরাতে সেভিলের বন্দর ছেড়েছিলেন বেদের সাজে। গোপনে নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়ার ফন্দিও তাঁর।

তারপর তিনি গেলেন কোথায়। ১৫৩১-এর জানুয়ারী মাসে পিজারো যখন পানামা থেকে তাঁর তৃতীয় অভিযানে বার হন তখন ঘনরাম আর সানসেদো পিজারোর দল থেকে বাদ পড়েছিলেন কেন?

না বাদ তাঁরা পড়েননি। ঘনরাম কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে নিজে থেকেই পিজারোর খাস জাহাজ ছেড়ে পানামায় পৌঁছোবার আগেই সান্তা মার্তায় নেমে গিয়েছিলেন।

সান্তা মার্তার জাহাজ ভেড়ানো পিজারোর পক্ষে শুভ হয়নি। ১৫৩০-এর জানুয়ারী মাসে সেভিল ছেড়ে সান লুকার-এর চড়া এড়িয়ে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গোমেরাতে জাহাজ ধরে তিনি ভাই ফার্নান্ডোর জন্যে অপেক্ষা করেন।

কাপিতান সানসেদো সেভিলে জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে পালাবার সময় যে-আশ্বাস দিয়েছিলেন তা মিথ্যে হয়নি। পিজারোর ভাই হার্নান্দো সেভিল কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর মাতব্বরদের ধোঁকা দিয়ে ঠিকই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

তারপর মহাসাগর নিরাপদে পেরিয়ে তাঁদের জাহাজ ভেড়ে সান্তা মার্তা বন্দরে। এইখানেই পিজারোর লোকলস্করের মধ্যে অনেকে বিগড়ে যায়। সান্তা মার্তার বাসিন্দারা তাদের বেশ দমিয়ে দেয়। এসব বাসিন্দারাও এককালে এসপানিয়া থেকে সোনাদানা আর ঐশ্বর্যের লোভে পাড়ি দিয়েছিল। তারপর তাদের সব আশায় ছাই পড়েছে। জোয়ারে বয়ে যাবার পর স্রোতের জঞ্জালের মত তারা আটকে পড়ে আছে এই জলাজঙ্গলের রাজ্যে।

এসব পোড়-খাওয়া নাকাল মানুষের কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। পিজারোর লোকলস্কর বন্দরে নেমে দুদিন তাদের অভিযান সম্বন্ধে একটু বড়াই করেছিল।

সান্তা মার্তার লোকেরা তাদের উৎসাহে একেবারে বরফজল ঢেলে দিয়েছে।

তারা হেসে যা বলেছে তার সোজা মানে হল এই যে, যার কাছে [illegible] আর কোরো না। খোলামকুচির মত সোনা ছড়ানো এমন দেশ সত্যি কোথাও আছে নাকি। ওইসব গুজব দিয়ে শুধু তাদের স্পেন থেকে ভুলিয়ে আনা।

সান্তা মার্তার লোকেরা নিজেদের দৃষ্টান্তই দিয়েছে। তারাও দেশ ছেড়ে অমনি সব মিথ্যে আশ্বাসে ভুলেই এসেছিল। এসে এখন তাদের এই হাল। তাদের এ-অঞ্চল ত শুধু পচে আছে। 'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশ ত এরও অধম। সে-দেশের কথা জানতে ত আর তাদের বাকি নেই। সে যদি সত্যি অমন সোনার দেশ হত তাহলে তারা নিজেরা পচে মরত এই নরকে। পিজারোকে যে স্পেন পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছে লোকলস্কর আনতে, তাতেই ত তার ফাঁকিটা বোঝা উচিত। হাতের কাছে এখানে লোক পেলে সাগরপারে তাকে পাড়ি দিতে হয়?

মুখে একটু-আধটু তর্ক করবার চেষ্টা অবশ্য পিজারোর লোকেরা করেনি এমন নয়, কিন্তু তাদের মনে একটু ভয়ে পোকা ঢুকতে শুরু করেছে সেই থেকেই।

কিন্তু সে-দেশ কেমন কেউ ত ভালো জানে না। দু-একজন শুধু [illegible] আঁচিয়েছে—অন্যরকমও ত হতে পারে।

হ্যাঁ তা পারে বৈকি। আর্কা ডিটাকাহি দিয়ে বলেছেন,—সেখানকার জলহাওয়া নাকি আরো জঘন্য, মশা-মাছি জোঁক পোকা-মাকড়ের ঝাঁক আরো পাগল-করা জ্বালায় কিলবিলে। সাপ আরো বড় আর বিষাক্ত, আর জলে কেমান অর্থাৎ কুমীর আরো ভয়ঙ্কর। সবদিক দিয়েই সে-দেশ ভয়ের ত বটেই।

সান্তা মার্তার বসে কথাগুলো শোনার সঙ্গেই তা মনে দাগ কেটেছে আরো বেশী। স্পেন ছেড়ে যারা নতুন আমেরিকার দ্বীপ-পুঞ্জ, কি হিসপানিওলা কার্তাহেনা পর্যন্ত এক-আধবার এসেছে তাদের কাছে সান্তা মার্তা সত্যিই প্রেতাত্মার মুলুক।

এরকম জায়গার সঙ্গে তাদের পরিচয়ই নেই। তারা আর যাই হোক খোলামেলা জায়গার মানুষ। এ-ধরনের দমচাপা জঙ্গল-পাহাড় জলাজায়গায় দিনদুপুরেই অন্ধকার দুর্ভেদ্য জঙ্গল তারা কল্পনাই করেনি। শুধু জঙ্গল নয় যেন বিরাট বিস্ময়ে আকাশ ভারী করে রাখা বিরাট সব বন্য। আর দরকারের দলের মত বিদঘুটে সব কীট-পতঙ্গের জানোয়ার এক অন্ত নেই। এ জঙ্গলের অন্ধকারময়তায় যেন সত্যি হয়ে ওঠা দুঃস্বপ্ন।

প্রথম অভিজ্ঞতা যাদের এইরকম নতুন মহাদেশটা আগাগোড়াই ভয়াবহ বলে তাদের বোঝানো খুব কঠিন হয়নি। প্রথম শীকারটুকুই সাধারণের নমুনা বলে তারা মেনে নিয়েছে।

এরকম ধারণা ঠেকাবার চেষ্টা কেউ করেনি এমন নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হয়নি।

তখন সান্তা মার্তার বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছে সাহসী কিছু রসদ আর জল তোলার সঙ্গে সেপাইদের ছোটখাট একটু-আধটু লেনদেনও চলছে। মাঝি মাল্লা সেপাইরা বেশীর ভাগই বন্দরের লোকজনের সঙ্গে সেই সুযোগে অবসরমত একটু আড্ডা দেয়। আড্ডা মানে অবশ্য শুঁড়িখানায় বসে 'পুলকে' টানা। আমেরিকার-ই একটি অদ্ভুত গাছ আগাভের ডাঁটার রস থেকে গাঁজানো, দুধে রং-এর এই 'পুলকে' তখন নেশা হিসেবে এসপানিওলদের দারুণ পেয়ারের হয়ে উঠেছে।

এই 'পুলকে'-র আসরেই সান্তা মার্তার লোকেরা পিজারোর লোকেদের কান ভাঙিয়েছে।

বাধা দেবার চেষ্টা যে করেছে সে একটা ছেলে মাত্র। পিজারোর দলের লোকেরা তাকে গানাদো বলে জানে। সেভিলের বন্দর ছাড়বার পর জাহাজে নতুন মুখ হিসেবে তাকে দেখা গিয়েছিল। তা নতুন মুখ ত শুধু একটাই নয়। এ-ধরনের অভিযানে হামেশাই তা দেখা যায়। গানাদো নামটা একটু অদ্ভুত কিন্তু ছেলেদের নাম হিসাবে তাও কানে সয়ে গিয়েছে।

কিছু বাধা শুধানো ভার ছেড়ে বলে শুভ-কামনা কি যেমন তেমন করেনি, তেমনি নাইহও নয়। আসলে গানাদোকে নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা ঘামাতেই হয়নি। লোকটা নিজে থেকেই একটু যেন সরে সরে থেকেছে সবকিছু থেকে।

এই গানাদোকে কিন্তু 'পুলকে'-র শুঁড়িখানার আসরে একটু ঘন ঘন দেখা গেছে আর সব দলের সঙ্গে।

সেটাও কিছু এমন অদ্ভুত নয়। 'পুলকে'-র মত নেশার টানে কে না ছোটে আসে।

কিন্তু সান্তামার্তার লোকেদের সঙ্গে তাকে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে সবাই একটু অবাক।

'সূর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের নিন্দে শুনে গানাদো অবশ্য ক্ষেপে-টেপে যায়নি। সে যা বলেছে, তা বিদ্রূপের সুরে।

বলেছে, হ্যাঁ কথাটা মন্দ নয়। নিজের পাতা জালের গর্ত যার ডিঙোবার ক্ষমতা নেই, সে কুয়োর ব্যাঙের পক্ষে বাইরের সব এঁদো পুকুর মনে করাই ভালো।

'পুলকে'-র নেশা বেশ জমে উঠেছে, মুখ দিয়ে পৌঁছোতে একটু দেরী আছে। সান্তা মার্তার মাতালরাই ক্ষেপেছে তারপর।

আমরা কুয়োর ব্যাঙ! নিজেদের মান বাঁচাতে আমরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে দুর্নাম রটাচ্ছি! তাহলে শুনবে একটা ছড়া!

কি ছড়া?—জিজ্ঞাসা করেছে পিজারোর মাঝিমাল্লাদের অনেকে।

গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম প্রমাদ গুনেছেন তখনই। ছড়ার উল্লেখ শুনেই তিনি বুঝেছেন ব্যাপারটা সঙ্গীন।

সান্তামার্তার মাতাল দিব্যি তখন ছড়া আওড়াতে সুরু করেছে—

পুয়েস সেনিওর গোবেরনাদর
মিরেলো বিয়েন পোর এন্তেরো
কুয়ে আয়া ভা এল রেকোহেদর
ই আকা কুয়েদা এল কার্নিসেরো

এ-ছড়া আওড়ানো শেষ হবার পর গানাদোকে আর সেখানে দেখা যায়নি। অবশ্য বেগতিক দেখে গানাদোরূপী ঘনরাম সরে পড়েছেন আগেই।

কেন? ঘনরাম ওই ছড়া শুনেই পালালেন কেন? ও-ছড়া ভূতের মন্ত্রতন্ত্র নাকি!—শিবেনদের বাঁকা মন্তব্যের মত মনে শিবপদবাবু জো পেয়ে চিমটিটুকু কাটলেন।

না, ভূতের মন্ত্র নয়। কথায় অবহেলা হয়ে দাসমশাই কিন্তু অনায়াসে এ-বেয়াদপি মাপ করে বললেন, তবে এ বড় সাংঘাতিক ছড়া। এ-ছড়ার মানে শুনেই ঘনরাম বুঝেছিলেন যে সান্তা মার্তা তাঁদের পক্ষে বেশ একটু শক্ত জায়গা। এ-ছড়া যারা আওড়ায় তাদের ঠাণ্ডা করবার মত জবাব কখনও তৈরী হয়নি।

কিন্তু ছড়াটা অত সাংঘাতিক কেন? ওর মানেটার কিছু আছে? কোনরকমে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণ সরল কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলেন,—

হ্যাঁ, মানে আছে বই কি!—দাসমশাই অনুকম্পা করে জানালেন, আর সেই মানেটার জন্যেই ছড়াটা সাংঘাতিক। ও-ছড়ার বাংলা মানে মোটামুটি এইরকম করা যায়—

কোতোয়ালসাহেব থাকুন হুঁশিয়ার,
আড়কাঠিটার ওপর রাখুন নজর!
ভেড়ার পাল সে যায় তাড়িয়ে আনতে
কসাই যেথায় ছুরি শানায় জবর।
এই ছড়াকে...

শিবপদবাবুর টিপ্পনীটুকু নিজেই শুধরে দিয়ে দাসমশাই বললেন,—এই ছড়াকে এত ভয়! সবাই আপনারা তাই ভাবছেন নিশ্চয়। ছড়াটার ইতিহাস জানলে তা আর ভাবতেন না। ছড়াটা রচনা হিসেবেও উঁচু দরের নয়, মানেটুকুতেও এমন অসম্ভব কিছু শুধু কানে শুনে পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় কেন, কারা কবে, ও ছড়া বেঁধেছিল তা জানলে। ও ছড়া বেঁধেছিল পিজারোর আগের অভিযানের কয়েকজন হতাশ নাবিক সেপাই। সোনার দেশের পিজারোর অভিযানে বেরিয়ে তারা তখন সব দিক দিয়ে দুর্দশার একশেষ হয়েছে। কোনো রকমে বেঁচে কিছু পড়ে আছে। কিন্তু পিজারো আর আলমাগ্রো তাদের জোর করে গাল্লো নামে এক জঘন্য দ্বীপে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করেন। বেগতিক অবস্থা বুঝে নাবিক-সেপাইদের বেশীর ভাগই তখন পানামায় তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের অবস্থার কথা জানাবার চেষ্টা করে। গাল্লো দ্বীপে এক দলকে রেখে নেহাৎ রুগ্ন আর অনিচ্ছুক কয়েকজনকে নিয়ে আলমাগ্রো তখন নতুন লোকজন আর রসদ সংগ্রহ করে আনতে একটি জাহাজে পানামায় ফিরছেন। এই জাহাজে ফিরে-যাওয়া সেপাইদের মারফতই গাল্লো দ্বীপে যাদের থাকতে বাধ্য করা হয় তারা তাদের চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আলমাগ্রো সে সব চিঠি কেড়ে নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে পানামায় পৌঁছোবার রাস্তা বন্ধ করেন। তা সত্ত্বেও একটি চিঠি পানামায় গিয়ে পৌঁছোয়। পৌঁছোয় আবার যার তার কাছে নয়, একেবারে খোদ শাসনকর্তা পেড্রো দে লস রিয়সের বিবিসাহেবের কাছে।

কেমন করে এ চিঠি তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। সাধারণের মধ্যে নেই বলে আলমাগ্রো তা তন্ন তন্ন করে খুঁজিয়ে লেখা কাগজের একটা টুকরোও কোথাও জাহাজে থাকতে দেন নি। এ চিঠি তাঁর নজর এড়াল কি করে?

(ক্রমশ)

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

দেশে বিদেশে

দ্বিতীয় দিয়েনবিয়েনফ্যুর সূচনা

"ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে নোংরা লড়াই আরম্ভ করেছে তার জন্যে ইতিহাস তাকে কখনো ক্ষমা করবে না।" **লাইফ** ম্যাগাজিনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রুশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ কোসিগিন এই মন্তব্য করেছেন। সাক্ষাৎকারের বিবরণ ২৯ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়েছে।

ইতিহাস কি সেই প্রতিশোধ নিতে আরম্ভ করেছে? ৩০শে জানুয়ারী ভিয়েৎনামে চান্দ্র নববর্ষের শুরু থেকে ভিয়েৎকং গেরিলাদের যে তৎপরতা শুরু হয়েছে তা থেকে এ-কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই তৎপরতা ধাপে ধাপে বেড়ে পরের দিন ৩১ জানুয়ারী একেবারে দ্বিতীয় দিয়েনবিয়েনফু, প্রচণ্ডতা অর্জন করতে চলেছিল। তার জের এখনো থামেনি এবং সহজে থামবে না।

চান্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ভিয়েৎকং তরফ থেকে করা হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী পক্ষ তা সরাসরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। গেরিলা তৎপরতা তার পরেই তীব্রতা লাভ করে।

২৯ নভেম্বর গেরিলারা আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে অন্ততঃ দুটি শহর দখল করে নেয় এবং অন্যে সাতটি শহরে মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীকে বিপন্ন করে তোলে।

পরের দিন প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর গেরিলারা অবশ্য পিছু হটতে বাধ্য হয় কিন্তু অনেক মার্কিন মুখপত্রের মতেই মার্কিন যুদ্ধ সরঞ্জামের যে ক্ষতি হয়েছে তা 'ব্যাপক'। এক দানাং ঘাঁটিতেই দুটি মার্কিন বিমান বিধ্বস্ত ও ২৩টি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু তারা পিছু হটেছিল আবার পূর্ণোদ্যমে এগোবার জন্যে। ৩১ ডিসেম্বর গেরিলারা একযোগে রাজধানী সায়গন ও দেশের সর্বত্র আরো গোটা তিরিশেক শহরের ওপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণ যেমন ছিল নাটকীয়, তেমনি ছিল দুঃসাহসী ও প্রচণ্ড। এই আক্রমণের কোন তুলনা নেই। রাজধানী সায়গনে রাতের অন্ধকারে অনুপ্রবেশ করে মার্কিন রক্ষীদের পর্যুদস্ত করে মার্কিন দূতাবাসটি দখল করে নেয় ও ছ' ঘণ্টা তাদের দখলে রাখে। একই সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট থিউ'র প্রাসাদ, রেডিও স্টেশন, মার্কিন সৈন্যদের থাকবার গোটা ছয়েক বাড়ী, দুর্ভেদ্য তান সন নুট বিমানবন্দর এবং সায়গনের উত্তরে বিয়েন হোয়ায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৃহত্তম মার্কিন ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চলায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাঙ্কার এবং প্রেসিডেন্ট থিউ অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছেন। সায়গন থেকে লোকাপসারণ করা হচ্ছে। সারা দেশে সামরিক আইন জারী করা হয়েছে।

ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার পর আমেরিকা এতবড় মার আগে আর খায়নি। ১৯৫৪ সালে দিয়েনবিয়েনফুর পতনের পর গেরিলারা এত বড় শৌর্য আর কখনো প্রকাশ করতে পারেনি। মার্কিন সৈন্যরা পরে অবশ্য দূতাবাস ভবনটি উদ্ধার করে, কিন্তু গেরিলাদের প্রতিহত করা এখনো সম্ভব হয়নি। সায়গনে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে।

১ ফেব্রুয়ারী গেরিলাদের উচ্ছেদ করার জন্যে সায়গনের ওপর বোমা বর্ষণ হয়। কালো ধোঁয়ায় শহর ও শহরতলীর আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তান সন নুট বিমানবন্দরের চারপাশে লড়াই কেন্দ্রীভূত হয়। গেরিলারা একটি হোটেলের ওপরতলা দখল

করে দেয়। প্রেসিডেন্ট থিউ যখন হেলিকপ্টারে করে তাঁর প্রসাদের ছাদের ওপর নামবার চেষ্টা করে তখন ঐ হোটেল থেকে গেরিলারা হেলিকপ্টারের দিকে গুলী করে। শহরের অন্তত ৭টি জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলতে থাকে। অন্তত দুটি এলাকায় দেখা যায় গেরিলারা দরজায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে লোকজনকে বলছে : "আমরা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের লোক, আমরা সায়গনকে মুক্ত করতে এসেছি।"

এদিকে দেশের অন্যান্য অংশে অন্তত পাঁচটি শহর গেরিলারা দখল করে নিয়েছে বলে জানা গেছে। শহরগুলি হল কানাং, দলাত, হুয়ে, ট্রা ভিন ও কোয়াং ত্রি। হ্যানয় বেতারের খবরে দাবী করা হয়েছে যে, সায়গন ও হুয়ে শহরে বিপ্লবী পরিষদ কায়েম হয়েছে।

ভিয়েৎনামের এই নতুন ঘটনাচক্রে মার্কিন কর্তৃপক্ষ স্পষ্টতই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর সামরিক উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করে দিয়েছেন এবং রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট উভয় দলের কাছে অকুণ্ঠ সমর্থন দাবী করেছেন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড ঘোষণা করেছেন, ভিয়েৎকংদের আসল আক্রমণ আসা এখনো বাকী আছে।

আক্রমণের ধরণ দেখে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ভিয়েৎকংরা এবার চূড়ান্ত মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় ডিয়েন-বিয়েনফু সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়েই যদি তারা এই আক্রমণ চালিয়ে থাকে তাহলে অবশ্য এই উদ্দেশ্য আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। এর পর, ধরে নেওয়া যায়, আমেরিকা আরো সতর্ক হবে, প্রেসিডেন্ট জনসন শান্তি আলোচনায় যে-কোন প্রস্তাব এখন সরাসরি অগ্রাহ্য করবেন, মার্কিন কংগ্রেস ভিয়েৎনামে কঠোরতর নীতি সমর্থন করবেন।

কিন্তু তাতেও কি তাঁরা শেষ রক্ষা করতে পারবেন? শুধু নৈতিক ও দুঃসাহসিকতার জন্যেই নয়, ভিয়েৎকংদের সর্বশেষ তৎপরতা ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি সম্পর্কে কতগুলি সত্যকে তুলে ধরে যেগুলি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, রাজধানী সায়গনের ওপর, বিশেষ করে মার্কিন দূতাবাসের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালানো হয়েছে তাতে এটা প্রমাণিত হয়েছে আমেরিকা বহু কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করুক গেরিলাদের গতি রোধ করা সহজ নয়।

দ্বিতীয়ত, পাঁচলক্ষাধিক মার্কিন সৈন্য দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ছেয়ে ফেলার পরেও গেরিলারা যেভাবে সর্বত্র একযোগে এবং অনেকাংশে সফল আক্রমণ চালাতে পেরেছে তাতে এটা দেখা যাচ্ছে যে, এই যুদ্ধ গেরিলা সংগঠনকে এতটুকু কাবু করতে সক্ষম হয়নি এবং গেরিলারা সহজেই যে-কোন সময় মার্কিন-দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীকে দুর্গের মধ্যে বিপন্ন করে ফেলতে পারে।

তৃতীয়ত, এটা অনস্বীকার্য যে, এই ঘটনাগুলো, বিশেষ করে খোদ রাজধানীর

যুদ্ধে একখানি দুঃসাহস কখনই সম্ভব হত না যদি সাধারণ মানুষ ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী বাহিনীরই কোন কোন অংশের সমর্থন গেরিলারা না পেত।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধে জেতা এবং সেই জয়লাভকে স্থায়িত্ব দেওয়া কতখানি সম্ভব? এই কথাটা মার্কিন কর্তৃপক্ষের এখন ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সশস্ত্র বাহিনীর এই চারজন সিনিয়র অফিসারকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। (বামদিক থেকে দক্ষিণে)—লেঃ জেনারেল এস এইচ এফ জে মানেকশ (পদ্মভূষণ); লেঃ জেনারেল এ কে দেব, সিনিয়র এয়ার মার্শাল এস এন গোয়েল এবং মেজর জেনারেল এস পি ভোরা (পরম বিশিষ্ট সেবা পদক)।

শোষিত এখন শাসক

ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার মত শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী মণ্ডল শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব শ্রীমণ্ডলের কপালে লেখা ছিল। নইলে সাধারণ নির্বাচনের সংসদে নির্বাচিত হয়েও রাজনীতি করার জন্যে রাজ্যে থেকে যাবেন কেন? আর বিধানসভার সদস্য না হয়েও ছমাস যুক্তফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রিত্ব করার পর যখন তাঁর মন্ত্রিত্বের পথে সাংবিধানিক বাধা এসে দাঁড়ালো, তখনই বা তিনি সংসদে ফিরে যেতে চাইলেন না কেন?

শোষিত দলের নেতা শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল

তার বদলে, গত আগস্ট মাসে, তিনি যুক্তফ্রন্ট থেকে সতেরোজন সদস্য নিয়ে বেরিয়ে এলেন এবং শোষিত দল নামে একটি দল গঠন করে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন।

গত ১৮ জানুয়ারী বিহার বিধানসভায় ভোটাভুটিতে কংগ্রেস-শোষিত দল আতাতের কাছে মহামায়াপ্রসাদ সিংহের যুক্তফ্রন্ট হেরে গেল। সরকার গঠনের ভার স্বভাবতই এসে পড়ল আঁতাতের ওপর। কিন্তু আবারও একটি সাংবিধানিক বাধা উপস্থিত হয়ে মণ্ডল মশাইয়ের মন্ত্রী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তিনি ইতিমধ্যে বিধানমণ্ডলীর সদস্য না হয়ে ছমাস মন্ত্রিত্ব করে নিয়েছেন। সুতরাং তিনি সদস্য না হয়ে আর কি করে মন্ত্রিত্ব করবেন? আইন অনুযায়ী সদস্য না হয়ে সর্বোচ্চ ছমাস পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব করা যেতে পারে।

কিন্তু মণ্ডল মশাইয়ের তাতে বয়সে চলবে কেন। মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্যেই যে তিনি বিহারে যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটিয়েছেন। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী না হলে তাঁর চলবে কেন?

অতএব তিনি কি করলেন? তিনি সতীশপ্রসাদ সিংহ নামে তাঁর এক অনুগত ভক্তকে সাময়িকভাবে মুখ্যমন্ত্রী করে সরকার গঠন করিয়ে নিলেন। আর সেই সুযোগে পরমানন্দ নামে বিধান পরিষদের একজন মনোনীত কংগ্রেস সদস্যকে অনুরোধ করলেন যাতে তিনি পরমানন্দে মণ্ডল মশাইয়ের জন্যে তাঁর আসনটি ছেড়ে দেন। ছেড়ে তিনি দিলেন। আর সেই জায়গায় ভক্ত সতীশপ্রসাদের পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল নিত্যানন্দ কানুনগো মণ্ডল মশাইকে পরিষদের শূন্য আসনে মনোনীত করে দিলেন।

তারপর? তারপরের কাহিনী অতি সোজা। এবার ভক্ত সতীশপ্রসাদের পদত্যাগের পালা। তিনি পদত্যাগ করলে রাজ্যপাল কানুনগো মণ্ডল মশাইকে সরকার গঠনের জন্যে ডেকে পাঠালেন। আর কোন বাধা রইলো না। শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ মণ্ডল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। শোষিত নেতা এখন শাসকের গদীতে বসলেন।

ভারত-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগ

ভারতবর্ষের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার বৈষয়িক সহযোগিতা একটা নূতন পথ ধরে অগ্রসর হতে চলেছে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের সাম্প্রতিক ভারত সফরের পর এই আশা দেখা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের সফরের শেষে তাঁর ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দ্বারা যৌথভাবে স্বাক্ষরিত যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সহযোগিতার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, উভয় দেশ আশা করে যে, তাদের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হবে। তার উপরে এ বিষয়েও একমত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উপায় হিসাবে তাদের অবশ্যই অর্থনৈতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে সহযোগিতার নূতন পথ খুঁজে বের করতে হবে। উভয় পক্ষ একমত হয়ে স্থির করেছে যে, উভয় তরফের বিশেষজ্ঞরা বিষয়টির বিশদ পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করবেন।

এই বিবৃতির মধ্যে অর্থনৈতিক ও শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েট সহযোগিতার "নূতন পথ অনুসন্ধানের" কথার উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই নূতন পথ কি হতে পারে তার কোন আভাস কোসিগিন ইন্দিরা যুক্ত বিবৃতির মধ্যে দেওয়া হয় নি। কিন্তু কোসিগিনের ভারত সফরকালে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেই যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যার থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়, ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সহযোগিতা কোন্ নূতন পথ ধরে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

প্রস্তাবিত এই নূতন পথটি হচ্ছে, ভারতবর্ষে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ভারতবর্ষে সরাসরি সোভিয়েট মূলধন বিনিয়োগ। গত প্রভাতের দিল্লীতে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার সময় ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং প্রস্তাবটি তোলেন। সংবাদে প্রকাশ যে, প্রস্তাবটি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সহানুভূতি লাভ করেছে।

যদি শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তাহলে ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রে একটি নূতন দিক উদ্ঘাটিত হবে। এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষের শিল্পায়নে যে সাহায্য দিয়ে এসেছে সেটা সীমাবদ্ধ ছিল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ ও স্বল্প হারের সুদে। সোভিয়েট সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির কোনটিতেই সোভিয়েট মূলধন লগ্নী করা হয় নি এবং কোনটির পরিচালনভারেই সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ নেই। এই ব্যবস্থার একটা বড় অসুবিধা এই যে, একটা শিল্প প্রতিষ্ঠা ও চালু করে দিয়েই সাহায্যদাতা দেশের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়, প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি লাভজনক হচ্ছে কিনা, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নেওয়ার ক্ষমতা সেই শিল্পের থাকছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সাহায্যগ্রহীতা দেশের উপর বর্তায়।

সোভিয়েট সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ভারতীয় শিল্পে ইতিমধ্যে এই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানা, রাঁচীর ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা, দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদির উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দেশে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। এই কারখানাগুলিতে যে অর্থ লগ্নী করা হয়েছে তাতে যদি সোভিয়েট রাশিয়ার অংশ থাকত তাহলে সেই লগ্নীর নিরাপত্তার জন্য আগ্রহ আজকের তুলনায় বেশী হত এবং যেসব কারখানায় আজ ঐ ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয় রদবদলে রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া সহজ হত।

সম্ভবত এই বিবেচনাতেই ভারতবর্ষের তরফ থেকে ভারত-সোভিয়েট যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব করা হয়েছে। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী যে এই প্রস্তাব এক কথাতেই প্রত্যাখ্যান করে দেন নি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে। যদি তা হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, সোভিয়েট রাশিয়া বিদেশে পুঁজি নিয়োগ সম্পর্কে মার্ক্সবাদের ঐতিহ্যগত ধারণা থেকে অনেকখানিক অগ্রসর হয়ে এসেছে। একবার যদি সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থার আশা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে পূর্ব ইয়োরোপের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও রাশিয়ার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে, এটা অবধারিত।

এই নূতন যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব ছাড়া অন্যান্য যেসব দিকে ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেগুলির কিছু কিছু উল্লেখ ইন্দিরা-কোসিগিন যুক্ত বিবৃতিতে আছে। দুই দেশই নূতন পরিকল্পনা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছে। দুই দেশের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এই সমন্বয় এমনভাবে করা হবে যাতে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে রাশিয়ায় রপ্তানী করার সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে রাশিয়ার সাহায্যে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উৎপন্ন পণ্যের জন্য সেদেশে যথাসম্ভব বৃহৎ বাজার উন্মুক্ত করা হবে, এটা আশা করা যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, রাশিয়া ইতিমধ্যে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে ভারতীয় রেলওয়ে ওয়াগন ও রেল-লাইন আমদানী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিদেশে ভারতীয় পণ্য রপ্তানী বাড়ানোর জন্য আর একটি পন্থা গ্রহণের প্রস্তাব নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভারতের বাইরে যেসব দেশে রাশিয়া কারিগরী সহায়তা দিচ্ছে সে সব দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভারতীয় সাজসরঞ্জাম আমদানী করতে হবে, সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ থেকে এমন শর্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সোভিয়েট রাশিয়ার বৈষয়িক সহযোগিতার আর একটি নূতন সম্ভাব্য ক্ষেত্র হল—দুর্গাপুরের খনি যন্ত্রপাতি কারখানায় বা যে সকল শিল্পের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম সেগুলির কিছুটা রদবদল করে ঐ কারখানাগুলিকে অন্য কোন ধরনের পণ্য উৎপাদনের উপযুক্ত করে তোলা।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেসাই, শিল্পমন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ ডি আর গ্যাডগিল প্রভৃতির আলোচনায় এইসব বিষয়ে কতকগুলি নীতিগত সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে। এইসব সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করার ভার বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক মাসে দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা একত্র বসে ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্যের প্রসারের জন্য এবং ভারতীয় শিল্পের প্রসার ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘনিষ্ঠতর সোভিয়েট সহযোগিতার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে এবং এই সফরকালে দুই দেশের ভিতর বৈষয়িক সম্পর্কের ভিত্তির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নয়নে সোভিয়েট রাশিয়া আগ্রহবান। ভারতবর্ষে ভারী শিল্প, তৈল শিল্প, ঔষধ শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সোভিয়েট রাশিয়া বিরাট সাহায্য দিয়েছে। এইসব শিল্পোদ্যোগ নষ্ট হতে যাচ্ছে, চাহিদার অভাবে সে সব শিল্পোদ্যোগের উৎপন্ন পণ্যের কাটতি নেই এবং বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে দেখা যাচ্ছে—এমন সম্ভাবনায় রুশ সরকার উদ্বিগ্ন। কোসিগিন-ইন্দিরা যুক্ত ইশতাহারে সেই উদ্বেগের প্রতিফলন হয়েছে।

মনে হয় যেন অলৌকিক কাহিনী।

আসামের দুর্গম অঞ্চলে এক পাহাড়। দুর্ভেদ্য অরণ্যসংকুল সেই পাহাড়ের ওপর একটিমাত্র মূর্তি।

পাথরের মূর্তি। নিকষকালো। যেন কষ্টিপাথর। আকারে মূর্তিটা দানবিক। দর্শনসৌকর্যেও তাই। হঠাৎ দেখলে বুক ধড়াস করে ওঠে—এমন ভয়াবহ।

পুরাকালের কোন্ আরণ্যকের ছেনি আর হাতুড়িতে বিকটদর্শন এই প্রস্তর-দানবের সৃষ্টি, তা জানা যায় না। জানা যায় না কার দুরন্ত কল্পনায় রূপ নিয়েছিল এহেন রক্তজমানো মুখাবয়ব।

শুধু জানা যায়, অন্ধকারের দুনিয়ার বিভীষিকার প্রতীক করালবদন এই মহা-মূর্তির ললাটে ছিল তৃতীয় নয়ন।

পদ্মরাগ প্রহেলিকা

অদ্রীশ বর্ধন

ফাদার ঘনশ্যামের গোয়েন্দা কাহিনী (৮)

পাথরের কিন্তু দামী পাথরের। একটা প্রকাণ্ড পদ্মরাগমণির।

পদ্মরাগের রক্তরাগে জ্বলতো সেই তৃতীয় চক্ষু। ধক ধক করতো গোধূলির অস্তরাগে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল ললাটের খাঁজকাটা শূন্য। পদ্মরাগ উধাও।

•

পদ্মরাগ যেখানে গেছে, গেছে এক ছিনতাই সেখানে। হাত বদল হতে-হতে সাত সিন্ধু ঘুরে এসেছে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ—শত্রুচিহ্নিত আতংকস্বরূপ মহাকায় মন্দিরের তৃতীয় নয়ন পদ্মরাগ।

অবশেষে পৌঁছেছে রাজা অমর-নারায়ণের সংগ্রহশালায়।

আর, তারপরেই ঘটল সেই অলৌকিক লীলা।

হঠাৎ আবির্ভূত হল একটা হাত।

শুধু একটা হাত। কব্জাছাড়া হাত। মুঠোর মধ্যে ধরল প্রকাণ্ড পদ্মরাগকে। অদৃশ্য হয়ে গেল পরমুহূর্তেই।

ভোজবাজির মতই অন্তর্হিত হল পদ্মরাগমণি। কেউ জানল না রহস্যটা; কেউ বলল জিনের কারসাজি, [illegible] অশরীরী-আত্মার দুষ্ট লীলাখেলা।

ঘুরে পেছন ফিরে দেখল বর্তুলবপু নিয়ে পেছন পেছন আসছে ফাদার ঘনশ্যাম।

কাছে এসে বোকা বোকা হাসি হেসে বলল ঘনশ্যাম "বিরক্ত করলাম নাতো?"

"মোটেই না। আপনার থলিটা দেখাবেন বুঝি?"

"না, না। আমি বলছিলাম কি, আপনি মেসমেরিজম এর আগে দেখেছেন?"

"দেখবো না কেন? তবে আজ যা দেখলেম তা স্রেফ বুজরুকি।"

"তবে পদ্মরাগের অন্তর্ধানটা ঘটল কি ভাবে?"

"হাতসাফাইয়ের কারসাজি।"

"এই দেখুন। আমি যা জানি আপনিও তা জানেন। আমি কিন্তু আর একটা জিনিস বেশি জানি" নিরীহকণ্ঠে বলল ফাদার ঘনশ্যাম।

"কী?" দুই চোখ ছোট হয়ে এল করোটি-বিশেষজ্ঞর।

"আপনার প্রকৃত পেশা।"

"সেটা কী?"

"ক্রেনিওলজি আপনার হবি হতে পারে, কিন্তু নেশা নয় পেশাও নয়। আপনার প্রকৃত নেশা এবং পেশা হল গোয়েন্দাগিরি। আপনি একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা।"

•

অপলকে তাকিয়ে রইল সারসপাখী-সদৃশ করোটি-বিশেষজ্ঞ।

তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তাতে কি প্রমাণিত হল?"

"কিসসু না। শুধু সত্যের প্রকাশ ঘটল। সম্ভবত রাণী মার্গারিকাই আপনাকে এখানে অ্যাপয়েন্ট করেছেন। কিন্তু সেকথা থাক। মণিটা কোন দিকে গেল বলুন তো?"

"আমার ভয়ে। কাপালিক বুঝেছিল আমি কে তাই।"

কাষ্ঠহাসি হাসল ফাদার ঘনশ্যাম। বলল, "কয়েকটা অতি সামান্য, কিন্তু অতি অদ্ভুত ঘটনা হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে।"

"যথা?"

"এক নম্বর—প্রসেনজিৎ কাপালিকের জারিজুরি ফাঁস করবে জেনেই রাণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কাপালিক তাকে দেখে ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে আর রাজী হল না কেন?"

"বেশ। তারপর?"

"দুই নম্বর—প্রসেনজিৎ শুধু বাঁ হাতে কাপালিককে ধরে রইল কেন?"

"তারপর?"

"তিন নম্বর—প্রসেনজিৎ ডানহাতটা পকেটের মধ্যে রেখে দিয়েছিল কেন?"

"তারপর?"

"চার নম্বর—প্রসেনজিৎ হাতে গ্লাভস্ পরেছিল কেন?"

"তারপর?"

"পাঁচ নম্বর—প্রসেনজিতের চাইতে কাপালিক অনেক শক্তিমান পুরুষ। অথচ প্রসেনজিৎ তাকে একহাতে ধরে রইল—কাপালিক নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টা করল না কেন?"

"আর কিছু আছে?"

"নেই। কিন্তু এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর কি বলুন দিকি?"

"আপনিই বলুন।"

"প্রসেনজিৎ মণি-চোর, কাপালিক নির্দোষ।"

"কথাটা আর কাউকে বলবেন না। সন্দেহ করবে। ভাববে ইদানীং গাঁজা ধরেছেন।"

"সবটা শুনলে তা ভাববে না।"

"তবে শুনি সবটা।"

"প্রসেনজিৎ কাপালিককে হাত দেখায়নি কেন? কারণ আগে থেকেই ডানহাতে মণি রাখা ছিল। দস্তানাও পরেছিল সেই কারণে। প্রসেনজিৎ কাপালিককে বাঁহাতে ধরেছিল কেন? কারণ হাতের এপাশ দিয়ে সে বাঁহাতে ধরেছিল কাপালিককে, আর ওপাশ দিয়ে [illegible] ডানহাত বাড়িয়ে ধরেছিল মণিটাকে। পেছন থেকে আমরা তাই দেখেছি শুধু একটা হাত। [illegible] সে হাত কাপালিকেরই ভেবে নিয়েছি। হাত সাফাইয়ের কায়দায় মণিটাকে পকেটস্থ করে এই কারণেই প্রসেনজিৎ ডানহাত আর বার করেনি।"

শুনতে শুনতে প্রাইভেট ডিটেকটিভের মুখের ভাব পালটে যাচ্ছিল। চোখজোড়ার জায়গায় ফুটে উঠেছিল নির্ভেজাল বিস্ময়। এবার তোতলাতে বলল, "কিন্তু কাপালিক কেন ধস্তাধস্তি করেন নি?"

"কাপালিকের চরম ঈপ্সা কি? অলৌকিক ক্ষমতালাভ। কিন্তু অন্য [illegible] এই ক্ষমতার প্রতীক যদি তাকে কেউ দেয়, তবে সেটা না নেওয়াটা বোকামি। কাপালিক বুদ্ধিমান পুরুষ। তাই সব বুঝেও সে মৌনী হয়ে গেছে। কারণ একটা বিরাট অলৌকিক মায়ায় পুরো কৃতিত্বটাই সে পেয়ে যাচ্ছে বিনা পরিশ্রমে। বরং আশীর্বাদ।"

"কিন্তু প্রসেনজিৎ—"

"জুয়াড়ী ছেলে। রাণীর কাছ থেকে হামেশাই টাকা ধার করত। তাই প্ল্যান করেছিল পদ্মরাগকে উধাও করে দেওয়ার।"

"কিন্তু ফেরত দিল কেন?"

"আমার কাজই তো তাই। পাপীর মনকে অনুতাপের আগুনে পুড়িয়ে শোধন করে দেওয়া।"

সহাস্যকণ্ঠে বলল ডিটেকটিভ, "কিন্তু কাপালিকের ভণ্ডামি আপনার ফাঁস করে দেওয়া উচিত ছিল।"

"বটগাছ বিরাট হয়। তার তলায় পাপী আসে, পুণ্যবান আসে—সবাই আশ্রয় পায়। সব প্রাচীন ধর্মেই এমনি পাপপুণ্যের খেলা চলে সেখানে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করাটা বিবেকে আটকায়না কি?"

* বিদেশী ছায়ায়।

চিড়িয়াখানার বাসিন্দা ফটো : রেখা সেন

এইটি গুপ্তকবির বাংসরিক প্রীতিসম্মিলন উৎসব হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মারা যান ১৮৫৯ খৃঃ ২৩ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫)। প্রভাকর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত।

প্রভাকর ছাড়াও গুপ্তকবি আরো কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করে-ছিলেন। কখনও তার নাম পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকত, কখনও তিনি গোপনেই থেকে যেতেন। প্রভাকর প্রেস থেকে একটি উত্তেজনামূলক পত্রিকা 'পাষণ্ড পীড়ন' প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সংবাদ রসরাজের' তীব্র মসীযুদ্ধ সেকালে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। গুপ্তকবি পাষণ্ড পীড়নে পদ্যে তার মত প্রকাশ করলে গৌরীশঙ্কর রসরাজে পদ্যে উত্তর দিতেন। সেই আক্রমণের ভাষা ছিল যেমন অশ্লীল তেমনি কুৎসাপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছিল ঈশ্বর গুপ্তের। পাষণ্ড পীড়ন ১৮৪৬ খৃঃ ২০ জুন (১২৫৩ সনের ৭ আষাঢ়) প্রকাশিত হয়ে ১৮৪৭ খৃঃ আগস্ট-সেপ্টেম্বরে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। পত্রিকাটি অদ্ভুত কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন সীতানাথ ঘোষ। তিনি পত্রিকার হেড লাইন চুরি করে পালিয়ে যান এবং বিপক্ষ 'সংবাদভাস্করে' যোগ দেন।

প্রভাকর প্রেস থেকে প্রকাশিত আর একটি সাপ্তাহিক হোল "সংবাদ সাধুরঞ্জন"। প্রতি সোমবার প্রকাশিত হোত। ১৮৪৭ খৃঃ আগস্ট মাসে (১২৫৪ সালের ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। বার বৎসর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১২৬৬ সালের বৈশাখে বন্ধ হয়ে যায়।

নানান বিষয়ের মূল্যবান প্রবন্ধ এবং কবিতা প্রচারই ছিল সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রকাশের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বা বন্ধুসজনেরাই ছিলেন এই পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠী। সেকালের জনসাধারণের মধ্যে এর প্রবল সমাদর ঘটেছিল। শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, ছাত্র এবং নারী প্রত্যেকেই প্রায় এর পাঠক ছিলেন।

পত্রিকাটির জনসমাদর এত বেশী ঘটে যে, পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিজ্ঞাপন আসতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ সাধুরঞ্জন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। সম্পাদক হিসাবে নবকৃষ্ণ রায়ের নাম ছাপা হতে থাকে। তিনি ছিলেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। লেখার ব্যাপারে তার মাথা ঘামাত না। নাম ছাপা কাগজের সঙ্গে তার সম্পর্কও বিশেষ ছিল না। সব কাজই করতেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং তার অনুরাগী সহকর্মীরা।

ঈশ্বরচন্দ্র মারা যাওয়ার পর সংবাদ সাধুরঞ্জন নিয়ে একটি মজার ব্যাপার ঘটে। নবকৃষ্ণ রায় সাধুরঞ্জন স্বত্ব গ্রহণ করতে চান। কিন্তু পত্রিকার পরিচালকেরা তাতে অসম্মত হলেন। তারা পত্রিকা থেকে সরাতে তাকে দিতে রাজি ছিলেন; কিন্তু স্বত্ব দিতে চাননি। ঈশ্বরচন্দ্র উইলেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। নবকৃষ্ণ একদিন পোস্ট অফিসে গিয়ে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রাপ্য ছয় মাসের টাকা নিয়ে এলেন। পত্রিকার পরিচালকেরা এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারলেন না। এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে তিনি কোন উত্তর দিতে অসম্মত হন। কিন্তু একদিন রাত্রে হঠাৎ তিনি পত্রিকার হেড লাইন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান। আর সাধুরঞ্জন প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রভাকর কর্তৃপক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হলেন না, তখন তারা 'সংবাদ দিনমণি' নামে আর একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন।

সংবাদপ্রভাকর প্রকাশের এক বছর আগে মেছুয়াবাজার থেকে 'সংবাদ রত্নাবলী' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। মহেশচন্দ্র পাল ছিলেন সম্পাদক। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব ভার ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ওপর। কারণ মহেশচন্দ্রের কোনরকম রচনাশক্তি ছিল না। পরে সম্পাদক হন রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। ১৮৩২ খৃঃ ২৪ জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়। এক বছর আট মাস চলবার পর রত্নাবলী বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ সাহায্য করতেন মেছুয়াবাজারের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।

ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদকীয় দৃষ্টিভঙ্গী বিচারের অন্যতম প্রতিফলন হোল তার রক্ষণশীলতা। উদার মত, প্রগতি চিন্তা এবং সনাতন রক্ষণশীল চিন্তা ধারার টানাপোড়েনে গুপ্তকবি যেন দিশেহারা। পাশ্চাত্য চিন্তা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অনুপ্রবেশের ফলে যে বিকৃত সংস্কৃতির উদ্ভব হচ্ছে তা প্রভাকর সম্পাদকের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দুয়ানী বজায় রাখতে চেয়ে-ছিলেন নিজের ধর্মকে বাঁচাবার জন্য। খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারবোধ এবং ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিরোধও তার মধ্যে সক্রিয় ছিল।

দেশ ও বাংলাভক্তত্বে এই কবি-সাংবাদিকের অধিকাংশ রচনাই বিশিষ্ট। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক দরদী প্রাণের মানুষ। বাংলাদেশে অত্যাচার কোম্পানীর অত্যাচার, নীলকরদের অমানুষিক উৎপীড়ন, বাংলার দুর্গতি তাকে বিক্ষুব্ধ করেছিল বলে তার কলম অনেকবার অগ্নিবর্ষণে সকলকে বিব্রত করে তুলেছিল। বাংলা দেশের মানুষকে পরাধীনতার গ্লানি সম্পর্কে সচেতন এবং আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত করতে গুপ্তকবির ভূমিকা ছিল অনন্য। তিনি লিখেছিলেন,

"মিছা মণিমুক্তা হেম
স্বদেশের প্রিয় প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।"

উনিশ শতকের বহু মনীষীর মতই ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র জীবনটাই কাটিয়েছেন চাকুরে। উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ তার ঘটেনি। জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। নানান প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে এই মানুষটি বহু শিক্ষালাভ করেছিলেন। নানান বিপরীতধর্মী অভ্যাসের মধ্যে স্বীয় চরিত্রকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিলেন।

আদর্শ বৈপরীত্য ।।

প্রভাকর সম্পাদক রক্ষণশীল না প্রগতি-বিমুখ ছিলেন কি না—তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। হিন্দু কলেজের অংশ ব্রাহ্ম-সমাজ, হিন্দুধর্ম সংস্কারকামী মানুষের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তবে সমাজের মুখপত্র ছিল 'এনকোয়ারার' এবং 'জ্ঞানান্বেষণ'। ব্রাহ্মসমাজপন্থী উদার-রক্ষণশীলদের ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'। তাদের সমর্থক ছিল ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা প্রভৃতি পত্রিকা। এই উভয় দলের প্রতি রক্ষণশীলদের তীব্র আক্রমণ নানাভাবে ফেটে পড়েছিল তাদের ইতিমধ্যেই রাজ্যের সতীদাহপ্রথা বন্ধ হয়েছে। ভাবনা তখন ছিল প্রতিজ্ঞা পড়া বিয়েনী। এই

পুরুষ না মহিলা?

মহিলা হলেই ভাল হয়।

বেশ, আমার এইমাত্র মনে পড়ল, আমার এক শালী মিস মজুমদার পেয়িং গেস্ট থাকবার একটা বাড়ি খুঁজছেন। তিনিও বিজ্ঞাপনের কপি পাঠিয়েছেন। তাঁকে আপনি স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন। বিয়ে-থা করেননি ভাল চাকরি করেন, টাকাপয়সার ব্যাপারে উটু-দি-পাই মিটিয়ে দেবেন আপনাকে।

কি নাম? কোথায় কাজ করেন, একটু জেনে নেওয়া ভাল।

নিশ্চয়ই, এসব জেনে নেবেন বইকি। মিস মজুমদার মানে, হেলেন মজুমদার, ইস্ট-ওয়েস্ট ক্লাকটন্‌-এর সেক্রেটারী। ঠিকানাটা আপনাকে দিয়ে দি, আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। এই নিন ওর টেলিফোন নম্বর, ফোনেই আলাপ করে নেবেন। আর কোনো পার্টি যদি আসে এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে তা গছে দেবেন।

টেলিফোনের চিরকুটটুকু বুকপকেটে রেখে সম্পাদকের আশ্বাস নিয়ে রাখহরি বেরিয়ে পড়ে 'সমাজ সেবা' অফিস থেকে। বাড়িতে একটি অপরিচিতা মহিলা থাকবেন, অবিবাহিতা তায় হেলেন......রাখহরি একটা ট্রামে চড়ে বসে এবং পরে দেখে সেটা ভুল ট্রাম।

বিজ্ঞপ্তি প্রচারের আগের একটু ইতি-হাস আছে।

রাখহরি ও তস্য পত্নী বিজনবালা নিজ বাড়িতেই বাস করে। এই শহরে বাড়িটুকু করতে রাখহরির জমানো টাকা সবই ঢালতে হয়েছে কন্ট্রাকটরের পকেটে। তবু দুখানি ঘরের বেশি আর উঠল না। কায়ক্লেশে ছাদে একখানা চিলকোঠা।

একফালি বারান্দায় মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এসে বসে। গল্প করতে চেষ্টা করে কিন্তু কথা যে কেন ফুরিয়ে যায় তা ওরা বুঝতে পারে না।

ঐ দেখ, বিজুদের বারান্দা আজ সরগরম, রাখহরি কথা বাড়াতে চায়।

হ্যাঁ, কেন হবে না? বাড়িতে লোক কত, সবাই মিলে গল্প করলে জমজমাট ত হবেই।

বেশ আড্ডা দিচ্ছে ওরা তাই না?

দেবেই ত, কেন দেবে না।

আমরাও দিই না কেন—কি বল?

ওসব কথা ছাড় দিকি, আমি যা বল-ছিলুম তার কি হল?

কিসের?

দিঘায় যাওয়া। চল না একবার বেড়িয়ে আসা যাক। কত লোক যাচ্ছে। সঙ্গীসাথী জুটতেও অভাব হবে না—তুমি প্রাণখুলে বেড়াবে আর গল্প করবে, আমিও সঙ্গী পাব।

তাত হয়, কিন্তু আটকায় যে এক জায়গায়। বাইরে পা বাড়ালেই পকেটের টাকা কর্পূর হয়ে উড়ে যায়। থাকতো সেরকম ওড়াবার মত, তাহলে দিঘা কেন কাশ্মীর রাণীক্ষেত কিছু বাদ দিতুম কি?

বাড়তি আয়ের চেষ্টা ত নেই তোমার। আর অত হাত লম্বা করে খরচ করলে আর থাকবে কি?

যিনি বলছেন তাঁর হাতটা খুব ছোট।

আমি অমন বেহিসেবী খরচ করি না। যেটুকু দরকার তাই করি। আছি দুটো মানুষ, একটু ভাল না খেলেই বা চলবে কি করে? তোমারই ত মুখে রুচবে না। থাকতো যদি একটা গুঁড়ো তাহলে ভাব দেখি কত খরচ বাড়ত—

ওসব কথা থাক, শোন, একখানা ঘর ভাড়া দিলে কেমন হয়?

ওমা! এর মধ্যে ভাড়াটে? তার রান্নাঘর কোথা দেবে? তার চাই বাথরুম, চাই খাবার ঘর...... হ্যানো ত্যানো......

হয়েছে! একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে, রাখহরি উল্লসিত হয়ে স্ত্রীকে অবাক করে দেয়।

কি হল?

পেয়িং গেস্ট। আজকাল আমাদের মত লোকদের একমাত্র সমাধান হচ্ছে পেয়িং গেস্ট। একটি ভাল গেস্ট পেলে, সঙ্গীকে সঙ্গী আবার মাসে মাসে টাকাও পাওয়া যাবে।

তাত, কিন্তু বাড়ির মধ্যে যে এসে থাকবে, কেমন লোক হবে—আমার সেই চেনা নেই—

সে ত আমাদের হাতে। দেখেশুনে নিতে হবে লোক, রীতিমত বাজিয়ে না নিলে কি চলে? লোক ভাল চাই, সদ্বংশে সচ্চরিত্র—থাকতে পাবে খাওয়া পাবে, বাড়ির লোকের মত বেশ আড্ডা, গল্পও চলবে—কি বল? সঙ্গীকে সঙ্গী আবার পয়সা দেবে।

তা হলে ত ভালই হয়, সংসার খরচটা ওই থেকেই চালিয়ে নেব—

কর্তা-গিন্নী দুজনেই চেষ্টায় থাকে ভাল একটি পেয়িং গেস্টের। কাগজে বিজ্ঞা-পন দেবে নাকি? রাখহরি হিসেব করে, কতরকম লোক এসে হামলা দেবে, তা হোক। তার মধ্যেই বাছাই করতে হবে।

রাখহরি ভাবল, বাড়ির মধ্যে পুরুষ-মানুষ ঢোকানো উচিত হবে না। বিজুর এমন কিছু বয়েস হয়নি। মহিলা গেস্টও এখন পাওয়া যাচ্ছে। মহিলাই ভাল—দেওয়া যাক সমাজ সেবায় একটা বিজ্ঞাপন।

এর পরের কাহিনী আমরা জানি।

রাখহরি ডায়াল করল, টু এইট টু নাইন ডবল ফোর......হ্যালো, আমি একবার মিস মজুমদারকে চাই...ও আপনিই, নমস্কার, আমি রাখহরি......পতিতপাবনবাবুর কাছে আপনার কথা—

ওপার থেকে জবাব এল, ও বুঝেছি, জামাইবাবুর কাছে সব শুনেছি, আপনি পেয়িং গেস্ট চান ত?

হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন।

খুব ভাল কথা, আমি একটা বিজ্ঞাপন দিতে যাচ্ছিলাম। শুনুন আমার কিন্তু পুরো একটা রুম চাই। আপনার ঘরটা কত বড়?

দশ বাই বারো, দক্ষিণে একটু বারান্দাও আছে।

ফাইন। আমার চলে যাবে। বাড়িতে মেম্বার?

আমরা স্বামী-স্ত্রী মাত্র।

ছেলেপুলে?

নাথিং!

যাঃ, আমি আবার বাচ্চাকাচ্চা পছন্দ করি না। আচ্ছা কত দিতে হবে আমায়......

আজকাল যেরকম ত বাজারের অবস্থা। খাওয়া থাকার জন্যে মোট শ দুই টাকার কম পারব না।

তা আপনি যা বলছেন বেশী নয়, অবশ্য যদি খাওয়ার স্ট্যান্ডার্ডটা ভাল হয়। আপনার স্ত্রীই রাঁধেন নাকি?

হ্যাঁ, অদ্ভুত রাঁধে সে, রান্না তার ম্যাজিক। রোজ নতুন একটা কিছু আসছেই। আর বলবেন না, রোজই চাই নতুন আমার।

বাস্ বাস্ আর বলতে হবে না। তাহলে জানুয়ারী মাস থেকে আমি আপনার গেস্ট হচ্ছি। কাল পরশু [illegible] কালই গিয়ে আলাপ সেরে আসব, কি বলেন?

মাথায় চুড়ো করা খোঁপা...রাখহরির স্বপ্নজাল যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে জট পাকিয়ে গেল।

আসুন আসুন, মালপত্রগুলো ভেতরে নিয়ে আসুন......

সুটকেশ হোল্ডঅল ইত্যাদি গাদাপ্রমাণ মালপত্র ভেতরে এল।

বাড়ির বাইরে গাড়ির শব্দ ও কলরব শুনে বিজনবালা আলু বেগুনের ডাল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে নতুন আগন্তুকের সামনে।

ইনি আমার স্ত্রী।

নমস্কার, হেলেন হাত তোলার চেষ্টা করে।

আর ইনি, মানে মিস মজুমদার আমাদের বাড়িতে গেস্ট থাকবেন বলে এসেছেন। তোমায় বলতে একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

বিজনের মুখখানায় কে যেন কালি ঢেলে দিল। বাবা! পেটে পেটে এত—গেস্ট ঠিক ঠাক হয়ে গেছে! তাও আবার বেছে বেছে এক মেমসাহেব!

আপনাদের বাড়িতে এলুম! অতিথি হয়ে থাকতে চাই...হেলেন কথা পাড়ে।

বেশত, এর বেশি বিজনবালার ঠোঁট দিয়ে বেরুল না, আমি চা করে আনি, বসুন—বলেই সে অন্তর্ধান করল।

আচ্ছা, আমার ঘর কোনটা বলুন ত? হেলেন এবার কাজের কথায় নামে।

এই যে, এর পাশের ঘরটাই আপনার... বলে রাখহরি সেই ঘরে নিয়ে গেল হেলেনকে।

এদিক ওদিক তাকিয়ে হেলেন বললে, সব ভাল কিন্তু যাই বলুন ঘরে আলোটা একটু কম।

আচ্ছা, বলতে পারেন, মিস্টার রাখহরি রায়ের বাড়িটা? চোয়াড়ে গাল তক্তার মত চিমড়ে সুট পরিহিত একটি জীব দাঁড়াল রাখহরির সামনে। মাথায় তার পাৎলা চুলে বাদামী আভা, মুখে পাইপ।

আজ্ঞে, এইটেই, আপনি—?

আমি বোকেন বোস, বুঝতে পেরেছেন বোধহয় কেন এসেছি?

ঠিক বুঝতে পারছি না ত—কি ব্যাপার?

হা হা হা ... ...

I am your guest from this day on, I have settled it with your wife

মিসেসকে একবার জিগেস করুন, পাইপ মুখে দেহখানা বাঁকা করে বলল বোকেন।

তাই নাকি? আমি ত শুনিনি...

Strange. আপনি শোনেন নি, আশ্চর্য! এক মিনিট, আমি সুটকেস আর হোল্ডঅলটা নিয়ে আসছি...

দেখুন, আমাদের একজন গেস্টের দরকার ছিল, তিনি ত আগেই এসে গেছেন... এখন—

Good Lord! ভদ্রলোকের কথাই কথা আমি একবার আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি?

রান্নাঘরে চলে গেছে রাখহরি।

ব্যাপারটা কি? তুমি এক চিমড়ে সাহেবকে গেস্ট ঠিক করেছ—? কই একবারও ত বলনি।

তুমি বলেছিলে আমায়?

আহা, তোমায় সব কথা বলতে যাব কেন, এটা ত পুরুষেরই কাজ।

কেন? মেয়েদের কাজ না কেন? আমরাও যে পারি তাই দেখিয়ে দিলুম।

বে-শ! এখন, কথা দিয়েছ যখন, কোথায় থাকবে ঠিক করে দাও। চল, সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে বিজনবালা বাইরে এসেছে।

নমস্কার! আমি বোকেন বোস, কাকিমার সঙ্গে আপনার কথা পাকা ছিল, তাই না? কাকিমা মানে, আপনার বন্ধু পুষ্প বোস—

হ্যাঁ, কিন্তু—

ব্যস, আর কিন্তুর কিছু নেই। রিয়্যালি, সত্যি বলতে কি, আমি আপনার রান্না খাবার লোভেই এসেছি......এত প্রশংসা শুনেছি যে—তাহলে মালগুলো গাড়ি থেকে নামিয়ে আনি—বোকেন তরতর করে নেমে গেল রাস্তায়।

কি হবে এখন? সমস্যার জটিল আবর্তে নিমজ্জমান রাখহরির শুধু এই প্রশ্নটুকু রাখল।

একটু চা ত খাওয়াই আগে, এদের বাড়িতে যখন এসেছে তারপর যা হয় হবে—বলে বিজনবালা ভুবন্ত রাখহরিকে তদবস্থায় রেখেই প্রস্থান করল।

রাখহরি একবার মনে মনে হরিকে স্মরণ করেছে। হরিই ত রাখেন তাকে চিরদিন—এবং তারপরই ঘরে উঁকি মেরে দেখেছে। দেখেছে, হেলেন তার জিনিসপত্র ঘরের তাকে তাকে গুছিয়ে ফেলেছে। জানলাতে নতুন পর্দা ঝুলছে।

আসুন একটু চা খাওয়া যাক, রাখহরি গলায় নরম মিশিয়ে ডাক ছাড়ল হেলেনের উদ্দেশে। বোকেনও এসে বসল। মালপত্র সবই উঠিয়ে এনেছে ঘরের মধ্যে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, যাই বলুন আপনাদের পাড়াটা খুব quiet লাগছে, আমি যেখানে ছিলুম একেবারে কান-ফাটা ঝালাপালা, horrible ট্রাফিকের আওয়াজ। হেলেনকে দেখে সে হাত তুলে বললে, নমস্কার, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি! দাঁড়ান দাঁড়ান, আচ্ছা আপনি কি একটা exhibition করতে আমাদের club-এর হলটা নিয়েছিলেন?

হবে। হেলেনের নিস্পৃহ জবাব। আমরা ত প্রায়ই সেই exhibition করি মাঝে মাঝে—

রাখহরি অধীরভাবে বলে উঠল, আচ্ছা দেখুন, আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটা অনুরোধ—আমাদের মাত্র একখানি ঘর, আমরা একজন গেস্ট রাখতে পারি। ভুলক্রমে আপনারা দুজন এসে গেছেন, এখন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের মধ্যে একজন থাকুন আর একজন—কথা অসমাপ্ত রইল রাখহরির।

Oh never! পাইপ নামিয়ে বোকেন বলে ওঠে, আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। কোথায় যাবো এখন বলুন, বাড়িওয়ালাকে দস্তুরমত নোটিশ দিয়ে এসেছি—এখন খালি বাসা পাবো কোথায়—?

হেলেনও সমস্বরে বলে উঠল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমায় কি চলে যেতে বলছেন মিঃ রায়? আমিও ত বাড়ি ছেড়ে এসেছি। সেখানে এতক্ষণে নতুন ভাড়াটে এসে গেছে......তাছাড়া আমি ত আমার ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছি, দেখে আসুন না......

উনি বুঝি ঐ ঘরটা occupy করেছেন, বোকেন বলে ওঠে, ঠিক আছে, আমি এই ঘরটা নিচ্ছি—তবে ফার্নিচারগুলো সরাতে হবে—

ওটার আ-আ-আমরা থাকি যে—রাখহরির ধরা গলা।

আপনার ত বাড়ি মশায়......হে হে-হে—বোকেন যেন হাসিতে ফেটে পড়ে। আপনারা যেখানে খুশি থাকতে পারেন। কি বলেন মিস—

মজুমদার, কথা জুগিয়ে দিল হেলেন। আপনাদের আবার থাকবার ভাবনা কি? নিজের বাড়ি, যেখানে খুশি থাকতে পারেন ...হিক হিক হিক—হেলেনও হাসির ফুলঝুরি ছাড়ে।

রাগে ছাপে মুখখানা মন্দারি পড়েছে। একটা বিজনবালার একটা রাখহরির।

যাই বল, বিজনবালা কথা পাড়ে। বোকেনবাবু এক কথার লোক, একেই টাকাটা আডভান্স করে দিয়েছে।

মিস মজুমদারও সেদিকে খেলাপ করেনি, রাখহরি পকেটটা চুপ্চুপ মারে। সন্ধেবেলা ব্যাগ খুলে টাকাটা গুঁজে দিয়েছে......যাই হোক, মন্দ হল না—কি বল?

এবার তাহলে বিদায় যাবার আর বাধা কি?

সেকি? এদের খাওয়াবে কে? আমরা গেলে চলবে কি করে? দেখতে পাচ্ছ কিছু, ওপরে নীল আকাশ নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে—মনে কর এটা যেন সমুদ্রতীর। বাইরের এ ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে আমাদের ক্লান্তির গায়ে সেটা বঙ্গোপসাগরের হাওয়া। কল্পনা কর আমরা বিদায় বেড়াচ্ছি—নীচে কিসের শব্দ না? কে যেন হাসছে—

কে আবার? ঝাঁঝিয়ে ওঠে বিজনবালা, দুজনে খুব গল্প চলছে আর মাঝে মাঝে খুব হাসির হুল্লোড় উঠছে। সন্ধ্যে থেকেই ত চলছে।

মন্দ হল না। ওরাও সঙ্গী পেয়েছে গল্প করার—তাই না?

ঐ শোনো, এখন আবার সুরে গান শুরু।

ওটা কিসের?

মেয়েলি গেলেক উঠেছে বোধ হয়—সর্বনাশ করলে গো, বলদুটো গেল আমাদের। বলদুটো গেল! কোথা থেকে দুটো ভূত এসে আমাদের ঘাড়ে চাপল গো।

ছিঃ, অতিথিদের এ কথা বলতে আছে। আহা রে ... ...

আনলেন তাই বলে একেবারে—এখন যে সব ঢবআলারা হয়েছে ঢং পেয়ে বলে কেমন গাইলুম তেমন নয়—এতেও অহনং হেল বেস্তর। বৈঠকী আমেজটা এল, কিন্তু সুরের কারিগরীও রইল অনেকটা খেয়াল গানের মতো। তার মধ্যে খেয়াল গান তো তুই বোধহয় শুনিস নি। সে থাকগে যাক গে—এতেও অনেকটা সহজ হয়ে এল। লোকে বুঝতেও পারল, আনন্দও পেল। মনোহরশাহী কেন? এ নিয়ে বাপু নানান মুনির নানান মত— কেউ বলে কাঁদড়া মনোহরশাহী পরগণার বলে ঐ নাম হল, কেউ বলে এই দশঘরার কাছে মনোহর শাহ বলে একজন প্রথম ঐ ঢং প্রবর্তন করেন বলে ওর ঐ নাম। কেউ বলে কাঁদড়াতেই আউলে মনোহর দাস বলে এক বৈরাগি ছিলেন, তিনিই এই ঢং আমদানী করেন। কিন্তু আমার মনে হয় মনোহরশাহী পরগণার কথাটাই ঠিক, সব জায়গাতেই তো দেখি জায়গার নাম থেকেই ঠাটের নাম।'

এসব ইতিহাস ভাল লাগার কথা নয়—কিন্তু সুরবালার লাগে। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শোনে সে। তার কাছে এ এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। গাইছে সে, বাহবাও পাচ্ছে এতকাল—কিন্তু এ গান সম্বন্ধে যে এত কথা জানবার আছে তা কখনও কল্পনা করেনি। মতি শুধু মুখেই বলে না—একই পদ নিজে বিভিন্ন ঠাটে গেয়ে শুনিয়ে দেয়—তফাৎটা বুঝিয়ে দেয়। তারও যেন নেশা লেগেছে একটা। এতকালের অধীত বিদ্যা আর জ্ঞান কাউকে দেবার জন্যেই বুঝি এতকাল ছটফট করছিল সে, আধার পায় নি। আদৌ শুনতেই চায় না কেউ—এমন মুগ্ধদৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে একাগ্রমনে শোনা তো দূরের কথা। মনে করেও রাখে না। এ রাখবে—এ মেয়েটি, তা ওর মুখের দিকে চেয়েই বোঝে। (রেখেও ছিল। পরবর্তী জীবনে সুরোদিদি বলেছিলেন আমাকে, 'সেদিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে। আজও তেমন চেলা বা সাগরেদ পেলে শিখিয়ে যেতে পারি, আর কিছু না হোক, গুরুঋণ শোধ হয় খানিকটা। কিন্তু শোনাব কাকে? কেউ কি আর আজকাল শিখতে চায়? না শুনতেই চায় এসব?')

'ঠাট বা ধারা কি একটা?' কোন কোন দিন, মুজরো-টুজরো না থাকলে পূর্ব অভ্যাসমতো বিকেলে গা ধুয়ে কুঁচনো শাড়ি পরে [illegible] মেখে পা-ছড়িয়ে বসে গল্প জমতে জমতেও এসব প্রসঙ্গ ওঠে, 'গরানহাটি থেকে একটু হালকা করার জন্যে মনোহরশাহীর চল করা হল কিন্তু তাতেও লোক তেমন নিলে না। তাই লোকের মেজাজ বা মন বুঝে আর একটু হালকা করে ফেললেন পদকর্তা ঠাকুর বিপ্রদাস ঘোষ-মশাই। ঠাকুরমশাই ছিলেন হুগলী জেলার রাণীহাট পরগণার লোক, সেই জন্যেই ঐ ধারাটাকে বলে রাণীহাটী, তা থেকে রেনেটি। এটা কিরকম দাঁড়াল জানিস? গরানহাটিকে যদি ধ্রুপদ বলো, তাহলে মনোহরশাহী হল গে খেয়াল—রেনেটি ঠুংরি। এই [illegible]। এই যে এখন আমাদের পদ হয়েছে—গাইতে গাইতে আসল গান ছেড়ে আখর দেওয়া—এও শুনেছি ঐ বিপ্রদাস ঠাকুরের আসর থেকেই শুরু হয়েছে।

'এ ছাড়া ধরো গে ময়নাডালের দল। মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন গদাধর ঠাকুর তাঁর বংশের সন্তান ছেলেন মঙ্গল ঠাকুর, তাঁর বংশ এখনও কাঁদড়ায় বাস করেন—আদি বাস অবিশ্যি ওখানে নয়—সে ঐ মুর্শিদাবাদের ওদিকে কোথায় যেন শুনিছি—কাঁদড়া তো আমাদের দেশের কাছে—মানে কাটোয়ার কাছাকাছি বর্ধমান জেলায়। তা সে থাকগে যাক গে নিসিংহ মিত্তির হলেন ঐ মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্যসাগরেদ, ওঁদের কাছেই গান শেখেন। এঁদেরই বংশে সেই ধারাটা বজায় রেখেছেন, ময়নাডালের ধারা বলে।... এমন কত বলব। মন্দারিণী ঠাট বলে একটা, গড়মান্দারণ বলে কী একটা নাকি জায়গা আছে—সেখান থেকেই ঐ ঠাটের নাম। সে জায়গা নাকি বাংলার মধ্যে। তবে এসব নতুন নয় কি হাল আমলের নয়। যখন খেতুরে মোচ্ছব হয় তখনও এসব ধারায় লোকে গেয়েছে। ঝাড়খণ্ডী বলো, মন্দারিণী ধারা বলো—এ সবই বহুকাল থেকে লোকে গেয়ে আসছে। ঝাড়খণ্ডী তো খুবই পুরনো আমাদের কড়ুইয়ের গোকুল ঠাকুর পঞ্চকোটের শেরগড়ে গিয়ে বাস শুরু করেন—তিনি যে ধারায় গাইতেন সেইটেই ঝাড়খণ্ডী বলে বলছে। পঞ্চকোট ঐ ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ে তো। মহাপ্রভু যখন নীলাচলে যেতেন ঝাড়খণ্ডের পথেই যেতেন নাকি—পুঁথি-পুস্তকে লেখা আছে। তবে এসব গানের খুব চল হয়নি—যেখানকার জিনিস সেখানেই—ঐ জেলায় কি ঐ পরগণার ভেতরে লোকে গায়। এসব শুনেছি আমি পয়সা খরচ করে লোক আনিয়ে আনিয়ে। তবে ওসব আর শিখিনি, অত পেরে উঠব না, মজুরীও পোষাবে না—তা জানতুম। মোটামুটি বড় যে তিনটে ঠাট—মনোহরশাহী গরানহাটি রেনেটি—এ কটা ভাল করে শিখেছি, গাইতেও পারি। গাইও মধ্যে মাঝে মিলিয়ে মিশিয়ে। ওস্তাদরা শুনলে গাল দেবে—কিন্তু আমার ভাল লাগে—যারা শোনে, তাদেরও মুখ বদল হয়। যে যা বলুক, আমাদের তো এই রোজগার, লোকের ভাল লাগাটা আমাদের আগে দেখা দরকার।'

টাকা হাতে আসতে প্রথমেই শশী-বৌদির ধার শোধ করে এসেছে সুরো। আরও কিছু দেবার জন্যে অনেক করে ধরেছিল, বৌদি রাজী হন নি। সুরো বলেছিল, 'চড়া সুদে যেগুলো নেওয়া আছে সেগুলো অন্তত শোধ করে দাও না বৌদি সুদটা তো বাঁচবে। আমি তো দান করছি না, সে আস্পর্ধা আমার নেই—ধারই দিতে চাইছি। না হয় আমাকেও কিছু সুদ দিও।'

চারুবাবু ধমক দিয়েছেন শুনে, 'এত দুঃখেও তোর চৈতন্য হয়নি সুরো। টাকা জমা, দু'চারখানা গয়না গড়িয়ে নে এইবেলা। চিরকাল দুধ ভাত আসবে—ভাবছিস এমনিই চলবে এখন থেকে—না? এর পর যদি কিছুদিন কোন বায়না না আসে—তখন? টাকা [illegible] কি?'

শশীবৌদি প্রস্তাব করেছিলেন, সেই হারটা ভেঙে আর কিছু সোনা দিয়ে ভারী দেখে একটা হার কিম্বা—কী এখন ফ্যাশন হয়েছে এখন—তাই গড়াতে। সুরো প্রবল-ভাবে ঘাড় নেড়েছে, 'ও হার আমি গলাতে দেব না বৌদি ও তোমার দেওয়া—ও আমার লক্ষ্মী। ও আমার তোলা থাকবে। যদি কোন দিন নিজের ঘরবাড়ি হয়—লক্ষ্মী পাততে পারি—ঐ হার পেতে লক্ষ্মী বসাবো।'

অবশ্য সে সোনার দরকারও হয় না। মাস তিন চারের মধ্যেই চুড়ি বালা হার গড়িয়ে নেয় একে একে। মাকেও গড়িয়ে দেয় কিছু কিছু। কাপড়-চোপড় তো কিনতেই হয়—এগুলো ঠাট বজায় দেবার জন্য। নিত্য বাইরে যাওয়া ভাল ভাল শাড়ি না হলে চলে না। প্রথম প্রথম মতিই শাড়ি ধার করে দিয়েছিল, গয়না পরিয়ে দিয়েছিল, এখন আর তার কাছে নিতে হয় না। মতি বলেছে, এবার দু'তিন সেট সবরকম গয়না গড়িয়ে নেবে তার স্যাকরাকে দিয়ে, এক গয়না রোজ পরে গেলে ইজ্জত থাকে না।

'তাতে একটু বেশী জমক তোর, ভাল দেখে সাতনরী হার আর মুক্তোর কণ্ঠী গড়িয়ে দেব। এ সব কানের জড়োয়া কেয়াপাত আর আলা ঝুমকো। এদিকে পা-সাজানো হলে টায়রা গড়িয়ে নিস একটা ভালো দেখে—' ইত্যাদি।

আরও বলে, 'কী সব এখন নতুন বিলিতি জিনিস বেরিয়েছে মুখে মাখে, তাই একটা-আধটা কিনিস। আমিও দেখেছি, ফরাসীদের তৈরী, দাম কি—একো একো শিশি পাঁচ-সাত-দশ বারো টাকা পর্যন্ত। এখানেও [illegible], চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই বলে। নতুন নতুন, এখন কাঁচা বয়স দেখেশুনে—একটু জেল্লাতে থাকা দরকার। এখন খরচ কেপ্পনতা করতে নেই, যে কাজের যা। বলে, আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারি। মানুষটাকে দেখে যদি ভাল লাগে তখন তার সবই ভাল লাগবে।'

দুঃখদিনের স্মৃতি, দুর্দিনের স্মৃতি প্রথম বয়সের উজ্জ্বল বটে ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসে একটু একটু করে—কিন্তু দুঃখ অত সহজে অব্যাহতি দেয় না। অভাবের চিন্তা ছিল একটা—এখন অসংখ্য দুশ্চিন্তা মাথা তোলে। প্রাচুর্য অন্য বেদনা জাগিয়ে আনে। ভাইটা এখনও নিরুদ্দেশ। নিস্তারিণী আগের মতো আর কান্নাকাটি করে না, সে ধরেই নিয়েছে ছেলে আর তার নেই—তবু নানা সুখাদ্য রাঁধতে গিয়ে তার চোখে জল আসে, এক এক দিন—গণেশ যা বেশী ভাল-বাসত সে সব খাবার রেঁধে—নিজে মুখে তুলতে পারে না।

আর চেয়েও দুর্ভাবনা সুরোর বাবার জন্যে। ভবতারণ যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। কোন যে শক্তি তখনো বাকি আছে তা নেই, মনে হয় যেন আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসছেন। অদম্য দুর্দৈব শক্তি নিয়ে জোর করে দাঁড়িয়েছেন, যেন ঘোড়াকে চাবুক মেরে চালানোর মতো—সম্প্রতি এবার তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভবতারণ নিজেই বোঝেন, [illegible]

বাজারের জন্যেই, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান জিনিস আনায়, নিস্তারিণী রাঁধেও—কিন্তু ভবতারণ কিছুই খেতে পারেন না' পীড়াপীড়ি করলে হাসেন। বলেন, 'এগাই এ পৃথিবীর খাওয়া শেষ করে এনেছেন, আর কেন?... হলও তো অনেক দিন, এবার ছেড়ে দে বৌ।' কোন কোন দিন মেয়েকে বলেন, 'কেন মিছিমিছি টানাটানি করছিস মা, শুধুশুধু খরচ অন্তর কতকগুলো। তার চেয়ে এবার ভরসা করে ছেড়ে দে।... তোর জন্যেই ভাবনা ছিল—এখন সেটাও কমেছে, আর কিছু না হোক, তোর ভাত-কাপড় তুই চালিয়ে নিতে পারবি মনে হচ্ছে, তোর মাকেও কিছু ফেলবি না।... আর তোর ভাই—? না, তার কথা আর ভাবি না। ভেবেই বা কি করব বল। সে তো একরকম নিজের পথ নিজেই দেখে নিয়েছে—।'

মুখে বললেও—তার কথা যে বেশী রকম ভাবেন, আর সেই ভাবনাই যে দিন দিন তাঁকে এমন ক্লিষ্ট এমন কৃশ এমন জীবন-বিমুখ করে তুলছে তা সুরো জানে। তবে এও জানে যে শুধু ভাইয়ের কথা নয়, সেই সঙ্গে ওর কথাও ভাবেন—এখনও পর্যন্ত।

এক একদিন নিস্তারিণীকে বলেন ভবতারণ, 'তখন তুই বিয়ে দিতে চেয়েছিলি সুরোর—কিন্তু তোর কথা শুনিনি। এখন মনে হচ্ছে দিয়ে দিলেই হত। সত্যিই ও ব্রাহ্মণের মেয়ে ছাড়া হতে পারে না। এত তেজ ওর, এত সত্যি কথা ভালবাসে—। তাছাড়া, মায়ের দেওয়া—আজ পর্যন্ত অন্য জাতের ভাতও খায়নি।... তখন যে দিলে আজ একঘর নাতিনাতনি দেখে যেতে পারতুম। ছেলেটা তো বাপে হারানেই গেল। বংশটা আর রইল না। এমন কি আর মহাশয় লোকের বংশ তা—কিছু না, তবু পিতৃকুলের কাছে ঋণটা থেকেই গেল।... যাক গে, কর্তার ইচ্ছের কর্ম। ঠাকুর যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন। আমরা মিছেই ভেবে মরি বৈ তো নয়।'

ঠাকুর যে শেষ করে আনছেন, প্রদীপের তেল যে কমে আসছে—তা সুরোও বোঝে। তবু সে তার চেষ্টার কোন ত্রুটি করে না।

শেষ পর্যন্ত বড় সাহেব ডাক্তারও ডাকে একদিন। কিন্তু তিনিও শুনে ঘাড় নাড়েন—অর্থাৎ ভেতরে কিছু নেই, আর বেশীদিন নয়। ভবতারণ তিরস্কার করেন সুরোকে, 'পয়সাগুলো কি তোর কুটকুট করে রে? গরীবের এসব ঘোড়া রোগ কেন? দেখে বুঝতে পাচ্ছিস না? কলকব্জা অনেকদিন বিনা তেলে ঘুরলে যা হয়—সব ক্ষয়ে গেছে একবার থেকে। এবার এ ফেলে দেবার সময় হয়েছে। মিছিমিছি এর পেছনে এত পয়সা খরচ করছিস কেন? ...তোর এত দুঃখের পয়সা।... তোর রোজগার কিছু ব্যাপারীর গদির রোজগার নয়, যে মালিক পড়ে থাকলেও অপরে চালাতে পারবে। ঈশ্বর না করুন—ঠাণ্ডা লেগে দুদিন গলা ভাঙলে এ কারবার বন্ধ। একটা লোকের গতরের ওপর সব নির্ভর করছে। ...মতিকে দেখেও শিক্ষে হল না তোর? অত বড় ডাকসাইটে গাইয়ে একটু বাত ধরলো তো রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। এইবেলা—মা লক্ষ্মী যদ্দিন আসছেন—দুদিনের জন্যে জমিয়ে রাখ, পোস্টাপিসে কি সব জমানোর আইন হয়েছে, সেখানে রাখ। কোম্পানীর ঘরে টাকা থাকলে কোন ভয় নেই। সোনাদানা করাও গয়নার ঠিক নয়, কোনদিন চোর ডাকাতের পেটে যাবে—এক রাত্তিরে আবার যে-কে সেই, পথের ভিখিরী। লক্ষ্মী দুচার দিন মানুষকে দিয়ে যাচাই করেন, যে যত্ন করে ধরে রাখে তাকেই ফেলে দেন। টাকা নিয়ে এমন অবথা ছিনিমিনি খেলিস নি।'

শেষ হয়ে আসছে তো বটেই। বেশীদিন আর নয়—তা সুরোও জানে। কেবল ভগবানকে ডাকে। মানুষটা তো কখনও অধর্মের পথে চলে নি, শেষ ইচ্ছাটা ওর পূরণ করো ঠাকুর। ছেলেটাকে এনে দাও। একবার শেষ দেখাটাও দেখতে পাবে না!...

ছেলের জন্যে যে কী পরিমাণ আকুলি-বিকুলি করছেন ভবতারণ তা মুখের ভাষায় প্রকাশ করেন না সহজে—বোধহয় এদের মুখ চেয়েই আরও, অকারণে কষ্ট পাবে ভেবেই প্রাণপণে চেপে থাকেন—কিন্তু এক এক সময় মনের সে আকুলতাটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে, চাপতে পারেন না কিছুতেই।

কীর্তনের মুজরো সাধারণত ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষেই হয়—মতির ভাষায় 'খাঁজবাড়ি' ছাড়া শখ করে কেজন আবার কে কমনে দেয়? গোয়ার বাজনদাররা বসে খায়, কেমন 'এটচেট' দেখলে কেরোচিন্তে খাঁচাও বাঁধে—যে গাইতে যায় সে বিশেষ খায় না। মতি খেত না, সেই দেখাদেখি সুরোও খায় না কোথাও। মতি বলে, 'ওতে ইজ্জত থাকে না। কেত্তনওলীকে তো কেউ আর ভদ্দর লোক বামুন কায়েতের মেয়েদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাবে না, আলাদা বসিয়ে খাওয়াবে—হয়ত আমাদেরই দোয়ার বাজনদারদের সঙ্গে বসাবে, উঁচো [illegible] বসানোও আশ্চর্য্য নয়। সে অপমান সেধে নিতে যাই কেন? গান গাইতে চড় খেতে যাওয়া! ...কেন, আমরা কি খেতে পাই না যে, দুবেলা দুটি খেতে গলায় [illegible] একেবারে?'

বসে না খেলেও—দেশির ভাগ বাড়িতেই—খুঁটি করে খাবার তুলে দেয় গাড়িতে। সুরো প্রথম প্রথম নিজের বাড়ি আনত না, মতির বাড়িতেই রেখে আসত—কি চাকর ঠাকুর দরোয়ানের জন্যে। ইদানীং মতি রাগ করে, বলে, 'অত খাবার রেখে যাস কেন? যখন নিয়েই এলি তখন খেতে দোষ কি? এখন তো আমিও পাইনি, খাবার রো আসবেই। তোর পাওনা তুই নিবিনে কেন? কিছু রেখে কিছু দিয়ে যা অন্তত—এ তো আর কেউ পাইকুড়নো এঁটোকাঁটা খাল দেয় না।'

তবু সুরোর যেন কোথায় একটা বাধত। শেষে মতিই জোর করে বাছেন ঠাকুর বা ঠাকরুন—যখন যে থাকে রাঁধুনী তাকে দিয়ে ভাগ করিয়ে কিছু রেখে কিছুটা আবার গাড়িতে তুলে দিতে শুরু করল। শ্রাদ্ধ-বাড়ির খাবার বড় একটা দিত না—শুধু নাম-করা বড়লোকের বাড়ির ছাড়া—তবে দিয়ে দিতে অমপ্রাশনের খাবার নিঃসংকোচে দিত, নির্বিচারে। খাবার অনেক বেশীই থাকত, এদের প্রয়োজনের ঢের বেশী। তিনটে তো প্রাণী, একটা ঝি-কি অবশ্য হয়েছে এখন—তেমনি ভবতারণ খাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন বলতে গেলে। অন্নপ্রাশ-নের এসব খাবার দিতে লজ্জা করত সুরোর, শেষে একদিন ভয়ে ভয়ে প্রস্তাব করতে তিনি হেসে বললেন, 'খাঁজবাড়ির খাবার উনি এমনিই খেতে চান না, অন্নপ্রাশনের বাড়িতে গিয়েও পরিবেশন করেন না—দিয়ে দিয়ে তো আমি আর ছেলেটা, ওসব মজুতের দরকার নেই, যদি ভাল মিষ্টি আসে কোনদিন—আলাদা করে কেউ দেয়—দু একটা দিয়ে যাস। এই তো সোজা কথা—তুইও যেমন জিজ্ঞেস করলি আমিও তেমনি উত্তর দিলুম, এতে আর তোর এত লজ্জা কি?'

তাই দেয় সুরো। অধিকাংশ জায়গাতেই মিষ্টির অংশ আলাদা করে দেয়—হাঁড়ি ভরে। সুরোও আলাদা করে আসতাম দই মিষ্টি রাবড়ি ক্ষীর ওদের দিয়ে আসে। নিস্তারিণীর এটা বাড়াবাড়ি পছন্দ হয় না। আড়ালে চাপা গলায় গজগজ করে, 'ছেড়ে দিয়েছে ভাল জিনিসগুলো তুই খেয়ে রাখ নিয়ে খা—তা নয়, আগভাগ সেরা জিনিস-গুলো নিয়ে চললেন দাতব্য করতে। যেমনি কপাল, চিরটাকাল আমার সমান জ্বালা গেল, যেমন বাপ তেমনি বেটি। এত ঠেকে এত শিখেও চৈতন্য হল না।'

সুরবালা এসব কান দেয় না। সে জানে এত দিলেও যা থাকবে তা ওরা খেয়ে শেষ করতে পারবে না, ফেলা যাবে। বেশিও তুই। মিষ্টি তবু দু একদিন রেখে খাওয়া যায়, তাও অধিকাংশ পচে ওঠে, ফেলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। আর আজকাল তো

বায়ুউদ্ভূত স্ফুটিপারের শব্দের সাহায্যে জনৈক রোগীর মস্তিষ্কে টিউমার পরীক্ষা করা হচ্ছে।

দুগ্ধশালায় পরীক্ষা করে বহুমূত্র, বৃক্ক, যকৃৎ ও হৃদরোগের পূর্বলক্ষণ পাওয়া যেতে পারে।

বিজ্ঞানের কথা
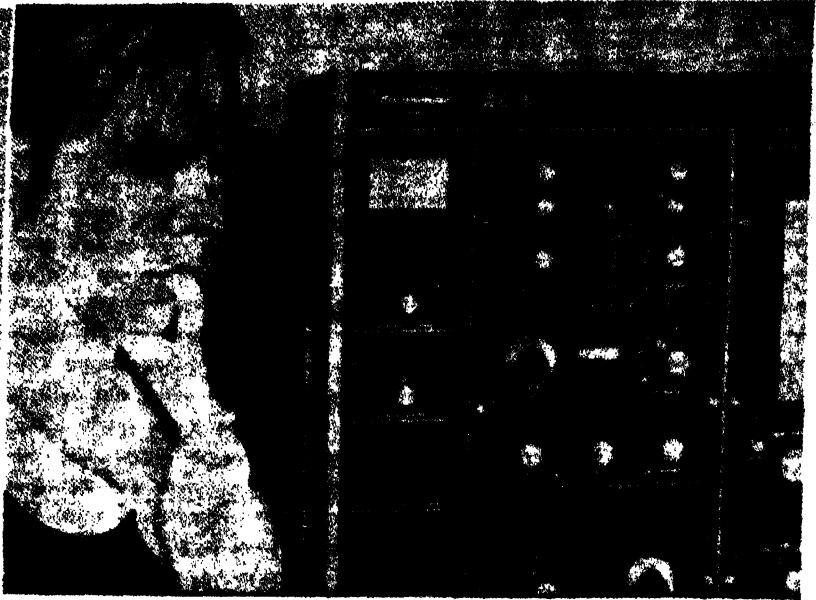
মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে পূর্বাভাষ

এতদিন আমরা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কথাই শুনে এসেছি। এই পূর্বাভাস থেকে দৈনন্দিন আবহাওয়া সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায় এবং অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেয়ে থাকি। আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এমনি ধরনের পূর্বাভাস যদি জানা যায়, তা হলে অনেক রোগ অসুখের হাত থেকে আমরা পূর্বাহ্নেই পরিত্রাণ পেতে পারি। এখন পর্যন্ত স্বাস্থ্যের অবস্থা জানার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়-ব্যবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো। এর ফলে স্বাস্থ্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহলে এমন পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে, যার সাহায্যে প্রকৃত রোগাক্রমণের পূর্বাহ্নেই তার সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে পূর্বাভাস জানানো যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বিষয়ে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হচ্ছে, যাতে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় করে এতদিনের প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক নিবর্তনমূলক চিকিৎসা-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে। এই আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থাকে অভিহিত করা হয়েছে 'প্রিডিক্টিভ মেডিসিন' অর্থাৎ পূর্বাভাসমূলক চিকিৎসা।

এই নতুন চিকিৎসা-ব্যবস্থায় চিকিৎসক কেবলমাত্র রোগাক্রান্ত মানুষের রোগ নির্ণয় করেন না, অধিকন্তু রোগের সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কেও মানুষকে পূর্বাভাস দিতে পারবেন। শুধু রোগের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আহরণের ফলেই এটা সম্ভব হয় নি, নতুন নতুন যন্ত্র ও পরীক্ষার ফলেও আপাতসুস্থ মানুষের দেহে পরবর্তীকালে কোন মারাত্মক রোগাক্রমণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানতে পারায় তা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু নতুন পদ্ধতায় হলে শরীর পরীক্ষার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। যদিও পরীক্ষার পদ্ধতি ভিন্নরকমের, তবে চিকিৎসক সাধারণভাবে দেহের তাপ, রক্তচাপ, নাড়ীর গতি এবং স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দন পরিমাপ করেন। চোখ, নাক, কান, মুখ, গলা ও ত্বক ইত্যাদি শরীরের উন্মুক্ত অঙ্গগুলি তিনি পরীক্ষা করে দেখেন এবং শরীরের বহির্ভাগের কাছাকাছি যেসব আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি আছে সেগুলি টোকা দিয়ে ও আঙুল চালিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি শরীরের বহির্ভাগও পরীক্ষা, স্নায়ুর সাড়া পরিমাপ, মলমূত্রের রাসায়নিক পরীক্ষা এবং এক্স-রে ফটোও পরীক্ষা করে দেখেন।

নিজস্ব জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা চিকিৎসক তারপর এইসব তথ্য যাচাই করেন। এ সমস্ত অনুসন্ধান পূর্বাভাসমূলক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত এবং এসব তথ্যের সঙ্গে যোগ করা হয় উন্নত ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিপ্রদত্ত তথ্য। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে যে কম্পিউটার যুক্ত থাকে তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি গ্রহণ ও সমন্বয় করে চিকিৎসককে সাহায্য করে এবং তাঁর নির্দেশমতো সেগুলি বিচারবিশ্লেষণ করে ফলাফল জানিয়ে দেয়।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের একটি উদাহরণ হচ্ছে 'রোবট কেমিস্ট' অর্থাৎ যান্ত্রিক রাসায়নিক। এই যন্ত্র ঘণ্টায় ১২০ জন রোগীর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদন করতে পারে। যন্ত্রের সম্পাদিত পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য তথ্য মিলিয়ে বহুমূত্র সংক্রান্ত ব্যাধি, গেঁটে বাত, ন্যাবা ও আরো অনেক ব্যাধির পূর্বাভাস দেওয়া যায়।

দুগ্ধশালার রাসায়নিক বিশ্লেষণের সঙ্গে নতুন পদ্ধতায় সম্পাদিত অন্যান্য পরীক্ষার ফল যোগ করে হৃদ্‌রোগ, বহুমূত্র রোগ, বৃক্ক ও যকৃতের রোগের পূর্বাভাস কোনরকম রোগ-সংকেত প্রকাশ পাবার বহু পূর্বেই জানা সম্ভব হয়েছে।

সানফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের জনৈক শারীরতত্ত্ববিদ এমন একটি পরীক্ষাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যাতে সামান্য পরিমাণ রক্তের নমুনার একটি তেজস্ক্রিয় উপাদান মিশিয়ে কয়েক শ্রেণী ক্যানসারের পূর্বাভাস জানা যায়।

ফিলাডেলফিয়ার জেনারেল হাসপাতালের জনৈক হৃদ্‌তত্ত্ববিদ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণ কর্মরত মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক সংকেত পরিমাপ করে তিনি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হৃদ্‌রোগের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তা বলে দিতে পারেন।

'মাল্টি ফেজ স্ক্রীনিং' বলে অভিহিত এই ধরনের বিবিধ পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি থেকে চিকিৎসক কম্পিউটারের সাহায্যে

১৪ রকমের গাছপালা পশুদেহের ক্যানসার দমনে কার্যকর বলে জানা গেছে। ১০ রকমের গাছপালা নিয়ে এখনও পরীক্ষা করা হচ্ছে। আশা করা যায়, পশুদেহের ক্যানসার দমনে ভারতীয় গাছপালার কার্যকারিতা যথাযথভাবে প্রমাণিত হলে মানুষের ক্যানসার রোগে ব্যবহারোপযোগী নতুন ও বিভিন্ন রকমের উপাদানেরও সন্ধান পাওয়া যাবে এদেশে।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী আকাদেমিশিয়ান এ আই ওপারিন, বারাণসীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৫তম অধিবেশনে যোগদানের পর কলকাতায় আসেন। আকাদেমিশিয়ান ওপারিন হলেন সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাখ্ জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ১৫ ও ১৬ জানুয়ারী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের স্বর্ণজয়ন্তী অধিবেশনে যোগ দেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে এই বিখ্যাত সোভিয়েত জীববিজ্ঞানী মনে করেন যে, বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা জৈব-রসায়নবিজ্ঞানেও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদান ক্রমেই অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠবে।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন আজ প্রায় বিশ বছর ধরে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির বাখ্ জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা এবং ১৯৪৬ সাল থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। তাঁর বয়স এখন ৭৪ বছর।

আলেকজান্ডার ইভানোভিচ ওপারিন ১৮৯৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক হন ১৯১৭ খৃঃ ও পরে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। আকাদেমিশিয়ান এ এন বাখের অধীনে তিনি গবেষণা করেন ও পরে তাঁরই সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির জৈব-রসায়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইনস্টিটিউটের নাম হয় পরে বাখ্ ইনস্টিটিউট। ১৯৪৬ সাল থেকেই আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা রয়েছেন।

১৯২৯ খৃঃ থেকে তিনি প্রথমে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও পরে অধ্যাপক হন। ১৯৩৯ খৃঃ থেকে তিনি সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপন্ডিং সদস্য ও ১৯৪৬ খৃঃ থেকে পূর্ণ সদস্য হন। ওপারিন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৫২ খৃঃ তিনি বিশ্ব-বিজ্ঞানকর্মী ফেডারেশনের সহ-সভাপতি। তিনি বুলগেরীয় বিজ্ঞান আকাদেমি, লিওপোলডিনা বিজ্ঞান গবেষণা আকাদেমি, ফিনল্যাণ্ডের রসায়ন-পরিষদ, জাপানের জৈব-রসায়ন সমিতি প্রভৃতির সম্মানিত সদস্য ও জেনার ক্রেডারিক শিলার বিশ্ববিদ্যালয়, পারিস্বয়ু বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সম্মানিত ডক্টরেট।

স্বদেশে বাখ্ পুরস্কার, মেচনিকভ পুরস্কার, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির মেসনিকভ স্বর্ণপদক প্রভৃতি তিনি লাভ করেছেন। সর্বোচ্চ সোভিয়েত সম্মান অর্ডার অব লেনিন, অর্ডার অব গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়র, অর্ডার অব রেড ব্যানার অব সোস্যালিস্ট লেবর প্রভৃতি সম্মানে তিনি ভূষিত। সোভিয়েত মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তিনি সদস্য। "বৃহৎ সোভিয়েত চিকিৎসা-বিজ্ঞান এনসাইক্লোপিডিয়া"র তিনি মুখ্য সম্পাদক।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিনের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অবদানের মধ্যে পড়ে উদ্ভিদ জগতে এনজাইমের ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা, শিল্পক্ষেত্রে জৈব-রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞান-জগতে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান বলে স্বীকৃত।

আকাদেমিশিয়ান ওপারিন ১০০টিরও বেশি বিজ্ঞানপ্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থগুলি হল: "জীবনের উদ্ভব", "পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব", "জীবন: তার প্রকৃতি, উদ্ভব ও বিকাশ", "জীবকোষের এনজাইমের ক্রিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থ।

শুভঙ্কর

মৌমাছির নাচ

কুঞ্জবিহারী পাল

একটি মৌমাছিরজো রাণী থাকে একটি এবং তাকে ঘিরেই মৌমাছির সামাজিক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি। একটি মৌমাছির চাকে চল্লিশ থেকে ষাট হাজারের মত মৌমাছি থাকে। এদের মধ্যে অধিকাংশই হল শ্রমিক-মৌমাছি। এরা সব সময়েই ব্যস্ত রয়েছে মধু সংগ্রহের কাজে। একটি রাণীমৌমাছি কয়েক ঋতু বেঁচে থাকে, কিন্তু শ্রমিক এবং পুরুষমৌমাছিরা দীর্ঘজীবী নয়। রাণী-মৌমাছির গা থেকে একটা বিশেষ ধরনের লালার গন্ধে পুরুষমৌমাছিরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়। এ লালা জিনিসটার বৈজ্ঞানিক নাম অক্সোডেকেন সেনেইক অ্যাসিড। এরই সঙ্গে রাণীমৌমাছির চর্বিকণার দশ কিলোমিটার জায়গায় সব পুরুষমৌমাছি রাণীর কাছে এসে হাজির হয়। উঁচু আকাশের পানে ওড়ার প্রতিযোগিতায় যে সব পুরুষমৌমাছি রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে রাণী তাদের কাছেই দেহদান করে থাকে।

রাণীমৌমাছিকে এরপর অনেক কাজ করতে হয়। কলোনী গড়ার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করে বয়ঃসন্ধিকালীয় কাজে মন দিতে হয় তাকে। ডিমপাড়ার জন্যে ঘর বানিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করা, মৌচাকের কোষ দেখাশুনো করা এবং শূককীটদের সেবা-শুশ্রূষা করা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে রাণীমৌমাছি এসময়। এরপর কয়েকদিন ধরে তার কাজ হল মধু এবং পরাগ জমিয়ে রাখা। বিভিন্ন ফুল থেকে মধু এবং পরাগ সংগ্রহের কাজ করে শ্রমিকমৌমাছি। দিনদিন এমনিভাবে কেটে যায়। এখানে সে মৌচাকের দরজায় প্রহরীর মত অবস্থান করতে থাকে। বাকী জীবনটা তার মধু এবং পরাগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাজেই কেটে যায়। তার শরীরের গঠনও একেবারে সম্পূর্ণভাবেই উপযুক্ত। শূককীটদের সেবাশুশ্রূষা করবার সময় তার মাথার গ্লান্ড থেকে রয়াল জেলি বেরোয় যা দিয়ে সে শূককীটদের খাওয়াতে পারে। আবার যখন মৌচাক তৈরীর কাজ করে সে, তার গ্লান্ড গুলি শুকিয়ে দিয়ে পেটের উপাদান থেকে

ইংরেজি ৮-এর মত

পর্যন্ত কার্যকরী হয়। প্রহরীমৌমাছি এবং শ্রমিকমৌমাছিদের এই সুযোগের ক্ষমতা ফুরিয়ে যায় প্রায় পুরোপুরি।

ফুলে মধু তৈরী হতে শুরু করলেই হাজার হাজার মৌমাছিকে ঘুরেফিরে আসতে দেখা যায় এক ফুল থেকে অন্য ফুলে। কিন্তু কেন এমনটা, জায়গায় যেতে ফুলে

গোল নৃত্য

কখন মধু তৈরী হল বা মৌমাছিরা টের পায় কী করে? বিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন যে, একদল মৌমাছির কাজই হল ফুলে ফুলে ঘুরে কোথায় মধু তৈরী হল তার সংবাদ সংগ্রহ করা। এদের বলা যেতে পারে স্কাউটমৌমাছি। কোন মধুর সংবাদ পেলে এরা পেটভরে মধু খেয়ে চাকে ফিরে আসে। এসময় তাকে খুবই উত্তেজিত মনে হয়। চাকের দরজা দিয়ে সে একদম ছুটে চলে যায় চাকের উপরকার অংশে। সেখানে অন্য মৌমাছির দলের মধ্যে বসে সে পেটের মধু মুখ দিয়ে বের করে দেয়। চাকের মৌমাছিরা তার মুখ থেকে মধু চুষে নিয়ে কেবে জমা করে রাখে। এবারে স্কাউটমৌমাছি চাকের উপর নাচতে শুরু করে দেয়। নৃত্য চলে কয়েক সেকেন্ড, কখনো বা মিনিটখানেকের মত। ফলে যেসব শ্রমিকমৌমাছি চাকের উপর নিষ্কর্মা বসেছিল এতক্ষণ তারা নর্তকীর নাচের অর্থ বুঝে নিয়ে তার নাচের অনুসরণ করতে থাকে। নর্তকী এবার চাকের অন্য অংশে গিয়ে হাজির হয়। সেখানেও সে আগের মতই একটু সময় নেচে নেয়; ফলে এখান থেকেও কিছু সঙ্গী জোটাতে তার বেগ পেতে হয় না। নতুন মৌমাছি নিয়ে সে এবারে ছুটে যায় নতুন আবিষ্কার করা ফুলের কাছে। দলের সকলেই এখান থেকে পেট ভরে মধু খেয়ে ফিরে আসে চাকে। আবার নর্তকীর মত এরা সকলেই মধু জমা করে দিয়ে আগের মতই নাচ শুরু করে দেয়। ফলে একে একে অনেক মৌমাছিই একাজে এদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। মধুসংগ্রহের কাজে এরপর আর কোন অসুবিধেই হয় না।

মধুসংগ্রহের জায়গাটি যদি হয় খুব কাছে তবে মৌমাছিরা যে ধরনের নাচ নাচে তাকে বলা যেতে পারে 'গোলনৃত্য'। এ নাচের আবর্ত একটি কোনো আয়তনের মধ্যে হয়। এ জায়গার মধ্যে পরিমাণ যদি হয় বেশী তবে নাচের উত্তেজনাও থাকে বেশী এবং নাচও চলে বেশী সময় ধরে। আবার মধুসংগ্রহের জায়গাটি যদি হয় বেশ খানিকটা দূরে তবে যে নাচ নাচে মৌমাছিরা তাকে আমরা ইংরেজী 'আটের নাচ' বা 'বাংলা চারের নাচ' বলতে পারি। কারণ অনেক সময়ই এ নাচের পথ গোল হলেও ইংরেজী আট বা বাংলা চারের আকার ধারণ করে একাধারে এ নাচের পদ্ধতি। এ নাচের আবর্ত দুটি বা তিনটি কোনো আয়তনে সমান হয়। নাচের উত্তেজনা ও স্থায়িত্ব আগের মতই মধুর পরিমাণের সফলতা বা প্রাচুর্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। অর্ধ-বৃত্তাকার পথের সরল রেখার অংশ দিয়ে নাচবার সময় নর্তকী তার লেজের দিকটা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ বার করে এদিক-ওদিক নাড়তে থাকে।

নাচের ছন্দ, এদিক-ওদিক কতবার ঘুরে-পাক খাচ্ছে এবং নাচের দ্রুততার উপর মধু-সংগ্রহের জায়গার দূরত্ব নির্ভর করে। মধু-সংগ্রহ স্থান যদি ১০০ মিটার দূরে হয় তবে দেখা যায় যে, নর্তকীমৌমাছি যে 'আটের নাচ' করে তাতে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১১বার অর্ধবৃত্তাকার পথ অতিক্রম করে চলেছে সে। আবার এ দূরত্ব ১৫০ মিটার হলে প্রতি ১৫ সেকেন্ডে ১০বার এবং ২০০ মিটার হলে ১৫ সেকেন্ডে ৮ বার অর্ধ-বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করতে দেখা যায়। যখন দূরত্ব বেড়ে হয় ১ কিলোমিটার তখন এ পথ দাঁড়ায় চারবার মাত্র। একথাও বলা চলে যে, মধুসংগ্রহের স্থানের দূরত্ব যত বাড়বে অর্ধবৃত্তাকার গতির পরিবর্তন হবে তত।

মধুর উৎস যত দূরে হবে লেজের কম্পন হবে বেশী সংখ্যকবার। নর্তকী যখন ১০০ মিটার দূরের পথের জন্যে সঙ্গী সংগ্রহ করে তখন আটের নাচের সরল অংশে দুই কি তিনবার সে তার লেজ নাড়ে। দু'শ মিটার দূরের জন্যে লেজের কম্পন হয় চারবার। আবার সাতশ' মিটার দূরত্বের জন্যে কম্পন দাঁড়ায় দশ বা এগার বার। কাজেই নাচের সময় লেজ নাড়া এবং নাচের দ্রুততা দেখে অনুমান করা সম্ভব কত দূরে রয়েছে মধুর উৎস।

নর্তকী তার নাচের সাহায্যে মধুর উৎসের দূরত্ব বুঝিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না; মধুর উৎস কোনদিকে তারও নির্দেশ দেয় সে তার নাচের সাহায্যে। নাচের সময় সূর্যের অবস্থান, মৌচাক এবং মধুর উৎস—এ তিনটি স্থানে যদি একটি ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক-বিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায় তবে দেখা যায় যে, চাক থেকে মধুর উৎসবিন্দুর ভিতরকার সরলরেখা এবং চাক থেকে সূর্যের অবস্থান-বিন্দু যোগ করে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাদের ভিতরকার কোণই উৎসের দিক-নির্ণয়ে সাহায্য করে। সূর্য, মৌচাক এবং মধুর উৎস যদি একই সরলরেখায় অবস্থিত হয় তবে আটের নাচের সরলরেখার অংশটি চাকের ঠিক উপরেই পড়বে। আবার চাক থেকে মধুর উৎস এবং চাক থেকে সূর্য যোগ করে যে দুটি রেখা পাওয়া যাবে তাদের ভিতরকার কোণটি হয় যদি ৬০ ডিগ্রী তবে নাচের সরলপথটিও চাকের উপর ৬০ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করবে।

নর্তকী যখন দক্ষিণ দিকের কোন মধুর উৎসের সন্ধান পায় তখন সে চাকের উত্তর দিকেই নৃত্য করতে থাকে, তবে এসময় সে তার মাথাটি উঁচু করে রাখে। আবার উত্তর দিকে মধুর উৎস থাকলে নাচবার সময় সে তার মাথা রাখে নীচু করে। পূর্বদিকের উৎসের বেলা মৌমাছি তার মাথা রাখে বাঁদিকে ঘুরিয়ে, আর পশ্চিমদিকের উৎস হলে মাথাটি থাকে ডানদিকে ফেরানো। কাজেই নাচের ধরনধারণ দেখে শ্রমিক-মৌমাছিদের উৎস চিনে নিতে বেগ পেতে হয় না।

আমাদের মত মৌমাছির কোন ভাষা নেই সত্যি, কিন্তু তাদের সামাজিক ব্যাপার-স্যাপার এবং উদ্দেশ্যমূলক নাচের ভাষা দেখলে সত্যিকার তাই অবাক হতে হয়।

প্রভু বললেন, নিরন্তর হরিস্মরণই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। তুমি বৃন্দাবনে যাও। অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম কীর্তন করো। এক নামাভাসেই তোমার পাপদোষ যাবে আর নাম হতেই পাবে কৃষ্ণচরণ।

হরিনাম পরমপাবন। অস্পৃশ্যকে শুচি করে, অতীর্থকে তীর্থ করে। হেলায়-অশ্রদ্ধায় এমন কি বাক্য-পূরণেও নামোচ্চারণ করলে ফল হয়। 'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ কাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়।।'

শুধু নামে নয়, নামাভাসেও হবে। রত্ন যেখানেই রাখো, সিন্দুকেই হোক বা ছাইয়ের গাদাতেই হোক, তার সমান মূল্য। শব্দো নাম তো বটেই নামে-বন্ধ নামের অক্ষরগুলোও অপ্রাকৃত চিন্ময়। তাই নামের মত নামাভাসেও প্রচণ্ড শক্তি। শূকরের দাঁতে আহত হয়ে যবন 'হারাম' 'হারাম' বলে ডেকে মুক্তি পেয়েছিল। বলছে শূকর, ডাকা হচ্ছে রামকে। একেই বলে নামাভাসে মুক্তি। নামাভাসেরই যদি এত শক্তি তাহলে স্পষ্ট নামোচ্চারণ যে প্রত্যক্ষ ফল দেবে তাতে আর কার সন্দেহ? নামের উচ্চারণ যদি অশুদ্ধ হয়, এমন কি অসম্পূর্ণও হয়, কিছু এসে যাবে না, ঐ ত্রুটি ও ন্যূনতায়ও নাম-প্রভাব অম্লান থাকবে। সমস্ত প্রারব্ধ পাপের নাশও এই নামেই। আর নাম ও নামী অভিন্ন বলে নামীর যেমন মহিমা, নামেরও তেমনি।

সুবুদ্ধি রায় বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করল। প্রয়াগ অযোধ্যা হয়ে পৌঁছুল নৈমিষারণ্যে। সেখান থেকে মথুরায়। মথুরায় এসে শুনল প্রভু ব্রজভূমি দর্শন করে ফিরে গিয়েছেন। আরেকবার দেখা হবে ভেবেছিল, হল না।

কী করে জীবিকানির্বাহ করবে সুবুদ্ধি? জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ এনে বাজারে বিক্রী করতে লাগল। কাঠ আনে কী করে? দড়ি দিয়ে বেঁধে, কাঁধে করে। মূল্য পায় কত? এক বোঝা মাত্র পাঁচ পয়সা, খদ্দের সদয় হলে, ছয়। তার থেকে এক পয়সা দিয়ে চানা-চাবানা কিনে নিয়ে খায় আর বাকি পয়সা বেনের দোকানে জমিয়ে রাখে। সে পয়সায় গরিব দুঃখী সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করে। আর যদি সে বাঙালি বৈষ্ণব হয় তাহলে তারজন্যে দধি ভাত তেল কেনে, শুধু মুড়ির বদলে দুই ভাতের জোগাড় দেখে। নিজের জন্যে কিন্তু শুকনো চানার বেশি নয়, না, কখনো নয়।

যে সুবুদ্ধি একদিন অধিকারী ছিল, কত তার দাসদাসী, কত তার ভোগের উপকরণ, সে আজ কিনা এক পয়সার চানা খেয়ে দিন কাটায়। প্রভুর কৃপায় সে বৈরাগ্য-ভূষণ হয়েছে। পরাপেক্ষা নেই, নিজেতেই নিজের নির্ভর, সেই নিরন্তর অনুদ্যম। যেটুকু সঞ্চয় সেটুকুও নিজের ভোগের জন্যে নয়, কাঙাল বৈষ্ণবের সেবার জন্যে।

রূপ ও অনুপম মথুরায় এসে সুবুদ্ধি রায় দেখা করতে গেল। দুই ভাইকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাল ব্রজমণ্ডল। কিন্তু মাসখানেকের বেশি তারা থাকতে পারল না, সনাতন কাশীতে আছে খবর পেয়ে চলল কাশী। গঙ্গাতীরের রাস্তা দিয়ে প্রভু গিয়েছেন শুনে তারা সেই পথ ধরল। আর সনাতনের বৃন্দাবনযাত্রা সটান রাজপথ দিয়ে। তাই কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হল না। প্রয়াগে পৌঁছে রূপ ও অনুপম খবর পেল সনাতন মথুরায় গিয়েছে আর সনাতন মথুরায় পৌঁছে জানল যদিও রূপ-অনুপম মথুরায়ই ফিরেছিল, তারা এখন প্রয়াগে।

সনাতনকে পেয়ে সুবুদ্ধির আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু কঠোর তপস্বী মহাবিজ্ঞ সনাতনের সেবাসুখে স্পৃহা নেই, তাই সুবুদ্ধির সেবার ব্যবহার তার কাছে লোকনীতি নয়। সে তাঁর বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত, কী হবে তার সেবাস্বাচ্ছন্দ্যে?

বৃন্দাবনে পরে যে আনন্দ নিকেতন গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তির প্রথম প্রস্তর সুবুদ্ধি রায়।

(৬৭)

ব্রাহ্মণী বিপ্র

নীলাচলে প্রত্যাগমনকালে মহাপ্রভু শিবঘাটে এসেছেন। সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে দেখলেন রঘুনাথকে।

মুখে নিরন্তর রামনাম, এক ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল হাত জুড়ে। কৃপা করে আমার ঘরে যদি ভিক্ষা পান—ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করল সবিনয়ে।

রাম নাম ছাড়া অন্য কথা বলে না, ব্রাহ্মণে আকৃষ্ট হলেন প্রভু। তার ঘরে অতিথি হয়ে বসে কাটালেন।

পরদিন চললেন অগস্ত্য তীর্থে। অক্ষয়-বটের এসে অঙ্গ স্পর্শ করলেন। ফিরতে এসে দেখলেন হরিদ্বারকে।

ফিরে এলেন শিবঘাটে। সেই ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। এ কী, ব্রাহ্মণ দেখি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনাম বলছে!

এ তোমার কী রকম হল? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, আগে তুমি সর্বদা রামনাম করতে, এখন হঠাৎ কৃষ্ণনাম বলতে শুরু করেছ কেন?

ব্রাহ্মণ বললে, প্রভু তোমার দর্শন প্রভাবে আমার অন্তরের সংস্কার দূর হল। আমি বাল্যকাল থেকে রামনাম করছি, তোমাকে দেখে কেন কে জানে একবার কৃষ্ণ-নাম মনে এল। মনে আসতেই জিভে এল, আর বিনা চেষ্টাতেই বারে-বারে স্ফুরিত হতে লাগল। শাস্ত্রমতে রামও পরব্রহ্ম, কৃষ্ণও পরব্রহ্ম, কিন্তু শাস্ত্রই বলছে রামনামের চেয়ে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য বেশি। শুধু আমি যে রাম-নাম করতাম তার কারণ রাম আমার ইষ্টদেব। কিন্তু তোমাকে দেখে যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কৃষ্ণনাম মুখে এসে গেল, তখনই বুঝলাম সে নামের কী মহিমা!

প্রভু হাসতে লাগলেন।

তুমিই সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণ প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সকলকে, এমন কি নিজেকে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। যিনি জীব-দুঃখ কর্ষণ করে তাঁকে দান করেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই নিত্য আনন্দের উৎস। কৃষ্ণই সুন্দরতম।

[illegible]

একটু সমতল পেয়ে নিঃশব্দে পথ চিনে চিনে নেমে যাচ্ছে। মুখে একটি কথা নেই। কেবল পলক পড়ছে বলেই চেনা যাচ্ছে নদী। তারই ধারে আনা গাছের মতো, আর একটু লম্বা, তবে কলা গাছের মতো অতো লম্বা নয়; পাতাও কলার চেয়ে ঢের সরু গাছের ঝাড়। আর গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা ফুল হয়ে আছে, হানি সাকলের আকার, পাপড়িগুলোর ডগা ঝুঁকে পড়ছে ফুলের নাভিকেন্দ্রের দিকে। স্যাক্সোফোনের ভাঁটির মতো ভাঁটির গায়ে সারি সারি ফুল। অদ্ভুত গন্ধ। ফুল নিলাম। গাছ নেবার জন্য গাছ ধরে টানাটানি করতেই ভিভি এগিয়ে এলো। ওর হাতে কাটলাস।

"কাটলাস? পেলে কোথা থেকে?"

"পুরুষের সঙ্গে আমি যখন বার হই তখন একা থাকলে কাটলাস আনি না। দোকা হলেই কাটলাস আনি। ইটারনাল ট্রায়াঙ্গেল কাটায় সাহায্য করে।"

"এখন তো একা! তবে কাটলাস কেন?"

"কে একা!" হাত ছুঁড়ে বলে ভিভি! "তা হলে কি আর কথা ছিলো! তোমার সোহাগ তো ঐ বুনো ফুল। কাজেই এ ট্রায়াঙ্গল কাটতে হবে। ফুল দ্বন্দ্ব।"

কাটলাস চালাতে লাগলো ভিভি। গভীর নিবিড়। আমার মতো জড়াজড়ি করে আছে।

পাহাড়ী থেকে এবার দেখা যাচ্ছে কোকোর বাগান। খাড়া খাড়া লম্বা কোকো ফলের হলুদ শাখাগুলো দীপ্ত। কফি আর কোকো জন্মাতে হলে বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা দরকার, প্রায় গুমোট হবার মতো। এবং সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাসও দরকার। তাই কোকো এবং কফি বাগানের বুকে দাঁড়িয়ে থাকে বিশাল বিশাল আকাশছোঁয়া গাছ। মেহগনি, ইমোরটেল, হর্তুকীর মতো বুনো গাছ। আজকাল সেগুনের চারা লাগানো হচ্ছে। এদের গায়ে অসংখ্য অর্কিড, অসংখ্য প্যারাসাইট গাছ। এদের ছায়াতলে প্রতিপালিত হচ্ছে শ্রীমান কোকো। শ্রীমতী কফি। কোকো বাগানের শেষ হতেই ধীরে ধীরে মনুষ্য বসতি চোখে পড়ে। চোখে পড়ে পর পর ঝুঁকে পড়া ব্রেড ফ্রুটের গাছ। Moraceal পরিবারের Artocarpus incisa; আমাদের কাঁঠাল গোত্রের, বন সম্বন্ধে পাতাগুলো সাইজেও বড়ো। যেন টেবিলের পাতা। কম্পাউণ্ডারদের স্প্যাচুলা। রবারের গাছের মতো গাছটার দিকে তাকালেই মনে হয় কাঁঠাল জাতির এক কেষ্ট। ফুল হয় যখন তখন দেখে মনে হয় ফুটলে এটা হবে অতিকায় ধুতরো ফুল। কিন্তু কিছুই ফোটে না। যখন ফোটে, তখন দেখা যায় লিচুর মতো, আনারসের মতো এক গুটি ফল। তাই বড়ো হয়ে বড়ো বেলের মতো আকারে ফুটবলের মতো বড়ো হয়। নিরেট ফল। কাটলে শাদা। টুকরো টুকরো, ফালা ফালা, চাকতি চাকতি, যেভাবে ইচ্ছে কেটে সেদ্ধ করে মেখে চটকে খাও, বড়া করে খাও, ভাজনা করো, ভাজো, পেট ভরে খাও। অপর্যাপ্ত, অবিরল,—সারা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জুড়ে ব্রেড ফ্রুটের গাছ। নিগ্রোদের প্রাণ, যেমন বাঙালীর ভাত। ব্রেড ফ্রুট পুড়িয়ে (বেক করে) ভেতরটা কুরে নিয়ে নুন-মশলা মেখে খাওয়া, নারকোল-চিংড়ির মতো প্রেমাস্পদ ভোজন,—এদেশীয়দের।

তবু তফাৎ আছে। এবং সেই তফাতের মধ্যেই লেখা আছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট খেলার মূলমন্ত্র। নিগ্রো মেয়ের মেদের, নিগ্রো ছেলের স্ফূর্তির উচ্ছল মাংসল জীবনযাত্রার, নিগ্রো [illegible] এবং নিগ্রো কৃষ্টির গোপন [illegible] ইতিহাস। সেই গুপ্তিভেদের কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় এসিকুইবোর কফিক্ষেতে দেওরূপ মহারাজের বাগানের কথা।

সেদিন সঙ্গে ছিলো দেওরূপের ম্যানেজার মিঃ গ্রিফিথ। গুয়ানার লোক। পর্তুগীজ বা ইংরেজ বা আরও কোনো জাত খিচুড়ি হবে। নাক আর চুল দেখলে কেউ শাদা বলবে না। কিন্তু ওর চামড়া শাদা। ও নিজেকে শাদাই ভাবতো।

আমি ব্রেড ফ্রুট গাছ দেখে মাত হয়েছি "কী মনোহর গাছ! প্রকৃতির দেওয়া একটা আস্ত ভাঁড়ার ঘর!"

সেদিন গ্রিফিথ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। কালীর মুন্সীঘাটে সহদেও মহারাজকে 'জয় রাধেশ্যাম' বললে যেমন সে কটমট করে চাইতো। ('সীতারাম' বলার ভক্ত ছিলো সহদেও মহারাজ)। গ্রিফিথ মুখ থেকে জ্বালা পাইপটা নামিয়ে বললো, "মনোহর বললেন, আস্ত ভাঁড়ার ঘর? আস্ত ক্রীতদাস করার যন্ত্র। যতদিন এ আছে ততোদিন নিগ্রোর দাসত্ব ঘুচবে না, ঘুচবে না।" অবাক হয়েছিলাম। মাত্র গাছ একটা, বলে কিনা ক্রীতদাসের সেরা মালিক? কিন্তু গ্রিফিথ বলে চলেছিলো, "ঐ যে আপনাদের 'বাউন্টী' জাহাজের বিদ্রোহের কথা নিয়ে ভালেবর ভালেবর সিনেমা হয়ে গেলো, সেই 'বাউন্টি' জাহাজে চড়েই তো তাহিতি থেকে এই গাছের চারা যাচ্ছিলো ইংলণ্ডে। তারপর ক্যাপটেন ব্লাই সেগুলো এনে এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চালান করেন। আর সে কবেকার [illegible]? সেই থেকেই জাল। এই গাছ লাগাতে তো আর কষ্ট নেই। লাগালেই হোলো। দু' তিনটে গাছ থাকলেই একটা পরিবারের [illegible] চলবে। নিশ্চিন্তি! বাস, কোনো নিগ্রো কাজ করবে না; কেবল ঐ গাছে হ্যামক টাঙিয়ে দোল খাবে। করবে কেন? ক্ষিদে পায়, ভাঙো ব্রেডফ্রুট! আলস্য আর কুঁড়েমিতে দেশটা উচ্ছন্নে গেলো। এক এক সময়ে মনে হয় ক্রীটের ছাগল নিপাত করার জন্য যেমন আইন হয়েছিলো, তেমনি ব্রেডফ্রুট নিপাত করার আইন হোক দেশে। নিপাত যাক গাছগুলো। অভাবে স্বভাব যেমন বিগড়োয়, অভাব গেলে স্বভাব আবার ফেরেও না। অতি সুখে রোম মোলো, অতি সহজ জীবনে নিগ্রো মোলো; দেশের শিল্প বাণিজ্য লোপ হয়ে রইলো।"

সত্যি কথাই তাই। মনে পড়ে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৮ জন খালাসী [illegible] ক্যাপটেন ব্লাইকে H. M. S. Bounty থেকে খোলা বোটে নামিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাপটেন ব্লাইয়ের নির্দয় অত্যাচারেই খালাসীরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা [illegible] ৮০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে ক্যাপটেন ব্লাই বাটাভিয়ায় জীবন্ত পৌঁছোন। পৌঁছেছিলো। সেখান থেকে সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হয়ে ইংলণ্ডে ফিরেছিলো। ইতিমধ্যে ব্রেডফ্রুটের চারাগুলো মরে যাচ্ছে দেখে সেগুলোকে ক্যাপটেন ব্লাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জমিতে [illegible] দিয়ে যায়। এখন এই [illegible] বছর পরে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের খানা টেবিলের চেয়ারম্যান শ্রীমান ব্রেডফ্রুট।

চাষ নেই। পরিশ্রম নেই। [illegible] আর [illegible] চায় না। শুধু গাছ থেকেই সব। [illegible] নারকেল আর কলা,—এ তিন থাকতে শ্রম আবার করা কেন? পড়ে আছে বিস্তর মাঠ। সারাদিন খেলো, নাচো, দৌড়ও, ঘুমোও। তাই ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ; নাচে নিগ্রো, গানে নিগ্রো, এ্যাথলেটিক্সে নিগ্রো, মুষ্টিযুদ্ধে নিগ্রো। এতো অবসর, এতো বিলাস আর ব্রেডফ্রুটের গাছ। কোথায় সম্ভব? তাই বলছিলাম ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের এতো যে সুনাম, তার সূত্রসন্ধান ঐ ব্রেডফ্রুটের গাছ! যেখানে সহজ, সেখানে স্ফূর্তি, সেখানেই পরিশ্রম, শৌখিনতা, রোগ, অনাচার। সত্যিকারের ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান জীবন যন্ত্র-মন্ত্র-মদ, জীবন। তার চলা মন্দাক্রান্তা তালে।

ঝকঝকে পী খানা। ফ' মনা। এবার ক্লাব হোটেল পার হয়ে এলাম। ফ' মনা গ্রামখানা একটা ওলন্দাজ উইন্ড-মিল ঘিরে গড়ে উঠেছে। এর গড়নটা তাই গোল। একটা বড়ো পথ বেয়ে গেলে সটান, বিরাট ভারতীয় গাছের সারিতে ঢাকা। ও পথে গেলে আর ক্লাব হোটেলে যাওয়া হবে না।

(ক্রমশঃ)

দের উপর ধূসর এবং নিচটা সাদাটে। দেখেই মনে পড়ে ভারতীয় টিট বা রামগাংরা। সবুজ-পিঠ টিটের এক প্রজাতি (পারুস মন্টিকোলাস) ভারতে হিমালয় অঞ্চলে ৫ থেকে ৮ হাজার ফিটের মধ্যে সাধারণতঃ দেখা যায়। বাচ্চা অবস্থায় কিন্তু সব এশীয় টিটেরই উপরিভাগ সবুজ। এর থেকে প্রমাণিত হয় এরা ইওরোপীয় থেকেই উদ্ভূত।

ভারতীয় রামগাংরা দেশভেদে পাঁচটি উপজাতিতে বিভক্ত। প্রথমটিকে (পারুস মেজর কাশ্মিরেন্সিস) দেখা যায় পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর থেকে গাড়োয়াল। শীতকালে পাঞ্জাবের সমতলভূমিতে নামে। দ্বিতীয়টি (পা মে নিপালেন্সিস) নিম্ন নেপাল থেকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স থেকে আসাম, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম ব্রহ্মদেশ। তৃতীয় (পা মে স্টুপি) আবু পাহাড়, মধ্যভারত, উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা। চতুর্থ (পা মে জিয়ারাটেন্সিস) আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান ও পাঞ্জাবের সমতল। পঞ্চম (পা মে মাহ্রাট্টারাম) সিংহলবাসী। কেবল [illegible] দেখা যায় একটি প্রজাতি (পারুস ন্যুকালিস)—সাদা-ডানা কালো রামগাংরা।

খাদ্য— কীট-পতঙ্গ, তাদের ডিম ও শূক, ফলের কুঁড়ি, ছোটখাটো ফল, ছোট বাদাম ও ফলের বীজের শাঁস।

রামগাংরাকে ভারতের সমতল অপেক্ষা পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় একটু বেশি। সাড়ে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার ফিটের মধ্যে বেশি। তার উপরে দেখা গেলেও তা অল্পসংখ্যক। অবস্থা বিশেষে কদাচিৎ ৯-১০ হাজার ফিটেও দেখা গেছে।

গভীর জঙ্গল না হলেও মোটামুটি বন গাছপালার মধ্যেই এদের জীবনযাত্রা। ঝোপে-ঝাড়েও ঘোরাফেরা আছে। অবশ্য খাদ্যান্বেষণে মাটিতে নামতে মোটেই দ্বিধা করে না। স্বভাবে পরিযায়ী না হলেও প্রজনন-কালের পর বেশ কিছুটা ভ্রমণ করে। সমতলে নেমে আসতে তখন দ্বিধা করে না।

অন্যান্য কীট-পতঙ্গভুক ছোটো পাখির সঙ্গে ছোটো দলে শিকার করে বেড়ালেও সাধারণতঃ জোড়ে কিংবা একা বিচরণ করতে দেখা যায়।

খাদ্যান্বেষণের কায়দাটা দেখতে বেশ লাগে। ছোটো পোকা বা তার শূক কিংবা তার ডিম খুঁজতে প্রতিটি ক্ষুদ্রতম শাখা-প্রশাখা পাতা ও গাছের ছালের ফাঁকে তন্ন তন্ন করে দেখে। সে সময় মাথা ও ঘাড়ের দোলানি দেখলে হাসি আসে। উপর থেকে যখন কিছু দেখা গেল না তখন গাছ ডাল বা ফুল ফলের বোঁটা আঁকড়ে ঝুঁকে উলটো দিকে সম্ভব অসম্ভব জায়গায় খুঁজতে থাকে। তখন কসরত যা দেখায় তা একমাত্র সার্কাসেই সম্ভব। ঠোঁটের বাঁধুনি ও পায়ের মাংসপেশীর শক্ত সাহায্য করে এই কসরত প্রদর্শনে। এক-এক সময় খাদ্য কোনো শক্ত বস্তু গাছের ডালে পায়ে চেপে ধরে মোটা ত্রিকোণাকার চঞ্চু দিয়ে কুড়ুলের মতো সেটাকে ঠুকতে থাকে আহার জন্যে। সেই আওয়াজটা প্রায়ই ভুল করায় কোনো কাঠঠোকরার বলে। বাগানের ফল-ফুল কিছু নষ্ট করলেও অনেক অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ এদের হাতে মারা পড়ে।

হাবেভাবে অর্থাৎ স্বভাবে খুবই স্ফূর্তিবাজ। খাদ্যান্বেষণের সময় পরস্পরের মধ্যে নানা ডাকের আদান প্রদান চালায়। শিস দেওয়ার মতো পরিষ্কার ডাক দেয়—হুইসি-ই হুইসি-ই হুইসি-ই...জুইট জুইট... হুই-চিচি হুই-চিচি হুই-চিচি......।

একবার শিকারে গিয়ে রামগাংরার একটি অদ্ভুত চরিত্রের পরিচয় পেয়েছিলাম। বন গাছপালার মধ্যে এক গাছের ডালে হঠাৎ একজোড়া হরিয়াল দেখতে পাই। তারা আমায় দেখতে পায় নি বা আমার আগমন বুঝতে পারে নি। না হলে অত সহজে জোড়ার মারা সম্ভব ছিল না। উপরের ডাল থেকে পড়ে নিচের ডালে আটকে গেল। সে দুটিকে সংগ্রহ করতে গিয়ে যেই একটা ডালে উঠেছি অমনি হিস্‌ হিস্‌ শব্দে চমকে উঠলাম। আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হই। স্থির হয়ে দেখছি কোথায় কালসর্পী শমন। নাঃ, কোথাও নড়াচড়া নেই। চোখেও কিছু পড়ছে না। আবার ডালের উপর উঠতে গিয়ে হিস্‌ হিস্‌ শব্দ। সেইসঙ্গে মনে হল যেন থুতু ছিটোচ্ছে। লক্ষ করলাম গাছটার কাণ্ডে একটা গর্ত। ক্রুদ্ধ আওয়াজ সেখান থেকেই আসছে। ভালো করে ফোকরটাকে দেখলাম। ভয়টা অমূলক। সামান্য একটা পাখি। গাছের ফোকরে তার বাসায় বসে আছে। খুব সম্ভব ডিমে তা দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম, যার থেকে উদ্ভূত সমস্ত পক্ষিকুল সেই সরীসৃপের একটি ঐ ডাক এত কোটি বছর পরেও বিবর্তনের মাধ্যমে এই পাখি তা কাটাতে পারে নি। নিশ্চিন্তে খুব কাছে গিয়ে দেখলাম—রামগাংরা। তার চোখ পাকানো সাপের মতো হিস্‌ হিস্‌ আর থুতু ছিটকানোতে বেশ মজা লাগল।

৫ থেকে ১৫ ফিটের মধ্যে গাছের গায়ে বসন্তবৌরী বা কাঠঠোকরার পরিত্যক্ত গর্ত করা বাসায় অথবা দেওয়ালের গায়ে গর্তে রামগাংরা বাসা বানায়।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর। তবে এক-এক স্থানে এক-এক রকম সময়। যেমন, হিমালয় অঞ্চলে মার্চ থেকে জুলাই, কোথাও ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই, কোথাওবা জুলাই থেকে নভেম্বর। বছরে দুবার ৪ থেকে ৬টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ সাদা, তার উপরে লালচে-পাটকিলে এবং ফিকে বেগুনীর ছিট ও ছোপ। ডিমের মাপ—লম্বায় ০.৭০, চওড়ায় ০.৫৪ ইঞ্চি।

আরও কয়েকটি গণের রামগাংরা বা টিট বসবাস করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। যথা—

১। চূড়াবলগুলী (লোফোফানিস)। কালো-ঝুঁটি টিট দেখা যায় আফগানিস্তান থেকে গাড়োয়াল, নেপাল, সিকিম এবং তিব্বত।

২। শঙ্কুশিখ (ম্যাকলোলোফাস)। হলদে-গাল টিট। বাসস্থান—নেপাল থেকে উত্তর আসাম, আবু পাহাড় থেকে ছোটোনাগপুরের পরেশনাথ এবং পূর্ব পাকিস্তান।

৩। কেশিকী (ইজিথালোস বা ইজিথালিসকাস)। লাল-মাথা টিট। বাসস্থান—হিমালয়ের চিত্রল থেকে উত্তর আসাম।

৪। স্বর্ণচূড় (মেলানোক্লোরা)। সুলতান টিট (মে সুলতানিয়া সুলতানিয়া)। ইংরেজি— ঐ। কছাড়ি—লাও-রাজা-পাটাং-লিলি। লেপচা—বন-তিলিয়া-কো।

বাসস্থান—হিমালয়ের নিম্নাংশে ২ থেকে ৪ হাজার ফিটের মধ্যে উত্তরবঙ্গ, নেপাল ও আসাম।

রামগাংরা-গণের সবচেয়ে সুন্দর পাখি সুলতান টিট। কপাল, মাথার চাঁদি এবং ঝুঁটি ঝকঝকে হলুদ। মাথার বাকি অংশ, ঘাড়, পিঠ, ডানা এবং বুক কুচকুচে কালো। ডানা ও পুচ্ছের পালকের ধারে [illegible]। [illegible] কেবল বাইরের পালকের ডগা সাদা। বাকি নিচের পালক গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ। ঊরুতে হলুদ পালকের মধ্যে কয়েকটি সাদা। চঞ্চু কালো, চোখের পাতা বাদামী, কনীনিকা গাঢ় বাদামী, পায়ের রং [illegible]।

ছোটো [illegible] এক-[illegible] হয়। বাকি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

পরেশকে। এ চিঠিও পৌঁছল না অতসীর হাতে, তার বদলে অভিলাষের কৌশলে মনের কথা জেনে নিল পরেশ, আর সেই চিঠি নিয়েই অতসী রচনা করে চলল তার স্বপ্নের নীড়। কিন্তু সে ভুল ভাঙল এক-দিন। অভিলাষ বুঝিয়ে দিল তৃতীয় কোন ব্যক্তিই এই ভুল-বোঝাবুঝির নাটের গুরু। কিন্তু কে সে? অবশেষে অতসীই খুঁজে বের করল। পরেশই হল সেই তৃতীয় ব্যক্তি। অভিলাষ-প্রত্যাখ্যাত অতসী এক নাটকীয় মুহূর্তে কী করে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেল পরেশের কাছে এই নিয়েই ছবির শেষাংশ রচিত। সুবোধ ঘোষের 'আবিষ্কার' গল্প অবলম্বনে এই কাহিনীটির ট্রিটমেন্ট সত্যিই প্রশংসনীয়। অবশ্য ত্রুটি যে কিছু নেই তা নয়। পরেশের কবিতাচর্চার দৃশ্যটি কিছুটা অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই বহন করে। এ ছাড়া কাহিনীর গতিও মাঝে মাঝে শ্লথ। অভিনয়ে প্রত্যেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তবে অতসী বিশ্বাসরূপী রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় কিছুতেই ভোলা যায় না। এমন প্রাণবন্ত, সাবলীল অভিনয় সত্যিই প্রশংসার্হ। অভিলাষরূপী অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়েও এক আশ্চর্য প্রাণের

অগ্রদূত পরিচালিত চিত্রটির সঙ্গীতগ্রহণের সময় সঙ্গীত-পরিচালক [illegible] ঘোষ ইলা বসু ও অরুণ দত্তকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

সাড়া পাওয়া যায়। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (পরেশ) তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। পল্টুর ভূমিকায় রবি ঘোষ এক কথায় অপূর্ব! অন্যান্য ভূমিকায় সুমিতা সান্যাল, অনুভা দেবী, কণিকা মজুমদার, জহর রায়, রতীন ঠাকুর, পিনু মজুমদার নিজ নিজ ভূমিকায় সুঅভিনয় করেন।

এ ছবির একটি বড় আকর্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীত। গান তিনটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস ও রুমা গুহ-ঠাকুরতা। তবে রুমা গুহঠাকুরতার কণ্ঠে 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে' গানটি অবিস্মরণীয়। ছবির কলাকৌশলের প্রত্যেকটি বিভাগই মোটামুটি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

এক কথায় বলা যায়, অরূপ গুহ-ঠাকুরতা পরিচালিত 'পঞ্চশর' অভিনয়ে, গানে, বহির্দৃশ্যগ্রহণে নিটোল ছবি ও শিল্পনির্দেশনার হিসেবে রীতিমত আকর্ষণীয় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

●

পথে হল দেখা (বাংলা): শ্রীলেখা মুভিটোনের নিবেদন; ৩,০৫০·১৩ মিটার দীর্ঘ এবং ১৩ রীলে সম্পূর্ণ, প্রযোজনা: জে এন সিনহা; পরিচালনা: সতীন অধিকারী; কাহিনী: জ্যোতির্ময় রায়; চিত্রনাট্য: বিধায়ক ভট্টাচার্য; সঙ্গীত-পরিচালনা: ভি বালসারা; গীত-রচনা: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও মণি সরকার; চিত্রগ্রহণ: নিমাই রায়; শব্দানুলেখন: জে ডি ইরাণী ও বাণী দত্ত; সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা: শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশনা: সৌর সেন; সম্পাদনা: মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়; নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং ইলা বসু; রূপায়ণে: সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, জাহ্নবী দেবী, রেণুকা রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, বিপিন গুপ্ত, শ্যাম লাহা, জহর রায়, অমর মল্লিক, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এন সি ফিল্মস-এর পরিবেশনায় গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, রূপবাণী থেকে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে।

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যে ছবির নায়ক এবং জহর রায় যে ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু থাকবে, সে ছবি যে হাসির ছবি, তাতে নিশ্চয়ই কারো সন্দেহ নেই। তবুও বলব, 'পথে হল দেখা' ছবিটি শুধু

মঞ্জুর হয়েছে। জীবনের এই শুভ লগ্ন তার কেন এল যখন সে বুঝতে পারল তখন সে তার আত্মহত্যার কথা ভাবে নি। জ্যাক পিটারসের চিত্রনাট্যে উপরোক্ত উপরোক্ত কাহিনীর চিত্রায়ন করেছেন অ্যালা রেনে। প্রধান চরিত্রে আছেন জুল সিগ ও ওলগা জর্জ পিকট, অ্যানুক ফাস্বজ্যাক তাঁর সহযোগী।...জাঁ লুক গদার তাঁর চাঞ্চল্যকর ছবি শেষ করে এখন করছেন প্রতি সপ্তাহান্তে প্যারিসের খোলা রাস্তায় যে গাড়ীর মেলা বসে তার ওপরই এক হাস্যরসাত্মক ট্রাজিক ছবি। ইতিমধ্যে রাস্তায় রাস্তায় কিছু দৃশ্য তোলা হয়েও গেছে। এ ছবিতেই নাকি গদার দীর্ঘতম ট্র্যাকিং শটটি তুলবেন। ছবির নায়ক-নায়িকা চরিত্রে আছেন মেরিল ডার্ক ও জিন ইয়েন।... খ্যাতনামা লেখক রোমান গ্রে (যাঁর ক্রেডিটে 'রুটস অফ হেভেন', 'লেডি এল', 'দি স্কি বাম'-এর মত কয়েকটি বেস্ট সেলার রেকর্ড আছে) এবার নতুনরূপে দেখা দিচ্ছেন। নিজের গল্প ও নিজের চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'বার্ডস ইন পেরু' নামে একটি ছবি করার মনস্থ করেছেন গ্রে। ছবিতে লেখকের স্ত্রী জাঁ সিবার্গ এক সুন্দরী, যৌনকাতর উন্মাদনীর চরিত্রে অভিনয় করবেন। এই স্ত্রীলোকটি নিজের ঐ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার দরুণ শান্তি পায় নি আর তার কাছাকাছি যারা ছিল তারাও পেল না। অন্যান্য চরিত্রে থাকবেন মরিস রোনেৎ, পিয়ের ব্রাসুর, ড্যানিয়েল ডারি।

শ্রীমধুসূদন নাটকাভিনয়

গত ২৫ জানুয়ারী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন উপলক্ষে বাণীপুরের নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (২নং) ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপক শ্রীউৎপল চক্রবর্তীর পরিচালনায় বনফুল রচিত 'শ্রীমধুসূদন' নাটকটি পরিবেশন করেন।

বিভিন্ন ভূমিকায় সর্বশ্রী দেবব্রত দে, তুলসী মুখোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চট্টোপাধ্যায়, সুধারঞ্জন চক্রবর্তী, পান্নালাল পাত্র, মণিভূষণ হীরা, পরেশ পাত্রিয়া, মুকুল দাস, শম্ভুলাল ব্রহ্মচারী, মণিমোহন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরা।

উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। এছাড়াও শ্রীমধুসূদন রচিত সঙ্গীত 'রেখো মা দাসেরে মনে' এবং কবিতাও পরিবেশন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

বলাকা নাট্যগোষ্ঠীর অভিনয়

'বলাকা' নাট্যগোষ্ঠী ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ কলিকাতার একটি বিশিষ্ট মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' ও মধুসংলাপী বিধায়ক ভট্টাচার্যের বহু অভিনীত নাটক 'মাটির ঘর' নিয়মিত পরিবেশন করবেন।

মালঞ্চের নাট্যরূপ ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন অরুণকান্তি সাহা ও মাটির ঘরে দিলীপ চৌধুরী। দুইটি নাটকেই সংগীত পরিচালনা করবেন সংগীত শিল্পী শচীন গুপ্তের ভাই সৌরেন গুপ্ত।

হিন্দী হাই স্কুলে অভিনীত অনামিকা-র 'সপ্তর্ষি' নাটকে রবি ঘোষ এবং পল্লবী মেটা

রাজা বদল

গত জানুয়ারী বিশ্বরূপা মঞ্চে চেনামহল গোষ্ঠী জোতু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রাজা বদল' নাটকটি কিংবদন্তীর সঙ্গে মঞ্চস্থ করলেও নাটক নির্বাচনই গোষ্ঠীর চিন্তার অপরিপক্কতাকে প্রকাশ করেছে। গভীরতাহীন এই নাটকের পরিচালক শ্রীরণজিৎ দত্ত। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের কাজ পরিচ্ছন্ন হলেও প্রধান নারী চরিত্রে অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট সাবলীল নন, তার চাইতে বরং ছেলেহারা বিধবা মার চরিত্র অপেক্ষাকৃত সুন্দর। প্রধান পুরুষ চরিত্রে রণজিৎ দত্ত স্বাচ্ছন্দ ও সরল। অন্যান্য চরিত্রে যাঁরা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা হলেন উপেন তালুকদার, ও অন্যান্যরা।

বিবিধ সংবাদ

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসবে মহাজাতি সদনে সকাল ৯টায়, রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারী।

এদিনে অংশগ্রহণ করবেন শ্রী ভি বালসারা ও সম্প্রদায় আর শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়। নতুন প্রতিভা ছাড়া সন্তবের 'কাবুলিওয়ালা' আর রবিগুপ্তের 'বিস্কুট ঠাকুমা'ও সেদিন পরিবেশিত হবে।

সিটি এস্প্লানেডে মহিলা যাদুকর

প্রায় এক বছর অনুপস্থিতির পর মহিলা যাদুকর উমা দাশগুপ্ত আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় সিটি এস্প্লানেডে দর্শকদের অভিবাদন জানাবেন। এর আগে দেখানো খেলাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্প্রতি উদ্ভাবিত উত্তেজক দুটি খেলা—'জাদুবিদ্যার খেল' ও 'মুণ্ডহীন নারী' নিঃসন্দেহে দর্শকদের আসরটিকে মাৎ করে দেবে।

প্রীতি অনুষ্ঠান

গত শনিবার সন্ধ্যায় পানিহাটি ম্যুনিসিপ্যালিটির মিলনবাটিতে স্থানীয় যুব-সংঘের তরুণ সঙ্ঘের এক প্রীতি অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ২৪-পরগনা (উত্তর) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীকৃষ্ণমোহন পোদ্দারের সভাপতিত্বে। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনির্মল বসু। সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় তরুণ সঙ্ঘের আদর্শ ও করণীয় কর্মের এক বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। সভাপতি এবং প্রধান অতিথির সময়োপযোগী ভাষণের পর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে সর্বশ্রী দিলীপ ঘোষ, কমল কুমারী, রেবতীভূষণ, মঞ্জু দেবী, ইন্দু চৌধুরী, পার্থ কাচী প্রমুখ সুখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। সর্বশ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, শিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের আন্তরিক চেষ্টায় প্রীতি-অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

একটি সুপরিকল্পিত শিশু-উৎসব

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ভাই-বোনেদের আসর শতাধিক বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় একটা সুপরিকল্পিত শিশু-উৎসবের আয়োজন করে আসছেন জাতির স্মরণীয় দিন ২৩ জানুয়ারী থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত চার দিন ধরে। এবারেও সে অনুষ্ঠান খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ও শ্রীপ্রভাতসুন্দর মণ্ডলের যথাক্রমে সভাপতিত্বে ও প্রধান আতিথ্যে সোনারপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

এবারের অনুষ্ঠানেও শতাধিক শিশু-শিল্পীরা দৈনিক সহস্রাধিক ছেলে-মেয়েদের ও তাদের অভিভাবকদের পর্যন্ত আবৃত্তি, গানে, নাচে, যন্ত্রসঙ্গীতে, অভিনয় ও ব্রতচারী নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ করে প্রত্যেকেই 'উৎসাহ-পুরস্কার' লাভ করে। এ ছাড়া ছোটদের 'চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা' দেবার জন্যে শিক্ষামূলক রঙীন ছবি দেখান হয়।

সমবেত কণ্ঠে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় এবারে যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস স্মৃতি পদক লাভ করে নীহারকণা বালিকা বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে সোনারপাড়া বালক-বালিকা বিদ্যালয় দেবেন্দ্র-স্মৃতি পদক লাভ করে। শিক্ষাগুরুর প্রতি ভক্তি রক্ষে ছোটদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবারে গরম আলোয়ান উপহার দেওয়া হয় তেঁতুলবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তীকে (৬০ বছর)। ছোটদের আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা দেবার এই অভিনব পরিকল্পনা ও পরিচালনার মূল শিশু-সাহিত্যিক শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়কে। এই অভিনব শিশু-উৎসবটির আয়োজনের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানাই।

যন্ত্র ও সঙ্গীতের দিকটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হোলো। লোকসঙ্গীতের প্রেরণা উৎস মোটের ওপর সকল দেশেই এক— সাধারণ জনজীবনের আনন্দবেদনা, স্বপ্ন, প্রবাদ ও দুঃখের যার ঘনীভূত রূপ। গ্রাম্য-জীবনের 'কান্না-হাসির দোল-দোলানো' 'পৌষ ফাগুনের মেলা' স্যান্‌ট্রি, ব্যাঞ্জো, ফিড্‌ল ইত্যাদি লোকযন্ত্রের সঙ্গতে মূর্ত হয়ে উঠল। এ আনন্দ চরমে পৌঁছল যখন প্রেক্ষাগৃহে উপবিষ্ট মার্কিনী শ্রোতারা শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন অতি পরিচিত সুদূর দেশের মাটির গন্ধবাহী সঙ্গীতগুলির সঙ্গে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের উৎসধারায় অবগাহন করে আনন্দটুকুই ছিল আমাদের উপরি পাওনা। যন্ত্রসঙ্গীতে—ফিলাডেলফিয়া স্ট্রিং কোয়া-র্টেটের পরিবেশনায় ছিলেন ওঁদেরই ভাষায় "দি ম্যাগ্‌নিফিশিয়ান্ট ফোর" জেভা শ্লেনজার, আরউইন আইসেনবার্গ, চার্লস বার্নার্ড এবং অ্যালান ইস্‌লিটিজিন। আপন দেশে এঁরা "ওয়ান অফ দি মোস্ট এ্যাড্‌ভেনচারাস্ অফ অল মিউজিক্যাল অরগেনাইজেশন" রূপে খ্যাত।

ইস্‌লিন-উক্ত সঙ্গীতদর্শন অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাজ্ঞ শিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রগতিশীল শিল্পীদের সঙ্গীতচিন্তা পরিবেশন করাই এই শিল্পী-চতুষ্টয়ের লক্ষ্য। বীটোফেন থেকে বারটক, স্কুবার্গ থেকে সোয়েনবার্গ অবধি তাঁদের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টি-সিজমের যুগ্ম পরিবেশনায় উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁদের হিন্দী হাইস্কুলের সঙ্গীতানুষ্ঠান।

মোজার্টের কোয়ার্টেট ইন বি ফ্ল্যাটকে ৪৫৮ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হোলো। শিল্পী-চতুষ্টয় এ্যাডাগিও এবং এ্যালেগ্রো অংশে অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে তোলেন। একক অংশে সাঙ্গীতিক ভাষায় কথোপকথন, একসময়ে নাটকীয় রস ও অর্কেস্ট্রায় শক্তিশালী সুরনিক্ষেপে মর্মবাণী প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

জিও কিরচারের উত্তেজনাসঞ্চারী সঙ্গীতরচনায় বেগবান গতি জীবনের প্রবহমান ভাবধারাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

নৃত্য-সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের এই ত্রিধারা উপহার দেবার জন্য ইন্দো-আমেরিকান কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

একডালিয়া সঙ্গীত সম্মেলন

ছোট্ট পরিসরের মধ্যেও খুব জমে উঠেছিল দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া সঙ্গীত সম্মেলন। ২৫-২৬ এবং ২৭ জানুয়ারী যথাক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীত অধুনা সঙ্গীতজগতের এই ত্রিধারা সমন্বয় সকল শ্রেণীর শ্রোতাদের আনন্দের আয়োজনে উদ্যোক্তাদের ত্রুটি ছিল না। আর এই সঙ্কট যুগের হাজারো সমস্যাকিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ আকণ্ঠ করেছে "গান সুধা নিরবধি"।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, চিন্ময় চ্যাটার্জি, সুমিত্রা সেন, নিবেদন মুখার্জি, সাগর সেন, চিত্তরঞ্জন মুখার্জি ছাড়াও ছিলেন অশোকা দে এবং দেবীপ্রসাদ বাগচী।

আধুনিক গানে মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, প্রতিমা ব্যানার্জি, উৎপলা ঘোষ, হাস্যকৌতুকে জহর রায় এবং অন্যে বাজনায় শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছেন।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে শ্রীভীষ্মদেব উপস্থিত হতে পারেন নি। প্রতিশ্রুত অন্যান্য সকল শিল্পীই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী প্রণতি বর্মন বাগেশ্রী রাগে বিলম্বিত একতাল, দ্রুত ঝাঁপতাল, ত্রিতালে হিন্দোলবাহার এবং পরিশেষে ঠুংরী গেয়ে শোনালেন। সুর ও লয় উভয় বিচারেই তাঁর গান যথোচিত মানে প্রতিষ্ঠিত।

ওস্তাদ নাসির আমেদের "বেহাগ" রাগ-পরিবেশনায় তাঁর স্বভাবানুগ তানশিল্পীর বৈচিত্র্য ও মূর্ছনাভিক্ষেপ সঞ্চারিত হলেও কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভগ্ন থাকায়, ওপরের দিকের পর্দায় সুরসঞ্চালন বিঘ্নিত। তাই আশানুরূপ জমে উঠতে পারেনি।

পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর আশাবরী-টোড়ি অনেকরকম বাধা যথা শীতাধিক্য অথবা যে কারণেই হোক বসে-যাওয়া কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মাধুর্যের অভাব, সহযোগী শিল্পীদের উপযুক্ত কণ্ঠস্বর সহায়তার কার্পণ্য ইত্যাদি অতিক্রম করেও রসোত্তীর্ণ হয়ে শ্রোতাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে।

আমজাদ আলির সরোদ বাজের দাপটে, তানের গতিচমকে এবং শিল্পীর আবেদন-সঞ্চারী আনন্দভরা মেজাজে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবে বিস্তার অংশ আরো একটু সুসংবদ্ধ এবং সুচিন্তিত হলে এঁর বাদনশৈলী উপযুক্ত মর্যাদায় সুপ্রতি-ষ্ঠিত হয়ে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে গুণী-জনেরও আনন্দের কারণ হবে।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় বাজালেন 'কিলাসখানি'। জয়ন্তে বিশেষ সময়ের পর এই একই রাতে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার শ্রীব্যানার্জির যুগ্ম অনুষ্ঠান তাঁরই উপযুক্ত সু-উচ্চ শিল্পীজন, ধ্যান ও সাধনার আলোয় উজ্জ্বল। কিলাসখানি টোড়ির বিষণ্ণ গাম্ভীর্য ভাবভারের পর ভৈরবী-ঠুংরীর রসধারা আকাশে শ্রোতাদের চিত্তকে স্বচ্ছ মুক্তিদানের উজ্জ্বল আনন্দ তোলার নয়। এই অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে এই আসরের শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান।

ভারত নাট্যম ও কথকে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিল্পী

সম্প্রতি বিড়লা অ্যাকাদেমিতে আয়োজিত ভারতনাট্যম ও কথকনৃত্যের এক যুগ্ম অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যের চমক ছিল।

ভারতনাট্যমের শিল্পী ছিলেন আমে-রিকান নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী জুলি দেশাই। ইনি 'আমেরিকান মডার্ন ডান্সের' ছাত্রী হলেও বালাসরস্বতীর নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে প্রদ্যুম্ন দাসের কাছে 'ভারতনাট্যম' শিক্ষা করছেন। সেদিন ইনি দেখালেন অলারিপু, নবরস-নটেশ্বর-আদিনায়।

বিষয়বস্তুগুলির গুরুত্বে যে কোনো নৃত্যদর্শকের নিকট সহজবোধ্য। মাত্র দশ মাসের শিক্ষা ও অনুশীলনীতে কোনো বিদেশিনী শিল্পীর পক্ষে এই নৃত্যবিষয়ের বিশ্লেষণ কত কঠিন তাও সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই কঠিন কাজে অপেক্ষাকৃত অনু-শীলনীর অপেক্ষা থাকলেও উপভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হয়নি। প্রথমেই যে বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হচ্ছে শ্রীমতী জুলির নৃত্যের স্বতঃস্ফূর্ততা। ভারতনাট্যমের মত ব্যাপক ও সুকঠিন নৃত্যকে তিনি শিক্ষার বিষয়রূপে নির্বাচন করেছেন এবং নেচে আনন্দ পাচ্ছেন। এইটেই হোলো বড় কথা। রসের অভিব্যক্তিতে তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল। তবে এ অভাবের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অন্যদিকও ছিল। বিভিন্ন দেহভঙ্গিমায় নিখুঁত স্থাপনদক্ষতা প্রশংসনীয় নয়কম। বিশেষ কণ্ঠজাতি আটোয়া তালের মত ১৪ মাত্রায় জটিল মাত্রা বিভাগে নিখুঁত পদক্ষেপ অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবী রাখে। শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসের সুযোগ্য পুত্র চিত্রেশ দাসের কথকনৃত্য এই সন্ধ্যায় বিশেষ অনুষ্ঠান। পরণ, চক্রধর, তৎকার গৎ, খেলায় সমন্বয়ের নৃত্য-ধর্মগুণ কথকের এক প্রামাণ্য উদাহরণ তিনি দর্শক-দের কাছে পেশ করলেন। তবলা ও পাখোয়াজের বিভিন্ন বোলসমৃদ্ধ পর্যবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তালের মর্যাদিরক্ষাে চিত্রেশের দ্রুত পদক্ষেপ সাহসিকতা ও আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল। খেলার ছন্দবৈচিত্র্যে উপযুক্ত শিক্ষা ও রেওয়াজের সুস্পষ্ট ছাপ। শিল্পীর মৌলিকতা ব্যক্ত হয়েছে তৎকার অঙ্গাভিত্তিক "চৌমচলা" বিভিন্ন গতির লয়-বিন্যাসে। গত বছর রবীন্দ্রভারতীতে এই নৃত্য প্রদর্শন করে সুবিখ্যাত মার্কিনী শিল্পী পলিন-কোনারের লিখিত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য "এ্যানাদার ডান্সার হু লেফ্ট মি সাম কোরিওগ্রাফিক ওয়ার্ক এ বয় ট্রেন্ড্ ইন এনার্জেটিক কথক স্টাইল অ্যান্ড হু ইউজড্ কথক ফুট অ্যান্ড হেড মিনস্ ইন এ্যাডভান্স হুইচ ক্রিয়েট টু মিক্স আপ ইম্প্রেশন অফ দি সাউন্ডস এ্যান্ড ফিলিং অফ এ ট্রেনরাইড। ইট ওয়াজ এ রিমার্কেবল এভোকেশন এ্যান্ড দি ট্রেডিশনালিস্ট কনসিডার্ড ভেরী ক্লেভার।"

নৃত্যশেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শিল্পী-দ্বয়কে অভিনন্দন-মাল্যে ভূষিত করেছেন। সবচেয়ে বড় শ্রীমতী কমলা দেবী ও অমলাশঙ্করের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। এ যেন নবীন শিল্পীদ্বয়ের যাত্রাপথে শিল্পজগতেরই শুভকামনারূপে বিশিষ্ট শিল্পীব্যক্তিদ্বয়ের আশীর্বাদ।

—চিত্রাঙ্গদা

সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে। এদিকে বিভিন্ন দেশের টেনিস খেলার কর্মকর্তারা আজ মহা সঙ্কটে পড়েছেন। তাঁদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে—পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্যে প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত করার দাবী স্বীকার করে নেওয়া অথবা প্রতিভাশালী অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়েই প্রতিযোগিতার আসর করা। শেষের পথটি কিন্তু খুব সহজ নয়, নানা অভিযোগ, বাধা-বিপত্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। পেশাদার টেনিস খেলার পথ-প্রদর্শক জ্যাক ক্রামার হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, অনুমতি পাওয়া না গেলেও পেশাদার এবং অপেশাদার খেলোয়াড়রা আগামী উইম্বলেডন লন টেনিস। প্রতিযোগিতার আসরে খেলতে নামবেই। সেক্ষেত্রে অপেশাদার খেলোয়াড়দের বরখাস্ত করার জন্যে কর্মকর্তাদের একটা বিরাট তালিকা তৈরী করতে হবে। বৃটিশ লন টেনিস এসোসিয়েশনের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, আমরা যে শিখা জ্বালিয়েছি তা বর্তমানে আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে ছড়িয়ে গেছে।

এদিকে বিশ্ববিখ্যাত অপেশাদার টেনিস খেলোয়াড়রা পেশাদার খেলোয়াড়দের দলে যোগ দিতে শুরু করেছেন। ১৯৬৭ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের দুই সদস্য জন নিউকম্ব এবং টনি রোচ পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে আমেরিকার 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ানশীপ টেনিস' সংস্থার সঙ্গে তিন বছরের এক চুক্তি করেছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী খেলার জন্যে গত বছরের উইম্বলেডন চ্যাম্পিয়ান জন নিউকম্ব নূন্যপক্ষে ১০৫,০০০ আমেরিকান ডলার পারিশ্রমিক পাবেন। অপরদিকে রোচের পারিশ্রমিকের পরিমাণ নূন্যপক্ষে ১২০,০০০ আমেরিকান ডলার।

আমেরিকার পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ডেনিস র‍্যালস্টোন

টেনিস খেলায় অপেশাদার এবং পেশাদার খেলোয়াড়দের যেভাবে দেখা হয় তা খেলার বৃহত্তর স্বার্থের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। অপেশাদার খেলোয়াড়দের সামাজিক পদমর্যাদা অনেক বেশী। সেখানে পেশাদার খেলোয়াড়রা 'একঘরে' হয়ে আছেন। এই ভেদনীতির ফলেই আর এক শ্রেণীর খেলোয়াড়দের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁদের বলা হয় আধা-পেশাদার। এঁরা সাপেরও মুখ পাচ্ছেন এবং ব্যাঙেরও মুখ চুম্বিয়ে নেন। এই আধা-পেশাদার খেলোয়াড়রা সামাজিক মর্যাদা নষ্টের ভয়ে সরাসরি পেশাদার খেলোয়াড় দলে যোগ দেন না, কিন্তু ক্রীড়ানৈপুণ্যের জোরেতে সংক্ষেপে এবং বাঁকাপথে একটা পেশাদার খেলোয়াড়দের সমান অর্থ উপার্জন করেন। খেলাধুলার বৃহত্তর স্বার্থের প্রশ্নে এই আধা-পেশাদার খেলোয়াড়দের উৎখাতের উদ্দেশ্যে পেশাদার খেলোয়াড় সম্পর্কে পূর্বের ভেদনীতির পরিবর্তনের চেষ্টা অনেকদিন থেকে আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটেন সর্বপ্রথম এই ভেদনীতির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অপূর্ব সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে।
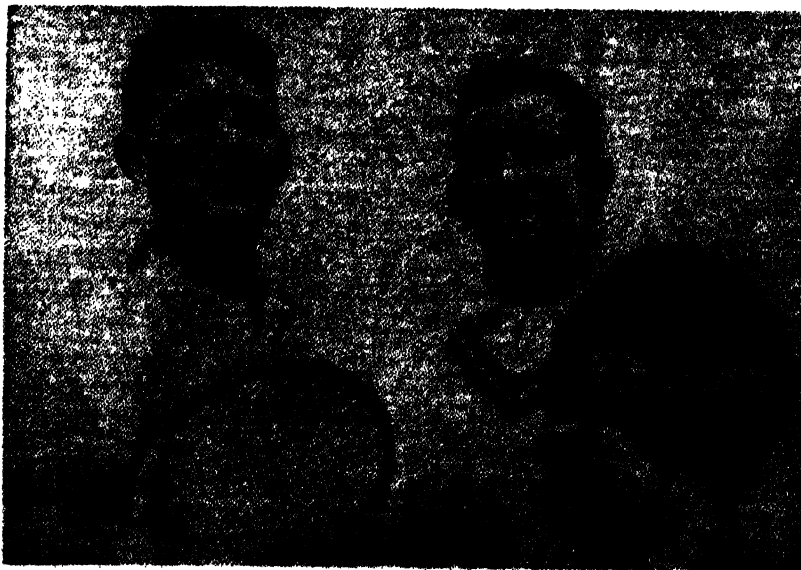
বিশ্ববিখ্যাত পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় দুই রোজ এবং রড লেভার

চতুর্থ দিনে ২১২ রানের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে খেলায় জয়লাভের জন্যে ৩৪২ রান তুলতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। স্কোর বোর্ডে ভারতবর্ষের ২ উইকেট পড়ে ১৪৫ রান দেখে অনেকের মনে হয়েছিল ভারতবর্ষ জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলতে সক্ষম হবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যথারীতি শোচনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায়। যেখানে খেলার এক সময়ে এক উইকেট পড়ে ১২০ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল, ১৮০ রানের মাথায় ৬ষ্ঠ উইকেট পড়ে গেছে অর্থাৎ ৫ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র ৬০ রান যোগ হয়েছে। চতুর্থ দিনের খেলায় মোট ১৩টা উইকেট পড়েছিল—অস্ট্রেলিয়ার ৭টা উইকেট ৭০ রানে এবং ভারতবর্ষের ৬টা উইকেট ১১৩ রানে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে তিনজন খেলোয়াড় রান-আউট হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের এই দিনের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় একমাত্র আবিদ আলী আক্রমণাত্মক খেলায় ৮১ রান করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ২৮ মিনিট স্থায়ী ছিল। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৬·৬ ওভার বল দিয়ে ভারতবর্ষের বাকী ৪টে উইকেট ফেলে দেয়। ১৯৭ রানের মাথায় ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ববি সিম্পসন ১৬টা বলে মাত্র দুই রান দিয়ে নাদকার্ণী, প্রসন্ন এবং বেদীকে আউট করেন। ভারতবর্ষের শেষ জয়সীমার উইকেট পান কাউপার। ভারতবর্ষ পূর্ব দিনের ১৯৩ রানের (৬ উইকেটে) পুঁজি নিয়ে শেষ দিনে খেলতে নামে। পূর্ব দিনের রানের সঙ্গে কোন রান যোগ হওয়ার আগেই দুটো উইকেট (নাদকার্ণী এবং প্রসন্ন) পড়ে যায়। শেষ দিনের চার রান তুলেছিলেন বেদী (২ রান), কুলকার্ণী (এক রান) এবং জয়সীমা (এক রান)। বিদায়ী টেস্ট খেলোয়াড় সিম্পসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৯ রানে ৫টা এবং কাউপার ৪৯ রানে ৪টে উইকেট পান। তাছাড়া সিম্পসন তিনটে ক্যাচ ধরে ইঞ্জিনীয়ার (৩৭ রান), আবিদ আলী (৮১ রান) এবং সোরতিকে (৪ রান) আউট করেন।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উভয় দলের মধ্যে শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ডগলাস ওয়াল্টার্স—খেলা ২, ইনিংস ৪, নট-আউট ২ বার, মোট রান ২৫৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৯৪* এবং গড় ১২৭·০০। ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন পতৌদি—খেলা ৩, ইনিংস ৬, মোট রান ৩৩৯, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৮৫ এবং গড় ৫৬·৫০। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার কাউপার—খেলা ৪, ইনিংস ৭, নট-আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৬৫, মোট রান ৪৮৫ এবং গড় ৬৯·২৮। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান করেছেন রুসী সুর্তি—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নট-আউট ০, মোট রান ৩৪১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৭০ এবং গড় ৪৩·০৭।

বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন—ওভার ৭৯, মেডেন ২০, রান ১৮৮, উইকেট ১৩ এবং গড় ১৪·২৩। ভারতবর্ষের পক্ষে শীর্ষস্থান পান প্রসন্ন—ওভার ২১৪·৩, মেডেন ৩৪, রান ৬৮৩, উইকেট ২৫ এবং গড় ২৭·৪৪। তাছাড়া প্রসন্ন উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (২৫টি) পাওয়ার গৌরব লাভ করেছেন। তাঁর পরই সুর্তির স্থান—উইকেট সংখ্যা ১৫ (গড় ৩৫·২০)। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বাধিক উইকেট (১৩টি) পেয়েছেন তিনজন—সিম্পসন (গড় ১৪·২৩) কাউপার (গড় ১৮·৩৮) এবং ম্যাকেঞ্জী (গড় ২৪·০০)।

সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেছেন অস্ট্রেলিয়ার চারজন—মাত্র খেলোয়াড় বব কাউপার ২টি (১০৮ ও ১৬৫), ববি সিম্পসন (১০৯), আয়ান চ্যাপেল (১৫১) এবং বিল লরী (১০০)। অপর দিকে ভারতবর্ষের পক্ষে মাত্র এম এল জয়সীমা সেঞ্চুরী (১০১ রান) করেন।

টেবল টেনিস টেস্ট

ভারত সফরকারী জাপানী টেবল টেনিস দল বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ৫-০ এবং ব্যাঙ্গালোরের দ্বিতীয় টেস্টে ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে।

প্রথম টেস্টের ফলাফল

টোকিও তাসাকা ১৮-২১, ২১-১৬ ও ২১-৯ পয়েন্টে ডি এম মার্চেন্টকে পরাজিত করেন।

সিগেও ইটো ২১-৫ ও ২১-১২ পয়েন্টে মীর কাসিম আলীকে পরাজিত করেন।

তোকুয়াসু নিশি ২১-১০ ও ২১-১৬ পয়েন্টে ফারুক খোদাজিকে পরাজিত করেন।

সিগেও ইটো ২১-৫ ও ২১-১৫ পয়েন্টে ডি এম মার্চেন্টকে পরাজিত করেন।

টোকিও তাসাকা ২১-১৪ ও ২১-৯ পয়েন্টে ফারুক খোদাইজিকে পরাজিত করেন।

বিশ্বজয়ী জাপান

১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে ৪টি খেতাব জয়ের সূত্রে (মহিলা বিভাগের কোর্বিলোন কাপ, ব্যক্তিগত বিভাগে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মহিলাদের ডাবলস) জাপান আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে একেবারে রাতারাতি খ্যাতি লাভ করে। ১৯৫৩ সালে জাপান আন্তর্জাতিক কারণে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের সাফল্য নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য—১৯৫৪ সালে ৩টি খেতাব, ১৯৫৫ সালে ২টি খেতাব, ১৯৫৬ সালে ৪টি খেতাব, ১৯৫৭ সালে ৫টি খেতাব, ১৯৫৯ সালে ৬টি খেতাব, ১৯৬১ সালে ৩টি খেতাব, ১৯৬৩ সালে ৪টি খেতাব, ১৯৬৫ সালে ২টি খেতাব এবং ১৯৬৭ সালে ৬টি খেতাব। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের পর এক বছর অন্তর বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসছে এবং প্রতিযোগিতার খেতাবের সংখ্যা মোট ৭টি—দলগত বিভাগে ২টি এবং ব্যক্তিগত বিভাগে ৫টি। মোট এই ৭টি খেতাবের মধ্যে জাপান দু'বার (১৯৫৯ ও ১৯৬৭ সালে) একই বছরে ৬টি করে খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এ পর্যন্ত জাপান ১০টি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে মোট ৭০টি খেতাবের মধ্যে ৩৯টি খেতাব জয়ী হয়েছে (শতকরা ৫৫·৫৫)। ১৯৫২ সালে ১৯তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের ৪টি খেতাব জয়ের সূত্রে এশিয়া মহাদেশের যে জয়যাত্রার উদ্বোধন হয় তা ১৯৬৫ সালের ২৮তম আসরে যেভাবে পূর্ণ হয়। যুগোশ্লাভিয়াতে অনুষ্ঠিত ২৮তম বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় কেবল প্রজাতন্ত্রী চীন এবং জাপানের খেলোয়াড়রা সাতটি অনুষ্ঠানেরই ফাইনালে খেলেছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল—এই সময়ে অনুষ্ঠিত ১১টি বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ৭৭টি খেতাবের মধ্যে এশিয়া মহাদেশই ৫১টি খেতাব জয়ী হয়েছে—জাপান ৩৯টি এবং প্রজাতন্ত্রী চীন ১২টি খেতাব। তবে, রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৩ সালে জাপান এবং ১৯৬৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

বর্তমান ভারতসফরকারী জাপানী টেবল টেনিস দলের সঙ্গে গতবারের (১৯৬৭) বিশ্ব সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হাসেগাওয়া আসেন নি। তবে দলে আছেন জাপানের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান সিগেও ইটো এবং ৩নং খেলোয়াড় তোকুয়াসু নিশি। এই দু'জন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছাড়া আরও কয়েকজন উদীয়মান খেলোয়াড় দলভুক্ত হয়েছেন।

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার নেতাজী স্টেডিয়ামে জাপান বনাম ভারতবর্ষের ৩য় টেবল টেনিস টেস্ট খেলার আসর বসবে।

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

জব্বলপুরে আয়োজিত অষ্টাদশ জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল পুরুষ বিভাগের খেতাব জয়ী হয়েছে। অপর দিকে মহারাষ্ট্র খেতাব পেয়েছে মহিলা এবং বালক বিভাগে।

ফাইনাল খেলা

পুরুষ বিভাগ: সার্ভিসেস দল ৭৮-৬৪ পয়েন্টে রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ: মহারাষ্ট্র ৪০-৩০ পয়েন্টে বাংলাকে পরাজিত করে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

পোড়া··· কাটা··· পোকার কামড়
এই সব আকস্মিক দুর্ঘটনায়
এ্যাগ্রিমেন্ট
চর্বিবর্জিত এ্যান্টিসেপটিক মলম
নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য
সংক্রমণ প্রতিরোধক □ সত্বর আরামদায়ক
শিশুদের কোমল ত্বকের
পক্ষেও নিরাপদ □ দাগ লাগে না
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী
হাতের
কাছে
রাখুন
AGRIMENT

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪১শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 16th February, 1968 শুক্রবার ৩রা ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise

সূচীপত্র

জয়তু মহাত্মা শিশিরকুমার

অমৃত সম্পাদকীয়

শতাব্দীর অভিনন্দন

একশত বৎসর একটি জাতির ইতিহাসে খুব বেশি সময় নয়। কিন্তু আমাদের জাতির ইতিহাসে বিগত একশত বৎসর নানাদিক দিয়ে চিহ্নিত হয়ে আছে অগ্রযাত্রার পদক্ষেপে, সাফল্যের কীর্তির আলোকে। ভারতবর্ষের নবযুগের অভ্যুদয়রূপে এই শতাব্দী আমাদের কাছে এবং উত্তরকালের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই স্মরণীয় শতাব্দীর সমান্তরালে হল ভারতের সংবাদপত্র-জগতের পুরোধা অমৃতবাজার পত্রিকা। এই বৎসর ২০শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজারের শতবর্ষপূর্তি। তার উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে নানাভাবে। দেশ-বিদেশ থেকে খ্যাতনামা মনীষী, রাষ্ট্রনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও লেখক, সাংবাদিক ও দার্শনিক পত্রিকার শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে পাঠিয়েছেন অভিনন্দন। আমরা পত্রিকার কনিষ্ঠতম সহযোগী হিসেবে শতাব্দীর বনস্পতিকে জানাই অন্তরের অভিবাদন। পত্রিকা শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, আরও বহু শতাব্দী তাকে অতিক্রম করে যেতে হবে জাতির অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে, তার দুঃখ-সুখ, আশা এবং নিরাশার সঙ্গী হয়ে।

বাঙালীর গৌরব এই যে, তাদের একটি প্রতিষ্ঠান বিপুল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শতবর্ষের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছে স্বাধীন চিন্তা ও লেখনীর মুক্ত আকাশে। অমৃতবাজার বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিভূরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। শহরের চাকচিক্য তখন তার ছিল না, যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরা গ্রামে (বর্তমান নাম অমৃতবাজার) মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁর ভ্রাতাদের প্রচেষ্টায় পত্রিকার প্রথম আবির্ভাব। সে-যুগে সহায়-সম্বলহীন আদর্শবাদী বাঙালী যুবকের পক্ষে এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ সহজ কথা ছিল না। বিশেষত পত্রিকা তার জন্মলগ্ন থেকেই ছিল ভারতে বৃটিশ স্বৈরাচারের কঠোর সমালোচক। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্জয় ঘোষণা নিয়ে শিশিরকুমারের স্বাধীন সাংবাদিকতার সূত্রপাত। তারপর সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা, সংস্কারের বিরোধিতা এবং সুস্থ পরিচ্ছন্ন সমাজ প্রবর্তনের জন্য অবিশ্রান্তভাবে তিনি তাঁর লেখনী প্রয়োগ করেছেন।

পত্রিকার কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্য তদানীন্তন বৃটিশ শাসকদের প্রেস আইন প্রবর্তন ঐতিহাসিক কলঙ্কের স্মারক হয়ে আছে। অমৃতবাজার পত্রিকার আদর্শবাদী ও অকুতোভয় সম্পাদক বাংলা পত্রিকাকে ইংরেজিতে রূপান্তরিত করে স্বৈরাচারী বৃটিশ শাসকদের সেদিন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা তখন থেকেই ইংরেজি পত্রিকা। কিন্তু বিদেশী ভাষায় প্রকাশিত হলেও নামে ও কাজে অমৃতবাজার রয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভারতের কল্যাণ, ভারতের মুক্তি, ভারতের উন্নয়নই হল তার ধ্যান, তার স্বপ্ন, তার সমস্ত কর্মপ্রয়াসের একমাত্র উদ্দেশ্য। বহু বৎসর পর জাতির চরমতম দুর্দিনে অমৃতবাজারের সাংবাদিকতার উৎকর্ষ ও অবিচল আদর্শনিষ্ঠার উল্লেখ করে গান্ধীজী বলেছিলেন, অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যিই অমৃত।

জনগণের আশীর্বাদ ও অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে কোনো সংবাদপত্র এত দীর্ঘকাল অবিচলিতভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে না। অমৃতবাজার পত্রিকার নাম আজ প্রতি ঘরে-ঘরে। বৃটিশ আমলে পত্রিকার চেয়ে বিত্তশালী অনেক সংবাদপত্র ছিল, যারা বিদেশী সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে ভারতের জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল। তাদের সেই চেষ্টা সফল হতে পারেনি, তার কারণ জনগণ সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার মতো দেশকল্যাণব্রতী সংবাদপত্রের প্রতি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও স্বীকৃত। কিন্তু পত্রিকার কর্তব্য তাতে শেষ হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় জনমতের দর্পণ এবং জনমতের সংগঠক। দেশ স্বাধীন হবার পর আমাদের সমস্যা আরও স্পষ্টভাবে দেশবাসীর সামনে উপস্থিত হয়েছে। এই সময়ে পত্রিকার দায়িত্ব বেড়েছে বহুগুণে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, তার অখণ্ডতা অটুট রাখা এবং তার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জনমতকে সতর্ক ও সজাগ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে পত্রিকা। সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমারের প্রজ্জ্বলন্ত আদর্শের শিখাই তাঁর উত্তরসূরীদের পথ প্রদর্শন করে নিয়ে যাচ্ছে। জন্মভূমির দুঃখমোচনের জন্য যশোহরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে আদর্শে উদ্দীপ্ত ভ্রাতৃবৃন্দ যে মহান্ ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন, আমরা আজ সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কল্যাণব্রতের শতাব্দীপূর্তি উৎসবে যোগদান করি।

অমৃতবাজারের সহযোগীরূপে অমৃত তার ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। অমৃত এক্ষেত্রে নবাগত। কিন্তু তার সামনে রয়েছে শতাব্দীর সাক্ষীস্বরূপে এই বনস্পতি। কত ঝড়, কত বিদ্যুৎ-চমক কত প্রলয় দুর্যোগের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে এই মহীরূহ নিশ্চিত সত্যের মতো দণ্ডায়মান। তার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এই আজ কনিষ্ঠের অভিনন্দন অগ্রজের প্রতি।

জয়তু অমৃতবাজার পত্রিকা।

মহাত্মাজীর বাণী

১৯৪৭ সালে অমৃতবাজার পত্রিকা যখন সাম্প্রদায়িক মন্ত্রণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, মহাত্মা গান্ধী তখন বলেছিলেন — "অমৃতবাজার পত্রিকা সত্যিই [illegible]।"

জাতির জনকের কাছ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার এ এক বিরাট পুরস্কার।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা

(পত্রিকায় প্রকাশিত)

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূর্ণিমা রাত চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

[সম্পূর্ণ কবিতাটি অন্যত্র]

মহামতি লেনিন বলেছেন :

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ অমৃতবাজার পত্রিকা যখন নির্ভীকভাবে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল, পত্রিকার অন্যতম বিশিষ্ট পাঠক মহামতি লেনিন তখন অমৃতবাজারের সেই সংবাদ পাঠ করে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি জানাবার জন্যে নির্দেশ দিলে উত্তর ভারতের বলশেভিক ব্যুরোর চীফ এজেন্ট অ্যালেক্সিয়েভ যে পত্র দিয়েছিলেন নীচে তা উদ্ধৃত হোল :

"মঁসিয়ে লেনিন আপনার বিখ্যাত কাগজে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বিবরণ পড়েছেন এবং তিনি আমাকে ভারতবর্ষের জনগণকে জানাতে বলেছেন যে, সোভিয়েত সরকার তাঁদের ভারতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল। যেহেতু আপনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকাটি সম্পাদনা করছেন, তাই আমি আপনাকে এই চিঠি পাঠাতে প্রয়াসী হয়েছি।"

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী উৎসব শুরু হচ্ছে ২০ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

একটি ভাল সংবাদপত্র ইতিহাস সঙ্কলন করা যায়। আর একটি মহৎ সংবাদপত্র সেই ইতিহাসকে রূপায়িত করে। অমৃতবাজার পত্রিকা নিষ্ঠা ও গৌরবের সঙ্গে বাংলাদেশ এবং ভারতের সেবা করেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে এর বিরাট অবদান আছে। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকালের সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ স্বাধীনতার জন্যে তাঁর লেখনী পরিচালনা করে গেছেন।

তাঁর ভাই মতিলাল ঘোষ তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সাংবাদিকতার ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এঁদের আদর্শ পরবর্তী দিনে পত্রিকার সম্পাদকদের এবং মালিকদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আদর্শবাদ, বুদ্ধিজীবীর সততা এবং জনসেবার সঙ্কল্পই এখন সংবাদপত্রকে বাঁচাতে পারে এবং একে ব্যবসাদারী একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বিবেকসম্মত সেবার শতবর্ষ পূরণের জন্যে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন
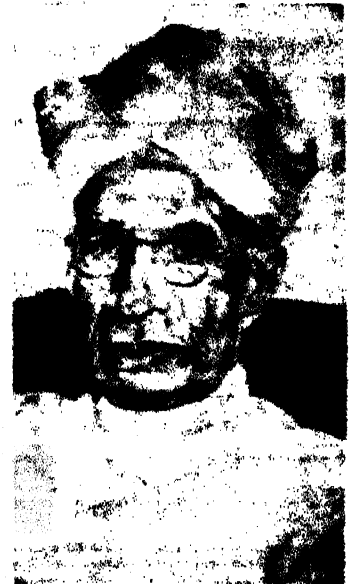
"...দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং যে অসমাপ্ত বিপ্লব সমাধা করতে আমরা যুক্ত আছি তাতে এই পত্রিকা সহায়তা করে এসেছে। দলগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্বাধীনভাবে নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের জন্য এই পত্রিকার জনসেবা অতুলনীয়। সুতরাং এটি জাতীয় সংবাদপত্র। জাতীয় এই হিসাবে যে, এ কোন বিশেষ স্বার্থকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেয় নি। ভবিষ্যতে এর আরো সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি যে কোন গোষ্ঠীর চাপ থেকে অটল হয়েই এর নিজের নীতির অনুসরণ করে চলবে। আজকের দিনে সংবাদপত্রগুলি যখন বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর সহায়তায় তাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করে চলে তখন অমৃত-বাজার পত্রিকার মত একটি স্বাধীন সংবাদপত্র থাকা মঙ্গলজনক।"

পত্রিকার অবদান

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

"বাল্যকাল থেকেই আমি অমৃতবাজার পত্রিকার পাঠক। বছরের পর বছর ধরে আমি এই কাগজের নিয়মিত পাঠক। এমন কথাও বলতে পারি যে, এটি আমার তরুণ বয়সের প্রথম প্রেম এবং এই ভালবাসা আজ পর্যন্ত টিঁকে আছে। জনসাধারণের সেবায় পত্রিকার দৃঢ়তা সম্পর্কে আমার সপ্রশংস মনোভাব কখনো কমে নি। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রগতির প্রতিটি স্তরে একে জনমতের সামনে দেখা গিয়েছে। আমার দেশের মতই আমি একে ভালবাসি।"

তেজবাহাদুর সপ্রু

"অমৃতবাজার পত্রিকা একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। অতীতে এ অনেক কাজ করেছে এবং আজকের দিনে আরো অনেক বেশী সেবা করতে পারে।"

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

"শিশিরবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সম্মান ও সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। তাঁর পদপ্রান্তে বসে অনেক শিক্ষা আমি পেয়েছিলাম। তাঁকে আমার পিতার মতই আমি সম্মান করতাম এবং একথাও বলতে পারি যে, পরিবর্তে তিনিও আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।"

"আমার কাছে মনে হয় শিশিরবাবু ছিলেন এদেশের সাংবাদিকদের পথিকৃৎ... পত্রিকায় তাঁরই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায়...তখনকার দিনে স্বাধীন ও মুক্ত সাংবাদিকতা সহজ ছিল না। কি উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে আমার প্রদেশে পত্রিকার জন্যে অপেক্ষা করা হত তা আমি জানি। আমরা স্বদেশী ভাষায় যখন সংবাদপত্র প্রকাশ করি তখন অমৃতবাজার পত্রিকারই অনুসরণ করেছিলাম।"

রাজেন্দ্রপ্রসাদ

"স্বাধীনতার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের অংশ অনেকখানি। বিদেশী প্রভুদের লৌহকঠিন নিষ্পেষণ একে সহ্য করতে হয়েছে। এদের স্বত্বাধিকারীদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং সম্পাদকদের দীর্ঘকাল কারাবাস করতে হয়েছে।

"অমৃতবাজার পত্রিকার স্থান জাতীয় সংবাদপত্রগুলির মধ্যে অতি উচ্চে এবং এর আত্মত্যাগের জন্যে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এটি সুপরিচিত।

"আমি আশা করি অতীতে স্বাধীনতার জন্যে পত্রিকা যেভাবে কাজ করে এসেছে ভবিষ্যতেও ভারতমাতার মঙ্গল ও উন্নতির জন্যে তেমনি শক্তি নিয়েই কাজ করে যাবে।"

শেখ আবদুল্লা

"সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্যে অগ্রসর হওয়ার নিজস্ব ঐতিহ্য অমৃতবাজার পত্রিকার রয়েছে এবং বিশেষভাবে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্নভাবে এর সমর্থন লক্ষ্য করার মত। জম্মু ও কাশ্মীরের জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে যাঁরা প্রথম তীব্র আগ্রহ নিয়েছিলেন এই পত্রিকাটি তাঁদের অন্যতম।"

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

"...অমৃতবাজার পত্রিকা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আঠারোশো আশী নাগাদ এতে কি বেরোত এবং কলকাতার এই কাগজের ভাগ্যে কি ঘটত এবং সাদেশে আমার সেই অতি অল্প বয়সে তাতে আমি কতখানি উত্তেজিত বোধ করতাম সে সব আমার মনে পড়ে। আমি ভারতের ঐক্য এবং স্বাধীনতার আগমন অনুভব করতাম।"

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"পত্রিকার দুঃখভোগ এবং সেবার ইতিহাস মহান এবং এটি চিরকালই এর মহান প্রতিষ্ঠাতাদের আদর্শ রক্ষা করে এসেছে। 'পত্রিকা' একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক উত্থান-পতনে সর্বস্তরেই একে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের রোষ উপেক্ষা করে দুর্দম সাহসে জনসাধারণের অধিকারের পতাকা উত্তোলিত করে এগিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী লগ্নে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
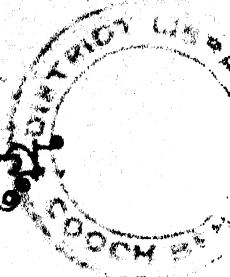
একশত বৎসর পূর্বে ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যশোর জেলার পল্লীগ্রাম মাগুরা থেকে বাংলাভাষার একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা জন্মলাভ করেছিল। মাগুরা গ্রামের ঘোষ পরিবারের হরিনারায়ণ ঘোষ গৃহকর্তা। সেকালের পল্লী অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ওই অঞ্চলের গ্রামবাসী-জনদের সমাজপতি। অমৃতবাজার পত্রিকা বের হয়েছিল তাঁর পুত্রদের উদ্যোগে। তাঁদের মধ্যে শিশিরকুমার মধ্যমণি, তিনিই প্রধান।

বিরাট এক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কল্পনা করে অমৃতবাজার বের করেন নি তাঁরা। তখন ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় নি। ইংরেজ শাসন তখন মহারাজ করা হরিণকে তার প্রতিটি দেহের আক্ষেপ মৃদু গর্জন করে হিংস্র বাঘের মত থাবা মারছে। নড়তে দেয় না। ইংরেজ বাঘের মত, সিংহের মত, যার মতই হোক, বাংলাদেশকে সমাজের বুকে পা বা থাবা উদ্যত করে রেখেছে, একটা থাবা কুঠীয়াল সম্প্রদায় তার মধ্যে নীলকরেরা প্রধান, এরাই সংখ্যায় বেশী। (এরা ছাড়া অন্য কুঠীও ছিল—যেমন রেশমকুঠী, তারা নীলকরদের মত প্রবল ছিল না।) আর একটা থাবা হল ইংরেজ সিভিলিয়ান সম্প্রদায়। নীলকরগোষ্ঠী যে থাবাটা তার অত্যাচারে পাড়াগাঁয়ে তখন ক্ষতবিক্ষত জর্জরিত। বাংলাদেশে ডাকাতের ভয়ও ছিল, প্রবল ভয় সেকালে। কিন্তু ডাকাতের ভয় সাধারণ মানুষে করত না, এবং দিনেও কেউ ডাকাতের ভয় করত না। নীলকরদের ভয় ছিল সকল মানুষের পক্ষে সমান ভয়, দরিদ্রের পক্ষে বেশী এবং এর আর দিন-রাত্রি ছিল না। দিনে-রাতে সমান ভয়, কার ভাগ্য যে কখন মন্দ হবে, কেউ বলতে পারে না, নীলকরদের পাইকেরা এসে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবে। সেকালের নীলকরদের অত্যাচারের কথা সর্বজনবিদিত। তখন নীলদর্পণ লেখা হয়েছে, হরিশ মুখুজ্জে এবং লঙ সাহেব দণ্ডিত হয়েছেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে। সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী যাঁরা তাঁদের অনেকে নীলকরদের সঙ্গে সহযোগিতা করে লাভবান এবং রাজদরবারেও প্রতিষ্ঠাবান হয়েছেন। এদেশে তখন কয়েকখানি ইংরিজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইংরেজ রাজত্ব কায়েম করবার জন্য মুখর হয়েছে, তাদের গলা চড়েছে।

সারা বাংলাদেশে একটি বড় প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেকালের বাংলাদেশের মধ্য বাঙালীজনেরা সম্ববদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা রাজার এবং রাজার জাতের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন কিন্তু যেন যথেষ্ট নয়। তাতে না জাগেন ঈশ্বর, না জাগে মানুষ, বাকী থাকে রাজশক্তি, তারাও এতে এতটুকু কান দেয় না। সে প্রতিষ্ঠানটির নাম বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

অমৃতবাজার পত্রিকায় এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, সে মন্তব্য হতাশা-জনক। গত সপ্তাহে অমৃতে সে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। তাই তুলে দিচ্ছি—

"বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা আমাদের সকল বল, সকল ভরসা কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে আমরা যেমন আমাদের তেমনি সভা। কোন কর্তব্যকর্মে ইহাদের প্রায়ই উৎসাহ নাই, বিশেষতঃ যেখানে স্বার্থের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না-থাকে।"

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্যেরা দেশের জন্য কর্ম করে উপাধি পেতেন ইংরেজের সরকারের কাছে। কাজটাই ছিল মডারেটদের কাজ। যাঁরা ইংরেজের কাছে খেতাব পেতেন, তাঁরাই ছিলেন দেশের নেতা, সমাজের সমাজপতি।

অমৃতবাজারে এ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"কেহ কেহ দুটি-একটি ভারি কাজের দ্বারা রায়বাহাদুর পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে"। কিন্তু দেশের দরিদ্র আর্ত সাধারণ মানুষের উপর রাজশক্তি বা রাজকর্মচারীদের যে উৎকট অত্যাচার তার প্রতিকারে কেউ এক পা বাড়াতেন না, বা একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ-বাণী ধ্বনিত হত না।

অমৃতবাজার প্রকাশিত করেছিলেন ঘোষ ভ্রাতৃবৃন্দ এই বোবা বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দেবার জন্য।

এই সত্যকে আমি মর্মে মর্মে একদা উপলব্ধি করেছিলাম, আমার নিতান্ত বাল্যকালে। অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সেই উপলব্ধি নূতন করে যেন মনের মধ্যে অনুভব করছি।

দেশসেবার যে উৎস, মানবপ্রেমের যে উৎস, অন্যায়ের প্রতিবাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে-উৎস অকস্মাৎ সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেই উৎস থেকেই হয়েছে সংবাদপত্রের জন্ম। অবশ্য একথাগুলি সেদিন এমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তখন আমার বাল্যাবস্থা,—বয়স মাত্র তখন সাত বৎসর কয়েক মাস। সালটা ইংরিজী ১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গ হয়েছে। দেশ তখন উত্তপ্ত। রাজশক্তি তখন হিংস্র এবং রুদ্র। দেশের ধনী এবং সম্পন্ন অবস্থার অধিকাংশজনেরাই রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধিকারে

এসে তাঁদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত হয়েছেন। বিদেশী সরকার দেশ ভাগ করে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের যে-জাগ্রতশক্তি, সেই শক্তিকে দুর্বল করবার জন্য একদিকে তারা দেশকে বিখণ্ডিত করেছে। অন্যদিকে ধনীদের ও ইংরাজী শিক্ষিতদের একাংশকে কাছে টেনে সাধারণ সমাজ থেকে পৃথক করার ভেদনীতিকে গ্রহণ করেছে। এই সব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিয়ে তাঁদের খেতাবে এবং অন্যান্য সম্মানে সম্মানিত করে প্রচারও করতে চাচ্ছেন যে, এঁরাই দেশের নেতা এঁরাই দেশের হিতৈষী। এঁদের কথাই দেশের মানুষের শোনা উচিত এবং বিদেশী সরকার বিদেশী হলেও গুণগ্রাহী ও দেশের কল্যাণকামী।

আমাদের গ্রামের সমাজটি মধ্যবিত্ত-প্রধান সমাজ। ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী। অধিকাংশেরাই ছোটখাট জমিদারীর মালিক। আয় পঞ্চাশ-আড়াইশো থেকে দু হাজার-তিন হাজার চার হাজার পর্যন্ত। একজনের ছিল হাজার বারেক টাকা তিনি আমার জ্যাঠামশাই এবং আর একজনের আয় ছিল লক্ষাধিক। লোকে তাঁকে লক্ষপতি বলত। তাঁর আয় ব্যবসায় থেকেই বেশী, জমিদারীর ক্ষেত্রে তিনি নবাগত, আধুনিক, জমিদারীর পরিমাণ দশ হাজারের কাছে যাই-যাই করছে। ব্যক্তিটি ভাগ্যবানই শুধু ছিলেন না, শক্তিমানের সমুদ্যমসম্পন্ন, সহৃদয়, দুঃখ মানুষেও ছিলেন। ইংরেজ সরকার আমাদের থানার মধ্যে তাঁকে কাছে টানলে। এর আগে তিনি গ্রামে দেবপ্রতিষ্ঠা করেছেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেছেন, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, দেবকীর্তি সংস্কার প্রভৃতি অনেক কর্ম করেছেন, ইংরেজ সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট, একজন আয়েঙ্গার সাহেব আই-সি-এস এসে তাঁকে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করালে, চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠাও করালে এবং খেতাবের ভরসা দিয়ে তাঁকে বলে দিয়ে গেল, তুমিই এখানকার নেতা ও প্রধান,

[illegible] শ্রেষ্ঠ। নেতৃত্ব প্রাপ্য সত্যিই ছিল তাঁর। তিনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই হিসেবে মানুষ তাঁকে নিশ্চয় একদিন মেনে নিত। এই মানানো এবং মেনে নেওয়ার একটি পথ ও পদ্ধতি আছে, সেই পথ ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ করতে একটু সময়ও লাগে। এই হৃদয়বান ধনীজনটি এতকাল পর্যন্ত সেই পথেই চলেছিলেন, কীর্তির পর কীর্তি করে সকল বংশের কীর্তিকে অতিক্রম করে অগ্রগামী হবেন, হলেই তাঁকে সকলে মানবে, এই নীতিই অনুসরণ করে-ছিলেন। হঠাৎ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রশ্রয় তাঁকে স্ফীত করে তুললে। পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য প্রতীক্ষার তর সইল না, তিনি রাজকীয় প্রশ্রয়ে অহংকৃত হয়ে চাপ দিয়ে প্রধান বলে মানাতে চাইলেন। ফলে আমাদের গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন প্রভাব না-থাকলেও সাধারণ মানুষ ও বিশেষ ব্যক্তি ধনীজনের সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সৃষ্টি হল। দুই-একটা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মত ছোটখাট সংঘর্ষও ঘটল।

গ্রামের সমাজের মাথার দিকে যাঁরা ছিলেন, স্বাভাবিকভাবে সংগ্রাম তাঁদের সঙ্গে। আমার বাবা, আমার জ্যাঠামশায় এঁরা ছিলেন এঁদের মধ্যে। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এঁদের সঙ্গে ছিল না। যাঁর সঙ্গে ওই ধনীটির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছিল, তাঁর সঙ্গে প্রীতি ছিল আমার বাবার ও জ্যাঠামশায়ের। যদি কেউ বলে এঁরা একটা দলের অন্তর্গত ছিলেন, তাহলে তাতে আপত্তি করব না। হঠাৎ একটা বিচিত্র পথে এঁদের তিনজনের সঙ্গেই এই প্রধান ব্যক্তিটির সংঘর্ষ বাধল। বাংলা ইস্কুলের ব্যাপার নিয়ে। ধনীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির ম্যানেজিং কমিটিতে এঁরা সকলেই মেম্বর ছিলেন, সেখানে এক-জন শিক্ষককে ম্যানেজিং কমিটির বিনা সম্মতিতে জবাব দেওয়া নিয়ে মতভেদ এবং পরিশেষে মত-বিরোধে পরিণত হল। তারও পরে বিরোধ আর শুধু মতামতের গণ্ডীর পরিধির মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, ছড়িয়ে পড়ল জীবনের সর্বত্র। জেদের অত্যাচারে জীবন হয়ে উঠল জর্জরিত। দেশপ্রেম নয়, নিতান্তভাবে গ্রাম-জীবনে প্রতিষ্ঠা নিয়ে দ্বন্দ্ব। তবে একটি শিক্ষকের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে যে ন্যায় আছে—সে ন্যায় নিঃসংশয়ে ছিল।

তখন বালক ছিলাম, জানি না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে সে-জেদবশে মামলা-মকদ্দমা কতটা বেড়েছিল, তবে বেড়েছিল কিছুটা। অন্যদিকে সে-উত্তাপ যে কতখানি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, তা সেই-বালক বয়সেও আমি অনুভব করেছিলাম। একটা বিরোধের কণ্টকিত জ্বালাকর স্পর্শ যেন আমি অনুভব করতাম। আমি তখন গ্রামের ইস্কুলেই পড়ি। তখন হাইস্কুলে ইনফ্যান্ট ক্লাস ছিল। সেই ক্লাসে ভর্তি হয়ে এইটথ বি ক্লাসে উঠেছি। সেকেণ্ড হয়েছি। স্কুলের হেডমাস্টার থেকে অপর সব মাস্টারেরাই প্রায় এই বিরোধে জড়িয়েছেন, তাঁদের ভ্রূ যেন কুঞ্চিত হয় আমাকে দেখে। অন্ততঃ [illegible] এ বিষয়ে [illegible] যা মনে হয় তাঁরা আমার [illegible] দিয়ে তাঁরাও সে [illegible]। এরই মধ্যে একদা ঘটে গেল এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমার বাবা-জ্যাঠার উপর নেমে এল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আঘাত।

ব্যাপারটা ঘটল এই। স্কুলে হল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সমারোহ। জেলার সদর থেকে এলেন সস্ত্রীক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। বাঙালী আই-সি-এস। তাঁর চেহারাটা আজও মনে পড়ছে আমার। সুপুরুষ ব্যক্তি, সুন্দর বিদেশী রঙের স্যুট পরা। টাইটা ছিল সুন্দর ঘোর লাল রঙের। এবং উপর পাটিতে সাজানো একটা বা দুটো দাঁত ছিল সোনার।

আমি দুটি প্রাইজ পেয়েছিলাম। একটি ক্লাসে সেকেণ্ড হওয়ার প্রাইজ অন্যটি সভায় কবিতা আবৃত্তির জন্য প্রাইজ। আমার বাবা অনেক প্রত্যাশা করতেন আমার উপর। প্রথম পক্ষের সংসার দূরে-দূরে যাওয়ার পর [illegible] বয়সে দ্বিতীয় সংসার করেন। সেই সংসারেও প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সন্তান আমি। আমার [illegible], আমার উপর প্রত্যাশাও তত। বাবার বাসনা ছিল আমি হাইকোর্টের উকীল হব। (আমার পিতামহ উকীল ছিলেন)। ওই পুরস্কার বিতরণী সভায় আমার জীবনের প্রথম গৌরব অর্জন করেছি আমি। কিন্তু বাবা এ সভায় গেলেন না। গেলেন না, স্কুলের কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতাপক্ষ ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের অগ্রাহ্য ক'রে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছেন এবং ওই শিক্ষকটিকে বরখাস্ত করে যে অন্যায় করেছেন সেই কারণে, তারই প্রতি-বাদে। কিন্তু বুঝতে পারেন নি এর জন্য কি ঘটতে পারে।

যা ঘটল তাকে বিনা দ্বিধায় বজ্রাঘাত বলা চলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কানে এই ঘটনাটি তুলে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হল যে, এই সভায় উপস্থিত না-হয়ে এই ব্যক্তি সাহেবেরই অপমান করেছে।

১৯০৫ সালের আই-সি-এস। সঙ্গে সঙ্গে এক পত্র জারী হল (দিন পনেরো পর) "তুমি এই সভায় অনুপস্থিত হয়েছ, তাতে আমি অবজ্ঞাত হয়েছি বলে মনে করি। আমার সঙ্গে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। এর জন্য আমি চাই যে, তুমি স্থানীয় সেটেলমেণ্ট অফিসারের সামনে (তখন ওখানে সেটেল-মেণ্ট চলছিল) স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

আমার বাবার অন্তরে একটা নিদারুণ ইংরেজ-ভীতি ছিল। তাঁর বাল্যকালে তাঁর মামার বাড়ীতে (সাঁওতাল বিদ্রোহের কেন্দ্র-স্থল) সাঁওতালদের উপর ইংরেজের নিষ্ঠুর ও নির্মম দমনমূলক অত্যাচারের গল্প শোনার ফলে এই ভয় তাঁকে আচ্ছন্ন করে-ছিল। তিনি ভয়ে প্রায় ভেঙে পড়লেন। কোনমতেই সাহস সঞ্চয় করে 'না' বলতেও পারলেন না। একটি নির্দিষ্ট দিনে সেটেল-মেণ্ট অফিসারের আপিসে বাবার ক্ষমা-প্রার্থ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

খ্যাতি-অখ্যাতি এক জিনিষ, আর পুরাণ হয়ে ওঠা আরেক।

ঢাক বাজানো নাম নিয়েও পুরাণের উপাদান হবার সৌভাগ্য কজন মানুষ বা কটা বস্তুর হয়?

পুরোনো হলেই তা পুরাণ হয় না।

মানুষজন বা অন্য কিছু পুরাণ-কথা হয়ে ওঠে সময়ের এমন এক রসায়নে যার নকল চলে না। চেষ্টা-চরিত্র করে কি পয়সা ঢেলে এ রসায়ন সার্থক করা সম্ভব নয়।

শুধু সাময়িক সাফল্যও এ পুরাণ মাহাত্ম্য দেয় না। নিজের যুগের প্রচুর সম্মান সমাদর নিয়েও একজন ইতিহাসের উল্লেখ মাত্র হয়ে থাকেন, আরেকজন পুরাণের মহিমা পান।

মাইকেল মধুসূদন পুরাণ-কথা হয়ে আছেন কিন্তু হেমচন্দ্র তা হন নি, এমন কি ভারতচন্দ্রও পুরাণের প্রান্তটুকুর বেশী ছুঁয়েছেন কিনা সন্দেহ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বর্তমান জীবিত-কালের স্মৃতিতেই যে পুরাণ-গরিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁর সমসাময়িক আর কোন দেশনায়ক তার নাগাল পেয়েছেন কি?

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে জেনেও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, বোম্বাই তার সমস্ত সমৃদ্ধি আর প্রাকৃতিক শোভা নিয়ে যা থেকে বঞ্চিত জনাকীর্ণ কলকাতা তার সমস্ত সমস্যা সত্ত্বেও পুরাণের উপাদান হিসাবে সেই রহস্য মহিমায় মণ্ডিত।

পুরাণ হয়ে ওঠার বিরল গৌরব, কিন্তু আকস্মিক দৈবাধীন ব্যাপার নয়। তার মূলে এমন কিছু থাকে যার মূল্য সময়ই যাচাই করে নেয়। সময় যেন তার গূঢ় রসায়ন প্রক্রিয়ার জারিত করে অনেক বাতিল মেকী ও আংশিক খাঁটি রত্নের মধ্যে একটি কি দুটিকে বেছে নিয়ে পুরাণ কিংবদন্তীর দুর্লভ অমরত্ব দেয়।

আমার সামনে আজ সকালে এই পুরাণ কিংবদন্তীর রহস্যমহিমামণ্ডিত একটি জিনিষ মেলা রয়েছে। জিনিসটি আর কিছু নয়, একটি খবরের কাগজ।

এ খবরের কাগজে যে সব সংবাদ ছাপা আছে অন্য অনেক কাগজেই তা পাওয়া যাবে নিশ্চয়। ছাপা ও সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে এ কাগজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্য কেউ নেই এমনও বোধহয় নয়।

তবু এ কাগজটিকে ভিন্ন একটি মুগ্ধ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে না দেখে পারি না।

তার কারণ বোধহয় এই যে, এ কাগজটি হাতে নিলে নিজের অজান্তেই পুরো একশত বৎসরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রাণোচ্ছল ইতিহাসের স্রোত আমাদের স্পন্দিত আন্দোলিত করে যায়।

এক-আধ বছর নয়, একশ' বছর ধরে এই কাগজটি আমাদের দেশের জাগরণ-যজ্ঞের সাক্ষী ও শরিক।

নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ কাগজ আগুন হয়ে জ্বলেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রেস অ্যাক্টের অপমান ও নির্লজ্জ অবিচারের জবাব দিয়েছে রাতকে দিন করার মত অবিশ্বাস্য অসাধ্য সাধনে। ইলবার্ট বিলের সমর্থনে সমস্ত দেশের আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র করে তুলেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ শোনাবার গৌরব লাভ করেছে, বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে জয়-পতাকায় উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছে সমস্ত দেশবাসীর চিত্তে।

সামান্য কটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র। সম্পূর্ণ বিবরণ দীর্ঘ বিচিত্র বিস্ময়কর। তা বিস্তারিতভাবে জানায় অপেক্ষা রাখে। সে বিবরণ এখানে দু কথায় শেষ করবার নয়। তবে বাংলা ও ভারতবর্ষের বর্তমান কালের ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পরিচয় যাঁদের আছে তাঁরা জানেন একাধারে দিশারী ও দর্পণ হিসাবে দেশের সমস্ত মহৎ ও দুঃসাহসী মুক্তি-অভিযানে এবং আত্মশক্তির সাধনায় এই একটি পত্রিকা নির্ভীক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছে একশত বৎসর ধরে।

একশত বৎসর! মানুষের পক্ষে যেমন একটি সংবাদপত্রের পক্ষেও তেমনি বড় সামান্য ব্যাপার নয়। মানুষের বেলা প্রাকৃতিক নিয়মেই শতবর্ষে জরা আসে। মনে করা যেতে পারে যে, যান্ত্রিকভাবে মুদ্রিত কোন পত্রিকার বেলায় হয়ত সেরকম অমোঘ প্রাকৃতিক বিধান নেই। কিন্তু একশ' বছর ধরে সমানের বদলে বর্ধমান প্রাণবেগ নিয়ে দেশে-বিদেশে কটা দৈনিকের এমন বলিষ্ঠ আত্ম-বিস্তারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়!

বিলেতের টাইমস পত্রিকা স্বনামে প্রকাশিত হয় অবশ্য ১৭৮৮-র পয়লা জানুয়ারী। কিন্তু আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস অমৃতবাজার পত্রিকার চেয়ে বয়সে মাত্র সতেরো বছরের বড়। তার প্রথম প্রকাশের তারিখ হল ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৫১।

বিলেতের 'টাইমস' পত্রিকাকে বাদ দিলে সেখানকার অন্য অনেক সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাই অমৃতবাজারের তুলনায় বয়সের বড়াই করতে পারে না। 'ডেলী নিউজ' ১৮৪৬-এ প্রতিষ্ঠিত হলেও মালিক বদলাই করেছে কয়েকবার। আর যথার্থ হিসাব ধরলে এক পেনি দামে যৌবন থেকে

তার প্রকাশ শুরু হয় সেই ত' তার সত্যকার প্রতিষ্ঠা দিবস। এ ব্যাপারটি ঘটে ১৮৬৮তে। ডেলী ক্রনিকল, ডেলী মেল বা ডেলী এক্সপ্রেস, সব কটি পত্রিকাই অমৃতবাজারের চেয়ে কনিষ্ঠ। ডেলী ক্রনিকল ১৮৭৭-এ, ডেলী মেল ১৮৯৬-এ আর ডেলী এক্সপ্রেস প্রথম ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

বয়সের এ সব হিসাব শুধু কিছুটা কৌতূহলই অবশ্য মেটায়। কোনো পত্রিকার সার্থকতা শুধু তার পরমায়ু দিয়ে বিচার করবার নয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সুদীর্ঘ পরমায়ু আমাদের সম্ভ্রম বিস্ময় জাগায় কিন্তু দৈনিক পত্রিকার ক্ষেত্রে তার অসামান্য ভূমিকার বিচারে এ দীর্ঘ পরমায়ুর বৈশিষ্ট্যও গৌণ।

আজকের যুগে খবরের কাগজের প্রভাব যেমন গভীর ও সুদূরপ্রসারী তার দায়িত্বও তেমনি কঠিন। রোমক সাম্রাজ্যে দেওয়ালে লটকানো হাতে লেখা বিজ্ঞপ্তি Acta Diurna রূপে যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আজ আধুনিক বস্তুবাহনে তা জনজীবনের এক বিরাট মহাশক্তিধর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। এ নিয়ন্তা দেব না দানব, কার পক্ষে যুদ্ধমান, সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

শুধু সংবাদ ও বিবরণের প্রাচুর্য, তার ভাষার চাতুরী, শিরোনামার বাহাদুরী, এমন কি নিরপেক্ষতার ভঙ্গী দিয়েই খবরের কাগজ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে না, সমস্ত ব্যবসায়িক সাফল্যের ঊর্ধ্বে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে অক্লান্ত নির্ভীক সংগ্রাম করে যাবার এক অনির্বাণ প্রেরণা যদি না তার মধ্যে প্রকাশ পায়।

এক শতাব্দী ধরে এ প্রেরণা অম্লান রাখবার চেষ্টা কখনো শিথিল হতে দেয় নি বলেই অমৃতবাজার সংবাদপত্রের জগতে আজ পুরাণ-মাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত।

শাখায়-প্রশাখায় যে পত্রিকা আজ বিরাট এক মহীরুহ, শতবর্ষ আগে বাংলার অখ্যাত একটি গ্রামে তার বীজ বপন করেছিলেন সেকালের আশ্চর্য এক মানুষ মহাত্মা শিশিরকুমার। তপোদীপ্ত সেই অদ্ভুত-কর্মা পুরুষের পবিত্র প্রাণ-প্রেরণাই এ পত্রিকাকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে চিরসজীব রেখেছে বলে বিশ্বাস করি।

প্রবোধকুমার সান্যাল

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ অতীতের ইতিহাস নূতন বাঙালী জাতিসৃষ্টির ইতিহাস। সিপাহী বিদ্রোহের পর যেকালে আপন দুর্ভাগ্যে সমগ্র ভারত রাজনীতিক অচৈতন্যে আচ্ছন্ন ছিল সেই দুর্যোগের কালে অমৃতবাজার পত্রিকা দুর্বল দেশের কানে কানে উজ্জীবনী মন্ত্র পাঠ করতে বসেছিল। অমৃতবাজারের গৌরব জাতিসৃষ্টির গৌরব। একথা কেউ ভোলে নি, সেই একটা কাল—যে কালে অশিক্ষা বা কুশিক্ষার অন্ধ অন্ধতা জাতির মুখে কোনও ভাষা এনে দেয় নি। বাংলার প্রাক্তন মনীষীদের তখন যৌবন-কাল। রবীন্দ্রনাথ নাবালক। সেইকালে না ছিল বিজলি, না মোটর, না বেতার, না বা টেলিফোন। কলকাতার ঘোড়ার গাড়ি আর পাল্কি ছিল যানবাহন। এক প্রদেশের খবর অন্য প্রদেশে পৌঁছতে হয়ত দু' মাস লাগত। তখন না ছিল কংগ্রেস, না বা স্বাধীনতার আন্দোলন। সমাজ-উন্নয়ন জিনিস কি প্রকার—তারও ধ্যান-ধারণা বিশেষ ছিল না। পৃথিবী কত বড় বা ব্যাপক, তা কেবল একটু-আধটু জানা যেত ঔপনিবেশিক ইংরেজ আর ফরাসডাঙ্গার ফরাসীদের মুখে—যারা তখনও বাঙালী মহলে হুঁকো তামাক আর গড়গড়ায় টান দিয়ে যেত। সেইকালে ইংরেজের বেপরোয়া মনোবৃত্তির প্রথম প্রতিবাদ ওঠে অমৃতবাজার পত্রিকায়। বলা বাহুল্য, তৎকালীন কালে অমৃতবাজার সেই প্রথম একটি অভিনব চিন্তাধারা ও সাংবাদিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। যৌবনকাল সেই শিশির ঘোষের বা মতির বা দুর্দান্ত কেরাণীদের দণ্ড হাতে নিয়ে অমৃতবাজারই প্রথম সাংবাদিকদের পথ দেখাতে পেরেছিলেন এবং সাংবাদিক এক গোষ্ঠী রচনা করে তাঁরা এই প্রথম দেখালেন যে, সংবাদপত্রসেবকরা একাধারে বেতন-ভোগী হতে পারেন। তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজের দৈনন্দিন কর্মজীবনের কাছে উপরে অসম্ভবই ছিল এই ধরনের কাজে আত্মনিয়োগ করা,—এর জন্য পারি-শ্রমিকের প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। সাহিত্য, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, রাজনীতি বা দেশসেবা—তখনও অর্থকরী হয়ে ওঠে নি। কাব্য, সাহিত্য, চিত্রশিল্প, দেশসেবা বা সাংবাদিকতা,—এসব জিনিস নিয়ে যারা থেকে থাকত তাদেরকে বেকুব বলা হত, এবং তাদের বিবাহ ব্যাপারে কন্যার পিতারা তাদের হাতে কন্যাসম্প্রদান করতে চাইত না। অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষের ইতিহাস বাঙালী জাতির জাগরণের সামাজিক পরিমণ্ডল, ইতিহাস, বিবর্তন এবং আন্দোলন—সাংবাদিক দিক

থেকে জাতীয়তাবাদের প্রথম চেতনা আনে এই পত্রিকা। কিন্তু একশ' বছরে এই পত্রিকার পথ সর্বদা কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেকবার পায়ে কাঁটা ফুটেছে, ঝড়ে ঝাপটে ক্ষত হয়েছে অনেক। ঈর্ষায়, অনুযোগে, অপবাদে বা দুর্নীতিবুদ্ধিতে, মাঝে মাঝে তাকে হোঁচট খেতেও হয়েছে—কিন্তু তার জীবনের কাল ধারাবাহিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিতে সমুজ্জ্বল।

অমৃতবাজার একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা। শুধু এটি যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্রিকাগুলির অন্যতম তাই নয়, প্রাচ্য এবং পশ্চিম প্রাচ্যে তার প্রচার ও প্রতিপত্তি বোধ করি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তার সংবাদ-সরবরাহব্যবস্থা উচ্চাঙ্গসম্মত, এবং তার খ্যাতি সুদূর প্রসারী। বহিঃ-পৃথিবীতে বসে যদি কেউ ভারতকে জানতে চায় এবং ভারতের সুদূর অঞ্চলে বসে যদি কেউ বাঙালীর সুস্পষ্ট পরিচয় নিতে চায়, তবে তাকে এই পত্রিকাই পাঠ করতে হবে। এই পত্রিকার সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতি সাধনা, বাঙালীর শিল্প সাহিত্য কলা ও সাংস্কৃতিক সমস্ত প্রকার আন্দোলন — প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই পত্রিকার নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁদের মধ্যে স্বর্গত শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ বা মৃণালকান্তি ঘোষ,—এঁদেরকে কেউ ভোলে নি। কিন্তু এই পত্রিকার আধুনিক কালের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যাঁর হাতে ঘটেছে সেই অকুতভয় কর্মবীর ও নিরপেক্ষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সকলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

অমৃতবাজারের শতবার্ষিকী উৎসবে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ইংরেজি কাগজের বাংলা নাম

মনোজ বসু

অমৃতবাজার পত্রিকার একশ বছর পূর্তি আর কয়েকটা দিন পরে।

অমৃতবাজার জায়গাটা আমার জন্মগ্রাম থেকে অধিক দূরে নয়। ছোট-বয়স গ্রামেই কেটেছে, সেই গ্রামাঞ্চল ছাড়া আর কিছু জানতাম না। জ্ঞান হওয়া ইস্তক অমৃতবাজারের কথা শুনেছি। খানিকটা রূপকথার মতো। আসল নাম পোলো-মাগুরা। যশোহর-খুলনায় অনেকগুলো মাগুরা—কেন জানি না, পোলো নামে বিশেষ চিহ্নিত ছিল ঐ গ্রাম।

ঘোষেরা জমিদার—গ্রাম্য জমিদার যেমন-ধারা হয়। কিছু প্রজাপাটক খাসজমি বাগ-বাগিচা ও বাড়ি। আর ঐ অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব। ঘোষ-ভ্রাতাদের অতুলন মাতৃভক্তি। মা অমৃতময়ী—তাঁরই নামে সাহিত্যপত্রিকা হল 'অমৃত-প্রবাহিনী'। (সে কাগজ উঠে গিয়েছিল। শতবর্ষের কাছাকাছি এসে নাম কিছু ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার কি নবরূপে দেখা দিল—এই 'অমৃত'? পাক্ষিক এবারে সাপ্তাহিক হয়ে এসেছে।) গ্রামের উপর তাঁরা বাজার বসালেন, তা-ও মায়ের নামে। অমৃতবাজার। পোলো-মাগুরা লোপ পেয়ে গ্রামের নামও লোকের মুখে মুখে 'অমৃতবাজার' হয়ে দাঁড়াল।

সাহিত্য-পত্রিকা ছেড়ে তারপর খবরের কাগজ। গ্রামের পত্রিকা, গ্রামের নামেই তার নাম—অমৃতবাজার পত্রিকা। পুরোপুরি বাংলা কাগজ, নাম থেকেই মালুম হচ্ছে—পাঠক সর্বসাধারণ অবাধে না না পড়তে পারে। 'প্রবাহিনী'র জন্য কাঠের প্রেস এসেছিল—সেই প্রেসে ছাপা হয়ে হপ্তায় হপ্তায় বেরোয়। কাগজের আয়তন ছোট, কিন্তু লেখার মধ্যে আগুন। দেশপ্রেমের আগুন—অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নিজ্বালা। ইংরেজ রাজপুরুষদের বাংলা লেখা সঠিক বোধগম্য হবার কথা নয়—পাছে মিলচয় মর্মোচিত ভাঁকা লাগছে না, খানিকটা লেখা অতএব ইংরেজিতেও থাকা উচিত। পত্রিকা তখন দ্বিভাষিক হল—বাংলা তো আছেই, সঙ্গে কিছু ইংরেজি লেখা।

যশোহর ও প্রতিবেশী জেলা নদীয়ায় অজস্র নীলকুঠি তখন। যার ধ্বংসচিহ্ন আজও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নীলের ব্যবসা জোর চলছে, এবং যা হয়ে থাকে, বেশি মুনাফার লোভে রায়তের উপর নানা অত্যাচার। রাজপুরুষেরা সাহেব, নীলকরও তাই। সাদায় সাদায় মুখ শোঁকাশুঁকি—একই ভাবে সার্টিফিকেট বর্ণাশিনা। রায়তে বিচার পায় না। বিচারের জন্য লড়বে, সে তাকতই বা ক'জনার? এমনি সময় ঘোষ-ভ্রাতৃগণ বিশেষ করে শিশিরকুমারের মধ্যে তারা আপন মানুষ পেয়ে গেল। শৈশবে গ্রাম-বুড়োদের মুখে আমি তাঁর গল্প শুনেছি। শিক্ষিত অর্থবান জমিদার গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর চাষা-ভুষোর মধ্যে ঘোরেন। তাদের নেতৃত্ব নেন, কাগজে তাদের কথা তুলে ধরেন, সাহসে ও আত্মবিশ্বাসে দুর্বার করে তোলেন তাদের। লাল-মুখের সামনাসামনি দাঁড়াতে আর তারা পরোয়া করে না। বাংলার প্রথম গণজাগৃতি যাঁদের আয়োজনে গড়ে উঠল, শিশিরকুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।

হু-হু করে প্রচার বাড়ছে—সবাই পড়তে চায়, কাগজ সবাই হাতে পেতে চায়। লাট-বেলাট থেকে সামান্য-সাধারণ। ছোট্ট গ্রামের মধ্যে থেকে আর চলে না। গ্রামের পত্রিকা নগরে এলো তখন, এই গঙ্গার কূলে। ইংরেজ-ঘাঁটির একেবারে বুকের উপর—বুকে চেপে বসে দাড়ি উপড়ানো আর কি!

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি! নতুন আইন হল—ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। ইংরেজি কাগজে যা-ই বা কিছু গরম-গরম লেখে, দেশি কাগজে কখনো তা চলতে পারবে না। ঘোষেরাও শুনেন নাকি! আইন আজকে পাশ হল এক রাত্রির মধ্যে ভানুমতীর খেল, পরের দিনের পত্রিকা বেরুল বিলকুল ইংরেজি। সারা রাত্রি জেগে টাইপের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন। প্রেস অ্যাক্টকে কলা দেখালেন। ইংরেজি কাগজের বাংলা নাম—নাম-রহস্য এইখানে।

ছোট বয়সে আমরা রূপকথার মতন অমৃতবাজারের কাহিনী শুনতাম। বা-জননীর নাম জগতের সামনে তুলে ধরা—কী অপরূপ মাতৃপ্রেম! নিষ্ঠা অধ্যবসায় ও স্বদেশপ্রেমের সম্বল নিয়ে নগণ্য গ্রামে থেকেও কত বড় জিনিস গড়ে তোলা যায়।

আরও আছে। কলকাতা-যশোহর রোড একটা জায়গায় হঠাৎ বাঁক নিয়ে রেল-লাইন ভেদ করেছে। ঝাঁপড়া আম-কাঁঠালের গাছ কয়েকটা এবং কলাড় বৈঁচিবন—ট্রেনের পথে বরাবর তাই দেখতাম। হঠাৎ সেখানে ঘর উঠে গেল, আলো জ্বলল, স্টেশন হল। অমৃতবাজার রোড স্টেশন। গ্রাম অমৃতবাজার অনেকখানি দূর সেই স্টেশন থেকে—নামটা তবু হাজার হাজার যাত্রীর চোখে নিত্যদিন ঝিলিক দিয়ে যেত। মাতৃনাম-বিজড়িত অমৃতবাজার। এই আমলে, এখন যাঁরা পত্রিকার কর্ণধার তাঁরাই করেছিলেন। বাংলাদেশ দুই খণ্ড হল—তার পরেও যাতায়াতের পথে সে স্টেশন দেখেছি। এখন আর যেতে দেয় না—স্টেশন আছে কিনা জানিনে। না থাকলেই বা কী করতে পারি দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং নিষ্ফল হাত কামড়ানো ছাড়া?

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষের উৎসব করছেন। পত্রিকার প্রথম প্রতিষ্ঠাভূমি অমৃতময়ীর স্মৃতিবাহিত গ্রাম অমৃতবাজারে অনুষ্ঠানের খানিকটা অন্তত হলে কেমন হত বলুন দিকি। পাখি-ডাকা ছায়া-ছায়া গ্রাম-পথে তীর্থযাত্রীর প্রসন্নতা নিয়ে দেশ-বিদেশের অতিথিরা বিচরণ করছেন, বাঁওড়ে নৌকা বাইছেন, কপোতাক্ষীর স্নিগ্ধ জলে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হচ্ছেন—কী অপরূপ উৎসবই না হতে পারত।

আজ নয়, আজ নয়। নীলকর সাহেবদেরও অন্যায়-অত্যাচার একদিন অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছিল—দোর্দণ্ডপ্রতাপ তারা কোথায় চলে গেল পাততাড়ি গুটিয়ে। যেদিন স্বভূমি থেকে বিনা দোষে নির্বাসিত আমরা বুকে বল আর চোখে আগুন নিয়ে ফিরে যাব—আজ না হোক অদূর-কালে এ অন্যায়ের অবসান হবে। হবেই। অমৃতবাজার শত-বার্ষিকী উৎসবের ঐ অংশটা তদ্দিন পর্যন্ত মুলতুবি রইল।

'ওদের কথা লাটসাহেব পর্যন্ত পৌঁছয় না। তিনি জানলে হয়ত কিছুটা ভাল হতে পারে।'

শিশিরকুমারের মুখে একটু হাসি ফুটলো, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'মাস্টারমশাই আজ বলেছেন, Pen is mightier than sword?

পুত্রের মুখের ওপর পিতার স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। বললেন, 'কথাটা ঠিক। Pen is mighter than sword!

যশোরের উত্তর বিভাগ—মহম্মদপুর। মুর্শিদকুলির আমলে সীতারাম রায় এখানকার রাজা ছিলেন। তাঁর অভ্যুত্থান ও পতন যেন একটা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। মহম্মদপুর ধ্বংস হয়ে গেল। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর জন্ম নিল মারাত্মক ব্যাধি—ম্যালেরিয়া। এর বিস্তৃতি সারা দেশটাকে ধ্বংস করে দিল। যশোর নিল এক নামকরা ভূমিকা। গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বংস হয়ে গেল, প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে হলো না। এই সংকটময়কালে পোলোমাগুরোর ঘোষ পরিবারে এলো এক কল্পনাতীত দুর্দিন। হরিনারাণবাবু এই রোগের কবলে দেহ রাখলেন। ঘোষেদের সংসারে অসচ্ছলতা ছিল না। দুঃস্থ মানুষদের সাধ্যমত সাহায্য করতেন শিশিরজননী অমৃতময়ী। হরিনারায়ণের মৃত্যুর পর অবস্থান্তর ঘটল। তখন দুঃখকষ্টের অবধি নেই, তবুও কিন্তু ঘোষদের মনোবল একটুকু ভেঙে পড়েনি। সে সময়ে একটু ইংরেজী বলতে লিখতে পারলে বেশ ভাল চাকরি মিলতো। শিশিরকুমার ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন।

"The articles of Sisir Kumar display his remarkable sagacity, strong common sense, power of expression and clear scathing style and mastery over the English language even in those days when he was a mere strippling".

যশোরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহৃদয়তা তাঁকে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী করে দিল। তাঁর সুমিষ্ট আলাপ, ভদ্রব্যবহার, কর্মশক্তি ও দরদী মন যেন তাঁকে প্রত্যেককেই আপনজন বলে মনে করতে লাগলো। যশোরে তিনি হয়ে পড়লেন সকলের মানুষ।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। তিনি বললেন একদিন,

'একটা চাকরি নেও না। সংসারের কষ্টটাতো যাবে। সাহেবরা একদিন রাজি হবে।'

শিশিরকুমার একটু হাসলেন। বললেন, 'কি চাকরি ভাই? দারোগাগিরি!' অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠলো। শান্ত ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'দাসত্বের চেয়ে দারিদ্র্য শতগুণে শ্রেয়।'

তাঁর মনের ভেতর একটা কথাই যেন বারে বারে জেগে উঠতো—Pen is mightier than sword: ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ চললো। দুঃখ আর দৈন্যে হতাশ হওয়া অপৌরুষেয়। স্থির হলো, যশোর থেকে একটা কাগজ বের করতে হবে। সাহেবদের অত্যাচার ও তার প্রতিরোধ—প্রজাদের দুঃখদুর্দশা নিরসনের সুচিন্তিত পন্থা, ধনীদের শাসন ও শোষণের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের এটি হবে নির্ভীক মুখপত্র। সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে শিশিরকুমার গ্রামে ফিরলেন। মাকে গিয়ে বললেন, 'আজ তোমার আশীর্বাদ নিতে এসেছি মা।'

মাতা অমৃতময়ী শিশিরকুমারের মস্তক স্পর্শ করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, 'আশীর্বাদ! জগজ্জননী জানেন আমার অন্তরের কথা!'

শিশিরকুমারের চোখটা ভিজে উঠলো। বললেন স্বর্গাদপি গরীয়সী সে যে তুমি, আমার মা!'

পুত্রকে স্নেহালিঙ্গনে বুকে চেপে ধরলেন মাতা অমৃতময়ী।

তাঁর চোখে তখন অশ্রুধারা।

'আশীর্বাদ করো মা! দেশের শতসহস্র জননীর চোখের জল যেন মুছিয়ে দিতে পারি। আশীর্বাদ করো মা তোমার নাম নিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা যেন জগতের কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়।' বললেন শিশিরকুমার।

যশোরে প্রতিষ্ঠিত হলো অমৃতবাজার পত্রিকা। এটা আজ থেকে একশ বছর আগে।

ম্যাজিস্ট্রেটরা সাহেব। তাঁরা গোড়ার দিকে পত্রিকার সমর্থক ছিলেন। তাঁরা এই ভেবেছিলেন—পত্রিকা তাঁদের সব কাজের সমর্থক হবে। কিন্তু শিশিরকুমার ভিন্ন ধাতের লোক। তাঁদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো। সাহেবরা জ্বলে উঠলেন। শিশিরকুমার লাটসাহেবের কাজের সমালোচনা করতে দ্বিধা করলেন না। সাহেবরা একেবারে ক্ষেপে গেলেন। গোয়েন্দা পুলিশ ছুটলো তাঁর পিছনে। প্রসন্নবাবু, গিরীশ ঘোষ মজুন নামকরা প্রথম শ্রেণীর দারোগা। তাঁরা শিশিরকুমারকে আইনের আওতায় ফেলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টাই বিফল হল।

তখন দেশে আর্থিক দুর্দিন। পত্রিকার প্রচার সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। এর ওপর যশোরের ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে শিশিরকুমারের কর্মশক্তি অবলুপ্ত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে। তিনি কলকাতায় চলে এলেন।
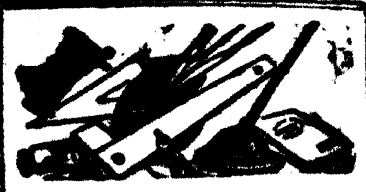
এখন নূতন কর্মস্থল হলো—বাগবাজার। একটা প্রেস কিনলেন শিশিরকুমার। এই প্রেসটি "পত্রিকা অফিসে" সযত্নে রাখা আছে। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রেট্রিয়টের অবলুপ্তি ঘটেছে। ইণ্ডিয়ান মিরর তত জোরদার নয়। ধীরে ধীরে 'পত্রিকা' তার মূল আদর্শ রূপায়িত করে জনগণের চিত্ত জয় করে নিল। লোকে বলতো—পত্রিকা, দেশের পত্রিকা—সকলের পত্রিকা। স্যার রিচার্ড টেম্পল তখন ছোটলাট। স্যার রিচার্ড-এর মত সহৃদয় লাট বাংলায় খুব কমই এসেছেন। পত্রিকার প্রবন্ধে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি নিজেই শিশিরকুমারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। তখনকার দিনের বাংলার লাট গভর্ণমেন্টের কর্তা। পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সৌহার্দ্যের নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি। ঈর্ষায় জ্বলে উঠলো কলকাতার সংবাদিকের দল।

কোনো এক সম্পাদক প্রকাশ্যে বলে ফেললেন,—"বাঙালটা লাটসাহেবকে একেবারে মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে।" শিশিরকুমারের পরামর্শ নিয়ে স্যার রিচার্ড শাসনপদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করলেন। তাঁরই পরামর্শ মতো কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্বাচন প্রথার ব্যবস্থা হলো। সেইটেই ভারতে সর্বপ্রথম ইলেকশনের প্রচলন। পত্রিকার এই অবদান আজ গণতন্ত্রের পূর্ণ লক্ষ্যে এসে পৌঁচেছে।

কলকাতায় তখন ইংরেজি শিক্ষা চালু হয়েছে। ইংরেজদের তখন সাহেবদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আবহাওয়া উদ্বুদ্ধ। মেধাবী ছেলেরা চলেছে বিলেতে। ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুত করার কায়দা আর কেউ মানছে না। বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিতদের প্রভাবে তাদের ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে। উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেছেন। শিক্ষায় দেশ অগ্রগামী, কিন্তু দেশ যে পরাধীন। মিঃ হিউমের সাহায্যে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলো—উদ্দেশ্য দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত করতে হবে।

১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন—সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনকার দিনে ইংরেজদের কাছে আবেদন আর নিবেদন, এই ছিল কংগ্রেসের কাজ। এই গোলপাকানো রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে পত্রিকা দেখিয়ে দিল পথের সন্ধান। কংগ্রেসের মনোভাব ক্রমশ কঠোরতর হতে উঠলো। রাজনীতির মূল উৎস ছিল কলকাতায়। বিডন স্কোয়ারে শিশিরকুমার এক জনসভা ডাকলেন। অগণিত লোকসমাগম। সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা, সরকারী কার্যপদ্ধতির অসঙ্গতি, হগ সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে পত্রিকা প্রকাশ্যে যে আন্দোলনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। শিশিরকুমারের সংগঠনশক্তির প্রভাবে ভারতবর্ষ বিদেশী ইংলিশম্যানেও প্রকাশিত হলো।

তখন ভারতে ইংরেজ রাজত্বের মধ্যাহ্ন। ভিক্টোরিয়া যুগ। তাঁর রাজত্বকাল

কদিন হাইকোর্ট ছাড়লেন না। শেষে একদিন রায় হলো। লর্ড জাবি'শায় তুষারবাবুকে বললেন,

"Tushar Kanti Ghosh — you have been adjudged by this court to be guilty of contempt of court by reason of the article. No apology or regret has come from you. You be detained in simple imprisonment for a period of three months".

দ্বিতীয় তড়িৎকান্তি বিশ্বাসকে জানানো হল,

"You were before this court in 1917 reflecting the impartiality of the then Chief Justice. You were subjected to a fine. That ought to have put you on your guard. You adopt the same attitude as the Editor. Therefore you be detained in simple imprisonment for a period of one calender month".

আইনের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্যে প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের অনুমতি চাওয়া হলো, কিন্তু জাবি'শায় তা বাতিল করে দিলেন।

বিদেশী বিচারের ভ্রূকুটির প্রতি-পরীক্ষায় না করে জনমতের স্বার্থ দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতার জন্য লড়ে পত্রিকার সম্পাদক বারবার কারাগারে নির্যাতিত হয়েছেন। জনসাধারণের প্রতি তাঁর দরদ ও পত্রিকা সিদ্ধান্তের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, কর্তাদের প্রতিবাদ-পত্র আর জনগণ দীপালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—সুদূর ভবিষ্যতেও পত্রিকা দেশ ও জনগণের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে থাকবে।

কারাবাসের দিনগুলি

তুষারকান্তি ঘোষ

আমি ১৯৩৫ সালে তিন মাসের জন্যে জেলে গিয়েছিলাম। কারণ, হাই-কোর্টের জজেদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কাগজে একটা রচনায় আমরা বলেছিলাম যে, হাইকোর্টের জজেরা যদি বড় বড় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেন তবে তাঁদের স্বাধীনভাবে রায় দেবার ক্ষমতা থাকবে না। প্রায় সমস্ত ফৌজদারী মোকদ্দমায় সরকার নিজেই একটি পক্ষ। তাই সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে জজ যদি বেশী মেশেন তবে তিনি ন্যায়সঙ্গত কাউকে শাস্তি দিলেও আসামীর মনে হতে পারে যে, 'আমার জজকে সেই দিন দেখলাম চীফ সেক্রেটারীর সঙ্গে চা খেতে খেতে হাসাহাসি করছেন।' আমাদের বলবার কথা এই ছিল যে, শুধু ন্যায়-পরায়ণ রায় দেওয়াই যথেষ্ট নয়, মামলার বিবদমান পক্ষের মনে এমন একটা বিশ্বাস থাকতে হবে যে রায় তাদের বিরুদ্ধে গেলেও তাতে অন্য কারো প্রভাব কাজ করে নি। এই ঘটনার বিষয়ে অনেকেই জানেন। সেইজন্যে স্বল্প কথায় জানাচ্ছি যে, হাইকোর্ট আমাকে আদালত অবমাননার জন্যে বিচার করেন, এবং চীফ জাস্টিসকে নিয়ে পাঁচজন জজ ছিলেন আমার বিচারক। চীফ স্যর হ্যারল্ড ডার্বিশায়ার এবং আর তিনজন ইংরেজ জজ একমত হয়ে আমাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। কেবল একজন বাঙালী জজ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আমি নির্দোষী। দোষী সাব্যস্ত করে জজেরা আমাকে ক্ষমা চাইতে বলেন। কিন্তু আমি তা পারি নি। আমি অবশ্য জানতাম যে রচনাটি যেভাবে লেখা হয়েছে সেটা ঠিকভাবে লেখা হয় নি—এই কথাই অন্য-ভাবে বলা যেত, কাউকে কটাক্ষ না করে। এটা জানবার একটা কারণও আগেই ঘটে-ছিল। পত্রিকায় ঐ রচনাটি যখন বেরোয় তখন আমি ছিলাম এলাহাবাদে। সেদিন আমি স্যর তেজবাহাদুরের সঙ্গে গল্প করছি। এমন সময় পত্রিকা এল। স্যর তেজবাহাদুর পত্রিকা হাতে নিয়ে রচনাটিতে চোখ বুলিয়ে তখনই বলেছিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ভাল হলেও এ লেখার জন্যে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু এসব জানলেও আমার ক্ষমাপ্রার্থনায় প্রধান বাধা ছিল এই যে, তাতে আমার আদর্শবোধে আঘাত লাগত। অসংযত ভাষায় লেখা হলেও যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা ন্যায়সঙ্গত। সেইজন্যে ক্ষমাপ্রার্থনায় কোন প্রশ্নই আমার মনে ওঠে নি। এবং আমার অ্যাডভোকেট স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু এবং শৈলেন বন্দ্যো-পাধ্যায় জজেদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ক্ষমা চাইতে আমি সক্ষম নই এবং অসম্মত।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আদালতকে, বিশেষ করে হাইকোর্টকে আমি আন্তরিক সম্মান করি। বিশেষত, তখনকার কালে যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপন্ন বিদেশী শক্তি এখানে রাজত্ব করছিল তখন একমাত্র হাই-কোর্টই আমাদের খানিকটা নিরাপত্তা দিতে পারত।

যাই হোক, একটা বিষয়ে আমি মনে ব্যথা পেয়েছিলাম যে, পত্রিকার বৃদ্ধ প্রিন্টার বেচারীও আমার সঙ্গে জেলে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর কোন দোষই ছিল না। তিনি ছিলেন অধীনস্থ কর্মচারী এবং কোন রচনাতে পরিবর্তন করার কিছুমাত্র ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। তাছাড়া আমার মতোই ঐ বিশেষ রচনাটির বিষয়ে তিনিও কিছুই জানতেন না। আমি ছিলাম এলাহাবাদে এবং তিনি সেই সময় ছিলেন কলকাতার বাইরে। তবে বিচারে শাস্তি হলেও ভালোর মধ্যে এই যে, আমার যে ক্ষেত্রে হয়েছিল তিন মাস, তাঁর হয়েছিল মাত্র এক মাস জেল। এবং তিনিও হয়ে-ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বন্দী।

এইবার জেলের কয়েকটি ঘটনার কথা বলব।

জজেরা রায় দেবার পর তখনকার শেরিফ আবদুল হাকিম গজনভি আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলে নিয়ে গেলেন। তার আগে তিনি দয়া করে আমাকে একটা সুবিধে দিয়েছিলেন, তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার বিচার হয়ে যাবার পর জেলে যাবার আগে তিনি আমাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। এটা নাকি রীতি-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু তিনি আমাদের পরিবারকে ভালমত জানতেন, এবং সেই-জন্যেই আমি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার এই সুযোগটুকু পেয়েছিলাম। বলাবাহুল্য, টেলিফোনে আমি শুধু আমার স্ত্রীকে ভরসা ও আশ্বাস দিয়ে মন খারাপ করতেই বারণ করেছিলাম।

জেলের প্রথম ঘটনা হল, সেখানে পৌঁছেই আমার টাকাকড়ি যা-কিছু সঙ্গে ছিল সব জেল থেকে নিয়ে নিল। এবং দোতলায় দুখানি পাশাপাশি ঘরে আমাদের রাখা হল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, আমাদের প্রিন্টার, তিনি সম্পর্কে আমার মামা, তাঁর মুখ শুকনো। আমি বললাম, মামা, এত মন খারাপ করছ কেন? একসঙ্গে থাকব। তাছাড়া তুমি তো আগেই চলে যাবে।' মামা বললেন, 'তা নয়, মুশকিল হয়েছে একটা। বাবাজী, তুমি তো জানো আমি আফিংখোর। সময়ে আফিং না পেলে তো আমার চলবে না।' এই কথা শুনে যখন ভাবছি কী করা যায়, তখন বঙ্কিমবাবু বলে একজন ভদ্র-লোক—যিনি আমাদের পাশের সেলে থাকতেন — তিনি আমাদের কথাবার্তার কিছুটা শুনে এগিয়ে এসে বললেন, 'এর জন্যে ভাবনা কী? টাকা আছে?' আমি বললাম, 'না।' কিন্তু মামা বললেন, 'আছে!' কারণ আমাদের কাছ থেকে যখন টাকাকড়ি জেল থেকে নিয়েছিল তখন মামা হয়তো ভুলবশত তাঁর সঙ্গের টাকা জমা দেন নি। যাই হোক, বঙ্কিমবাবু মামার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে চলে গেলেন। এবং তখন যদিও প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তবু ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আট আনা দামের মত আফিং এনে দিলেন। আমি বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কয়েদী হয়ে এ কাজ কী করে করলেন। তাতে তিনি জানালেন, "এসব জিনিস অনায়াসেই আনা যায়। তবে টাকায় আট আনা কমিশন। আমি আজ চার বছর জেলে আছি। আমি এসব জানি।" আফিং পেয়ে মামার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং তখনই বুঝলাম, হাই-কোর্টে জেল হবার খবর পাবার পর মামা কেন এতো মুষড়ে পড়েছিলেন। এর পর থেকে মামা যতোদিন আমার সঙ্গে জেলে ছিলেন, বেশ হাসিখুশিভাবেই ছিলেন। অবশ্য ইতিমধ্যে দরখাস্ত করার পরে জজেরা তাঁর আফিং পাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রেসিডেন্সী জেলে সাত দিন কাটানোর পর আমাদের আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই আমি বাকী সময়টা ছিলাম।

জেলে আমাদের ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। সেটা একটা ছোট্টো বাংলো মত। দরজায় ঢুকে পড়লে, সেখানে তিনটি ঘর এবং সংলগ্ন একটি বাথরুম ছিল। আর ছিল পাঁচিলে ঘেরা ছোট একটি উঠোন।

আলিপুর জেলে নবজীবন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি অনেকগুলো বন্ধু পেয়েছিলাম—তাঁরা সেখানকার ডেপুটি জেলার এবং ডাক্তার ছিলেন। রোজ সন্ধ্যার সময় আমার লক-আপ হয়ে গেলে তাঁরা এসে দরজার লোহার গরাদের বাইরে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

এ'দের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়াতে আমি কত উপকৃত হয়েছিলুম তা বলতে পারি না। সপ্তাহে একদিন করে আমি বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে পারতাম। এই সব দেখা করার সময় বরাবরই আমার স্ত্রী নিয়মিত আসতেন। একদিন তিনি এলেন না। শুধু আমার ভাইপো শচীবিলাস এল, এবং জানাল, একটা বিয়ের নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল তাই আমার স্ত্রী সেদিন আসেন নি। শচীর সঙ্গে আমার স্ত্রীকে না দেখে আমার মন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়েছিল। তাই শচীর প্রবোধবাক্যে আমি কিছুমাত্র আশ্বস্ত হতে পারি নি। আমি আমার স্ত্রীকে ভালোরকমই চিনতাম। তাই আমি একেবারে বিশ্বাস করতে পারি নি যে তিনি জেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে না এসে নিমন্ত্রণ খেতে যাবেন। তা সে নিমন্ত্রণ যতোই অপরিহার্য এবং নিকট-আত্মীয়দের দ্বারা হোক না কেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আর নেই। আমি তাই শচীর সঙ্গে কোন কথা না বলে আমার ঘরে ফিরে গেলুম।

সেই দিন সন্ধ্যায় ডেপুটি জেলার আলীমদাদ অতি গোপনে আমাকে একখানি পত্র এনে দিলেন। সে পত্র আমার স্ত্রী লিখেছিলেন। তার পূর্বরাত্রি থেকে প্রায় কলেরার মত পেটের অসুখ হয়েছিল তাঁর—সেইজন্যে তিনি তখন সম্পূর্ণ শয্যাগত ছিলেন। এই পত্র পেয়ে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছিলাম। কারণ তার আগে দুঃখে ও চিন্তায় আমি জীবন্মৃত হয়েছিলাম।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি যে জেলে আটক থাকাকালীন মনের এমন অবস্থা হয় যে, একটা স্বাভাবিক ঘটনাও অস্বাভাবিক মনে হয়, এবং একটা তুচ্ছ ঘটনাও ভয়ঙ্কর বলে ভ্রম হয়। আলীমদাদ আমাকে অনুগ্রহ না করলে এ চিঠি আমি সেদিন কখনোই পেতাম না। কারণ বন্দীদের প্রত্যেক চিঠি সেন্সর না করে দেওয়া হত না।

এ প্রসঙ্গে চিঠি সম্বন্ধে আরেকটি কথা মনে হচ্ছে। প্রথম প্রথম আমার স্ত্রী আমাকে যেসব চিঠি লিখতেন এবং আমি তার যেসব জবাব দিতাম সেগুলো সেন্সর করা হত। এ থেকে বেশ বোঝা যাবে যে, সে চিঠিগুলো কোন জাতের চিঠি ছিল। তুমি কেমন আছ, আমি ভালো আছি, এর বেশী নয়। এ চিঠিতে আমাদের কারো তৃপ্তি হত না। সেইজন্যে আমরা একটা নিয়ম-বিরুদ্ধ কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষ উপায়ে পত্রের আদান-প্রদান করতুম। আমাদের যখন সাক্ষাৎকার হত তখন একজন ডেপুটি জেলার সেই ঘরে উপস্থিত থাকতেন। আমরা তাঁকে বলতাম যে, আপনি একটু দূরে বসে অন্য দিকে চেয়ে থাকুন। তিনি তাই করতেন এবং সেই সময়ে আমার গোপনে লেখা চিঠি আমার স্ত্রীকে দিতাম, এবং তিনিও তাঁর লেখা চিঠি আমার হাতে দিতেন। আমি এ জিনিসটা আমার বন্ধু ডেপুটি জেলারদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন করি নি। তবে আমরা এমন কোন কথা লিখতাম না যা কোন অংশেই জেলের আইন-বিরুদ্ধ হতে পারে। এইসব চিঠিতে কেবল আমাদের পারিবারিক কথাই থাকত। জেল সম্বন্ধে কোন খবর থাকত না। আমার তখনকার পরিচিত ডেপুটি জেলারদের মধ্যে একজন ছিলেন চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, যিনি পরে 'জরাসন্ধ' নামে সাহিত্যখ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে আমাদের এই বাঞ্ছিত সাক্ষাৎকারে কেবল একজন অহিন্দু ডেপুটি জেলার বেশ সাহায্য করতেন না। আমরা যখন আপন আপন কথা বলতাম তখন তিনি কটমট করে চেয়ে থাকতেন। তা সত্ত্বেও অবশ্য তিনি আমাদের চিঠি আদান-প্রদান ধরতে পারতেন না। কারণ চেয়ারে বসার সময় কিম্বা উঠে যাবার সময়ই আমরা এ কাজটা করতাম। এই সব চিঠিতে আমার নিকট আত্মীয়স্বজনদের সংবাদ থাকত বলে আমার জেল-জীবনে অনেকটা শান্তি পেয়েছিলাম। আজ এই পর্যন্ত।

অমৃতবাজার শতবার্ষিকীতে
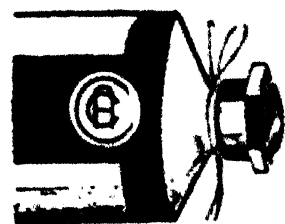
নরেন্দ্র দেব

শিক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সঙ্গেও আমার পরিচয় শুরু। আমাদের ছাত্রাবস্থায়, অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে যখন ছাত্রসমাজ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সেই সময় থেকে সংবাদপত্র নিয়ে আমরা রীতিমত তর্কযুদ্ধে মেতে উঠতুম। কতরকম ন্যায়-অন্যায় বিচার করতুম। তখন আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে খবরের কাগজে ছাপার হরফে যা বেরিয়েছে তা সবই সত্য। তার একবর্ণও মিথ্যা হতে পারে না।

খবরের কাগজ নিয়ে অল্প বয়সে আমরা কাড়াকাড়ি করতুম বিশেষতঃ "ক্রিকেট" খেলার বিবরণটা পড়বার জন্যই। সে সময় মহারাজা নাটোরের 'নাটোর ইলেভন' কুচবিহার মহারাজের 'কুচবিহার ইলেভেন' পাতিয়ালার মহারাজের 'পাতিয়ালা ইলেভেন' এদের সঙ্গে 'ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের' ম্যাচের খেলা দেখবার খুবই উৎসাহ ছিল। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের খেলায় একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করতুম আমরা। লালমুখোদের হারাতে পারলে খুশীতে আমাদের কালো মুখও লাল হয়ে উঠতো! খেলার বিবরণ এবং খেলুড়েদের পরিচয় জানবার একমাত্র উপায় ছিল আমাদের খবরের কাগজের 'স্পোর্টিং নিউজ'।

কাজেই সকাল হতে না হতেই 'খবরের কাগজ' নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো বাড়ির ছেলেদের মহলে। পাড়ার ছেলেরাও অনেকে আমাদের বাড়ি এসে জড়ো হত সকালে, শুধু ওই খেলার খবরটা পড়ে যেতে বা জেনে যেতে। এটি জানবার একমাত্র উপায় ছিল সেদিন দৈনিক ইংরিজী সংবাদপত্রগুলি। পাঁচখানি 'ইংরিজী দৈনিক' নিয়ে সেদিন আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। যথাঃ 'স্টেটসম্যান', 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আর 'বেঙ্গলী'।

এদের মধ্যে তিনখানির অস্তিত্ব আজ আর নেই, যথা 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' আর 'বেঙ্গলী'। 'স্টেটসম্যান' আর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' এখনও অমর হয়ে আছে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পড়ে আমরা যে তৃপ্তি পেতুম 'স্টেটসম্যান' পড়ে আমরা সে তৃপ্তি পেতুম না। কারণ 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় থাকতো—চৌরঙ্গীর ইউরোপীয় সমাজের খবরই বেশি। ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ প্রায় না থাকার মধ্যে বলা চলে। ভারতের সকল প্রদেশের এমন সামন্ত রাজন্যদেরও খবর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যেমন নির্ভীকভাবে পরিবেশন করতেন একমাত্র রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' কাগজ ছাড়া অন্য কোনও কাগজেই তা পেতুম না আমরা।

"বুয়োর ওয়ার" এবং "রুশো-জাপানীজ ওয়ারে"র খবর সঠিক জানবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য কাগজ ছিল আমাদের কাছে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। তারপর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিলাতী কাগজ আমরা 'বয়কট' করেছিলুম। সেদিন আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পত্রিকা ছিল 'অমৃতবাজার' আর 'বেঙ্গলী'। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সম্পাদিত বাঙলা 'হিতবাদী' পত্রিকাও আমাদের দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

তারপর, এই কলকাতার কোল ছুঁয়ে ভাগীরথীর বহু তরঙ্গ বয়ে গেছে। পৃথিবী জুড়ে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল। কত রাজা ও রাজসিংহাসন শূন্যে মিলিয়ে গেল। কত আন্দোলন, কত আলোড়ন এই ভারতের বুকে 'নরমপন্থী' 'গরমপন্থী' কংগ্রেস নিয়ে চললো। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন ও বিপ্লবীদের সহিংস আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠলো—'অমৃতবাজার' সেই ঢেউয়ের উপর আজও ভেসে চলেছে।

"অমৃতবাজার পত্রিকার" কাছে সারা ভারতবাসী নানাভাবে প্রভূত ঋণী। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনে বরাবরই আমি দেখে এসেছি 'অমৃতবাজার পত্রিকা' চিরদিনই এই বিদেশীর পদদলিত দুঃখ পরিব্লুত নিপীড়িত, নানা অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবাসীদের সতত কল্যাণকামী সজাগ বন্ধু ছিলেন। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার শিরোনামের তলায় বড় বড় হরফে লেখা থাকতো 'এ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' কিন্তু আমার মনে হয় একথা একমাত্র বলতে পারতো—'অমৃতবাজার পত্রিকা'। বিদেশী সরকারের নানা উৎপীড়ন অত্যাচার তুচ্ছ করে নির্ভীক দুঃসাহসী কর্তব্যনিষ্ঠ সংবাদসেবী রূপে অমৃতবাজার পত্রিকা এই শতবর্ষকাল তার গৌরবধ্বজা উঁচু করে ধরে আছে। শিশিরকুমার ও মতিলালকে ভারতবাসী যদি কোনও দিন ভুলেও যায় হয়তো তাদের সৃষ্ট 'অমৃতবাজার পত্রিকাকে' এদেশ কোনও দিনই ভুলতে পারবে না।

অমৃতবাজার পত্রিকার এই শতবার্ষিকী তো একখানি সংবাদপত্রের শতায়ু লাভের গৌরব নয়, এ যে—এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা সমাজ ও সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধ এবং রাষ্ট্রচেতনার অবিস্মরণীয় ইতিহাস। জয় হোক শতায়ুষ্মান 'অমৃতবাজার পত্রিকার'।

মৌসুমী নকশা
Bata

কৃষ্ণ ধর

অমৃতবাজার পত্রিকার একশো বছর বয়স হওয়াটা খুবই তাৎপর্যের। 'শিশু-বয়সেই তার প্রাণান্ত হবার আশংকা ছিল। ইংরেজরা এই পত্রিকাটিকে সুনজরে দেখেনি। তার কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রেস আইনই পাল্টে দিলে। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার কলম তাতে বন্ধ হয়নি। ছিল বাংলা ও ইংরেজি মিশানো দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক। ইংরেজের কুখ্যাত আইনের বেড়া ডিঙাবার জন্য সম্পাদক শিশিরকুমার পরবর্তী সপ্তাহেই তাকে সম্পূর্ণ ইংরেজিতে রূপান্তরিত করেন।

ঘটনাটা অবাক করার মতোই। যেমন আজ আমরা অবাক হয়ে ভাবি কী করে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাংলাদেশের গণ্ডগ্রামে প্রকাশিত একটি পত্রিকা সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছিল পত্রিকার সম্পাদনা-বৈশিষ্ট্যে, তার কলমের জোরে। ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙাবার জন্য যাঁদের কাজ স্মরণীয় হয়ে আছে, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্ভীকতা ও একনিষ্ঠতা তাদের মধ্যেই গণনীয়। এই একশো বছর বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের নবজাগরণের কাল। অমৃতবাজার পত্রিকা তার সাক্ষী। তার শতবর্ষের পৃষ্ঠার পর্যায় অনু-সন্ধানীরা একটি জাতির জাগরণের স্বাক্ষর পাবেন। আজকের যুগে বাস করে কোনো তরুণ পাঠকের পক্ষে বোঝা মুশকিল যে সংবাদপত্র প্রকাশ ও পরিচালনা করা সে যুগে ছিল কত কঠিন। তখন মুদ্রাযন্ত্রের এত উন্নতি হয়নি, তা সুলভও ছিল না। তা ছাড়া ইংরেজ শাসনের খাঁড়াটা যেন জাঁকিয়ে বসেছিল দেশের বুকে। সম্পাদককে কলম চালাবার আগে পাঁচবার ভাবতে হত— এই লেখা বেরোলে কাগজের আয়ু আর কতদিন টিকবে?

শিশিরকুমার তা জানতেন। কিন্তু তাতে তিনি হতাশ হননি। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছিলেন এই পত্রিকার চারপাশে। তা সম্ভব হয়েছিল অমৃতবাজার পত্রিকার আন্তরিক দেশসেবার গুণে।

১৮৬৮ সাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সিপাহী বিদ্রোহের দশ-এগারো বছর পরের সময়। ইংরেজরা একটা মস্ত ঘা খেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন মাত্র সাত বৎসরের বালক। বঙ্কিম-চন্দ্রের বয়স তখন ত্রিশ। আলীপুরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর। ঔপ-ন্যাসিক হিসেবে তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত। মাইকেল মধুসূদন তখন দুর্দান্ত কবিরূপে বন্দিত। বাংলাদেশে সাহিত্যে, দর্শনে এবং ভাবধারায় নবীন প্রাণের জোয়ার প্রবাহিত। এই পরিবেশে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম। অমৃতবাজারের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক তাঁর এই প্রয়াসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ব্যঙ্গাত্ম-স্নিগ্ধ শ্লেষমিশ্রিত ভাষায় লিখেছিলেন, "স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা...... যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত ও স্বচ্ছন্দ-তার নিমিত্ত, রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি ক্লেশ-কর ও কঠিন কর্মে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতিনীতি উদ্দেশ্য, স্বার্থশূন্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া তাহাদিগের নিকট যে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের চেষ্টা করি।" অতি স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ ভাষায় সম্পাদক লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর উদ্দেশ্য। ভাষায় কোনো জড়তা নেই, বাক্য-বন্ধনও বেশ আধুনিক। পত্রিকার শিরোভূষণরূপে প্রকা-শিত হত এই দুটি ছত্র ঃ

"অমৃতবাজার কালকূটে যদি হায় হায়।
করেছে কি আর্যসুতে জেনো নাহি যায়।।"

এর পর পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠকদের এবং শাসকবর্গের কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাংলা-দেশে পত্রিকার পূর্বসূরী হিন্দু পেট্রিয়ট— তার নির্ভীক সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের নাম তখনও লোকের মুখে মুখে। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হবার কয়েক বছর আগেই হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু হরিশচন্দ্র তখন এক লেজেন্ডে পরিণত। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের চরিত্রদের মুখে শোনা গেল এই গান ঃ

"নীল বাঁদরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মলো,
লঙের হলো কারাগার,
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

শিশিরকুমারের মনে এই বেদনার্ত কণ্ঠের গান নিশ্চয়ই প্রতিধ্বনিত হত। কারণ, আমরা পরবর্তীকালে দেখেছি নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার অক্লান্ত ক্রুসেড। উত্তরাধিকারের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশে সে কারণেই অমৃতবাজার পত্রিকা তখন শিক্ষিত মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য।

শিশিরকুমারের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব ডঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ঠাকুর-বাড়ির সঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকার ঘনিষ্ঠতা যে ছিল তা বোঝা যায় বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম কবিতা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন শিশিরকুমারই তাঁর কাগজে।

শিশিরকুমারের লেখনীর ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল পত্রিকার জন্মের আগে হরিশচন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়টে। এই কাগজে তিনি ছদ্ম-নামে নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা করে কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করতেন। পরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আন্দোলন তখন এভাবেই দানা বেঁধে ওঠে। তার সঙ্গে সঙ্গে দাবী ওঠে শিক্ষা প্রসারের, সমাজ সংস্কারের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তখন সার্থকতার উত্তুঙ্গে। বাংলাদেশে এই সময়টাকে আমরা চিহ্নিত করেছি নবজাগরণের কাল হিসেবে। চিন্তার মুক্তি ও সমস্ত রকম কুসংস্কারের বিনাশ— এই আদর্শ নিয়েই শুরু হয়েছিল বাংলার নবজাগরণ। তার জন্য চাই নতুন ভাষা, নয়তো নতুন চিন্তার বাহন হবে কোন জরাজীর্ণ অপ্রচলিত ভাষা। বিদ্যাসাগরের হাতের কলমে আদলে বদলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে নতুন যুগের উপযোগী করে তুললেন। মধুসূদন পয়ারের বেড়ি ভেঙে তার পরে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পত্তন করলেন। শুধু তাই নয়, কাব্য-চিন্তাতেও তিনি বিপ্লব আনলেন রামায়ণ কাহিনীর নববিন্যাসে। তার অনুগামী হলেন নবীনচন্দ্র সেন।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির উদার ও রাজনৈতিক অর্থে বেশি আগ্রহী হলেও তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। অতে-

শিশিরকুমার আর তাঁর ত্রিসীমানাও মাড়ান নি কোনোদিন। শেষপর্যন্ত অবশ্য অনেক কষ্টে এবং অন্য কৌশলে সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধলেখক রাজকৃষ্ণ মিত্রের নাম সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁকে এক বছর ও 'পত্রিকা'র মুদ্রাকরকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিতও করা হয়েছিল। কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকৃত সম্পাদক তখন কে ছিলেন আইনের দিক থেকে কোর্টের পক্ষে তা নির্ধারণ করা সম্ভবই হয়নি সেদিন। কোর্টের সে চেষ্টা মাত্র বাইশ বছরের যুবক মতিলাল ঘোষ সেদিন কিভাবে বানচাল করে দিয়েছিলেন তাও সত্যি জানবার মতো বিষয়।

পূর্বোক্ত মামলায় সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষী মানা হয়েছিল মতিলাল ঘোষকে তাঁর সেজদা শিশিরকুমার যে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধটির লেখক যে অন্য আর কেউ, তাঁকে দিয়ে তা' প্রমাণ করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রবন্ধকারের নামটি বার করে নেবার জন্যে। কিন্তু তাঁকে জেরা করে কোনো উদ্দেশ্যই সফল হয়নি। এখানে সেই জেরারই কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

ম্যাজিস্ট্রেট মতিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—অমৃতবাজার পত্রিকার মালিক কে?

মতিলাল—এ পত্রিকা জনসাধারণের।

ম্যাজিস্ট্রেট—তা' কেমন করে হতে পারে? এর আগের এক মামলায় আপনিই বলেছিলেন এর মালিক আপনার এক কাকা, আর এখন বলছেন, এর মালিক জনসাধারণ!

মতিলাল—আমি ঠিকই বলেছি। আমার কাকা প্রেসের মালিক, এ কথাই আমি আগে বলেছিলাম, তিনি পত্রিকার মালিক নন। প্রেস এবং পত্রিকা এক জিনিস নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট রেগে গিয়ে তখন প্রশ্ন করলেন—'পত্রিকা'র সম্পাদক কে?

মতিলাল—তা' হলে সে কথা শুনুন, অতি সম্প্রতি এই কাগজখানার প্রকাশ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্থির হয়নি কে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট—কিন্তু জনসাধারণ কি শিশিরকুমারকেই তার সম্পাদক বলে মনে করে না?

মতিলাল—হ্যাঁ, সে কথা ঠিক, কারণ শিশিরকুমার খুব ভালো লিখতে পারেন বলে তারা জানে।

ম্যাজিস্ট্রেট—আপনি কি বলতে চান শিশির ও বেশ ভালো ইংরেজী লিখতে পারে?

মতিলাল—নিশ্চয়ই, খুব ভালো ইংরেজীই তিনি লেখেন এবং অনেক মোটা মাইনের রাজকর্মচারীদের চেয়েও ভালো ইংরেজী।

এরপর বিচারক আর কোনো প্রশ্ন করতে ভরসা পাননি। "ঘোরতর অত্যাচার" প্রবন্ধের লেখক যা অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের নাম বার করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে সে সময়ে যে অবস্থায় পড়তে হয়েছিল তা' সহজেই অনুমেয়। শেষপর্যন্ত প্রবন্ধকার ও মুদ্রাকরকে অন্যায়ভাবে ইংরেজের আদালতে দণ্ডিত করা হলেও শিশিরকুমারকে ধরা-ছোঁয়া সম্ভব হয়নি।

তা' হলেও সেই থেকেই অমৃতবাজার পত্রিকাকে জব্দ করার জন্যে, তাকে ঘুষ দিয়ে হাত করার জন্যে এবং শেষপর্যন্ত তাকে ধ্বংস করার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চলে এসেছে, কিন্তু বৃটিশ শাসকের সেই সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা যে আজ তার শতবর্ষ অতিক্রম করে আসতে পারছে তার মূলে রয়েছে সত্যকার জন-প্রতিনিধিত্বের শক্তি। সেই বলে বলীয়ান হয়েই শাসকবর্গের ভ্রূকুটি, ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি শিশিরকুমার-মতিলাল।

প্রথম থেকেই সৎ সাংবাদিকতা ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে অমৃতবাজার পত্রিকা। কিন্তু শিশিরকুমারের জীবনের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে যে উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তার কোনো তুলনা নেই। বৃটিশ-বিরোধী সংবাদ ও তীব্র সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশে অমৃতবাজার পত্রিকাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে বাংলার তদানীন্তন লেঃ গভর্ণর স্যার অ্যাশলি ইডেন এক অভিনব কৌশল-জাল বিস্তার করেছিলেন শিশিরকুমারকে বাগে আনার জন্যে। শিশিরকুমারের কাছে ছোট লাটসাহেব এক নির্লজ্জ প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন, "আসুন আমরা তিনজন—আমি, আপনি ও কৃষ্টদাস—এই প্রদেশ শাসন করি। আমার নির্দেশ মতো কৃষ্টদাস তাঁর কাগজ (হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্টদাস পাল "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হয়েছিলেন) চালাতে রাজী হয়েছেন। আপনাকেও তাই করতে হবে। "হিন্দু পেট্রিয়ট"কে যেমন করা হয়ে থাকে আপনার কাগজেও আমি তেমনি অর্থসাহায্য দিয়ে যাবো।" এই ঘৃণ্য প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সেদিন যেভাবে রাজপ্রতিনিধির মুখের ওপর যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন শিশিরকুমার, তা' কোনোদিন বিস্মৃত হবার নয়। স্যর অ্যাশলি ইডেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলে দিলেন,

'Your honour, there ought to be at least one honest Journalist in the land.'

একেই বলে মুখের মতো জবাব। এবং সেই জবাব শোনবার পর স্যার অ্যাশলি তখনকার মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু সেই থেকেই কী করে অমৃতবাজার পত্রিকা এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত বৃটিশ-বিরোধী অন্যান্য পত্র-পত্রিকাকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা যায় তার চক্রান্ত চলতে থাকে। তারই পরিণতিতে বড়লাট লর্ড লিটনের প্রেরণায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র দমন আইন ঘোষিত হলে সাপ্তাহিক দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা) অমৃতবাজার পত্রিকা ২১শে মার্চের সংখ্যা থেকেই পুরোপুরি ইংরেজী সংবাদপত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এই দমন-নীতির প্রতিবাদে তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে বলা হয়—

'A subservient Press means no Press in the long run But what is the good of a Press at all that is subservient? It will not represent the feelings and wishes of the nation It will not lead but mislead the nation The institution will not be wanted in the country, but it will stand a huge lie deceiving both the Government and the nation It is far better to grope in the dark than to have a light which misleads. It is better to have no advocate and depend upon the good sense of the Judge than to trust one who is false and treacherous.

এই কথা কয়টির মধ্যেই অমৃতবাজার পত্রিকার নীতি ও আদর্শ যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে। সত্য ও সেবা এবং স্বাধীনতা ও সাহসিকতার প্রতীক অমৃতবাজার পত্রিকাকে সেই আদর্শই শতবর্ষে অধিকারী করেছে এবং যতদিন দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠাতাদের পতাকা অনুসরণ করে সে চলতে পারবে ততদিনই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি জাতির গৌরব সম্পদ ও ঐক্যের সুউজ্জ্বল বস্তু বলে গণ্য হবে।

ট্যাক্স দিতে হইবে।......গবর্ণমেণ্ট যে সর্ব্বনাশিয়া হার ধরিয়াছেন তাহা নিম্নে দেখুন।

৫০০	হইতে	৭৫০	পর্য্যন্ত	১১
৭৫০	"	১০০০	"	২৭
১০০০	"	১৫০০	"	৩১
১৫০০	"	২০০০	"	৫৪

......একজন ইংরেজ পার্লিয়ামেণ্টে ২টার সময় এতদ্দেশীয় ১৫ কোটী লোকের ভাগ্য পাঠ করিলেন, তাহার তিন দিনের দিন আর কয়েকজন ইংরেজ উহা লইয়া খানিক তর্ক করিলেন, করিয়া ইনকম ট্যাক্স বিধিবদ্ধ করা হইল আর গবর্ণর জেনারেল উহা আইন পাশ করিলেন।..............

আমরা ইনকম ট্যাক্সের মূলগত প্রণালীর বড় সপক্ষে। রাজ্যের ভার যেরূপ ব্যক্তি তাহার সেইরূপ বহন করা উচিত তাহা হইলে কাহারো কষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা প্রায় ঘটিয়া উঠে না।..................
ন্যায্য বিচার করিতে গেলে আয় বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে নিরিখ বৃদ্ধি করা উচিত।......
আমরা নিম্নে যেরূপ সিডিউল দিতেছি এইরূপে হার ধরিলে অত্যাচারের অনেক লাঘব হইতে পারে।

১০০	হইতে	৫০০	শতকরা	॥০
৫০০	"	১০০০	"	১
১০০০	"	১৫০০	"	১।০
১৫০০	"	২০০০	"	১৸০
২০০০	"	৩০০০	"	২,
৩০০০	"	৪০০০	"	২।০

এইরূপে যাহাদের আয় ৫ হাজার টাকার উপরে তাহাদের নিকট ৩৸০ লওয়া যাইতে পারে। ......(২ বৈশাখ ১২৭৭। ১৪ এপ্রিল ১৮৭০)

চৈত্র মেলার বিজ্ঞাপন

আগামী চৈত্রমেলা উপলক্ষে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ নিম্নলিখিত বিষয় সকলের নিম্নলিখিত পুরস্কার দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

বিষয় ঃ

(১) নীতি বিষয়ক অন্যূন ২৫টি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।

(২) বিদ্যা, ভাষা, রাজনিয়ম, কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য এই পাঁচটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া এদেশের উন্নতিকল্পে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত রচনা।

(৩) এতদ্দেশে কার্পাস ও রেশমাদি দ্বারা যেরূপ বস্ত্রাদি বয়ন করে, তাদ্বিষয়ক বর্ণনা ৮ পেজি কাগজের অন্যূন ২ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৪) এদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী মনুষ্যশরীরের অস্থি-সংস্থান, সংখ্যা ও অবস্থা বিষয়ে বর্ণনা, ও ৮ পেজি কাগজের অন্যূন ৫ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৫) রামায়ণ গ্রন্থের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৬) মহাভারত গ্রন্থের মর্ম্ম ও তদন্তর্গত নীতি-বিষয়ক উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা।

(৭) ক্ষত্রিয় জাতির সাহস ও স্বদেশ-প্রিয়তা বিষয়ক উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা কবিতা রচনা।

(৮) বিজ্ঞান, অর্থাৎ মেকানিক্স, হাইড্রস্ট্যাটিক্স, অপটিক্স, ইলেকট্রিসিটি এই সকল বিষয়ে ৮ পেজি কাগজের অন্যূন ৬ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা ১০০

(৯) বর্ত্তমান রাজনিয়ম বিষয়ে ঐ অন্যূন ৫ ফারমা উৎকৃষ্ট সাধু ভাষায় রচনা। ৫০

(১০) এদেশীয় গুরুমহাশয়েরা একণে যেরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিরূপে তাহার উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে তাদ্বিষয়ক বর্ণন ২৫

(১১) এতদ্দেশীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ে পূর্ব্বের সহিত এখনকার তুলনা করিয়া তদীয় অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষ বর্ণন, ৮ পেজি কাগজের অন্যূন ৩ ফারমা ঐ

(১২) কৃষিকর্ম্মোপযোগী ও কুমারের দ্রব্যজাত প্রদর্শনের জন্য ৩০০

(১৩) এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কৃত শিল্পকর্ম্ম প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৪) এদেশীয় চিত্রকর ও কারিকরদিগের চিত্রিত ও নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৫) মালাকরদের বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রদর্শনের জন্য ২০০

(১৬) এদেশীয় লোকের ব্যায়াম শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য ১০০

উপরোক্ত লেখনী বিষয়-সকলের মধ্যে যিনি যে বিষয় লিখিবেন তিনি তাহা আগামী ২০ চৈত্রের মধ্যে ১০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

যাঁহারা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ স্থানে তাহা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, আগামী চৈত্রমেলা উপলক্ষে যিনি যে সকল দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিবেন, তিনি তাহার তালিকা বা দ্রব্যাদিসমেত শোভাবাজারের রাজবাটীতে শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের নিকট পাঠাইবে, তিনি কিম্বা শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ দেব তাহার রসিদ দিবেন। শ্রীগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক। শ্রীনবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক। (৩০ ফাল্গুন, ১২৭৫। ১১ মার্চ, ১৮৬৯)

চৈত্র মেলা

গত চৈত্র সংক্রান্তিতে কলিকাতার বাবু আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগানে চৈত্র মেলার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা এবার অধিকতর সমারোহের সহিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। লোকের জনতা বিলক্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্থান সংকীর্ণ ও উত্তম বন্দোবস্ত না হওয়ায় অতি গোল হইয়াছিল। এমনকি আমরা শুনিলাম অনেকগুলি ভদ্রলোককে ধাক্কা খাইতে হইয়াছিল। এবেলকার অনেক দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়াছিল। এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যও বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি দেখিয়া অনেকে সন্তোষলাভ করেন। গত বৎসরের ন্যায় উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রস্তাবসকল পঠিত হইয়াছিল। [illegible]
সংস্কৃত কলেজের কতকগুলি ছাত্র বেণী-সংহার নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাট্যশালাটি অতিশয় অপ্রশস্ত হইয়াছিল এবং এই অভিনয়-স্থিরে পৌঁছিতে লোকের এত সমাগম হয় যে, তাঁহারা অভিনয় ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক ইঁহাদিগের উদ্যোগ অতিশয় মহৎ। ব্যায়াম চর্চ্চা এবার উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। অনেকগুলি ভদ্রসন্তান ব্যায়াম চর্চ্চার পরীক্ষা দেন। তাঁহাদের নৈপুণ্য দেখিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।......

(১১ বৈশাখ ১২৭৬।
২২ এপ্রিল ১৮৬৯)

......বাবু [illegible] ঘোষের বাড়ী [illegible]। ......[illegible] তাঁহার [illegible]—[illegible] প্রস্তুত করা।...

মহাত্মা শিশির কুমার ও পরলোক তত্ত্ব

ভবানী মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের জননী অমৃতময়ী মাত্র ন' বছর বয়সে স্বামীর-ঘর করতে এসেছিলেন। পরিপূর্ণ সংসার, স্বামী হরিনারায়ণ ঘোষ ১২৬৯ সালের পৌষ মাসে যখন লোকান্তর গমন করেন তখন তাঁর আটটি পুত্র, তিনটি কন্যা, তিনটি পুত্রবধূ ও কয়েকটি পৌত্র ও পৌত্রী। অমৃতময়ী বালিকাবয়সে সংসারে প্রবেশ করে এই প্রথম শোক পেলেন। এর প্রায় আড়াই বছর পরে অমৃতময়ীর পঞ্চম পুত্র হীরালালের মাত্র আঠারো বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তিনি তাঁদের দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না, বললেন, "যদি তাঁদের দুঃখ দূর করিতে নাই পারিলাম তবে বাঁচিয়া ফল কি?"

মাতৃভক্তপ্রাণ হীরালালের মৃত্যুতে অমৃতময়ী বিশেষ কাতর হলেন, তিনি পুত্রদের বললেন: "বাবা, আমার হীরালাল যখন তার অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছে তখন আমি আর এই ছার প্রাণ রাখব না।"

পুত্র বসন্তকুমার জননীকে প্রবোধ দিলেন—"মৃত্যুর পর আবার আমাদের মিলন হবে, বৃথা শোক কেন? যদি প্রমাণ না পাই তবে আমরা সবাই হীরালালের পথ অনুসরণ করব।"

এই সময় আমেরিকায় প্রেত-তত্ত্বচর্চা বিশেষ সাফল্যলাভ করে এবং তাঁদের উদ্ভাবিত পন্থায় পরলোকগত আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শিশিরকুমার দেশ থেকে কলকাতায় এলেন এবং কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের ৩০শ বার্ষিক শোকসভায় (১৯১৬) মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির ভাষণে বলেন—

> "For some domestic affection my late lamented brother, Sisir Babu, thought of starting for America to learn the modern art of occultism direct from the spiritualists there. He met Peary Chand Babu in the Calcutta Public Library to consult with him. Peary Babu gave him some verval instructions as how to form Circles etc. and some books to read and advised him that it is not necessary for any person to go anywhere but we can succeed if we practice here".

এইভাবে শিশিরকুমার সর্বপ্রথম প্রেত-তত্ত্বে আগ্রহী হলেন। প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে মহাত্মা শিশিরকুমার যে উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন তা তুলনাবিহীন। তিনি "The Hindu Spiritual Magazine" নামে যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তা বিশেষ মূল্যবান। তাঁর তিরোভাবের পর শিশিরকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র বিদ্যুৎকান্তি এই পত্রিকা পরিচালনা করেন, পরে অবশ্য পত্রিকাটি বন্ধ হয়।

পরলোকে সুধীরচন্দ্র সরকার

প্রখ্যাত সাহিত্য-সেবী এবং প্রকাশক শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার গত ১০ ফেব্রুয়ারি ৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। অমৃতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আগামী সংখ্যায় তাঁর কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হবে।

মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, তা ছাড়া এই গ্রন্থে ঘোষ পরিবারের পারিবারিক চক্রের ৬৮ বর্ষের বিবরণ ও কলকাতায় অধ্যাত্মচর্চার ৭৩ বৎসরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মৃণালকান্তি শিশিরকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সুলেখক ছিলেন। দি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন ইদানীং দুর্লভ। তবে সেই মাসিক পত্রিকা এমনই মূল্যবান প্রবন্ধ ও তথ্যসমৃদ্ধ যে যদি কোনো উৎসাহী প্রকাশক তার সংকলন প্রকাশ করেন তাহলে লাভবান হবেন।

এই পত্রিকায় স্বয়ং মহাত্মা শিশিরকুমার অধ্যাত্ম বিষয়ে কিভাবে তাঁদের আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন:

> "We were eight brothers and devotedly loved one another. One of our brothers suddenly died and this had a tremendous effect upon the entire family. Was it for this that God implanted love in the human breast? Was it for this that He gave life? The fact was, we were trained under religious principles, and had a strong faith in the existence and goodness of our Creator. Our faith in God received a rude shock when the incident happened.

ঈশ্বরের মহিমায় বিশ্বাসী মহাত্মা শিশিরকুমার ও তাঁর পরিবারবর্গের মনে একটা সংশয় সৃষ্টি হল। ঈশ্বর যেহেতু তিনি ধার্মিকের মধ্যে মানিত, মঙ্গলনিলয় অন্যথা বিষয়ে তিনি বিশ্বাসী, এখন মনে হল তিনি কি নিষ্ঠুর ও নির্দয়?

> "If God gave life and love to man and then destined man for anihilation, if He implanted love in the human breast and destined man to suffer the severe pangs of bereavement, He must be the most cruel being in existence. Surely a man, unless he were a monster, would never snatch a child from the bosom of its mother. This God was doing constantly; was God more cruel than His creation, man? If there was survival and reunion after death it was all right, otherwise what was the use of living it all? Let the entire family put an end to their lives once for all, and put an end to their misery. Thus the entire family felt in the anguish of their soul".

মহাত্মা শিশিরকুমারের উপরিউক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, হীরালালের মৃত্যুতে ঘোষ পরিবার কি গভীর শোকে মগ্ন হয়েছিলেন। তাই প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট উপদেশ সংগ্রহ করে শিশিরকুমার প্রথম থেকে ভ্রাতা বসন্তকুমার, হেমন্তকুমার, মতিলাল এবং জননী ও ভগিনীদের একত্র নিয়ে চক্রে বসলেন। কাতরকণ্ঠে তাঁরা প্রার্থনাসঙ্গীত গান করতে লাগলেন—প্রথম প্রথম তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও চতুর্থ দিনে দুই-তিনটি প্রার্থনা সঙ্গীতের পর হীরালালের আত্মার আবির্ভাব ঘটে। হীরালাল বিভিন্ন মিডিয়াম মারফৎ পরলোক সম্পর্কে জানালেন যে, "পৃথিবী হইতে এই স্থান সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। এখানে এখনও শ্রীভগবানের কিম্বা যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন এরূপ কোন ভাগ্যবান পবিত্র পারলৌকিক মূর্তির দর্শন পাই নাই। এখানে এরূপ অনেকেও আছে যাহারা এই চিন্ময়-জগতে আসিয়াও পূর্বের ন্যায় কদর্য আচরণ করিতেছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।"

চক্রের এই সাফল্যে ঘোষ পরিবারের নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হল এবং প্রত্যহই সেখানে এইভাবে চক্র বসার অনুষ্ঠান পালিত হল। শিশিরকুমারের ভ্রাতা হেমন্তকুমার, ভগ্নী স্নিগ্ধ সৌদামিনী, দাসী কাদম্বিনী প্রভৃতি মাঝে মাঝে মিডিয়াম হতেন।

একটি শতবার্ষিকী
ভেবে দেখ মনে —
এক দিন শতবর্ষ আগে
অমৃত বাজার পত্রিকা
২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ যশোহর
মানহানির প্রথম আক্রমণ - জুন, ১৮৬৮
১৮৭১
স্থান - পরিবর্তন - কলকাতা হিদারাম ব্যানার্জী লেন
১৮৭৪
বাগবাজার
এত বড় আস্পর্দ্ধা ? কোথাকার একটা নেটিভ সাপ্তাহিক, লিখেছে কিনা - শাসনা, প্রজাবিদ্রোহ, আর বিহারে দুর্ভিক্ষ - এ সবি আমাদের অপশাসনের ফল !
১৮৭৩
১৮৭৪
অমৃত বাজার পত্রিকা সাপ্তাহিক
Amrita Bazar Patrika
ENGLISH WEEKLY
THE RULERS WORD NO LAW
ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ১৮৭৮
কী দুঃসাহস, এবার আমাদের 'মণ্ডূক' বলে সম্বোধন করেছে !
AMRITA BAZAR PATRIKA (WEEKLY)
THE GOVT. IS A COWARD.
ইলবার্ট বিল ১৮৮৩
ধেত্তো দাও ভাই ! নেটিভরা ৮০ বছরে সাবালক হয় !
AMRITA BAZAR PATRIKA (WEEKLY)
AGE OF CONSENT BILL
"ARE WE NOT HUMAN BEINGS ?"
১৮৯১
গাছ বড় হয়ে ছায়া দিচ্ছে
Amrita Bazar Patrika DAILY
দৈনিক পত্রিকা ১৮৯১ ১৯ ফেব্রুয়ারী
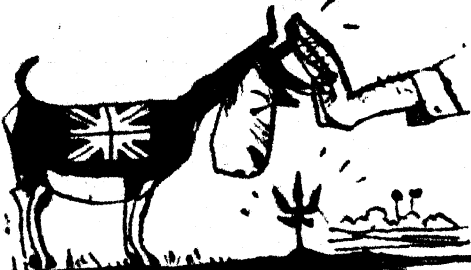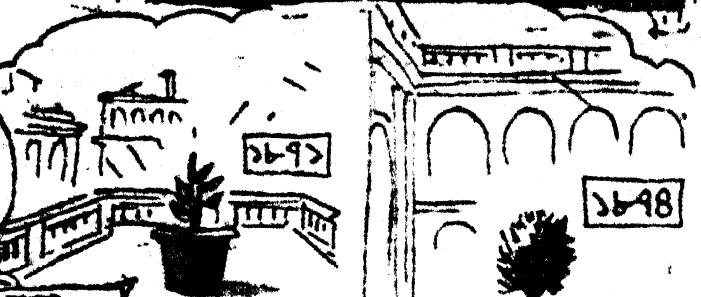
রপ্ত নয়, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পরিশ্রমও আরম্ভ করে দিলেন। মিশন সম্পর্কীয় গ্রন্থখানি প্রকাশের তিন বছর পরেই আমরা পেলুম বাংলা প্রবাদসংগ্রহের একখানি বই। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থখানি যে অপরিসীম মূল্যের অধিকারী তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেদিন শুধু ভাষা নয়, চারিদিকেই আমাদের কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটানোর কাজেও সাহেব হাত দিলেন। তখনো রেললাইন নানা দেশ জুড়ে পাতা হয় নি। দূরকে নিকট করার কোন পথ ছিল না। তাই সাহেব যখন কলকাতা থেকে দিল্লী চললেন, তাঁর অভিজ্ঞতা কলমে লিখে ধরে রাখলেন আমাদের জ্ঞাতার্থে। সাহেব ইস্কুল খুললেন। কিন্তু কি পড়াবেন? সেদিন আমাদের দেশে কোন স্পষ্ট শিক্ষাদর্শ ছিল না। সুতরাং শিক্ষাব্রতীর পক্ষে কি করণীয়? — ইস্কুল চালাতে গিয়ে সাহেব নিজে যা অনুভব করলেন তা নিয়ে একটি বইও লিখে ফেললেন। বইটির নাম, 'হোয়াট মে বি ডান : এ ট্র্যাক্ট ফর পারসন্স এন-গেজড ইন এডুকেশন'। সেদিন ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে জোয়ার এসেছে। কত বই বেরোচ্ছে, কত পত্রিকা সম্পাদিত হচ্ছে। — কে তাদের হিসাব রাখে? আর হিসাব না রাখলে পরবর্তীকাল তাদের কি কোন খবর জানতে পারবে? — যাই হোক, সাহেব এ দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিলেন। সেকালে প্রকাশিত চোদ্দশ বাঙলা বইয়ের বর্ণনা-মূলক একটি তালিকা তিনি পরবর্তীকালের জন্য প্রণয়ন করে গেলেন।

না, বেশি গভীরে না গেলেও চলে। লঙ সাহেব সেদিন নেটিভদের স্বার্থে যা করে গেছেন তা অভাবনীয়। বাঙালীদের ঘরে ঘরে সেদিন তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। আর তিনি যে শেষপর্যন্ত নীল-দুশমনদের সঙ্গেও পাঞ্জা লড়বেন তাতে আর বিস্ময়ের কি?

কিন্তু তাই বলে লঙ সাহেবের যে জরিমানা ও কয়েদ হবে তাও কেউ ভাবে নি। একজন নেটিভ জমিদার জরিমানার টাকা জমার করে কোর্টে ফেলে দিলেন। কিন্তু তাঁর হয়ে ত আর জেল খাটা যায় না। আইনে আটকায়। নইলে তাতেও নেটিভরা পিছপা ছিল না। কিন্তু এখন কি হবে?

আগেই বলেছি সেদিন এ দুশ্চিন্তায় ছটফট করতে লাগল কলকাতা। নেটিভ পাড়ার কারো বাড়িতে আর হাঁড়ি চড়ল না। আবালবৃদ্ধবনিতা অঝোরে কাঁদল। পল্লী-গ্রামের কৃষককুল মাথার চুল ছিঁড়ল আর বুক চাপড়ে হাহুতাশ করতে থাকল। এতদ-সত্ত্বেও সাহেবকে কিন্তু জেলেই নিয়ে যাওয়া হল।

পরের দিন সকালবেলার জেলরক্ষকের যখন ঘুম ভাঙল, তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন জেলখানার দরজায় সাংঘাতিক ভিড়। চাপ-রাসীকে ডেকে সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কি ব্যাপার, এত ভিড় কিসের?'

চাপরাসী এসে সেলাম দিয়ে বলল : 'হুজুর, ওনারা সব লঙ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

সাহেব ভাল করে একবার ভিড়ের দিকে চোখ তুলে দেখলেন। শুধু নেটিভ নয়, অনেক সাহেবও সেখানে দাঁড়িয়ে। ওপরে তিন তলার একটি কক্ষে লঙ সাহেবকে রাখা হয়েছিল। মিসেস লঙকেও থাকার জন্য দেওয়া হয়েছিল বিশেষ অনুমতি। এবার দর্শনার্থীদের এক এক করে বিশেষ অনুমতি দিলেন জেলার সাহেব।

এইভাবে অনুমতি দিতে দিতে একটি বিশেষ ছেলের দিকে নজর পড়ল সাহেবের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'তুমি কি চাও খোকা, তুমিও কি লঙ সাহেবের দর্শনার্থী?'

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে জানাল, হাঁ।

কেন কে জানে জেলার সাহেব ছেলেটিকে হটিয়ে দিলেন। বললেন, না বাপু, ওসব ছেলেমানুষী চলবে না। ভাগো হটো।

কিন্তু ছেলেটি সহজে হটবার পাত্র নয়। সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ঘাড় নীচু করে। মনে হল মুখ তুললেই টস টস করে গড়িয়ে পড়বে চোখের জল।

ছেলেটির আগ্রহ ও আবেগের কথা বিবেচনা করে শেষপর্যন্ত জেলার সাহেবের দয়া হল। তিনি অনুমতি দিলেন। এইবার ছেলেটির চোখ দিয়ে লঙ সাহেবকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

সেই বিশেষ দর্শনার্থীকে তিনতলার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। [illegible]

হিন্দুমেলার উপহার

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'। ১৮৭৫ খৃঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী (১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সাল) অমৃতবাজার পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পূর্ণ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হোল ঃ

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্ব্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরূহ নড়েনাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিল ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিল ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উর্ব্বরা ক্ষেত্রের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসিখুসি আর লাগে না ভাল।

৯

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুনে,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে।

১৫

আবার সেদিন (ও) দেখিয়াছি আমি
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি,
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা।

১৭

শুনেছি আবার শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সেদিন আসিবে ফিরে।

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখন দিবে রে জ্যোতি।

১৯

হা! যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতি পটে
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

আমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক্ আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্ট্যাচুর মতই অচঞ্চল দেহে দাঁড়িয়ে রইল কাঞ্চনকুমার এবং বজ্রপাতের আওয়াজটা শোনা গেল তখনি।

যেন হাজার হাজার দামামা বেজে উঠল আকাশের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত... গুড়ুম গুড়ুম শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসতেই নড়ে উঠল কাঞ্চনকুমারের ক্লাসাইট ঘড়ি।

বলল প্রশান্ত কণ্ঠে, "প্রায় এক মিনিট।"

"তার মানে?" প্রশ্ন করল দিবস নামধারী হাওয়াই শার্ট পরা যুবক।

"বিদ্যুত চমকানোর প্রায় এক মিনিট পরেই শোনা গেল শব্দটা। ঝড়ের খুব জোর নেই। বৃষ্টি এলে এ গাছটাই ছাতার কাজ করবে।"

দলের একমাত্র মহিলা সত্যবতী কাতরকণ্ঠে বললেন,—"তার আগেই কোথাও মাথা গুঁজতে পারলে ভাল হত না?"

দিবস বললে, "দূরের ঐ কেল্লাটায় গেলেই তো হয়।"

সত্যবতীর জাঁদরেল স্বামী কর্নেল মণিলাল এতক্ষণ চুপচাপ বসে পাইপ টানছিলেন। ভদ্রলোক রিটায়ার্ড কর্নেল। কিন্তু বস্ত পাকানো গোঁফের মধ্যে বিগত সামরিক আভিজাত্য এখনও খানিকটা ধরে রেখে দিয়েছেন।

দিবসের প্রস্তাব শুনে পাইপ সরিয়ে বললেন তিনি, "যেতে পারো, কিন্তু পরে পস্তাবে।"

"কেন?"

"কারণ, ও কেল্লার নাম বিশালগড়। কিন্তু আমরা বলি বিষাদগড়।

"বিষাদগড়! তার মানে, বিষাদের আড্ডা!"

"এগজ্যাক্টলি! ও বিষাদপুরীর কাহিনী যদি শোনো তো তুমিও বিষণ্ণ হয়ে যাবে।"

গল্প শুনতে দিবস ভালবাসে। তাই চেপে ধরল কর্নেল মণিলালকে। শুরু হল বিশালগড়ের বিষাদ কাহিনী। দিনান্তের শীতবায়ুতে বনস্পতির অরণ্যানীর পত্রমর্মরের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল কর্নেলের কণ্ঠস্বর। হু-হু করে পেরিয়ে গেল পঁচিশটা বছর।

পঁচিশ বছর আগের কাহিনী!

•

মেয়েটির নাম রাত্রি।

রাত্রির মতই নিবিড় শ্যামল তার রূপ। সে রূপে উগ্রতা ছিল না, ছিল স্নিগ্ধতা।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মতই রাত্রিকে গড়েছিলেন বিধাতা। মেঘের মত একরাশ চুল এলিয়ে যখন সে বসে থাকত পারস্য-গালিচা-পাতা ঘরের এককোণে, বেলোয়ারী কাচের ঝাড়লণ্ঠন জোছনাই পরম সোহাগে জড়িয়ে থাকত তার জাফরান রংয়ের অর্কিডপল্লব কাঁচুলি, জরির-চটি-পরা ক্ষুদ্র সুন্দর দুখানি চরণ গোলাপি মখমল আসনে স্থাপিত থাকত অলসভাবে, তখন মনে হত আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর একটি রজনী যেন উপন্যাসলোক থেকে উড়ে এসেছে। মনে হত দীপ্তিময়ী গোলাপের নির্বাপিত দীপ একটি রাত্রি। কল্পনার চোখে দেখা যেত প্রজ্বলিত স্ফটিকপাত্রে আপেল নাসপাতি নারাঙ্গি আঙুর; ঝিকমিকে কাচপাত্রে স্বর্ণাভ মদিরা; মনে হত, এই মুহূর্তে রাত্রি যদি গ্রীবা বেঁকিয়ে, ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় হাসি আর কটাক্ষ স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে মৃদু-ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহটিকে দ্রুতবেগে ঘুরিয়ে বাসনা আর বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে, যাঁর সয়েম্পীর কান্না, নূপুরের আর্তনাদ আর সিরাজের সুবর্ণমদিরার মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা আর কটাক্ষের আঘাত হানে— তখন বুঝি আমাদের নিশিকান্তের তরুণী-ইরানীর মতই সে মোহিনী হয়ে উঠতে পারে। পারে সর্পিনীর মত বাহুবেষ্টনে সর্বাঙ্গ বেঁধে ফেলতে। সুগন্ধ নিঃশ্বাস আর সুকোমল ওষ্ঠের স্পর্শে তনুমন অসাড় করতে।

রাত্রির স্নিগ্ধশ্যামল রূপের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। অতিবড় পুরুষসিংহও পতঙ্গের মত ছুটে আসত তার কাছে—যেন আগুনের আকর্ষণে। অথচ কাছে এলেই পেত শান্তি, নিবিড় শান্তি। যেমনটি পেয়েছিল বিশালগড়ের নবাবজাদা ইস্পাহানী।

ইস্পাহানী দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ। খানদানী চেহারা। তরবারির মত ধারালো মজবুত স্বাস্থ্য। উদার মন। দিলদরিয়া মেজাজ।

বন্ধুবান্ধবরা বলত, ইস্পাহানী পূর্বপুরুষদের সব কটি নবাবী গুণই পেয়েছে, পায়নি কেবল একটি।

পর্বতপ্রমাণ যৌবনচক্রের বিনিময়ে বিশ্বসুন্দরীদের সংগ্রহ করে হারেম সাজানোর আর্ট ইস্পাহানী জানত না।

তার কারণও ছিল।

বাল্যকাল থেকেই যে বালিকার অন্তরের সঙ্গে গাঁটছড়াবন্ধনে নিজেকে বেঁধেছিল ইস্পাহানী, নাম তার রাত্রি।

ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ের ছেলেমানুষি আড়ি ও ভাব, খেলা ও ঝগড়া অনেকের কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল। ক্রমে ক্রমে মধুর এই সম্পর্কটুকু মধুরতর মধুতম হয়ে উঠেছে। যৌবনসমীরণের ধর্মই তাই। দুজনে দুজনকে মেনে নিয়েছে জীবন-মরণের সঙ্গী হিসেবে।

সন্ধ্যার সময়ে আঁধারের সূত্রপাত দেখলেই পাখি যেমন নীড়ে ফিরে আসে, পুরুষসিংহ ইস্পাহানীও তেমনি বহু প্রলয়সংকটে ছুটে আসত রাত্রির কাছে। ওষুধ পড়ত কতকগুলোর। কারণ, রাত্রি যেন অমাবস্যার রাত্রি। তার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে জোনাকীরা চাঁদের সম্পূর্ণ আলোকই স্তরে স্তরে সঞ্চিত থাকত— সামান্য রশ্মিবর্ষণে স্নিগ্ধ হয়ে উঠত ইস্পাহানীর কাতর হৃদয়।

এমনি মেয়ে ছিল রাত্রি। আর এমনি পুরুষ ছিল ইস্পাহানী।

কিন্তু ভালবাসা যাদের সুগভীর, তাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশি। তা নাহলে ধূমকেতুর মত কোনই বা মেহের আলির আবির্ভাবে ইস্পাহানী-রাত্রির হাসি আর গান মিলিয়ে যাবে, কেনই বা সুখের দিন অর্ন্তহিত হবে, কেনই বা দুরন্ত দেবদেবীরা চিরকালের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে কোনদিন দুটি অন্তরে?

মেহের আলি নবাবজাদা ইস্পাহানীর দূরসম্পর্কের ভাই। চপল, চঞ্চল, দুরন্ত। ইস্পাহানী তাকে ভালবাসত আপন ভাইয়ের মত। একই প্রাসাদে কেটেছে দুজনের শৈশব, কৈশোর। যৌবনের সিংহতোরণও পেরিয়েছে দুজনে একসঙ্গে।

কিন্তু দুই ভাইয়ে এক জায়গায় মিল ছিল না। ইস্পাহানীর মন ছিল আকাশের মত উদার, দিবালোকের মত অকপট। আর, মেহের আলি ছিল ঠিক তার বিপরীত। কপটতা ছিল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনের ভাব মুখে প্রকাশ করত না। বুঝি সেই কারণেই ইস্পাহানী যখন পিস্তল-বন্দুক চালনায় লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠল, মেহের আলি তখন মন দিল অভিনয় শিক্ষার দিকে।

রাত্রি ছিল দুজনেরই খেলার সঙ্গী।

মানুষের জীবনে দুর্যোগ যখন আসে, তখন অকস্মাৎই আসে। আচম্বিতে অকালে পৃথিবীর মায়া কাটাল মেহের আলি।

রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল দুই ভাই। সেইখানেই একটি পাণ্ডুরোগে দেহনিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেহের আলি। প্রচণ্ড আঘাতে দিশেহারা হয়ে গেল ইস্পাহানী। বংশের ঐতিহ্য অনুসারে মেহের আলিকে গোর দেওয়ার কথাও তার মাথায় এল না। কোনরকমে ভাইকে কবরস্থ করে উধাও হয়ে গেল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। পাগলের মত ঘুরতে লাগল দেশদেশান্তরে।

রাত্রির সঙ্গে তার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল মেহের আলির মৃত্যুর আগে। কিন্তু এখন বিয়ে ভেঙে গেল। প্রেয়সীর চেয়ে ভাই যে অনেক বড়, পঁচিশ বছরের বৃহৎ বিরহের মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করে চলেছে ইস্পাহানী।

অনেক দিগ্‌দিগন্তর ঘুরে রাত্রিকে ভেঙে ইস্পাহানী দীর্ঘ পঁচিশ বছর এমনি করে পালিয়ে বেড়িয়েছে। পাছে স্মৃতির আক্রমণ ঘটে, সহ্য করতে না পারে, তাই মেহের আলির সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠতা, তাদের সকলের সংস্রব ত্যাগ করেছে, মেহের আলির যাবতীয় চিহ্ন বিশালগড় থেকে মুছে ফেলেছে, নিজে নির্বাণ খুঁজেছে ঈশ্বরের উপাসনায়। দিবারাত্র কালো আচ্ছাদনে মুখ ঢেকে থাকে ইস্পাহানী; বিশালগড়ের বাইরে এক পা-ও বেরোয় না। গত পঁচিশ বছর কেউ তার মুখ দেখেনি—সে-ও কারও মুখের দিকে তাকায়নি। পঁচিশ বছরের বিষাদ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে বিশালগড়ের প্রতিটি ঘরে। তাই ও কেল্লার আর এক নাম বিষাদগড়।

•

শেষ হল কাহিনী।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। শুধু বনস্পতির অরণ্যানীর পত্রমর্মরের হাহাকার। যেন অরণ্যের-দীর্ঘশ্বাস।

তারপর দিবস বললে,—"তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে, মেহের আলির বিয়োগব্যথাই যে বিশালগড়কে বেদনার [illegible] করেছিল, রাত্রিকে ছেড়ে আর ঘুঁচিয়ে [illegible] ইস্পাহানী সেই বিশালগড় ত্যাগ করে পালাতে চেয়েছিল।"

"আপনারা আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসছেন বলে।"

"বেশ গুছিয়ে কথা বলেন দেখছি। কিন্তু কিছুই আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না।"

"অর্থাৎ আপনি আসল ঘটনাটা বলবেন না?"

"আসল ঘটনা মানে?"

"ভাইয়ের মৃত্যুতে ইস্পাহানীর বুক ভেঙে গেছে বলেই যে পঁচিশ বছর পরে সে বিবশ হয়েছে—আপনার এই গল্পের মূলে যে ঘটনা আছে সেইটা।"

"আর কোনো ঘটনা নেই।"

ভাঙা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিট করে তাকিয়ে বলল কাদার ঘনশ্যাম, "তাহলে আপনি আমাকেই বলতে বাধ্য করলেন। নবাবজাদা ইস্পাহানী যে কেবল ভাইয়ের মৃত্যুতেই শোকাচ্ছন্ন এ ধাপ্পা আমি বিশ্বাস করি না। তাই পাঁচটা প্রশ্ন করছি।

"প্রথম প্রশ্ন রাত্রির সঙ্গে ইস্পাহানীর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছিল। অথচ ভাইয়ের মৃত্যুর পর সে বিয়ে ভেঙে গেল কেন? নিকটআত্মীয়ের মৃত্যুতে বিয়ে ভেঙে দিতে কখনো শুনেছেন? বরং বিচ্ছেদব্যথা ভোলবার জন্যেই মানুষ এ ক্ষেত্রে বিয়ে করে বসে। নবাবজাদা ইস্পাহানীর মত সম্ভ্রান্ত পুরুষ কিন্তু ঠিক তার বিপরীত কাণ্ড করলেন। বিনা দোষে বাগদত্তাকে ত্যাগ করলেন। কেন?"

পাইপ নামিয়ে গোঁফের প্রান্ত কামড়ে ধরলেন কর্ণেল মণিলাল।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন" ড্রয়ার থেকে কয়েকটা পিন তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল ঘনশ্যাম: "ইস্পাহানী হামেশাই চিঠি লিখত, অবিকল রাত্রির মত একটা বউ মেহের আলির জন্যে এনে দিতে। কেন?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কর্ণেল মণিলাল।

তৃতীয় প্রশ্ন, ইস্পাহানীর শোকের ধরনটা বড়ই অদ্ভুত। মেহের আলির সব চিহ্ন সব স্মৃতি বিলাসগড় থেকে মুছে ফেলার কোনো দরকার ছিল কি? অবশ্য শোকের প্রচণ্ড ধাক্কায় কখনো-সখনো এ রকম দেখা যায় বটে কিন্তু একটানা পঁচিশ বছর ধরে এই বিলাপ-নাটক চলে, তখন বুঝতে হবে এর অন্য মানে আছে।"

তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন কর্ণেল, "থামুন।"

"চতুর্থ প্রশ্ন", অবিচলিত কণ্ঠে বলল কাদার ঘনশ্যাম। "অশ্ব চালনায় অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও মেহের আলিকে বংশের নিয়মমত গোর দেওয়া হয়নি কেন? খুব তাড়াহুড়ো করে গোপনে অবজ্ঞা করা হয়েছিল তাকে। পঞ্চম এবং শেষ প্রশ্ন—ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেশে উধাও হয়ে গেলেন কেন ইস্পাহানী? আসলে, পালিয়ে গেল, তাই নয় কী?"

"থামুন!" গর্জে উঠল কর্ণেল মণিলাল: "আমি বলছি সব বলছি। তবে সবার আগে শুনে রাখুন, এ লড়াইয়ে অন্যায় কিছু ঘটে নি।"

"বটে!" বলে পাঁজর-খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ঘনশ্যাম পাদরী।

"তুয়েল লড়েছিল দুভাই। উপলক্ষ্য, রাত্রি। ইস্পাহানী বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলতেই খেপে গেল মেহের আলি। রাত্রিকে সে দীর্ঘদিন ধরে মনে মনে ভালবেসেছিল। দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে। সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনও ভাসছে। বালিয়াড়ির এদিকে দাঁড়িয়ে ইস্পাহানী—সঙ্গী হিসেবে আমিও। ওদিকে মেহের আলি—আর তার সঙ্গী কাঞ্চনকুমার। কাঞ্চনের তখন সবে মাত্র হচ্ছে। মেহের তার কাছেই অভিনয় শিখত। কিন্তু যা শুরু করেছিলাম তাই হল। ইস্পাহানীর নিশানা কখনো ব্যর্থ হত না। সেদিক দিয়ে মেহের ছিল নেহাতই আনাড়ি। গুলি চলল। দড়াম করে আছাড়ে পড়ল মেহের। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ফিরে এল ইস্পাহানীর।

চেঁচিয়ে উঠল এ কি করলাম! বলেই বিভলবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়োলো ভাইয়ের দিকে। ছুটতে ছুটতে আমাকে বলল গাঁ থেকে ডাক্তার নিয়ে আসতে। আমিও দৌড়োলাম গাঁয়ের দিকে। বালিয়াড়ির আড়ালে যাওয়ার আগে শেষবারের মত দেখলাম তীরবেগে দৌড়োচ্ছে ইস্পাহানী। বালির ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে মেহের আলি। পাশেই গোধূলির রাঙা দিগন্তের পটভূমিকায় স্থিরদেহে দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকুমার। হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে গাঁয়ের ডাক্তারকে খবর দিতেই ভদ্রলোক টপ করে নিজের ঘোড়ায় উঠেই ধাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার দৌড়ে এসে যখন পৌঁছোলাম, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মেহের আলিকে কবর দিয়ে ফিরে আসছেন ডাক্তার আর কাঞ্চনকুমার। ইস্পাহানী নেই। নিজের হাতে ভাইকে খুন করে সেই যে উধাও হয়ে গেল ইস্পাহানী ফিরল অনেক বছর পরে। কিন্তু ও মুখ আর কাউকে দেখালো না।"

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল কাদার ঘনশ্যাম। মনের চোখে ভাসছিল একটি রক্তসন্ধ্যার দৃশ্য। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে বেগে দৌড়োচ্ছে ইস্পাহানী আর লুটিয়ে মেহের আলির পাশে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে কাঞ্চনকুমার।

"আশ্চর্য!" নিজের মনেই বলল ঘনশ্যাম।

"কি আশ্চর্য?"

"সঙ্গী যখন গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল, তখনও কাঞ্চনকুমার দাঁড়িয়ে রইল কেন?

"অথচ কাঞ্চনেরই তখন উচিত ছিল ডাক্তারের কাছে দৌড়ে যাওয়া।"

"কিন্তু গেল না। কেন গেল না? চটপট কিছু করা বোধহয় কাঞ্চনকুমারের ধাতে নেই?"

"বিলক্ষণ আছে। তবে মাঝে মাঝে দিবাস্বপ্নী ওরা এমন পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে...থাকে বলাই, কাল রাতেই তো ঐভাবে দাঁড়িয়েছিল কাঞ্চন। বিদ্যুৎ চমকালো, আমরা চমকালাম, কিন্তু চোখের পাতাও ফেলল না কাঞ্চনকুমার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বাজপড়ার আওয়াজ শোনার জন্যে। তুয়েলের দিনও ওকে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কাল সন্ধ্যাতেও বাজের আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল সঠিক সময়টা—কী হলো?"

লজ্জিতমুখে উঠে দাঁড়াল কাদার ঘনশ্যাম,—"পিনটা আঙুলে ফুটে গেল। আচ্ছা চলি। নমস্কার।"

"আজ বিকেলেই কিন্তু তলাপাত্র নিয়ে যাচ্ছেন বিলাসগড়ে।"

"তাই নাকি?" বলে ভাঙা ছাতা নিয়ে এগোলো ঘনশ্যাম। দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল।

ফিসফিস করে বললে, "কর্ণেল, রাত্রিকে নিয়ে যাবেন না, সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

•

বিলাসগড়।...

দেউড়ীর সামনে সবাই হাজির। ফিলম, তলাপাত্র কর্ণেল সত্যব্রতী এবং রাত্রি।

চিরকুমারী রাত্রি। ব্যাকুলা বিরহিণী রাত্রি। বিষাদ-প্রতিমা রাত্রি।

দলে নেই একটি অতি-পরিচিত মূর্তি। নেই অভিনেতা কাঞ্চনকুমার। অকস্মাৎ জরুরী কাজে তাকে দূরে যেতে হয়েছে—অনেক দূরে।

প্রকাণ্ড চত্বর পেরিয়ে চওড়া মর্মর সোপানের নিচে এসে দাঁড়াল ছোট্ট দলটি। সবার আগে সমুদ্রের ফেনার মত কোমল শুভ্র বেশবাসে রাত্রি।

সিঁড়ির নিচ থেকে হাঁক দিলেন কর্ণেল—"ইস্পাহানী আমরা এসেছি।"

চারটি মিনারে প্রতিধ্বনি হয়ে তাক মিলিয়ে গেল দূরে কোথাও। উত্তর এল না। তার বদলে ওপরের চাতালে এসে দাঁড়াল এক বেতপ মূর্তি। পরনে ধূসর কালো আলখাল্লা।

"কাদার ঘনশ্যাম!" অস্ফুটকণ্ঠে বলল দিলম।

"আপনি কেন এসেছেন?" তীব্র রুক্ষকণ্ঠে কর্ণেলের।

"আমার কর্তব্য করতে," গম্ভীর মুখে জবাব দিল কাদার ঘনশ্যাম।

"যথেষ্ট হয়েছে। আর কোন কর্তব্য না করাই ভাল।" বিদ্রুপতীক্ষ্ণ কণ্ঠ তলাপাত্রের।

"আজ্ঞে না। একটি, এখনও বাকী আছে। আমি এসেছি ওঁকে ওঁর কল্পনার খাঁচা থেকে মুক্তি দিতে আর রাত্রি দেবীকে তাঁর জীবনজোড়া প্রতীক্ষা থেকে রেহাই দিতে।"

ঠিক এই সময়ে কাদার ঘনশ্যামের পেছনে এসে দাঁড়াল আর একটি দীর্ঘাকার পুরুষ। মাথায় তার বুকলশ্যুর আলখাল্লা।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে উঠল সিঁড়ির নিচে।

"ইস্পাহানী। ইস্পাহানী।"

রাত্রিকে ঠেকানো গেল না। সত্যব্রতী। এক-এক পা করে সিঁড়ির ওপর উঠতে লাগল রাত্রি। হাওয়ায় উড়তে লাগল তার সাদা শাড়ির আঁচল, দুকে দুলতে লাগল। আবেগ-বিহ্বল দুই চোখে ফুটে উঠল মিনতির আকুতি।

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐ দূরের দুটি পাহাড়,—মর্ন-লা-প্লা মর্ন-কনস্টা। ঐ পাহাড় দুটির গা বেয়ে বয়ে যায় ক্যারিবিয়ানের প্রসিদ্ধ বাতাস। ঝির ঝির বাতাসের বুকে গাল পেতে ঘুমিয়ে আছে ছোট-ছোট দুটি গাঁ। ট্রয় ইলে, লা পাজেরী। অনেক দূরে আছে আরও পাহাড়; আরও শ্যামল বন। গাড়ী রেখে উঠছি। পাহাড়ের ঢের তলায় নীল সমুদ্র ফেনা তুলে ধাক্কা দিচ্ছে পাথর ছড়ানো তীরে। দূরের গিরিচূড়ায় শ্যামল বনানীর ভেলভেটের ওপর রাখা পুণ্যাত্মা যীশুর নামে গড়া ধবধবে শাদা এক গির্জা,—মার্তিনিকের মঁমার্ত্র। বাতাস দিচ্ছে। এ বাতাসের নাম বণিক ইংরেজ দিয়েছে ট্রেড উইন্ড, বাণিজ্য বাতাস; রসিক ফরাসী দিয়েছে আরাম-বিধুর বাতাস!

পা ছড়িয়ে বসেছি একটা বুনো গাছের তলায়। চেস্টনাটের মতো বিশাল ঝুঁকে পড়া পাতা-ঘন গাছ। ক্যাথি কোনো রকমে গড়িয়ে পড়লো ঘাসের বুকে। ভিভি তাড়াতাড়ি একটা হ্যামক টাঙিয়ে দিলো। খাবারের সরঞ্জামে ব্যস্ত হোলো।

আমি তখন মনে মনে দেখছি জসেফিনকে: নেপোলিয়নের ভাগ্যাকাশের শুকতারা জোসেফিন। ট্রয়-ইলের মেয়ে নয়, পাশের গাঁ লা-পাজেরীর মেয়ে। তারই নামে এই স্যাভানা। পার্কের মধ্যে রেলিং-ঘেরা জোসেফিনের মর্মর মূর্তি। ও মূর্তি আমি দেখতে পাবো; ও মূর্তির খবর নেবো; ও মূর্তি সব মূর্তির মতো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনের উপত্যকা বেয়ে দৌড়ে নেমে আসছে চপল মেয়ে জোসেফিন; খালি পায়ে ফ্রকপরা টান খাওয়া জোসেফিন। এই মাটিতেই সে খেলা করতো, তার বোন এমীর সঙ্গে। এমীর কথাও বলবো।

ফরাসীরা সাজিয়েছে শুধু জোসেফিনের গাঁ। কিন্তু ইতিহাস তো লজ্জায় ঢাকা পড়ে না। আমার মনে পড়ে একা জোসেফিন নয়; মাদাম মন্তেস্পান; মাদাম মন্তেনোন; এমী-দ্যু-বুক-দা-রিভেরী। এক মার্তিনিক ইয়োরোপের ইতিহাসের পাতায় চার-চারজন বরণীয়া নারীকে পাঠিয়েছে। এবং তার মধ্যে দু'জন এই গাঁয়ের মেয়ে। একজন সম্রাট নেপোলিয়নের ঘরনী; অপরটি তুর্কীর সম্রাট তৃতীয় সেলিমের হারেমের বাঁদী এবং তুর্ক সম্রাট দ্বিতীয় মেহমুদের জননী।

"কী হোলো!" হাঁক পাড়ে ক্যাথি।

"জসেফিন ভর করেছে! মার্তিনিকে আসবে, মদ ছোঁবে না, ভিভি-কে আদর করবে না,—পেত্নী ভর করবে না তো কী হবে। যে দেশের যে দেবতা; পেন্নামী না দিলে চলে কখনও?"

ওরা নানা দ্রব্য গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। শুওরের মাংস ভাজা। স্যাটাইনের বিচি গুঁড়িয়ে মশলা দিয়ে। বড়ো বড়ো চিংড়ি, ফ্রাই করা এক গাদা; সঙ্গে রুটিও, আর মদও। ভিভির গ্লাস ভরতি। আমি বলি, "কী ওটা? শ্যাম্পেন, না মার্তিনিকান 'পেরনে'?"

ভিভি ঢোকটা গিলে বলে,—"এও না, ও-ও তাই। ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো কেন? এখানকার নদীর জলও তো তোমার চলবে না।

ভিভির চোখ যেন জ্বলজ্বল করে। ওর স্বাভাবিক অবস্থাটাই সদাতুর। মদ খেলে শুধু কথাগুলো খুলে যেতো; বেশী, একটু বেশী হাসতো, আর অকারণ রোমান্টিক হয়ে পড়তো।

আমি বলি "নদী জলের অপরাধ?"

"ওমা! তা জানো না। কিবকিবে ঐ যে দুটি নদী দেখছো, একটির নাম মাদাম, অন্যটির নাম মঁসিয়ে।"

হেসে বলি, "মঁসিয়ে থেকে জল আনা যাবে?"

ক্যাথী হাসে।

ভিভি বলে, "তোমারও দোষ। আমি ক্যাথী ছাড়া জানিনে; তুমিও মঁসিয়ে পেলে মাদাম চাও না!"

ভিভি মার্তিনিকান মেয়ে। ফরাসী শাসনব্যবস্থার ফলে বিভিন্ন মিশ্রজাতিতে পরিপুষ্ট। —ফরাসীরা ইংরেজদের মতো কথায় কোথায় জীবনের দীপ্তি ঢেকে রাখে না।

"আমারই মতো ভালোবাসতো জোসে-ফিন তার পিসতুতো বোন এমীকে। আমি যেমন ক্যাথীকে ভালোবাসি। আমারই মতো, ওরাও একসঙ্গে খেলেছে। ছোটোবেলার মেয়ে। কতো সাধ, কতো আহ্লাদ। তখনকার দিনে, ওদেরও পাবে কিছু; কিছু, তবে সেইটিতেই বেশী,—এখানে বন,—এই সব পাহাড়ের আনাচে-কানাচে থাকতো সাধু, সন্ন্যাসী..."

"মার্তিনিকে সাধু সন্ন্যাসী?" আমি হেসে উঠি।

"হ্যাঁগো! মস্ত সিদ্ধাই! ত্রিকালজ্ঞ। ম্যাকবেথও তো সেই সব সাধু-সাধ্বীর কাছে গিয়েছিলো।"

"ডাইনী?"

"মূর্খেরা তাই বলে; পরশ পেলে। জ্ঞানীরা বলে সিদ্ধ-যোগিনী। তেমনি সব বুড়ী থুড়থুড়ি যোগিনীরা থাকতো ঐ সব পাহাড়ে।......সবার সেরা ছিলো রোবাই মা। আরাওয়াকে জাতের শত-শত বছরের ভারে নুয়ে পড়া বুড়ী। থাকতো মাকড়সার জালে ঢাকা, বাদুড়ের পাখার বাতাসে শীতল একটা গুহায়। ত্রিকাল বলে দিতে পারতো।

"কিশোরী সেই দুটি মেয়ে ফ্রান্সে যাচ্ছে পড়াশুনো করবে।...কার ভাগ্যে কী আছে ওরা পরামর্শ করলো যাবে বুড়ী রোবাইমার গুহায় যতো ভয়ই করুক যাবে।"

আমি বলি, "মেয়েদের মাথায় সন্দেহ আর ঔৎসুক্য একবার ঢুকলে, জানতেই হবে!"

ভিভি হেসে বলে, "তাই জানতে চায়। খালি পায়ে চুপি চুপি ওরা গিয়েছিলো রোবাইমার কাছে। প্রথম প্রশ্ন করলো জোসেফিন। আমার ভবিষ্যৎ বলে দাও। আগুনে জ্বেলে তার মধ্যে নানা জড়ি-বুটি ফেলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী রচনা করে বুড়ী তাকে বলেছিলো তোর বিয়ে যেতে যেতেই সারা হবে। সে বিয়ে কিছু নয়। তোর বাচ্চারা সব রাজা-রানী হবে। তাও কিছু নয়। তোর মাথায় চড়বে সম্রাজ্ঞীর তাজ। পরাবে আরেকজন; তাকে তুই ভালোবেসে মরবি। ভালো যে বাসে সেই মরে, তুইও মরবি। ঘোর ঘোর রং, বেশী কালো বাঁদিরা! কিছু নয় সে। কিন্তু তোর চোখে চোখ পড়লে সে আর থাকতে পারবে না। তারপর তোর ভাগ্যেই সে চড়-চড় করে উঠবে। রাজ-চক্রবর্তী হবে। কিন্তু তুমি তার ভয়ে থরো থরো কাঁপবে। তোকে সে সম্রাজ্ঞী মাথায় বসাবে।......আর সেইদিন থেকেই তুই নামবি আর নামবি। সে তোর কাছে যা চাইবে তাকে তুই তা দিতে পারবি না। তোর বুক থেকে নেমে সে অন্য বুকে যাবে। নেমে যাবে, নেমে যাবে। অনেক দূরে, অনেক নীচে। তখন তুই থাকবি একা। আর সারা জাতি তোর নামে জপমালা জপবে। তুই আর তুই থাকবি না; তুই তখন তার মধ্যে থাকবি। সে থাকবে তোর অনেক বাইরে, অনেক অনেক বাইরে।"

"কিন্তু সত্যি এ কথা?" আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি। ভিভি বলে, "তুমি সত্যি, না আমি সত্যি? ইতিহাস যা বলে তাই বলছি। তাওতো এমীর কথা শোনোনি। ওরা এক জাহাজেই ফ্রান্সে গিয়েছিলো। এমী ছিলো বড়ো ঘরের, বড়ো ব্যবসাদারের মেয়ে।"

আমি বলি, "আমি শুনতে চাই!"

"জগন কাহিনী লিখবে বন্ধু তো? এমীর ইতিহাস জেনে রাখো।"

"তা জানি। আমি না এই রোমাঞ্চকর কাহিনী। এই বলো, শুনবো। এমীর কী ঘটেছিলো কাহিনী?"

বাংলার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস প্রতিনিধি দল : শ্রীশঙ্কর সেন, ই শোর, মিঃ এ বি গণি চৌধুরী ও মিঃ কাসেম আলী মীর্জার সঙ্গে শ্রীআশুতোষ ঘোষকে (সর্ব ডানদিকে) দেখা যাচ্ছে।

শ্রীআশু ঘোষের পশ্চিমবাংলা

শ্রীআশুতোষ ঘোষ যখন দিল্লীতে যাচ্ছিলেন, তখন দমদম বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর কোটের বাটনহোলে ছিল একটি রক্তগোলাপ। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বললেন, "রাজনীতির চুক্তি হচ্ছে সুন্দরী নারী আর গোলাপ ফুলের মত—যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই ভাল।" আশুবাবুর বুকে-আঁটা রক্তগোলাপ দিল্লীতে পৌঁছবার আগেই ঝরে গিয়েছিল কিনা জানি না; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির চুক্তিগুলি যে ভেঙে যাচ্ছিল গত সপ্তাহে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক জীবনও একটা অনিশ্চিত অবস্থার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অথচ, এমনি করে এত তাড়াতাড়ি যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালিশন সরকারের সামনে সংকট এসে যাবে সেটা আগে থেকে অনুমান করা যায়নি। ১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। গত অধিবেশনের মত এই অধিবেশনও যাতে স্পীকারের বাধা দানের ফলে বানচাল হয়ে না যায় এবং এই অধিবেশনে ভোট নিয়ে যাতে দেখান যায় যে, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সরকারের পক্ষে অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন আছে তার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, সেদিকেই কংগ্রেস ও পি ডি এফ মহলের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা চলছিল।

এরই মধ্যে আশু ঘোষ সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ হয়ে গেলেন।

২ ফেব্রুয়ারী তারিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী কার্যনির্বাহক সমিতিদ্বয়ের এক যুক্ত বৈঠক হল। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হল, "কংগ্রেসের ভিতর অনৈক্যের সব সংবাদ ভিত্তিহীন। কংগ্রেসের সাংগঠনিক ও পরিষদীয়, এই উভয় শাখাই সকল অবস্থায় দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ।" এই অধিবেশনের পর শ্রীঅতুল্য ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, আশু ঘোষ যেসব চাল দিচ্ছেন বলে সংবাদ আছে, সেগুলিতে কোয়ালিশন সরকারের পক্ষে ভয়ের কোন কারণ নেই এবং সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা "সপ্তাহে সপ্তাহে না হলেও মাসে মাসে" বাড়তে থাকবে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে বললেন, "যুক্তফ্রন্টের নয়মাসব্যাপী অপটু শাসন জনসাধারণের উপর যেসব অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংকট চাপিয়ে দিয়েছে, সেই সংকটগুলির মোকাবেলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ও একজোট হয়ে কাজ করছেন।"

পশ্চিমবঙ্গের কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিকের দুই নেতার এই বক্তব্যে [illegible] "২৪ ঘণ্টার মধ্যেই" কিন্তু দেখা গেল,

এবছর শীতকালেও গুলমার্গে (কাশ্মীর) যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে দিল্লীতে অধিবেশনরত বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্যও গুলমার্গ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবিতে বরফের ওপর স্কী-ক্রীড়ারত পর্যটকদের দেখা যাচ্ছে।

শিল্পোন্নত দেশগুলোকে একদিকে যেমন উন্নতিশীল দেশের রপ্তানী আয়ের আকস্মিক ঘাটতি মেটাবার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দিতে হবে, তেমনি মৌলিক সাহায্যও দিতে হবে। মৌলিক সাহায্য ছাড়া অতিরিক্ত সাহায্যে কোন ফল হবে না।

জাতীয় আয়ের এক শতাংশ উন্নতিশীল দেশে হস্তান্তর সম্পর্কে ডঃ প্রেবিশ বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করেন এই এক শতাংশের ৭৫ ভাগ আসুক সরকারী সূত্রে এবং ২৫ ভাগ আসুক বেসরকারী বিনিয়োগের মাধ্যমে।

অর্থ সাহায্যের শর্তাবলীও যাতে শিথিল করা হয়, ডঃ প্রেবিশ সেজন্যেও আহ্বান জানান। তাঁর ধারণায় বর্তমান সম্মেলনের সামনে দুটি কর্তব্য রয়েছে: (১) উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি বিশ্ব স্ট্র্যাটেজির কাঠামো তৈরী করা, এবং (২) ঐ লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্যে কি কি করা দরকার সে সম্পর্কে মতৈক্যে আসা।

তাঁর প্রস্তাবিত বিশ্ব স্ট্র্যাটেজির মূল বিষয়গুলি হল:

● উন্নয়নের মুখ্য দায়িত্ব যদিও উন্নতিশীল দেশগুলির নিজেদের কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়।

● এই সহযোগিতাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

● সাহায্য করার মনোভাব নিয়েই এই সহযোগিতা দিতে হবে, সাহায্যকারী দেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের দিকে তাকালে চলবে না।

● ডঃ প্রেবিশ এই প্রসঙ্গে উন্নতিশীল দেশগুলির প্রতিও একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন: ঐ দেশগুলি যাতে বৈদেশিক সাহায্যের সুযোগ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে সেজন্যে তাদের সামাজিক কাঠামোর উপযুক্ত সংস্কার সাধন করা উচিত।

তিনি আশা করেন, উন্নতিশীল দেশগুলির রপ্তানী বৃদ্ধির জন্যে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবার সাধারণ নীতিগুলি নির্ধারণ করতে সম্মেলন সক্ষম হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে কোন কোন দেশ অন্য দেশগুলিকে যে পাল্টা বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তারও অবসান করতে হবে। তা না হলে উন্নতিশীল দেশগুলি প্রকৃত লাভবান হতে পারবে না।

আরো সহজ হারে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট ১ ফেব্রুয়ারী তাঁর ভাষণে উন্নত দেশগুলির প্রতি বলেন যে, উন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্য ও বাণিজ্যিক সুবিধা দিলে পরিণামে তাদেরই লাভ হবে। সাহায্যের দ্বারা অতিরিক্ত ঋণ-সমস্যা সৃষ্টি হয় তা যাতে দেশগুলির রপ্তানী বাণিজ্যকেও সাহায্য করবে।

"আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা সশস্ত্র বাহিনী নয়।"

সুবিধা দেবার বদলে পাল্টা সুবিধা আদায় করার যে নীতি উন্নত দেশগুলো প্রয়োগ করে থাকে, উ থান্ট তার তীব্র নিন্দা করেন। নিজেদের কৃষি ও খনিজ-প্রধান শিল্পকে বাঁচাবার যে অতিরিক্ত আগ্রহ উন্নত দেশগুলির মধ্যে দেখা যায় তিনি তারও কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্য উদারতর করার জন্যে সেক্রেটারী-জেনারেল আবেদন জানান, এবং বলেন উন্নয়নের পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রী দেশগুলির আরো বেশী অংশ গ্রহণ করা উচিত।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ জর্জ উডস্‌ও ঐদিন সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি বলেন উন্নত দেশগুলির বর্তমান জাতীয় আয় দেড় হাজার বিলিয়ন ডলার। এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ এই আয় চতুর্গুণ বেড়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে একটি অসহনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভাজন দেখা দিতে পারে। এই বিভাজন যদি এড়াতে হয় তাহলে দরিদ্র দেশগুলির উন্নতির জন্যে উন্নত দেশগুলিকে আরো সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই চারটি ভাষণের মধ্যে যে সব নীতি ও লক্ষ্যগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তারই আলোকে সম্মেলনে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

INDIAN RAILWAYS

খেলাধূলা

দর্শক

রঞ্জি ট্রফি সেমি-ফাইনাল

বাংলা : ১৮৬ রাণ (অম্বর রায় ৪৭, শ্যামসুন্দর মিত্র ৩৩ এবং চুনী গোস্বামী ৩২ রাণ। শিভালকর ৩৯ রাণে ৪, ভার্দে ২৮ রাণে ৩ এবং বন্দ্রে ১১ রাণে ২ উইকেট)

ও ২৮৭ রাণ (শ্যামসুন্দর মিত্র ১০৪, অম্বর রায় ৭১ এবং পি সি পোদ্দার ৫৪ রাণ। কৌসলে ২১ রাণে ৪, বন্দ্রে ৩৬ রাণে ২ এবং শিভালকর ৪২ রাণে ২ উইকেট)

বোম্বাই : ৪৩৬ রাণ (সুধীর নায়েক ১৩৬, মনোহর হর্দিকার ১৩৫ এবং ডি আর কারকানি ৫০ রাণ। জলি সরকার ১০০ রাণে ৪, রমেশ ভাটিয়া ৯৩ রাণে ৩ এবং সুব্রত গুহ ৭১ রাণে ২ উইকেট)—৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড।

ও ৪ রাণ (১ উইকেট)

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাই দল প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। খেলার সরাসরি জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মোট সর্বাধিক ১৮ বার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ড বোম্বাইয়ের। তা ছাড়া তারা গত ৯ বার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সূত্রে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার রঞ্জি ট্রফি জয়ের রেকর্ডও করেছে। বোম্বাই যদি ১৯৬৭-৬৮ সালের ফাইনালেও রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয় তাহলে তারা উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দুর্লভ বিশ্ব রেকর্ড করবে। ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্থান—ক্রিকেট-ক্রীড়ারত এই সাতটি দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড আছে মাত্র দুটি দলের—উপর্যুপরি ৯ বার করে বোম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফি জয় এবং অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস দলের শেফিল্ড শীল্ড জয়।

প্রথম দিনের খেলায় ১৮৬ রাণের মাথায় বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হলে বাকি সময়টা খেলে বোম্বাই দল কোন উইকেট না খুইয়ে ৯ রান সংগ্রহ করে। বাংলার খেলার সূচনা খুবই খারাপ হয়েছিল—৮ রাণের মাথায় ১ম এবং ১২ রাণের মাথায় ২য় ও ৩য় উইকেট পড়ে যায়। লাঞ্চের সময় বাংলার রাণ ছিল ৬৮ (৩ উইকেটে)। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে শ্যামসুন্দর মিত্র এবং অম্বর রায় দলের ৬৭ রাণ তুলে দিয়ে দলকে শোচনীয় অবস্থা থেকে কিছুটা উদ্ধার করেন। বোম্বাই দলের "গ্রাউন্ড ফিল্ডিং" খুবই উন্নত পর্যায়ের হয়েছিল। তবুও দু-একটা 'ক্যাচ' ফস্কেছিল। তা না হলে বাংলার রাণের চেহারা আরও কাহিল হত।

দ্বিতীয় দিনের খেলার গোড়ার দিকে বোম্বাই দলকে যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল তা থেকে তারা সামলে নেয়। বোম্বাইয়ের ৩ রাণের মাথায় ১ম এবং ১৮ রাণের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। এই প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর ওপনিং-ব্যাটসম্যান সুধীর নায়েক (১৩৬ রাণ), অশোক মানকাদ (৩৯ রাণ) এবং মনোহর হর্দিকার (নট-আউট ৬৩ রাণ) শেষ পর্যন্ত খেলার স্রোত ঘুরিয়ে দেন। নায়েক বার তিন—প্রবীর মুখার্জি, চুনী গোস্বামী এবং দীপঙ্কর সরকারের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শেষ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিট খেলে ব্যক্তিগত ১৩৬ রাণ (১৮টি বাউণ্ডারীসহ) করেন। বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের ২৫৯ রাণের (৪ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হলে তারা বাংলার প্রথম ইনিংসের থেকে ৭৩ রাণে এগিয়ে যায়; তাদের হাতে জমা থাকে প্রথম ইনিংসের আরও ৬টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ৪০ মিনিট আগে ৪৩৬ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় বোম্বাই তাদের প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। বোম্বাই দলের অধিনায়ক মনোহর হর্দিকার ব্যক্তিগত ১৩৫ রান করে তৃতীয় দিনের খেলায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ৩৬৫ মিনিট খেলে তাঁর ১৩৫ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী এবং দুটো ওভার-বাউণ্ডারী করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি এবং কারকানি ৭ম উইকেটের জুটিতে মূল্যবান ১১৯ রান সংগ্রহ করে দলের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

বাংলা ২৫০ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং খেলার বাকি সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭৬ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে ইনিংসে পরাজয় থেকে অব্যাহতি পেতে বাংলা দলের আরও ১৭৫ রানের প্রয়োজন হয়; এদিকে হাতে জমা থাকে দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের ১২ রানের মাথায় ১ম ও ২য় এবং ১৫ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ২৮৭ রানের মাথায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। শ্যামসুন্দর মিত্র (১০৪ রান), অম্বর রায় (৭১ রান) এবং পি সি পোদ্দার (৫৪ রান) দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভের পথ রুদ্ধ করে দেন। বাংলা দলের অধিনায়ক শ্যামসুন্দর মিত্রের ১০৪ রান (১৫টা বাউণ্ডারীসহ) তুলতে ৩২০ মিনিট সময় লাগে। তাছাড়া তিনি অম্বর রায়ের সঙ্গে ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১১০ রান এবং পি সি পোদ্দারের সঙ্গে ৫ম উইকেটের জুটিতে ১২৬ রান সংগ্রহ করে অধিনায়কের বিরাট দায়িত্ব যোগ্যতা-সহকারে পালন করেছিলেন।

খেলার শেষ দিনে যখন ২৮৭ রানের মাথায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়, তখন খেলা ভাঙতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় বাকি ছিল এবং খেলায় সরাসরি জয়লাভের জন্যে বোম্বাই দলের ৩৮ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র ৪ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হয়।

অপরদিকের সেমি-ফাইনালে মাদ্রাজ ৭ উইকেটে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। প্রথম দিনেই খেলা ভাঙার ২৪ মিনিট আগে ২১৩ রানের মাথায় সার্ভিসেস দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। মাদ্রাজ এইদিন ১ উইকেট খুইয়ে ৮ রান করে। মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসের ২৪৩ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। তৃতীয় দিনে ২৮৩ রানের মাথায় মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ৭০ রানে অগ্রগামী হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪১ রানের মাথায় সার্ভিসেস দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭২ রান তুলতে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে খেলার ১৫ মিনিটে কোন উইকেট না-খুইয়ে ১০ রান সংগ্রহ করে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনের লাঞ্চের আগেই খেলার জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়ে যায়। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭৪ রানের (৩ উইকেটে) মাথায় খেলা শেষ হয়—মাদ্রাজ ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

এই নিয়ে মাদ্রাজ চারবার রঞ্জি ট্রফির ফাইনালে উঠলো। তারা ইতিপূর্বে মাত্র একবার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে—১৯৫৪-৫৫ সালের ফাইনালে হোলকারের বিপক্ষে ৪৬ রানে। বাকি দু'বারের ফাইনালে তারা পরাজিত হয়—১৯৫৫-৫৬ সালে বোম্বাইয়ের কাছে ১৯০ রানে এবং ১৯৬০-৬১ সালের ফাইনালে মহারাষ্ট্রের কাছে ৬ উইকেটে।

প্রদর্শনী ফুটবল

এশিয়ান এবং মারডেকা ফুটবল চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ সম্প্রতি ভারত সফরে এসে তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে গেল। ভারত সফরে তাদের পাঁচটি প্রদর্শনী খেলার ফলাফল : জয় ৩, ড্র ১ এবং পরাজয় ১। নিখিল ভারত ফুটবল একাদশ দলকে তারা গৌহাটিতে ৩—১, কালিকটে ১—১, নয়াদিল্লীতে ৪—২ এবং পাটনায় ১—০ গোলে পরাজিত করে। ভারত সফরে তাদের এক মাত্র পরাজয় কলকাতায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আই এফ এ দলের কাছে ০-১ গোলে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জা?

অ্যানাসিন

এরকম ভোগান্তির নিশ্চিত উপশমে
ঢের ভালো কারণ এটি
৪ ভাবে কাজ করে

অ্যানাসিন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত একাধিক ভেষজের অপূর্ব সমবায়ে তৈরী বলেই খুব তাড়াতাড়ি ৪-ভাবে আপনাকে আরাম এনে দেবে :

১) অ্যানাসিন সর্দি এবং তার আনুষঙ্গিক অস্বস্তি দূর করবে—তাড়াতাড়ি।

২) অ্যানাসিন ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় স্নায়ুর উত্তেজনা আর শরীরের ব্যথা সারাবে।

৩) অ্যানাসিন অবসাদ ঘোচাবে—যা সাধারণতঃ সর্দি আর ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গী হ'য়ে আসে।

৪) অ্যানাসিন ক্লান্তি দূর ক'রে আবার আপনার স্বাভাবিক উৎসাহ ও আনন্দ ফিরিয়ে আনবে।

এছাড়া, অ্যানাসিনে মাথাধরা, দাঁতশূল আর শরীরের ব্যথাও সারবে।

২টি অ্যানাসিন খেলেই খুব তাড়াতাড়ি আরাম

Regd. User: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

অমৃত

চল ও অচল অবস্থা

কেউ জানেন না আমরা এখন কোন্ অবস্থায় বাস করছি। সবাই বলছেন, অবস্থাটা সুবিধার নয় অর্থাৎ অচল। অনেকে বলছেন, বেশ তো চলছে। চরম নিরাশা থেকেই এ-ধরনের উক্তি বেরোতে পারে। পশ্চিমবাংলার অবস্থাও হয়েছে তাই। প্রায় তিন মাস ধরে এই রাজ্যে প্রশাসনিক জট লেগে আছে, তা খোলবার চেষ্টা করেও খোলা যাচ্ছে না। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো 'যতবার আলো জ্বালাইতে চাই নিভে যায় বারে বারে।'

গত সপ্তাহে বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশন শুরুতেই পণ্ড হয়ে যায়। রাজ্যপাল ভাষণ দিতে পেরেছেন কি পারেননি, তাই নিয়ে চুল-চেরা তর্ক চলছে। কিছুসংখ্যক সদস্য এমন হট্টগোল করছিলেন যে, রাজ্যপালের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সভাকক্ষে প্রবেশ করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যদিও বা তিনি অন্য দরজা দিয়ে সভাকক্ষে ঢুকেছিলেন, তবুও তাঁর পক্ষে দু-তিন মিনিটের বেশি ভাষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ বিরোধী পক্ষ চাইছেন বিধানসভা অচল করে দিতে। কার্যত বিধানসভা অচলাই। স্পীকার বলেছেন যে, তাঁর পূর্বতন রুলিং পরিবর্তন করার কোনো কারণ ঘটেনি। সুতরাং যথাপূর্বং তথাপরং। অর্থাৎ বিধানসভার অচল অবস্থা চলছে এবং চলতে থাকবে যদি না এর মধ্যে সাংবিধানিক জটিলতা দূর করার জন্য কোনো চেষ্টা হয়।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর অনেক রাজ্যেই সরকার বদল হয়েছে। কিন্তু এমন সঙ্গীন অবস্থা বোধহয় অন্য কোনো সরকারের হয়নি। বিধানসভার অভ্যন্তরে ভোটাভুটিতে সরকারের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব প্রমাণ করার প্রকৃত সুযোগ ছিল। এছাড়া পরিষদীয় গণতন্ত্রে অন্য কীভাবে সরকার বদল করা যায় তা আমরা জানি না। লক্ষণ খুবই খারাপ। এভাবে পরিষদীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা মুশকিল। সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে গণতন্ত্রের রীতিনীতি বিষয়ে ন্যূনতম বোঝাপড়া না থাকলে অচল অবস্থা দেখা দিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে সেই দুর্ভাগ্যই আজ দেখা দিয়েছে।

দলত্যাগীর ফলে রাজনৈতিক পরিবেশও কলুষিত হয়ে উঠেছে। কে আসছে, কে যাচ্ছে, এই যদি রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য চিন্তা হয় তাহলে সরকারের কোনো স্থায়িত্ব থাকতে পারে না। এবং সরকার যদি নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সামলাতে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে প্রশাসনিক কাজকর্ম শিকেয় ওঠে। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়মাস ধরে তাই চলছে। বিরোধী পক্ষ পর্যায়ক্রমে করছেন আইন অমান্য। দফায় দফায় লোক গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে যাচ্ছেন। ছাত্ররা বিক্ষোভ করছে। কলকারখানাগুলির মধ্যে যেগুলির দরজা বন্ধ ছিল তার কিছু খুলেছে, কিন্তু সব খোলেনি। বেকারদের বোঝা ভারী হচ্ছে। ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ সুযোগ পেলেই ঘটছে। বাইরের লোক তো কলকাতা সম্পর্কে শিহরিত।

এতে ক্ষতি হচ্ছে আমাদেরই। রাজনীতিকদের লড়াইয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ আজ ক্লান্ত, সন্ত্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন। গণতন্ত্রে বলে, বিধানসভাতেই বিতর্কের মীমাংসা করতে হবে। সমস্যা যত জটিলই হক, বিধানসভায় তার সমাধানের পথ পাওয়া দুষ্কর নয়। দুঃখের বিষয়, সেই বিধানসভা এখন অকেজো হয়ে আছে। তার ফলে নানারকম গোঁড়ামি রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছে। সকালে-বিকালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে চলছে বিভিন্ন পক্ষের দড়ি টানাটানি—এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপার। এতে গণতন্ত্রের খোলসটুকুই বজায় থাকে, তার স্বধর্ম নষ্ট হয়।

এর প্রতিকারের কথা আমাদের ভাবতে হবে। নয়াদিল্লী এ-বিষয়ে চিন্তা করছেন। রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপেই হক, কিংবা অন্য কোনো উপায়েই হক এই অচল অবস্থা দূর করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যে-সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয়, একটা সেটলমেন্ট শীঘ্রই হবে। এখন বাজেট পাশ করাবার সময়। অধিবেশন পণ্ড হওয়ায় তার আশাও সুদূরপরাহত হয়ে গেল। আমরা জানি পরিষদীয় গণতন্ত্র নিয়ে এ-ধরনের খেলা করতে করতে অনেক দেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে এবং তার ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একনায়কতন্ত্র। পৃথিবীর বহু দেশই একনায়কতন্ত্রের দ্বারা কবলিত হয়েছে। ভারতবর্ষের যেন সেই দুর্ভাগ্য না ঘটে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি যদি বাস্তববোধ বিবর্জিত হয় এবং যে-কোনোভাবে ক্ষমতা দখলের জন্যই ব্যগ্র হয়ে ওঠে তাহলে পরিষদীয় গণতন্ত্রের স্বধর্ম আর থাকবে না, তার জায়গায় অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের অচল অবস্থা দেখে সে-কারণেই সকলে উদ্বিগ্ন। তার সুষ্ঠু সমাধান আমাদের দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কোনো জোড়াতালির সমাধান আমরা চাই না। যাতে নির্বাচিত সরকার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন তার নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সেটাই গণতন্ত্রের পথ।

বিদেশে রবিশংকর

ভূদেবশংকর

পণ্ডিত রবিশংকর সাধারণের কাছে গুণী সঙ্গীতশিল্পীরূপেই পরিচিত, কিন্তু তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের প্রতিক্ষণ ভারতীয় সঙ্গীতের সেবায় নিয়োজিত। ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের বিদেশে প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে। কিছুকাল আগেও ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্যের শ্রোতাদের কাছে অবোধ্য ছিল। দশ বছর আগেও ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ভারতীয় সঙ্গীত শোনবার জন্য শ্রোতা পাওয়া দুষ্কর ছিল, আর আজ সেই সব দেশে হাজার হাজার দর্শক ভারতীয় সঙ্গীতকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সঙ্গীতের বিদেশে যথার্থ প্রচারের জন্য রবিশংকরের দান অসামান্য।

ভারতীয় মার্গসঙ্গীত বহুকাল ধরে গোষ্ঠীগতভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষেও এর নিগূঢ় রস আস্বাদন করার সুযোগ খুবই কম ছিল। রাজা-মহারাজাদের আনুকূল্যে তাঁদের পরিষদবর্গের মধ্যে এই সঙ্গীতের আসর জমে উঠত। আজকাল ঘরোয়া জলসা ও সঙ্গীত সম্মেলনের মাধ্যমে এই সঙ্গীত জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে। অনেকেই এই ভারতীয় সঙ্গীতধারাকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেয়েছেন। একদিকে যেমন এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী শ্রোতাদের কাছে এই সঙ্গীতের যথাযথ প্রচার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশের সরকার বার বার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠিয়েছেন। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিদেশী শ্রোতাদের মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠলেও তাঁদের মন পরিতৃপ্ত হয়নি। তাই যখন রবিশংকর প্রমুখ শিল্পীরা বিদেশের দরবারে ভারতীয় সঙ্গীতসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তাঁদের মধ্যে বহুল আগ্রহের সঞ্চার হল। বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় আজ রবিশংকর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে তাঁদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

রবিশংকরের শিল্পীজীবনের প্রধান অনুপ্রেরণা তাঁর স্বনামধন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদয়শংকর। শৈশব থেকেই তিনি এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে লালিত হন। উদয়শংকরের নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পান এবং ভারতবর্ষের ও বিদেশের বহু গুণী

দুই শিল্পী রবিশংকর এবং ওস্তাদ আল্লারাখা

মার্কিন দেশে রবিশঙ্কর

চিত্রাঙ্গদা সেন

সংস্কৃতির আদানপ্রদানেই সভ্যতা সুদৃঢ় হয়। আর সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কৃতির দূত আজ পাড়ি জমাচ্ছে দেশ-বিদেশে। ভারতীয় সংস্কৃতির এমনি একজন দূত হচ্ছেন পণ্ডিত রবিশংকর। সেতার বাদনে তাঁর কৃতিত্ব দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশেও ঔৎসুক্য সঞ্চার করেছে। পরদেশী সেই সব উৎসাহীদের অনুরোধে তাঁকে বার বার যেতে হচ্ছে সেখানে, শোনাতে হচ্ছে তাঁর বাজনা। শুধু তাই নয়, সেসব দেশে শিক্ষার্থীও জুটেছে অনেক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে বিটল এবং হিপি। তাঁর সর্বখ্যাত শিষ্য হচ্ছেন জর্জ হ্যারিসন—বিটল চতুষ্টয়ের অন্যতম। পণ্ডিতজী তাঁকে এখনও প্রথম শিক্ষার্থী বলে মনে করেন। জর্জকে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষা দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে এবং লস এঞ্জেলসে। জর্জ কিছুদিন বম্বেতে এসেও ছিলেন। উদ্দেশ্য অবশ্যই সঙ্গীতশিক্ষা। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তাঁর হোটেলের চারদিকে ভিড় করে। জর্জ তাদের বলেন, টোকিও অথবা অন্যান্য জায়গায় যে দৃশ্য দেখা যায় এখানে তা দেখব বলে আশা করিনি। আমি এখানে বীটলরূপে আসিনি, এসেছি জর্জ হ্যারিসন হিসাবে যোগসাধনা এবং ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা করতে। আপনাদের উচিত সর্বাগ্রে নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। জর্জ সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর অভিমত হলো, জর্জকে যখন প্রথম দেখি তখন তার বিনয় আন্তরিকতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। সে আমার কাছে ৮ সপ্তাহ থাকতে দিয়েছিল। আমি জর্জকে একেবারে প্রাথমিক স্কেল, ফিঙ্গারিং ও পাল্টা থেকে শেখাতে শুরু করি। এটা অবশ্যই সময়সাপেক্ষ।

গুরু রবিশঙ্কর ও বিটল শিষ্য সম্পর্কে হেরাল্ড এগ্‌জামিনার এক্সপ্রেস-এর সমালোচক বলেছেন, হলিউড Bowl এ আজকের সন্ধ্যায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনরত পণ্ডিত রবিশঙ্করের সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা ছিলেন তাঁরই বিনয়াবনত বিটল শিষ্য গীটার বাদক জর্জ হ্যারিসন। জর্জ এ প্রসঙ্গে বললেন, তার লস এঞ্জেলস আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আজকের রাতের সঙ্গীতানুষ্ঠান শ্রবণ এবং পণ্ডিতজীর নতুন স্কুলে আরও কিছু সঙ্গীতের পাঠ-গ্রহণ। তিনি ইতিপূর্বে ছয় সপ্তাহ জর্জকে শিক্ষা দিয়েছেন। খালি পায়ে ভারতীয় পোষাক পরিহিত জর্জ পায়ের উপর পা তুলে ভারতীয় পদ্ধতিতে মাটির উপর বসেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি আরো জানালেন, সিটা (সেতারের বীটল উচ্চারণ) নিয়ে আমি যাই বাজাইনা কেন তা পপ মিউজিক ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াবে না। যদি আমি যথাযথ নিয়মমাফিক চর্চা চালিয়ে যেতে পারি এবং অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি তবেই হয়তো কিছু বাজাতে পারব।

এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা ভাল যে, পণ্ডিতজী লস এঞ্জেলসে কিন্নর স্কুল অব ইণ্ডিয়ান মিউজিক শুরু করেছেন উৎসাহী শিক্ষার্থীদের অনুরোধে।

হলিউড Bowl -এর এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে [illegible] পত্রিকার প্রতিনিধি মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, পণ্ডিত রবিশঙ্করের বক্তব্য শুনে মনে হলো আমেরিকানরা হুজুগপ্রিয় জাত। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষে আমরা বাজাতে বাজাতে রাত-ভোর করে দিই, বাট দিস আমেরিকা ইউ হ্যাভ ইউনিয়নস। পণ্ডিতজীর পরিকল্পনাধীন এই সঙ্গীতের আসর চলে পুরোপুরি সাড়ে চার ঘণ্টা ধরে। আমেরিকাবাসী বিশেষত হিপিরা একটানা ধরে রাগসঙ্গীত শুনতে পারে কিনা সেটা ভাবার বিষয়।

শ্রোতার ভিড় ছিল কল্পনাতীত। অনুষ্ঠান আরম্ভের অনেক আগে থেকেই দেখা গেল যে, [illegible] মত শ্রোতৃবৃন্দ গাড়ি পার্ক করায় ব্যস্ত। এমন সময় তারকাখচিত শিল্পী শঙ্করের আবির্ভাব। বাইরে থেকে মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য তাদের কান বরদাস্ত করবে না। যাহোক, লোকজনের আগমন দেখে কিন্তু একটা কথাকে কিছুতেই মনে আমল না দিয়ে পারলাম না যে, এ পর্যন্ত পণ্ডিতজী পশ্চিমে যত স্ট্যাণ্ডিং ওভেশন পেয়েছেন এবারের তীব্রতা তার চেয়ে যেন কিছু মন্দীভূত মনে হলো।

ব্যালকনি থেকে মঞ্চের দিকে শিশুরা এগোবার দরুন অনেক আসনই খালি হয়েছিল। আবার বেশি উৎসাহী শ্রোতাদের স্টেজের চতুর্দিকে ভারতীয় পদ্ধতিতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে খুব মন দিয়ে বাজনা শুনতে দেখা গেল।

আত্মনিবেদিত শিল্পী রবিশঙ্করের অনেক কীর্তির মধ্যে একটি অন্যতম কৃতিত্ব হলো যে, তিনি অনেক পপ [illegible] হাল্কা এবং [illegible]

রক্তের টান

সুভাষ সেন

লম্বা টানা বারান্দা। উপরে টালির ছাদ। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। মফস্বল শহরের পুরনো আমলের ডাক-বাংলোর যেমনটা থাকে। পরপর গোটাকয়েক ঘর। বিরাট দরজা ঘরগুলোর এবং সবগুলোই বারান্দামুখো। দরজার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জানলাগুলিও বড় বড়। খড়খড়ি লাগানো। তবে এখন আর আস্ত প্রায় কোনটাই নেই। একটা ঘর বাদে বাকি সবগুলোই বন্ধ। এই ঘরটা অর্থাৎ আমি যেটায় উঠেছি, মোটামুটি চলনসই হলেও নেহাতই হতশ্রী—দীর্ঘকাল দরজা জানলায় হাত পড়েনি, কলি ফেরানো হয়নি, মেঝেতে অসংখ্য ফাটল ধরেছে। ঘরের আনাচে-কানাচে ঝুল জমে আছে। প্রথম দর্শনে যে প্রেমে পড়িনি সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অন্য ঘরগুলি দেখবার পর মন স্থির করতে এক মুহূর্তও দেরি হয়নি। বিশেষত যখন চৌকিদার দরজাগুলো সব খুলে দিল, আলোয় সারা ঘর ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্ধকারও যেন দূর হল। চৌকিদার আশ্বাস দিল যে আরো একটু ঝাড়পোঁছ ও করে দেবে। ঘরের রং-চটা খাট, নড়বড়ে টেবিল আর হাতলভাঙা চেয়ার আমাকে বিশেষ দমাতে পারলো না। কোণে একটা ড্রেসিং-টেবিলও ছিল, কিন্তু তার আয়নাটার এমন জরাজীর্ণ অবস্থা যে তাতে আর ছায়া পড়ে না বললেই চলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জায়গাটা আমার খুব ভালো লেগে গেল। শহরটা সুন্দর। বাংলা-বিহার সীমানায় হওয়ার দরুন দুই প্রদেশের ভালো-মন্দ মিশিয়ে থাকবার পক্ষে বস্তুতই ভালো, বিশেষত আমার মতো দুদিনের মুসাফিরের কাছে তো বটেই। জায়গাটার আরেক গুণ, লোকের ভিড় বলতে যা বোঝায় তা নেই, আর চেঞ্জারদের উৎপাতও কম। সরকারের নেক-নজর এখানে পড়ে না, তাই ডাক-বাংলোতে নমাসে ছমাসেও লোক আসে না। সুতরাং এখানে নিশ্চিন্ত মনে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হব হব। ঘরের সামনেই বারান্দার একধারে সে আমলের ঢাউস গোছের একটা আরাম কেদারায় বসে আছি পা এলিয়ে। পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে উঠছে। একটু দূরেই শালবন। ফাঁক দিয়ে চাঁদটা দেখা যাচ্ছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল যেন একটা প্রকাণ্ড তামার থালা। যত উপরে উঠছে, থালাটা ততই ছোট হয়ে আসছে, আর সেই সঙ্গে রংটা তামাটে থেকে ক্রমেই রুপোলী হতে হতে খুব করে একসময়ে হয়ে গেল আলোয় আলো-ময়। সন্ধ্যার অন্ধকার ফিকে হতে হতে জোছনার জোয়ারে বিলীন হয়ে গেল। যে শালগাছগুলো লম্বা লম্বা হাজার হাত বাড়িয়ে ডাক-বাংলোটাকে [illegible] করছিল, জোছনার উজ্জ্বল আলোয় সচকিত হয়ে তারা যেন হাত গুটিয়ে যে-যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু মিহি বরফের গুঁড়োর মতো জোছনার হালকা একটা ওড়না গাছগুলোর মাথায় আলতোভাবে লেগে রইল।

মাথার নিচে হাতদুটো জড়ো করে আরাম কেদারায় আধ-শোয়া হয়ে প্রকৃতির রঙবদলের খেলা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, জলজ্যান্ত একটা মানুষ কখন এসে বারান্দার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্যই করিনি। পায়ের শব্দে হুঁশ হল। তাকিয়ে দেখি আগন্তুক আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে ঠাহর হল ভদ্রলোক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালী। গায়ে একটা চাদর গলা অবধি জড়ানো। চৌকিদারটা গেছে বাজারে, কাজেই আলো জ্বালানো হয়নি তখনো। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায় তাতে মনে হল ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়। পঞ্চাশের নিচেই হবে। দাড়ি-গোঁফ কামানো। সাত্ত্বিক চেহারা। হাতে একটা ডাক্তারি সাইজের ব্যাগ।

"আজ রাতের মতো একটা ঘর পাওয়া যাবে এখানে?" আগন্তুক প্রশ্ন করলেন। ভারী গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ। বেশ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। আমি নিজের অজান্তেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। জবাব দিলাম,

সম্বন্ধেই কিছু আরো বলবেন। স্বভাবতই আমার মনে নানা প্রশ্ন ভিড় করে এসেছিল। সুতরাং কৌতূহল মেটাবার আশাতেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম বারান্দার এক কোণে। জোছনার জোয়ারে চারদিক ভেসে যাচ্ছে আর বোবা কাকগুলো থেকে থেকে ডেকে উঠছে। গা শিরশির করা উত্তুরে হাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে নিলাম।

"সমরেশবাবু, আপনি একটু আগেই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি এখানে কেন এসেছি। বিশ্বাস করুন, এখানে আসার আগের মুহূর্ত অবধি আমি নিজেই তা জানতাম। কী যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপনাকে পেয়ে অবধি মনে হচ্ছে আমাকে আসতেই হত। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যই। আপনার নাম শুনেছি অজিতের কাছে। আপনাকে সত্যি ও ভালোবাসত। কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করবার ওর উপায় ছিল না। ও নিজেও এ জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কষ্ট পেয়েছে।" সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন রঞ্জনবাবু। আমি সিগারেট খাই না শুনে নিজেই একটা ধরালেন। তারপর নিজের মনেই যেন বলে চললেন, 'দোতলার সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল অজিত। হাসপাতালে কয়েক ঘন্টা মাত্র বেঁচে ছিল। ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষরক্ষা হল না। মৃত্যুর সময়ে কাছে ওর আত্মীয়স্বজন বন্ধু বলতে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। আপনার ঠিকানা ও জানত কিনা বলতে পারি না আমাকে কখনো বলে নি।" খানিকক্ষণ নির্বাক থেকে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে আবার শুরু করলেন "শ্মশান থেকে যখন ফিরে এলাম, শরীর-মন অবসন্ন। যে ঘরে গত এক বছর ধরে দুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছি সেই খালি ঘরে ঢুকতে যেন মন বিদ্রোহ করে উঠল। সারা রাত না ঘুমিয়ে কাটল। কী যে আমার হল, সেই থেকে রাতের পর রাত অনিদ্রায় কাটতে লাগল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই মুমূর্ষু অজিতের কাতর কাকুতি-ভরা দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরা। ডাক্তার উপদেশ দিলেন স্থান পরিবর্তন করতে। আইডিও লজ ছাড়লাম। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হল না। রাত্রি হলেই শরীরের সমস্ত স্নায়ু যেন বেঁকে বসে। কত যে ঘুমের ওষুধ খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়েছে। অজিতের সেই কাতর দৃষ্টি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি এখন মুসাফির। আজ এখানে কাল ওখানে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেমন বেড়িয়েছিল মরা অ্যালবাট্রস পাখি গলায় ঝুলিয়ে কোলরিজের সেই হতভাগ্য নাবিক।"

"আপনার কথায় মনে হচ্ছে, যে-কোন কারণেই হোক অজিতের মৃত্যুর জন্য আপনি নিজেকে দায়ী করছেন। কিন্তু অজিত তো আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তাহলে আপনি কেন অকারণে নিজেকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? অজিত আপনার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল, সুতরাং ওর অপঘাত মৃত্যুতে যে আপনি প্রচণ্ড আঘাত পাবেন সেটা স্বাভাবিক। আমি অজিতকে জানতাম বলেই বুঝতে পারছি ও আপনাকে কতখানি আপন করে নিয়েছিল। কিন্তু আত্মীয়-বন্ধু বিয়োগের শোকও একদিন-না-একদিন ভুলতেই হয়, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম, নইলে সংসার অচল হয়ে যেত। আপনার সঙ্গে আমার মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়। বেশি উপদেশ দেওয়াটা ধৃষ্টতা হবে। অজিত দুজনেরই বন্ধু ছিল বলেই এতগুলো কথা বলতে সাহস পেলাম। অজিতের প্রসঙ্গ না হয় আজ মুলতুবী থাক, মিছিমিছি আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কাল না হয় বাকিটা শোনা যাবে।" ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। আমার কথায় উনি কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে যা বললেন, তারপর আর আমার মুখ দিয়ে কথা সরল না।

রঞ্জনবাবু বললেন, "কথাটা আপনাকে না বলা অবধি আমি শান্তি পাব না। অন্তত অজিতের আর একটি বন্ধু জানুক তাতে যদি আমার কিছুটাও প্রায়শ্চিত্ত হয়। দোতলার সিঁড়ি থেকে আমিই ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম। মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে ও বলেছিল সিঁড়িতে পা হড়কে পড়ে যায়। সবাই তাই বিশ্বাস করে কাপুরুষ আমি, তাই মুখ বুজে এই নিদারুণ অসত্যকে প্রশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী অজিতকে আমার আচরণের কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারি নি। তার সেই কাতর দৃষ্টি যেন আমাকে প্রশ্ন করেছে, 'কেন কেন কেন? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি। তোমাকে পরম বন্ধুর মতো ভালোবেসেছি। তোমার সঙ্গে কোন লুকোচুরি করি নি তোমাকে প্রতারণা করি নি। কী হল যে তুমি আমাকে এমন নির্মম ভাবে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিলে?'"

আমি আর ধৈর্য সংবরণ করতে পারলুম না, প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললুম, "দোহাই আপনার, হয় হেঁয়ালি থামান, নয়তো অজিতের কাহিনীর এখানেই ইতি হোক। আপনিই যদি অজিতের মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকেন তবে সে কথা পুলিশকে গিয়ে বলুন, আমাকে একাজে কেন কষ্ট দিচ্ছেন?"

এবারে রঞ্জনবাবু অত্যন্ত শান্ত অনুত্তেজিতভাবে বললেন, "পুলিশকে তখুনি বলেছিলাম, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি। আইডিও লজের অন্য বোর্ডারেরা পুলিশকে আড়ালে ডেকে বুঝিয়েছিল যে বন্ধুর শোকে আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এক বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও কখনো আমাদের দুজনকে কেউ সামান্য কথা কাটাকাটি পর্যন্ত করতে দেখে নি। বরং আড়ালে অনেকে আমাদের বন্ধুত্বের জন্য আক্ষেপও নিন্দা করে নি। আমরা অবশ্য ওদের কখনো কর্ণপাত করি নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও দুর্ঘটনাটা ঘটল। কেন ঘটল সে কথা এত বিচিত্র এবং অবিশ্বাস্য যে এতদিন কাউকে বলতে সাহস হয় নি। বললে হয় আমাকে পাগলা গারদে আটকে দিত নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আপনি অজিতের একজন বন্ধু ছিলেন এবং বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন একথাও ওর কাছে শুনেছি। সেজন্যই আপনাকে সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনাতে আমার দ্বিধা নেই। আপনিও হয়ত শেষপর্যন্ত আমার কথা পাগলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দেবেন। তবু আমাকে বলতেই হবে।"

একথার পর আমার কৌতূহল যে বাধা মানবে না তা সহজেই অনুমেয়। বাঁহাত হাতের রেডিয়াম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা তখন রাত একটায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডার তীব্রতাও বাড়ছে। দূরে কুকুরটা তখনো অবিশ্রান্ত ডেকে চলেছে। সচেতনে নিজেকে আরো একটু গুটিয়ে নিয়ে বসলাম। রঞ্জনবাবু সিগারেট ধরালেন। নিঃশব্দে কয়েকবার টান দিলেন তারপর বলতে শুরু করলেন। আমি নির্বাক বিস্ময়ে ওঁর সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শুনতে লাগলাম।

"মিস-রকের হল আমার টু-সীটার ঘরের আগেকার অংশীদার চলে গেছেন। একাই আছি আমি। বেশ ভালোই লাগছিল একলা থাকতে। ভাবছিলাম কে না কে এসে খালি জায়গা দখল করবে। সে লোক কেমন হবে, আমার সঙ্গে তার বনবে কিনা কিছুই জানি না। সেইটাই অশান্তি না ভোগ করতে হয়। যিনি চলে গেলেন তাঁর সঙ্গে যে খুব একটা বোঝাপড়া হয়েছিল তা বলা চলে না, তবে ভদ্রলোক নিজের মনে থাকতেন। যেচে পড়ে কখনো অহেতুক ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন নি, আবার অভদ্রতার মত ব্যবহারও করেন নি। ওঁর সম্পর্কে আমার মনোভাব মোটামুটি নিস্পৃহই ছিল। তাই উনি যখন চলে গেলেন তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মত মনের ভাব যেমন হয় নি, তেমনি আবার বিচ্ছেদের বেদনাও মনকে পীড়িত করে নি।

এই অবস্থায় একদিন আইডিও লজের ম্যানেজার অজিতকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। উস্কোখুস্কো ভাবুক-ভাবুক চেহারা। রোগাই বলা চলে, তবে দুর্বল নয়। যাকে আমরা বলি পেটানো গড়ন। গাঢ় রঙিন রং-এর প্যান্টের উপর মাথা হাফ শার্ট পরনে। জামা-কাপড়ে পারিপাট্য নেই, তবে পরিচ্ছন্ন। লম্বা দোহারা চেহারায় ঝাঁকড়া-চুল মাথাটা একটু বড়, বেমানান দেখায়। দুধের গড়ন লম্বাটে। গাল দুটো সামান্য বসা বলে চিবুকটা চোয়াড়ে ভাব। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর ওর চোখ দুটো। দিনের আলোয় যেন জ্বলজ্বল করছে। যেমন নীলাভ তেমনি গভীর। মনে হয় আপনার অন্তস্তল অবধি ওর দৃষ্টি পৌঁছচ্ছে। কিন্তু তাতে আপনার অস্বস্তি হবে না, কারণ সে দৃষ্টিতে অভদ্রতার কুটিলতা নেই। আমাকে উদ্দেশ করে হাত তুলে নমস্কার করলো, একটা মিষ্টি হাসিতে ওর চোখদুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আর দুটি চোখের কোণে আবছা প্রতিবিম্বের আভাসটি

আমার নিজের কোনোরকম শারীরিক কষ্ট নেই। আমি বেশ ভালোই আছি। ডাক্তারের কাছে গেলেই তারা একটা না একটা রোগ আবিষ্কার করবেই, নইলে তাদের পশার জমে না। এসব কথা সত্ত্বেও বন্ধু হিসেবে ও যদি আমার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তাতে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। আমি ওকে বললুম, "তোর সঙ্গে আমার এজন্মে না হলেও আর জন্মে নিশ্চয়ই রক্তের সম্বন্ধ ছিল। আমাকে নিয়ে তুই যে রকম পাগলামি করিস, নিজের ভাই হলেও বোধ-হয় এত করত না।" আমার কথায় ও যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কোনো জবাব দিলে না।

কয়েকদিন বাদে মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘাড়ের কাছে কেমন যেন একটা বোবা ব্যথা। ধড়মড় করে উঠে বসতে গিয়ে কার গায়ে ধাক্কা লাগল। "কে? কে এখানে বসে?" বলে চেঁচিয়ে উঠে বালিশের নিচে রাখা টর্চটা জ্বালিয়ে দেখি অজিত বসে আছে আমার খাটের ধারে। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল। অন্যায় করে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেলে যেমন অপ্রস্তুত অপরাধী মুখ হয় লোকের, তেমনি চকিত সন্ত্রস্ত ওর দৃষ্টি। কাঁচা ঘুমে তখনো আমার চোখ জোড়া, তবু উঠে সুইচ টিপে বাতি জ্বালালাম। অত আলোয় অজিত যেন আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ব্যাপার কী? আমি কি আবার সেদিনের মতো ঘুমের ভিতর আবোল-তাবোল বকছিলাম? মাঝরাত্রে অজিতই বা আমার বিছানার ধারে বসে কেন? সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘাড়ের কাছে আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে এসেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই ওখানটায় হাত দিয়েছি। এ কী, আবার রক্ত নাকি? হাতটা নামিয়ে আলোর কাছে ধরতেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। হাতের পাঁচটা আঙুলে স্পষ্ট রক্তের ছাপ।

রাত্রে কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে দুজনেই কেউ কারুর সঙ্গে যে আর কোনো কথা বলিনি, এটা মনে আছে। একটা অদ্ভুত সম্ভাবনায় আমার অন্তরাত্মা কেমন যেন বিমূঢ় বিকল হয়ে গিয়েছিল।

সকালে উঠে চা খেতে খেতে আড় চোখে অজিতের দিকে তাকিয়ে দেখি ও অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। ওর দৃষ্টি মেঝের উপর কিন্তু মন উধাও কোনো অজানা রাজ্যে। একটু কেশে ওর মনোযোগ আকর্ষণ করে বললাম, 'মনটা কি ইউরোপে পাঠিয়ে দিলি নাকি? তোর মতো একটা চ্যাটারবক্স এভাবে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলে বড় অস্বস্তি হয়। সে অনেক হয়েছে, এবার ধ্যানভঙ্গ কর।" আমার চটুলতায় বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হয়ে অজিত বললে, "তোকে একটা কথা বলা দরকার। কিন্তু কীভাবে কথাটা পাড়ব বুঝতে পারছি না। ভয় হয়, পাছে তুই ভুল বুঝিস।"

আমি হেসে বললাম, "অত ভণিতা না করে বলে ফেল। তোর কোনো ভয় নেই, ভুল তোকে আমি বুঝব না।"

অজিত একটু নড়েচড়ে বসল। কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে কাটল। আমি চায়ের পেয়ালাটা সবে মুখে তুলেছি এমন সময়ে অজিত বলতে শুরু করলে। ওর গলার স্বর হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে উঠেছে। এ যেন অন্য কারুর গলা। অজিতকে এত গম্ভীর আগে কখনো দেখিনি। চুমুক না দিয়েই পেয়ালাটা নামিয়ে রাখলাম।

অজিত বললে, "তোকে যা বলতে যাচ্ছি তার সূত্রপাত ইউরোপের প্রবাস-জীবনে। কয়েকদিনের ছুটিতে বেড়াতে গেছি সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটি শহরে। আমাদের দেশের মফস্বল শহরের মতোই কতকটা। আধুনিকতার ছোঁয়াচ তখনো তেমন লাগেনি। আমার মতো অনেকেই ছুটি কাটাতে যায় সেখানে। শহরের মোটা-মুটি সবরকম সুখ-সুবিধে পাওয়া যায়, অথচ নিরিবিলি। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, মোটরগাড়ির ভিড় নেই। সব মিলিয়ে বেশ উপভোগ্য জায়গা। এখানেই সোনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। চমৎকার হাসি-খুশি চটপটে মেয়ে। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। যে হোটেলে আমি উঠেছিলাম তার কাছেই একটা বড় স্টেশনারি দোকানে সেলসগার্ল। বিদেশী বলেই বোধহয় প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে সোনিয়া ভারী সদয় ব্যবহার করে-ছিল। তখনো ওদেশের ভাষাটা ততটা রপ্ত হয়নি। দুদিনেই সোনিয়া আমার অভি-ভাবকের স্থান দখল করলে। ছুটি হলেই ও আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতো। আজ এখানে কাল ওখানে, এইভাবে কয়েকদিনের ভেতরেই সমস্ত শহরটা দেখা হয়ে গেল। যখন আমার ফেরার সময় হয়ে এল, দেখলাম সোনিয়াকে ছাড়া আমার চলবে না। রেজিস্ট্রি অফিসে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

কর্মস্থলে যখন ফিরে এলাম, বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই অবাক। বিশেষ করে সমরেশ। সোনিয়ার প্রশংসায় সবাই পঞ্চ-মুখ। সুন্দরী, সুগৃহিণী তদুপরি সুরসিকা। খাইয়ে-দাইয়ে রঙ্গ-রসিকতা করে দুদিনেই সকলকে সোনিয়া বশ করে ফেললে। আমাকে তো ও ব্যবহার করত পুতুলের মতো। এটা পরো, ওটা খাও, ঠাণ্ডা লাগিয়ো না, এবার ঘুমুতে চলো— অষ্টপ্রহর এই লেগেই ছিল। ওর উপর একান্তভাবে নির্ভর করে আমারও খুব ভালো, খুব আরাম লাগছিল। সোনিয়ার এক বাতিক ছিল জোর করে আমাকে খাওয়ানো। নিজে সে খেতো কি খেত না, কিন্তু আমাকে খাইয়েই যেন ওর খিদে মিটত। খেতে খেতে শেষটায় আমার বিরক্তি ধরে যেত। কিন্তু ও তাতে কর্ণপাত করত না।

আমার যে এনিমিয়া হয়েছে ডাক্তারের রিপোর্ট না দেখলে টের পেতাম কিনা সন্দেহ। শরীরে কোনো গ্লানি নেই, দুর্বলতা নেই। তবুও কোম্পানীর নিয়ম-মাফিক বছরে প্রত্যেক কর্মীকে একবার ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়ে রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। আমার রিপোর্টে ডাক্তার লিখলেন, "বেশ এনিমিক কণ্ডিশন। পুষ্টির অভাব হচ্ছে।" প্রথমটা রিপোর্ট পড়ে আমি একটু অবাকই হলাম। ডাক্তারকে জিগ্যেস করলাম তাঁর কোনো ভুল হয়নি তো। ডাক্তার নির্ঘাৎ মর্মান্তিক চটেছিলেন, শুধু বললেন, ইউরোপের ডাক্তারেরা ভুল রিপোর্ট দেয় না।

সোনিয়া কিন্তু শুনে বিশেষ বিচলিত হল না। ও বললে, "ভুল সকলেরই হতে পারে। ইউরোপের ডাক্তার বলেই যে তার সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য, একথা আমি মানি না। কিন্তু তুমি তো কিছু খেতে দিলেই আজ-কাল চটে ওঠো। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া না করলে যে এনিমিয়া হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।"

মনের ভেতরে একটা খটকা থেকে গেল। সোনিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে ভালোমন্দ খাওয়াতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে চলল ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধপত্র। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। গলার কাছে কেমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। চোখ মেলতেই দেখি সোনিয়া আমার গলার উপর মুখ রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমি জেগেছি টের পেতেই ও চট করে উঠে বসল। কী যেন এক অজানা আশঙ্কায় আমিও উঠে বসে বাতিটা জ্বালালাম। সোনিয়া হাত দিয়ে তার মুখ আড়াল করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই যা দেখবার আমি দেখে নিয়েছি। ওর দুকষ বেয়ে সরু রক্তের ধারা।

সোনিয়া আমাকে বোঝালে। ইউ-রোপের অনেক জায়গায়, বিশেষত ওদের দেশে এখনো অনেক পরিবারে প্রাচীন-কালের সেই রক্তশোষণ বা 'ভ্যাম্পায়ারিজম'-এর ধারা বংশ পরম্পরায় চলে এসেছে। প্রকাশ্যে নয়, একান্ত গোপনেই। অনেক প্রাচীন তান্ত্রিক আচারের মতো এর অস্তিত্ব এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এই কদাচারে একবার যে অভ্যস্ত হয়েছে তার আর মুক্তি নেই। আমরণ তাকে অন্যের রক্তশোষণ করেই জীবনধারণ করে যেতে হবে। সভ্যজগতে একে কদাচার হিসেবেই গণ্য করা হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাদের কাছে এটা অতি স্বাভাবিক লেনদেনের সম্পর্ক ছাড়া আর কিছু নয়। আমি তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে, সেবা-যত্ন করে, এমন কি নিজের বরাদ্দ খাবারটুকু পর্যন্ত দিয়ে সুস্থ সবল রাখছি। প্রতিদানে আমি তোমার কাছ থেকে সামান্য রক্ত নিজের জীবনধারণের জন্য নিচ্ছি। এতে অন্যায়টা কোথায়? আহার্য মানুষে অন্য জীবের রক্ত-মাংস যখন বিনা দ্বিধায় খেতে পারে, তখন মানুষের রক্তপানেই বা বাধা কী? দেখা গেছে যে এতে দুপক্ষের কারুরই তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। যে রক্তপান করে তার আর অন্য কোনো খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আর অপরপক্ষের নিয়মিত

অধিকার ভালবাসার প্রকাশ পেলেও, মাঝখানে কোনো রোগ বা প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না।

সোনিয়াকে বাস্তবিকই আমি মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। তা না হলে এই বাঁধনের পরও আরো এক বছর ধরে বাক একটা দিনও আমরা একসঙ্গে থাকতে পারতাম না। এই একটা বছর যেমন একটা মেয়ের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। দিনের বেলা সোনিয়া আমার প্রাণধারণের রসদ জোগাত, রাতে আমি জোগাই ওর প্রাণরসধারা। প্রথম প্রথম অন্তরাত্মা ঘৃণায় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হয়ে উঠত এই অমানবীয় ব্যবস্থায়। কিন্তু ধীরে ধীরে আমিও যেন সব কিছু মেনে নিয়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে তখন বেশ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

মহরখানেক বাদে একটু খোলা আলো-হাওয়ার জন্য মনটা হাঁপিয়ে উঠল। সোনিয়াকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে সেই ছোট্ট শহরটিতে বেড়াতে গেলাম। পুরোনো জায়গায় গিয়ে সোনিয়াও খুব খুশি। বিশেষ করে এই জায়গা আমাদের দুজনের অনেক সুখস্মৃতি বহন করছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বেশি রাতে একদিন দুজনে বেড়াতে বেরোলাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের প্রিয় একটি ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। চাঁদের আলোয় নদীর ওপরে ছোট সাঁকোটা সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুজনে তার ওপরে এসে দাঁড়ালাম। অজো

মৌচাকের আড্ডায় (বাঁদিক থেকে দাঁড়ানো) ডাঃ রায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং (সিঁড়িতে বসে বাঁদিক থেকে) ভবানী মুখোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায় এবং নির্মল সরকার

শরৎচন্দ্রের প্রথম পুস্তক 'বড়দিদি' কেউ ছাপতে উৎসাহবোধ করেন নি, সেটি ছাপিয়েছিলেন 'যমুনা' সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল পণ করেই। তারপর শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশক, সুধীরচন্দ্র সরকার। এমন কি যে 'চরিত্রহীন' নিয়ে সেকালে আন্দোলন চলে-ছিল, সেই গ্রন্থটিও সুধীরচন্দ্রই প্রকাশ করেছিলেন। হেমেন্দ্রকুমার লিখেছেন—

"প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সুধীরই বইয়ের বাজারে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে দেখা দেন। শরৎচন্দ্রের সর্বশেষ পুস্তক 'ছেলেবেলার গল্প'ও তাঁরই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত শরৎচন্দ্রের যখন অনটন হয়েছিল, সুধীরই তাঁকে অর্থসাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।" সুধীরচন্দ্র প্রকাশক হিসাবে তাই অনন্য। তাঁর কাছে সাহিত্যরসিক মানুষ মাত্রেরই ঋণের আর সীমা নেই।

'কল্লোলে'র সাহিত্যিকদের গোড়ার দিকের রচনাবলীও এমনই আগ্রহভরে সুধীরচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, প্রবোধকুমার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগেই তাঁদের গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করেছেন সুধীর-চন্দ্র সরকার। আবার অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথমতম গ্রন্থ 'পথে ও প্রবাসে'র প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার।

ইদানীং জনপ্রিয় পুস্তকের প্রকাশের জন্যই বেশীর ভাগ পুস্তকব্যবসায়ী লালায়িত। কিন্তু সুধীরচন্দ্র জনপ্রিয়তার মোহে আকৃষ্ট হতেন না। ১৩২০ সালে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী 'যমুনা' মাসিকপত্রে প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তখন সুধীরচন্দ্র আগ্রহ প্রকাশ করে তা প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন। এই বিষয়ে 'নারীর মূল্যে'র প্রথম সংস্করণে সুধীরচন্দ্র যে 'নিবেদন' লিখে-ছিলেন তা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে একথা উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সংস্করণ-গুলিতেই এই 'নিবেদন' অংশ বর্জিত, কিন্তু 'নিবেদনটি'র ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। সুধীরচন্দ্র লিখেছিলেন :

১৩২০ সালের 'যমুনা' মাসিকপত্রে নারীর মূল্য প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা এগুলি গ্রন্থাকারে ছাপিবার অনুমতি লাভ করি।

কি মনে করিয়া যে শরৎবাবু তখন আত্মগোপন করিয়া শ্রীমতী অনিলা দেবীর ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে তিনিই জানেন, তবে, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এমনি আরও কয়েকটি 'মূল্য' লিখিয়া 'স্বদেশ মূল্য' নাম দিয়া পরে যখন গ্রন্থ ছাপা হইবে, তখন তাহা নিজের নামেই বাহির করিবেন। তারপরে, এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাটিয়া গেল, না লিখিলেন তিনি আর কোন মূল্য, না হইতে পাইল 'স্বদেশ মূল্য' ছাপা। আমরা গিয়া বলি প্রথায়, আপনার স্বদেশ মূল্য আপনারই থাক, পারেন ত আগামী জন্মে লিখিবেন, কিন্তু যে 'মূল্য' আপনাকে হাতে পাইয়াছি, তাহার সদ্ব্যবহার করি,— তিনি বলেন, না হে, থাক, এ আর বই করিয়া কাজ নাই। কিন্তু কারণ কিছুই বলেন না। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল। অথচ, তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও নয়,—আমাদের শুধু মনে হয়, তখনকার কালে নারীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে কথা কহিতে শিখে নাই বলিয়াই এ কাজ তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কাগজে কাগজে এঁদের দাবী-দাওয়ার প্রাবল্য ও পরাক্রান্ত নিষ্ফলতা দর্শন করিয়া এই বৃদ্ধ গ্রন্থকার ভয় পাইয়া গেছেন। তবে, এ কেবল আমাদের অনুমান, সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে, বই ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইহা প্রকাশ করিয়া ভাল করিয়াছি কি মন্দ করিয়াছি তাহা পাঠক বলিতে পারেন, আমাদের ত মনে হয় মন্দ করি নাই। কিন্তু ইহার যত কিছু দায়িত্ব সে আমাদেরই। ইতি—

বিনীত

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

গ্রন্থটি অতিশয় সুরুচিসম্পন্নভাবে মুদ্রিত এবং সুধীরচন্দ্রের বন্ধু শিল্পী চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা তিনটি প্রচ্ছদ শোভিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

সুধীরচন্দ্র নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের রচিত দুঃসাহসিক উপন্যাসগুলিরও প্রকাশক। 'শুভা', 'পাপের ছাপ', 'বিপর্যয়' প্রভৃতি উপন্যাস সেই যুগে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

আবার, অন্যান্য প্রকাশক অনেক ইতি-হাসের বিভিন্ন পর্বের মূল্যবান ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থাবলী, [illegible] গ্রন্থাবলী, [illegible], [illegible] ও

নতুন বই

সাজাহান নাটক — দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত। সাহিত্য প্রকাশ। ৪৭।২, রমেশচন্দ্র মজুমদার লেন, হাওড়া। দাম পাঁচ টাকা।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মপ্রকাশের পূর্বেই গিরিশচন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অমৃতলাল বসু - ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথও নাটক লিখতে শুরু করে দিয়েছেন। ঐতিহাসিক এবং যুগোপযোগী নাটক রচনা ক্ষেত্রে এঁদের থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বতন্ত্র-লোকের অধিবাসী। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অতুলনীয় কাব্যধর্মী ভাষা আর অসামান্য হাসির গান। সামাজিক নাটক অপেক্ষা ঐতিহাসিক নাটকের রোমান্টিক জগৎ দ্বিজেন্দ্রলালকে এনে দিয়েছে অধিকতর সার্থকতা। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের মধ্যে আধুনিক জীবন-সমস্যা রূপায়িত করেছেন। সেই সঙ্গে আছে আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষায় অভিনবত্ব। বহু প্রহসন খন্ডকাব্য ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয়তা ঘটেছিল সব থেকে বেশী। তাঁর শ্রেষ্ঠ পাঁচটি ঐতিহাসিক নাটক হোল রাণা প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন, সাজাহান। এর মধ্যে সাজাহান সব থেকে বেশী মঞ্চসফল এবং জনপ্রিয় নাটক। ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রেখে নাটক রচনায় তৎপর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বন্দী সাজাহান এবং তার চারপুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে সংগ্রামের কাহিনীই নাটকে বর্ণনা করা হয়েছে। সাজাহান, দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ জাহানারা চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এসেছে নাট্যকারের সৃষ্টি দিলদার চরিত্রটি। এই জীবন্ত চরিত্রগুলির সঙ্গে আরো বহু পার্শ্বচরিত্র। সর্বমিলিয়ে এই নাটকখানি মুঘলযুগের এক আশ্চর্য জীবনচিত্র তুলে ধরে এযুগের মানুষের সামনে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই ঐতিহাসিক নাটকটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায়। একশ চৌত্রিশ পাতার সুদীর্ঘ ভূমিকায় বহু মূল্যবান তথ্যের আলোকে নাটকটির চুলচেরা বিচার করেছেন তিনি। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সাজাহানের সার্থকতা বিচার করে সম্পাদক দেখিয়েছেন 'সাজাহান' শুধু সার্থক ঐতিহাসিক নাটকই নয়, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর 'ঐতিহাসিক' মূল্যও অনস্বীকার্য। সাজাহান চরিত্রের ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী সমালোচকদের মন্তব্যকে তিনি নতুন আলোকে বিচার করেছেন। সাজাহান নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ রায় দেখিয়েছেন, 'শেক্সপীয়রের চরিত্রসৃষ্টি', অন্তর্দ্বন্দ্ব, ট্র্যাজেডি-পরিকল্পনা ও জীবনরহস্যের গভীরে অবতরণ করার নাটকীয় কৌশল তিনি এই নাটকে অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে তিনি শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার সার্থকতা দেখিয়েছেন। শেক্সপীয়র বাঙালী নাট্যকারদের প্রিয়তম শিল্পী হলেও দ্বিজেন্দ্রলালের আগে আর কোনো নাট্যকার শেক্সপীয়রীয় রীতি এমন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। 'সাজাহান' নাটকে সংগীত প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনায় নাট্যকারের অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব সম্পাদক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভা, সাজাহানের নায়কচরিত্র, সংলাপ, গঠন-রীতি, অসংগতি আলোচনা, অতি-নাটকীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কেও সম্পাদকের আলোচনা মূল্যবান। ডঃ রায় যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকটি সম্পাদনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে সুধীজনের স্বীকৃতি পাবে।

●

দাজাল (কৌতুক নাটিকা) হরিপদ বসু। পান্ডুলিপি প্রকাশনী ৫২ নং সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত। দাম: দেড় টাকা।

একটা কথা আছে "এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।" ইদানীংকালে বাংলার নাট্য সাহিত্য বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করেছে তার নাট্য সাধনার মাধ্যমে। আলোচ্য নাটিকাখানি তার যে সেই প্রয়াসেরই সোপান তাতে কোন সন্দেহই নেই। বিশেষ করে হাসির নাটক আমাদের দেশে খুবই কম—সেদিক দিয়ে নাটিকাখানি তার কৌলিন্য বজায় রেখেছে।

হরিপদ বসু একজন প্রবীণ নাট্যকার। তাঁর শৌখীন নাট্যান্দোলন একদিন সমাদর লাভ করেছিল। এ নাটিকাখানিতেও সে পরিচয় আছে বলেই আমাদের মনে হয়। একটি মাত্র নারী চরিত্র আনন্দ ও কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র এবং সুন্দর একটি গল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই 'দাজাল' নাটিকাখানি। এর প্রতিটি চরিত্রই যেন জীবন্ত। পড়তে পড়তে মনে হয়, এসব চরিত্র যেন সকলেরই খুব সুপরিচিত। কাজেই নাটিকাখানি সুধী পাঠক ও নাট্যানুরাগী মহলে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির পরিচায়ক।

কেমন ভেঙেছে বুক : জগদীশচন্দ্র দাশ। প্রকাশক: অলকা-মিত্রা পাবলিকেশনস্, ১৭/১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪, দাম—৩·২৫।

বেপথুমতী : সন্তোষ দাশ। প্রকাশক : অলকা-মিত্রা পাবলিকেশনস্, ১৭/১, সারপেনটাইন লেন, কলকাতা-১৪। দাম —৩·২৫।

দুটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থদ্বয়ের নাম 'কেমন ভেঙেছে বুক' এবং 'বেপথুমতী'। গ্রন্থকার যথাক্রমে জগদীশচন্দ্র দাশ এবং সন্তোষ দাশ।

'কেমন ভেঙেছে বুক' কাব্যগ্রন্থ ছোট্ট-দুটি চিত্রধর্মী। কবির সহজেকোমল হৃদয়ানুভূতির স্পষ্ট ছাপও অবশ্য কোন কোন কবিতায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু নতুন আঙ্গিক তিনি আমদানি করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তা সফল হয়নি। এজন্য কবির আরো চর্চার প্রয়োজন এবং নিজের শক্তির উপলব্ধিতেই অবশ্য এই চর্চা সার্থকতা লাভ করবে।

সন্তোষ দাশের 'বেপথুমতী' কাব্যগ্রন্থে একটা সহজ সাবলীলতা আছে যা সহজে পাঠককে ধরে রাখে। অযথা চটক সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর নেই। কয়েকটি কবিতায় তিনি বেশ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। চিত্রময়, মিঠে ভাবটি তাঁর কবিতায় বেশ ফুটেছে।

উভয় গ্রন্থের ছাপা ও প্রচ্ছদ মনোহর।

●

বিচিত্র বাঘ শিকার : (অলোচনা)—উমা-প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা-বার। দাম তিন টাকা।

শিকার নিয়ে বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। আর শিকার সম্পর্কে বাঙালীর অনীহা কোনকালেই প্রকাশ পায়নি। বহু বিখ্যাত বাঙালী শিকারী দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছেন। তাদের জীবনের বিচিত্র কাহিনী বহু গ্রন্থে মনোরম চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু শিকারের [illegible] [illegible] বা [illegible] [illegible] সম্পর্কে বিশেষ কোন উপযোগী গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এদিকে লক্ষ্য রেখে উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বিচিত্র বাঘ শিকার গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

বিচিত্র বাঘ শিকার গ্রন্থে শিকার সম্পর্কে নানান কাহিনী যেমন আছে [illegible] শিকারের [illegible] বাঘ শিকার সম্পর্কে [illegible] [illegible] আছে। বাঙলা দেশের কোন [illegible] কি ধরনের বাঘ পাওয়া যায় এবং [illegible] অন্যান্য তথ্য ও [illegible] [illegible] সম্পর্কিত গ্রন্থের মত আছে। যাঁরা শিকার [illegible] এবং যাঁরা শিকার কাহিনী পড়তে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে বইখানি সমাদর পাবে।

জঁ জনে

নন্দদুলাল দে

একালের একজন বহু বিতর্কিত ফরাসী লেখকের জীবন ও সাহিত্য-কৃতির বিবরণ। তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ও কালাপাহাড়ী মতের জন্যে জঁ জনে আজ বিশ্ববিশ্রুত।

সনাতন জীবনধারায় যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের কাছে জঁ জনে সমাজের আবর্জনা। তাঁর নাম যেন সমকামী, প্রতারক ও তস্করের প্রতিশব্দ। ফ্রাঁসোয়া ভীয়ঁ, বোদলেয়র, মারকি দ সাদ্ তাঁর ক্লিন্ন জীবনবেদের পাশে ম্লান হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে কারাবাসে অন্যান্য কয়েদীদের ঘোর আপত্তি। অথচ জঁ পল সার্ত্র, জঁ ককতো প্রভৃতি প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁকে বন্ধুপদে বরণ করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।

বলা বাহুল্য জঁ জনের মত ও পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কোন বিশেষ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, কোন বিশেষ মতবাদেরও তিনি ধার ধারেন না—অস্তিত্ববাদ, তার নিয়মাবলী বা নির্দেশের উপরও তিনি আদৌ নির্ভরশীল নন। তথাপি সার্ত্র-এর সাহিত্যিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ সাহিত্যিক যা হতে পারেন এবং তাঁর যা হওয়া উচিত তিনি সার্ত্র-এর কাছে একটি চাক্ষুস উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সার্ত্র-এর সকল প্রত্যাশা জনের মধ্যে দিয়ে এমনভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে তাঁকে অস্তিত্ববাদ-পরিবারের এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় বলে ধরে নিতে পারা যায়।

সমাজের চোখে জনে বে-পরোয়া, বে-আইনী : কি লেখক হিসাবে, কি মানুষ হিসাবে—সবই তাঁর সমাজছাড়া সৃষ্টিছাড়া। শৈশবেই তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছেন সমাজের অতি নীচু স্তরে। এই অচেনা অজানা পৃথিবীতে শিশু প্রথম চোখ মেলে দেখে তার বাবা-মাকে। তাদের স্নেহের ছায়াতেই ধীরে ধীরে সে বড় হয়। জনে সে জগতের আস্বাদ কোনদিনই পাননি। তাঁর জন্ম-তারিখ সঠিক করে কেউ বলতে পারেন না; কেউ বলেন ১৯০৭ সনে, আবার কেউ বা বলেন ১৯১০ সনে প্যারীতে জন্ম। পিতৃমাতৃ-পরিচয়ও আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। মা তাঁকে সরকারী অনাথ আশ্রমে ছেড়ে চলে যান। পরে মধ্যফ্রান্সের মরভাঁ পাহাড়তলীর অঞ্চলে এক কৃষক পরিবারে তিনি মানুষ হন। দশ বৎসর বয়সে হঠাৎ তাঁর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি দেখা দেওয়ায় তাঁকে এক শোধন-প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। একের পর এক এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানে অবস্থানের পর, প্রধানত বিদেশীদের নিয়ে গঠিত সেনাদলে তিনি নাম লেখান। সেখান থেকে পালাতেও তাঁর বেশী দেরী হল না। তারপর ইওরোপে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কখন ভিক্ষা করেন, কখন চুরি। বহুবার জেল খাটলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নত্র্-দাম্ দে ফ্লর' প্যারীর দক্ষিণ উপকণ্ঠে ফ্রানের কারাগারে বসেই লেখা। ১৯৪৮ সালে চুরির অপরাধে তিনি সাজা পেলেন। চুরির জন্য এই নিয়ে তাঁর দশবার সাজা হল। স্থির হল ফরাসী উপনিবেশগুলির মধ্যে কোন একটিতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হবে। কিন্তু কয়েকজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকের মধ্যস্থতায় তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই ঘটনার পর তিনি সাহিত্যকর্ম থেকে অবসর নেবেন বলে ঠিক করেন। কেন, কিছুকাল চুপচাপ থাকবার পর ১৯৫৬-র আবার লে নেগ্র্ নিয়ে নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। বর্তমানে ইনি সাতখানি নাটক সমন্বয়ে একটি নাটক-চক্র রচনায় রত। এদের প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আবার সবগুলি জুড়িয়ে নাটক-চক্রটি অখণ্ড।

জনে সম্পর্কে এই স্বল্প-পরিচয়ই আমাদের মনে যুগপৎ কৌতূহল ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। যিনি কোনদিন বাঁধাধরা পথে চলেন না, বাপমায়ের স্নেহের আস্বাদ পেলেন না, যাঁর নিয়মতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষা বলতে যাঁর কিছুই নেই, কারাগারে যাঁর জীবন কাটে, তিনি সাহিত্যসৃষ্টির এই বিস্ময়কর ক্ষমতা পেলেন কোথা থেকে? বিরল হলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে এমন প্রতিভা কালেভদ্রে জন্মায়। কিন্তু তাদের জন্ম থাকে এবং জীবনও কাটে থাকে। তাই তাদের চেনা যায় না। হয়তো জনের পরিচয়ও অজ্ঞাত থেকে যেতো, যদি না সার্ত্র তাঁর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসায় আলোকবর্তিকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন—সমাজের একেবারে নীচের তলায় যাদের বাস তাদের জীবন কেমন, কি সম্ভাবনা আছে তাদের মধ্যে এই প্রশ্ন নিয়ে। 'সাঁতে' নামক কারাগারে জনে যখন বন্দী তখনই তিনি লিখছেন স্থির করেন। এই জেলেই হঠাৎ সার্ত্র একদিন তাঁর লেখা পড়তে পড়তে বিস্মিত হন। এরই সূত্র ধরে সার্ত্র ও জনের প্রথম পরিচয় ঘটে। জনে সার্ত্র-এরই আবিষ্কার।

জনে সম্পর্কে মনে পড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর (১৪৩১) ফরাসী গীতিকবি ফ্রাঁসোয়া ভীয়ঁকে। জনে এবং ভীয়ঁ দুজনেই পিতৃমাতৃ-পরিচয় [illegible]। ভীয়ঁকে যিনি পালন করেছিলেন সেই পুরোহিতের নামটিই তিনি নিয়েছিলেন। ছেলেবেলা

কেরিওলা ॥

মৃগাঙ্ক রায়

কী নিয়ে চলেছো তুমি, কেরিওলা! রোজ ভোর হলে পূবের
মাঠ ভেঙে এসে পশ্চিমের অস্তে চলে যাও। পায়ে শিশিরের হিম
আর ছেঁড়া ঘাসের পাতা জড়িয়ে থাকে, ভোরের হাওয়া লেগে
সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা পাথর। কেরিওলা, কি নিয়ে চলেছো তুমি?
পুতুল? চুড়ি হাতে বাতাসীবাদ্, ঘোমটা-টানা বৌ,
ঘরবাড়ি, মাচার পুরুষ্ট-লাউ, আতাফল,
লবঙ্গ-বেঁধানো খিলিপান?

কেরিওলা, রোজ আমরা তোমার ডাক শুনি—গর্ভিণী মায়েরা
যেমন জোয়ারের ডাক শোনে। অথচ তুমি আমাদের ডাক
শুনতে পাও না। প্রাচীন গাছের শিশির চোঁয়ানো গুঁড়ির মতো
তোমার শরীর পূবের মাঠ ভেঙে পশ্চিমের অস্তে যায় আর আমরা
তোমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকি আকাশে দু হাত
তুলে একদল উলঙ্গ শিশু।।

অমরতা শিক্ষা নেব বলে ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

আরও এক বৃক্ষ আছে, ওইখানে চন্দনের
কোমল সুবাসে। আলোর পাখিরা আসে, বাসা বাঁধে
তার স্নিগ্ধ বুকের ডালে।
একাকী নির্জন হলে
আমি সেই পাখিদের চোখে চোখ রাখি।
কেননা, পাতার শব্দে তারা নাকি শুনে গেছে
ভাগীরথী নদীর সঙ্গীত।
শিকড়ে পৌঁছার আগে আমি আজ সে সংবাদ জেনে নিতে চাই।

ইচ্ছে হয়, মাঝে মাঝে শহরের কোলাহল ছুঁড়ে ফেলে দিই
ইচ্ছে হয়, আমি সেই বৃক্ষের সমীপে চলে যাই
চন্দনের গন্ধ দিয়ে সারা অঙ্গ ঢাকি।
কিংবা সেই বৃক্ষটাকে
রোদ্দুরের দিকে তুলে ধরি।
বস্তুতঃ আমার ইচ্ছে আমারই রক্তের মূল্যে কেনা।

কেননা, আমি যে সেই বৃক্ষটাকে করেছি নির্মাণ।
আমার রক্তের ঘ্রাণ
আর দেহে বক্ষের মতন।
রাজনীতির প্রতিবেশে আমি রোজ শুনি তার গান।

এ শহর আর কোনো আজ রাতে [illegible]
[illegible] যাই মেনে
শূন্যতায় বুক বেঁধে শাবে।
আমি সেই সর্বনাশ জেনে [illegible] স্বপ্নে দেখেছি তাই—
চন্দনবৃক্ষের কাছে চিরদিনের অমরতা শিক্ষা নেব বলে।

নির্বিচারে গ্রহণ করবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

লেখক 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায়' বৃন্দাবন দাসের মাতা ও শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবী সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা খন্ডন করেছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চরিত্র-মাহাত্ম্য তিনি উদ্ঘাটন করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন, পরম ভাগবত বৃন্দাবন দাসের 'দৈন্য ছিল অকপট এবং ভক্তি হইতে উত্থিত'। শ্রীচৈতন্যভাগবতের উপাদান সম্পর্কেও তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গৌর-চরিতকার মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কবি কর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্ ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকম্ প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে তুলনামূলক আলোচনা তিনি করেছেন, তা অতিশয় সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অসম্পূর্ণতা ও ঐতিহাসিক ক্রমহীনতা সত্ত্বেও যে এই চরিতগ্রন্থখানির অসাধারণ মহিমা আছে, লেখক তারও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বৃন্দাবন দাসের চরিতগ্রন্থখানির মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও ভাষাগত দুর্বোধ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনে তিনি অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছেন। লেখক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, বৃন্দাবন দাস নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে যে যুগপৎ ভক্তভাব ও রাধাভাব প্রকট হয়েছিল, বৃন্দাবন দাসের চরিতগ্রন্থে তারও পরিচয় আছে। 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের ভূমিকায়' সুপন্ডিত লেখক দেখিয়েছেন,—শ্রীগৌরাঙ্গে যে সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সুদীপ্ত হয়েছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে তার ভূরি প্রমাণ রয়েছে এবং 'শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহ-কালে একমাত্র শ্রীরাধার মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবসমূহ সুদ্দীপ্ত হয়, অন্য কোনও গোপীতে নহে, শ্রীকৃষ্ণে তো কখনই নহে'। সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গ যে রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা ইঙ্গিতে বলেছেন। এখানেই কবিরাজ গোস্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অনুভূতিতে ঐক্য দেখা যায়। আবার শ্রীল বৃন্দাবন দাস অনেক স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পর্কে বৈকুণ্ঠনাথ, নারায়ণ, বৈকুণ্ঠনায়ক, ত্রিদশের রায় প্রভৃতি উক্তি করেছেন।

গৌরতত্ত্ব-সম্পর্কে যে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে পূর্ববর্তী চরিতকার মুরারি গুপ্ত ও পরবর্তী চরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, সুপন্ডিত লেখক তা প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শুধু গৌরতত্ত্ব নয়, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, অদ্বৈত-তত্ত্ব, গদাধর-তত্ত্ব প্রভৃতিও যে নানাভাবে বিবৃত হয়েছে, সুপন্ডিত লেখক তাও নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয়-কলহের কৌতুককর বিবরণও লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন —শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত,

'এক মূর্তি, দুই ভাগ, কৃষ্ণের লীলায়'।

অন্যত্র—

'প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু, দুই জন।
প্রীত বই অপ্রীত নাহি কোন ক্ষণ।।
তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা'।।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রয়োজন-তত্ত্ব, সম্বন্ধ-তত্ত্ব ও অভিধেয়-তত্ত্বেরও প্রসঙ্গ আছে এবং এ সমস্ত বিষয়ে যে বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, লেখক তাও প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় লিখেছেন—

'গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদের মধ্যে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই—মহাপ্রভুর উক্তিতে ভক্তগণের উক্তিতে এবং নিজের উক্তিতে—সর্বপ্রথমে জানাইয়াছেন যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়ের ধাম এবং উভয়ের সেবাপ্রাপ্তিই জীবের কাম্য, ভগবৎ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য, সেই সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রেমই হইতেছে একান্তভাবে প্রয়োজনীয় বস্তু এবং সেই প্রেমলাভের নিমিত্ত গৌরকৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সাধনভক্তিরই, অর্থাৎ রাগানুগা মার্গের সাধনভক্তিরই অনুষ্ঠান কর্তব্য। বাস্তবিক, বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সিদ্ধান্ত এই—

(ক) শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ উভয়েই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, উভয়েই উপাস্য, এবং উভয়ের ধাম ও সেবাপ্রাপ্তিই সাধকের কাম্য।

(খ) শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনার যোগেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর্তব্য।

(গ) প্রয়োজন-তত্ত্ব প্রেমলাভের জন্যই সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান জীবের কর্তব্য।

(ঘ) কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবাই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য।

(ঙ) সেবার বাসনাই প্রেমভক্তি বা শুদ্ধাভক্তি।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় পরম শ্রদ্ধাপূত চিত্তে গৌরলক্ষ্মী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে এ সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় নিবদ্ধ বৈষ্ণব শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে তিনি আমাদের নানা সুধা পরিবেশন করেছেন। শ্রীচৈতন্যলীলা-সম্পর্কে লোচন দাসের গ্রন্থ যে প্রামাণিক নয়, এও তিনি প্রদর্শন করেছেন। সকলেই জানেন, শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ও তদীয় শিষ্য লোচন দাস ঠাকুরের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের তাত্ত্বিক দৃষ্টিগত পার্থক্য আছে। তথাপি লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের কাব্য-মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সুপন্ডিত লেখক লোচন দাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিলে তাঁর আলোচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

এরপর লেখক 'গৌরাঙ্গ' ও 'জগতের প্রতি শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষা' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। লোকশিক্ষক বৃন্দাবন দাস যে তাঁর চরিত-গ্রন্থে জনসাধারণকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন, তাঁর দীন অন্তরের নিষ্কপটতা প্রদর্শন করেছেন, সাধু-নিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দার কুফল ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির অপকারিতার কথা কীর্তন করেছেন, লেখক নানা উদ্ধৃতির যোগে তা প্রতিপন্ন করেছেন। বৃন্দাবন দাসের কয়েকটি উক্তি আমাদের সকলেরই স্মরণীয়, যেমন—

(১) বিষ্ণুভক্তি নিরবধি অক্ষয় অব্যয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সব সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণশক্তি।।

(২) সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত—চারি বেদে কয়।

(৩) অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্বথা।

(৪) কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণব-সেবা বড়।
ভাগবত-আদি সর্বশাস্ত্রে কৈল দৃঢ়।।

(৫) যে-তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম
কেনে নহে।
তথাপিহ সর্বোত্তম—সর্বশাস্ত্রে কহে।।

(৬) পড়ে কেন লোক?
কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায়
কি করে?
ইত্যাদি।
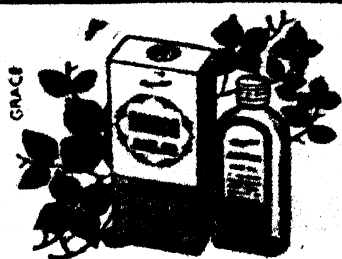
ঐতিহাসিক মূল্য

শ্রীল বৃন্দাবন দাসের চরিত-গ্রন্থ ভক্তমণ্ডলীর সমাদৃত এবং [illegible]

তান্ত্রিক সাধনার চরম লক্ষ্য যে শিবত্বলাভের মাধ্যমে ব্রহ্মানন্দলাভ, এ কথা তো তন্ত্রশাস্ত্রে পদেঃ পদেঃ উক্ত হয়েছে। অবশ্য, বৈষ্ণব সাধকরা 'নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয়।' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন—

'মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান'।।

কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছা যে বেদবিরুদ্ধ, এমন কথা কবিরাজ গোস্বামী কোথাও বলেন নি। আচার্য শঙ্কর আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্থাপক, ভারতবর্ষে যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তখন তিনি আবির্ভূত হয়ে সমগ্র দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেন, সুতরাং তাঁর প্রবর্তিত মায়াবাদ বেদবিরুদ্ধ নয়।

বাংলার তান্ত্রিক সাধকদের বৈশিষ্ট্য তাঁদের মাতৃভাবাসক্তি। যিনি 'করালবদনী ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা', তিনি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকদের চোখে আমাদেরই ঘরের স্নেহময়ী, মমতাময়ী জননী। বাংলার শক্তিসাধকরা ভক্তিধর্মের বিরোধী নন। শ্রীরামপ্রসাদের গানেও দেখা যায়, তিনি 'চিনি হইতে চাহেন নাই', অর্থাৎ, সাযুজ্য মুক্তি চান নি, তিনি চিনির মাধুর্য আস্বাদন করতে চেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করে বলেছেন—মা, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'।

বৈষ্ণব সাধকরা বলেন—রাগানুগা ভক্তির দ্বারা মানুষ ভাগবতী তনু লাভ করতে পারে। শাক্ত সাধকরাও বলেন—'দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ', স্বয়ং দেবতা হয়ে দেবতার আরাধনা করবে, বহিঃপূজার পূর্বে মানসপূজা করবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি প্রাণায়াম প্রভৃতির দ্বারা সাধককে দেবশরীরতা লাভ করতে হবে। সাধনার দ্বারা শুদ্ধ দেহ বা সিদ্ধ দেহ লাভ করাই—তান্ত্রিক সাধকদের চরম লক্ষ্য।

তান্ত্রিক সাধকরাও বৈষ্ণব সাধকদের ন্যায় জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সর্ব মানবকে আশার বাণী শুনিয়েছেন। তন্ত্রশাস্ত্র তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের জন্য যথাক্রমে পশ্বাচার বীরাচার ও দিব্যভাবের সাধনার বিধান দিয়েছেন। শ্রীরামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকরা যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ তন্ত্র সম্বন্ধে 'কয়েক জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের' উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রেখেও আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, তিনি এই সব 'বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের' এমন সব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যা তাঁর মতের অনুকূল। তন্ত্র সম্পর্কে স্বামী জগদীশ্বরানন্দের সিদ্ধান্ত তিনি মানেন না, নিজেও তাঁর 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর' ভূমিকা থেকে [illegible] উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি এই সব উক্তি থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন—'দশ মহাবিদ্যা দেবী তান্ত্রিকগণের কল্পিত, সুতরাং মহাবিদ্যার উপাসনা বেদবিরুদ্ধ। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যাঁহারা কালী, তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে বা পরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, শ্রীরামপ্রসাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই।'

লেখকের কয়েকটি বিভ্রান্তিকর উক্তি উদ্ধৃত হল—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন * বেদবিরুদ্ধ লৌকিক তন্ত্রমতের তান্ত্রিক সাধক। শ্রীরামপ্রসাদও তদ্রূপই ছিলেন। কালী ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে তাঁদের উক্তিগুলিও বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্রেরই কথা। অন্যত্র লেখক বলছেন—

'বেদানুসারে তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষলাভ হইতে পারে না'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের কথিত পরতত্ত্ব বেদকথিত পরতত্ত্ব নহেন'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের কথিত জীবতত্ত্বও বেদবিরুদ্ধ'।

অন্যত্র—

'তান্ত্রিকদের সাধনে * ভক্তির কোনও স্থান নাই'।

* 'তন্ত্রমতের সাধনে মোক্ষপ্রাপ্তি অসম্ভব'।

অন্যত্র—

বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রমতাবলম্বীরা পাষণ্ড।

অন্যত্র—

'যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম, যাহা বেদবহির্ভূত বা বেদবিরুদ্ধ, তাহা অধর্ম, ধর্মের সহিত অধর্মের সমন্বয় অসম্ভব।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন বাংলা দেশে তান্ত্রিক ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল। এখনও হয়তো অনেক যোগী ও তান্ত্রিক সাধক সাধন-পথে অগ্রসর হয়ে কিছু বিভূতি বা অলৌকিক শক্তি লাভ করেন এবং অর্থ বা যশের লোভে চরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন। কিন্তু কালক্রমে সকল ধর্মেরই তো গ্লানি ঘটে থাকে। এখনও অনেক তথাকথিত বৈষ্ণব আছেন যাঁরা 'সহজিয়া' প্রভৃতি উপধর্মের প্রভাবে মহাপ্রভু-প্রবর্তিত বিশুদ্ধ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। সুতরাং শাক্ততন্ত্র যে বেদ-বিরোধী, এ কথা প্রমাণিত হয় না।

এক হিসাবে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মও তান্ত্রিক ধর্মেরই এক বিশিষ্ট রূপ, বৈষ্ণবের নিকট শ্রীরাধাতন্ত্র পরম আদরণীয় গ্রন্থ। বাংলার বৈষ্ণব ধর্মে যুগলের উপাসনা আছে, এতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য। যে 'ব্রহ্মসংহিতা' শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ থেকে এ দেশে আনয়ন করেছেন, তার প্রথম কয়েকটি শ্লোকেও যন্ত্রযোগে উপাসনার কথা আছে। শ্রীজীব গোস্বামী গ্রন্থখানির যে টীকা রচনা করেছেন, তাতে শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁর উদার মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রুতিবোধের টীকাকার [illegible] বলেছেন—'প্রাতঃ [illegible], [illegible] [illegible] তান্ত্রিকী। [illegible] [illegible], [illegible] তান্ত্রিক-[illegible]'।

এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, প্রামাণ্য তন্ত্রসমূহ বেদসম্মত এবং ভ্রমপ্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-রহিত, কারণ, তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদান্তিক সাধনার লক্ষ্য অভিন্ন, আর সে লক্ষ্য—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি।

এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে, যাঁরা পর্বতশীর্ষে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিকট যেমন নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডের উচ্চতা ও নীচতার পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনই, যাঁরা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের নিকট ধর্মমতের পার্থক্য লুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই শ্রীরামপ্রসাদ, রামদুলাল, গোবিন্দ চৌধুরী প্রভৃতি শক্তিসাধকরা কখনও শ্যাম শ্যামায় অভেদ কখনও আপন উপাস্য দেবীর সঙ্গে মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধার অভিন্নতা উপলব্ধি করেছেন, আর তান্ত্রিক সাধক নিত্যকৃষ্ণ রাসলীলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও হরিসংকীর্তনের মহিমা প্রচার করেছেন। আবার, শক্তি সাধনা-সম্পর্কে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-বংশাবতংস প্রভুপাদ নিত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি যে কত উদার ছিল, সে কথাও সকলেই জানেন।

তথাপি, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন যে পরম পণ্ডিত শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের সুবিস্তৃত ভূমিকা ও সুবিশাল টীকা রচনা করে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হয়েছেন।

পরিশেষে আমরা 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' 'নিতাই-করুণা-কল্লোলিনী' টীকা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। 'পরমভাগবত' রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় খণ্ডে খণ্ডে শ্রীচৈতন্যভাগবতের যে বিশদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেছেন (আদি খণ্ড মধ্যখণ্ড (১ম), মধ্যখণ্ড (২য়) ও অন্ত্যখণ্ড), তা এই চরিতগ্রন্থের উপর নতুন আলোকপাত করেছে—আমাদের মনে হয়েছে, 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' একটি মণিমঞ্জুষা, কিন্তু এত দুর্লভ রত্ন যে এর ভিতর লুক্কায়িত ছিল, আমরা তা জানতাম না। যে সকল ভক্ত বৈষ্ণব এই চরিতগ্রন্থখানি 'স্বাধ্যায় ব্রত' হিসাবে নিত্য পাঠ করবেন, তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্য [illegible] মালার মত এই টীকাখানিকে চিরদিন কণ্ঠে ধারণ করবেন।*

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত—রাধাগোবিন্দ নাথ আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, ১ম ও ২য়, অন্ত্যখণ্ড। সাধনা-প্রকাশনী [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]।

বুশ্বাকে আমি লিখেছিলাম, মা, শাড়ীটা আপনি সাবধানে রেখে দিন। সময় মত আপনার মেমবোকে নিয়ে ওখানে গিয়েই শাড়ীটা গ্রহণ করব।

মেমসাহেবকে নিয়ে আরো কত কি কাণ্ডই হয়। তাইতো এবার ভেবেছি তোমাদের সঙ্গে এমন করে আর লুকোচুরি না খেলে পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলব। তাছাড়া আমার জীবনের এইসব ইতিহাস না জানলে তোমার পক্ষে ঘটকালি করাও অসুবিধা হতে পারে। তোমাকে সব কিছু লেখার আগে নৈতিক দিক থেকে মেমসাহেবের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। কিন্তু আজ সে এতদূরে চলে গেছে যে, তার অনুমতি আদায় করা প্রায় অসম্ভব। আর হ্যাঁ, তাছাড়া ঠিকানাটাও ঠিক আমার জানা নেই।

তুমি আর খোকনদা আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিও।

—তোমাদের বাচ্চু

(২)

ওয়েস্টার্ন কোর্ট
জনপথ
নিউদিল্লী

সেজোবৌদি,

মনে হলো তুমি আমার চিঠি পড়ে ঘাবড়ে গেছ। গত চিঠিতে তো বিশেষ কিছুই লিখি নি, এমন কি গৌরচন্দ্রিকাও পূর্ণ হয় নি। সুতরাং এখনই নার্ভাস হবার কি আছে? তাছাড়া তুমি না মেয়ে? অন্যের প্রেমের ব্যাপারে তোমাদের তো আগ্রহের শেষ নেই। শিক্ষিতাই হোক, আর অশিক্ষিতাই হোক, প্রেমপত্র সেন্সর করতে মেয়েরা তো শিরোমণি! ইউনিভার্সিটির জীবনে তো দেখেছি লেকচার শোনা, কফি-হাউসে আড্ডা দেবার মত অন্যদের প্রেমপত্র হাত করাও প্রায় সব মেয়েদের নিত্যকার কাজ ছিল। পাড়াগাঁয়ে যাও, সেখানেও দেখবে পাড়ুল-বৌদির চিঠি অন্নপূর্ণা-ঠাকুমাকে না পড়ে কিছুতেই ছাড়বে না। শুনেছি স্কুল-কলেজে মেয়েদের চিঠি এলে দিদিমণিরা একবার চোখ না বুলিয়ে ছাড়েন না। ছাত্রীদের অভিভাবকত্ব করবার অছিলায় চুরি করে প্রেমপত্র পড়াকে কিছুটা আইন-সম্মত করা যেতে পারে মাত্র; কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

তাছাড়া প্রেমের কাহিনী জানতে মেয়েদের অরুচি? কলিকালে না জানি আরো কত কি দেখব, শুনব। মেয়ের বিয়ে হলে মা পর্যন্ত জানতে চান, হ্যাঁরে খুকী, জামাই আদর-টাদর করেছিল তো? হাজার হোক মা তো! ঠিক খোলাখুলিভাবে সব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। তাই ঘুরিয়ে আদর-টাদর করার কথা তোলেন। বাসরঘর তো মাসি-খুড়ি থেকে দিদিদের ভীড়ে গিজ-গিজ করে।

আর সেই সতী-সাবিত্রী সীতা-দময়ন্তী থেকে সুরু করে আমাদের মা-মাসিরা যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজা বহন করে এনেছেন, শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যে ঐতিহ্যের ধারা অম্লান রেখেছেন, আজ তুমি সেই মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে, আমি ভাবতে পারিনি।

সর্বোপরি আমি যখন নিজে স্বেচ্ছায় তোমাকে সব কথা বলছি, তখন তোমার লজ্জা বা সঙ্কোচের কি কারণ থাকতে পারে? আর তোমাকে ছাড়া আমার এই ইতিহাস কাকে জানাব বলতে পারো? তুমি আমার থেকে মাত্র এক বছরের সিনিয়র হলেও তোমাকে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই ভালবেসেছি, শ্রদ্ধা করেছি। খোকনদার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা যেদিন থেকে আবিষ্কার করেছি সেই দিন থেকেই তুমি আমার সেজোবৌদি হলে। ছাত্রজীবনের সেই শেষ দিনগুলিতে এবং আমার কর্মজীবনের প্রথম অধ্যায়ে তুমি আর খোকনদা যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছ, সহানুভূতি জানিয়েছ, তা ভুলবার নয়। তাইতো জীবনের সমস্ত সুখে-দুঃখে প্রথমেই মনে পড়ে তোমাকেই।

মেমসাহেবের ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই জানাই নি। তোমরা অবশ্য কিছু কিছু আঁচ করেছিলে কিন্তু খুব বেশী জানতে পারনি। ভগবানের দয়ায় আমি নিজে চলে আসায় নাটকটা খুব বেশী জমে উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে আর খোকনদাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। তাই কিছু জানাই নি। কিন্তু আর বেশী কথা ঠিক হবে না। তুমি যখন আমার বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ তখন সব কিছু না জানান অন্যায় হবে।

আর শুধু মেমসাহেবের কথাই নয়, আমার জীবনে যেসব মেয়েরা এসেছে, তাদের সবার কথাই তোমাকে লিখব। সব কিছু তোমাকে জানাব। কিছু লুকোব না। আর কিছু না হোক, তোমাকে প্রমাণ করে এইটুকু দেখিয়ে দিতে পারি যে, আমার এই কাহিনী কোনদিন খুব প্রাচীন হবে না। যদি ব্যাপারটাকে একটু এগিয়ে দেখো তাহলে হয়ত অন্য হতে এই কাহিনীকে পারে।

সুতরাং হে আমার সেজোবৌদি! তৈরী হও। হে আমার খোকনদার প্রাণের প্রিয় দেবেশ দেবের সেজো খোকনদা তোমার ছাত্রসম দেবরের প্রতি কৃপা করে, তার ইচ্ছা পূর্ণ কর।

—তোমাদের বাচ্চু,

(ক্রমশ)

ভিয়েৎনাম

গত ৩১ জানুয়ারী থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গেরিলারা যে ব্যাপক লড়াই আরম্ভ করেছে তার জের এখনো শেষ হয়নি। ১২ ফেব্রুয়ারী ভিয়েৎকংরা দাবী করে যে, উত্তরাঞ্চলের হুয়ে শহরটি এখন সম্পূর্ণরূপে তাদের দখলে।

হুয়ের যুদ্ধে উত্তর ভিয়েৎনামের নিয়মিত সৈন্যরাও অংশ নিচ্ছে। ১৫ ফেব্রুয়ারী মার্কিন সপ্তম নৌবহরের যুদ্ধজাহাজ থেকে হুয়ে শহরের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়, কিন্তু ভিয়েৎকং ও হ্যানয়ের সৈন্যদের সরানো যায়নি। শহরে এখনো ভিয়েৎকং পতাকা উড়ছে।

প্রকাশ, এই প্রচণ্ড সংঘর্ষে শহরের প্রায় ৮০ শতাংশই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দেয়াল-ঘেরা, প্রাচীন, ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় শত-শত মৃতদেহ ছড়িয়ে রয়েছে।

এদিকে উত্তর-পশ্চিম কোনায় খে-সানে মার্কিন ঘাঁটির ওপর ভিয়েৎকংদের সামরিক চাপ দিনের পর দিন বাড়ছে। গেরিলারা ক্রমেই ঘাঁটি ঘিরে এগিয়ে আসছে। খে-সানের ভৌগোলিক অবস্থা অনেকটা দিয়েন বিয়েনফুর মত। চারদিকে পাহাড়, মাঝখানে উপত্যকা। ঐ উপত্যকাতেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটির অবস্থান। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি থেকে কেবল উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যদের প্রবেশের পথের ওপরেই নজর রাখা হত না, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উত্তরাঞ্চলের প্রতিরক্ষারও আয়োজন চালানো হত। তার ওপর এই ঘাঁটি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গুরুত্বপূর্ণ ৯নং সড়কের ধারে অবস্থিত হওয়ায় (যে সড়ক উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে চলে গিয়েছে) এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি খে-সানের ঘাঁটি ভিয়েৎকংদের দখলে চলে যায় তাহলে তারা কেবল উত্তরের একটা ব্যাপক অংশের ওপরেই আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না, গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক দখল করে আমেরিকাকে গভীর ভাবে বিপন্ন করে তুলবে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ খে-সানের জন্য চিন্তিত। প্রকাশ, প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর জয়েন্ট চীফস অব স্টাফদের দিয়ে এই মর্মে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নিয়েছেন যে, খে-সান রক্ষা করা সম্ভব।

ইতিমধ্যে সায়গনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও গেরিলাদের প্রাধান্য রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছে।

ভিয়েৎকংদের এই অভ্যুত্থান মোকাবিলা আমেরিকা শেষ পর্যন্ত কিভাবে করবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে আপাততঃ মার্কিন কর্তৃপক্ষ আরো সাড়ে ১০ হাজার সৈন্য ভিয়েৎনামে পাঠিয়েছেন।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

দিল্লী সম্মেলনে মতভেদ

নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলনে প্রাথমিক বক্তৃতা দিতে উঠে দেশগুলির প্রতিনিধিরা দরিদ্র দেশগুলির জন্য অনেক অশ্রু বিসর্জন করেছেন। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে ধনবৈষম্য কমা দূরে থাকুক ক্রমশঃ বাড়ছে, একথা একজনের পর একজন প্রতিনিধি উঠে মামুলী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এখন প্রায় এক পক্ষকালব্যাপী পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের পর যখন সম্মেলনের বিভিন্ন কমিটিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে, ধনী দেশগুলি দরিদ্র দেশগুলির প্রতি যে মৌখিক সহানুভূতি দেখাচ্ছে সেই সহানুভূতিকে কোন নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধার আকারে রূপ দেওয়ার ইচ্ছা উন্নত দেশগুলির নেই।

প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকেই এই সন্দেহ প্রকাশ করে রেখেছে যে, এই সম্মেলনে সাধারণ আলোচনা হতে পারে; কিন্তু সেখানে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় উন্কটাড সম্মেলনের আলোচনা কতকগুলি মামুলী আপ্তবাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়েই শেষ হতে পারে, একথা অনুমান করেই সম্মেলনের সম্পাদক ডাঃ রাউল প্রেবিসকে বলেছিলেন, এই সম্মেলনে আন্তর্জাতিক ধন-বৈষম্য দূর করার বাস্তব ব্যবস্থা না হলে মানুষে বিপদ দেখা দিতে পারে।

আমেরিকার পক্ষ থেকে আর একটা যুক্তি তুলে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনশালী দুটি দেশ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দুটিই এখন গভীর আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে, সুতরাং ঠিক এই সময়ে পৃথিবীর সম্পন্ন দেশগুলি তাদের অসচ্ছল প্রতিবেশীদের জন্য খুব বেশী কিছু করতে পারবে এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্মেলনের উদ্বোধন করে ঠিকই বলেছেন, "আমাদের দেশগুলির সামনে প্রশ্নটা এই নয় যে, তারা উন্নতিশীল দেশগুলিকে সাহায্য করতে পারবে কিনা, আসল প্রশ্নটা হচ্ছে, উন্নতিশীল দেশগুলিকে তারা সাহায্য না দিয়ে পারবে কিনা।"

"৭৭ রাষ্ট্রের" আলজিয়ার্স সম্মেলনে পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির দাবী-দাওয়ার যে সনদ গৃহীত হয়েছিল তার মধ্যে একটি দফায় বলা হয়েছিল যে, উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে পণ্য আমদানী করার ব্যাপারে উন্নত দেশগুলিকে শুল্ক ছাড় দিতে হবে এবং এই ব্যাপারে কোন বৈষম্য করা চলবে না। নীতিগতভাবে এই প্রস্তাব সব উন্নত দেশই মেনে নিলেও কমিটি পর্যায়ে যখন এই প্রস্তাবের তাৎপর্য আলোচনা করা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে, উন্নত দেশগুলি নানা আপত্তি তুলে প্রস্তাবটি বানচাল করার চেষ্টা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এই ধরনের কোন ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার আগে কোন কোন উন্নত দেশ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি উন্নতিশীল দেশে নিজেদের উৎপন্ন রপ্তানী করার ব্যাপারে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে সেই প্রথা রদ হওয়া দরকার। কমনওয়েলথের দেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের এবং আফ্রিকার কতকগুলি প্রাক্তন উপনিবেশের সঙ্গে ফ্রান্সের এই ধরনের দ্বিপাক্ষিক বিশেষ সুবিধা'-র ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের নিজেদের বাজারের মধ্যে পণ্য আমদানী-রপ্তানীর ব্যাপারে পারস্পরিক সুবিধা ভোগ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য হচ্ছে, যে বিশেষ দেশে উন্নতিশীল দেশগুলির পণ্যের অবাধ প্রবেশের অধিকার দেবে তাহলে উন্নতিশীল দেশগুলিতে তার নিজের উৎপন্ন পণ্য বিক্রীর সম্পর্কে অন্যান্য উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তাদের সমান অধিকার দিতে হবে। কিন্তু কমিটির আলোচনায় ফ্রান্সের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, তাঁরা এই বিশেষ অধিকার ছাড়তে প্রস্তুত নন।

আরও একটি বিতর্ক উঠেছে, উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে কোন কোন ধরনের পণ্য আমদানীর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে তা নিয়ে। পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলি সাধারণভাবে কৃষিপণ্য আমদানীর ব্যাপারে শুল্ক ছাড় দিতে প্রস্তুত আছে; কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্য থেকে প্রস্তুত বা আধা-প্রস্তুত পণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজী নয়।

স্বভাবত এইসব জটিল প্রশ্ন উঠতে থাকায় ইতোমধ্যেই চিন্তিত প্রতিনিধি ভারতের প্রতিনিধি বলেছেন, আমরা শুধু কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেখতে পাচ্ছি। উন্নত দেশগুলি তাদের নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থের অধিকার ছাড়া কি রকম আগ্রহী তা এখন বোঝা যাচ্ছে না?

হিন্দুধর্মে পদ্মের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিষ্ণু আর সূর্যমূর্তির হাতে আয়ুধরূপে পদ্মকেই কল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া সৌরমণ্ডলের চারিদিকে বিরাজমান পশুপাখী, নদী, পাহাড়, মানুষের জগতের কল্পনাও নানা লোকশিল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খকে পূজো করার রেওয়াজ আছে। দক্ষিণ ভারতে কোনও কোনও সম্প্রদায় শঙ্খকে এখনও দেবতা-জ্ঞানে পূজো করে থাকেন। বিশ্ব-সংসারের প্রতীক হিসাবে পদ্ম এবং কেন্দ্রীভূত সূর্য কল্পনা ও তাকে ঘিরে শঙ্খলতা ও জীবজগত এই ভাবেই নকসায় ধরা হয়ে থাকে। শঙ্খলতা শাদা, অতএব শুভ্রতা বা শুচিতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ব্রত-উদ্‌যাপন এবং সেই ব্রত-উদ্‌যাপনের মাধ্যম হিসাবে আলপনার ব্যবহার সেই পুরনো বিশ্বাস বা ম্যাজিকের থিয়োরীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যা চাই তাকে যেন পাই আর সেই পাওয়ার জন্য যে-চেষ্টা তাই এই বিশ্বাস বা ম্যাজিক থিয়োরীর মূল কথা। আলপনার পূর্ণকুম্ভ সংকেতের পূর্ণকুম্ভ হয়ে উঠুক তারই জন্য ব্রত-কথা। তারই জন্য আলপনা। ঘটে, পটে, সরায়, বাড়ীর মেঝের, উঠোনে, রোয়াকে সেই ইচ্ছারই অভিব্যক্তি আলপনার মাধ্যমে। উত্তর ভারতে ঘরের দেওয়ালে আলপনা দেওয়ার মধ্যেও এই ইচ্ছারই প্রকাশ। আধিভৌতিক শক্তির সাধনা ও তার সাহায্যে সিদ্ধিলাভ এইটিই আসল কথা। লোক-শিল্পের উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসারও এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছে।

ব্রতের বিকল্প বা তার কাছাকাছি অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপনের রেওয়াজ সারা ভারতবর্ষে থাকলেও, বাঙলার মেয়েদের ব্রত-পালনের একটা নিজস্ব রীতি-প্রকৃতি আছে যা আর কোথাও বড়ো একটা চোখে পড়ে না। লক্ষ্মীর পুজো, সরস্বতীর পুজোতে আলপনা দেওয়া আজও অনেক বাড়ীতেই চোখে পড়ে। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এছাড়াও বাঙলাদেশে খুবই জনপ্রিয় ছিল তোষলা ব্রত। তোষলা ব্রত ছিল জমিকে আরও বেশী শস্য দেওয়ার জন্য উপাসনা করার মতো। বসুধারা ব্রত পালন করে মেঘরাজাকে ডাকা হোত, তাকে বলা হোত এবার যেন ভালো বৃষ্টি হয়। ক্ষেতে ক্ষেতে যেন ডাক দিয়ে যায় নবীন ধানের আমন্ত্রণ। সূর্যের উদ্দেশে উদ্‌যাপন করা হোত মাঘমণ্ডল ব্রত। এই-সব ব্রতে কোনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিত পূজারীর প্রয়োজন ছিল না। চালের গুঁড়োকে ভেজানো পিটুলী গোলা দিয়েই আলপনা আঁকা হয়ে থাকে শুধু হাতে আঙুলের সাহায্যে। একটুকরো ন্যাকড়ার মধ্যে কখনো কিছু অপেক্ষাকৃত ঘন পিটুলী জড়িয়ে নেওয়া হয়ে থাকে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য। বাঙলাদেশে এককালে যে চালের প্রাচুর্য ছিল, আলপনা-শিল্পে পিটুলী-গোলার ব্যবহার থেকেই তা বোঝা যায়। দুধে-ভাতে বাঙালীর সন্তান যে একদিন বড়ো হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় বাঙালী পুরনারীর ভাদুলী-ব্রতের কল্পনায়। ভাদুলী ব্রত পালন করা হোত গোয়াল-ভরা গরুর কামনায়।

সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের চেহারা গেছে পাল্টিয়ে। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ সর্বোপরি দেশভাগের ধাক্কাতে বাঙালীর অর্থনৈতিক বনিয়াদ গেছে ভেঙে আর সেই সঙ্গে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেও এসেছে একটা বিরাট পরিবর্তন। ব্রতগুলি [illegible] পুরনো মানুষের মতো আর [illegible] করে আসে না। অনেক [illegible] পায় যায়।

ব্রতগুলির সংরক্ষণে [illegible] শিল্পকে নতুন মর্যাদায় [illegible] একটা চেষ্টা [illegible] প্রাতঃস্মরণীয় [illegible] অবনীন্দ্রনাথের [illegible] গুলির একটি [illegible] ১৯১৭ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা স্কুল অব আর্টসে আলিম্পন-শিল্পকে অবশ্যকরণীয় পাঠ্যসূচীর অঙ্গীভূত করা হয়। এপ্রসঙ্গে নন্দলাল বসুর নামও কম নয়। ১৯১৯ সালে শান্তি-নিকেতনে প্রধানত নন্দলালের চেষ্টাতেই কলাভবনে নিয়মিতভাবে আলপনা শেখানোর কাজ শুরু হয়। এ-কাজে সুকুমারী দেবীর নামও অবশ্য স্মরণীয়। নন্দলালের চিন্তাকে তিনিই কর্মে রূপায়িত করেছেন বলা চলে। আলপনা-শিল্পের পুনরুদ্ধারে শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চসজ্জায় আলপনা আঁকা হতে থাকে। আলপনার রূপকে মোটাইকে বলা নন্দলাল বসুর হলকর্ষণের চিত্রটি শান্তিনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বৃক্ষরোপণ, হল-কর্ষণ, শিল্পোৎসব, জন্মোৎসব, এমনকি সমাবর্তন উৎসবেও আলপনাকে নানাভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনে হয়েছে। তাই আলপনা সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধানে এই প্রসঙ্গটুকুর উত্থাপনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়েছে বলে মনে হতে পারে।

আলপনার প্রচলিত ডিজাইনগুলিকে আজকাল অবশ্য নানাভাবে দেখেছি বাটিকের কাজে, কাপড়-ছাপাইয়ের নকসার কাজে, এম্ব্রয়ডারীর কাজে, নকশী-কাঁথার কাজে ইত্যাদিতে লাগাতে দেখা যাচ্ছে। (সঙ্গে প্রকাশিত আলপনার ডিজাইনগুলি ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অব আর্ট অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডিক্রাফটসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

নামের সার্থকতা

"আমাদের কাজ তো শুধু কলকাতায় নয় যে, আপনাকে সব দেখাতে পারব—" বললেন শ্রীমতী সুশীলা সিংহী। "আমাদের কাজ চলছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে। এই ঘরে," বলে ৮ নং গভর্নমেন্ট প্লেসের অফিসঘরখানির চারদিকটা দেখিয়ে বললেন, "এইসব দেয়ালজোড়া পুরোনো আলমারীতে সেই কাজের নিদর্শন কিছু-কিছু আছে।" বলছিলেন মহিলা সেবা-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী সুশীলা সিংহী।

তাঁর নির্দেশ মত একটি মেয়ে এসে আলমারীর মধ্যে রাখা খদ্দরের নানা রকম ডিজাইন করা বেডকভার ও চাদর, ব্লাউজপীস, ঝাড়ন, টেবিলম্যাট, খেশ প্রভৃতি আমাকে দেখাতে লাগল।

"এছাড়া খদ্দরের শাড়ি ও ধুতিও আমরা অল্প-স্বল্প করে থাকি" তিনি বলে চললেন, "আর এ সবই বিক্রীর জন্যে। আমাদের মেয়েরাই এ সমস্ত বানিয়েছে। দশটা থেকে পাঁচটা হল আমাদের প্রতিটি কেন্দ্রের বিক্রীর জন্য নির্ধারিত সময়।"

ইতিমধ্যে সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী অশোকা গুপ্তা এসে পড়লেন। তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—"পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু আমাদের এই সমিতি স্থাপন করেন রাজভবনের মধ্যেই। সেটা ছিল ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস, দেশবিভাগের অব্যবহিতকাল পরেই। তিনি এটার নাম দিলেন, 'ইমারজেন্সী রিলিফ কমিটি'। সব রকম দুর্ঘটনায় সাহায্য করাই হচ্ছে আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। তবে সেই সময় দেশ-বিভাগের ফলে যেসব উদ্বাস্তু দলে-দলে এসে পশ্চিমবঙ্গে জড়ো হচ্ছিল, প্রধানতঃ তাদের মুখ চেয়েই তিনি এই সমিতি আরম্ভ করেন।"

উদ্বাস্তুদের জন্য এরা যা করেছে তা প্রায় অসাধ্য সাধন। শুধু যে কলিকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এরা শিক্ষার্থী মেয়েদের রাজভবনে নিয়ে আসত তা নয়, সুদূর মফস্বলে ও গ্রামেও এরা চরকা নিয়ে গিয়েছে। উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প ও কলোনীতে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের দিয়ে সুতো কাটিয়ে হাজার হাজার পরিবারকে এরা অনশন ও ভিক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

এখনও এরা সেই কাজই করছে, যদিও 'উদ্বাস্তু' বলে এখন আলাদা কোন সংজ্ঞা নেই। এখন এদের লক্ষ্য—সমস্ত দুঃস্থ নারী-সমাজ। গ্রামে গ্রামে [illegible] বহু দিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। 'তাহেরপুর' বলে একটি গ্রামে, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত ৬০ নিয়ে একটি শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনা হয়। বিভিন্ন গ্রাম ও ক্যাম্প থেকে চরকায় কাটা সুতো নিয়ে মেয়েরা এখানে জমায়েৎ হতে লাগল, সেই সুতোর কাপড় বোনবার জন্য। এই কেন্দ্রের অধিকাংশই ছিল শিক্ষার্থী ক্যাম্প। মেয়েদের থাকা-খাওয়ার সমস্ত খরচ ও দুপুরের খাওয়ার সব ভার ছিল 'সমিতির' উপর।

'রাজভবন' থেকে একটু দূরে যখন 'সমিতির' পুনর্স্থাপন হল, তখন সেখানেও তাঁত বসান হল। ১৯৬০ সাল থেকে এদের জন্য একটি 'ডে হোম'এর সূত্রপাত হল। এখানে এবং গৌহাটিতে যেসব মেয়ে শিক্ষা নিতে বা কাজ করতে আসে, তাদের এখনও আসা-খাওয়ার সব খরচ যোগান হয়। দুপুরের পুরো খাওয়ার পরিবর্তে এখন অবশ্য জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে।

বছরের পর বছর বহু মেয়েই এই দুটি তাঁত ও চরকার কেন্দ্র থেকে সুতো কাটা ও বস্ত্র বোনায় শিক্ষালাভ

একজন বিশিষ্ট মহিলা

বৃটিশ ভেটেরিনারি অ্যাসোসিয়েশনের ইতিহাসে ১৯৬৭ সাল একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ১০০ বছরের জীবনে এইবারই প্রথম একজন মহিলা পুরুষকে হটিয়ে তার প্রেসিডেন্ট হলেন।

এই বিশিষ্ট মহিলা হলেন মিস জোন ব্রাঙ্কার, ইনি ১৯৩৭ সালে লন্ডনের রয়েল ভেটেরিনারি কলেজ থেকে পাশ করে বের হন এবং এখন ইনি বার্মিংহামের কাছে সাটন কোল্ডফিল্ডে বাস করছেন। এখানে তিনি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন। পশু চিকিৎসাই তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত।

বয়স এখন তাঁর পঞ্চাশের কোঠায়, কিন্তু উৎসাহে এখনও ভাঁটা পড়ে নি। একজন অল্প বয়সী মেয়ের মতই তিনি চটপট কাজ করতে পারেন। অ্যাসোসিয়েশনের এই নির্বাচনে তিনি আদৌ বিস্মিত হন নি। তিনি বলেন: 'অ্যাসোসিয়েশনের কাজ চালাবার মত অত সময় দিতে পারে, এমন মেয়ে কোথায়? থাকলেও খুবই অল্প। এই জন্যই প্রেসিডেন্ট হবার মত মেয়ে খুঁজে বের করা আগে সম্ভব হয় নি। কোন সংস্কার এর মূলে নেই।' বৃটেনে পশু-চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় ৭০০০। এর মধ্যে মহিলা চিকিৎসকের সংখ্যা হল ৬৯৫। সংখ্যাটা কম নয়, মিস ব্রাঙ্কার বলেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অল্প বয়স্কা এবং সকলেই প্রায় পারিবারিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত, সেজন্য প্র্যাকটিসে পুরো সময় দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় মাত্র ১৯৫ জন পুরো সময়ের প্র্যাকটিসের সুযোগ পেয়েছেন।

মিস ব্রাঙ্কার প্রথম দিকে পাঁচ বছর একজন প্রবীণ চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে কাজ করেন, ১৯৫২ সালের পরে পশু-চিকিৎসক হিসাবে তাঁর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বৃটেনে মহিলা পশু-চিকিৎসকদের জন্য আলাদা যে সংস্থা গড়ে ওঠে তিনি তার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাছাড়া বহু ছোটখাট সমিতির সঙ্গে তিনি যুক্ত।

পশু-চিকিৎসাবিদ্যার পাঁচ বছরের কোর্সটি শেষ করে মেয়েরা নানা দিকের কাজ-কর্মের মধ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারে। সাধারণভাবে প্র্যাকটিস করা ছাড়াও তাঁরা গবেষণা অথবা সরকারী কাজকর্ম করতে পারেন। শিক্ষকতাও তাঁদের একটা কাজ হতে পারে। মিস ব্রাঙ্কার মনে করেন যে, বৃটিশ সরকারের ব্যাপকভাবে মৎস্য [illegible] যে প্রস্তাব রয়েছে তা যদি কাজে পরিণত হবার সুযোগ পায় তাহলে বহু পশু-চিকিৎসক, বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসক, গবেষণার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন: 'সবচেয়ে বড় [illegible] পরিকল্পনামূলক শিক্ষা [illegible] আমাদের [illegible] অনেক কিছু [illegible] হবে এবং সেই সঙ্গে [illegible]।'

পুতুল নাচ

পুতুল নাচ পৃথিবীর সব দেশেই একটি প্রাচীন লোকরঞ্জন শিল্প। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামেও এককালে এর ব্যাপকতা কম ছিল না। কিন্তু বর্তমান আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের যুগে এই শিল্পটির মৃত্যুর বোধহয় আর বেশী দেরী নেই। অনেক সাবেকী পুতুল-নাচ ব্যবসায়ীকে আর্থিক অনটনের চাপে পড়ে এই ব্যবসাটি ছাড়তে হয়েছে। শহরে আধুনিক শিক্ষিত শিল্পীমহলে এ নিয়ে কিছু কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে এবং কয়েকজন সাময়িক সাফল্য লাভও করেছেন। কিন্তু পশ্চিমী দেশের মত একে নতুন করে জনপ্রিয় করে তোলা এখনো সম্ভব হয়নি। তবু বর্তমান নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির মধ্যেও যাঁরা একাজে হাত দিয়েছেন শিল্পী শৈল চক্রবর্তী তাঁদের অন্যতম। নিজের পরিবারের লোকজন নিয়েই মাঝে মাঝে ইনি পুতুল নাচ দেখিয়ে থাকেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারী রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ হলে এ'দের "পুতুল-রঙ্গম"-এর একটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। নকুড়-বাবা, লম্বকর্ণ এবং পুতুলীবাঈ নামে তিনটি ছোট্ট নাটিকা পরিবেশন করা হল। প্রথমটি কথামালার সেই বাঘের গলায় হাড় ফোটার গল্প থেকে নেওয়া। দ্বিতীয় কাহিনী এক লোভী প্রতিবেশীকে নিয়ে এবং তৃতীয় রূপকথাটি পুতুল রাজ্যের নৃত্য-বিমুখ রাজকন্যাকে কেমন করে নাচানো হল সেই কাহিনী নিয়ে। পুতুলগুলি খুবই সুন্দর হয়েছিলো। সঙ্গীত পরিবেশনের দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়। তবে মনে হয় কাহিনীর গতি কোন কোন জায়গায় আরেকটু দ্রুত করবার প্রয়োজন আছে। অনুষ্ঠানে জনসমাগম দেখা গেল বিশেষ আশাপ্রদ। হয়ত সুযোগ সুবিধে পেলে পুতুলনাচ আবার ছোটদের মনোরঞ্জনের ক্ষেত্রে নিজের আসন করে নিতে পারবে।

মনের মাধুরী মেশানো বিচিত্র সব দ্রব্য-সম্ভার। এতদিন এসব বস্তুকে নিয়েই আমি স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছি—ধ্যানমেত্রে এদেরই আমি প্রত্যক্ষ করে পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিতে চেয়েছি। রাস্তা দিয়ে সারি সারি লোক হেঁটে চলেছে। তারা যেন সবাই আমার মনের মানুষ। এবার আমি কিরকম একটু দিশাহারা হয়ে পড়লাম। বিস্ময় যেন থৈ হারিয়ে ফেলছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। জিভটা শুকিয়ে আসছে। পায়ের বুড়ো আঙুলটা টনটন করছে। সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এটাই যেন আমার স্বাভাবিক গতিভঙ্গি। পায়ে পায়ে এগুবার চেষ্টা করলাম, কয়েক পা এগিয়েছি এমন সময় হঠাৎ কি হলো। আজব নগরীর (আমার মনে সেটাই সবচেয়ে সত্যি এবং স্বতঃসিদ্ধ) সবাই ছুটতে শুরু করলো। ওরা আমার দিকেই ক্রমে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ ভাবছিলাম বোধহয় দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এবার বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে গেল। দেখলাম সমস্ত নগরীটা একটা বিকটাকার শ্বাপদের চেহারা নিয়ে ছুটে আসছে। তার ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। চোখ দুটি যেন জ্বলন্ত দুটি বিরাট মশাল। নাক দিয়ে হলকা বেরিয়ে আসছে। সামনে যা পড়ছে সব পুড়ছে। লোকগুলো সবাই মরছে। সে দৃশ্য কি বীভৎস। আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেছে। নড়বার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। প্রচণ্ড বেগে পালাতে শুরু করবো তাও পারছি না, এক মুহূর্ত ভাবলাম, তারপরই চোখ মেলে দেখলাম সামনে কেউ কোথাও নেই। আমি একা দাঁড়িয়ে। আর সেই শ্বাপদটা এবার আমাকে শেষ করার জন্যই প্রচণ্ড হুংকারে লেজ ঝাপটাতে ঝাপটাতে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ যেন আমি সম্বিত ফিরে পেলাম—তীব্রভাবে আত্মরক্ষার তাগিদ অনুভব করলাম। সেইরকম বুড়ো আঙুলের উপর ভর করেই ছুটতে শুরু করলাম। আমি যত ছুটছি, জন্তুটাও ততই এগিয়ে আসছে। বাঁচবার শেষ চেষ্টায় প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম। সহযাত্রীর ধাক্কায় ঘুম ভেঙে গেল। কপালে হাত দিয়ে দেখি ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া দেহপ্রাণ জুড়িয়ে দিলো। ট্রেন তখন দ্রুত ছুটে চলেছে। সব কথাগুলো একবার ভাবতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তাল কেটে যাচ্ছে। কিছুতেই সব তথ্যগুলি একসঙ্গে জড়ো করতে পারছি না। ভাবতে ভাবতে আবার চোখ বুজে আসার উপক্রম। ততক্ষণে কিছু কিছু সহযাত্রীর কথাবার্তায় বোঝা গেল কোন একটা স্টেশন নিকটবর্তী। ওরা নেমে যাবার তোড়জোড় করছে। আমিও ভাবলাম স্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘুমের আবেশটা কাটিয়ে নেব। ভাবতে ভাবতেই স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো। সহযাত্রীদের অনেকেই নেমে গেল। কম্পার্টমেন্টটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

আমিও প্লাটফর্মে নেমে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকালাম। লোকজনের ছোটাছুটি একমাত্র দ্রষ্টব্য। কিছুদূর দৃষ্টি চালালে অবশ্য পাহাড়গুলির চিহ্ন নজরে পড়ে। অদূরে গরুর গাড়িটা কিরকম এঁকে-বেঁকে মোড় ঘুরেছে দেখার চেষ্টা করছিলাম। ঘণ্টা পড়লো। ট্রেনে উঠে বসবো এমন সময় একটি পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। ফিরে তাকাতেই দেখি কে একজন আমাদের কামরার দিকেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই ওকে খুব পরিচিত বলে মনে হলো কিন্তু ঠিক মনে করতে পারলাম না। তাই নীরব অভ্যর্থনা ছাড়া আগন্তুককে আর কিছুই জানালো না। ট্রেন চলতে শুরু করলো। একান্ত পরিচিত অথচ সাময়িক বিস্মৃতির ঘোর কিছুতেই কাটছে না। ও এদিকে আমার সম্বন্ধে নানা খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেছে। আমি কিছুই বলতে পারছি না। এবার হয়ত ও আমার মনের ভাব বুঝতে পারে। দেখলাম সাঁওতা ধরা পড়ে গেছি। ও যেন হেসে ফেলে পড়লো। চোখ দুটো গোল গোল করে জিজ্ঞাসা করলো—

'অবাক করলি ভাই। আমাকেও ভুলে গেলি? আমি মীরা রে মীরা।'

'তা কি করে চিনবো বল? তোরা কী রকম বদলেছিস!' আমি দোষ কাটাবার চেষ্টা করি।

'তুইও তো অনেক বদলে গেছিস।'

ফাদার ঘনশ্যামের রোমাঞ্চ কাহিনী (৮)

অদ্রীশ বর্ধন

কেলেংকারিটা ঘটল সোমাবতীর জন্মদিনেই।

অথচ ঐ একটা দিনেই হাসিখুশীর বন্যা বইয়ে দেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর সামন্ত।

সোমাবতী তাঁর একমাত্র মেয়ে। কাজেই সারা বছর তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও জন্মদিনটি এলেই তাক লাগিয়ে দিতেন সোসাইটিকে। ঐশ্বর্যের জৌলুশে চোখে ধাঁধা লাগত অনেক রথীমহারথীর।

বিশেষ কিছু না। প্রতি বছর শুধু একটি মুক্তো তিনি উপহার দিতেন সোমাবতীকে।

প্রাসাদের আলোকসজ্জাও ম্লান হয়ে যেত সেই মুক্তোর কাছে।

দুনিয়ার যেখানে যত হীরে জহরতের মার্কেট আছে, সবাই জানত স্যার ত্রিলোকেশ্বরের মুক্তো কেনার বৃত্তান্ত। বেশি না, শুধু একটি মুক্তো। বছরে একবারই তিনি ঐ একটি মুক্তো কিনতেন। কিন্তু তা হত দুনিয়ার সেরা মুক্তো।

ছোট খাট মার্বেল গুলির মত সেই মুক্তোর চাপা দ্যুতির দিকে তাকিয়ে যে কোনো জাঁদরেল জহুরীও বলে দিতে পারত —সাত সাগরের সেরা পাঁজর বুক চিরে বার করা এ মুক্তো কেনাবেচার তোলার ক্ষমতা রাজা-বাদশা ছাড়া আর কারও নেই।

কিন্তু মেয়ের জন্মদিনে এই বিপুল অর্থই অকাতরে ব্যয় করতেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর সামন্ত।

মুক্তোর সংখ্যা বছরে বছরে বেড়েছে। কুড়িটি জন্মদিন এসেছে তরুণী সোমাবতীর জীবনে—জমেছে কুড়িটি মুক্তো।

সোমাবতীর মুক্তোর মালার নাম শোনেনি সোসাইটিতে হেন লোক নেই। কোত্থেকে যে এমন সাচ্চা মুক্তো জোগাড় করতেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর তা গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল মেয়ে মহলে। অনেক কাগজে মুক্তোর মালার ছবিও ছাপা হয়েছিল।

মুক্তোর মালা অনেকেরই থাকে। কিন্তু এমনটি আর কেউ দেখেনি। যেমন রঙ, তেমনি ওজন। টলটলে অশ্রুর মত নির্মল, রেশমী অলকগুচ্ছের মত হাল্কা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনেক মুক্তোকেও নাকি হার মানিয়ে দিয়েছিল সোমাবতীর মুক্তোর মালা।

কাচ আর ভাঁজকরা মাপকাঠি বেরিয়ে পড়ায় অনেকেরই চোখ কপালে উঠল।

কূটনীতিবিদ সন্মানগুপ্তর পকেট থেকে দুটো পুরিয়া পাওয়া গেল। পুরিয়ার ভেতরে খানিকটা সাদা গুঁড়ো। নিরীহ গুঁড়ো। কিন্তু সন্মানগুপ্তর মুখটা অকস্মাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়ায় অনেকেরই সন্দেহ হল পাউডারটা সম্ভবত কোকেন।

সুকান্ত মিত্র স্যার ত্রিলোকেশ্বরের ভাইপো। তার পকেটে পাওয়া গেল একটা ভূতের গল্পের সংকলন। তার বাবার পকেট থেকে বেরুলো শীলমোহর করার খানিকটা লাল গালা, বৃটিশ আমলের একটা সেকেলে রুপোর টাকা, আর একটা ভাঁজ করা টিস্যু পেপার।

ত্রিলোকেশ্বর-গৃহিণীর খুড়তুতো ভাই শিশুপাল দত্তের পকেট থেকে আবির্ভাব ঘটল ছোট্ট একটা কাঁচির। সেই সঙ্গে গুটিতিনেক লুডোর ছক্কার মত চিনির ডেলা—যেমনটি বড় বড় রেস্তোরাঁয় চা-কফির সঙ্গে দেয়। অতএব শিশুপাল দত্ত নিঃসন্দেহে ক্লেপটোম্যানিয়াক্, অর্থাৎ হাত-টানের অভ্যাস আছে।

কিন্তু সদাশিব পালের পকেট-গহ্বর থেকে সাদা তুলো, তিনটে গুলিসুতো, আর কার্ডের ওপর লাগানো বারোটা সেফটিপিন দেখে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন সকলে, তারপরেই মনে পড়ল সামন্তপ্রাসাদ সাজানোর ভার পড়েছিল সদাশিব পালের ওপরেই। নিউ মার্কেট থেকে আনা ফুলের মালা, স্তবক এবং প্ল্যাস্টিকের আঙুরগুচ্ছ, লতাপাতা এনে কদিন কি খাটুনিটাই না খেটেছে বেচারী সদাশিব।

বিশ্ববসু ভৌমিক মেয়েদের চুলের ফিতে, কমপ্যাক্ট পাউডার আর আধখানা কাঁচা আলু নিয়ে বেড়ায় দেখে অনেকেই মুচকি হাসি করে উঠল। কাঁচুমাচু মুখে বিশ্ব-বসু জানাল, আলুটা নাকি তার বাতের টোটকা। চুলের ফিতে আর কমপ্যাক্ট পাউডার স্ত্রী চিত্রলেখার।

এই গেল পুরুষদের ব্যাপার। মেয়ে-দের কাছ থেকে পাওয়া গেল আরও একদার বস্তু।

যেমন, মিস অহল্যা চ্যাটার্জীর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আবির্ভূত হল একটি খনার বচন, তিনটি চুলের কাঁটা এবং একটি খুকুর ফোটোগ্রাফ।

গন্ধ খুপরিসহ চৈনিক সিগারেট কেস—চিত্রলেখা ভৌমিকের।

তিনটে অ্যাসপিরিন বড়ি—সুকান্তর বোন আভার।

একটি অত্যন্ত গোপনীয় চিঠি—সুকান্তর বান্ধবী দীপা সেনের।

সবশেষে ভ্যানিটিব্যাগ উপুড় করল শিশুপালের বান্ধবী ঝিনকু সান্যাল। সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চমকে উঠল অন্যান্য মেয়েরা। কেননা, ব্যাগের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা মুক্তোর নেকলেস!

চমকে দেওয়ার জন্যেই ব্যাগ উপুড় করেছিল ঝিনকু। কেননা, আঁচড়েই জানা গেল মুক্তোগুলো বিলকুল ঝুটো।

ফলে, পর্বতের মূষিক প্রসবই সার হল।

আসল কণ্ঠহারের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

সোমাবতী তখন করুণ নয়নে তাকাল ফাদার ঘনশ্যামের দিকে।

চড়াই পাখির মত চিঁ-চিঁ করে উঠল ফাদার ঘনশ্যাম। যেন অনেকদিন খেতে পায়নি, এমনি মিনমিনে গলায় বললে, "ঘরগুলো এত বেশি সার্চ করা হয়েছে যে—"

"পায়ের ছাপের বারোটা বেজে গেছে, তাই তো?" বলল সোমাবতী।

"ঠিক ধরেছো। তাহলেও চেষ্টা করে দেখা যাক আর কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা। আপনারা সবাই এ-ঘরেই বসুন। অন্য ঘরগুলোয় আমি এক চক্কর ঘুরে আসি। কিন্তু আরেকজনকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। কে আসবেন?"

স্যার ত্রিলোকেশ্বর এগিয়ে এলেন। বললেন, "আমি।"

শুরু হল বাকী চারটে ঘরে তল্লাসী-পর্ব।

সব ঘরেই সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ফাদার ঘনশ্যাম। চকচকে মেঝের ওপর মাঝে মাঝে বাচ্চা হাতীর মতই হামা-গুড়ি দিল, ড্রইংরুমের মেঝেতে সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল এবং একটা গথিক আলমারীর তলায় চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

আশায় আনন্দে বুকের ধুকপুকোনি বেড়ে গেল স্যার ত্রিলোকেশ্বরের।

অবশেষে আলমারীর তলায় হাত ঢুকিয়ে দিল ঘনশ্যাম। নাগাল পেল না। তাই পকেটের মাপকাঠির ভাঁজ খুলে তাই দিয়ে খানিক কসরৎ করে বার করে আনল জিনিসটা।

দেখে ফুটো বেলুনের মত নিভে চুপসে গেলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

অথচ কেন যে পুঁচকে ঐ জিনিসটার দিকে অমন সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফাদার ঘনশ্যাম, তা বুঝলেন না।

ঘনশ্যাম মণ্ডল বোধকরি তখন স্যার ত্রিলোকেশ্বরের কথা ভুলেই গেছিল। ভুলে গেছিল আশপাশের জগৎ। পলকহীন দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গোটা মনটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল হাতের তালুতে রাখা ছোট্ট বস্তুটির ওপর।

জিনিসটা আর কিছুই নয়—একটা কানা আলপিন।

কিন্তু সাধারণ আলপিন নয়।

খুব ছোট পোকামাকড়কে সেটিং বোর্ডে গেঁথে রাখতে পতঙ্গ বৈজ্ঞানিকরা যে-ধরনের আলপিন ব্যবহার করেন, সেই জিনিস। লম্বায় পৌনে এক ইঞ্চি। চুলের মত সরু। অতীক্ষ্ণ ডগা। মাথাটি টিপির ছোট।

"হলো কী?" হেঁকে বললেন স্যার।

কেতার দলে গিয়ে পৌঁছলেন উঠলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

ফাদার ঘনশ্যাম বেশড়ে বসল মেঝের ওপর। ফলে, মনে হল যেন একটা অতিকায় কোলা ব্যাঙ বসেছে কালো মেঝের ওপর।

বলল, "আপনার গেস্টদের মধ্যে এক জনের পোকামাকড় সংগ্রহ করার শখ আছে।"

"আমার জানা নেই। তাহলেও জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।"

"না-না-না। সর্বনাশ, ও-কাজটি করতে যাবেন না" বলে মাথা হেঁট করে রইল ঘনশ্যাম পাকড়াশি। অন্তরীপানো কালো মেঝের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে রইল কিসের চিন্তায়। চকচকে মেঝের ওপর দেখা গেল তার নিজের মুখের প্রতিফলন—কাঁচের মধ্যে যেন আর একজন ঘনশ্যাম পাকড়াশি পলকহীন চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওপর দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে শব্দ—"সাবাস!"

"সাবাস মানে?" চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

"বাহাদুর বটে মুক্তো চোর। তাই একটু তারিফ করলাম।"

স্থির চোখে তাকালেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

বললেন, "মুক্তো-চোরকে আপনি চেনেন?"

"বিলক্ষণ চিনি।"

"কে সে?"

"এখন বলব না।"

মুখ লাল হয়ে গেল স্যারের।

আরক্ত মুখে বললেন, "মুক্তোগুলো কোথায় আছে, তা কি জানা গেছে?"

"অবশ্যই জানা গেছে।"

"কোথায় আছে?"

"এখন বলব না।"

"তাহলে কি বলবেন, দয়া করে সেটা বলবেন?" বোমার মতই ফেটে পড়লেন স্যার ত্রিলোকেশ্বর।

"শুধু বলব, আজ রাতে এ-ঘর তালা-বন্ধ থাকুক। চাবি রাখুন আপনার কাছে। গেস্টদের আজ রাতে এ-বাড়ীর আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিন—কিন্তু কারো কাছে শুধু একটা কথা বলবেন না।"

"কি কথা?"

"এই আলপিনের কথা।"

"নিকুচি করেছে আপনার আলপিনের। আমি চাই আমার মুক্তোর মালা।"

"পাবেন—কাল সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। মুক্তো চোরকেও দেখবেন—কাল সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে। কিন্তু মনে রাখবেন, ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায়—এ জিনিস পাওয়া গেছে এ-ঘরের মেঝেতে।"

বলে, মেঝেতে ওপর রাখা আলপিনটা সযত্নে আলখাল্লায় গেঁথে রাখল ঘনশ্যাম মণ্ডল।

সেদিন সামন্ত-প্রাসাদের সকলে ঘুমিয়ে কাদা, একা [illegible] অন্ধকারের মধ্যে তখন

বিজ্ঞানের কথা

পৃথিবীতে মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশি কেন?

সারা পৃথিবীতে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ছেলে না মেয়ে, কার সংখ্যা বেশি?—এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা পৃথিবী জুড়ে সমীক্ষা করে দেখেছেন, প্রতি বছর পৃথিবীতে গড়ে একশোজন নবজাতকদের মধ্যে ছেলের জন্মহার হচ্ছে ৫১·৪৬। অর্থাৎ প্রতি বছর পৃথিবীতে মেয়ের চেয়ে ছেলেই জন্মায় বেশি। এইভাবে ছেলেদের সংখ্যা যদি ক্রমশই বেড়ে চলে, তাহলে মানুষের সমাজে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই একজন বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন, 'আমরা এমন এক পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি যেখানে বিবাহযোগ্য মেয়ের অভাব সত্য সত্যই প্রকট হবে।'

পৃথিবীতে মানবজাতির উদ্বর্তনের দিক থেকে বিচার করলে পুরুষের জন্মহার বেশি কেন তার উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হয় না। আমরা সাধারণত মেয়েদের 'অবলা জাতি' বলে থাকি। উদ্বর্তনের দিক থেকে দেখলে কিন্তু দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে পুরুষেরাই হচ্ছে 'দুর্বল জাতি'। কারণ মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের আয়ু অপেক্ষাকৃত কম। প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু উভয় অবস্থাতেই ছেলেরা সংক্রামক রোগে বেশি আক্রান্ত হয় এবং মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা আঘাত, বেদনা ও ভয়ে কাবু হয় বেশি। এইসব স্বাভাবিক কারণে ছেলেদের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি না হলে জীবনের প্রতিযোগিতায় তাদের যে হটে যেতে হবে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু মানুষের জীবনচক্রে নারী ও পুরুষের এই আনুপাতিক হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, তার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করার জন্যে নানা তত্ত্ব পেশ করেছেন। আমরা জানি, স্পার্ম বা শুক্রাণু যখন ডিম্বাণু বা ওভামের সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই হয় ভ্রূণের সৃষ্টি। শুক্রাণু বহন করে পুরুষের বৈশিষ্ট্য এবং ডিম্বাণু বহন করে নারীর বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষায় জানা গেছে, ডিম্বাণুর তুলনায় শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত হালকা এবং দ্রুত ধাবিত হতে পারে। একটি তত্ত্ব অনুযায়ী পুং-ক্রোমোসোম বা ওয়াই-ক্রোমোসোমের এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ স্ত্রী-ক্রোমোসোম বা এক্স-ক্রোমোসোমের তুলনায় তারা সহজে মিলিত হতে পারে। আর এই কারণেই পুরুষের জন্মহার অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে।

সম্প্রতি পরীক্ষামূলক সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আর একটি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট প্রজননতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক সি ডি ডার্লিংটন ও তাঁর সহকর্মীরা। এই তত্ত্বটি বেশ জটিল। সরলভাবে বলতে গেলে এই তত্ত্বের মূল কথা হল—ছেলেরা সংখ্যায় বেশি জন্মায় তার কারণ হচ্ছে, যে-ডিম্ব-কোষ থেকে তার সৃষ্টি, সেটি মায়ের সম্পর্কে পরক বা বহিরাগত। এখানে একটা আপাত-বিরোধী ব্যাপার দেখা যায়, মানুষের দেহ তার অভ্যন্তরস্থ যে-কোনো পরক কোষের উপস্থিতি প্রতিরোধ করতে চায়। কিন্তু এখন পরীক্ষামূলক সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রচুর পাওয়া গেছে যা থেকে জানা যায়, দেহমধ্যে পরক প্রোটিন বা অ্যান্টি-জেনের উপস্থিতির দরুণ যে প্রতিরোধক অ্যান্টিবডি গড়ে ওঠে, তা নিষিক্তকরণের পর মায়ের গর্ভাশয়ে ডিম্ব-কোষ রোপণে প্রকৃতপক্ষে সাহায্য করে। অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া কিভাবে ডিম্বকোষ রোপণে সাহায্য করে, তা সম্যকভাবে এখনও উপলব্ধি করা যায়নি। তবে একাধিক গবেষক এ-বিষয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করে দেখিয়েছেন, এটাই হয়ে থাকে। ডার্লিংটন-এর মতে পুং-কোষে বেশি অ্যান্টিজেন থাকায় গর্ভাশয়ে রোপণের সময় তারাই সুযোগ পায় বেশি। আর সে কারণেই ছেলের আনুপাতিক জন্ম-সংখ্যা হয় বেশি।

পুং বা ওয়াই-ক্রোমোসোম থাকায় স্বভাবতই মায়ের গর্ভাশয়ে এগুলি পরক হয়। পুং-ক্রোমোসোম বংশগতির যে উপকরণ বহন করে তার দরুনই কোষে পুং-বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মা মেয়ে হওয়ায় এই উপকরণগুলি মা-র সম্পর্কে পরক এবং সেজন্যে তারা অতিরিক্ত মাত্রায় প্রতিরোধক বিক্রিয়া গড়ে তুলতে চায়। স্ত্রী-কোষে কোনো ওয়াই-ক্রোমোসোম না থাকায় এই ধরনের বিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। এই অতিরিক্ত বিক্রিয়ায় ফল সামান্য হতে বাধ্য, কারণ ওয়াই-ক্রোমোসোম হচ্ছে ক্ষুদ্রাকারের। কিন্তু তা পুং-কোষের অনুকূলে পাল্লা ভারী করার পক্ষে যথেষ্ট এবং তাই পুরুষের সংখ্যাধিক্য প্রকাশ পায়।

এই তত্ত্বের সমর্থনে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে : পুং এবং স্ত্রী-কোষের মধ্যে যত বেশি সাদৃশ্য দেখা যাবে, ওয়াই-ক্রোমোসোমের কার্যকারিতার ফল হবে তত বেশি। জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহে দেখা যায়, জনক-জননীর বংশগতির অবদান অস্বাভাবিক-একই রকম। তাহলে ডার্লিংটনের তত্ত্ব অনুসারে ওয়াই-ক্রোমোসোমের প্রতিক্রিয়া হবে প্রবল এবং ফলত স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার হবে অস্বাভাবিকভাবে বেশি। জেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের ফলে যে-সব ছেলেমেয়ে জন্মেছে, তার অনুসন্ধান করে ডার্লিংটন এই আনুপাতিক হারের সমর্থন পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিন পুরুষ ধরে যাদের মধ্যে এই ধরনের বিয়ে হয়েছে, তাদের ছেলে-মেয়েদের আনুপাতিক হার আরও বেশি হতে দেখা গেছে। স্ত্রী-পুরুষের হার এক্ষেত্রে ০·৬১ পর্যন্ত হয়েছে। জর্ডন ও ইজরাইলের সামারিটান সম্প্রদায়ের মধ্যে (যারা বংশপরম্পরায় এই ধরনের বিবাহ করে থাকে) স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক হার ০·৬২-তে উঠতে দেখা গেছে, অর্থাৎ একশো জন নবজাতকের মধ্যে ৬২ জন হয় ছেলে এবং ৩৮ জন হয় মেয়ে।

নিদ্রা ও নিদ্রাহীনতা

মানুষ ঘুমোয় কেন? সহজ মনে হলেও প্রশ্নটির জবাব দেওয়া সোজা নয়। নিউরোফিজিওলজিস্টদের সাম্প্রতিক আবিষ্কার নিদ্রা প্রহেলিকার কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। দেখা গেছে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ কেন্দ্র নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সময় জন্তুদের মস্তিষ্কের এই অংশ অপসারিত করায় তারা তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা গেলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই জন্তুরা নিদ্রিত অবস্থায় থাকতে পারে।

কখন ও কেন নিদ্রা আসে তার ব্যাখ্যা অবশ্য এতে পাওয়া যায় না। আপাতদৃষ্টিতে হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের এক স্তর এই নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে ও প্রকৃতি চক্রের সঙ্গে তা যুক্ত। সূর্যগ্রহণ, ঋতু বদল, চন্দ্রচক্র, দিন-রাত, জোয়ার-ভাঁটা — এ সবই জীবজগতের প্রক্রিয়াসমূহকে প্রভাবিত করেছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত শারীরতত্ত্ববিদরা ২৪ ঘণ্টার চক্রকে বদলাবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এবং পরীক্ষায়

ফ্রাঙ্কফুর্টের খবর যে একজন চিকিৎসক পাঁজরা থেকে কোমলাস্থি নিয়ে স্বরনালীতে প্রতিরোপণ করে গলার আওয়াজ জোর করে দিচ্ছেন। কিভাবে তা হয় ছবিতে ব্যাখ্যা করছেন ডাক্তার এবেরহার্ট কোইনিক

৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিদ্রার সময়কে কমিয়ে বারো ঘণ্টা করা হয়েছে। সকল মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে সামাজিক প্রয়োজনীয় কাজ ও অবসরযাপনের অতিরিক্ত সময় জোগাতে পারে।

কোন ব্যক্তি একেবারে না ঘুমিয়ে পারে না — বাতাস বা খাদ্যের মতই ঘুম সমান প্রয়োজনীয়। তবে সব মানুষই যে স্বাভাবিক নিদ্রা যায় তা নয়। চিকিৎসকেরা এমন বহু ঘটনার কথা জানেন যেখানে কোন কোন ব্যক্তি বাসে, সিনেমায় এবং এমন কি হাঁটতে হাঁটতে বা সাইকেল চড়ে যেতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ে। জনৈক চিকিৎসক রোগী পরীক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন। কখনো কখনো মাংসপেশী শিথিল হলে নিদ্রা আসে। জনৈক শিকারী বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হলেই দুর্বলতা তাকে গ্রাস করত। এই ব্যাধির কোন কোন বহিঃপ্রকাশকে বলা হয় নার্কোলেপ্সি।

কেস হিস্ট্রি থেকে বহু দিন, মাসের পর মাস ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এরূপ রোগীর দীর্ঘ রেকর্ড পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই তরুণ-তরুণী—সাধারণত মহিলা। এরা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে এবং দু-তিন দিন কিম্বা দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত নিদ্রিত থাকে। সাধারণত কোন কিছুই তাদের জাগাতে পারে না — সূঁচের খোঁচা, ঘুষি কিছুতেই তাদের ঘুম ভাঙে না।

এক বিশেষ ধরনের শীতস্বাপে (হাইবারনেসন) তন্দ্রাচ্ছন্নতার সঙ্গে ঘুম জড়িয়ে থাকে। এ ধরনের 'সাময়িক শীতস্বাপ' প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে এর স্থায়িত্ব এক মাসের বেশি হয় না। ২০ বছরের অধিককাল ধরে নিদ্রিত ব্যক্তির দুটি কেস রেকর্ড করা হয়েছে। রাশিয়ার এক বড় জমিদারীর ম্যানেজার জনৈক কোচালকিন উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং তার ঘুম ভাঙে অক্টোবর বিপ্লবের পর। বিখ্যাত সোভিয়েত শারীরতত্ত্ববিদ ইভান পাভলোফ এই ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেছিলেন।

মাঝে মাঝে পত্র-পত্রিকায় এরূপ লোকের সংবাদ বেরোয় যারা নাকি একেবারেই নিদ্রা যায় না। এসব সংবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। একটা তত্ত্ব আছে যে এসব ব্যক্তির দেহে অকস্মাৎ ঘুম নেমে আসে, তা সামান্যক্ষণ স্থায়ী হয় এবং অন্যেরা ও সে ব্যক্তি নিজেও এই ঘুমের ব্যাপার লক্ষ্য করতে পারে না।

অবসাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হল অনিদ্রা — এটি বর্তমান শতকের এক ব্যাপক ব্যাধি। এর কারণ স্নায়ুব্যবস্থার একটা নির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা—নিউরাস্থানিয়া। ঘুম পাড়িয়ে এখন এ রোগের চিকিৎসা করা হয়।

কয়েক বছর আগে কোন কোন বিদেশী পত্রিকা চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশন করেছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা নাকি স্বাভাবিক নিদ্রার জায়গায় বৈদ্যুতিক নিদ্রাবেশ ঘটানোর প্রক্রিয়া প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন। বলা হয়েছিল, হাজার হাজার লোকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়েছে।

এসব সংবাদের উৎস কি ছিল?

বিশিষ্ট সোভিয়েত মানসিক ব্যাধি চিকিৎসক ডাক্তার [illegible] নির্দেশে এল নিভেতস্কি ও [illegible] ও জেড কিরিলোভা ব্লাক জেনারেটর নামে একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এর একটি মুখোশাকার ছিল। এতে প্রলেপ নরম সীসার একটি চক্ষুপ্রকোষ্ঠ ও শ্লাস্টিক কাপ। এই কাপে আছে দুই জোড়া করে ইলেকট্রোড। এই ইলেকট্রোডগুলি রোগীর নাকের চারপাশে চামড়ার উপর ও কানের পেছনে জুড়ে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। একেই বলা হয় 'বৈদ্যুতিক নিদ্রা' ও কখনো কখনো 'বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো গান'। রুশ শরীরতত্ত্ববিদ আই পাভলোফ ও এন ভেদেনস্কি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তার ভিত্তিতেই এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রতি বারে বৈদ্যুতিক ঘুম পাড়ানো ৩০।৪০ মিনিট থেকে দেড়-দু ঘণ্টা স্থায়ী হয়। বস্তুত, বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দেবার পরও কিছুক্ষণ রোগী ঘুমোতে থাকে। ১৫ থেকে ২০ দিন চিকিৎসার পর নিউরাস্থানিয়া রোগের পুরো আরোগ্য সম্পন্ন হয়।

উৎসাহ বাড়ে

এই নতুন পদ্ধতির বহু সমর্থক, প্রধানত মানসিকব্যাধি-চিকিৎসকেরা [illegible] দিয়ে গেল। তাঁরা [illegible] কোন ধরনের [illegible], [illegible] [illegible], মানসিক অবসাদের ধরনের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক ঘুমপাড়ানো পদ্ধতি ব্যবহার করলেন। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই

হবেই হোক—তার সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল কিরণের মনে। এ ক্ষমতা গণেশের আশৈশব—কোনদিনই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারে না, তার কোন অনুরোধ বা আবদার প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সুরবালা তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ভাল করেই জানে।

কিরণও ক্রমশ একটু একটু করে পোষ মানল। আর সেই সুযোগে পরে কোন ধড়িবাজ জোচ্চোরের খপ্পরে মতিগতি আবার বদলে যাবার সময় না দিয়েই গণেশ ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল, ওর বাবা-মায়ের কাছে। তাঁরা এত দিন ও-গির ছেলে বা ঐ টাকার—কোনটাই ফিরে পাবার আশা করেন নি। ছেলে ফিরে আসবে তা তাঁরা জানতেন, কলকাতাতেই যে ঘোরা-ফেরা করছে সে, এ খবরটা পেয়েছেন আগেই, কিন্তু সেই জন্যেই টাকাটা ফিরবে না, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। টাকাটা ফুরোলে ছেলে ফিরবে রিক্তহস্তে, ভগ্নমনে, ওদিকের নেশাটাও ছুটে যাবে ততদিনে, ঘরে ও বিষয়-কর্মে মন বসবে; তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে সেরেস্তার কাজে জুতে দেবেন সেই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেই ছেলে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে আসতে—আর সেই সঙ্গে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ হারানিধি টাকাটাও—স্বভাবতই খুশী হয়ে উঠলেন, এবং সমস্ত বিবরণ শুনে গণেশের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন। কিরণের মা তো একেবারেই বড় ছেলে সম্পর্ক পাতিয়ে—'তুই আমার যথার্থ বড় ছেলের কাজ করলি বাবা' বলে কোলে বসিয়ে চুমু খেয়ে আদরে আদরে অস্থির করে তুললেন। কিরণের বাবাও কিছুতে তাড়াতাড়ি ছাড়তে রাজী হলেন না, একরকম জোর করেই ধরে রাখলেন। কৃতজ্ঞতা ছাড়াও গণেশের চেহারায় আর কথাবার্তায় ইতিমধ্যেই তাঁরা যথেষ্ট মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

সেই সময়েই কথাপ্রসঙ্গে কিরণ একদিন বলেছিল—গণেশের শখ বা নেশার কথাটা।

গণেশ এই মধ্যে কয়েকদিনেই তার ম্যাজিকের খেলা কিছু কিছু ও'দের দেখিয়ে-ছিল। প্রায় অবিশ্বাস্য সেসব এ'দের কাছে। পরে যখন শুনলেন যে, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও এই জাদুবিদ্যা বা ইন্দ্রজাল শেখার জন্যে সে পথে পথে ঘোরে, বেদেদের দলে মিশে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—তখন রামকমলবাবুই ওকে বলেন—এসব বিদ্যা ভাল করে শিখতে হলে কামরূপে যাওয়া দরকার। সেখানে নাকি ঘরে ঘরে—মেয়েরা পর্যন্ত এসব বিদ্যা জানে। শুধু বলাই নয়, ওর উৎসাহ দেখে খরচপত্র সব দিয়ে তিনিই পাঠিয়ে দিয়ে-ছিলেন সেখানে।

কামরূপের কথা তিনি কার কাছ থেকে শুনেছিলেন কে জানে—বোধ হয় 'কামরূপ কামিখ্যের মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া করে করে রাখে' এমনি একটা জনশ্রুতি থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে তারা ইন্দ্রজাল জানে। সেখানে খুব কিছু সুবিধে হয়নি গণেশের। সুবিধে হয়েছিল—তবে সে অন্যত্র। রামকমল বাবুর দৌলতে—খরচ দেবার সময় কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নি তিনি—আর গণেশেরও অতিথেয়তা আদায়ের শক্তি প্রায় অলৌকিক, গোটা আসামটাই সে দেখে নিয়েছে প্রায় আর সেই সুযোগে পাহাড়ীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেও নিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে আসাম ঘুরে মাত্র এই কদিন আগে ফিরেছে কিরণের টানে বা তার বাবা-মার টানে, তাদের দেশেই। ইতিমধ্যে কিরণও তাদের সেরেস্তার জাবদা ও খোকড়ের চাপে হাঁপিয়ে উঠেছিল, কলকাতায় আসবার জন্যে ছটফট করছিল। গণেশ যে তাকে থিয়েটারে ঢোকবার সুবিধে করে দেবে—সে প্রতিশ্রুতি কিরণ ভোলে নি। কিরণের সে ইচ্ছাতে পরোক্ষে ইন্ধন যোগালেন রামকমলবাবুরাই। গণেশের মতো ছেলে হারিয়ে, এতকাল না দেখে না জানি ওর বাবা-মা কত কষ্ট পাচ্ছেন অনুমান করে তাঁরাই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ কিরণকে সঙ্গে দিয়ে গণেশকে ওর বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটাও একটু ঘুরে আসুক, গণেশ সঙ্গে থাকলে বিগড়োবার ভয় নেই, হয়ত এ কথাও ও'দের মনের মধ্যে ছিল।

ভবতারণের প্রান্ধ-শান্তি চুকে যেতে কিরণ তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠল। চোর-বাগানের দিকে কোথায় তাদের নাকি একটা বাড়ি ভাড়া করাই আছে দীর্ঘকাল থেকে। সেখানে একটা ভাগের চাকরও আছে। ভাগের চাকর মানে সে অন্য বাড়িতে ঠিকে কাজ করে, কাছেই মেয়েছেলেদের পাড়া, সেখানে ফর ফর বাজার করে দিয়ে আসাই তার প্রধান জীবিকা—থাকে এদের এই বাড়িতে, কতকটা চৌকীদার হিসেবে। ছোট বাড়ি, ওপরে দুখানি, নিচে একখানি ঘর। চিকিৎসা কি মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে কলকাতায় এলে রামকমলবাবুরা এখানে ওঠেন, ও'দের আত্মীয়স্বজনেও মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করেন কেউ কেউ। তখন এক পোর্টেবল হারিন, হোটেলের ভাত খাওয়ারও এক [illegible]

ছিল না। বড়, মাঝারি এমন কি ছোট ছোট জমিদারদেরও একটা বাসা ভাড়া করা থাকত কলকাতায়। অনেক ছোট জমিদার পুরো বাড়ি ভাড়া করতে পারতেন না, মধুর বাজারের ওপর একখানা করে ঘর ভাড়া করে রাখতেন। সেখানে খাট-দুই থাকত, দু'টো হুঁকো-কলকে তামাকের সরঞ্জাম ও দড়ির আলনায় বারোয়ারী গামছা একখানা থাকত। বাকী যার যা দরকার সঙ্গে আনতে হত।

এ'দের বাসাতে বারো কেউ এলে ঐ চাকরটিই এ'দের কাজকর্ম করে দিত, ঠিকে বামুন ডেকে আনত রান্নার জন্যে। রামকমল-বাবু নিজে এলে অবশ্য রান্নার লোক সঙ্গেই আনতেন—বাকী সকলের ঠিকে বামুনই ভরসা। কাউকে না পাওয়া গেলে—শ্যামবাজারে ঠিক বসুরে বামুন দুর্লভ হয়ে পড়ত মধ্যে মধ্যে—ঐ ভৃত্যটিই যোগাড়যন্ত্র করে দিত, কিরণ বা অপর যে আসত নিজেরা ভাতটা নামিয়ে নিত। এটুকু তখন জানত প্রায় সকলেই। তখন ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কোন আত্মীয়দের হাতে ভাত খাওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারত না কেউ।...

বাসায় উঠে গেলেও এ বাড়িতে আসা-যাওয়া অব্যাহত রইল কিরণের। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে গণেশের টানেই আসত সে, কিন্তু দেখা যেত যে গণেশ না থাকলেও ওঠবার জন্যে বা গণেশের খোঁজে বেরোবার জন্যে ব্যস্ত হয় না। বরং রান্নাঘরের সামনের সংকীর্ণ রকে বসে নিস্তারিণীর সঙ্গে গল্প করার দিকেই তার যেন ঝোঁক বেশী। অনেক সময় গল্পও করত না, নিস্তারিণী একাই বকে যেত, সে শুধু চুপ করে বসে শুনত। ইতিমধ্যে সুরবালার গান শুনেছে সে; গান শুনে যে মুগ্ধ হয়েছে, সে কথাও বলেছে সে সরলভাবেই। আজকাল কোথায় বসে ওর মুজরো থাকে কৌশলে জেনে নিয়ে অনিমন্ত্রিতই সেখানে যায় গান শুনতে। আনাগোনাই বড়—আর প্রাণপণে চেষ্টা করে সুরোর চোখের বাইরে আত্মগোপন করে বসে থাকতে। তবে এক আধ দিন ধরা পড়েও যায়—তখন যা হোক একটা অজুহাত গোঁজামিল দিয়ে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। সুরবালা ওর এই লজ্জা কি সংকোচের কোন কারণ খুঁজে পায় না। একটু অবাক হয়েই বলে, 'তা গান ভালবাস, গান শুনতে যাবে, এর মধ্যে দুষ্য তো কিছু নেই, তবে এত লজ্জা পাও কেন? আর লুকোবারই বা চেষ্টা করো কেন? তোমরা বড়মানুষের ছেলে, বিনা নেমন্তন্নে তোমার যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু সে চেনা বাড়িতে। অচেনা জায়গায় আর দোষ কি? সেখানে তো আর সম্মানের প্রশ্ন নেই।'

কিরণ এ প্রশ্নেরও জবাবে কোন জবাব দিতে পারে না, ঈষৎ লজ্জিত বিব্রত মুখে চুপ করে থাকে।...

ঐ গান শোনা আর এদের বাড়িতে আস [illegible] বা আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো—এবং [illegible] তাস দিয়েই রাতের খাওয়াটা এখানে [illegible] দিয়ে কিরণের কোন আপত্তি হয় না। [illegible] প্রথম নিস্তারিণী খাওয়াবার [illegible]—একটু [illegible] বোধ করেছে। [illegible]

আপিসে বসে থাকতে পারতুম। কথা দিয়েছি, দিব্যি গেলেছি, যতদিন সে বেঁচে থাকবে কিম্বা যতদিন আমি বেঁচে থাকব—রোজগারের ভাগ তাকে দোব। শুধু তো পেনার এক পয়সা সে ছোঁয় না, তাও তো আমি তাকে দিতে গেছলুম।'

নিস্তারিণী গজগজ করে, পাঁড় বোকা বলে গাল দেয় মেয়েকে।

মেয়ে ওদের পুরনো পাড়ায় একটা ছোট বাড়ি বায়না করেছে কিনবে বলে—তাতেও যেন মনে বিশেষ সান্ত্বনা পায় না। বলে, 'ওর বাপ মিনসে চিরকাল আমার হাড় ভাজা-ভাজা করে জ্বালিয়ে খেয়েছে—ও আর যাবে না! নইলে আমার বরাতের লেখন খোলতাই হবে কেন? আমার পাওনাটা যাবে কোথায়?...যেমনে দিয়ে যা হোক, আমাকে জ্বলতেই হবে।...ভাবছে চিরকাল এমনি যাবে! মাড়কে দেখেও চৈতন্য হল না আশ্চর্য! গতর খাটিয়ে রোজগার কি একটা রোজগার? না, তার কোন ভাগ্যি আছে? যদি গলা কাটিয়ে পরবেলা কেঁপেছে তো ঐকটা টাকা ঘরে আনিস। আজ যদি গলাটা ভেঙে থাকে এক মাস তো এক পয়সা ঘরে আসবে না। যদ্দিন পাচ্ছিস—দিন কিনে নে, তা নয়।...আমারই ভুল, বলতে যাওয়াই অন্যায়। চোরা না শোনে— ধর্মের কাহিনী, এ তো জানা কথাই।'

সুরবালা আর কথা বাড়ায় না। 'ধর্মের কাহিনী' শব্দ দুটো শুনে হাসি পেলেও সে হাসি চেপেই যায়। সে দেখেছে যে, নিস্তারিণীর সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে যাওয়া বা কোন যুক্তি দেখাতে যাওয়া নিরর্থক। মিছিমিছি নিজেরই কষ্ট। এক-আধ দিন শুধু সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে এর আগে, দলুইবৌদিদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নি। তাই এখন আর কিছু বলে না।...

দলুইবৌদিদের সে কথাটা সে কোন দিন ভুলবে না। ওঁদের আগেকার যোগানী চারুবাবুর কাছে তার গোপন কিছু সঞ্চয় জমা রাখত। কত রাখত মাসে কত জমছে তা সে কখনও হিসেব রাখে নি, যখন যা পেত—দু টাকা এক টাকা দু আনা চার আনা, এসে ফেলে দিয়ে চলে যেত, কত কি জমছে কখনও জিজ্ঞাসাও করে নি। চারু-বাবুই গুনে গেঁথে একটা খাতাতে জমা করতেন, ওর জন্যে একটা আলাদা ছোট্ট খাতা করেছিলেন খেরো বাঁধানো, একটা টিনের কৌটো করেছিলেন, তাতেই ঐ টাকাটা রেখে নিজেদের দেরাজের এক কোণে রেখে দিতেন। হঠাৎ কি হল, সে যোগানী আর এল না। কাপড়গুলো যা নিয়ে গিয়েছিল, কে একটি ছেলে এসে দিয়ে গেল, বলে গেল বৌ দিন দুই পরে এসে ওঁদের ময়লা কাপড় নিয়ে যাবে। আর সে এল না। সেও-না, ঐ ছেলেটাও নয়—তার বাড়ি থেকে কেউই এল না। তার খবরও নিতে পারলেন না চারুবাবুরা, কারণ আগের যে ঠিকানা জানতেন সে বস্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে বলে তারা উঠে গেছে কদিন আগেই, কোথায় গেছে নিয়াৎ পাকাপাকি করেই সেটা লিখে রাখা হয় নি।...অনেক দিন দেখে দেখে নতুন লোক ঠিক করেছেন চারুবাবু, করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আগেকার সেই বৌয়ের গচ্ছিত টাকা আর শেষ কদিনের থানা-তিন-চল্লিশ কাপড়ের ক গণ্ডা পয়সা থেকেই গেছে ওঁদের কাছে।

সুরোর মনে আছে, একবার ওঁদের খুব অনটন যাচ্ছিল, কী কারণে মাইনে পেতে দেরি হয়েছিল চারুবাবুর কদিন, ঘরে কিছুই ছিল না। শেষে এমন হল একদিন ঘরে হাঁড়িই চড়ে না—মুদীর দোকানে কত ধার করা উচিত সে সম্বন্ধে চারুবাবুর আইন খুব কড়া ছিল—সেদিন সুরোই মনে করিয়ে দিয়েছিল, 'সেই যোগা-বৌয়ের টাকাটা তো আছে, তা থেকে একটা টাকা নিয়ে এখন চালান না, পরে হাতে এলে আবার পুষিয়ে রেখে দেবেন!'

চারুবাবু যেন শিউরে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, 'তাই কখনও পারি! বাপরে, ও যে পরের গচ্ছিত করা টাকা। বিশ্বাস করে আমার কাছে রেখে গেছে। ও টাকা খাওয়া আর গোমাংস খাওয়া একই কথা!'

সুরো শুধু তর্ক করেছিল, 'আপনি তো তাকে ফাঁকি দিচ্ছেন না, চুরিও করছেন না। হাতে এলেই আবার তোলোলা করে রাখবেন—তাতে দোষটা কি?...তাছাড়া সে কোথায়? আছে কিনা তাই দেখুন। সে কি আর কোনদিন এ টাকা চাইতে আসবে আবার?'

খাবি খেতে থাকে? কী কপালই সে নিয়ে আসে? তার মধ্যে যদি পুষিয়ে রাখতে না পারি? একটা টাকা ফেলেছিল মনে তার মনে হবে হয়ত আরও ফেলেছি—মনে পড়বে কেবলি এক টাকা!'

'কপালেরই বা দরকার কি। সে তো জানেও না কী আছে কত আছে। পরে বরং অন্য সুতোয় ঐ টাকাটা ফিরিয়ে দেবেন!'

'সেই তো আরও বিপদ। সে জানে না বলেই তো আমার একখানি দায়িত্ব। এ টাকা স্বয়ং ভগবান পাহারা দিচ্ছেন তার হয়ে, তিনিই হিসেব রাখছেন। সেইজন্যে তো আরও সাবধানে থাকা দরকার। মিথ্যে বললে কি গোপন করলে তার আর কতটুকু ক্ষতি, আমারই মনুষ্যত্ব চলে গেল তো।...তাছাড়া কি জানিস, এ অভ্যেসটাই খারাপ। একবার ভাঙলেই জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে, তখন সামান্য দরকারেই আগে ঐ টাকাটার কথা মনে পড়বে। নেবও তখন। আর বার বার নিতে নিতে একবার হয়ত লিখতেই ভুলে যাব, হিসেব থাকবে না—হয়ত আর সেটা ফিরিয়ে দেওয়াই হবে না।...না সুরো, তার চেয়ে না খেয়ে পেটে মরে যাওয়াও ভাল।'

'আর যদি সে কোনদিনই না আসে? এর তো বুকে দিয়ে আগলে রাখবেন!'

'আমি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার দায়িত্ব, তারপর আমার ছেলে বুঝবে। কিম্বা আর যে মালিক হবে তখন সে বুঝবে। আমি বলে যাবো—ও টাকা কোন অনাথ আশ্রমে কি কোন দাতব্য আতুরালয়ে দিয়ে দিতে। তারপর তার ধর্ম।'

'তা আপনার একটা কৈফিয়তও তো আছে। একটা টাকা একদিন ধার করলেই একেবারে বড় অধর্ম হয়ে গেল!' সুরো জেদ করে।

এর উত্তরে হেসেছিলেন চারুবাবু, 'ধার করার কথা বলছিস? তবে শোন্, বলি একটা গল্প। দিল্লীতে এক সুলতান ছিল জানিস, তিনি জানতেন রাজকোষের টাকা জনসাধারণের টাকা, প্রজাসাধারণ তার হিসেবার মাত্র। তিনি সুলতান হিসেবে খাটতেন, অন্য রোজগারের পথ ছিল না বলে তিনি দৈনিক এক টাকা হিসেবে মাইনে না জমখা নিতেন। তাঁর স্ত্রী নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করতেন। একবার তুমুল কাজের সময় বেগমসাহেবার শাড়িটা ছেঁড়ে পড়ে যায়—তিনি সুলতানকে গিয়ে বলেন, অন্তত দু-তিন দিনের জন্য একটা কি রাখার হুকুম দাও। 'টাকা?' বলেছিলেন সুলতান 'বেশী টাকা আমি দিতে পারব না।' বেগম বললেন, 'বেশ, তুমি না হয় তিনদিনের টাকা আগাম আমায় দাও, আমি ঐ টেডেনেই

এক রবিবারের সূর্য

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খিদার এলো ফ্রাঁসোয়ার। ওদের বাড়ীতে আসতেন ফরাসী বৃদ্ধ মনীষী স্কারন। রাজ-দরবারে খ্যাতি। রাজার সোহাগিনী মাদাম মন্তেস্প্যানের আদরের সামগ্রী। মস্ত আড্ডা বসে স্কারণের বাড়ী। রাজ্যের শিল্পী, কবি, গুণী সবাই যায়। ফ্রাঁসোয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের পাণি-পীড়ন করে তার যা সেবা যত্ন করলো দেখে মাদাম মন্তেস্প্যান তো থ'।

স্কারেন মারা গেলো। ফ্রাঁসোয়া সেই আড্ডা বজায় রাখলো, বিয়ে করলো না। রাণী মারিয়া থেরেসার সময় কাটতে চায় না। মাদাম মন্তেস্প্যান বুদ্ধি করে ফ্রাঁসোয়াকে দিলো রাণীর সঙ্গিনীর কাজে বহাল করে। ফ্রাঁসোয়া হয়ে গেলো মাদাম মেন্তেনান্। মেন্তেনানে ফ্রাঁসোয়ার অট্টালিকা। রাজা ঘন ঘন যান।

মন্তেস্পান প্রথমে রাগ, পরে ঝগড়া, আরও পরে চক্রান্ত করলো। কিন্তু মেন্তেনান সত্যিই তখনও খাঁটি মেয়ে। হাজার প্রলোভনেও রাজাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। রাণীর পরিচর্যা মন দিয়ে করে। এমন যে পরিচর্যা যা ক্যারিবিয়ান ক্রিওল্ই করতে পারে। রাণী বলতেন, বিয়ের পর থেকে আজ অবধি যদি সুখ পেয়ে থাকি, ফ্রাঁসোয়ার জন্য; স্বামী পেয়ে থাকি, ফ্রাঁসোয়ার জন্য। এমনই অদ্ভুত মায়াবিনী সেই ক্রিওল্-কন্যা, সেই মার্তিনিকান। যে রাজা সব ছেড়ে, মন্তেস্পানকেও ছেড়ে রাণীর মহালে দিনে তো থাকতেই, রাতেও থাকতেন।

সেই সুখের মধ্যে মরে গেলেন মেরিয়া থেরেসা। রাজা তখন ফাঁদ পাতলেন সেই সূর্যকন্যাকে ধরার জন্য। মার্তিনিকান মেয়ে রাজার বারবনিতা খ্যাতি হজম করেছিলো, কিন্তু বুদ্ধিতে তখনও সে ক্যাথলিক ফ্রাঁসোয়া। বিবাহ না করলে অঙ্গস্পর্শ হতে দেবে না। সেই বিয়ে হয়েছিলো,—গোপনে হলেও, হতে হয়েছিলো। এবং তারপর থেকে লুইয়ের মৃত্যু পর্যন্ত ফরাসী রাজ্যের পরিচালনার ভার বহন করেছিলো সেই 'মাদাম', নামে যিনি রক্ষিতা,—কিন্তু ধর্মে যিনি ক্যাথলিক, খাঁটি।

[illegible] এখনও জোসেফিনের কথা বলি, ফ্রাঁসোয়ার কথা বলি, আর এই দেহ পেতে দিই রাতের পর রাত রবাহূত বুভুক্ষুদের অপরিমেয় ক্ষুধার ভার বহন করতে, রোগে জীর্ণ হয়ে মরি, কয়লাঘাটায় কয়লা বই।

অথচ আমিই ফ্রাঁসোয়া। আমিই মাদাম মেন্তেনান্,—বিশ্বাস করো?

আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

উনিশ শো দুই সালের কথা। কদিন ধরে সেন্ট পিয়েরে শহরের পূবে পেলী পাহাড়ের চূড়া থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া আর মাটি ছড়াতে লাগলো আকাশে। আকাশ লাল হয়ে গেলো। সেন্ট পিয়েরে তখনকার দিনে সব সে সেরা নগর ছিলো মার্তিনিকের। গান, হাসি, হৈ-হুল্লোড়,—সেন্ট পীয়েরের মতো নগরী আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ছিলো না। সব ঢেকে গেলো ছাইয়ে, বালুতে। নদীর জল ফুলে উঠলো, কেবল কাদা ফুটতে লাগলো টগবগ করে। লোকে উদ্ভ্রান্ত হোলো, ক্ষান্ত হোলো না। পেলী আগ্নেয়গিরি। একটু উৎপাত করবে বৈকি! চল্লিশ হাজার লোকের বাস ছিলো সেন্ট পীয়েরেতে। আমাদের বসতভূমি, বাবার ব্যবসা সব ছিলো সেখানে। আজ আছি আমি। মেয়র অভয় দিয়েছিলেন ওসব কিছু নয়। এবং ৮ই মে সকালবেলায় লোকে তাই ভেবেছিলো। কদিন পরে সূর্যের স্নিগ্ধ আলো পড়েছে সেন্ট পীয়েরের পথে। 'এসেনশন্'-ডের আমোদে দলে দলে লোক রং-চং সাজ পরে জমায়েত হয়ে বার হয়েছে। হঠাৎ পর পর দুটো শব্দ। ডোমিনিকা, সেন্ট লুসিয়ায় সে শব্দ শোনা গেছিলো। পেলী পাহাড় ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গেছিলো।—একটা কালো দেয়াল ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে লাগলো; আগুন নয়, লাভা নয়; কুণ্ডলী পাকানো রাশি রাশি ধোঁয়া,—ধোঁয়ার দেয়াল,—একটা লাইন করে আকাশ অবধি উঁচু হয়ে নেমে আসতে লাগলো। যতদূর নজরে নিকষ অন্ধকার, আর অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখেনি; একটি শব্দ করেনি। বিষাক্ত তীব্র গ্যাসের সঙ্গে বালুর কণা [illegible], [illegible] ঢুকে পলকের মধ্যে যন্ত্রণাহীন, শব্দহীন মৃত্যু এসে গিয়েছিলো। সেই চল্লিশ হাজারের মধ্যে একটি প্রাণীও বাঁচেনি। সেন্ট পীয়েরে ছাই হয়ে চাপা আছে। আছে বলছি; ছিলো। এখন এই সব শিল্পতাই আবার গোড়া হয়েছে। তবুও জান পেয়েছে [illegible] আবার সেন্ট পীয়েরেতে। সেও। সেন্ট পীয়েরের কণ্ঠমালা পায়ে। সেই নিদারুণ বিভীষিকা আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে একক হয়ে আছে। অমন গ্যাস-অগ্নি লাভাহীন বিস্ফোরণ আজ অবধি 'পেলিয়ান্-টাইপ্' বিস্ফোরণ নামে চিহ্নিত। ভলকানোলজিস্টের আতঙ্ক।

সভ্য দুনিয়ায় যখন প্রথম এ-খবর পৌঁছুলো প্রথমটায় কেউ বিশ্বাস করেনি। কেবল বন্দরের বাইরে একটা ইয়াটে জন-চার খালাসী বেঁচেছিলো। এনশ্যান্ট মারিনারের ভুতুড়ে জাহাজের মতো সেই প্রেত-জাহাজ যখন ফোর্ট দ্য ফ্রাঁসে পৌঁছুলো, লোকে বললে, সেন্ট পীয়েরের খবর কী? খালাসীরা বললো,—সেন্ট পীয়েরে ছিলো, আর নেই। নরক থেকে শয়তানের দলকে দল এসে গোটা শহরটাকে নরকেই টেনে নিয়ে গিয়েছে।

দোহাই তোমার হিন্দু। মাতাল নইনি আমি। সত্যি কথা বলছি। কদিন ধরেই তো সেন্ট পীয়েরের আকাশে বাজির উৎপাতের কথা সবাই বলাবলি করছিলো। হঠাৎ বেলা নটা সাড়ে নটায় টেলিগ্রাফের দপ্তর আধা খবর দিতে দিতে বন্ধ। তারপর কতো ডাকাডাকি। কোনো সাড়া নেই। বেলা এগারোটা আন্দাজ সবাই বলাবলি করছে—"শুনেছি সেন্ট পীয়েরেতে কী হয়েছে।" বেলা দুটো নাগাদ ঐ ভুতুড়ে ইয়াট এলো। তারপর থেকেই হায় হায় সুরু হোলো।

কিন্তু সে তো প্রায় ষাট বছর আগের কথা। তোমার বয়স তো সবে বাইশ কি তেইশ!

তেইশ নই আমি। তেত্রিশ। তেত্রিশ না সাজলে তোমাকে ধরতাম কী করে? বাবা সেদিন এসেছিলেন মায়ের জন্মদিনের জন্য জিনিস কিনতে। আমার তিন ভাই-বোন ছিলো মায়ের সঙ্গে। সেই ভীষণ খবর পাবার পর বাবা সেন্ট পীয়েরেতে যাবেন বলে ছুটেছিলেন। কিন্তু সারা পৃথিবীতেই তখন আর সেন্ট পীয়েরে ছিলো না। সে শহরের বুকে তখন ছাই আর ছাই।

বাবা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। এসে পড়েছিলেন এই [illegible]-দু-সুদেয়ে। এবং কবলে পড়লেন একটি বারবনিতার। নাম তার রাঁদ লক্রেক্। রাঁদ লক্রেক্, জানতো তখনও বাবার হাতে অনেক টাকা। সে বাবাকে আর ছাড়লো না। বাবার বয়স তখন পঞ্চাশ তো হয়েই গেছে। আরও কিছুদিন পরে রাঁদ লক্রেকের কন্যা হয়। রাঁদ লক্রেক সেই কন্যাকে বড়ো করে। স্কুলে পাঠায়। বাবা সে মেয়েকে আদর করতেন; [illegible] দেরে গিয়েছিলো আরও। কিন্তু তখন বাবা নিঃস্ব। সমস্ত দেনা শোধ করার পর রাঁদ লক্রেককে [illegible] দিতে পারলেন না কিছু। রাঁদ লক্রেককে আমার [illegible] হয়। [illegible] সেই [illegible] রাঁদ

আঠারোখানি গানের মধ্যে অবিভাজ্য বস্তুর মধ্যেই আছে তেরখানি গান। এর মধ্যে একখানি বৈষ্ণব পদাবলী। বাকীগুলি হয় মুকুন্দ দাস, নয় হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা। রবীন্দ্ররচনা "বিধির বাঁধন" গানটি সমবেতকণ্ঠে গীত। সঙ্গীত-পরিচালক সহযোগী যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে আরও অবহিত হতে পারতেন। আগেই বলেছি, যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতকে বহুস্থানে ব্যাহত করেছে।

ফিল্ম ক্লাসিকস্-এর "চারণকবি মুকুন্দ দাস" দেশাত্মবোধক ছবি হিসেবে দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাতে সমর্থ হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

ইকনমিক প্রোডাকসন্সের 'পরিশোধ' ছবিটি এ-সপ্তাহের ২৩ ফেব্রুয়ারী কলকাতার উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত এ-কাহিনীটির চিত্ররূপ দিয়েছেন পরিচালক অর্ধেন্দু সেন। এই অনুপম কাহিনীর প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, দিলীপ রায়, তরুণকুমার, মলিনা দেবী, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও নরেশ মিত্র। ছবিটির সুরসৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ইকনমিক পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

এ-মাসের তেইশ তারিখে হিন্দী ছবি 'হামরাজ' ওরিয়েন্ট, ম্যাজেস্টিক, মেনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে। বোম্বাইয়ে নির্মিত এ-ছবিটির পরিচালক হলেন বি আর চোপড়া। বি আর ফিল্মসের এই রঙিন চিত্রে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত, রাজকুমার, মমতাজ, বলরাজ সাহানী এবং ভিম্মী। ছবিটির সুরকার হলেন রবি।

দেশী ছবির খবরাখবরে মধ্যে একটি নতুন ছবির পরিকল্পনা সম্প্রতি রূপ নিয়েছে। ছবিটির নাম 'পরিণীতা'। শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। এ-কাহিনীর ললিতা চরিত্রে মনোনীতা হয়েছে বালিকা বধূ-র নবাগতা নায়িকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া কয়েকটি মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সৌমিত্র [illegible], ছায়া দেবী ও নীরা মালিয়া।

জীবনীচিত্র হিসেবে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস বলা যেতে পারে। সম্প্রতি ছবিটির কাজ শুরু করেছেন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকায় রূপদান করবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া রয়েছেন দিলীপ চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল, তন্দ্রা বর্মন, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত ও রচিত 'বাদু' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয় সুসম্পন্ন হচ্ছে। শ্রীবিশ্বজিৎ-মল কাঁকরিয়া ছবিটির প্রযোজক। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্ত, গীতা চট্টোপাধ্যায়, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, শিবানী বসু, পদ্মা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, অজিত গাঙ্গুলী, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপদ সেন ছবিটির সুরকার।

পরিচালক [illegible] সেন এবং বি [illegible] ফিল্মসের 'আদর্শ' [illegible] ছবিটির কাজ শুরু করেছেন। সম্প্রতি [illegible] সুরকার রোশন ছবিটির সঙ্গীত-পরিচালক। সম্প্রতি [illegible] সিনে ল্যাবরেটরীতে রোশন সুরকৃত একটি গানে কণ্ঠদান করলেন [illegible] মঙ্গেশকর। এ-ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন সঞ্জীবকুমার, [illegible], [illegible], [illegible] সাহানী, [illegible], [illegible], মুকরী, তরুণ বোস এবং বিজয় [illegible]।

পরিচালক প্রকাশ মেহরা তাঁর নতুন ছবি 'হাসিনা মান যায়েগী'-র চিত্রগ্রহণ একটানা শুরু করেছেন রূপতারা স্টুডিওয়। কল্যাণজী আনন্দজী সুরকৃত এ-ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন শশী কাপুর, ববিতা, জনিতা, মনমোহন কৃষ্ণ, নিরঞ্জন শর্মা, সাপ্রু ও জনি ওয়াকার।

বাংলাদেশের তরুণ নায়িকা অপর্ণা সেনের প্রথম হিন্দী ছবিটির নাম হল 'বিশ্বাস'। এই রঙিন ছবিটি পরিচালনা করছেন কেওয়াল পি কাশ্যপ। শ্রীমতী সেনের বিপরীত নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন জিতেন্দ্র। বর্তমানে ছবিটির বহির্দৃশ্য নেপালে এবং বম্বে উত্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ-ছবিটির সুরকার হলেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর ধীরেন্দ্রলাল পরলোকগমন করেছেন। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

দুটি মনোজ্ঞ প্রামাণ্য চিত্র

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণে শ্রীবিভূতি রায় নবাগত নন্, তার নতুন ছবিদুটিও ('আপহি সব কুছ' ও 'খবরা জেবে পিছে') তাঁর পূর্বসুনাম অনুযায়ী নতুনত্বের স্বাদ বহন করে। খনির শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখেই ছবিদুটির বিষয়বস্তুকে রাখা হয়েছে এবং সম্ভবত ভাষা ও সংলাপও তাই হিন্দীতে। প্রথম ছবিতে দুই বিপরীত চরিত্রের শ্রমিকের জীবনযাত্রা ও ফলস্বরূপ তাদের মানসিক উন্নতি অবনতির সংগে আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের ভাগ্যের বিপর্যয়কে চিত্রায়িত করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে প্রথমটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত নাট্য ও অতিনাটকীয় রসের প্রাধান্য, তবে সেটা বরং অশিক্ষিত খনি-শ্রমিকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে অতিপ্রয়োজনীয়। ফ্লাশব্যাক পদ্ধতিতে জনৈক শ্রমিকের অসাবধানতা ও সময়ানুবর্তী না হওয়ায় তার ফলস্বরূপ তাকে কিভাবে একটি পা হারিয়ে ভিখারী সাজতে হোল তারই কাহিনী।

ছবিদুটি যদিও প্রামাণ্য চিত্র, তবে দেখতে বসে কিন্তু কাহিনীচিত্রেরই স্বাদ পাওয়া গেছে। টি ভি ফিল্মের দিকে দৃষ্টি রেখেই ছবিদুটো সম্পূর্ণ আগাগোড়া ষোল মিমি-তে তোলা হয়েছে এবং সে-ব্যাপারে টেকনিক্যাল দিকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ক্যামেরার কাজে শ্রীঅঞ্জন গুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদনা (রমেশ যোশী) ও অন্যান্য বিভাগের কাজ যথাযথ। সংগীতের ব্যবহার সুখশ্রাব্য (সুশোভন চক্রবর্তীর পরিচালনায়)। ভারত সরকারের খনি সুরক্ষা সংস্থার প্রযোজনায় শ্রীবিভূতি রায়ের এ-ছবিদুটি শুধুমাত্র খনি-শ্রমিকদের কেন, সাধারণের কাছেও আকর্ষণীয় হবে।

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব

ইস্ট ক্যালকাটা সিনে ক্লাব ১৮ই ও ২৫ ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় ইন্টালী টকীজ ও প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথাক্রমে দুটি চেক চিত্র (১) দি ট্র্যাপ, ও (২) রোমিও জুলিয়েট এ্যান্ড ডার্কনেস কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন।

সাবার্বন ফিল্ম্যান সিনে ক্লাব

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার সকালে প্রাচী সিনেমায় স্ট্যানলী কুব্রিক পরিচালিত 'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' ছবিটি দেখানো হবে।

'ডক্টর স্ট্রেঞ্জলাভ' দুর্ধর্ষবিজ্ঞান কাহিনীর মজাদার ছবি। উন্মাদ রোগগ্রস্ত এক বিমান-সেনাধ্যক্ষ নির্দেশ দিলেন রাশিয়ায় হাইড্রোজেন বোমাবর্ষণের, সে নির্দেশ যান্ত্রিক নির্দেশ, কিছুতেই কেউ রোধ করতে পারে না। এমনকি আমেরিকার প্রেসিডেন্টও বোমা বোঝাই বিমানগুলোকে ফিরিয়ে আনতে না পেরে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য হলেন পৃথিবীকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে।

গত রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারী মেট্রো সিনেমায় 'ফারেনহাইট-৪৫১' ফিল্মের প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি অশিষ্ট মন্তব্য জনৈক সদস্যের মুখে শোনা গিয়েছিল, আগামীতে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সে বিষয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবেন।

কোন্নগর, বিবেকানন্দ ক্লাব 'যুগনায়ক'

স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব থেকে তিরোধান জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর যুগনায়ক সুযোগপযোগী নাটক অভিনয় করে ক্লাব সদস্যগণ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন নাট্যকার স্বয়ং। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রায় কয়েক সহস্র দর্শক সমক্ষে দীর্ঘ সাড়ে-চারঘণ্টা ব্যাপী নাটকের এই প্রথম অভিনয়। প্রতিটি দৃশ্যই দর্শকমন জয় করে। এই দীর্ঘ নাটকে কোথাও দর্শকবৃন্দ অসঙ্গতি মনে করেননি।

আজকের দিনে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন, গিরিশ ঘোষের বক্তব্যসমূহ জনসমক্ষে তুলে ধরায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নাট্যকার। স্বামীজীর চিন্তা আজ ভারতচিন্তা হোক নাটকের মধ্যে বার বার এ বক্তব্য প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রধানদের অভিনয় করেন (রামকৃষ্ণ) অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, (বিলে) বিমল মুখার্জি (বিবেকানন্দ) প্রদ্যোতকুমার দাশগুপ্ত, (গিরিশ) অনুপ বাড়ুজ্যা, (নিরঞ্জনানন্দ) সুবেন্দু চৌধুরী, (ভুবনেশ্বরী) রেখা দাস (নিবেদিতা) বাণী লাহা (বাউল) বাদল কুণ্ডু (আলোয়ারের মহারাজ) দীপক দত্ত।

আবহসঙ্গীত, আলোকসম্পাত, মঞ্চ-পরিচালনা, খুবই প্রশংসনীয়। নাট্য-নির্দেশনায় শ্রীচক্রবর্তী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন—প্রথম দৃশ্যটি মনে রাখবার মত। কাহিনীর গতির সাথে অভিনয়ের সুরটি যেন একই সুত্রে বাঁধা। যার ফলে নাটকীয় সংঘাত ও নাট্যমুহূর্তগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দলগত অভিনয় এই নাট্যগোষ্ঠীর সম্পদ।

ব্যাঙ্গালোরে সি-এল-টি :

প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতির নিমন্ত্রণে শিশু রঙ্গমহলের একটি দল ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠান করবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। ২৭ ও ২৮এ জানুয়ারী রবীন্দ্র কলাক্ষেত্রে সি-এল-টির তিনটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। লাল সুন্দর, ছিচকে, বুড়ো আংলা, [illegible] ও লালচে বুড়ো ব্যাঙ্গালোরের সুধী মহলকে এক নতুন জগতে নিয়ে গিয়েছিল। "এমনটি কখনো দেখিনি" এই কথাই তাঁরা বারবার বলেছেন। প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

২৬ ও ২৯ তারিখে শিশু রঙ্গমহলকে এক বৈকালিক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করেন যথাক্রমে জুনিয়ার চেম্বার ও মহীশুর সরকার। ৭০ জনের এই দলটিকে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। মহীশুরে সব আয়োজনের জন্য [illegible] সম্ভব হয়নি। ব্যাঙ্গালোরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধা বসু, শ্রীমতী টাকার (Tucker), [illegible] শালিনী [illegible] সমাজসেবীরা শিশু রঙ্গমহলের [illegible] মত ব্যক্ত করেছিলেন।

শিবরাত্রিতে সারা রাত ধরে যাত্রা গান

শিবরাত্রি উপলক্ষে ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত ৯টা থেকে পূর্বশ্রী প্রেক্ষাগৃহে সারা রাত ধরে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন হয়েছে। এ বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাত্রা দল নব-রঞ্জন অপেরা দুটি নতুন পালা 'মাইকেল মধুসূদন' ([illegible]) অভিনয় করবে এবং দেবীগড় [illegible] করবেন। এই সঙ্গে অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকছে ক্যালকাটা মেরী ক্রেকার্স কর্তৃক সপ্তবর্ষীয়া শিল্পী নিবেদিতার পরিচালনায় নৃত্যগীতবহুল নাটিকা 'ঝড়ের'।

মেঘে ঢাকা তারা

আগামী বুধবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল, সন্ধ্যা [illegible] এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (শ্যামবাজার) কালচারাল এসোসিয়েশনের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীদি-[illegible] 'মেঘে ঢাকা তারা' অভিনীত হবে। নাটকটি পরিচালনা করবেন [illegible] শ্রীঅসিতকুমার চট্টো-পাধ্যায় ও সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেছেন [illegible] শ্রী কে এম সাকসেনা।

প্রতিদ্বন্দ্বীদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, প্রাণপাত পরিশ্রম করে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেওয়ার প্রয়াস, কোনো কিছুরই লক্ষণ তাঁদের আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ চেষ্টা থাকলে এবং বুদ্ধিতে টান না পড়লে মণ্টি মার্চেণ্ট অন্ততঃ সেদিন আরও কিছু পয়েন্ট পেতে পারতেন বা দর্শকদের উপভোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারতেন। কারণ, দু-একবার তিনি কিনা নেটের ব্যাকহ্যাণ্ড ফ্লিকে প্রতিদ্বন্দ্বিদের অবাক করে দিয়েছিলেন।

জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বীরা মার্চেণ্টের দক্ষতার ওপর এতোটুকু শ্রদ্ধা না রেখেই অনেকবার আলগা ভাবে বল তুলে মার্চেণ্টকে ব্যাকহ্যাণ্ড চালাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব সুযোগ সদ্ব্যবহারে মার্চেণ্টের মন কোথায়? খেলতে হয় তাই যেন তিনি কোর্টে নেমেছিলেন। মীর কাশিম আজিও অবিকল তাই। পারা না পারা স্বতন্ত্র কথা, চেষ্টায় ও পরিশ্রমে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক পণে তিনিও উজ্জীবিত হতে পারেন নি।

দেখে মনে হলো যে মনের দিক থেকে তাঁরা রীতিমতো আলগা। প্রতিযোগিতার আসরে এসে যাঁরা মনের এমন শিথিল ভাব বজায় রাখতে চান তাঁদের দিয়ে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না, তা তাঁদের যতো বড়োই কেন না সুযোগ সুবিধে ছড়িয়ে রাখা হোক।

সেদিক থেকে অনেক [illegible] করেছে খোদাইজি। তাই তিনি অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে নজরে পড়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পেরেছিলেন। কলকাতায় খোদাইজির সেরা খেলা সিগেও ইতোর বিরুদ্ধে। দুজনেই দু দেশের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। ইতো রাশ আলগা করেননি। তবুও খোদাইজির পক্ষে একটি গেম ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। খোদাইজি তিন নম্বরী জাপানী তোকুয়াস নিসির কাছ থেকেও একটি গেম পেয়েছিলেন, কিন্তু সেটি একেবারেই ফাঁকতালে তাঁর পক্ষে এসে যায়। কারণ ১৭-৯ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার পর নিসি প্যাভেলিয়নের দিকে চোখ রেখে হঠাৎ আলগা হাতে টুসকো, চটকদার মার মারার বিলাসিতাকে মাথায় তুলে নেন। আর সেই ফাঁকেই খোদাইজি গুটি গুটি পায়ে এগোতে থাকেন। খোদাইজির পয়েন্ট যখন চৌদ্দ আর নিসির কুড়ি তখনও নিসির মাথায় পোকাটি নড়ে-চড়ে তাকে নিরর্থক বাহাদুরি খেলা খেলার জন্যে তাগিদ জানাচ্ছিল। নিসি সেই ডাকে সাড়া দিতেই দ্বিতীয় গেমটি তাঁর বেহাত হয়ে যায়।

এই গেম পাওয়াতে নয়, সিগেও ইতোর কাছ থেকে একটি গেম ছিনিয়ে নেওয়াতেই খোদাইজির বড়ো বাহাদুরী। যে দেশে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বাস সে দেশের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় যে কি বস্তু চোখে না দেখেও তা আন্দাজ করা যেতে পারে। তাই ওই মুহূর্তে খোদাইজিকে যাঁরা দেখেননি তাঁরাও দূর থেকে খোদাইজির তারিফে অসঙ্কোচে তালি বাজাতে পারেন। তবে ওই খোদাইজিই হলেন ভারতীয় টেবল টেনিসের প্রথম সারির খেলোয়াড় গোষ্ঠীতে সবেধন নীলমণি! অবশিষ্টরা যদি মনের দিক থেকে এখুনিই আঁটোসাঁটো হয়ে মেহনতে গা ঢালতে না চান, তাহলে বর্তমানে তো নয়ই, ভবিষ্যতেও কোনো স্বপ্নের আশায়ও ওদের দিকে আমাদের না তাকানোই ভাল।

আধুনিক কালে যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াভূমিতে হালকা মন আর আলগা কাঠামোর ক্রীড়াবিদ বেমানান। চাহিদা শুধু শক্ত সমর্থ, রীতিমতো মজবুত চরিত্রদেরই। দরকার সামগ্রিক কাঠিন্যের। সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটির সন্ধানেই আমার সুপারিশ এই যে, যেসব ভারতীয়দের বিদেশে পাঠানো হবে বা বিদেশীদের সামনে দাঁড় করানো হবে তাঁদের যেন অনেক আগেই জিমনাসিয়ামে বা অ্যাথলিট ট্র্যাকে খাটতে পাঠানো হয়। তাঁদের মুখের ওপর বলা হোক, পাসপোর্ট চাও তো মেহনত করো।

জাপানীরা খেটেছেন, আজও খাটছেন। তাই তাঁরা থাকতে মাঝকোর্টে উজ্জ্বল প্রাণবন্যায় ভাটা পড়ে না। এমন কাজের ভূমিকা শুধু কাজকর্মই নয়, নরনারীরও। খাটতে খাটতে তাঁরা শারীরিক সম্পদ এমন বাড়িয়েছেন যে দম বারবার সময় সমস্ত পথ পা ফেলেও কাজের কাজ গুছিয়ে নিতেও তাঁদের ভাবনায় না। লক্ষ্যটি হাঁক লাগানো এবং মাথা [illegible] চিন্তার খোরাক। [illegible] দুটিতে দেখা যাক।

শেকহ্যাণ্ড নয়, জাপানীরা অনেকেই পেন-হোল্ডার গ্রিপে খেলেন। কলম ধরে লেখার রীতি অনুসরণ করেই তাঁরা র‍্যাকেটটি ধরেন। ধরা তো নয়, যেন বজ্র-আঁটুনি! খেলা চলতে থাকার সময় মুঠি শিথিল করে বাঁধন বা গ্রিপ বদলে নেওয়া যায় না। কাজেই ব্যাকহ্যাণ্ড মার মারা ওঁদের পক্ষে সম্ভবও নয়। অথচ ব্যাকহ্যাণ্ডে বল আসে নিত্য নিয়মিত। কি করে সামলান সেগুলো? সামলান যেন ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ডে সাজিয়ে নিয়ে।

ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ড বানাতে চোখের পলকে শরীরটিকে এক ধারে, টেবিল থেকে আরও দূরে টেনে নিয়ে যেতে হয়। আর তার জন্যে যে শারীরিক তৎপরতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও শক্তির প্রয়োজন তা ওঁরা জুটেই, সেটিই জোগাড় করে নিয়েছেন। শেকহ্যাণ্ড গ্রিপে খেলতে বাড়তি প্রয়োজন জোগাতে অস্বাভাবিক পরিশ্রম হয়তো করতেই হতো না। কিন্তু বাড়তি মেহনত ওঁরা হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। ওঁদের দেখাদেখি চীন, উত্তর কোরিয়া এবং প্রাচ্যের আরও কটি দেশ।

এই শারীরিক সম্পত্তিই যে মূল মূলধন সে কথা জাপান ও প্রাচ্যের আরও কটি দেশ জানে। তাই র‍্যাকেটের একপাশ থেকে স্পঞ্জ, রাবার ইত্যাদি ছেঁটে ফেলে দিতে তাঁদের কুণ্ঠা জাগেনি। ওগুলো ওঁদের কোনো কাজেই আসে না। র‍্যাকেটের একটি পিঠ তাঁরা ব্যবহারই করেন না। তাই তাঁদের সব মারের প্রয়োগই ফোরহ্যাণ্ডে। হাতের র‍্যাকেটের অকেজো পিঠটিকে দেখলেই বোঝা যায় যে, অসহজ পথ পরিক্রমায় র‍্যাকেটধারীরা আগে থেকেই বাড়তি পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। আর সেই প্রস্তুতি একদিনের নয়। প্রস্তুত হবার পথে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে ওঁরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছরও কাটিয়ে দিয়েছেন।

একালের ক্রীড়া মহলে এই কথাটি বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত যে, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের খেলোয়াড়েরা কবে সেই পরিচিত বাক্যের মূল্য বুঝে নিতে এগোবেন? ওঁরা যদি সাবেকী র‍্যাকেট ছেড়ে একপিঠে অকেজো র‍্যাকেট হাতে তুলে নেন তাহলে বোধ হয় অনেকখানি চোখে পড়ে, ব্যাকহ্যাণ্ডকে ফোরহ্যাণ্ড বানাতে দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি করতে বাধ্য হবেন। তাই প্রশ্ন, জাপানী-চীনা র‍্যাকেটই কি আমাদের টেবল টেনিসের মান উন্নয়নে বড় দাওয়াই?

ভিক্টর বার্না একদিন বলেছিলেন যে, চীনা-জাপানীরা কেন পেনহোল্ডার গ্রিপে র‍্যাকেট ধরে সহজ পথটি অসহজ করে তুলছেন জানি না। শেকহ্যাণ্ড গ্রিপে র‍্যাকেট ধরলে কি তাঁরা সহজেই আরও ভাল খেলতে পারতেন না? হয়তো পারতেন। কিন্তু তা করলে হয়তো চীনা-জাপানীরা এতোটা খাটার কোনো তাগিদ অনুভব করতে পারতেন না। তাঁরা ইচ্ছে করেই কঠিনতর পথ বেছে নিজেদের ফাঁকি দিতে চাননি। তাই নিজেরাও ফাঁকিতে পড়েননি। তাঁরা যে এক আদর্শ তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

তাঁরা কেউ [illegible] নন। শুধু শোভাবর্ধন করতেই তাঁরা কোর্টে নামেন না। তাঁরা সব জীবন্ত চরিত্র। তাদের উচ্চ আদর্শেই প্রতিপক্ষকে ঝাঁকিয়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। কে অবশিষ্টদের কাছে যে তাঁরা এই ধারণা পৌঁছতে পারেননি?

সূচনাতেই বল করতে নামেন অধিনায়ক সোবার্স। দলের অত্যন্ত দুর্যোগ সময়ে দীর্ঘ ৩৬৫ মিনিট ব্যাট করে এবার তিনি ব্যাট ছেড়ে বল দিতে নেমেছেন। ব্যাট ও প্যাড ছাড়ার জন্যে মাঝে যা মাত্র ২০ মিনিট বিশ্রামের সময় হাতে পান। মাঠের দর্শকেরা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে সোবার্সের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন—তিনি যে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'অল-রাউণ্ডার'। নট আউট ১১৩ রান করে ব্যাটিংয়ে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন এবার বোলিং বাকি। সোবার্স তাঁর দলের সমর্থকদের নিরাশ করেননি। তাঁর ইনিংসের প্রারম্ভিক ওভারেই সোবার্স মাত্র তিনটি বল দিয়ে বরকট এবং ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক কাউড্রের উইকেট পান—ইংল্যাণ্ডের রানের খরের অবস্থা তখন 'ছাড়ে মা ভবানী' অর্থাৎ শূন্য। সোবার্সের এই মারাত্মক বোলিংয়ে ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের আশা নির্মূল হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড তাদের এই প্রারম্ভিক বিপর্যয় রুখতে পারেনি, ১৯ রানের মাথায় আরও দুটো উইকেট (৩য় ও ৪র্থ) পড়ে যায়। আলোর অভাবে খেলতে অসুবিধা হচ্ছে জানিয়ে টম গ্রেভনী যে আবেদন করেন তা মঞ্জুর হলে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯ রানের (৪ উইকেটে) মাথায় ৫ম দিনের খেলা শেষ হয়। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের মাথায় জয়লাভের কোন চিন্তা ছিল না; ৬ষ্ঠ দিনের ৭৫ মিনিটের খেলা পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড যদি টিকে থাকে তাহলে তারা খুবই বর্তে যায়। অর্থাৎ কোন রকমে খেলাটা ড্র করা।

চতুর্থ দিনে হাঙ্গামার দরুণ খেলার যে ৭৫ মিনিট সময়টা নষ্ট হয়েছিল তা খেলা যায়নি। ফলে নির্দিষ্ট পাঁচদিনের খেলাটা ৬ষ্ঠ দিন পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ৬ষ্ঠ দিনের নির্দিষ্ট ৭৫ মিনিটের খেলাতে ইংল্যাণ্ডকে ইষ্টনাম জপ করতে হয়েছিল। এইদিনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের আরও চারটে উইকেট পড়ে যায়। ৬৮ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় যখন খেলা শেষ হয় তখন ইংল্যাণ্ডের হাতে জমা ছিল মাত্র দুটো উইকেট এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৫৯ রানের থেকে ৯১ রান কম। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের ৬৮ রানের মাথায় সোবার্সের বলে ইংল্যাণ্ডের ৮ম উইকেট (ডেভিড ব্রাউন) পড়ে যায়। সোবার্সের এই শেষ ওভারের একটা বল দিতে বাকি থাকলেও ইংল্যাণ্ডের এই ৬৮ রানের মাথাতেই খেলা শেষ হয়। বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা তাঁর ১০ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এই ডি' ওলিভিয়েরাকেই তাঁর বাকি টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনে ইংল্যাণ্ডের সমর্থকদের কাছে লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকতে হবে। চতুর্থ দিনে সোবার্স তাঁর মাত্র ৭ রানের মাথায় ডি' ওলিভিয়েরার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। সোবার্সই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পরিত্রাতার প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা যদি অভিযোগ করেন, ডি' ওলিভিয়েরার এই অক্ষমতার দরুণই ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা হলে তা খুব অন্যায় বলা হবে না।

আলোচ্য দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনে মুষ্টিমেয় গোঁড়া দর্শকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার জন্য স্থানীয় সরকারপক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়দের কাছে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। তাছাড়া স্যার লিয়ারী কনস্টানটাইন, কনরাড হান্ট প্রমুখ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড়রা সমর্থকদের বিক্ষোভ প্রদর্শনের তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দান করেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৯-৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষেই পোর্ট অব্ স্পেনের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত নিয়েই বিরাট আকারের দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধেছিল। প্রায় তিন হাজার মারমুখী দর্শক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অংশ নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

কলকাতার হকি মরসুম

কলকাতার হকি মরসুম সরকারীভাবে গত ৮ ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলা সুরু হয়েছে ১০ ফেব্রুয়ারী। তবে এখনও খেলা মোটেই জমেনি। কারণ, জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ করে বাংলা দল কলকাতায় ফিরে এলে বি এন আর, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং কাস্টমসের খেলা লীগ তালিকায় স্থান পাবে। এইসব ক্লাবের খেলোয়াড় নিয়েই বাংলার হকি দল তৈরী হয়েছে।

গত তিন বছরের (১৯৬৫-৬৭) প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর, ১৯৬৭ সালের বেটন কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, প্রথম বিভাগের নতুন দল ইস্টার্ণ রেলওয়ে—এই চারটি দলের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে অনেকেরই ধারণা। কাগজে-কলমে মোহনবাগান ক্লাব খুবই শক্তিশালী। খ্যাতনামা গুরুবক্স সিং (এবছরের বাংলা দলের অধিনায়ক) এবং মুখোপাধ্যা তো আছেনই, সেই সঙ্গে নতুন দুই নামকরা খেলোয়াড়—ইনামুর রহমন এবং ডি পেস দলে যোগদান করে যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তবে দলে নামকরা খেলোয়াড় আমদানী করে যে সব সময় লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায় না তা বহুবার দেখা গেছে। তা দেখেও কলকাতার অনেক নামী দলগুলি স্থানীয় খেলোয়াড়-দের উপেক্ষা করে বাংলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানীর নীতি ত্যাগ করতে পারেনি।

পরলোকে চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

বেশ কিছুদিন রোগ ভোগের পর গত ৫ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের প্রবীণ ক্রীড়া-সাংবাদিক ও সংগীত-সমালোচক শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'ফরওয়ার্ড' কাগজের রিপোর্টার হিসেবেই তিনি প্রথম সাংবাদিকতার কাজ করেন। সেটা তিন দশকের মাঝামাঝি। এর পর কিছুদিন 'সার্ভেন্ট', 'ইংলিশ ম্যান' ও 'লিবার্টি'তে কাজ করে ১৯৩৬ সালে তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পত্রিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। যুগান্তরের গোড়াপত্তনেও তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা ক্রীড়া-সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় ফুটবল ও রাগবী খেলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ১৯২৬-২৭ সালে বাঙালী রাগবী দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি। সেকালের ইউরোপীয় ক্রীড়াজগতে 'সাঁজু' হিসেবে পরিচিত চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়কে অনেকেই বলতেন, কলকাতার খেলাধুলোর 'জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া'। পশ্চিমবাংলার ক্রীড়া-সাংবাদিক সংঘের ছিলেন তিনি আজীবন সদস্য।

শুধু খেলাধুলোর জগতেই নয়, গান-বাজনার আসরেও এই মিশুকে মানুষটি ছিলেন সকলের চণ্ডীদা। অমৃতবাজার পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তিনি সংগীত-সমালোচনা করতেন। বাংলাদেশের প্রায় সব সংগীতশিল্পীর সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবনের শেষদিকটায় সংগীতে তাঁর অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রতিদিন
প্রতিঘরে
লক্ষ্মী ঘি
সকলকে তৃপ্তি দেয়
LAKHMI
LAKHMIDAS PREMJI
লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার বেশ
সুস্বাদু ও হৃদ্য হয়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

গানের জলসার চিঠির জবাব

গত সপ্তাহে শ্রীমতী বাণী বোস-এর চিঠিখানা পড়লাম। তিনি যে 'গানের জলসায়' প্রকাশিত কানন দেবী পরিবেশিত 'জয়মালা' অনুষ্ঠানের আলোচনা মন দিয়ে পড়েছেন—এটা নিঃসন্দেহে আনন্দের। তবে আমাদের পরিবেশিত তথ্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, কানন দেবীই এই অনুষ্ঠানের পরিবেশিকা প্রথম মহিলা শিল্পী নন, ইতিপূর্বে রুমা গুহঠাকুরতাও এই অনুষ্ঠান যোগ্যতার সঙ্গেই পরিচালনা করেছেন।

এর উত্তরে আমাদের জ্ঞাতব্য তথ্য হোলো এই যে, এ তথ্য উক্ত বিভাগীয় ব্যবস্থাপিকা শ্রীমতী পুষ্প বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাওয়া। পত্রলেখিকার পত্রপ্রাপ্ত শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আরও বিশদ-ভাবে খবর নিয়ে জানা গেল, শ্রীমতী বোস কথিত রুমা দেবীর অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ভিন্ন-গোত্রের। 'চিত্রশালা' শীর্ষক শিল্পীদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট সাক্ষাৎকারের পূর্বপ্রচলিত একটি অনুষ্ঠানে কানন দেবী, রুমা দেবী এবং আরও অনেক শিল্পীকেই উপস্থিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি সে অনুষ্ঠান নয়। জওয়ানদের জন্য প্রচারিত 'জয়মালা' অনুষ্ঠানের পরিবেশনা বাংলা চিত্রজগতের প্রথম মহিলা-শিল্পী কানন দেবীর দ্বারাই সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে। এ তথ্যে কোনো ভুল নেই।

চিত্রাঙ্গদা

অনুবাদ প্রসঙ্গ

'অমৃত'র গত ১ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় শ্রীঅভয়ঙ্কর সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইটার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি কর্তৃক অনুবাদ সাহিত্য প্রকাশের পরিকল্পনা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এর আগেও তিনি 'অমৃত'তে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বহু তথ্যবহুল রচনা প্রকাশ করেছেন। বাংলা বই-এর অনুবাদের ব্যাপারে তাঁর ও 'অমৃত' সম্পাদকের সমর্থন বাংলা-সাহিত্য অনুরাগীদের প্রশংসার দাবী রাখে। এর জন্যে তাঁরা বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

এই নতুন লেখক সমবায় সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা ও সম্পাদক হিসাবে আমি কয়েকটি বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের ধারণা অনুবাদ অতি সহজ কর্ম। স্কুলের পড়ার ও বই-এর মাধ্যমে অনুবাদ করতে আমরা সকলেই ছেলে-বেলা থেকে শিখি বলে এবিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই কাজটিকে কোনো গুরুত্ব দেন না। মূল্য ত নয়ই। কিন্তু এবিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ, যাঁরা কোনো প্রকাশক, লেখক বা সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই জানেন নির্ভরযোগ্য অনুবাদ কত কঠিন কাজ আর সে কাজের জন্যে যোগ্য লোকের কত অভাব এ-দেশে। যেমন তেমন করে লাইনের পর লাইন অনুবাদ করার কথা বলছি না। সত্যিকার অনুবাদ হচ্ছে লেখকের ভাব, ভাষা, তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যের যথার্থ অনুবাদ। সে কাজটা তিনিই করতে পারেন, যাঁর দুটি ভাষাতেই (মূল রচনার ভাষা এবং যে ভাষাতে অনুবাদ করা হবে) সমান দখল প্রয়োজন। লেখকের সাহিত্যসাধনা, তাঁর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে, তাঁর চিন্তার গভীরতা সম্বন্ধে এবং সর্বোপরি লেখকের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সেই দেশের আচার-রীতি-নীতি সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও অনুবাদককে যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। নইলে সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়।

এই সম্পর্কে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিই। প্রশেষ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' আজ ভারত-বিখ্যাত। 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারের জন্যে আজ এই বইটি সর্বভারতীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অনেকে হয়তো জানেন না, একটি বিখ্যাত প্রকাশক সংস্থার পক্ষ থেকে 'গণদেবতা'র ইংরেজি অনুবাদের ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁরা এই বইটি পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন, অনুবাদে, বিশেষ ইংরেজি অনুবাদে এই বই-এর মর্ম প্রকাশ করা কত দুঃসাধ্য ব্যাপার! 'গণদেবতার' পটভূমিকে গভীরভাবে না জানলে এবং চরিত্রগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকলে শুধু বইটির আক্ষরিক অনুবাদে লেখকের প্রতি অবিচারই করা হত। সেজন্যে কাজটির ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীমতী লীলা রায়কে। বাংলা ও ইংরেজিতে তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি বীরভূমের ঐ পটভূমিকা, তার মানুষগুলিকেও তিনি গভীরভাবে চেনেন জানেন। সেজন্যেই ইংরেজিতে এই অনুবাদ সার্থক হয়েছে।

কাজেই অনুবাদের কাজে এক প্রান্তে আছেন লেখক, অন্য প্রান্তে অনুবাদক—কিন্তু মাঝখানে যে সেতুবন্ধ রয়েছে—সেই সেতুবন্ধটি লেখকের সঙ্গে অনুবাদকের আত্মিক যোগসূত্র। লেখকের বইটিই শুধু নয়, লেখকের সব কিছুকে জানতে হবে অনুবাদকের, নইলে এ-কাজে ব্যর্থতা আসবে। আর সেই কারণেই বাংলা থেকে ইংরেজিতে বা ইংরেজি থেকে বাংলায় যেসব অনুবাদ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার হাতে গোনা কয়েকটি ছেড়ে বাকী সবই নিরর্থক ও ব্যর্থ হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে, আক্ষরিক, সাহিত্য হয়নি। তাই পাঠক বাংলা অনুবাদে কোনো বিখ্যাত ইংরেজি বা অন্য ভাষার বই পড়তে চায় না। রস পায় না বলেই।

অনুবাদ কর্মের যে সমস্ত সমস্যা আছে, সেগুলির আলোচনা এবং অনুবাদ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও চর্চার জন্যে 'রাইটার্স গিল্ড'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতায় "ট্রান্সলেটার্স ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আছেন বহু বিখ্যাত ভারতীয় ও বিদেশী ভাষা অভিজ্ঞ পুরুষ ও মহিলা ও অনুবাদকরা। আশা করা যায় এই 'ক্লাব' অনুবাদ-কর্ম সম্বন্ধে কিছু ভাল কাজ করতে সক্ষম হবে।

শেখর সেন
যুগ্ম সম্পাদক, রাইটার্স গিল্ড
সেক্রেটারি, ওয়েস্ট বেঙ্গল
রাইটার্স কো-অপারেটিভ
সোসাইটি লিঃ।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

'অমৃতে' চিত্র সমালোচনা বিভাগে 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা' ছবিটির সমালোচনা পড়ে চিঠিটি লেখতে গিয়েছিলাম, ছবিটি দেখে এসে আর একবার পড়লাম। 'ছোট্ট জিজ্ঞাসা'র কথা ছোট্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ছোট্ট হলেও ছবিটি চমৎকার। আরও চমৎকার গীতা'র ভূমিকা। সংবেদনশীল গীতা'র ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় ও খোকা'র ভূমিকায় শ্রীমান প্রসেনজিৎ-এর অভিনয় বহুদিন মনে থাকবে। 'কোন গানই কাহিনীর প্রয়োজন মিটিয়ে ছবিটির অগ্র-গতিকে সাহায্য করেনি,' কথাটা ঠিক হলেও ছবিটি পরিচ্ছন্ন বা স্বচ্ছ হতে কোথাও বাধে নি। দেখেছে 'খোকা'র টুইস্ট নৃত্য। দৃশ্যটিবটি, বেদনাদায়ক ও হাস্যকর। ঐ অংশটি না যুক্ত করলে ভাল হতো। অথবা দেশাত্মবোধক কোন গীতিকবের সঙ্গে 'খোকা'র কণ্ঠ মেলাতে সাহায্য করলে ছবিটি নিশ্চিত অপূর্ব হতো। যেমন অপূর্ব হয়েছে সেতারী মুক্তাকণ্ঠ ও মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি'র সঙ্গে খোকার পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

দিলীপকুমার মিত্র [illegible],
[illegible]

অমৃত সম্পাদকীয়

সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন শাসন

এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচিত সরকারের বদলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হল। জরুরী অবস্থার জন্যই সংবিধানে এই ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এমন একটা অনিশ্চিত আবহাওয়া বিরাজ করছিল যে, রাজ্যপালের পক্ষে এই ব্যবস্থা সুপারিশ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সাংবিধানিক গণতন্ত্র জনগণের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে। সংবিধানের ওপর বিশ্বাস না রাখলে এক মুহূর্তও আর তা চলবে না। তখন শুরু হয় তার কুব্যাখ্যা, শুরু হয় ক্ষমতার অপব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গে গত কমাস সুস্থভাবে শাসনকার্য চালানোটা কঠিন হয়ে পড়েছিল। মন্ত্রীরা সর্বদাই শঙ্কিত থাকতেন কখন দলত্যাগ ঘটে এবং কখন তাঁদের বিদায় নিতে হয়। দুঃখের বিষয় বিধানসভার অধিবেশন হতেই পারল না এক শ্রেণীর সদস্যের বাধাদানের ফলে এবং স্পীকারের বিতর্কিত রুলিং-এর জট না খুলতে পারার জন্য।

রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের মন থেকে সেই অস্বস্তির ভাব কেটে গেছে। অন্তত এখন প্রতিদিন আইন অমান্য, প্রতিদিন ১৪৪ ধারার শাসন নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন করবে না। শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে হাতে নিয়েই রাজ্যপাল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন এবং সভাসমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এতে বিরোধীপক্ষের বিক্ষোভ কমবে আশা করা যায়। বর্তমান রাজ্যপাল যখন পাঞ্জাবে ছিলেন তখন মজুতদার-কালোবাজারীদের তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন খাদ্যশস্য নিয়ে মুনাফাবাজী করার জন্য। এখানেও তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছেন মজুতদারদের। খাদ্যসংকট নিয়েই পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী গোলমাল ঘটেছে গত কয়েক বৎসর ধরে। খাদ্যসংগ্রহে ব্যর্থতার দরুণ চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল গত বৎসর এ রাজ্যের জনসাধারণকে। এবারেও সংগ্রহের পরিমাণ আশানুরূপ নয়। গত তিনমাস বিদায়ী কোয়ালিশন সরকার প্রতি মুহূর্তেই দুর্ভাবনায় ভুগেছেন। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্তে এবং কঠোরভাবে গ্রামাঞ্চল থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। রাজ্যপালকে এখন এই দায়িত্ব নিতে হবে।

রাজ্যপাল শক্ত লোক। রাজনীতিকরা অনেক সময় নানান চাপে পড়ে সৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে কার্যে পরিণত করতে পারেন না। রাজ্যপালের পক্ষে সেদিক দিয়ে কাজ করার সুবিধা। তিনি ইতিমধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন অবিলম্বে লেভির চাল আদায় করার জন্য। মজুতদার ও জোতদাররা এ নিয়ে কত টালবাহানাই না করেছে। দু দুটো মন্ত্রিসভা হিমসিম খেয়ে গেছে ন্যায্যমূল্যে উৎপাদকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত চাল আদায় করতে। এবারে রাজ্যপালের কড়া হুকুম, দরকার হলে আটক আইন প্রয়োগ করে লেভির চাল আদায় ও মজুত উদ্ধার করতে হবে।

পশ্চিমবাংলার আরেক সমস্যা বেকারসংখ্যাবৃদ্ধি এবং কলকারখানায় অনিয়মিত উৎপাদন। যুক্তফ্রন্টের আমলে এবং তারও আগে থেকে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে শিল্পে মন্দা এবং ঘেরাও নীতির জন্য। তার ফলে শিল্প-নির্ভর পশ্চিমবঙ্গে চরম সংকট দেখা দিয়েছে। বহু শ্রমিক বেকার, শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। সমাজের অর্থনীতিতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের যা আয় হয় তার চল্লিশ শতাংশ হয় পশ্চিমবঙ্গের শিল্প থেকে। সুতরাং ক্ষতিটা একা পশ্চিমবঙ্গের নয়, গোটা দেশের। রাজ্যপালকে এখন তাই জাতির স্বার্থে শিল্পপ্রচেষ্টা পুনরুজ্জীবনের জন্য সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। কৃষি এবং শিল্প—এই দুইয়ের সমস্যা না মেটাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের সংকট কাটবে না। রাজ্যপাল তা জানেন বলেই প্রথমেই এই দুই দিকে নজর দিয়েছেন। এই কাজে আশা করি তিনি দেশের শুভবুদ্ধি মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা পাবেন।

এর পরে আসছে অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের কথা। রাষ্ট্রপতির শাসন চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে তাড়াতাড়ি নির্বাচন করলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা মনে করার কোনো কারণ নেই। কেরলে একবার অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন করেও কোনো দলের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পরস্পর রেষারেষি দূর না হলে এবং সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব গড়ে না উঠলে হাজারটা দলের খিচুড়ি নিয়ে কোয়ালিশনই স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষ চায় পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সৎ ও স্থায়ী সরকার গঠন। রাষ্ট্রপতির শাসন যদি রাজনৈতিক দলগুলোর চৈতন্যোদয় করতে সমর্থ হয় তাহলেই এই পরীক্ষা সার্থক এবং কল্যাণকর হবে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কাছে।

ফ্যাশান প্যারেড

আর না হলেই কানমলা খেয়ে বসে পড়তে হবে। স্বীকার করতে হবে আমি হেরে গেলাম, পারলাম না। কিন্তু বাঁচতে গেলে হার স্বীকার করলে চলবে না—বসে পড়লে অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে না। তাই যেমন চালাবে তেমনি চলতে হবে। এবং এই যেমন চালানো তেমনি চলাটাই হলো ফ্যাশান।

ভবতোষ সাহা

সবাই বলে, আমরা পুরোদস্তুর ফ্যাশানেবল। ফ্যাশানের জগতেই আমাদের বাস। তাই ফ্যাশানেবল হতে আমরা বাধ্য। চোখ মেলে, কান খাড়া করে সব সময় সজাগ থাকতে হয়। কখনো পা টিপে টিপে চলতে হয়, আবার কখনো জোর কদমে ছোটদৌড় জুড়তে হয়। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে এরকম করতেই হবে।

আধুনিক যুগই হলো ফ্যাশানের যুগ। চোখের নিমেষে নতুন ফ্যাশান পুরনো হয়—পুরনো ফ্যাশান রূপ বদল করে এসে আসর জাঁকিয়ে বসে। যতদিন উত্তেজনা থাকে ততদিন সবাই বেশ সে আগুনে হাত-পা সেঁকে নেয়। তারপর ঠাণ্ডা হয়ে এলেই পরমগতি। ঝোঁকটা আমাদের কোন দিকে সেটা ঠিক ঠিক ঠাউরে ওঠাই মুশকিল। এদিকে ফ্যাশানের জন্য চোখের ঘুমকে ছুটি দিয়ে বসে আছি, আর ওদিকে হুজুগে মত্ত হয়ে হয় নয় করে চলেছি। ফ্যাশানের চেয়ে হুজুগটাই দেখি আজকের দিনের মুখ্য শিরোমণির জায়গা নিয়ে বসেছে। সেটা বেশ বোঝা যায়, যখন সেটা বাজারে আসে ভালোমন্দ বিচার না করে আমরা সেটা নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ি। আসল কথা, ভালো-মন্দর বিচারের অবসরই পাই না। তারপর যখন [illegible] জোয়ার ভেসে যাচ্ছে, [illegible]

শুরু হয়েছে, তখন আমরাও হাত-পা গুটিয়ে বসি। ইতিমধ্যে বাজার চলতে ফ্যাশানে বনবন ঘুরেছে। অথচ কে যে এটা ফ্যাশান বলে মাথায় ঢোকালো আবার কখন নামিয়ে দিল সবই দুর্বোধ্য হয়ে গেল। এ যেন সেই শোনা কথাটার মতো, রামবাবু বললেন রামবাবু বাড়ি নেই। আমরা যেন নিজেদের মধ্যে থেকেও নেই। ভাববার অবকাশ পাচ্ছি না। সবাই যেদিকে ছুটেছে আমরাও সেদিকে ছুটেছি। আর মুখে বলি, যুগের সঙ্গে তাল রাখছি। অথচ তাল রাখতে গিয়ে যে নিজেরাই তাল কেটে বসে আছি সেটুকু বুঝতে পারি না—বুঝলেও কিছু করতে পারি না।

অথচ আগাগোড়া ফ্যাশান মানবেতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য। ফ্যাশান বাদ দিয়ে ইতিহাস ভাবা যায় না। হাল-বাকল পরার

পর থেকে ফ্যাশানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে গড়ে উঠেছে ফ্যাশান, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং রুচির অনুযায়ী। এক দেশের ফ্যাশান আরেক দেশের ঈর্ষার কারণ ঘটিয়েছে। ফ্যাশানে ফ্যাশানে প্রতিযোগিতাও কম হয়নি। প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে দুটি ভিন্ন ধরনের

আবিষ্কার। পুরোনো কাসুন্দি বেশি ঘেঁটে লাভ নেই। তবু বলা অসঙ্গত নয় যে, ফ্যাশানের রাজ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় দান শাড়ি—যার মহিমা কিনা বিশ শতকের শেষার্ধেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি বরং বেড়েই চলেছে। তাছাড়া অতীতে আমাদের ফ্যাশানের ঐতিহ্য বহন করে বেঁচেছে অনেকে। পাশ্চাত্যের গাউন নারীমহলে সমাদর লাভ করেছে কিন্তু প্রাদুর্ভাব বিস্তার করতে পারেনি। আজ অবশ্য কোন দেশের নিজস্ব ফ্যাশান পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এই ফ্যাশানকে বলে, ফেরেকল। ভারতে শাড়ী, জাপানে কিমোনো, আরবদের আভরণ নিজস্ব আজো সচল। কিন্তু তাদের দুর্বার গতিতে এমন কি রূপ নেবে এখনি তা বলা সম্ভব নয়। কারণ ফ্যাশানের বদলে আজ পুরোপুরি চলে

গেছে পাশ্চাত্য দেশগুলির হাতে এবং তারাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পোশাকের তথা ফ্যাশানের নিয়ামক।

এই কিছুদিন আগে মিডলেংথ, ম্যাকসি এবং টপলেস স্কার্ট নিয়ে দেশে তুমুল আলোড়ন হয়ে গেল। মিনি পোশাক নিয়ে দেশ-বিদেশে আবার জোর হৈচৈ। কিন্তু সবই বহনারম্ভে লঘুক্রিয়া। পোশাকগুলি বাজারে ঠিকই চলছে। এত হটগোলের মধ্যে একটা মজার ঘটনা ঘটে গেল ইংল্যান্ডে। রাজকুমারী মার্গারেট একটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রচলিত এক ফ্যাশানে। সেটা নিয়ে রাজকুমারীর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হলো। অথচ সেই পোশাকের ঝুল ছিল পা পর্যন্ত। সুতরাং আজকের যুগে বাস করে কেন

ফ্যাশান বা পোশাকটা ঠিক অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে এবং কোন পোশাক শালীনতার গণ্ডি মেনে চলে বলা বড় কঠিন। আজকের যদি অজন্তা বা ইলোরার গুহাগাত্রে খোদিত মূর্তিরা সেই ফ্যাশানে জীবন্ত হয়ে আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে তবে নিশ্চয়ই আমরা দুবে লজ্জায় পড়ে

যাব। অথচ সে যুগে এই পোশাক চালু ছিল এবং যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। না হলে রাজানুগৃহীত ভাস্কর এই পোশাকপরা নারীমূর্তি আঁকার প্রেরণা পেলেন কোত্থেকে? আমরা সভ্যতায় তখন অনেক দেশের পুরোভাগে পদ অধিকার করেছিলাম। সেদিন যা সম্ভব হয়েছিল আজ সেটা সম্ভব নয়। এজন্য দায়ী কি রুচি? ইতিমধ্যে জগৎময় শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করেছে। রুচি নিশ্চয়ই পরিশীলিত হয়েছে। তাই যথা-সম্ভব দেহের মর্যাদা রক্ষাকারী পোশাকই হবে আমাদের ফ্যাশান। আমরা নিশ্চয়ই আবার সেই ছাল-বাকল পরতে চাই না এবং গুহাজীবনও ফিরে পেতে চাই না। সুস্থ-সবল এবং রুচিবান হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। মানবসভ্যতার চূড়োয় উঠে এটাই আমাদের এখন একমাত্র প্রার্থনা হওয়া উচিত।

কয়েকটি দেশ আবার পোশাক-আশাক সম্বন্ধে কিছুটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। পোশাকে আধুনিক হওয়া যায় অথচ রুচি বজায় রাখা যায়, এদিকে তারা নজর দিয়েছে। আমাদের দেশে ব্যাকলেস-স্লিভলেসের দৌরাত্ম্যই যা কিছুটা অনুভূত হয়েছে। অন্যসব তেমন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। শাড়ি এখনো বহাল তবিয়তে নিজের একচ্ছত্র রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। তবে চলতি দুনিয়ার ফ্যাশানের দিকে নজর রেখে বলা যায় যে, নগ্নতার প্রকাশই আজকের ফ্যাশানের মূল কথা। অথচ ফ্যাশান হচ্ছে জাতীয় তথা সভ্যতার অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাঁচতে হলে ফ্যাশান বজায় রাখতে হবেই। লেসের কাজে ইতিমধ্যে রাশিয়া সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে। অবশ্য রাশিয়ার লেসের ঐতিহ্য খুবই পুরনো। তাকে স্বীকার করে নতুন রূপ দেওয়া নিশ্চয়ই কৃতিত্বের। তবে ফ্যাশান আবিষ্কার এবং বাস্তবের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব পশ্চিম জার্মানীর। ফ্যাশানের বাজারে এরা সব সময়ই একটা বড়ো বাতাস বইয়ে চলেছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছুটা দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। ফ্যাশান নিয়ে এত যে কারবার সে কথা মনে রেখেই পশ্চিম জার্মানীর এদিকে চিন্তা করা উচিত। তবে এদের স্ট্রীপের ফ্যাশান প্রশংসনীয়: আধুনিকাদের রুচিমাফিক স্ট্রীপ তৈরি করার দিক থেকে কৃতিত্ব এদের অবশ্য স্বীকার্য আর সেই সঙ্গে কয়েকটি ফ্যাশানও—যার মধ্যে সত্যিকার শিল্পীমনের পরিচয় আছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে আজকের ফ্যাশানটা কি দাঁড়াচ্ছে তা একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছে ছিল বহুদিনের। না হলে আজকের বহু বিতর্কিত ফ্যাশানের পুরো চেহারাটা জানা হচ্ছিল না। সেই সঙ্গে আরো জানা প্রয়োজন ছিল ভারতীয় পটভূমিতে তা কি রূপ নিচ্ছে। মিনি পোশাকের পাশাপাশি শাড়ির বাহার পড়েছে না আরো পিছিয়ে পড়ছে কিনা জানার সুযোগ করে দিল জে. কে. হেলেন কার্টিস ও কোরিনা আয়োজিত ফ্যাশান প্যারেড—ভারতীয় এবং পশ্চিমী ফ্যাশানের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী।

ফ্যাশান প্যারেডের নাম ছিল স্প্রিং বু উইন্টার। পরিচালকের ঘোষণায় কান পাতলাম। হানিমুন স্পেশাল পোশাকে মডেলের উচ্ছ্বসিত পদচারণা এবং যন্ত্রবাজনার তালে পরিবেশ তখন গম্ভীর আবেশ বিস্তার করেছে। হানিমুনে আঁটোসাটো পোশাকের সুন্দর বৈশিষ্ট্য—পুরোটাই ইউরোপীয়। মনে হলো হানিমুন ব্যাপারটাই তো পরদেশী। তারপর সুইম-স্যুট, প্লে-স্যুট চোখে বেশ কিছুটা মায়াঞ্জন পরিয়ে দিল। অনেক দেশে এ দুটি নিয়ে

শ্রীমতী গৌরী সান্যাল, আর্মাভাস মণ্ডল ও পিয়া ঘোষ

বিউটি কনটেস্ট

নন্দিতা সেন

উত্তুরে হাওয়ার প্রচণ্ডতায় শীত-কাতুরে প্রকৃতি একান্ত রিক্ত। তবু নিজেকে সাজানোর চেষ্টায় তার কসুর নেই। মরশুমী ফুলের বাহারে সে নিজের দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির এই নতুন আভরণ মানুষকেও টানে। শীতে সবাই তাই সাজগোজ করে। কিন্তু সুন্দরের অনুপস্থিতিতে সৌন্দর্য তখন চাপা পড়ে থাকে। চলে প্রহর গণনা। তারপর একসময় ঢাকনাটুকু সরে যায়, প্রতীক্ষায় অবসান হয়। শীতের কুহেলি পথ বেয়ে বসন্ত আত্মপ্রকাশ করে। সুন্দরের স্পর্শে সুন্দর উন্মুখ চোখ মেলে ধরে—সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। এমনি চলে আসছে আবহমানকাল ধরে। শীতে যা থাকে, চাপাচুপি দেওয়া বসন্তে জীয়ন কাঠির ছোঁয়া লেগে তা জেগে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এ-কি রূপ দেখছ আজ। সারা শীত ধরে যার প্রস্তুতি বসন্তে হয় তারই সমাপন। বসন্ত তাই মধু-ঋতু। সুন্দরের উপস্থিতিতে সৌন্দর্য উপভোগের চেতনা আমাদের ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে, রসে অবশ-বিবশ করে।

শীত যখন ফিকে হয়ে এসেছে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস মনে রঙের মায়াজাল বিস্তারের চেষ্টা করছে, তখনই ধুম পড়ে গেল রূপসী নির্বাচনের। রূপসীরাও হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন নিজেদের রূপের যশ সম্পর্কে। তাই যাচাই করে দেবার জন্য আর তর সয় না। একে একে এসে হাজির হচ্ছেন—[illegible] আসে যায়। রূপে পাল্লা দিয়ে নিজেকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত করার এ সেই চিরন্তন বাসনা। পৃথিবীর সব দেশের মেয়েদের মধ্যেই এই বাসনা দিনকে দিন বলবতী হচ্ছে। সবকিছুর যখন বিচার হয় এবং নির্দিষ্ট মানদণ্ডে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা আছে, তখন সৌন্দর্য কেন পিছনে পড়ে থাকবে! তাই সে সজাগ হয়েছে। সুন্দরীরা এগিয়ে এসেছে। নিজেদের সৌন্দর্য প্রমাণে তাদের উৎসাহ আজ নিছক সখের নয়,—গভীর অর্থ বহন করে আনে এই সৌন্দর্যের বিচার এবং প্রতিযোগিতার আসর।

সৌন্দর্যের এমন নিরিখ আগে [illegible]

দেখে সৌন্দর্য-সাধনা এবং উপকরণের অন্তহীন বিবরণ পাওয়া যাবে। কুমকুম অলঙ্কার থেকে শুরু করে বস্ত্র আভরণ সবই ছিল সেদিন সাজিয়ে গুছিয়ে মনো-মত করে তোলার উপকরণ। সেদিন নারী সেজেছে, রূপে একে অপরকে টেক্কা দে দিতে না চেয়েছে এমন নয়। বরং রূপ সচেতনতা সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সুন্দরের বন্দনা গান আমাদের সেকথা বারবার মনে পড়িয়ে দেয়। কালিদাসের কালে সুন্দরী অগুরু মেশানো জলে স্নান সেরে ধূপের ধোঁয়ায় শুকিয়ে নিতো চুল। তারপর চলতো প্রসাধনপর্ব। কর্ণে কুণ্ডল, গলায় রত্নহার, হাতে বাজু-বন্ধ, বেণীবন্ধে শোভা পেত কুরুবক ফুল, অঙ্গে চন্দনের প্রলেপ। তারপর স্বচ্ছ জলা-শয়ের ধারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেই হয়তো চমকে উঠতো—এতো যে তার রূপ তা অজানা রয়ে গেল অনেকের কাছে। বহুজন তার রূপের তারিফ করলো না। শুধুমাত্র গৃহকোণে বসে নিজের রূপে নিজেই সে চমৎকৃত হলো অথবা গর্বিত করেকজন। তবু মাঝে-মধ্যে রূপের খ্যাতি উঠোনের সীমান্ত পেরিয়ে অনেকের কানে গিয়ে উঠতো। আর তখনই বাঁধতো অনর্থ। দুর্বলের উপর শক্তিমানের অত্যাচার তার শান্তিটুকু কেড়ে নিত। আবার উভয়পক্ষ শক্তিমান হলে তো কথাই ছিল না। এমনি হয়েছিল চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে নিয়ে। সেকথা ইতিহাস সগৌরবে ঘোষণা করে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এমনি করেই রূপের জৌলুষ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। শুধু ভারতবর্ষে নয় ক্লিওপেট্রা এবং হেলেনও এই ইতিহাসে উপকরণ যুগিয়েছে। আবার মহাভারতের পাতায় সুভদ্রা-হরণেও অর্জুনের এই রূপ-তৃষ্ণার কথাই আমাদের মনে পড়ে যায়। রূপের আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক এবং রূপচর্চা নারীর জন্মাধিকার। নতুন দিন আসবে, ইতি-হাসের পাতা ওল্টাবে কিন্তু রূপচর্চার এই চিরন্তনতা কোনদিন নষ্ট হবে না। আশে-পাশের ঘটনায় তাই মনে হয়।

সেই অতীত দিনের তুলনায় আজকের পৃথিবী অনেক ভিন্ন। সেদিনের কোনকিছুর সঙ্গে আজকের মিল খুঁজে পাওয়া দায়। তবু মিল আছে, আর সে মিলের একটিই হলো রূপ-তৃষ্ণা। মানুষ আজ সব ব্যাপারেই পরীক্ষায় অগ্রণী হয়েছে। বিদ্যা-বুদ্ধি,

প্রথম
নর্মাদিন ভারিক

কুশলতা এবং শক্তিমত্তায় নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ তার অনন্ত-অসংখ্য। তাই রূপ নিয়েই বা সে পিছিয়ে থাকবে কেন? বিদ্যা-বুদ্ধির গুণে একটা উপকারিতা না থাকলেও রূপের দাম থাকতে পারে। তখন এই বাছাবো রূপই তার সম্পদ। একেই বিশ্বের বাজারে সে বাজি মাৎ করে দিতে পারে। বিশ্ব-সুন্দরী গ্রীক কুমারী এই রূপের জোরেই সারা পৃথিবীতে এত নাম-ডাক করেছে। অর্থ উপার্জনের পথও তার অজস্র। সিনেমা, থিয়েটার, টেলিভিশন, মডেল এবং ফ্যাশান-শোয়ে তার কত কদর। তার এক-একটি দেখার দাম কয়েক হাজার টাকা। সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতায় একবার উৎরে যেতে পারলে এইসব সম্মান আসে একসঙ্গে এবং অভাব-নীয়ের মত। এতটা অবশ্য হয় কেবলমাত্র বিশ্ব-সুন্দরীর বেলায়। কিন্তু অন্যান্য নির্বাচিত সুন্দরীরাও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার অজস্র সুযোগ পায়। তাই হাতের কাছে এমন সুযোগ পেয়ে কে আর হাত-ছাড়া করতে চায়। বরং রূপসী প্রতি-যোগিতায় নেমে বরাত ঠুকে দেখা অনেক ভাল। 'সিসেম ফাঁক' যদি হয় তো ভালই, না হলেও 'সিসেম বন্ধ' হওয়ার কারণ নেই। সবাই তো আর শুধু রূপের মোহ ছড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় না এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সেজন্য যোগ-দানও করে না। তারা চায় নিছক স্বীকৃতি। যে রূপকে তারা দিনে দিনে করে তুলেছে অপরূপ, তার সহর্ষ অভিনন্দন, এই সঙ্গে চায় দেশ বেড়ানোর এক দুর্বার আকর্ষণ। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার আসরে রূপসীদের তাই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। বম্বের বিজয়ী ভারত-সুন্দরী শ্রীমতী সুমিত্রা সেন তো বলেই ফেলেছে, ক্যালিফোর্ণিয়ার সমুদ্র, হ্রদ, পাহাড়, অরণ্য আমায় যেন ডাক দিচ্ছে এবং আমি ক্রমাগত রোমাঞ্চিত হচ্ছি যে, বিশ্বের দরবারে আমাকে দাঁড়াতে হবে—বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতার আসরে। উনিশ বছরের তন্বী শ্রীমতী সুমিত্রা পেশায় রিসেপশনিস্ট। আগামী এপ্রিল মাসে ক্যালিফোর্ণিয়ার লংবীচে অনুষ্ঠিত মিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিযোগিতায় তিনি অংশ নেবেন। এর ওপরে আছে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার। সেদিক থেকে বিচার করে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় আমাদের মেয়েদের যোগদান খুবই তাৎপর্য-পূর্ণ। তবু সব জড়তা কাটিয়ে, সংশয় জয় করে তারা পাদ-প্রদীপের সামনে দাঁড়াচ্ছে এটা আশার কথা। পরের কথা পরে বিবেচনা করা যাবে। সুযোগ পেলে যে তারা হাতছাড়া করবে না সেকথা বলাই বাহুল্য।

মহোৎসবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবার কলকাতা শহরে তিনটি সৌন্দর্য প্রতি-যোগিতার আসর বসে। প্রথমটির আয়োজন করেন প্রসাধন-দ্রব্য প্রস্তুতকারক সাহিব সিং-এর সহযোগিতায় 'ইভস উইকলি'

তৃতীয়
জয়শ্রী দাশগুপ্ত

দ্বিতীয়
ফ্লোরেন্স এজেকেল

পত্রিকা। শ্রীমতী মালা প্রধান এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হন।

অপর দুটি প্রতিযোগিতার আসর বসায় প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুতকারক জে কে হেলেন কার্টিসের সহযোগিতায় ফেমিনা পত্রিকা। এর প্রথমটা হলো 'টিনস বিউটি কনটেস্ট'। গতবারেও এই প্রতিযোগিতায় সাড়া বেশ ভালই পাওয়া গিয়েছিল। এবছর প্রতিযোগীর সংখ্যা কম ছিল না। প্রতিযোগীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রতিযোগিতার প্রাণ-ধর্মকেই সূচিত করছিল। এতে প্রথম স্থান অধিকার করে গৌরী সান্ডেল এবং প্রথম ও দ্বিতীয় হয় যথাক্রমে আশাডাস মুখল ও প্রিয়া ঘোষ। এদের সবাই এবার পুরস্কারে সন্তুষ্ট। বৃহত্তর প্রতিযোগিতার আহ্বান এদের আসবে আগামী বছরগুলিতে। সেদিন এদের উৎকর্ষ দেখবার আশায় আমরা এখন থেকেই প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

এবার আসা যাক কলকাতা রূপসীর কথায়। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল কুড়িজন। সবাই বেশ সপ্রতিভ। ওদের গতিভঙ্গী এবং স্মার্টনেস পরীক্ষা করার ছলে পরিচালক যখন ওদের সঙ্গে হাস্যমুখর বাক্যালাপ করছিলেন, তখনই এটা বেশ বোঝা গেল। সবাই বেশ চটপটে এবং সৌন্দর্যের মাত্রাজ্ঞানে বেশ অভিজ্ঞ। পরিমিত হাসি এবং তেমনি চটুল ভঙ্গিতে ওরা পরিচালকের কথার উত্তর দিচ্ছিল। ফলে সারাক্ষণ অনুষ্ঠানের মধ্যে বেশ একটা প্রাণের আমেজ অনুভব করা গেছে। বাছাই চলে দুবার। তৃতীয়বারে হয় চূড়ান্ত নির্বাচন। প্রতিযোগীর সংখ্যা তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেক কমে এসেছে। সকলেরই বুক দুরুদুরু। কিন্তু মুখে সেই মিষ্টি হাসি, চলাফেরায় একই স্মার্টনেস। এইভাবে তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত হলো।

বিচারকের রায় ঘোষিত হলো। অপেক্ষাকুল দর্শকেরা প্রচণ্ড হাততালিতে ফেটে পড়লেন। কলকাতার 'মিস ফেমিনা' নির্বাচিত হলেন শ্রীমতী নর্গিস আরিফ তাকে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিল গত বছরের কলকাতা রূপসী শ্রীমতী নাতালি উড। এছাড়াও শ্রীমতী আরিফ পেল নগদ পাঁচশো টাকা, উষা সেলাইকল এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী। শ্রীমতী ফ্লোরেন্স এজেকেল এবং শ্রীমতী জয়শ্রী দাশগুপ্ত যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। সবাইকে পুরস্কার দেন টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সংবাদপত্র গোষ্ঠীর ডিরেক্টর শ্রীমতী রমা জৈন।

বিজয়িনীদের একটু বিস্তৃত পরিচয় দিই। শ্রীমতী আরিফ স্কুল-জীবন শেষ করে গৃহসজ্জায় তালিম নিচ্ছে। আমেরিকায় তার গৃহসজ্জা ও সৌন্দর্য-চর্চা শিখতে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। শ্রীমতী এজেকেল সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখছে আর শ্রীমতী জয়শ্রী স্কুলের ছাত্রী।

শ্রীমতী আরিফের প্রসঙ্গে আবার একটু আসা যাক। তার প্রতিযোগিতা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। বরং এই প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী হয়ে তার প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হলো। এরপর 'মিস ইণ্ডিয়া' নির্বাচন হবে। সে প্রতিযোগিতায় অন্য শহরের প্রতিযোগীর সঙ্গে এর লড়াই।

।।প্রথম তরঙ্গ।।

'তুই শেষ পর্যন্ত এমন ভুল করলি? তোর মতন তেজী মেয়ে...' অংশুলা বলল।

স্বাতী উদাস হেসে বলল, 'সব সময় কী হিসেব করে চলা যায় ভাই। না হিসেব করতে ভালো লাগে?'

'তাই বলে ভবিষ্যত ভাববিনে তুই? পরিণাম?'

'কী জানি কী করে যে হল। শিমুলতলায় সেবার আমার অসুখের সময় অযাচিতভাবে যা করেছিল, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল আমার হৃদয়ে। কিন্তু বুঝতে পারিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার রক্তে লোভও উসকে উঠেছিল। তুই জানিস আমার চাকরিতে আনন্দ নেই, প্রাণ নেই। আমি ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে যাচ্ছিলাম. একটু আলোর জন্যে আমি যে কত কাঙাল ছিলাম সুব্রত আমাকে তা বোঝাল।'

অংশুলা বলল. 'কিন্তু তুই তো জানতিস সুব্রত বিবাহিত। একটি বাচ্চাও আছে। যতদূর মনে হয় ওদের সুখের সংসার...'

স্বাতী বলল, 'সেইটেই তো কাল হল। ওর সুখের চেহারাটাই আমাকে বারবার নাড়া দিচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, ওর সুখটাকেই আমি ভালোবাসতাম। সুব্রত প্রথম দিন থেকেই আমাকে চিনেছিল, চোখ দেখে কিনা জানিনে। আমাকে ঘিরে সব ব্যাপারেই ওর যত্নের বাড়াবাড়ি ছিল, প্রশ্রয়ও ছিল না এমন নয়। আমার সাহস বাড়ল। লোভ থেকে সাহস, অদ্ভুত রোমাঞ্চ বোধ করলাম। তারপর ও একদিন গাড়িতে লিফ্ট দেবার সময় আমাকে বলেই ফেলল। কী জানিস, অনেকদিন গুমোটের পর হঠাৎ বৃষ্টি নামলে যেমন হয়, তেমনি একটা ভালো-লাগা খর অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি ওর বক্ষবন্ধে টোকা দিয়ে বললাম : জানি। বললাম : আমাকে আঘাত দিতে চাও দিয়ো, কোনোদিন অবহেলা কোরো না, আমার সহ্য হবে না।

সমাজ বেশি সংযম আশা করে। এইসব মানুষের হাতে সমাজ বিপন্ন হয়।'

স্বাতী বিবর্ণ হাসল। 'ভালোবাসবার আগে তোমার কাছে পরামর্শ নিলে ভালো হত দেখছি। এখন আমি কী করি বলো তো?'

অংশুলো বলল, 'যা হয়েছে ফেরানো যাবে না। এখন তোর উচিত সরে দাঁড়ানো। চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হয়।'

স্বাতী বলল, 'কথাটা মন্দ বলোনি। দেখি ভেবে। কিন্তু কাজটা খুব ছেলেমানুষি হবে না? ভীতু কাপুরুষের মতন? ধরো ওকে ছেড়ে যদি না-থাকতে পারি? যদি—'

অংশুলো বলল, 'মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে। সেইজন্যেই তাদের শক্তি বলে।'

স্বাতী বলল, 'আমি দূরে চলে গেলাম আর ও যদি আমার ত্যাগ বুঝতে না পারে, যদি ভুল বোঝে? আমাকে যদি ও বাজে খেলো মেয়ে ভাবে? তার চেয়ে ওকে পরিষ্কার করে বলা ভালো, তাই না?'

অংশুলো বলল 'সংসারে অনেক জিনিস আছে যা পরিষ্কার করতে যাওয়া বিপদ।'

'তাই বলে পালাতে হবে আমার প্রিয়জনের কাছ থেকে?' স্বাতী উষ্ণ হল।

'স্বামী মঙ্গলের জন্যে পালানোতে অপরাধ নেই।'

'কিন্তু ও যদি জবাবদিহি চায়? যদি প্রশ্ন করে ওর অপরাধ কী। কী বলব তাকে? বলব: ভুল করে এগিয়েছিলাম, এখন ভুলকে সংশোধন করতে দাও, এই তো? কিন্তু তুমি জানো ভুল আমরা কেউই করিনি। আমার তিন বছর বয়েসটা আর যাই হোক, ভুল করার নয়।'

অংশুলো বলল, 'মানুষ সারাজীবন ভুল করতে পারে। তার আবার বয়স কী।'

স্বাতী মাথা চুলকোলো। 'তাই তো। আচ্ছা এখন চলি। পরে দেখা হবে।'

স্বাতী চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে গেল।

।। দ্বিতীয় তরঙ্গ ।।

রাত্রিতে সুব্রত এলে স্বাতী আয়নায় মুখ মুছতে-মুছতে বলল: 'জানো আমি চলে যাচ্ছি।'

সুব্রত বিছানায় শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। অন্যমনস্ক। শুনতে পেল কিনা কে জানে।

স্বাতী ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। তারপর আবার বলল, 'শুনেছেন মশায়?'

'কই দাও।' সুব্রত হাত বাড়িয়ে দিল। তারপর প্রসারিত হাতে কিছু এল না দেখে সবিস্ময়ে ওর দিকে তাকাল। হাসল। 'আমি ভাবলাম কফি এনেছ।'

স্বাতীর এবার দমে-যাবার পালা। 'কী হয়েছে? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

সুব্রত বলল, 'আমার পাশের ফ্ল্যাটে একটি মৃত্যু দেখলাম। বজলু, নতুন বিয়ে হয়েছিল।'

স্বাতী ছিটারের সুইচ অফ করল। গম্ভীর, বিমর্ষ।

'ওর বুকের স্বামীকে যদি দেখতে। বেচারী...'

'এই নাও কফি।'

'আমার কাছে বোসো।'

'বারে, আমার কাজ নেই বুঝি?'

'তোমাকে আজ কোনো কাজ করতে দেবো না।' সুব্রত ওর হাত ধরল। ওর মুখের দিকে কেমন করে চেয়ে রইল।

স্বাতী বসল।

সুব্রত ওর ঘাড়ে মুখ ঘষল, চুলে আঙুল রাখল।

'জানো মানুষ জীবনে কত স্বপ্ন দ্যাখে—' সুব্রত বৃষ্টির মতন গলায় বলল: 'কত আশা-আনন্দ, তারপর কত বেলা বাড়ে স্বপ্নের শিশির শুকিয়ে যায়।'

'কী স্বপ্ন দেখতে আমাকে বলো না?' স্বাতী আদুরে গলায় জিগ্যেস করল।

সুব্রত বলল: 'এই মানুষের সম্পর্কে প্রকৃতির সম্পর্কে। কেমন মনে হত এই জগতটা একটা অদ্ভুত সংগতি আর সুষমায় ভরা। সূর্য দেখলে আনন্দ হত, মেঘ দেখলে, সবুজ অরণ্য, সমুদ্র, চাঁদ, পাখি, ফুল—অহরহ চলেছে আনন্দের মহোৎসব। আর মানুষ এই উৎসব থেকে তার আনন্দকে নেবে ছিনিয়ে, যেমন করে সে আকাশের বিদ্যুতকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মনে হত প্রকৃতির অজস্র ঐশ্বর্যকে মানুষ প্রতীক করে নিজের জীবনে ব্যবহার করেছে। মানুষ সূর্য হয়, অরণ্য হয়, পাখি ফুল চাঁদ হয়...'

'তারপর—' স্বাতী কাত হয়ে পড়ল বিছানায়, তার দেহকে বিকশিত করে দিল পরম রহস্যে: 'আর মানুষ সমুদ্র হয় না?'

সুব্রত ওর কপোলে হাত রাখল, গ্রীবায়, চোখের পাতায়: 'হয়। হতে চেষ্টা করে।'

'জানো আমি কোনোদিন সমুদ্রে যাইনি।'

'যাবে। সকলকেই সমুদ্রে যেতে হবে।'

'তারপর কী হল বলো?' সুব্রতর আঙুলে স্বাতীর আঙুলে।

সুব্রত বলল: 'স্বপ্ন ছিঁড়ে গেল। দেখলাম মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কোনো সংগতি নেই। মানুষের জীবন অসামঞ্জস্যে ভরে উঠেছে। জানো: ইচ্ছে ছিল দর্শন পড়ব, আমাকে ওরা ইঞ্জিনিয়ার করল। কিন্তু আমার দার্শনিকতাকে তো আমি ছাড়তে পারলাম না। নিজের কাজে ডুবে থাকতে থাকতে কখন ভুলে গেলাম পৃথিবীতে লোক আছে, যারা আজো স্বপ্ন দ্যাখে, সংগতি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে। আমার কী দুঃখ জানো, মানুষ সুস্থ হলে আর আমার কাছে আসে না। আমার স্বপ্নগুলো আমি কাকে দেবো?'

সুব্রতর মুখের ওপর স্বাতীর চোখের তারা দুটো কল্যাণ আকাশের মতন চকচক করছিল। স্বাতী ভারি নিশ্বাস ফেলল।

'আমার সুব্রত—'

'উঁ?'

'এই সূর্য-চন্দ্র-পাখির কল্পনাত যদি কোনোদিন স্খলিত হয়ে পড়ে—'

সুব্রত বলল, 'কী করে হবে? ওরা যে পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরছে। কারুর স্খলিত হবার উপায় নেই।'

আলোতে স্বাতীর দাঁত ঝিকিয়ে উঠল। একটু থেমে থেকে বলল: 'তোমাকে একটা কথা বলিনি। আমি বাইরে একটা চাকরি পেয়েছি।'

সুব্রত বলল, 'সে কী করে হয়।'

'কেন? আমার কেরিয়ারের দরকার নেই? সারা জীবন ছোটো হয়ে থাকব? আমার উন্নতি তুমি চাও না?'

সুব্রত অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হাসল। 'আমি বুঝতে পারিনি। কবে যাবে?'

'তুমি ছুটি দিলেই যাব।'

'তার কী দরকার আছে কোনো?' সুব্রত হাসল কেবল: 'মানুষের উন্নতির ব্যাপারটা তার একার, সম্পূর্ণ নিজস্ব।'

'আর কোনোদিন হয়তো ফিরতে পারবো না।' স্বাতী বলল।

'সেখানে ভালো লেগে গেলে আর ফিরবে কেন?' সুব্রত নিশ্চিন্ত জবাব দিল।

অবিশ্বাসের চোখে স্বাতী প্রশ্ন করল: 'তোমার কষ্ট হবে না?'

'না।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

'বাসি।'

'ভালোবাসলে ছেড়ে থাকতে পারা যায়?'

'না-পারলে তুমি যাচ্ছ কী করে?' সুব্রত হাসল: 'মানুষের উন্নতি চাই, চাইনে?'

'জানিনে।' স্বাতী ধড়মড় করে উঠে বসল। বিস্রস্ত চুলগুলি ঠিক করে নিল। 'কেন তোমার জোর নেই, আমার ওপর অধিকার নেই?'

সুব্রত সিগারেট ধরাল। 'আমি তোমাকে কোনো অধিকার দিতে পারিনি। তোমার দায়-দায়িত্ব মর্যাদা কিছুই আমি বহন করতে পারিনি। না জোটু একটি সংসারও নয়।'

স্বাতী বলল, 'হয়তো এই ভালো হয়েছে। তোমার সঙ্গে সংসার করলে তোমাকে হারাতাম। যেমন করে তোমার স্ত্রী হারিয়েছেন। যখন ইচ্ছে আমরা কাছে আসতে পারছি, বাইরে থেকে চাপানো কোনো শর্ত আমাদের ভিতে ভিতে চেপে মারছে না। আমরা যত পরিমাণে স্বাধীন তত বেশি আনন্দ। সব মানুষের কাছে সুখের চেহারা কী একরকম সুব্রত? একেক জন একেক রকমে সুখী হয়। কেউ বন্ধনে কেউ মুক্তিতে।'

সুব্রত বলল, 'শোনো। জানিয়ো সব জানতে পেয়েছো।'

স্বাতী এক মুহূর্ত অস্থির হয়ে রইল। কোনো কথা বলতে পারল না।

সুব্রত আবার বলল, 'আমার প্রতিকারের পকেটে কী করে তোমার চুলের কাঁটা চালান হয়ে গিয়েছিল।'

স্বাতী কাঁপা গলায় বলল, 'আমি, আমি তো রাখিনি।'

'কে বলেছে তুমি রেখেছ?' সুব্রত হাসল। 'কথাটা হচ্ছে লালিমা সব জানতে পেরেছে। অথচ একটা প্রমাণ পেয়েও সে বিশ্বাস করেনি। কারণ ও জানে আমি কোনোদিন অভিনয় করিনি। আমি যে কোথাও অভিনয় করতে পারিনে সেটাও ও জানে।'

'থামো।' স্বাতী চিৎকার করে উঠল। 'তোমার দাম্পত্য-সংলাপ আমাকে শুনিয়ে লাভ কী? উনি ভালো হোন খারাপ হোন আমার কী যায় আসে।'

সুব্রত আহত হয়ে চুপ করে গেল।

'তোমার স্ত্রী উদার হতে পারেন, কারণ তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। বাইরের থেকে তুমি যে-অনেক যে-উত্তেজনা কুড়িয়ে নিয়ে যাও উনি তার ভাগ পান।'

'স্বাতী!'

'আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না। আমি ছায়া হতে পারিনে, মিথ্যে হতে পারিনে। আমার ইচ্ছের সলতে পুড়িয়ে আর কেউ প্রদীপ জ্বালবে, আমি তা সইব না। তুমি যখন আমার কাছে তখন সম্পূর্ণ আমার, আমার নিজস্ব, সেখানে আমি কাউকে হাত বাড়াতে দেবো না। আর যখন চলে যাবে তখন তোমার অস্তিত্বকে আমি আমারই কাছে বন্দী করে রাখব।'

সুব্রত স্থির বসে রইল।

।। তৃতীয় তরঙ্গ ।।

"উত্তর বাংলার এই ছোট্ট শহর আমার কর্মস্থলের পরিচয় তোমাকে আগেই দিয়েছি— স্বাতী লিখেছে : 'এমন বোবাধরা গুমোট শহর আমি বেশি দেখিনি। না-আছে একটা নদী, না-পাহাড়, কাজে যাচ্ছি আর ফিরছি। লোকগুলোর চরিত্রে এমন একটা জিনিস আছে যে বুকের রক্তকে পর্যন্ত হিম করে দেয়। আমিও যেন ক্রমশ গুমোটের কঠিন আচ্ছাদনে জড়িয়ে বন্দী হয়ে পড়ছি।

"এক ছুটির দিনে ট্রেনে করে কাছেই একটা জঙ্গল আছে শুনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর সেখানে দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ-দেখা চন্দন সোমের সঙ্গে। সে এখানকার জঙ্গলের সরকারি অফিসার। চন্দনকে মনে আছে তোমার? আমার ছোটোবেলার বন্ধু, আমার চেয়ে বছর কয়েকের ছোটোই হবে। ভালো লেখাপড়া জানতো! আজও : কী সুকান্ত পুরুষের মতন চেহারা হয়েছে ওর। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি উজ্জ্বলতা। সর্বাঙ্গ দিয়ে দিগন্ত ছাড়িয়ে হাসতে পারে। যেন কোনো বাধা মানবে না।

"আমাকে ধরে নিয়ে গেল ওর কোয়ার্টার্সে। কী সুন্দর সাজিয়েছে ওর কোয়ার্টার্সটাকে। যেমন নিখুঁত তেমনি টপ। মনে হয় না যে একটা জঙ্গলে রয়েছি। গ্রাম্যজনের ভয়োয়া নিরাপত্তার কথা মনে পড়ে যায়। জানো তো মেয়েদের স্বভাব, আমার নিরর্থক গুমোটের পর ওর এই বন্ধুত্ব আমাকে হালকা মুক্ত করে তুলেছিল। আমি যেন অধিক লোভী হয়ে পড়েছিলাম। আর, চন্দন যেন আমাকে পেয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ওর এই উত্তেজিত-মুখ আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল বইকি।

"তারপর পুরোনো দিনের এলোমেলো কথা। হাসি। কফির পর। স্যান্ডউইচ। না, এখনো সে তেমন বদলায়নি।

"একবার কৌতূহল হয়েছিল জিজ্ঞেস করতে কেন সে বিয়ে করেনি। কিন্তু তবে করিনি। কারণ পাল্টা জিজ্ঞাসা সে আমাকেও করতে পারত। কে বিশ্বাস করবে, আমার এই বয়সে পিছনের কোনো ইতিহাস নেই।

"আমি ওর নরম বিছানায় শুয়ে ছিলাম, আর ও চৌকিতে বসে সেতারে ঝংকার তুলছিল।

"কতক্ষণ যে ওইভাবে কাটল জানিনে। সুর থামলে পর তার যেন দীর্ঘশ্বাসই হয়ে আটকে রইল বিকেলের রঙ-ঢালা নির্জন আকাশে। মনে হল হাজারো গল্প করেও যে সময়ের ব্যবধানকে আমরা পার হয়ে আসতে পারছিলুম না, তারের সুরে সে দ্বিধাগুলো কাটিয়ে দিল।

"ওকে বললাম : 'এবার ফিরতে হবে। নইলে ফেরার ট্রেন পাব না।'

"চন্দন হাসল। বলল : 'আবার কবে দেখা পাচ্ছি?'

ভারতীয় সাহিত্য

মারাঠি লেখকের জীবনাবসান ॥

প্রখ্যাত মারাঠি লেখক শ্রীগোপালকৃষ্ণ ভোবে গত ১২ ফেব্রুয়ারী গোয়ার একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯ বৎসর। গোয়া তাঁর জন্মভূমি। তিনি এখানে এসেছিলেন "মারাঠি নাট্য সম্মেলনে" অংশ গ্রহণের জন্য। তিনি যখন একটি মারাঠি সঙ্গীতানুষ্ঠান শুনছিলেন, ঠিক সেই সময়ই অসুস্থতা বোধ করেন। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় "মারগোয়া" হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে মারাঠি-সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে, তা অপূরণীয়।

বাংলা ভাষা শহিদ দিবসে কলকাতায় অনুষ্ঠান ॥

বাংলা দেশ বিভক্ত হয়েছে বটে, তবু সে তার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ভুলে যায়নি। উভয় বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতি এক। এপারে যে বাংলা, ওপারেও সেই একই বাংলা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পূর্ব বাংলার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল, শত শহিদের রক্তে। উভয় বাংলার মানুষের বুকে সেই আত্মত্যাগের কাহিনী এখনও সমান ভাবে প্রবাহিত। পশ্চিম বাংলার মানুষ যে আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্মরণ করে, তার প্রমাণ গত ২১ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় "ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে" অনুষ্ঠিত সভাটি। 'বাংলা ভাষা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি যেমন আমাদের অনুপ্রাণিত করে, তেমনি পূর্ব বাংলার মানুষকেও। ঠিক তেমনি ভাবেই পূর্ব বাংলার মানুষেরও সমান আবেদন আমাদের কাছে। উভয় বঙ্গের সাহিত্য ও শিল্প-সাধনা উভয় বঙ্গের সম্পদ।"

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ এবং সেইসব উপকরণ নিয়ে সাম্প্রতিক কালে যে গবেষণা চলছে, তাতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গবেষকদের মধ্যে বিশেষ কোনও যোগসূত্র থাকছে না। এ ব্যাপারে বিশেষ সক্রিয় হওয়া দরকার। যদি উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় না থাকে, তাহলে তা ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতার নামান্তর হবে।"

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "পূর্ব বাংলার শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই সার্থক হবে, যখন তাঁদের আত্মত্যাগের প্রেরণায় আমরা কোনো মহৎ কাজে এগিয়ে আসতে পারবো। ইংরেজীকে যাঁরা হটিয়ে দিতে চান, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তবু মাতৃ-ভাষাই উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তখনই সার্থক হবে, যখন আমরা মাতৃভাষাকে সম্মানের আসন দিতে পারবো।"

সর্বশ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য, সত্যেন মৈত্র, গোপাল হালদার, পান্নালাল দাশগুপ্ত, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ সুহাস ভট্টাচার্য প্রমুখও সভায় ভাষণ দেন। কাজী সব্যসাচী পূর্ব বাংলার কবিদের কবিতা পাঠ করেন এবং সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অবাঙ্গালীদের প্রয়াস ॥

সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য গত ১১ ফেব্রুয়ারী কলকাতায় অবাঙ্গালী লেখক, সাংবাদিক এবং শিল্পীবৃন্দের এক সভা

মুনসী প্রেমচন্দ-এর 'রঙ্গভূমি'র রুশ অনুবাদ ॥

মুনশী প্রেমচন্দ রুশ-পাঠকদের কাছে বর্তমানে একটি অতি প্রিয় নাম। সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত 'রঙ্গভূমি' হিন্দী থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন তিনজন হিন্দীভাষা ও সাহিত্যবিদ—ই, বোরোভিক, ভি মাখোতিন, ভি ক্যাসেলিনিকভ। ভূমিকা লিখেছেন হিন্দী সাহিত্যগবেষক ভি বালিন। পূর্বেও ভি বালিন প্রেমচন্দ-এর সাহিত্য সম্পর্কে বহু নিবন্ধ লিখেছেন।

গত দশ বছর ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকায় প্রেমচন্দ-এর গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে আসছে। ইতিপূর্বে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোদান' 'নির্মলা' প্রভৃতি সোভিয়েট পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর গল্পের অনেকগুলি অনুবাদ সঙ্কলনও বেরিয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের জনগণের কাছেও প্রেমচন্দ অপরিচিত নন। উজবেক, তাজিক, তুর্কমেন, তাতার, কাজাখ, কিরঘিজ, আর্মেনীয়, জর্জীয়, আজারবাইজানী, ইউক্রেনীয় এবং এস্তোনীয় প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গল্প ও সাহিত্যের অনুবাদ হয়ে চলেছে। হিন্দী-লেখক শ্রীহংসরাজ রহবার লেখা "প্রেমচন্দ-এর জীবন ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থটিও রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির অনুবাদ করেছেন—ই বোরোভিক ও ভি মাখোতিন।

গোর ভিডাল-এর নতুন উপন্যাস ॥

গোর ভিডাল সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য-সাহিত্যে একটি বিতর্কিত নাম। তাঁর 'মায়রা ব্রেকিনরিজ' উপন্যাসের বিক্রয়সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

এ উপন্যাসের নায়িকা মায়রা। উপন্যাসের একটি ঘরে কাহিনীর সূত্রপাত। নায়ক তাকে প্রথমে তার খাস কামরায় শুধু বন্দিনী করেনি, গলায় চারপাশে একটি বাঁধন ছ্যাংলার পেঁচিয়ে তার উপর ব্যভিচার করেছে। সে তখন নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না।

এইসব কৌতুককর ঘটনার সমাহারে 'মায়রা ব্রেকিনরিজ' জমজমাট। একেকটি ঘটনা স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে গেছে পরবর্তী ঘটনার দিকে। পাশ্চাত্য সমালোচকবর্গ এ ব্যাপারে নিরুত্তর থাকতে পারেননি। তাঁদের মনেও জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়েছে, তা হলে কি সাহিত্যের শালীনতাবোধ নিম্নমুখী?—না, ক্যাসানোভা আন্দ-এর প্রাধান্য উঠছে?

গোর ভিডাল ছিলেন মূলতঃ সিরিয়াস লেখক। তাঁর ঘটনাক্রম অনেক সময় এলোমেলো মনে হলেও অপ্রাসঙ্গিক নয়। একদা তিনি রাজনীতির আসরে নেমেছিলেন একজন ডেমোক্র্যাট হিসেবে। তাঁর পূর্ববর্তী রচনা—উপন্যাস 'জুলিয়ান', 'ওয়াশিংটন ডি, সি', এ স্মল প্ল্যানেট', এবং সমালোচনার গ্রন্থ 'রীডিং দি বোট'।

এইসব রচনায় মায়রা ব্রেকিনরিজের কোন প্রস্তুতি নেই। ভিডাল ও তাঁর প্রকাশক উপন্যাসটির উপসংহারে নায়চরিত্রের যৌন-সমস্যায় একটি স-সংশয় উপাদানের দিকেই অঙ্গুলি-সংকেত করেছেন। এবং চতুর ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে গ্রন্থটি আদৌ সমালোচনার জন্য নয়। যে কোনো বিবেকবান পাঠকের কাছে মায়রার যৌন-পরিচিতির চাবিকাঠি হিপোক্রেটস মনোবিশ্লেষণের আবহে সন্দেহজনক। নায়িকা মায়রা হলিউডী মানসিকতার দ্বারা তাড়িত এবং যৌন-ব্যাপারে অসতর্ক ও লোভাতুর পুরুষদের দ্বারা বেপরোয়া ভাবে ধর্ষিতা। মায়রার কাছে যৌনতাই শক্তির উৎস।

ভিডাল ঘটনাক্রমে ভিক্টোরীয় ও রক্ষণশীলদের উত্তেজনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, সাহিত্য নয়, শব্দই এ যুগের অন্যতম নির্দিষ্ট চেতনায় পরিচালিত করবে। [illegible]
[illegible]

আস্তানা নিয়েছেন সেখানেই তাঁর সঙ্গে আছে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ সেপাই।

পিজারোর কি এবার মানে মানে ফিরে যাবার ব্যবস্থাই করা উচিত ছিল না?

কিন্তু তিনি তা করলেন কই? একশ' আটষট্টি জন সৈন্য সঙ্গে নিয়েই তিনি আতাহুয়ালপার সঙ্গে দেখা করবার জন্য কাক্সামালকার উদ্দেশে এগিয়ে চললেন।

আতাহুয়ালপা কে তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

তিনিই হলেন সূর্যপ্রভব ইংকা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, আর কাক্সামালকা হ'ল পেরুর এক আশ্চর্য ঝরণা-জলের শহর, তখনকার ইংকা নরেশদের মত এখনও মানুষ যেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে যায়।

ইংকা আতাহুয়ালপার নিজের ডেরায় কর্ডিলিয়েরাস-এর পার্বত্য গোলোকধাঁধা ভেদ করে এ ভাবে যাওয়া এক হিসেবে বাতুল গোঁয়ার্তুমি ছাড়া কিছু নয়। কি করবেন পিজারো তাঁর ওই কটা সঙ্গী নিয়ে সেই ইংকা সম্রাটের কাছে উপস্থিত হয়ে? তিনি কি শুধু সেই মহামহিমের দর্শন-লাভের জন্যেই যাচ্ছেন? অকূল সাগর আর দুর্গম গিরি-মরু পেরিয়ে এসেছেন শুধু কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে?

সে অনুগ্রহ চাইলেই যে পাবেন তারই বা ভরসা কি? রাজা-গজার মেজাজের কিছু ঠিক আছে! পিজারো আর তাঁর দলবল এ অজানা দেশের রেওয়াজ দস্তুর আদব কায়দা কিছুই জানেন না বললে হয়। সামান্য একটু ভুলচুক হওয়া আশ্চর্য কি! আর তাতেই ইংকা রাজেশ্বরের মেজাজ যদি বিগড়ে যায়, তখন? যে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ইংকা আতাহুয়ালপার সঙ্গে রক্ষী হিসেবে আছে তারা সবাই একটা করে ঢোকা দিলেই ত তাঁরা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবেন। যদি বা তাদের এড়িয়ে কোনমতে কাক্সামালকা থেকে পালাতে পারেন, তারপর নিস্তার পাবেন কি? এ পাহাড়ী গোলক-ধাঁধার রাজ্যে পথে পথে দুর্গের পাহারা। তা ছাড়া দূর-দূরান্তরে রাজাদেশ নিয়ে যাওয়া ও খবর দেওয়া নেওয়ার জন্যে দৌড়বাজ দূতের ব্যবস্থা আছে। তাঁর পাঁচ পা না যেতে যেতেই তাঁদের খবর পাহাড় থেকে সাগর-তীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

এ সব কথা একেবারেই ভাবেন নি পিজারো এমন নির্বোধ গোঁয়ার সাঁতাই নয়। তবু তিনি যে অটল সঙ্কল্প নিয়ে কাক্সামালকা শহরের দিকে এগিয়ে গেছেন তা শুধু বাতুল জেদের জনাই বোধহয় নয়। ভরসা পাবার মত কিছু একটা তিনি সম্ভবতঃ জেনেছিলেন।

ভরসা যা থেকে পেয়েছিলেন তা কি ইংকা সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস? মনে হয় তাই। এ বিশাল রহস্যময় সাম্রাজ্যের অন্দর-কানাচে নানা বিবরণের মধ্যে আতাহুয়ালপার রাজেশ্বর হওয়ার কাহিনীটুকুই তখন তাঁকে কিছুটা আশা দিয়ে থাকতে পারে।

আশা এই কারণে যে আতাহুয়ালপার ভাগ্যে নিরঙ্কুশ সাম্রাজ্য লাভ ঘটে নি। রক্ত-সমুদ্র পার হয়ে তাঁকে সিংহাসনে পৌঁছোতে হয়েছে। আর তাও তিনি পৌঁছেছেন মাত্র সেদিন ভ্রাতৃহত্যার পাতকে কলঙ্কিত হয়ে।

ইতিহাসের জ্ঞান নিরক্ষর পিজারোর ছিল না বটে কিন্তু ধূর্ত বিচক্ষণতা নিশ্চয় ছিল যাতে ঘরোয়া খুনোখুনিই যে বাইরের দুশমণের রাস্তা সাফ করে দেয় তা তিনি বুঝতেন।

সাম্রাজ্য নিয়ে যে ঘরোয়া সংগ্রামে আতাহুয়ালপাকে ভ্রাতৃহত্যার পাতকী হতে হয় ইংকা রাজবংশের ইতিহাসে তা অভাবনীয়।

ইংকাদের আদি অভ্যুত্থান টিটিকাকা হ্রদের তীরের সময়ের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট। নিজেদের যাঁরা সূর্যের সন্তান বলতেন সেই ইংকা রাজবংশের ইংকা টুপাক যুপানকি ছিলেন এক অসামান্য পুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। তার আগেই ইংকো সাম্রাজ্য তাঁর বাহুবলে উত্তরে বর্তমান ইকোয়েডরের কুইটো থেকে দক্ষিণে এখনকার চিলি রাজ্যের মরুপ্রায় তীরভূমি আতাকামা ছাড়িয়েও বিস্তৃত হয়েছে।

ইংকা যুপানকির পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুয়াইনা কাপাক কীর্তিতে পিতাকেও হয়ত ছাড়িয়ে গেছেন। ইংকা সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুখ শান্তি ও সম্মানের যুগ তাঁর রাজত্বকালেই এসেছিল কিন্তু এ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজও তিনি নিজের অজ্ঞাতে রোপণ করে গিয়েছিলেন।

[illegible] ১৫২৪এর নভেম্বর মাসে পিজারো যখন প্রথম পানামা বন্দর থেকে সুদূর কল্পিত সোনার দেশ আবিষ্কারের আশায় পাড়ি দেন, হুয়াইনা কাপাক তখনও জীবিত।

নতুন মহাদেশে শ্বেতকায় সম্পর্কে অপরিচিত এক জাতের বিদেশী মানুষের পদার্পণের কথা তিনি জেনে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। জেনেছিলেন সম্ভবত পিজারোর প্রথম অভিযান সুরু হবার আগেই। বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করে সেণ্ট মাইকেল উপসাগর পার হয়ে ইংকা সাম্রাজ্যের প্রথম কিংবদন্তী যখন শোনেন তখনই এই অজেনা আগন্তুকদের খবর হয়ত হুয়াইনা কাপাকের কানে পৌঁছেছিল। তখন যদি এ খবর নাও পেয়ে থাকেন, পিজারো আর আলমাগ্রো তাঁদের প্রথম অভিযানে গিয়ে যে সান হুয়ান নদী পর্যন্ত পৌঁছোলে তার বিবরণ হুয়াইনা কাপাক নিশ্চয় পেয়েছিলেন। শোনা যায় এ বিবরণ শুনে তিনি নাকি বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন ভবিষ্যতের কথা ভেবে। পিজারোর সৈন্যদের বন্দুক ও সওয়ারী ঘোড়ার বর্ণনা বেশ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই কাপাক শুনেছিলেন নিশ্চয়। এ রকম অদ্ভুত মানুষ যাদের শক্তি তাদের [illegible] সংখ্যা অল্প হলেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা জেনেও হুয়াইনা কাপাক নিশ্চিন্ত হননি। দিক-চক্রবালে সামান্য একটা কালো ফোঁটা দেখেই ইংকা সাম্রাজ্যের ভিৎ নাড়ানো প্রলয়-তুফানের আবির্ভাব তিনি নাকি অনুমান করেছিলেন।

নিজের অনুমান সত্য হয়ে ওঠা দেখে যাবার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। সঠিক তারিখ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে তবু পোনেরোশ পঁচিশ কি ছাব্বিশে তিনি মারা যান।

মারা যাবার আগে এমন একটি কাজ তিনি করে যান যা ইংকা রাজবংশের চিরকালের রীতি ও সংস্কারের বিরোধী। ইংকা রাজবংশের প্রাচীন রীতি অনুসারে ইংকা নরেশের নিজের ভগিনীই একমাত্র রাজরাণী হবার যোগ্য এবং তারই প্রথম পুত্রসন্তান রাজশক্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

সে হিসেবে হুয়াইনা কাপাকের সাম্রাজ্য তাঁর বৈধ বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হুয়াসকারের ওপরই বর্তাবার কথা। হুয়াসকার পুত্র হিসেবে কাপাকের অপ্রিয়ও ছিলেন না। তাঁর হুয়াসকার নামের কুইচুয়া ভাষার অর্থ হল শৃঙ্খল। এরকম অদ্ভুত নাম রাখবার কারণ এই যে হুয়াসকারের জন্মোৎসবের নাচের আসরে অভিজাত বনেদীদের জাতীয় নাচের সময় ধরবার জন্যে হুয়াইনা কাপাক চারশ হাতেরও বেশী লম্বা ও জোয়ান মানুষের কব্জির মত মোটা একটি স্বর্ণশৃঙ্খল তৈরী করিয়েছিলেন।

হুয়াসকারের প্রতি তাঁর স্নেহের অভাব তারপর ঘটেনি, কিন্তু আর এক টান তাঁর ছিল প্রবলতর।

হুয়াইনা কাপাক উত্তরের কুইটো জয় করবার পর সে রাজ্যের শেষ শিরি বা অধীশ্বর পরাধীনতার দুঃখেই মারা যান। কাপাক তাঁর কন্যাকে তখন বিয়ে করেন। তখনকার যুগের প্রায় সব দেশের রাজা-রাজড়ার মত ইংকাদের বৈধ মহিষী ছাড়া অন্য রাণী ও শয্যাসঙ্গিনী থাকত অসংখ্য। কাপাকের সবচেয়ে প্রিয় রাণী ছিল কিন্তু কুইটোর এই রাজকন্যা। এরই প্রেমে শেষ জীবনটা তিনি নিজের রাজধানী ছেড়ে কুইটো থেকেই শাসনকার্য চালিয়েছেন।

কুইটোর এই রাজকন্যাই আতাহুয়ালপার জননী। ছেলেবেলা থেকে আতাহুয়ালপা বাপের সঙ্গে সঙ্গেই থেকেছে। বড় হয়ে উঠেছে তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষার স্নেহের প্রশ্রয়ে। ইংকা ছাড়া আতাহুয়ালপার শরীরে অন্য রক্ত ছিল বলেই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত দুর্দম উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর প্রাণের উচ্ছলতা দেখা গেছে। দিনে দিনে পুত্রস্নেহাতুর হুয়াইনা কাপাকের তিনি নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকালে সেইজন্য হয়েই হুয়াইনা কাপাক ইংকা রাজবংশের সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে সমস্ত সাম্রাজ্য বৈধ উত্তরাধিকারী হুয়াসকার আর আতাহুয়ালপার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। বিরোধের বীজ রোপিত হয়েছে তখনই। (ক্রমশ)

মহাত্মা শিশিরকুমার

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিক স্মরণোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

পূর্ণ শত বৎসরের পরে এই স্মৃতি মহোৎসব
তব সুবিখ্যাত নাম সমুজ্জ্বল ইতিহাস পটে
অবিস্মরণীয় মূর্তি অলোকসামান্য কীর্তি বটে
বঙ্গ মহামণ্ডলে সার্বভৌম জাতীয় গৌরব।

'অমৃত বাজার' পত্র, এক রাতে—সে কী অসম্ভব!
বঙ্গভাষা ইংলিশ হল! তোমার ইঙ্গিতে কিনা ঘটে
অঘটন পটীয়ান, হে মহান্, তোমার দাপটে
প্রজাশক্তি উঠে জাগি, রাজশক্তি মানে পরাভব।

'অমিয়-নিমাই' কথা মহাভাব প্রেম চিন্তামণি
'নাম ব্রহ্ম-জয়ধ্বজা, ধর তুমি পথে ও প্রাঙ্গণে
কালাচাঁদ-গীতা তব গোরাচাঁদ-গৌরবের ধ্বনি
নিতাইয়ের প্রেমবন্যা বহাইলে গৌড় বৃন্দাবনে।

শিশিরকুমার তুমি শিশিরেরও চেয়ে সুকুমার
বজ্রগর্ভ বিজলীর প্রতিভার প্রভাব দুর্বার।

> ceased lady, Rose du Verger de Sauvis.......and Mother of Her Majesty the Empress of the French, Queen of Italy......"

পড়তে পড়তে আত্মহারা হয়ে যাই।

জোসেফিনের মা সমৃদ্ধ মহিলা ছিলেন না। বিশেষ কোনো সম্পত্তি ছিলো না তাঁর। অনেকে বলে তাঁর নিজের বহু ক্রীতদাস-দাসী ছিলো বলেই নেপোলিয়ন দাসপ্রথা পুনরায় চালু করে ছিলেন। (রিপাবলিকান বিদ্রোহের আংশিক হিসেবে দাসপ্রথা রোধ হয়ে গিয়েছিলো গণতান্ত্রিক ফ্রান্সে)। দেখা যায় মরার কিছুদিন আগেও পাঁচজন নতুন দাস কিনেছিলেন Rose du Verger, এসব দাস সদ্য সদ্য আফ্রিকা থেকে আমদানী! একটি 'দান' ভারী মজার। ছোট্টো ভাইপোকে দিচ্ছেন ছোট্টো একটি নিগ্রো-বালক আর ছোট্টো একটি ঘোড়া। ওরা বোধহয় একজুটী হয়ে খেলাধুলো করতো। বৃদ্ধা বোধহয় সেই জুটীটা চান নি।

ডাক্তার রসেটের বাড়ীতে আমরা সবাই চিংড়ি এবং কালালু খেলাম। আর খেলাম চমৎকার একটি খাদ্য। গোটা একটি পাম-গাছ কেটে তার ভেতরের শাঁসটা (কলা হলে 'থোড়' বলতাম) যেখান থেকে পাতা বার হয়, ঠিক তার নীচের অংশটা, চিংড়ি দিয়ে রান্না। সুস্বাদু, সন্দেহ নেই: অসুবিধা এই যে গোটা পাম গাছটির মৃত্যু।

জোসেফিন সম্রাজ্ঞী হয়ে আসার পর তাঁর থাকার জন্য বাড়ী হয়ে ছিলো। সে বাড়ীর দালান, আউট হাউসগুলো, ধোবার ঘর, সবই আছে। যেন কঙ্কাল। জানলা দরজা খুলে পড়েছে। গাছ-গাছাড়ি জন্মেছে। একটি ঘরের মেঝেয় একখানা বড় পাথর বাঁধানো। পাঁর্যা মাথা নেড়ে নেড়ে বোঝালে এইখানে জোসেফিন ভূমিষ্ঠা হয়ে ছিলেন। প্রকাণ্ড একটি বট জাতীয় গাছের শেকড় আষ্টেপৃষ্ঠে পাকিয়ে ধরেছে ঘরখানা।

বাইরে গরু চরছে। ছেলেরা খেলা করছে। পুরাতন চিনির কলের চিমনীটা ছাড়া আর কিছু নেই। কয়েকটি আম গাছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে।

পাঁর্যা বিদায় নিলো গাড়ীর কাছে এসে। পীয়েরে তাকে একটা গোটা নোতুন দিতে সে দু-কান জোড়া হাসিতে ভরিয়ে দিলো লা-পাজেরীর আকাশ।

বাড়ী ফিরে আর সময় ছিলো না। সন্ধ্যা আটটায় যে প্লেনখানা ছাড়বে তাতে যাবো গুয়েদালুপে। সেখানে কোনো হোটেল নেই। পীয়েরে আমাকে একটা ঠিকানা দিলো। ভদ্রলোকের কারবার নৌকোর।—ইংরেজ পরিবার। তিন পুরুষ গুয়েদালুপে আছে। কোনো কষ্ট হবে না। সমুদ্রের ধারে তার ছোট্টো বাড়ী আছে। সেখানে থাকলেই চলে যাবে। মিস্টার হেনরি ম্যাকবার্নী।

গুয়েদালুপ

আকাশ থেকে গুয়েদালুপেকে দেখায় যেন নীল জলের ওপর অতিকায় একটা প্রজাপতি পাখা মেলে বসেছে। দুটি দ্বীপ। জোড়া আছে একটি প্রণালী দিয়ে, নাম রিভিয়েরে স্যালী। রিভিয়েরে স্যালী এখন মাটি চাপা পড়ে হাঁস বাঁধা পড়েছে। দুধারের দুটি উপসাগরের নাম গ্রাণ্ড স্যালী ক্যুল্‌ক এবং পেটী স্যালী ক্যুল্‌ক। প্রজাপতির বুকে যদি হয় রিভিয়েরে স্যালী তবে পশ্চিমের পাখাটির নাম 'ছোটো-মাটি' অর্থাৎ Basse Terre এবং পুবের পাখাটার নাম মস্তো-মাটি, Grand Terre এরই আরও পশ্চিমে মাইল পাঁচেক দূরে 'লেজিয়েন্' লম্বাটে একটা ছোটো দ্বীপ; আর মাইল আষ্টেক দক্ষিণে মারী গ্যালান্তে' দ্বীপ প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল। এছাড়া গ্যুয়েদালুপের সঙ্গী সাত-আটটি আরো দ্বীপ আছে। গুয়েদালুপের উত্তরে মন্টসেরাট এবং দক্ষিণে ডোমিনিকা বড়ো দ্বীপ। দুটোই ইংরেজদের। ডোমিনিকার কথা পরে বলা যাবে। মার্তিনীক থেকে গুয়েদালুপ যখন এলাম তখন ডোমিনিকার ওপর দিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু ফরাসী বিমান, ডোমিনিকায় নামেনি। মন্টসেরাটের দক্ষিণে এবং গুয়েদালুপের উত্তরে সাগরটির নাম গুয়েদালুপ-প্যাসেজ। এবং দক্ষিণের সাগরটার নাম ডোমিনিকা-প্যাসেজ। এইসব প্যাসেজ-গুলোতে সদা সর্বদাই মেছো ডিঙ্গি খেয়া দেওয়া করছে। সাধারণভাবে স্মাগলিংয়ের সদর কাছারী এইসব দ্বীপগুলো। ইংরেজ ফরাসী জেলাজেল থাকায় দুজন দ্বীপে দ্বীপে স্মাগলিং জীবিকার্জনের একটা বড়ো উপায়।

পরে আবিষ্কার করেছিলাম হেনরী ম্যাকবার্ণীর কতোখানি প্রতিপত্তি ছিলো এই সব স্মাগলারদের ওপরে। অনেক নৌকোর মালিক ও। জেলেদের নৌকো দিতো দৈনিক ভাড়ায়। এই ছিলো ম্যাকবার্ণির মুখ্য ব্যবসা। নিজের ছিলো একখানা কুইক-বোট। সৌখীন যাত্রীদের কোত্থাও লাও ঘোরাতো; এবং কখনও কখনও বোট-পার্টিতে ভাড়া খাটাতো। বোটখানার নাম 'নিনো'।

আমি যখন পৌঁছুই, তখন ওর বীচ-হাউসের একখানাও খালি ছিলো না। ওর নিজের জন্য তিনখানা ঘরের একটা ক্যাম্প-বাসা ছিলো। তারই একখানা আমার। কোনোই কষ্ট নেই। সমুদ্রের ওপরে খোলা জানলা। টেবিল-চেয়ার, বিছানা; সবসে সেরা এক হ্যামক। স্টোভ, কফীর সরঞ্জাম, বাস।

ম্যাকবার্ণী খাঁই ভিন্নার লোক। মোটা, হাড়ে-মাসে। খুব ছোটো করে ছাঁটা চুলে পাক ধরেছে। চিবুকের তলায় খোলো খোলো অনেক থর চর্বির ভাঁজ। কথা বলতে গেলে খোলা মাত্র বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে দম দিয়েই। নাক প্রায় বন্ধ। সদা-সর্বদা মুখে পাইপ। মোটা মোটা দু-দুই হাতে যেন আঁকশি দিয়ে টিপে আছে। ওকে বরাবরই নীল-রংয়ের জিন-কাপড়ে গড়া, সেলাই-করা জামা-পাজামা এক-রকম বিকল-দুকোর ধরনের পোষাকে দেখেছি। ছুতো-কারিগর, খাটিয়ে, মজুরাধিকেরদের সবারই এই পোষাক। কেবল মাথায় টুপিটি খাঁটি ফরাসী প্রথায় একটু তেরছা, সৌখিন এবং পালক গোঁজা। ইংরিজী যা বলতো, থেকে থেকে—এক্সেন্ট নেই বললেই চলে। টাইম্‌-কে-কে তাইম্ না বলে পারতো না। রাইস বলতে গিয়ে গাইস্ই বলতো।

পয়েন্ট পিত্রে প্রধান বন্দর। আমাদের আস্তা একটু দূরে পেটীবুর্গে। "কুমারী-দরো" Basse Terre -তেই গুয়োদালুপের বিখ্যাত পাহাড়ী অংশ। লা সুফ্রিয়েরে ৪৮৭০ ফুট, সাঁ-তুয়ে ৪৮৫৫ ফুট। গুয়াদালুপের রাজধানী Basse-Terre ও Basse-Terre দ্বীপেই।

প্লেন নামে পয়েন্ট পিত্রে-তেই। পয়েন্ট পিত্রে থেকে বাস-এ তেরে যাবার পথটা মনোরম। গুয়োদালুপের বৈশিষ্ট্য আর বিচিত্র বাঁহর্দ্যা এই পথটাতেই দেখা যায়। মনে হয় কর্তারা ইচ্ছে করেই পথটাকে এই-ভাবে তৈরি করিয়েছিলেন।

দ্বীপটার নাম কলম্বাস কেন গুয়েদা-লুপ রেখেছিলেন তার একটা ইতিহাস আছে। Extremadura স্পেনের একটা প্রদেশ। এখানেই গুয়েদালুপ নামে একটা মঠ-বিহার আছে। কলম্বাস এই দ্বীপটার নাম গুয়েদালুপ রেখে সেই বিহারে প্রতি-শ্রুত অঙ্গীকার পালন করেছিলেন। ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর কলম্বাস এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। তার অংশ রোববারে আর একটি দ্বীপ আবিষ্কার করে সেই দিনটিকে মর্যাদা দেন দ্বীপটির নাম 'ডোমিনিকা' রেখে। গুয়েদালুপ সংলগ্ন মারী গ্যালান্টে দ্বীপটির নামকরণ করে-ছিলেন তাঁর নিজের জাহাজটির নামে। ১৪৯৩ থেকে ১৬০৪ পর্যন্ত স্পেনীয়রা এই দ্বীপে বসত করতে গিয়ে ক্যারিবদের হাতে মারখেল। ক্যারিবরা ছিলো দুর্ধর্ষ বন্য জাত। কিন্তু স্পেনীয়রা সরে যাবার পর এলো ফরাসীরা। সেটা ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসী গুয়েদালুপে নিয়ে মারামারি করেছে। ১৮১৫-তে ভিয়েনা কংগ্রেসে গুয়েদালুপ পাকাপাকি ফরাসী হোলো। কিন্তু ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এটা ফ্রান্সই হয়ে গেলো। ফ্রান্সের অন্যতম প্রদেশ। গুয়েদালুপের প্রত্যেকটি মানুষ ফরাসী॥ সেন্টস্ আইল্যান্ডস্, সেন্ট বার্থেলেমী, মারী গ্যালান্তে, সেন্ট মার্টিন্—সবাই ফ্রান্স॥

কিন্তু এ-ফরাসীরা ফ্রান্সের ফরাসী থেকে ফরাসীতর। এদের ফ্রান্সেরই রেডিওতে বললে পাকা [illegible] ফরাসী শোনা যাবে, যা প্যারিসের পাকীও [illegible] পারবেন না। [illegible] নিজের ক্ষেত্রে [illegible] অর্থে গুয়েদালুপ [illegible]।

বাংলা ও হিন্দী চিত্রের দুই নায়ক-নায়িকা ললিতা ও সর্বেন্দু

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র-সমালোচনা :

হংসমিথুন (বাঙলা) : গীতছন্দম্-এর নিবেদন; ৪,২১৪·০০ মিটার দীর্ঘ এবং ১৫ রীলে সম্পূর্ণ; প্রযোজনা : সনাতন মুখোপাধ্যায়; কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : পার্থপ্রতিম চৌধুরী; সংগীত-পরিচালনা : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গীতছন্দম্ নিবেদিত "হংসমিথুনে" চিত্রের কাহিনীর অকুস্থান হচ্ছে স্কটিশ চার্চ কলেজ কল্পনা করা হয়েছে,—যেখানে সহশিক্ষা বা কো-এডুকেশন চালু আছে। নায়িকা শ্রীচৌধুরী ঐ কলেজের কলা-বিভাগের ছাত্রী। নায়িকার পিতা ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরীর কথা থেকে প্রকাশ, শ্রী চৌধুরী ১৯৫৮ সালের ১লা জুন স্কটিশ চার্চ কলেজের কলাবিভাগের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। —ব্যস, কাহিনীর এইটুকুই হচ্ছে বাস্তব পটভূমিকা। —এ ছাড়া সব কিছুই হচ্ছে কল্পনা, নিছক কল্পনা।

ক্লাসে একটি সুশ্রী মেয়েকে দেখতে পেলে বহু ছেলেই তার সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করে থাকে বিভিন্ন পথ ধরে। তার মধ্যে একটি পথ হল—নানা অছিলায় মেয়েটির বিরক্তি উৎপাদন করা। সেই পথ ধরেই "হংসমিথুনে"-এর নায়ক দিব্যেন্দু শ্রীর সঙ্গে পরিচিত হয় এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে বিস্মিত করে তার বাবা সঞ্জয় চৌধুরীর কাছে আইনের ছাত্ররূপে আলোচনা করতে আসে। তাকে নিজেদের বাড়ীতে দেখে এবং নিজের বাবার সঙ্গে তার আইনবিষয়ক আলোচনা শুনে শ্রী দিব্যেন্দুর দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তার দুর্দান্তপনা, শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান প্রভৃতির তারিফ না করে পারে না। এর পরে দিব্যেন্দু যখন তার কাছে আলাদাভাবে কবুল করে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অভিপ্রায়েই তাকে বহুপ্রকার অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, তখন দিব্যেন্দু শ্রীর মনে রীতিমত দোলা জাগায়। ফলে শ্রী ও দিব্যেন্দু ক্রমেই দুজনের কাছাকাছি আসতে থাকে—অবাধ হয় তাদের মেলামেশা। শ্রী দিব্যেন্দুকে আবার নতুনরূপে আবিষ্কার করে, যখন এক সন্ধ্যায় তার সন্ধানে বেরিয়ে সে দেখে, স্কটিশ কলেজ ছাত্র পরিষদ পরিচালিত 'অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়'-এর (কাহিনীর এইখানে আবার একটু বাস্তবের ছোঁয়াচ) সেই হচ্ছে প্রধান শিক্ষক ও পরি-চালক। তখন সে মোহে ওঠে : কেমন এক সুন্দর যে মনে হয়। দুজনেই দুজনকে জীবনসাথীরূপে পেতে আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু দিব্যেন্দু এরই মধ্যে জেনে ফেলেছে, শ্রী ওদের পার্টি ঘরের মেয়ে হলেও ওদের মধ্যে সামাজিক বিবাহ হবার পথে একটি বিরাট বাধা আছে; সে জানে, তার বাবা উকীল প্রমথ মল্লিক হচ্ছেন শ্রীর বাবা ব্যারিস্টার সঞ্জয় চৌধুরীর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেই কারণে তিনি কিছুতেই সঞ্জয় চৌধুরীর কাছে তার কন্যাকে বধূরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব করতে সম্মত হবেন না। অতএব সে শ্রীর কাছে প্রস্তাব করে রেজেস্ট্রী বিবাহের। কিন্তু শ্রী হচ্ছে ধর্মভীরু এবং সে তার নিজের বিবাহ যথারীতি অভিভাবকের সঙ্গে সম্পন্ন হবে না, এ-কথায় সায় দিতে পারে না। —এর পর দিব্যেন্দুর দাদা সৌমিত্র সাহায্যে ওরা কেমন করে সকল বাধা অতিক্রমের পর মিলিত হল, এই নিয়েই ছবির শেষ অধ্যায়টি রচিত।

"হংসমিথুন" ছবিটিকে একটি পুরো-পুরো ক্যাম্পাসভিত্তিক কমেডিরূপে আকার দেবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ছবিটি আরম্ভ করা হয়েছিলও সেইভাবেই। কিন্তু মিডলক্লাস অ্যাডভেঞ্চারে তার সুর পরিবর্তন করেছেন কাহিনীকার পরিচালক নায়ক দিব্যেন্দুর দাদা সদানন্দ ও তাঁর স্ত্রী

পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট চিত্রে নীলিমা চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায়

দেশী ছবির খবর

ছবির মেলা বসেছে। দেশী ছবির খবরে নির্মীয়মান এবং মুক্তিপ্রতীক্ষিত অনেক ছবির নাম যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের ছবির কথা আগে বলি। তারপর বোম্বাইয়ে নির্মিত হিন্দী ছবির খবরে আসছি।

বর্তমানে অভিনেত্রী-পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী বনফুল রচিত রূপকথা কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেষ করেছেন। সম্প্রতি এ ছবির বহির্দৃশ্যের জন্য মেদিনীপুর, ওড়িষ্যা এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থান পরিচালিকা নির্বাচিত করেছেন। এ ছবিতে বহু পাত্র-পাত্রী যুক্ত হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে শিল্পী নির্বাচনের মোটামুটি কাজও শেষ হয়েছে। সম্ভবত এ ছবিতে উত্তমকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী দেবী, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, ছায়া দেবী, দিলীপ রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, চিন্ময় রায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় এবং নবাগত স্বরূপ দত্ত প্রভৃতি শিল্পীকে দেখতে পাওয়া যাবে। এখনও ভূমিকালিপি সম্পূর্ণ হয়নি। সম্ভাব্য নামগুলো আপনাদের আগেভাগে জানিয়ে রাখলাম। নামের পরিবর্তন হতে পারে। ছবির সঙ্গীতপরিচালনা করবেন পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবী।

বাংলাদেশের প্রথম অভিনেত্রী পরিচালিকা হলেন মঞ্জু দে। অভিশপ্ত চম্বল চিত্রের সাফল্যের পর তিনি বর্তমানে শুরু করেছেন 'স্বপ্ন নিয়ে'। এটি একটি রহস্যমূলক চিত্র। কাহিনীকার হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলীতে রূপদান করছেন বাসবী নন্দী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, মঞ্জু দে, নীলিমা দাস প্রভৃতি। এ ছবির সুর-সৃষ্টি করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত। সুভোগা ডিস্ট্রিবিউটার্স ছবিটির পরিবেশক।

চলচ্চিত্র ভারতীর 'কখনো মেঘ' বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষিত। অগ্রদূত পরিচালিত এ ছবির প্রধান চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তমকুমার, অঞ্জনা ভৌমিক, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিম ঘোষ। ডি লুক্স ফিল্ম পরিবেশিত এ ছবির সুরকার হলেন সুধীন দাশগুপ্ত।

এবারে হিন্দী ছবির খবরে আসা যাক। আগেই বলেছি হিন্দী ছবির প্রধান নির্মাণস্থল বোম্বাই। বর্তমানে যে নতুন ছবিগুলোর কাজ শুরু হয়েছে তার খবরাখবর আপনাদের জানাচ্ছি। তার আগে দুটি জনপ্রিয় নায়িকার বিবাহ-সংবাদ জানিয়ে রাখি।

সম্প্রতি মালা সিনহার শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হল নেপালী চিত্রের নায়ক চিদাম্বর প্রসাদ লোহানির সঙ্গে। ভালবাসা থেকেই এ মিলনের সূত্রপাত। নেপালী চিত্র 'মাইতি ঘর'-এ মালা সিনহার বিপরীতে সি পি লোহানি প্রথম অভিনয় করেছিলেন। এখন মালা ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের নায়িকা হলেন।

বৈজয়ন্তীমালাও এ মাসের শেষ তারিখে পূর্বঘোষিত পাত্র ডাঃ সি এল বালীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন। মাদ্রাজে বিবাহবাসর বসবে আর প্রীতিভোজের আয়োজন হয়েছে বোম্বাইয়ে। যেভাবে বিবাহের ঢেউ বইছে তাতে মনে হয় বোম্বাইয়ে আর কোন কুমারী নায়িকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পরিচালক এ ভীম সিংহ বোম্বাই অঞ্চলে তাঁর রঙীন ছবি 'ভাই বহেন'-র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করার পর সম্প্রতি শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওর অভ্যন্তরের কাজ শুরু করেছেন। ছবির মুখ্য অংশে রূপদান করছেন সুনীল দত্ত, নতুন, অশোককুমার, প্রাণ, হেলেন, পদ্মিনী, জীবন, মুকরি, বি বি ভাল্লা ভাল্লা এবং নবাগত দিবাকর বালী। শঙ্কর-জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

কাহিনীর পরিচালক দুলাল গুহ তাঁর নতুন ছবি 'খামোশ করে পুকার কে'-র চিত্রগ্রহণ শ্রীসাউণ্ড স্টুডিওয় শুরু করেছেন। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন নন্দা, সঞ্জীবকুমার, অভি ভট্টাচার্য মালিনী, তরুণ বোস, দুর্গা খোটে, লীলা মিশ্র, তিওয়ারী ও কানহাইলাল। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

দেব আনন্দ ও বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত 'দুনিয়া' চিত্রের দৃশ্যগ্রহণ সম্প্রতি মেহেবুব স্টুডিওয় শুরু করেছেন পরিচালক টি প্রকাশ রাও। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করছেন বলরাজ সাহানি, মাস্টার, জনি ওয়াকার, প্রেম চোপরা ও সুরেশ। সঙ্গীতপরিচালনায় রয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ।

সাধারণতঃ শীতের মরশুমে বাইরে ছুরে আসার একটা হিড়িক পড়ে যায়। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের আশায় নয় বৈচিত্র্যের পিপাসাই মূলতঃ এর কারণ। ইদানীংকালে পুরী এ ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত ডিসেম্বর মাসের কয়েকটা দিন পুরী যখন এই বছরের বর্ষশেষের ছুটিতে জমজমাট, তখন এক প্রবল জনস্রোত দেখা দিয়েছিল পুরীর সমুদ্রসৈকতে। কত উৎসবের মাঝার রোদের শপথ লাগার মুহূর্ত থেকে রৌদ্রস্নাত বালুবেলায় মধ্যাহ্নের পর পর্যন্ত অগণিত মানুষের জনতা জমায়েত হয়েছিল। মেয়ে পুরুষ শিশুদের মধ্যে নানা বয়সের নানা দেশের লোক। তাদের কেউ এসেছেন কটক থেকে, কেউ বা এসেছেন ভুবনেশ্বর থেকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির, চিল্কার হ্রদ, কোণারকের সূর্যমন্দির, উদয়গিরি খণ্ডগিরি মহাপ্রভু জগন্নাথের চেয়েও বিশিষ্ট আকর্ষণ আজ সমুদ্রবেলায়। উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠছে একটি তরুণ আর তরুণী—স্কেটিং কম্পিটিশন বাহাদুর।

বাঙলা দেশ এখনও ভাল করেই দেখেনি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের কাছেও একে অপরিচিত [illegible] তার দেখা [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত [illegible] ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]। ছবি : [illegible]

স্টুডিও থেকে বলছি

শট নং—১১০

ক্যামেরার ফ্রেমে গৌরাঙ্গ আর মণ্টু। মিড ক্লোজ শট।

মণ্টু—গৌরাঙ্গ, বৌদি কোথায়?

গৌরাঙ্গ (বিস্ময়ের সুরে)—কেন, ঘরে নেই?

মণ্টু—না তো!

গৌরাঙ্গ—দেখি (এগিয়ে যেতে উদ্যত বারান্দার দিকে)।

মণ্টু—থাক, আমিই দেখছি। ক্যামেরা এগিয়ে আসে মণ্টুর দিকে। মণ্টু ডানদিক ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। কাট্।

মিড ক্লোজ শট। মণ্টু সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে। বাঁ হাত দিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালে। কাট্।

এবার ক্যামেরা সিঁড়ির ওপরে। মণ্টু ওপরের দিকে তাকায়, তারপর উঠে আসে ওপরে। কাট্।

কাট নং—১১১

মিড্ ক্লোজ শট্। সরসী দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। দূরে আশেপাশের বাড়ীর আলো দেখা যায়। মণ্টু ডানদিক থেকে ফ্রেমে ঢোকে। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় সরসীর দিকে, ক্যামেরাও এগিয়ে আসে ওদের ফ্রেমে ধরে। কাট্।

ক্লোজ শট্। ফ্রেমে মণ্টু আর সরসী।

মণ্টু—রীনাসেসন কেমন হয়েছে তা বললে না?

সরসী—বলবার তো খুবই ভালো হয়েছে।

মণ্টু—তাহলে আমার পাওনা দিলে না।

মণ্টু দুহাত দিয়ে আলগাভাবে সরসীকে কাছে টেনে নেয়।

বিগ ক্লোজ আপ্। সরসীর উদাস জল-ভরা চোখ। মিড ক্লোজ শট্। সরসী বাধা দিতে চায়, পারে না।

কাট্।

ঐ একই ফ্রেম। ক্লোজ শট্।

সরসী—না-না—

মণ্টু—রাগ কোরো না সরো।

সরসী—রাগ তো আমি করিনি, তুমিই করেছ।

মণ্টু—সে তো অনেক আগে, এখন তো দেখছি তুমিই রাগ করেছ।

মণ্টু সরসীর দিকে তাকায়। কাট্।

ক্যামেরা এবার ওদের দুজনকে একই ফ্রেমে রেখে একটু তাইমে। ক্লোজ শট্।

সরসী—আমি করেছি কারণে, তুমি করেছ অকারণে। শখ তো তোমার......

বলতে বলতে মণ্টু জড়িয়ে ধরে সরসীকে। গলা তার উত্তাপে ভারী হয়ে যায়। কাট্।

ক্লোজ শট্। মণ্টু। তাকিয়ে আছে সরসীর দিকে।

মণ্টু—তুমি খালি আমার রাগটাই দেখছ, কষ্টটা দেখছ না। কতদিন আমি ওদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারিনি। কাট্।

ক্লোজ শট্। সরসী। আদরের সুরে আর দৃষ্টিতে তাকায়, বলে।

সরসী—আমারও কি ইচ্ছে করে না? তবে জীবনে কোন ব্রত গ্রহণ করবার কি দরকার ছিল?

(সরসীর গলা কান্নায় ভিজে আসে)। তুমি আবার চিৎকার করবে, যা-তা কথা বলবে। অথচ ভয়েস। গৌরাঙ্গ ডাকে ওদের। দুজনেই ছেড়ে দেয় দুজনকে। ফেড্ আউট।

শট নং—১১২

ফেড্ ইন। দেখা যায় বাগানে একরাশ মাটি ফেলা হয়েছে। এদিক-ওদিকে কিছু খালি টব আবার কিছু টব মাটি-ভরা। ক্যামেরা প্রায় বাগানটা প্যান করে যেতে আরও একটু বাঁদিকে প্যান করতেই ফ্রেমে এসে পড়ে মণ্টু আর সরসী।

মিড ক্লোজ শট্। সরসী আর মণ্টু একটা টবে মাটি ভরে গোলাপের চারা পুঁতছে। কাট্।

মিড্ ক্লোজ শট্। সরসী খুশি করে জল ঢালছে, হাসছে সামনের হাসি। কাট্।

মণ্টু সরসী দুজনেই এসে এগিয়ে গাছটার দিকে চেয়ে। মিড ক্লোজ শট্।

ক্লোজ শট্। মণ্টু।

মণ্টু—এখন চারাগাছ, যখন ফুলে ভরে যাবে কেমন লাগবে সরো।

ক্লোজ শট্। সরসী।

সরসী—আগে ফুল ফুটুক, তবে তো। কাট্।

ওরা দুজনেই উঠে পড়ে। ক্যামেরা প্যান করে ডানদিকে। মণ্টু হাত ধোয়। মিড ক্লোজ শট্।

ক্লোজ শট্। সরসী জল ঢেলে দিতে থাকে। ফেড আউট।

যে-তিনটে দৃশ্যের কথা বললাম, এগুলি হল আলোছায়া প্রোডাকসন্সের নতুন নির্মীয়মান ছবি 'ছিন্ন সবুজের পাতা'-এর। কথা-সাহিত্যিক সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এ-ছবির পরিচালনার ভার নিয়েছেন আপ্নু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরোক্ত কটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ হল কয়েকদিন আগে টেকনিসিয়ানস্ স্টুডিওতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। শুধু সম্প্রতি এক বিরাট সেট পড়েছিল স্টুডিওর ময়দানে। [illegible] নাম ও আরও [illegible] দৃশ্য গৃহীত হল ঐ সেটে। ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে আছেন [illegible] ও [illegible]।

জন্মশতবার্ষিকী অরবিন্দ চিত্রে অরবিন্দ চরিত্রে দিলীপ রায় এবং নিবেদিতা চরিত্রে শ্রীমতী ভিভানো।

চট্টোপাধ্যায়ের। প্রথম অভিনয় ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে।

স্বর-গরল

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'অনুমূর্ণী' সম্প্রতি 'স্বর-গরল' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। নাট্যকার স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত স্বয়ং নাট্য-নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনায় পরিচ্ছন্ন শিল্প-বোধের ছাপ ছিল।

নাট্য সম্মেলন

নাট্য সম্মেলনের ৪র্থ বার্ষিক অধি-বেশন এবার বসছে প্যারি স্কোয়ারে (সুভাষ বাগ) মার্চের প্রথম সপ্তাহে। এবারেও অনুষ্ঠানসূচীতে অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। অনুষ্ঠানও চলবে পনেরো দিনব্যাপী।

অবসাদ

সম্প্রতি পার্ক স্ট্রীট রিক্রিয়েশন (মহাশিল্প অ্যান্ড মাহীশিল্প লিঃ) ক্লাবের সভাবৃন্দ স্টার রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন পৃথ্বীশ সরকারের 'অবসাদ' নাটকটি। নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শ্রীকমল চট্টো-পাধ্যায়। তাঁর সুষ্ঠু শিল্পবোধ অভিনয়ের অনেক জায়গাতেই সুন্দরভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অভিনয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি বলিষ্ঠই থাকে বলতে হবে। অভিনয়ের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুশান্ত বসু (অলোক), প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুপ), নীলু রায়চৌধুরী (বলাই), বসন্ত চৌধুরী (কিনু), দেবু মুখোপাধ্যায় (বিজয়), অপূর্ব ভট্টাচার্য (গোকুল), সুতপা ভট্টাচার্য (বাণী) সুঅভিনয়ের স্বাক্ষর উপস্থিত করতে পেরেছেন।

নায়িকা বিদায়

কিছুদিন আগে 'কল্পতরু'র প্রযো-জনায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হল বসন্ত ভট্টাচার্যের কৌতুকরসাশ্রিত নাটক 'নায়িকা বিদায়'। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে বহন করেন। প্রতিটি শিল্পীই প্রাণ-ঢেলে অভিনয় করেছেন বলে সমগ্র অভিনয়ে সব সময়েই একটা সজীবতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে। অভিনয়ে যাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—রাজকুমার বসু (কার্তিক), সুমন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদল), নীতিশ সান্যাল (সোমেন), ক্ষিতি দাস (অঞ্জলি)। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দেন—বিশ্বনাথ বসাক, পুলক সেন, অরুণ চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীত ও মঞ্চস্থাপত্যে সহায়তা করেন সুকুমার সাহা ও সুনীল মোদক।

ভাঁটিনীর বিচার

হিন্দুস্থান বিল্ডার্স পোস্টাল রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাবৃন্দ সম্প্রতি 'রঙমহলে' শচীন সেনগুপ্তের 'ভাঁটিনীর বিচার' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীকালিপদ চক্রবর্তী। তাঁর প্রয়োগ-পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—সীতাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলাকী গুহ, শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ ঘোষ, শ্যামকুমার চক্রবর্তী, মোতিলাল বসু, মানস ঘোষ, মদু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর ভট্টাচার্য।

বিবিধ সংবাদ

দশরূপকের নতুন নাটক 'শেক্‌চেঙ্কো'

দশরূপক নাট্যগোষ্ঠী এবার একখানা নতুন ধরনের নাটক নিয়ে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হচ্ছেন আগামী ৬ই মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। শ্রীমন্মথ রায় রচিত সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাটক-খানির নাম 'শেভচেঙ্কো'। এই নাটকের গান ও কবিতাগুলি বাংলায় রূপায়িত করেছেন কবি রাম বসু। নাট্যনির্দেশনায় আছেন ভরদ্বাজ এবং সঙ্গীত পরিচালনায় পরেশ ধর।

বোকারোর আনন্দানুষ্ঠান

ডি ভি সি বোকারো শিশু-শিল্পীদের নিয়ে যে কত সুন্দর মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়, তার প্রমাণ রাখলেন বোকারোর 'হাসি-খুশীর আসর'। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় ক্লাবের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে এই সংস্থাটি এ মনোজ্ঞ অনু-ষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছোট্ট দুটি মেয়ে সুদীপা ভট্টাচার্য এবং শম্পা মজুমদারের নয়না-ভিরাম বাউল নৃত্যের মাধ্যমে। কুমারী প্রীতি গুপ্ত এবং সিমন্তী চ্যাটার্জির মিলিত নৃত্য দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। উক্ত দুটি নৃত্যের সঙ্গে নেপথ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে এবং যন্ত্রে ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী দীপালী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি এবং শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য। ছোট-মেয়ে চৈতালী মিত্রের 'কিচু-চোর' আবৃত্তি অবাক করে দেবার মত। জ্যোৎস্না দাস (ধানবাদ)-এর রাসবৃন্দের উপর নেপাছ-বোধক সঙ্গীতটি উপেক্ষা করবার মত নয়। এ শিশু-শিল্পীর সঙ্গে হারমোনিয়াম এবং তবলা সহযোগিতায় যথাক্রমে ছিলেন শ্রীকালীনাথ মুখার্জি এবং শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য। বিশেষ অনুরোধে শ্রীমতী দীপালী ভট্টাচার্য একখানি সঙ্গীত পরি-বেশন করে উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দেন। মাঃ ইন্দ্রজিৎ এবং মাঃ প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি এ দুই ভাই সহোদর মিলে পিয়ানো একর্ডিয়ানের তালে তালে টুইস্ট নৃত্য দর্শকবৃন্দের মধ্যে খুশীর জোয়ার বইয়ে দেন। এ দুই শিশু-শিল্পীর সঙ্গে পিয়ানো একর্ডিয়ানে ছিলেন শ্রীকমল দে। এরপর শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী রচিত বহু প্রতীক্ষিত 'পণ্ডিত বিদায়' প্রহসনটি শ্রীগোপাল সেন-র পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। এর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন : সর্বশ্রী কুমার ব্যানার্জি (হেডপণ্ডিত), বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি (ইন্সপেক্টর), আশীষ দাশগুপ্ত (অফিসার), মদুমিতা চৌধুরী (পণ্ডিতমশায়), শঙ্কর দত্ত (বৈদ্য), মিন্টু রায় (মুকুল),

জলসা

সুরেশ সঙ্গীত সংসদ

হাস্যিরসতম ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে উত্তরা সিনেমা হলে সুরেশ সঙ্গীত সংসদের চতুর্থ অধিবেশন সুরু হয় ওঙ্কারনাথের গাওয়া বন্দেমাতরম রেকর্ড বাজিয়ে। সাধককণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীতের ভাব আবেগ ও দীপ্তি মিলে এক—সুরসমৃদ্ধ গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

তারপর ভূপেন্দ্রবন্দনা। 'ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ স্মরণে রচিত এই গানটির রচয়িতা ও সুরকার শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। কেদার, আলাহিয়া বিলাবল, ভাটিয়ার ও বসন্ত রাগভিত্তিতে রচিত—শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও মঞ্জু ভট্টাচার্য, দ্যুতি চন্দ, গোপা চট্টোপাধ্যায় ও রাধা চৌধুরী গীত এই অনুষ্ঠান খুব উপভোগ্য হয়েছে ও গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

আলাপ ও ধ্রুপদ গেয়ে শোনালেন ওস্তাদ রহিমুদ্দিন ডাগর। রাগ চৌরী। ধ্রুপদের ভাবসমৃদ্ধ বিরাট পটভূমিকায় চৌরির বিষন্ন গাম্ভীর্য ডাগরবাণী বাজের সরল আবেগে মাধুর্যে এবং শিল্পীর শান্ত আত্মসমাহিত পরিবেশনায় এক মর্যাদা-গম্ভীর রসসমৃদ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে। বিঠলদাস গুজরাটীর পাখোয়াজ সঙ্গত সঙ্গীতের উপযুক্ত ছন্দসৌষ্ঠব রচনা করেছে। সঙ্গীতসুরেতিকে শিল্পসুন্দর সার্থকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল শ্রীনির্মলচন্দ্র চক্রবর্তীর সেতার; ইনি বাজালেন কোমল আশাবরী। আশাবরীর এই প্রাচীন রূপটির শুদ্ধ রূপায়ণ আলাপের সুচিন্তিত বিস্তার এবং অতিরঞ্জনবর্জিত নাতিদীর্ঘ গতের আধারে সুপরিবেশিত। রাগের অন্তর্নিহিত সচঞ্চল বেদনা কোমল রেখাবের শ্রুতিতে কোমল মাধুর্যের ব্যঞ্জনায় পরিব্যাপ্ত। শ্রীসুধীর চাটার্জীর তবলা-সঙ্গত সংযত ও সুন্দর।

এই অধিবেশনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল শ্রীউদয়শঙ্করের সম্বর্ধনাসভা ও সঙ্গীত-শাস্ত্রী কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে সংসদের পক্ষ থেকে 'মিউজিশিয়ান অব বেঙ্গল' (১৯৬৮) রূপে ঘোষণা এবং স্বর্ণ-পদক দান।

স্রষ্টা ও শিল্পী উদয়শঙ্করকে মাল্য-ভূষিত করে তাঁর হাতে মানপত্র প্রদান করেন সংসদের সভাপতি শ্রীমন্মথ ঘোষ। এই উপলক্ষে উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' চিত্রের কিয়দংশ দেখানো হয়। সৃষ্টির প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন করে স্রষ্টাকে অভিনন্দনজ্ঞাপনের মহৎ পরিকল্পনা সঙ্গত উল্লেখের দাবী রাখে।

কুমার বীরেন্দ্রকিশোরকে 'মিউজিশিয়ান অব বেঙ্গল' রূপে ঘোষণা অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত ও বিবেচনার পরিচায়ক। তবে এই প্রসঙ্গে যদি বাংলাদেশের গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধ্যায়ে রায়চৌধুরী পরিবারের বিরল শিল্পসাধনা পৃষ্ঠ-পোষকতা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিপুল অবদানের উল্লেখ করতেন আরো সুশোভন হোত। ভারতের শিল্পীকুল গৌরীপুর স্টেটের আনুকুল্য অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আজও স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅশোককুমার সরকার।

ওস্তাদ আমীর খাঁর গান দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ

শিল্পীসংখ্যা-ভারাক্রান্ত সর্বভারতীয় সঙ্গীত সমাজ তিনে তেতালাছন্দে যথা-রীতি শ্রোতা ও দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করে দীর্ঘ সাতদিন ধরে চলেছিল। নতুনত্বের মধ্যে এবারের সঙ্গীতসভা বসেছে মহম্মদ আলি পার্কের সুবৃহৎ চত্বরে। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তায় সব অনুষ্ঠান শোনা সম্ভব হয়নি। যেটুকু শুনেছি তার মধ্যে কিছুই যে উপভোগ্য হয়নি তাও নয়। যেমন সারা-রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানে ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ ও সেতার। ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর অনুষ্ঠান ছিল প্রথমার্ধে। বেহাগে আলাপ বাজিয়ে মারু বেহাগে গৎ শোনালেন। আলাপের বিস্তারে গায়কী অঙ্গের সঙ্গে ধ্রুবাবের ধ্রুপদী বিস্তারে যেমন মননশীলতার পরিচয় মুদ্রিত তেমনই চিত্তগ্রাহী অনিল ভট্টাচার্যের তবলাসঙ্গতে গতের ছন্দ-বৈচিত্র্য।

আমেরিকা সফরের পর নিখিল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের অনুষ্ঠান এই প্রথম শোনা গেল। ললিত রাগের শান্ত করুণ রস যুগল মধ্যমের শুদ্ধ, গম্ভীর শ্রুতিতে যেমন নিটোল হয়ে দানা বেঁধেছে তেমনই রং-বাহারের ঝিকিমিকি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সিন্ধুভৈরবীর চিত্তহারী বিস্তার ও তান-বৈচিত্র্যে। শিল্পীর মেজাজে উপযুক্ত সহায়তা করেছে শ্রীশ্যামল বসুর তবলা-সঙ্গত।

শ্রীবলরাম পাঠকের সেতারবাদন তানসেন সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তরুণ শিল্পী শ্রীমিলন নাগ—'বাগেশ্রী' বাজালেন। আলাপ ও জোড়ের অংশ বিলম্বিত ও অনতিক্রমীয় প্রথমশ্রেণীর রাগ, গতের অংশও রসসমৃদ্ধ। উদীয়মান সেতার-বাদক সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যকোষ' রাগ বাজালেন প্রায় প্রশংসা আমরা করেছি। সুরেশ চক্রবর্তী দুটি এই রাগ কণ্ঠসঙ্গীতে দু-এক শিল্পীকে গাইতে শোনা গেছে। কিন্তু সেতারে বোধহয় এই প্রথম।

হিমাংশু বিশ্বাসের 'নায়কী কানাড়া'র তাঁর উদ্যমান অনাহত ছিল।

আর একটি তরুণ শিল্পীর অনুষ্ঠান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হোল আশীষ গুপ্তের গীটার। গীটারের সমস্ত অবয়ব বজায় রেখেও রাগসঙ্গীতের পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা খুব আনন্দদায়ক।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ আমীর খাঁর শুদ্ধকল্যাণ ও দরবারী কানাড়া ও তারাপদ চক্রবর্তীর গুঞ্জিকানাড়া মনে রাখবার মত। একজনের মিড়প্রাণ শান্ত-বিস্তার অপরজনের তানসমৃদ্ধ ওজস। একজনের ধ্যান অপরজনের ধারণা—সঙ্গীতের এই দুটি দিক সম্বন্ধে দুই শিল্পী আমাদের অবহিত করেছিলেন। নাসির আমেদের তানের চকমিকি তাক লাগাবার মতই। এম আর গৌতমের শ্যাম কল্যাণ, টপ্পা ও ঠুংরি সুরেলা কণ্ঠের মাধুর্য মন কেড়ে নিয়েছে। প্রসূন বন্দ্যো-পাধ্যায় বাগেশ্রী-এ নিষ্ঠা ও রূপদক্ষতা যথেষ্ট। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগ' তাঁর উপযুক্ত মানে পরিবেশিত।

নবাগতা শিল্পীদের মধ্যে শ্রীলা চক্রবর্তীর মালকোষ-এ প্রতিশ্রুতির পরিচয় সুস্পষ্ট। নিমাইকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের গানও আমাদের ভাল লেগেছে। এত বড় সম্মেলন আরও সুষ্ঠুভাবে হওয়া উচিত। সাংবাদিকবৃন্দের আসন আর সম্মেলন আরোও একটু ভালো হলে ক্ষতি কি? বিশেষ প্যান্ডেলে?

সুরমঞ্জরীর বিদায়তনের 'তাসের দেশ'

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বালিগঞ্জ শিক্ষা-সদন হলে আয়োজিত সুরমঞ্জরীর তাসের দেশ নৃত্যনাট্য উল্লেখের দাবী রাখে। হরতনীর ভূমিকায় মিতা রায়-চৌধুরীর নৃত্য অনবদ্য। রাজপুত্রের ভূমিকায় শাশ্বতা সাহা ও রুইতনের ভূমিকায় শিবানী মিত্রের অভিনয় কৃতিত্বের দাবী রাখে। এছাড়া রূপা চক্রবর্তী, সুস্মিতা ঘোষ, সম্পা লাহিড়ী প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয়ে সাবলীল। সংগীত পরি-চালনায় শ্রীসৌমেন রায় কৃতিত্বের দাবী রাখেন। সংগীতে কৃষ্ণবিহারী সিংহ, সৌমেন ঘোষ, শাশ্বতা সাহা ও জয়শ্রী সেন-গুপ্ত প্রভৃতির গান উল্লেখের দাবী রাখে।

ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ভবানীপুরে ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিরাট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন

কলকাতার পৌর সম্বর্ধনা সভায় মেয়র শ্রীগোবিন্দ দে ১৯৬৭ সালের রোভার্স এবং ডুরান্ড কাপ বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ক প্রশান্ত সিংহকে স্মারক ট্রফি উপহার দিচ্ছেন।

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

নিউজিল্যান্ড : ৩৫০ রান (গ্রাহাম ডাউলিং ১৪৩, বি ই কংডন ৫৮ এবং এম বার্জেস ৫০ রান। আবিদ আলী ২৪ রানে ৪, দেশাই ৬১ রানে ২ এবং নাদকার্নী ৩১ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৮ রান (বি এ জি মারে ৫৪ রান। প্রসন্ন ৯৪ রানে ৬ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৩৫৯ রান (ওয়াদেকার ৮০ এবং ইঞ্জিনীয়ার ৬৩ রান। মট্‌ ৮৬ রানে ৫ এবং এলাবেস্টার ৬৬ রানে ৩ উইকেট)

ও ২০০ রান (৫ উইকেটে। ওয়াদেকার ৭১ রান। এলাবেস্টার ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জল তারিখ যুক্ত হল—১৯৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী। এইদিন ডুনেডিনের প্রথম টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে পরাজিত করার সূত্রে বিদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম জয়ী হল। পতৌদির নবাব মনসুর আলী খুবই ভাগ্যবান, তাঁরই নেতৃত্বে ভারতবর্ষের এই জয়। পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়াল: খেলা ২৬, জয় ৩, হার ১৩ এবং ড্র ১০। অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের শতকরা ১১·৫৩ জয়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে এই প্রথম টেস্ট ম্যাচ ধরে ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংখ্যা দাঁড়ালো ১০৫ এবং তার ফলাফল—ভারতবর্ষের জয় ১১, পরাজয় ৪৪ এবং ড্র ৫০। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ঘটনাপঞ্জীর ওপর চোখ বুলিয়ে পেলাম: (১) ১৯৩২ সালের ২৫ জুন, লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট খেলার উদ্বোধন—আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে কর্ণেল সি কে নাইডুর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রথম আবির্ভাব, (২) ১৯৫২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজের পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের কাছে ইংল্যান্ডের এক ইনিংস ও ৮ রানে পরাজয়—সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ভারতবর্ষের প্রথম জয়—বিজয়ী ভারতবর্ষের অধিনায়ক ছিলেন বিজয় হাজারে এবং (৩) পাকিস্তানের বিপক্ষে ১৯৫২-৫৩ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায় (ড্র ২) জয়লাভের সূত্রে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে ভারতবর্ষের প্রথম 'রাবার জয়'। এক্ষেত্রে লালা অমরনাথ ছিলেন ভারতবর্ষের অধিনায়ক। ভারতবর্ষের সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ঘটনাপঞ্জীতে এখনও যা প্রধান বাকি আছে তা বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট সিরিজ জয়।

ডুনেডিনের প্রথম টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক বেরী সিনক্লেয়ার টসে জয়ী হয়ে প্রথম গ্রহণায় ব্যাট করার দান নিয়েছিলেন। তাদের ১ম উইকেট পড়ে যায় ৪৫ রানের মাথায়। ২য় উইকেটের জুটিতে বি ই কংডন (৫৮ রান) এবং গ্রাহাম ডাউলিং দলের ১৫৫ রান তুলে প্রাথমিক বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করলেও পরবর্তী খেলায় পুনরায় বিপর্যয় দেখা দেয়—২০০ রানের মাথায় ২য়, ২০১ রানের মাথায় ৩য়, ২৫৩ রানের মাথায় ৪র্থ এবং ২৪৬ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। চা-পানের সময় নিউজিল্যান্ডের রান ছিল ১৬৩ (১ উইকেটে)। প্রথম দিনে তাদের রান উঠেছিল ২৪৮ (৫ উইকেটে)। গ্রাহাম ডাউলিং শত রান (১৪৩) করেন।

দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের কিছু পরে ৩৫০ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অর্থাৎ এইদিনে তারা বাকি ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১০২ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। আবিদ আলী ২৪ রানে ৪টে উইকেট পান—প্রথমদিন পান ৪ রানে ২-টো। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের ৩-টে উইকেট খুইয়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—৩৯ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়েছিল। ২য় উইকেটের জুটিতে ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (৬৩ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার দলের ৭৯ রান যোগ করেছিলেন। অপর দিকে ৩য় উইকেটের জুটিতে ওয়াদেকার এবং সুর্তি সংগ্রহ করেছিলেন ৫৪ রান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষের ১০ মিনিট আগে ওয়াদেকার তাঁর ৮০ রান করে আউট হন। সুর্তি ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

তৃতীয় দিনে চা-পানের ঠিক আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৩৫৯ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ ৯ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষের ৩০২ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়েছিল। শেষ ১০ম উইকেটে দেশাই এবং বেদী জুটি বাঁধেন। ভারতবর্ষ তখনও নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৩৫০ রানের থেকে ৪৮ রান পিছনে। ১০ম উইকেটের জুটিতে বেদী (২২ রান) এবং দেশাই (নটআউট ৩২ রান) দলের অতি মূল্যবান ৫৭ রান যোগ করে দলকে প্রথম ইনিংসের খেলায় অগ্রগামী হতে সাহায্য করেন। ভিক মটের বলে চোয়ালে দারুণ আঘাত পেয়েও আহত দেশাই অপরাজিত ৩২ রান করে যে অপরাজিত থাকেন তা তাঁর দৃঢ়তা এবং দৃঢ়চিত্ততারই পরিচয়। তৃতীয় দিনের বাকি খেলার সময়ে নিউজিল্যান্ড ২য় ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে লাঞ্চের পর ২০৮ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ৬১ রানের মাথায় [illegible]

এবং ৯২ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়ে যায়।

খেলায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০০ রান সংগ্রহ করতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৬১ রান করে। দলের ৩০ রানের মাথায় ১ম এবং ৪১ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়েছিল। ৩য় উইকেটের জুটিতে সুর্তি (৪৪ রান) এবং ওয়াদেকার দলের ১০০ রান তুলে ভারতবর্ষকে জয়লাভের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। এইদিন আলোর অভাবে ৬ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলায় অপরাজিত থাকেন ওয়াদেকার (৭১ রান) এবং পতৌদি (৩ রান)।

আগের দিনের রাত্রে বৃষ্টির দরুন ৫ম দিনের খেলা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হয়নি। এইদিন খেলার গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের দুটো উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়—দলের ১৬৩ রানের মাথায় ৪র্থ (ওয়াদেকার) এবং ১৬৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট (পাতৌদি) পড়েছিল। এদিকে পূর্বদিনের ১৬১ রানের (৩ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ৮ রান যোগ হয়েছিল। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ১৯৪ (৫ উইকেটে)। তখনও জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২০০ রানে পৌঁছতে ৬ রানের প্রয়োজন ছিল, এদিকে হাতে জমা ছিল ৫টা উইকেট। লাঞ্চের পরই ভারতবর্ষ ২০০ রান পূর্ণ করে ৫ উইকেটে জয়ী হয়।

রঞ্জি ট্রফি ফাইনাল

মাদ্রাজ: ২৫৮ রান (প্রভাকর ৬৭ এবং ভাস্কর নটআউট ৭৬ রান। জার্সে ৪৫ রানে ৪ ও বাদু গুপ্তে ৫৯ রানে ৩ উইকেট)—৫ উইকেটে।

ও ৩০২ রান (রাজাগোপাল ৭৩, বেলিয়াপ্পা ৫১ এবং দয়ালু ৫১ রান। সিতালকার ৮৬ রানে ৩ এবং গুপ্তে ১২৮ রানে ৩ উইকেট)

বোম্বাই: ৩১২ রান (অশোক মানকাদ ১১২, মনোহর হার্দিকার ৭০ এবং ডি আর কারথানিস ৫৩ রান। ভাস্কর ৬৮ রানে ৪ উইকেট)

ও ২২৫ রান (কারথানিস ৪৩, হার্দিকার নটআউট ৬২ এবং সোলকার নটআউট ৫৫ রান। বেঙ্কটরাঘবন ৮৫ রানে ২ এবং কুমার ৮১ রানে ২ উইকেট)

ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই প্রথম ইনিংসের রানে মাদ্রাজকে পরাজিত করে উপর্যুপরি ১০-বার রঞ্জি ট্রফি জয়ী হয়েছে এবং সেই সূত্রে এশিয়া মহাদেশের জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছে। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তান—এই পাঁচটি দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কোন একদলের পক্ষে উপর্যুপরি ১০-বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব

রঞ্জি ট্রফি

হয়নি। গত বছর বোম্বাই রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের সূত্রে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বিশ্ব রেকর্ড (উপর্যুপরি ৯-বার জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান) স্পর্শ করেছিল। এ বিষয়ে পূর্বের বিশ্ব রেকর্ড ছিল ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেট লীগে সারে দলের—উপর্যুপরি ৭-বার কাউন্টি লীগ চ্যাম্পিয়ান (১৯৫২-৫৮)। সারে দলের এই বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছিল নিউসাউথ ওয়েলস ১৯৬১ সালে—উপর্যুপরি ৮-বার শেফিল্ড শীল্ড জয় করার সূত্রে। নিউসাউথ ওয়েলস ১৯৬২ সালেও শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়েছিল।

আলোচ্য ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দলের পক্ষে রঞ্জি ট্রফি জয় খুবই কৃতিত্বের পরিচয় এই কারণে যে, তাদের ৬ জন নামজাদা খেলোয়াড় খেলেননি, তাঁরা ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ড সফর করছেন।

বোম্বাই দলের অধিনায়ক মনোহর হার্দিকার টসে জয়ী হয়েও মাদ্রাজ দলকে ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন। মাদ্রাজের প্রথম ইনিংসের সূচনা মোটেই সুবিধার হয়নি: মাত্র ৫৫ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত নীচের দিকের তিনজন খেলোয়াড় মাদ্রাজের সুনাম রক্ষা করেছিলেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে প্রভাকর এবং ভাস্কর ৮৭ রান এবং ১০ম উইকেটের জুটিতে কুমার এবং ভাস্কর ৬২ রান যোগ করেছিলেন। ভাস্কর ৭৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। প্রথম দিনেই ২৫৮ রানের মাথায় মাদ্রাজের প্রথম ইনিংস শেষ হলে বোম্বাই দুটো উইকেট খুইয়ে মাত্র ৭ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনে বোম্বাইয়ের ২১৪ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে তরুণ খেলোয়াড় অশোক মানকাদ (১১২ রান) এবং অধিনায়ক হার্দিকার দলের ১৬৮ রান যোগ করেন।

তৃতীয় দিনে ৩১২ রানের মাথায় বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা ৫৪ রানে অগ্রগামী হয়। অপরদিকে মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না খুইয়ে ১১১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ তাদের প্রাধান্য বজায় রাখতে পারেনি। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস চা-পানের ১৫ মিনিট পর ৩০২ রানের মাথায় শেষ হয়। চতুর্থ দিনে ১৯১ রানের বিনিময়ে তাদের ২য় ইনিংসের ১০টা উইকেট পড়ে যায়—৮৭.৪ ওভারের খেলায়। খেলায় সরাসরি জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪৯ রান তুলতে বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস

জাপানের টেবল টেনিস দল : ভারত সফরে তাঁরা পাঁচটি টেস্টের প্রতিটিতে ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ী হয়েছে। দলের সঙ্গে ৩ জন ভারতীয় খেলোয়াড় আছেন।

খেলতে নেমে একটা উইকেট খুইয়ে ৪৫ রান তুলেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২২৫ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় খেলা শেষ হলে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভ হল না, আরও ২৪ রান করার প্রয়োজন ছিল। এই দিন বোম্বাই দারুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল—যেখানে এক সময়ে ১ উইকেট পড়ে তাদের ১৪ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল ১০৯ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়েছে। শেষ-পর্যন্ত ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে হরদিকার (নট আউট ৬২) এবং সোলকার (নট আউট ৫৫) দলের পতন রোধ করেন। তাঁরা ২০২ মিনিটে দলের ১১৬ রান তুলে দিয়ে অপরাজিত থাকেন।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

ওয়েলিংটনে (উতকামণ্ড) ১৯৬৮ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার উপর্যুপরি তিন বছর রঙ্গস্বামী কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ১৯৬৬ সালে সার্ভিসেস এবং ১৯৬৭ সালে মাদ্রাজ দলের সঙ্গে তারা যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল। তবে রেলওয়ে ইতিপূর্বে একক দল হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৫৭—৫৯) রঙ্গস্বামী কাপ জয়ী হয়েছে। তারা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার প্রথম চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৫০ সালে, প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বছরে। এপর্যন্ত রেলওয়ে দল ১০-বার জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হয়ে সর্বাধিকবার খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছে। তাদের পরই পাঞ্জাবের সাফল্য—৯-বার জয়।

বাংলার খেলা

বাংলা দল 'গ' অঞ্চলের লীগ খেলায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ান দল হিসাবে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২—২ ও ০—৪ গোলে রেলওয়ে দলের কাছে পরাজিত হয়। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা দল এপর্যন্ত তিনবার (১৯৩৬, ১৯৩৮ ও ১৯৫২) জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

উতকামণ্ডের নিকটবর্তী আরুভান-কাডু এবং ওয়েলিংটনে ১৯৬৮ সালের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার আসর বসে। গত ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে অলিম্পিক প্রথায় প্রতিযোগিতার খেলা সুরু হয়েছিল। প্রথমে মোট ২৬টি দল প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটি দল—বিহার, রাজস্থান এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দল প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়াতে অবশিষ্ট ২৩টি দলকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলানো হয়েছিল। প্রতি অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করে।

আঞ্চলিক লীগ পর্যায়ের খেলার তালিকা এইভাবে তৈরী হয়েছিল :

'ক' অঞ্চল (দক্ষিণ) : মহীশূর, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র এবং কেরালা

'খ' অঞ্চল (উত্তর) : সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ভূপাল, মধ্যভারত, দিল্লী, পাতিয়ালা এবং জম্মু-কাশ্মীর

'গ' অঞ্চল (পূর্ব) : বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ

'ঘ' অঞ্চল (পশ্চিম) : রেলওয়ে, বোম্বাই, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া এবং বিদর্ভ।

কোয়ার্টার ফাইনাল

লীগের খেলায় 'ক' অঞ্চল থেকে মহীশূর এবং হায়দরাবাদ, 'খ' অঞ্চল থেকে সার্ভিসেস এবং পাঞ্জাব, 'গ' অঞ্চল থেকে বাংলা এবং উত্তর প্রদেশ এবং 'ঘ' অঞ্চল থেকে রেলওয়ে এবং বোম্বাই দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা লাভ করেছিল। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় পাঞ্জাব ২-১ গোলে হায়দরাবাদ, মহীশূর ১—০ গোলে সার্ভিসেস, রেলওয়ে ২—২ ও ৪—০ গোলে বাংলা এবং বোম্বাই ০—০ ও ২—১ গোলে উত্তরপ্রদেশকে পরাজিত করে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। সেমি-ফাইনালে রেলওয়ে ১—০ গোলে পাঞ্জাব এবং মহীশূর ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছিল। মহীশূরের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১/১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নির্মল বার সাবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, আর নতুন ধোয়ার সুগন্ধে ভরে উঠে।

নির্মল
—পূর্ব ভারতে এই বার সাবানই কাটতিতে সবার ওপরে

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড
৪৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 8th March 1968. শুক্রবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীঅমল রায়

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ সংখ্যা প্রসঙ্গে

(১)

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সম্মান অমৃতবাজার পত্রিকার। বৃটিশ শাসন এবং শোষণের দিনগুলিতে একনিষ্ঠভাবে জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যথা-বেদনাকে প্রকাশ করে অমৃতবাজার এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছিল। সেই পত্রিকার শতবার্ষিকী নিঃসন্দেহে জাতীয় উৎসব। সেই উৎসবের ব্যাপকতার মধ্যে অমৃতের অমৃতবাজার পত্রিকা শতবর্ষ সংখ্যাটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

এই পত্রিকা সম্পর্কে জ্ঞাত-অজ্ঞাত অনেক তথ্যে এই সংখ্যাটি সমৃদ্ধ। স্বদেশে বিদেশে এই পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ সম্পর্কে রুশ বিপ্লবের নায়ক মহামতি লেনিনের উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পত্রিকায় প্রকাশিত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়ে তিনি একে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় পত্রিকা বলে অভিহিত করেছেন।

বিদেশী শাসকদের অত্যাচার এবং এবং অনাচারের বিরুদ্ধেই পত্রিকার অভিযান ছিল সর্বাপেক্ষা সোচ্চার। ইংরেজ রাজপুরুষেরা পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সর্বদা উৎকণ্ঠ থাকতেন। পত্রিকা যেন তাঁদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। তাঁরা অনেক চেষ্টা করেও পত্রিকাকে বাগে আনতে পারেননি। আর পারবেনই বা কি করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই তো অমৃতবাজারের জন্ম। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-পীড়িত চাষীদের কথা সভাসমাজে প্রকাশ করার সংকল্প নিয়েই যে মহাত্মা শিশিরকুমার এই পত্রিকার সূচনা করেন। বর্তমান কালের বাঙালীর মনেও এসম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'অমৃতবাজার পত্রিকা শতবার্ষিকী জন্মে' প্রবন্ধে বলেছেন, 'দেশের দরিদ্র, আর্ত সাধারণ মানুষের উপর রাজশক্তি বা রাজকর্মচারীদের যে উদ্ধত অত্যাচার তার প্রতিকারে কেউ এক পা বাড়াতেন না বা একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ বাণী ধ্বনিত হত না। অমৃতবাজার প্রকাশ করেছিলেন ঘোষ ভ্রাতৃবৃন্দ, এই বোবা বেদনা ও ক্ষোভকে ভাষা দেবার জন্য।' অমৃতবাজারের পক্ষে এই উক্তি যে কি বিরাট সত্য বহন করে তা শতবর্ষের পরিচয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারা যায়।

বিদেশী শাসকদের নিগ্রহের ভয়ে সত্য প্রকাশে অমৃতবাজার কখনও বিরত বা পেছপা হয়নি। বরং সাহসের সঙ্গে সত্য প্রকাশ করে এই পত্রিকার রাজরোষে পড়ার কাহিনী সর্বজনবিদিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রকাশের পর পত্রিকার উপর রাজরোষ নেমে আসে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। আবার একবার বিচারপতি ও সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করায় সম্পাদক ও মুদ্রাকর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তবু রাজপুরুষদের অনেকে এই পত্রিকার আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতা-প্রীতিকে গভীর মর্যাদার চোখে দেখতেন। কঠিন ইংরেজ বড়লাটের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, সকালে অমৃতবাজার পত্রিকা না দেখলে গোটা দিনটাই তার ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এই তথ্যটি আমরা জানতে পারি স্বর্গীয় সুধীরচন্দ্র সরকারের সাক্ষাৎকার থেকে। এই প্রসঙ্গে সে সময়ে [illegible] কারণ বৃটিশ সরকারের সবচেয়ে কড়া সমালোচক ছিল অমৃতবাজার। কিন্তু জাতীয় জীবনে এর স্থানকে স্বীকার করে লাট সাহেব একথা বলেছিলেন।

'পুরোণ-মহিমায়' সামান্য কটি কথায় পত্রিকার সুবিস্তৃত জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছেন, 'নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ কাগজ আগুন হয়ে জ্বলেছে। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের অপমান ও নির্লজ্জ অবিচারের জবাব দিয়েছে রাতকে দিন করার মত অবিশ্বাস্য অসাধ্য সাধনে। ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সমর্থনে সমস্ত দেশের আত্ম-মর্যাদাবোধ তীব্র করে তুলেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিবরণ সোনালি গৌরব লাভ করেছে, বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে এ পত্রিকার উদ্দীপনা সঞ্চারিত করেছে সমস্ত দেশবাসীর চিত্তে। শতবর্ষের সাধনায় বাঙালী তথা ভারতীয় জীবনে পত্রিকা যে কি বিশাল স্থান জুড়ে রয়েছে এ লেখা তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। পত্রিকার নিগ্রহ ও আত্মরক্ষার কাহিনী এর জীবনবেদকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

সেই সঙ্গে প্রায় সমগ্র দেশের মতামতকে প্রতিফলিত করার চেষ্টা হয়েছে 'অমৃতের' এই সংখ্যায়। জাতীয় পত্রিকা অমৃত-বাজারের মহিমা-কীর্তনে 'অমৃতের' এই সাধু প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা বলতে কোন আপত্তি নেই। সময়োপযোগী এই সংখ্যাটির জন্য 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯।

(২)

গত ৩রা ফাল্গুনে ১৭৪ এবং অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ উপলক্ষে 'অমৃতের' বিশেষ সংখ্যাটি পাঠ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম। মনটা গর্বে ও আনন্দে ভরে উঠলো যখন ভাবলাম যে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এক ইংরেজী সংবাদপত্র তার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন করছে। উক্ত সংখ্যায় প্রতিটি রচনা তথ্যপূর্ণ, সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ। কৌতূহলী পাঠকের অমূল্য সম্পদ। চিত্রের মাধ্যমে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনার সার্থক পরিবেশন অপূর্ব।

শতবর্ষ পূর্বে যে পরিবেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রতিষ্ঠা, তা সবই আজ আমাদের স্মরণীয়। পরাধীন ভারতবর্ষ বিদেশী শাসকের শোষণে সমগ্র জাতি নিপীড়িত অত্যাচারিত। বেদনার ভাষা প্রকাশের সার্থক বাহনের অভাব। সেই সময়ে এর জন্ম। এক গ্রামে। নানা অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতবাসীর পক্ষে কলমধারী [illegible] রূপে এই পত্রিকা।

যে কোন জাতিকে সার্থক করে তুলতে তার কাছে সংবাদপত্রের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদপত্র জাতিকে সকল প্রকার কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার অন্ধকারময় পরিবেশ থেকে মুক্ত করে এক মহান উদার জাতিতে পরিণত হবার পথ নির্দেশ দেয়। অমৃতবাজার পত্রিকা তা সত্য প্রমাণিত করেছে। পত্রিকাটি পরাধীন জাতিকে বিদেশী শাসকের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছে। স্বাধীন ভারতকে কিভাবে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যায় তার জন্য সুচিন্তিত পথ-নির্দেশ দিয়ে চলেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষের ইতিহাস এক সংগ্রামের ইতিহাস। পত্রিকাটির স্পষ্টবাদিতা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করে।

আজ সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে।

রাধারাণী দেবীর কথা উচ্চারণ করে বলি—অনেক দুঃখ লাঞ্ছনা, অবাঞ্ছিত দুর্যোগ উদ্যোগের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অমৃতবাজারকে একশো বছর হেঁটে আসতে হয়েছে। আজ সমস্ত দেশবাসীর উচিত তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করে জয়ধ্বনি উচ্চারণ করা। কারণ, এই কাগজটির সঙ্গে কেবলমাত্র বাঙালী জাতিরই নয়, সারা ভারতবাসীরই পুরুষানুক্রমিক যোগ।

অমৃতের বিশেষ সংখ্যাটির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বিমলেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়,
[illegible] : হাওড়া।

অমৃত

নিজের এলাকার অধিকার

ঘটনাটি হয়তো সরকারী দৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু জনসাধারণের কাছে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বেগের কারণ। তিন বছর আগে কচ্ছের রান নিয়ে যখন পাকিস্থান গোলমাল শুরু করে এবং পরে চালায় সামরিক আক্রমণ, তখনও জনসাধারণ জানতই না যে, সীমানা নিয়ে কোনো বিরোধ আছে কচ্ছ অঞ্চলে। পরে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় যে, কয়েক বছর আগেই একবার সর্দার স্বরণ সিং মহাশয় রাওয়ালপিন্ডিতে গিয়ে আলোচনার সময় বলে এসেছিলেন যে, কচ্ছের রান এলাকার সীমারেখা নির্ধারণে পাকিস্থানের সঙ্গে আলোচনায় ভারত রাজী। সেখানেই তো পরোক্ষভাবে বিরোধের সমস্যা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

একই ব্যাপার ঘটেছিল বেরুবাড়ির বেলায়। পাকিস্থান বলেছিল, পশ্চিমবঙ্গের এই সীমান্ত গ্রামটি নিয়ে বিরোধ আছে। ভারত সরকার তা স্বীকার করে নিয়ে বেরুবাড়ি তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপত্তি না তুললে এতদিনে বেরুবাড়িতে পাকিস্থানের প্রভুত্ব কায়েম হত। আকসাই চীনের সড়ক নির্মাণের ঘটনা তো কর্তব্যচ্যুতি ও গাফিলতির ঐতিহাসিক নজীর হয়ে আছে।

সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সালিশীর রায় ভারতকে মানতে হবে। নতুবা দুনিয়ার সামনে ভারতের মর্যাদাহানি ঘটবে। এই কথাগুলো শুনতে ভাল। ন্যায়নীতি অনুসরণ করা সবারই উচিত। কিন্তু সরকারী গাফিলতি বা অক্ষমতার ফলে যদি দেশের মানুষের ক্ষতি হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার অধিকার জনসাধারণের আছে। "সদা সতর্কতাই স্বাধীনতার মাশুল" একথা একটি শিশুরাষ্ট্রও পর্যন্ত জানে। ভারত সরকারের নেতাদের মুখেও আমরা হরদম এই ধরনের আপ্তবাক্য শুনেতে অভ্যস্ত। এই সতর্কতা শুধু কামান-বন্দুক-ফৌজ দিয়ে সীমান্ত পাহারা দিলেই হয় না। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, তার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও চিরাচরিত অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাও রাষ্ট্রনেতাদের উচিত।

সম্প্রতি পক প্রণালীতে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপ, যার নাম কচ্চাতিভু, নিয়ে তেমনি এক দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে লোকসভায় তুমুল বিতর্ক হয়ে গেছে। সরকারপক্ষ কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। দ্বীপটি আকারে ছোট, তাতে কোনো জনবসতি নেই বলে প্রকাশ। থাকার মধ্যে রোমান ক্যাথলিকদের একটি গীর্জা। প্রতি বৎসর মার্চ মাসে এই দ্বীপের গীর্জায় সন্ত এন্টনীর স্মরণোৎসব উদ্‌যাপন করতে ভারত ও সিংহল উভয় দেশ থেকেই লোক যায়। এবারে সিংহল সরকার নাকি দ্বীপটির ওপর তাদের অধিকার কায়েম করার জন্য ক্যাথলিক উৎসবের সময়ে পুলিশ-পেয়াদা পাঠাবেন। সিংহলের একটি পত্রিকায় খবরটি বের না হলে হয়তো ভারত সরকার জানতেই পারতেন না ওই দূরের নির্জন দ্বীপে কী ঘটতে চলেছে।

ভারত সরকার অবশ্য বলছেন যে, উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। সিংহল সরকার একতরফা কিছু করবেন না বলে তাদের বিশ্বাস। তা বিশ্বাস করে সরকার যদি স্বস্তি পান বলার কিছু নেই। কিন্তু জনসাধারণের উদ্বেগও যথার্থ। কারণ, এ ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে এবং প্রতিবারেই ভারতকে অনেক খেসারৎ দিতে হয়েছে গাফিলতির জন্য। এবারেও যে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, নিশ্চয়তা কি? শোনা যাচ্ছে, ভারত সরকার নাকি এ নিয়ে সিংহল সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ করছেন। যদি দ্বীপটি ভারতেরই হয়, তাহলে আর আলোচনা কেন, তাকে দখলে রাখার জন্য ব্যবস্থা অবিলম্বে নিতে বাধা কোথায়? আর যদি এ নিয়ে বিরোধ থাকে, তাহলে এতদিন তা নিষ্পত্তি না করে ফেলে রাখা হয়েছে কেন? অমীমাংসিত বিরোধের জের কতদূর প্রসারিত হতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ কাশ্মীর। সালিশীতে গেলে কী ফল হয়, তার নজীর কচ্ছ ট্রাইব্যুনাল। এরপরেও কি আমাদের বলতে হবে যে, আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকরা নিজের দেশের সার্বভৌম অধিকারের সীমানা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল? নিজের এলাকা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা যদি স্পষ্ট না থাকে তাহলে এমন বিড়ম্বনা ঘটবেই। যে-কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে এ ধরনের শিথিলতা অত্যন্ত লজ্জাকর। ভারতের জনসাধারণ তার সরকারকে যথাসময়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এখন সরকারকে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে আমরা নিশ্চয়ই চাইব। কিন্তু নিজের জমির বিনিময়ে, নিজের সার্বভৌম অধিকার খর্ব করে তা কখনই চাইব না। ভারত সরকার এ বিষয়ে সতর্ক হোন। ছোট বিরোধ থেকেই বৃহত্তর বিরোধের উৎপত্তি হয়। তাকে অবহেলা করা নিজের নিরাপত্তাকেই বিপন্ন করার শামিল।

ভিয়েৎনাম : পঁচিশ বছরের লড়াই

সুধীরকুমার সেন

১৯৫৩ সালে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী রেনে মেয়ার ওয়াশিংটনে বলেছিলেন যে, কম্যুনিজম যাতে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া গ্রাস এবং ভারতের পার্শ্বদেশ বিপন্ন না করতে পারে সেই জনাই ফ্রান্স ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করছে।

কথাটা অবশ্য সত্য ছিলো না। ফ্রান্স লড়াই করছিল ভিয়েৎনামে থাকার জন্য। কিন্তু থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, পর পরই ডিয়েনবিয়েনফুর বিপর্যয়ের পর ইন্দোচীন থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। ফ্রান্সের সেদিনকার আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সেই বিদায়কে আরো অপরিহার্য করে ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু ভিয়েৎনামে আমেরিকা আজ যে লড়াই করছে তা কি সেখানে থাকার জন্যে না বেরিয়ে আসার জন্য? দেশে ও বিদেশে—এমনকি খাস ভিয়েৎনামেও ঘটনাচক্র আজ তার এমন প্রতিকূলে যে ভিয়েৎনামে আবার সেই ডিয়েনবিয়েনফুর পুনরাবৃত্তির সন্দেহ অনেকের মনে দোলা দিচ্ছে। শঙ্কা যে শুধু অপরের তা নয়, সম্ভবত প্রেসিডেন্ট জনসনেরও, যেজন্য তিনি খে সানের সদ্য-পূর্ব মার্কিন ঘাঁটি-রক্ষী সেনাপতিদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন যে, খে সান তাঁরা প্রাণপণে রক্ষা করবেন। মার্কিন সমরনায়করা বলছেন, খে সানে ডিয়েনবিয়েনফু হবে না, বরং এই আক্রমণ কম্যুনিস্টদের পক্ষে 'বে অব পিগস' (কেনেডির হুমকীতে ক্রুশ্চেভের কিউবা থেকে সোভিয়েট মিসাইল অপসারণের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত) হবে। দুই পক্ষেরই এই দাবী ও পাল্টা দাবীর অন্তরালে ভাগ্যদেবতা ভিয়েৎনামবাসীদের জন্য নতুন কোন দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যের ভূমিকা রচনা করছেন তা অবশ্য আজ সকলেরই অগোচরে।

পঁচিশ বছরের যুদ্ধ

ভিয়েৎনামবাসীদের দুর্ভাগ্য অবশ্য নতুন নয়। দঃ ভিয়েৎনামে আজ যাদের বয়স পঁচিশ বছর হয়েছে তারাও সেই যুদ্ধের মধ্যেই জন্মেছিলো। এই নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের মধ্যে দেশ পুনর্গঠনের কোনো অবকাশ আসে না। দঃ ভিয়েৎনামের এক কোটি সত্তর লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশই (চল্লিশ লক্ষ) আজ উদ্বাস্তু। শস্যক্ষেত্র উজাড়, শিল্প বিধ্বস্ত। যুদ্ধ চালাতে মার্কিন সরকার দিনে যে ২০ লক্ষ ডলার ভিয়েৎনামে খরচ করে তারই ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে ভিয়েৎনামীদের জীবন, সরকারী কর্মচারীদের বিলাসব্যসন, দুর্নীতি, ব্যবসায়ীদের মুনাফাবাজি, কালোবাজার।

ফরাসী বিদায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে ফরাসী শক্তির পতনের পরই জাপান এসে ইন্দোচীন দখল করে। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ফরাসী শক্তি ইন্দোচীনে ফিরে আসে। ১৯৪৬ সালে কম্যুনিস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নায়করূপে ভো নুয়েন গিয়াপ নামে এক অজ্ঞাতপরিচয় জেনারেল জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এই যুদ্ধ চললো ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত যখন গিয়াপ (৫৬, এখন উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিরক্ষামন্ত্রী) ডিয়েনবিয়েনফুর যুদ্ধে ফরাসীদের ওপর চরম আঘাত

বৃটেন ও সোভিয়েট হলো এই সম্মেলনের যুগ্ম-সভাপতি। চুক্তির ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য কানাডা, ভারত ও পোল্যাণ্ডকে নিয়ে এক আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হলো।

দ্বিতীয় সম্মেলন

পরবর্তীকালে লাওসে আবার দক্ষিণ-পন্থী, নিরপেক্ষতাবাদী এবং কম্যুনিস্ট প্যাথেট লাও-এর মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিলে ১৯৬১ সালে জেনেভায় আবার এই সম্মেলন বসে এবং পরবছর লাওসের নিরপেক্ষতা মান্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বর্মা ও থাই-ল্যাণ্ডও ছিলো স্বাক্ষরকারী।

কিন্তু দঃ ভিয়েৎনামে শান্তি এলো না। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির পর হাজার হাজার ভিয়েৎমিন চলে গেলো উত্তরে রাজ্য গড়তে, কিছু রয়ে গেলো দক্ষিণে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী হো চি মিনকে অনেকখানি ভূমি ছেড়ে দিতে হলো। তবে তাঁর আশা ছিলো যে ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে সমগ্র দেশকেই তিনি কম্যুনিস্ট শাসনের আওতায় ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হবেন। কিন্তু নির্বাচন হলো না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধান মার্কিন সমর্থনপুষ্ট দিয়েম বললেন যে, চুক্তি করেছে ফরাসীরা ভিয়েৎনামের জাতীয় স্বার্থ অবজ্ঞা করে। কাজেই, এ চুক্তি তিনি মানতে বাধ্য নন।

ভিয়েৎকং বাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ট্রান দো। সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইনি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

একজন ভিয়েৎকং যুদ্ধবন্দীকে মার্কিনী নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় একজন মার্কিনী সৈন্য পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নির্বাচনের ঘোষিত তারিখ কেটে যাওয়ার পর থেকে দঃ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট (নতুন নাম ভিয়েৎকং) বিদ্রোহ ধীরে ধীরে মাথা চেড়ে উঠতে থাকে। কম্যুনিস্টদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য দিয়েমের ছিলো না। কাজেই তিনি আমেরিকার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। আমেরিকা দঃ ভিয়েৎনামের বাহিনীকে সংগঠনের জন্য অর্থসাহায্য ও সামরিক উপদেষ্টা পাঠাতে রাজী হলো। ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সায়গনে মার্কিন সেনাপতি লেঃ জেঃ জন ডব্লিউ ও'ড্যানিয়েলের নেতৃত্বে তিনশ' সেনানী ও সৈন্যের একটি মিশন হাজির হলো। ভিয়েৎনামের গৃহযুদ্ধে মার্কিনের জড়িয়ে পড়ার এইভাবেই হলো সূচনা।

প্রেসিডেন্ট দিয়েম (ভিয়েৎনামী উচ্চারণ এম) ছিলেন কড়া ডিক্টেটর। যে আট বছর তিনি তক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার মধ্যে দেশে কোনো রাজনৈতিক বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হয়নি। কিন্তু কোনো ডিক্টেটরই চিরকাল নিরঙ্কুশ নন। ভিয়েৎনামের জনগণ ধর্মের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত—বৌদ্ধ ও রোম্যান ক্যাথলিক, যার মধ্যে বৌদ্ধরাই অতিমাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠ (মোট ১ কোটি ৭০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ)। ১৯৬৩ সালে দিয়েমের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন শুরু হলো বৌদ্ধদের ওপর ধর্মীয় নিপীড়নের অভিযোগে, যার পরিসমাপ্তিতে দিয়েম শেষপর্যন্ত পদচ্যুত এবং প্রায় সপরিবারে নিহত হলেন।

দিয়েমের উচ্ছেদে বৌদ্ধদের পিছনে শক্তির মূল উৎস ছিলো যে সেনাপতি-গোষ্ঠী, আমেরিকা তলে তলে তাদের উৎসাহ যুগিয়েছিল। কিন্তু এদের কর্তৃত্ব বেশীদিন রইলো না। ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারী নুয়েন খান নামে এক তরুণ সেনাপতি এদের বরবাদ করে সামরিক শাসন কায়েম করলো। আবার আমেরিকা তার পেছনে। তারপর আবার শুরু হলো সায়গনের রাষ্ট্রীয় জনতার সঙ্গে সংঘাত, যাতে সামিল হলো বৌদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ সেনানীরা। খানের তক্ত ওল্টালো, নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো পশ্চিমী ধাঁচের এক অসামরিক সরকার প্রধানমন্ত্রী ট্রান ভান হুয়ং-এর নেতৃত্বে।

কিন্তু বৌদ্ধদের আন্দোলন থামলো না, তাদের দাবী, রাষ্ট্রশাসনে অংশীদারী। ফলে, হুয়ং-এর বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর তরুণ সেনানীদের বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো, অভিযোগ বৌদ্ধদের রাষ্ট্রশাসনে কর্তৃত্ব দেওয়া হলে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই ব্যাহত হবে, কারণ তাদের অনেকে কম্যুনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল। জেনারেল খান (তখন প্রধান সেনাপতি) তলে তলে তাদের প্ররোচনা দিতে লাগলেন।

সায়গনে প্রচণ্ড লড়াই-এর সময় এই মহিলা ও শিশুটি থানকোয়াং প্যাগোডার পিছনে কয়েক কাটা এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে। রোরুদ্যমানা নারী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে, আর ছোট ছেলেটি মুখ ঢেকে বসে আছে।

কাও কির আবির্ভাব

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এই অস্থায়ী রাজনীতির মধ্যে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি বিমানবাহিনীর অধিনায়ক কাও কি অকস্মাৎ ক্ষমতা দখল করলেন।

দঃ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক মঞ্চে এই নিরবচ্ছিন্ন ওঠানামার পালায় সমাপ্তি ঘটাবার জন্য আমেরিকা কিছুদিন ধরেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। কাও কি'র ক্ষমতা দখলের পর থেকেই দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আমেরিকার কাছ থেকে প্রবল চাপ আসতে থাকে। কাও কি নির্বাচনকে বিলম্বিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্তে শেষপর্যন্ত এড়ানো গেলো না, কাও কি'র ইচ্ছা ছিলো তিনিই আবার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত জেনারেল নুয়েন ভান থিউকে প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিয়ে নিজে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। আমেরিকার আশা ছিলো যে, এই নির্বাচনে থিউ-কাই'র শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মোকাবিলায় তাদের হাত জোরদার করা হবে। কিন্তু অন্তত ভোটের বেলা আমেরিকার আশানুরূপ হলো না। প্রথমত দঃ ভিয়েৎনামবাসীদের পরিকল্পনার ভিয়েৎকং প্রভাবিত অঞ্চলে থাকায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভোটে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু ভোটে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যেও থিউ-কাই'র জনপ্রিয়তা

বেশী নয়, কারণ, মোট ভোটের মাত্র ৩৫ শতাংশ পেয়ে এ'রা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে বিরোধীপক্ষীয়রা ভোট দেবেছিলেন ডেমোক্রেটিক অপোজিশন ফ্রন্ট নামক দলে। নির্বাচনের পরে এই দলের নেতারা নানা দুর্নীতির অভিযোগ করে সায়গনস্থ মার্কিন দূতের কাছে পত্র দেন এবং দঃ ভিয়েৎনামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিন হস্তক্ষেপ বন্ধ করার দাবী জানান। নির্বাচনের প্রহসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সায়গনের রাজপথে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। এমনকি, বৌদ্ধরাও এই নির্বাচনে খুশী হয়নি।

নোংরা কুশ্রী যুদ্ধ

এবং ভিয়েৎনামের এই অস্থির রাজনীতিকে আবর্তন করেই যুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্কের ভাষায়—'নোংরা, কুশ্রী, অনাকাঙ্ক্ষিত; জঙ্গল, পর্বত, জলা-জঙ্গলের যুদ্ধ যাতে গেরিলাদের চোরাগোপ্তা লড়াই-এর সুবিধা বেশী; আর যারা তাদের হটিয়ে দিতে চায় তাদের পক্ষে নৈরাশ্যের অন্ত থাকে না।'

রাস্ক যে অনাকাঙ্ক্ষিত নৈরাশ্যজনক যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন আমেরিকা তাতে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হলো ১৯৬৫-র মার্চে যখন দঃ ভিয়েৎনামে প্রথম মার্কিন স্থলবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত হলো, যারা সরকারী সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়বে।

ডিয়েমের উচ্ছেদ এবং পরবর্তীকালে ভিয়েৎনামের অস্থির রাজনীতির মধ্যে ভিয়েৎকংদের সাফল্য এমন আশঙ্কাজনক হয়ে দেখা দিলো যে ১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে দঃ ভিয়েৎনাম বাহিনী সপ্তাহে এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং একটা করে প্রাদেশিক রাজধানী খোয়াতে লাগলো। সরকারী বাহিনীকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য এই-সময় থেকে আমেরিকা ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে শুরু করে। ১৯৫৫ সালে যখন প্রথম মার্কিন সামরিক উপদেষ্টা মিশন সায়গনে পদার্পণ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিনশ'। ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে এই সংখ্যা পৌঁছেছিল ২০ হাজারে, যারা তখনো নামে উপদেষ্টা ও টেকনিশিয়ান। তারপর এলো স্থলসৈন্য পাঠাবার সেই মারাত্মক সিদ্ধান্ত। ১৯৬৫-র জুনে ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫১,০০০-এ; '৬৬-র জানুয়ারীতে ২,৬৭,০০০; '৬৭-র জানুয়ারীতে ৩,৫০,০০০; এবং ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারীতে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৫,২৫,০০০-এ; যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দঃ ভিয়েৎনামের সাত লক্ষ সরকারী সৈন্য ও ৫৮ হাজার মিত্র সৈন্য। অপরপক্ষে মার্কিন হিসেবেই, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধরত ভিয়েৎকং ও উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্যের মোট সংখ্যা মাত্র ৩,৭৮,০০০।

জেঃ ওয়েস্টমোরল্যান্ড

১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ডকে কম্যান্ড দিয়ে পাঠানো হয়। ওয়েস্টমোরল্যান্ড এসে যুদ্ধের রীতি বদলে দেন, ভিয়েৎনামের যুদ্ধ পুরোদস্তুর আধুনিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে এতে যে সাফল্য দেখা দেয়নি তা নয়। ১৯৬৫-র শেষার্ধ থেকে মার্কিন অগ্নিবর্ষণক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে কম্যুনিস্টরা যুদ্ধের পর যুদ্ধে বিপর্যস্ত হতে লাগলো। এবং এইরকমও একটা আভাস দেখা দিলো যে ক্রমাগত বিপুল সৈন্যক্ষয়ের সম্মুখীন হয়ে কম্যুনিস্টদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। এর ফলে অতিমাত্রায় আশান্বিত হয়ে ১৯৬৭-র বসন্তকালে ওয়েস্টমোরল্যান্ড স্বদেশবাসীদের প্রকাশ্যভাবে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আগামী দু' বছর বা তারও আগেই মার্কিন সৈন্যদের পর্যায়ক্রমে দঃ ভিয়েৎনাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করাও এখন সম্ভব হতে পারে।

ভিয়েৎকং রণনীতি পরিবর্তন

কিন্তু বছরখানেক আগে ভিয়েৎকংদের যুদ্ধনীতিতে এমন একটা পরিবর্তন ঘটলো যা যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা আমূল পাল্টে দিলো। এযাবত ভিয়েৎকংরা যুদ্ধ করছিল নিছক গেরিলা কৌশল অনুসরণে, যাকে বলা যায় 'আকস্মিক আঘাত ও অন্তর্ধানের রীতি'। এখন থেকে শুরু হলো এর পরিবর্তে উত্তর ভিয়েৎনামের মধ্যবর্তী সৈন্যদের এলাকায় মার্কিন ঘাঁটিগুলোর ওপর

*

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট সৈন্যরা যুদ্ধ করছে।

*

ভিয়েৎকংরা যখন আক্রমণ করছে একজন সরকারী সৈন্য শিশু দুটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।

জানুয়ারী তারিখেই দঃ ভিয়েৎনামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ভিয়েৎকংদের ব্যাপক আক্রমণ শুরু হলো।

আক্রমণের তৃতীয় দিনেই দঃ ভিয়েৎনামের ২৬টা প্রাদেশিক রাজধানী তাদের মর্টার ও রকেটবর্ষণের সম্মুখীন হলো, দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী দানাং-এর রাজপথে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগলো, সম্রাটদের প্রাচীন রাজধানী হুয়ে অবরুদ্ধ হলো।

আক্রমণ আরো চমকপ্রদ হলো সায়গনে। এখানে মাত্র ২০জন ভিয়েৎকং মার্কিন দূতাবাসে ঢুকে ৬' ঘণ্টাকাল তাকে আংশিকভাবে দখল করে রইল, বেতারঘাঁটিতে হানা দিলো, আর একদল দেখা দিলো প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে।

এবং ভিয়েৎকংদের এই আক্রমণে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের পর্যাপ্ত প্রয়োগ। সোভিয়েট ও চীনের কাছ থেকে পাওয়া রকেট ও মর্টার এবারকার যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্ব নিয়েছে। খে সানে মার্কিন মেরিন সৈন্যদের যে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি রয়েছে তার ওপর আক্রমণের জন্য ৪০,০০০ উত্তর ভিয়েৎনামী সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে। সোভিয়েট-প্রদত্ত ট্যাঙ্কের সাহায্যে কম্যুনিস্টরা খে সানের অদূরবর্তী ল্যাং ভেইস্থ মার্কিন ঘাঁটি দখল করে। এই যুদ্ধে ভিয়েৎকংদের পক্ষে সোভিয়েট মিগ জেট বিমানও দেখা দিলো। দঃ ভিয়েৎনামের রণাঙ্গনে এই প্রথম ভিয়েৎকংদের ট্যাঙ্ক ও বিমানের আবির্ভাব।

খে সানের ভবিষ্যৎ

খে সানের যুদ্ধ কি পরিণতি নেবে তা অবশ্য এখনো (অর্থাৎ ২০-২-৬৮ পর্যন্ত।) ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে ল্যাং ভেইর পতনে মার্কিন মনোবলের যে হানি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবুও মার্কিন সেনানায়করা দৃঢ়পণ, তাঁরা খে সানকে যে কোনোভাবে রক্ষা করবেন। তার কারণ, মার্কিন রণনীতিবিদদের মতে, খে সানের সামরিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। মার্কিন জয়েন্ট চীফ অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল আর্ল হুইলার বলেছেন, খে সানের অবস্থিতি রণনীতির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যমুক্ত এলাকা বরাবর আমাদের যে প্রতিরক্ষাব্যূহ রয়েছে খে সান তার পশ্চিমী নোঙর। মনস্তাত্ত্বিকভাবেও এর গুরুত্ব অত্যধিক, কারণ, খে সান পেলে উত্তর ভিয়েৎনামের সৈন্যরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গভীর অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারবে, উপকূলবর্তী অঞ্চলে অনায়াসে এসে পড়বে এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করবে।

উত্তর দেওয়ার সুযোগ হিসেবে ৪০ ঘণ্টাকাল বোমাবর্ষণ বিরতির আদেশ দিয়েছিলেন। এইসময় উত্তর দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় বলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন প্রেসিডেন্ট জনসনকে অনুরোধ করেন হো চি মিনকে আর একটু বেশী সময় দিতে। কিন্তু উইলসনের সেই অনুরোধ মার্কিনরা প্রত্যাখ্যান করে।

এরি কিছুদিন পরে এলো হ্যানয়ের সাম্প্রতিক প্রস্তাব। জানুয়ারীর মাঝামাঝি প্যারিসস্থ প্রতিনিধি মাই ভান বো প্রস্তাব করেন যে, উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ হলে উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে। উত্তর ভিয়েৎনামের এই প্রস্তাবে তার পূর্বেকার দাবী (মার্কিন সৈন্যদের ভিয়েৎনাম ত্যাগ এবং ভিয়েৎকংদের রাজনৈতিক সংস্থা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে স্বীকৃতি দান) যে উত্থাপন করা হয়নি, নিছক বোমাবর্ষণ বন্ধেই আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, এই বিষয়টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবং মার্কিনের মিত্রপক্ষীরাও এতে আপোষ-আলোচনায় হ্যানয়ের প্রকৃত আগ্রহের আভাস লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাড়া এলো দ্বিধামিশ্রিত। জনসন এতে হ্যানয়ের দুর্বলতার ইঙ্গিত অনুমান করলেন, তিনি বললেন, যে কোনো আলোচনার প্রথম সর্ত হবে খাঁটি যুদ্ধবিরতি। মার্কিন পদস্থ ব্যক্তিরা এর তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বললেন যে, আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে কম্যুনিস্টদের বঞ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।

চান্দ্র নববর্ষের অভিযান

ভিয়েৎকং ও মার্কিনের কার্যাবলিতে আলোচনার ইচ্ছার কোনো আভাস পেল না। বিগত ৩০শে জানুয়ারী ভিয়েৎনামের ঘরে ঘরে উৎসব চান্দ্র নববর্ষ পড়েছিল। ৩১শে

ভিয়েৎনামে আমেরিকা

পরোক্ষ আগ্রহ থেকে সক্রিয় ভূমিকায়

বরুণ রায়

একথা আজ মনে হতে পারে বলা হবে, কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ভিয়েৎনাম সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব একজন বাইরের পর্যবেক্ষকের পরোক্ষ আগ্রহের ছাড়া আর কিছু ছিল না।

বরং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (১৯০০-৪৫) এই কথাই মনে করতেন যে, ফরাসীরা ভিয়েৎনামে এত অপশাসন করেছে এবং ভিয়েৎনামীদের এত বেশী শোষণ করেছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপানের আত্মসমর্পণের পর (জাপান ১৯৪০ সালে ভিয়েৎনাম দখল করে নিয়েছিল) ফরাসীদের আর সেখানে ফিরে যাবার কোন অধিকারই নেই।

এমন কি ফরাসীরা যাতে আর ভিয়েৎনাম দখল করতে না পারে সেজন্য তিনি ভিয়েৎনামকে সরাসরি চিয়াং কাই-শেকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। ভিয়েৎনামের চীন-বিরোধী মনোভাবের কথা মনে রেখে চিয়াং ঐ প্রস্তাবে রাজী হন নি। পরে ১৯৪৩ সালে তেহেরান সম্মেলনে ও ১৯৪৫ সালে পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত হয় যে, ষোড়শ সমান্তরালের উত্তরে চীনের এবং দক্ষিণে ভারত ও বৃটেনের অছি শাসন প্রবর্তিত হবে। এক সময় হো চি মিনের প্রতি আমেরিকার সমর্থন এত বেশী ছিল যে, মার্কিন কর্তৃপক্ষ অন্তত ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বার-বার এই দাবী জানিয়ে এসেছেন যে, হো'র বিরুদ্ধে ফরাসীরা বৃটেনের দেওয়া যেসব বিমান ব্যবহার করছেন, সেগুলি থেকে মার্কিন-নির্মিত প্রপেলার খুলে ফেলা হোক।

১৯৪৯ সালে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেল। চীনের আকাশে লাল তারকার অভ্যুদয়। পিকিং, নানকিং ও সাংহাই দখল করার পর মাও সে-তুঙের লালফৌজ ডিসেম্বরে ভিয়েৎনামের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছল। ভিয়েৎনামে তখন হো চি-মিনের সৈন্যদের সঙ্গে ফরাসীদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে। স্বভাবতই চীনে কম্যুনিস্টদের সাফল্য হো চি মিনকে উৎসাহিত করেছিল।

কিন্তু লালফৌজের এই সাফল্যের চাইতেও অন্য আরেকটি বিষয়ে সে-দিন ওয়াশিংটনে বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধ শঙ্কিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে হো চি মিন মাও সে-তুঙের শাসনকে স্বীকার করে নিলেন। বিনিময়ে চীন হো'র কর্তৃত্বাধীন ভিয়েৎনামকেই একমাত্র ভিয়েৎনাম বলে স্বীকৃতি দিলেন। ৩১ জানুয়ারী সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বীকার করলেন গণতান্ত্রিক রিপাবলিক অব ভিয়েৎনামকে।

ডীন অ্যাচিসন তখন আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব। তিনি বললেন: "হো চি মিনের 'জাতীয়তাবাদী' লক্ষ্য সম্পর্কে যদি কোন রঙীন ধারণা কারো থেকে থাকে তবে এবার তা দূর হওয়া উচিত। এর দ্বারা হো তাঁর আসল রূপে, ইন্দোচীনের নিজস্ব স্বাধীনতার শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হলেন।"

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের [illegible] প্রাচীন রাজধানী হুয়েতে সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরী করে অনুপ্রবেশকারী কম্যুনিস্টদের পশ্চাদ্ধাবন করার প্রস্তুতি পর্ব। পথে নদীটির ধারে মার্কিন নৌ-সেনাদের এগিয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত যুক্তি

একটা দেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেই তার কাছে নিজের দেশকে বিক্রি করে দেওয়া হয় এ-বড় অদ্ভুত যুক্তি। তাছাড়া চীনের তুখড় কম্যুনিস্টদের সাফল্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ভারসাম্যে যে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল ফরাসীদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে হো চি মিন তার সুযোগ নিতে চাইবেন, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি আছে তা বোঝের অগম্য। কিন্তু আমেরিকা যে কারণেই হোক ধরে নিল যে, মাও সে-তুং ও হো চি মিন একটা ষড়যন্ত্রের সামিল হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার এলাকা প্রসারিত করতে চাইছে।

অতএব তা ঠেকাতেই হবে। কারণ মাত্র এর কিছুদিন আগে আমেরিকা কম্যুনিজম ঠেকাবার একটা নীতি সাফল্যজনকভাবে গ্রহণ করেছিল। তুরস্ক ও গ্রীসে কম্যুনিস্ট-

আমেরিকার বিভিন্ন [illegible] [illegible] সামনে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে [illegible] প্রদর্শন।
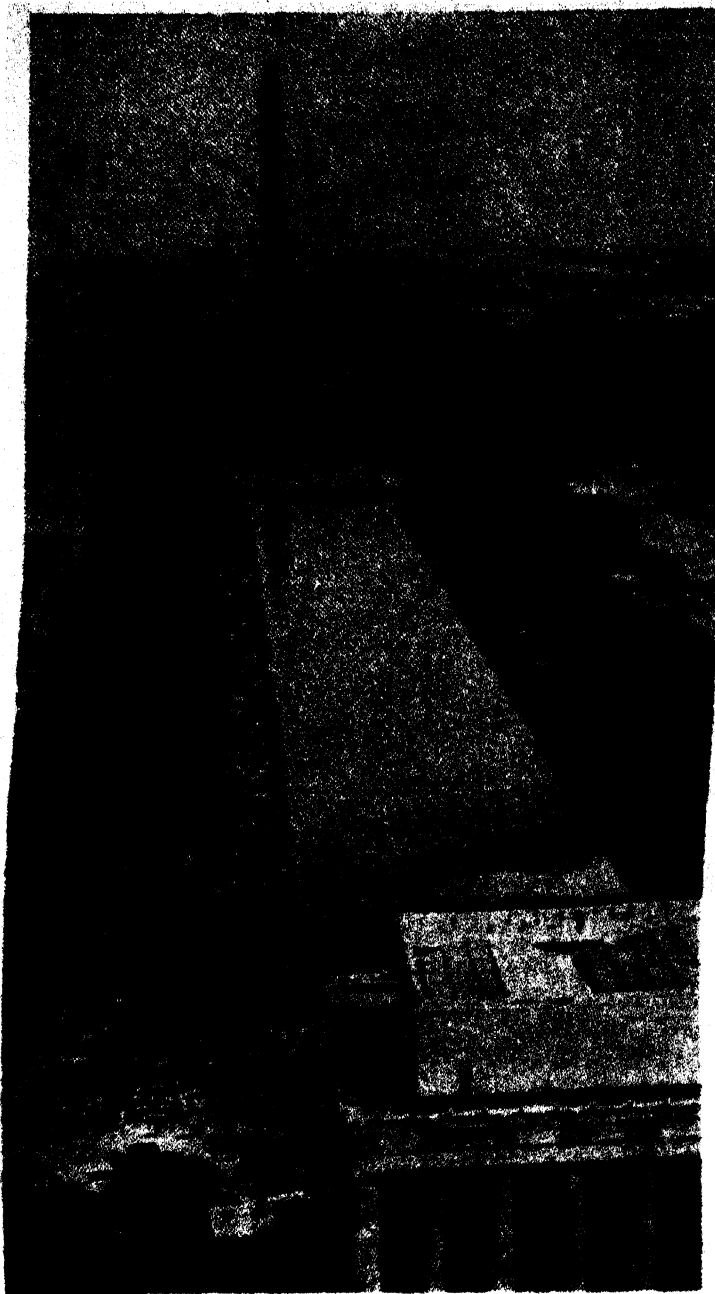
তুরস্কের জন্যে সাহায্য দেওয়া থেকেই এই নীতির সূত্রপাত। ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ এই সাহায্য চেয়ে কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান যে-কথা বলেছিলেন, তা-ই আজ 'ট্রুম্যান ডকট্রিন' নামে বিখ্যাত। তিনি বলেছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, মুক্ত যে-সব জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুর ক্ষমতা দখলের কিংবা বাইরের চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সমর্থন করাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হওয়া উচিত।"

ইতিমধ্যে হো চি মিনের প্রভাব খর্ব করার উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাসীরা পদচ্যুত সম্রাট বাও দাইকে দেশে ফিরিয়ে এনে ১৯৪৯ সালে যখন সায়গনে পুতুল সরকার গঠন করলেন তখন এই নীতি অনুসারেই আমেরিকা তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল। কিন্তু এরপর ওয়াশিংটন বাও দাইকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাতে আরম্ভ করল। ডীন অ্যাচিসন এক বার্তা পাঠিয়ে জানালেন আমেরিকা বাও দাই সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী।

৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাও দাই সরকারকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃতি দিল।

এই স্বীকৃতির পরেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ হো চি মিনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার জন্যে ফ্রান্স ও বাও দাই সরকারকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। মে মাসে প্যারিসে ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে মিঃ অ্যাচিসন এই মর্মে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা পুনঃস্থাপনার এবং প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের বিকাশের ওপরেই ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান নির্ভরশীল, এবং এই প্রকল্প লক্ষ্যসিদ্ধি অর্জনে আমেরিকা সাহায্য করতে পারে ও করা উচিত।"

দ্রুততর সাহায্য

২৫ জুন কম্যুনিস্ট উত্তর কোরিয়া ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করলে মার্কিন সরকার এই সম্বন্ধে দ্রুততর হলেন। ২৭ জুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা ফ্রান্স ও বাও দাই'র সৈন্যবাহিনীকে দ্রুততর সামরিক সাহায্য দেবে এবং ঐসব বাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্যে একটি সামরিক মিশন পাঠাবে।

ভিয়েতনামের জলে ও জঙ্গলে আমেরিকা এখন যে রকম বিরাটভাবে জড়িয়ে পড়েছে তার সূত্রপাত হয়েছিল এইভাবে, ধীরে ধীরে।

১৯৫২ সালের ১৮ ডিসেম্বর মার্কিন সরকার ইন্দোচীনের জন্যে একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা সাহায্য কার্যসূচীর কথা ঘোষণা করলেন এবং জানালেন তাঁরা কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সাড়ে তিন কোটি ডলার বরাদ্দ করেছেন।

তারপর এলেন ডালেস, জন ফস্টার ডালেস, ১৯৫৩ সালে নতুন প্রেসিডেন্ট মিঃ আইজেনহাওয়ারের পররাষ্ট্র সচিব হয়ে।

ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি পরে যে অগ্রগতি লাভ করে, তার গোড়াপত্তন করেছিলেন এই ডালেস। তাঁর আমলেই আমেরিকা ভিয়েতনামে সামরিক দিক দিয়ে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে। তাঁর আমলেই ফরাসীদের প্রতি মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ ৭৫ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়। তাঁরই প্ররোচনায় ১৯৫৩ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার "আমাদের নিজেদের স্বার্থে" ফরাসীদের সর্বাত্মক সাহায্য দেবার নীতি প্রথম ঘোষণা করেন। তাঁরই উদ্যোগে ভিয়েতনামে কম্যুনিস্ট ঠেকাবার নীতি

একজন ভিয়েৎকং সৈন্যকে গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে জেনারেল এলি গেলেন ওয়াশিংটনে। সেখানে জেনারেলের সামনেই প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ডকে নির্দেশ দিলেন দিয়েনবিয়েনফু রক্ষার জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন তা সবই যেন করা হয়। অস্ত্রশস্ত্র, বিমান যা চাওয়া হবে তাই যেন দেওয়া হয়। অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ড জেনারেল এলিকে জানালেন, ফরাসী সরকার যদি আমেরিকার প্রত্যক্ষ সামরিক হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে তাহলে আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এই সময়েই তাঁর বিখ্যাত 'ডোমিনো থিয়োরী'র প্রবর্তন করেন। এই থিয়োরীর বক্তব্য হল, যদি ইন্দোচীনের পতন ঘটে তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবগুলি দেশই একে-একে বিপন্ন হয়ে পড়বে। মিঃ ডালেস বললেন, যে কোন উপায়েই হোক এই সম্ভাবনা ঠেকাতে হবে। "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রুশ ও চীনা ধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হলে সমস্ত মুক্ত দুনিয়াই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনাকে সম্মিলিত ব্যবস্থায় দমন করতেই হবে। এর জন্যে গুরুতর ঝুঁকি নিতে হতে পারে। কিন্তু এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কয়েক বছর পরে আমাদের যে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে, সে তুলনায় এই ঝুঁকি কিছুই নয়।"

৩ এপ্রিল, ১৯৫৪, শনিবার জন ফস্টার ডালেস মার্কিন কংগ্রেসের আটজন প্রভাবশালী সদস্যকে নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। উদ্দেশ্য: ভিয়েৎনামে নৌ ও বিমান শক্তি ব্যবহার করার জন্যে তাঁদের সম্মতি আদায় করা। এছাড়া, তিনি বললেন, দিয়েনবিয়েনফুকে রক্ষা করার কোন উপায় নেই।

ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডমিরাল র‍্যাডফোর্ডও। তিনি তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানালেন: বিমানবাহী জাহাজ 'এসেক্স' ও 'বক্সার' থেকে ২০০ বিমান এবং ফিলিপিনের ঘাঁটি থেকে আরো কিছু বিমান একযোগে শুধু একবার গিয়ে দিয়েনবিয়েনফু, এলাকায় হানা দেবে। তাতেই কাজ হবে।

এই পরিকল্পনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হয় নি, কারণ (১) মার্কিন কংগ্রেস এটা অনুমোদন করে নি, (২) বৃটেন এই পরিকল্পনা সমর্থন করতে অস্বীকার করে, এবং (৩) এর জন্যে আমেরিকা যে শর্তগুলি দিয়েছিল ফরাসীরা তা গ্রহণ করেনি।

আমেরিকার শর্তগুলি ছিল এই রকম: এই যুদ্ধে অংশ নেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে; ভিয়েৎনাম ও ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে; আমেরিকা ফরাসীদের বিকল্প হিসেবে নয় অংশীদার হিসেবে এবং প্রধানত সমুদ্র ও আকাশ থেকে যুদ্ধ করবে; স্থানীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ভার আমেরিকার হাতে দিতে হবে; এবং যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ, না হলে প্রধান কর্তৃত্ব আমেরিকাকে দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার এ-সম্পর্কেই পরে লিখেছিলেন: "ফরাসীদের হাতে তাদের খুশি মত ব্যবহৃত হবার জন্যে আমি আমাদের সৈন্য পাঠাতে কখনই রাজী হব না।"

দিয়েন বিয়েনফুর পর

ফরাসীরা আমেরিকার শর্তে রাজী হলে ভিয়েৎনামের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত কিনা সে প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমাদের সামনে যে ইতিহাস রয়েছে, তা হল এক শোচনীয় সামরিক ব্যর্থতার, ১৯৫৪ সালের ৭ মে ভিয়েৎমিন সেনাবাহিনী যা ফরাসীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল। দিয়েনবিয়েনফুর পতন ইন্দোচীনে ফরাসীদের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে খতম করে দিয়েছিল।

এরপর ঘটনা দ্রুত তালে প্রবাহিত হতে থাকে। কারণ ওয়াশিংটন ফরাসীদের পরাজয়ের পরিণতির কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

একথা আজ লিখতে কোন বাধা নেই যে, দিয়েনবিয়েনফুর পতনের পরে জেনেভায় ইন্দোচীনের সমস্যার মীমাংসার জন্যে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। কারণ আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য ভিয়েৎনামকে পুরোপুরি কম্যুনিস্ট, নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। মীমাংসা আলোচনার সাফল্য অর্জনের অর্থ হল হো চি মিনের সঙ্গে আপোস করার প্রস্তাব স্বীকার করে নেওয়া। আমেরিকা তা করতে মোটেই রাজী ছিল না। কোন রকম আপোস করার বিরুদ্ধে আমেরিকার মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে, আমেরিকা জেনিভা সম্মেলনের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতেও অস্বীকার করেছিল।

ঐ বছর সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা নামে একটি সামরিক সংস্থা গঠনে আমেরিকা উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতকং সন্দেহে ধৃত এক ব্যক্তির মুখের সামনে ছুরি ধরে স্বীকৃতি আদায় করা হচ্ছে।

ভিয়েতকং সন্দেহে ধৃত জনৈক মহিলা। মার্কিন [illegible] একজন তাকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

জেনেভাতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

ভিয়েৎনাম বৃটেনের নীতি

প্রতীক ভৌমিক

বৃটেনের ভিয়েতনাম নীতি বর্তমান বৎসরের দুটি ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন গিয়েছিলেন মস্কো এবং ওয়াশিংটন। সে সময়ে প্রচারিত হয় দুটি বিবৃতি।

জানুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইলসন মস্কো যান। সেই সময়ে দুটি দেশের একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয়। ঐ বিবৃতিতে ভিয়েতনাম বিরোধের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানান হয়। নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিরূপণ ও পরিচালনার সম্পূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার একমাত্র সেই অঞ্চলের জনগণেরই আছে। এই নীতির ভিত্তিতেই এই বিরোধের সমাধান করতে হবে। বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৫৪ সালের ইন্দোচীন সম্পর্কিত জেনেভা সম্মেলনের চেয়ারম্যান। দুই রাষ্ট্রই এই সুদৃঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন যে, উল্লিখিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য তারা একক এবং যুক্তভাবে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন।

পর্যবেক্ষক মহল বলছেন যে উইলসন কোসিগিনের যুক্ত বিবৃতি এবং উইলসনের প্রকাশ্য বিবৃতি থেকে মনে হয় যে, মিঃ উইলসনের যদি ভিয়েতনাম সম্পর্কে সোভিয়েত নীতি বিরুদ্ধে [illegible] করার ইচ্ছা থেকেও থাকে তাতে তিনি আদৌ সফল হননি। তবে তাঁরা একথাও বলেছেন যে, যুক্ত বিবৃতিতে যা প্রকাশ পায়নি বা প্রকাশ্যে যা বলা হয়নি তা আরও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এরপরই ওয়াশিংটন সফরে যান এবং তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেন যে, ভিয়েতনাম সম্পর্কে পূর্ব ও পশ্চিমের বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সময়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ উইলসন বলেন যে, যুদ্ধের পথে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান কিছুতেই করা যাবে না।

তিনি বলেন যে, সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনাকালে বেশির ভাগ সময় স্বভাবতই ভিয়েতনাম প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা হয়, কারণ আজকের পৃথিবীতে ভিয়েৎনাম সমস্যার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আর কিছু নেই। এ ব্যাপারে প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এই সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের পথ খুঁজে বার করা, তবে সে সমাধান যে রাজনৈতিক পথে হবে না, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

এরপরই মিঃ উইলসন ওয়াশিংটন যান। সেখানে তিনি তিনটি কথা জানান :

তিনি বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান মার্কিন নীতি— [illegible]

ভারতীয় সাহিত্য

তেলুগু ভাষায় বাংলা কবিতা ॥

রবীন্দ্রনাথের পর প্রায় কোনও বাঙালী লেখকের রচনাই তেলুগু ভাষায় অনূদিত হয়নি। সম্প্রতি আধুনিক বাঙালী কবিদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করবার জন্য 'দিগম্বর কভুলু' কবি সমাজ এগিয়ে এসেছেন। এর মধ্যেই তাঁরা কয়েকজনের কবিতার অনুবাদ করে ফেলেছেন। তাঁরা এইসব অনূদিত কবিতা নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থও প্রকাশ করবেন।

শকুন্তু সাহিত্যসভা ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মিলে কিছুকাল আগেই সংগঠিত করেন শকুন্তু সাহিত্যসভা। আশুতোষ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রথীন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সাধন ভট্টাচার্য, রমেশ মাথুর, চণ্ডী লাহিড়ী প্রমুখ এই পাক্ষিক সাহিত্যসভার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত। কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যানুরাগী বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীগণ ইচ্ছে করলে এই আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংস্থার পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে সাহিত্যানুরাগীদের ৬৫ গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা ১২-য় সংস্থার সম্পাদক অসিত পালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ॥

"ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিবেশী সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমেই পরস্পরের সমৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ সম্ভব। এভাবেই একদিন ভারতীয় সংহতির পথ আরও প্রশস্ত হবে।'—বলেছেন শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গ-সাহিত্য পরিষদের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি উপরের মন্তব্যটি করেন। তিনি বলেন যে, "বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভারের অনুবাদের দ্বারা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।" এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় বাংলা ভাষাকে যাতে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে স্থান দেওয়া হয়, তার জন্যও তিনি চেষ্টা করবেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকিরণকুমার ভট্টাচার্য। পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীতরুণকান্তি ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক শ্রী দেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভাষণ দেন। অনুষ্ঠানে এলাহাবাদের বহু শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে।

কলকাতায় ব্রিটিশ পুস্তক প্রকাশক

লণ্ডনের বি পি সি পাবলিশিং লিমিটেডের কম্পানী ম্যানেজার মিঃ টম বোর্ডম্যান গত ২ মার্চ বোম্বাই থেকে দুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এখানে তাঁর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যাঁদের যোগাযোগ রয়েছে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন ও আলোচনা করেন।

তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পুস্তকপ্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতাদের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক সুদৃঢ় করা এবং কোম্পানীর নতুন রেফারেন্স পুস্তক 'দি হিস্ট্রি অব দি টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি'র বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা।

মিঃ বোর্ডম্যান মনে করেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সাহিত্য-পুস্তকের বিক্রি ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকবে।

সত্যেন্দ্র সাহিত্য সংবাদ ॥

গত ১০ ফেব্রুয়ারী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মস্থান নিমতায় গাইকুল প্রাঙ্গণে কবির ৮৭তম জন্মদিবস পালন করা হয়।

ভিয়েতনামের ওপর দৃষ্টি ॥

ভিয়েতনামের দিকে আজ সারা পৃথিবীর চোখ। যাঁরা রাজনীতি করেন, আর যাঁরা রাজনীতি করেন না—তাঁদের সকলের কাছেই এটি একটি সমস্যা। এই বিষয়টির ওপরে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচিত হয়েছে। সম্প্রতি বেরিয়েছে ডীন ব্রেলিসের লেখা 'দি ফেস অব সাউথ ভিয়েতনাম' নামে একটি সচিত্র গ্রন্থ। মিস জিল ক্রেমেন্তজ-এর তোলা অজস্র ছবিতে বইটি আকর্ষণীয়।

ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে মিস ক্রেমেন্তজ দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধই প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের সারকথা নয়। মানুষের ওপরে যুদ্ধের প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনই তাঁর ছবি তোলার আসল কারণ। সেইজন্যেই, যুদ্ধরত মানুষের ভয়াবহ দিনযাপনের পাশাপাশি সাধারণ জনজীবনের উদ্দীপক চিত্রাবলীও তিনি স্বচ্ছন্দে তুলে গেছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর কোন আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। সৈনিকদের আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা প্রভৃতি যেমন তাঁর ছবির উপকরণ—তেমনি আহত সৈনিকদের হতাশা, ক্লান্তি ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাকুলতাও সমভাবে আকর্ষণীয়।

গ্রন্থকার ডীন ব্রেলিস একজন সাংবাদিক। তিনি [illegible] কথা সরবরাহ করেছেন। হো চি মিনকে তিনি জন ব্রাউনের মত গল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক হিসেবে অঙ্কিত করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী কী সম্পর্কেও অনুরূপ গল্পের অবতারণা। ব্রেলিস ভিয়েতকংদের এলাকায় প্রবেশের সুযোগ পাননি। তবে, ভিয়েতকংদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন এমন একজন সদ্য বিবাহিত নিগ্রো-সার্জেণ্ট ও সবে-গোঁফওঠা একজন আমেরিকান তরুণের গল্প করেছেন। অবশ্য, এরা দুজনেই ভিয়েতকংদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন।

মিস ক্রেমেন্তজ এখন নিউ-ইয়র্কে আছেন। ব্রেলিস গ্রন্থ শেষ করেছেন এই বলে —"এবং এখনও যুদ্ধ চলছে...।"

গ্রন্থটি উপন্যাসের মতো ঘটনাবহুল।

পরলোকে অধ্যাপক পিতিরিম এ সোরোকিন ॥

প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক পিতিরিম এ সোরোকিন সম্প্রতি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ম্যাসাচুসেটসে হার্ভার্ডে অধ্যাপকরূপে কাজ করেছিলেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ওপরে তাঁর জীবনব্যাপী অনুচিন্তনের সার্থক ফলশ্রুতি 'সোশাল অ্যাণ্ড কালচারাল ডাইনামিকস'। বস্তুতান্ত্রিক জীবন-চেতনা এবং ভাববাদী প্রেম ও বিশ্বাসের দোল খাওয়ার পর্যায় নির্ণয়ে তাঁর চিন্তা কেন্দ্রীভূত ছিল। সোরোকিনের মতে, পাশ্চাত্য-সভ্যতা ভোগ-প্রধান। তিনি তাঁর দীর্ঘজীবনে প্রায় তিরিশটি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এইসব গ্রন্থ উত্থান-পতনময় মানবজাতির আত্মধ্বংসী প্রবণতাসমূহকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

থিয়োডোর স্টর্ম-এর জন্মদিবস পালন

জার্মানীর প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক থিয়োডোর স্টর্ম-এর ১৫০তম জন্মদিবস পালিত হয়ে গেলো কিছুদিন আগে। তাঁর জন্মস্থান উত্তর সাগরের উপকূলে অবস্থিত হুসুম-এ। এই উপলক্ষে স্টর্ম ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত অন্যান্য সাহিত্যকৃতির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারা পৃথিবীর জার্মান কবি-সাহিত্যিকরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। জাপানের অধ্যাপক তাকাহাসি জাপানী-সাহিত্যে স্টর্ম-এর প্রভাব সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্টর্মের বর্ণমাধুরী শিল্পচেতনার প্রেক্ষাপটের ওপর সুচিন্তিত আলোচনা করেন কনস্টানজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক [illegible]। টমাস মান তাঁর প্রথম জীবনে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

দেশে-বিদেশে

কচ্ছের পর কচ্ছাতিভু

পক প্রণালী নামে যে সংকীর্ণ জলপ্রণালী সিংহল ও ভারতের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে, সেই সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম কচ্ছাতিভু। প্রাক্তন রামনাদের রাজার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত এই দ্বীপ বালুকাময় ও জলহীন। তার আয়তন—দৈর্ঘ্যে এক মাইল, প্রস্থে তিনশ' গজ। এই দ্বীপে জনবসতি নেই। শুধু একটি গীর্জা আছে। ভারত ও সিংহল, দুই দেশ থেকেই ক্যাথলিকরা তাঁদের ধর্মীয় পাল-পার্বণ উপলক্ষে কচ্ছাতিভুতে যান। আগামী ১৭ মার্চ তারিখে সেখানে সন্ত অ্যান্টনির উৎসব হওয়ার কথা। ঠিক তার প্রাক্কালে সিংহল সরকার ঐ জনবসতিহীন দ্বীপটিতে পুলিশ-পেয়াদা পাঠিয়ে দ্বীপটির দখল নিয়েছেন। সিংহলের 'সান' পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশ করে বলা হয় যে, সিংহল সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের স্থায়ী সেক্রেটারী দাবী করেছেন, কচ্ছাতিভু দ্বীপটি পুরোপুরি সিংহলের। আরও খবর দেওয়া হয় যে, দ্বীপটিকে সিংহল তার বিমান ঘাঁটির জন্য ব্যবহার করতে চায়।

'সান' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদ গত সপ্তাহে ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে দেশে হৈ-চৈ পড়ে যায়। লোকসভায় এস-এস-পি ও জনসংঘের কয়েকজন সদস্য সরকারকে শক্ত করে চেপে ধরেন।

আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের রায় মেনে কচ্ছের রানের একাংশ পাকিস্তানকে খয়রাত করা হচ্ছে। এখন আর ভারত সরকারের অন্য উপায় নেই—এই কৈফিয়ৎ দিয়ে পার্লামেন্টে একটা অনাস্থা প্রস্তাবের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে এইভাবে আর একটা জবাবদিহির মধ্যে পড়তে হল।

লোকসভায় উত্তেজিত সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রী বি আর ভগৎ একটি বেফাঁস উক্তি করে শ্রীমতী গান্ধীর কাজ আরও কঠিন করে দিয়েছেন। শ্রীভগৎ ১ মার্চ তারিখে লোকসভায় বলেছেন যে, দ্বীপটি সিংহলেরও দখলে নেই, ভারতেরও দখলে নেই। একজন সরকারী মুখপাত্রের এই ধরনের উক্তিতে সদস্যরা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা দেন যে, ঐ দ্বীপে কোন পক্ষেরই সামরিক বা পুলিশ ঘাঁটি নেই, এই অর্থে সেটি কোন দেশের দখলে নয়। শ্রীমতী গান্ধী সদস্যদের বলেন যে, এই সংবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানবার জন্য সিংহলস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে, তার কথা মনে রেখে শ্রীমতী গান্ধী সদস্যদের ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু, এটা লক্ষণীয় যে, শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার করে বলেন নি, দ্বীপটি ভারতের এবং ভারতবর্ষ এই দ্বীপের উপর তার অধিকার বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

শ্রীমতী গান্ধীর এই বিবৃতির সুর থেকেই সন্দেহ হচ্ছে যে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতবর্ষ হয়ত আর এক দফা কুরবানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

কচ্ছাতিভু দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ভারত ও সিংহলের মধ্যে দীর্ঘকালের পুরানো বিরোধ আছে এবং এই দ্বীপটি একটি ক্ষুদ্র, জনবসতিহীন, ঊষর ভূখণ্ড মাত্র—এই কথাগুলি এ ব্যাপারে বড় নয়। বড় কথা হল, ভারতবর্ষ যে ভূখণ্ডকে তার আঞ্চলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তার উপর তার নিজের সার্বভৌম অধিকার সে প্রয়োগ ও রক্ষা করবে কিনা।

লোকসভায় এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি, এটাই উদ্বেগের কথা।

জাপান সমুদ্রের তরঙ্গ

উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনী কর্তৃক মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো' আটকের ঘটনায় জাপান সমুদ্র আলোড়িত হয়েছিল। সেই আলোড়নের তরঙ্গ অন্যান্য দেশের মধ্যে জাপানকেও আঘাত করেছে—যার ফলে জাপানের সাতো মন্ত্রিসভা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন এবং ঐ মন্ত্রিসভা থেকে কৃষি ও বনমন্ত্রী তাদাও কুরাইশি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

ঘটনাটা ঘটেছে এইভাবে:—

জাপানীরা মাছের ভক্ত। বাঙালীর মতই জাপানীদেরও খাদ্যের তালিকায় মাছ একটি অপরিহার্য পদ। জাপানের বাজারে এক্ষেত্রে মাছের দাম জানুয়ারী মাসের শেষে ও ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় খুব বেড়ে গেল। বনমন্ত্রী তাদাও কুরাইশির উপর ভার পড়ল। অনুসন্ধানে প্রকাশ পেল, 'পুয়েবলো' আটকের ঘটনার পর জাপান সমুদ্রে দুই বৃহৎ মার্কিন ও সোভিয়েট রণতরীর টহলদারি বেড়ে গেছে। তার ফলে জাপানী জেলেরা ডিঙ্গি নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে আর বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না এবং সেই কারণেই বাজারে মাছের যোগান কমে গেছে।

৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপানী সাংবাদিকরা [illegible] মাছধরা ডিঙির জেলেদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তুললেন। কৃষিমন্ত্রী কুরাইশি বললেন, 'জেলে নৌকাগুলির নিরাপত্তা বিধান করতে হলে পিছনে যুদ্ধজাহাজ ও কামান থাকা প্রয়োজন।' তিনি আরও বললেন, 'আমাদের যদি পরমাণু বোমা ও তিন লক্ষ সৈন্য থাকত...'

কুরাইশির এই উক্তিতে যেন আগুনে ঘৃতাহুতি দিল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর গৃহীত জাপানের সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, জাপান কখনও সামরিক শক্তি হওয়ার চেষ্টা করবে না এবং কখনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী, সংগ্রহ বা ব্যবহার করার চেষ্টা করবে না। জাপানী সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ঐ সংবিধানের একটি মূল ধারা। জাপান পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার উপর পরমাণু বোমা পড়েছে। ভবিষ্যতে যাতে আর একটা পরমাণু যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে না হয়, সেজন্য জাপানের মানুষের আগ্রহ খুবই বেশী। প্রধানমন্ত্রী আইসাকু সাতো গত নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে কথা বলে দেশে ফিরে আসার পর জাপানের সংবিধানের এই যুদ্ধবিরোধী ধারা সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ দেখা দেয়। তবুও দেখা যায়, প্রতি দশজন জাপানীর মধ্যে নয়জন সংবিধানের এই নবম অনুচ্ছেদ বহাল রাখার পক্ষপাতী।

[illegible] মন্ত্রিসভায় বিরোধীদল জাপানী জনগণের এই মনোভাবটি [illegible] জাগিয়ে তুললেন। কুরাইশির বিরুদ্ধে [illegible]

হবার গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বন্দীশালার অন্ধকূপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। অজানা, অজ্ঞাত, ভবিষ্যতের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য এ'দের অনেকেই আবার কলেজে ভর্তি হলেন। আমাদের কলেজেও অনেকে ভর্তি হয়েছিলেন।

দিনের বেলায় হাফ্ আদর্শবাদী, হাফ্ ভাবুক, হাফ পলিটিসিয়ান, হাফ অভিনেতা, হাফ গায়ক, হাফ খেলোয়াড়দেরই সংখ্যা ছিল বেশী। সন্ধ্যার পর যাঁরা আসতেন তাঁদের অধিকাংশই ডালহৌসী-ক্যানিং স্ট্রীট-ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে অর্ধমৃত অবস্থায় ছুটতে ছুটতে কলেজে আসতেন।

সওয়া দশটায় মেয়েদের ক্লাশ শেষ হতো আর ছেলেদের ক্লাশ শুরু হতো। আমার ক্লাশ কোনদিন সওয়া দশটায়, কোনদিন এগারটায় শুরু হতো। সওয়া দশটায় ক্লাশ থাকলে ছেলেরা কোনদিন লেট করত না। বরং দশটা বাজতে বাজতেই কমনরুমে ছেড়ে দোতলা-তিনতলার দিকে পা বাড়াত। সওয়া দশটায় সন্ধিলগ্নের প্রতি অন্যান্য ছাত্রদের মত আমারও আকর্ষণ ছিল কিন্তু সকালবেলায় দু-দুটো টিউশনি করে কলেজে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে যেত। তাইতো সওয়া দশটার ক্ষণিক বসন্তের হাওয়া আমার উপভোগ করার সুযোগ নিয়মিত হতো না।

বীণামাসির সঙ্গে প্রায়ই পূরবী সিনেমার কাছাকাছি দেখা হতো। বীণামাসি বিবাহিতা যুবতী কিন্তু সিঁদুর পরত না। বীণামাসি বলত, বিয়ে করেও যখন স্বামীকে পেলাম না, শ্বশুরবাড়ীতেও স্থান পেলাম না, তখন সিঁদুর পরব কার জন্য? কিসের জন্য? ফুটপাতের এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দু'চার মিনিট কথাবার্তা বলতাম। কলেজের ছোকরা অধ্যাপক ও ছাত্রদের কেউ কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় একটু সরস দৃষ্টি দিয়ে চাইতেন। বীণামাসি ও আমি দুজনেই তা লক্ষ্য করতাম কিন্তু গ্রাহ্য করতাম না।

পর পর কদিন বীণামাসির সঙ্গে দেখা হলো না। প্রথম কদিন বিশেষ কিছু ভাবিনি। পুরো একটা সপ্তাহ দেখা না হবার পর একটু চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। অথচ বীণামাসিদের বাড়ী গিয়ে খোঁজ করার সে সময়ও হয় না। কলেজ শেষ হতে না হতেই আবার টিউশনি করতে ছুটতে হয়।

সেদিনও কলেজে আসবার পথে বীণামাসির দেখা পেলাম না। কিন্তু ঐ পূরবী সিনেমার কাছাকাছিই হঠাৎ একটী অনিন্দ্য লাবণ্যের স্বরূপ আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বল্লো, শুনুন। বীণাদির খুব অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় হ্যারিসন রোডের পর পূরবী সিনেমার পাশে এমনভাবে একজন সুন্দরী আমাকে বীণামাসির সমন জারী করবে, কল্পনাও করতে পারিনি। মুহূর্তের জন্য তাকে চমকে গিয়েছিলাম। একটু সামলে নেবার পর অনেক প্রশ্ন মনে এসেছিল কিন্তু গলা দিয়ে সেসব প্রশ্ন বেরুতে সাহস পারনি। শুধু বলেছিলাম, আপনি জানলেন কি করে?

—আমি বীণাদির বাড়ী গিয়েছিলাম।

সেই দিনই বিকেল বেলা বীণামাসিকে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি যেতেই বীণামাসি আমাকে প্রশ্ন করল, 'নীলিমার কাছে খবর পেয়েছিস বুঝি?'

আমি বল্লাম, 'কোন নীলিমা?'

'ঐ যে আমাদের সঙ্গে পড়ে নীলিমা সরকার......'

'তা জানিনে, তবে আজ সকালেই পূরবীর কাছে একটা সুন্দর ধরনের মেয়ে...'

বীণামাসি আর এগুতে দিল না। বল্লো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ তো নীলিমা।'

আমি বল্লাম, 'তাই বুঝি?'

বীণামাসির কাছে আমি আমার চিত্ত চাঞ্চল্যের বিন্দুমাত্র আভাস দিলাম না। নিজেকে সংযত করে নিলাম। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে সেদিনের মত বিদায় নেবার আগে বীণামাসিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কলেজ থেকে কেউ তোমাকে দেখতে আসেন না?'

'হ্যাঁ, অনেকেই আসে।'

তিন-চারদিন পরে আবার বীণামাসিকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি সেদিনের সেই নীলিমা সরকারও বসে আছেন। নমস্কার বিনিময় করে আমি পাশের মোড়াটায় বসলাম। বীণামাসি চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে বল্লো, 'জানিস নীলিমা, বাচ্চু আগে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমাদের এই পাড়ার বাচ্চার সবাই ওর মা মারা যান......'

নীলিমা বল্লো, 'তাই নাকি?'

আমি বল্লাম, 'আমার জীবন কাহিনী শোনার অনেক অবকাশ পাবেন, আজ থাক। যদি লিখতে পারত তবে বীণামাসি আমার জীবন নিয়ে একটা নাটক লিখত। জানা জান বীণামাসির কলম চলে না, শুধু মুখ চলে। কিন্তু তার ঠেলাতেই আমি অস্থির।'

নীলিমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ-পরিচয় হলো। দশ-বারো দিন পরে, বীণামাসির বাড়ীতেই আমাদের [illegible] দেখা। সেদিন [illegible]
[illegible]

দাঁতে চিবুই স্বপ্ন, কুটো ঘাস ॥

কৃষ্ণ বসু

করণাতলায় শুয়ে শুয়ে আপন মনে দাঁতে চিবুই
স্বপ্ন, কুটো ঘাস
দেখি দূরে ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে গুলমিং মিলের
ফুল ফোটানো আকাশ।
মনের ভিতর হাঁটতে থাকি সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকি
অন্ধকারে গুহায়—
হঠাৎ কখন চমক লাগে পায়ের শব্দ শুনলে পরে
চেঁচিয়ে বলি, কে যায়?
অনেক দিনের অমার্জিত উঠোন কোণে দেখতে পেলাম
সিঁদুর মাখা পিঁড়ি
দেখেই আমি চিনতে পারি, মনে পড়ে এইখানেতে
করেছিলাম যুগল হারাকিরি।
নিজের শবকে তারপরেতে কাফন দিয়ে গভীর হাতে
আলতো করে ঢাকি
না তাকিয়ে চিনতে পারি কে শুয়েছে আমার পাশে
সন্ধ্যামণির সুবাস গায়ে মাখি।
নির্জনতা ঘুম ভাঙে না শিশির করে বিলাপ করে
সন্ধ্যা আতুর আকাশ
আমি তখন ফিরে গিয়ে করণাতলায় শুয়ে শুয়ে
দাঁতে চিবুই স্বপ্ন, কুটো ঘাস।

এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী ॥

মনোরমা সিংহ রায়

হিংস্র দিন কী যে আনে শুধু, বুঝি নাগিনী সে তার
বিষ ঢেলে দিয়ে দিয়ে ফিরে যায় বিবরে আবার।
মৃত্যু নীল মুহূর্তের বিলাপের শেষ অঙ্ক পরে
ধূসর ম্লানিমা সব ঢেকে দেয়। শুধু অশ্রু ঝরে।।
তারপর বাকী থাকে নাগালের বাহিরে তখন
অনুদ্দিষ্ট সুখ তার নিয়ে কিছু চারু আকর্ষণ।।
অনিন্দ্য সকাল ব্যর্থ। বেদনায় কল্পনা বিলীন,
তবু কি হৃদয় ভেঙে কিছু রেখে যায় না এ দিন।

আলোকরা অপরাহ্ন আসে নেমে, মায়াবী তুলিকা
অপরূপ কারুকার্য এঁকে দিয়ে জ্বালে দীপশিখা
নক্ষত্রের আলো দিয়ে। অনুপম মাধুরী শিল্পের
মোহিনী হাসির আভা রেখে যায় যেন ললাটের
উপরে দুহাত রেখে। সে এক পবিত্র আশীর্বাদ,
সব বিষ বিলুপ্ত করে নাকি সে অমৃত স্বাদ।

তারপর ঘুম নিয়ে আসে, হায় নির্বাক যামিনী
তখনো হও না শান্ত, এতো বিষ ঢালে কি নাগিনী।

প্রেত পুঁথির রহস্য

ফাদার ঘনশ্যামের
রোমাঞ্চ কাহিনী (১০)

• অদ্রীশ বর্ধন

ভূত আছে কি নেই?

অনেক পুরোনো প্রশ্ন। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক আলোচনা-সভা প্রবন্ধ-গল্পের ইয়ত্তা নেই। কেউ প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। কেউ প্রেত-তত্ত্বে মহা পণ্ডিত, কেউ পণ্ডিত-মূর্খ।

কিন্তু রেবতীশংকর মুখুজ্জের মত চাঁছর মূর্তি দুনিয়ায় আর দুটি নেই। কেউ যদি তাঁকে বলত, মুখুজ্জেমশায়, আপনি নাকি ভূত মানেন? ভূত-বিজ্ঞানে খুব দখল আছে নাকি আপনার?' তাহলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন রেবতী মুখুজ্জে। আবার যদি কেউ সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলত, 'ওহো, তাই বলুন, আপনি তাহলে প্রেতাত্মা মানেন না?' তৎক্ষণাৎ আর একবার বোমার মত তিনি ফেটে পড়তেন।

বিশ্বাসী বললেও রেগে টিনটে হতেন, অবিশ্বাসী বললেও চটে লাল হতেন। এ হেন চরিত্রের মানুষ রেবতী মুখুজ্জেকে যারা চিনত, তারা তাঁকে আর ঘাঁটাতে চাইত না।

• কারণ, রেবতী মুখুজ্জের বাপ-ঠাকুর্দা অনেক পয়সা জমিয়ে গেছেন—ওড়াতে পারেননি। একমাত্র বংশধর রেবতী মুখুজ্জে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েও [illegible]

লিট্‌কুইজ নং ২৮-এ প্রাপ্ত কোন এণ্ট্রিই সর্বৈব নির্ভুল নয়।
একটি ভুল হওয়া ৭ জন বিজয়ী প্রত্যেকে ২২৮৬, টাকা
পেয়েছেন। ৩টি পুরস্কার সহ মার্কি ট্রানজিস্টর।

বন্ধের শেষ তারিখ

ডাকে প্রেরিত সকল প্রবেশপত্র : ১০-৩-৬৮

আনন্দবাজারে সমাধান : ১৯-৩-৬৮

আপনি আপনার প্রবেশপত্র পাঠাতে পারেন বুধবার ১২-৩-৬৮ তারিখে কিন্তু উহা এক্সপ্রেস ডেলিভারীতে পাঠান।

সমাধান কেবল পাইবার জন্য আপনার প্রবেশপত্রসহ নিজ ঠিকানা লিখিত ও স্ট্যাম্প পোস্টকার্ড পাঠান।

১০ টাকা পাঠান এবং লিট্‌কুইজ টিকেটের ৫টি সংখ্যা লাভ করুন।

স্থানীয় এজেন্ট

নিম্নলিখিত এজেন্টের নিকট থেকে এন্ট্রি ফরম ও ক্যাশ রসিদ পাবেন :

পি, সি, অ্যান্ড কোং, ফ্ল্যাট নং ৬, ব্লক 'বি', ১৩, বেন্টিঙ্ক রোড, কলিকাতা—১৪

৩০, লিট্‌কুইজের সরকারী ভর্তি ফর্ম

ADDRESS :—LITQUIZ No. 30, ALANKAR, BALARAM ST., BOMBAY-7

দ্রষ্টব্য:—(১) প্রত্যেক কলমে, আপনার বাতিল করা শব্দটি কালি দিয়ে কেটে দিন; (২) আপনি যদি সবকয়টি কুপন না পাঠান, তাহলে বাকী কুপনগুলি বাতিল করে দিন; (৩) আপনি যদি মানি অর্ডারযোগে প্রবেশমূল্য পাঠান, তাহলে এই এন্ট্রি ফর্মের সঙ্গে, ডাকঘর থেকে পাওয়া মানি অর্ডার রসিদটি অবশ্যই পাঠাবেন। মানি অর্ডার রসিদ ছাড়া এন্ট্রি বাতিল করা হবে; (৪) আই-পি-ও ক্রস করবেন না। লিট্‌কুইজ নং—৩০ বোম্বাই-৭-এর অনুকূলে টাকা পাঠান।

No.	1 (Re. 1)		2 (Re. 1)		3 (Re. 1)		4 (Re. 1)	
1	ARTISTS	IDEALISTS	ARTISTS	IDEALISTS	ARTISTS	IDEALISTS	ARTISTS	IDEALISTS
2	COMMON	HUMAN	COMMON	HUMAN	COMMON	HUMAN	COMMON	HUMAN
3	CRIMINALITY	CRUELTY	CRIMINALITY	CRUELTY	CRIMINALITY	CRUELTY	CRIMINALITY	CRUELTY
4	DANGEROUS	PRECIOUS	DANGEROUS	PRECIOUS	DANGEROUS	PRECIOUS	DANGEROUS	PRECIOUS
5	ECONOMIC	SCIENTIFIC	ECONOMIC	SCIENTIFIC	ECONOMIC	SCIENTIFIC	ECONOMIC	SCIENTIFIC
6	ECONOMICALLY	ENTIRELY	ECONOMICALLY	ENTIRELY	ECONOMICALLY	ENTIRELY	ECONOMICALLY	ENTIRELY
7	EDUCATION	RELIGION	EDUCATION	RELIGION	EDUCATION	RELIGION	EDUCATION	RELIGION
8	FUTURE	PEOPLE	FUTURE	PEOPLE	FUTURE	PEOPLE	FUTURE	PEOPLE
9	HISTORICAL	SPIRITUAL	HISTORICAL	SPIRITUAL	HISTORICAL	SPIRITUAL	HISTORICAL	SPIRITUAL
10	HUMILITY	RESPONSIBILITY	HUMILITY	RESPONSIBILITY	HUMILITY	RESPONSIBILITY	HUMILITY	RESPONSIBILITY
11	MORALITY	PROSPERITY	MORALITY	PROSPERITY	MORALITY	PROSPERITY	MORALITY	PROSPERITY
12	PAIN	PLEASURE	PAIN	PLEASURE	PAIN	PLEASURE	PAIN	PLEASURE
13	PEACE	PRACTICE	PEACE	PRACTICE	PEACE	PRACTICE	PEACE	PRACTICE
14	PLANNERS	POLITICIANS	PLANNERS	POLITICIANS	PLANNERS	POLITICIANS	PLANNERS	POLITICIANS
15	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	PRODUCTIVITY	PROSPERITY	PRODUCTIVITY	PROSPERITY
16	PROPAGANDA	WAR	PROPAGANDA	WAR	PROPAGANDA	WAR	PROPAGANDA	WAR
17	REALITY	RELIGIOUS	REALITY	RELIGIOUS	REALITY	RELIGIOUS	REALITY	RELIGIOUS
18	WORSHIPS	WRONGS	WORSHIPS	WRONGS	WORSHIPS	WRONGS	WORSHIPS	WRONGS

SEND FIRST TWO COUPONS & ENTER MINIQUIZ (A) FREE • SEND FOUR COUPONS & ENTER BOTH MINIQUIZ (A & B) FREE

MINIQUIZ (A) — 6 CLUES FREE COUPON

ARTISTS	IDEALISTS
COMMON	HUMAN
CRIMINALITY	CRUELTY
PROPAGANDA	WAR
REALITY	RELIGIOUS
WORSHIPS	WRONGS

30

MINIQUIZ (B) — 12 CLUES FREE COUPON

DANGEROUS	PRECIOUS	HUMILITY	RESPONSIBILITY
ECONOMIC	SCIENTIFIC	MORALITY	PROSPERITY
ECONOMICALLY	ENTIRELY	PAIN	PLEASURE
EDUCATION	RELIGION	PEACE	PRACTICE
FUTURE	PEOPLE	PLANNERS	POLITICIANS
HISTORICAL	SPIRITUAL	PRODUCTIVITY	PROSPERITY

৩০ (অমৃত)

এই কুইজে যোগদান করবার জন্য আমি নিয়ম ও সর্তাবলী পালন করতে রাজী এবং প্রতিযোগিতা সম্পাদকের বিচার চূড়ান্তভাবে ও আইনতঃ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করলাম। প্রত্যেক কুপনের জন্য প্রবেশ মূল্য : ১, টাকা, সম্পূর্ণ ফর্মটির (৪টি কুপন) প্রবেশ মূল্য ৪, টাকা। আমি এম-ও রসিদ/আই-পি-ও/লিট্‌কুইজ ক্যাশ রসিদ/প্রাইজ কার্ড ও তার নম্বর.................পাঠাইলাম।

NAME ——————————————

CAPITAL LETTERS

ADDRESS ——————————————

——————————————

এখানে কাটুন ও এই পুরো ফর্মটি পাঠান

ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমীর দাশগুপ্ত

সরকারী মহলের বক্তব্য থেকে ধারণা করা যায় যে, ব্যাঙ্কের 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' কথাটির অর্থ হচ্ছে ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের চূড়ান্ত বণ্টন ও ব্যবহারের উপর সমাজের, অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ। এ-কথা অবশ্য সত্যি যে, এ-বিষয়ে নতুন কোন সরকারী আইন পাশ না-হলেও, এখনি ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাহ্যত অনতিক্রম্য। তথাপি যদি টাকার বাজারে এমন কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকে যাদের ঐসব প্রচলিত ক্ষমতার অধীনে আনা সর্বদা সম্ভব না হয়, তাহলে গুণগতভাবে নতুন কোন নিয়ন্ত্রণ-বিধির প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের সরাসরি জাতীয়করণ পন্থা বাতিল করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরোক্ষ ক্ষমতা আরো কিছু বাড়ালে কি উদ্দেশ্য সফল হবে?

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে আলোচ্য সুপারিশ এ-দেশের অর্থনীতিক ক্ষমতার ঘনীভবন (concentration of economic power)-এর মৌলিক প্রশ্নটিকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গেছে। ধনতন্ত্র বনাম সমাজ-তন্ত্রের প্রাচীন প্রশ্নটি কিন্তু এখন আর উচ্চারণ করা হচ্ছে না। বরং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পিছনে সরাসরি চাপ আসছে চতুর্থ পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাধীন কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব থেকে। বলা বাহুল্য, এই দুই উৎপাদনক্ষেত্রেই দাদনের (financial advances) প্রয়োজন বিরাট। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের ৫০ ভাগ কৃষির এবং সমগ্র শিল্পজাত আয়ের ৪০ ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান। অথচ প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মোট ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের মাত্র ০·২ শতাংশ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তার মাত্র ৬ শতাংশ বণ্টিত হয়। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বর্তমান ক্রেডিট বণ্টন পরিস্থিতিটি আর্থিক প্রগতির মোটেই অনুকূল নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কি বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে?

অথচ আর্থিক ক্ষমতার ঘনীভবনের প্রশ্নটি কিন্তু শুধুমাত্র আদর্শগত ব্যাপারই নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও যেসব কারণে ব্যাঙ্কের যথাযথ পরিচালন বিপর্যস্ত হয়, আর্থিক শক্তির ঘনীভবন ব্যাপারটির সঙ্গে কার্যত তাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। এখন এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলিকে যদি বে-সরকারী ভিত্তিতেই চলতে দেওয়া সাব্যস্ত হয়, তাহলে বড়ো এবং মাঝারি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্ব এবং ক্ষুদ্রশিল্প-বিমুখতাকে স্বীকার করে নিতেই হবে—কারণ স্পষ্টতই ক্ষুদ্রশিল্পের (এবং কৃষিরও) ঋণগ্রহণযোগ্যতা (creditworthiness) নগণ্য। অথচ ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে বে-সরকারী ভিত্তিতে চলতে দেওয়ার মানেই হচ্ছে ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষ লক্ষণ—বৃহৎ শিল্প, বৃহৎ ব্যবসায় এবং ব্যাঙ্কের শৃঙ্খলিত (interlocking) মালিকানা তথা পরিচালনাকে আরো সংহত ও শক্তিশালী হবার সুযোগ দেওয়া। কিছুকাল আগে শ্রীঅশোক মেহতার এক উদ্বেজক বক্তব্যে জানা যায় যে, দেশের ৬৫০টি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সমগ্র ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয়। এমতাবস্থায়, হয় সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জাতীয়করণ (তথা ঘনীভূত আর্থিক শক্তির অপসারণ), অথবা কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ক্রেডিট যোগাড়ের কাজে ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কদের কার্যকরী ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা বিকল্প হিসেবে ভাবা চলে। আলোচ্য 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' এই কার্যকরী সাহায্য তো দিতে পারবেই না, উপরন্তু ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ককে তার লাভজনক ক্ষেত্র থেকে টেনে এনে অনিশ্চয়তাপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বে বহাল করার কিংবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার অপপ্রচেষ্টাতেই কার্যত নিযুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষির ক্রেডিট প্রয়োজন মেটাবার জন্য সরকার ইতিপূর্বে যথাক্রমে স্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশন এবং স্টেট রুরাল কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি করেছিলেন। সম্প্রতিকাল পর্যন্ত এরকম একটা ধারণাও লোকের মনে তৈরি করা হয়েছিল যে, এই বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলির বিত্তবত্তা তাদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেজন্যই কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি ব্যাঙ্ক-সমুদয়ের কোন বিশেষ দায়িত্বও ছিল না। যদি এহেন সরকারী বিশ্বাস কিংবা ধারণা কালক্রমে অবাস্তব বলে প্রতীত হয়ে থাকে, সেজন্য এখন ব্যাঙ্কগোষ্ঠীকে অপবাদ দেওয়া অবশ্যই সমীচীন হবে না। বস্তুত, এতাবৎ সরকারী অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ-বনাম-জাতীয়করণ প্রশ্নটির যথাযথ মীমাংসা করতে হবে।

এখানে বক্তব্য এই নয় যে, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার জাতীয়করণ নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব সমস্যা নেই। কারণ, কার্যত দেখা গেছে যে, বে-সরকারী ব্যাঙ্কের তুলনায় সরকারী খাতের অন্তর্গত ব্যাঙ্কগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি মোটেই অধিকতর সদ্ভাব প্রদর্শন করেনি। ক্ষুদ্র-শিল্পক্ষেত্রে সরকারী-খাতভুক্ত ব্যাঙ্কের দাদন তার মোট দাদনের মাত্র ৬ শতাংশের ঊর্ধ্বে ওঠেনি—যার ফলে এই শ্রেণীর শিল্পগুলি তাদের চলতি পুঁজির (working capital) প্রায় পঞ্চাশ ভাগের জন্যই বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পেতেছে। অথচ এ-কথা হয়তো নির্বিবাদে বলা চলে যে, 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' পরোক্ষ, বণিক ব্যবসাদারীস্বার্থনিয়ন্ত্রক, নীতির তুলনায় সরাসরি জাতীয়করণ অনেক বেশি সাধারণ-স্বার্থনির্ভর।

শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কের তথাকথিত শৃঙ্খলিত মালিকানা ও পরিচালন সমস্যাটির আরেক জটিল দিক এখানে আলোচনা-সাপেক্ষ—যে দিকটি প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিশেষ প্রতিবন্ধক। ভারতের অর্থনীতিক ব্যবস্থাক্ষেত্রে দুটি পৃথক টাকার বাজার বর্তমান। বিরাটায়তন বে-সরকারী ("unorganised") বাজারটি মূলত নিজের নিয়মে অথবা খেয়ালে চলে: সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক বিধান-গুলি সেখানে প্রায় অচল। এই বাজারের চড়া সুদের হার এ-দেশের গ্রাম-ঐতিহ্যের অঙ্গবিশেষ। আশা করা গিয়েছিল যে, অর্থনীতিক পরিকল্পনা তথা সামাজিক উন্নয়নের হাত ধরে এমন কতকগুলি পরিবর্তন আসবে যার সংঘাতে সরকারী এবং বে-সরকারী টাকার বাজারের কার্যকরী সুদের হার দুটির বিরাট পার্থক্য ক্রমে কমে আসবে এবং দুটি বাজারের সমন্বয় (integration) হবে। কিন্তু সুস্থ পরিস্থিতিতে, এই প্রক্রিয়ায় বে-সরকারী সুদের হারটি ক্রমে সরকারী হারের নিকটবর্তী হতে থাকবে, বিপরীত ব্যাপারটি নয়। সরকারী হারটি যদি বে-সরকারী হারের দিকে এগোতে থাকে, তাহলে বরং অবাঞ্ছিত ফলাফলই দেখা যাবে। অর্থাৎ, সরকারী বাজার থেকে টাকা ক্রমশ বে-সরকারী বাজারে প্রবাহিত হবে এবং ফলে প্রথম বাজারটির আয়তন হ্রাস পাবে। স্পষ্টতই, এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধানুগ নিয়ন্ত্রণপরিধি সংকীর্ণতর হতে থাকবে।

দুর্ভাগ্যত, সম্প্রতিকালের ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে যে, এ-দেশের দুটি টাকার বাজারের পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমাগত অসুস্থ খাতে বয়ে চলেছে। গত বছরের আর্থিক বাস্তবতার মাসগুলিতে সুদের হার (Call rate) শতকরা ১৫ পর্যন্ত উঠে-ছিল। এই ঘটনাটি অসুস্থ, কারণ এক্ষেত্রে সরকারী সুদের হার বেড়ে গিয়ে বে-সরকারীর নিকটবর্তী হয়েছে, এবং অসুস্থ-তার আরেক প্রমাণস্বরূপ বাজারে কালো টাকার বিপুল উপস্থিতি ও প্রচলন দেখা গেছে। দেশের দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশে বে-সরকারী বাজারের মাধ্যমে টাকার (এবং কালো টাকার) এই সহজলভ্যতা প্রায় অনিবার্যভাবেই খাদ্যশস্য ইত্যাদির ফাটকা মজুতদারীকে (speculative hoarding) উৎসাহিত করেছে। এবং এই [illegible]

হয়েছে, ততই বে-সরকারী বাজারের উপর মজুতদারদের আর্থিক নির্ভরতা বিস্তৃত-তর হয়েছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয়েক বছর ব্যাঙ্ক উঁচু সুদের হার চালু রেখেছে। আশা করা গিয়েছিল যে, চড়া সুদের বোঝা মজুত-দারদের বাঁধাই ক্ষমতাকে (staying power) শক্তিহীন করে দেবে। এমন কি, এই আশায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রধান ব্যবসা-কেন্দ্রগুলিতেও ব্যাঙ্ক ঋণের মঞ্জুর করার ব্যাপারে সংকীর্ণতর নীতি অবলম্বন করে-ছিল—যার উদাহরণস্বরূপ স্মরণ করা যায় যে, সদস্য ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ ছিল, তারা যেন নতুন ক্রেডিটের শতকরা ৮০ ভাগ শুধু শিল্প-ক্ষেত্রে (industry) মঞ্জুর করে। অথচ এসব নীতির কোন সুফল হয়েছে কিনা সন্দেহ। সম্ভবত, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ মজুতদারের বাঁধাই ক্ষমতার অসুবিধাকে ছাপিয়ে গেছে এবং প্রয়োজনীয় ঋণের সংগ্রহে তাদের ক্রমাগত ব্যাঙ্ক পরিধির বাইরে যেতে উৎসাহিত করেছে। সুতরাং, যদিও ভারতবর্ষে চড়া সুদের সরকারী নীতি সাধারণভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে, তথাপি এই নীতির ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলি (manufacturing industries) তাদের বিনিয়োগযোগ্য ঋণের (industrial credit) জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, এবং অন্যত্র টাকার বাজারের প্রকৃত ভূমিকা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বাইরে সরে যাচ্ছে। স্পষ্টতই, এই পরিবেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও, বে-সরকারী বাজারের জোরাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবলভাবে ফাটকা মজুতদারী চলেছে। প্রমাণস্বরূপ আবার বলা যায় যে, ১৯৬৬-৬৭ সনের যে-পর্যায়ে সুদের হার সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল, ঠিক তখনই দেখা যায়, খাদ্যশস্যের পরিমাণগত হ্রাসের অনুপাতে খাদ্যের দাম অনেক বেশি চড়ে গিয়েছিল। যেহেতু ঐ একই সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার অধীনস্থ সদস্য ব্যাঙ্ক-গুলিকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, তারা যেন খাদ্যদ্রব্যের কারবারে কোন ঋণ মঞ্জুর না করে, এই বিরাট ফাটকার খেলায় দরকারী টাকা তাহলে নিশ্চয়ই এসেছিল বে-সরকারী বাজার থেকে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ-কথাও বলা চলে যে, দেশের মুদ্রাস্ফীতির ইন্ধন জুগিয়েছে এই বে-সরকারী বাজারই—যে-বাজারের কার্য-কলাপের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাসন অসম্ভব।

ব্যাঙ্ক, বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায়ের যে সুসংগঠিত মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে, সে-প্রসঙ্গে পুনর্বার ফিরে গিয়ে এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, এই ব্যবস্থায় কার্যপরিধি সরকারী ও বে-সরকারী টাকার বাজারের সীমানা ছেড়ে চলে। শিল্প ও ব্যবসায় সংস্থাগুলি তাই তাদের প্রয়োজনমতো দুই বাজার—এবং বিশেষত বে-সরকারী বাজার থেকেই ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। প্রস্তাবিত সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তিত আইন-কানুন দিয়ে এসব কাঠামোগত (structural) সমস্যার নিরসন সম্ভব হবে কিনা, বৃহৎ ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ট কোন ঋণ-গ্রহীতাদের, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণমঞ্জুর-বিরোধী আইনকে ফাঁকি দেবার কিংবা এড়ানোর উদ্দেশ্যে যদি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক থেকে একই সঙ্গে ঋণ সংগ্রহ করে তার ইচ্ছামতো ব্যবসায়ে টাকা খাটানোর প্রয়াস পায়, তাহলে 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' ব্যবস্থা ফলপ্রসূ কোন বাধা দিতে পারবে কিনা সন্দেহ। অথবা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে কি দেশের পুঁজির বাজার বর্ধিষ্ণুতর হবে—একমাত্র যে-বর্ধিষ্ণুতা সামাজিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে এবং তাদের উভয়কে বর্ধিত করতে পারে? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থায় 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ', ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কার্যকর বিকল্প হিসেবে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হতে পারে না।

লালবাঈ চিত্রে শবনম

প্রেক্ষাগৃহ

চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষা

টালিগঞ্জে নির্মীয়মান একখানি ছবির চিত্রনাট্যের একটি ছোট্ট অংশ ছাপার অক্ষরে পড়বার পরেই কথাটা আবার করে মনে হল। কী নিদারুণ অজ্ঞতাকেই না সম্বল করে চিত্রনাট্য রচনার কাজে ব্রতী হওয়ার দুঃসাহসিকতা পোষণ করেন কেউ কেউ। যদিও স্বীকার করি যে, "চিত্রনাট্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে আজ থেকে দশ বছর আগেও যে-সব কথা জোর দিয়ে বলা চলত, আজ আর তা চলে না", তবু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বেশ জোরের সঙ্গে বলার প্রয়োজন আছে যে, কোনো কাহিনীকে ছবির পর্দায় কিভাবে বললে তা সাফল্যের সঙ্গে বলা হবে, এই জ্ঞান হচ্ছে আহরণের সামগ্রী এবং এসম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। একটি কাহিনীকে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মাধ্যমে কেমনভাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং একটি দৃশ্যকে ক্যামেরা অবস্থান অনুযায়ী কেমনভাবে বিভিন্ন শট্-এ ভাগ করতে হয়, তা জানা ও শেখা দরকার এবং সকল বিদ্যার মতোই এ-বিদ্যা গুরুমুখী। চিত্রনাট্য রচনা বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় আজ বহু পুস্তকাদি রচিত হয়েছে এবং এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব পুস্তকই ইংরেজী ভাষায় অনূদিত। তবুও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, এই চিত্রনাট্যরচনা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনই কোনো অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকার বা চিত্রনাট্যকারদের কাছ থেকে এর রচনারীতি সংক্রান্ত পাঠ গ্রহণ না করলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবারই সম্ভাবনা বেশী।

চিত্রনাট্যরচনার মতো, চলচ্চিত্রশিল্পের পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ, শব্দানুলেখন, সম্পাদনা, শিল্পনির্দেশনা, সংগীতপরিচালনা, পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ প্রভৃতি কলাকৌশলের বিভিন্ন দিক নিয়মিতভাবে শিক্ষণীয়। এই ললিত ও যৌগিক শিল্পটির (অ্যাপ্লায়েড অ্যান্ড কম্পোজিট আর্ট) কোনো বিভাগ সম্পর্কেই আমাদের দেশে আগে কোনো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৫২ সালে গঠিত ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির সুপারিশ অনুসারে মাত্র কয়েক বছর হল পুণাতে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখানে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্যে মাত্র দশটি করে ছাত্র ভর্তি করা হয়। শিক্ষাগ্রহণেচ্ছুদের তুলনায় এই সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এছাড়া সুদূর বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য থেকে পুণায় গিয়ে শিক্ষালাভ করা মাত্র আর্থিক কারণেই নয়, আরও বহুবিধ অসুবিধার জন্যে বহু শিক্ষালাভেচ্ছুকের পক্ষেই অসাধ্য। কাজেই পুণায় পাঠগ্রহণের সুবিধা বোম্বাই বা মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতে চিত্র-প্রযোজনার আর দুটি অঞ্চল—মাদ্রাজ ও কলিকাতায় সন্নিকটে যদি পুণার অনুরূপ আর দুটি চলচ্চিত্র-শিক্ষণ-কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা হয়, তাহলে কিছুটা সুরাহা সম্ভব।

অনেকের মুখেই প্রশ্ন শুনতে পাই, চলচ্চিত্রশিল্পের কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে তত্ত্বীয় বা পুঁথিগত এবং ফলিত বা ব্যবহারিক (theoritical and practical) শিক্ষালাভ করলেই কি সার্থক পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রগ্রাহক বা ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী, সম্পাদক প্রভৃতি হওয়া যায়? কোনো শিক্ষণ-কেন্দ্র থেকে এই ধরনের শিক্ষালাভ না করেই তো আমাদের দেশে দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতীন বসু, শান্তারাম, সোহরাব মোদী এবং বর্তমান যুগে

ভারতবর্ষের ক্রীড়া-সমালোচকবৃন্দ। যাঁরা ধারা-বিবরণী দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ বক্তার আসনে বসেছিলেন বরোদার মহারাজা। আর অনেকের মধ্যে ছিলেন ক্রিকেটের স্বর্গীয় মহামানব ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। বরোদার মহারাজা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ওরেলকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ম্যাচের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে আপনার কি বক্তব্য? ফ্র্যাঙ্ক ওরেল নির্দ্বিধায় বললেন, "দেখুন, একটা বিরাট ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানে ঝড় কিংবা সাইক্লোন না হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হারকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" তারপর একটু থেমে বললেন—"তবে দেখুন, একটা কথা কি জানেন, যতক্ষণ গ্যারি সোবার্স ব্যাট হাতে ক্রীজে রয়েছেন ততক্ষণ এ খেলার শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কিছু বলা মানে মূর্খতার নামান্তর মাত্র। অসম্ভবকে সম্ভব করার যে দারুণ ক্ষমতা ওর আছে তাতে কারও আপত্তি করার নেই। ওর মত খেলোয়াড় আমাদের দেশে অতীতে জন্মায়নি, বর্তমানে নেই, আর ভবিষ্যতেও জন্মাবে কিনা জানি না।"—আমি কথা শেষ করার আগেই তিনি বললেন 'হ্যাঁ আমি শুনেছি সেকথা।'

—জানেন? একথা শুনতে শুনতে আমার অজান্তে চোখের কোল দুটো ভিজে গিয়েছিল শুধু এই কথা ভেবে যে, কে—কার সম্বন্ধে এ কি বলছেন। যিনি বলছেন তিনি আর কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। তিনিই ছিলেন এই দলের অধিনায়ক এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক—তিনিই অধিনায়কের পদে নির্বাচিত করেছেন এই সোবার্সকে।

প্রশ্ন—বুঝলাম না আপনার কথা।

উত্তরে বললাম—হ্যাঁ, সোবার্সকে অধিনায়কের পদে বসাবার মূলে ফ্র্যাঙ্কের অবদানই বেশী ছিল। ব্যাপারটা কি জানেন? শোনা যায় ফ্র্যাঙ্ক অধিনায়ক পদ থেকে সরে আসার পর হান্টের অধিনায়ক হবার কথা ছিল এবং হয়েও গিয়েছিলেন। শুধু নির্বাচকমণ্ডলী সরকারীভাবে ঘোষণা করেননি। তাঁরা শুধু মাত্র ওরেলের সম্মতির অপেক্ষায় ছিলেন। ওরেল দেশে ছিলেন না। দেশে ফিরে এলে তাঁকে সব বলা হলো। রাজি হলেন না ওরেল। বললেন, সোবার্সই একমাত্র লোক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক হবার সব যোগ্যতা রাখে। অবশ্যই আমার মতে। ওরেলের কথা শুনে নির্বাচকমণ্ডলী একবাক্যে সায় দিয়ে সোবার্সকেই করলেন অধিনায়ক।

ভদ্রলোক মনে মনে কি যেন ভেবে নিলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন—"সে দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের বোলাররা আশাতীত সাফল্যলাভ করেছেন।"

"অবশ্যই।" ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলাম। বললাম: "বিশেষ করে দুর্রানী, প্রসন্ন, বেদীর বোলিং প্রশংসা করার মত। কিন্তু নিরাশ করেছেন ওপনিং বোলার রামাকান্ত দেশাই। ক্রিকেটে বয়স বাড়লে বুদ্ধি বাড়ে। কিন্তু ফাস্ট বোলারদের মেয়াদ বেশী দিন থাকে না। তবুও দেশাই-য়ের নির্বাচন নিয়ে কম কথা ওঠেনি। দেশাই যে অপারগ সেইটাই প্রমাণিত হল টেস্ট পর্যায়ের খেলায়।"

ভদ্রলোক এবার শেষ কথা পাড়লেন। বললেন: "নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে আমরা জিতব কিনা? ওরা যা খেলছে তাতে ভারত 'রাবার' অক্ষুন্ন রাখতে পারবে কি?"

শেষ কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। তাই ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়েই বললাম: "নিউজিল্যাণ্ড এমন কিছু টিম নয় যে ভারতীয় দলকে কোনঠাসা করতে পারে। নিউজিল্যাণ্ড মাঠে রাণ আছে যদি অবশ্য ব্যাটসম্যানরা ধৈর্য ধরে খেলেন। আশাকরি তৃতীয় টেস্টে ভারত জিততেও পারে। আর যদি জেতে তাহলে বোলারদের দ্বারাই তা সম্ভব হবে। ব্যাটসম্যানদের ওপর কোন ভরসা নেই।"

খেলাধুলা

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা

নিউজিল্যাণ্ড: ৫০২ রান (গ্রাহাম ডাউলিং ২৩৯, ব্রুস মারে ৭৪ এবং কিথ টমসন ৬৯ রান। বিষেণ সিং বেদী ১২৭ রানে ৬ উইকেট)
ও ৮৮ রান (৪ উইকেটে। বিভান কংডন নটআউট ৬১ রান। বেদী ২১ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ: ২৮৮ রান (রুসী সুর্তি ৬৭, পতৌদি ৫২ এবং বোরদে ৫৭ রান। ডিক মজ ৬৩ রানে ৬ এবং রিচার্ড কলিঙ্গ ৮৫ রানে ৩ উইকেট)
ও ৩০১ রান (ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৬৩, সুর্তি ৪৫ এবং পতৌদি ৪৭ রান। গ্যারী বার্টলেট ৩৮ রানে ৬ উইকেট)

প্রথম দিন (ফেব্রুয়ারী ২২):
নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেট খুইয়ে ২৭০ রান সংগ্রহ করে। অপরাজিত থাকেন গ্রাহাম ডাউলিং (১০৫ রান) এবং মার্ক বার্জেস (১০ রান)।

দ্বিতীয় দিন (ফেব্রুয়ারী ২৩):
নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৫০২ রানের মাথায় শেষ হলে ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮ রান সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিন (ফেব্রুয়ারী ২৪):
ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ২৮৮ রানের মাথায় শেষ হলে তারা 'ফলো-অন' আইনের আওতায় পড়ে যায়। তবে এইদিন সময়ের অভাবে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে আর নামেনি।

চতুর্থ দিন (ফেব্রুয়ারী ২৬):
ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে ২৪০ রান সংগ্রহ করেছিল।

পঞ্চম দিন (ফেব্রুয়ারী ২৭):
ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ৩০১ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৮৮ রান তুলে দিয়ে ৬ উইকেটে জয়ী হয়।

নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চের ল্যাঙ্কাস্টার পার্কে আয়োজিত নিউজিল্যাণ্ড বনাম ভারতবর্ষের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ৬ উইকেটে জয়ী হয়েছে। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আজের এই নিয়ে যে ১১টি সরকারী টেস্ট খেলা হল তাতে নিউজিল্যাণ্ডের এই প্রথম জয়। অপরদিকে ভারতবর্ষের জয় ৪ এবং খেলা ড্র ৬। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য, নিউজিল্যাণ্ড এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে মোট ৮১টি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ (সরকারী ও বেসরকারী) খেলে মাত্র ৪টি খেলায় জয়ী হল।

ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদি টসে জয়ী হয়েও প্রথম ব্যাট করার দান নিউজিল্যাণ্ডকে ছেড়ে দেন। এর জন্যে ভারতবর্ষকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে। প্রথম দিনের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৭০ রান তুলেছিল। নিউজিল্যাণ্ড দলের নিয়মিত অধিনায়ক বেরী সিনক্লেয়ার অসুস্থ থাকায় এই দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হননি। তাঁর অবর্তমানে গ্রাহাম ডাউলিং দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। টেস্ট ক্রিকেটে ডাউলিংয়ের এই প্রথম দল পরিচালনা। প্রথম উইকেটের জুটিতে ব্রুস মারে (৭৪ রান) এবং ডাউলিং দলের ১২৬ রান তুলেছিলেন—ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁদের এই ১২৬ রানই নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে প্রথম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড রান। ২য় উইকেটের জুটিতে বিভান কংডন (২৮ রান) এবং ডাউলিং ৮২ রান তুলেন। তাছাড়া ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ডাউলিং এবং মার্ক বার্জেস ৪৬ মিনিটে ৫০ রান তুলে দিয়ে প্রথমদিনের খেলায় অপরাজিত থাকেন। ডাউলিং তাঁর ৬১ ও ১২২ রানের

রাণআউট হওয়া থেকে রক্ষা পেলেও তাঁর নটআউট ১০৫ রান দর্শকদের খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তিনি ২১০ মিনিটে তাঁর যে শত রান পূর্ণ করেন তাতে ছিল ১২টা বাউণ্ডারী এবং ২টো ওভার বাউণ্ডারী। ডুনেডিনের প্রথম টেস্টেও ডাউলিং সেঞ্চুরী করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, ডাউলিং ছাড়া ভারতবর্ষের বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট ক্রিকেট দলের হয়ে উপর্যুপরি টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজে জন রিড—১২০ রান (কলকাতা) এবং নটআউট ১১৯ রান (নিউদিল্লী)।

দ্বিতীয় দিনে ৫০২ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে টেস্টের এক ইনিংসের খেলায় নিউজিল্যাণ্ডের এই প্রথম ৫০০ রান সংগ্রহ করার নজির। অপরদিকে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ভারতবর্ষ এক ইনিংসের খেলায় ৫০০ রান তুলেছে ২ বার—৫৩১ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ, নিউদিল্লী, ১৯৫৫-৫৬) এবং ৫৩৭ (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ, মাদ্রাজ ১৯৫৫-৫৬)।

অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং ৫৪৭ মিনিট খেলে ২৩৯ রান করে আউট হন। তাঁর এই রানে ছিল ২৮টা বাউণ্ডারী এবং ৫টা ওভার-বাউণ্ডারী। ডাউলিংয়ের এই ২৩৯ রানই বর্তমানে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হল। পূর্বের রেকর্ড—বার্ট সাটক্লিফের নটআউট ২৩০ রান (বিপক্ষে ভারতবর্ষ, নিউদিল্লী, ১৯৫৫-৫৬)।

দ্বিতীয় দিনে ৫ম উইকেটের জুটি ডাউলিং এবং কিথ টমসন ১১২ মিনিটে ১০০ রান তুলে দিয়ে দৃঢ়তাপূর্ণ খেলার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের পক্ষে বোলিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ন্যাটা স্পিনার বিষেণ সিং বেদী (১২৭ রানে ৬ উইকেট)।

ভারতবর্ষ প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে একটা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮ রান সংগ্রহ করে। আলোর অভাবে দ্বিতীয় দিনের ১ ঘণ্টার মত খেলা বন্ধ রাখা হয়।

তৃতীয় দিনে ২৮৮ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা খেলার নিয়মে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয়। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ৫০২ রানের থেকে ভারতবর্ষ ২১৪ রানের পিছনে পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে পতৌদি এবং সূর্তি দলের ১০০ রান তুলে পরাজয়ের মত রানের চেহারাটা পাল্টে দিয়েছিলেন। দলের মাত্র ৫০ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। নিউজিল্যাণ্ডের ঠিক ঐ ৫০ রানে ৩টা উইকেট দিয়ে ভারতবর্ষের সেঞ্চুরী করেছিলেন
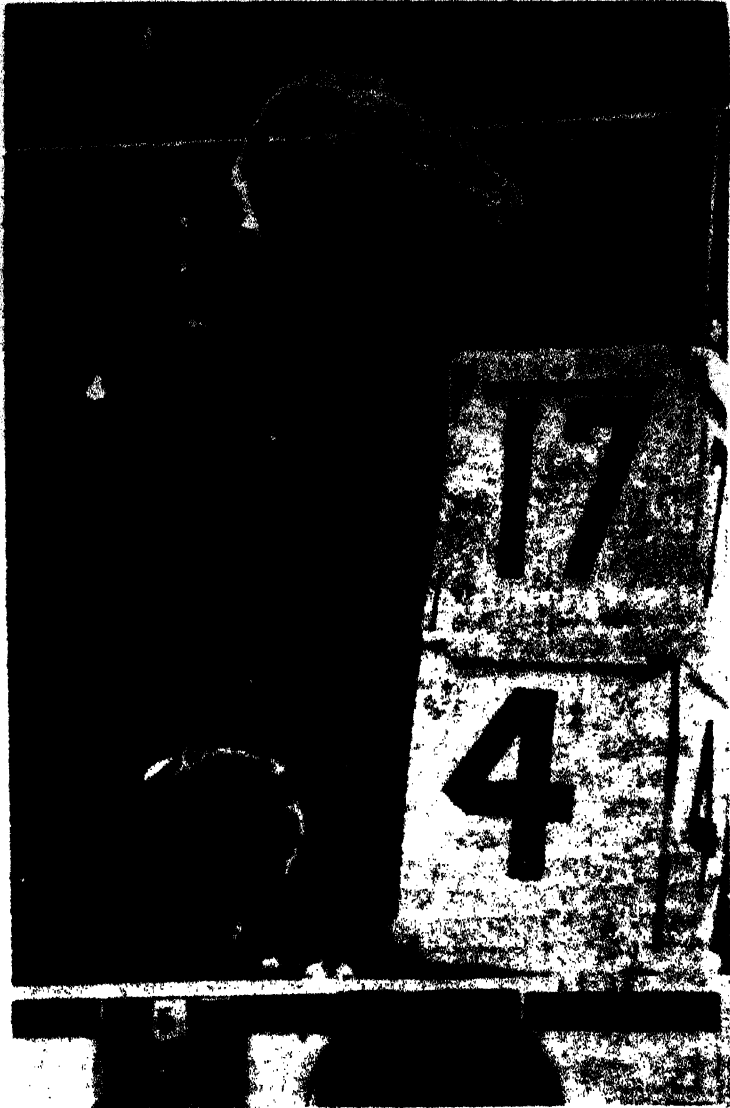
দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বব্ সিগ্রেন নিউইয়র্কের মিলরোজ বার্ষিক ইণ্ডোর ক্রীড়ানুষ্ঠানের পোলভল্টে ১৭ ফুট ৩½ ইঞ্চি উচ্চতা (৫·২৮৯ মিটার) অতিক্রম করে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-রেকর্ড (৫·২৫৭ মিটার) ভঙ্গ করেন।

রবিবার ছিল বিশ্রামের দিন। সোমবার—অর্থাৎ খেলার ৪র্থ দিনে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করে। দলের ৫৬ রানের মাথায় ১ম এবং ৮২ রানের মাথায় ২য় উইকেট পড়ে যায়। সূর্তি (৪৫ রান) এবং পতৌদি ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ৭১ রান সংগ্রহ করেন। চা-পানের নির্ধারিত সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ২০২ (৪ উইকেটে)। কিন্তু চা-পানের পরবর্তী খেলায় ভারতবর্ষের আরও ৪টে উইকেট পড়ে যায়। স্কোর বোর্ডে যেখানে এক সময়ে ভারতবর্ষের রান ছিল ৪ উইকেট পড়ে ২০১ সেখানে দেখা গেল ৮ উইকেটে ২৮৩ রান। নিউজিল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার গ্যারী বার্টলেট এইদিন ৩৮ রানে ৫টা উইকেট পান। তিনি তাঁর এক ওভারের বোলিংয়ে ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদি (৮৭ রান) এবং সহ-অধিনায়ক বোরদেকে (৩৩ রান) বোল্ড আউট করেন।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮৩ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় যখন চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয় তখন ভারতবর্ষ মাত্র ৬৯ রানে অগ্রগামী হয়েছে এবং হাতে জমা আছে মাত্র ২টো উইকেট।

পঞ্চম দিনে ভারতবর্ষ তার বাকি দুটো উইকেটের বিনিময়ে পূর্ব দিনের ২৮৩ রানের (৮ উইকেটে) সঙ্গে মাত্র ১৮ রান যোগ করেছিল—৩০১ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে নিউজিল্যাণ্ডের

শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বার্ষিক ১৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতার শীর্ষস্থানীয় তিনজন: প্রথম বিমল দাস (৬নং), ...র শচীন্দ্র ঘোষ (১১নং) এবং ...ণ দাস (৯নং)।

খেলায় জয়লাভের জন্যে ৮৮ রান করার প্রয়োজন হয়। বার্টলেট তাঁর এই দিনের তৃতীয় ওভারে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের শেষ দুটো উইকেট পান। ফলে তিনি দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩৮ রানে ৬টা উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। গ্যারী বার্টলেট হলেন নিউজিল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার। তিনি ভারতবর্ষের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলায় দলভুক্ত হননি। এই দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত হয়ে তিনি ক্রীড়ামহলে যথেষ্ট বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিলেন। কারণ, চলতি মরশুমে প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেননি এবং শেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬৬ সালের সিরিজে। আলোচ্য ২য় টেস্ট খেলায় বার্টলেটের ৩২টা 'নো-বল' হয়েছিল।

নিউজিল্যাণ্ড জয়লাভের প্রয়োজনে ৮৮ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। কিন্তু তাদের গোড়াপত্তন খুবই খারাপ হয়েছিল। দলের কোন রান যোগ হওয়ার আগেই ১ম উইকেট পড়ে যায়। ২য় উইকেট পড়ে ৩০ রানের মাথায়। বিভান কংডন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলেন এবং তিনিই দলের জয়সূচক রানটি সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত নিজস্ব ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন। কংডন প্রথমে দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় দলে স্থান পাননি। দলের অধিনায়ক সিনক্লেয়ার শেষ সময়ে দৈহিক অপটুতার কারণে খেলায় যোগদান না করায় কংডন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দলভুক্ত হন।

ক্রাইস্ট চার্চের উইকেটে সম্বন্ধে যাদের অনুমান ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইরকম উইকেটে ফাস্ট বোলারদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা খুব বেশী। টসে জয়ী হয়েও পতৌদি যে প্রথম ব্যাট করার দান ছেড়ে দেন, তার কারণ তাঁর দলের খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলার সম্পর্কে মজ্জাগত ভীতি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের এ-'জুজুর ভয়' কবে ঘাড় থেকে নামবে?

উল্লেখযোগ্য টেস্ট পরিসংখ্যান

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের বিগত ১১টি টেস্ট খেলার (১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী ২৭ পর্যন্ত) সূত্রে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা :

(১) ১৯৫৫-৫৬ সালের মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং পঙ্কজ রায় ৪১৩ রান সংগ্রহ করে প্রথম উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক রান করার বিশ্ব রেকর্ড করেন—এ রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে।

(২) ১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষ যে ৬টা ইনিংস খেলেছিল তার প্রতিটির এক ইনিংসের খেলায় ৪০০ রানের বেশী রান (তবে ৬০০ রান নয়) তুলেছিল—হায়দরাবাদের ১ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ৪৯৮ রান (৪ উইঃ ডিক্লেঃ), বোম্বাইয়ের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৪২১ রান (৮ উইঃ ডিক্লেঃ), দিল্লীর ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫৩১ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ), কলকাতায় ৪র্থ টেস্টের ২য় ইনিংসে ৪৩৮ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) এবং মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে ৫৩৭ রান (৩ উইঃ ডিক্লেঃ)। একটি টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলার প্রতিটির এক ইনিংসে ৪০০ রান করার রেকর্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষই প্রথম স্থাপন করে—এ রেকর্ড আজও অক্ষুন্ন আছে।

(৩) ১৯৬৫ সালে কলকাতায় দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের বি আর টেলর সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করেন এবং এক ইনিংসে ৮... রানে ৫টা উইকেট পান—খেলোয়াড়-জীবনে প্রথম সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নেমে সেঞ্চুরী এবং এক ইনিংসে ৫টা উইকেট পাওয়ার নজির টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই প্রথম।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ৫৩৭ রান (৩ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যাণ্ড : ৫০২ রান, ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে, ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ২৩১—ভিনু মানকাদ, মাদ্রাজের ৫ম টেস্টের ১ম ইনিংসে, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যাণ্ড : ২৩৯—গ্রাহাম ডাউলিং, ক্রাইস্ট চার্চের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে, ১৯৬৮

টেস্ট ক্রিকেটে নিউজিল্যাণ্ডের জয়

১৯৫৫-৫৬ সাল : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে শেষ ৪র্থ টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের ১৯০ রানে জয়। এই সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩—১ খেলায় 'রাবার' জয়ী হয়।

১৯৬১-৬২ সাল : দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বে-সরকারী টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের জয় ২টি—৩য় টেস্টে ৭২ রানে এবং ৫ম টেস্টে ৪০ রানে। এই সিরিজে ১ম ও ৪র্থ টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা জয়ী হয় এবং ২য় টেস্ট ড্র যায়। ফলে সিরিজ অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯৬৮ সাল : ভারতবর্ষের বিপক্ষে ২য় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের ৬ উইকেটে জয়।

পত্রিকার শতবার্ষিকী ক্রীড়ানুষ্ঠান

অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে কলকাতায় ময়দানে ফুটবল খেলার আয়োজনও হচ্ছে। পত্রিকা শতবার্ষিকীর এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে আছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলকে নিয়ে ত্রিদলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং বিভিন্ন বৈদেশিক ফুটবল দলের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা। এই উপলক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়ন, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, উত্তর কোরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে শক্তিশালী ফুটবল দল আসবার কথা চলছে।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

'শতবর্ষ পরে' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে

১৭ই ফাল্গুনের 'অমৃতে' (ইং ১লা মার্চ, ১৯৬৮) প্রখ্যাত অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'শতবর্ষ পরে' পড়লুম। এদেশে আজ নানা-রূপে ধরে পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার যে উল্টো স্রোত বইতে শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করায় আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধে তিনি যে সরলীকৃত বিশ্লেষণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার সামান্য একটু আপত্তি জানাবার আছে।

শ্রীরায়ের বক্তব্য থেকে মনে হয় যে, তাঁর বিশ্লেষণের মূল অনুমান হচ্ছে যে, ভারতের বর্তমান সমস্যার গোড়ার কথা হল আধুনিকতার সঙ্গে পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার সংঘাত"। এই সংঘাতে অগ্রগমনের শক্তিকে সহায়তার জন্য তিনি "আধুনিকতার বাহিনীতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ডাক দিয়েছেন দেশের কবি-মনীষীদের।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই, লড়াইটা কি শুধু তথাকথিত আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন-পশ্চাদগামিতার? তথাকথিত আধুনিকতার শিবিরেও কি মেকী নেই, ভেজাল নেই? যদি ধরেও নিই পুরাতনী-পশ্চাদগামিতার স্রোতকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে এ-দেশ সমর্থ হল, তবে আমরা কোন দিকে যাব? আধুনিকতারও কি নানা অর্থ নেই? আমাদের দেশে 'আধুনিকতা'র নামে আজ যা-কিছু চলছে, সবকিছুই কি আমরা আধুনিক বলে মেনে নেব?

আধুনিকতার নামে যাঁরা জয়ধ্বনি তোলেন, আজ তাঁদের আধুনিকতার অর্থ ভেবে দেখার সময় এসেছে। আধুনিকতা মানে কি নিছক নব্যতা বা নতুনত্ব? এ-শতাব্দীর ত্রিশ দশকে নাৎসীবাদ (বা তার ইতালীয় সংস্করণ ফ্যাসীবাদ) অবশ্যই আনকোরা নতুন ছিল, যেমন নতুন ছিল হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে যন্ত্রণাদানের পদ্ধতি। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর তো সেদিন নিছক নতুন বলেই রাষ্ট্রীয় মতবাদ হিসেবে নাৎসীবাদকে বা বন্দীশালার ক্ষেত্রে হিটলারী পদ্ধতিকে আধুনিক বা শ্রেয় বলে মেনে নেননি। আজকের উদাহরণ ধরলে, 'টুইস্ট' বা 'শেক' নিশ্চয়ই নাচ হিসেবে ভরতনাট্যমের থেকে নতুনতর; যেমন নতুনতর 'পপ মিউজিক'; ভারতীয় মার্গসংগীত, এমনকি রবীন্দ্রসংগীতেরও তুলনায়। তবে আধুনিকতার নামে লড়াই দিতে গিয়ে আমরা কি তাদেরই দলে ভিড়ব, আর সমস্বরে ধ্বনিসহযোগে বিদায় দেব ভরতনাট্যম, মার্গসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতকে? 'আকাশবাণী'র কলকাতা কেন্দ্রে পত্রাঘাত করে যেসব আধুনিক সংগীত-প্রেমী তরুণ রবীন্দ্রসংগীত ও মার্গসংগীতের পরিবর্তে 'আধুনিক সংগীতে'র সময়সীমা বাড়াতে চান, তাঁদের মনোরঞ্জন হয়তো করতে পারি, কিন্তু তাঁরাও পশ্চাদগামী-সনাতনপন্থীদের থেকে সংস্কৃতি বা কল্যাণের দিক দিয়ে কম বিপজ্জনক—এমন কথা-ই কি প্রখ্যাত রায়-মশাই আমাদের বলবেন?

আধুনিকতার অন্য আর এক অর্থ বলতে অনেকেই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে পাশ্চাত্যগামিতাকে ধরে থাকেন। কিন্তু পশ্চিমেও তো আজ নানা হাওয়া—তার কোনটা আধুনিক বলে শিরোধার্য করব? পূর্ব-ইয়োরোপের দেশগুলিও আমাদের কাছে পশ্চিমের অংশ, যেমন পশ্চিম হল ইংরেজদের দেশ বা আমেরিকা। যদি আধুনিকতাই আমাদের চলার পথের দিগ্দর্শক হয়, তবে কোনটা আধুনিক? যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, আমেরিকা বা পশ্চিম-ইয়োরোপই আধুনিকতার শেষ কথা—তবুও তো রেহাই নেই। আমেরিকাতেও তো আজ ভারতীয় মার্গসংগীত আর যোগ নিয়ে হৈ-চৈ চলছে। তবে কি আমরা একই সঙ্গে এল এস ডি আর যোগ, 'পপ মিউজিক' আর শাস্ত্রীয় সংগীত, হলিউডের নগ্ন কমার্শিয়ালিজম আর পশ্চিম-ইয়োরোপের সিনেমাজগতের নতুন পরীক্ষা সবই আধুনিক বলে 'পাত' ভরে নেব?

সংস্কৃতির কথা ছেড়ে দিয়ে যদি যন্ত্র-শিল্প-বিপ্লবকে আধুনিকতার জনক বলে মানা হয়, সেখানে আসি, তবে সেক্ষেত্রেও দেখি অন্তত এদেশে নির্বিচার অনুকরণ-প্রিয়তাকেই আধুনিকতার পোষাক পরিয়ে চালান হচ্ছে। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনকে dualistic পদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ করার কিছু কিছু চেষ্টা চোখে পড়ে। এরই একটি পদ্ধতি অনুসারে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রাচীন উৎপাদন-কৌশলনির্ভর ও আধুনিক উৎপাদন-কৌশলনির্ভর দুটি সেকটরের অস্তিত্ব বর্তমান ধরে নিয়ে, অর্থ-বিস্তারের জন্য আধুনিক উৎপাদন-কৌশলনির্ভর সেকটরের প্রসারের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এ-পদ্ধতি বহুলাংশে সঠিক হলেও, এর প্রয়োগকালে আমাদের শিল্পপতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকেরা বিচারবিহীন উৎসাহে পাশ্চাত্যের অগ্রসর দেশগুলির নব্যতম উৎপাদন-কৌশল, পরিকল্পনা পদ্ধতি ও যন্ত্রাদির নির্বিচার প্রয়োগকেই আধুনিকীকরণের সমার্থক বলে জেনেছেন—যদিও উপযুক্ত কারিগর, বাজার এবং আবহাওয়াগত পারিপার্শ্বিকের অভাবে তার ফল বহুলাংশে শোকাবহ হয়েছে।

আলোচনা বোধহয় দীর্ঘ হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু কোন সমস্যার অত্যধিক সরলীকরণে আমার ভীতি আছে, অতএব অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ অগ্রণী চিন্তানায়কদের দরবারে আমার আবেদন, আজকের ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে যে অসংখ্য পরস্পরনির্ভর স্রোতের টানাপোড়েন চলছে, সুষ্ঠু বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগে তার বিশ্লেষণ করে আমাদের পথ দেখান। যেহেতু আধুনিকতা নিঃসন্দেহে কাম্য, তা-ই আধুনিকতার নামে সবকিছু নব্যতার উৎপাত বা সমকালীনতাকেই প্রাধান্য না দিয়ে, অন্তর যাতে মঙ্গলকর ও কল্যাণগত পরিণামের ভিত্তিতে আধুনিকতার সংজ্ঞা বিচার করতে পারি, সেদিকেই তাঁরা আমাদের চিন্তা করতে প্রণোদিত করুন। অন্যথা যদি ভয়াবহ হয়, দাঁড়িয়ে যাওয়া চোখে উদভ্রান্ত হয়ে দৌড়বার চেষ্টাও তো সমভাবেই বিপজ্জনক। এদিকেই আমি লেখক ও পাঠক সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

সুরেশ ঘোষ
উপাধ্যায়, অর্থনীতি বিভাগ,
কল্যাণপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই জাতের পাখি প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার ৪০ সংখ্যার শ্রীঅজয় হোমের 'দুই জাতের পাখি' প্রবন্ধটি বেশ আকর্ষণী হয়েছে। অমৃতের পাতায় ইতি-পূর্বেও তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। সেসব আলোচনা নানা তথ্য সহযোগে ভালই হয়েছিল।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বনপুলী বংশের রামগাংরা এবং শিলাদিশী বংশজাত চোরপাখি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। স্বভাবতই তিনি বিস্তৃত আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেছেন। এই দুটি পাখি ভারতের পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য দেশভেদে এদের প্রকৃতি এক নয়। তবু মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে। এদের পরিচয় পাঠকের অনেক অজানা কথার উত্তর দেয়। এদের খালো দেশে দেশে কি রকম তফাৎ তা আমাদের সেই চিরাচরিত জিজ্ঞাসাকেই তুলে ধরে। পশ্চিমের পাখিরা শীতের ভয়ে থানা সঞ্চয় করে। আমাদের দেশের পাখিরা তা করে না। দেশগুলি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত বলেই আমাদের দেশের পাখিরা অনায়াসে আচরণ করে। আর এজন্যই দেখা যায় যে শীতে নানাদেশের পাখিরা এদেশে এসে আশ্রয় নেয়। এ শুধু আশ্রয়ের তাড়নাই নয়। এর পেছনে আছে খাদ্যের সন্ধান। এই দুটি কারণেই শীতে আমাদের দেশে পশ্চিমী পাখিদের মেলা বসে যায়। কিন্তু আমাদের দেশের পাখিদের এরকম অভ্যাস আছে কিনা সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লেখকের কাছে পাঠকের অনুরোধ তিনি আমাদের দেশের পাখির চরিত্র পরিচয়ও বিস্তৃত করুন।

উমা দত্ত
কলকাতা-১৮

অমৃত

সম্পাদকীয়

নবীন প্রাণের বসন্তে

বসন্তের আবাহন কী করে শুরু করা যায়, তা নিয়ে কবির মনে কত কথাই গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। এবারের বসন্তোৎসবের কথা তো চিন্তাই করা যায় না, চারিদিকে এত বিপর্যয়ের মধ্যে। বসন্তের চেয়ে বসন্তের টীকার কথা মনে পড়ে সর্বাগ্রে। তখনই হয়তো কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোনো ক্লান্ত সাংবাদিক বলে ওঠেন, এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে। কিন্তু এখানেই সব কথা শেষ হয়ে যায় না। বসন্ত ঋতুর একটা অনস্বীকার্য আকুলতা আছে। তার আগমনেতাতা রক্তের নেশা সবুজের বুককে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এবং তখনি কবি বলেন, ওরে ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে। এ শুধু কবির চোখ দিয়ে জগতকে দেখা নয়। জগতের যা সুন্দর, যা রমণীয়, যা স্নিগ্ধ, তাকে বরণ করাই বসন্তোৎসবের সার্থকতা। দোল-পূর্ণিমার দিনটি আমাদের কাছে বসন্তের চিরনবীন অতিথির মতো সমাগত। এই দিন সব প্রাণের কাছে পরম বাঞ্ছিত। শ্রীকৃষ্ণের হোলি খেলার দিন এটি। আমাদেরও মানসে আসে এই দিনে সবার রঙে রঙ মেশাবার আহ্বান। বসন্তের চিরজাগ্রত প্রাণ হোলির রঙে রঙে মিশে গিয়ে সকলকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। হোলি নবীনের, জীবনের, বসন্তের উৎসব।

এই দিনটি বাঙালীর কাছে আরও স্মরণীয় এই কারণে যে, এই দিনে নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু মহাপ্রভু ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন বাংলার এক সংকট সময়ে জন্মগ্রহণ করে। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ বাংলাদেশে প্রেমভক্তির বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন। তিনিও নবীন জীবনের উজ্জ্বল পথিকরূপেই এসেছিলেন আমাদের মাঝখানে। এ-জীবনের, এ-ভক্তির, এ-প্রেমের কোনো তুলনা হয় না। বৈষ্ণব কবিদের অমর লেখনীতে সুললিত ছন্দোবন্ধনে প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনদর্শনের অপরূপ ব্যাখ্যা আমরা পাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হয়েছিলেন জগতে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য। যে-ধর্মে উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, পুণ্যবান-পাপীর কোনো ভেদ নেই, সেই বিশ্বজনীন বৈষ্ণবধর্ম তিনি প্রচার করে গেছেন। তাঁর জীবন ও দর্শন বাংলার নব-জাগরণের মহৎ সূচনা। বৈষ্ণব ধর্ম থেকেই উৎসারিত অনুপম বৈষ্ণব সাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু জীর্ণ সনাতন ধর্মকেই নবীন প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাননি মহত্তর লক্ষ্যের দিকে, তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে তৈরী হয়েছিল সাহিত্যের এক নতুন ঐতিহ্য। চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যের রূপ, রস ও আস্বাদ এই মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের জীবনরস স্পর্শে অভূতপূর্ব সজীবতা লাভ করেছিল। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে জানাই প্রণাম।

এই বসন্তেরই জয়গান গেয়েছেন আমাদের কবি। জীর্ণ পাতার ডালে সবুজের অংকুরোদ্গম নিয়ে বসন্ত যখন আসে, তখন তাকে নতুন জীবনের অগ্রদূতরূপেই আমরা বন্দনা করি। ঋতুরাজের জয়গানে আকাশ তখন মুখরিত হয়ে ওঠে। ঝরাপাতার গান শেষ করে বসন্তে বসন্তে ডাক আসে কবির প্রতি। কবি তখন বলতে চান, "জগতটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে, তবু সে জীর্ণ নয়—আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান; অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকোচ্ছে, ডাল মরছে। জরা-মৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না।" যখন মনে হয়েছিল, শীত যেন প্রকৃতিকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তখনি বসন্তের অপরূপ সমারোহ আমাদের মনে নতুনের আস্বাদ জাগিয়ে দিল।

জাতির জীবনে যদি বসন্তোৎসবকে প্রতীক হিসেবে আমরা গ্রহণ করি, তখন আমরা দেখতে পাব যে, নিঃস্বতার মুহূর্তেই নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। এই বিশ্বাস না থাকলে বসন্তোৎসব কখনো সুন্দর সার্থক হতে পারে না। আমরা জানি, জীবনের চারিদিকে আজ এত অসুন্দরের আনাগোনা, এত দীনতা ও মালিন্য যে তার মধ্যে বসন্তোৎসবের কথা বড় বেমানান, বেসুরো মনে হবে অনেকের কানে। কিন্তু আমরা রিক্ত বলেই পূর্ণকে এমনভাবে চাই। আমাদের ব্যর্থতার অঞ্জলি দিয়ে সার্থকতাকে বরণ করি। হয়তো মানুষ এখনো আনুষ্ঠানিক সংস্কারবশেই হোলির উৎসবে মাতে, আবীর ছড়িয়ে দেয় প্রিয়জনের ললাটে। তবু নবীন প্রাণের এই বসন্তকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তাকে আমরা হৃদয়ের পদ্মাসনে আমন্ত্রণ জানাই। ব্যক্তির ও জাতির জীবনে নবীন প্রাণের প্রতীক বসন্ত সার্থকতায় দীপ্ত হয়ে উঠুক।

আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ,
বন্দে জগৎপ্রিয় করৌ করুণাবতারৌ॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণকলৌ
সমর্পয়িতু মুন্নতোজ্জ্বলরসাং
স্বভক্তি শ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরট-সুন্দর-দ্যুতি-কদম্ব-
সন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দন॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

শ্রীমতী রাধা প্রেমময়ী। শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিলাষ প্রকাশ করলেন লীলামূর্তিতে একাত্ম রূপ পরিগ্রহ করতে। শ্রীকৃষ্ণেরও ঐ বাসনা। শ্রীমতী রাধার বাসনা শুনে তিনি পরম সুখী ও উৎসাহিত হলেন। কিন্তু তিনি রইলেন নীরব কণ্ঠ। বিলাসান্তে উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় শায়িত হলেন। যোগমায়ার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ নিলেন। শ্রীমতী রাধা সেই রূপাবলোকন করলেন। এই লীলার পর শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হলেন নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে। সুপ্তা তু প্রেয়সী রাধাং পরম প্রীতি-সূচক, স্বপ্নেচ্ছাসীদ্ যথাপূর্ব

মুহেমোহেন জগদ্গুরুঃ।।
প্রেমালিঙ্গন যোগেন চাচিন্ত্য
শক্তি যোগতঃ।
রাধাভাব কান্তিযুক্তাং
মূর্তিমেকাং প্রকাশয়েৎ।।

স্বপ্নেতু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ।
অন্তোন্যভাবমাপন্নং স্বয়ং
কৃষ্ণ স্বরূপতঃ।।

—অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং
স্বয়োর্ভক্তি পরোন্মিতাঃ।
প্রেমভাবসমাপন্নো নিরুপাধিঃ স্বয়ং হরি।।

চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পর-তত্ত্ব,
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব।
নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়,
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞী।
প্রকাশ বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম,
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। তিনিই ধরাধামে চৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত। তাঁর অন্তরে কৃষ্ণ, বাহিরে গৌরবর্ণ। রাধা-ভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপে চৈতন্য। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রস এক দেহে আস্বাদনের জন্য চৈতন্য প্রভুরূপে আবির্ভূত।

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার,
যুগধর্ম নাম কৈল প্রচার।
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ,
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল প্রয়োজন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাঞী, ব্রজেন্দ্রকুমার,
রসময় মূর্তি-কৃষ্ণ—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার,
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।

রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। তিনি আবির্ভূত হয়েছেন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের আধিক্য দূর করতে।

সর্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এইতো নিশ্চয়,
হেনকালে আইল যুগাবতার সময়।
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন,
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ-আকর্ষণ।
পিতা-মাতা গুরুগণ আগে অবতারি,
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি।
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু,
তাহাতে প্রকট হইল কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥

মহাপ্রভু অনুরোধ লীলা-মাধুর্য বিতরণের জন্য নবদ্বীপে শচীদেবীর গর্ভে

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব

দেশবন্ধু পার্ক

অনুষ্ঠান সূচী

২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭৪ (ইং ১৩ই মার্চ, ১৯৬৮) বুধবার :

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবাহন-অভিষেক-অর্চনা।

সন্ধ্যা ৭টায়—অধিবাস কীর্তন।

●

৩০শে ফাল্গুন, (১৪ই মার্চ), বৃহস্পতিবার :

প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকায়—মঙ্গলারাত্রিক অন্তে ষোল প্রহরব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ আরম্ভ।

সন্ধ্যা ৬টায়—মহতী জনসভা :

সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী; প্রধান অতিথি—শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী; উদ্বোধক—প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী; মঙ্গলাচরণ—শ্রীমৎ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী; স্বাগত ভাষণ—প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী; বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস; শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; উদ্বোধন সঙ্গীত—শ্রীমাধবী দত্ত; ধন্যবাদ জ্ঞাপন—শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ। রাত্রি ৮ ঘটিকায়—বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দের কীর্তন ও ভজন।

●

১লা চৈত্র (১৫ই মার্চ), শুক্রবার :

বৈকাল ৫টায়—শ্রীরাধারমণ সাংখ্যানন্দজী কথক সম্রাট কর্তৃক ভাগবত পাঠ, বৈকাল ৬টায়—বাউল গানে—শ্রীঅমর পাল ও সম্প্রদায়। ভজন—শ্রীবাণী ঘোষ। রাত্রি সাতটায়—শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের সভ্যবৃন্দের "শ্রীনিমাই-সন্ন্যাস" নাট্যাভিনয়।

২রা চৈত্র (১৬ই মার্চ), শনিবার :

বৈকাল পাঁচটায়—শ্রীরাধারমণ "কীর্তন সমাজ কর্তৃক "শচীর-নিমাই" (লীলাকীর্তন) কীর্তন। সন্ধ্যা ৭টায়—হাওড়া নাট্যচক্রের "অমর নিমাই" গীতিনাট্যাভিনয়।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ,
যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার।।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা,
যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়,
তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুই যাই বলিহারি।

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে,
নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সেজন ভকতি-অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে,
নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌর মণ্ডলভূমি,
যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস।।

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭১)

রূপ গোস্বামী

(ক)

রামকেলিতে প্রভুর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও আরেক রকম হয়ে গিয়েছে।

চাকরিতে আর স্পৃহা নেই। চাকরির ফলে বিস্তর পয়সা হয়েছে। বিষয়ত্যাগ না করলে মনে-প্রাণে ভজন করা অসম্ভব। কিন্তু এই বিষয় নবাব বাজেয়াপ্ত করে এও অসহ্য।

সনাতনের সঙ্গে-সঙ্গে রূপও কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করল যাতে অচিরে চৈতন্যচরণ পেতে পারে।

নবাবের কাছে ছুটি চেয়ে ছুটি পেল রূপ। নৌকাতে করে অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে নিজের গ্রামে, মুর্শিদাবাদ জেলার মাড়গ্রামে, এসে পৌঁছুল। এত ধন নিয়ে সে কী করে, কাকে দেয়? অর্ধেক দিয়ে দিল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের সেবায়, বাকি অর্ধেকের অর্ধেক দিল আত্মীয়-কুটুম্বকে, আর অবশিষ্ট বিশ্বাসী এক ব্রাহ্মণের কাছে গচ্ছিত রাখল যদি রাজদণ্ডে জরিমানা দিতে হয়। সনাতনের জন্যে গৌড়ে এক মুদির দোকানে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছে।

নীলাচলে রূপ লোক পাঠাল প্রভু কখন বৃন্দাবন রওনা হন আমাকে খবর দেবে। আমি অপেক্ষা করছি।

রূপ সনাতনকে চিঠি লিখে পাঠাল: আমি আর অনুপম বৃন্দাবনে যাচ্ছি প্রভুর চরণদর্শন করতে। তুমি যেমন করে পারো চলে এস। মুদির কাছে দশ হাজার টাকা রেখে এসেছি, তাই মুক্তিপণ দিয়ে বেরিয়ে এস কারাগার থেকে।

প্রয়াগে এসে শুনল প্রভু এখানে আছেন। শুনে আনন্দের তরঙ্গ জাগতে লাগল। আরো শুনল প্রভু চলেছেন বিন্দু-মাধবদর্শনে। দু ভাই রূপ আর অনুপম চলল এগিয়ে। দেখল পথে লক্ষ লোকের জনতা। কেউ নাচছে গাইছে কেউ-কেউ বা কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলে পথে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ভিড় থেকে দু ভাই সরে দাঁড়াল। তারা দীন পতিত, তারা দীন অকিঞ্চন।

দক্ষিণ ভারতের এক বিপ্র প্রভুকে তার গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিল। সেইখানে রূপ আর অনুপম হাজির হল। দশনে দুই গুচ্ছ তৃণ ধরে দুজনে প্রভুর উদ্দেশে দূর থেকেই দণ্ডবৎ হল।

প্রভু প্রসন্নমুখে বললেন, ওঠো, এস আমার কাছে। কৃষ্ণের করুণা অপরিসীম। তোমাদের বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন। চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও আমার অপ্রিয় যদি সে ভক্তিহীন হয়, আর চণ্ডালও আমার প্রিয় যদি সে আমাতে ভক্তিমান থাকে। সুতরাং সে ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র মনে করে দান করবে, তার বস্তুই গ্রহণ করবে, তাকে পূজা করবে আমার মত। বলে প্রভু দু ভাইকে আলিঙ্গন করলেন, চরণ রাখলেন মাথার উপরে। তোমরাও যে ভক্তিধনে ধনী, আমার হৃদ্‌গ্রাহ্য।

দু ভাই প্রভুকে স্তুতি করল। কৃষ্ণ-প্রেমদাতা মহাবদান্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরচন্দ্র কৃষ্ণকে প্রণাম করি।

প্রভু বললেন, সনাতনের কথা বলো।

সে তো রাজগৃহে বন্দী হয়ে আছে। জানালে রূপ, তুমি যদি উদ্ধার করো তবেই তার মুক্তি সম্ভব। নচেৎ নয়।

প্রভু বললেন, ভয় নেই, শিগগিরই সনাতন মুক্ত হবে। মিলন হবে আমার সঙ্গে।

দাক্ষিণাত্য বিপ্রের গৃহেই দু'ভাই স্থান পেল। তাদেরকে প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র এনে দিল বলভদ্র।

ত্রিবেণীসঙ্গমের কাছেই প্রভুর থাকবার জায়গা ঠিক হল। দু ভাই রূপ আর অনুপম কাছেই বাসা নিল। বিপরীত তীরের আড়াইল গ্রাম থেকে দেখা করতে এল বল্লভ ভট্ট। যার এত ভাবভক্তির কথা শুনি তাকে দেখে আসি চলকে।

দেখতে এলেই চক্ষুস্থির। কে ঐ সানন্দসন্দের লাবণ্যপ্রদীপ! তখুনি দণ্ডবৎ পড়ল বল্লভ। প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। সুরু হল কৃষ্ণকথা, আর কৃষ্ণকথা সুরু হলে সাধ্য কী প্রেম সংবরণ করো!

প্রভুকে বল্লভ নিমন্ত্রণ করল নিজগৃহে।
এই দুই ভাইকে দেখুন। রূপ আর অনুপম। অনুপমেরও আরেক নাম বল্লভ।
বল্লভ এগিয়ে এল, দু'ভাই দূরে পালাল। বললে, আমরা অস্পৃশ্য পামর, আমাদের ছুঁয়ো না।

সে কী কথা! বল্লভ তাকাল প্রভুর দিকে।

পাণ্ডিত্যাভিমানী বল্লভের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করবার জন্যে প্রভু বললেন, হাঁ, ঠিকই বলেছে, তুমি বৈদিক যাজ্ঞিক কুলীন, তুমি এদের ছুঁয়ো না, এরা হীন জাতি।

হীন জাতি! বিস্ময় মানল বল্লভ: কিন্তু এদের মুখে যে কৃষ্ণনাম নর্তন করছে। এরা অধম নয়, এরা সর্বোত্তম।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। বললেন প্রভু, যার ভক্তি নেই তার জপতপ শাস্ত্রজ্ঞান মৃতদেহের অলঙ্কারের মতই অসার। নীচকুলে জন্মেও যে ভক্ত, তার ভক্তির দীপ্তাগ্নি সমস্ত কলুষ দগ্ধ করে দিয়েছে। সে পণ্ডিতজনেরও বন্দনীয়।

নির্জনতার আশায় প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে এলেন। রূপকে নিলেন সঙ্গে, শিক্ষা দিতে বসলেন। কৃষ্ণতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত। রামানন্দের সঙ্গে বসে যত মীমাংসা করেছিলেন—সমস্ত। পরে বললেন, এবার বৃন্দাবনে যাও।
শোনো তবে ভক্তিরসের লক্ষণ।

ভক্তিরস সিন্ধু, পারাপারশূন্য, গম্ভীর। তোমার আস্বাদের জন্যে শুধু একবিন্দু উপহার দিচ্ছি। কেশাগ্রের শত ভাগকে শত শত বার বিভাগ করলে যে বস্তু হয়, জীব সেই সূক্ষ্মতম বস্তু, সংখ্যায় অন্তহীন। স্বীয় কর্মফলে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করছে। সে ঈশ্বরের শাসনাধীন। ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য। জীবের মধ্যে আবার দুরকম ভেদ—স্থাবর আর জঙ্গম। যারা অচল, যেমন বৃক্ষ, তারা স্থাবর জীব আর যারা সচল তারাই জঙ্গম জীব। জঙ্গমে আবার তিন রকম ভেদ—জলচর, স্থলচর, তির্যক। মানুষ স্থলচরের মধ্যে। সংখ্যা জীবসমষ্টির তুলনায় অত্যল্প। আবার মনুষ্যের মধ্যেও কত কম লোক বেদনিষ্ঠ। যারা বেদনিষ্ঠ অর্থাৎ যারা বেদ মানে, তাদের মধ্যে অনেক শুধু মুখে মানে, প্রাণে মানে না, অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম করে না, বরং বেদনিষিদ্ধ পাপ কর্ম করে। যারা বেদবিহিত কর্ম করে তাদের মধ্যে অনেকেই না কজন? কোটি কর্মনিষ্ঠের চেয়ে একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী জীব-ব্রহ্মের অভেদ মানলেও ভক্তিহীন থাকতে পারে না। জ্ঞানীও ভক্তির জোরেই ব্রহ্মের সাযুজ্য চায়।

কোটি-কোটি জ্ঞানীর মধ্যে যদি একজন মাত্র মুক্ত হয়! আর কোটি মুক্তদের মধ্যে যদি একজন মাত্র কৃষ্ণভক্ত হয়! তা হলেই দেখ কৃষ্ণভক্তের সংখ্যা কত সামান্য। সুতরাং এক কৃষ্ণভক্ত!

কৃষ্ণভক্ত কী রকম?

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তার নিজসুখের বাসনা নেই। তাই সে শান্ত, অচঞ্চল।

একটি প্রাচীন চিত্র : ছয় গোঁসাই

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী।

থেকে যায় কোথাও না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথাও কখনো যাননি।

এর তাৎপর্য কী?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনেই স্থায়ী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলায় শুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি-কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে শুধু বৃন্দাবনই বর্ণিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ তখন [illegible] প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্নভাবে একই আদেশ করছেন।

তাই হবে। দুই ভাগে ভাগ করব নাটককে। নান্দী-প্রস্তাবনাও আলাদা হবে। বৃন্দাবন নিয়ে লিখব 'বিদগ্ধ মাধব' আর দ্বারকা-মথুরা নিয়ে লিখব 'ললিত মাধব'।

কিন্তু রথাগ্রে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু এ কোন শ্লোক আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ—' সে আমার কৌমারহরণ করেছিল সেই আমার মনোনীত বর। সেই চৈত্র রাত্রি মধুযামিনী উপস্থিত। সেই মালতী উন্মীলিত। সুরভিত সেই কদম্বকাননবায়ু। আমিও সেই নায়িকা সমুৎসুকা। তবুও আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে রেবাতটের বেতসী তরুতলের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু যেন এই শ্লোক এক আবরণের মধ্যে পড়লেন যার অর্থ রূপ সহজেই বুঝতে পারল। সে একটি সমার্থক শ্লোক রচনা করল, তারপর সেটি তালপাতায় লিখে কুটিরের চালায় গুঁজে রেখে সমুদ্রস্নান করতে গেল।

কুটিরে প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। চালের মধ্যে গোঁজা তালপাতায় নজর পড়তেই সেটি টেনে আনলেন। দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক! প্রভুর যে গোপনভাব শুধু স্বরূপ দামোদর জানে তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে রূপ এসে প্রণত হতেই প্রভু তাকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয়, স্নেহের চড়। বললেন, তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমায় কে বলল? কে বোঝাল?

স্বরূপকে পড়তে দিলেন।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতস্ত্র—হে সহচরি, আমার সেই দয়িত কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন আমিও সেই রাধা, আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, তবুও আমার চিত্ত চঞ্চল কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনিতে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনের অরণ্যের জন্যে উৎকণ্ঠিত।

প্রভু রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করলেন। কী করে জানতে পারলে আমার নিগূঢ় তত্ত্ব?

শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে। বললে রূপ, তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব বোঝে কার সাধ্য? শ্লোক উচ্চারিত হোক, যথার্থ প্রকাশ হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপা দরকার।

আরেক দিন, নাটক লিখছে রূপ। প্রভু পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, কী লিখছ? বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর! যেন মুক্তোর সার। প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন লিপি তেমনি রচনা। কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে—'

'কৃ' আর 'ষ্ণ' এই দুটি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি বর্ণ যদি একত্র হয়ে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত জিহ্বায় এই নামের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত-শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের শত-শত কাজ বিকল পড়ে থাক।

তার মানে এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধরণীর অযুত শ্রবণের জন্যে অসংখ্য কান দাও। ইন্দ্রিয়সমূহ যতই প্রবল হোক, নামের সামনে তাদের অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত, নিষ্ক্রিয়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নামসমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মেরে তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণনাম কোন মধুতে প্রস্তুত।

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।

(ক্রমশঃ)

মহাপ্রভুর মিলনযাত্রা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমে জগাই-মাধাই'র হৃদয়-পরিবর্তন।

—হঠাৎই এভাবে পড়ে গিয়ে প্যারা-লাইজড্ হয়ে গেলেন?

—হ্যাঁ, হঠাৎই।

—মানুষের কথা বলা যায় না, সুনন্দর দিকে ফিরে সুনন্দ ভ্রূ কুঁচকে বলল, আর যা ভেজাল খাওয়া-দাওয়া জুটছে আজকাল কপালে। এই তো আমার নতুন মাসীমার বর—আই মীন—মেসোমশাই মাসখানেক আগেই হঠাৎ একটা স্ট্রোকে—

—ওটার অবশ্য অন্য কারণ। রুনো শুধরে দিল।

—তা বটে। ও'র ঐ ব্যবসার গোল-মালটাই কাল হল। খুব চিন্তিত ভঙ্গি করল সুনন্দ।

—তুমি বোস, আমি দু' কাপ কফি করে আনি। সুনন্দর কাঁধে মৃদু টোকা দিল রুনো। নির্মলাকে বলল, তুমি খাবে কফি?

—না, না। নির্মলা জোরে মাথা নাড়ল।

রুনো ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে সুনন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইল। গুনগুন করল গলায়—আমার এই দেহখানি তুলে ধরো। খুব নীচু অথচ স্পষ্ট অক্ষরে। কি চমৎকার গলা। আর গানের কথা। ঠিক বোঝা যায় না তবু যেন বুকের মধ্যে কোথায় ঘা দেয়। দুর্বোধ্য কষ্টে বাজতে থাকে।

—আমি যাই এবার। নির্মলা তৎপর হল।

—বসুন না। সুনন্দ বলল খাতির করে।

হাতের পাতা ঘেমে উঠেছিল নির্মলার। বুকের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম কয়েকটি স্নায়ু কেঁপে উঠছিল। কেন এমন হচ্ছে। রুনো তো কত সহজে হাসছে খেলছে ওর সঙ্গে। মনেই হচ্ছে না কোন ছেলের সঙ্গে আলাপ করছে। কেমন অনায়াসে কাঁধটা ছুঁয়ে দিল ওর।

—আপনি বোধহয় খুব লাজুক। কথা বলছেন না।

লাজুক। নিজের মনেই হাসল নির্মলা। একটু পরেই রুনোকে আড়ালে যদি শুধোও, শুনবে'খন ওর মুখের কথা। রুনো নিশ্চয় বলতে বলতে হাসিতে ছটফটিয়ে উঠবে।

—লাজুক কেন হব। নির্মলা তাকাল স্পষ্ট করে। আর এই প্রথম দেখল ছেলেটি কত সুন্দর। অনেকদিন আগে একটা সিনেমা দেখেছিল। তাতে যে সুন্দর ছেলেটি অভিনয় করেছিল, তাকে আজো মনে রেখেছে নির্মলা। সুনন্দর হাবভাব সাজ-পোষাক অনেকটা সেরকম।

আর এ-কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠল নির্মলার ভেতরটা, ছুটে পালাতে চাইল ওর দৃষ্টির সামনে থেকে। মনে মনে খুব গোপন ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে পাশে রুনোদের শোবার ঘরের আলমারির বড় আয়নাটার সামনে উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার দাঁড়ায়। তারপর হয়তো তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হবে।

—আচ্ছা, এই আপনার বাবা অসুখে পড়ার পর থেকে আপনাদের সংসারে খুব অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই না?

খুব সরল খুব অন্তরঙ্গভাবে প্রশ্ন-গুলি করছিল সুনন্দ এবং সেজন্যেই নির্মলা ওকে এড়িয়ে যেতে পারছিল না।

—হ্যাঁ, খুবই। মাকে পরের বাড়ী খেটে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতে হয়। বলতে বলতে ওপাশে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল নির্মলা, যেন তাদের এমন হীনতা আর দৈন্যের কথা সুনন্দর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলা যাবে না। মুখে ক্ষোভের শব্দ করল সুনন্দ। গলাকে আরও কোমল করে বলল,

—আপনার ভাইরা এখনো কিছু কাজ করে না, না?

—করে। বড় ভাইটি। আমার থেকে বছর-তিনেকের ছোট। নতুন একটা কাজে ঢুকেছে। তা সে করলে কি হবে, এমনই নষ্ট হয়ে গেছে যে, বাড়ীর সঙ্গে তার শুধু খাওয়া আর ঘুমের সম্পর্ক। আর ছোট ভাইটি খুবই ছোট। কর্পোরেশন ইস্কুলে পড়ে।

সুনন্দ আর কথা বলল না। অনেকক্ষণ সমস্ত ঘরে নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার ভার ছড়িয়ে রইল। তারপর কফি নিয়ে রুনো ঘরে ঢুকতেই নির্মলা বলে উঠল—আমি এবার যাই, কেমন?

সুনন্দকে আর বলল না। কারণ, সুনন্দ আরও কিছুক্ষণ থাকতে বললে সে-প্রলোভন দমন করা অসাধ্য হবে এই ভেবে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল নির্মলা। নীচে তখন দালান উঠোন ঘর সবকিছুর ওপর ভারী অন্ধকারের পর্দা ঝুলছিল। কেমন যেন বিবর্ণ প্রেতায়িত মনে হচ্ছিল সবকিছু। কোনক্রমে নিশ্বাস চেপে ঘরে এল নির্মলা। কে জানে নিবারণ উঠে ডেকেছিল কিনা, এক টুকরো আলোর জন্যে কাতরোক্তি করেছিল কিনা। নির্মলা অন্য কথা ভাবতে ভাবতে আলো জ্বালল। চৌকিতে লীন হয়ে থাকা অস্তিত্বে একটু স্পন্দন জাগল যেন। একবার তাকিয়ে দেখল নির্মলা। কিন্তু ডাকতে বা কোন কথা বলতে তার এখন প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো। সুনন্দ এখনো ওপরে আছে। ঝরঝর করে স্ফটিকস্বচ্ছ বৃষ্টি পড়ার মত অনর্গল হাসছে, কথা বলছে। কে জানে। কে জানে, হয়ত নির্মলাদের কথাই চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এখনো আলোচনা করে যাচ্ছে। কোথাকার কোন সম্পন্ন ঘরের আদুরে সুন্দর আধুনিক ছেলে, সে কবে যেন নির্মলাকে দেখেছে, তাদের কথা শুনেছে এবং হুবহু মনে করে রেখে দিয়েছে। আমার এই দেহখানি—বুকের মধ্যে একটা কেমন করা ভাব নির্মলাকে উদাস করাচ্ছিল। চোখের তারায় অন্য রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে নির্মলা সেই ক্লিন্ন মলিন জীর্ণ ঘরে খানিকক্ষণ আপন আবেগে পায়চারী করল, তারপর হঠাৎ বাইরে এসে দুমদাম দুপদাপ করে উনুন ধরাতে বসল। আরও নির্মলাকে রান্না করতে হবে, এই চুলোর সংসারে হাঁ-মুখগুলিকে ভরাট করবার জন্য। কারো কারো অদৃষ্টে এমন হয়, নির্মলা ভাবল, এমনি অনন্তকাল ধরে খাওয়া প্রেতিনীর মত মরণের অভিশাপে পচে মরতে হয়। নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভিতর থেকে আগুনের কিছু হলকা বেরিয়ে আসতে আসতে যেন ক্রমশ তার শরীরটাকে ভারহীন লঘু করে ফেলছিল, যেন এখুনি যে-কোন মুহূর্তে মাটিতে নিরালম্ব হয়ে পড়ে যেতে পারে। আর কোনদিন উঠবে না, আর কোনদিন এই লাঞ্ছনাজনক উঞ্ছ জীবন যাপন করতে আসবে না। তাই যেন হয়, হে ঈশ্বর। উপরে উঠোনের ফোকরে মুখের তারাজ্বলা কালচে আকাশের দিকে তাকাল নির্মলা। ধোঁয়ায় জ্বালা-করা চোখ থেকে অজস্র জল কাপড়ে মুছতে লাগল। তারপর উনুন ধরে গেলে গনগনে আগুনের সামনে বসে রান্না করতে করতে অকারণ মনে মনে দগ্ধ হতে থাকল।

রাত ঘন হয়ে আসতে একে একে ভাই দুজন এবং মা ঘরে ফিরল। বড়ভাই কলতলায় চলে গেল হিন্দী গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। ছোটটি একবার রান্নার দিকে তাকিয়ে আশ্বস্ত হয়ে ছেঁড়া পাজামার বল নিয়ে লোফালুফি শুরু করে দিল। রোজের মত ক্লান্তিতে অস্ফুট কিছু কাতরোক্তি করল মা। আঁচল বিছিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল। মায়ের ঐ পরিশ্রান্ত ছন্নছাড়া চেহারার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল না নির্মলার। যেন খুব মন দিয়ে দ্রুত রান্না করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে মা ফিরে তাকাল চৌকির দিকে। হ্যারি-কেনটা নীচে থাকায় ওর ওপরটা অস্পষ্ট আবছায়া জমাট বেঁধে ছিল। শোয়া অবস্থাতেই খানিকটা পিছলে ওর দিকে সরে এল মা।

—এখন এরকম চুপচাপ শুয়ে রয়েছে যে? শরীর ভাল আছে তো?

—হুঁ। নির্মলা কড়ায় ডাল ছাড়ল শব্দ করে।

মা এবার উঁচু হয়ে বসে আলোটা তুলল। নিবারণ জেগেই ছিল।

—ওষুধ খাইয়েছিলি?

না। মনে মনে জিভ কাটল নির্মলা। সন্ধ্যে থেকে একবারো স্মরণ হয়নি। অথচ ওষুধটি অত্যাবশ্যক। ওপাশে নিবারণ স্বচ্ছ নিরুত্তর। সাহস করে সত্যি কথাটা বলতে পারল না নির্মলা।

—হ্যাঁ দিয়েছি। নির্মলা অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভঙ্গি করল।

হ্যারিকেন তখন উঁচু থাকায় নিবারণের মুখের ওপর পাণ্ডুর লালচে খানিকটা আলো। আড়চোখে এক পলক তাকিয়ে নির্মলা দেখল নিবারণ ঠান্ডা অচঞ্চল দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। বুকের মধ্যেটা শিরশির করে উঠল নির্মলার। যেন চোখদুটো কোন পৃথিবীর অনেক ওপারের প্রেতলোক থেকে তার দিকে নিষ্পন্দ, আশীর্বাদ বর্ষণ করে যাচ্ছে।

—ঠিক বলিনি, মা?

—তোর খাবার ইচ্ছে হয়েছে, বলেছিল। মা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল, কান্তি তো আমাদের পর নয়, যে লজ্জা করতে হবে।

কান্তিও হাসল।—আচ্ছা কটা চপ খেতে পারো দেখছি।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল কান্তি। বাইরে রোদের রঙ ফিকে হয়ে আসায় ঘরের মধ্যে, কড়িকাঠে, বালিখসা দেয়ালে আস্তে আস্তে ধূসর ছায়া জমতে শুরু করেছিল। নির্মলা ঘরের জিনিসপত্রগুলি একটু এদিক ওদিক গুছোবার চেষ্টা করল। তারপর মায়ের চোখে চোখ রেখে হেসে ফেলল।

—তোকে না কতবার বলেছি এমন রঙওঠা ছেঁড়া কাপড়টা পরবি না আর। মা ওকে শাসন করল।

—কি হয়েছে? নির্মলা ঔদাসীন্য দেখাল, আমাকে এতেই মানায়।

—আহা। মা আদরের স্বর ফুটিয়ে গলায়, মেয়ে কি আমার খারাপ? কেমন ফর্সা রঙ।

নির্মলা হি-হি-হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল। নিজেকে ব্যঙ্গ করেই। নিবারণের মাথার নীচের বালিশ চাদর সব গুছোতে লাগল।

—যে যেমনই হোক, দুনিয়ার মেয়েরা সব ফিটফাট পরিষ্কার থাকে। মায়ের ক্ষোভটা একটু একটু করে প্রকট হচ্ছিল।

—দুনিয়ার মেয়েরা লেখাপড়া করে, ইস্কুল কলেজে যায়, বেড়ায়, সাজগোজ করে, তাদের সঙ্গে আমার মেলে না।

খুব মৃদু কথাটায় নির্মলা চুপ করিয়ে দিল মাকে। ঘরের মধ্যে একটা বুক-চাপা, গুমোট ভাব আবছায়া অন্ধকারের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। ঘরের কোণে বিবর্ণ চৌকিটা এবং তার ওপরে নিবারণের অস্তিত্ব ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। এখনো আলো জ্বালার সময় হয়নি। নির্মলা কলঘর থেকে মুখে চোখে জল দিয়ে এল। কাপড়ের আঁচলে পরিষ্কার করে মুখ মুছতে মুছতেই কান্তি এসে গেল জুতো মস্‌মসিয়ে। বড় ভিজে ভিজে ঠোঙাটা এগিয়ে ধরল,—নাও, গরম ভেজে দিল একেবারে।

নির্মলার দিকে হাত বাড়িয়ে যেমন এক রকম অধিকারবোধের মত করে বলল কথাটা। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল নির্মলা, তারপর লঘু হেসে ঠোঙাটা নিল। বাবার কাছে এগিয়ে গেল। নিবারণের মুখ বন্ধ চোয়াল শক্ত। আবছা থাকার দরুণ কান্তি নিবারণের মুখ দেখতে পেল না কিন্তু নির্মলা দেখল। ঝুঁকে পড়ে একটুকরো চপ মুখের কাছে ধরে অনুরোধের সুরে বলল—খাও।

লোভনীয় খাদ্যবস্তুকে আর অবহেলা করল না নিবারণ। খেতে লাগল নির্মলার হাত থেকে। তার খাওয়ার পর ওরাও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। খেতে খেতে কান্তি বলল,—নির্মলার চেহারাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

মা সস্নেহে তাকাল নির্মলার দিকে। কান্তিকে শুনিয়ে আক্ষেপ করল,—সারাদিন খাটুনী, রুগীর সেবা, তারপর পেটে তো ভালমন্দ কিছু পড়ে না।

তুমি থামো তো মা, নির্মলা ধমকায় দিল, আমি বেশ আছি। দেখবে আমার গায়ে কত জোর?

—না থাক। কান্তি ঠাট্টা করে উঠল, ঐ কেঠো হাতের যা খেলে যে কেউ কাত হয়ে পড়বে।

নির্মলা আহত হল কিনা বোঝা গেল না। ওর মুখ সামান্য ম্লান দেখাল।

—ওর জন্যে একটু চেষ্টা-চরিত্র কর না বাবা। ঘর-সংসার ওকে নইলে চলে না, তবু তো পার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

—ওর বিয়ের কথা বলছেন? আচ্ছা সে-রকম খোঁজ পেলে বলে দেখব'খন। কান্তির গলা উদারতায় ভারী হল।

নির্মলার মা একটু থতিয়ে গেল। কান্তি জিজ্ঞাসা করল,

—ওর কোন ফটো তোলা নেই, না? থাকলে সুবিধে হত।

—কে আর তুলছে। নির্মলার মা হতাশায় ভঙ্গি করল।

—চলুক না আমার সঙ্গে তুলে দিচ্ছি দোকান থেকে।

নির্মলার মায়ের চোখ উৎসাহে ঝকঝকে দেখাল।

—বেশ তো আজই যেতে পারে। আজ তো আমি ঘরে আছি। নির্মলা হ্যারিকেন জ্বালাচ্ছিল পেছনে ফিরে। বলল,

—আজ কাজে বেরোবে না তুমি?

—না, ওদের বাড়ীর সকলের নেমন্তন্ন। রান্নার পাট আজকে নেই সেজন্য।

—ভালই তো হল। যাবে নাকি, নির্মলা? কান্তি নির্মলার অস্পষ্ট লম্বাটে অস্তিত্বের দিকে তাকাল। নির্মলা উত্তর দিল না। হ্যারিকেন উঁচু করে তাক থেকে নিবারণের ঔষধ পাড়ল। অনুজ্জ্বল আলোয় কান্তির গোল মুখ পুষ্ট গাল ক্রমশ তেলে চকচকে লাগছিল। নির্মলার সপ্রশ্নতায় দৃষ্টি সরিয়ে কান্তি বলল,

—সারাদিন এই খুপরী ঘরে বসে থাকো, চলো না একটু বেড়িয়ে আসবে।

নির্মলা তবু মৌন। আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। মা বিরক্ত হল।

—ও আবার কি। যাবি তো যা না, এত করে বলছে যখন।

—না। নির্মলা এক কথায় উত্তর দিল। ওর সমস্ত সত্তা ছেয়ে বোবা কান্নার অনুভূতি নামছিল। কান্তির চকচকে মুখ, ঘূর্ণমান চোখ, সটান চাপা চুলের মাথা গোলগাল গড়ন কোনদিনই পছন্দ হয় না ওর। লোকটার দিকে তাকালেই মনে হয় একটা শান্ত সাপ, সমস্ত শরীর অস্তিত্ব ভরে তার চাহিদা, সে যে কোন পথ থেকেই হোক না কেন।

—যাবি না? মার ভঙ্গিতে ভর্ৎসনা উষ্মা সব একসঙ্গে ঝরে পড়ল।

—না, আমার ভাল লাগে না। জবাব দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নির্মলা। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা বিরাজ করল কিছুক্ষণ। তারপর কান্তি উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ছাড়ল শরীরে।

—যাই তাহলে, মাসীমা?

সেই স্বল্পালোক ওষুধটা—প্রায় চীৎকার করে প্রাণপণে যেন নির্মলার মা পুরোনো আন্তরিকতার দাবীটুকু বজায় রাখতে চাইল।

—আমি খুবই চেষ্টা করব। যত তাড়াতাড়ি পারি।

আশ্বস্ত করার মত করে বলল কান্তি তারপর বেরিয়ে গেল।

কদিন থেকেই নিবারণের যেন কি হয়েছে। ক্রমশ নিস্তেজ ভাবটা সব কিছুতে ফুটে উঠছে। হয়তো এই বেঁচে থাকা এবং শুয়ে থাকার প্রতি তীব্রভাবে বীতস্পৃহ হয়ে। সম্পূর্ণ সজ্ঞান সচেতন অথচ স্বেচ্ছায় একবার নড়াচড়া করে না পর্যন্ত। কোন কথা বলার চেষ্টা করে না, কেউ সেবিকার ডাকলে বা প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়ে সংক্ষেপে জবাব দেয়।

যখন ঘরে খুব একা থাকে, এই বাপের দিকে চেয়ে মন খারাপ হয়ে যায় নির্মলার। বাপ তাকে খুব ভালবাসত ছোট-বেলায় মনে পড়ে, যখন অন্য কোন সন্তান হয়নি তখন নিবারণ নির্মলার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেনি। তক্তপোষের একধারে বসে নির্মলা দেখল নিবারণ স্থির হয়ে ওপাশের দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি মৃতলোকের মত ঘোলাটে, স্থির। বুকের ভেতরটা কেমন করল নির্মলার। উঠে নিবারণের মাথায় হাত বুলোতে গেল ভ্রূ কুঁচকে উঠল নিবারণের অর্থাৎ তার ভাল লাগছে না। নির্মলা ঈষৎ নত হয়ে ডাকল—মাথাটা টিপে দোব? বাবা, ও বাবা? কয়েকবার প্রশ্নের পর নিবারণ অস্ফুট দুর্বোধ্য কিছু শব্দ করল মুখ দিয়ে। নির্মলা বুঝল না, আস্তে আস্তে সরে এল। বাইরে দুপুর পাতলা হয়ে এসেছে। নরম রোদের পর্দা একটু একটু হাওয়ায় ক্রমশ জানলার গরাদ কার্নিশের কোণ থেকে ক্রমশ গুটিয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছিল। নির্মলার মধ্যে আবার সেই একা একা খণ্ডিত ভাবটা আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল। প্রায় নির্জন ঘরের মধ্যে একা কি করবে ভেবে না পেয়ে ছটফট করে উঠল নির্মলা। সেই অস্থিরতা অত্যন্ত গোপন মালকের মত সমস্ত স্নায়ুশিরায় ছড়িয়ে দিয়ে নির্মলাকে দিশাহারা করে তুলল।

ওপরে আজ সুদেষ্ণ এসেছে, একটু আগেই, দরজা দিয়ে ঢোকার সময় লক্ষ্য করেছে নির্মলা। এতক্ষণ হয়ত সুজনে হাসি গল্পে মেতে উঠেছে চঞ্চল পাখিদের মত। বাড়ীতে ঢোকার সময় নির্মলাদের ঘরের দিকে তাকায়নি সুদেষ্ণ, কিন্তু নির্মলাকে তো তার মনে আছে। নির্মলা অনুভব অনিচ্ছিত বলে সে তো অবহেলা করে না। কত সমাদরে কথা বলে। তাতে কি যদি এখন অল্প কিছু সময় ওদের মধ্যে যায় নির্মলা? কয়েক মুহূর্ত বসে গল্প করে অবশ্য ...

মহাপ্রভুর আবির্ভাবে

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রেমের ঠাকুর তুমি আজো পঞ্চশত বর্ষ পরে
গৌরগত প্রাণমন গৌড়জন অনুধ্যান করে
তব পুণ্য আবির্ভাব।
এসেছিলে যবে নারী নর
ধর্মহীন তমোলীন ভ্রষ্টাচার বিশ্লিষ্ট-অন্তর
সমাজ শৃঙ্খলাহীন।
তুমি জাগাইলে সংঘ বোধ
একান্ত একতা যোগে অন্যায়েরে করি প্রতিরোধ
দলিলে দুর্বৃত্ত কাজি,—দিলে নাম ব্রহ্ম উপাসনা,—
আপামর সাধারণে সাম্যসামে জাগালে চেতনা
নরে নারায়ণ-বোধ।
'হরিনাম',—সর্বপাপ হরে
সবুদ্ধি যাঁরেরে তাই সেই নামে সুপবিত্র করে
রাখিলে আপন পদে।
বেদান্তের ব্যাখ্যা অভিনব
ব্রহ্ম সত্য, সৃষ্টি সত্য,—এ-জগৎ সত্য সম্ভব,—
স্বপ্ন নহে,—স্বপ্নবৎ; এ-জগৎ ঈশ্বরের তনু
মায়া তাঁর মহাশক্তি, প্রতি জীব তাঁর পুণ্য অণু
জন্ম হতে জীবনের জটিল পিচ্ছিল চক্রপথে
চলে তারা সেই মতে।
ভক্তজন চড়ি মনোরথে
যায় সে-পরমধামে, পায় সে শাশ্বত-নিকেতন
যে যেমন ভজে তারে তাহারেও সে ভজে তেমন।
শান্ত দাস্য সখ্যভাবে বাৎসল্যে বা অথবা মধুরে
পতি-ভর্তা-প্রভু-সাক্ষী পরমাত্মা পরাণ বঁধুরে
জ্ঞান-যোগ-ভক্তি এই সাধনার ত্রিবিধ পন্থায়
কর্মযোগে পূজা করি নিবেদন করে আপনায়
প্রিয় তিনি—প্রিয়তম,—প্রিয়তর কেহ নাহি আর
স্বল্পায়ু কলির জীব, একবার লহ নাম তাঁর,
ত্রিভুবনেশ্বর হরি, মানবের প্রেমের ভিখারী
প্রেমে তাঁর বাঁশী বাজে মিছে কাজে রয় নরনারী
শুনিয়া না শোনে কানে।
তাই অবতীর্ণ তিনি নিজে
প্রেমের পসরা শিরে দ্বারে দ্বারে অশ্রুনীরে ভিজে।

অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র, আবির্ভূত হেরি গোরাচাঁদে,—
কলঙ্কী পূর্ণিমা চন্দ্র হরিষে বিষাদ ভরি কাঁদে।

স্বর্গ যখন নরক ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

সংশয়ের অন্ধকারে হারানো আমি
পথ খুঁজে পাবো কিনা আর, সেই প্রশ্ন।
এই মর্ত্য—স্বর্গে আজ নরক গুলজার;
গণিকা পৃথিবী : অহমিকা এজারেন্ট,
অথচ আবিরে রাঙা বাসন্তী পূর্ণিমা,
আরও চিন্তিত দিন যায় ঘুরে ঘুরে।
ডিগ্রীর কবচ-পরা বেকারের ভিড়,
মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তপ্রায় রুক্ষ উপেক্ষায়;
খল গুরু-জ্যোতিষীর অসত্য আশ্বাস,
চারদিকে ফাঁদ পেতে রাখে মেনকারা।
লুটের মেলায় যত ভণ্ড নেতা, রাষ্ট্র-ধুরন্ধর—
হৃদয় শ্মশান কিংবা শূন্য মরুদ্যান।
দিন কাটে ধীরে ধীরে ম্লান সন্ধ্যা নামে,
সবাই ভ্রুক্ষেপহীন শেষযাত্রা কুসুমশয্যায়;
আপনারে নিয়ে মত্ত আশ্চর্য ঐশ্বর্যে,
নিতান্ত সাম্রাজ্যবাদী ভোগী ভগবান।

জন্মশতবার্ষিকী স্মরণে

ম্যাক্‌সিম গোর্কী

ভবানী মুখোপাধ্যায়

।। প্রথম পর্ব ।।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এক উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে ১৬ই মার্চ তারিখে ভার্ভারা কাশিরিনা আর ম্যাক্‌সিম পিয়েসকভের প্রথম সন্তান অ্যালেক্সী পিয়েসকভ ভূমিষ্ঠ হলেন। সাইবেরিয়ার ভবঘুরে যুবক পিয়েসকভ নিজনি-নভগোরডে এসেছিলেন ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতে, সেই শহরের কাশিরিন পরিবার সম্পন্ন গৃহস্থ, তাদের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে যুবক পিয়েসকভের প্রেম। একেবারে ভবঘুরে, মাথায় একরাশ চুল, দড়ি দিয়ে বাঁধা। জামা-কাপড় অপরিচ্ছন্ন এবং সাধারণ, সেই একদিন এসে হাজির পাণিপ্রার্থী হয়ে। ভার্ভারার বিবাহ সম্ভব হয়েছিল তাঁর জননীর জন্য, পিতা প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ম্যাক্সিমের শ্যালকরা ছিল পাঁড় মাতাল এবং অতিশয় দুর্দান্ত প্রকৃতির। তারা একদিন ম্যাক্সিমকে ঠাণ্ডা জলের ডোবায় খেলার নাম করে নিয়ে গিয়ে প্রায় হত্যা করেছিল, কিন্তু সেই যাত্রা ম্যাক্সিম বেঁচে গেলেন, এর কিছুকাল পরে একটা কাজ নিয়ে ম্যাক্সিম অস্ত্রাখানে চলে গেলেন, ফিরে এলেন চার বছর পরে। তখন শিশু অ্যালেক্সী একটু বড়ো হয়ে উঠেছে কিন্তু হঠাৎ তার কলেরা হল, শিশু বেঁচেও উঠল কিন্তু ম্যাক্সিম সেই রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর [illegible] পুত্রের ম্যাক্সিম সেই রোগেই মারা গেলেন।

শিশু অ্যালেক্সীর চোখের সামনে যেন জীবনের রহস্যের একটা যবনিকা উন্মোচিত হল। সদ্যমৃত ম্যাক্সিম, চুপচাপ শুয়ে আছেন। আর সন্তানসম্ভবা জননী সেই নির্জীব দেহটার পাশে পাগলিনীর মত বসে কাঁদছেন। শিশু অ্যালেক্সী ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুড়ি দিদিমা এসে অ্যালেক্সীকে ভোলাবার চেষ্টা করেন। এদিকে মৃতদেহটিকে কবরস্থ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। শিশু অ্যালেক্সী ভয়ে ভয়ে একটা বিরাট [illegible] পাশে লুকিয়ে পড়লেন। সেই ক্ষণ থেকে দেখা গেল এক নবজন্মের সূচনা অ্যালেক্সীর ছোট ভাইটি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যু জীবনের এই দুটি বিরাট রহস্য শিশু অ্যালেক্সীর চোখে যেন এক নতুন জগতের সন্ধান এনে দেয়।

যে পরিবেশে অ্যালেক্সী বড় হয়ে ওঠে, সেই পরিবেশ অতিশয় জঘন্য। দিন-রাত মারামারি আর সামান্য প্রাপ্তির জেতে কলহ। দাদামশাই কাশিরিন বদমেজাজী মানুষ। শাস্তি দেওয়ার অস্ত্র তাঁর বেত এবং সেই শাস্তিদান করার সময় তাঁর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একদিন অ্যালেক্সীকে শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি তাঁর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেন, অবশ্য ছোট অ্যালেক্সীও কিন্তু মুখ বুজে সেই অত্যাচার সহ্য করল না। সে একেবারে উন্মত্তের মত রুখে দাঁড়ায়। এর পরই সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল। যাই হোক এইভাবে শিশু অ্যালেক্সী ক্রমশ দুঃসাহসী হয়ে উঠতে থাকেন। রাতে দিদিমার কাছে শোয় অ্যালেক্সী। দিদিমা ধর্মপ্রাণা। তিনি সকলের জন্য প্রার্থনা করেন, সকলের [illegible] কাঁদেন। তবে শিশু অ্যালেক্সীর মনেও হয়তো জাগে, তবে সে প্রতিজ্ঞা করে নিজের মনে চুপ করে সে কোন অন্যায় সহ্য করবে না। সে প্রতিশোধ নেবে সব অন্যায়ের।

বাল্যকালের নানা উত্থান-পতন জননী ভার্ভারার বিচিত্র জীবন। অত্যাচারী বুড়ো দাদামশাই এবং স্নেহময়ী দিদিমা আর সেই সঙ্গে অনেক পশুপক্ষী বালক অ্যালেক্সীর মনকে ভরে রাখে। ভার্ভারা ম্যাক্সিমভকে বিয়ে করে চলে যায়। বুড়ো কাশিরিন বাড়ি বিক্রী করে, দিদিমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেয়। ভার্ভারার স্নেহ থেকে সে বঞ্চিত। পারিবারিক জীবন অতিশয় ক্লেশকর। একদিন একটি নোট চুরি করে হ্যান্স অ্যান্ডারসনের গল্পের বই কিনে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে অ্যালেক্সী। তবু অ্যালেক্সী পড়াশোনায় ভাল। পুরস্কার পায় ভাল ছাত্র হিসাবে। আর সেই পুরস্কার পাওয়া বই বিক্রী করে রোগজীর্ণ দিদিমার সেবা করে।

কিন্তু পড়াশোনা অগ্রসর হয় না। স্কুলটা উঠে গেল। এদিকে জননী ভার্ভারাও জীর্ণ হয়ে পড়েন। ম্যাক্সিমভের দেখা পাওয়া গেল [illegible], একটি নতুন চাকরী এবং নতুন বাসার খোঁজ করে বাড়ি এসেছেন ভার্ভারা ও ছেলেদের নিতে যেতে। অ্যালেক্সী বাড়ি ছিল না, ফিরল যখন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। জননী ভার্ভারা অতিশয় উত্তেজিত হয়ে অ্যালেক্সীকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়েন, তারপর পুত্রের হাতে একটু জলপান করেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আলেকসীর জীবনের বন্ধন শুরু হল। তখন আলেকসীর বয়স মাত্র দশ বছর।

।। দুই ।।

সেই দশ বছর বয়সেই একটা চাকরী জুটে গেল জুতোর দোকানে। একেবারে পাথরের মূর্তির মত চুপচাপ থাকতে হবে কর্তার হুকুম। কর্তার বাড়িই থাকে আলেকসী, সেখানে জুতো পালিশ থেকে ডিসধোয়া ইত্যাদি ছোটখাট কাজগুলি করতে হয়। এই জুতোর দোকানে মাসতুতো ভাই সাসা কেরানীর কাজ করে। সে একটু উচ্চপদস্থ, তাই একটু স্বতন্ত্র থাকতে চায়।

আলেকসী লক্ষ্য করে দোকানের মানুষগুলো কেমন বর্বর, অকারণে খদ্দেরকে ঠকায় যা তা কথা বলে স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি করে। তার ভাল লাগে না, সে এই পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে চায়। কিন্তু হাতে গরম সুপ পড়ে গিয়ে বাধা পড়ল। হাসপাতালে যেতে হল, সারা রাত যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়ে ভোরবেলা জেগে দেখে সেই স্নেহময়ী দিদিমা শিয়রে বসে আছেন। প্রথম চাকুরীর এইখানেই ইতি।

কাশিরিনদের অবস্থা বিপর্যয় ঘটে গেছে। নিদারুণ অভাব। বৃদ্ধ বন থেকে কাঠ আনে। আলেকসী আর দিদিমা ফলমূল সংগ্রহ করে। দুজনের কোনমতে চলে। কাশিরিন কিন্তু আবার একটা কাজ জোগাড় করে দেয়। দিদিমার বোন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁর পুত্র প্ল্যান তৈরী করেন। এই ছেলেটির কাছে কাজ করতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতেও কাজ কম নয়। দিনরাত খাটুনি। চাকরের মত সব কাজ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত একদিন দিদিমার বোনের ছেলেটিকে বলে, আমি ত চাকরের কাজই করছি তোমার কাজ কিছু শেখাও। ছেলেটির মন ভাল, সে বললে বেশ ত এইসব থেকে কাজ কর।' দিদিমার বোনের তা সইল না, সে ভাবল ছেলেটা যদি কাজ শিখে নেয় তাহলে আমার ছেলের কি হবে, ফলে গৃহস্থালীর কাজ আরও বেড়ে গেল। জুলুম আর অত্যাচার আর সহ্য হয় না আলেকসীর। একদিন সকালে পাঁউরুটি কিনতে বেরিয়ে আর ফেরে না।

নিজনিনভগোরদের শহর ভলগার তীরে অবস্থিত। সেই প্রাণ-প্রবাহিনী ভলগা বারো বছরের আলেকসীকে হাতছানি দেয়। মাসে দু রুবল মাইনে বরাদ্দ হল একটা স্টীমারে। শুরু হল আলেকসীর বিশ্বদর্শনের পালা।

স্টীমারের বাইরে ভলগা, কিন্তু ভিতরের মানুষগুলি নীচ, অতি নিম্নস্তরের। এদের চলে কোন বিকার নেই, পুরুষ ও নর-নারীর যৌনকর্ম সর্বসমক্ষেই অহরহ ঘটে। বারো বছরের ছেলে আলেকসীর জীবনের রহস্য কি বিচিত্র হাতেখড়ি। এই স্টীমারের রাঁধুনী মিখায়েল স্মিউরি ছিলেন সেনাবাহিনীর লোক, গায়ে প্রচণ্ড জোর। কেন দয়া, ক্ষমার ধার ধারেন না, গায়ের জোরও কম নয়। বালক আলেকসীকে তাঁর ভাল লাগে। তিনিই আলেকসীকে ধরে-বেঁধে পড়তে বসালেন। একদিন সেই স্টীমারের ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কাছে তিনি একখানা 'গোগোলের তারাস বালবা' এনে দিলেন বালক আলেকসীকে। এই প্রথম পরিচয় মহৎ সাহিত্যকারের রচনার সঙ্গে। সুমধুর রচনা, সরসতায় সজীব। ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর কাছে ক্রমে ক্রমে নেক্রাসভ, ওয়াল্টার স্কট আলেকজাণ্ডার দুমা, প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকের শ্রেষ্ঠ রচনা আসে। এ এক বিচিত্র জগৎ। ছেলেবেলা দিদিমার কাছে রূপকথা শুনেছে সে এও আশ্চর্য কল্পলোক, কিন্তু তার সঙ্গে বাস্তবের যোগ নেই। সুতরাং এ সব মানুষ রক্ত-মাংসে গড়া। বালক আলেকসীর মনে প্রশ্ন জাগে—মানুষ তাহলে শুধু যে মন্দ তা নয় ভাল মানুষও আছে। স্মিউরি বলে — ভাল-মন্দের বিচারে কি প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ বেশ বুদ্ধিমান, বাকী সবাই গাধা।

এই স্টীমারের চাকরী থেকে একদিন মাত্র আট রুবল নিয়ে বিদায় নিতে হল আলেকসীকে মিথ্যা অপবাদ নিয়ে। চলে আসার সময় স্মিউরি বলেছিল—খুব পড়াশোনা করবি। এর চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই।

বেশ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে আলেকসীর। জীবন তার প্রতি নির্মম হলেও তার অনেকখানি রহস্য এই অল্পকালের মধ্যেই ওকে দেখিয়েছে আবরণ উন্মোচন করে। এই কদিনেই সে নিয়ে ফিরেছে অনেক বছরের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এখন আর দাদামশায়ের চোখরাঙানী সে সইবে না। সইবে না, কারও কোন অন্যায় অত্যাচার।

দাদামশায়ের কাছে এসে আবার সেই পুরাতন জীবন। সেই পরিচিত দুঃখময় জীবন ভাল লাগে না। আলেকসী চায় নির্জনতা। নিঃসঙ্গ হয়ে সেই নীল দিগন্তে বিচরণ করতে তার মন চায়। হঠাৎ একদিন কাশিরিনদের বাড়ির কাছে এক দল সেনা ও কসাক এসে শিবির বাঁধল। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেল আলেকসী। বেশ ভাব হয়েছে, একদিন একটা সিগারেট ওরা উপহার দিল, আলেকসী সিগারেটটা ধরাতেই তার ভেতরকার টোবাকো ওর মুখটা পুড়িয়ে দিল। কি নির্মম পরিহাস। কি নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তি এই মানুষগুলির।

এর পর কসাকদের সঙ্গে এসে মিশল আলেকসী। এরা কিন্তু মানুষ ভাল। এদের পরিবেশ বেশ ভাল লাগে আলেকসীর। কিন্তু সেই স্বপ্নও ভাঙে, একজন কসাক তার স্ত্রীকে এমনভাবে উৎপীড়ন করছিল যা কিশোর আলেকসীর মনটা বেদনায় ভরে দেয়।

বয়ঃসন্ধির কাল এসেছে। যৌনরহস্য তার অজানা নয়, কিন্তু রোমান্টিক প্রেম যা গল্প উপন্যাসে পড়েছে তাই বেশ ভাল লাগে আলেকসীর। বাড়ির সামনে থাকত এক দর্জির স্ত্রী। তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা তামাশা করে, তাঁর সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রচারও করে। কিশোর আলেকসী তাঁকে সতর্ক করে দেয়। তারপর একদিন সেই নারীর মধ্যেও যে কল্পনা প্রকাশ পায় তা কিশোর আলেকসীকে উৎপীড়িত করে। এঁর কাছেও কিছু বই পাওয়া গেল, হাল্কা উপন্যাস, তবু বই।

এর পর যিনি প্রভাবিত করলেন আলেকসীকে তিনি এক পরমা সুন্দরী সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর বিধবা রমণী। তাঁর বাড়িতে একটা সাংস্কৃতিক চক্র ছিল। এই বিধবার

সোভিয়েত ইউনিয়নে গোর্কী জন্ম-শতবার্ষিকী ॥

সম্প্রতি কনস্তান্তিন ফেদিন-এর সভাপতিত্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গোর্কি জয়ন্তী কমিটির এক অধিবেশন হয়। গোর্কির জন্মস্থান নিজনি নভগরোদ শহরের বর্তমান মেয়র এ সকলোফ জানান এই উপলক্ষে শহরবাসী নানাপ্রকার বিদ্বজ্জন সম্মেলন, প্রদর্শনী ও সংগীত-উৎসবের আয়োজন করবেন। তাছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ও রুশ ফেডারেশনের লেখক-সমিতির একটি যুক্ত-অধিবেশনও সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রি-পরিষদের সংবাদপত্র-সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি এন মিখাইলোফ জানান আগামী মার্চ মাসের মধ্যে মস্কোয় প্রকাশন-সংস্থাসমূহ অন্ততঃ ৬৫টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ করবেন। বিভিন্ন গ্রন্থের মুদ্রণ সংখ্যা ৫০ লক্ষেরও বেশি হবে। তাছাড়া নাউক প্রকাশনী থেকে এ বছর গোর্কির রচনাবলী ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

সোভিয়েত রঙ্গমঞ্চগুলিতেও গোর্কির গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ক্রেমলিন থিয়েটারে দশদিনব্যাপী গোর্কি-নাট্যোৎসব শুরু হয়েছে। গোর্কির অনেকগুলি গল্পের ভিত্তিতে 'রাশিয়া প্রদক্ষিণ' নামে এক চলচ্চিত্র তোলা হয়েছে। তাঁর 'একঘেয়েমি থেকে মুক্তির জন্য' কাহিনীর চলচ্চিত্ররূপও সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া গোর্কি সম্পর্কে আটটি দলিলচিত্রও মুক্তি পাবে। বিশ্বসাহিত্য-সংক্রান্ত গোর্কি ইনস্টিটিউট থেকে এল নিওনোফ-এর সম্পাদনায় তিনটি সিরিজে গোর্কির সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। গোর্কির আমলের বিশেষজ্ঞদের লেখা পুস্তকাবলী, গোর্কির অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও নোটসমূহের একটি সংগ্রহপুস্তকও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হবে।

একটি পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে আলেকসী রূপকথা শোনাত। সেই পাঁচ বছরের মেয়েটাই একদিন আলেকসীকে বাড়ির ভেতর টেনে নিয়ে যায়। আলেকসী ছোট ঘরের ছেলে তাই খুব সন্তুষ্ট হলেন না মেয়েটির মা, তবু সে যে পড়াশোনা ভালবাসে এটা তাঁর ভাল লাগল। আর আলেকসী এই বিধবা রমণীটিকে মনে মনে ভালবেসে ফেলেছে। এই রমণী তার চোখে মানবী নয় স্বপ্নলোকবাসিনী দেবী। অন্য পুরুষের সঙ্গে তিনি কথা বললে তার অন্তরে ব্যথা লাগে, সে চুপ করে থাকে। কোন কোন দিন আলেকসীর সামনেই তিনি তাঁর বুকের আবরণ উন্মোচন করেন, কোন বিকার নেই কিন্তু আলেকসীর মনে। কিন্তু একদিন সেই রমণীকে দেখা গেল একজন মিলিটারি কর্মীর নিবিড় বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছেন। বালক আলেকসীর কাছে মৃত্যু আঘাত, মহিলাটিও বুঝলেন। ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। স্বল্পস্থায়ী হলেও এই মহিলাটিকে ভুলতে পারে না আলেকসী।

ইতিমধ্যে রাশিয়ায় লেগেছে বিপ্লবের কালবৈশাখী। বালক আলেকসী কিন্তু তার খবর রাখে না। বিপ্লবীরা সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্দারকে হত্যা করেছে। আলেকসী কিছু কিছু আলোচনা শোনে, কিন্তু তার কাছে এসব কথা অর্থহীন। সে কিছুই বোঝে না। জারের অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য সর্বত্র গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করাটা নিছক বাতুলতা। যারা পড়াশোনা করে তারাই বিপ্লবী। যে বাড়িতে থাকে তারাও পড়াশোনা পছন্দ করে না। বাতি রেখে মোমবাতি ঢেকে পাশ দিয়ে রাখে, যাতে না জ্বালান হয়। আলেকসী চাঁদের আলোয় পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু তা হয় না।

সেই রমণীর স্বামীর কাছে আলেকসী সন্ধান পেয়েছিল পুশকিন, গ্রীন উড, বালজাকের রচনার। তারপর সেই সম্ভ্রান্ত বিধবার কাছে সন্ধান পায় পুশকিনের কবিতার। তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া গেল তুর্গেনিভ। বালক আলেকসী আবার স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। তারপর আর এক চুরির দায়ে নির্বাসিত হয়ে আলেকসী বেরিয়ে পড়ল ভলগার তীরে।

এইবার স্টীমারে পরিচয় হল বেকারের সঙ্গে। এ এক বিচিত্র মানুষ। কোন ন্যায়-নীতির ধার ধারে না, যেন আদিম মানুষ। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সব তুচ্ছ তার কাছে। তার কাহিনীতেই নীতি প্রচারে প্রচেষ্টা নেই। আলেকসীর জীবনে এ আর এক সম্পদ।

নিজনিতে ফিরে এসে এবার একটা কাজ পেল 'আইকন' বিক্রীর দোকানে। নানা-রকম দেব-দেবীর মূর্তি, ধর্মান্ধ মানুষ কেনে তাগা-তাবিজের মত, তাদের বিশ্বাস বিপদে-আপদে এই 'আইকন' তাদের রক্ষা করবে। কিন্তু এই কাজে যারা লিপ্ত তারা আস্ত জোচ্চোর প্রকৃতির। সরল প্রাণ লোকদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকায়। কারিগরদের অবস্থা ভাল, তারা মালিকদের মত নয়। সে আইকন-নির্মাতাদের কাছে গল্প ও কবিতা শোনায়। কিন্তু মন আবার উদাও হয়। এবার পারস্যে যেতে চায়। কিন্তু সেই নক্সাকার মামা একদিন একটি সিগারেট দিলেন, বললেন ওসব বাজে কথা ছাড়। আমি একটা দোকান করব মেলায়, সেখানে সহায়তা করবি চল। মামা লোক ভাল। দোকানের মুহুরীদের কারকর্ম দেখে আলেকসী। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিয়ন স্ট্রীটে পতিতা পল্লীতে যায়। মামা সতর্ক করে দেন। কিন্তু আলেকসী পতিতাদের দুঃখময় জীবন দেখে বেদনা বোধ করে। তাই একদিন সে পথে যাওয়া বন্ধ হল।

না আলেকসী এইবার আবার বেরিয়ে পড়বে। এমন সময় পরিচয় হল এভ্রাইনভ নামে একটি সুন্দর ছেলের সঙ্গে। তার বয়স উনিশ বছর। সে ওকে পড়াশোনায় উৎসাহিত করে। পাঁচ বছর লাগবে কলেজে যথার্থ শিক্ষালাভ করতে। এভ্রাইনভ তাকে সব দিক থেকে সহায়তা করবে।

একদিন প্রকৃত শিক্ষালাভের জন্য আলেকসী আবার স্টীমারে চড়ে বসল। সেদিন বিদায়বেলায় দিদিমা সজল চোখে বলেছিলেন—মানুষের ওপর যেন রাগ করিস না, মানুষের বিচার ভগবান করে না ওটা শয়তানের কাজ।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সুবিধা হল না পড়াশোনার, সেখানকার কর্তারা কোন সহানুভূতি দেখালেন না। গরীব ছোট-লোকেরা যাতে লেখাপড়া না শেখে কর্তৃ-পক্ষের সেই নির্দেশ। এই সময় একজন আলাপ হল বাসকিনের সঙ্গে, লোকটির বাসনা ছিল শিক্ষক হবে, হল কিন্তু চোর। লোকটা কিন্তু বেশ ভাল গান লেখে, বেশ্যাদের জন্য সে অনেক গান লেখে। লোকটা আলেকসীকে স্নেহের চোখে দেখে। আর একজন চোরাই মাল বিক্রী করত, খাঁড় শানানোর দোকানের অন্তরালে সেই চোর আসল কারবার। সে কিন্তু বলে—তুমি যেন চুরি কর না। এ কাজ তোমার নয়।

কিন্তু আরও একজন এল জীবনে। তার নাম প্লেটনভ। সেও গরীব। আলেকসীর অবস্থা জেনে সিঁড়ির তলায় যে ঘরটিতে থাকত সেখানে তারও একটা জায়গা হল। এই বস্তিতে কয়েক ঘর পতিতা থাকে। একটাতে থাকেন একজন পাগল অঙ্কের পণ্ডিত। পতিতারা এই লোকটাকে দুবেলা খেতে দেয়। আলেকসীর ঠিক মাথার ওপর থাকে একজন ছাত্র, তার কাছে প্রতি রাত্রে একজন ধনী রমণী এসে প্রেম নিবেদন করে। এই বিচিত্র সংসারে আলেকসীর দিন কাটে। গুপ্ত সমিতিতে বসে এডাম স্মিথের অর্থ-নীতির গ্রন্থাদির পাঠ শোনে।

আলেকসী সন্ধান পায় ডেরেনকভের দোকানের। নানা ধরনের বিপ্লবীর সঙ্গে অনেক দিন কাটল আলেকসীর। "নারদ" বা জনগণের সম্প্রদায়কে বলা হত 'নারদনিক'। 'নারদ' এক দেবতার নাম, সেইভাবে জন-গণের পূজা করে 'নারদনিকরা'। আলেকসীও এই জনগণের পূজায় আত্ম-নিবেদন করে। এবার জীবন হল নূতন ধারায় প্রবাহিত।

একটা পাঁউরুটি কারখানায় কাজ পাওয়া গেল। এখানে চল্লিশজন কর্মচারী। এ আর এক জগৎ।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভারতীয় সাহিত্য

স্বাধীনতার পরবর্তী মালয়ালম কথাসাহিত্য

স্বাধীনতার পরবর্তী মালয়ালম কথা-সাহিত্য নিঃসন্দেহেই বিশিষ্টতার দাবি রাখে অবশ্য স্বাধীনতার মূল্যবোধের কোন প্রভাব মালয়ালম সাহিত্যিকদের উপর পড়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

স্বাধীনতার পরে মালয়ালম উপন্যাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দিকটি চোখে পড়ে, তা হল একদিকে ফরাসী ও রুশীয় উপন্যাসের প্রভাব এবং অন্যদিকে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ও মার্ক্সবাদের প্রভাব। এ ছাড়াও দেখা গেল, যাঁরা স্বাধীনতার আগে ছোট গল্প লিখতেন, তাঁরা উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেছেন। এই সময়ে উপন্যাস রচনায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে উরুব ও শ্রীশিবশঙ্কর পিল্লাই খুবই উল্লেখযোগ্য। এঁদের দুজনের উপন্যাস নানা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। শ্রীশিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত "চেম্মিন" ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এ ছাড়াও যাঁরা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীকেশব দেব, মহম্মদ বশীর ও পানিক্কর। শ্রীকেশব দেব তাঁর উপন্যাস "ওটাপক নিন্নু"তে একজন রিক্সাচালকের বাস্তব জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মহম্মদ বশীরের রচনায় মুসলমান সমাজের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কাহিনী বর্ণিত। পানিক্কর হলেন কেরলের একজন অন্যতম প্রিয় ঔপন্যাসিক।

ছোট গল্পের ক্ষেত্রটি উপন্যাসের মত তেমন সমৃদ্ধ নয়। একালের মালয়ালম গল্পের প্রধান বিষয় হল মনস্তত্ত্ব ও চেতনা-প্রবাহ। অবশ্য অনেক লেখক তাঁদের গল্পের পটভূমি রচনা করেছেন, ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে। কাক্কনাদন, নন্দনার, পারপ্পুরম প্রমুখ গল্পকারগণ যুদ্ধের পটভূমিতে তাঁদের গল্প রচনা করেছেন। এই সব গল্পের আবেদন যে অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তরুণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে সীমিত। মাধবী কুট্টি একালের মালয়ালম ছোট গল্পের অন্যতম লেখিকা। কমলা দাস ছদ্মনামে তিনি ইংরেজিতেও কাব্য রচনা করে থাকেন।

কৃত্তিবাসের বার্ষিক উৎসব

এবার কৃত্তিবাস পুরস্কার লাভ করেছেন শিলচরের কবি শান্তনু ঘোষ। গত ১ মার্চ কলকাতার ওভারটুন হলে এই পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে একটি কবি সভার আয়োজন হয়। শান্তনু ঘোষ অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর কাব্য পাঠ করে শোনান তনুশ্রী ভট্টাচার্য।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বিদেশী সাহিত্য

আন্তর্জাতিক অনুবাদক সম্মেলন ॥

কিছুদিন আগে পূর্ব-ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লেখক ও অনুবাদকদের একটি সম্মেলন হয়ে গেল ফ্রাঙ্কফুর্টে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। ফ্রাঙ্কফুর্ট সাহিত্য সংস্থার যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা ও সমকালীন পোলিশ-সাহিত্যের অনুবাদক কার্ল দেদেসিয়াস উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, অনুবাদকেরা প্রকাশকদের সহকারী নন, বরং প্রকাশকদের উচিত তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করা। এই সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন জিগনিউ হার্বার্ট। অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার কামিল জিরোদকোয়া এবং ইভান কুপেক, হাঙ্গেরীর সেন্ডার ওয়েস, তামাস উনগোয়ারী এবং এলমার সাস, রুমানিয়ার সোফিয়ানা সোরা ও পেতার স্টয়েকো—এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, বুলগারিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বার্লিন সাহিত্য সংস্থার উলফগাং ওয়াইরাখ 'আধুনিক জার্মান ভাষা' সাহিত্যের সর্বশেষ দিক ও সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের একটি বিবরণ দেন। কবি কার্ল ক্রোলো সমকালীন জার্মান কবিতা সম্পর্কে একটি লিখিত ভাষণ দেন। কবি এরিখ ফ্রাইড প্রথমে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরে তার ওপরে অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস ।।

কিছুকাল আগে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 'গোর্কি ইনস্টিটিউট'-এর উদ্যোগে 'এ হিস্টরি অব ওয়র্ল্ড লিটারেচার' নামে একটি গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু হয়েছে। তাঁরা এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে।

এই বিরাট পরিকল্পনায় পদ্ধতিগত আদর্শ কি হবে— সেই সম্পর্কে কিছু কিছু খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতীয়-সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রগতি-রেখা নিরূপণ করে—তাদের পারস্পরিক প্রভাব কিভাবে বিশ্বসাহিত্যের নির্মাণ ও গঠনে সহায়তা করেছে তা সাধারণ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এর জন্য প্রত্যেকটি জাতীয় সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলাদাভাবে লেখা হবে না। সবরকম অনাবশ্যক বিতর্ক ও বিশ্লেষণ এবং অপ্রকৃত ঘটনার সমাবেশকে পরিহার করে, দৃঢ় ও সুস্পষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই তা রচিত হবে। কেননা, বিশ্ব-সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি জাতীয়-সাহিত্যের যোগফল নয়, বরং তাদের ঐক্যতান সৃষ্ট একটি ঐতিহাসিক কলাকৃতি।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

'বাবু'র মহিমা

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

ইংরেজ আমলে বাবু নামের সঙ্গে পুরোনো কলকাতার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল এবং তা বিশেষ আমেজের। সাহেবেরা বাঙালীর কোন বিষয় পরামর্শ নেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেই বলতেন, ওদের বাবু কি বলেন?

মোট কথা, তখনকার দিনে বাবুরা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বেশ প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। বাঙালীরা তাদের এই জাতি-ভায়েদের প্রাধান্য দেখে মনে মনে যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন না, তা বলা যায় না। তবে তাঁদের খুবই ভয় করে চলতেন।

সে ইংরেজও চলে গেছে, আর এদেশের আদপ-কায়দারও পরিবর্তন হয়েছে। এখন সেই বাবুদের আদরও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু সামাজিক জীবন থেকে তাঁদের নাম কমলে কি হয়, স্বরাজ লাভের পর দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুনভাবে বাবুর গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে চলেছে। কোন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কি করেন বা আপামর জনসাধারণ কোন সমস্যায় বিষয় কি চিন্তা করছেন, তা বড় কথা নয়। আসল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সকল সমস্যা বা প্রশ্নের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের বাবুরা কি বলছেন? এবং পরবর্তীকালে দেখা যায়, রাজনীতিতে বাবুদের কথাই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করছে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে বিগত নির্বাচনের কথা। এক কোটিরও বেশী লোক ভোট দিয়ে রায় দিলেন, কংগ্রেস শুধু নয় কোন বিরোধী দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। ফলে বিরোধী দলগুলি যুক্তফ্রন্টের আকারে মিলিত হয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। নিজেদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য, ব্যক্তিগত কারণ ইত্যাদির ফলে দেখা গেল যে, যুক্তফ্রন্টের কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা অবশ্যই বিঘ্নিত হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, কংগ্রেসের প্রধান 'বাবুরা' মনে করলেন, ফ্রন্টের মধ্যে দলত্যাগ করিয়ে সরকার দখল করতে হবে। একথা সত্য, সে সময় কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীর মধ্যে বেশ কিছুটা হতাশা এসেছিল। কিন্তু তা বলে জনগণের মত নিয়ে যে সরকার দখল করা যায়, তা তাঁরা ভাবেনও নি। কিন্তু বাবু ভায় নামের দল সেই অনুযায়ী কার্যকর করার চেষ্টা করলেন এবং সাধারণ কর্মীদের তা মেনে নিতে হল। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের বাড়ীর ছোটভাইদের এক বাবু সে সময় অজয়বাবুকে বানচাল করবার জন্য সরকারের পরিবর্তনে বাদ সাধলেন এবং ভবিষ্যতে দেখা গেছে ছোটভায়েদের বাবুর চেষ্টায় কংগ্রেসের ভেতরে যথার্থ এড-হক কমিটি গঠিত হল না। অজয়বাবু যুক্তফ্রন্ট সরকারের হয়ে পদত্যাগপত্র পেশ করে কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারলেন না।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসী নেতা গোবিন্দবাবু নাকি গোপনে মুখ্যমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। এতে কংগ্রেসের অন্যান্য বাবুরা ক্ষিপ্ত। তাঁদের ক্ষোভের কথা তাঁরা গৃহিণী-দের নিকট প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। যা হোক আসলে দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের ভেতরে যে কোন্দল, তা বাবু অথবা বাবুদের ঘিরেই দানা বেঁধে উঠেছে। সাধারণ কর্মীদের এ বিষয়ে কিছু করার নেই। তাঁরা এই সব দ্বন্দ্বের খেসারত দর্শক। অথচ সব কিছু ন্যায় বা অন্যায় কাজ তাঁদের মাথেই হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের দিকে তাকালে সেই একই দৃশ্য দেখা যাবে। শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের নতুন দল জাতীয় পার্টিকে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, এই প্রশ্ন নিয়ে তুমুল হট্টগোল। [illegible] দলের শ্রীসুশীল ধাড়া চান না কবির সাহেবকে পাত্তা দিতে। শ্রীকবিরেরও ইচ্ছে সুশীলবাবুর মাতব্বরী সহ্য করব না। এ দিকে যুক্তফ্রন্টের শক্তি বৃদ্ধি হল বা কমলো তাতে কারও যায়-আসে না। ওখানেও বাবুর লড়াই চলেছে।

গত সাধারণ নির্বাচনের পর দেখা গেছে, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের [illegible] অবজ্ঞা করতে কেউ যদি চেষ্টা করে থাকেন, তবে তিনি হলেন কংগ্রেস দলের ছোট-ভায়েদের বাবু। [illegible]

দল কোনদিনই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেবেন না। ফলে ভবিষ্যতের আশায় তিনি এর সর্বনাশ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সে সময় বড়ভায়ের বাবুর এতে সমর্থন ছিল না। ফলে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল।

পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, বড়ভায়ের বাবুকে তাঁর নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ করা হবে না বলে আশ্বাস দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনের ধ্বনি কংগ্রেস ভবনে শোনা গেল। সাধারণ কর্মীরা ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই রাজনীতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অকম্যুনিস্টদের নিয়ে জাতীয় সরকার গঠনের একটা জোর চেষ্টা চলেছে। গোপনে অনেকগুলি রাজনৈতিক পার্টির অনেক নেতাই শলা-পরামর্শ করছেন। তাঁদের ইচ্ছে, এই ধরনের একটা তৃতীয় শক্তি যদি গড়ে তোলা যায়, তবেই ভবিষ্যতে স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব। অবশ্য এই ব্যাপারে তাদের বিশেষ বিপদ আছে। কারণ কংগ্রেসের পক্ষে একা সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। কম্যুনিস্টরা সরকার গড়ে তুলুক, তাও অনেকে চান না।

যা হোক কোন পার্টিই তাঁদের কর্মীর সঙ্গে পরামর্শ করার কথা বিবেচনা করেছেন বলে মনে হয় না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এ প্রস্তাব [illegible] বিরোধী তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। এ জন্য কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই নাকি ওয়ার্কিং কমিটির সামনে প্রস্তাব রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক মহল মনে করছেন যে, পার্টিগুলির কর্মীদের না এই শ্রেণীর বাবুর কর্তৃত্ব হবে হবে না হতে পারবে, ততদিন তাঁদের পক্ষে [illegible] সম্ভব নয়। কারণ এই বাবুরাই [illegible]

অঙ্গনা

প্রমীলা

দুস্তর বাধা পেরিয়ে

সেবাদর্শ

'It is not every day that one meets a disciple of Ramakrishna Paramahansa.'

"As an emperor, Sree Ramakrishna has founded a new Empire."

ডাইনীবিদ্যা বা ব্লাক ম্যাজিক। এই ধরনের ডাইনীদের কথা লিখতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত ইংরাজ লেখক ডেভিস তাঁর একখানি গ্রন্থে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

একবার এক ডাইনী, ডাইনীবিদ্যার উপরে একখানি গ্রন্থ রচনা করে কোন এক সংবাদপত্র সম্পাদককে বইখানির একটি আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করে। সম্পাদক মহাশয় সেই বইখানিকে গালাগালি দিয়ে একটি কড়া সমালোচনা লেখেন। স্বভাবতঃই তিনি তখন সেই ডাইনীর বিরুদ্ধে পড়ে যান। অতঃপর ডাইনী হুনেস নামক অদ্ভুত হর্‌পের সাহায্যে সম্পাদকের প্রাণ-সংহার করেন। খাস ডাইনীই যে গ্রন্থখানির রচয়িতা সম্পাদক মহাশয় সম্ভবতঃ তা জানতেন না।

সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে একদিন অগণিত ডাইনী জাল বিস্তার করে বেড়িয়েছে। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে উনিশ শতক পর্যন্ত চার শতাব্দী ধরে এখানে ছিল ডাইনীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ ও প্রভাব। এদের কথা লিখতে গিয়ে মিঃ পিলিয়াম টিনডেল তাঁর এ হ্যান্ডবুক অন উইচেস গ্রন্থে লিখেছেন যে—

— Its European history, from the middle ages to the eighteenth century, belongs almost exclusively to the dark side of life ; it is a saga of ignorance, distortion, fear, brutality and generally grotesque behaviour on the part of both those accused of witchcraft and those who accused them.

কোন কোন সমীক্ষকের মতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইউরোপে প্রায় ১০ লক্ষ ডাইনীর অস্তিত্ব ছিল। এখনও এদের সংখ্যা খুব কম নয়। এদের সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে সেইজ ইওয়ান তাঁর উইচ হান্টিং অ্যান্ড উইচ ট্রায়ালস, লণ্ডন অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক, ১৯২৯ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৫৪২ সাল থেকে ১৭৩৬ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডেই প্রায় এক হাজারেরও বেশী সংখ্যক ডাইনীর বিচার হয়েছে আদালতে। এখনও পর্যন্ত যে ওদেশে কিছু কিছু ডাইনীর অস্তিত্ব আছে সম্প্রতি তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল। একালে বৃটেনের বিজ্ঞতম এবং প্রাচীনতম উইচ বা ডাইন, ৭৬ বৎসর বয়স্ক ডাঃ গার্ডনার বলেছেন যে কম-বেশী ১৫০ জন ডাইনী এখনও ইংলণ্ডে আছে।

আফ্রিকা মহাদেশের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরলে দেখতে পাব যে সেখানে ডাইনীদের প্রচণ্ড আধিপত্য। শোনা যায় যে আফ্রিকার উইচ ডক্টরদের স্থান কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের মধ্যে 'প্রধান'-এর ঠিক পরেই। এদের কার্যকলাপ এবং শক্তি সম্পর্কে একটি পরিচিত গল্প এখানে উল্লেখনীয়। একবার একজন শ্বেতকায় ব্যক্তি এক উইচ ডক্টর-এর বাড়ীতে ধুলো ফেলে চলে আসে। আর যায় কোথায়! ডক্টর-এর মাথায় জ্বলে উঠলো আগুন! ব্লাক-ম্যাজিকের 'দু-মন্তর' বলে সেই শ্বেতকায় ব্যক্তির ছেলের মুখে দিয়ে অনবরত ধুলো বেরোতে লাগল। ক্রমে ক্রমে ছেলেটির হল দম্‌বন্ধের দশা। ডাক্তাররা সবাই জবাব দিল। ছেলে মর-মর। অবশেষে সেই শ্বেতকায় ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে উইচ ডক্টর-এর পা জড়িয়ে ধরল। "দয়া করে বাঁচিয়ে দিন আমার ছেলেকে—আমার অন্যায় হয়েছে।" এতক্ষণে ডক্টর-এর রাগ কমল। নিজের মুখ থেকে খানিকটা থুথু বার করে খেতে দিল শ্বেতকায় ব্যক্তির ছেলেকে। ডাইনীর থুথু খেয়ে ছেলে সেরে উঠল। বিষে হল বিষক্ষয়।

আমাদের দেশেও অনেকটা এই ধরনের ঘটনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। একটা ঘটনা বলি। বেশ কিছুকাল আগে ঘটনাটি ঘটেছিল মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি একটি গ্রামে।

স্থানীয় এক ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন। দশ মাস দশদিন কেটে গেল অথচ ভদ্রমহিলা সন্তান প্রসব করলেন না। প্রতি মুহূর্তে প্রসব বেদনা ভোগের মধ্য দিয়ে আরও দুটি মাস কাটল। অবশেষে বড় বড় ডাক্তার বদ্যি পর্যন্ত রোগের কিনারা করতে না পেরে নিয়ে আসা হল এক বুড়ো ওঝাকে। ওঝাজী ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে বললেন যে গর্ভধারণের মাস তিনেকের মধ্যেই যুবতীকে কোন ডাইনী বাণ মেরেছিল। ফলে প্রসব যন্ত্রণা সত্ত্বেও সন্তান ভূমিষ্ঠ হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ওঝাটির পরামর্শে এবং সাহায্যে নিয়ে আসা হল আর একজন ডাইনীকে। উলটো বাণ মেরে ডাইনী বাণ তুলে আনল। মেয়েটি মা হল। এখানেও ঠিক একই অবস্থা। বিষে-বিষক্ষয়।

পৃথিবীর সব দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই একটা 'বিশ্বাস' প্রচলিত আছে যে সাধারণতঃ সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই 'ডাইনী' দেখা যায়। অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই ব্লাক-ম্যাজিক রপ্ত করে থাকেন এবং তাঁরাই ওই ম্যাজিকের শক্তিকে বিশ্বাস করেন। এই ধারণা বা বিশ্বাস ভ্রান্ত। তামাম দুনিয়ার ডাইনীবিদ্যার খেলা বা ব্লাক-ম্যাজিকের কুখ্যাত কেরামতির ইতিহাস উদ্ধার করে একথা প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে একদা সমাজের উচ্চমহলেও এ বিদ্যা তার আসন করে নিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের উচ্চমহলের বেশ কিছু খানদানী লোক নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য ডাইনী বিদ্যার সাহায্য নিয়েছিল। ওয়েস্ট মুরল্যাণ্ড-এর আর্ল তার বাবাকে ধ্বংস করে জুয়ার দেনা মেটাবার জন্য বাবার ধন-সম্পত্তি হস্তগত করতে ব্লাক-ম্যাজিকের সাহায্য নিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য ডাইনীবিদ্যার আশ্রয় নেবার দৃষ্টান্তও ওদেশে আছে। এলিস কিটেলার নামে এক বনেদী পরিবারের অভিজাত যুবতী তাঁর তৃতীয় স্বামীর দ্বারা অভিযুক্তা হয়ে আদালতে 'কুহকিনী নারী' হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং শাস্তি পেয়েছিলেন। এই মহিলা ব্লাক-ম্যাজিকের সাহায্যে তাঁর প্রথম দুই স্বামীর প্রাণ-সংহার করেন। অনেকেই সন্দেহ করেন যে নিত্য নতুন স্বামীসঙ্গ উপভোগ করার জন্যই যুবতী অনুরূপ কাজ করতেন। ভারতবর্ষেও শিক্ষিত ও উচ্চমহলের কোন কোন ব্যক্তি যে ব্লাক-ম্যাজিকের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন না সম্প্রতি তার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। গত বৎসর (১৯৬৭), ২১শে অক্টোবর তারিখে কলকাতার দৈনিক যুগান্তরের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায় যে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত চন্নপট্টনের একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ব্লাক-ম্যাজিক শেখার জন্য তাঁর আট বছরের মেয়ের মাথা কেটে ফেলেন বলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

ডাইনীবিদ্যা সত্য-সত্যই এক বিচিত্র বিদ্যা। এই বিদ্যা যারা রপ্ত করে, তারা আরও বিচিত্র, আরও বিস্ময়কর। কখনও দিবালোকে, কখনও নির্জন রাতে, কখনও একাকী, কখনও দলবদ্ধভাবে এরা এই সাংঘাতিক যাদুর খেলা প্রয়োগ করে। দলবদ্ধভাবে ইংলণ্ডের ডাইনীবিদ্যা প্রদর্শনের কথা বলতে গিয়ে ডঃ গার্ডনার বলেছেন যে, একজন নেতাসহ ৬ জন মহিলা এবং ৬ জন পুরুষ ডাইনী তাদের নিজেদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করা একটি ছুরি বা তরবারি দিয়ে প্রথমে মাটিতে একটি বৃত্তাকার স্থান চিহ্নিত করে নেয়। তারপর প্রচুর মদ আর কেক খেয়ে বৃত্তাকার স্থানের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে উন্মাদের মত নাচতে নাচতে এরা যাদুশক্তি প্রয়োগ করে। এই সমস্ত ডাইনীরা যে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের মত দুরন্ত যৌনবাসনার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত তা প্রমাণিত হয় যখন ডাঃ গার্ডনার জানান যে ঐ নৃত্যরত ১২ জন উলঙ্গ যুবক-যুবতীর মধ্যে কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রী এবং কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রী না হলেও পরস্পরের প্রতি এমনই অনুরক্ত থাকে যে পরবর্তীকালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

দিবালোকে দলবদ্ধভাবে যেমন ডাইনীদের আনাগোনা চলে তেমনি নিশুতি রাতে একাকীও কতিপয় ডাইনীদের কার্যকলাপের কাহিনী শুনলে রীতিমত আতঙ্কে উঠতে হয়। শেষোক্ত ডাইনীবিদ্যার সাংঘাতিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতবর্ষে। এখনও এদেশের অতি বড় সাহসী ব্যক্তিও নিশিডাকের কথা শুনলে শিউরে ওঠেন। যাঁরা নিশিডাকের কথা শুনেছেন তাঁরা নিশিডাকের সম্ভাবনা আছে জানতে পারলে আপন সন্তান-সন্ততিদের বুকের মধ্যে আগলে রেখে সারাটি রাত দুর্গানাম জপ করতে করতে নিদ্রাহীনভাবে কাটিয়ে দেন। কি এই নিশিডাক?

নিশিডাকও এক ধরনের বিপজ্জনক ব্লাক-ম্যাজিক বা বিশেষ কোনও মন্ত্রের অমঙ্গলজনক শক্তি। সুস্থ ব্যক্তির প্রাণসংহার করে কোন মৃত্যুমুখী অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করা হয় নিশিডাকের সাহায্যে। অমাবস্যার নিশুতি রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একটি কাঁচ ডাবের মুখ কেটে হাতে ডাবের ঢাকনী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিশিডাকবিদ্যা-আয়ত্তকারী (ডাইনী?)। রাত্রির অন্ধকারে

যে কোন বাড়ীর কোন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে তারই নিকট আত্মীয়ের কণ্ঠস্বর অবিকল নকল করে সে তার নাম ধরে ডাক দেয়। যদি কোনক্রমে সেই ঘুমন্ত ব্যক্তি ডাইনীর তিনটি ডাকের মধ্যে সাড়া দেয় তবে সে সংগে সংগে ভাবের মুখটি ঢাকনী দিয়ে বন্ধ করে ফেলে। এখানেই শেষ। এরপরেই সেই অদ্ভুত ডাকের শক্তিতে সেই ভাবের জল পান করে মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে আর সেই হতভাগ্য ব্যক্তি যে তিনটি ডাকে সাড়া দিয়েছিল, সে কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই নিশিডাকের ঘটনা ভারতবর্ষে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ঘটেছে বলে শোনা গেছে।

বিভিন্ন ধরনের ব্ল্যাক-ম্যাজিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বরাবরই প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এদের মধ্যে 'চুল কেটে নেওয়া', এবং 'দৃষ্টি দেওয়া' ব্ল্যাক-ম্যাজিকের উল্লেখযোগ্য প্রভাগ। শোনা যায়, কোন কোন দুষ্ট ব্যক্তি সুযোগ পেলেই কারণে বা অকারণে অন্যের চুল কেটে নেয়। এর ফল নানান রকমের হয়। কখনও সেই চুলকাটা জায়গায় আর চুল ওঠে না, কখনও মস্তিষ্কবিকৃত হয় ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় যে কোন লোকের কোন স্থানে কেটে গেলে বা ঘা হলে কোন ন্যাকড়া বা কাপড় দিয়ে সে সেই স্থানটি বেঁধে রাখে। অনেকের কাছেই এর কারণ হচ্ছে যে

ডাইনীরা যদি এইদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দৃষ্টি দেয় তবে সেই স্থানটি পচতে পচতে শরীরের সর্বত্র পচন ধরে। শুধু তাই নয়, একটু অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাব যে আজও পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সন্তানের জননী তাঁদের হৃষ্টপুষ্ট শিশুদের অত্যন্ত সাবধানে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। তাঁদের মতে কোন-ক্রমে দুষ্ট ব্যক্তির অশুভ দৃষ্টি শিশুদের উপরে পড়লে এই সব শিশুরা রুগ্ন হতে থাকে এবং সময়ে সময়ে তাদের প্রাণও বিপন্ন হয়।

উইচ বা ডাইনী শব্দটি শুনলে স্বভাবতঃই ধারণা হতে পারে যে এই সব ব্ল্যাক-ম্যাজিক আয়ত্তকারীরা সকলেই মহিলা। এই ধারণা ভ্রান্ত। উইচরা পুরুষ এবং মহিলা দুই রকমেরই হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে, বিশেষ করে বৃটেনের মেয়ে ডাইনীরা অধিকাংশ সময়েই বিড়ালের সঙ্গ পছন্দ করে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার বিড়াল বা নেকড়ে বাঘের আকার ধারণ করে। ওদেশের ডাইনীদের বিড়ালসান্নিধ্য-কামনার কারণ সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত পোষণ করেন। আমরা আপাততঃ সেই বহুবিতর্কিত মতামতের মধ্যে না গিয়ে বরং ওদের বিড়াল বা নেকড়ের আকার ধারণের কারণ অনুসন্ধান করব। অনেকেই মনে করেন যে এর কারণ দুটি। প্রথমতঃ ডাইনী যে ব্যক্তিকে ক্ষতি করতে চায়, আত্মগোপন করে তারই কাছাকাছি থাকা এবং দ্বিতীয়তঃ ডাইনী হিসাবে চিহ্নিত না করে বা ধরা না দিয়ে সাধারণ স্বাভাবিক এবং বিপদমুক্ত জীবনযাপন করা। এ সম্পর্কে দুটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করছি।

নরওয়েতে একবার একটা মিলে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে পর পর দু বছর আগুনে ধরে যায়। তিন বছরের মাথায় এক রাত্রিতে মিলের পাহারাদার হঠাৎ লক্ষ করল যে কতকগুলি বিড়াল মুখে একটি পিচ ভর্তি পাত্র নিয়ে মিলের ভিতরে ঢুকল এবং একটু পরে সেই পাত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মিলের সর্বত্র সেই আগুন লাগিয়ে দিতে আরম্ভ করল। ভয় পেয়ে পাহারাদার চিৎকার করে উঠতেই মিলের মালিক ছুটে এলেন সেখানে। বিড়ালের দল ততক্ষণে পাহারাদারকে আক্রমণ করেছে। ওদিকে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। মিলের মালিক ছুটে গিয়ে একটি বিড়ালের পা কেটে দিতেই চিৎকার করতে করতে সব কটি বিড়াল পালিয়ে গেল। পরদিন সকালে মিল মালিক দেখল যে মিলের আর সব যেমন-তেমন আছে কিন্তু নিজের ঘরে তার স্ত্রী শয্যাশায়ী। স্ত্রীর একখানি হাত কাটা। পরে এই স্ত্রীলোকটি ডাইনী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। বিড়ালের আকার ধারণ করে, লোকজনের অগোচরে সে স্বামীর ক্ষতি করার জন্য চেষ্টা করে বেড়াচ্ছিল! অথচ বেচারী স্বামী তাকে কোনদিন সন্দেহই করতে পারেনি।

আর একটি ঘটনাও বেশ লোমহর্ষক। একবার এক শিকারী কতকগুলি নেকড়ের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নেকড়েগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ভাগ্যক্রমে শিকারী একটি নেকড়ের একখানি পা কেটে ফেলতেই সব কটি নেকড়ে পালিয়ে যায়। নেকড়ের কাটা পা-টি পকেটে পুরে বাড়ী ফেরার পথে শিকারীর সঙ্গে তার এক বন্ধুর দেখা হল। বন্ধুকে শিকারী সব ঘটনা বলতে বলতে পকেট থেকে নেকড়ের পা-টি তুলে দেখাতেই বন্ধু চমকে উঠল। দুজনেই দেখল যে পা-টি ততক্ষণে একটি মহিলার হাতের আকার ধারণ করেছে। হাতের আঙুলে লাগানো একটি আংটি শিকারীর বন্ধুর ভীষণ পরিচিত। বন্ধু কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে দেখে যে ঘরে তার স্ত্রী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার একটি হাত কাটা। এই স্ত্রীলোকটিকে পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে ফেলে। আসলে ওই স্ত্রীলোকটি আত্মগোপন করে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের চর্চা করত। ও ছিল ডাইনী।

বিবসনা কিংবা উলঙ্গ কেন?—সবশেষে আর একটি প্রসঙ্গ তুলেই আমাদের আলোচনা শেষ করব। ইউরোপ মহাদেশের ডাইনীবিদ্যার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে অধিকাংশ ডাইনী (পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে) প্রায়ই উলঙ্গ অবস্থায় বা বিবসনা হয়ে তাদের যাদুশক্তি প্রয়োগ করে। এর কারণ কি? কেউ কেউ বলেন যে, সামান্যতম পোষাকও ডাইনীদের শক্তি-প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে। মিঃ টিনডল মনে করেন যে, প্রকৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন থেকে যাদুশক্তি প্রয়োগ করার জন্যই এরা বিবসনা থাকে। আমাদের দেশে ব্ল্যাক-ম্যাজিকের প্রদর্শনকারীরা সর্বক্ষেত্রে উলঙ্গ না থাকলেও শোনা যায় যে এরা এদের নিজস্ব উপাস্য সেই অদ্ভুত শক্তির কাছে নির্জনে বসে বিবস্ত্র অবস্থাতেই উপাসনা করে।

নানা ঘটনা, রটনা, বিভিন্ন লেখকের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকায় যুক্তি-নির্ভর আলোচনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, স্মৃতিকথন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই আলোচনায় যে সমস্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা গেল তা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে শুধু একদেশে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ব্ল্যাক-ম্যাজিক কিংবা ডাইনীবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকতে পারে। এ প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে—ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc) কি ডাইনী ছিলেন? নইলে তাঁকে কেন সেই অপরাধেই পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।
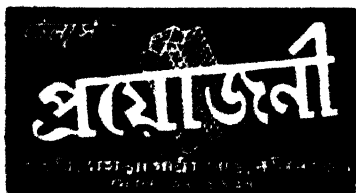
নিমাই ভট্টাচার্য

(৫)

ওয়েস্টার্ণ কোর্ট
জনপথ
নিউ দিল্লী

দোলাবৌদি,

আমি দিল্লী ফিরে এসেছি, কিন্তু কদিন এমন অপ্রত্যাশিত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটালাম যে, কিছুতেই তোমাকে চিঠি লেখার সময় পাইনি। তাছাড়া ইতিমধ্যে দু'দিনের জন্য তোমাদের বন্ধু মাধুরী চ্যাটার্জি আর তাঁর স্বামী এসেছিলেন। মাধুরীকে মনে পড়ছে তোমার? প্রেসিডেন্সীতে ফিলজফি নিয়ে পড়ত। পার্ক-সার্কাস বেকবাগানের মোড়ে থাকত।

দিল্লীতে আসার পর নিত্য-নৈমিত্তিক পরিচিত আধা-পরিচিত অনেকেই আসেন আমার আস্তানায়। কেউ ইন্টারভিউ দিতে, কেউ অফিসের কাজে, কেউ বা আবার দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বারের পথে লাল-কেল্লা-কুতুবমিনার আর রাজঘাট-শান্তিবন দেখার অভিপ্রায়ে। মাধুরী চালাক মেয়ে। হাজার হোক তোমাদেরই বন্ধু তো! স্বামী এসেছিলেন অফিসের কাজে, আর উনি এসেছিলেন স্বামীকে অনুপ্রেরণা দিতে। এখনও সেই আগের মতনই হৈ-হুল্লোড় করে। স্বামীকে সকাল বেলায় অফিসে রওনা করিয়ে দিয়ে সারা দিন নিজে হৈ-হৈ করে চক্কর কেটে বেড়াত আমার সঙ্গে। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম কিন্তু মাধুরী হতো না। বিকেল বেলায় স্বামী এলে আমাদের সেকেন্ড ইনিংস শুরু হতো।

যাই হোক বেশ কাটল দুটো দিন। মাধুরীর হাতে তোমার একটা শাড়ী আর পেটুক খোকনদার জন্য খানিকটা সোহন-হালুয়া পাঠিয়েছি। শাড়ীটা তোমার পছন্দ হলো কিনা জানিও।

যাই হোক এদিকে আমার মনের পর দিয়ে মৌসুমীর ঝড় বয়ে যাবার পর পরই আমি হঠাৎ সাংবাদিকতা শুরু করলাম। আমার জীবনের সে এক যুগসন্ধিক্ষণ। জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ ওলট-পালট হয়ে গেল। মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়ে, আই-এ পাশ করে বি-এ পড়ে। তারপর বি বি দত্তর সই করা পাশপোর্ট নিয়ে চোদ্দ আনা ছেলে ঢুকে পড়ত জীবনযুদ্ধের পাওয়ার লীগ খেলতে। বাকি দু' আনা আরো এগিয়ে যেত। তাদের মধ্যে কেউ ফার্স্ট-ডিভিশনের কেউ আই-এফ-এ শীল্ড বা রোভার্স খেলত। কেউ কেউ আবার আরো এগিয়ে যেত।

আমি পাওয়ার লীগে খেলবার জন্যই জন্মেছিলাম ও তারই প্রস্তুতি করছিলাম। মাঝে মাঝে অবশ্য স্বপ্ন দেখতাম ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। অথবা অধ্যাপক হয়ে কোথা দূরের কলেজে যাব, মেয়েদের পড়াব, ছেলেদের পড়াব। ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার জন্য মন আকুল ব্যাকুল হলেও আমি কিছুতেই তার প্রকাশ করব না। কিন্তু তবুও ছাত্রীরা আমার কাছে ছুটে আসবে নানা কারণে, নানা প্রয়োজনে। ইউনিয়নের বাড়ী একদিন চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করার অনেক মধুর কাহিনী ছড়াবে সমস্ত নারী-জগতের মধ্যে। তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি আর কি।

আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনদিন খবরের কাগজে চাকরির কথা তো দূরের কথা, খবরের কাগজের অফিসে পর্যন্ত যাননি। তাইতো কেউ কল্পনা করেননি তাদের বংশের এই কুলাঙ্গার খবরের কাগজে চাকরি করবে। দেশটা দু'টুকরো হবার আগে আমাদের সমাজজীবন কয়েকটা পরিচিত ধারায় বয়ে গেছে। সেই পরিচিত সীমানার বাইরে যাবার প্রয়োজন বা তাগিদ বিশেষ কেউই বোধ করেননি। দেশটা স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই অতীত দিনের সেসব রীতিনীতি, নিয়ম-কানুন প্রয়োজন কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এই শান্ত-স্নিগ্ধ পৃথিবীটা যেন কোটি কোটি বছর পেরিয়ে অগ্নি-বলয়ে পরিণত হলো। জৈব প্রয়োজনটা চরম নগ্নভাবে প্রকাশ হলো। ইতিহাসের বলি হয়ে মানুষগুলো বাঁচবার প্রয়োজনে উন্মাদের মত ছুটে বেড়াল চারদিকে। সেদিনের সে অগ্নি-বলয়ে পৃথিবীর যে যেখানে পারল আশ্রয় করে নিল। লক্ষপতির ছেলে কলেজ স্ট্রীটে হকার হলো, আমার-তোমার চাইতেও বনেদী ঘরের অনেক মেয়ে-বৌ বৌবাজারে আর কিড স্ট্রীটের ম্যাসেজ-বাথে গিয়ে দেহ বিক্রয় করতে বাধ্য হলো।

বৌবাজারের রথের মেলায় বা বিজয়া দশমীর দিন কুমোরটুলীর ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেছ? দেখেছ কেমন হাউ হাউ করে কাঁদে? লক্ষ করেছ বাবা-মাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে, ব্যাকুল হয়ে অর্থহীন ভাবে সবার দিকেই কেমন তাকায়? আমিও সেদিন এমনি করে অর্থহীন ভাবে চারদিকে তাকাচ্ছিলাম একটু জীবনের আশায়। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন—তা ভাববার সময় বা ক্ষমতা কোনটাই সেদিন আমার ছিল না। তাইতো অপ্রত্যাশিতভাবে খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার সুযোগ পেয়ে আমি আর দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলাম।

রামায়ণে পড়েছি সতীত্বের প্রমাণ দেবার জন্য সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়েও স্বামীর পাশে সীতার স্থান হয়নি। রাজ-রাজেশ্বরী সন্তানসম্ভবা সীতাকে প্রিয়-হীন বন্ধুহীন নিঃস্ব হয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। জান দোলাবৌদি, আমার মাঝে মাঝেই মনে হয় সীতার গর্ভেই বোধহয় বাঙালীর পূর্বপুরুষদের জন্ম। তা না হলে সমগ্র বাঙালী জাতটা এমন অভিশাপগ্রস্ত কেন হলো? স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চরম অগ্নিপরীক্ষা দেবার পরও কেন তার মুক্তি হলো না? স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও কেন তাদের চোখের জল পড়া বন্ধ হলো না?

সত্যি দোলাবৌদি, সেদিনের কথা মনে হলে আজও সর্বাঙ্গটা শিউরে ওঠে, মাথাটা ঘুরে যায়, দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়। সেই দুর্দিনের মধ্যেই আমি নতুন পথে যাত্রা শুরু করলাম। সকালবেলার টিউশানি দুটো ছাড়লাম না; কিন্তু বিকেলের ছাত্র-পড়ানো বন্ধ করলাম। দুপুরে অনেক আগে সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে বাজতেই নোট-বই পেন্সিল নিয়ে চলে যেতাম সভাসমিতি বা কোন প্রেস কনফারেন্সে। তারপর অফিস। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত রোজই কাজ করতে হতো। কোন কোনদিন আমার বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত তিনটে-চারটেও হয়ে যেত।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এমনি করে চালিয়েছি। বিনিময়ে কি পেয়েছি? প্রথম বছর একটি পয়সাও পাইনি। দিনের টিউশানির রোজ-গার দিয়ে ট্রাম-বাসের খরচ চালিয়েছি। পরের বছর থেকে মাসিক দশ-টাকা রোজগার শুরু করলাম। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাধনার প্রথম পর্ব শেষ করলাম। শিক্ষকদের অনেকে আশা করতেন, সাংবাদিকতার নেশা শেষ করে একটা রাস্তা ধর। সত্যি তখন অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতি এমন সংকটাপন্ন ছিল যে, কিছু একটা না করলে চলছিল না। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও এই একই সমস্যার সম্মুখীন হলো। সবাই উপলব্ধি করছিল কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে—তা কেউই জানত না। ডাক্তারী-ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার মত ক্ষমতা কারুরই ছিল না। তাই ওদিকে আর কেউ পা বাড়াল না। আমি রিফিউজি অফিস থেকে শুরু করে শিয়ালদহ-বারাকপুরের সমস্ত কল-কারখানার দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ালাম একটা পঞ্চাশ টাকার অ্যাপ্রেন্টিস-শিপের জন্য। জুটল না। তাই এবার বিজ্ঞান সাধনায় ইস্তফা দিয়ে সাহিত্য-সাধনা আর সাংবাদিকতা নিয়েই পরবর্তী অধ্যায় শুরু করলাম।

তোমাকে এত কথা লিখতাম না। তাছাড়া হয়ত কিছু কিছু তুমি শুনেছ যা

জেনেছ। কিন্তু এই জন্যই এসব জানাচ্ছি যে, আমার জীবনের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে মেমসাহেবকে পেয়েছিলাম, তা না জানলে তুমি ঠিক পুরোটা উপলব্ধি করবে না।

যৌবনে প্রায় সব ছেলেমেয়েই প্রেমে পড়ে। এটা তাদের ধর্ম, কর্ম। প্রয়োজনও বটে কিছুটা। তাছাড়া শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণতা লাভ করার এটা সব চাইতে বড় প্রমাণ। কলেজের কমনরুমে বা থিয়েটারের গ্রীনরুমে অনেক প্রেমের কাহিনীরই আদি-পর্ব রচিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মেয়াদ হয় ক্ষণস্থায়ী। সামান্য একটু হাসি, একটু গল্প, একটু মেলামেশার পর অনেক ছেলেমেয়েই প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে ওঠে। জীবনকে উপলব্ধি না করে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে যারা প্রেম করে বলে দাবী করে, তারা হয় বোকা, নয় মিথ্যাবাদী। দুটি মন, দুটি প্রাণ দুটি ধারা, দুটি অপরিচিত মানুষ একই সঙ্গে কোরাস গাইবে অথচ তার পরিবেশ থাকবে না, প্রস্তুতি থাকবে না, তা হতে পারে না। এই পরিবেশ আর প্রস্তুতি থাকে না বলেই আমাদের দেশের কলেজ-রেস্তোরাঁর প্রেম প্রায়ই ব্যর্থ হয়। দুধ জমিয়ে ভাল মিষ্টি দই খেতে হলে অনেক তম্বির, তদারক ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটু হিসাব-নিকাশ বা তম্বির-তদারকের গন্ডগোলে হয় দই জমে না, অথবা জমলেও দইটা টক হয়ে যায়।

দুটি নারীপুরুষকে নিয়ে একটা সুন্দর ছন্দবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে হলে শুধু চোখের নেশা আর দেহের ক্ষুধাই যথেষ্ট নয়। আরো অনেক কিছু চাই। তাছাড়া জীবনে এই পরম চাওয়া চাইবারও একটা সময় আছে। কিছু পেতে হলেও সে পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে হয়।

বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ও পরিবেশে অনেককেই অনেক সময় ভাল লাগে। হাসপাতালে হাসিখুসী ভরা নার্সদের কত আপন, কত প্রিয় মনে হয়। কিন্তু হাসপাতালের বাইরে? সমাজ-জীবনের বৃহত্তর পরিবেশে? কজন পারে তাদের আপন জ্ঞানে সমাদর করতে?

আমার জীবনটা যদি সুন্দর, স্বাভাবিক ও ছন্দময় হয়ে এগিয়ে যেত তাহলে হয়ত যে কোন মেয়েকে দিয়েই আমার জীবনের প্রয়োজন মিটত। কিন্তু আমি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছিলাম। একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে বাঁচবার জন্য অসংখ্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরেও কোন ফল হয়নি। মাত্র একশ' পঁচিশ টাকার একটা সামান্য রিপোর্টারের চাকরির জন্য কতজনকে যে দিনের পর দিন তৈল-মর্দন করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। তবুও বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের যোগ্য বংশধরদের মন গলেনি।

কেন, আত্মীয়-বন্ধুরা কোথায়? পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারের সঙ্গে আবার আত্মীয়তা কিসের? নিতান্ত দু'চারজন মূর্খ বন্ধু ছাড়া আর সবার কাছেই আমি অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম।

দোলাবৌদি, আমার সে চরম দুর্দিনের ইতিহাস তোমাকে আর বেশী লিখব না। তুমি দুঃখ পাবে। তবে জেনে রাখ তোমাদের ঐ কলকাতার রাজপথে আমি দীর্ঘদিন ধরে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি, একটি পয়সার অভাবে সেকেন্ড ক্লাশ ট্রামে পর্যন্ত চড়তে পারিনি। দু'চারজন নিকট আত্মীয়ের প্রতি কর্তব্য পালন করে বহুদিন নিজের অদৃষ্টে দু'বেলা অন্ন জোটাতেও পারিনি। কিন্তু কি আশ্চর্য! বিধাতাপুরুষ যত নিষ্ঠুর হয়েছেন আমার প্রতিজ্ঞাও তত প্রবল হয়েছে। বিধাতার কাছে কিছুতেই হার মানতে চায়নি আমার মন।

এমনি করে বিধাতাপুরুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে প্রায় সাত-আট বছর কেটে গেল। তবুও কোন কূল-কিনারা নজরে পড়ল না। এই সাত-আট বছরে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। সাত-আট বছর আগে শুধু বেঁচে থাকবার জন্য আমি কর্মজীবন শুরু করেছিলাম, কিন্তু সাত-আট বছর পরে আমি শুধু বাঁচতে চাইনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের অরণ্যের মধ্যে আমি হারিয়ে যেতে চাইনি। চাইনি শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যার সমাধান করতে। মনে মনে আরো কিছু আশা করছিলাম।

কিন্তু আশা করলেই তো আর সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া শুধু আশা করে আর কতদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করা যায়? আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। মনের শক্তি, দেহের তেজ যেন আস্তে আস্তে হারাতে শুরু করলাম। হাজার হোক ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে।

কাজকর্মে ফাঁকি দিতে শুরু করলাম। ঘুরে-ফিরে নিত্য-নতুন খবর জোগাড় করার চাইতে নিউজ ডিপার্টমেন্টে সাব-এডিটরদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়াই আমার কাছে বেশী আকর্ষণীয় হলো। শুধু আমাদের অফিসেই নয়, আরো অনেক আড্ডাখানায় যাতায়াত শুরু করলাম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেমন যেন দার্শনিকসুলভ ঔদাসীন্য দেখা দিল। মোদ্দা-কথায় আমি যেন পাল্টাতে শুরু করলাম।

বেশীদিন নয়, আর কিছুকাল এমনি করে চললে আমি নিশ্চয়ই চিরকালের মত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতাম। ঠিক এমনি এক চরম মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অঘটন।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরছিলাম কলকাতা। বোলপুর স্টেশনে দানাপুর প্যাসেঞ্জারের আমার কামরায় আরো অনেকে উঠলেন। ভীড়ের মধ্যে কোনমতে এক পাশে একটু জায়গা করে আমি বসে পড়লাম। জানলার পাশে মাথাটা রেখে আনমনা হয়ে কিছুক্ষণ কি যে দেখছিলাম। দু'চারটে স্টেশনও পার হয়ে গেল। বীরভূমের লাল-মাটি আর তালগাছ কখন যে পিছনে ফেলে এসেছি, তাও খেয়াল করলাম না। বাইরে অন্ধকার নেমে এলো। উদাস দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে কামরার মধ্যে নিয়ে এলাম। ভাবছিলাম কামরাটাকে একটু ভাল করে দেখে নেব। কিন্তু পারলাম না। দৃষ্টিটা সামনের দিকে এগুতে গিয়েই আটকে পড়ল। এমন বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল গভীর কালো টানা-টানা দুটি চোখ আগে কখনও দেখিনি। একবার নয়, দু'বার নয়, বার বার দেখলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে আবার দেখলাম। আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখলাম। অসভ্যের মত, হ্যাংলার মত আমি শুধু ঐ দিকেই চেয়ে রইলাম।

আমি যদি খোকনদার মত সাহিত্যের ভাল ছাত্র হতাম ও সংস্কৃত সাহিত্য পড়া থাকত, তাহলে হয়ত কালিদাসের মেঘদূতের উত্তরমেঘ থেকে 'কোট' করে বলতাম—

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা
নিম্ননাভিঃ।'

কালিদাসের মত আমি আর এগিয়ে যেতে পারিনি। এইখানেই আটকে গেলাম। তাছাড়া দানাপুর প্যাসেঞ্জারের ঐ কামরায় অতগুলো প্যাসেঞ্জারের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে এর চাইতে বেশী কি এগুতে পারা যায়?

পরে অবশ্য মেমসাহেবকে আমি আমার সেদিনের মনের ইচ্ছার কথা বলেছিলাম। কমাস পর আমি আর মেমসাহেব দানাপুর প্যাসেঞ্জারেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা ফিরছিলাম। বর্ধমানে এসে কামরাটা প্রায় খালি হয়ে গেল। ও পাশের বেঞ্চিতে শুধু এক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছাড়া আর কোন যাত্রী ছিল না। মেমসাহেব আমার হাতের পর মুখটা রেখে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও যেন কি ভাবছিলাম। হঠাৎ মেমসাহেব আমাকে একটু নাড়া দিয়ে বলল, শোন।

আমি ঠিক খেয়াল করিনি। মেমসাহেব আবার আমাকে ডাক দিল, শোন না!

'কিছু বলছ?'

মেমসাহেব হাত দিয়ে আমার মুখটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। আঙুল দিয়ে আমার কপালের পর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। দু'চার মিনিট শুধু চেয়ে রইল আমার দিকে। একটু হাসল। সলজ্জ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে।

এবার আমি ওর মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কিছু বলবে?

আমার দিকে তাকাতে পারল না। ট্রেনের কামরার ঐ স্বল্প আলোয় ঠিক বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হলো যেন লজ্জায় ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে। দেখতে বেশ লাগছিল। দু'চার মিনিট আমি ওকে প্রাণভরে দেখে নিলাম। তারপর কানে কানে ফিস ফিস করে বললাম, লজ্জা করছে?

মেমসাহেব জবাব দিল না। শুধু হাসল। একটু পরে আমার কানে কানে বলল, একটা কথা বলবে?

'বল।'

'প্রথম যেদিন তুমি আমাকে এমনি ট্রেনে যাবার সময় দেখেছিলে, সেদিন আমাকে তোমার ভাল লেগেছিল?'

মনে হয়েছিল—

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্ববিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে
সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।'

মেমসাহেব ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরে বলল, অসভ্য কোথাকার!

'ছি, ছি, মেমসাহেব, তুমি আমাকে অসভ্য বললে। অসভ্য বলতে হলে কালি-দাসকে অসভ্য বলো।'

আমি একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি রামায়ণ পড়েছ?

'কেন? এবার বুঝি রামায়ণের একটা কোটেশন শোনাবে?'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'পড়েছি।'

'মূল রামায়ণ না তার অনুবাদ পড়েছ?'

'মূল সংস্কৃত রামায়ণ পড়িনি, কিন্তু অনুবাদ পড়েছি।'

'বেশ! পড়ে! অরণ্যকাণ্ডে সীতাকে প্রথম দেখার পর রাবণ কি বলেছিলেন জান?'

'সীতার রূপের তারিফ করেছিলেন কিন্তু ঠিক কি বলেছিলেন, তা মনে নেই।'

'বেশ তো আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাবণ সীতাকে বলেছিলেন—'

মেমসাহেব বাধা দিয়ে বললো, 'তোমার আর শোনাতে হবে না। ঠিক লাইনগুলো মনে না থাকলেও আমি জানি রাবণ কি ধরনের সাংঘাতিক বর্ণনা করেছিলেন।'

একটু থেমে দুষ্টুমী একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখের কাছে মুখটা এনে বলল, তুমিও তো আর এক রাবণ! ডাকাত কোথাকার! দিনে দুপুরে কলকাতা শহরের মধ্যে আমাকে চুরি করল!

থাকগে সেসব কথা। সেদিন শেষ-পর্যন্ত ধরা পড়েছিলাম। চুরি করে দেখতে দেখতে একবার ধরা পড়লাম। চোখে চোখ পড়তেই আমি দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু মিনিটখানেক পরেই আবার চেয়েছি। আবার ধরা পড়েছি। আবার চেয়েছি, আবার ধরা পড়েছি।

মেমসাহেবের আর দুটি বন্ধু কিছু ধরতে না পারলেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছ-বার পর কামরা থেকে বেরুবার সময় আমার মনটা যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা ও বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু কি করা যাবে? দুজনের কেউই কিছু বলতে পারিনি। জীবনের বর্ণময় পথ চলতে গিয়ে এমনি একটু-আধটু বিদ্যুতের চমকানি তো সবার জীবনেই দেখা দিতে পারে। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অস্বাভাবিকতাও কিছু নেই।

ওরা তিন বন্ধু কামরা থেকে নামবার বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি নামলাম। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিলাম গেটের দিকে। আরেকবার তাকিয়ে নিলাম ওর দিকে। মনে মনে ভাবছিলাম, এইত একটু পরেই দুজনে হারিয়ে যাব কলকাতা শহরের জনারণ্যের মধ্যে। আর হয়ত জীবনেও কোনদিন দেখা হবে না। হয়ত কেন? নিশ্চয়ই কোনদিন দেখা হবে না।

হঠাৎ গেটের দিকে তাকাতে নজর পড়ল, মেমসাহেব একবার মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। আমি দূরে থেকে হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানালাম।

কেউ বুঝল না, কেউ জানল না, কি ঘটে গেল। এমন কি আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি কি হয়ে গেল। আমি তো এর আগে কোনদিন কোন মেয়ের দিকে অমন করে দেখিনি, কোন মেয়েও তো অমন করে আমাকে মাতাল করে তোলেনি। কেন এমন হলো? শুধু বুঝেছিলাম, বিধাতাপুরুষের নিশ্চয়ই কোন ইঙ্গিত আছে। আর মনে মনে জেনেছিলাম, দেখা আমাদের হবেই।

বিশ্বাস কর দোলাবৌদি, শুধু আমার চোখের নেশা নয়, শুধু মেমসাহেবের দেহের আকর্ষণও নয়, আরো কি যেন একটা আশ্চর্য টান অনুভব করেছিলাম মনের মধ্যে। মনে মনে বেশ উপলব্ধি করলাম যে, আমার জীবনযুদ্ধের নতুন সেনাপতি হাজির! এই নতুন সেনাপতি আমাকে সহজে পরাজয় বরণ করতে দেবে না, আমাকে পিছিয়ে যেতে দেবে না। আমাকে হারিয়ে যেতে দেবে না ভবিষ্যতের অন্ধকারে।

অদৃষ্ট যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, কি আশ্চর্যভাবে দুটি অপরিচিত মানুষকে নিবিড় করে এক সূত্রে বেঁধে দেয়, তা ভাবলে চমকে উঠি।

পরের দিন বেশ দেরী করে অফিসে গেলাম। চীফ রিপোর্টার আশা করেননি আমি অফিসে আসব। তাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং আর গোটা তিনেক প্রেস কনফারেন্স কভার করার ব্যবস্থা আগেই করেছিলেন। তবুও আমি যেতেই উনি লাফিয়ে উঠলেন, দেখে আশ্চর্য হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার?

'তুমি দৌড়ে একবার পার্ক স্ট্রীট আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রীতে গিয়ে যামিনী রায়ের এক্জিবিশনটা দেখে এসো। আজই শেষ দিন। ওর একটা রিভিউ না বেরুলে দোতলায় উঠতে পারছি না।'

বুঝলাম উপরওয়ালারা বার বার বলা সত্ত্বেও এক্জিবিশনটার রিভিউ ছাপা হয়নি এবং এডিটর সাহেব বেশ অসন্তুষ্ট।

কলকাতার অন্যান্য রিপোর্টারদের মত আমিও নৃত্য-গীত বা শিল্পকলা বুঝতাম না, কিন্তু প্রয়োজনবোধে কলমের পর কলম রিপোর্ট লিখতে পারতাম ওসব নিয়ে। কেন তানসেন-সম্মেলনও তো কভার করেছি। বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব গাইবার আগে স্টেজের পাশে ব্ল্যাকবোর্ডে 'রাগ' ইত্যাদি লিখে দিত। আমার মত সঙ্গীত-বিশারদ রিপোর্টারের দল সেই কথাগুলি ভাঙিয়েই বেশ এক প্যারা লিখে দিতাম। শেষে আবার বাহাদুরী করে হয়ত মন্তব্য লিখতাম, গতবারের চাইতেও এবারের খাঁ সাহেবের গান অনেক বেশী জোরালো হয়েছিল। অথবা লিখেছি, রাগ রাগেশ্রীতে শ্রোতার মাতিয়ে মুগ্ধ করলেন রবিশঙ্কর। অনেকে বিলায়ত খাঁকে পছন্দ করলেও আমার মনে হল রাগ রাগেশ্রীতেই রবিশঙ্কর তাঁর শিল্পীসত্তাকে সব চাইতে বেশী প্রকাশ করতে পেরেছেন।

কেন মহাজাতি সদনের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনে? রোজ অন্তত এক কলম লিখতেই হতো। লিখেছি, আজকের অধিবেশনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন দ্বিজেন মুখার্জি। বিশেষ করে তাঁর শেষ গানখানি 'তবু মনে রেখো' ... 'ভরা থাক ভরা থাক স্মৃতি-সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি' বহুদিন ভুলতে পারব না। গত বছরের সম্মেলনে এই গানখানিই আর একজন নামজাদা শিল্পী গেয়েছিলেন। ভালই গেয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যেন এত ভাল লাগেনি। বোধকরি দরদের অভাব ছিল। তাছাড়া কিছু কিছু গান আছে যা বিশেষ বিশেষ শিল্পীর কাছেই ভাল লাগে। 'চৈত্র দিনের ঝরা পাতার পথে' অনেকেই গাইতে পারেন, কিন্তু পঙ্কজ মল্লিকের মত কি আর কেউ গাইতে পারবেন? কেন সায়গলের গাওয়া 'আমি তোমার মত' বা কানন দেবীর 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে'?...

এমনি করে কিছুটা কমনসেন্স আর কলমের জোরে রিপোর্টারের দল বেশ কাজ চালিয়ে যান। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা অনেকটা মফস্বলের ডাক্তারবাবুদের মত। কিছুতেই বিশেষজ্ঞ নন, অথচ সব কিছু রোগেরই চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনবোধে ছুরি-কাঁচি নিয়ে একটা ফোড়া অপারেশন পর্যন্ত চাপিয়ে পঞ্চানন চাটুজ্যে বা ঘরোয়া মুখার্জির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও দ্বিধা করেন না।

সুতরাং আমিও দ্বিধা না করে চলে গেলাম যামিনী রায়ের এক্জিবিশন রিভিউ করতে।

ওকেই এক্জিবিশনের শেষ দিন, তার-পর আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রীর ছোট্ট ঘর। বেশ ভীড় হয়েছিল। তবুও আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কিছু কিছু নোট নিচ্ছিলাম। একটা হলের দেখা শেষ করে পাশের হলটার যাবার মুখে অকস্মাৎ দেখা পেলাম মেমসাহেবের। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, কিন্তু যাহার হোক Truth is strange than Fiction. তাই না দোলাবৌদি?

প্রায় দুজনেই একসঙ্গে বললাম, আরে, আপনি?

'আপনি বুঝি যামিনী রায়ের ভক্ত?'—আমাকে প্রশ্ন করে মেমসাহেব।

'পঞ্চাশ টাকা মাইনের রিপোর্টারী করি বলে এই আর্ট-কল্চার জন্য ভক্ত হয়েছি।'

'আপনি বুঝি রিপোর্টার?'

'নির্লজ্জ আর বেহায়াপনা দেখে এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে?'

'ছি, ছি, ওকথা কেন বলছেন?'

পাশের গেলিটিকে এক নজর দেখে মেমসাহেব মন্তব্য করল, রিপোর্টারদের তো ভারী মজা।

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, সবাই এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস...

শেষ করতে হল না। তার আগেই বলল, আপনি দেখছি রবীন্দ্রনাথেরও ভক্ত।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আর একটু পরে দেখবেন আমি আপনারও ভক্ত।'

—ক্রমশ, বাঃ.।

রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে অনন্য গবেষণা

অধ্যাপক রোনাল্ড নরিশ

অধ্যাপক ম্যানফ্রেড আইগেন
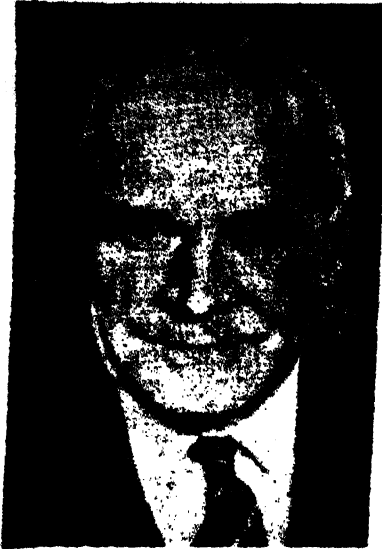
যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া অতি-দ্রুত সম্পাদিত হয় সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান এতদিন পর্যন্ত সীমিত ছিল। এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তা নির্ণয় করা এতদিন দুরূহ ছিল। সম্প্রতি তিনজন রসায়ন-বিজ্ঞানীর অনন্য গবেষণার ফলে অতিদ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে ঘটে তা যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। এক সেকেন্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাদের বিষয়ও এখন সঠিকভাবে জানা গেছে।

এই তিনজন রসায়ন-বিজ্ঞানী হলেন বৃটেনের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারি-টাস অধ্যাপক রেনাল্ড জর্জ নরিশ, লন্ডনের রয়েল ইন্সটিটিউশনের অধিকর্তা অধ্যাপক জর্জ পোর্টার এবং পশ্চিম জার্মানীর গটিনজেনে ম্যাক্স্-প্ল্যাঙ্ক ইন্সটিট্যুটের ভৌত রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ম্যানফ্রেড আইগেন। স্বল্পস্থায়ী উচ্চশক্তি স্পন্দনের সাহায্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা ব্যাহত করে তাঁরা অতি দ্রুত সম্পাদিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেন।

তাঁরা যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা হচ্ছে বিক্রিয়াশীল ও বিক্রিয়ালব্ধ দ্রব্য-গুলির মধ্যে যে সাম্যাবস্থা থাকে তা প্রথমে ব্যাহত করা এবং তারপর বৈদ্যুতিক, তাপিক বা আলোকসংক্রান্ত উপায়ে সাম্যা-বস্থা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সময় নির্ণয় করা। তাঁদের এই অনন্য গবেষণার ফলে এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়ে সম্পাদিত বিক্রিয়ার কার্যপ্রণালীও যথা-যথভাবে উপলব্ধি করা গেছে। আর তাঁদের এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ১৯৬৭ সালে তাঁদের তিনজনকে যৌথভাবে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। প্লাস্টিক শিল্পে এবং অতিকায় অণুগঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁদের এই গবেষণা প্রযুক্ত হয়েছে। অতিদ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এই গবেষণার ফলে প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসায়নিক গতিবিদ্যা সম্পর্কে অনুরূপ অনুসন্ধানের জন্যে ইংলন্ডের পরলোকগত স্যার সিরিল হিন-সেলউড এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অধ্যাপক নিকোলাই সেমেনভকে ১৯৫৬ সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এ-থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক নরিশ, অধ্যাপক পোর্টার এবং অধ্যাপক আইগেনের কর্মকৃতি সম্পর্কে এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

অধ্যাপক রোনাল্ড নরিশ

অধ্যাপক নরিশ ১৮৯৭ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজের পার্স স্কুলে এবং এমানুয়েল কলেজে শিক্ষা এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি এবং ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। এমা-নুয়েল কলেজের রিসার্চ ফেলো হিসাবে তাঁর গবেষক-জীবনের শুরু (১৯২৫-৩১)। এরপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়নশাস্ত্রের লেকচারাররূপে তিনি যোগদান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৮ বছর (১৯৩৭-৬৫) তিনি ভৌত-রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধানরূপে কাজ করেন এবং ১৯৬৫ সালে অবসর-গ্রহণের পর এমারিটাস অধ্যাপকপদে বৃত হন। ১৯৩৬ সালে তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ভৌত রসায়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে অধ্যাপক নরিশ দেশবিদেশের বহু সম্মাননা ও পদক লাভ করেছেন। প্যারিস, লীডস্ এবং শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান-সূচক ডি-এস-সি ডিগ্রী প্রদান করেন। পোলিশ কেমিক্যাল সোসাইটি, সুইডেনের উপসালার রয়েল সোসাইটি অব সায়েন্স-এর তিনি সম্মানিত সদস্য। অধ্যাপক নরিশ এখনও ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করেন এবং শিল্পসংস্থাসমূহ তাদের সমস্যা সমাধানে তাঁর পরামর্শ পেয়ে থাকে।

অধ্যাপক জর্জ পোর্টার

অধ্যাপক পোর্টার ১৯২০ সালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষালাভ করেন থর্ন গ্রামার স্কুল, লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেম্ব্রিজের এমানুয়েল কলেজে। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর গবেষক-জীবনের সূচনা। অধ্যাপক নরিশের মতো তিনিও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ-ডি এবং ডি-এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি রাজকীয় নৌবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভৌত রসায়ন বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। এরপর এমানুয়েল কলেজের ফেলো এবং ভৌত রসায়ন গবেষণার উপাধ্যক্ষ হন। ১৯৫৫ সালে তিনি শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে

জৈব রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন। অন্যান্য বিশ্বসমাজ থেকে তিনি সম্মাননা লাভ করেছেন। 'আধুনিক জগতে রসায়ন' শীর্ষক একটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

১৯৪৯ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরিশ এবং অধ্যাপক পোর্টার অতি-দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে একযোগে গবেষণা শুরু করেন। ক্লোরিন গ্যাসের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান চালান। একদিকে ক্লোরিন পরমাণুর মধ্যে সংঘাত ও অণুগঠন এবং অপরদিকে অণু ভেঙে পরমাণুর সৃষ্টি নিয়ে এই সাম্যাবস্থা রচিত হয়। স্বল্পস্থায়ী অতি শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্পার্কের সাহায্যে ক্লোরিন গ্যাসকে অভিঘাত করে তাঁরা সাম্যাবস্থা ব্যাহত করেন। এই বিশৃঙ্খলার ফলে সাধারণত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিঘ্নিত অবস্থায় যে গতিতে ক্লোরিন অণু স্বাভাবিকভাবে পুনর্গঠিত হয় তা তাঁরা পরিমাপ করেন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তাঁরা কেম্ব্রিজে একযোগে কাজ করেছিলেন, তারপর অধ্যাপক পোর্টার শেফিল্ডে চলে যাওয়ায় স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করেন।

অধ্যাপক মানফ্রেড আইগেন

অধ্যাপক আইগেন ১৯২৭ সালে জার্মানীর বোখামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জার্মানীর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীর কাছে গটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র পাঠ গ্রহণ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়ন বিভাগে তাঁর গবেষক-জীবনের সূচনা। ১৯৫৩ সালে গটিনজেনের ম্যাকস্ প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটে ভৌত রসায়ন বিভাগে সহকারী বিজ্ঞানী হিসাবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে এই বিভাগের তিনি অধ্যক্ষ। ভৌত রসায়নে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে তাঁকে ওয়াশিংটন, হারভার্ড এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ভৌত রসায়ন সম্পর্কে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা।

অধ্যাপক আইগেন হাইড্রোজেন গ্যাসের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছেন। জলের অণুর ভাঙনের ফলে যে হাইড্রোজেন আয়নের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন। বিস্ফোরণের স্পন্দন বা উচ্চশক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্পন্দনের সাহায্যে তিনি হাইড্রোজেন আয়ন গঠনের সাম্যাবস্থা ব্যাহত করেন। এই অনুসন্ধানে তিনি যে ফল লাভ করেছেন তা এখন জীবতাত্ত্বিক জগতে এনজাইম বিক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োগ করছেন। —[illegible]

ভেষজশাস্ত্রে সোনার সিঁড়ি

*বিগত শতকগুলির আন্তর্জাতিক ভেষজ বিজ্ঞানের চিরায়ত সাহিত্যরাজি একটি সোনার সিঁড়ি যা বেয়ে মানবজাতি আধুনিক জ্ঞানের শিখরে আরোহণ করেছে। এসব রচনা প্রকাশে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিপুল প্রয়াস করেছেন। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। শুধু প্রাচীন গ্রীক, আরবী, লাতিন ও ইতালীয় ভাষাগুলি থেকে অনুবাদ এই প্রয়াসের অন্তর্গত ছিল না। ভেষজ ভাষাতাত্ত্বিক ও পরিভাষাগত বিপুল গবেষণার প্রয়োজন হয়েছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ব্যক্তি এসব চিরায়ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা চালাতে হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় জীববিজ্ঞান ও ভেষজশাস্ত্র প্রকাশনা ভবনের প্রথম কৃতিত্ব ছিল তিন খণ্ডে হিপোক্রেটিস-এর রচনাবলী প্রকাশ (১৯৩৬—৪১)। মূল গ্রীক থেকে এর অনুবাদ করেছিলেন অধ্যাপক বি রুদনেভ এবং ভূমিকা ও টীকা লিখেছিলেন অধ্যাপক ভি কর্পোভ।

১৯৪৮ সালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর প্রকাশনা ভবন রুশ ভাষায় উইলিয়াম হার্ভের 'এক্সারসিটাশিও অ্যানাটোমিকা দ্য মোতু কর্ডিস এত্ সাঙ্গুইনিস ইন এনিম্যালিবাস' মুদ্রণ করে।

শরীরসংস্থান - শারীরতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক গবেষণার ফলশ্রুতি ছিল আন্দ্রিয়াস ভেসালিয়াসের (১৫১৪ — ১৫৬৪) 'দ্য কর্পোরিস হিউম্যানি ফ্যাব্রিকা' গ্রন্থ। শরীর-সংস্থান বিদ্যাচর্চায় তিনি এক নতুন যুগের উন্মোচন করেছিলেন। এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর গ্রন্থের প্রথম সোভিয়েত সংস্করণ সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির প্রকাশনা ভবন ১৯৫০—৫৪ সালে প্রকাশ করে।

মধ্যযুগের ভেষজশাস্ত্রের একটি বৃহৎ কীর্তি আবু ইবন সিনার বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ 'চিকিৎসা সংহিতা'। এই ভেষজ বিশ্ব-কোষটির অনুবাদ করা হয় একাদশ শতকের মূল আরবী পাণ্ডুলিপি থেকে। ১৯৫৪—৬০ সালে তাশখন্দে রুশ ও উজবেক ভাষায় টীকাসহ [illegible] বৃহৎ খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। একালে সোভিয়েত আরবী বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকের বিপুল গবেষণার ফলশ্রুতি এই অনুবাদ প্রকাশ। ইউরোপ বা আমেরিকা কোথাও এই সংহিতার পুরো অনুবাদ পাওয়া যায় না।

প্রাচ্যের এই মহান চিকিৎসকের মাথার খুলির আলোকচিত্র ও তার বিশদ বিবরণ থেকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁর প্রকৃত চেহারা খাড়া করতে সক্ষম হয়েছেন। মধ্যযুগ ও আধুনিককালে ইবন সিনার বহু প্রতিকৃতি দেখা গেছে তার সবগুলিই শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত। বিখ্যাত সোভিয়েত নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানী অধ্যাপক মিখাইল গেরাসিমভের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জটিল কাজটির বিবরণ রয়েছে তাঁর 'ইবন সিনার প্রতিকৃতি' বইটিতে।

গ্যালেনাসের কালের আগে প্রাচীন রোমের ভেষজশাস্ত্রে একজন প্রতিনিধি অরেলিয়াস সেলসাস। তাঁর আট খণ্ডের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'দ্য মেডিসিনা' এক দল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের দ্বারা অনূদিত হয়।

শরীরসংস্থান — শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার একটা বৃহৎ কীর্তি লিওনার্দো দা ভিঞ্চির (১৪৫২—১৫১৯) চমৎকার রচনাবলী। শরীরসংস্থানবিদ্যা সম্পর্কে তিনি ১২০টি নোটবই লিখেছিলেন এবং তাঁর মতে এই রচনার সময় 'তাঁর পরিশ্রমের অভাব ছিল না, অভাব ছিল সময়ের'। ধমনী সম্পর্কে তাঁর গবেষণা ও বিস্ময়কর ছবি-এর সব আমাদের হাতে আসে নি। পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন মহাফেজখানায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি সংগ্রহ করতে অবিশ্বাস্য রকমের জটিল ধরনের কাজ করতে হয়েছিল। ফলে বিজ্ঞান প্রকাশনা ভবন ১৯৬৫ সালে রুশ ভাষায় শরীর-সংস্থান বিদ্যা সম্পর্কে এই মহান বিজ্ঞানীর রচনাবলী প্রকাশ করতে পেরেছিল। সে সময়েই এই বিজ্ঞানী আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানী ও শিল্পীর জন্মকালীন, তাঁর কালের পর্যাপ্ত সবই এই নোটবইয়ে প্রতিফলিত। মূল ইতালীয় ভাষা থেকে অনুবাদ করে সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি টীকাসহ এই পুস্তক প্রকাশ করে। নবীন সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ দানে এই পুস্তক চমৎকার সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

ভেষজ বিজ্ঞানের একটি অতি আগ্রহোদ্দীপক কীর্তি 'সালের্নো স্বাস্থ্য কোড' — রচয়িতা ভিলানোভার আর্নল্ড (১২৩৫—১৩১১)। এই চিরায়ত গ্রন্থটি ১২০টি সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। লাতিন হস্তলিপি গ্রন্থ থেকে একই ছন্দে রুশ ভাষায় এটি অনূদিত হয়। ১৯৬৪ সালে ভেষজশাস্ত্র প্রকাশনা ভবন এটি রুশ ভাষায় প্রকাশ করে। স্বাস্থ্যরক্ষার যেসব ব্যবস্থাপত্র এতে আছে তা আধুনিক পাঠকেরও যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি করে।

রোমান ভেষজশাস্ত্রের বিশিষ্টতম প্রতিনিধি ছিলেন ক্লডিয়াস গ্যালেনাস। রুশ ভাষায় এই মহান চিকিৎসকের কোন রচনাই আগে প্রকাশিত হয় নি। ভেষজশাস্ত্র প্রকাশনা ভবন এই বিজ্ঞানীর প্রধান রচনা 'মানবদেহের অংশসমূহের ব্যবহার সম্পর্কে' — এর সঠিক রুশ সংস্করণ তৈরি করেছে। ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকায় ইংরেজী ভাষায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।

বিদেশিনী, তার উপর শ্বেতাঙ্গিনী, অতএব বলুন কলকাতা আপনার কেমন লাগছে, এই প্রশ্ন দিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করিনি। হুগলী বেয়ে স্টীমার চলছিল, ডেকচেয়ারে বসে দুকূলের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই বললেন, "কলকাতা আর নিউ অর্লিয়ান্স কোথায় যেন মিল আছে এই দুই শহরে। কলকাতায় এলেই আমার নিউ অর্লিয়ান্সের স্মৃতি জেগে ওঠে।"

মিসিসিপির মোহানার অদূরে উজানে নিউ অর্লিয়ান্স শহর, যেমন হুগলীর মোহানায় কলকাতা। আমেরিকার অন্যতম বৃহত্তম বন্দর নিউ অর্লিয়ান্স, যেমন কলকাতা ভারতবর্ষের। প্রায় চার হাজার মাইল পথ বয়ে মিসিসিপি তার সব জল ঢেলে দেয় অতলান্তিকের উপসাগর গাল্ফ অফ্ মেক্সিকোতে—আর তার সঙ্গে বছরে চল্লিশ কোটি টন কাদা। নিউ অর্লিয়ান্স পর্যন্ত জাহাজ চালু রাখতে চব্বিশ ঘন্টা ড্রেজার দিয়ে কাদা পাম্প করে বার করে দিতে হয়। "হুগলীর জল কী আন্দাজ পলি বয়ে নিয়ে আসে বঙ্গোপসাগরে?" জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা। আমাদের স্টীমার তখন হুগলীর একটা ড্রেজারের পাশ দিয়ে জল কেটে মোহানার দিকে এগোচ্ছে।

শুধুমাত্র এইটুকু মিল না আরও কিছু, এটুকু তো প্রাথমিক ভূগোলের জ্ঞান থেকেই জানা যায়। অবশ্য প্রশ্ন করাই বিড়ম্বনা, অজান্তে কখন আলোচনা গিয়ে ঠেকবে কলকাতার আবর্জনায় আর ভিখিরীতে কে জানে। কিন্তু উনি সে পথে গেলেন না। বললেন, "নিউ অর্লিয়ান্স পুরাতনকে ভালবাসে। সত্যি বলতে কী, পুরাতনকে যেন আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। কলকাতাও তাই। সেইজন্যই কলকাতাকে এত ভাল লাগে।"

এখানে অবশ্য একটা কথা চেপে যেতে চেয়েছিলাম। কলকাতা পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় কি? কলকাতার নতুন হবার সম্ভাবনা সীমিত অতএব পুরাতনকে সহ্য করা ছাড়া তার উপায় নেই। না, বিদেশীকে ভুল তথ্য পরিবেশন করার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় নেই। বরং সরল মনে গলদ স্বীকার করা ভাল। বললাম, "অবশ্যই এ'দের মতি আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবৃত্তি আমাদের নেই, তবে রক ছাড়তে পারব না।"

রক মানে কি জানতে চাইলেন তিনি। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেই ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন, "কী আশ্চর্য, এ মিলটার কথা আমিও জানতাম না। নিউ অর্লিয়ান্সের ভিউ কারে (কথাটা ফরাসী, মানে পুরোনো পাড়া) রকে ভর্তি, এবং সেখানেও ঠিক এমনি রকে বসে লোকে আড্ডা দেয়।"

আরও অনেক মিলের কথা তিনি বললেন। ভারতবর্ষে এক কলকাতাই এখনও ট্রামগাড়ী ছাড়তে পারেনি, আমেরিকাতে যে মুষ্টিমেয় দুটিকয় শহরে এখনও ট্রামগাড়ী চালু আছে। শো-পিস হিসাবেও বটে, যাতায়াতের প্রয়োজনেও বটে, তার মধ্যে নিউ অর্লিয়ান্স একটি (ট্রামগাড়ীকে ওখানে বলা হয় স্ট্রীট কার)।

এখানেও একটি মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে যেতে হল। নিউ অর্লিয়ান্স থেকে ট্রাম উঠে গেলে বিশেষ কেউ টের পাবে না, টুরিস্ট ছাড়া। কিন্তু কলকাতা থেকে ট্রাম উঠে গেলে? সে অবস্থার কথা কল্পনা করা যায় না।

বাজারের কথা উঠতেই ভদ্রমহিলার মুখ আর একবার উজ্জ্বল হল। বললেন, কলকাতার বাজারে ঢুকলে মনে হয় নিউ অর্লিয়ান্সের বাজার। লাউ-কুমড়ো থেকে কেয়েন লঙ্কা চ্যাড়স সবই নিউ অর্লিয়ান্সের বাজারে মেলে, এবং বিক্রীও হয় প্রায় কলকাতার বাজারের মতই ঢঙে। আমেরিকার হালের সুপার মার্কেটের সামনে নিউ অর্লিয়ান্সের পুরোনো বাজার এখনও তার অতীতের প্রতি মোহের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কলকাতার পুজোর কথা বিশেষ করে ভদ্রমহিলা বললেন, কলকাতার পুজোর উদ্দীপনার তুলনা কোথাও নেই। বরং অর্লিয়ান্সের মার্দি গ্রা উৎসবে যে প্রাণ-প্রাচুর্যের খানিকটা দেখা যায়। মার্দি গ্রা উৎসবের অঙ্গ হিসাবে যে মুখোশ শোভাযাত্রা নিউ অর্লিয়ান্সের রাস্তায় বার হয়, অনেকটা পুজোর বিসর্জনের দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

•

বয়স্কা আমেরিকান ভদ্রমহিলা সম্প্রতি কলকাতায় বাংলাদেশে ছাপাখানার ইতিহাসের উপর গবেষণায় রত আছেন। ছাপাখানার ইতিহাস মানে এর যান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক ইতিহাস নয়—মুদ্রণের "মানবিক" দিক নিয়ে তিনি চর্চা করেন। যেমন ধরুন একটা উনবিংশ শতাব্দীতে মুদ্রিত একখানা বই নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে দেখেন এটি ছাপতে প্রিন্টারকে কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সেই সেই সমস্যার সমাধান সে কী উপায়ে করেছিল। বাড়ী অবশ্য তাঁর নিউ অর্লিয়ান্সে বা ক্যালিফোর্নিয়ায় কোথাও নয়—তিনি টেক্সাসের। কলকাতায় এর আগেও এসেছেন, এবং এবার কলকাতার আসবার আগে লন্ডনের গ্রন্থাগারে বিষয়ক ব্যাপারে অনুসন্ধান করে এসেছেন।

আমাদের গন্তব্য ছিল সুন্দরবন। তিন দিন শুধু জল আর জল—দেখতে দেখতে তিনি বললেন—পূর্ব পাকিস্তানকে সব জল দিয়ে দিয়ে পশ্চিমের ভাণ্ডার যে একেবারে শুকিয়ে গেছে তা নয়—এইখানে এসে পশ্চিমবঙ্গকেও সুজলা বলতে বাধা থাকে না।

তবে একটা বড় বৈষম্য এত জল থাকা সত্ত্বেও তাঁর নজর এড়ায়নি। "এতটা জল বেয়ে এলাম, একটাও মাঝির গান শুনতে পেলাম না। পদ্মা, মেঘনা বা পূর্ব পাকিস্তানের আর আর নদীর বুকে এখনও মাঝির গান শুনতে পাবেন। বড় হনটিং সেসব গান।"

তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে একাধারে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতত্ত্ববিদ, এবং অনেক কিছু হতে হয়। যেমন একটি প্রশ্ন : সেদ্ধ চাল কীভাবে করে। সেদ্ধ না করে চাল করা যায় কিনা, আর সেদ্ধ চাল করার তাৎপর্যটা কি।

যতদূর জানা ছিল বললাম। ধান সেদ্ধ করে নিলে পরে চাল কুটলে সে চাল ভাত করবার সময় বেশী শ্বেতসার মাড়ের সঙ্গে চলে যেতে পারে না। এতে অপচয় কম হয়, আর দ্বিতীয়ত আতপ চাল [illegible]।

সুন্দরবনের অন্তরে যখন স্টীমার পৌঁছল তখন জলপথের দুপাশে ঘন জঙ্গলের মাঝে মাঝে খাঁড়ির ভেতর দিয়ে বনের মধ্যে বহুদূর দৃষ্টিপাত করা যায়। দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। একটা লম্বা বাঁশ বা লাঠি কাদায় বা তীরে পোঁতা, আর তার মাথায় সাদা কাপড় নিশানের মত করে অথবা টোপরের মত করে বাঁধা। "ওগুলো কী?" জানতে চাইলেন। তখন বলা সম্ভব হয়নি পরে জেনেছিলাম, ওগুলো স্মৃতিচিহ্ন। সুন্দরবনে নৌকা বেয়ে যারা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে কাঠ কাটতে যায়, তাদের মধ্যে কাউকে বাঘে নিয়ে গেলে, তার হাতের দাঁড় ঠিক যেখান থেকে তাকে বাঘে টেনে নিয়েছে সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়। এক টুকরো সাদা কাপড়ের এক কোণে খানিকটা চাল বেঁধে, সে কাপড়টা দাঁড়ের ডগায় আটকে দেওয়া হয় গাজী সাহেবের উদ্দেশে। এ গাজী সাহেব সুন্দরবনের কাঠুরেদের রক্ষক। গাজী সাহেবের সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী আছে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে সুন্দরবনে বিচরণ করেন আর তাঁকে অনুসরণ করে শত শত বাঘ। গাজীসাহেব কাঠুরেদের পুজোয় প্রসন্ন হলে বাঘদের আদেশ করেন কাঠুরেদের গায়ে আঁচড়টি না দিতে।

এই স্মৃতিচিহ্নগুলি যেমন পোঁতা আছে তেমনি রেখে দেবার নিয়ম। কেউ যদি টেনে তুলতে চেষ্টা করে তবে সে যেন একেবারে তুলে ফেলে। কারণ প্রথম টানে না উঠলে অনিবার্যভাবে সে বাঘের পরবর্তী শিকার। —[illegible]

বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সর-এর নিয়ম অনুসারে কোনো ছবির সেন্সর হয়ে গেলে, হয় ছবিটির একটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য জমা দিতে হয়, আর নয়তো ছবির একটি প্রিন্ট সেন্সার কর্তৃপক্ষকে বরাবরের জন্যে দিয়ে দিতে হয়। আমরা জানি, বহু চিত্র-প্রযোজক জমা দেবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে চিত্রনাট্য লেখানোর পরিবর্তে ছবিতে শব্দ-পুনর্যোজনা করবার জন্যে যে আর-আর (রি-রেকর্ডিং) প্রিন্ট ক'রে থাকেন, সেইটিকেই সেন্সর অফিসে জমা দিয়ে দেন। এর ফলে বহু ছবিই সেন্সার দপ্তরের হেপাজতে জমা থাকবার কথা। কিন্তু ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের জন্ম সাল ১৯৫২ থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় কতগুলি ছবির প্রিন্ট জমা পড়েছে এবং জমা-পড়া সেই প্রিন্টগুলির কি দশা হয়েছে, সে-সংবাদ সেন্সর বোর্ডের কাছ থেকে কোনোদিনই কেউ জানতে চেষ্টা করেননি।

পুরোনো চলচ্চিত্র আরও একটি বিশেষ কারণে অত্যন্ত দুর্লভ। প্রায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ব্যবসারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ৩৫ মিঃ মিঃ স্ট্যান্ডার্ড ফিল্মের হ'ত নাইট্রেট ফর্ম (বেস)। এই নাইট্রেট বেস-বিশিষ্ট ফিল্মগুলি হ'ত অত্যন্ত সহজদাহ্য; সামান্য অগ্নিস্পর্শে এরা নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। এ-ছাড়া ছিল আপনা হ'তেই পুড়ে যাওয়ার উৎপাত, যাকে বলে— automatic combustion (স্বয়ংদাহ্যপ্রবণতা)। এই দুর্ভাবে অতীতে কত যে ফিল্ম-ভাণ্ডার পুড়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মনে পড়ে ১৯৪০ সালে নিউ-থিয়েটার্স ল্যাবরেটারীতে আগুন জ্বলে উঠে মিনিট দশেকের মধ্যেই সকল ছবির নেগেটিভ ভস্মে পরিণত হয়েছিল। ম্যাডান কোম্পানীর ধর্মতলার গুদাম, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের গুদাম, ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর পুরোনো ফিল্মের গুদাম প্রভৃতিতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কত যে পুরোনো ছবি বিনষ্ট হয়েছে, তার সংখ্যা নেই। এমন অগ্নুৎপাতের ঘটনা বোম্বাই ও মাদ্রাজেও ঘটেছে। অথচ আমাদের পুরোনো ছবিগুলিই আমাদের চলচ্চিত্রেতিহাসের বিশিষ্টতম উপাদান। প্রতিটি ছবির কোনো কোনো দৃশ্যের ফোটো (যাকে স্টুডিওর ভাষায় স্টীল বলা হয়) দিয়ে ছবির অভাব কতটুকু মেটাতে পারে?

চলচ্চিত্রের সঙ্গে দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সামাজিক রীতিনীতি, রুস ও রুচিবোধ, বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক ব্যবহার, প্রভৃতি বহুবিধ জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কাজেই আমাদের দেশের সবকটি চলচ্চিত্রকে যদি আমাদের চোখের সামনে পাওয়া যেত, তা থেকে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গত আটষট্টি বছরের সামাজিক, শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিকে আমাদের চোখের সামনে দেখতে পারতুম। এই কথা মনে রেখে আজও আমাদের চেষ্টা করা উচিত, যেখানে যেটুকু

অভিনেত্রী : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিপ্রা চক্রবর্তী ফটো : অমৃত

পাওয়া যায়, তাকেই নির্বিচারে উদ্ধার করে চলচ্চিত্রাগারে সংগ্রহ করা। সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে যে-সব ছবি নির্মিত হচ্ছে, তাদের প্রতিটির একটি পূর্ণাঙ্গ প্রিন্ট (রিলিজ-প্রিন্ট) যাতে পুণায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ-এ জমা পড়ে, তার জন্য ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার বিভাগের সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এর জন্য যদি বিশেষ কোনো আইন প্রচলনের প্রয়োজন হয়, তাও করা দরকার। শোনা যায় আমাদের এই ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভে মাত্র দুশোটি ছবি সংগৃহীত হয়েছে। অনুমান করা কঠিন নয় যে, ভারতে প্রস্তুত অগণিত ছবির তুলনায় এই সংগ্রহ অত্যন্ত নগণ্য। মাত্র ১৯৩১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যেই আমাদের দেশে ন্যূনাধিক ৮,০০০ (আট হাজার) কাহিনী-চিত্র তৈরী হয়েছে। এবং এর অধিকাংশই সবাক। এছাড়া আছে তথ্য ও সংবাদচিত্র। এর আগে মাত্র বাঙলাদেশেই ১৯১৯ সাল থেকে নির্মিত হয়েছে অন্ততঃ একশত আটত্রিশটি নির্বাক ছবি।

সেগুলিরও কোনো না কোনো নিদর্শন নির্মিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের লা সিনেমাথেক ফ্রাঁসেয়াতে সংগৃহীত ছবির সংখ্যা হচ্ছে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার); রাশিয়ায় সংগৃহীত হয়েছে ১৬,০০০; রুমানিয়ায় ৮,৫০০; পোল্যাণ্ডে ৮,০০০; চেকোশ্লোভাকিয়ায় ১৮,০০০; ইস্ট জার্মানীতে ২৬,০০০। এর থেকেই বুঝতে পারা যায়, আমাদের ভারতে সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় অতীতের চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রাংশ সংগ্রহের জন্যে আমাদের কত ব্যাপক অভিযান চালানো উচিত। এবং আমাদের মনে হয়, কাহিনী-চিত্র বা তথ্যচিত্র, যাই হোক না কেন, বা যেমনই হোক না কেন, সবরকম চলচ্চিত্র সংগ্রহের জন্য আমাদের বাঁচিকত হওয়া উচিত শুধুমাত্র আমাদের দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রেতিহাস রচনা করবার জন্যে নয়, গত আটষট্টি বছরব্যাপী আমাদের জীবন-যাত্রার একটি জীবন্ত প্রতিরূপকে আমাদের চোখের সামনে পাবার জন্যে।

স্টুডিও থেকে

পীযূষ বসুর পরিচালনায় সমরেশ বসু রচিত 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবির প্রথম দিনের স্যুটিং-এ যে দৃশ্যটি গৃহীত হয়েছিল সেটিই তুলে দিচ্ছি এখানে।

দার্জিলিং-এর এক হোটেল স্যুইট, সমর চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ, অমর কথা বলছে তাই শুনছে।

দুজনের কম্পোজিট-এ মিড্ লং শট্। নং—১

অমর—নিজেকে বড় একা একা মনে হত। সাফল্যের এত বড় একটা আনন্দ যেন সেখানে পৌঁছতে পারল না।

সমর—মানুষের জীবনে কাজই সব নয় কি রায়। একটা কোথাও একটা কিছু দরকার—যেটা না হলে জীবনটা বড় ফাঁকা মনে হয়। কাট্।

শট নং—২ ক্লোজ শট্।

অমর—সত্যিই তাই, কাজ ছাড়া কিছু ভাবিনি—ভাবতামও না। সমরবাবু, ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, তবু স্ত্রীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হলো না। হওয়া উচিত ছিল! কি জানি, আজকাল তাই বারবার মনে হয় যা আমার করা উচিত ছিল আমি তা বুঝি করিনি।

ক্যামেরা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চার্জ করে অমরকে।

পৃথক শট্। ক্লোজ আপ্।

অমর চেয়ারে বসে আছে, দৃষ্টি তার সামনের ফায়ার প্লেসের দিকে। কাট্।

ক্লোজ শট্। ক্যামেরা অমরের হাত ধরে প্যান করতে করতে সামনের টেবিলে রাখা সিগারেট ভর্তি টিনকে ধরে। কাট্।

ক্লোজ শট্। এ্যাসট্রে ভর্তি ছাই। ভর্তি সিগারেট টিন শূন্য এখন। অমরের চোখে রাত জাগার ছাপ। কাট্।

উঠে দাঁড়ায় অমর। পায়চারি করে সিগারেট খেতে খেতে। বড় বিষণ্ণ আর চিন্তিত দেখায়। কাট্।

ক্যামেরা ঘরের বাইরে। ক্লোজ শট্। অমর বাইরে তাকিয়ে আছে। কাট্।

দূরে দেখা যায় সুমিতা কাকলীকে নিয়ে হেঁটে চলেছে। কাট।

ক্লোজ শট্। অমর উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিন্তা করতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এক অসাফল্যের অভিমানের হাসি ভেসে ওঠে তার মুখে। তারপর বেরিয়ে যায় ফ্রেম থেকে।

অমর ও সমরের চরিত্রে ছিলেন নবাগত স্বরূপ দত্ত ও দিলীপ রায়। সুমিতার চরিত্রে আছেন মাধবী মুখার্জি।

এ ছবির মূল কাহিনী হোল একজন কর্মব্যস্ত, কুশলী, কাজপাগল ইঞ্জিনীয়ার ও তার স্ত্রীর মানসিক বিরোধের। অমর ভালবেসেই বিয়ে করেছিল সুমিতাকে। ভেবেছিল আর কি প্রয়োজন। নতুন বস্তু আবিষ্কারের খেয়ালে স্ত্রীর প্রতি অধিকার কেড়েছিল অমর। সুমিতা তাকে বলেছে, বুঝিয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে। অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে সুমিতা তাই একমাত্র মেয়ে কাকলীকে নিয়ে সরে এসেছে অমরের কাছ থেকে, বলে এসেছে—তোমার কাজের পথে যখন আমি বাধা, আমি সরে গেলাম।

তারপর এতদিনের নিরলস সাধনা যখন সাফল্য নিয়ে এল তখন মনের আনন্দের ভাগীদের খুঁজতে গিয়ে দেখে সে জায়গা শূন্য। ছুটতে ছুটতে চলে আসে দার্জিলিংয়ে। সুমিতার কাছে যায়: কাকলীকে, সুমিতাকে কাছে টেনে নিতে চায়।

কিন্তু তা হয় না। সুমিতা তখন অভিমানে অন্ধ। ভালোবাসার বন্যা তখন বাধাবেদনার বাঁধে আটকে থাকে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে বন্ধু সমরের কাছে আসে। লেখক সমর সব শুনে ওদের দুজনের মধ্যে সেতু হয়ে দাঁড়ায়। আবার মিলিত হয় দুজনে। ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা ভেঙে ফেলে এগিয়ে আসে সুমিতা, নিজের ভুল বুঝে ভালবাসার হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় অমর। চার হাত দুজনকে ধরে, চার চোখ মিলিত হয়।

•

শট্ নং—৪০

দেহাতী এক উত্তরপ্রদেশবাসীর কুঁড়ে ঘর। ক্যামেরা শঙ্কর সরাভাই, ভানুর রাজু আর যশোমতীকে ক্লোজে ধরে আছে। ওরা সবাই খাচ্ছে, একমাত্র রাজু ছাড়া। ও দাঁড়িয়ে আছে মুখ ভার করে।

শঙ্কর হাত ধরে বসাতে চায় রাজুকে, রাজু হাত সরিয়ে দেয়। শঙ্কর তখন খাবার নিয়ে রাজুর মুখের কাছে দেয়। এবারও রাগভরে হাত সরিয়ে দিয়ে রাজু বলে—'তখন বকে, এখন আবার আদর করতে এসেছে!'

ক্যামেরা পেছনে সরে আসে। মিড্ লং শট্।

দিদি খাবার হাতে নিয়ে বাঁ দিক থেকে ফ্রেমে ইন্ করতে করতে বলে—'কি রে, তোদের বাবা ভাইদের ঝগড়া এখন মিটলো?'

এই কথা বলতে বলতেই দিদি খাবার থালা সামনে নিয়ে বসে থাকা চুপচাপ যশোমতীর দিকে তাকায়। ওকে অমন নীরব দেখে বিস্মিত হয়। দিদি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক সুরে বলে—'কি ভাই, তুমি তো কিছুই খাচ্ছো না! এ সব তোমার ভাল লাগছে না বুঝি।'

দিদির একথা বলার সময় শঙ্কর যশোমতীর দিকে তাকিয়েছিল। সেই সুযোগে রাজু বসে পড়ে মামার থালা থেকে একটা আলু তুলে নেয়।

শঙ্কর তাই দেখে রাজুর দিকে স্নেহভরা ধমকের সুরে বলে ওঠে 'এই, খবরদার।'

ঐ একই সঙ্গে দিদির প্রশ্নে নিজেকে সামলে নিয়ে সৌজন্যের হাসি হেসে যশোমতী বলে—'না না দিদি, খুব ভালো লাগছে।' কাট্।

দুটো মনিটর আর একটা টেক্ এন-জি হওয়ার পর দৃশ্যটা গৃহীত হল গত বুধবার কালকাটা মুভিটোন স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে। যশোমতী, শঙ্কর, দিদি ও ভাগনে রাজুর ভূমিকায় অভিনয় করছেন যথাক্রমে সুপ্রিয়া দেবী, উত্তমকুমার, দীপ্তি রায় ও মাঃ অরিন্দম গাঙ্গুলী। লোকনাথ চিত্রমন্দিরের পতাকাতলে নির্মীয়মান এই 'সাবরমতী' ছবির পরিচালক হীরেন নাগ।

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে : চিত্রের মহরতে মাধবী মুখোপাধ্যায়, আর ডি বনশাল, পরিচালক পীযূষ বসু, দিলীপ রায় এবং কালীপদ সরকার

দিকে তার প্রতিবাদ অবশ্যম্ভাবী এবং সেই অবিবেচনার ফল যে কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি তা অনুধাবন করতে পারেননি। আন্তর্জাতিক কমিটির এই অবিবেচনার খেসারত দিতে হবে মেক্সিকো সিটির উদীয়মান ওলিম্পিকের উদ্যোক্তাদের। অবস্থা এখন এত ঘোরাল হয়ে উঠেছে যে ওলিম্পিকের মূল অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা তাতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

মেক্সিকো সিটিতে ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের আর মাত্র সাত-আট মাস বাকী। বিশ্ব ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের স্থান নির্বাচিত হওয়ার গৌরব যে কোন দেশের পক্ষেই স্মরণীয়। সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলিট ও ক্রীড়াবিদদের একত্র সমাবেশ, ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের আগমনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক নতুন শহর, নতুন কর্মোদ্যম ও জীবনচাঞ্চল্যে মুখর হয়ে ওঠে সে দেশ। এর জন্যে বহু আয়োজন, বহু পরিশ্রম ও সম্পদ বিনিয়োগ করতে হয়। এই প্রস্তুতি পর্বের জন্যে মেক্সিকোতেও কম মেহনৎ করতে হয়নি। এখন যদি মূল অনুষ্ঠানই বিঘ্নিত হয় অহলে সে দেশের উদ্যোক্তাদের মান-সম্মান কোথায় থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রতিযোগিতায় প্রবেশের অনুমতি দেবার জন্যে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি গ্রেনোবেলে যে বৈঠক করে মেক্সিকো সেই বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু মেক্সিকোর সেই প্রতিবাদ কমিটি কানে তোলেনি। আজ মেক্সিকোর সংগঠকেরা তাই বিপন্ন বোধ করছেন এবং ওলিম্পিক সংগঠন কমিটির সভাপতি র‍্যামিরেজকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। না করে উপায়ই বা কি। সারা আফ্রিকা মহাদেশ ওলিম্পিক বর্জন করলে কেনিয়ার কিপচোকিনো, কিপ্রুগাট, ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত এ্যাথলিটরা আসবেন না। ফলে ওলিম্পিকের আকর্ষণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

শুধু কি তাই। দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলিম্পিকের প্রবেশের দ্বার খুলে দেওয়ায় আফ্রিকা মহাদেশ ছাড়াও এশিয়ার বহু রাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে আরব রাষ্ট্রসমূহ, পাকিস্থান, কিউবা প্রভৃতি মেক্সিকো ওলিম্পিক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাশিয়া আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটিকে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্যে চাপ দিয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় রাশিয়া জানিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যে খোলা দ্বার আবার বন্ধ না করলে রাশিয়াও হয়ত ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানে বিরত থাকবে। ভারতও আন্তর্জাতিক কমিটির উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

এদিকে মেক্সিকো সরকারের মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সংবাদপত্র "এল ন্যাশনাল" আন্তর্জাতিক কমিটিকে তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করে লিখেছে—"জাতীয় দল নির্বাচনে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটি যে নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা তা ভঙ্গ করেছে। কারণ নির্বাচনী প্রতিযোগিতার দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষ থেকে শ্বেত ও অশ্বেতকায়দের একত্রে অংশ নিতে দেওয়া হয় নাই।" যুগোস্লাভিয়ার ওলিম্পিক কমিটির পক্ষ থেকেও ঐ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে প্রায় চল্লিশটি দেশ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করে জানিয়েছে যে, সিদ্ধান্ত বদলানো না হলে তারা মেক্সিকো ক্রীড়ায় অংশ নেবে না।

বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষোভ রয়েছে এবং সেখানকার কৃষ্ণকায় এ্যাথলিটরা আমেরিকার হয়ে ওলিম্পিকে যোগ দেবেন না একটা আন্দোলনও সুরু করে দিয়েছিলেন। অবশ্য তা বেশি দূর না গড়ালেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে ওলিম্পিকে গ্রহণের প্রশ্নে সেখানেও আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওলিম্পিক বয়কট কমিটির সংগঠক নিগ্রো এ্যাথলিট হ্যারী এডওয়ার্ডস মেক্সিকো ওলিম্পিক বয়কটকারী দেশগুলির কেবল কৃষ্ণকায়দের নিয়ে একটি ওলিম্পিক ক্রীড়া আয়োজনের প্রস্তাব করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি আরও বলেছেন, তাঁর ওলিম্পিক বয়কট কমিটি শীঘ্রই কৃষ্ণকায়দের ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের আন্দোলন সুরু করবেন। গ্রীষ্মের শেষদিকে আফ্রিকার কোন দেশে এই ওলিম্পিক ক্রীড়ার আসর বসলে কৃষ্ণকায় এ্যাথলিট এবং ছাত্ররা নির্বিঘ্নে এতে যোগ দিতে পারবে।"

কেনিয়া আবার এক প্রস্তাব দিয়ে বলেছে যে অক্টোবরে মেক্সিকোতে ওলিম্পিক চলাকালে বয়কটকারী দেশগুলিকে নিয়ে তারা এক ক্রীড়ানুষ্ঠান করতে রাজী। কেনিয়ার এই প্রস্তাবে হয়ত তেমন সাড়া মিলবে না। কিংবা নিগ্রো ওলিম্পিকের প্রভাব কতটা কার্যকর হবে তাও বলা যায় না। তবে সব মিলিয়ে মেক্সিকো ওলিম্পিক যে এক ঘোর বিপর্যয়ের সম্মুখীন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই সঙ্কটের মুখেও দক্ষিণ আফ্রিকা কিন্তু তার গোঁয়ার্তুমি পরিহার করেনি। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ ফ্রাঙ্ক বাক্সন ঘোষণা করেছেন যে তাঁর দেশ কোন অবস্থাতেই ওলিম্পিক থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেবে না। নিগ্রোদের নিয়ে তাঁরা কোন তোষামোদই করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন, কর্তার পছন্দই এখন সর্বাগ্রে তাঁর সম্মান।

চারদিকের এই রব, বিশেষত আমেরিকা ও মেক্সিকো ওলিম্পিক সংগঠন কমিটির সভাপতির পীড়াপীড়িতে আন্তর্জাতিক ওলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ অ্যাভেরী ব্রাণ্ডেজ মার্কি বলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নটির বিবেচনার জন্যে শীঘ্রই তিনি কমিটির এক জরুরী বৈঠক ডাকবেন। অবশ্য এই বৈঠক কবে বসবে তা জানা যায়নি। তবে তিনি মার্কি বক্তব্য করেছেন, এই বৈঠক ডাকতে তিন থেকে ছয় দিন সময় লাগতে পারে।

বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতে জনমত প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ভারতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশন এখনও কেন মেক্সিকো ওলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি তা নিয়ে ভারতের সংসদে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। ৬ মার্চ রাজ্যসভায় কংগ্রেসী ও বিরোধী সদস্যরা একযোগে কণ্ঠে জাতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের দীর্ঘসূত্রতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা রাজ্যসভায় জানান এ সম্পর্কে জাতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে আর মেক্সিকো ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারত অংশ নেবে কিনা সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শীঘ্রই সভা বসবে।

ভারতীয় ওলিম্পিক এসোসিয়েশনের এই দীর্ঘসূত্রতার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী নীতির জন্য ভারত চিরকালই তার বিরোধীতা করে এসেছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি সুস্পষ্ট। অথচ ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে সুসমঞ্জস নীতির অভাব দেখা যায়। ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে এড়িয়ে চললেও টেনিসে এই বর্ণবিদ্বেষী দেশের সঙ্গে ভারতের যোগদান কোন মতেই বাঞ্ছনীয় হয়নি। ডেভিস কাপের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খাস জেলায় গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা খেলে এসেছে। অন্যান্য প্রতিযোগিতায়ও ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছে। বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকাকে সর্বতোভাবে বয়কট প্রয়োজন এবং ভারতের পক্ষ থেকে তেমন দুর্নীতিই গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার এই প্রশ্নে আজ বিশ্ব ওলিম্পিক বিপন্ন হতে বসেছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড
তৃতীয় টেস্ট খেলা

ওয়েস্ট ইণ্ডিজঃ ৩৪৯ রান (বেসিল বুচার ৮৬, গ্যারী সোবার্স ৬৮ এবং স্টেভ ক্যামাচো ৫৭ রান। জন স্নো ৮৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ২৮৪ রান (৬ উইকেটে। ক্লাইভ লয়েড নটআউট ১১৩ এবং বুচার ৬০ রান। স্নো ৩১ রানে ৩ উইকেট)

ইংল্যাণ্ডঃ ৪৪৯ রান (জন এডরিচ ১৪৬, জিওফ বয়কট ৯০, টম গ্রেভনী ৫৫ এবং বেসিল ডি'অলিভিয়েরা ৫১ রান। চার্লি গ্রিফিথ ৭১ রানে ৩ এবং ল্যান্স গিবস ৯৮ রানে ৩ উইকেট)

ব্রিজটাউনের কেনসিংটন ওভাল মাঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংল্যাণ্ড দলের তৃতীয় টেস্ট খেলাটি প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মত অমীমাংসিত থেকে গেছে। ফলে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তার বিশ্বজোড়া নামডাক অনেকটা হারিয়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিশ্ববিশ্রুত প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় স্যার লিয়ারী কনস্টান-টাইনের কথায় 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের স্বর্ণ-যুগের অবসান হতে চলেছে।' আগের মত তাদের ব্যাটিংয়ের দাপট নেই। সোবার্সই একমাত্র নির্ভরশীল—তিনিই এখন দলের 'ঘরে মন নীলমণি'—দলের বিপদে এখন তিনি ত্রাণ কর্তার ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি এখন ৬নং খেলোয়াড় হিসাবে খেলতে নামছেন এবং তাঁর উপযুক্ত জুটি মিলছে না। ফলে খেলায় বেশী রান উঠছে না। বোলিংয়ে তাদের আগের রুদ্রমূর্তি বর্তমানে খুবই বিনম্র চেহারায় দাঁড়িয়েছে। হল এবং গ্রিফিথের ফাস্ট বল ইংল্যাণ্ডের ব্যাটস-ম্যানদের 'সরষে ফুলের ক্ষেত' দেখাতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা এঁদের বল বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছেন। এক কথায়, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এখন বোনেদি বাড়ীর পড়তি অবস্থা।

বৃষ্টির দরুণ প্রথম দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি। মোট ৯০ মিনিট খেলার সময় নষ্ট হয়। খেলার মধ্যে বৃষ্টি নামায় তিন-বার খেলা বন্ধ হয়েছিল। তবুও প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২-টো উইকেট খুইয়ে যে ৮৬ রান সংগ্রহ করেছিল তা তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ খেলারই পরিচয়।

দ্বিতীয় দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের আরো ৪টে উইকেট পড়ে যায়। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ে স্কোর বোর্ডে তাদের ৩১১ রান (৬ উইকেটে) দাঁড়ায়। সোবার্স ৬৪ এবং হ্যারে ২৭ রান করে অপরাজিত থাকেন। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে স্টেভ ক্যামাচো এবং বেসিল বুচার দলের ৯৬ রান যোগ করেন। খেলার প্রথমভাগে বুচার (৮৬ রান) ছিলেন দলের মেরুদণ্ড। অতঃপর ত্রাণকর্তার ভূমিকায় নামেন সোবার্স। চা-পানের পরই সোবার্স তাঁর স্বরূপে প্রকাশ করেন।

তৃতীয় দিনে ৩৪৯ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো ৮৬ রানে ৫টা উইকেট পান। শেষ ১০ম উইকেটের জুটিতে চার্লি গ্রিফিথ এবং ল্যান্স গিবস অপ্রত্যাশিতভাবে ৫৫ মিনিটে ৩০ রান তুলে দেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুই প্রখ্যাত ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং চার্লি গ্রিফিথ এই দিনের খেলায় আহত হন।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড কোন উইকেট না খুইয়ে ১৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল। জন এডরিচ ৬৪ রান এবং জিওফ বয়কট ৯০ রান করে নটআউট থাকেন।

খেলার তৃতীয় দিনটা ছিল ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্যেরই দিন। খেলায় সর্ববিষয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ইংল্যাণ্ড নাজেহাল করে ছেড়েছিল।

চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ৮টা উইকেট খুইয়ে পূর্ব দিনের ১৬৯ রানের (কোন উইকেট না পড়ে) সঙ্গে ২৪৩ রান যোগ করে—খেলার শেষে ৪১২ রান (৮ উইকেটে) দাঁড়ায়। ইংল্যাণ্ডের ওপানিং ব্যাটসম্যান জন এডরিচ ১৪৬ রান করেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। ১ম উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং এডরিচ দলের ১৭২ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত বেশ শক্ত করেছিলেন। এরপর ৭র্থ উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং গ্রেভনী ১০৯ রান যোগ করেন।

পঞ্চম দিনে ৪৪৯ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে তারা ১০০ রানে অগ্রগামী হয়। ইংল্যাণ্ডের ১ম ইনিংসের শেষ দুটো উইকেটে ৩৭ রান উঠেছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ২৮৪ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২৬০ মিনিটে ২য় ইনিংসের এই ২৮৪ রান সংগ্রহ করেছিল। দলের মাত্র ৭৯ রানের মাথায় ৩য় উইকেট পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ উইকেটের জুটি বেসিল বুচার (৬০ রান) এবং ক্লাইভ লয়েড ৮৬ মিনিটে দলের ১০১ রান তুলে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। লয়েড ১১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলার জন স্নো তৃতীয় টেস্ট খেলায় ১২৫ রানে ৮টা উইকেট পান (৮৬ রানে ৫ ও ৩৯ রানে ৩ উইকেট)।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে চলতি ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মোটেই এঁটে উঠতে পারছে না। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেয় এবং দুবারই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য করে। আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ব্যাট করে; কিন্তু ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ১০০ রানে অগ্রগামী হয়।

শেফিল্ড শীল্ড

অস্ট্রেলিয়ার ১৯৬৭-৬৮ সালের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের সূত্রে শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়েছে। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ইতিপূর্বে মাত্র একবার (১৯৪৭-৪৮) শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়। এ বছর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দলে ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত প্রাক্তন টেস্ট বোলার টনি লকের যোগদান এবং তাঁর যোগদানের প্রথম বছরেই দীর্ঘদিন পর ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দলের শেফিল্ড শীল্ড জয়—নিঃসন্দেহে লকের কেরামতির পরিচয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া দল শেফিল্ড শীল্ড প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম যোগদানের বছরেই শীল্ড জয়ী হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স কাউণ্টি ক্রিকেট দলের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট লর্ড শেফিল্ড অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার উন্নতিকল্পে যে অর্থ দান করেন তা দিয়ে একটি শীল্ড তৈরী করে ১৮৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয়। এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ান দলের পুরস্কারের নামকরণ হয় শেফিল্ড শীল্ড। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে তিনটি কলোনী (পরবর্তী কালে স্টেট)—ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং সাউথ অস্ট্রেলিয়া যোগদান করেছিল। কুইন্সল্যাণ্ড ১৯২৬ এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রথম অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণকারী পাঁচটি দলের মধ্যে একমাত্র কুইন্সল্যাণ্ড দল আজও শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়নি। চারটি দল প্রথম শেফিল্ড শীল্ড জয় করে—ভিক্টোরিয়া ১৮৯২-৯৩ সালে, সাউথ অস্ট্রেলিয়া ১৮৯৩-৯৪ সালে নিউ সাউথ ওয়েলস ১৮৯৫-৯৬ সালে এবং ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে। সর্বাধিকবার শেফিল্ড শীল্ড জয়ের রেকর্ড আছে নিউ সাউথ ওয়েলসের—৩৬ বার। তাছাড়া নিউ সাউথ ওয়েলস উপর্যুপরি ৯ বার (১৯৫৪-৬২) শেফিল্ড শীল্ড জয়ী হয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ক্রিকেট প্রতি-যোগিতায় উপর্যুপরি সর্বাধিকবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার বিশ্ব রেকর্ড করেছিল। অবিশ্যি তাদের এ রেকর্ড আর বেশী নেই, ১৯৬৮ সালে বোম্বাই উপর্যুপরি ১০বার রঞ্জি ট্রফি জয়লাভের সূত্রে তা ভেঙে দিয়েছে।

অমৃত পাবলিকেশন্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

মূল্য
৪৭ সংখ্যা

Friday, 22nd March, 1968. শুক্রবার, ৮ই চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনিতাই ঘোষ

শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রসঙ্গে

অমৃতের অমৃতবাজার শতবার্ষিকী সংখ্যাটি বিগত এক শতাব্দীর এক গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছে আমার কাছে। দেশপ্রেমিক মহাত্মা শিশিরকুমার অমৃতবাজারের মাধ্যমে একদিকে অনলস সংগ্রাম করেছিলেন বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তিনি ছিলেন দেশের মননশীল শিক্ষিত সমাজের কাছে প্রেরণার বরেণ্য-উৎস। এই সংগ্রাম ও প্রেরণার সম্মিলিত ধারায় উজ্জীবিত হয়েছিল ভারতবর্ষের জনমানস। অমৃতবাজারের শতবর্ষের ইতিহাস তাই ভারতবর্ষের সর্বস্তরব্যাপী গণজাগৃতির ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা শিশিরকুমারের একটি পত্র এখানে উদ্ধৃত করছি। পত্রটিতে জীবন সম্বন্ধে তাঁর একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি তিনি লিখেছিলেন আমার পিতামহ প্রেসিডেন্সী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পোস্ট-অফিস আনন্দগোপাল সেন কে। আনন্দগোপাল সেন ছিলেন মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহপাঠী ও শিশিরকুমারের একান্ত স্নেহভাজন। কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় তিনি শিক্ষা-বিভাগে ডেপুটি ইন্‌স্পেকটর অফ স্কুলস পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু আইন পাঠ সমাপ্ত করার জন্য প্রার্থিত ছুটি না পাওয়ায় পদত্যাগ করেন ও পরে ডাক-বিভাগে যোগদান করেন। আনন্দগোপাল সত্যাশ্রয়ী, ধর্মানুরাগী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন বলে মহাত্মা শিশিরকুমার তাঁকে গভীর স্নেহ করতেন। শিশিরকুমারের নির্দেশে তিনি আজীবন অমৃতবাজারের বিশেষ সংবাদদাতারূপে কাজ করেছেন। তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আনন্দগোপাল সেনের ধর্ম, সাহিত্য, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে বহু লেখা ছড়িয়ে আছে। তাঁর রচিত 'The Post Office of India' পুস্তকটি ঐতিহাসিক মূল্য ও রচনাকুশলতার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত হয় (২২শে জুলাই, ১৮৭৫ সংখ্যা)। স্বাধীনচিত্ততার জন্যই আনন্দগোপাল অবসর গ্রহণের পর তাঁকে প্রদত্ত সরকারী খেতাব প্রত্যাখ্যানের মত বৈশিষ্ট্য দেখাতে পেরেছিলেন। তাঁকে লিখিত মহাত্মা শিশিরকুমারের আলোচ্য পত্রটির তারিখ ১৬ই নভেম্বর, ১৯০৮।

প্রিয়তম আনন্দগোপাল,

তুমি কেন দুঃখ কর, বুঝিতে পারি না। মরিলে যে কিছু দুঃখ আছে দূর হইবে; আর ক্রমে মরণ নিকট হইতেছে। মরণ নিকট বলিয়া আনন্দিত হও। আমি তোমাকে ভুলি নাই। সেদিন একটা প্রস্তাব পড়িতেছিলাম। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তুমি লিখিয়াছ 'বাসনা কম [illegible], উহা কমিতে দিও।' তুমি নিকটে থাকিলে, একথা লইয়া আমি তোমার সহিত তর্ক করিতাম। আমরা ভালবাসার ভগবানকে ভালবাসা দিয়া ভজনা করি। আমাদের বাসনা ক্রমে প্রবল হইবে ও উহা প্রিয় প্রাণনাথ পূর্ণ করিবেন। তবে বাসনাগুলি ভাল হওয়া চাই। যাহার বাসনা নাই সে মৃত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভজন কিরূপে করিবে। বাসনা ধ্বংস কর এ জ্ঞানী লোকের কথা, ভক্তের নহে।

তোমার দাদা শিশির

এই কয়েক ছত্রের পত্রটিতে জীবনকে শিশিরকুমার কোন্ দৃষ্টিতে দেখতেন এবং জ্ঞান ও ভক্তির পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রথীন্দ্রনাথ সেন
কলিকাতা-১৯

ভ্রমণ কাহিনী

গত সংখ্যায় প্রখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী লেখক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গনাথ' রচনাটি পড়লাম। তাঁর অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনী পড়েছি। বর্তমান রচনায় পঞ্চ কেদারের তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথের যে রূপ তিনি তুলে ধরেছেন তা আর কারও লেখায় ফুটে ওঠেনি। প্রাকৃতিক এবং নৈসর্গিক যে চিত্র এর মধ্যে পাই, তা যেন মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। এই ধরনের ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করে অমৃতের সুনাম বৃদ্ধি পাবে আশা করি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্যের 'কার্নিকোবরের সূর্য' রচনাটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। লেখক এক নতুন জগতের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই বিস্তৃত অঞ্চলকে নিয়ে বাঙলা ভাষায় কোন গ্রন্থ সম্ভবত এ পর্যন্ত রচিত হয়নি। তাছাড়া শ্রীভট্টাচার্যের বর্ণনাভঙ্গী এবং ভাষাও বেশ রমণীয়। এই রমণীয়তাই তো যে কোন গদ্য রচনার একটি প্রধান গুণ। লেখক যেভাবে সমগ্র রূপটি প্রকাশ করছেন, আমাদের মত ঘরে আবদ্ধ বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ সমাদর পাবে।

এই দুটি ভ্রমণ কাহিনীর জন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীলেখা চৌধুরী
মধুলেখা চৌধুরী
কলকাতা—৯

'কলকাতা' প্রসঙ্গে

রাজনীতির ডামাডোলে এখন কলকাতা জড় হয়ে উঠেছে। সেখানে আজ দুবেলা বলতে না বলতেই আরম্ভ হলো সেই পড়া। এর যেন আর শেষ নেই। কোথাও থেকে সপ্তর্ষিমা থেকে বিভার [illegible] পর্যন্ত একটি বিজ্ঞানকুর পুনরাবৃত্তি। এখানে আজকাল আর কান পাতার জো নেই। এখান থেকে জোর করে ছুটি নিয়ে একবার তাকান শহর কলকাতার দিকে। বাইরে থেকে মনে হবে নেহাতই সেই গতানুগতিক জীবনযাত্রা— কোন বৈচিত্র্য বা কিয়ত্তর স্বাদের অবকাশ নেই। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখুন আমি রসের প্রস্রবণের সন্ধান পাবেন। তখন আপনার ক্লান্তি কেটে যাবে, মনে হবে হাওয়ায় আমেজ লাগবে।

এই প্রাণ-রূপ শহরটির জীবনে বৈচিত্র্যের যেন অন্ত নেই। হাজার টেলিফোনের মধ্যেও কলকাতা নিজস্ব মেজাজ বজায় রেখে বহাল তবিয়তে দিন কাটাচ্ছে। তার রোজকার জীবনে কত না হাজারী হরেক মরশুমী সমারোহ। কত নাটকীয় ঘটনা রোজ ঘটে যাচ্ছে। কত বিস্ময়ীর নিত্য সম্ভার এই শহরে। তাঁদের কেউ শহরকে ভালবেসে সাম্প্রত জানাচ্ছে অবাধ কেউবা হরেক ভাবে জীর্ণ বলে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। তবে কলকাতার মেজাজে কোন পরিবর্তন নেই এবং বিদেশী টুরিস্টেরও কমতি নেই। তাছাড়া এই শহরে চিরকালীন এবং প্রতিদিনের অনেক ঘটনার সমাবেশ, যা আমাদের সাধা পাছে পড়ে না।

এখবর কেউ জানে, কেউ জানে না। সবাই সাদা চোখে কলকাতাকে দেখে আর হতাশ হয়। চলে যাদের নিত্যই পদচারণ; রোজই ঘুমে থেকে উঠে তারা কলকাতাকে দেখছে, কিন্তু লক্ষণীয় কিছু যেন তাদের নজরে পড়ে না। অর্থাৎ তারা সে রসের রসিক না। তবে কেউ কেউ আকস্মিকভাবে বিচ্ছিন্ন দু একটি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করে বৈকি। কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তার খবর পাচ্ছে না। যে কলকাতাকে নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা পরিসীমা নেই তার বৈচিত্র্যটুকু সকলের অগোচরেই রয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি সে দায়িত্ব আপনারা নিয়েছেন। কলকাতার বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করানোর দায়িত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহে আপনারা পাঠকদের ধন্যবাদভাজন হবেন। এতে আমাদের অনেকদিনের একটি সাধ পূর্ণ হলো।

অমৃতের পাঠক হিসেবে এজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাই।

[illegible] চৌধুরী
কলকাতা—[illegible]

অমৃত

সম্পাদকীয়
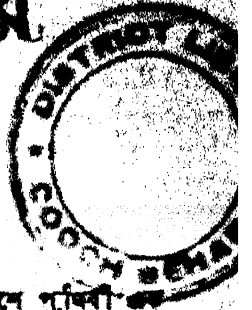
সাদা এবং কালো

এক পৃথিবীর স্বপ্ন দার্শনিক ও দূরদর্শীরা অনেককাল ধরেই দেখে আসছেন। বহু জাতির সমাবেশে পৃথিবী এক এবং অভিন্ন, এই রকম কল্পনা শুভ অধ্যায়ের সূচনা করে। কিন্তু বাস্তবে তা এখনো আমাদের অসাধ্যই রয়ে গেছে। আমরা মৌখিকেই তাকাই মানুষে মানুষে মৈত্রী যেমন ঘোষি তেমনি প্রকাশ করি বিদ্বেষ ও সংঘর্ষ। আমরা বোধহয় এখনও আদিম অন্ধতায় বন্দীভূতই আছি কোনো কোনো বিষয়ে।

সম্প্রতি আফ্রিকার রাজ্য রোডেশিয়ায় এমনি মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেল যা সভ্য মানুষের অত্যন্ত বেদনার কারণ হয়েছে। রোডেশিয়া রাজ্যটির আফ্রিকান নাম জিমবাবোয়ে। ইংরেজের উপনিবেশ ছিল এতদিন। তার লোকসংখ্যার মধ্যে চল্লিশ লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। মাত্র দু লক্ষ শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের বংশধর। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশ যে দাবীতে স্বাধীনতা লাভ করেছে, রোডেশিয়ার কালো মানুষও সেই একই দাবীতে স্বাধীনতালাভের যোগ্য। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকরা ১৯৬৫ সালে নিজেরাই একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেয়। বৃটিশ সরকার সে-সময় অনেক হম্বিতম্বি করেছিলেন কিন্তু কিছুই হল না। রোডেশিয়ার স্বেচ্ছাবৃত প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথ সংখ্যালঘু শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বের দরবারে এ নিয়ে নালিশ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদ প্রস্তাব নিয়েছিল স্মিথ সরকারের হুঁকো-নাপিত বন্ধ করা হবে। তাকে তেল দেওয়া হবে না, শুকিয়ে মারা হবে যতদিন না তাঁর বেআইনি [illegible] হয়। কিন্তু দেখা গেল, এতে স্মিথ সরকারের মোটেই বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি। কারণ, শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ায় এমন অনেক দেশ আছে যারা মনের তলায় স্মিথ-দরদী, অনেক দেশ তো প্রকাশ্যেই এই সরকারকে তেল-জল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে। সাদা ও কালোর ব্যবধান জীইয়ে রাখার জন্য শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার বর্ণ-বিদ্বেষীর অভাব নেই।

একটা জাতির অধিকাংশ মানুষকে বঞ্চিত রেখে স্বাধীনতার নাম করে সংখ্যালঘু শাসন কায়েম রাখার অর্থ পরাধীনতাই। বৃটিশ উপনিবেশ থাকা কালে রোডেশিয়ায় যে-দুর্দশা ছিল স্মিথ সরকারের আমলে তা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি সালসবারীতে এই সরকার দুনিয়ার জনমত অগ্রাহ্য করে একের-পর-এক রোডেশীয় মুক্তিযোদ্ধাকে ফাঁসি দিয়েছে। বৃটিশ রাণীর অনুকম্পা প্রদর্শন, মহামান্য পোপের আবেদন কোনো কিছুর প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয় নি। অথচ এই সরকারের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মহাশক্তিশালী বৃটিশ সরকারও নিষ্ক্রিয়। এই ধরনের অনাচার চলতে দেওয়া পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বিঘ্নকর। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা ক্ষমতা দখল করে যে নজীর স্থাপন করেছে রোডেশিয়াতে স্মিথ তারই অনুসরণ করছে। কোনোদিন যদি পর্তুগীজ অ্যাঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকেও অনুরূপ স্বাধীন সরকার গঠিত হয় তাহলেও বলার কিছু থাকবে না।

এদিকে সভ্য রাষ্ট্রসমূহও পরোক্ষে বর্ণ বিদ্বেষই জাগিয়ে তুলছেন। ইংলণ্ডে কেনিয়াবাসী বৃটিশ ভারতীয়দের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে সম্প্রতি। কারণ এদের গায়ের রঙ কালো। কেনিয়াবাসী শ্বেতাঙ্গরা যত খুশি ইংলণ্ডে যেতে পারেন তাতে বৃটিশ সমাজের কোনো একীকরণ সংকট দেখা দেবে না, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গরা গেলেই মহাদুশ্চিন্তা। বৃটিশ লেবার পার্টি নিয়ন্ত্রিত সরকারের হাত দিয়ে এমন একটি বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন পাশ হবে তা ভাবা যায় নি। যাঁরা ইংলণ্ডকে গণতন্ত্রের স্বর্গ বলে মনে করেন এই ঘটনার পর তাঁরা নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টিতে বৃটেন ও তার সরকারকে বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

আমেরিকাতে তো সাদা ও কালোর বিরোধের কোনো স্থায়ী মীমাংসা এখন পর্যন্ত হল না। মার্কিন সরকার কালো নিগ্রোদের সমানাধিকার দিয়ে আইন পাশ করেছেন, কিন্তু সমাজের যে-অংশ রক্তশুদ্ধি বা গায়ের চামড়া দিয়ে মানুষের সংস্কৃতি বিচার করে তাদের কাছে এই আইন অর্থহীন। তাই মহাত্মা আব্রাহাম লিঙ্কনের আত্মদানের পরও মার্কিন সমাজ আজ পর্যন্ত তাঁর রক্তের ঋণ শোধ করতে পারল না মুষ্টিমেয় আভিজাত্যমানী বর্ণ-বৈষম্যবাদীদের জন্য।

রাষ্ট্রসংঘ স্থাপিত হয়েছিল বিশ্বমানবের মৈত্রী ও সমানাধিকারের আদর্শের ভিত্তিতে। সেই ভিত্তি বাস্তবে [illegible] ছিল। মানুষ এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখলেও সেই পৃথিবীর চেহারা তাদের কাছে স্পষ্ট হয় নি। যদি হত তাহলে শুধু কালো [illegible] অপরাধে মানুষকে আজ এত নির্যাতন সহ্য করতে হত না।

সেকালের বাঙালী ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে জানতে হলে চোখ ফেরাতে হবে সেকালের সমাজ-চিত্রের দিকে যা ধরা পড়েছে কবির লেখায়, শিল্পীর পট-চিত্রে, লোক-সঙ্গীতের মাধ্যমে, মন্দিরের গায়ের ফলকে। কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' গ্রন্থে বাঙালী ছেলেদের সম্পর্কে বর্ণনা যা লিখেছেন, তা খুব মজার। তিনি লিখেছেন, বাঙালী ছাত্ররা যে জুতো পরতো তাতে ময়ূরপঙ্খী নৌকার আকারে শুঁড় তোলা থাকত, হাঁটবার সময় সে জুতোর মচমচ আওয়াজ হত। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল সুবিন্যস্ত এবং পথে চলবার সময় নিজের পোষাকের দিকে তারা মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখতো। তাদের কোমর ক্ষীণ, সেই ক্ষীণ কোমরে তারা লাল রঙের কোমরবন্ধ ব্যবহার কোরতো। তাদের দুই কানেই সোনার অলঙ্কার থাকতো এবং হাতে থাকতো নক্সা-করা ছড়ি। কবি ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন যে তাদের চালচলন দেখলে মনে হত যে তারা ধনপতি কুবের। খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে সারা ভারতবর্ষ থেকে ছাত্ররা কাশ্মীরে যেত পড়তে এবং কাশ্মীর প্রবাসী বাঙালী ছাত্রদের সম্পর্কেই কবির এই উক্তি।

যুগে যুগে বাঙালী তার পোষাক-পরিচ্ছদ পাল্টিয়েছে। সেলাই করা জামা পরার রেওয়াজ ভারতবর্ষে প্রায় ছিলই না বলা চলে, বাংলা দেশে তো নাই। বাংলা [illegible] পল্লী অঞ্চলের মেয়েরা আজও [illegible] কাপড়-জামা পরতে চান না, [illegible]

পরা মানেই দুঃখ-দারিদ্র্যকে মেনে নেওয়া। মনে হয় সেলাইকরা জামা পরার রীতি মুসলমান আমলেই বেশী করে চালু হয়। বাঙালী মেয়েরা চিরকালই শুধু একখানি শাড়ীই পরে এসেছেন এবং তারই আঁচল জড়িয়ে দিন কাটিয়েছেন। অপেক্ষাকৃত বিত্তবানেরা অবশ্য শাড়ীর ওপর ওড়নাও পরতেন। গ্রামের পুরুষমানুষ আট-হাতি খাটো ধুতি পরেই দিন কাটাতেন, শহরের মানুষের ধুতির বহর ছিল বেশী। যাদের অবস্থা ভালো তাঁরা অবশ্য গায়ে চাদরও দিতেন। জমিদার বা ধনী সম্প্রদায়ের বাড়ীর মেয়েরা নানা রকমের নক্সীকাজ করা বক্ষবাসও ব্যবহার করতেন।

আমরা যাকে বলি পাঞ্জাবী, পাঞ্জাবীরা সেই জামাকেই বলে বাঙালী-কুর্তা। গা-ঢাকার জন্য জামা বা পাজামা তো পশ্চিম ভারতেরই দান। মুসলমান আমলে রাজকার্যে নিযুক্ত হিন্দুদের মধ্যেও মুসলমানী ঢংয়ের পোষাক পরার রেওয়াজ চালু হয়, সেই ধারা আজও বর্তমান রয়েছে। ইংরেজ আমলেও বাঙালী-বাবু আর একবার তার পোষাক পাল্টেছে। পুরো হাতের সার্টের ওপর ধুতিপরা এবং তারও ওপরে গলাবন্ধ কোট চাপানো ইংরেজ সওদাগরী অফিসের বড়বাবুর চেহারাটা আজও আমাদের অনেকেরই চোখের ওপর ভাসছে। বাঙালী ছিন্ন দেশের আজও অনেক রকমের পোষাক পরেছে। গুজরাটী মেয়েদের ঢংয়ে ঘাগরা পরার কথাও জানা গেছে বাংলাদেশে। বাঙালী মেয়ের শাড়ী ছিল নানা রকমের আর তাদের নামও ছিল কতো। যেমন—নীলাম্বরী, মেঘডম্বুর, কমলাবিলাস থেকে জামদানী, বালুচর। বেশী দামের শাড়ী ছিল মসলিন। মসলিনে নানা রকমের বুটি তুলে তৈরী করা হোত রকমারী নক্সার শাড়ী যাকে বলা হোত জামদানী। জামদানীর সুতো খুব সরু, বুনট অত্যন্ত জমাট। এর নক্সাগুলি দুলত রেখা ভিত্তিক; কোথাও জ্যামিতিক, কোথাও গাছ বা লতাপাতাকে সাজিয়ে দেওয়া। হলদে, লাল আর সবুজ এই তিনটি রংই ছিল বেশী। বালুচর শাড়ীর বৈশিষ্ট্য তার আঁচলার নক্সায়। এই আঁচলের নক্সাগুলি চতুষ্কোণ পর পর সাজানো খোপের মতো। এক একটি খোপে বিচিত্র নক্সা—হাতী, ঘোড়া, ময়ূর, পাখী, [illegible] [illegible]
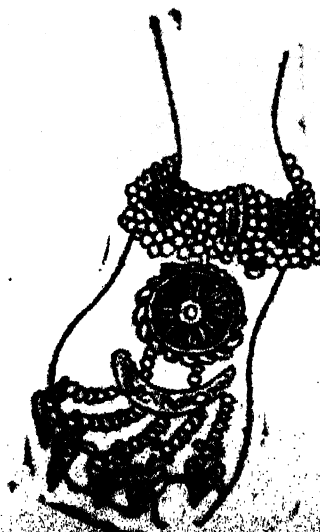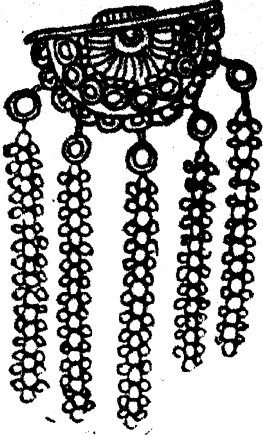
মসলিনের কথা লিখেছেন। হীরা নর্তকীর বর্ণনায় গোপীচাঁদ লিখেছেন, 'অব্র এক না শাড়ী পরে নিয়র মেলানি, রাইত হইলে শাড়ীখানি থাকে নিয়রে ভিনিয়া, দিন হইলে নটির শাড়ী উঠে জ্বলিয়া' ইত্যাদি। এই 'নিয়র মেলানী' শাড়ীই মসলিন। এক শ্রেণীর মসলিনের নাম 'শবনম' বা 'ভোরের শিশির' ছিল।

টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে খালি বাঙালীই করে। হাতে শাঁখা, নোয়া শুধু বাঙালী কনেরই। এই শাঁখার ডিজাইনই তো কতো পালটিয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে! কতো ডিজাইনই না ছিল—হোগলা পাতা, মানে-না-মানা, জলতরঙ্গ, কঙ্কা, বাঁশগিঁট, মটর-দানা, করোগেট, রেল-লাইন, মতিদানা কঙ্কন, কাঁথালি কঙ্কন ইত্যাদি।

গিলে-করা পাঞ্জাবী, চুনোট-করা ধুতি, পায়ে পাম্প-শু, গ্রীসিয়ান, অ্যালবার্ট বাঙালীবাবুর বাবুয়ানা নিয়ে কতোই না লেখা হয়েছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে। কাঁধে বুলবুলি পাখী রেখে নিমন্ত্রণে যাওয়া, সেও তো বাবু-কালচারেরই এক রূপ। জুড়ি-গাড়ী, হুঁকো, পাল্কী, অম্বুরী তামাক, কাশ্মীরী-শাল, তবক-দেওয়া পান, ঝাড়-বাতি সেদিনের বিত্তবান বাঙালীর একটি বড় অংশ এর মধ্যেই ডুবে ছিলেন। বুলবুলির লড়াই, টাকা বেঁধে ঘুড়ি ওড়ানো, নাচ-গান-মহফিলে সে কালটাই ছিল অন্য।

ক্রেপ করে শাড়ী পরতে ভারতবর্ষকে শিখিয়েছে বাঙলা দেশই। ঠাকুর বাড়ীতেই এ রীতির জন্ম। ছেলেদের পোষাকেরও যে কতো রকম-ফের ঘটে গেল। এই সেদিনও বড়ুয়া-কলার, জহর-কোট, শাঁখরন-কাফ, ডবল-কাফ ইত্যাদি পরতে ছেলেরা কতোই না ভালোবাসতো! দশ আনা-ছ' আনা আর পিছন দিকে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের প্যাটার্ন এখন খুবই সেকেলে বলে মনে হয় না কি!

ঘটি-হাতা ব্লাউজ, জলতরঙ্গ চুড়ি পরার দিন গেছে। ম্যাগেয়া হাতাও এখন প্রায় সেকেলে। শুনছি এখন ছ' গিরে কাপড়েই হাত-কাটা (স্লিভ-লেস) ব্লাউজ হয়ে যাচ্ছে। গহনা না পরাটাই এখন ফ্যাসান। ছেলেদের বড় ঘড়ি আজ মেয়েদের হাতে। হয়ত অচিরে মেয়েদের ছোট ঘড়ি আবারই ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরবে এবং সেটাই হবে সব চেয়ে লেটেস্ট ফ্যাসান।

'নকল হইতে সাবধান' এ বিজ্ঞাপনও পুরোনো। আজ নকল-গহনারই ছড়াছড়ি চারদিকে। হাতীর দাঁতের গহনা, সামুদ্রিক শঙ্খের গহনা, রূপোর ফিলিগ্রি কাজ-করা গহনা, পাথর-ঝিনুক বসানো গহনা এ সবই মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত।

অজন্তা চিত্রের অনুকরণে বাঁধা খোঁপা আজকাল রাস্তাঘাটে প্রায়ই চোখে পড়ছে। বাঙলা দেশের শাড়ীর মধ্যে শুধু টাঙ্গাইলই কিছু চালু, নইলে বাঙালী মেয়ে আজ সব চেয়ে বেশী কিনছে মাদ্রাজ, অন্ধ্র, বোম্বাই আর মধ্যপ্রদেশের শাড়ী। বেনারসী জামদানী, টিস্যু, সম্বলপুরের বাঁধনী, আউরঙ্গাবাদ, ভেঙ্কোর, চান্দেরী, মাহেশ্বরী, কোটা, হায়দ্রাবাদী প্রিন্টস, রতন-গিরি ইত্যাদি শাড়ী আজ বাঙালী আধুনিকা রমণীর ওয়ার্ডরোবে একখানি করে থাকবে আশা করা যায়।

ছাপা কাপড়েরও প্রচলন এখানে খুব। তবে বাঙলা দেশের নিজস্ব ছাপা ডিজাইন নামাবলী, আলপনা, কলকা, ফুলকারী ইত্যাদির চাহিদা কমেছে, বরং এখন বিদেশী ছাপা ডিজাইনেরই কদর বেশী।
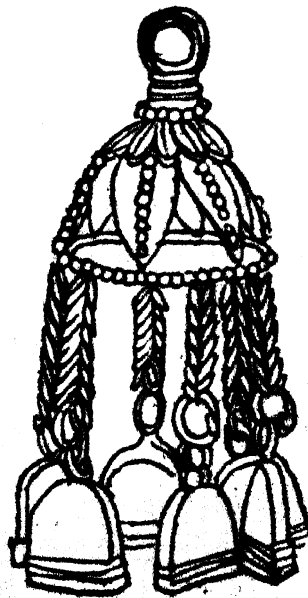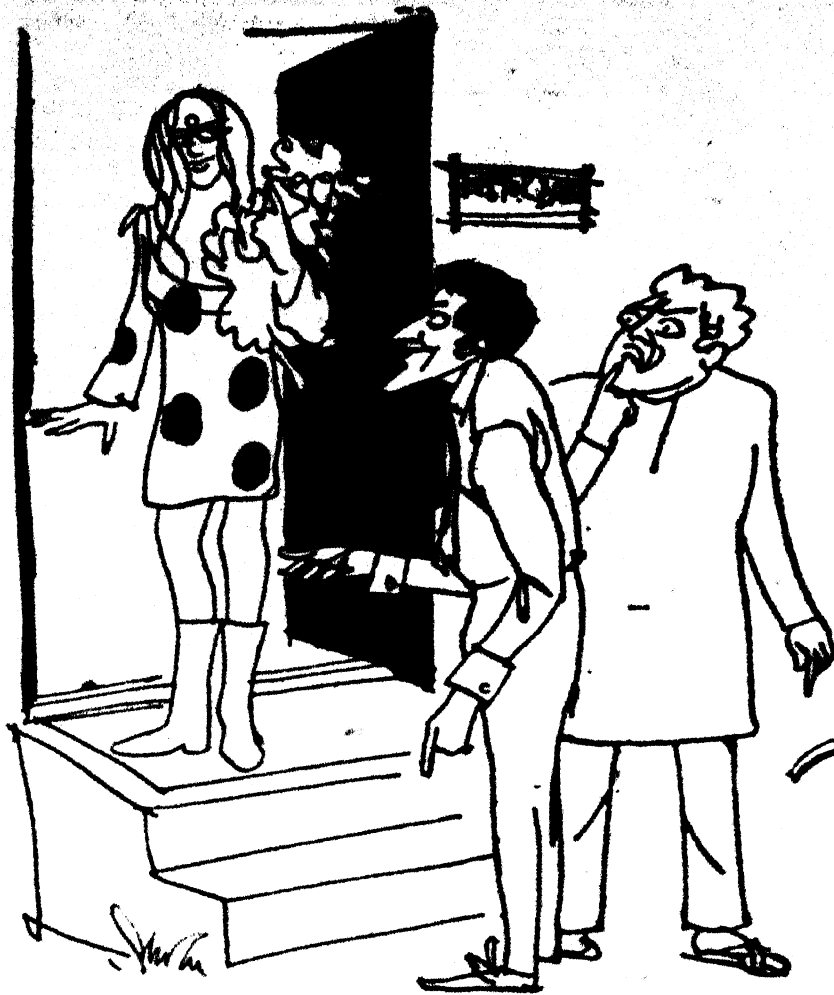
"মাম্মি, ড্যাডিকে দুজন জেন্টলম্যান ডাকছেন।" স্কার্ট পরা, বব ও শ্যাম্পু করা চুলের অধিকারিণী কিশোরীটির আহ্লাদ-লব্ধ কণ্ঠস্বর এবং দরজায় 'বিওয়্যার অব ডগ'-এর নিচে কুন্টো কে বাউসের নেম-প্লেটের যুগপৎ আক্রমণে অনিবার্যভাবে সাময়িক দৌর্বল্য দেখা দিল আমার। ছুটির দিনের পায়জামা, চপ্পল এবং হাত ভাঁজ করা জামার আড়ালে হাঁটু এবং বুক দু-ই-ই কাঁপতে শুরু করল। আমার শারীরিক অস্বস্তির কথা বুঝতে পেরে কনুই চেপে ধরল হাজারীলাল। মেয়েটি ঘরের ভেতর উধাও হয়ে যেতে না যেতেই হাওয়া করে এলেন জনৈকা মধ্যবয়সী মহিলা। হাজারীকে দেখে উল্লসিত হয়ে লিপ-স্টিকের ফাঁকে টুথ পেস্টের অনেকটা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে হাত তুলে হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে একেবারে দরজার কাছে এসে হুমড়ি খেতে পড়তে পড়তে আশ্চর্যজনকভাবে সামলে নিলেন। পায়ের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলা রণপায়ে চলাফেরা করেন—জুতোর হীল অত লম্বা এবং সরু আমি এই প্রথম দেখলাম।

"হ্যালো ডার্লিং! কি মনে করে?" ভদ্রমহিলা আরেকটি আঘাত হানলেন আমার [illegible] কণ্ঠে। দুই চোখ ম্যাকসিমাম লিমিট পর্যন্ত বিস্ফারিত করে তাকালেন তার সযত্নে লালিত বুকের দিকে। হাজারীলালকে আমরা ইয়ার বন্ধুরা বড় জোর হাজু পর্যন্ত ডেকেছি, কিন্তু হাজা? সেজোর—ভাবতেই কেমন যেন গা ঘিন ঘিন করতে লাগল আমার। হাজারীলাল একগাল হেসে বলল, "মেজদা নেই বৌদি?"

"ও ইয়েস, তোমার মেজদা আছেন। এসো, ভেতরে এসে বোসো।" বুঝতে পারলাম কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে কথার পেছনে সাধনা আছে ভদ্রমহিলার। আমার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে সম্ভবত আমার চটি-পায়জামা-জামা কম্বিনেশনের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করার জন্যই দ্রুত কুঁচকে একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি। আমরা একঝলক সেন্টের গন্ধ নাকে মেখে কুন্টো কে বাউসের ড্রইংরুমে ঢুকলাম।

ঝকঝকে সাজানো ড্রইংরুম। মাঝ মধ্যে জুড়ে কার্পেট পাতা, তার মাঝখানে লতাপাতা আঁকা কভারের সোফা সেট। চার দেয়ালের মাঝামাঝি ঠেস দেওয়া চারটে হাল-ফ্যাশানের বইয়ের আলমারী।

"বোসো, আমি কুন্টোকে ডেকে দিচ্ছি।" ভদ্রমহিলা একটি ঝটকায় পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। আমি হাজারীলালের কাঁধে হাত দিয়ে ওকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলাম। অবশেষে দাঁত খিঁচিয়ে বললাম, "শালা, এই তোর জাঠতুতো দাদার বাড়ি নাকি, অ্যাঁ? না কি আমাকে তিন নম্বর ভাঁওতা দিয়ে কোন বাঙ্‌রেজদের বাড়িতে নিয়ে এসেছিস সেটা নিজেকেই খাঁটি করে দেখার জন্য?"

"বাঙ্‌রেজ? মানে?" জিজ্ঞেস করল হাজারীলাল।

"আরে বাবা বাঙালীই বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে যাদের ইংরেজ বনবার ভারি সাধ!"

শহীদের মত মুখ করে জবাব দিল হাজারীলাল, "বিশ্বাস কর সুবল, এটাই আমার জাঠতুতো দাদা কৃষ্ণকান্ত বসুর বাড়ি। আমার আপন জ্যাঠামশাইয়ের—"

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন আবার।

"কুন্টো আসছে। একি, তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? প্লীজ বী সীটেড। তারপর—কি খাবে বলো, টী অর কফি?"

আমার দিকে তাকাল হাজারীলাল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ভদ্রমহিলা অতিথি আপ্যায়ন মেড ইজির নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত—এরপরই আমরা কেউ কিছু মুখ ফুটে বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবেন তিনি, "উইথ অর উইদাউট সুগার?" আমি এ হক জানি। সোফায় বসে পা নাচাতে নাচাতে বললাম, "আমার চা হলে এক কাপ চলতে পারে।"

রাস্তার দু ধারে কয়েক শ' বর্গ অন্তর কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স। বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন রঙ-এর বড় রাস্তা থেকে সরল জ্যামিতিক রেখার মত সরু সরু পীচঢালা পথ বেরিয়ে গেছে দু ধারে। তারই দু পাশে স্টাফ-কোয়ার্টার্স। এ টাইপ কোয়ার্টার্স থেকে বি টাইপের তফাৎ কেবল মাত্র আকৃতিতে বা রঙ-এর হেরফেরেই নয়, আভিজাত্যেও। তবে, ভুলক্রমেও কোনও দিন তৈরী হবে না পাশাপাশি। নেহরু রোডের বাসিন্দারা কোনও দিনই পা দেবে না গান্ধী কলোনীতে। সমস্ত উপনগরীটাই গড়ে উঠেছে কাঞ্চন কৌলীন্যের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে। অফিসারদের কোয়ার্টার সাধারণ কর্মচারীদের আবাসস্থল থেকে কম-সে-কম তিন মাইল দূরে। উজ্জ্বল রঙ-এর বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী, সামনে মেহেদী বেড়া দেওয়া একফালি লন। দূরে থেকে দেখলে মনে হবে এক রাশ গোলাপ ফুল সবুজ পাতার গোড়ায় ঈষৎ মুখ ঢেকে আছে।

রাতুল চাকলাদারের আস্তানা ওখান থেকে অনেক দূরে। স্বল্প আয়ের কর্মচারী-দের কোয়ার্টার্সের এক প্রান্তে। রাতুল এখানকার প্রধান ইস্পাত কারখানার এ্যাকা-উন্টস ক্লার্ক। রোগা ডিগডিগে চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গালের দু'দিকের হাড়-দুটো অস্বাভাবিক রকমের উঁচু। কথা বলার সময় গলার অ্যাডাম্‌স অ্যাপলটা বিশ্রীভাবে বেরিয়ে আসে। রাতুল চাকলাদারকে এই তল্লাটের সবাই চেনে। রাতুল সম্পর্কে একটু বিতৃষ্ণা মেশানো কৌতূহল আছে এখানকার ছা-পোষা কেরানীদের মনে। রাতুল বিবাহিত কিন্তু ওর স্ত্রীকে বিশেষ কেউ দেখে নি। দেখবে কি করে? সুধা, রাতুলের বউ, প্রায়ই বাপের বাড়ী যায় আর গেলে ফেরার নাম করে না সহজে। প্রতিবেশী সহকর্মীরা প্রথমটা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষো, ফিসফাস করত। রাতুলের আধা-ব্যাচেলার কোয়ার্টারের জানালায় ফাঁক দিয়ে রঙীন শাড়ীর আঁচল নাকি দেখা গেছে দিনে-দুপুরে। তার পাশের বাড়ীর ওভারশীয়ার জগৎবাবু হলপ করে বলতে পারে যে, গভীর রাত্রে সে মেয়েলি গলার খিলখিল হাসি শুনেছে রাতুলের ঘর থেকে। অথচ ভদ্রলোকের বউকে আনবার নামগন্ধ নেই। রাতুলের স্বভাব-চরিত্র যে সন্দেহজনক তাতে এখানকার অনেক গৃহস্থই নিঃসংশয়। কাজেই মুখে সদ্ভাব বজায় রেখেও তারা অনেকেই রাতুলকে বাড়ীর কাছে ঘেঁসতে দেয় না। ডাগর মেয়ে-বউকে আড়ালে রাখবার।

রাতুল চাকলাদারের অবশ্য এসব নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। লেখাপড়া করেছে সিউড়ীতে। আই এস-সি পর্যন্ত পড়েছিল রাতুল। পরীক্ষা দেয় নি শেষ পর্যন্ত। বাবা ছিল ওখানকার ইরিগেশন প্রজেক্টের ওভার-শীয়ার। ছেলের মতিগতি দেখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, ওখানেই এ্যাকাউন্টস লাইনে। প্রথম দু-চার বছর ওদিকেই কাটিয়েছে সে, দুবরাজপুরে, ইলামবাজার, কেঁদুলী, সরকারী কাজের হিসাবপত্র করত আর ঘুরে বেড়াত ময়ূরাক্ষী আর অজয়ের ধারে ধারে। সাঁওতালদের বস্তীতে সন্ধ্যার পর আর পাঁচজনের সঙ্গে উবু হয়ে বসে কচি শাল-পাতার চারকোণা ঠোঙায় মহুয়া গিলে নেশা করত। তারপর হয়ত কোনও মেয়েকে ইতি-উতি চোখের ইশারায় রাজী করিয়ে অন্ধকারে অপেক্ষা করত কোনও কাঁদরের ধারে। এই ছিল রাতুল চাকলাদারের প্রথম যৌবন। ছেলের সংসারের দিকে মন টানবার জন্য বাপে বিয়ে দিয়েছিল সাঁইথিয়ার কোন এক বড় জোতদারের মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু রাতুলের রক্তে যে নেশা অনেক দিন আগেই জ্বলে উঠেছিল সুধা পারে নি তা নেভাতে। অনেক ঘাটের জল খেয়ে রাতুল এখানে এসেছে চাকরী করতে। এসেছেও অনেক দিন। প্রয়োজন হলে ওরা আপনিই আসে। বাড়ীর বাইরের বারান্দায়, অবেলায় ঘুম দিয়ে ফোলা ফোলা চোখে, দুপাশের কাঁস আঁটিতে আঁটিতে এসে উবু হয়ে বসে রাতুল সিগারেট ধরায়। বাসন মেজেগো, বাসন, হাঁক ছাড়তে ছাড়তে যে দাঁইজা পাড়ার পশ্চিমা মেয়েটি রাস্তা দিয়ে যায়, সে রাতুলের দৃষ্টিতে কি দেখে সেই জানে— নির্জন দুপুরে রাস্তাঘাট এদিক-ওদিক এক নজরে দেখে নিয়ে মুচকি হেসে সটান এসে দাঁড়ায় সামনে। এ সব ব্যাপারে খুব একটা বাছ-বিচার রাতুলের নেই।

রাতুলের অফিসটা বেশ দূরে। সাত-সকালে স্নান খাওয়া সেরে সে যখন বাসের জন্য কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে এসে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরায় তখন এ পাড়ার অনেক বাবুই বাজার শেষ করে ফেরে নি। হাতের তরিতরকারীর ব্যাগ, মাছের ন্যাকড়া সামলে, জগৎ ওভারশীয়ার মুখে হাসি টেনে বলে, রাতুল-বাবু, এত সাতসকালে যে? রাতুল মৃদু হেসে সিগারেটের ছাই ঝাড়ে, কোনও জবাব দেয় না। জগৎ ওভারশীয়ারের হেসে কথা না বলে উপায় নেই। অনেক টাকার টি-এ বিল পাশ হবে রাতুলের হাত দিয়ে। শুধু জগৎবাবু কেন, আরও অনেক কেরানী, ওভারশীয়ার, সার্ভেয়ারকে রাতুলের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেকর্মে চটপটে বলে উপর মহলে রাতুলের প্রতিপত্তি আছে, তাই রাতুলকে সহজে কেউ ঘাঁটাতে চায় না। রাতুল অফিস যায় আসে। ঘরে ফিরে টুকি-টাকী গৃহস্থালির কাজ করে। হাতে কাজ না থাকলে নিচু পর্দায় রেডিও খুলে গান শোনে। সুধা আবার বাপের বাড়ী গেছে। পর পর দুটো সন্তান নষ্ট হয়ে যাবার পর সুধা নানা রকম স্ত্রীরোগে ভুগছে, রাতুলের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। তাছাড়া রাতুলের স্বভাব-দোষটাও বোধহয় টের পেয়েছে সুধা। প্রতিবারেই ফিরে এসে সুধা ঘরের চারদিকে সন্দেহ-মাখা দৃষ্টিতে তাকায়, আনাচ-কানাচ খোঁজে। সোজাসুজি তাকায় না, কিন্তু রাতুল পিছন ফিরে বুঝতে পারে সুধার নিষ্ফল অসন্তোষের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে।

গ্রীষ্মের দুপুরটা বড় কষ্টকর এখানে। সকাল থেকেই প্রচণ্ড রোদ্দুরের দাবদাহে পথ-ঘাট তেতে ওঠে। রাস্তার পীচ গলে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হু-হু করে শুধু যেন আগুনের শিখার মত। পথঘাট জন-জনপ্রাণীহীন। রোদের তাপ বাড়ার আগেই রাতুল এ সময় অফিসে ছোটে। ফেরেও সন্ধ্যার পর।

তাড়াতাড়ি ঘরে তালা-চাবি বন্ধ করে বাইরের বারান্দায় এসে রাতুল দেখল অদ্ভুত কাণ্ড। ধুলোর ঝড় উঠেছে, সেই সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। একটা বাচ্চা ছেলেকে টানতে টানতে দ্রুত পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে একটি বার-তেরো বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে রাতুলের বারান্দায় এসে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামল। মেয়েটির হাতে আনাজ-তরকারীর থলে, বোধহয় বাজার করে ফিরছিল। চোখ কচলে, চুল সরিয়ে রাতুলকে দেখে মেয়েটা একটু সঙ্কুচিত হল। অপ্রতিভ নিচু গলায় বলল, বৃষ্টিটা এমন নামল।

রাতুল এতক্ষণ চুপ করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছিল, বেশ বাড়ন্ত গড়ন, সঙ্গের ছোট ছেলেটা বোধহয় ভাই। বৃষ্টি আর লাল ধুলোয় ওদের সর্বাঙ্গ মাখামাখি হয়ে গেছে। রাতুল সিগারেট নামিয়ে নরম গলায় বলল, তাতে কি হয়েছে, একটু দাঁড়িয়ে যাও। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, মুড়মুড় করে মেঘ ছুটে আসছে উত্তর দিক থেকে, বৃষ্টিধারায় জোগান দেবার জন্য। রাতুল একটু ইতস্তত করল, কি যেন ভাবল, তারপর আকাশের দিকে আরেকবার তাকিয়ে পকেট থেকে চাবি বার করে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। ছোট ছেলেটা এতক্ষণ কৌতূহলী-ভরে রাতুলকে লক্ষ্য করছিল। রাতুল ঘরে ঢোকবার পর এক পা, দু পা করে সেও ভিতরে ঢুকে অবাক চোখে চারদিক তাকাতে লাগল। মেয়েটি হঠাৎ পিছন ফিরে ভাইকে না দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘরের ভিতর চোখ পড়তে সংকোচ আর ভাই-এর প্রতি বিরক্তিতে অস্ফুট শব্দ করে উঠল। চাপা গলায় ডাকল, লম্বু, এই লম্বু চলে আয়। রাতুল ওপাশের বন্ধ জানালাটা খুলে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। হাতের মুঠোয় দেশলাইটা চেপে ধরে, ধীর গলায় বলল, আহা, থাক না। তুমিও এসো না ভিতরে। এ বৃষ্টি সহজে থামবে না মনে হচ্ছে।

মেয়েটি অপরিচিত লোকের মুখে 'তুমি' শুনে একটু কুঁকড়ে গেল। চকিতে একবার রাতুলের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল। রাতুল সহজ গলায় বলল, এসো, ভিতরে এসো, বসবে। কি নাম তোমার?

মেয়েটি দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষছিল। রাতুলের প্রশ্নের উত্তরে [illegible] বলল, [illegible]। [illegible] ছোট ভাইটা ততক্ষণ একটা টী-পয় [illegible] করছিল। সে [illegible]

শুনে দাঁড়িয়ে আধো আধো গলায় বলে উঠল, আমাকে নাম হাসকল। কথা বলার ভঙ্গিতে আর অযাচিত উত্তর শুনে রাতুল হো হো করে হেসে উঠল। সন্ধ্যাও ফিক করে হেসে মাথা নিচু করল। তারপর যেন অনেকটা সহজভাবেই সন্ধ্যা ঘরে ঢুকে ভাইকে কাছে টেনে ছোট তক্তপোষের কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল। রাতুল একটা চেয়ার টেনে বসেছিল সন্ধ্যার মুখোমুখি। এতক্ষণে খুঁটিয়ে দেখল ওকে। নেহাৎই মেয়ে-মানুষ, বার-তেরোর বেশী বয়স নয়। কালোর উপর চোখের ভুরু দুটো টানা টানা, ভাসা ভাসা চোখ। সুডৌল চিবুক। বেশ শান্ত মুখশ্রী। রাতুলের বেশ ভাল লাগল ওর ঈষৎ অপ্রস্তুত বিপন্ন মুখটা। সন্ধ্যা মাঝে মাঝেই আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। রাতুল আস্তে আস্তে সন্ধ্যাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই জানল। সন্ধ্যা এবার ক্লাশ এইটে উঠেছে। দু বোন এক ভাই। সন্ধ্যাই বড়। ওর বাবা স্টীল প্ল্যান্টের স্টোর ক্লার্ক। রাতুল ঠিক চিনতে পারল না নাম শুনে। নতুন নতুন অনেকেই এসেছে আজকাল। ওরা পাশী কলোনীর উত্তর দিকটায় থাকে, নতুন এসেছে।

রাতুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। শম্ভু দিদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল সন্ধ্যার চাপা তর্জন উপেক্ষা করে। রাতুল সম্বিত ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর পাশের ঘরে গিয়ে টিনের কৌটো খুলে গোটা-কয়েক বিস্কুট বার করে এনে শম্ভুর হাতে দুটো দিয়ে বাকিটা সন্ধ্যার সামনে ধরল। সন্ধ্যা যেন লজ্জায় মরে গিয়ে ছিটকে সরে যেতে চাইল। তারপর দু হাত কোলে গুঁজে মাথা নিচু করে আপত্তি জানাল—না-না এসব কেন। শম্ভু মহানন্দে বিস্কুট চিবুতে চিবুতে দিদির নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। রাতুল সস্নেহে হেসে বলল, কি হয়েছে তাতে, নাও না, সামান্য বিস্কুটই তো। নাও হাত পাতো। সন্ধ্যা ইতস্তত করে আড়চোখে দেখল বিস্কুটগুলো দামী, চকোলেট ক্রীম দেওয়া। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে তারপর অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিল। রাতুলের সামনে মুখে দিতে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছিল। রাতুল সরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। বৃষ্টি আরও কিছুক্ষণ চলবে কিনা কে জানে।

সন্ধ্যা বিস্কুটের একটা কোণ ভেঙে মুখে পুরে নিঃশব্দে চিবুতে চিবুতে ঘরের চারদিক দেখছিল। ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। দেওয়ালে সুন্দর ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার,—টেবিলে সৌখীন টেবিল-ল্যাম্প ও দোয়াতদান। একটা ছোট স্ট্যান্ডে আটকানো একটি বয়স্কা মেয়ের ফটো। সন্ধ্যা কৌতূহলী চোখে ঘাড় উঁচু করে ছবিটা দেখবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটির সঙ্গে রাতুলের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টায় মাঝে মাঝে অনেক রাতুলকে দেখছিল। রাতুল কিন্তু ইতিমধ্যে সন্ধ্যা আর ওর ভাই-এর উপস্থিতিটা ভুলে যাচ্ছিল। অফিসের দেরী

ঘরে গেছে অনেক। জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল বর্ষাতি গায়ে, ছাতা মাথায় কিছু অফিসযাত্রী একজন-দুজন করে বাস-স্টপে জড়ো হচ্ছে। বৃষ্টি ধরে এসেছে প্রায়।

সন্ধ্যা মুখ তুলে রাতুলের মনোভাবটা বোধহয় বুঝতে পারল। হাতের বিস্কুট সবগুলো খাওয়া হয় নি। অলক্ষ্যে ফ্রকের পকেটে সেগুলো চালান করে দিয়ে কোলের উপর থেকে বিস্কুটের গুঁড়ো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকল, শঙ্কু। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে সামান্য। কিন্তু লোকজন সব বেরিয়ে গেছে। শঙ্কুকে বাঁ হাতে সাপটে ধরে সন্ধ্যা ওর বাজারের থলে গুঁছিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। রাতুলও ভাবছিল, এই ফাঁকে বেরুনো যায় কিনা। সন্ধ্যাদের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, মাঝে মাঝে ভাইকে নিয়ে এসো কেমন? সন্ধ্যা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে। রাতুল কি ভেবে এক পা এগিয়ে পকেট থেকে একটা চকচকে সিকি বার করে সন্ধ্যার হাতে গুঁজে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, আমার কাছে টফি নেই, যাবার পথে শঙ্কুকে কিনে দিও। সন্ধ্যা একটু বিব্রত হচ্ছিল, কিন্তু সিকিটা হাত পেতে নিয়েই মুঠিটা বন্ধ করে মাথা হেঁট করে নেমে গেল নিচে। ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রাতুল পিছন ফিরে নিচু হয়ে দরজা বন্ধ করছে।

রাতুলের অফিসটা একটু দূরে হলেও বেশ ছিমছাম, নিরিবিলি। নূতন একতলা বাড়ীটার ঘরগুলো ছোট ছোট, চার পাশের জানালা দরজায় ভারী পর্দা, হঠাৎ দেখলে ফ্যামিলী কোয়ার্টার বলে মনে হবে। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করে রাতুল সোজা হয়ে বসে টেবিল-ল্যাম্পের শেডটা টেনে দিয়ে চোখ আড়াল করল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে গা এলিয়ে দিল। সকালের ছবিটা মনে পড়ল। সন্ধ্যা আর ওর ছোট ভাই শঙ্কুর কথা। কথাটা ভাবতে ভাল লাগল রাতুলের। সন্ধ্যার অপ্রস্তুত মুখটা। বেশ ভাসা ভাসা চোখ দুটো।

বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অফিসের বয়টা বার-দুই এসে ঘুরে গেছে। রাতুল আসেও যেমন সবার আগে যায়ও তেমনি সবার পরে। সারা দিন কাজের চাপে সময় থাকে না নিঃশ্বাস ফেলবার। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় খেয়াল থাকে না। সন্ধ্যার পর ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ দাঁড়ায় বেতো পঙ্গু ঘোড়ার মত। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। রাতুলের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম, তাও কাছাকাছি কেউ নেই। আর পাঁচজন যখন তাস-পাশা, দাবার আড্ডায় মশগুল, রাতুল তখন একা একা সিগারেট ধরিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন দিন দূরের গ্রামের দিকে রওনা দেয়। ধীরে সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় সাঁওতাল বস্তীতে। রাতুলকে ওরা চিনে গেছে সকলেই। কোম্পানীর বাবু বটে। কিন্তু কিছু কামীনের সঙ্গে রাতুলের সম্পর্ক সন্দেহজনক। কিন্তু এদের মধ্যে, বিশেষ করে শহরে যারা কাজ করতে যায়, তাদের সকলেই জানে। কাজেই বুড়ো সাঁওতাল সর্দারগুলো মদের পয়সাটা আদায় করে ছেড়ে দেয়। মুখের হম্বি-তম্বি অবশ্য ঠিক থাকে। নেশা করা লাল চোখ দুটো তুলে রাতুলকে দেখে তারপর ঘাড় গুঁজে চুপচাপ বসে থাকে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে যখন মহুয়া পাকে, সাঁওতাল বসতিগুলোতে চোলাই মদ তৈরী হয়। রাতুল বেশ কড়া নেশা করেই বাড়ী ফেরে। ফেরবার পথে রজেনবাবুর হোটেলে কষা মাংস আর রুটী। খাবারের অর্ডার শুনেই রজেন কুন্ডু বুঝতে পারে রাতুলবাবু আজ কোন দিকে গিয়েছিল। বেশ খাতিরও করে ওরা রাতুলকে। হোটেলের লাইসেন্সটা নাকি রাতুলই বার করে দিয়েছিল। তাই রাতুলের এখানে স্পেশাল খাতির।

এখানকার বড় রাস্তাগুলো অধিকাংশ সময়েই নির্জন, দুপুরের আলসেমীতে পড়ে পড়ে ঝিমোয়। বড় ঝাঁকড়া সেগুন গাছে ঘুঘু পাখী ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যায়, পিছনে লাল ধুলোর ঘূর্ণি তুলে। সকাল নটার পর একজন-দুজন করে বাস স্টপে জমা হতে থাকে অফিসযাত্রীরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোটখাট ভীড় জমে ওঠে। খুচরো কথাবার্তা, কুশল প্রশ্ন, ছোটখাট হাসি-ঠাট্টার মধ্যে আবহাওয়াটা সরগরম হয়ে ওঠে। ছোকরা কর্মচারীদের দল পরে ড্রেন পাইপ প্যান্ট, টি-সার্ট। মেয়েরা রঙীন প্রিন্টের শাড়ী, সেই সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ আর ভ্যানিটি ব্যাগ। ছেলে-মেয়েদের অনেকে ব্যাচেলার হওয়া সত্ত্বেও ফ্যামিলী কোয়ার্টার পেয়েছে। নিজস্ব আলাদা বাড়ী। এদের আলোচনার প্রধান ও সবচেয়ে মুখরোচক বিষয়বস্তু হল কোন ছেলেকে কোন মেয়ের সঙ্গে আজকাল বেশী ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। কার বাড়ীর জানালায় রঙীন শাড়ীর আঁচল উড়তে দেখা গেছে, ইত্যাদি। ছোটখাট স্ক্যান্ডাল আজকাল অবশ্য তেমন একটা চাঞ্চল্য জাগায় না। বিকেলে অফিস ছুটির পরও বাস স্টপগুলির একই চেহারা। সকালের পরিচ্ছন্ন পাউডার-ঘষা মুখ বিকেলে একটু তেলতেলে দেখায়, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দৃপ্ত ভঙ্গীটা একটু গা এলিয়ে দেওয়ার ক্লান্তিতে নরম হয়ে পড়ে। কোন মুখরোচক খবর থাকলে অবশ্য জায়গাটা সরগরম হয়ে ওঠে নানা মন্তব্য আর টিপ্পনীতে।

* * *

রবিবার দিন সকাল। বেলা তখন প্রায় নটা। রাতুল ছোট আয়নাটার সামনে নিবিষ্ট মনে দাড়ি কামাচ্ছিল। পাশের ঘরে স্টোভের উপর কেৎলীতে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছে। শোঁ-শোঁ শব্দ আসছে একটা ও-ঘর থেকে। রাতুলের মনটাও খুশীর সকালে রোদ পোহাচ্ছে। গতকাল ছুটির ঠিক আগে বড়-সাহেবের অফিসে ডাক পড়েছিল রাতুলের। অনেক দিনের পুরোনো কতগুলো জটিল অডিট অবজেকশনের ব্যাপার ছিল। বড় সাহেব রাতুলের কাজে খুব খুশী। চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে, ইঙ্গিত দিয়েছেন ভবিষ্যৎ উন্নতির। সামনের মাসেই বেশ বড় রকম ওলট-পালট হবে হেড অফিসে। দেখাই যাক, কি হয়, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বকেই যেন রাতুল বোঝাচ্ছিল। শিশু কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে রাতুল বিস্মিতভাবে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সন্ধ্যা আর ওর ভাই শঙ্কর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে। শঙ্কর প্রাণপণে দিদির হাত ছাড়িয়ে বারান্দায় উঠে আসার চেষ্টা করছে আর এক হাতে বাজারের থলে, অন্য হাতে শঙ্করের হাত আঁকড়ে ধরে বিব্রত আর বিরক্তভাবে সন্ধ্যা ওকে টেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। রোদের তাপে সন্ধ্যার মুখটা রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, উড়ো চুল এসে লেপটে পড়েছে এধার-ওধার। ছবিটা দেখতে দেখতে রাতুল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ক্ষুরটা নামিয়ে রেখে, তোয়ালে দিয়ে গালের সাবান মুছে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা অপ্রস্তুতভাবে কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই রাতুল শঙ্করকে ডেকে নিল কোলে। সন্ধ্যাও নিরুপায় হয়ে পিছু পিছু ঘরে ঢুকল। কিন্তু মনে মনে খুশী হল রাতুলের আগ্রহ দেখে।

ঘরে ঢুকে ওকে নামিয়ে দিতেই শঙ্কর যথারীতি দাপাদাপি আরম্ভ করল ঘরময়। একবার লাফিয়ে বেতের চেয়ারটায় ওঠে, আবার এগিয়ে গিয়ে সৌখীন টেবিল-ল্যাম্পটার ঢাকনায় হাত দেয়। সন্ধ্যা রুদ্ধ গলায় ডাকে, শঙ্কর কি অসভ্যতা হচ্ছে, এদিকে এসো। রাতুল মৃদু হেসে বলল, তুমি সব তাতেই এত লজ্জা পাও কেন? সন্ধ্যা মুখ লাল করে মাথা নিচু করে অস্ফুট গলায় বলল, ভারী অসভ্য!

রাতুল সন্ধ্যার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছিল। তরল গলায় বলল, কে অসভ্য, আমি? সন্ধ্যা একটু যেন অবাক হয়ে চোখ তুলে রাতুলের দিকে তাকাল। এই গম্ভীর ধরনের বয়স্ক ভদ্রলোক তার সঙ্গে আবার ইয়ার্কি করতে পারে নাকি? রাতুলের কৌতুকোজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা যেন মরমে মরে গেল। যা, কি যে বলেন, বলে ছিটকে বেরিয়ে গেল বারান্দায়! রাতুল হাসিমুখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ সন্ধ্যার দিকে।

ওদিকে ঘরের ভিতর শঙ্করের কাণ্ড দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও সন্ধ্যার দায় হয়ে উঠল। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়েছে পাশের ঘরে যেখানে স্টোভে টগবগ করে চায়ের জল ফুটছে। শঙ্কর ছিটকিনি আলমারী খুলে বিস্কুটের টিন টেনে বার করেছে ততক্ষণ। পর্দার ফাঁক দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছে সন্ধ্যা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ উসখুস করে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল সন্ধ্যা। রাতুল দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছে ...

দাঁড়িয়ে রাখত। তারপর রাতুলকে তুলে নিয়ে, জীপ হাঁকাত। শহর থেকে বেরিয়ে বাঁক ফিরে খাড়াটা মাঠের ধারে কোন কোণের আড়ালে দাঁড় করাত পান্দু বর্মণ। তারপর সুইচ টিপে হেড-লাইট নিভিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে পান্দু বর্মণ করে দেশলাই জেলে বিড়ি ধরিয়ে পা এলিয়ে দিত সীটে। হাটুরে সাঁওতাল মাঝিনগুলো ধীরে ফিরতো তখন শহরের কেনাবেচা শেষ করে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মেয়েগুলো নিজেদের ভাষায় কলকল করে কথা বলতে বলতে পথ চলতো। হঠাৎ কোণের আড়ালে দাঁড় করান গাড়ী আর আরোহীর দিকে চোখ পড়লে খিল্ খিল্ করে হেসে নিজেদের মধ্যে গা টেপাটেপি করতে করতে পথ চলতো। এখানে এভাবে অপেক্ষা করার মানে ওরা জানে। মিষ্টি হেসে বাবুরা জিজ্ঞাসা করবে, কুথাকে যাবি তোরা, ঘর কুথা বটে। চল্ পোঁছে দি। লে সিগারেট খা। যারা এ-ফাঁদে পা দেয়, জেনেশুনেই দেয়। ফিস্ ফিস্ করে কি কথাবার্তা হয় কে জানে, এবড়ো-খেবড়ো ঢেউ-খেলান মাঠের অন্ধকারে মিশে যায় দুটি মূর্তি অন্ধকারে ওদের চোখ যেন শ্বাপদের মত জ্বলে। রুক্ষ ঘাসহীন পাথুরে জমিতে গড়াগড়ি দেয় তারা। কিছুক্ষণের জন্য বুনো জানোয়ারের মত দাপাদাপি করে, তারপর ফিরে আসে তৃপ্ত ক্লান্ত দেহে।

রাতুল ঘুমে ঘুমে চোখে সিগারেটের প্যাকেটের থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আড় হয়ে পড়ে রইল বিছানায়। অফিস যাবার তাড়া নেই, এক সময় গিয়ে ঘুরে এলেই হবে। হঠাৎ মনে হল সন্ধ্যা আর ছোট ভাই অনেকদিন আসেনি। ওদের আসা-যাওয়াটা আজকাল বেশ সহজ হয়ে গেছে। শঙ্কর যথানিয়মে আলেভাবে বিস্কুটের টিন কি চকোলেটের বাক্স দখল করে, সন্ধ্যা আলতো পায়ে এ-ঘর ও-ঘর যাতায়াত করে, টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো নেড়েচেড়ে দেখে। দুধার প্রসাধনের জিনিসগুলোর দিকেই ওর নজর বেশী। ড্রাজ্জাতরে তুলে নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে সেন্টের শিশিটা নাকের সঙ্গে চেপে ধরে, পাউডারের পাফটা আলতো করে গালে বোলায়। রাতুলের কাছে একদিন ধরা পড়ে গিয়ে সন্ধ্যা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর জেদী মেয়ের মত ঠোঁট উল্টে বলল, এসব এখানে রাখার কোন মানে হয় না। রাতুল সন্ধ্যার মনের গতিবিধিটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। সন্ধ্যা যে সুধার অস্তিত্বটা বিশেষ পছন্দ করে না, এমন একটা সন্দেহের ছায়া রাতুলের মনে খেলা করছিল। কিছুদিন আগে রাতুল বিস্মিতভাবে লক্ষ্য করেছে, শোবার ঘরে দেওয়ালের গায়ে আটকান সুধার ছবিটা উল্টে রয়েছে। দমকা হাওয়াতেও হতে পারে, কে জানে। অকারণ খোয়াকেয়ার ফাঁকে সন্ধ্যা মাঝে মাঝে নির্নিমেষে তাকিয়ে রাতুলকে লক্ষ্য করে সেটা সে খবরের কাগজের আড়াল থেকেও মাঝে মাঝে টের পায়। কোনও ব্যাপারে উদ্দাহিত ভাবে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে রাতুলকে দু-তন্দ্রী করে। গভীর কালো চোখে কি যেন ছায়া পড়ে। তারপর মাথা নিচু করে মেঝেতে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘসতে থাকে জোরে জোরে। কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ ঠোঁট উল্টে সরে যায় ওখান থেকে, জানালার শিক ধরে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে অবশ্য ওর ছেলেমানুষীতে রাতুল বেশ কৌতুক বোধ করে। লুচি বেলতে গিয়ে কিছুতেই সমান করে গোল করতে না পেরে ময়দার লেচি দুমড়ে মুচড়ে আবার নতুন করে বৃথা চেষ্টা করছে। শেষটা লজ্জা আর অপমানে মুখ রাঙা করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্য করছে, রাতুল কেমন নিপুণ হাতে লুচি বেলে কড়াতে ফেলছে।

ধীরেসুস্থে স্নান সেরে, জামাকাপড় পরে দরজায় তালা দিয়ে রাতুল বেরুল। ব্রজেনবাবুর হোটেলে খেয়েই অফিস যাবে আজ। কতক্ষণে ফেরা যাবে কে জানে। গত কয়েক সপ্তাহের কাজের একটা রিপোর্ট লিখতে হবে। একবার বসলে আর সহজে ওঠা যাবে না। ধুলো উড়িয়ে একটা বাস আসতেই রাতুল লাফিয়ে উঠে পড়ল।

রাতুল বরাবরই কাজ-পাগলা মানুষ। যতই বাইরের টান থাক, হাতের কাজ ফেলে সে কখনই উঠতে পারে না। অফিস গিয়ে দেখল, পাণ্ডুলীসাহেব হাঁ করে বসে আছেন রাতুলের রিপোর্টের অপেক্ষায়। বেলা যে কখন গড়িয়ে গেল টেরই পেল না। কাপ-চারেক চা আর প্রায় দেড় প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে রাতুল প্রায় বিশ পাতার একটা রিপোর্ট তৈরী করল। তারপর সেটা যখন টাইপিস্টের টেবিল থেকে তুলে, সংশোধন করে অফিসারের ঘরে জমা দিয়ে বাইরে বেরুল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমেছে, টিপ টিপ বৃষ্টি দু-চার ফোঁটা করে আরম্ভ হয়েছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল রাতুল কিছুক্ষণ, তারপর হঠাৎ একটা রিক্সা ডেকে বাড়ীর পথ ধরল। বাজার থেকে মাঝপথে কিছু খুচরো জিনিস কিনলো, তারপর রিক্সায় গা এলিয়ে বসে রইল প্রশান্ত মনে। বাড়ীর সামনে কাদ্‌ভার্টে একটা ঝাঁকুনী খেয়ে রিক্সাটা একেবারে লাফিয়ে উঠে ধীরে ধীরে থেমে গেল। এতক্ষণে সজাগ হল রাতুল। ভাড়া মিটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে মনে হল কে যেন অন্ধকারে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জিনিসগুলো সামলে রাতুল ঝুঁকে পড়ে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে সন্ধ্যা, তুমি? কতক্ষণ এসেছো?

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিটা একটু যেন ঝাঁকিয়ে এল। সেই সঙ্গে জোরে হাওয়া দিচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাল রাতুল। সহজে বৃষ্টি থামবে বলে মনে হয় না। রাতুল তালা খুলে ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। তারপর দরজার পর্দা সরিয়ে সন্ধ্যাকে ডাকল আবার। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা তির্যকভাবে সন্ধ্যার মুখের উপর পড়েছে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে সন্ধ্যাকে যেন অচেনা মনে হচ্ছে। রাতুল আবার জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ এসেছো? সন্ধ্যা শাড়ীর খুঁটে আঙুল মেঝেতে বসতে বসতে আবার জবাব দিল, এই তো কিছুক্ষণ। রাতুলের ঠিকমত ভাবটা তখনও কাটেনি, বলল, শঙ্কর কোথায়, ওকে সঙ্গে আনোনি? সন্ধ্যা ভাসা ভাসা জবাব দিল, ও বাড়ির খেলা খেলছে। রেখেছে, ছেলেমানুষ? রাতুল হেসে ফেলল। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে তারপর বলল, আর তুমি বুঝি খুব বুড়োমানুষ? তোমার মা খোঁজাখুঁজি করবে না তোমাকে? সন্ধ্যা হাল্কা গলায় বলল, জানতেই পারবে না মা, আমি এখানে আছি। মা জানে আমি আমার পিসতুতো দাদার বাড়ীতে আছি— সামনের একুশ নম্বর রাস্তায়।

রাতুল এবার স্থিরদৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে তাকাল। ছেলেমানুষ, চঞ্চল গোলগাল চেহারা। টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টিতে মাথার ভেজা চুলগুলো ভিজে কপালের সঙ্গে লেপ্টে আছে। ভাসা ভাসা চোখদুটো কিন্তু চিক্ চিক্ করছে, মুখটা লালচে। বোধহয় বৃষ্টি এড়াবার জন্য দৌড়ে এসেছে। সন্ধ্যা ঘরের ভিতর দেওয়ালে হেলান দিয়ে আড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একগুঁয়ে জেদী মেয়ের মত। রাতুল একবার ঘাড় ফিরিয়ে ঘড়িতে সময় দেখল, পৌনে সাতটা। সন্ধ্যার দিকে এক নজর তাকিয়ে উঠে গিয়ে রান্নাঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে চা-এর জলের কেত্‌লী বসাল, পেয়ালা-পিরিচ সাজাতে লাগল। সন্ধ্যা কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শোবার ঘরে ঢুকল, তারপর আলো জ্বালিয়ে ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। রাতুল ছোটখাট কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যার গতিবিধিটা লক্ষ্য করছিল। সন্ধ্যা যেন একটু একটু করে রহস্যময় হয়ে উঠছে ওর কাছে। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, সেই সঙ্গে দমকা হাওয়ার শব্দ ঘরের ভিতর স্টোভের সোঁ-সোঁ গর্জনের সঙ্গে মিশে গেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রাতুল শোবার ঘরের দরজায় চৌকাঠের কাছে পর্দা সরিয়ে কবাটের পাল্লার উপর অলস হাত রেখে দাঁড়াল। আয়নাতে দেখতে পেয়েছিল সন্ধ্যা। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে সেই রহস্যময় দৃষ্টিতে রাতুলের দিকে তাকাল। যেন সে জানতো, রাতুল এ-ঘরে আসবে।

রাতুল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল। হাতের সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছে। অনেকদিনের পুরোনো দুশের পাণ্ডুলিপির মত মনে পড়ছিল তার কৈশোরের স্মৃতি। শিউড়ীতে তখন থাকতো ওরা। তের-চোদ্দ বছর বয়েস, বোধহয় ক্লাস নাইনে পড়ত। মহাযুদ্ধের কাল চলছিল তখন। ওরা থাকতো দুখানা ঘরের সিংগলের কোয়ার্টার্স-এর শেষ প্রান্তে। ওখান থেকে আরম্ভ হয়েছে 'এ'-টাইপের বাংলো প্যাটার্নের কোয়ার্টার। ওদের পাশের বাড়ীতে ছিল মল্লিকা বৌদিরা। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্যানার্জির স্ত্রী। রাতুলের স্মৃতিটা নিজের অজান্তে একবার ধক করে কেঁপে উঠে স্পষ্ট হল। মল্লিকা বৌদির মুখ মনু

শতবার্ষিকী স্মরণে

ম্যাক্‌সিম গোর্কী (২)

ভবানী মুখোপাধ্যায়

।। তিন ।।

এই রুটির কারখানায় জীবন আর এক শিক্ষানবিশীর কাল। দেরেনকভ বিপ্লবের কাজের সাহায্যের জন্য এই রুটির কারখানা খুলেছিল। বিপ্লবের স্বপ্নে পাগল কিছু ছাত্র দেরেনকভের এই প্রচেষ্টায় সহায়ক। আলেকসীকে দেরেনকভ তাই সহকারী হিসাবে নিয়ে এল।

পাঁউরুটির কারখানায় অনেক কাজ. পাঁউরুটি তৈরী করা থেকে তার বিলি-বন্দোবস্ত। সেই সঙ্গে গোপনে বিপ্লবের প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা বিতরণও করতে হয়। এই কাজের সময়েই দেখা গেল নানা জায়গায় দেহবিলাসের বিচিত্র লীলা। ধর্মের আড্ডা, মেয়েদের বোর্ডিং সর্বত্রই সেই এক ধারা। যৌন কামনায় পরিতৃপ্তির বিচিত্র প্রয়াসে সবাই মশগুল। পাঁউরুটির কারখানার যারা কারিগর তারা যায় বেশ্যালয়ে। সেখানে আলেকসীকেও টেনে নিয়ে যায়। পাদ্রী সাহেবের নিস্পৃহ উপস্থিতির মত আলেকসী সেই সব দরিদ্র রমণীর জীবনকথা শোনে শিক্ষিত ছাত্রদের উৎপাতের কথাও জানতে পারে। কারখানার সর্দার কারিগর লুটোনিন একটি মেয়েকে লুকিয়ে পাঁউরুটি দিত দেহের বিনিময়ে। সেই সময়টা শীতের রাতেও আলেকসীকে ঠাণ্ডায় বসে থাকতে হত ঘরের বাইরে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত মেয়েটি যখন যাওয়ার সময় মৃদু কণ্ঠে বলত—যাও এইবার ঘরে যাও।

আলেকসী নারী-জীবনের বিচিত্র রহস্যের কথা চিন্তা করে। স্বর্গীয় প্রেম সম্পর্কে অন্তরে সংশয় জাগে, তাহলে কি সব মিথ্যা। সত্য শুধু এই দেহসম্ভোগ। ভালবাসা বলে কি কিছুই নেই।

এরই ফাঁকে ফাঁকে দেরেনকভের দোকানের একটি মজুরাণীর মুখ মনে জাগে। মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল আলেকসীর। তার তখন ভাল লাগারই বয়স। কিন্তু লঘু চরিত্রের মানুষ নয় বলেই, সব সময়ে এই সব বিচিত্র ধরনের নর-নারীর মধ্যে কাটিয়েও সে বীতস্পৃহ। তার মনে সর্বদাই নতুন প্রশ্ন জাগে—মানুষ কী? মানুষের কি অর্থ! জীবন সত্য না মৃত্যু সত্য। যারা বঞ্চিত, শোষিত, যন্ত্রণাপ্রপীড়িত তারাই আজ থেকে আলেকসীর অন্তরের আত্মীয়।

আসলে দেরেনকভ আলেকসীর জীবনে এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। আলেকসীর ছোট্ট দোকানে ছিল নারদনিক সমাজবাদীদের গুপ্ত আড্ডা। আলেকসী এই প্রথম এমন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এল যাঁরা কৃষি বিপ্লব এবং তাদের মধ্যে জমি বিতরণের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চালাতে চান। এরাই আবার দু ভাগ হয়ে গেল, যাঁরা আরো উগ্রপন্থী তাঁরা চান প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার উচ্ছেদ। আলেকসীর ভাল লাগে এদের উদ্দীপনাময় তর্ক-বিতর্ক, আবেগোচ্ছ্বাস এবং জনগণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করার আকুলতা। তাঁরা আলেকসীকে নানারকম বই পড়তে দেন, আলেকসীও নতুন নেশায় মগ্ন হয়ে আত্মহারা। আবার এর মাঝে জীবিকার জন্য কখনও বাগানের মালি কখনও কারো বাড়ির চৌকীদারি এই সবও করতে হয়। তার কণ্ঠস্বর ছিল ভারী মধুর তাই অনেক সময় গির্জায় গিয়ে গান করতে হয়। শেষকালে এই রুটির কারখানায় চাকরী জুটল। আর এই সময়েই খবর এল দিদিমার মৃত্যুর। আলেকসীর জীবনে এ এক গভীর শোক।

এর পরই আসে আর একটি শোকের আঘাত। দেরেনকভের দোকানে পরিচয় হয়েছিল রুবস্টভের সঙ্গে। রুবস্টভের বয়স অনেক বেশী আলেকসীর চেয়ে। কিন্তু তিনি বিপ্লবী এবং সেই মন নিয়ে সমস্ত রাশিয়ার অনেক কাপড়ের কারখানায় তিনি কাজ করেছেন। বিপ্লবের অনেক সংবাদ তিনি আলেকসীকে দিতেন। একদিন পথে দুজনে চলেছেন, হঠাৎ একটা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়লেন দুজনে। সাতান্ন বছর বয়সের রুবস্টভ বললেন—আলেকসী তুমি পালাও। আমি একা এদের মোকাবিলা করি। আলেকসী চলে এসেছিল কিন্তু রুবস্টভকে আর পাওয়া গেল না।

নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন হল আলেকসী। জীবনে এর মধ্যে দু-একটি মেয়ের ছায়া পড়েছে, কিন্তু তারা কোথায়? দিদিমার শিক্ষা সে আর এক প্রতীচক। কুড়ি বছরের কাছে পৌঁছে জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলেকসী একটা রিভলবারের গুলিতে মরদেহের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করল। বুকে বিঁধে-ছিল গুলিটা, কিন্তু সে যাত্রা বেঁচে গেল সে।

আবার নতুন জীবনের শুরু। দেরেনকভের আড্ডায় ইউক্রেনের মিখাইল আন্তনোভিচ রোমাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আলেকসীর। রোমাস সাইবেরিয়ায় নির্বাসন ভোগ করেছে দীর্ঘকাল। বুকে তার বিপ্লবের মদিরা, সে বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করে না। চুপ-চাপই থাকে বেশী সময়। আলেকসীকে সে ভারী ভালবাসে। একদিন রোমাস প্রস্তাব দেয় কাজান শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ক্রাসনোভিদোভো গ্রামে সে দোকান খুলবে, আলেকসীও চলুক সহকারী হয়ে। উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সেবা, দোকানদারীটা মুখোশমাত্র।

আলেকসীর বেশ ভাল লেগেছিল ভলগা তীরের এই পল্লীজীবন। এ ছাড়া রোমাস তাকে রুশ মনীষীদের রচনা ছাড়া বিদেশের মনীষীদের রচনার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে বললেন, বই পড়ো কিন্তু নিজের দৃষ্টিটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলো না।

কিন্তু রোমাসের এই দোকান বেশী দিন চলল না। ধনী চাষীদের লোকে তার দোকানটিকে নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। রোমাসকে চলে যেতে হয়, গ্রাম

ছেড়ে। আলেকসী কিছুদিন সম্পন্ন চাষীদের ক্ষেত-খামারে কাজ করে দিন চালায়। কিন্তু তারপর আবার যাত্রা শুরু—এবার অস্ত্রাখানের পথে। কিন্তু অস্ত্রাখানে যাওয়া তার হয় নি। নানারকমের কাজ করতে করতে একদিন আলেকসী ভলগা অঞ্চলে একটি রেলপথের চৌকীদারী কাজ পেল। রেলের মালগুদামের পাহারাদার। কসাকরা চৌকীদারদের ঘুস দিয়ে আটা চুরি করে, কিংবা বলে একজন সুন্দরী কসাক রমণী দেহ পর্যন্ত দান করে। আলেকসী কিন্তু সহজে কোন প্রলোভনে ধরা দেয় না। স্টেশনমাস্টারের বাড়িতে মাঝে মাঝে মাইফেল বসে। সেখানে সুরা ও নারীর অবাধ বাণিজ্য। আলেকসীরও নিমন্ত্রণ হয় গান শোনাবার জন্য। এই পঙ্কিল পরিবেশে কাটল কয়েক মাস। স্টেশনমাস্টারের বাড়িতেও কাজ করতে হত এবং শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওপরওয়ালাদের কাছে আলেকসী গদ্য এবং পদ্য মিশিয়ে এক বিচিত্র আবেদন পাঠায়। এর ফলে বদলী হল বোরিসোগ্লেবস্ক স্টেশনে। এখানে অনেকগুলি রাজনৈতিক অপরাধী নির্বাসিতদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। এরা রেলপথে মালপত্র চুরি নিরোধে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করে। কিছুকালের মধ্যে আবার বদলী হওয়ার আদেশ এল। এইবার ক্রুতোয়া স্টেশনে এসে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ এল বন্ধু নাজেনভ রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেছে। সে কিন্তু আলেকসীর জন্য দু'খানি বই রেখে গেছে স্পেনসার ও ওয়ালেসের বই। আলেকসীর জীবনে আবার আঘাত এল।

আলেকসী এবার নিজনীতে ফিরে সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে স্বদেশের সেবা করবে এই ভেবে রেলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে একদিন প্রাতে বেরিয়ে পড়ল। অনেক পথ পরিক্রমণ করে প্রায় দু মাস পরে আলেকসী মস্কো এসে পৌঁছাল। পোশাক-পরিচ্ছদ জীর্ণ, পায়ে হাঁটার শক্তি নেই। অনেক কষ্টে রেলের গার্ডকে বলে জবাই করার উদ্দেশ্যে চালানী কয়েকটি বলদের গাড়িতে তার সেই বাল্য ও কৈশোরের জীবনের রঙ্গভূমি নিজনীতে এসে পৌঁছাল।

কোথায় যাবে, কে আর আছে। কাজানে পরিচয় হয়েছিল সোমভের সঙ্গে। তার বাড়িতে এসে উঠল আলেকসী। তার সঙ্গে রাজনৈতিক আসামী প্রাক্তন শিক্ষক চেকিন। সোমভও সাইবেরীয়ার নির্বাসনে কাটিয়েছেন আজীবন। সুতরাং পুলিশের নজর পড়তে দেরী হল না। কিন্তু পুলিশ যখন দুজনকে গ্রেপ্তার করতে এল তখন দুজনেই পলাতক, আলেকসীও ঠিক সেই সময় এসে হাজির। তাকেই তখন জেনারেল পাজনানস্কী নজরবন্দী করে আটক করলেন।

এই জেনারেলও আলেকসীর জীবনে এক সুগ্রহ। তিনি আলেকসীর কাগজপত্রের মধ্যে কিছু কবিতার সন্ধান পেয়ে তাকে উৎসাহিত করলেন। তিনি উপদেশ দিলেন যে, জেলখানা থেকে বেরিয়েই যেন কারলেংকোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন আলেকসী। আলেকসীকে তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বললেন—বেশ পড়াশোনা করো, আরো লেখো তোমার ভালো হবে।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

॥ এক ॥

কারলেংকোর নাম আগে শোনা ছিল আলেকসীর। কারলেংকোও সাইবেরীয়ায় দণ্ডভোগ করেছেন। রোমাসের সঙ্গে তাঁর জানা-শোনা। নিজনি শহরে তখন কারলেংকোর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'মাকারের স্বপ্ন' নামক একটি গল্প সেইসময় মুখে মুখে প্রচলিত, কিন্তু আলেকসীর সেই গল্প ভাল লাগে নি। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে একদিন কারলেংকোকে পথে দেখলেন কিন্তু তিনি সেদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলেন নি। সামরিক বাহিনীতে চাকরী হল না, কারণ পুলিশের রিপোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে। নিজনি শহরেই মদের দোকানে ও পরে দুধের কাজ জুটল কিছুদিন।

এই নিদারুণ ক্লেশকর জীবনের মাঝে একদিন একটি কবিতার খাতা হাতে কারলেংকোর সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। কারলেংকো রোমাসের কাছে আলেকসীর নাম শুনেছিলেন। তাকে সাদরে বসিয়ে পড়তে লাগলেন "প্রাচীন ওক গাছের গান"। জীবনের অনেক কথা সেই পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত। কারলেংকো সহানুভূতি-ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তোমার বড় কষ্টে কাটছে, নয়?

কারলেংকো হঠাৎ কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করে খাতাটি রেখে দিলেন। পরে যখন ফেরৎ দিলেন তখন মাত্র দুটি পাতা রেখে দিলেন। ছন্দের অনেক ত্রুটি নির্দেশ করলেন। ফলে আলেকসীর লেখক সত্তা আহত হল। কারলেংকোর কাছে আর নয়।

নিজনি শহরে বৈচিত্র্যহীন জীবন কাটে তাঁর মন্থর গতিতে। দু বছর কেটে গেল এইভাবে। এর মধ্যে কেমিস্ট্রির ছাত্র নিকোলেভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। লোকটি অদ্ভুত। সে নিজে রসায়ন রসিক হলেও আসলে সে দার্শনিক। দর্শনে তার গভীর জ্ঞান। নানারকম রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তার শরীরটাও খারাপ হয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। পরবর্তী জীবনে সে কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছিল, সেখানে তার আকস্মিক মৃত্যু হয়।

নিকোলেভের সঙ্গে জটিল দার্শনিক সূত্র আলোচনা হত আলেকসীর। সেই বলেছিল—একমাত্র নির্ভরযোগ্য বস্তু হল মানুষের মস্তিষ্ক। যে যার নিজের মাথার ওপর যদি নির্ভর করে থাকে তাহলে তাকে আর ভাবতে হয় না। এই কথাটি আলেকসীর ভাল লেগেছিল। সেই সময় চারিদিকে নানা-রকমের বিভ্রান্তিকর মতবাদ, নিজের দুঃখ

অনুসারে তার ভেতর থেকে পথ করে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নিকোলো। ফলে নানারকমের উদ্ভট চিন্তা মাথায় এল, বুদ্ধিবৃত্তির ওপর চাপ পড়ল। নিদারুণ ক্লেশের জীবন তার এই রকমের গুরুত্বর চিন্তার ফলে মানসিক বিকার ঘটল আলেকসীর। এই সময় এটর্নী লানিনের তিনি ছিলেন কেরানী। একদিন তিনি তাঁকে দলিল-দস্তাবেজে জীবনের নানা কথার রচনা করলেন এক সুদীর্ঘ কবিতা। লানিন বিস্মিত হলেন আলেকসীর এই কাণ্ড দেখে। কিন্তু তিনি সহৃদয়, তিনি তাকে উপদেশ দিলেন ডাক্তারী পরীক্ষার।

একদিন গভীর রাতে ভলগা তীরবর্তী একটি টিলায় বসে আছেন, রাত কত তার হিসাব নেই। নিঃশব্দে তার পাশে এসে বসলেন কারলেংকো। মার্কসীয় দর্শনের কথা হয় দুজনে। তিনিও আলেকসীকে উপদেশ দিলেন, না বুঝে কোন কিছু গ্রহণ করবে না। সেই সূত্রে আলেকসীকে লেখার জন্যও তাগিদ দেন। আলেকসীর মনে কিন্তু সুগভীর হতাশা। তাকে দেখে ডাক্তার বললেন—যৌন অবদমনের ফলে এই বিকার ঘটেছে। মেয়েদের সঙ্গে একটু মেলামেশা করো। দেহের দাহ থেকে নিষ্কৃতি কই?

॥ দুই ॥

এর কিছুকাল পরেই দেখা হয়েছিল ওলগা কামিনসকীর সঙ্গে বিচিত্র ঘটনাচক্রে। ওলগাদের স্বামী-স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়েছিল আলেকসী — পরণে তার উদ্ভট পোশাক। একটা স্টীমার পার্টির আয়োজন হয়েছিল, সেই পার্টিতে পোলিস বোলেশ্লাভ কারসাক ও তাঁর স্ত্রী দুজনকে আমন্ত্রণ জানান হবে স্থির হল। ভার পড়ল আলেকসীর ওপর। আলেকসী ওলগাকে দেখে মুগ্ধ হল। অথচ ওলগা অপরের স্ত্রী এবং বয়সে তার চেয়ে বেশ কিছু বড়, প্রায় দশ বছরের বেশী। ওলগা তা বোঝে—সেও ধরা দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ স্বামীকে ছেড়ে তরুণ আলেকসীর কাছে আসতে সাহস হয় না। আবার এক আঘাত এল মনে।

১৮৯১ খৃস্টাব্দে প্রায় পদব্রজে আলেকসী এল ককেসাসের তিফলিস অঞ্চলে। বয়স তখন তেইশ, পরিপূর্ণ যৌবন। এই তিফলিসে পরিচয় হল আলেকজান্ডার কালইউজিনীর সঙ্গে। কালইউজিনীকে সাইবেরিয়ার শাস্তিভোগের পর তিফলিসে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তিনি "উইল অব দি পিপল" বা জনমত সম্প্রদায়ের বিপ্লবী। তাঁর নিজস্ব পাঠাগারটি বেশ সমৃদ্ধ। পড়াশোনা তাঁর যথেষ্ট। তিনি বিশেষ উৎসাহ দিলেন আলেকসীকে পড়াশোনায়। তাঁকে একদিন আলেকসী কথাপ্রসঙ্গে একটা গল্প বলে। কালইউজিনী বললেন, তুমি এই গল্পটা লিখে ফেল। খাসা হবে। এই বলে তাকে একটি ঘরে আটক করে বললেন—দাও দেখি দেখি এইবার গল্পটা।

এই তিফলিস শহর আর সহযোগী কালইউজিনী উত্তরকালে যিনি ম্যাক্সিম গোর্কী নামে পৃথিবীখ্যাত তাঁর বিকাশের পথে সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। অনেক পরে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে গোর্কী যখন জগৎপ্রসিদ্ধ লেখক তখন তিনি কালইউজিনীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি যে রূপ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছি তার মূলে প্রেরণা দিয়েছেন আপনি, আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন জীবনকে গভীরভাবে গ্রহণ করতে। আপনি আমার বন্ধু, গুরু ও পথপ্রদর্শক।

গল্প লেখা হল, এই গল্পটির নাম 'মাকার চুদরা'। ১৮৯২ খৃস্টাব্দের সেই ঊক দিনটি পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে স্মরণীয় গোর্কীর এই প্রথম গল্প। বেদিয়া সম্প্রদায়ের গল্প। এই জিপসীদের সর্দারের মুখে লেখক বলেছেন — যারা সভ্য মানুষ তারা স্বাধীনভাবে জীবনটাকে গ্রহণ করতে পারে না, তারা সবাই দাসখত লিখে বসে আছে। আমরা যার বেদিয়া তারাই জানি অবাধ মুক্তি কাকে বলে, আমাদের মুক্তি আকাশের উদার আশ্রয়ের নীচে। এই স্বাধীনতা-পাগল বৃদ্ধ জিপসী তার স্ত্রীর অধীনতাও সইতে পারে না, তাই একদিন তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে খুন করতেও দ্বিধা করল না।

এই গল্পটি তিফলিসের দৈনিক সংবাদপত্র 'ককেসাস' প্রকাশ করার জন্য পেশ করলেন আলেকসী। সম্পাদক বললেন—আপনার নামটা লিখে দিন। আলেকসীর মনে পড়ল জীবনের নিদারুণ ক্লেশের দিন, যার মধ্যে এতটুকু মাধুরী নেই, আছে শুধু তিক্ততার বিষবাষ্প, আর সেই বিষ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ। আলেকসী ছদ্মনাম ঠিক করলেন ম্যাক্সিম গোর্কী — অর্থাৎ ভাগ্যহীন তিক্ত মানুষ। সেই গল্পটি প্রকাশিত হল যথাসময়ে।

আলেকসী অর্থাৎ ম্যাক্সিম গোর্কীর অন্তরে কিন্তু তীব্র জ্বালা। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। পথে-প্রান্তরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন শান্তির সন্ধানে। কিন্তু শান্তির চিহ্ন কোথাও নেই, সর্বদিকে শুধু অশান্তি।

এই সময়ে তিফলিসেই আবার দেখা হল ওলগার সঙ্গে। সেদিন সেই ঝড়-জলের রাত্রে ওলগাকে প্রেমিক আলেকসী শুনিয়েছিল তার জীবনের করুণ কাহিনী। ওলগা আলেকসীকে ভালবেসেছিল, বুঝেছিল এই মানুষটার অন্তরে কি জ্বালা— আর সেই সঙ্গে আছে ওলগাকে পাওয়ার সুতীব্র কামনা।

লোকসুজি কথা না দিলেও ওলগা আলেকসীর সঙ্গে এসে ঘর বাঁধবে এমন কথা জানাল। তাই নিজনি থেকে আহ্লাদ আসতেই গোর্কী সেই এটর্নী লানিনের একান্তসচিব হয়ে ফিরে এলেন নিজনিতে। আর কিছুদিন পরে এল ওলগা, সঙ্গে রয়েছে তার ৪ বছরের মেয়েটি। আস্তানায় একটা বাসায় ওদের আশ্রয় দিলেন আলেকসী। একজীবন কোনক্রমে কেটেছে, কিন্তু তিনজনের খরচ চালাবার সঙ্গতি আলেকসীর নেই। তাই জীবনটা বড় কষ্টের হয়ে উঠল। ওলগা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, অনেক বেশী বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আলেকসীর বাসার এই দীন পরিবেশে সে অসুখী নয়। সেও পরিশ্রম করে কিছু কিছু রোজগারের চেষ্টা করে। গোর্কীর সম্বল লানিনের কাছে পাওয়া মাইনে আর কখনোসখনো প্রকাশিত গল্পের জন্য দুই কোপেক। বেশীদিন কিন্তু এই সুখও সইল না। জীবনে অনেক উৎসাহ সঞ্চারিত হল। নতুন লেখার প্রেরণা এল, কিন্তু ওলগার চটুল জীবন আলেকসীর মত মানুষের মনে কিঞ্চিৎ পীড়া দেয়। ওলগার বয়স বেশী, সেই কথা তুলে সে বলে তুমি যদি একটু কম বয়সের মেয়ে পেতে তাহলে বোধহয় খুশি হতে।

এদিকে সাহিত্যজগতে ক্রমশ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আলেকসী পিয়েসকভের। কারলেংকো Volgar Vestnik পত্রিকার সম্পাদক স্টাইনহার্টের কাছে শুনলেন—আলেকসী ম্যাক্সিম গোর্কী এই ছদ্মনামে কাজান গল্প লিখছেন। কারলেংকো একদিন দেখা করলেন। শুনলেন তাঁর অভিমানভরা উক্তি। কারলেংকোর তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা, এ ছাড়া তিনি 'রুস্কোয়ি বোগাটস্ত্বো' নামক বিখ্যাত মাসিকপত্রের সাহিত্যিক অন্যতম সম্পাদক। আর একজন সম্পাদক মাইখেলভস্কী। তিনি বিখ্যাত গল্প "চেলকাস" সাগ্রহে নিয়ে নিয়ে প্রকাশ করলেন (১৮৯৫)। এবং সেদিনই তিনি লক্ষ্য করলেন আলেকসীর শরীরটা ভেঙে পড়েছে। তাঁরও কানে এসেছিল আলেকসীর খবর কোমোকাফী ওলগাকে নিয়ে নানারকম রটনা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সস্নেহে বললেন—আলেকসী তুমি বরং সামারায় যাও আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তুমি এখানে আর থেকো না। তুমি আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছ। এ কি: তোমার যে এখন অনেক কাজ।

এইবার আলেকসীর দেহে যক্ষ্মারোগের লক্ষণ দেখা গেল। মনে পড়ল কারলেংকোর কথা। ওলগাকে বললেন। ওলগাকে আলেকসী সব মন দিয়ে ভালবেসেছিল, চপলা ওলগাও তাকে ভালবাসতেন। দুজনে বাঁধা রইলেন নিবিড় সাহচর্যে আলেকজান। তারপর ওলগা একটা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দিলেন, আর অসুস্থ আলেকসী গেলেন সামারায়।

॥ তিন ॥

এই সামারা শহরে দুখানি পত্রিকা ছিল 'সামারা গেজেট' আর 'সামারা হেরাল্ড'। আলেকসী কাজ নিয়েছিলেন প্রথমটিতে।

ভারতীয় সাহিত্য

গিরীশচন্দ্রের জন্মদিন ॥

মহাকবি গিরীশচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানটি এবার বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। কলকাতার মেয়র শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে গত ৬ মার্চ গিরীশ ভবনে নাট্যাচার্যের মূর্তি স্থাপনের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং গিরীশভবনের মধ্যে গিরীশ-চন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। মেয়র তাঁর ভাষণে বলেন, "নাট্য-জগতে গিরীশচন্দ্রের দান অবিস্মরণীয়। তিনিই প্রথম স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের শুভ সূচনা করে যান। পৌর-কমিশনার শ্রীদুলাল-গোপাল মুখোপাধ্যায় গিরীশ ভবনটিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবার এক প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য, শ্রীপান্নালাল দাস প্রমুখ ভাষণ দেন। জন্মদিন উপলক্ষে গিরীশ ভবনটি পত্রে পুষ্পে সজ্জিত করা হয়।

বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য উপদেষ্টা কমিটি গঠিত ॥

উচ্চতর শিক্ষায় বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসু।

শ্রীবসু ছাড়াও আর যাঁরা যাঁরা এই কমিটিতে আছেন, তাঁরা হলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী সহ পশ্চিমবঙ্গের সাতটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সচিব, ডি-পি-আই ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি।

কে কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার নেবেন তা জানতে চেয়ে এর মধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চিঠি পাঠান হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পাওয়ার পরেই কমিটি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন।

নিখিল ভারত কবি সম্মেলন ॥

গত ৭ মার্চ নিখিল ভারত কবি সম্মেলনের দপ্তরে বাংলা দেশের কবি সাহিত্যিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন সম্মেলনের সভাপতি শ্রীসতীকান্ত গুহ। তিনি বিস্তৃতভাবে সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন এবং সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে ভাষণ দেন। অন্যান্যদের মধ্যে মনীন্দ্র রায়, তরুণ সান্যাল, জগন্নাথ চক্রবর্তী, শান্তি লাহিড়ী, মনীষা ভট্টাচার্য, মোহিত লাহিড়ী, যোগব্রত চক্রবর্তী, রাধা চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল বসু প্রমুখও ভাষণ দেন।

জানা গেছে এই প্রথম সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনটি" উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। আগামী ১২, ১৩, ১৪ এপ্রিল কলকাতায় 'রবীন্দ্র সদনে' সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দিনের বিভিন্ন অধিবেশনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যথাক্রমে শ্রীউমাশঙ্কর যোশী, শ্রীকা-না সুব্রহ্মণ্যম, শ্রীশচী রাউতরায়, শ্রীগোপাল কুরুপ ও শ্রীপারভেজ শাহেদী। পৌরোহিত্য করবেন যথাক্রমে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅন্নদা-শঙ্কর রায়, শ্রীঅমলেন্দু বসু, শ্রীবিষ্ণু দে। উদ্বোধনে করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ,

---

অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশে শ্রেষ্ঠ স্থান ॥

ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিদেশী ভাষা থেকে অনু-বাদ-গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের স্থান সর্বাগ্রে রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় সর্বাধিক অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ভি আই লেনিনের রচনাবলী। এই পরিসংখ্যান ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক অনুবাদ-গ্রন্থপঞ্জীতে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালে বিশ্বের ৭০টি দেশে অনূদিত গ্রন্থের মোট সংখ্যা ছিল ৩৯২৬৭টি।

পল চেলানের নতুন কাব্যগ্রন্থ ॥

পশ্চিম জার্মানির কবি পল চেলান ১৯৬০ সালে জার্মান ভাষা ও সাহিত্য আকাদেমির প্রদত্ত বুকনার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি 'আতেম ওয়েন্ডে' নামে তাঁর একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ এক 'দুর্জ্ঞেয়তার বিরতি'র কাব্য। আধুনিক কাব্যের প্রকরণ ও প্রকাশে যে উৎকট অবোধ্যতা প্রকাশিত সেই অভিযোগের সঙ্গে চেলান নিজেকে যুক্ত করতে চান না। তিনি কবিতাকে 'সর্বাত্মক বিশ্লেষণের দীর্ঘায়িত মনো-সংযোগ' এবং 'বস্তুর সঙ্গে আপোষহীন সংলাপ' 'বিনিময়' বলে বর্ণনা করেন। চেলানের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দের স্যান্ড আউস্ দেন আর্নেন' ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'স্প্রাক-গিটার'। এই গ্রন্থে তাঁর কাব্যভাষা অধিক-তর সংহত।

কেনিয়ান বিপ্লবী-নেতার আত্মজীবনী : নট ইয়েট উহুরু ॥

কেনিয়ার বিপ্লবী-নেতা জারামোগি ওজিঙ্গা ওডিঙ্গার আত্মজীবনী 'নট ইয়েট উহুরু' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে নিউ-ইয়র্ক থেকে। তার ভূমিকা লিখেছেন কোয়ামে এনক্রুমা।

'উহুরু' শব্দের অর্থ হোল স্বাধীনতা। ওজিঙ্গা ওডিঙ্গার মতে, তাঁর দেশের জন-সাধারণ এখনো প্রকৃত স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। অথচ, দেশবাসী এতদিন সেই স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখে এসেছিল। বর্তমানে দেশ-বাসী যা পেয়েছে, তা হলো একটি আনু-ষ্ঠানিক বন্ধনমুক্তির ছাড়পত্র। দেশবাসীর বৈপ্লবিক অভিপ্রায় বিদেশী স্বার্থান্বেষী ও স্বদেশী আত্মসুখপরায়ণ রাজনীতিকদের চক্রান্তে উপযুক্ত প্রকাশের পথ পায়নি। সেখানে এখনো পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম চলছে। মিঃ ওডিঙ্গা বলেন, রাজনীতিকেরা সুখ, সম্পদ, প্রতিপত্তি ও ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সের মোহ ত্যাগ করতে না পারলে দেশের দুর্গতি কখনো যাবে না। এখনো সেখানকার বড় বড়ো ফার্ম, মিল, কলকারখানা ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মালিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা। তারা এখন দেশবাসীর মধ্যে অবক্ষয়ী মান-সিকতার অনুপ্রবেশ ঘটাবার ব্যাপারে সচেষ্ট। সেইজন্যেই সাময়িকভাবে চুপচাপ করে আছে।

মিঃ ওডিঙ্গা, তাঁর গ্রন্থে কেনিয়ার বর্তমান দুর্গতি ও পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্যে প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জাতীয় পুনর্গঠনের মনোভাবকে এখানে হত্যা করা হয়েছে।" তিনি এখন কেনিয়ার সরকার-বিরোধী দলের নেতা।

গ্রন্থটির বক্তব্য সম্পর্কে হয়তো সকলে একমত হবেন না। তবু একটি স্বাধীনতা-কামী মানুষের হৃদয়বেদনা বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না। বরং দেশবাসীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আবেদন যে কোন পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

সিংহলের লোকনাট্য বিষয়ক গ্রন্থ ॥

সম্প্রতি সিংহল সরকারের সাংস্কৃতিক দপ্তর অধ্যাপক ই আর শরচ্চন্দ্রের লেখা 'দি ফোক ড্রামা অব সিলোন' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সিংহলী সাহিত্য ও নাট্যবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশি নয়। বিশেষতঃ অধ্যাপক শরচ্চন্দ্রের গ্রন্থটি বাদ দিলে লোকনাট্যবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ আর নেই বললেই চলে। এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল প্রায় ষোল বছর আগে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইংরেজদের কাছেও কূটনীতির যে নব-কৌটিল্যের নাম পৌঁছোয়নি, তা তখনই শুনেছিলেন শুধু আপনার সেই পানামো!

শিবপদবাবুর বিস্মিত মন্তব্যে বিদ্রূপের খোঁচা নিশ্চয় একটু ছিল, কিন্তু দাসমশাই-এর নির্বিকার প্রশান্তি তা ভেদ করতে পারল না।

বরং এরকম একটা উপযুক্ত প্রশ্নে যেন খুশি হয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—হ্যাঁ বলবার যা শুনেছিলেন আর সোনা পুরে একটা আশ্চর্য কিছুও নয়। নিককলো দি বের্নার্দো মাকিয়াভেলী মাত্র পাঁচ বছর আগে ইটালীর ফ্লোরেন্সে মারা গেছেন। ইটালী আর স্পেনের দূরত্ব এমন কিছু নয় আর ইংরেজরা না জানলেও লাটিন দেশগুলিতে সে-যুগে জ্ঞান বিদ্যা রাজনীতির চর্চা যাঁরা করতেন ইটালীর এই অসামান্য মানুষটির খবর তাঁরা অনেকেই রাখতেন—বিশেষ করে গনজালো ফার্নানডেজ দে ওভিয়েডো ই ভালডেজ-এর মত মনস্বী মানুষ তো বটেই। তিনি রাজনীতিবিদ পণ্ডিত শুধু ছিলেন না, এক সময়ে ইটালী গিয়ে নেপলসের রাজা ফার্ডিনান্ডের অধীনে কাজও করেছেন। পানামো বলে যাঁর পরিচয়, এককালে এই ওভিয়েডোর কাছেই তিনি ক্রীতদাস ছিলেন। লেখাপড়া শেখবার সুযোগও পেয়েছিলেন সেইখানেই। মাকিয়াভেলীর নাম সুতরাং তাঁর অজানা থাকাটাই অস্বাভাবিক।

সব ত বুঝলাম!—শিবপদবাবু আর বোধহয় নীরব থাকতে পারলেন না—কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হল কি! পিজারোর গোপন মন্ত্রণাসভায় হেরাদা চুরি-করা বিদ্যে জাহির করে কি বলেছিল কি? যা বলেছিল তার সঙ্গে মাকিয়াভেলীর কি এমন সম্পর্ক যে সে-নামটা শোনালেই মুখে মধু-মেওয়ার ফোড়নের মত সে কথা হয়ে উঠেছিলেন আপনার পানামো?

হেরাদার কাছে মাকিয়াভেলী নামটা যেন কৌতুকের মুখে নুনের মত জিজ্ঞাসা করলেন?—পরম ধৈর্য আর অনুকম্পার সঙ্গে বললেন দাসমশাই,—তাহলে হেরাদা মন্ত্রণাসভায় যা বলেছিল, সেইটে একটু বিশদভাবে আগে শোনা দরকার। হেরাদা সিসিলি দ্বীপের আগাথক্লিস-এর নাম করে তার উপমা দিয়ে বলেছিল। উপমাটা কি আর আগাথক্লিস-ই বা কে? আগাথক্লিস বড় ঘরের ছেলে নয়, একেবারে অতি সাধারণ দীন দরিদ্র এক কুমোরের ছেলে। দেখতেও সাহস আর অসমসাহসী বুদ্ধির জোরে সে সিরাকুস নগরের শাসক পর্যন্ত হয়। তারপর সিরাকুস-এর শাসন-পরিষদের সমস্ত নগরপ্রধানদের সে একদিন সকালে ডেকে পাঠিয়ে জড় করে তার নিজের সেনাদের দিয়ে অতর্কিতে নির্মমভাবে হত্যা করায়। হোমরা-চোমরাদের একজনও এ-মরণফাঁদ থেকে রেহাই পায় না। এইভাবে পথের সব কাঁটা সরিয়ে আগাথক্লিস সিসিলির রাজদণ্ড অনায়াসে শুধু নীচ নৃশংসতার জোরেই অধিকার করে।

হুঁ!—শিবপদবাবুর মুখে এবার একটু গর্বের হাসি ফুটল,—এসব ত মাকিয়াভেলীর 'দ্য প্রিন্স' মানে রাজপুত্র বই-এ আছে। তাই থেকে নেওয়া।

না।—দাসমশাই গম্ভীর প্রতিবাদে শিব-পদবাবুকে নীরব করে পাণ্ডিত্যের দিগ্-দর্শী করলেন,—মাকিয়াভেলী বিখ্যাত হয়ে আছেন, অবশ্য যাকে 'দ্য প্রিন্স' বা রাজপুত্র বলেছেন সেই 'ইল প্রিন্সিপে' বইটির জন্যে। এ-বইটি পের্কুসিনা গ্রামের উপান্তে তাঁর নির্বাসন থেকে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে মাকিয়াভেলী শেষ করেন। 'ইল প্রিন্সিপে' বইটি আসলে কিন্তু আরো একটি বড় বই। 'ডিসকোর্সি সোপ্রা লা প্রাইমা ডেকা দি টিটো লিভিও'-র একটি অংশ মাত্র। এই বড় বইটি লেখা শুরু হয় 'রাজপুত্র'-এর আগে, শেষও হয় অনেক পরে। মাকিয়াভেলী ছিলেন প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক লিভি অর্থাৎ টাইটস লিভিয়স-এর দারুণ ভক্ত। ওই বড় বইটির লম্বা নামটার বাংলা মানে হল: লিভির প্রথম দশক সম্বন্ধে আলোচনা। লিভি-র বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপের মধ্যযুগের নব-কৌটিল্য মাকিয়াভেলী তাঁর বিচক্ষণ কূটনীতির পুরো পরিচয় ওই বড় বইটিতে রেখে গেছেন। হেরাদার সেই বইটি কোনরকম পড়া ছিল। তাই বেমালুম পাপ করে সে পিজারোর মন্ত্রণাসভায় নিজের বলে চালিয়ে বাহাদুরী দেখিয়েছে...

আর পানামো মানে জানলাম না হয় ধরে ফেলেছেন!—এতক্ষণ আড়ষ্ট অভিভূত থাকার পর শিবপদবাবুর স্বরে একটু ঝাঁঝ ফুটে উঠল,—কিন্তু তাতে হল কি!

যা হল তা বড় সাংঘাতিক!—দাসমশাই সকলকে যেন তৈরী হবার সুযোগ দিতে একটু থেমে হঠাৎ নাটকের যবনিকা তুললেন,—চার শ' বছরের প্রাচীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংকা রাজশক্তি কর্ডিলেরার তুষার-ঢাকা পার্বত্য সাম্রাজ্য থেকে কুয়াশার মত চির-কালের জন্যে মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল!—উদরদেশ যাঁর কুম্ভের মত স্ফীত, ভোজনবিলাসী সেই রামশরণ-

বাবুর কণ্ঠ থেকে বিমূঢ় আক্ষেপ শোনা গেল,—কেমন করে?

কেমন করে মিলিয়ে গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য।—দাসমশাই বলে চললেন,—মাত্র বাষট্টি জন সওয়ার আর একশ' ছজন পদাতিক যাঁর সম্বল, ইংকা সম্রাটের নিজের দুর্গনগরে অগণন বিপক্ষবাহিনীর মধ্যে যিনি একরকম বন্দী, সেই পিজারো এক কল্পনাতীত স্পর্ধা দেখিয়ে এ অসম্ভব সম্ভব করে তুললেন।

একটি বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, ঘনরাম সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারটার প্রত্যক্ষ-দর্শী হবার সুযোগ পাননি।

যে-রাত্রে দে সটোর কাছে মন্ত্রণাসভার বিবরণ তিনি শোনেন, তারপরের দিন সকালে কাক্সামালকার পাহাড়-ঘেরা উপত্যকাটির অন্ধিসন্ধি ভালো করে একটু জানবার জন্যে একা একাই তিনি একটু বেরিয়েছিলেন।

তারিখটা ষোলই নভেম্বর, ১৫৩২, শনিবার।

ইংকা আতাহুয়ালপা সেইদিনই পাল্টা লৌকিকতা করাতে সদলে পিজারোকে দর্শন দিতে আসবেন এরকম একটা কথা ঘনরাম শুনেছিলেন। কিন্তু আতাহুয়ালপা এত তাড়াতাড়ি সে-অনুগ্রহ করবেন, ঘনরাম তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

সেইখানেই তাঁর সর্বনাশা ভুল।

এ-ভুল না করলে ইংকা সাম্রাজ্যের ইতিহাস কি ভিন্ন হত?

তা হয়ত হত না, কিন্তু পিজারো আর তাঁর বাহিনীকে উদ্ধারপর্বের জন্যে আর একটু বেশী দাম দিতে হত নিশ্চয়।

ঘনরাম নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়েই সকালবেলা একটি ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়েছিলেন। ডিম্বাকৃতি কাক্সামালকা উপত্যকার চারিধারে কঠিন আকাশছোঁয়া পর্বতপ্রাচীর। সেই পর্বতপ্রাচীর সত্যিই কতখানি দুর্ভেদ্য তা জেনে আসা ঘনরামের প্রয়োজন মনে হয়েছিল।

বেলা দুপুর পর্যন্ত দূরে পাহাড়ের কোলে কোলে কাটিয়ে ঘনরাম ফিরে এসে শহরে ঢুকতে গিয়ে অবাক হয়েছেন। শহরের চেহারাই বদলে গিয়েছে। চারিদিকে উৎসবমত্ত জনতার উত্তেজিত আনন্দ কোলাহল। তার ভেতর দিয়ে ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপা সদলবলে পিজারোকে দর্শন দিতে আসছেন।

শোভাযাত্রার সামনে আসছে অসংখ্য অনুচর। ইংকা নরেশের যাত্রাপথে এতটুকু আবর্জনা কোথাও যাতে না থাকে তার জন্যে তারা আগে আগে পথ পরিষ্কার করতে করতে চলেছে। তার পরে আসছে অভিজাত ইংকা প্রধানরা সারিবদ্ধ হয়ে। তাদের মধ্যে যারা মানে সবচেয়ে বড় ইংকা সম্রাটকে তাঁর শিবিকায় তারা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে।

ইংকা নরেশের অভিজাত সব সেবকের সারা অঙ্গে বিচিত্র সব সোনার অলঙ্কার। বিকেলের রোদে সেই সব স্বর্ণালংকার যেন আগুনের মত জ্বলছে।

অভিজাত অনুচর আর সেবক ছাড়া ইংকা নরেশের শোভাযাত্রায় আছে অগণন সৈন্যসামন্ত। রাজপথে তাদের সকলকে কুলোয় নি। বেশীর ভাগ পথের ধারের প্রান্তরে বহুদূর পর্যন্ত যার ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘনরাম তাঁর ঘোড়াটি এক জায়গায় বেঁধে রেখে এসে কাক্সামালকার নাগরিকদের সঙ্গে মিশে এ দৃশ্য দেখছিলেন।

দেখতে দেখতে মনে তাঁর একটু আশঙ্কাই জেগেছে। ইংকা আতাহুয়ালপা এত সমারোহ করে পিজারোকে দেখা দিতে আসছেন শুধু কি নিজের ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে এসপানিওলদের চমকে দিতে? না এই দেখা দিতে যাওয়ার মধ্যে ভয়ানক কোনো উদ্দেশ্য সত্যিই আছে?

ইংকা নরেশের অনুচরদের ভালো করে লক্ষ্য করে সেরকম সন্দেহের কারণ আছে বলে কিছু মনে হয় নি। তাদের কথাবার্তা চালচলনে উৎসবের আনন্দমত্ততার লক্ষণই দেখা গেছে। মনে মনে অন্য অভিসন্ধি থাকলে দু' একজনের পক্ষে তা হয়ত গোপন করা সম্ভব কিন্তু এত বড় বিশাল বাহিনীর সকলেই অমন নিপুণ অভিনেতা নিশ্চয় হতে পারে না।

ইংকা নরেশের এটা কপট মিছিল নয় বোঝবার পরও কেন যে একটা ভাবি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হননি, ঘনরাম সত্যিই তখন ভেবে পান নি।

আতাহুয়ালপার একটি সিদ্ধান্তে ঘনরাম কিছুটা শুধু আশ্বস্ত হয়েছেন। পিজারো আর তাঁর বাহিনী নগরের যে অট্টালিকা মহলা অধিকার করে আছে তার আঙিনাটার দূরে এসে শোভাযাত্রা থেমে গেছে। থেমে গেছে আতাহুয়ালপারই আদেশে।

চারিদিকের মাঠে শিবির পাতবার আয়োজন দেখে ঘনরাম বুঝেছেন ইংকা নরেশ সে রাতের মত তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানেই কাটাতে চান।

ঘনরাম এবার নাগরিকদের ভিড় ঠেলে নিজেদের আস্তানার দিকেই এগিয়েছেন। কিন্তু বেশীদূর যাবার সুযোগ তাঁর হয় নি। রাজপথ মুক্ত রাখবার জন্যে আবার নাগরিকদের পথের পাশে সরিয়ে দিয়েছে ইংকা নরেশের সেবকবাহিনী।

জানা গেছে যে আতাহুয়ালপা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন পিজারোর অনুরোধে। ইংকা নরেশকে রাত্রের মত অতিথিশালায় থেকে দূরে মুক্ত প্রান্তরে বিশ্রামের আয়োজন করতে দেখে পিজারো দূত পাঠিয়ে তাঁকে এ সংকল্প ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। অনুরোধের কারণ বলা হয়েছে এই, যে পিজারো সেই রাত্রেই মহামান্য ইংকা অধীশ্বরের অভ্যর্থনার আয়োজন করে সেই সঙ্গে ভোজন-সভার সব ব্যবস্থা করেছেন। ইংকা নরেশ তাঁদের অনুগ্রহ না করলে সমস্ত আয়োজনই শুধু পণ্ড হবে না, মনে মনে পিজারোর বাহিনীর সকলে অত্যন্ত দুঃখ পাবে।

পিজারোর অনুরোধ রক্ষা করতে আতাহুয়ালপার রাজকীয় শোভাযাত্রা আবার অগ্রসর হয়েছে।

এবার আগের চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ঘনরাম ইংকা নরেশ আর তাঁর বাহক-সেবকদের শোভাযাত্রা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন।

আতাহুয়ালপার অনুচরদের বেশভূষা অলঙ্কার বিচিত্র ত বটেই, তাঁর নিজের পোশাকপরিচ্ছদ অলঙ্কারও অপূর্ব।

যে শিবিকায় তাঁকে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তা সোনা রুপোর পাত দিয়ে মোড়া আর নানা বিচিত্র রংবেরংয়ের পাখির পালক দিয়ে অপূর্ব শোভায় সাজানো। এই শিবিকার ওপর নিরেট সোনার তৈরী একটি সিংহাসনে আতাহুয়ালপা বসে আছেন। আগের বড় উৎসবের দিনের সঙ্গে আতাহুয়ালপার এদিনের সাজসজ্জার অনেক তফাৎ। রাজচক্রবর্তীর নিদর্শনস্বরূপ কপাল ঢাকা রাঙা 'বোর্লা'টি তাঁর মাথায় আগের দিনের মতই আছে, কিন্তু সেই দিনের গলায় যে অসাধারণ পান্নার মালাটি দেখা যাচ্ছে তা পিজারোর নিজের চোখের মত যেকোনো জহুরীর চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত।

যদি চলতে থাকে তাহলে এই বাড়তি ১১৩০ কোটি টাকারও বেশী সোনা পাওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা প্রতি দশ গ্রাম সোনা ৩৫ ডলার দামে কেনাবেচা করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না।

(৩) বিশ্ব অর্থনীতির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিরাট। বিশ্ব বাণিজ্যের এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। বেসরকারী বিদেশী মূলধনের প্রায় আধাআধি হচ্ছে আমেরিকান। সমস্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের মোটামুটি অর্ধেক হয় ডলারের হিসাবে। আমেরিকান ডলারের এই বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের দরুনই আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মুদ্রা হিসাবে ডলারের স্থান অপ্রতিহত ছিল। অন্তত এত দিন পর্যন্ত তাই ছিল। পশ্চিমী দেশগুলির কেন্দ্রীয় ব্যাংক, দুনিয়াজোড়া যাদের ব্যবসা এমন বড় বড় পেট্রোল কোম্পানীগুলিতে, তেলের রয়্যালটি বাবদ পশ্চিম এশিয়ার যেসব গভর্ণমেন্ট ও রাষ্ট্রপ্রধান প্রচুর অর্থ পান তাঁদের কাছে ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের ন্যায় আন্তর্জাতিক অর্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রভূত পরিমাণ ডলার রয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে সোনা কেনার যে হিড়িক পড়েছে তার মধ্য দিয়ে মূলত সারা পৃথিবীর এই ডলারধারীদের অনাস্থার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। "ডলার হচ্ছে সোনার চেয়েও দামী জিনিস" এই মনোভাব যত দিন চালু ছিল তত দিন কোন অসুবিধা ছিল না। পৃথিবীর আর যে কোন মুদ্রারই মূল্যক্ষয় হোক, মার্কিন ডলার ঠিক আছে, আর যে কোন অর্থনীতিই বিপর্যস্ত হোক, ডলারের অর্থনীতি ঠিক আছে—এই মনোভাব যত দিন ছিল, ততদিন ডলারের সঞ্চয় নিয়ে দুনিয়ার কারবারীদের কোন উদ্বেগ ছিল না। যে কোন সময়েই ডলারের বিনিময়ে সোনা পাওয়া যাবে—এই আশ্বাস ডলারের উপর আস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে ডলারের উপর এই আস্থা যতদিন ছিল ততদিন সোনার চেয়েও ডলারের প্রতি আন্তর্জাতিক লেনদেনের কারবারীদের বেশী আকর্ষণ ছিল। কেননা, ডলার খাটিয়ে সুদ উপার্জন করা যায়, আর সোনা সেই তুলনায় বন্ধ্যা বালুমাত্র।

কিন্তু দেবতার আসনও টলে, ভূমিকম্পে সবচেয়ে মজবুত বাড়ীর ভিত্তিমূলেও মাটি কাঁপে। তেমনিভাবেই আজ ডলার টলছে। আর আতঙ্কিত ডলারধারীরা যে যত বেগে পারেন ছুটছেন ডলারের বোঝা হাল্কা করে সোনা সংগ্রহ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে সোনার দাম বাড়ার প্রত্যাশায় যাঁদের ডলার নেই এমন সঞ্চয়কারীরাও সোনা কিনে রাখছেন। এই সব স্বর্ণসন্ধানীর হিসাব হচ্ছে দুটি : (ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুতেই তার তিন শতাংশ হারে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা বন্ধ করতে পারবে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের খরচ কমবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং এই খরচ বৃদ্ধিই অনিবার্য হয়ে উঠেছে, যার অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক লেনদেনে আমেরিকার ঘাটতি বাড়বে, কমবে না। গত নভেম্বর মাসে বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিং-এর বাট্টাহার হ্রাসের পর ডলারের আস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ডলারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ও আন্তর্জাতিক লেনদেনে তার ক্রমবর্ধমান ঘাটতি আমেরিকাকে আজ হোক, কাল হোক ডলারের বিনিময়মূল্য হ্রাস করতে বাধ্য করবে—(খ) যার অন্য অর্থ হচ্ছে সোনার আন্তর্জাতিক দাম চড়বে। দুদিন বাদে যদি সোনার দাম চড়েই যায়, আর সোনার হিসাবে ডলারের দাম পড়ে যায় তাহলে কোন্ বোকা ডলার ধরে রেখে লোকসান গুনতে চাইবে? আর কে না চাইবে এখনই ডলারকে সোনায় পরিবর্তন করে নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে কিছু মুনাফা করে নিতে?

এই অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করবে? সহজ বুদ্ধিতে বলে, সোনার দাম বাড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে সোজা রাস্তা। সোনার দাম বাড়ালে সোনা কেনার হিড়িক কমবে, নির্দিষ্ট মূল্যে সোনা বিক্রী করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আমেরিকার পক্ষে অধিকতর সহজসাধ্য হবে, যে কোন সময় ডলারের বিনিময়ে সোনা পাওয়া যাবে, এই নিশ্চয়তা ডলারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু এই সোজা রাস্তায় হাঁটা আমেরিকার পক্ষে এখন কয়েকটি কারণে কঠিন। প্রথমত, সোনার দর বাড়ান মানে ডলারের বহির্মূল্য স্থির রাখতে ব্যর্থতা।

প্রেসিডেন্ট জনসনের সরকার আজ এই সিদ্ধান্ত নিলে আগামী নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁকে সেজন্য গুরুতর শাস্তি পেতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা সোনার দাম বাড়ালে তার দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী তার থেকে দারুন সুবিধা পাবে। একটি হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। সারা পৃথিবীতে যত সোনা উৎপন্ন হয় তার অর্ধেকেরও বেশী আসে দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার খনি থেকে। আর দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই যেখান থেকে দুনিয়ার বাজারে সব চেয়ে বেশী সোনা আসে সেটা হচ্ছে সাইবেরিয়ার সোনার খনি। সাইবেরিয়ার সোনার খনির উৎপাদন হচ্ছে পৃথিবীর মোট সোনা উৎপাদনের এক অষ্টমাংশ। সোনার দাম বাড়ান মানে সোভিয়েট রাশিয়ার সুবিধা করে দেওয়া। আর সুবিধা করে দেওয়া ফ্রান্সের—যে ফ্রান্স, বিশেষ করে তার নেতা দ্য গল ইদানীংকালে আমেরিকান ডলারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ফ্রান্সের বহির্বাণিজ্যে বিরাট উদ্বৃত্ত হয়; এই উদ্বৃত্ত বাণিজ্য তার হাতে গত কয়েক বছরে বিপুল স্বর্ণভাণ্ডার এনে দিয়েছে। সোনার দাম বাড়াতে ফ্রান্সের আগ্রহ থাকবে এটা স্বাভাবিক। তৃতীয়ত, আজ সোনার দাম বাড়ালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলগুলিতে মজুত ডলারের দরুন যে লোকসান হবে তার খেসারত দেওয়ার জন্য আমেরিকার উপর দারুন চাপ আসবে এটা অবধারিত। অথচ এই খেসারত দিতে হলে মার্কিন অর্থনীতির উপর অসহনীয় চাপ পড়বে।

এইসব কারণেই মার্কিন অর্থ দপ্তর ও ফেডারেল রিজার্ভ ব্যুরো বারবার ঘোষণা করেছেন যে, ডলারের বিনিময়মূল্য কমান হবে না, সোনার দাম বাড়ান হবে না, যত সোনা চাই দেব, কিন্তু ডলারকে ডুবতে দেব না। এই উদ্দেশ্যেই কয়েক দিন আগে সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড ও ইটালীর প্রতিনিধিরা ঘোষণা করেছেন যে, সোনার দাম স্থির রাখতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সব দেশের মুদ্রাও মার্কিন ডলারের মত সোনার সঙ্গে বাঁধা। ডলারের পতন হলে, এই সব দেশের মুদ্রার উপরও আঘাত আসবে। তাই তারাও ডলারের স্থিতির জন্য আমেরিকার মতই উদ্‌গ্রীব।

ডলারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য দ্বিতীয় যে রাস্তাটি আমেরিকার সামনে খোলা আছে সেটাও কঠিন, তবে আমেরিকার পক্ষে কম বিপজ্জনক। আমেরিকা এখন সেই পথেই যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে, আমেরিকার ভিতরে মুদ্রাস্ফীতির চাপ ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ঘাটতি কমিয়ে ডলারের মূল্যক্ষয় রোধ করার পথ। দুটি ভাগ্যবানের [illegible] হার বাড়ান হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জনসন আয়করের উপর শতকরা দশ ভাগ সারচার্জ আদায়ের প্রস্তাব করেছেন, বিদেশে আমেরিকান মূলধন রপ্তানী, আমেরিকান নাগরিকদের পর্যটনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং আমেরিকায় বিদেশী মালের আমদানীর উপর শুল্ক চড়াবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই নীতির অনিবার্য ফল হচ্ছে বিদেশে মার্কিন অর্থসাহায্য কমবে, দেশের ভিতরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢিলা পড়বে, বিদেশ থেকে পণ্য আমদানীর উপর কড়াকড়ি হবে। অর্থাৎ এই সব ব্যবস্থা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের মান অক্ষত রাখবে না, তাছাড়াও [illegible] দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোতেও ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে।

ডলারের ডুবন্ত জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার লাইফবেল্ট অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র পার হবার জন্য বিশ্বের ধনপতিরা যখন হুড়োহুড়ি করছেন এবং সেই হুড়োহুড়িতে যখন ডুবন্ত ডলার-জাহাজ আরও ডুবছে তখন সারা পৃথিবী "ডলার-বনাম-সোনা"র মুখোমুখি লড়াইয়ে এই যুগের একটা উভয় সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কতটুকু দেখানো সম্ভব? কত রং, কত আকৃতি। মাছের ঝাঁক, জলের তলাকার গাছ, অ্যানিমোন, সি-কিউকাম্বার (সমুদ্র-শশা বলতে পারেন) অত নাম কি জানি, শুধু দেখা আর দেখে চোখ জুড়ানো।"

হুগলীর ঘোলা জলে অবশ্য এ দৃশ্য নেই। সেখানে আলো আদৌ প্রবেশ করে না, সামান্য গভীরেই রাত্রের অন্ধকার। আলো জ্বালিয়েও বিশেষ সুবিধা হয় না। অতে দেখতে আরও অসুবিধা হয়।

রাত্রিতে ওই ঘোলা জলের তলাতেই আবার আর এক রূপের জগৎ। তখন অসংখ্য জীবন্ত তারকার কণার মত 'জোনাকী' মাছেরা কখনও ঝাঁক বেঁধে কখনও একা এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। "দেখে দেখে এখন শুধু আলো থেকেই চিনতে পারি কোনটা কোন মাছ।"

হাঙর ছাড়া এসব দিকে আর একটা ভয় কুমীরের—তবে কুড়ি ফুটের বেশী গভীরে কুমীর শক্তিহীন, আর ডুবুরীর কাজও কুড়ি ফুটের অনেক তলায়।

হাঙর কুমীর তুচ্ছ আর একটি ভয়ের আছে, আজিজসাহেবের মুখে সে গল্প রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসের মতই লাগছিল। এ ভয়টি মানুষের তৈরী—এবং এর একটি মজার ইতিহাস আছে। মহাযুদ্ধের সময় এটা জার্মানদের একটি বিশেষ রণ-কৌশলের অন্তর্ভূত ছিল।

"যেখানে যেখানে জলের তলায় আমাদের নামতে হ'ত, জলমগ্ন জাহাজের খোঁজে বা মাইন সরাতে, সেসব জায়গায় জার্মানরা লম্বা লোহার শেকলে বেঁধে নামিয়ে দিত নরকঙ্কালের বাহিনী। হাঁ, নরকঙ্কাল। মনে করুন, দুশো ফুট জলের তলায়, জলের চাপে যেখানে ফুসফুস ফেটে যেতে পারে, সেখানে জল-ফুসফুস যন্ত্রের নলিকাগো যতটুকু নিশ্বাসের বাতাস পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে নেমে গেছি। চারিদিকে জল, উপরে জল, পৃথিবী, শুকনো মাটির সঙ্গে যোগাযোগ শুধু পিঠের সঙ্গে বাঁধা লাইফ লাইন দিয়ে, ছিঁড়ে গেলেই হল, যদিও ছিঁড়ে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব। ওই অবস্থায় নিঃসঙ্গ—একা-একা—হঠাৎ দাঁত বার করে হাসছে চোখের সামনে শাদা জ্যান্তভূতের মত একটি কঙ্কাল! ওই অবস্থায় চমকে উঠবে না এমন বীরপুরুষ কে আছে বলুন? ওটা শত্রু-পক্ষের চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়, এই জ্ঞান কি খুব বেশী সাহায্য করবে? বুদ্ধি দিয়ে ওর ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু মনের উপর ওর প্রভাব একবার কল্পনা করবার চেষ্টা করুন।" অনেক সময় পিঠের সঙ্গে আটকানো লাইফলাইন জলমগ্ন জাহাজের দড়ি-দড়ার সঙ্গে জড়িয়ে যায়। তখন সত্যি সত্যি প্রাণসংশয় হয়ে পড়ে।

গভীর সমুদ্রের ডুবুরীদের আর একটা বিচিত্র পরিস্থিতির কথা আজিজসাহেব বলেছিলেন, যেটা তাঁর নিজের হয় নি। শতশত ফিট গভীরে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য দেওয়া থাকে সর্বাধুনিক "একোয়া লাঙ" বা জল-ফুসফুস। অনেকটা গ্যাস-মুখোশের মত দেখতে, এর ভেতর খুব উচ্চ চাপে পোরা থাকে বাতাস—সেই বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ জলের তলায় স্বাভাবিক ভাবেই চলে, কিন্তু বিপদ হয় বাতাসের নাইট্রোজেন নিয়ে। সাধারণত নাইট্রোজেন নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে কোন ক্ষতির কারণ হয় না—কিন্তু অত চাপের নাইট্রোজেনের এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হঠাৎ মহাস্ফূর্তির একটা ঝোঁক শরীর মনকে পেয়ে বসে। তখন একটা মাছ দেখলে মনে হয় জল-ফুসফুসটা খুলে মাছকে খানিকটা হাওয়া দিয়ে দিই। যাস খুললেই হল। আনন্দের আতিশয্যে পাতাল থেকে একেবারে এক লাফে স্বর্গে।

*

কলকাতায় একটা শখের ডুবুরীক্লাবের প্রস্তাব নিয়ে অনেক যুবক আজিজ-সাহেবের কাছে আসেন। এ রকম ক্লাব পাশ্চাত্য দেশে অনেক আছে। হবি হিসাবে স্কিন ডাইভিং যে শরীর মন গঠনে বিশেষ উপযোগীই হবে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। —লেখকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

।। ১৯ ।।

রাজাবাবু যা বলেছেন, যা বলে গেছেন সে প্রস্তাব যে একেবারেই অবাস্তব অচল, তা সুরবালার থেকে বেশী কেউ জানে না। মাসিক পচিশ কেন, সাতশ টাকার জন্যেও যদি সে বাইরের গাওনা ছেড়ে দেয় তো সেটা তার লোকসানই। সব মাসে যে পাঁচ শ' টাকা আয় হয় তা নয়—কিন্তু তেমনি কোন কোন মাসে বেশীও হয়। আরও বেশী হবে। নামডাক ছড়াচ্ছে। আগে পঞ্চাশ ষাট টাকাতেও বায়না নিয়েছে—এখন একশ টাকার কম বড় একটা নেয় না। নিতান্ত কেউ এসে কাকুতি-মিনতি করলে, কোন পুরনো ঘর এসে ধরলে দশ বিশ কমায়। পঞ্চাশ ষাট টাকা এখন কেউ বলতে সাহসই করে না তাকে। ওদিকে দেড়শ দুশো টাকায় বায়নাও আসে। বড়লোক মক্কেল দেখলে দালালরাই ওর হয়ে মোটা টাকা হেঁকে বসে, দু' একবার গাইগুঁই করে রাজীও হয়ে যান তাঁরা। তাছাড়া, এটা তো বাঁধাবরাদ্দ রেট—পেলার হিসেব ধরলে অনেক বেশী আয় হয়। বিশেষ শ্রাদ্ধ বাড়িতে, বাঁধা মজুরীর ডবল তেডবল উঠে যায় পেলা থেকে।

আরও আছে। সাধনার কথা আছে। শিক্ষার কথা আছে। এতদিনের সাধনা তার, এতদিনের চেষ্টা। আজ বলতে গেলে সিদ্ধি তার করায়ত্ত। এখনই সে যে-কোন পুরুষ কীর্তনীয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাইতে পারে। তাকে আর চপওলী বলে নাক সিঁটকোতে সাহস করে না কেউ। বড় বড় আসরে তার নাম উল্লেখ হয়—নান্দু নিজে শুনে এসেছে। এখন গান ছেড়ে দেওয়া মানে আত্মহত্যাই করা একরকম।

আর এ তো শুধু বৃত্তি হিসেবেই নেওয়া নয়—এ যে তার প্রাণের জিনিস। মনেই পড়ে না—কেমন শিশুতে মতির কীর্তন শুনে আত্মহারা বিহ্বল হয়ে যেত সে। শত শাসনেও তাকে বেঁধে রাখা যায়নি—নিবৃত্ত করা যায় নি এই বিশেষ সঙ্গীতের আকর্ষণ থেকে। এ গান ছেড়ে দিলে কি বাঁচবে সে? মনে তো হয় না।

অথচ—রাজাবাবুকেই কি আজ ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব?

ভাবতেই যে বুকের মধ্যেটা টনটন করে ওঠে! এই যে সাতদিন দেখে না, এমনও হয় পর পর দুদিনও দেখা হয় না—নিতান্ত এক-আধটা মুজরো না নিলে যা অসম্ভব হয় তাও নিতে হয়—সে সময়টা প্রত্যাসন্ন মিলনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে বলেই সহ্য হয়। সন্ধ্যাটা কাটে চর্বিত-চর্বণে, প্রভাতটা কাটে কল্পনায়।... বলে গেছেন সাতদিন পরে আসবেন, মনে করতেও যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই কদিন তার কাটবে কি করে, কেমন করে বেঁচে থাকবে সে! একটাই—উন্মাদ উন্মাদ চিন্তা তার কল্পনা করছে—কোন ছুতোয় গিয়ে দূর থেকে দেখে আসা যায় কি না! প্রৌঢ়? বৃদ্ধ? বয়স্ক? তা সুরো জানে না। অত ভেবে দেখে নি। 'নয়নে লাগল রূপ মাধুরি'—এই শুধু জানে। ওঁকে দেখলে মনে যে আনন্দ হয়, প্রাণে যে শান্তি অনুভব করে, রক্তে যে উন্মাদনা জাগে—সমস্ত সত্তা যে পরিপূর্ণতা বোধ করে—এমন আর কাউকে দেখে করে না, কখনও করে নি। এইটুকুই শুধু জানে। এতদিন ভাবে নি, ভাবার দরকার হয় নি—ভাবার কথাও ভাবে নি—আজ বুঝছে যে ওঁকে তার 'না' বলা সম্ভব নয়, ওঁর জন্যে চরম স্বার্থ ত্যাগ করেই তৃপ্তি।...

না, নান্দুদা ঠিকই বলেছে। বহুদূর এগিয়ে গেছে সে, আর ফেরার উপায় নেই।...

তবু কথাটা মনে মনে তোলাপাড়া করে কদিন। কিছুতেই কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। কী উত্তর পাবে জেনেও একদিন মতির কাছে তোলে কথাটা। মতি চমকে ওঠে, বলে, তুই কি পাগল? এই কথা চুপ করে শুনে গেছিস আবার মনে মনে জিগোচ্ছিস? ...পাগল ছাড়া একথা কেউ পাড়েও না, কেউ তু বসে শোনেও না। তুই এখন বায়না ছাড়বি কি? কোন সাতরাজ্যের রাজা বা রাজপুত্তুর এসে যে করতে চাইলেও আমি তোকে বারণ করতুম। তোর এই উঠতিকাল, এই তো উন্নতির সময়। সত্যি কথা বলতে কি তোর বয়সে আমাদের এত নামডাক হয়নি—তোর যা হয়েছে। আমাদের বয়সে তুই দিনে মজুরী পেলা মিলিয়ে হাজার টাকা গুনে নিতে পারবি—এই বলে দিলুম।... আমার কাছে স্পষ্ট কথা—ঐ মিনসেকেই যদি তোর এত পছন্দ হয়ে থাকে ওকে তুই সখের পতি কর—বাড়িতে বাবু বসা, আর তাই তো কথাটা দাঁড়াচ্ছেও। পচিশ টাকা মাইনে দিয়ে যে বাঁধা রাখবে সে কি আর বেশী দিন শুধু আলগোছা বসে দুখানা গান শুনে ছেড়ে দেবে?...ওলো নেকী, আমরাও যাদের ছেলের ভাত খাই, বয়স তিন কুড়ি পেরিয়ে গেল—যে যাই বলুক, সুবিধা যা পাবে ওঠবার ঠিকই উঠবে। সে কখনও পিছিয়ে উঠতে পারে না। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে ঘি ঠিকই গলবে, আরও কাছে এলে পুড়েও যাবে। অত [illegible]

[illegible] হয়েই ভাবে সুরো—বিয়েকে বড় ভয় ... এমন ভাবার মতো ... [illegible] বিলাস মাত্র। তার বেশ একটু কৌতুকও অনুভব হয়। সে কৌতুকের একটা ক্ষীণ চিহ্ন হাসির ভঙ্গীতে লেগে থাকে দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। সামনের আসনে ওদের যে কি মনে হল সে একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকে তার দিকে। এতক্ষণে চেঁচামেচি শুরু করবে, কান্নাকাটি করবে সুরো—এইটেই সে আশা করেছিল বোধহয়। তার এই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে—এই ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে সে যেন কেমন হকচকিয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা।...

শেষ পর্যন্ত গাড়িটা একটা বড় ফটক পেরিয়ে একটা বাগানে ঢুকল। প্রায় অন্ধকারই হয়ে এসেছে তখন, তবুও কিছু কিছু নজর চলে। বেশ বড় বাগান। বাগানের ভেতরের পথ সরকারী রাস্তার চেয়ে ঢের বেশী চওড়া। পথের দুদিকে দুটো বড় পুকুর। নানান ফল ফুলের গাছ, ফুলের কেয়ারী। মধ্যে মধ্যে বোধহয় কিছু আনাজের চাষও আছে, সেটা বোঝা গেল না এতদূর থেকে। তবে বাগান যত বড়ই হোক—কোন ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠান যে এখানে নেই তা ঢুকেই বোঝা যায়। কর্মবাড়ির প্রধান লক্ষণ আলোকসজ্জা—তার কোন চিহ্নমাত্র নেই। বেশ খানিকটা বাগান ভেঙে ভেতরে দোতলা বাড়ি—বড়লোকের বাগানবাড়ি যেমন হয় তেমনিই—হয়ত মাঝের ঘরটা নাচঘর হবে—গাড়িবারান্দা সবই ঠিক—কিন্তু না আছে লোকজন না আছে আলো। গাড়িবারান্দার মাথায় একটা তেলের আলো জ্বলছে মিটমিট করে; তার ভেতর দিয়ে হলঘরের ঝাড়টা দেখা যাচ্ছে—ঝাড় জ্বলছে বটে, সম্ভবত একটিই ছোট ঝাড়, তাতে এমনিতেই যথেষ্ট আলো হয়নি। ওপরের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, তবে সেও সাধারণ আলো—গৃহস্থদের ঘরে যা জ্বলে তেমনি। আর লোক তো একেবারেই নেই, কোথাও একটা দারোয়ান মালী পর্যন্ত চোখে পড়ল না। যে দারোয়ান সঙ্গে এসেছিল সে কোচোয়ানের পাশে বসে ছিল এতক্ষণ, সে-ই লাফিয়ে নিচে নেমে ফটক খুলে দিল, আবার গাড়ি বাগানে ঢুকলে বন্ধ করল। তারপর সেও অদৃশ্য হয়ে গেল।

গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামতে প্রায় অন্ধকারের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন যে মানুষটি—তাঁকে অন্ধকারেও চিনতে পারত সুরবালা—রাজাবাবু। নিজে গাড়ির দরজা খুলে হাত ধরে সুরবালাকে নামালেন।

'খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না?' ভেতরে যেতে যেতে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন—রাজাবাবু। সুরবালার মুখে চোখে কোন বিস্ময় বা অপ্রত্যাশিতের চমক লাগল কিনা সেই ক্ষীণ আলোতেই লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন।

'কৈ, না তো।' সহজভাবেই উত্তর দেয় সুরো।

'ভয় পাওনি? সে কি! আমি ভেবেছিলুম খুবই ভয় পাবে। বিয়ের কথা চিঠি লেখা ছিল আমার। ভাগ্যেই [illegible] বাদ [illegible] দেখাবে—বলা ছিল।'

পিছন দিকে ফিরে ঈষৎ শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকান ঝিয়ের দিকে।

'কি আছে বাবা চিঠিটা খুলে দেখতে বলো, দরকারই হল না যে। তিনি সব জানে বলে মনে হল তো আমার। একটা বড় কাগজ নি,—টায় চুপ করে বসে আইল ম্যাজটা পথ!'

'আশ্চর্য তো! কিসে বুঝলে?' রাজাবাবু প্রশ্ন করেন সুরোকে।

'ঠিক যে কোন লক্ষণে বুঝেছি তা নয়। হঠাৎই মনে হল। এমনিই ভাবছিলুম, ঠাকুরকে ডাকছিলুম তুমি যেন জোর করে তোমার কাছে টেনে নাও, নিতে পারো।... সেদিন কেমন মনে হল ঠাকুরই স্থানে থেকে কানে শুনেছেন। সেদিন মানে—ঐ লোকটা যেদিন বায়না দিতে গেল।...মন অন্তর্যামী বলে—তাই হবে বোধহয়। তখন থেকেই কেমন আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেল। দুঃখ দুশ্চিন্তা কিছুই রইল না। কী করব—একদিকে তুমি আর একদিকে আমার মান, আমার নাম বল প্রতিপত্তি টাকা, মা ভাই—বড় সাংঘাতিক গোলমালে পড়েছিলুম, কিছুই ঠিক করতে পারছিলুম না। মনে হচ্ছিল তুমিই আমার হয়ে যা ভাল হয় ঠিক করবে। সেদিন মনে হল ঠিক করেছ। আশ্চর্য একটা শান্তি পেলুম মনে, আমার আর কোন দায়দায়িত্ব রইল না—যেন বেঁচে গেলুম।'

খুব আস্তে আস্তে বলছিল সুরবালা, ঘুমন্ত মানুষের মতোই। থেমে থেমে যেন কতকটা আধো আধো কথার মতো। রাজাবাবুর হাত ধরে, তাঁর হাতে ভর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে। রাজাবাবুও আবিষ্ট হয়ে শুনছিলেন। এ তাঁর কাছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য, স্বপ্নের আশাতীত সুখ। এতটা ভাবতে পর্যন্ত যেন সাহস করেন নি—যখন এই চক্রান্ত করেছিলেন, যথেষ্ট ভয়ে ভয়েই করেছিলেন, চরম দুঃসাহসের কাজ করছেন বুঝেই। এখন মনে হচ্ছে কথা নয়, যেন—ঘুমের মধ্যে কোন গান শুনেছেন। এত বিস্ময় এত আনন্দ আর কখনও বোধ হয় নি। কোন বিস্ময়, কোন অভাবনীয়তে যে এত আনন্দ থাকতে পারে তাও তিনি জানতেন না।

ওপরে পৌঁছে হলঘর পেরিয়ে পূর্বদিকের ঘরে ঢুকল ওরা। বড় খাটে শুভ্র সুন্দর শয্যা। খাটের বাজুতে বাজুতে ফুল। ফুলের গোড়েমালা জড়ানো। সুরবালা ফুল ভালবাসে—শুধুই যেন অধিকার পেয়েছে। সেই প্রথম দিনের—মানে ওদের দেখা যেদিন প্রথম—আসরের মতো গোড়ে মালাতেই [illegible] ঝুলছে চারদিকে, খাটের ছত্রিতে ছত্রিতে। দেওয়ালের গায়েও। খাটের পাশে শ্বেত পাথরের উঁচু চৌকীতে [illegible] দুটি রুপোর চুমকী বাটিতে খাবার জল। একটা জলচৌকীতে [illegible]। [illegible] [illegible] মতো কি পাতা। খাটের ওপরে টানা পাখা—তাতেও ফুলের সমারোহ। একটিমাত্র ঝাড়—তাতে চার পাঁচটা [illegible] তেলের সেজ জ্বলছে, সেটুকু আলোও [illegible] আবছা অস্পষ্ট আর মেদুর হয়েছে।

[illegible] রাজাবাবু। [illegible] ঘরটা বন্ধ করে [illegible] নিয়ে [illegible] চাই না সে, তখন হয় না।

খানিকটা সেখানে থেকে ঈষৎ একটু আকর্ষণ করে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন রাজাবাবু।

এ ঘরের সম্পূর্ণ ভিন্ন সজ্জা। প্রথমেই মনে হল বুঝি কোন পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা ছোট্ট সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণের বড় যুগল মূর্তি, ফুলেমালায় সাজানো। তার সামনে আলপনা দেওয়া জায়গায় আম্রপল্লব দেওয়া পূর্ণ ঘট। পাশে একটি বড় থালায় দুটি মালা, ধূপের বাটিতে চন্দন।

'আমি সকাল থেকে উপবাস করে আছি সুরো। বাইরের অনুষ্ঠান তো সম্ভব নয়, তুমি বললে, আমি জানি—কিন্তু তোমার ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুরের কাছে তো সব সমান। তাঁর কাছে প্রেমই বড়। তাঁর সামনে তাঁকে সাক্ষী রেখে আমরা মালা বদল করব। আমাদের বিয়ে হবে।'

সুরো গলায় আঁচল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই মূর্তিটির সামনে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল, তারপর ফিরে রাজাবাবুকেও। তারপর উঠে সে নিজেই এবার তাঁর হাত ধরে আকর্ষণ করল, 'চলো ও ঘরে যাই।'

'এ ঘরে—এ ঘরের কাজটা করবে না?'

'না। ওতে আর দরকার নেই। আমার ঠাকুরের কথা বলছিলে না—আমার এই গানের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর—তাঁরই শিখিয়েছেন ভালবাসার লোকের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে হলে সব বিসর্জন দিতে হয়।... মেয়েদের কাছে লজ্জা অনেক বড়, বস্ত্রহরণ করে তিনি গোপিনীদের লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন দিইয়েছিলেন। মাসী কথাটা বারবার বলেছে আমাকে, এই লোকও বলেছে। খ্যাতি, যশ আর টাকা—মানুষের কাছে সবচেয়ে লোভের বস্তু, আমিত্বের বস্তু—চিরদিনের মতো ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি, নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিতে, সঁপে দিতে—সেখানে ঐ তুচ্ছ মালাবদলের অহঙ্কারটুকুই বা রাখব কেন? তুমি আমাকে দাসীর মতোই পায়ে ঠাঁই দাও, বাঁধা মেয়েমানুষের মতো করেই নাও, তুমি আমাকে খেলার চোখে দ্যাখো—যা খুশি। ও নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাবো না। কোন কথাই ভাবব না।...তোমার পায়ে সঁপে দিয়েছি আমাকে—এইটুকুই শুধু জানব, এর বেশী নয়। কোন অহঙ্কার কোন জড়তা কোথাও না থাকে। আজ থেকে যা ভাববার যা করবার তুমি ভাববে, তুমি করবে। যদি কোনদিন তাড়িয়ে দাও সেদিনও ঝগড়া করব না, কপাল চাপড়াব না। জানব না যে আমার কি হল। এইটুকু জীবনে বুঝেছি—তুমিই আমার পূজার ঠাকুর, তোমাকে পাবার জন্যেই এতদিন এত [illegible] [illegible], এত কেঁদেছি।'

(ক্রমশঃ)

বিশ্বাস ছিল যে নববর্ষের প্রথমদিনে চণ্ডাল কিংবা দেহ অশুচি করলে সে বৎসর বসন্ত স্পর্শ করতে পারে না। এখনও মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ নববর্ষের দিনে অন্ত্যজ স্পর্শ দ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে শুদ্ধ হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে হোলি আর্য-পূর্ব জাতিদের উৎসব ছিল। আর এ তথ্য সংস্কৃতিগত জনতত্ত্ব-বিশারদদের দ্বারাও আজ স্বীকৃত। আধুনিক ঐতিহাসিক হোলি উৎসবকে নব্যপ্রস্তর যুগের সীমানার মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চান। তাঁর মতে

> "Large mesolithic deposits of ashes, with a few animal bonfires (from the sacrifices) and rain-compacted strata prove annual or periodic recurrence in the same locality of sacrifice associated with gigantic holi bonfires" (Kosambi)

আরও জানা গেছে আদিতে হোলি ছিল কৃষি সমাজের পূজা; সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত ছিল তার প্রধান অঙ্গ। উপরে হোলির যে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, তার সঙ্গে আর্যপূর্ব দ্রাবিড়দের উৎসবাদির আশ্চর্য রকমের মিল দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতের মাটিতে কৃষির প্রবর্তন করেন অব্যবহিত দ্রাবিড়-পূর্ব জাতি—প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির যোগ আনার মধ্যে বড়ো অবদানই এই প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড ও দ্রাবিড়দের। এঁদের অনেক দেবদেবী আর্যদের মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করেছেন। গোন্দ, কোল প্রকৃতির দেবতা গণশ্যাম দেও কৃষ্ণরূপে, ভইরো কালভৈরব ও হনুমন্ত (তামিল অন-মন্তি, অর্থ পুরুষ বানর) হনুমান হয়ে বসে আছেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে এর কারণ,

> The spirit of Hinduism has always been Catholic, and it has always been ready to give shelter to foreign beliefs, provided it was permitted to assimilate them in its own fashion" (Hastings)

দ্রাবিড়দের উৎসবাদিকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : (১) কৃষিকার্যের সঙ্গে জড়িত যেমন জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজ বপন ও শস্য কর্তনের সময়কার উৎসব; এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে বেশী ফসল উৎপাদন করা; আর (২) সমাজের ক্ষতিকারক অপদেবতা বিতাড়নের জন্য সাময়িক আচার অনুষ্ঠান ও যাদু-মন্ত্রাদি প্রয়োগ করা। এখানে উল্লেখ্য যে ফুল, ফল, রান্না করা খাদ্যাদি, পোশাক অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে (যেন কোন মানুষকে উৎসর্গ করা হচ্ছে) মূর্তিপূজা দ্রাবিড়দেরই উদ্ভাবনা। এ জিনিস বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির হোতা আর্যদের অজানা ছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের মতে সংস্কৃত 'পূজ' ধাতু দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠি থেকে আগত। এছাড়া অনেক সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারও দ্রাবিড়দের থেকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। এদের মধ্যে দেবর ভাজের মধ্যে [illegible] ভাব, ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের মধ্যে নিষেধমূলক সম্পর্ক এবং বিবাহাদি শুভ কাজে সিঁদুর ও হরিদ্রার ব্যবহার উল্লেখ করা যেতে পারে। নরবলি প্রথাও দ্রাবিড়দের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। দ্রাবিড় জাতিরই উত্তরাধিকারী কোল ও গোন্দদের কৃষি উৎসবের উপাদানগুলির (যেমন, নরবলি, মেষ বধ করা, শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে বহ্ন্যুৎসবের ভস্ম ছড়ান, মদ্যপান ও যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা) সঙ্গে হোলির প্রকৃতির কোন পার্থক্য নেই। সাঁওতালদের মাঘ পরবেও এই পানোন্মত্ততা ও যৌনোচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে মিঃ টমাসের উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে—

> Holi is a fertility festival which has its origin in the aboriginal orgies of some powerful tribes and even now retain many of the characteristics of the fertility festivals of savages"

বৈদিক যুগে মদন নামে সারারাতব্যাপী একটি জনপ্রিয় উৎসবের সাক্ষাৎ পাই। এটি সম্ভবতঃ শীতকালে অনুষ্ঠিত হত কেননা সারারাতব্যাপী অগ্নি প্রজ্জ্বলনের উল্লেখ দেখি। স্বৈরিণীরা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য, অবিবাহিতা কন্যারা স্বামী সন্ধানে, দেহোপজীবিনীরা জীবিকা নির্বাহ করতে, কবি যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়, তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরস্কারের লোভে এ উৎসবে যোগ দিত। (পূর্বোল্লিখিত সাহারানপুর ও রাজপুতনার হোলি খেলা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) বৈদিক যুগে সম্বৎসরব্যাপী সত্রের পর অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরভারতে হোলির দিনে যে ভাঙ চলে তা বৈদিক যুগের সোমরসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য এসবের সঙ্গে উল্লিখিত দ্রাবিড় উৎসবের কোন যোগ আছে কিনা বলতে পারি না। তবে ডঃ ভি উইলকিনস্ দোলযাত্রা বা হোলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে—

> "It is a festival, with modern innovations, that was held in Vedic times to celebrate the return of Spring"

এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন আর্ল অফ্ রোনাল্ডসেও।

বৌদ্ধযুগে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ করার যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল প্রিয়দর্শী অশোকের সময় তা সম্পূর্ণ হয়। প্রিয়দর্শী অশোক দেশে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। এমন কি রাজপ্রাসাদের জন্য যে হাজার হাজার পশু বধ করা হত তা শেষ পর্যন্ত তিনটি প্রাণীতে এসে ঠেকে—দুটি ময়ূর ও একটি হরিণ। অবশেষে তাও বন্ধ করা হবে বলে শিলালিপিতে (প্রথম শিলালিপি) বলা হয়েছে।" সমস্ত 'সমাজ' বা উৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কেননা অশোক এসব উৎসবের মধ্যে পশুবধ ও অন্যান্য অসংযম লক্ষ্য করেছিলেন। বৌদ্ধযুগের এই 'সমাজ' বা উৎসবের সঙ্গে উপরোক্ত দ্রাবিড় বা আর্য-উৎসব কিংবা পরবর্তীকালের হোলির কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাও পুরাতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়।

তবে ঐতিহাসিকভাবে দোলোৎসব (বা হোলি, দুয়েরই অর্থ এক) এর প্রথম উল্লেখ পাই রামগড় পাহাড়ের এক লিপিতে (খৃঃ পূঃ ৩য়-২য় শতক)। বাসন্তী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবে নরনারী [illegible] সম্মিলিত হয়ে যোগ দিতেন। অবশ্য সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা অন্য কোন দেবতা পূজিত হতেন কিনা, জানা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে হোলির প্রথম উল্লেখ দেখা যায় জৈমিনীর পূর্বমীমাংসার শবরভাষ্যে। কারো কারো মতে জৈমিনী খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন এবং শবরভাষ্য রচিত হয়েছিল খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে। ([illegible] এ কাল নিরূপণ সম্পর্কে মতদ্বৈধ বর্তমান) সেখানে প্রাচ্যবাসীদের হোলাকা উৎসব যাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীকৃষ্ণলীলার আকরগ্রন্থ ভাগবত পুরাণে (৬ষ্ঠ শতক) শ্রীকৃষ্ণের দোললীলার কোন উল্লেখ দেখি না। পদ্ম পুরাণের পাতাল খণ্ডে (ডঃ হাজরার মতে রচনাকাল ৯০০—১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) কলিযুগে দোলোৎসব সকল উৎসবের মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। একাদশী থেকে আরম্ভ করে তিন বা পাঁচদিনের এই উৎসবে চতুর্দশীর অষ্টমযামে বা প্রতিপৎ সন্ধিকালে যথাবিধি ভক্তিপূর্বক সিত, রক্ত, গৌর ও পীত এই চতুর্বিধ ফল্গুচূর্ণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার বিধান এতে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণাভিমুখে শ্রীকৃষ্ণকে দোলযানে স্থাপন করার কথাও এ পুরাণে উল্লেখ আছে। তবে দশম শতাব্দীর মধ্যে দোলোৎসব যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আছে। উচ্চবংশসম্ভূত মহিলারা এ উৎসব উপলক্ষ্যে উদ্যানবৃক্ষে টাঙানো দোলায় দোল খেতেন। [illegible] একটি

বসন্তোৎসব, বা মদনোৎসব কিংবা কাম-মহোৎসব নামে উৎসবের প্রচলন ছিল। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (৩য়-৪র্থ শতক), শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও কুমারিল ভট্টের তন্ত্র-বার্তিকা (৭ম শতক), ভবভূতির মালতী-মাধব (৮ম শতক)। অলবেরুনী (১১শ শতক), রঘুনন্দন (১৬শ শতক) এবং মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলী রচয়িতারা—সকলেই এ উৎসবের কথা বলে গেছেন। রত্নাবলীতে 'মদনোৎসবের' ওপর একটি 'অঙ্কই' লেখা হয়েছে। বসন্তকালে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে নাগরিকরা পটবাস কুঙ্কুম-চন্দনে সুরভিত করে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ ও ভৃঙ্গার ভরে জল নিয়ে পরস্পরকে নিষিক্ত করত। তন্ত্রবার্তিকার ব্যাখ্যায় 'মধুর-মালিকা' বলেছে—"ফাল্গুন প্রতিপাদে ক্রিয়মানঃ পরস্পরজলসেকঃ বসন্তোৎসবঃ।" অলবেরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয় চৈত্রী পূর্ণিমার বসন্তোৎসব প্রধানতঃ মেয়েদেরই উৎসব ছিল। নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে উপহারের জন্য তারা স্বামীদের উত্যক্ত করে তুলতেন। অলবেরুনীর গ্রন্থে কামোৎসব নামে একটি উৎসবের যেন আভাস পাচ্ছি। জ্ঞানদাসের (ষোড়শ শতক) দুটি ছত্রে মদনোৎসবের নাম দেখি—

"পরভৃত মুকুলিত, অলিকুল গান।
মদন মহোৎসব পিককুল রাব।।"

ঐতিহাসিকের মতে ষোড়শ শতকের পর কোন সময় এই বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলি উৎসবের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে যায়। তার উপর মুসলমান রাজা-বাদশাহ ও হারেমের শাহজাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় হোলি ঐ সব উৎসবকে গ্রাস করে নিজের একচ্ছত্র আসনটি অধিকার করে নেয়।

এপর্যন্ত আলোচনায় আমরা 'মূর্খ-রাজা' বা হোলি উপলক্ষ্যে লোক-ঠকান বা লোককে বোকা বানানোর কোন বিবরণ সেকালের সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিনি। পরবর্তীকালে বিদেশী পর্যটকের বিবরণে ও সমসাময়িক গ্রন্থে এর উল্লেখ পাই। এতে মনে হয় আমাদের হোলির সঙ্গে এগুলির যোগ (সংযোজন?) হয়ত পরবর্তীকালের।

হোলি উৎসবের সময় ছত্রপুরের রাজার কাছ থেকে ফরাসী পর্যটক Rousselett বালির তৈরী একখানা ভোঁতা মিষ্টি উপহার পেয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে এই খেলা খুবই প্রিয় ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মুতাক্ষেরীণে 'মূর্খ রাজার' এক মজার বর্ণনা আছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আমাদের হোলি বা দোলের অনুরূপ কয়েকটি উৎসব আছে। শ্যামদেশের ব্যাঙ্কক-এ যে দোলোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তা ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা সেখানে পৌঁছেছিল। চার ব্যক্তি বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হয়ে দোলায় আরোহণ করে এবং তাদের ঘিরে নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করা হয়। রাজপরিবারের লোকেরাও এতে যোগদান করেন। যদিও শীতকালে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তৎসত্ত্বেও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে একে বসন্তোৎসব বলা হয়েছে। হোলির সমসাময়িক কালে অনুষ্ঠিত রোমানদের কয়েকটি উৎসবও আমাদের হোলি উৎসবের অনুরূপ। Lupercalia উৎসবে যুবক ও বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা নগ্ন হয়ে [illegible] করে। Matronalia Festa উৎসবটি [illegible] সংক্রান্ত ও বসন্তঋতুর উৎসবরূপেই উদযাপন করা হয়। ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে [illegible] মদ্যপান, নৃত্যগীত এবং [illegible] Anna Perenna-র প্রধান অঙ্গ। ১৭ মার্চ-এর Liberalia উৎসবে [illegible] দেবতা Bacchus-এর উদ্দেশ্যে [illegible] ও আহুতি প্রদান করা হয়। ইতালীয় কবি ওভিদ (৪৩ খৃঃ পূঃ—১৭ খৃঃ) তার 'ফাস্তী' (Fasti) কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, ব্যাকাসের প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ জয় করার পর থেকে রোমে [illegible] এই নৈবেদ্য ও আহুতি দান প্রথার সূত্র। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই 'ফাস্তী' কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে পালাপার্বণ, লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক গল্প ও পুরাণ কাহিনী। জার্মানি ও ইতালির কার্নিভালও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সমগ্র জার্মানি এ উৎসবে এমনভাবে মেতে ওঠে যেন সেদিনই হচ্ছে পৃথিবীর শেষ দিন। মুখোশের আড়ালে অথবা সারা মুখে ও দেহে লাল-কাল রঙ মেখে নগ্ন হয়ে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে তারা লিপ্ত হত, তার তুলনা মেলা ভার। ইতালিতে উল্লিখিত আচরণের সঙ্গে নকল মিষ্টি আদান-প্রদান ও পরস্পরের গায়ে আবির (?) ও জল দেওয়ার রীতি দেখি। পর্তুগীজদের মধ্যেও অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বর্তমানকালেও ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং গ্রীসে মানুষের কুশপুত্তলিকা ('কার্নিভাল রাজা' নামে পরিচিত) শোভাযাত্রা সহকারে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে অতঃপর আগুনে পোড়ান হয়; ক্ষেত্রবিশেষে গুলী বা শিরশ্ছেদও করা হয়। কোথাও কোথাও উক্ত মহোৎসবে চাষাবাদের শস্যবীজ অর্পণ করা হয়। অবাধে মদ্যপান ও অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ এ উৎসবের অন্যতম উপাদান। নৃতত্ত্ববিদের মতে

"The resemblance of this festival with the Holi is so great that we are led to the conclusion that it is a form of the Holi which has dropped one or two elements in course of time of transmission" (N. K. Bose)

'মূর্খ রাজার' অনুরূপ প্রথা [illegible] দেখা যায়। প্রাচীন পারস্যে এক নগ্ন অলীক রাজাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে রাস্তায় ঘোরান হত। শীত ঋতু চলে যাবার সময় এই 'খেলা' অনুষ্ঠিত হত। রাজার হাতে একটি পাখা থাকত এবং তাকে শীতের দিন খুবই কষ্ট পাচ্ছেন—এই ভান করতেন। লোকেরা ঢিল ছুঁড়ত। তিনি দোকানের কাছে পয়সা চাইতেন। কেউ না দিলে তার গায়ে রং ছুঁড়ে দিতেন। এই অনুষ্ঠান বসন্ত কালেও হত। পুরাতত্ত্ববিদগণ প্রাচীন ব্যাবিলনেও পারস্যের অনুরূপ 'অলীক রাজা' দেখেছেন। ব্যাবিলনে এই অলীক রাজার আবির্ভাবকাল ২৩০০ খৃঃ পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। বিদেশের উৎসবের সঙ্গে আমাদের হোলি উৎসবের সাদৃশ্য খুবই সাধারণ ও আংশিক প্রকৃতির এবং বহুক্ষেত্রে নয়। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা বলতে পারি

"In joining the scattered fragments that survive the mutilation of ancient customs we must be forgiven if all the parts are not found closely to agree. Little of the means of information have been transmitted to us and that little can only be eked out by conjecture."

উপরে হোলি উৎসবের যে আলোচনা করা হল তাতে দেখা যায় যে আমাদের হোলি বা দোলোৎসবের সঙ্গে দেশ-বিদেশের বহু উৎসব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোন একটিমাত্র উৎসবের কোন একক উপাদান আমাদের বর্তমান হোলিকে গড়ে তোলেনি, বিভিন্ন উৎসবের, বিভিন্ন প্রাচীন জাতি-উপজাতির আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের বহু সঞ্চয় আত্মস্থ করে আলোচ্য উৎসবটি বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বহ্ন্যুৎসব ও তার অধিপতির মধ্যে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি, কুশপুত্তলিকা দাহের মধ্যে কোন কোন প্রাচীন জাতি-উপজাতির নরবলি প্রথা, রঙখেলা ও লোকাচারের মধ্যে জাতির যৌন বিশ্বাস, যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতির মধ্যে লিঙ্গপূজা কিংবা আলোচ্য উৎসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ কোন যোনাচার জড়িত বলে মনে করা হয়। তাই নৃতত্ত্ববিদের মতে,—

"The Holi, therefore, appears to be a conglomerate of festivities, with its origin in the astronomical equinok and the agricultural harvests, its evolution in the nomadic habits of the first immigrants, the ancestral worship of heroes, the leisurely adoption of a tribal festival ......, and finally in the embellishment of the puranas".

অনড় করে দিতে হবে। তাহলেই লুঠপাট করবার সুবিধে।

জাহাজটি নিকটে আসতেই ক্যাপ্টেন জ্যাক চমকে উঠলেন। সদাগরী তরী নয়—এ এক যুদ্ধজাহাজ। জলদস্যুর দলের সাধ্য কি যে এর সঙ্গে এঁটে ওঠে। কিন্তু তবু যুদ্ধ শুরু হল। কারণ তখন আর ফেরবার পথ নেই। বলা বাহুল্য জ্যাক্ হারতে শুরু করলেন। জলদস্যুর দল পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করল ডেকের পিছনে। কিন্তু অ্যান বনি এবং তার এক বন্ধু জলদস্যু মেরী রীড (ইনিও মহিলা) প্রাণপণে লড়লেন। ক্যালিকো জ্যাক দলবল নিয়ে ধরা পড়লেন। তাদের সঙ্গে অ্যান বনি এবং মেরী রীড উভয়েই বন্দী হলেন।

জলদস্যুর দলকে নিয়ে আসা হল জামাইকাতে। বিচার শুরু হল সেন্ট জাগো দা লা ভেগাতে। ২০ নভেম্বর, ১৭২০ খৃস্টাব্দ। রায় বেরুল। সকলের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছেন বিচারক। অ্যান বনিরও ফাঁসী হবে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য আবেদন করলেন অ্যান তার ফাঁসীর দিন পিছিয়ে দিতে। জানা গেছে যে অ্যান বনির আর ফাঁসী হয়নি। কিন্তু কি হয়েছিল তার, এ কথাও অন্ধকারে ঢাকা। সম্ভবত পীড়িত অবস্থায় মারা যান অ্যান বনি। কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায়, ইতিহাসে যা লেখা হয়নি।

ক্যালিকো জ্যাকের ফাঁসীর দিন তাকে আনা হয়েছিল অ্যানের কাছে। জ্যাক মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ ইচ্ছায় স্ত্রীর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অ্যান বনি স্বামীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলেন নি। রাগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন অ্যান। ক্যালিকো জ্যাক স্ত্রীর কাছে বিদায় চাইলেন—শেষ-বিদায়। অ্যান বনি উত্তরে বললেন,—স্বামীকে দেখে তার দুঃখ জাগছে মনে। সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জন করলে আজ তাকে এমন কুকুরের মত ঝুলতে হত না।

অ্যান বনির সঙ্গে আর একজন নারী জলদস্যুরও ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল। এর নাম মেরী রীড। অ্যান বনির চেয়েও মেরী রীডের প্রথম জীবন অনেক বেশী রোমান্টিক, অনেক বেশী বৈচিত্র্যপূর্ণ। মেরী রীডের সমস্ত জীবনটা একটা উপন্যাসের মত।

ছোটবেলায় মেরী রীডকে নিয়ে তার মা বিধবা হয়েছিলেন। ভারী সুন্দর দেখতে ছিলেন মেরীর মা। অবশ্য মেরী রীডও কিছু কম ছিলেন না। ছোটবেলায় তাকে ছেলের মত মানুষ করতে চেয়েছিলেন মেরীর মা। ছেলেদের জামা-প্যান্ট পরে মেরী রীড পথ হাঁটতেন। দুরন্ত ডানপিটে। সবাই দেখে বলত,—বাঃ। বেশ সেনাপতি-সেনাপতি ভাব ছেলেটির। ছেলে সেজেই মেরী রীড এক ফরাসী ভদ্রমহিলার কাছে চাকরী নিলেন। ফাই ফরমাস খাটবার চাকর। কিন্তু এই নিপাট ভালোমানুষী চাকরী ভালো লাগল না মেরীর। পুরুষের বেশেই মেরী চাকরী নিলেন এক রণপোতে। সেখানেও ভালো লাগল না। মেরী রীড চলে এলেন

মেরী রীড

সেনাদলে। ফ্লাণ্ডার্সের এক পদাতিক সৈন্য হলেন তিনি। মোহিনী নারী মন মেরী। ছদ্মবেশী এক পুরুষ সৈন্য। কিন্তু পদাতিক বাহিনীতে মন টিকল না মেরীর। পায়ে হেঁটে বেড়াতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাই মেরী রীড হলেন অশ্বারোহী সৈন্য। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে বেড়াবেন অশ্বচালনা করে। এই না হলে মন ভরে?

সৈনাদলে একজনকে দেখে ভালো লাগল মেরীর। হাজার হলেও নারী মেরী রীড। চিত্রাঙ্গদার মত ধনুর্বাণ হাতে নিলেই কি মনটাকেও ধনুকের মত বাঁকানো যায়? প্রেমের অঞ্জন লাগল মেরীর চোখে। এবং একদিন এক অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে মেরী তার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। বললেন তার ভালোবাসার কাহিনী। সৈন্য চমকে উঠে মেরীকে বললেন নারীর পোষাক পরতে। মেরী রীডকে বিয়ে করলেন তিনি। সলজ্জ বধূবেশ পরলেন মেরী, অশ্বারোহী সৈন্যের ঢাল-তলোয়ার ছেড়ে।

সৈন্যদলে সে এক হৈ-চৈ। আজব ব্যাপার। এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। দুই সৈন্যের বিয়ে হবে। মেরী রীডকে দেখবার জন্য সকলে ভীড় করল। যাই হোক মেরীকে সেনাবাহিনীর চাকরী থেকে ছুটি দেওয়া হলো। বিয়ে করে মেরী রীড স্বামীকে নিয়ে বাসা বাঁধল।

কিন্তু বিধাতা কুটিল। কিছুদিনের মধ্যেই স্বামী বেচারার মৃত্যু হল। মেরী রীড নারীর বসন ফেলে আবার পুরুষ সাজলেন। হল্যাণ্ডের এক সৈন্যদলে চাকরী হল তার। কিন্তু নানা কারণে সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা সহ্য হল না মেরী রীডের। মনের মধ্যে বড় জ্বলন্ত স্বামীর স্মৃতি। তাছাড়া এই কিছু সময় সুখে কাটিয়ে মেরী একটু আয়েসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই সৈন্য-দল ছেড়ে মেরী রীড গেলেন নাবিকের কাজে। তার জাহাজ যাচ্ছিল পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে। কিন্তু পথি-

মধ্যে ক্যাপ্টেন জন রেকাম জলদস্যুর দল নিয়ে জাহাজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আরো অনেকের সঙ্গে মেরী রীড বন্দী হলেন জলদস্যুর হাতে। কিন্তু রেকামের তখন লোক দরকার ছিল তার দলে। মেরী রীড কথাবার্তার সঙ্গে যোগ দিলেন জন রেকামের দলে। জলদস্যুবৃত্তিকে গ্রহণ করলেন মেরী।

কিন্তু হয়ত তার এই জলদস্যু জীবনের শেষ হত। কারণ বাহামার সরকার জল-দস্যুদের ক্ষমা করতে স্বীকৃত হলেন যদি জলদস্যুরা সভ্য সমাজে ফিরে এসে নাগরিক জীবন যাপন করতে রাজী হয়। ক্যাপ্টেন রেকম রাজী হলেন এই প্রস্তাবে। জল-দস্যুর দল নীলসমুদ্র ছেড়ে উঠল ডাঙায়। রেকামের সঙ্গে মেরী রীডও ছিলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন রেকাম বেশীদিন থাকতে পারলেন না। একঘেয়ে নাগরিক-জীবন তার কাছে রীতিমত কষ্টকর মনে হল, সম্ভবত সঙ্গী জলদস্যুর দল জলের মাছের মত ডাঙায় উঠে দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হয়েছিল। সুতরাং সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে জলদস্যু রেকাম আবার জলে নামলেন। নীল সমুদ্রের হাতছানি উপেক্ষা করে থাকা মেরী রীডেরও অসম্ভব মনে হয়েছিল।

বেশ কয়েকটি জাহাজ দখল করে নিল জলদস্যুরা। অধিকাংশই জামাইকার। দখলের পর কয়েকজন বন্দী যোগ দিল জলদস্যুর দলে। এদের মধ্যে এক যুবক এলেন রেকামের দলে নাম লেখাতে। মেরী রীডের ভালো লাগল একে দেখে। সুন্দর দেখতে ভদ্রলোক কিন্তু মেরী তার কাছে নিজের পরিচয় জানালেন না।

ইতিমধ্যে সেই নতুন যুবকের সঙ্গে এক জলদস্যুর বিবাদ উপস্থিত হয়েছে। নিয়মানুযায়ী দুজনকে উঠতে হবে ডাঙায় এবং সেখানে উভয়ের মধ্যে লড়াইয়ের নিষ্পত্তি হবে। ঘটনা শুনে মেরী রীডের বুকটা উঠল কেঁপে। সুন্দর যুবক যদি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অসমর্থ হয় জলদস্যুর হাতে? প্রেমের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল দুর্ভাবনায়।

মেরী রীড আর কালবিলম্ব করলেন না। প্রতিপক্ষ সেই জলদস্যুর সঙ্গে নিজেই একটা বিবাদ বাধিয়ে বসলেন। তখনই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে ফেললেন মেরী। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। পিস্তলের এক গুলিতে জলদস্যু তার হাতে প্রাণ হারাল।

জয়ী হয়ে মেরী রীড এলেন প্রেমিকের কাছে। অন্তরের প্রেম নিবেদন করলেন মেরী। এবং জানালেন যে পুরুষের বেশে তিনি এক প্রেমিকা নারী। দুজনে স্বীকার করে নিলেন দুজনকে। মেরী রীড একেই বিবাহের বন্ধন বলে স্বীকার করলেন।

দা লা ভেগাতে বিচার হয়েছিল মেরী রীডের। বিচারকরা তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। সুন্দরী এই রমণীকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে প্রাণ চায়নি তাদের। কিন্তু সাক্ষ্য-দানকালের একটিমাত্র উক্তিতে বিচারকদের মত পালটে যায়। তাদের কোমল মন মুহূর্তে কঠোর এবং রূঢ় হয়ে উঠেছিল।

শব্দের গাছ ।।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

ইজিচেয়ারে গা শুইয়ে
মন বসিয়েছিলাম কিচ্ছুনা-য়,
চোখ তুলতেই গেট, গেটের পাশেই আমগাছ,
গাছের অবিচ্ছিন্ন অবয়ব দৃষ্টিকে ডেকে নেবেই—
গাছের কিংবা তার প্রাচীরস্পর্শী ছায়ার—
একই কথা।

এখন কী মাস?
পাট-খড়ের ঘ্রাণ বলে দিচ্ছে হেমন্ত,
বেশ তাই।
এমন সন্দেহী ছায়া, এমন ইজেল-যোগ্য প্রশাখা
চোখ ভরে দ্যাখ,
পারো তো মনের মধ্যে এঁকে নাও।

দ্যাখ,
দেয়াল পার করে রোদকে আরো অবনতিতে
দিনমান ডিউটি বদল করলো,
এল দুপুরের জায়গায় বিকেল, তারপর
বিকেলের পিঠের ওপর উঠলো সন্ধ্যা
ছাইরঙের ওভারকোট গায়।
এখন সারা সংসারে গ্রাফিকের চেহারাই আলাদা—
ঘরমুখো।

আবার ইজিচেয়ারে গা, কানভাসে মাথা,
মাথার মধ্যে বিজড়িত ঘুম,
আর ঘুমের মধ্যে গেট,
গেটের পাশেই আমগাছ
(থাক, বিবরণের কী দরকার?)
গাছের অবিচ্ছিন্ন অবয়ব স্বপ্নকে ডেকে নেবেই—
গাছের কিংবা তার প্রাচীরস্পর্শী ছায়ার—
একই কথা।

একটা কাঠঠোকরা ডাকছে,
পড়শিদের আর কী করো? ভাবছিলাম।
হঠাৎ গেট, গাছ, ছায়া স্বপ্ন সব ডুবিয়ে
পাখি, পাখি, আর পাখি—
আসলে পাখি নয়, পাতাও নয়,
শুধু কিচিরমিচির, কিচিরমিচির, কিচিরমিচির।
কুজন্তং সবার আমগাছ, অবাক প্রতিমধুর সন্ধ্যা
শোনো।
গাছের শব্দ? না তা নয়,
অবিনাশী পরিপূর্ণ এক শব্দের গাছ।

প্রস্থান ।।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

চাঁদ ঘুরে মরে—পৃথিবী কেন্দ্রে থাকে,
পৃথিবীও করে সূর্য পরিক্রমা,
তেমনি নিয়ত তোমারি চতুর্দিকে
আমি ঘুরে যাব প্রতিদিন প্রিয়তমা।

আগ্রহ ছিল যদিও সিন্ধুরসে—
ভাবব না আমি পুরোনো সৈকতটিরে,
তবু সমুদ্র জোয়ারে জলোচ্ছ্বাসে
সব ডুবে যায় কৃষ্ণতিথির ভিড়ে।

যদি ফুল তুলে প্রতিদিন সাজি ভরে
টেবিলে রাখতে—জয়পুরী ফুলদানী
পূর্ণতা নিয়ে নিশ্চিত খুশী হতো
কত অসহায় অমর্ত্য রাজধানী।

আজ বিকেলের নিরালা অবাঞ্ছিত
আমার পৃথিবী সহসা কেন্দ্রচ্যুত
আমি ঘুরে যাই অন্য কিছুর টানে
আমার হৃদয় বেদনায় আপ্লুত।

জানলে না তুমি ভূকম্পনের কালে
আমি সরে গেছি অন্য ভূমণ্ডলে।

মানুষ যেখানে বাস করে তাদের রুচিবোধ সম্পর্কে আমরা অনেক সময় একটা পিঠ-চাপড়ানো উন্নাসিক ভাব প্রকাশ করে থাকি। এই অজ্ঞতা দূর করতে, তাদের রূপসৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা আনতে, আর তাদের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগাতে, তাদের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের নিজেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যেই একান্ত প্রয়োজন। পার্থিব বৈভবে আমরা অধিকাংশ এখনো দরিদ্র। কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যে এই রূপ আর রঙের সমারোহের উৎসটা খুঁজে বার করতে পারলে আমাদের অনেকখানি পাওয়া হবে।

●

ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ২৪শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১ই মার্চ তাঁদের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। এ'দের সভ্য-বৃন্দ এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগীদের পাঠানো ছবি নিয়ে ৬০।৭০ খানির মত একবর্ণ আর ৩০খানির ওপর রঙীন স্লাইডের পরিচ্ছন্ন প্রদর্শনীতে অনেকগুলি সুন্দর ফটোগ্রাফ দেখা গেল। কিছুদিন ধরে যেসব ট্রিক ফটোগ্রাফির একটা ঢেউ দেখা গিয়েছিল, বর্তমান প্রদর্শনীতে সেগুলি সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। সোজা সাদা-সিধে ছবি, যেখানে টোন, আলো আর কম্পোজিসনের দিকে দৃষ্টি রেখে রূপ আর আবহাওয়া সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, সে-ধরনের কাজেরই বাহুল্য দেখা গেল। সর্বভারতীয় বিভাগে বালকচন্দ্র দাস ও অরুণকুমার গাঙ্গুলীর তোলা দৃশ্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কে এন মাঙ্গ, দীপক মিত্র, অরুণাংশু মুখার্জি ও 'প' শর্মার প্রতিকৃতিগুলি বেশ উঁচু দরের। সভ্যদের মধ্যে সুব্রত চ্যাটার্জি, সমর ব্যানার্জি চমৎকার কাজ করেছেন। সারা প্রদর্শনীর ছবির নির্বাচন এবং নিম্নতম মানরক্ষার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

●

গোপাল সান্যাল আর্টস্ অ্যান্ড প্রিন্টস্-এ ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ই মার্চ পর্যন্ত ১৩খানি অয়েল এবং ড্রয়িং-এর প্রদর্শনী করলেন। শ্রীসান্যালের ইতি-পূর্বে যে-ছবি দেখেছিলাম, বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর পূর্বরীতির পরিবর্তন বিশেষ কিছু ঘটেনি। কেবল কয়েকখানি ছবিতে প্রকাশ কর্মকারের রীতির ছাপ অনেকখানি পড়েছে, যেমন 'ট্রেযার্স হেভন' বা 'ক্রাইস্ট বোর্ণ ডাউন ফ্রম দি ক্রস' ছবির নাম করা যেতে পারে। অধিকাংশ ছবিতেই দুঃখভারপ্রপীড়িত মানুষের বড় বড় চোখে স্তিমিত দৃষ্টি (এমন কি শিল্পীর জীব-জন্তু নিয়ে আঁকা কম্পোজিশনেও সেই একই দৃষ্টি দেখা যায়) যা দর্শকের অনু-ভূতিকেও স্তিমিত করে আনে। এছাড়া তিনি খৃস্টমূর্তিকেও তাঁর চিত্রের অন্যতম বিষয়-বস্তু করেছেন।

আধুনিক তরুণ শিল্পীদের অনেকের কাছে আজকাল খৃস্টমূর্তি এবং গীর্জা নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা দেখা যাচ্ছে। তবে এগুলি প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বা দর্শকদের

হংস (কেরালা)

মনে কতখানি মূল প্রোথিত করতে পারে, তা অনুমানসাপেক্ষ। ইউরোপের শিল্প-কলায় এই মূর্তি দীর্ঘকাল ধরে শিল্পীর এবং সমাজজীবনের মধ্যে অনুপ্রেরণা স্বাভাবিক কারণেই যুগিয়ে এসেছে। আমাদের শিল্পীরা একে হঠাৎ কোন একটা রেডিমেড কম্পোজিশন হিসেবে গ্রহণ করে বসছেন না তো?

●

এসপ্ল্যানেডের রেফুজি হ্যান্ডিক্রাফটের 'প্রদর্শিনী' গ্যালারীতে গীতাঞ্জলি আনন্দ, নীনা ভারমা এবং বীণা চন্দক—এই তিন মহিলা বারোখানি অয়েল পেন্টিং ৪ঠা থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত প্রদর্শন করলেন। এ'দের সকলের কাজই অ্যাকাডেমিক, তবে সাদামাটা ধরনের। বেশীর ভাগ ছবিই হয় কোন নিসর্গ দৃশ্য নয়ত দৈনন্দিন জীবনের কর্মরতা নারী বা কোন মহিলার প্রতিকৃতি। নীনা ভার্মার একটি স্টিল লাইফ এবং গীতাঞ্জলি আনন্দের একটি অয়েল স্কেচ উল্লেখযোগ্য।

●

দীর্ঘকাল পরে কেমোল্ড-গ্যালারীতে অরুণ বোসের প্রিন্টিং ও পেন্টিং-এর একটি প্রদর্শনী করা হল। ১লা থেকে ১১ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে সর্বসমেত ২৩খানি ছবি শ্রীবোস উপস্থিত করেন। ইতিপূর্বে এক যৌথ প্রদর্শনীতে তাঁর এই ধরনের কিছু ছবির নিদর্শন দেখা গিয়েছিল। প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিতেই কতকটা মুখোসের মত কতকগুলি মুখাকৃতি দেখা যায়, যার মধ্যে দিয়ে হয়ত বর্তমান জীবনের বিভিন্ন ধরনে নিপীড়নের মধ্যে বিভ্রান্ত মানুষের প্রতিকৃতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। "কুয়েশ্চন টেনসেস" "ট্রিপেন্টড হাই", "এলিয়েন চাইল্ড" প্রভৃতি ছবির মধ্যে এই ধরনটা পরিস্ফুট। অন্যান্য ছবিতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতীকের প্রয়োগ সুস্পষ্ট। গ্রাফিক শিল্পী হিসেবে শ্রীবোসের এই ছবিগুলির রং এবং রেখার মধ্যে হয়ত গ্রাফিকধর্মিতা একটু বেশীভাবে দেখা যাবে। কিন্তু কেবল সেইজন্যেই ছবির বিরুদ্ধ সমালোচনা হওয়া উচিত নয়। ডিজাইন, কম্পোজিশন এবং টেকনিকের দিকে যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন দ্বিধাসংকুচিত ভাব নেই। ●

—চিত্রনিক

বিদেশ প্রত্যাগত রবিশংকর

"আমি ঐতিহ্যচ্যুত-শিল্পী নই, হিপি-হিপিদের নায়কও নই, একান্তই ঐতিহ্যাশ্রিত ভারতীয় সঙ্গীতের সেবক।"

—রবিশংকর।

হেমন্তব্যাপী দীর্ঘ বিদেশ-সফর প্রত্যাগত পণ্ডিত রবিশংকর এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া বৈঠকে সাংবাদিকবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক বিতর্কমূলক প্রশ্নের জবাব দিলেন। সর্বশ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, অঞ্জিতা মুখোপাধ্যায়, ভূপেনশংকর, জগদীশ চট্টোপাধ্যায় এবং বিক্রম ঘোষ আয়োজিত সন্দর্ভে ভারতীয় পদ্ধতিতে সজ্জিত এই সভার আকর্ষণীয় ধূপ-দীপ আল্পনা ইত্যাদির ভারতীয় সৌন্দর্য মিঃ হফম্যান ও সম্প্রদায়ের। ইহারা রবিশংকরজীকে কেন্দ্র করে একটি তথ্য-সন্ধানী চিত্র-গ্রহণ করছেন এবং এই সভা সেই চিত্রের এক বিশেষ অংশ, মুগ্ধ করেছে।

অঞ্জিতা মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সভার উদ্বোধন ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদ সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করেছিলেন, কবিগুরু ভারতের কাব্য ও সাহিত্যকে বিশ্বের রসিকসমাজের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং ভারতীয় সঙ্গীতের অপরিমেয় ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যলোকের প্রতি বিদেশীর মুগ্ধদৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন—স্বয়ং রবিশংকর ও আলি আকবর। আজ বিদেশীরা শুধু এ সঙ্গীত শুনেই তুষ্ট নন, শিখতেও চান, এবং সেই কারণেই পণ্ডিতজী ও আলি আকবর খাঁ সাহেবকে অধিকাংশ সময় ওদেশেই কাটাতে হয়। এ গৌরব সারা ভারতবাসীর—এবং এ গৌরব অর্জনকারী দুইজনেই বাঙালী—এ সত্য বাঙালীর স্মরণ করবার মতো।

অন্যান্যবারের সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে এবারের তফাৎ হলো এই যে, এবার পণ্ডিতজী বিদেশীদের চিত্তবিজয়-কাহিনী সবিস্তারে দেশবাসীর গোচরে আনবার জন্য এই সম্মেলন আহ্বান করেননি। সাংবাদিকবৃন্দ আহূত হয়েছিলেন,—তাঁদের জিজ্ঞাসা এবং বিভ্রান্তকারী বহুল প্রচারিত গুজবদের সত্যাসত্য বিষয়ে অবগত হবার জন্য।

আমাদের প্রশ্ন ছিল বিটল-হিপি এবং 'টিন-এজার' সমাজের নায়কত্ব প্রাপ্তিই তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতির মানদণ্ড কিনা? ওদেশের সাধারণের রুচি ও সঙ্গীতজ্ঞ মহলকে ভারতীয় সঙ্গীত কতটা আকর্ষণ করতে পেরেছে? ওদেশের ভারতীয় সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বিদ্যা আয়ত্ত করে, এর মেজাজ ও বৈশিষ্ট্য পরিবেশন করা

সম্ভব কিনা? ক্রমাগত বিদেশী-শ্রোতাদের বাজনা শোনাতে গিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন বলে একটা অসন্তোষপূর্ণ অভিযোগ শোনা যাচ্ছে এ সম্বন্ধেই বা তাঁর বক্তব্য কি? ইত্যাদি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে পন্ডিতজী বললেন, ওখানের সমস্ত বড় বড় হলের বিরাট শ্রোতৃমন্ডলীদের কিছু অংশে হয়ত হিপি ও 'বিটল' থাকতেন। পন্ডিতজী বাজনার আগে ভারতীয় পরিবেশিতব্য রাগ তার মেজাজ ইত্যাদির বিষয় সংক্ষেপে বোঝাতে গিয়ে হিপি-বিটল-শ্রোতাদের প্রতি ঔদাসীন্য না দেখিয়ে তাদের মত করেও কিছু বলতেন যাতে সকল শ্রেণীর শ্রোতাই আপনাপন গ্রাহিষ্ণুতা অনুসারে সঙ্গীতের রসগ্রহণে সমর্থ হয়। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের খবর দিতে গিয়ে ওদেশের সাংবাদিক মহল—তাঁর বক্তব্যের অন্যান্য সকল অংশ বাদ দিয়ে—হয়ত বিশেষ করে হিপি-বিটল ও তরুণ সম্প্রদায়ের ওপরই বেশি জোর দিয়ে ক্যাপসন তৈরী করেছেন।

এজন্য ওদেশ এবং এদেশ উভয় দেশেই এমন সব **বিভ্রান্তকর মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য রবিশংকর দায়ী নন।** হিপিদের সম্বন্ধে তাঁর মত হলো এই যে, হিপি-সমাজে তাঁর সুবিপুল জনপ্রিয়তা মাত্র সম্প্রতিকালের ঘটনা। কিন্তু ইহুদি-মেনুহিন প্রমুখ ইউরোপের গুণী-সমাজে তাঁর সমাদরের আসন এ ঘটনার বহু আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রতি হিপিদের আকর্ষণের ব্যাপারটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং তার সম্পর্কিত প্রচার ঘটেছে বলেই এটাকে এতখানি প্রাধান্য দেবার কোনো কারণ নেই। কারণ এর জন্য মূলে পন্ডিতজীর দায়িত্ব ততখানি নয়, যতখানি দায়ী চমকপ্রিয় এক শ্রেণীর বিদেশী সাংবাদিক।

ব্যক্তিগতভাবে হিপিদের গুণকে তিনি যতখানি শ্রদ্ধা করেন ঠিক ততখানি অশ্রদ্ধা করেন তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-পদ্ধতিকে। যেমন সকল রকম মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের প্রবল আসক্তি এবং ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তাকে জড়িত করার প্রচেষ্টা। 'আমি বাজনার আগে স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল ভাষায় ঘোষণা করতাম, কোনোরকম নেশাচ্ছন্ন-দৃষ্টি চুলু-চুলু নেত্রে আমার বাজনার আসরে এলে বাজানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতীয় সঙ্গীত সাধনার বস্তু। মানুষের মনকে বাস্তবজগৎ থেকে ছিন্ন করে ভাবলোকে পৌঁছে দেবার সম্মোহনকারী শক্তি এ সঙ্গীতের মধ্যেই নিহিত। তার জন্য বাইরের কোনো উত্তেজক নিষ্প্রয়োজন। শিল্পী শ্রোতা উভয়কেই ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে এ বস্তু গ্রহণ করতে হয়।'

আবার 'হিপিদের মধ্যে প্রশংসাযোগ্য গুণ হলো তাদের 'জাগতিক' সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে বৈরাগ্যপন্থী হবার চারিত্রিক শক্তি, শান্তি ও প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা, যুদ্ধের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

বিট্‌ল-প্রসঙ্গে রবিশংকরজী বললেন, জর্জ আমার শিষ্য, আমার সঙ্গে ভারতে এসেছে, নিষ্ঠাভরে শিখছে—এ ছাড়া বিট্‌লদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। জর্জ যখন প্রথম আমার কাছে এসেছিল শিষ্যত্ব করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, আমি তেমন আমল দিইনি। ভেবেছিলাম এটা নতুনত্বের প্রতি মোহগ্রস্ত হুজুগ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু তার সত্যিকারের শেখবার তাগিদ, ভারতীয় সঙ্গীত ও দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং একাগ্রতা ও নম্র-মধুর স্বভাব আমায় মুগ্ধ করেছে। তার মানে এ নয়, বিট্‌লসমাজের প্রতি আমি আসক্ত বা তাদের সঙ্গে জড়িত। ইহুদি মেনুহিন ছাড়াও ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীমহলের পেডেরেস্কি, চোকার্নিন, ফিজে ক্রেইস্‌লার এবং পিউবিল ক্যাসল-এর মূল্যবান বন্ধুত্বলাভে ধন্য হয়েছি। মেনুহিন নিজেই আগ্রহী হয়ে ভারতীয় রাগের ওপর একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড করেছেন আমারই পরিচালনায়। সেই রেকর্ডেরই রেকর্ড-সেল হওয়ায় ওরা আগেকার হিজ-মাস্টার-এর মডেলের একটি স্বর্ণনির্মিত রেপ্লিকা আমায় উপহার দিয়েছেন। —(সুন্দর সেই বস্তুটি আমরা দেখলামও!)—চিন্তাশীল সঙ্গীতমহলকে আকৃষ্ট করতে পেরেছি কিনা এইটেই তার যথেষ্ট প্রমাণ বলে আমি মনে করি। ওদেশের তরুণ-সম্প্রদায় আগ্রহী, জিজ্ঞাসু, সৌন্দর্যানুরাগী—এবং সরল। সত্যিকারের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ পেলে পরিণত শিল্পী হয়ে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। ওরা শিখছে। আমরা প্রাথমিক ভিত্তি তৈরী করে দিচ্ছি—। ভারতীয় সঙ্গীত সাঁচাকার শিখতে হলে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। সে সময় দেবার এখনও অবধি ওদের অবকাশ হলো কই? যদি সে সুযোগ হয় পারবে না এমন কথা বলা যায় না। মিঃ হিগিন্‌স্ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে যে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, উদাহরণ হিসেবে সেইটেই যথেষ্ট।

ভারতীয় সঙ্গীতের '[illegible]' ভাঙার অভিযোগের উত্তরে পন্ডিতজী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—সঙ্গীত আমার ধর্ম। আলাউদ্দিন খাঁর মত ভারতীয় সঙ্গীতে ঈশ্বরসদৃশ গুরু পাবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে বলে আমি শুধু গর্ববোধই করি না, প্রতি মুহূর্তে সে কথা স্মরণে রাখি। তানসেনের বিরাট সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও বীণকারের শুদ্ধতা ও শুচিতাসমৃদ্ধ যে শিক্ষা গুরুর কাছে পেয়েছি তা থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি। শিল্পী হিসাবে আমার দুটি সত্তা—একটি সত্তা সেতার শোনায় এবং তা করে সে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতেই। অপর সত্তা স্রষ্টার কাজে উৎসাহী হয়ে চিত্রসঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা, ব্যালে রেকর্ডিং ইত্যাদি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়। স্রষ্টা হিসেবে আমার সকল এক্সপেরিমেন্ট সমানে সমাদর লাভ করবে একথা আমি বলতে পারি না। তবে বাজাবার সময় বিশেষ করে বিদেশী শ্রোতার আসরে আমি ভারতীয় পদ্ধতির দৃঢ়নিবদ্ধ শৃঙ্খলা থেকে একটুকুও সরে যাই না। তবে ওদেশের লোকদের 'ফাস্ট'-জীবন, সময় তাদের অল্প; তাছাড়া বাজাবার সময় দরজা বন্ধ হলে শেষ না হওয়া অবধি খোলাও হয় না। সেজন্যে এবং ভারতীয় সঙ্গীতে ওদের কান এখনো অনভ্যস্ত—এসব কথা চিন্তা করে প্রথম প্রথম বাজনার সময়কে সংক্ষিপ্ত করে ভাগ করে নিতাম। প্রথমে দ্রুত গৎ, তান, ঝালা—পরে বিলম্বিত শেষে আলাপ। ভারতীয় সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করতে হলে এটুকু উগ্রতা না কমিয়ে উপায় নেই। তবে দীর্ঘদিন চেষ্টার ফলে এখন ওদের কান তৈরী হয়ে উঠেছে। আমাদের এখানকার শ্রোতাদের মতই দেড় ঘন্টাব্যাপী আলাপ শোনার পিপাসাই শুধু এখন ওদের প্রবল নয়। আলাপ শুনে ওদের চোখে জলও আসে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলিউড বোল্‌-এ প্রায় আধমণ ধূপ পুড়িয়ে, উড়িষ্যার মন্ডপ আনিয়ে মঞ্চ তৈরী করে খোলা আকাশের নীচে ভারতীয় পদ্ধতিতে যে সঙ্গীতসভা হয়েছিল (তাতে ছিল, কর্ণাটিক মিউজিক, আমার, আলি আকবর ও বিসমিল্লার বাজনা) ওরা সারারাত ধরে সে চালিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু ব্যবস্থা করা যায়নি বলে তা চালানো হয়েছিল রাত দুটো পর্যন্ত। তাছাড়া ওদের মতো পঞ্চম সোয়ারী, ধামার, চৌতাল ইত্যাদি কঠিন তালের সঙ্গে নিখুঁতভাবে তাল দিয়ে শোনা দক্ষিণ ভারত ছাড়া এদেশেও দুর্লভ। এই আগ্রহ সঞ্চারের মূলে আমি ছাড়াও আলি আকবর, বিসমিল্লা এবং অন্যান্য শিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য।

সেদিন সাক্ষাৎকারের শেষে মনে হল, আজ উভয় দেশের মধ্যে সাঙ্গীতিক মেলবন্ধন গড়ে ওঠার মূলে আছে ওদের জানবার অদম্য আগ্রহ, গ্রহণশীল মন, সঙ্গীতের প্রাথমিক বনেদ (তা ক্লাসিক্যাল হোক) এবং পন্ডিতজীর বাজনার যাদু ছাড়াও [illegible], ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি নানা ভাষার ওপর দখল এবং ওদেশের বাখ, মোজার্ট প্রমুখ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে শুরু করে পপ অবধি সকল শ্রেণীর সঙ্গীতের সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য। এর জন্য রবিশংকরের কাছে আমাদের ঋণের অবধি নেই।

এই অভিমতের অনুষ্ঠানটির জন্যে পরিশ্রমী [illegible] মুখোপাধ্যায়, ধন্যবাদার্হ।

—[illegible]

প্রেক্ষাগৃহ

আমেরিকায় নতুন ঢেউ

ভারতবর্ষের পরাজয় ৩০

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৫ :

১৯৩২ : ১৫৮ রানে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
১৯৩৬ : ৯ উইকেটে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
: ৯ উইকেটে (৩য় টেস্ট, ওভাল)
১৯৪৬ : ১০ উইকেটে (১ম টেস্ট, লর্ডস)
১৯৫২ : ৭ উইকেটে (১ম টেস্ট, লিডস)
: ৮ উইকেটে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
: এক ইনিংস ও ২০৭ রানে (৩য় টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার)
১৯৫৯ : এক ইনিংস ও ৫৯ রানে (১ম টেস্ট, নটিংহাম)
: ৮ উইকেটে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
: এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে (৩য় টেস্ট, লিডস)
: ১৭১ রানে (৪র্থ টেস্ট, ম্যাঞ্চেস্টার)
: এক ইনিংস ও ২৭ রানে (৫ম টেস্ট, ওভাল)
১৯৬৭ : ৬ উইকেটে (১ম টেস্ট, লিডস)
: এক ইনিংস ও ১২৪ রানে (২য় টেস্ট, লর্ডস)
: ১৩২ রানে (৩য় টেস্ট, এজবাস্টন)

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮ :

১৯৪৭-৪৮ : এক ইনিংস ও ২২৬ রানে (১ম টেস্ট, ব্রিসবেন)
: ২৩৩ রানে (৩য় টেস্ট, মেলবোর্ন)
: এক ইনিংস ও ১৬ রানে (৪র্থ টেস্ট, এডিলেড)
: এক ইনিংস ও ১৭৭ রানে (৫ম টেস্ট, মেলবোর্ন)
১৯৬৭-৬৮ : ১৪৬ রানে (১ম টেস্ট, এডিলেড)
: এক ইনিংস ও ৪ রানে (২য় টেস্ট, মেলবোর্ন)
: ৩৯ রানে (৩য় টেস্ট, ব্রিসবেন)

জিওফ বয়কট

ডন ব্র্যাডম্যান

: ১৪৪ রানে (৪র্থ টেস্ট, সিডনী)

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৬ :

১৯৫২-৫৩ : ১৪২ রানে (২য় টেস্ট, বার্বাডোজ)
১৯৬১-৬২ : ১০ উইকেটে (১ম টেস্ট, ট্রিনিদাদ)
: এক ইনিংস ও ১৮ রানে (২য় টেস্ট, কিংস্টন)
: এক ইনিংস ও ৩০ রানে (৩য় টেস্ট, বার্বাডোজ)
: ৭ উইকেটে (৪র্থ টেস্ট, ট্রিনিদাদ)
: ১২৩ রানে (৫ম টেস্ট, কিংস্টন)

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১ :

১৯৬৮ : ৬ উইকেটে (২য় টেস্ট, ক্রাইস্ট চার্চ)

ভিনু মানকাদ

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

বিদেশের মাটিতে ভারতবর্ষের টেস্ট খেলার উদ্বোধন

বিপক্ষ দল	তারিখ	স্থান
ইংল্যান্ড	২৫ জুন, ১৯৩২	লর্ডস
অস্ট্রেলিয়া	২৮ নভেম্বর, ১৯৪৭	ব্রিসবেন
ওঃ ইন্ডিজ	২১ জানুয়ারী ১৯৫৩	পোর্ট অব স্পেন
পাকিস্তান	১ জানুয়ারী ১৯৫৫	ঢাকা
নিউজিল্যান্ড	১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮	ডুনেডিন

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	স্থান	বছর
ইংল্যান্ড	৫১০	লিডস	১৯৬৭
ওঃ ইন্ডিজ	৪৪৪	কিংস্টন	১৯৫২-৫৩
অস্ট্রেলিয়া	৩৮১	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
নিউজিল্যান্ড	৩০১	ডুনেডিন	১৯৬৮
পাকিস্তান	২৫১	লাহোর	১৯৫৪-৫৫

ভারতবর্ষের বিপক্ষে এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

বিপক্ষ দল	রান	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৬৭৪	এডিলেড	১৯৪৭-৪৮
ওঃ ইন্ডিজ	৬৩১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	কিংস্টন	১৯৬১-৬২
ইংল্যান্ড	৫৭১ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৩৬
নিউজিল্যান্ড	৫০২	ক্রাইস্ট চার্চ	১৯৬৮
পাকিস্তান	৩২৮	লাহোর	১৯৫৪-৫৫

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো ইনিংসের খেলায়)

ভারতবর্ষের পক্ষে

বিপক্ষে	রান	স্থান	বছর
অস্ট্রেলিয়া	৫৮	ব্রিসবেন	১৯৪৭-৪৮
ইংল্যান্ড	৫৮	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫২
ওঃ ইন্ডিজ	৯৮	ট্রিনিদাদ	১৯৬১-৬২
পাকিস্তান	১৪৫	করাচি	১৯৫৪-৫৫
নিউজিল্যান্ড	২৫২	অকল্যান্ড	১৯৬৮

নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়ী হয়ে ভেজা মাঠে ভারতবর্ষকে ব্যাট করতে পাঠান। বৃষ্টি এবং আলোর অভাবের দরুণ প্রথম দিনে মাত্র ৭৫ মিনিট খেলা সম্ভব হয়েছিল। লাঞ্চ এবং চা-পানের মধ্যে ১ ঘন্টা খেলা হয়। চা-পানের পর আম্পায়াররা মাঠ পরীক্ষা করে ঐদিনের মত খেলা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন। প্রথম দিনের ৭৫ মিনিটের খেলায় ভারতবর্ষ ২টো উইকেট খুইয়ে ৬১ রান সংগ্রহ করেছিল।

দ্বিতীয় দিনেও বৃষ্টির দরুণ খেলার অনেক সময় নষ্ট হয়। প্রথমত এক ঘন্টা দেরীতে খেলা আরম্ভ হয় এবং চা-পানের পর আর খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষ আরও দুটো উইকেট খুইয়ে ৮৯ রান যোগ করে। ভারতবর্ষের রান দাঁড়ায় ১৫০ (৪ উইকেটে)। পতৌদি ৩৭ এবং বোরদে ৮ রান করে খেলায় অপরাজিত ছিলেন।

তৃতীয় দিনে পুরো সময় খেলা হয়েছিল। ভারতবর্ষের ২৫২ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। ভারতবর্ষ এইদিন আর বাকি ৬টা উইকেটের বিনিময়ে ১০২ রান সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ফাস্ট-বোলার বার্টলেটের বলে অধিনায়ক পতৌদি ঠোঁটে খুব জোর আঘাত পেয়েছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি মুখে প্লাস্টার ব্যান্ডেজ বেঁধে খেলতে নামেন এবং দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫১ রান করেন। লাঞ্চের কিছু পরেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে নিউজিল্যান্ড খেলার বাকি সময়ে প্রথম ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ১০১ রান সংগ্রহ করেছিল। দুই স্পিন বোলার প্রসন্ন (১৮ রানে ২ উইকেট) এবং সুর্তি (৩২ রানে ২ উইকেট) নিউজিল্যান্ডকে নাজেহাল করে নিজ দলের প্রাধান্য বিস্তারে সহযোগিতা করেন। চা-পানের সময় নিউজিল্যান্ডের দুটো উইকেট পড়ে ৪৪ রান ছিল। চা-পানের পরবর্তী খেলায় আরও ৪টে উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৫৭ রান উঠেছিল।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১৪০ রানের মাথায় শেষ হয়। এই দিন তাদের বাকি ৪ উইকেটে মাত্র ৩৯ রান উঠেছিল। ফলে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের থেকে ১১২ রানের পিছনে পড়ে। চতুর্থ দিনের বাকি সময়ের খেলায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ২১৬ রান সংগ্রহ করে ৩২৮ রানে এগিয়ে যায়। সুর্তি ৮১ রান এবং বোরদে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকেন। সুর্তি ২১৬ মিনিটে তাঁর ৮১ রান তুলেছিলেন। ৫ম উইকেটের অপরাজিত জুটি সুর্তি এবং বোরদে ১১৬ মিনিটে দলের পক্ষে ৮৯ রান সংগ্রহ করেন।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে অধিনায়ক পতৌদি দলের ২৬১ রানের (৫ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই সময় ভারতবর্ষ ৩৭৩ রানে অগ্রগামী ছিল এবং ৩০০ মিনিট খেলার সময় ছিল। ভারতবর্ষ ৩৫০ মিনিট খেলে দ্বিতীয় ইনিংসের এই ২৬১ রান (৫ উইকেটে) সংগ্রহ করেছিল। টেস্ট ক্রিকেটে সুর্তিকে তাঁর প্রথম শতরান করার সুযোগ দিতে গিয়ে পতৌদি দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে দেরী করেছিলেন। সুর্তির দুর্ভাগ্য যে, তাঁর শতরান পূর্ণ হয়নি—তিনি ৯৯ রানের মাথায় আউট হন। সুর্তি শেষ পর্যন্ত নিজের ওপর আস্থা রেখে খেলতে পারেননি। তিনি তাঁর ৯৮ রানের মাথায় গ্যারী বার্টলেটের বল খেলে সেকেন্ড স্লিপে মার্ক বার্জেসের হাতে এক সহজ ক্যাচ তুলে দেন। বার্জেস সে ক্যাচ মাটিতে ফেলে দিলে তিনি সে যাত্রা খুব বেঁচে যান। কিন্তু বার্টলেটের পরবর্তী ওভারে সুর্তি তাঁর ৯৯ রানের মাথায় পুনরায় যে 'ক্যাচ' তুলেন তা শেষ পর্যন্ত মার্ক বার্জেসই ধরেন। সুর্তি ২৫৮ মিনিটের খেলায় ৯টা বাউন্ডারী সহ ৯৯ রান করেন। ৫ম উইকেটের জুটিতে সুর্তি এবং বোরদে দলের খাতে মূল্যবান ১২৬ রান তুলেছিলেন। বোরদে শেষপর্যন্ত ৬৫ রান করে অপরাজিত থাকেন।

নিউজিল্যান্ড ৩০০ মিনিটের খেলার সময় হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এদিকে খেলায় জয়লাভের জন্যে তাদের ৩৭৪ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চা-পানের কিছু পরেই মাত্র ১০১ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। প্রসন্ন (৪০ রানে ৪ উইকেট), বেদী (১৪ রানে ৩ উইকেট) এবং সুর্তির (৩৩ রানে ২ উইকেট) বোলিংয়ের সাফল্যের দরুণেই নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ১০১ রানে শেষ হয়েছিল। ব্যাটিং এবং বোলিংয়ে সমান কৃতিত্বের পরিচয় দেন সুর্তি—মোট ১২৭ রান (২৮ ও ৯৯) এবং ৬২ রানে ৪টে উইকেট (৩২ রানে ২ ও ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ব্যাটিং-বোলিংয়ের গড়

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে উভয় দলের পক্ষে নিউজিল্যান্ডের গ্রাহাম ডাউলিং সর্বাধিক মোট রান করেছেন এবং ব্যাটিংয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন—খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ০, মোট রান ৪৭১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৩৯ এবং গড় ৫৮·৮৭। ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাধিক মোট রান এবং ব্যাটিংয়ের তালিকায় উভয় দলের পক্ষে ২য় স্থান পেয়েছেন অজিত ওয়াদেকার —খেলা ৪, ইনিংস ৮, নটআউট ১ বার, মোট রান ৩৩০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪৩ এবং গড় ৪৭·১৪। উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন যথাক্রমে ভারতবর্ষের তিনজন খেলোয়াড়—৩য় স্থান রুসী সুর্তি (মোট রান ৩২১ ও গড় ৪৫·৮৫), ৪র্থ স্থান চান্দু বোরদে (মোট রান ২৪২ ও গড় ৪০·৩৩) এবং ৫ম স্থান ফারুক ইঞ্জিনীয়ার (মোট রান ৩২১ ও গড় ৪০·১২)। ভারতবর্ষের অধিনায়ক পতৌদির মোট রান ২২১ ও গড় ৩১·৫৭।

বোলিংয়ে উভয় দলের পক্ষে শীর্ষস্থান পেয়েছেন বাপু নাদকার্নী (২৩১ রানে ১৪ উইকেট ও গড় ১৭·১২)। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্রথম স্থান পান গ্যারী বার্টলেট (১১৬ রানে ১০ উইকেট এবং গড় ১১·৬০)। উভয় দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন ইরাপল্লী প্রসন্ন—৪৫১ রানে ২৪টি উইকেট (গড় ১৮·৭৯)। নিউজিল্যান্ডের ডিক মত নিজ দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পান—৪০০ রানে ১৫টি উইকেট (গড় ২৬·৮৬)।

টেস্ট সেঞ্চুরী :

নিউজিল্যান্ড (২) : গ্রাহাম ডাউলিং (২)— ১৪৩ রান (১ম টেস্ট, ডুনেডিন) এবং ২৩৯ রান (২য় টেস্ট, ক্রাইস্ট চার্চ)

ভারতবর্ষ (১) : অজিত ওয়াদেকার—১৪৩ রান (৩য় টেস্ট, ওয়েলিংটন)

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

টেস্টের সূচনা—নভেম্বর ২০, ১৯৫৫ (হায়দরাবাদ) : শেষ খেলা মার্চ ১২, ১৯৬৮ (অকল্যান্ড)

স্থান	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউজিল্যান্ড জয়ী	খেলা ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	৩	০	৬	৯
নিউজিল্যান্ড	৩	১	০	৪
মোট :	৬	১	৬	১৩

সিম্পসনের টেস্ট সেঞ্চুরী

ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বব সিম্পসন দুটি সেঞ্চুরী করেছিলেন—এডিলেডের ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসে ১০৩ রান এবং মেলবোর্নের ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ১০৯ রান। কিন্তু ৪র্থ টেস্টের শেষে সিডনী থেকে বিশ্বখ্যাত সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ পি, পি টি আই এবং ইউ এন আই টেস্ট সিরিজের আলোচনা প্রসঙ্গে সেঞ্চুরী রানের যে হিসাব দেয় তার মধ্যে সিম্পসনের ১ম টেস্টের ২য় ইনিংসের সেঞ্চুরীর (১০৩ রান) উল্লেখ ছিল না (১লা এবং ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের স্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্রষ্টব্য)। ফলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ভুল তথ্য অনেককেই বিভ্রান্ত করেছে।

কয়েকজন পাঠক এই ভুল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ক্রিকেট খেলায় তাঁদের নিষ্ঠা এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। ০

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৮শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 29th March, 1968 শুক্রবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রী[illegible]

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

উত্তর-চল্লিশের চিন্তা প্রসঙ্গে

পঁয়তাল্লিশ সংখ্যায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তর চল্লিশের চিন্তা' পড়ে ইতিমধ্যেই এই বেশ ভরা যৌবনেই কেমন হাবুডুবু খাচ্ছি। দিনে দিনে এই বয়সটার কাছাকাছি পৌঁছুচ্ছি, তাই ভাবনাটা ক্রমে জোরদার হচ্ছে। উত্তর-চল্লিশের চিন্তা সত্যি বড় মারাত্মক। পৃথিবীর এত রস, আনন্দ এই বয়সে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন মিইয়ে যায়। কোনমতেই সেই ফেলে-আসা দিনের স্বাদ আর তাতে পাওয়া যায় না। সে-উৎসাহ এবং উদ্যমও সম্পূর্ণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যে-কাজ কয়েকদিন আগেও হাসিমুখে করা যেত, এই মুহূর্তে আর তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব কথা ভেবেই বুঝি পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা উত্তর-চল্লিশে পৌঁছে পুরোপুরি আত্মনির্ভর হয়ে চটুল জীবন থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা করেন। এসব কথা ভেবেই হয়তো আমাদের দেশে নির্দেশ ছিল—পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ। আজকাল আর এ-নিয়ম মেনে চলার কোন প্রয়োজন কেউ বোধ করেন না এবং সেরকম সুযোগ-সুবিধারও অভাব।

কিন্তু উত্তর-চল্লিশের চিন্তা আজো আছে। ও-দেশে যেমন এ-দেশেও তেমনি। সবাই মোটামুটি এ-সময়ের মধ্যে নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আজকের আর্থিক সমস্যার দিনে চল্লিশের সবকিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ উত্তর-চল্লিশের চিন্তার বোঝা ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসে আছে।

বিনয় সান্যাল
কলকাতা-২৫

বাঙরেজ কালচার প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার ছেচল্লিশ সংখ্যায় সুরেশ চক্রবর্তী মশায়ের 'বাঙরেজ কালচার' পড়ে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলাম। বাঙালীদের একটি অংশ যে কিভাবে দিনের পর দিন ইংরেজি রুচির প্রতি আসক্ত হয়ে ক্রমশ বিকৃতরুচিসম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, এই লেখাটি পড়ে তা বেশ উপলব্ধি করা যায়।

দীর্ঘদিন ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ইংরেজী আদব-কায়দা আজো আমরা ছাড়তে পারিনি। বরং মজ্জায় মজ্জায় তার অনুপ্রবেশ আমাদের ব্যস্ত করে তুলেছে। ইংরেজি আদব-কায়দা এক বস্তু, আর তার অন্ধ অনুকরণ অন্য জিনিস। আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী আছেন যাঁরা চলনে-বলনে, বেশভূষায় পুরোপুরি ইংরেজ সাজতে চান। এঁদের অনেকের কাছেই ইংল্যাণ্ড দেশটার সঙ্গে পরিচয় নেহাতই ভূগোলের মাধ্যমে। আজ বরাত জোরে কারো ভাগ্যে হয়তো শিকে ছিঁড়েছে। এই ভাগ্যবানের দল খুব বেশি হলে মাস ছয়েকের জন্য বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন। বেশিদিন থাকলে খুব একটা অসুবিধা হতো না, কিন্তু এই কয়দিনে ইংরেজিয়ানা রপ্ত করতে গিয়ে একেবারে ইংরেজি কালচারের বিজ্ঞাপন সেজে দেশে ফিরে আসেন, নিজের স্বজাতীয়তার সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে। তিনি যে এককালের বাঙালী কুলোদ্ভবেরই একজন, তা বুঝতে বেশ কষ্ট হয়। আর কষ্ট হওয়ার মানেই তো তিনি সাহেবিয়ানার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন।

এ-রকম সাহেবদের মেজাজ এবং আচার-ব্যবহার ঠিক কোন পঞ্জি-পুঁথি ধরে চলে না। এদেশের সঙ্গে ঠিক কোন সমাজেরই মিল নেই। ইংরেজি অনুকরণে গড়ে উঠেছেন এই পরগাছার দল। এঁরা নিজেরাই নিজেদের সামাজিক নিয়মকানুন তৈরি করেছেন এবং সেভাবেই সমাজের বুকে চলাফেরা করেন।

এঁরা নিজেরাও জানেন না যে, ইংরেজি আদব-কায়দায় তাঁরা বিকৃত ফসিল এবং দেশীয় সংস্কৃতির পক্ষে তাঁরা নিছক জঞ্জালস্বরূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দেশে এঁরাই সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে অধিষ্ঠান করেন। আর তাঁদের চারপাশে স্তাবকদেরও অবধি থাকে না। বাংলাদেশে এই সব ইংরেজি কালচারের উচ্ছিষ্ট সেবীরা নিজেদের সীমিত বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে দেশীয় সংস্কৃতির পক্ষে লম্বা-চওড়া বুলি ঝাড়েন। যা বলেন তার শতকরা নিরানব্বইটি কথাই অর্থহীন প্রলাপের মত শোনায়।

'বাঙরেজ কালচার' নিবন্ধটি ইংরেজি ভাবাপন্ন বাঙালীদের চৈতন্যোদয়ে কিছুটা সাহায্য করবে বলে আশা করা যায়।

—অমিত দত্ত, হাওড়া—১।

পাখি প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৪৫ সংখ্যায় শ্রীউমা রায় লিখিত চিঠির জবাবে জানাই, শুধু খাদ্যের তাড়নাতেই পশ্চিম এবং হিমালয়ের অপর পারে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে আমাদের দেশে পাখি আসে না। পাখি দেশান্তরী বা পরিযায়ী হওয়া নিয়ে নানা মতবাদ আছে। কেবল শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে নয়, শ্রীউমা রায়ের অনুমানমতো খাদ্যসংগ্রহের সঙ্গে অবশ্যই কিছুটা যোগ আছে।

উত্তর গোলার্ধের অনেক পাখি কিন্তু খাদ্যাভাব ঘটবার আগে থেকেই সরতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্মকালীন দেশেও পাখি দেশান্তরী হয়, যদিও তার দূরত্ব খুব বেশি নয়। তা হয় সে-অঞ্চলে যখন কড়ক-পালি ফসলের ফলন বেশি হয় বলে।

উত্তর গোলার্ধের পাখি বেশি পরিযায়ী হয় বলে অনেকে মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক (প্লিসটোসিন) যুগের হিমবাহই এর কারণ। হিমবাহের দরুনে পাখিরা বাধ্য হয়েছিল দক্ষিণে সরে আসতে এবং বরফ সরে গেলে ফিরেছিল। প্রতি শীতে তারা মনে করে আবার বুঝি শীতযুগ এল। পূর্বপুরুষদের এই অভ্যাস এখনও তারা ছাড়ে নি।

প্রশ্ন জাগে অন্তঃস্রাবীর কোন গ্রন্থি বা কি এমন জিনিস তাদের প্রণোদিত করে ঠিক একইভাবে প্রতি বছর দেশান্তরী হতে? আমরা জানি এন্ডোক্রাইন গ্রন্থির ক্ষরণের জন্য পুরুষপাখি গান গায়, স্ত্রীপাখী ডিম পাড়ে এবং বাসা বাঁধবার সময় তাদের আভ্যন্তরিক অনেক কিছু বদলায়। সেসময় পার হয়ে গেলেও অন্যান্য বহু অদলবদল হয়। ঠিক এই সময়ে সাধারণত প্রায় সব পাখিই দেশান্তরী হয়। এর মধ্যে আলোর বদল একটা কারণ। বসন্তে ও গ্রীষ্মে আলোর জোর বাড়ে, কিন্তু হেমন্তে কমে। ঠিক সময় যখন আসে পাখি তখন তা কেন এবং তার হেতু কি তা বোঝে না, তবুও নিজ দেশ ত্যাগ করে দূর লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা করে। এমনও দেখা গেছে প্রতি বছর একই দিনে একই সময়ে তারা এসে পৌঁছেছে।

পাখির দেশান্তরী বা পরিযায়ী হওয়া নিয়ে বিদেশে অনেক গবেষণা হচ্ছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সঠিক কারণ নির্ণয় হয়নি।

নমস্কারান্তে
অজয় ঘোষ
কলকাতা : ১৭

অমৃত

সম্পাদকীয়

তরুণ সমাজ নিয়ে উদ্বেগ

তরুণদের ওপর আমরা বেশি আশা রাখি বলেই তাদের নিয়ে উদ্বেগও আমাদের বেশি। সমাজের সব স্তরেই আজ নানা কারণে বিক্ষোভের দেখা মেলে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং আশাভঙ্গের বেদনা থেকেই মূলত এই বিক্ষোভের সৃষ্টি। তবুও, বিশেষত ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা বিক্ষোভকে আমাদের একটু আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। কারণ, ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলাবোধ না থাকলে জীবনের পরবর্তীকালে সুসংবদ্ধভাবে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ নিয়ে সেই কারণেই শিক্ষাবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ ও সমাজ-হিতৈষীদের মনে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আমরা বর্তমান সংখ্যায় তরুণ সমাজের এই সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। পাঠকসাধারণ এ থেকে সমস্যাটির একটি চিত্র পাবেন আশা করি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের বহু সমস্যা আছে। ছাত্রসমাজের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতা ও বিক্ষোভ তার মধ্যে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোনো একটি বিশেষ রাজ্যে বা বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই সমস্যা সীমাবদ্ধ নয়। ভারতের প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই এই সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত। স্বাধীনতার আগেও ছাত্রসমাজ নানাবিধ আন্দোলন করেছে এ কথা সত্য। কিন্তু তখন নিজেদের বিদ্যায়তনের শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের আগ্রহের অভাব দেখা যায়নি। আজ দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি যে ছাত্রসমাজকে যে-কোনো দল যে-কোনো স্লোগান দিয়ে রাস্তায় নিয়ে আসতে পারে। তাতে বিদ্যায়তনের শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হলেও ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রতিবাদ ওঠে না।

কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিভাগের কর্তাব্যক্তি কেউই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাত থেকে আজকাল নিস্তার পান না। ছাত্রদের দাবী নানা রকম হলে তা সব সময়েই কর্তৃপক্ষের উচিত সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা। কিন্তু ছাত্ররা দলবদ্ধ হয়ে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যকে ঘেরাও করে যে-ভাবে দাবী আদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করছে তা কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে বিদ্যায়তনের শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে এবং ছাত্র-সমাজ সম্পর্কেও সমাজে দেখা দিচ্ছে হতাশা।

পরীক্ষার তারিখ পেছনোর দাবী তো আজকাল ছাত্রসমাজের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে মনে হয়। এই দলবদ্ধতার চাপে পড়ে বহু আগ্রহী ও মেধাবী ছাত্র নীরবে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তার কোনো প্রতিকার চোখে পড়ে না। এইভাবে গোটা ছাত্রসমাজেই শৃঙ্খলাহীনতা সংক্রামিত হচ্ছে।

রাজনীতির সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক থাকবে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বলা হয়ে থাকে যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তো ছাত্রদের রাজনীতিতে ডাক দেওয়া হত। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, সেটা ছিল দেশের মুক্তি-আন্দোলন। স্বাধীন দেশে ছাত্রদের দায়িত্ব অন্যরকমের, ঠিক প্রতিদিনের রাজনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কি খুবই অপরিহার্য? জানি এ প্রশ্ন করলেই তুমুল বিতর্ক উঠবে। পক্ষে এবং বিপক্ষে উকীলেরও অভাব হবে না। কিন্তু আমরা মনে করি, এদেশে ছাত্রমহলে বড় বেশি রাজনীতি চর্চা হচ্ছে। এর জন্য অবশ্য একা ছাত্ররা দায়ী নয়। শিক্ষামণ্ডলীর থেকে শুরু করে বিদ্যায়তন পর্যন্ত সর্বত্রই রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক। এতে ছাত্ররা নিরাসক্ত সুশীল সুবোধ বালক হয়ে দূরে থাকবে এটা আশা করা অযৌক্তিক। সুতরাং ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখার দায়িত্ব বড়দেরও। নইলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আদর্শের সংঘাত ছাত্রসমাজের ঐক্য ও শৃঙ্খলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে বাধ্য।

আমরা জানি এই শৃঙ্খলাহীনতার মূলে রয়েছে সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের দৈন্য। সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনের সময়ে ছাত্ররা 'ডিগ্রী চাই না, চাকরী চাই' বলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাষ্ট্রনেতা ও শিক্ষাবিদদের এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, কেতাবী শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ব্যবধান আজ দুস্তর। ডিগ্রী-ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভারতের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ছাত্রসমাজের মন থেকে হতাশা দূর করতে না পারলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়বে এবং এই বিক্ষোভ থেকেই জন্ম নেয় শৃঙ্খলাহীনতা। এর জন্য ক্ষতি শুধু ছাত্রসমাজের নয়, ছাত্রদের দিকে যাঁরা তাকিয়ে আছেন আশা নিয়ে, তাঁদেরও।

ছাত্রসমাজকে তাই চিন্তা করে দেখতে হবে যে, রাস্তায় বিক্ষোভ দেখিয়ে, পরীক্ষার হলে গোলমাল করে, অধ্যক্ষ-উপাচার্যকে ঘেরাও করে তাদের শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণ হবে কিনা। সমাজে যে সর্বব্যাপী হতাশা তা থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারে তরুণ সমাজ। তারাই ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা নিয়ে দূর করতে পারে এই অন্ধকার। সুতরাং তারা নিজেরা সংযত ও একাগ্রচিত্ত না হলে গোটা সমাজেরই ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেবে। দেশের সকলকেই বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে হবে।

এই সবের মূলে কারণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা। তার সমাধানকল্পেই তাঁরা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চলতে বাধ্য হয়েছেন। রাজনৈতিক পরিবর্তন না হলে ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থামা সম্ভব নয়। কিন্তু একদল ছাত্র যাঁরা রাজনীতির চেয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন তাঁরা এইসব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়াশোনার সর্বনাশ ডাকতে চান না। এঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। বারেবারে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার ফলে পড়ুয়া ছাত্ররা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে আমায় জানিয়েছেন। তবে অপর পক্ষ একথাও বলেছে যে, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে কেরোসিন অভাব, খাদ্যাভাব আন্দোলনে বহুবার ধর্মঘট হয় এবং ফলে লেখাপড়া ও ক্লাস কম হয়। সেই কারণে পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেবার পক্ষে তাঁরা আন্দোলন করেন। এইসব ব্যাপারে নাকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং উপাচার্য ছাত্র-নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করে থাকেন। ছাত্র-নেতাদের মতে তাঁদের সঙ্গে উপাচার্যের সম্পর্ক খুবই মধুর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতাদের কথায় এই বুঝেছি যে, তাঁরা প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দিতে চান, তারপর হল ছাত্রদের স্বার্থে ছাত্র-আন্দোলন। যেমন স্কলারশিপ, চিকিৎসা, আহার ও বাসস্থান, খেলাধুলো ও আমোদপ্রমোদ। এখানেই তফাৎ ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশের ও সমাজবাদী দেশের ছাত্রসংস্থার সঙ্গে।

ইউরোপের সোস্যালিস্ট দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংস্থার সংস্পর্শে আমি বহুবার এসেছি। সোস্যালিস্ট দেশেই দেখেছি তাঁদের ছাত্রসংস্থা ছাত্রদের মুখ্য সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, যেমন স্কলারশিপ, চিকিৎসা, আহার ও বাসস্থান, খেলাধুলো ও আমোদপ্রমোদ। তবে সুখের বিষয় ওঁদের ছাত্র-সংস্থা তাঁদের সরকারের কাছ থেকে সর্ববিষয়ে সহযোগিতা ও সাহায্য পেয়ে থাকে এবং উপরোক্ত সমস্যায় সরকার আগে এগিয়ে আসে। রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে আমি সোস্যালিস্ট দেশের ছাত্রদের মাথা ঘামাতে দেখিনি। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা রাজনীতি বোঝেন না।

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংস্থাগুলো ভিন্নধরনের। তারা আরও স্বাধীন। রাজনীতির অনেক দূরে তারা। তাদের ছাত্র-সংস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ হল ছাত্রদের স্কলারশিপের সংখ্যা বাড়ে আরও বাড়ে, পড়বার জায়গা ও হলঘরের সংখ্যা ও অধ্যাপকের সংখ্যা বাড়ে আরও বাড়ে তার জন্যে আন্দোলন। তারা নিজেরা সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে; চিকিৎসা হয় বিনামূল্যে, খেলাধুলো আমোদপ্রমোদের কোনো ত্রুটি করে না তারা। সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি। ফ্রান্স ও ইতালীতে বামপন্থী দলের জয়জয়কার। সেখানে তাদের দল বেশ শক্তিশালী। তাই বলে কিন্তু ছাত্র-নেতারা তাঁদের নিজেদের সমস্যার কথা না ভেবে বা আন্দোলন না চালিয়ে অনর্থক রাজনৈতিক আন্দোলনে বা ধর্মঘটে যোগদান করেন না। আমি তো তাই দেখেছি। আমি অনেকবার দেখেছি যে, কোনো রাজনৈতিক বিক্ষোভের সময় ছাত্র-ইউনিয়ন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে, কিন্তু ক্লাস বাদ দিয়ে ধর্মঘট করেনি। বরং ক্লাসের শেষে তাঁরা প্ল্যাকার্ড হাতে শোভাযাত্রা করে প্রদর্শন করে কোনো হলে মিলিত হয়ে বক্তৃতায় প্রতিবাদ-সভা ডেকেছেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে ক্লাস কামাই বা পরীক্ষার প্রস্তুতি স্থগিত রাখতে আমি কোনোদিন শুনিনি। রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে খুব বেশী ধর্মঘট করতে দেখিনি। প্রয়োজন হলে তাঁরাও ধর্মঘট ডাকতেন। তবে প্রতিদিন নয়।

কলকাতায় বিভিন্ন ছাত্রসংস্থার সংগঠনমূলক কাজের নমুনা দেখে বিস্মিত হয়েছি। এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে এক লাখ সত্তর হাজার ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-সংস্থার পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্রে রয়েছে মাত্র ডজনখানেক বেড। সেখানে থাকা উচিত ছিল তিন হাজার বেড। অন্ততঃ তা না হলেও তিনশ বেড থাকা উচিত ছিল। সে সম্বন্ধে কোনো প্রচেষ্টা চলেছে বলে আমার জানা নেই। ছাত্রদের সস্তায় মধ্যাহ্ন বা সান্ধ্যভোজের কোনো ব্যবস্থা আছে বলেও আমার জানা নেই। তবে ছাত্রনেতাদের কাছে শুনলাম যে তাঁদের প্রচেষ্টায় ছাত্রদের জন্যে বাসের ভাড়া কমাবার আন্দোলনে সার্থক হয়েছেন। বাস-ট্রাম-ট্রেনে ছাত্রদের জন্যে সস্তায় বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মনে করি।

বেকার ইঞ্জিনীয়ার : সংকট ও সমাধান

কল্যাণ বসু

বিপ্লব রায়, কমল চৌধুরী প্রমুখের কথা বলছি। অনেকটা পথ ছুটে এসে এরা থমকে দাঁড়িয়েছে। যে প্রতিশ্রুত সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের সব সংকল্প এরা রক্ষা করে এসেছে, হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সেই সম্ভাবনা মুছে গেল। পেছনে ফেরা—এদের স্বপ্নে নেই। অথচ মুখোমুখি সব কটি দরজা, সব কটি জানালা নির্দয়ভাবে চোখ বুজে রয়েছে।

হিসেবের খাতার হিসেবে এরাও সমাজের বোঝা। অন্য হাজারো বেকারের মত এরাও আজ বেকার। বেকার ইঞ্জিনীয়ার। বাপ-মা এবং সংসারের আর যারা অজস্র ত্যাগে দিনের পর দিন এদের সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এরা অক্ষম। অথচ, এ অবস্থার জন্য বিপ্লব, কমলদের দায়ী করা চলে না। অসংখ্য হাতুড়ীর ঘায়ে নিজেদের এরা প্রস্তুত করেছে। কিন্তু সমাজ এদের হাতে দেশ গড়ার হাতিয়ার তুলে দেয় নি। সমাজকে জেরা করলে সে দেখাবে সরকারকে, সরকার পরিকল্পনাকে এবং সব শেষে হয়ত শোনা যাবে বিদেশী আক্রমণ, দারিদ্র্য ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষিত দেশবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা হতে থাকে। এবং পণ্ডিত নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারাও এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ তৈরী শুরু হয়ে যায়। সেই একই সঙ্গে দেশের কর্ণধাররা শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনভিত্তিক করে তোলার কথা ভাবতে থাকেন। শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করা হল। কলেজ পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্রকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার সুপারিশ এল। সেই থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষাসহ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় শিক্ষাকেন্দ্র বেড়েই চলেছে। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে জীব-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ছাত্রদের বেলায়। এখন অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, এ অবস্থায় শিক্ষার সুযোগ কেন গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ এঁরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমাতে বলছেন, ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমাতে বলছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলোতে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমাবার প্রস্তাবও উঠেছে। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাব মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থনীতির সাময়িক চাহিদার মাপকাঠির বিচারে শিক্ষার সুযোগ গুটিয়ে নেওয়া অবাস্তব।

এ পথে সমস্যার সমাধান তো সম্ভব নয়ই, বরং ভবিষ্যতে সমস্যা জটিলতর হবে এবং প্রচুর অর্থের অপচয় হবে। কেউ কেউ উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিয়ন্ত্রণের কথা বলছেন। এ প্রস্তাবে যৌক্তিকতা থাকলেও জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে উমেদারের সংখ্যা কমাতে হলে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর ছাত্রদের সামনে চাকুরী, বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থার সুযোগ তুলে ধরা দরকার।

বিশ বছরে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি পরিসংখ্যান থেকে এ সত্যের কিনারা করা যায়। ১৯৪৭ সালে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। আজ সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিশ লক্ষ। কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার পেছনে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না। 'ইঞ্জিনীয়াররা শৌখিন, গৃহিণীদের মতই শৌখিন'—কোন কোন রাষ্ট্রনায়কের এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদে ইঞ্জিনীয়াররা বলেন, নিজেদের গাফিলতি ঢাকবার জন্যই রাষ্ট্রনায়কদের এ ধরনের কথা বলতে শোনা যায়। ক্ষুব্ধ একজন ইঞ্জিনীয়ার বললেন, "তাঁরা কি চান আমরা রাস্তায় রাস্তায় মোট বইব। দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার জন্যই আমরা নিজেদের তৈরী করেছি। কাজ না পেয়ে প্রয়োজনের তাগাদায় ও চাহিদায় অনেকে নেমেও এসেছেন। নিজেদের পরিচয় গোপন করে আমাদের অনেকে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতাও করছেন।"

অথচ, একজন ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করতে কি বিরাট খরচ ভাবতে পারেন? একজন ছাত্রের জন্য পাঁচ বছরে একটি পরিবারকে হাজার দশেক টাকা খরচ করতে হয়। খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এক-একজন ছাত্রের পেছনে পাঁচ বছরে সরকারের খরচ তিরিশ হাজার টাকার মত। খড়্গপুরের মত না হলেও অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা কেন্দ্রেও সরকারের বিরাট খরচ হয়ে থাকে। এত টাকার বিনিময়ে যে লোকশক্তি তৈরী হচ্ছে তা সুযোগের অভাবের অজুহাতে অনুৎপাদক করে রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

পশ্চিম বাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলো থেকে বছরে প্রায় ১৪০০ ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী পেয়ে থাকেন। একটি কেন্দ্রের হিসেব বর্তমান সমস্যার কিছুটা ধারণা দেবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সালে বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩৭০ ইঞ্জিনীয়ার ডিগ্রী পান। এদের মধ্যে যাঁরা চাকরী পেয়েছেন বলে হিসেব পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের সংখ্যা মাত্র ১০৬। সরকারের ডিভিশন্যাল ট্রেনিং, উচ্চশিক্ষা, বিদেশ সফর ইত্যাদি ব্যাপারে মোট ১২৫ জন নিয়োজিত আছেন। বাকী একশ' ছাত্রের খবর পাওয়া যায় নি।

ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইঞ্জিনীয়ারদের আরো কঠিন পরীক্ষায় বসতে হয়। ধৈর্যের পরীক্ষা। অ্যাপ্লিকেশনের পর অ্যাপ্লিকেশন। কোথাও কোথাও থেকে 'রিগ্রেট' পত্র আসে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে তাও নয়। সুবিধের কথা, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবেদনপত্র পাঠাতে বিশেষ ফী'র প্রয়োজন হয় না। কিন্তু হিন্দুস্থান স্টীল, দুর্গাপুরের ভারত হেভী ইলেকট্রিকস্, এফ-সি-আই প্রভৃতি সরকারী সংস্থায় আবেদনপত্র পাঠাতেই পাঁচ থেকে দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার দিতে হয়। জনৈক বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলাম। দু' বছর আগে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে পাশ করেছেন। চাকরীর আশায় দু' বছরে তিনি যত অ্যাপ্লিকেশন ছেড়েছেন তার সংখ্যা শ'-আড়াই। যখন কথা বলছিলাম তখনও তাঁর হাতে ছিল একটি অ্যাপ্লিকেশন। ডাকে ফেলতে চলেছেন। তেরটা ইন্টারভিউ পেয়েছেন। যে ক'টিতে গিয়েছেন, কোনটিই লাগে নি। প্রথম যেদিন ইন্টারভিউ দিতে যান, মনে ছিল, চাকরী তো হাতের মুঠোয়। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে ইন্টারভিউ ব্যাপারটা একেবারে ধোঁকাবাজী। দিনে ট্যুইশন করে রাতের পর রাত জেগে কি কষ্ট করে ডিগ্রী আদায় করতে হয়েছে ভদ্রলোক সে কাহিনী বলছিলেন। চাকরীর বিজ্ঞাপনের কথা উঠল। তিনি বললেন, খবরের কাগজে ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরীর যেসব বিজ্ঞাপন বেরোয় সে সবে প্রধান শর্ত 'পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক', কি 'দু' বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক'। কিন্তু সুযোগ না থাকলে অভিজ্ঞতা অর্জন কি করে সম্ভব? শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ প্রসঙ্গে জনৈক অধ্যাপক বললেন, ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং-এর দিকটায় আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। দেশের স্বার্থে এ ব্যাপারে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থাগুলোর আরো উদ্যোগী হওয়া উচিত। বে-সরকারী শিল্প সংস্থানগুলো ইঞ্জিনীয়ার ছাত্রদের ট্রেনিং-এর যে সুযোগ দিতেন তা ক্রমশই কমিয়ে আনছেন। ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য সরকারের যে এক বছরের ডিভিশন্যাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা আছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। শিবপুরে বি-ই কলেজের গত বছরের ৩৩০ জন ডিগ্রীপ্রাপ্তের মধ্যে মাত্র ১২০ জন এবং যাদবপুরের ৩৭০

সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-প্রসারও সমানভাবে প্রয়োজন। কিন্তু গত ছ' বছরের হিসেব দেখলে বোঝা যাবে ক্রমশঃ ভারতে শিল্প-প্রসার কিভাবে শ্লথ হয়ে পড়ছে। সে কারণেই ক্রমশ অর্থনৈতিক সংকট দেশ ছেয়ে ফেলছে। ছোট ছোট শিল্পপতিরা নতুন কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করতে চাইছেন না। এর ফলে মূল্যমানের প্রতিযোগিতায় টিঁকতে না পেরে ভারতীয় উৎপাদন দ্রব্যের রপ্তানী কমছে এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগও কমছে। কিন্তু সরকার সমস্যাটাকে অন্যভাবে দেখছেন আগামী দিনের দুশ্চিন্তায় তাঁরা নিজেদের ক্লান্ত করতে চাইছেন না। বিশিষ্ট শিল্পপতি শ্রী জি ডি বিড়লা একটি হিসেবে দেখিয়েছেন ভারতে শিল্পের প্রসার প্রতি বছর কিভাবে কমছে। এক এক বছরের এই শতকরা হিসেব তার আগের বছরের অনুপাতে তৈরী।

১৯৬১	+	৮·৪
১৯৬২	+	৮·৭
১৯৬৩	+	৮·২
১৯৬৪	+	৭·০
১৯৬৫	+	৫·৪
১৯৬৬	+	২·৫
জানুয়ারী থেকে মার্চ ১৯৬৭	+	০·২

(১৯৬৬ সালের আগস্ট-ডিসেম্বরের তুলনায়)

ভারী শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট শিল্পও দেশে বাড়তে থাকবে এবং এভাবে রপ্তানী, কর্মসংস্থান, সরকারী আয় এবং সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব।

ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থান সমস্যা সমাধানে নানান ধরনের প্রস্তাব আসছে। একটি প্রস্তাবে 'ওয়ান মিলিয়ন জব ফাউণ্ডেশনের' কথা বলা হয়েছে। এই ফাউণ্ডেশন নতুন ইঞ্জিনীয়ারদের দশ বছরের মেয়াদে ঋণ দেবেন ছোট ছোট শিল্প গড়ে তুলতে। এর আগে এদের শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হবে। তারপর শুধু ঋণ দিয়ে সাহায্যই নয়। প্রথম কয়েকটি বছর সরকারী ও প্রতিষ্ঠিত বে-সরকারী সংস্থাগুলোকে এদের জন্য অর্ডার সংগ্রহ করে দিতে হবে এবং এদের উৎপাদন বাজারে চালু করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতারাও [illegible] এখন এ ধরনের প্রস্তাবে সায় দিচ্ছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে গেলে [illegible] শিল্পের সংখ্যা আগে বাড়াতে হবে।

আলোচনায় ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের প্রধান কয়েকটি সমস্যা ফুটে উঠেছে। কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ার অবশ্য আরও একটি কারণের কথা বলছিলেন। তাঁদের ধারণা বহু শিল্প-সংস্থা এম-এস ডিপ্লোমা-প্রাপ্তদের দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের কাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কারণ তুলনায় এদের কম বেতন দিতে হয়। ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের দিয়ে কাজ চালিয়ে দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের বঞ্চিত করা নিশ্চয়ই অন্যায়। কাজ না পেয়ে যাঁরা বসে আছেন, এমন কয়েকজনকে দেখেছি টেকনিক প্রাইভেট কাজ করছে। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ খুব কম। আর্কিটেকচারাল, সিভিল ইত্যাদি কয়েকটি বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার ছাড়া খুচরো কাজ অন্যদের পক্ষে পাওয়া কষ্ট। অনেক আর্কিটেক্ট জানালেন, বাংলা দেশে এখনও আর্কিটেক্টদের প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ ধারণা তৈরী হয় নি। দিল্লী, পাঞ্জাব, আমেদাবাদ প্রভৃতি এলাকা আর্কিটেক্টদের যেভাবে 'প্রটেকশন' দেওয়া হয়েছে পঃ বঃ সরকার তার কিছুই করেন নি। এখানে বাড়ীর প্ল্যান করার ব্যাপারে বিশেষ নিয়মকানুন নেই। অনায়াভাবে অনেকেই আর্কিটেক্টদের প্রাপ্য সুযোগ নিচ্ছেন। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দোকান ও ছোট ছোট কল কারখানা বিপুল সংখ্যায় দুর্দিন পাওয়ায় ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারদের টেকনিক কাজ করার সুযোগ একেবারেই কমে গিয়েছে।

আলোচনায় শেষে উঠবার আগে হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ছে।

ভদ্র জীবনের প্রথম থেকে অর্থাৎ স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় থেকে [illegible] প্রত্যেকটা হোঁচট খেয়ে যখনই [illegible] দিকে তাকান হয়, [illegible] উত্তর—দেশের দারিদ্রের কথা [illegible] অবিরাম পরিশ্রম, কঠিন সাধনা ও [illegible] ভবিষ্যতের [illegible] দিয়ে এসে চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে [illegible] মনে হয় যেমনি [illegible] সম্পর্কে [illegible] দেখা দেয়। [illegible] ইঞ্জিনীয়ার [illegible] একই অবস্থা। তবে সর্বাধিক কথা [illegible] মন্ত্রী ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী [illegible] সম্প্রতি দেশের [illegible] ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের [illegible] কথা ঘোষণা করেছেন। [illegible] ইন্দিরা গান্ধীও [illegible] সপ্তাহের মধ্যে [illegible] ইঞ্জিনীয়ারদের কর্মসংস্থানের জন্য [illegible] পরিকল্পনা [illegible] ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং অন্যান্য জায়গায় সরকারের চাপে [illegible] দের হাতে কাজ দিয়ে এই সমস্যা সাময়িক মিটবে। কিন্তু একভাবে ভবিষ্যতের সমস্যা মিটবে কি? আগামী বছরগুলোতে যারা ডিগ্রী নিয়ে বেরোবেন তাঁদের কর্মসংস্থান? এর জন্য চাই সুদূরপ্রসারী চিন্তা ও পরিকল্পনা। প্রয়োজন জাতীয় [illegible] চাকাকে চালু করা অর্থাৎ মূল সমস্যার সমাধান অর্থাৎ শিল্প-প্রসারের গতি দ্রুত করা।
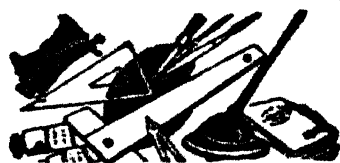
হয়েছিল, জনসাভেক লেখক ছাত্রদের প্ররোচিত করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আন্তর্জাতিক ইহুদী সংস্থা নাকি এই ছাত্র-বিক্ষোভে প্ররোচনা জুগিয়েছিল। কারণ বিগত মিশর-ইস্রায়েল যুদ্ধে পোল্যান্ড ইস্রায়েলের বিরোধিতা করায় তারা হয়তো এর সুযোগ নিয়েছিল। এই সংস্থা ওয়ারশর ইহুদী ছাত্রদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল এবং এসব ছাত্রই সাম্প্রতিক গোলযোগে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সন্দেহ আরো প্রবল হচ্ছে এজন্য যে, হাঙ্গামায় সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের অধিকাংশই হচ্ছে ইহুদী। আবার স্বল্পসংখ্যায়ী এই ছাত্র-হাঙ্গামা হয়তো বড়রকমের কোন শঙ্কার সংকেত। সে যাই হোক এর পিছনে বাইরের প্ররোচনা ও চক্রান্ত আছে না আরো বেশী গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে দেশের তরুণ ও বুদ্ধিজীবীরা এই শক্তিকে পুষ্ট করেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হঠাৎ পোল্যান্ডের ছাত্র-হাঙ্গামা সর্বাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করে। ছাত্রদের এরকম কঠিন আন্দোলন ইউরোপে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর দেখা যায় না। কিন্তু ছাত্র-বিক্ষোভের দিক থেকে কেউ বাদ যায় না। সব দেশের ছাত্ররাই নিজের নিজের দাবী নিয়ে আজ আন্দোলনের পথে নেমে পড়ছেন। দেশে দেশে বিক্ষোভের কারণ সঙ্গতভাবেই স্বতন্ত্র। পূর্ব-ইউরোপের কথা বাদ দিলে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিও একইভাবে ছাত্র আন্দোলনের শিকার হচ্ছে। এই ছাত্র-আন্দোলনের হাত থেকে আমেরিকারও রেহাই নেই। এদেশের রাজ্যে রাজ্যেও লেগে আছে অবিরাম ছাত্র-বিক্ষোভ এবং অশান্তি। বিশ্বের প্রবহমান ঘটনাস্রোতের দিকে তাকিয়ে এই ছাত্র-বিক্ষোভের মূল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা প্রচণ্ড অসহায়তার মনোভাব ফুটে উঠেছে ছাত্র-বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে।

আজকের সভ্য দুনিয়ায় সর্বাধিক নিন্দিত বর্ণবৈষম্য নিয়ে আমেরিকার ছাত্রদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। ছাত্রদের একটা বিরাট অংশ বর্ণবৈষম্য সমর্থন করে চলেছে এবং সম্প্রতি যখন আইনের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রদের প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয় তখন আমেরিকার অনেক রাজ্যেই ছাত্র-বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এই বিক্ষোভ একেবারে প্রশমিত হয়েছে বলা চলে না। বরং তুষের আগুনের মতো তা ধিকি ধিকি জ্বলছে এবং সময়ে সময়ে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠছে। বর্ণবিদ্বেষী ছাত্রসমাজ [illegible] একেবারেই [illegible] মাধ্যমে [illegible] প্রকাশ করে চলেছে।

সম্প্রতি এই আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। প্রায় এক হাজার ছাত্র আকস্মিকভাবে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েন। তাঁরা কর্তৃপক্ষকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় জবরদখল করেন এবং নিগ্রো প্রাধান্যযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর বারান্দায় বসে পড়ে বিক্ষোভ জানাতে থাকেন।

নব-কলেবরে এই আন্দোলনের সূচনা হয় কয়েকদিন আগেই অশিষ্ট আচরণের দায়ে সাইটিংকে ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কৃত করেন। বিক্ষোভকারী ছাত্রদের দাবী সমস্ত আন্দোলনের দায় থেকে এই ছাত্রদের অব্যাহতি দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের এই দাবী মেনে নিতে পারেননি। তাই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিজেদের হাতে নিয়েছেন। নিরুপায় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো ছাত্রদের [illegible]

[illegible]

পবিত্র আশ্রম

দীপক চৌধুরী

প্রায় দশ বছর আগে হোটেলটা খুলেছিলেন পবিত্রবাবু। নাম দিয়েছিলেন পবিত্র আশ্রম। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের পূব দিকে একটা দোতলা বাড়ির ছাদের ওপরে সাইনবোর্ডটা আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। বেশ বড় সাইনবোর্ড। সকলেরই চোখে পড়ে। রাত্রিবেলা সাইনবোর্ডের চার কোণায় চারটে আলো জ্বলে। এমন-ভাবে জ্বলে যেন আলোগুলো যাত্রীদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। অনেকেই হয়তো আপনারা পবিত্র আশ্রমে দু-এক রাত বাস করেছেন। পবিত্র আশ্রমের মালিক পবিত্র চাটুজ্জের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। বড় ভাল লোক। সবার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলেন। প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। কার কি অসুবিধে হচ্ছে তার খোঁজ-খবর রাখেন। রান্নাবান্না পছন্দ হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধেও সকলের মতামত জানতে চান। বলেন, 'সকলের মুখের স্বাদ তো একরকম নয়। বলবেন, অসুবিধে হলে বলবেন।' তার ফলে প্রতিদিনই স্থায়ী বাসিন্দারা বলতেও আরম্ভ করল। এক নম্বর ঘরের নরেশবাবু প্রতিদিনই বলে পাঠান যে, পোনা মাছ খেলে তাঁর বদহজম হয়। কই কিংবা মাগুর মাছের ঝোল খেলে তিনি সুস্থ থাকেন। নিয়মিত অফিসে গিয়ে সরকারী কাজ-কর্ম করতে পারেন। কাজেই করতে হয় না। তিন নম্বর ঘরের অনাথ মিত্র রেল কোম্পানীর কেরানী। অল্প বয়স। সে ছোট পোনা খেতে পারে না। রেল সম্পর্কে প্রতিদিনই তাকে ফাইল ঘাঁটতে হয়। রেল-ওয়ালা পাকা পোনা না খেলে তার গা গুলোয়। পাঁচ নম্বর ঘরের তারিণী পণ্ডিত ঠাকুরের ভক্ত। তিনি বলেন, 'মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি মশাই। দুবেলা দু-গেলাস করে খাঁটি দুধ দেবেন।' গত পাঁচ বছর থেকে একই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি। মাছ-মাংস ছাড়েন নি। দু-গেলাস করে নিয়মিত দুধ পান করে যাচ্ছেন। তার জন্য বেশি টাকা তিনি দেন না। সকলেই সুখ্যাতি করেন পবিত্রবাবুর। তাঁর মতো সৎ লোক পৃথিবীতে আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হোটেলের মালিকদের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়।

তারিণী পণ্ডিত বলেন 'এসব হচ্ছে ব্যবসার কৌশল। আমরা তাঁর স্থায়ী বাসিন্দে। হোটেলের আসল সাইনবোর্ড হচ্ছি আমরা। এখানে আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাস করছি বলেই তো লোকজন বিশ্বাস করে এখানে আসে। মাছ-মাংস ছেড়ে দিচ্ছি মশাই। দু-গেলাস দুধের সঙ্গে পোয়াটেক ছানাও দেবেন। কেন দেবেন না? আমরা তাঁর বিজ্ঞাপন। এটা বিজ্ঞাপনের যুগ। লাখ লাখ টাকা খরচ করেন [illegible]। কেবল পবিত্র চাটুজ্জে আমাদের জন্য এ পয়সা খরচ করছেন।'

দশ বছর আগে হোটেলটা খুলেছিলেন পবিত্রবাবু। তখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ। এখন বত্রিশ। সুন্দর ছিলেন। চেহারা ছিপছিপে ধরনের মানুষ। এখন তাঁর চেহারা [illegible] হয়েছে। [illegible] একা চলাফেরা করতে পারেন না। সেইজন্য একতলাতে নেমে এসেছেন। সেখানেই অফিস, সেখানেই শোবার ঘর।

মাঝে মাঝে বড় অস্থির। শিলিগুড়ি রেল স্টেশনের দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কাটান, দিন কাটান একা একা। দশটা বছর কাটিয়ে দিলেন। ঐ দিকে চেয়ে থাকেন আর কি যেন ভাবেন। ভাবছেন গত দশ বছর থেকে। ঐ শিলিগুড়ি রেল স্টেশন থেকেই মিনতি পালিয়ে গিয়েছিল।

তখন তাঁর বয়স ছিল বাইশ। অটুট স্বাস্থ্য। মালদা থেকে এসেছিলেন পরেশ মুখার্জির মেয়েটিকে বিয়ে করতে। সামাজিক বিয়ে। [illegible] ছাড়াও নগদ তিন হাজার টাকা হাতে পেয়েছিলেন। পরেশবাবু একজন শিলিগুড়ির মাঝারি ধনিক। দিতে তাঁর কষ্টও হয় নি। জামাই হিসেবে পবিত্র চাটুজ্জের দাম ছিল বাজারে। পিতার একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকে পিতৃহীন। সংসারে শুধু মা রয়েছেন। তার

তোমার সে-ছেলেও আছে। বললে গোপীনাথ।

সে আছে? সে থাকলে আমার কত কাজ করত। তুমি করবে? গোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠল।

বলো কী কাজ?

তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে?

যখন বলছ নিশ্চয়ই করব। তুমি আমার বাবা, তোমার আদেশ আমি অমান্য করব না। গোপীনাথ আশ্বাস দিল।

গোবিন্দ দেহত্যাগ করলে বিগ্রহের পাদপদ্মে দিয়ে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝরতে লাগল। পিতার মৃত্যুতে ছেলে শোকার্ত হবে না? ছেলে কি পাষাণ?

নতুন সেবায়েতকে স্বপ্ন দেখাল গোপীনাথ।

গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচ পালন করব আর হবিষ্যান্ন খাব। আমাকে স্নান করিয়ে কাছা পরিয়ে দাও। আমি আমার পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছি, আমি তার শ্রাদ্ধ করব, পিণ্ড দেব তিল হাতে। সব বন্দোবস্ত করো।

স্বপ্ন কথা সকলকে বললে সেবায়েত।

গোবিন্দের শ্রাদ্ধবাসরে সে কী ভিড়! গোপীনাথকে কাছা পরিয়ে আনা হল সভায়। আনন্দের কোলাহল পড়ে গেল চারদিকে। তিল হাতে গোপীনাথ গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিল।

একেই বলে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো।

নিজের ছেলে বেঁচে থাকলে সে আর ক বছর শ্রাদ্ধ করত? গোপীনাথের মতন যে ছেলে সে আবহমানকাল রাখতে পারে প্রতিশ্রুতি।

প্রতি বছর চৈত্র মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে আসছে।

(৭৪)

কালিদাস

গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাসও এসেছে নীলাচলে।

কে কালিদাস?

রঘুনাথদাস গোস্বামীর জ্ঞাতি-খুড়ো—বয়োবৃদ্ধ—সরল, উদার, মহাভাগবত। কৃষ্ণনাম ছাড়া আর কিছু বলে না। কাউকে যদি ডাকতে হয়, হরেকৃষ্ণ বলে শব্দ করে, কাকে ডাকছে সম্বোধিত লোক বুঝতে পারে চাইতে। কী চাই, কী করতে হবে তাও ঐ হরেকৃষ্ণ শব্দ থেকেই বোঝা যায়। তার সমস্ত ব্যবহারের কৃষ্ণনামই একমাত্র সংকেত।

এমন কি যখন পাশা-খেলায় দান ফেলে তখনো কালিদাস বলে ওঠে হরেকৃষ্ণ।

আর কী করে?

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে। এই তার আবাল্য সাধন।

কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সে বৈষ্ণব বাড়িতে যায়, গিয়ে বলে, উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব কৃতার্থ হয়ে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয়, কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব, কিন্তু জাতিতে ভুঁইমালি। তার বাড়িতে কতগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুরও তার স্ত্রীকে আম দিয়ে প্রণাম করল। কতক্ষণ বলল কৃষ্ণকথা।

ঝড়ুঠাকুর বললে, আমি নীচ জাতি আর তুমি সংকুলোদ্ভব অতিথি—বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব? আদেশ করো কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার আহারের ব্যবস্থা করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভুক্ত চলে যাও, তাহলে আমি বাঁচব না।

কালিদাস বললে, ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমাকে দর্শন করে পবিত্র হতে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, তোমার পদরজ দাও, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।

ঝড়ুঠাকুর অস্থির হয়ে উঠল। বললে, ছি-ছি, এ কী কথা, একথা বলতে নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি এমন অসংগত প্রার্থনা করো না।

কিন্তু শাস্ত্র কী বলেছে? শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাল কালিদাস: চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সুতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র জ্ঞান করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে আমারই মত পূজ্য। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন এমন চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র করতে পারেন কিন্তু সেই বহুগর্বিত ভূরি-মান ব্রাহ্মণ তা পারে না।

ঝড়ুঠাকুর বললে, হ্যাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিন্তু আমার সেই ভক্তি কই? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভক্তির কানাকড়িও আমাতে নেই।

কালিদাস আর কী করে, ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেলে ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে।

তারপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মনে-মনেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নিবেদন করল। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে আম খেয়ে আঁটি আর খোসা ফেলে দিল আস্তাকুঁড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চুপি-চুপি সেখান থেকে চোষা আঁটি কুড়িয়ে নিয়ে চুষতে লাগল। আনন্দে প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগন্নাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ। সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশ সিঁড়ির কপাটের আড়ালে একটা গর্ত আছে, সেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোন। পা ধুয়ে পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে। গোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেউ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভু যেদিন পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে এসে দাঁড়াল। এক-একে তিন অঞ্জলি জল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভু তাকে বারণ করলেন। বললেন, আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।

প্রভু জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে দুর্লভ তাই পাইয়ে দিলেন তাকে। বুঝিয়ে দিলেন, শুধু বৈষ্ণবনিষ্ঠাতেই ভগবানের মহৎ কৃপা লাভ করা যায়।

দর্শনান্তে প্রভু ঘরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহির্দ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা লজ্জা ছেড়ে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কৃপার অধিকারী হয়। কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহাপ্রসাদ।

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল।।

এই তিনের সেবা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু ধ্যানযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের অবলোকন হয় না। সাধুদের চরণধূলির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ।

কালিদাসই তার সাক্ষী।

(৭৫)

ভাগবত আচার্য

আসল নাম রঘুনাথ, উপাধি ভাগবতাচার্য। উপাধি প্রভুর দেওয়া।

গৌড় এসে আবার নীলাচলে ফিরে চলেছেন প্রভু, পথে বরাহনগরে এক মহাভাগ্যবান ব্রাহ্মণের ঘরে এসে উঠলেন। সে ব্রাহ্মণ রঘুনাথ। তার একমাত্র গুণ—সে ভাগবত-পাঠে সুশিক্ষিত।

প্রভুকে পদার্পণ করতে দেখেই রঘুনাথ ভাগবত-পাঠ করতে শুরু করল।

সম্বর্ধনার সবচেয়ে বড় আয়োজন—ভাগবত-পাঠ।

প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। নৃত্যের সঙ্গে কখনো-কখনো হুঙ্কার-গর্জন। কখনো বা আকুল অশ্রুধারা। বাহ্যস্মৃতি হারিয়ে রাত্রি তিন প্রহর পর্যন্ত চলল এই নৃত্যাবেশ। পরিশেষে একটু সুস্থির হয়ে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কারু মুখে এমন ভাগবত পড়া শুনিনি। আজ থেকে তোমার নাম হল ভাগবতাচার্য। ভাগবত পড়া ছাড়া আর তোমার কোনো কাজ নেই।

শুধু ভাগবতপাঠেই কৃষ্ণপ্রেম।

ভাগবতাচার্য গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। শ্রীপাট বরাহনগরে।

(ক্রমশ)

জলসা

রবিশংকরের উল্লেখযোগ্য সেতার অনুষ্ঠান

এবারের গৌরবময় বিদেশ সফরের পর পণ্ডিত রবিশংকরের বাজনা প্রথম শোনা যায় রবিশংকর সম্বর্ধনা-সভা-আয়োজিত রবীন্দ্রসদনের এক সান্ধ্যসভায়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার তরফ থেকে দোষত্রুটি অবশ্যই ছিল। সাংবাদিক মহলের ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। তবু উল্লেখযোগ্য এই কারণে এখানে আমরা সাংবাদিক মহলে রবিশংকরের উক্তির সার্থক প্রমাণ পেলাম। উক্তিটি ছিল : "বিশ্বাস করুন গুরুর কাছে তানসেন ঘরানার বীণকার ঐতিহ্যসম্পন্ন যে শিক্ষা আমি পেয়েছি, তা থেকে আমি এতটুকুও বিচ্যুত হইনি।"

সত্যিই হননি। সেদিনের আলাপ শুরু "শ্রী" রাগ দিয়ে। ঐ রাগেই ১১ মাত্রার তালের একটি গৎ বাজিয়ে, চলে গেলেন "দেশ" রাগে। শেষকালে ধুনের অংশে পরিবেশিত রাগমালার বিচিত্র সমন্বয়। আলাপের বিলম্বিত অংশে বারবার তার নেমে যাওয়া বা যে কোন কারণেই হোক পণ্ডিতজীকে কিছু বিব্রত দেখা গেল। হয়ত সেইজন্যই জমে উঠতে কিছু দেরী হয়। কিন্তু জমে যখন উঠল। বিশেষ জোড়ের অংশে। তখন পণ্ডিত রবিশংকরের বাজনা বলে চিনতে ভুল হয়নি। 'শ্রী' শুদ্ধ এবং বিশাল রাগ অন্যতম ঠাটও বটে। সরল, মপসা এই আরোহী বজায় রেখে—এই রাগ পরিবেশন করা অনেক শীর্ষস্থানীয় শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় না এবং 'পূরিয়া ধানেশ্রী'র সংগে এই রাগকে এক করে ফেলেন। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত আরোহী, অবরোহী অব্যাহত রেখে রাগের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ও শান্তির ভাব যেভাবে সঞ্চারিত করেছেন তা তাঁর মত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। পূর্বোক্ত প্রধান এই রাগের মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে সুরের বিস্তারে রেখাব অলংকারের পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্যের সমন্বয় বিশেষ অবরোহী গমকের সুগম্ভীর নাদধ্বনি ভোলবার নয়। ১১ মাত্রার গতের ছন্দবৈভবেও রাগের ভাবে চাঞ্চল্য লাগেনি।

তবু বলব এই রাগে বুদ্ধিদীপ্ত যতখানি আবেগের আবেদন ততটা নয়। এ ক্ষতিপূরণ ঘটেছে "দেশ"-এ।

তিনটি রাগই খেয়ালের অংগে। কিন্তু একঘেয়েমো বা পুনরাবৃত্তিমূলক নয়। গানের আস্থায়ী, সঞ্চারী আভোগের মত খেয়ালেরও ধ্রুপদ, কলাবন্তী ও ঠুংরির এই তিনটি অংগে তিন রাগে পরিবেশিত। "শ্রী" রাগে ধ্রুপদাংগের "ডিরিডিরি" "দেশ" এ কখন যে "সপাট"এর 'ভারা ভারা' হয়ে গেল টেরই পাওয়া গেল না। তারপর দাদরা ছন্দের দুলে থেকে অতিদ্রুত পরধুনের ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে আবার তিনতালে গৎ ধরা এমন এক রোমাঞ্চের সৃষ্টি করেছে—যার মধ্যে আল্লারাখার মত তবলচির অবদান কম নয়। দ্রুততম গতিতেও ঠেকার স্পষ্টতার মজা ভোলবার নয়।

ডোভার লেন মিউজিক সমরী

ডোভার লেনের ছোট্ট জলসায় শিল্পী শ্রীকমলেশ মিত্রের "তবলাতরংগ"কে উপস্থিত করা হয় এমন সময়, যখন শ্রোতারা সব এসে পৌঁছুতে পারেননি। "তবলাতরংগ" উদয়শংকরের প্রাক্তন সংগীতপরিচালক শ্রীবিষ্ণুদাস সিরালীর পরে এমন সুসংগত ও উপভোগ্য করে বাজাতে কোনো শিল্পীকেই শোনা যায়নি। এই পর্যায়ের অনেক কৌশলতম সংস্করণ বা অনেকটা অনুকরণেরই শামিল হয়ে যা কেউ বাজিয়ে থাকেন তবে তার মধ্যে সত্যিকারের শিল্প, প্রতিভা অথবা অভিনব শৈলীর কোনো স্বাক্ষরই থাকে না। দ্বিতীয়তঃ "তবলাতরংগ" বলতে কি বোঝায় অনেকেই তা জানেন না যেমন জানেন না এই বিরল প্রতিভার সম্বন্ধে। তাছাড়া উদয়শংকরের সংগে বিদেশ সফরকালে শ্রীমিত্র ওদেশের বিদগ্ধ সংগীতজ্ঞ মহলের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেন। যে ক'জন শ্রোতা সেদিন তবলাতরংগে তাঁর "চিরবাণী" রাগ শুনেছেন তাঁরা শুধু মুগ্ধই হননি। তাঁদেরই বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিত রবিশংকরের সংগীতানুষ্ঠানের পর শ্রীমিত্রকে আবার আসরে বসতে হয়েছে। দ্বিতীয়বারে ইনি শোনালেন "মোহিনী" এবং শ্রোতাদের বিশেষ আগ্রহে রামপ্রসাদী সুর বাজিয়ে সহর্ষ করতালির মধ্যে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন।

যন্ত্রসংগীতে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতার তাঁর অগণিত ভক্তকে খুশী করলেও পণ্ডিতমহলের প্রশংসার ভাগটা যেন বেশী। কারণ তানের দাপট, মীড়ের প্রাণকাড়া সৌন্দর্য ছাড়াও যে বস্তু—তাঁর বাজনায় একটা নতুন ওজন সৃষ্টি করেছে—সে হোল তাঁর রাগরূপায়ণের গাম্ভীর্য।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] প্রাঞ্জল বিস্তারের উজ্জ্বলতা, অলংকার লয়কারী সকল দিক বিচারেই তাঁর সুনামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকার পরিবেশিত "দরবারী কানাড়া" তাঁর কণ্ঠের অনুকূল নয়। কিন্তু বিস্তারপদ্ধতির শান্ত চলন ও গায়কীর আভিজাত্য শোনবার মত।

শ্রীমতী মালবিকা কাননের "বিভাস" পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। এ. কাননের আড়ানা ও যোগের যথাযোগ্য রাগে পরিবেশিত। বেগম আখতারের ঠুংরি, দাদরা ও গজল হাসির আলোয় ঝংকারের সম্পদে এখনও যেন যাদু বিস্তার করে।

মোহনকুমারীকে বহুদিন বাদে আবার কলকাতার আসরে দেখে সবাই আনন্দিত। তাঁর লয় ও ছন্দ কুশলতা যেন আরও রেওয়াজী ও পরিমার্জিত।

সাতরঙ সংগীত সম্মেলন

সাতরঙ সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হয় মহাজাতি সদনে।

বহু তরুণ শিল্পীকে এবার দেখা গেছে যেমন—[illegible] অভিজিৎ চক্রবর্তী এবং অনেক প্রতিষ্ঠিত গুণী শিল্পীকে আর মিটিয়ে শোনবার সুযোগ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। যেমন [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীতপ্রেমী বাংলাদেশের বিশেষ কোনো আসরেই এবার এঁর [illegible] হয়নি। এখানে এঁর বাজনা [illegible] শোনবার সুযোগ পাওয়া গেল। প্রথম দিন ইনি বাজালেন [illegible]। সুবিন্যস্ত আলাপের অংশ কখনও [illegible], কখনও [illegible] [illegible] তানের সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] তাঁর নিজের। [illegible] [illegible]

কণ্ঠসংগীতের আসরে ওস্তাদ আমিনুদ্দীন ডাগরের শুদ্ধ [illegible] চন্দ্রকোষ ও বাগেশ্রী রাগ পরিবেশিত ধ্রুপদ ও ধামার এক সুগম্ভীর সাংগীতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সেখানে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক। ইনি গাইলেন [illegible]। উদারা কণ্ঠলালিত্যে এই প্রাণবন্তী রাগ নিয়েছেই শ্রোতাদের চিত্তজয় করে নিয়েছে। পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধনের গুরুত্ব এবং ওংকারনাথজীর কাব্যময়ী সৌন্দর্যের সংগে নিজস্ব আবেগ সঞ্চারিত তাঁর গায়নশৈলী সকল শ্রেণীর শ্রোতাকেই মুগ্ধ করবার শক্তি রাখে। বিশেষ অনুরোধে গাইলেন "যোগিয়া" রাগের একটি ভজন "মমতা [illegible]"। সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতার আর এক উপভোগ্য অনুষ্ঠান। পূরিয়া কল্যাণের আলাপ ও গৎ উভয় অংশেই তাঁর পরিশীলিত শিক্ষা ও রেওয়াজ বিদ্যমান।

বালকশিল্পী অভিজিৎ চক্রবর্তীর তবলালহরা গৎ রেলা ঠেকা ও লয়ংকারী বিস্ময়কর। রেওয়াজ যদি শিথিল না হয়—পরিণত বয়সে অবশ্যই ইনি বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর তবলাবাদকের স্থান পূর্ণ করবেন।

—[illegible]

ক্রিকেটে দ্রুতগামিতার মতো সমঝে, বুঝে খেলারও প্রয়োজনীয়তা আছে। সংযমী না হতে পারলে বড় আসরে টি'কে থাকা যায় না। আক্রমণের সঙ্গে আত্মরক্ষার মূল নীতির সমন্বয় ঘটানোই ক্রিকেটের সার্থক ক্রীড়ারীতি। তাই যে ব্যাটসম্যান মেরে মেরে মাঠে ঘাসে উত্তাপ ছড়ান তাঁকেও যেমন আদর করি, তেমনি যে খেলোয়াড় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁতে দাঁত কষে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে জানেন তাঁকেও আমরা নির্ভেজাল শ্রদ্ধা জানাই।

সেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন পূর্বসূরী বিজয়েরা—মার্চেন্ট, হাজারে ও মনজরেকার। টেস্ট খেলার মাঠে তাঁদের ভূমিকা মন্থর হলেও মস্ত। পাতৌদির দলে তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই এই ভূমিকার মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে চান নি। ভারত বছর পঁয়ত্রিশেরও বেশি টেস্ট ক্রিকেট খেলছে। এখনও যদি সত্যোপলব্ধিতে বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে আমাদের ক্রিকেট মানসে কবে সুস্থ চেতনা উঁকি দেবে?

ফাস্ট বোলারের ঘাটতি [illegible] সন্দেহ নেই। তবুও বলি যে শুধুমাত্র সেই ঘাটতির উল্লেখ করলে কিন্তু অন্য ঘাটতির দিকগুলো আড়ালে থেকে যেতে পারে। ঘাটতি ছিল আরও নানা দিকে।

ফিল্ডিংয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল বটেই; তার ওপর বিপক্ষের বলের পেস বা গতির আন্দাজ পাওয়ায় অক্ষমতা। পাতৌদি নিজে বলেছেন যে অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারেরাও খাঁটি পেসম্যান নন। কিন্তু অস্ট্রেলীয় উইকেটের গতি প্রচণ্ড প্রাণ ছিল। সেখানে বল পড়ে আরও জোরে ছুটেছে এবং [illegible] উঁচুতে লাফিয়েছেও। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা এই উইকেটের নাড়ীর খবর পান নি।

পান নি সত্যি। কিন্তু পেতে চেয়েছিলেন কি?

ভারতের প্রথম সারির ব্যাটসম্যানেরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস খেলেও যদি এক ধরনের পিচের প্রকৃতি জেনে নিতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে যে ত্রুটিটা পিচের নয়। দোষ-ত্রুটি সবই তাঁদের যাঁরা মস্তিষ্ককে বন্ধ রেখে শুধু দেহ দিয়েই ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছেন।

মাঠের খেলায়ও শরীরের ভূমিকা যেমন আছে, তেমনি আছে মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয়তা। মাথাই দেহ দেহকে চালায়। অথচ মাথা বা মনের দরজায় খিল এঁটে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা না করলে যা ঘটা স্বাভাবিক, অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটে গিয়েছে। এতো নামডাকওয়ালা খেলোয়াড় সব, পিচের পেস ও বাউন্স বুঝতেই হিমসিম খেয়ে গেলেন। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগছে!

পিচের খবর নেওয়ার জন্য মাঠে নেমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার উপদেশ তো সব ক্রিকেটারের ভাগ্যে জোটে। নীচের থেকে ওপরের মহলের, সর্বস্তরের ব্যাটসম্যানই তাঁদের জীবনে হয় গুরু, না হয় সিনিয়ার সঙ্গীকে এ বিষয়ে উপদেশটা পান। অস্ট্রেলিয়ায় যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরাও পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ বোঝা যাচ্ছে সে সব কথায় কান পাতার ও'দের আগ্রহ ছিল না। থাকলে অতি সাধারণ ভুলের ফাঁদে ও'রা বার বার পা বাড়িয়ে দেবেন কেন?

পাতৌদির বিলাপ শুনে মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা কি খেলেছেন, আত্মসমীক্ষায় তাঁরা যদি তা উপলব্ধি করতে পারেন তাহলেই হয়তো ভবিষ্যতে কাজের কাজ করে তুলতে পারবেন ওঁরাই। কিন্তু আয়নার সামনে নিজেদের দাঁড় করাতে যদি আগের মতোই কুণ্ঠাই থেকে যায় তাহলে অস্ট্রেলিয়া সফরের শিক্ষা ভারতীয় ক্রিকেটের কোনো কল্যাণেই লাগাতে পারবে না। যেমন পারে নি ইংলণ্ড সফরে প্রাপ্ত শিক্ষা কোনো কাজে আসতে।

কিন্তু ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সমস্ত বৃত্তান্তই কি হা-হুতাশে ভরানো? পাতৌদির যেন সন্তাপ, দুঃখ-খেদ। তবু মনে হয় যে হারতে হারতেও ভারতীয় দলের কেউ কেউ দুঃখ আঁধার ক্ষীণ আলোকবর্তিকা জ্বালাতে পেরেছিলেন। দূর থেকে আমরা যদি ঠাওর না পেয়েও থাকি তাহলে শরণ নিই ক্রিকেটে বিশেষজ্ঞ জ্যাক ফিঙ্গলটনের অভিমতের।

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় এবং স্বনামখ্যাত সমালোচক ফিঙ্গলটন লিখছেন,

'প্রসন্নর মতো বোলার যদি অস্ট্রেলিয়া দলে থাকতো! তিনি স্পিনে ও ফ্লাইটে ধোঁকা এনেছেন। চারটি টেস্টে পঁচিশটি উইকেট পাওয়া এক কীর্তি, সন্দেহ নেই। তিনিই ভারতীয় দলের সেরা বোলার। বর্তমান সফরের নির্বাচিত সহকারী দলে পাতৌদির নাম সবার আগে স্মরণ করে আমি প্রসন্নকে দ্বিতীয় আসন দিতে চাই।

ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়াদেকারের সম্ভাবনা বিপুল। তবে ব্যাট করার সময় বলের প্রতীক্ষায় তিনি বোলারের মুখোমুখি দাঁড়ান কেন, কেন সোজাসুজি দু চোখ মেলে দেখতে চান তা আমি বুঝতে পারি না। অতোটা বুক খুলে আড়াআড়ি না দাঁড়িয়ে পাশ ফিরে দাঁড়ালে তিনি নিশ্চয়ই সুফল পাবেন।

'মেলবোর্নে পাতৌদির ব্যাটিং এ পর্যায়ের খেলায় নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল। দু দলের আর কেউই এমন উঁচু জাতের খেলা দেখাতে পারেন নি। মেলবোর্নে অনেক অবিস্মরণীয় ব্যাটসম্যান এর আগে খেলেছেন। পাতৌদির দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সেই সব দিকপাল ব্যাটসম্যানদের স্মরণীয় কীর্তির পাশে সহজেই নিজের জায়গা করে নিতে পারে। এই ইনিংসের পরিচয়ে পাতৌদি মেলবোর্নের স্বর্ণফলকের মধ্যে নিজের নাম চিরদিনের জন্য খোদাই করে দিতে পেরেছেন।

ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিংয়ে, সবক্ষেত্রেই সুর্তি'র সাফল্যের স্বাক্ষর প্রত্যক্ষ। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থাকাতে মাঝে মাঝে তিনি এমন কিছু করেছেন যা সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে কেউ আশা করতে পারেন নি। আমার মনে হয় না যে পাতৌদি একজন কড়া ক্যাপ্টেন। সুর্তি সম্পর্কে তিনি সুতো আলগা করে রেখেছিলেন। রাশ টেনে ধরতে পারলে আরও ভাল ফল পাওয়া যেতো।

'আর' এক সম্ভাবনাময় ব্যাটসম্যান হলেন আবিদ আলি। আবিদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে। তিনি খাটতে ভালবাসেন এবং হাত খুলে মারতেও ভয় পান না। এবং মার মারার সময় বল লাগে ব্যাটের মাঝখানেই। যে ব্যাটসম্যান বল পিটোন ব্যাটের মাঝখানটি দিয়ে তাঁর সাফল্য অনিবার্য। তবে আবিদকে সংযমের নির্দেশ মানতেই হবে। যেহেতু ডন ব্র্যাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যানও এই নির্দেশ মাথা পেতে নিতেন।

ইঞ্জিনীয়ার ব্যাটসম্যান হিসেবে পুরোপুরি আক্রমণাত্মক। নতুন বলকে তাঁর মতো অশ্রদ্ধা আর কেউ দেখাতে পারেন না। তবে ইঞ্জিনীয়ার মূলতঃ উইকেটরক্ষক। তাই কিপিং শেষ করেই তাঁর পক্ষে দলের ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে মাঠে না নামাই ভাল। বিশ্রাম [illegible] পরে এলে দলের প্রয়োজন তিনি আরও ভাল করে মেটাতে পারবেন।'

সব মিলিয়ে ফিঙ্গলটনের উপলব্ধি, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের নিজেদের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আগে কিছু না ভেবেই ব্যাট হাতে মাঠে নামা নিরর্থক। ব্যাটিং অর্ডারটিকেও পাল্টাতে হবে, পাতৌদির আগে আসা দরকার, যেমন প্রয়োজন ইঞ্জিনীয়ারের পরে নামা।

খাঁটি কথা বলেছেন ফিঙ্গলটন, ভাবা দরকার। যা নেই তার জন্যে আক্ষেপ না করে যা আছে সেই সম্পদকে কিভাবে দলের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় সে সম্বন্ধে পরিণত চিন্তার প্রয়োজন।

আর একটি প্রস্তাব আমার রয়েছে। পুরনো প্রস্তাব, নতুন করে আবার বলছি যে ব্যাটসম্যান হিসেবে পাতৌদিকে দলে রেখে দল পরিচালনার দায়িত্ব অন্যের কাঁধে অর্পণ করা যায় না? ফিঙ্গলটনের এবং প্রত্যক্ষদর্শী সবাকারই মতে, পাতৌদি কড়া মানুষ নন। অথচ উঠতি বয়সের ডজন-খানেক তরুণের সামনে আচরণবিধির আদর্শ নমুনা রাখতে দলপতিকে সময় সময় কড়া হতেই হয়। কিন্তু যে মানুষ নিজের সম্বন্ধেই নরম, তিনি অন্যের ওপর জোর খাটাবেন কি করে? তাই বলছি, পাতৌদির নেতৃত্বের প্রভাব থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে মুক্তি দেওয়া হোক। পাতৌদি দলে থাকুন ব্যাটসম্যান, ফিল্ডসম্যান হিসেবে; নেতারূপে নন।

ঈস্ট বাকল্যান্ড রোড একক কাহিনী নয়। একটি বড় ইতিহাস-রীতি ও তখনকার দুরবস্থার ভিতর বিভিন্ন কয়েকটি পরিবারের একাধিক আলাদা-আলাদা বিচিত্র কাহিনী, সূক্ষ্ম যোগসূত্রে গাঁথা।...তরুণদের ভাবপ্রবণতা অসুবিধা, আমরা কিছু অপরিচিত নয়। তাদের জীবনের বাইরের চেহারাটা যদিও এ-যুগের, তারা কেবল বিশেষ যুগের নয়, চিরন্তন জীবন-ধারার অংশ।...বইখানির ভাষায়, বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রণে পরিণত মন এবং নিপুণ হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। —যুগান্তর

ঈস্ট বাকল্যান্ড রোড, বইখানার নাম দেখে মনে হয়েছিল কোন ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ হবে কিম্বা বড় জোর ছায়ানুবাদ। কিন্তু পড়তে বসে ভুল ভাঙল। নিতান্তই দেশী গল্প যার পটভূমিকা বিহারের ছোটো দুটি শহর। অনেকগুলো নরনারীকে নিপুণভাবে জোড় বেঁধে পাঠককে উপহার দিয়েছেন লেখক। প্রথম থেকেই বুঝতে পারা যায়, তাঁর রস সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সেই সঙ্গে আছে একটি চিন্তাশীল মন। তাঁর কলমে শ্রী ও শক্তি দুই-ই আছে। —প্রমথনাথ বিশী

বইখানার নাম ও কাহিনি দেখে প্রথমেই বিস্ময় জেগেছিল এ লেখক কে—তারপর পড়তে পড়তে বিচিত্র চরিত্রের অন্তরালে জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনের সমারোহ দেখে উৎফুল্ল হলাম। লেখকের সঙ্গে পরিচিত নই। ভাবতাম কোনো অন্যের সুন্দর করে লেখার দিন বুঝি শেষ হয়ে গেছে। দেখলাম আপনি সিনেমার জন্যে লেখেননি বা সস্তা পাঠকদের জন্য। আপনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আপনাকে অন্তরের অভিনন্দন জানাই।

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ছদ্মনামের অন্তরালে যে লেখকটি আত্মগোপন করে আছেন, তাঁকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমি সর্বান্তঃকরণে এই লেখককে স্বাগত জানাচ্ছি।

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঈস্ট বাকল্যান্ড রোড ৮৲

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত সৃষ্টি

অপরাজিত

॥ নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥

—দশ টাকা—

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

একদা কী করিয়া

নূতন আঙ্গিকে লেখা এই উপন্যাসের পূর্বপট ইতিহাস—কিন্তু আসলে এটি রোমান্টিক রসসাধনা উপন্যাস। এই উপন্যাসে মানুষের মনের যে চিত্র ফুটেছে—বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা নেই। কাহিনীর গতি যেমন সহজ তেমনিই তার আকর্ষণ। "বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি।"

নূতন মুদ্রণ প্রকাশিত হল

—তেরো টাকা

॥ নূতন বই ॥

প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস

নগরে অনেক রাত ৪॥

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ৫৲

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস

জরির আঁচল ৪৲

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

আঁধি ৭॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনী

কুমারি গিরিপথে ৫॥

এবং

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০৲

— নূতন মুদ্রণ —

তারাশংকরের	জরাসন্ধের
রাধা ৮৲	**বন্যা ৪৲**

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৮৲

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২

নিয়মাবলী
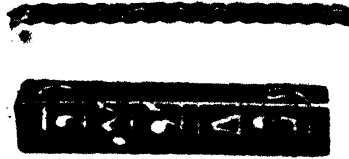
লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা		মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা	২২-০০
ষান্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা	১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা	৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৭ম বর্ষ ৪র্থ খণ্ড

৪৮শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday 5th April, 1968 শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীসুনীল দাস

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

ছাত্র সমস্যা প্রসঙ্গে

অমৃত পত্রিকার সাতচল্লিশ সংখ্যায় বর্তমানে দেশে চলতি ছাত্র অসন্তোষ সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এরকম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে এধরনের প্রয়াস যখন চোখে পড়ে না। তবুও কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায় এবং ছাত্র সমস্যার কথা উঠলেই এ প্রশ্নগুলো মনে আসা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। খুব একটা নির্বিঘ্নে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা চলে না। বরং নানা বাধা-বিপত্তি এসে এর পথ রোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে-সব বিপত্তি যোগে টেঁকেনি। এবার আরম্ভ হয়েছে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা। এখানে তেমন কোন গোলমালের খবর জানা যায়নি। আশা করা যায় শান্ত পরিবেশেই ছাত্ররা হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা শেষ করতে পারবে। অন্যান্য পরীক্ষাগুলিও নিরুপদ্রবে অনুষ্ঠিত হোক, এটাই আমাদের কামনা।

কিন্তু কত ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে এবং যারা পাশ করবে তাদের সকলেই উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ পাবেন এমন কথা বলা যায় না। পূর্ববর্তী বৎসরগুলির অভিজ্ঞতা অন্তত আমাদের সেকথাই বলে। পাশ করা ছাত্রদের তুলনায় কলেজের সংখ্যা খুবই কম। তাই সকলের পক্ষে কলেজীয় শিক্ষা সুলভ হবে না। সাধারণ শিক্ষার কথা ছেড়ে দিয়ে এবার কারিগরী শিক্ষার কথা ধরা যাক। সবাই আজকাল এদিকে বেশি ঝুঁকছেন। কিন্তু গোড়ার সমস্যাটা এখানেও যথারীতি বহাল থেকে যায় অর্থাৎ স্থান অসংকুলান। টেকনিকাল এডুকেশনের জন্য কলেজ ও পলিটেকনিক বেশ কিছু আছে তবু প্রয়োজনের তুলনায় তাদের সংখ্যাল্পতা অনস্বীকার্য। তাই দেখা যায় কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রেও ছাত্ররা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

তাছাড়া কলেজে সীট পাওয়া গেলেও হোস্টেলের সমস্যা আবার ছাত্র ও অভিভাবককে বেশ ভাবিয়ে তোলে। ছাত্র-ছাত্রী নির্বিশেষে এই সমস্যা ক্রমে সর্বজনীন রূপ নিচ্ছে। কোন একটি হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে একবার বলেছিলেন, প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্রীকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দিতে বেশ কষ্ট হয়। অথচ তাঁদের হাত-পা বাঁধা।

এরপর পরীক্ষা-পরবর্তী জীবনে চাকরীর সমস্যা তো আছেই।

এসব কথা ভেবেচিন্তে বুঝতে অসুবিধা হয় না ছাত্র সমস্যার মূল কোথায়। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, আমাদের দেশে নানা প্ল্যানের অন্ত নেই। ছাত্রদের সম্পর্কেও অনেক পরিকল্পনা করা হয়। এখানে শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞরাই থাকেন। নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের এখানে নিলে বিশেষজ্ঞদের অনেক সুবিধা হতে পারে এবং ছাত্রসমস্যা সমাধানের একটা মোটা-মুটি পথও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তখন দেখা যাবে বাধা হয়েই ছাত্ররাও আর আন্দোলনের নামে মেতে ওঠার সুযোগ পাচ্ছেন না।

অমলকান্তি চক্রবর্তী
কলকাতা-১২

সাহিত্যের মিলন ক্ষেত্র

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগটি চালু রাখার জন্যে বাংলো পত্র-পত্রিকার জগতে 'অমৃত' নিঃসন্দেহেই বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। বিশেষ করে 'ভারতীয় সাহিত্য' ও 'বিদেশী সাহিত্য' উপ-বিভাগ দুটিতে আমরা প্রতি সপ্তাহে যে নতুন নিত্যনতুন খবর পাই, তার জন্যে কৃতজ্ঞ।

গত ৪৭ সংখ্যায় অন্যান্য আকর্ষণীয় সংবাদের মধ্যে দেখলাম 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন' সম্পর্কে একটি মূল্যবান খবর। এর আগেও 'ভারতীয় সাহিত্যের' পৃষ্ঠায় এই নিখিল ভারত কবি সম্মেলনের খবর পেয়েছি। গত সংখ্যায় খবরটি এই কারণেই বিশেষ উল্লেখ্য যে সর্বভারতীয় কবি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবেদন। সত্যিকথা বলতে কি, আজ যখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে উগ্র প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তখন এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মনে হয়। জাতীয় সংহতি দৃঢ়তর করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী-দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর এঁদের মধ্যে কবিরা আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। জাতীয় সংহতির প্রশ্নে কবিদের আমি বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। সমস্ত রকম বিচ্ছেদ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধেই তাঁদের প্রতিবাদ সোচ্চার, কারণ কবিরা হল জীবনের মিলনমন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, আজ যে জাতীয় সংহতিতে ফাটল দেখা দেবার উপক্রম হয়েছে তার কারণ হল সহিষ্ণুতার অভাব, এবং অন্য ভাষাভাষী সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি। বলা-বাহুল্য, এইসব ত্রুটি তখনই দূর করা সম্ভব, যখন ভাবের বিনিময় গভীরতর হয়। এটা খুবই লজ্জার কথা যে, আমরা সকলেই ভারতীয়, অথচ ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য ও শিল্পকলার খবরাখবর তেমন রাখি না। যদি রাখতাম তবে অনেকের মিথ্যা কথায়ই গণতান্ত্রিক ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ত না। বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মনের কথা জানতে হলে চাই সাহিত্য পাঠ। কিন্তু তা সব সময় সম্ভব হয় না। ভাষাগত ব্যবধান ও আর্থিক টানাটানি এর জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। তাই নানা সমস্যায় জর্জরিত ভারতে এই ধরনের সম্মেলনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রগতির জন্যে এবং জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, বেশ কিছুকাল আগে কলকাতায় নিখিল ভারত সাহিত্যিক সম্মেলন হয়েছিল। কিন্তু তারপর অনেক-দিন এই ধরনের সমাবেশ ঘটেনি। বাঙালি কবি ও সংস্কৃতি নেতারা সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন, বিভিন্ন প্রদেশের কবি ও বুদ্ধিজীবীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। আশা করি তাঁদের এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হবে।

সুস্মিতা সেন
রাঁচী

কেন এই অস্থিরতা

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছুকাল ধরেই তোলপাড় চলছে। গত সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতের রাজ-নৈতিক মানচিত্র বেশ কিছুটা রঙ বদল হয়েছিল। একটানা বিশ বছর কংগ্রেসী শাসনের পর কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। চরিত্রের দিক দিয়ে এইসব সরকার যে একই শ্রেণীর তা বলা যায় না। কিন্তু কয়েকমাস যেতে না যেতেই অধিকাংশ রাজ্যে সরকারের পতন ঘটে। দল ভাঙাভাঙির মারাত্মক রোগ পেয়ে বসে কোনো কোনো ব্যক্তি বা দলের ক্ষেত্রে। বিহার, পাঞ্জাব, পশ্চিম বাংলা থেকে শুরু করে আরো কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটে। ব্যতিক্রম হিসেবে অবশ্য কেরালা, উড়িষ্যা বা মাদ্রাজ রয়ে গেল।

সে যাই হোক চতুর্থ সাধারণ নির্বা-চনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সুস্থতা আশা করা গিয়েছিল তা অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এই রাজনৈতিক টানা পোড়েনের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় কি? দল-পাল্টা-পাল্টির রোগ কি নির্মূল করা যায় না? অন্তর্বর্তী নির্বাচন এব্যাপারে হয়তো কিছুটা সুরাহা করতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার তা চিরস্থায়ী নয়। এবিষয়ে তাই সকল রাজ-নৈতিক দল ও সরকার সমস্তকে নতুন করে ভাবতে হবে।

সুধীর সামন্ত
মেদিনীপুর

অমৃত

সম্পাদকীয়

একটি লজ্জার চিত্র

গেল সপ্তাহে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও বিক্ষোভ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এবারে চিত্রের অন্যদিকে আমরা একটু তাকাতে চাই। অর্থাৎ শিক্ষার জন্য কী করা হচ্ছে এবং কতটুকু সাফল্যই বা লাভ করা গেছে। শিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে যত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে জ্ঞানলাভের সুযোগ দেওয়া যায়। আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য পূরণ হতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। অথচ স্বাধীনতার একুশ বছর পরেও এ-আশা করাটা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়।

ভারতবর্ষের সংবিধানে এ-কথা উল্লেখ আছে যে, সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে দেশে সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সেই দশ বছর কবেই পার হয়ে গেছে। ভারতের মাত্র কয়েকটি রাজ্যে তা চালু হয়েছে, কিন্তু তা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হয়নি। সবচেয়ে লজ্জার চিত্র পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-জগতের। আমরা চিরকালই নিজেদের শিক্ষায়-দীক্ষায় ভারতের অন্যান্য রাজ্যবাসীদের চাইতে অগ্রগামী মনে করে থাকি। কিন্তু এখন সে দাবী আর খাটে না। শিক্ষিতের হার বিচার করলে সারা ভারতে পশ্চিমবাংলার স্থান এখন পঞ্চম। এ-বিষয়ে কেরল সবাইকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। মানুষকে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যর্থতা লজ্জাজনক। এই কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক। বাঙালীর সংস্কৃতির রাজধানী এই শহর। ভারতবর্ষের নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি এই মহানগরী। কিন্তু আজ পর্যন্ত এখানে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যায়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন নিজেই সম্প্রতি এক বক্তৃতায় ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের কাছ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় যে, এই রাজ্যে ৬ থেকে ১১ বছর বয়স্ক অন্তত ১২ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাহিদা মেটাতে গিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য এই রাজ্যে বেশি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা সে তুলনায় অবহেলিত। উচ্চশিক্ষার প্রসার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিকূলতা করছে, এ যুক্তি একটু বিস্ময়কর বৈকি। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ গরীব নিম্নবিত্তদের ছেলের জন্য বলার কেউ নেই বলে তাকে বিনা বেতনে অ-আ-ক-খ শেখানো হবে না এটা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার কথা। সরকার এই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা দেওয়ার সাংবিধানিক দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে। এশিয়ার অন্যান্য ছোটখাটো দেশ কোরিয়া, কম্বোডিয়া, মালয়েশিয়া কি সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সাক্ষরতার অভিযানে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। ভারতবর্ষ তার বিপুল জনসমষ্টিকে নিরক্ষর রেখে কীভাবে সামাজিক কল্যাণের বিপ্লব সাধন করবে তা ভাবাই যায় না।

পরিকল্পনার ত্রুটি শিক্ষাক্ষেত্রে এই নৈরাশ্যের জন্য অনেকখানি দায়ী। পরিকল্পনা থাকলে কীভাবে সাফল্য সাধন করা যায়, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অনেক দেশেরই ইতিহাসে। কিউবা ছিল একটি নিরক্ষরের দেশ। ফিদেল কাস্ত্রো ক্ষমতা দখল করেই সর্বপ্রথম নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে হাত দিলেন। গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলা হল শুধু ছেলেমেয়েদের জন্য নয়, নিরক্ষর বয়স্ক চাষী-মজুরদের জন্যও। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ' মাসের জন্য বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের পাঠানো হল গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে সাহায্য করার জন্য। তাদের এই আন্দোলন সফল হয়েছে। সে-দেশে নিরক্ষর বয়স্ক লোকের শতকরা আশীজনই আজ অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা নিয়ে যত বেশি মাথা ঘামানো হচ্ছে, সে তুলনায় এই প্রাথমিক প্রশ্নের দিকে ততটা নজর পড়ছে না শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের এবং দেশবাসীর। অথচ এ-কথা কে না জানে যে, গণতন্ত্র বলুন, সমাজতন্ত্র বলুন কিংবা স্বাধীনতা রক্ষা বলুন, কোনো সংকল্পই শিক্ষাহীন অজ্ঞ মানুষদের দ্বারা করা সম্ভব নয়। শিক্ষা-খাতে ব্যয় হল জাতির সবচেয়ে মূল্যবান আমানত। শিক্ষিত জনগণই জাতির সবচেয়ে দুর্জয় রক্ষক। আমরা প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে যদি সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ না করি, তাহলে যার জন্য স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, সেই উদ্দেশ্যই যাবে ব্যর্থ হয়ে।

গণতন্ত্রের আসল ভিত্তি

অনিল ভট্টাচার্য

সামনে আসছে মধ্যবর্তী নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আপাতত শান্ত। বিগত দিনের তিক্ততা, প্রতিহিংসা আর পারস্পরিক কর্দম নিক্ষেপের উপর অন্তত সাময়িকভাবে যবনিকা পড়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই শান্ত পরিস্থিতিতে বিগত দিনগুলোর ইতিহাস বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। রাজ্যের গণতান্ত্রিক আবহাওয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেই আত্মসমীক্ষার বিশেষ দরকারও। সারা ভারতে আজও পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিক চেতনার ক্ষেত্রে প্রথম আসন দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিল্লী গুরুতর উদ্বিগ্ন। রাজনৈতিক চেতনায় পশ্চিমবঙ্গ সর্বাগ্রে থাকলেও, এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো কেন?

এই প্রশ্নের নানা উত্তর থাকতে পারে। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় থাকার সুযোগ ঘটে। সেই সুযোগ আর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পর সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রশ্নটির জবাব দেওয়া বোধহয় অনধিকার চর্চা হবে না। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে দায়ী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে শাসক দলের শ্রদ্ধার অভাব। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর থেকে এই রাজ্যে শান্ত আর নিরুপদ্রব বিধানসভার কোনো অধিবেশন সম্ভব হয়নি। নামে গণতন্ত্র চলেছে, কাজে পারস্পরিক প্রতিহিংসাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তারই শেষ পর্যায়ে বিধানসভা খারিজ হয়েছে। জনপ্রতিনিধি বলে সরকারীভাবে কোনো প্রতিনিধি এখন এই রাজ্যে নেই।

কিন্তু কেন এমনটি হয়েছে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে প্রথমেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ সতেরো বছর কংগ্রেসী শাসনের পর্যালোচনা করতে হবে। ডাঃ রায়ের আমলেও বিরোধীরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জনতার ওপর লাঠি, গ্যাস, গুলী চলেছে। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও ডাঃ রায় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে একটা সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। বিরোধী নেতা যতীন চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করার পর তাঁর স্ত্রীকে ডাঃ রায় টেলিফোন করেছেন। বলেছেন: স্বামীর জন্যে উদ্বিগ্ন হোয়ো না। জেলে থাকলেও যাতে ভালো থাকে তার ব্যবস্থা করেছি। রাইটার্স বিল্ডিং-এ গুরুতর সরকারী কাজের সময় জ্যোতি বসু দেখা করতে চাইলে ডাঃ রায় সব কাজ ফেলে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেছেন। জ্যোতি বসু কোনো অনুরোধ করলে তিনি যতদূর সম্ভব সেই অনুরোধ রক্ষা করেছেন। বিধানসভায় ডাঃ রায়কে প্রচণ্ড সমালোচনার পর অধিবেশন শেষে সেই সদস্যকে ডাঃ রায়ের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে দেখা যেতো। আমার মোদ্দা কথা হচ্ছে, তখন একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল।

তারপর এসেছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। প্রফুল্ল সেন শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সকলের উপকার করতেন। সেখানে কোনো অভদ্রতা বা রাজনীতি ছিল না। সাংবাদিকরূপে এই মানুষটির আন্তরিকতার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। প্রফুল্ল সেনও ডাঃ রায়ের ট্র্যাডিশান বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলে এল চীনা আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে ভারত রক্ষা আইন। সাধারণ আইনকানুন চাপা পড়ে ভারত রক্ষা আইন সবার ওপরে স্থান নিলো। শুরু হলো ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার, বিধানসভার বাইরে আর ভিতরে বৃহত্তম বিরোধী দল সম্পর্কে প্রচণ্ড সমালোচনা। এই দলের নেতারা জেলে। অন্যদিকে তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনার অভিযান চলছে। একটা নির্দিষ্ট 'সিন্ডিকেট ক্লিক' তখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা দখল করে ফেলেছে। ফলাফলে শাসক দলের সঙ্গে বৃহত্তম বিরোধী দলের শ্রদ্ধার সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হলো। এরপরে এসেছিল ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় আর এক দফা ভারত রক্ষা আইনের অপব্যবহার। এই অপব্যবহারের প্রতিক্রিয়া শাসক দলকে নির্বাচনে পরাজিত করতে খুব বেশী সাহায্য করেছিল। প্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁর মন্ত্রিত্বের শেষ পর্যায়ে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। নির্বাচনের পর এলো যুক্তফ্রণ্ট সরকার। এই সরকারের শরিকদের কংগ্রেস দলের প্রতি বিরূপতা দীর্ঘদিনের। সেই বিরূপতাকে শ্রদ্ধার পর্যায়ে আনবার সময় দেওয়া হোল না। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটানো হোলো। এলো কংগ্রেস-সমর্থিত পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভা, আর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের গ্রেপ্তার, লাঠি, গ্যাস, গুলী, ১৪৪ ধারা। শাসক দলের সঙ্গে বিরোধী দলের কোনো সম্পর্কই রইলো না। একটা প্রতিহিংসার আবহাওয়ায় সারা রাজ্যে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিল। দুজন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার মন্ত্রী প্রহৃত হলেন। শেষ পর্যায়ে কংগ্রেস- পি ডি এফ মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছে। বিধানসভা খারিজ হয়েছে। সবাই এখন আগামী নির্বাচনের জন্যে তৈরী হচ্ছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে একটা শ্রদ্ধার মনোভাব থাকা দরকার। নইলে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা চালানো যায় না। কিন্তু কোথায় সেই শ্রদ্ধার মনোভাব?
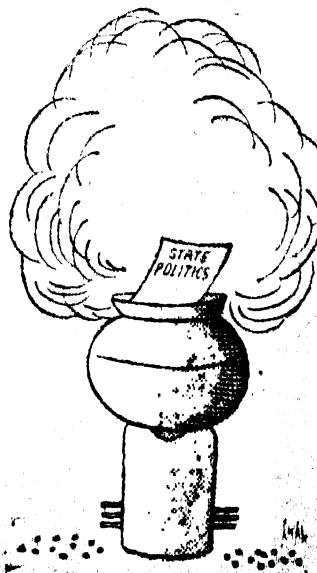
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

পরিষ্কার ছবি কৈ?

মহেন্দ্র চক্রবর্তী

চাওয়া ও চাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার ওপরই পশ্চিমবাংলার বর্তমানের রাজনীতির অনেকখানি ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। অন্ধ্রের লোকেরা চেয়েছিল বলেই ভারত সরকার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে রাজ্যপালের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রফুল্লবাবু এই অনুরোধ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে মুক্তি আর পান না। এমন কি হায়দ্রাবাদ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট তাঁদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর জীবনী চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। যা হোক, অবশেষে খান্দুভাই দেশাই নাকি প্রফুল্লবাবুকে রক্ষা করলেন। তিনি অন্ধ্রের রাজ্যপাল হতে স্বীকৃত হওয়ায় ভারত সরকার তাঁকে পট্টম থানু পিল্লাই-এর স্থলাভিষিক্ত করতে প্রস্তাব দিয়েছেন।

তাই প্রফুল্লবাবুর এই রাজ্যের রাজনীতিতে অবস্থান এখন একরকম প্রায় স্বীকৃত হয়ে গেছে। অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে তিনি নির্বাচন প্রার্থী হচ্ছেন। আরামবাগ পৌরসভার নির্বাচনের ফলাফলের মধ্য দিয়ে সেখানকার মানুষ প্রফুল্লবাবু ও তাঁর দলবলের কাছে আশার আলো তুলে ধরেছেন। যে খবরটা প্রফুল্লঅনুগামীদের শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছে, তা হচ্ছে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন না। তা হলে অন্তত পারিষদীয় দলের নেতৃত্ব নিয়ে হয়তো প্রকাশ্যে ঝগড়ার দামামা বাজবে না। অতুল্যবাবুকে প্রার্থী মনোনয়নের ভার দিলেই তিনি প্রমাণ করতে পারবেন, সংগঠনটা তাঁর হাতের কব্জার মধ্যে।

বিবৃতির মারফৎ অতুল্যবাবু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালে কি হয়, এর পর ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কথা আসছে। তিনি কংগ্রেসের ওপর নির্ভর করেই ২রা অক্টোবরের পরে তুফান সমুদ্রে ভাঙা ডিঙ্গী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, উল্টো ফল হলো। লোকদলের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী আঁতাতের ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র সেন বা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের আগ্রহ থাকলেও অতুল্যবাবু বাদ সাধছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথা হচ্ছে, হুমায়ুন কবির সাহেব চেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের উপ-নির্বাচনে স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা প্রীতি চট্টোপাধ্যায় যদি নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তবে কংগ্রেস যেন তাঁকে সমর্থন করে। কিন্তু কংগ্রেস তা করলেন না: তাঁরা ইলা পালচৌধুরীকে প্রার্থী দিলেন। সমস্যার জটিলতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ডঃ ঘোষের নাম লোকদল প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করতে চলেছেন। এতে প্রফুল্লচন্দ্র সেন অত্যন্ত খুশি। জোর চেষ্টা চলেছে এবং তারই ফলে হয়তো দেখা যাবে ইলা পালচৌধুরীর নাম প্রত্যাহৃত হয়েছে। কারণ নির্বাচনের পর একই আকাশে দুই 'প্রফুল্লু'র আবির্ভাব হলে সংশ্লিষ্ট দুটি পার্টিরই বিব্রত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশেষ করে যেখানে ডঃ ঘোষ নিজেই কংগ্রেসে ফিরে যেতে স্বীকৃত আছেন, সেখানে জটিলতা অনেক বেশী দেখা দেবে।

ডঃ ঘোষ কংগ্রেসে ফিরে যাবেন কিনা, এই নিয়ে ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডঃ চন্দ্রের সঙ্গে তার দীর্ঘ সময়ের আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু কবির সাহেব তৃতীয় শক্তিজোট সৃষ্টির ওপর বিশেষ

অংশগ্রহণ দিচ্ছেন। ফলে লোকদলকে গ্টিয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কম্যুনিস্টদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে অকম্যুনিস্টদের নিয়ে একটা তৃতীয় শক্তিজোটের যে প্রয়োজনীয়তা একেবারে নেই, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসও একেবারে অস্বীকার করতে পারছেন না। আর তৃতীয় জোট গড়ে তোলার জন্য জাতীয় পার্টির নেতা শ্রীজাহাংগীর কবিরও কথাবার্তা চালাচ্ছেন। বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের এক বিরাট অংশের সংগে তাঁর আলোচনা হয়েছে। তাছাড়া প্রজা-সোস্যালিস্ট, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট, গুর্খা লীগ, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রমুখের সংগে রুদ্ধ-দ্বারকক্ষে কথা হয়ে গেছে। তাঁর ধারণা, আই-এন-ডি-এফ এবং কংগ্রেসের বেশ কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই শক্তিজোটে যোগ দেবেন। আই, এন, ডি, এফ কংগ্রেস—পি, ডি, এফ-এর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে জনসাধারণের পরিচিতি লাভ করেছে। জাতীয় পার্টি বা লোকদলকে শক্তি বলে স্বীকার না করলেও তাঁরা পৃথকভাবে তৃতীয় শক্তিগোষ্ঠি গঠনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহে লোকদলের সংগে যদি কংগ্রেসের নির্বাচনী আঁতাত না হয়, তবে কবির সাহেব হয়তো প্রগতিশীল কংগ্রেস প্রার্থীদের আসনগুলি ছেড়ে দিয়ে বাকি সব কয়টি অর্থাৎ গুটিদশের মত হবে, সংখ্যক আসনে তাদের নিজেদের প্রার্থী দেবেন। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের কোন কোন নেতা ভাবতে সুরু করেছেন যে, লোকদলের সংগে আঁতাত মানেই দায়িত্ব নেওয়া। তবে জাতীয় দলের খুবই বিশ্বাস যে, জগন্নাথ কোলে, শংকরদাস ব্যানার্জি, কাজেম আলি মীর্জা ইত্যাদি জাতীয় দলে যোগদান করবেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের সমর্থন কৈ?

এদিকে যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখা আজ এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ক্রান্তিদল জাহাংগীর কবিরকে আর বরদাস্ত করবেন না। ফলে ফ্রন্টের সামনে জটিলতা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পি-এস-পি, এস-এস-পি, আর গুর্খা লীগ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। আসন বন্টনের ব্যাপার নিয়ে যে মতভেদ সেটাকে তাঁরা কায়দা করে কর্মসূচী প্রণয়নের ঘাড়ে চাপাতে চান। অন্তত জনসাধারণকে বলা যাবে যে, আদর্শগত পার্থক্য থাকায় বিপদ দেখা দেবে। কতকগুলি পার্টি বৈপ্লবাত্মক নীতি গ্রহণের ওপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ডান কম্যুনিস্ট পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবেন, যাতে ফ্রন্টটা বজায় থাকে।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা ফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেও তাঁরা 'আগাছাদের' আর বেশীদিন সহ্য করবেন না। এ কাজে আর-এস-পি, এস-ইউ-সি, তাঁদের বিশেষ সাহায্য করবে বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আজ বাম কম্যুনিস্ট নেতাদের কাছে নক্শালবাড়ী এক ভূতের মত দেখা দিয়েছে। মুখে নেতারা বলছেন, নকসালবাড়ীপন্থী বলতে কিছু নেই। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে ঐ পন্থীরা প্রার্থী দিতে পারেন, এটা কানাঘুষা শুনে তাঁদের চমক লাগছে।

যা হোক নির্বাচনের ব্যাপারে বিভিন্ন শিবিরে তোড়জোড় চললেও কোথাও এখনও পরিষ্কার ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। কংগ্রেস শিবিরে বিক্ষুব্ধরা আর বাইরে আন্দোলন করবার চেষ্টা করবেন না। কিন্তু কংগ্রেস ভবনের ওপর চাপ রাখতে তাদের চেষ্টার কসুর হবে না। বিশেষ করে এই বিক্ষুব্ধরা বুঝতে পেরেছেন, নির্বাচনের পরেই কংগ্রেস ভবনের নেতারা আক্রমণের পথ গ্রহণ করবেন। অতএব আগে থেকে 'গার্ড' নেওয়া দরকার।

আবার শোনা যাচ্ছে, লোকদলের মধ্য থেকে অল্প হলেও কিছু লোক বেরিয়ে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমাজ গঠনের চেষ্টা করছেন। তাঁদের শক্তি কি? এই আলোচনা এই অবস্থায় না তোলাই বাঞ্ছনীয়। যেমন আই-এন-ডি-এফ নিয়ে বেশী লোক এখন মাথা ঘামাচ্ছে না।
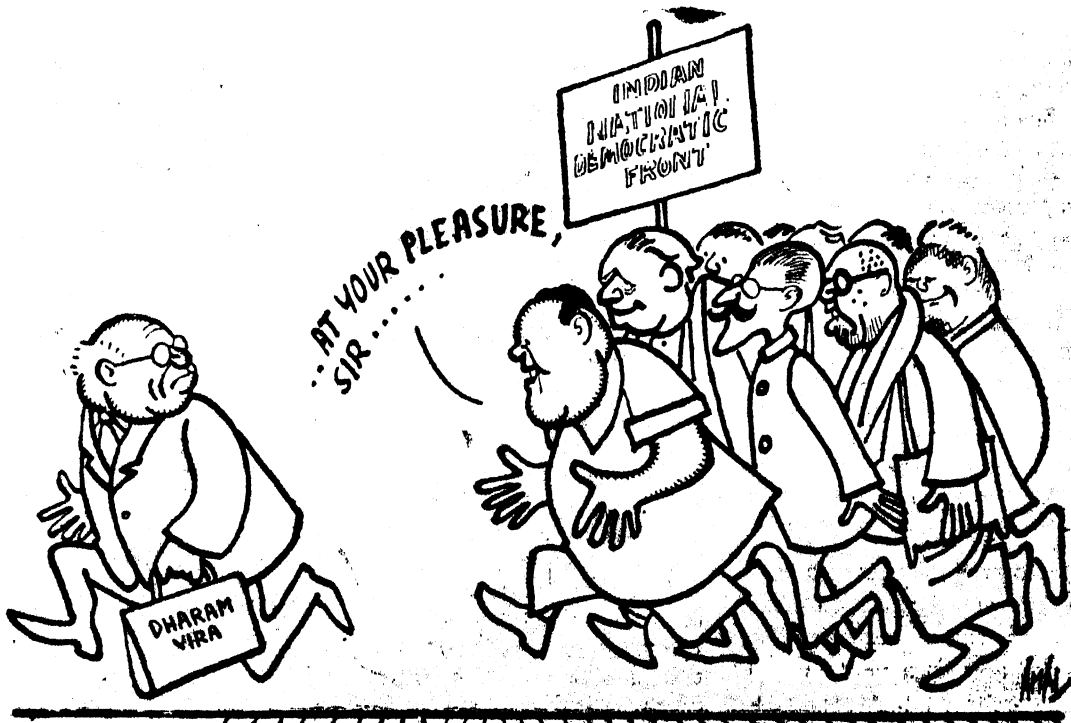
সারা ভারতে

দল ভাঙা

দল গড়া

অজিত চক্রবর্তী

স্বাধীনতার পর যত দিন যাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলির ততই বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। একথা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেমন, রাজ্য ক্ষেত্রেও তেমনই সত্যি।

কংগ্রেস থেকে কম্যুনিস্ট পার্টিকে সরে যেতে বাধ্য করার পর বেরিয়ে এল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে নাম থেকে 'কংগ্রেস' শব্দটি বাদ পড়ল। আরও পরে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা কিষাণ-মজদুর পার্টির সঙ্গে সোস্যালিস্ট পার্টির মিলনে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টি সৃষ্ট হল। গত নির্বাচনের পর কংগ্রেস-ত্যাগীদের আর একটি বড় দল গঠিত হলঃ ভারতীয় ক্রান্তি দল।

হিন্দুমহাসভার একাংশের উদ্যোগে আরও আগে ভারতীয় জনসংঘ গঠিত হয়। স্বতন্ত্র পার্টির পেছনেও অনেক হিন্দু-মহাসভাপন্থী ও কংগ্রেসীর সক্রিয় সমর্থন ছিল।

এইভাবেই একটি রাজনৈতিক দল থেকে ক্রমাগত এক বা একাধিক রাজনৈতিক দল গঠিত হচ্ছে। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে এসেছে (দক্ষিণপন্থী) কম্যুনিস্ট পার্টি, (বামপন্থী) কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ছাড়াও সুগঠিত না হলেও একটি মধ্যপন্থী গোষ্ঠী। হালে বাম কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে নকসালপন্থী কম্যুনিস্টরা বেরিয়ে আসব-আসব করছেন। এঁদের তিনটি গোষ্ঠী (দেশব্রতী, কমিউন ও দক্ষিণদেশ) এক হতে পারলে শীঘ্রই সম্ভবত আর একটি রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করবে।

পি-এস-পি ভেঙে গঠিত হয়েছে এস-এস-পি ও পি-এস-পি। ফরোয়ার্ড ব্লক ভেঙে সুভাষবাদী ও মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক হল, সুভাষবাদীরা পি-এস-পিতে যোগ দিলে ফরোয়ার্ড ব্লক ব্রাকেটমুক্ত হবার কিছুদিন পরে আবার আর একটি মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হল।

আর-এস-পি ভেঙে গঠিত হয়েছে এস-ইউ-সি, আর-সি-পি-আই ভেঙে তিন টুকরো হয়েছে। হালের পার্টি ভারতীয় ক্রান্তি দল থেকে বেরিয়ে-আসা একটি গোষ্ঠী লোকদল গঠন করেছেন। এইভাবে দলের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতের সর্বত্র।

দলের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়ে যায়। বোম্বাইয়ের পৌর নির্বাচন এই ব্যাপারে সব-কিছুকে

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংকটে গত নভেম্বর মাসে কলকাতায় জনতা পুলিশে সংঘর্ষ

ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অকস্মাৎ পরিবর্তন আনেন শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু ঘোষ এবং কাজেম আলি মির্জা

টেক্কা দেবে। ১৩৩টি আসনের জন্য এবার রেকর্ডসংখ্যক প্রার্থী—৭১৯ জন—দাঁড়িয়েছেন : কংগ্রেস ১২৪, শিবসেনা ৯৭, জনসংঘ ৭০, স্বতন্ত্র ৪৬, কম্যুনিস্ট পার্টি ৩৭, কম্যুনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ১০, এস-এস-পি ৩৬, পি-এস-পি ৩২, রিপাবলিকান পার্টি ১৫, পেজেন্টস পার্টি ৯, মুসলিম লীগ ১৫, সিভিক ফ্রন্ট ৩২ এবং নির্দলীয় ১৯৬। বোম্বাই কর্পোরেশনে এখন দলগত অবস্থা হল : কংগ্রেস ২২, সমিতি ২৭, পি-এস-পি ৬, জনসংঘ, মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি তিনটে করে এবং নির্দলীয় ১০।

বোম্বাইয়ের এই বারটি দলের কারও পক্ষে একা লড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাই, রাজনীতিতে যা হয়, সকলেই 'বিস্ময়কর সব শয্যাসঙ্গী' বেছে নিচ্ছে। (১) কংগ্রেস ও রিপাবলিকান পার্টি, (২) পি-এস-পি ও শিবসেনা, (৩) দুই কম্যুনিস্ট পার্টি, এস-এস-পি, পেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি ও মুসলিম লীগ এবং (৪) জনসংঘ ও স্বতন্ত্র—এই চারটে ফ্রন্ট আসরে নেমেছেন।

হরিয়ানায় অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনের জন্যে যে দলগুলি তোড়জোড় সুরু করেছে তাদের সংখ্যা আরও বেশি, কমপক্ষে ১৫টি। বিশাল হরিয়ানা পার্টি, এস-এস-পি, পি-এস-পি, দুই কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, রিপাবলিকান পার্টি, ভারতীয় ক্রান্তি দল, হরিয়ানা জনতা পার্টি, দুই হরিয়ানা অকালী দল এই এগার দলের যুক্তফ্রন্ট ছাড়া নির্বাচনী আসরে নেমেছে কংগ্রেস,, জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও আর্য সমাজ।

এই পনর দলের প্রার্থীরা ছাড়াও থাকবেন নির্দলীয় প্রার্থীরা।

দলের সংখ্যা যত বাড়ছে তত অসুবিধেয় পড়ছে কংগ্রেস, কারণ বলতে গেলে, ছোট বড় সব দলেই কংগ্রেসীরা আছেন, সংখ্যা যাই হোক না কেন।

সাধারণ নির্বাচনের পর যে কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া তার সব কটিতেই দলত্যাগীরা কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করেছে। পশ্চিম বাংলায় বাংলা কংগ্রেস, উড়িষ্যায় জন কংগ্রেস এবং বিহারে জনক্রান্তি দল, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার ব্যাপারে মুখ্য-ভূমিকা নেয়। পরে এই দলগুলিই মিলিত হয়ে ভারতীয় ক্রান্তি দল গঠন করে।

এই ক্রান্তি দলে ভাঙনের ফলেই পঃ বাংলা ও বিহারে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। পরে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের

চরণ সিং

মহামায়া প্রসাদ সিংহ

কয়েকজন এম-এল-এ ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন করায় শেষপর্যন্ত এই রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয় আর বিহারে কংগ্রেসের একদল এম-এল-এ বেরিয়ে এসে লোকক্রান্তি দল গঠন করায় সেখানে নতুন করে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র এখনও মুখ্যত কংগ্রেসের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কেরলে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হবার সবচেয়ে বড় হেতু কংগ্রেসত্যাগীদের কেরল কংগ্রেস যা এখনও ক্রান্তি দলে যোগ [illegible] নি। কেরলে পৌ[illegible]হের নির্বাচনে

হরেকৃষ্ণ মহতাব

এবার কংগ্রেস বিদ্রোহী কংগ্রেসীদের কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝওতা করছেন যার ফলে ফলাফল অন্য রকমের হতে পারে।

কিন্তু কেরলে বিদ্রোহী-কংগ্রেসীদের সঙ্গে যাঁরা হাত মেলাচ্ছেন, পান্ডিচেরীতে তাঁরা নিজেদের ঘর সামলাতেই হিমসিম খাচ্ছেন। এতদিন ৩০ জন সদস্যের কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মোকাবিলা করছিলেন নয় জন নির্দলীয় সদস্য। প্রাক্তন 'কামরাজ' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীফারুক মারিকার অন্য ছ জন সদস্য নিয়ে দলত্যাগ করেছেন, ফলে বিরোধী দল এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৩০ জনের মধ্যে ১৬ জন তাঁদের দিকে। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগাউবার্ট এখন বিরোধী দলের নেতা। বাজেট অধিবেশনেই এঁরা অনাস্থা প্রস্তাব আনছেন।

শ্রীফারুক মারিকারকে নিয়ে তিনজন 'কামরাজ' মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস ছাড়লেন। অপর দুজন হলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিনোদানন্দ ঝা।

ঠিক 'কামরাজ' নয়, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীকামরাজের বদলে কংগ্রেস সভাপতির পদ গ্রহণ করেছেন। ফল কিন্তু প্রায় একই ধরণের হয়েছে। এখনও স্থির হয়নি কে মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী হবেন। একদিকে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীবি ডি যাত্তি অন্যদিকে পূর্তমন্ত্রী শ্রী বীরেন্দ্র পাতিল। প্রথম জনের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণাপ্পা, দ্বিতীয় জনের পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং। পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হবার পর বোঝা যাবে মহীশূরে কংগ্রেস কেরলের পথে যাবে কি না।

রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন উত্তরপ্রদেশে জোর দল ভাঙাভাঙি চলছে। সংযুক্ত বিধায়ক দলের ২৫ জন সদস্য নাকি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা নাকি ২৩০-এ পৌঁছবে। বিহারে লোকক্রান্তি দল মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর জন্যেও জোর তোড়জোড় চলেছে। উভয় রাজ্যেই বহুধাবিভক্ত সংযুক্ত বিধায়ক দল অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে অক্ষত রাখতে চেষ্টার কসুর করছেন না। মধ্যপ্রদেশে, কংগ্রেসের চেষ্টা সফল হয় নি, এখন মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত করে সংযুক্ত বিধায়ক দল ভবিষ্যতে সেরকম চেষ্টার পথ বন্ধ করতে চাইছেন।

সাধারণ নির্বাচনের আগে কংগ্রেস থেকে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও হুমায়ুন কবির (পশ্চিম বাংলা), হরেকৃষ্ণ মহতাব (উড়িষ্যা), মহামায়াপ্রসাদ সিংহ

কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা

(বিহার), কুম্ভরাম আর্য (রাজস্থান) প্রভৃতি। নির্বাচনের পর কংগ্রেসত্যাগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : সর্বশ্রী চরণ সিংহ (উত্তর প্রদেশ), গোবিন্দনারায়ণ সিং (মধ্যপ্রদেশ)। ক্রান্তি দল ছাড়া নির্বাচনের পর এই কয়টি দল গঠিত হয়েছে : লোকদল (পঃ বঙ্গ), শোষিত দল (বিহার), লোকক্রান্তি দল (বিহার), এবং কৃষক বিধায়ক দল (উত্তরপ্রদেশ)। নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্য অংশ নেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক হুমায়ুন কবির (পঃ বঙ্গ), শ্রীবিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ মণ্ডল ও শ্রীএস কে সিন্‌হা (বিহার)।

ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে কংগ্রেসের মত সকল দলই কিছু-না-কিছু ভাঙছে। আগামী নির্বাচনের ফলাফল বহুলাংশে নির্ভর করবে এই ভাঙাগড়ার উপর।

একনজরে

১৯৬৭ | ১৯৬৮

	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ
অন্ধ্রপ্রদেশ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
আসাম	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
উত্তরপ্রদেশ	•	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
উড়িষ্যা	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
কাশ্মীর	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
কেরল	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——
গুজরাট	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ত্রিপুরা	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
পশ্চিমবঙ্গ	——	——	——	——	——	——	——	——	●	●	●	▬	▬
পাঞ্জাব	——	——	——	——	——	——	——	——		●	●	●	●
বিহার	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	●	●	●
মণিপুর	•	•	•	•	•	•	•	•	•	▬	▬	•	•
মধ্যপ্রদেশ	•	•	•	•	•	——	——	——	——	——	——	——	——
মহারাষ্ট্র	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
মহীশূর	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
মাদ্রাজ	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
রাজস্থান	▬	▬	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
হরিয়ানা	•	•	•	——	——	——	——	——	——	▬	▬	▬	▬
হিমাচলপ্রদেশ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

কংগ্রেস • অ-কংগ্রেস ....
অকংগ্রেস কোয়ালিশন ——
রাষ্ট্রপতির শাসন ▬
কংগ্রেস কোয়ালিশন বা সমর্থিত ●

গত নির্বাচনের পর সমগ্র ভারতব্যাপী কোথাও রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রবর্তন হয়। এক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এসেছে দল ভাঙাভাঙি নিয়ে এক চরম বিশৃংখলা কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস একক সংখ্যা- অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্র- গরিষ্ঠতা লাভ করে। আবার কোথাও অ- পতি শাসন প্রবর্তনের পর মধ্যবর্তীকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কয়েকটি নির্বাচনও এগিয়ে আসছে। এই অবস্থায় রাজ্যে দু-এক মাসের মধ্যেই মন্ত্রিসভার সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক চিত্রটি এখানে পতন ঘটে। কোথাও কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা, তুলে ধরা হোল।

বড় দল থেকে ছোট দল

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়
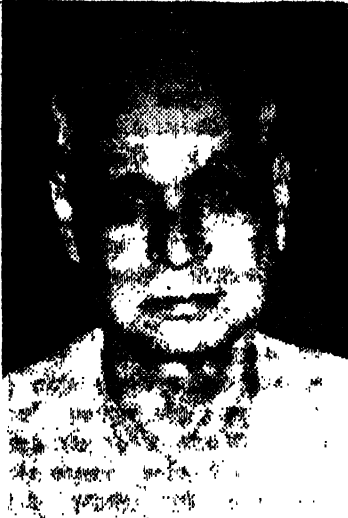
বঙ্কিমচন্দ্র সত্য সত্যই ঋষি ছিলেন। ঋষিরা শুধু নাকের ডগার জিনিসটিই দেখেন না, তাঁরা ভবিষ্যতের ঘটনাও প্রত্যক্ষ করেন—ইঙ্গিতে সে-কথা জানিয়েও যান। মাতৃবন্দনা করে তিনি একদিন গেয়েছিলেন, "বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং"। সেদিনের পটভূমিতে মা আমার নিশ্চয় বহুবলধারিণীং ছিলেন। আজ মা হয়েছেন—বহুদলধারিণীং। আজকের বাংলাদেশে দলের সংখ্যা কম করে পঁচিশটি। এই দলীয় শোভাযাত্রায় যেসব পতাকা দেখা যাবে, তার সবগুলি এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। শুধু সেই পার্টিগুলির কথাই এখানে আলোচনা করা হবে, যেগুলি নবাগত, রাজনীতির খোলা ময়দানে যেগুলি এখনও আগন্তুকের পর্যায়ে পড়ে।

এসব দলের উৎপত্তি সন্ধানী নিশ্চয় জানেন যে, তাঁদের উৎস স্রোতমূলটি এক। তা হল—বাংলা কংগ্রেস। বছর-তিনেক আগে কংগ্রেসে দলাদলির ফলে বাংলা কংগ্রেস নামক দলের চারাটি বাংলার সরেস মাটি ফুঁড়ে মাথাচাড়া দেয়। কিন্তু চারার গোড়া শক্ত হওয়ার আগেই সাতটি পার্টির অনেক [illegible] এসেছে। জানি না ভবিষ্যতে কি হবে।

চতুর্থ নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস প্রার্থীরা বিধানসভার চৌত্রিশটি আসনে জয়ী হয়। দলের সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়া অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রবেশ করেন।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে একটি গ্রুপ গড়ে ওঠে, যাঁরা নানা কারণে সুশীলবাবুর ওপর বিরক্ত। এই গ্রুপে ছিলেন ২৪ পরগণা থেকে নির্বাচিত বাংলা কংগ্রেসের সবকয়জন সদস্য; তাঁরা হলেন সর্বশ্রী জাহাঙ্গীর কবির, চণ্ডীপদ মিত্র, জয়ন্তীপ্রসন্ন মুখার্জি, হরেন্দ্রনাথ মজুমদার গঙ্গাধর প্রামাণিক, আমীর আলী মোল্লা জয়নাল আবেদীন, অধর হালদার এবং হৃষীকেশ হালদার। নদীয়ার সর্বশ্রী নলিনাক্ষ সান্যাল, ধণীন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল, জগন্নাথ মজুমদার এবং মেদিনীপুরের সর্বশ্রী মহতাপচন্দ্র দাস, প্রশান্ত গায়েনও এই গ্রুপে ছিলেন। তাঁদের মোট সংখ্যা চৌদ্দজন। তাছাড়া মেদিনীপুরের আরও অন্তত তিনজন বাংলা কংগ্রেস এম-এল-এ গত অক্টোবর মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই গ্রুপের সঙ্গে চলছিলেন।

তাঁরা বিভিন্ন সময়ে অজয়বাবুর কাছে সুশীলবাবু সম্পর্কে নালিশ জানান; দেখা যায়, তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। এরই মধ্যে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে মন-কষাকষি তীব্র হচ্ছিল। মন-কষাকষির মূলে ছিল আইন-শৃঙ্খলা এবং আরও তিনটি প্রশ্ন। এই চারটি প্রশ্ন অজয়বাবুর মনকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, তিনি ২রা অক্টোবর যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। এ-সিদ্ধান্তের কথা মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকে তাঁর দলের এম-এল-এ'দের জানাননি। পরে অবশ্য তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলান কিন্তু কথাটা আর গোপন থাকেনি।

এ নিয়েও দলের মধ্যে ঝড় ওঠে। আগে যে গ্রুপটির কথা বলা হয়েছে, তাঁরা এই ব্যাপারটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের তীব্র

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

সমালোচনা করেন। কিন্তু তাঁদের কথায় দুটি সুর শোনা যায়। একটি সুর: মুখ্যমন্ত্রী ঠিক কাজই করছিলেন; তবে এতবড় গুরুত্বের ব্যাপার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের কাছে গোপন রেখে তিনি ভুল করেছিলেন। আর একদল বলেন; মুখ্যমন্ত্রী এখন যা করতে যাচ্ছিলেন তা ভুল; গোপনে করতে যাওয়া আরও অন্যায়।

তবে তাঁরা উভয় পক্ষই বলেন, সব ব্যাপার মিটে যেতে পারে যদি বাংলা কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী পুনর্গঠিত করা হয়। এ-ব্যাপারে কিছুদিন আগে নয়াদিল্লীতে বাংলা কংগ্রেসের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি চুক্তিও হয়েছিল। অজয়বাবুর দূত সেখানে বিদ্রোহীদের দাবী মেনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঐ চুক্তি মানা হচ্ছে না।

১৫ই অক্টোবর কলকাতায় বাংলা কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনেই বিভেদ আত্মপ্রকাশ করল। শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের নেতৃত্বে একদল এম-এল-এ সম্মেলন বয়কট করলেন। শ্রীকবিরের কাছ থেকে একটি টেলিফোন পেয়ে শ্রীজগন্নাথ মজুমদার একদল এম-এল-এ নিয়ে অজয়বাবুর কাছে আবার দরবার করলেন। অনুরোধ জানালেন, সুশীলবাবু মন্ত্রী থাকুন কিন্তু সম্পাদকের পদে ইস্তফা দিন। জগন্নাথবাবু, অজয়ত

ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দানের জন্য স্পীকার শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। এরপর আর বিধানসভার অধিবেশন বসেনি
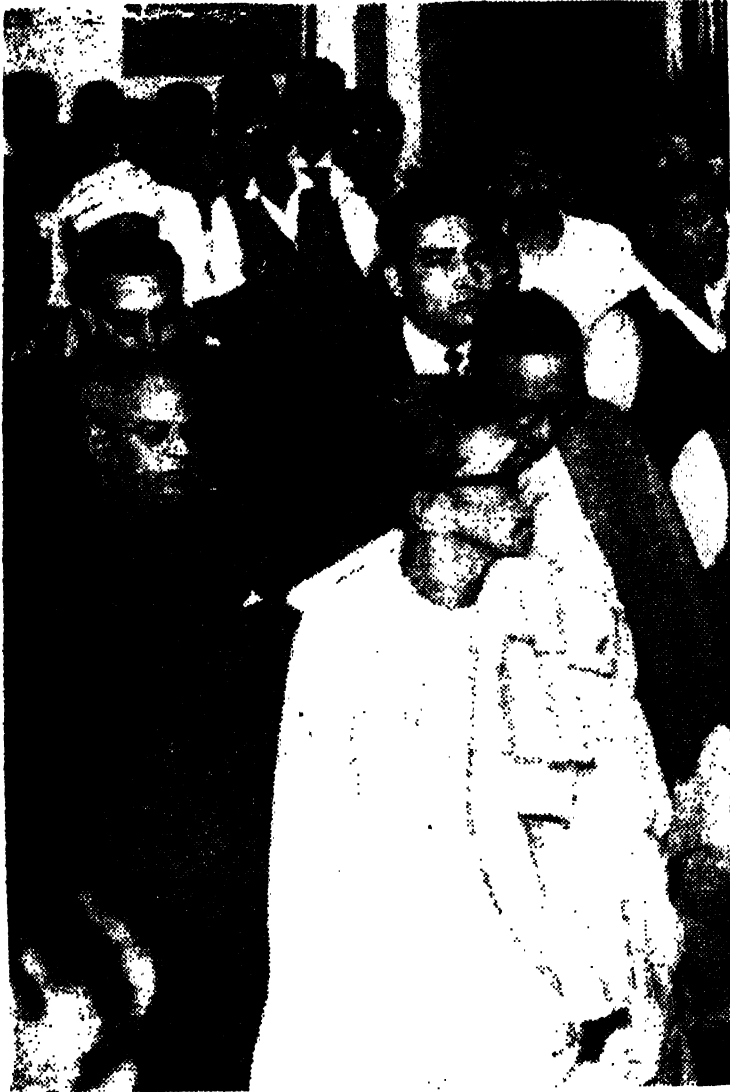
কাতরভাবে অনুরোধ জানালেন, অজয়দা, এখনও ভেবে দেখুন। একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য এত কষ্টে গড়া দল ভেঙে যাবে?

এর উত্তর দিয়েছিলেন নাকি সুশীল-বাবু। তিনি বলেছিলেন, ভেঙে যায় যাবে। 'একলা চলো রে' বলে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, দরকার হলে আবার একলা চলব।

এরপর ঘটনাস্রোত অত্যন্ত বেগে বয়ে চলল। অজয়বাবু কিছুতেই বিদ্রোহীদের দাবী মানবেন না; বিদ্রোহীরাও আর সুশীলবাবুকে মেনে নেবেন না। ২৮শে অক্টোবর মীমাংসার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন প্রশ্ন উঠল এবার কি?

একটা মত হোল, পৃথক দল গড়ে যুক্তফ্রন্টেই থাকা হোক। আর একটা মত ছিল আলাদা দল গড়ে ফ্রণ্টের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করা হোক। ২৪ পরগণার এম-এল-এ'রা শেষোক্ত মতের সমর্থক; বাদ শুধু শ্রীজাহাঙ্গীর কবির। যুক্তফ্রন্টের ওপর থেকে এখনই সমর্থন প্রত্যাহারে আপত্তি জানিয়ে শ্রীকবির দার্জিলিং গেলেন। ফিরলেন ৩১শে অক্টোবর। সেদিন রাজ্যপালের কাছে একটি চিঠি চলে গেছে। তাতে ক্রান্তি দলের ৮ জন সদস্য যুক্তফ্রন্টের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন।

এই আটজনের সঙ্গে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষসহ আর ৬ জন নির্বাচিত এম-এল-এ যোগ দিলেন। এঁরা সকলে মিলে গড়ে তুললেন নতুন দল—প্রগ্রেসিভ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (পি-ডি-এফ)।

ঘোষ-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং বাঙলা দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার অনেক দিনের মধ্যে পি-ডি-এফের এক বৈঠকে দলের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। স্থির হয় দলের নতুন নাম হবে ভারতীয় লোকদল। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির লোকদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখ করা দরকার যে, পি-ডি-এফ গঠনের ব্যাপারেও অধ্যাপক কবিরের হাত ছিল অনেকখানি। এই লোকদল এবারের নির্বাচনে বাঙলা কংগ্রেস তথা ক্রান্তি দলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলার জাতীয় দল

শ্রীসুশীল ধাড়ার বিরোধী যেসব বাঙলা কংগ্রেস এম-এল-এ নতুন সরকারকে সমর্থন জানালেন না, শ্রীজাহাঙ্গীর কবির তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। স্থির হল তাঁরা মূলত কংগ্রেস বিরোধী দলরূপেই কাজ করবেন। অবশ্য তার জন্য তাঁরা কম্যুনিস্টদের 'লেজুড়ে' পরিণত হবেন না।

৮ই জানুয়ারী মুস্লিম ইন্সটিটিউটে এক সম্মেলনে বাঙলার জাতীয় দলের জন্ম ঘোষণা করা হল। এতে পূর্বতন বিধান-সভার যে ছয়জন সদস্য আছেন তাঁরা হলেন: সর্বশ্রী জাহাঙ্গীর কবির, জগন্নাথ মজুম-দার, মহতাপচন্দ্র দাস, প্রশান্ত গায়েন, মণীন্দ্র মণ্ডল এবং করিম বক্স।

জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠাতারা প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা যুক্তফ্রন্টের সঙ্গেই থাকবেন। যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ পার্টিও তাই চাইছিলেন। ক্রান্তি দলের নেতারা কিন্তু তা চান নি। ফলে জাতীয় দল আজ একা, যুক্তফ্রন্টে তার স্থান হয় নি। স্বভাবতই জাতীয় দলও আজ লোক দলের মতই ক্রান্তি দলের বিরুদ্ধে

জাহাঙ্গীর কবির

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
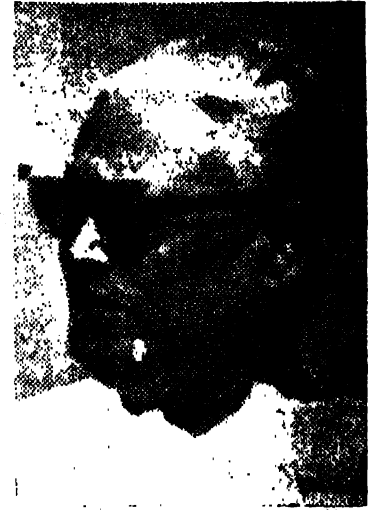
অতুল্য ঘোষ

তার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর।

আই-এন-ডি-এফ

১৫ই জানুয়ারী কংগ্রেস ঘোষ-মন্ত্রিসভায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়। আগের দিন বেশ রাত্রে কলকাতায় কর্মরত এক বিশেষ সংবাদদাতা জানলেন যে, কোয়ালিশন সরকারের ওপর থেকে কংগ্রেস ও পি-ডি-এফে'র এক দল সদস্য সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবেন। পর দিন নয়াদিল্লীর মাত্র একখানি কাগজে এ সংবাদ বেরুলে এবং তা আবার রাজ্য রাজনীতির জলকে ঘুলিয়ে তুলল।

১১ই ফেব্রুয়ারী ঐ বিশেষ সংবাদদাতার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। দিনটি রাজনৈতিক দিনপঞ্জীতেও বিশেষভাবে চিহ্নিত। ঐ দিন সন্ধ্যায় আরও একটি নতুন দল জন্ম নিল। নাম তার ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট। তার কিছুক্ষণ আগে শ্রীআশু ঘোষের নেতৃত্বে ১৬ জন এম-এল-এ রাজ্যপালের কাছে হাজির হলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা আর ঘোষ-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেন না। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন দলের নেতা। নেতা ছাড়া এখনও যাঁরা এই দলে আছেন তাঁরা হলেন : সর্বশ্রী কাজেম আলী মীর্জা, এস এম আবদাল্লা, শঙ্কর সেন, ঈশোর, নেপাল বাউরি, বাবুলাল হেমরম, ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, টি এ নুরনবী, সতীশ বাউরি, অধর হালদার, গিরিন মণ্ডল, সাজ্জাদ হোসেন, হৃষিকেশ হালদার এবং গহুরাম মাঝি।

যুক্তফ্রন্ট কথা দিয়েছিল যে, ঘোষ মন্ত্রিসভার পতন ঘটলে একটি নতুন সরকার গঠনের ব্যাপারে তারা আই-এন-ডি-এফকে একটু মর্যাদা দেবে। রাষ্ট্রপতির শাসন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের পর অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সোমনাথ লাহিড়ী।

হুমায়ুন কবির
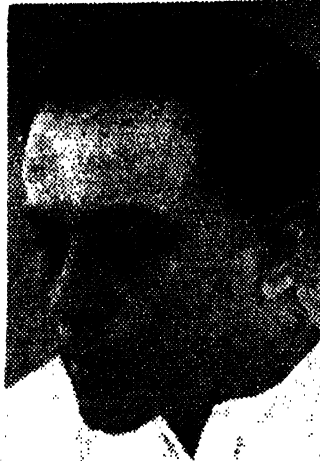
জ্যোতি বসু

আশু ঘোষ

বিধান সভার শেষ অধিবেশনে যোগদানের জন্য চলেছেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, দাশরথি তা এবং প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র।

প্রবর্তনের পর এ অধ্যায় শেষ হয়েছে। এখন বিধানসভায় প্রার্থী দেওয়ার পালা। যতদূর জানা যাচ্ছে এ ব্যাপারে যুক্তফ্রন্ট আই-এন-ডি-এফ'কে কোন সুযোগ দিতে নারাজ। তাই এখনও পর্যন্ত আই-এন-ডি-এফ নির্বাচনী দরিয়ায় নিঃসঙ্গ।

আজাদ হিন্দ সংঘ

আগামী সাধারণ নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি নতুন পার্টি ময়দানে নামতে পারে। সে পার্টির নাম আজাদ হিন্দ সংঘ। চব্বিশে ফেব্রুয়ারী খাস রাজধানীতে সংঘের গোড়াপত্তন করেছেন নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয়নাথ বসু এম-পি। শ্রীবসু গত নির্বাচনে ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং জয়ী হয়েছিলেন। নতুন দল গড়ার ব্যাপারে শ্রীবসুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হচ্ছেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ মাইতি। শ্রীমাইতি গত নির্বাচনে বাঙলা কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোক-সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আর যাঁরা উদ্যোগী তাঁদের মধ্যে অনেকেই আজাদ হিন্দ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন।

এই দল নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। এ'দের কর্মসূচীতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, চীন ও পাকিস্তানের সম্পর্কে কঠোর মনোভাব, ভারতের আণবিক অস্ত্র নির্মাণ, "সত্যকার গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্র স্থাপন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।

আজাদ হিন্দ সংঘ নির্বাচনের ব্যাপারে সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে বোঝা-পড়ায় আসতে চান। অবশ্য এখনও পর্যন্ত সংঘের পক্ষ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না।

এই হারে বাঙলা দেশে নতুন নতুন দল গজিয়ে উঠতে থাকলে অদূর-ভবিষ্যতে মা আমার 'শতদলধারিণী' হয়ে উঠবেন এমন আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

সন্ধ্যার জল্পনা

বারান্দার আলো নেভানো ছিল। কাল-পুরুষের কোমরের ছোরাটার দিকে তাকিয়ে মিসেস শ্রীবাস্তব সরবতের গেলাসে চুমুক দিলেন। 'সুজাতা, তোমায় বলতে কোনো আপত্তি নেই। আমি জানি তুমি বুঝতে পারবে।' সর্বনাশ, সুজাতা ভাবলো এখন যদি আত্মকাহিনী শুরু হয়, সাড়ে আটটা বাজছে। একটু পরেই শেখর ছেলেদের নিয়ে সার্কাস থেকে ফিরবে। এখনো রুটির আটা মাখা হয়নি, সন্ধেবেলায় দুধ জ্বাল না দিয়ে রাখা রয়েছে। মিসেস শ্রীবাস্তব চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। চোখটা আকাশের দিকেই রেখে খেলাচ্ছলে গেলাসের আইস কিউবগুলি নাড়াতে নাড়াতে মৃদু-স্বরে বললেন· 'তুমিই একলা নও। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি এত দেরিতে বিয়ে করলাম কেন। প্রশ্নটা অসঙ্গত নয়। সত্যিই তো, বাবার টাকা, রূপ, পড়াশুনো, বিয়ের জন্য যা যা দরকার কোনটারই তো অভাব ছিল না, তবু তিরিশ বছর পর্যন্ত কুমারী থাকায় লোকের মনে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।' সুজাতা মনে মনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। কে জানতো কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। কোথায় গল্প হচ্ছিল মামুলী দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে। র‍্যাশনে চিনির পরিমাণ আবার কমলো, সব্জির দাম হু হু করে বাড়ছে—ধোপাও সুযোগ বুঝে রেট বাড়ালো, অথচ গরম-কালের সন্ধ্যায় একটু ধোপার বাড়ির পাটভাঙা সুতী শাড়ি না পরতে পারলে ভালোই লাগে না, এই সব নিরাপদ মেয়েলী আলোচনা। শ্রীবাস্তবের ব্রিজের নেশা। রোজ সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে যেতে না পারলে রীতিমত কষ্ট পায়। ক্যাম্পাসের সবাই জানে যে মিসেস শ্রীবাস্তবের সন্ধ্যাটা সেজন্য একাই কাটে। তাই আজ শেখর ছেলেদের নিয়ে বেরোনোতে সুজাতা খবর পাঠিয়েছিল আমিও সন্ধ্যায় একাই আছি, এসো না গল্প করা যাবে। এখন তারই জের কতদূর চলে কে জানে।

'সবাই ভাবে আমরা প্রেম করে বিয়ে করেছি। কেনইবা ভাববে না। দুজনে একই ডিপার্টমেন্টে পড়াই—এতদিনের জানা-শোনা। কিন্তু সুজাতা, আমি তোমায় বলি শোনো মেয়েদের জীবনে একবারই প্রেম হয়। বিশেষত হিন্দুর মেয়ের।' সুজাতা সামনে তাকিয়ে ভাবলো বারান্দার পরি-বেশটাই ভুল। বেলফুলের গন্ধ, এক আকাশ ঝকমকে তারা, আবছায়া অন্ধকার। চট করে উঠে মাথার ওপরের বাট পাওয়ারের আলোটা জেলে দিলে হয়তো প্রথম যৌবনের প্রেমের গল্পটা এখনো আটকানো যেতে পারে। অন্ধকারে চোখে পড়ছে না, কিন্তু বারান্দার চতুর্দিকে ট্রাইসাইকেল, ঘুড়ি লাটাই, রবারের চটি আর ভাঙা রেলগাড়ি ছড়ানো আছে। সেগুলো নজরে পড়লে হয়তো কাজে দেবে। কিন্তু থাক। ভদ্রমহিলা বোধহয় সারা দুপুর খসখসের পর্দাঘেরা ঘরে মহিলাদের পত্রিকায় প্রেমের গল্প পড়ে রবিবার পালন করেছেন। বিকেলে আয়ার তৈরী চা জলখাবার খেয়ে, সুগন্ধি দেওয়া জলে স্নান করে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। এখন নক্ষত্রালোকে যদি একটু স্মৃতিবিলাসের ইচ্ছা হয়, তো এমন কি দোষের। সুজাতার ঝি যে ছুটিতে বাড়ি গেছে, আর এই গরমে সারা দুপুর তিনটি অনিচ্ছুক বালককে ঘুম পাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে যে কিরকম গলদঘর্ম হতে হয়েছে সেকথা মিসেস শ্রীবাস্তবের জানার কথা নয়।

'হিন্দুর মেয়ের প্রেম একবারই হয়। সত্যি সুজাতা, আমার মুখে হিন্দুর মেয়ে শুনে তুমি হয়তো হাসছো। আমার চুল ছোট করে কাটা, আমি মাঝে মাঝে স্মোক করি, বিদেশে পড়াশুনো করেছি, জাতের বাইরে বিয়েও করেছি, কিন্তু তবু অন্তরে আমি সেই সনাতন হিন্দু নারীই রয়ে গেলাম। বাইরের যা আধুনিকত্ব দেখছো সেটা আমার ছদ্মবেশ। আসলে মনে মনে

আমি শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মত—আমার সত্যিকারের স্থান হোলো—’

‘হাতপাখা হাতে স্বামীর ভাতের থালার সামনে?’ সুজাতা তাঁর বাক্যের পাদপূরণ করে দিল, ‘শরৎচন্দ্রই তোমাকে মেরে রেখেছেন আসলে। আমার তো ধারণা কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের পর উপন্যাস পড়া ঘোরতর অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। আর তুমি কিনা ড্রইং-রুমে সারি সারি গৃহদাহ চরিত্রহীন সাজিয়ে রেখেছো।’ এখনো আলোচনার মোড় ফেরানো যায়, সুজাতা আশাবাদীর মত ভাবলো। সাহিত্য নিয়ে তর্কই সই—হোক না কেন বহুআলোচিত শরৎ-সাহিত্য। আর যাই হোক ত্রিশোত্তীর্ণা নারীর কলেজ-প্রেমের গল্প শোনার থেকে তো বাঞ্ছনীয়।

মিসেস শ্রীবাস্তব দৃশ্যত আহত হলেন। ‘সুজাতা, তুমি শরৎবাবুর দেশের লোক—তুমি বাংলায় তাঁর বই পড়েছো, তোমার মুখে এ কি কথা। শরৎচন্দ্রের লেখা নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিয়ে আমি বড় হয়েছি। আমার বাবা ডিস্ট্রিক্টস্-এ ঘুরতেন। যেখানেই যাই বিরাট বিরাট বাংলো। আমি এক সন্তান। সঙ্গীহীনভাবে সারাদিন এঘর থেকে ওঘর ঘুরে বেড়াই। কথা বলার লোক নেই, আয়া অর্ডারলি ছাড়া। আমার সঙ্গী শুধু গল্প উপন্যাসের বই। শরৎচন্দ্রের রাশি রাশি উপন্যাস। আমার জীবনের সব আদর্শ আমি তাতেই পেয়েছি। তারপর একুশ বছর বয়সে ওই-রকম সুরক্ষিত জীবন থেকে হঠাৎ একেবারে বিলেত গিয়ে পেঁছিলাম। যাকে প্রথম ভালবাসলাম তাকেই প্রাণমন দিলাম। তাইতো এত বছর পরে বিয়ে করেও আমি প্রেম আর করতে পারলাম না।’

সুজাতার মনে পড়ল, যখন সন্ধ্যার শুরুতে র‍্যাশন আর ধোপা আর শাড়ির গল্প হচ্ছিল তখন মিসেস শ্রীবাস্তব খুব রহস্যজনকভাবে বলেছিলেন ‘অবশ্য এখন আর ধোপার খরচ অতটা গায়ে লাগে না। রঙিন শাড়ি পরি তো। রোজ না ধোয়ালেও চলে। আগে আমি বিনা পাড়ের শাদা শাড়ি ছাড়া পরতাম না। তখন প্রতিদিন একটা করে শাড়ির পাট ভাঙতে হোতো। সাত বচ্ছর আমি শাদা শাড়ি পরেছি।’ সুজাতা তখন বোকার মত জিজ্ঞেস করেছিল ‘কেন?’ ‘কেন?’ মিসেস শ্রীবাস্তবের মুচকি হাসিতে রহস্য গাঢ়তর হয়েছিল। ‘শুধু কি শাদা শাড়ি? সাত বচ্ছর আমি নিরামিষ খেয়েছি, মুখে পাউডার দিইনি, টিপ পরিনি, লিপস্টিকের কথা তো বাদই দাও।’

‘কিন্তু কেন?’ সুজাতা তার প্রশ্নের আবার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিল ‘এরকম কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলে কেন শুধু শুধু? সত্যি বলতে কি তুমি বিয়েটাই বা কিভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলে এতদিন তাই আমি ভাবি।’ ব্যাস্। আর কিছু বলতে হয়নি। মিসেস শ্রীবাস্তব ঘনিষ্টভাবে গলা নামিয়ে বলেছিলেন ‘বলবো, তোমাকে বলবো। তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই সুজাতা। তুমি বুঝতে পারবে।’

‘আমার যখন ষোলো বছর বয়স তখন থেকে মা গয়না গড়াতে শুরু করেছিলেন। কলেজের ছুটিতে হস্টেল থেকে বাড়ি আসতাম তখন স্যাকরার কাছে মাপ দিতে হোতো। কোনবার চুড়ি, কোনবার আংটি, কোমরের গোট।’ একটু ম্লান হেসে যোগ করলেন, ‘ষোলো বছরের সরু কোমরে গোট তিরিশ বছরের কনের কোমরে আর আঁটলো না। মা বাড়াতে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হইনি। সব জিনিসের একটা সময় আছে। যাই হোক, মেয়ে কলেজে পড়ছে, মা এদিকে থরে থরে গয়না কাপড় দানসামগ্রী কিনে কিনে সাজিয়ে রাখছেন। জজ সাহেবের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে দেওয়া-থোয়াটা উপযুক্ত হওয়া চাই তো। আর খোঁজখবর চলছে। কোথাও ঘর উপযুক্ত হয় তো বর লম্বায় বড় খাটো। রূপবান আই এ এস ছেলে মিললো তো ঘর খানদানী নয়। ছেলের গুণ ও বাপের প্রতিপত্তি মানানসই হোলো তো দেখা গেলো বোনের সংখ্যা অনেকগুলি। ঈশ্বর না করেন বাবা চোখ বুজলে বোনের বিয়ে দিতে দিতে প্রাণ যাবে। এই সব করতে করতে আমার কুড়ি বছর পুরো হোলো। হস্টেলের পাট চুকিয়ে বাড়ি এলাম বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে শুধু নাটক নভেল পড়ি আর কুশনকভার ও টেবিল ক্লথে এমব্রয়ডারী করি—এসব হাতের কাজও বিয়ের তত্ত্বে যাবে। এমন সময়ে হঠাৎ একদিন লম্বা একটা মার্কিনি খামে একটা অপ্রত্যাশিত চিঠি এসে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। কলেজে থাকতে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাট্টাচ্ছলে একটা বিজ্ঞাপনের উত্তরে রাটগার্স ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সে কথা আমার নিজেরও খেয়াল ছিল না। এতদিনে তার জবাব এল হাজির। আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে পারি। কলেজের মাইনে মাফ্, তবে থাকা খাওয়ার খরচ নিজের। ব্যাপারটাতে শুধু আমার বাবা মা কেন আমিও যেন একটু হকচাকিয়ে গেলাম। স্বাধীনভাবে বিদেশ গিয়ে লেখাপড়ার কথা আমি কোনদিন ভাবিনি। চিরকাল জানি কলেজে পড়াটড়াগুলো অলস প্রস্তুতি মাত্র। এসব ছেলেখেলার পর ঘটাকরে বিয়ে হয়ে যাবে আমার বাবার মতই কোন সিভিল সারভেন্টের সঙ্গে— কি অন্যকোন বিত্তবান ঘরে। শরৎচন্দ্র আর প্রেমচন্দ পড়ে নিজেকে মনে মনে আদর্শ স্ত্রী বলে কল্পনা করে এসেছি। কি করে স্বামীর ঘরে সবাইকে খুশি করবো, অনাঘ্রাত ফুলের মত নিজেকে তুলে দেবো সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের হাতে—এই সব দিবাস্বপ্নে আমার মধ্যাহ্ন ভরে থাকতো। হঠাৎ এ চিঠি পড়ে আমার কি রিঅ্যাকশন হওয়া উচিত তা ঠিক করতেই দিন কয়েক লেগে গেল। আমার বাবা চিরদিন নিজেকে উদারপন্থী বলে গর্ব করে এসেছেন। আমার বিদেশে অ্যাপ্লাই করা দেখে তিনি ধরে নিলেন আমার উচ্চশিক্ষা পাবার ইচ্ছা। কাজেই চিরদিনের সংস্কার, নিজের ইচ্ছে সব চেপে তিনি আপাত উৎসাহসহকারে আমার যাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। সবাইকে ডেকে ডেকে জাঁক করে বললেন কত শ'য়ে শয়ে অ্যাপ্লিকেশন সেখানে গেছে, তার মধ্যে থেকে যদি আমার মুন্নিকে ওরা বেছে নিয়ে থাকে তো আমরা স্বার্থ-পরের মত বাধা দেবো কেন। বিয়ে থাওয়া ঘর-সংসার তো রইলই। ছেলেমানুষ বছরখানেক শখ হয়েছে ঘুরেই আসুক। আমার নিজের কি ইচ্ছা বোঝবার অবকাশই হোলো না। বাবার গর্ব আর মায়ের কান্না-কাটির মধ্যে হুড়োহুড়ি করে একটা মাস কেটে গেল—পাসপোর্ট, ভিসা আর প্লেনের টিকিট করতে। বিয়ের তত্ত্ব দেবার জন্য কেনা নতুন সুটকেসে মা সাজিয়ে দিলেন এতদিনের জমানো সব মুর্শিদাবাদী, কাঞ্জী-ভরম আর গদোয়ালী শাড়ি। কোথায় হাতে মেহেদী লাগিয়ে, হলদে শাড়ি পরে আমি ডোলীতে চড়বো, তার বদলে চললাম নতুন হাইহীল বন্ধ জুতো পরে একলা বিশ্বজয় করতে। ভাগ্যের ফেরে মা চোখ মুছলেন, আমিও হতভম্ব হয়ে রইলাম।’

সুজাতা ভাবলো এটা তো উপক্রমণিকা। আসল গল্পটা বোধহয় এবার শুরু হবে। শুনতেও কৌতূহল হচ্ছে, অথচ শেখর ছেলেদের নিয়ে বাড়ি এসে পড়বে এক্ষুনি। বাচ্চাদের খুব খিদে পেয়েছে নিশ্চয়—যদি না সার্কাসে শেখর ওদের আইসক্রীম খাইয়ে থাকে। তবু ন'টা বেজে গেছে—রুটির আটাটা কি বারান্দায় নিয়ে এসে মেখে ফেলবে,—না মিসেস শ্রীবাস্তবকে বলবে চলো রান্নাঘরে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসবে—ততক্ষণ আমি রুটিগুলো বানিয়ে ফেলি।

সুজাতা উঠে পড়লো। তাই বোধহয় ভালো হবে। তাড়াতাড়া রান্নাঘরের আলো জ্বালা থাকবে—জিরে হলুদ মশলার শিশির মাঝখানে বসে শ্রীমতী শ্রীবাস্তবের রোমান্টিকতার আধিক্য একটু প্রশমিত হতে পারে। স্টোভ জেলে দুধটা চড়িয়ে সুজাতা বারান্দায় এলো মিসেস শ্রীবাস্তবকে ডাকতে। ইতিমধ্যে মিসেস শ্রীবাস্তব আরামচেয়ারের পিছনে অনেকটা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আকাশের দিকে মুখ তুলে বসেছিলেন। সুজাতা ফিরে আসতে খুব নীচু গলায় রহস্যের আমেজ মাখিয়ে শুধু বললেন ‘নিঃসঙ্গতা!’ চোখটা বন্ধই রইল। কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। যতক্ষণ না তিনি আর কিছু বলেন সুজাতা রান্নাঘরে মোড়া নিয়ে বসার মত তুচ্ছ কথা বলে এই অর্থ-পূর্ণ স্তব্ধতা ভাঙতে সাহস পেল না। খানিকক্ষণ পরে মিসেস শ্রীবাস্তব নিঃশ্বাস ফেলে শুরু করলেন, ‘আজকাল নিঃসঙ্গতা নিয়ে অনেক গল্প কবিতা লেখা হচ্ছে দেখছি। কিন্তু বিদেশে ভারতীয় ছাত্রীর নিঃসঙ্গতা যে কি নিদারুণ তা নিয়ে

কাউকে লিখতে দেখি না। তুমিও অবশ্য বিদেশ গেছ সুজাতা, কিন্তু সে তো বিয়ের পরে। তুমি জানো না কুমারী মেয়ের পক্ষে আমেরিকায় ছাত্রীজীবন কি দুঃসহ।'

'দুঃসহ? তুমি কি বলো!' এতক্ষণে সুজাতা কথা বলার সাহস পেলো। 'আমার তো অনেক সময় দুঃখ হোতো কেন বিয়ের আগে আসিনি। কতো বেশি মনোযোগ পাওয়া যায় লোকের কাছ থেকে। সিনেমা থিয়েটারের পয়সা তো ছেলেরা দিয়েই দেয়, এমনকি মাঝে মাঝে দামী রেস্টুরেন্টেও পরের খাওয়া যায়। ট্রান্সপোর্টের ঝামেলা নেই। ডেটিংএর কল্যাণে শনিবার রবিবার মুফত ভালো গাড়িও চড়া হয়ে যায়। এর চেয়ে আরাম আর কি আছে।'

মিসেস শ্রীবাস্তবের জবাব শুনে মনে হোলো সীরিয়স ব্যাপার নিয়ে রসিকতা ও'র পছন্দ নয়। উনি বললেন, 'তুমি ঠাট্টা করছো সুজাতা। তুমি ভালো-ভাবেই জানো ভারতীয় হিন্দু মেয়ের পক্ষে ডেটিং করার কথা ভাবাই কিরকম অসম্ভব। শনিবার দিন সন্ধ্যা হতেই ডরমিটারী খালি হয়ে যেত, সোমবার পর্যন্ত আমার যে কিভাবে সময় কাটতো সুজাতা, আমি কি করে বোঝাই। এক একবার ভাবতাম ফিরে চলে যাই দেশে। এখনো গিয়ে চিরাচরিত প্রথায় বিয়ে করে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেতে পারি। কিন্তু বাবার কথা ভেবে থেমে যেতে হোতো। খরচপত্র করে আমাকে পাঠিয়েছেন, অন্তত এম-এটাও যদি না পাশ করে যেতে পারি বাবা বড় দুঃখ পাবেন।

'কিন্তু শুধু পড়াশুনো নিয়েই তো মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে পারে না। মেয়েরা সব ক্লাসের বাইরে যে সব গল্প নিয়ে মেতে থাকে তাতে আমার কোন অংশ নেই। সে সব কথা শুনলে আমার কান লাল হয়ে যায়। নাটকনভেল আমিও কম পড়িনি। কিন্তু আমি মনে মনে ছিলাম অপাপবিদ্ধ। ডরমীটারীর মেয়েদের নির্লজ্জতা, অশালীন আলোচনা আমার দিনগুলিকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।'

আসল গল্পটা শুরু হতে দেরি দেখে সুজাতা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। মনে মনে ভাবলো, ন্যাকামি শব্দটার অন্য কোন ভাষায় অনুবাদ হয় কি? হিন্দিতে 'নখরা' বলে একটা কথা আছে বটে—কিন্তু ইংরেজিতে? আবছা আলোয় মিসেস শ্রীবাস্তবের আকৃতির দিকে তাকিয়ে সুজাতার হঠাৎ মনে হোলো যদি বয়স কুড়ি বছরের নীচে হয়, আর কোমরের মাপ যদি হয় চব্বিশ ইঞ্চির কম, তাহলে হয়তো বা ন্যাকামিটা মানিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ত্রিশোর্ধে শারীরিক স্ফীতির শিকার হবার পর নৈব নৈব চ। যাক গে তবু এখন ভদ্র-মহিলাকে ঘাঁটিয়ে কাজ নেই—প্রেমের ব্যাপারটা এলো বলে। এটা জানা কথাই যে, নিঃসঙ্গতার একমাত্র ওষুধ প্রেম। অবশ্য

ভাগ্যবানটি কোন মার্কিনী ছোকরা না প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র সেটা না জানা পর্যন্ত ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। শরৎচন্দ্রের নায়িকার রোলের জন্য যিনি রিহার্সাল দিয়ে রেডী, ডরমিটারীর মেয়েদের আলোচনা শুনে যিনি শিউরে ওঠেন, তাঁর সম্বন্ধে আমেরিকান কোন ছেলে কৌতূহলী হবে কিনা সুজাতা ঠিক আন্দাজ করতে পারছিল না। অবশ্য চেহারার ব্যাপারটাও ফেলে দেবার নয়। এখন পাশ থেকে ভদ্রমহিলার তিনটি চিবুক দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু দশ বছর আগে তিনি তন্বী ছিলেন এটা কল্পনা করা যেতে পারে। ভীষণ দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখন কোনো রকমে গল্পের শেষটুকু শুনে ফেলার গরজ যেন সুজাতারই। অথচ মিসেস শ্রীবাস্তব তেমনি চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনই তাড়া নেই।

'তারপর' সুজাতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো। বেশি হুড়োহুড়ি করলে আবার স্মৃতিচারণের সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে।

'তারপর?' মিসেস শ্রীবাস্তব এবার চোখ খুলে যে রকম আত্মগতভাবে হাসলেন তাতে সুজাতার মনে হোলো এই-বার আসল কথায় আসতে আর বেশি দেরি নেই। 'এই রকম একটি নির্জন শনিবারের সন্ধ্যায় আমার দেখা হোলো মনুজেন্দ্র উপাধ্যায়ের সঙ্গে। মনুজেন্দ্র আসলে এসে-ছিল অন্য একটি মেয়ের জন্য। ওর ডেট ছিল আমার রুম-মেট স্যান্ডী স্কোলসের সঙ্গে। স্যান্ডীর বাড়ি থেকে হঠাৎ জরুরী তলব আসায় ওকে দুপুরের ট্রেনে চলে যেতে হয়। আমার ওপর স্যান্ডী ভার দিয়ে গিয়েছিল মনুজেন্দ্রের কাছ থেকে মার্জনা চেয়ে বুঝিয়ে বলবার। ডরমিটারীর হলে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে বলতে আমার মনে হোলো যেন অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসেছি, যেন অনেক দিন অনাবৃষ্টির পর হঠাৎ বৃষ্টি এলো। স্যান্ডীর কথা থেকে কখন যে আমার নিজের কথায় এসেছি, কখন যে একটা সোফায় এসে পাশাপাশি বসেছি, কখন যে গল্পে গল্পে সন্ধ্যা কেটে গেছে আমি বুঝতে পারি নি। মনুজেন্দ্র যাবার সময়ে আমাকে বললো অনেক দিন কারুর সঙ্গে বসে এ রকম নিরিবিলিতে মন খুলে কথা বলি নি। এ দেশের মেয়েরা এসবের মর্ম বোঝে না। ওরা খালি বোঝে ঊর্ধ্বশ্বাসে এখান থেকে ওখানে গাড়ি করে ছোটা,—সিনেমা থিয়েটার, খাওয়া আর নাচ। মনুজেন্দ্র চলে যাবার পর সে রাত্রে আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি। খেতে ভালো লাগছে না, ঘুমোতে ভালো লাগছে না, কোন বই পড়ায় মন বসাতে পারছি না—অথচ এত দিনে দুর্বিষহ দিনগুলি হঠাৎ যেন ভালো লাগায় ভরে গেছে। কবিতা উপন্যাসের অভিজ্ঞতা থেকে মিলিয়ে দেখলাম এই হোলো প্রেমের লক্ষণ।

মনুজেন্দ্রের মধ্যে আমি কি দেখেছিলাম এখন জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবো না। ওর জামা-কাপড়ের পারিপাট্য আর যত্নলালিত সরু একজোড়া গোঁফ ছাড়া চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বলে মনে পড়ে না। কিন্তু সেসব কথা তখন গৌণ। মেয়ে-দের মধ্যে ও খুব পপুলার ছিল সেটা আমি এর আগেও লক্ষ্য করেছি। উচ্চারণে কষ্টার্জিত আমেরিকান টান সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারতাম ইংরাজি ভাষায় ওর দখল খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু তাতে ওর জনপ্রিয়তালাভের কিছু অসুবিধে হয় নি। আমি ছোটবেলা থেকে কনভেন্টে পড়েছি—আমি সহজেই বুঝতাম ওর ইংরাজি অন্য ভারতীয়দের তুলনায় কত আড়ষ্ট। ও অবশ্য আমার সঙ্গে হিন্দীতেই কথা বলতো। কোন কথা লুকোয়ও নি আমার কাছে। এক গ্রীষ্মকালে রোজ পার্কের বেঞ্চে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছে দ্বারভাঙ্গায় ওর গ্রামের কথা। কি ভীষণ সেকেলে গ্রাম্য-বাড়িতে ও মানুষ। কলেজে পড়েছে দ্বার-ভাঙ্গা শহরে। আমেরিকা আসার আগে কখনো প্যান্ট পরে নি। জাহাজে উঠে অনেক সাহস করে টিকি কেটেছে। এমন কি ওর যে আঠেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে আর সে বৌ গ্রামে আছে সে কথাও আমার কাছে গোপন করেনি।'

'বৌ আছে!' সুজাতা যেন আকাশ থেকে পড়লো। 'কি বলো তুমি? তবু তুমি তার প্রেমে পড়লে?' প্রেমের গল্পের নায়িকার কাছ থেকে এ রকম ব্যবহার অপ্রত্যাশিত।

'সেই তো সুজাতা—সেইটেই তো মুস্কিল। প্রেমের ব্যাপারে লজিক খাটে না।' মিসেস শ্রীবাস্তব এমনভাবে হাসলেন যেন সুজাতা এসবের কিই বা জানে। 'মনুজেন্দ্র বাইরে এত রমণীমোহন হলে হবে কি, অন্তরের দিক থেকে ছিল বড় অসুখী। দাম্পত্য জীবনে ও কখনো সখ্যতা পায় নি। ওর বৌ-এর নাকে নথ—মাথায় সাত হাত ঘোমটা। শীতকালের দুপুরে আঙ্গনের ওপর খাটিয়া পেতে হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি তুলে উপু হয়ে বসে চাল বাছে। লেখাপড়া নাকি ক্লাস ফোর অবধি, মনুজেন্দ্র তাই মনের দুঃখ ভোলবার জন্য আমেরিকায় এসে শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্গ লাভ করে তার জীবনের এই ভ্যাকুয়াম ভরে তোলবার চেষ্টা করছিল। আমি ওর বাইরের ফূর্তিবাজ চেহারার তলায় গোপন নিঃসঙ্গতার পরিচয় পেয়ে ওর প্রতি আকৃষ্ট হলাম—কারণ আমি নিজেও ছিলাম নিঃসঙ্গ। দুজনের একাকীত্ব মিলিয়ে আমরা এক আশ্চর্য ঘনিষ্ট দ্বীপ গড়ে তুললাম যেখানে ও হোলো আমার কানাইয়া আর আমি হলাম ব্রিজ কী গোরী। বাইরের জগত অনেক বেশি সহনীয় হয়ে উঠলো আমার কাছে।'

সুজাতা তখনও ব্যাপারটা ঠিকমত গুছিয়ে উঠতে পারে নি। একদিকে লখনউএর বনেদীঘরের একমাত্র মেয়ে, কনভেন্টে পড়া আই-সি-এস দুহিতা, অন্য দিকে গ্রাম্য মৈথিলী পরিবারের বাল্যকালে বিবাহিত সন্তান—এ দুজনের একাকীত্ব মিলিয়ে কি ধরনের প্রেমের জগত তৈরী হতে পারে সেটাই ও মনে মনে হিসেব করে দেখবার চেষ্টা করছে। এমন সময় মিসেস শ্রীবাস্তব হঠাৎ ভাবালুতা বাদ দিয়ে সোজাসুজি বলে বসলেন, 'অবশ্য প্রথম প্রথম আমি অনেক একগুঁয়েমি করেছি। চিরকালের সংস্কার তো। মনুজেন্দ্র হাত ধরতে এলে হাত সরিয়ে দিতাম। সিনেমা থিয়েটারে পাশাপাশি বসার সময় খানিকটা নিরাপদ দূরত্ব রাখতাম দুজনের মাঝখানে। আমাদের সনাতন সংস্কৃতিতে স্পর্শ ব্যাপারটার গুরুত্ব জানো তো সুজাতা? কিন্তু কত দিন চলবে এভাবে? তারপর এলো সেই অবিস্মরণীয় ডিসেম্বরের রাত—।

হঠাৎ চমকে উঠলো সুজাতা। গ্যাসের স্টোভে দুধ বসিয়ে এসেছে খেয়াল ছিল না। অনেকক্ষণ হয়ে গেল—নির্ঘাৎ দুধ উপছে পড়বে—কিন্তু গল্পের চরম মুহূর্তে কি করে এইরকম একটা গদ্যময় অজুহাতে রসভঙ্গ করা যায়। সুজাতা উঠতে গিয়েও পারলো না। যাক দুধ, মিসেস শ্রীবাস্তবের প্রেমের পরিবর্তনটা জানা দরকার।

'সে রাত্রে খুব বরফ পড়ছে—মনুজেন্দ্র আমাকে একটা ইটালিয়ান রেস্টোরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে আমরা চেস্টনাট স্ট্রীটের ফুটপাথে পায়চারি করছি। মনুজেন্দ্রের মাথায় টুপি, আমার মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। কিন্তু তবু ঠান্ডা হাওয়ায় কান যেন কেটে যাচ্ছে। দেখেছো নিশ্চয় রাত্রে খাবার পর শীতটা কি রকম জোরে চেপে ধরে। বিদায়ের মুহূর্তটা যতক্ষণ পারি আমরা প্রলম্বিত করছি এমন সময় মনুজেন্দ্রের মাথায় কি এলো, ও বললো এক কাজ করলে হয় না—তোমার ডরমিটারীতে তো বারোটার মধ্যে পোঁছুলেই হবে, এখনো অনেক দেরি। ততক্ষণ আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলো না—অন্ততঃ রাস্তার এই ঠান্ডা থেকে তো বাঁচবো। আমি কখনো মনুজেন্দ্রের অ্যাপার্টমেন্টে যাই নি তা নয়। একদিন দুপুরে গিয়েছিলাম ওর কাছে হিন্দি সিনেমার রেকর্ড শুনতে—কিন্তু তখন ওর ঘরে আরো কয়েকটি ভারতীয় ছেলে ছিল। আর একবার গিয়েছিলাম ওকে দহিবড়া রেঁধে খাওয়াতে—কিন্তু সেদিন দহিবড়া

এত ভালো উৎরে গিয়েছিল যে, মনুজেন্দ্র শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে টেলিফোন করে ডেকে একটা পার্টিরই ব্যবস্থা করে ফেলে। কিন্তু আজ এত রাত্রে একলা মনুজেন্দ্রের ঘরে যাবার প্রস্তাবে আমার মনে আজন্মের সব সংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ঔচিত্যবোধ আর শালীনতার সংগে সংগে কিন্তু অন্য একটা ক্ষীণ সাহসও অনুভব করলাম—সে কথা স্বীকার না করলে মিথ্যা বলা হবে। সেটা বোধ হয় কানহাইয়ার বাঁশীর ডাকে শ্রীরাধার—।'

মিসেস শ্রীবাস্তবের মুখটা এতক্ষণ আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা ছিল, হঠাৎ একটা তীব্র আলো সোজা এসে পড়ায় সুজাতা দেখতে পেলো তাঁর নাকের উপর ঘামের বিন্দু আর চোখের কোণে জল চিক্‌চিক্ করছে। আচমকা চোখের ওপর আলো এসে পড়ায় মুখের ভাবটা বদলে নেবারও সময় পান নি। সুজাতা দেখলো তিন পরত চিবুকে আর গালের চর্বির আড়ালে এক কিশোরী মেয়ের মুখ—আশা আশংকায় সজীব—এক ভীরু উত্তেজনায় আর্দ্র। আলোটা সরে গিয়ে বারান্দায় পড়লো—তারপর বারান্দার সিঁড়িতে, তারপর সামনের গ্ল্যাডিওলিরল বেডে। তারপর নিভে গেল—আর গাড়ির হেডলাইট বন্ধ হবার সংগে সংগে কলরব করতে করতে নামলো সুজাতার তিন ছেলে। প্রথমেই একজন আছাড় খেলো জিরানিয়ামের গামলার উপর—অন্য জন তাকে ধাক্‌কা দিয়ে এগিয়ে এলো মার দিকে ব্যস্ত হয়ে অংক-কষা কুকুরের বিবরণ শোনাতে। তৃতীয়জন ততক্ষণে পকেট থেকে একটা বল বার করে দেওয়ালের বিপক্ষে নাচাতে মনোযোগ দিয়েছে। সবশেষে গাড়ির সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। শেখর নেমে এসে প্রথমেই উঁচুগলায় প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার সামনের আলোটা কি গেছে নাকি? সব অন্ধকার কেন? ইস্ গ্যাসের এত গন্ধ কোত্থেকে?' কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বারান্দা ঝলমল করে উঠলো আলোতে, মানুষের গলার ও পায়ের শব্দে। একটা মিষ্টি তীব্র গন্ধ এবার সুজাতার নাকে আসাতে খেয়াল হোলো দুধ ফুটে ফুটে পড়ে গিয়ে গ্যাসের স্টোভ বন্ধ হয়ে গেছে। রান্নাঘরের দিকে ছুটে যেতে যেতে ও শুনলো মিসেস শ্রীবাস্তব তাঁর গলায় রোজকার অভ্যস্ত মিষ্টতা মাখিয়ে শেখরকে বলছেন, 'প্লীজ ক্যান আই গেট এ রাইড হোম?'—আর ছোট ছেলেটা দাদার বলটা চাই এই অজুহাতে দুমের বাজনা আর কান্নাকাটির সূত্রপাত করেছে। চৌখুপী ঝাড়নটা দিয়ে স্টোভের চারিদিকে দুধের নদী উপসাগর মুছতে মুছতে সুজাতার মনে হোলো মানুষের কোন খোলসটা আসল, পেঁয়াজের খোসা কত দূর পর্যন্ত ছাড়ানো যায়। আর এই সময় দরজার বাইরে মিসেস শ্রীবাস্তব চর্বির মুখোশ পরে এসে স্পষ্ট আলোতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ চলি ভাই সুজাতা, বড্ড দেরি হয়ে গেল। উনি হয়ত বাড়ি এসে অপেক্ষা করছেন। একটুতেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন কিনা আমার জন্য।' সুজাতা রুটির আটা মাখবার জন্য চুড়িগুলো হাতের উপর দিকে গুঁজে নিলো। ঘাড় নাড়ল শুধু, মিসেস শ্রীবাস্তবের দিকে তাকালও না।

জুল ভার্ণ

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস বর্তমান কালে সাহিত্যে সমাজে পাংক্তেয় হয়েছে। অপাংক্তেয় থাকার কথাই ওঠে না। কারণ, বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস রচনায় কল্পনার অভিনবত্বের প্রয়োজন। এই কল্পনা নরনারীর জীবনের সম্ভাব্য প্রেমলীলা বা দিন যাপনের গ্লানির ইতি-হাস মাত্র নয়, বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প-উপন্যাসের লেখকরা দূর-ভবিষ্যতের অনেক নিখুঁত কল্পনা করেছেন, তারপর সেই কল্পনা যখন সত্যে পরিণত হয়েছে তখন শুধু সাহিত্য পাঠক নয়, বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন লেখকবৃন্দের বলিষ্ঠ কল্পনা শক্তির পরিচয়ে।

বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস ও গল্প যে বর্তমানকালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই যুগে সবিশেষ উন্নতি হওয়ায় বিজ্ঞানের ফলে উদ্ভট এবং কল্পনাতীত কান্ড যে করা সম্ভব তা এখনকার মানুষের বিশ্বাসে আর বাধা নেই। উদ্ভট এবং প্রায় অসম্ভব বস্তুকে এখন সম্ভব বলে সহজেই মনে হয়। বাল্মীকির সোনার হরিণের জন্মও একালে অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু বর্তমানের মাপকাঠিতে অতীতকে বিচার করা অনুচিত। যখন কিছুই ছিল না তখন যাঁরা আশ্চর্য এবং অসম্ভবের কল্পনা করেছেন তাঁদের কৃতিত্ব অপরিসীম।

বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাসের পথিকৃৎ জুল ভার্ণকে সর্বাগ্রে মনে পড়ে। জুল ভার্ণ ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের নানতে শহরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। চল্লিশ বছর আগে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসব হয়ে গেছে, তথাপি তাঁর নাম আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

জুল ভার্ণের প্রকৃতি ছিল লাজুক। ঘরকুণো স্বভাবের ছেলেটি কোন দিকেই সহপাঠীদের ঈর্ষার কারণ হয়ে ওঠে নি। পড়াশোনাও মাঝামাঝি ধরনের, আর খেলা-ধুলোর ব্যাপারে একেবারে নিরুৎসাহ। ফলে, সবাই জুল ভার্ণকে পরিহার করে চলত।

যখন আঠারো বছর বয়স তখন জুল ভার্ণের পিতৃদেব তাকে প্যারিসে পাঠালেন আইন পড়ার জন্য। কিন্তু আইনের কচকচি তরুণ জুল ভার্ণের মোটেই ভাল লাগল না, তিনি কবিতা এবং নাটক রচনা মগ্ন করতে লাগলেন। কিন্তু সেই দিকেও সাফল্যের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

জুল ভার্ণ কিন্তু সহজে দমবার পাত্র নন। প্রচুর লিখছেন এবং পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন, যথারীতি সেগুলি আবার ফেরত চলে আসছে সম্পাদকদের বাঁধা মন্তব্য 'পরে আবার লিখলে পাঠাবেন, বিবেচনা করার চেষ্টা করব।'

একদিন সন্ধ্যায় এক কন্সার্টে হলে গেছেন জুল ভার্ণ। কিন্তু তাঁর অশান্ত মনে সেই সন্ধ্যায় কন্সার্টের সুরলহরী কোন সাড়া জাগাল না। তিনি বেরিয়ে পড়লেন বিরক্ত হয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় অন্যমনস্ক জুল ভার্ণ সহসা একেবারে কলা গাছের মত সোজা পড়ে গেলেন আর পড়লেন এক মোটা-সোটা মানুষের ঘাড়ে। তিনি ওপরে উঠছিলেন।

লজ্জিত হয়ে জুল ভার্ণ ভদ্রলোকটির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু সেই মোটা মানুষটি ওসব মামুলী উক্তিতে কান না দিয়ে—করমর্দনের জন্য হস্ত প্রসারিত করে বললেন, আমার নাম আলেকজান্দার ডুমা। একেবারে 'থ্রি মাসকেটিয়ার্সে'র স্বনামধন্য লেখকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লাজুক তরুণ জুল ভার্ণ। লজ্জায়, ভয়ে একেবারে স্তম্ভিত হলেন জুল ভার্ণ।

এই আকস্মিক পরিচয় কিন্তু জুল ভার্ণের জীবনে একটা নতুন পথের সন্ধান এনে দিল। এত দিনে যে-নিবিড় আঁধারে ভাগ্যহীন সাহিত্য-প্রেমিক পরিক্রমণ কর-ছিলেন, এত দিনে যেন তার অবসান ঘটল। সাফল্যের সোপানে তিনি যেন আকস্মিক-ভাবে উঠে দাঁড়ালেন। আলেকজান্দার ডুমা জুল ভার্ণকে উৎসাহিত করলেন। বললেন, কিছুতেই হাল ছাড়বে না। প্রচুর লিখে যাও। নতুন নতুন বিষয় ছড়ান আছে, যা হয় একটা খুঁজে নিয়ে লেগে পড়ো।

নতুন পথের সন্ধান করতে থাকেন জুল ভার্ণ। তিনি এতদিনে বুঝলেন যে, সাহিত্যের রাজদরবারে প্রবেশ করতে হলে যে ছাড়পত্রের প্রয়োজন তার নাম নতুনত্ব। চমকপ্রদ নতুন ধরনের লেখা না হলে এই দরবারের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ।

ভূগোলই ভালো। আলেকজান্দার ডুমার সাফল্য হয়েছে ইতিহাসে, তাহলে ভূগোল নিয়ে লিখলে হয়ত সাফল্য হবে। এদিকে শেয়ার বাজারে কাজ করে আর্থিক অবস্থারও একটু উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক উন্নতিতে তৃষ্ণা মেটে না, সাহিত্যিকের অশান্ত মন তাঁকে উৎপীড়িত করে। শেয়ার বাজারের কেরাণীগিরির কাজে নিয়মিত যেতে মন লাগে না। সেই অবসর-টুকু চুরি করে তিনি লেখার কাজেই মন দিলেন। যেটুকু সময় পাওয়া যায়, তা লিখেই কাটান জুল ভার্ণ।

এদিকে প্রচুর পরিশ্রমে লেখা 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' বারবার প্রকাশকদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসছে। যখন পঞ্চম-বারও সেইভাবেই ডাক-পিওন ফেরৎ দিয়ে গেল, তখন জুল ভার্ণ দুঃখে, অভিমানে, রাগে উন্মত্ত হয়ে পান্ডুলিপি অগ্নিকুন্ডে ছুঁড়ে ফেললেন। সৌভাগ্যের বিষয় পাশে ছিলেন স্ত্রী, তিনি সযত্নে সেটি কুড়িয়ে এনে অগ্নিদগ্ধ অংশ সংস্কার করলেন। অনুরোধ করলেন আর একবার ভাগ্য পরীক্ষা করতে। দেখাই যাক, কি হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার পাঠানো হল আরেক প্রকাশককে এবং কি আশ্চর্য এইবার বইটি তাঁদের পছন্দ হয়ে গেল।

'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' প্রচণ্ড বিক্রী হল। পাঠকরা পাগল, এমনকি সমালোচকরা বললেন, 'এই বই সহজে ভোলার নয়'। সাফল্যের এই সূচনায় অভিভূত হলেন জুল ভার্ণ। তাঁর কলমের গতি দ্রুত হল। প্রচুর লিখতে লাগলেন এবং তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে সাহিত্য-জগৎ বিস্মিত হল।

'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহের' পর 'পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে' প্রকাশিত হওয়ায় চারিদিকে সাড়া জাগলো। সাগরজলের গভীরে যে কি বিস্ময়কর বস্তু আছে, তার কথা এই উপন্যাসে অসামান্য লিপিকুশলতায় বিধৃত করলেন জুল ভার্ণ। সুয়েজ ক্যানালখ্যাত ফার্দিন্যান্দ দ্য লেসেপস প্রস্তাব করলেন জুল ভার্ণকে ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মানে ভূষিত করা হোক।

প্রচুর অর্থ সমাগম হতে লাগল। এমিয়েনে তোরণবিশিষ্ট একটি বিরাট বাড়ি কিনলেন, সেইসঙ্গে একটি পানসী। একটি পুত্রসন্তানও ভূমিষ্ঠ হয়েছে এই সময়। চারিদিকে মানচিত্র, বই আর যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে জুল ভার্ণ খালি লিখে চলেছেন। এ এক নতুন আনন্দ। এরপর ১৮৭২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হল জুল ভার্ণের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আশী দিনে ভূ প্রদক্ষিণ'। বাজী জেতার জন্য মিঃ ফিলিয়াস ফগের পৃথিবী পরিক্রমার বিবরণ। এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে লন্ডন ও আমেরিকার সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা মিঃ ফগের কল্পিত গতিবিধির কথা সংবাদপত্রে

প্রকাশ করতেন। এরপর প্রকাশিত হল 'সাগরজলের অতলে বিশ হাজার লীগ—'। নটিলাস নামক সাবমেরিণ কিভাবে অনির্দিষ্টকাল জলে ডুবে ছিল তার বিবরণ। জুলে ভার্ণ '২৮৯০ খৃষ্টাব্দে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের ডায়েরী' নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানের বলে ২৮৯০ খৃষ্টাব্দে কি ঘটবে, তা কল্পনা করেছেন। বেতার আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগে ভার্ণ টেলিভিসনের কথা বলেছেন। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় আকাশে ওড়ার অনেক আগে তিনি হেলিকপ্টার কল্পনা করেছেন। সাবমেরিণ, এসকালেটার, গাইডেড মিসাইলস, ট্যাংক, এয়ারকণ্ডিশন ব্যবস্থা, স্কাই স্ক্র্যাপার প্রভৃতি বিস্ময়কর বস্তু জুলে ভার্ণ অনেক আগে ভাগেই চিন্তা করেছেন। বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার তিনি আদিগুরু। মার্কোনি, সাইমন লেক, এডমিরাল বয়েড প্রভৃতি স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা জুলে ভার্ণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু তবু এই সাহিত্যকারের শেষজীবন অশান্তিতে কেটেছে। তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে সাহিত্যিক সমাজ কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। ফ্রেঞ্চ একাদেমিতেও তিনি নির্বাচিত হননি। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি নিয়ামকতন্ত্র এবং হিটলার-মুসোলিনীর মত নরদানব কল্পনা করেছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁর মৃত্যু হল, তখন অবশ্য ফ্রেঞ্চ একাদেমির সদস্যবৃন্দ শবানুগমন করেছিলেন। আর সেইসঙ্গে রাজন্যবর্গের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রশংসা বর্ষিত হয়েছিল প্রচুর। প্যারিসের সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল—"প্রাচীন কাহিনীকার আজ পরলোকে। এ যেন সান্তা ক্লসের মৃত্যু"। নিরলস সাধনায় ও সুদূরপ্রসারী কল্পনায় সর্বকালের সাহিত্যে বিচিত্র বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনার স্থায়ী আসন বিছিয়ে গিয়েছেন জুলে ভার্ণ।

যৌন আবেদনের গোপন কথা

পরলোকগত কলভিন কুলিজ বলেছিলেন, "আমার যদি চাই, তাহলেই পাওয়ার আকুলতা, না চাইলে, মোটেই চাই না।" খাঁটি কথা, এই উক্তি অবশ্য আপেল প্রসংগে তিনি করেছিলেন। তবে, এ-কথা তিনি রমনী প্রসংগেও বলতে পারতেন। আর সব পুরুষই তা বলতে পারেন।

বিশেষ কি বস্তু নর ও নারীর পারস্পরিক বিপরীত শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান যা সহজে আকৃষ্ট করে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে সর্বপ্রথম একটি প্রশ্নের জবাব প্রয়োজন, সাধারণত যাকে যৌন আবেদন বলা হয়, তা বলতে আমরা কি বুঝি।

সাধারণত যাকে যৌন আবেদন বলা হয় তার দ্বারা বোঝা যাবে না যে, কুরূপ এবং কিঞ্চিৎ নির্বোধ মানুষ জয়ন্তকে, অতুলনীয় রূপলাবণ্যবতী প্রমীলা কেন পাগলের মত ভালোবাসে। এই কারণেই ভালোবাসার রহস্য নিয়ে যে-সমস্যা যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে তার সমাধান করা সহজ নয়।

যৌনতত্ত্ববিশারদ ভ্যান ডি ভিল্‌ড যাকে বলেছেন—"the abstract conception of love" সেই কথাটির সঙ্গে যৌন আবেদন সংযুক্ত। জয়ন্ত ও প্রমীলার পারস্পরিক প্রীতি ও অনুরাগের মধ্যে "personal differentiation and fixation" তত্ত্বটি জড়িত। ব্যক্তিগত বিচার ও অনুরাগের ফলে পরস্পরের প্রতি এই ভালোবাসা গড়ে উঠেছে।

অনেকেরই বিশ্বাস যে, প্রেমের ঘোরালো পথের ব্যাখ্যা করা নিরর্থক। তথাপি উত্তেজনা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা যদি কেউ সযত্নে পড়ে থাকেন, তাহলে তাঁদের পক্ষে আসল ব্যাপার বোঝা অনেক সহজ হবে। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, কিভাবে ভালোবাসার বিকাশের বিমূর্ত ক্রিয়া অসংখ্য অভিব্যক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। চোখ, কান, নাক এবং অনুভূতির দ্বারাই সাধারণত এই মনোভংগী গড়ে ওঠে।

অনেক সময় বলা হয় যে, এই যৌন আবেদন বস্তুটির সংজ্ঞা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার মতোই নির্ণয় করা যায় না, তবে চোখে পড়লে তাকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়। তথাপি, যদি আমরা বিচার করি ব্যক্তিত্বের, তাহলে দেখি যে, কতকগুলি বিশেষ গুণের সমন্বয়ে সেই ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। যাদের আমরা দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলি, তাদের ক্ষেত্রে এই গুণের প্রকাশ একটু সুদৃঢ়ভাবেই ঘটে। তীক্ষ্ম দৃষ্টি, সুমধুর কণ্ঠস্বর, ভঙ্গীমাধুর্য, গতিভংগী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই সূত্রে মনে ভেসে ওঠে।

—অভয়ংকর

কলকাতা জেনারেল পোস্ট-অপিসে ভারত সরকার প্রচারিত গর্কি জন্মশতবার্ষিকী স্মারক ডাক টিকিট কিনে বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন সোভিয়েত কন্সাল জেনারেল শ্রীজায়কভ। ছবিতে মেয়র গোবিন্দ দে পি. এম. জি শ্রী এ এন বিশ্বাস এবং বৌদি রাণু মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

সোজা করে চলতো। একবার ঐ ১৯৩২-৩৩-এর সময়ে হঠাৎ দেখাসাক্ষাৎ হয় কারীব দলে আর পুলিশ দলে। তখন দাঙ্গা হয়। কিছু কিছু মরে। তারই ফলে রাজার রাজদণ্ড আর মুকুট যায়। ......

—কী ব্যাপার জানো, সরকার কারীবকে তো মারতে পারে না। বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

—কেন?

—ঐতো কুল্যে ক'টী। ওদের যদি সত্যিকার দণ্ডভাগী করা যায় তবে তো বছর কয়েকের মধ্যেই ওরা সাফ হয়ে যাবে।—

আমাদের লক্ষ্য অনত্র। রাজাকে ছেড়ে আমরা চলতে লাগলাম। নিগ্রোগুলোকে যেন এখন আমাদের জাতভাই বলে মনে হতে লাগলো। রাত কাটালাম একটা পুলিশ ফাঁড়িতে।

সাঁ-সুভোর একটা গাঁ। গির্জা আছে। সকালে ঘণ্টা দুই হেঁটে সেখানে এসে প্রাতরাশ সারা গেলো। এখানে গির্জা, স্কুল, ক্রিকেট, হাট, আভোকাদো, আম সবই আছে।

গাঁ ছেড়ে কিছু দূর যেতে না যেতে তুমুল বৃষ্টি। নিগ্রোগুলো বুদ্ধি করে বৃষ্টির বেগের অপর দিকে পাহাড়ের একটা খাঁদের মধ্যে আশ্রয় নিলো। ওদের তৎপরতা না হলে হয়তো ভিজতেই হোতো। আধ-ঘণ্টার ওপর সেই প্রলয়ান্তিক বৃষ্টি দেখে আমি তো চমকে উঠি। লিজি হাসে। ওর রাঙ্গা ঠোঁট দুটি নীল হয়ে গেছে। ও বলে—'এই বৃষ্টি মানেই তো ডোমিনিকা। নৈলে ডোমিনিকা দেখলে কী?'

আবার সেই পথ। বৃষ্টির পরের ভেজা পথ। জব জব করে পচা পাতার ভেতর থেকে জল উঠছে। ওপরে শাখায় শাখায় লিয়ানা এবং নানাবিধ লতার হার। পাতা বেয়ে জল পড়ছে সারা গায়। সারা বন্য জঠর ভ্যাপসানীতে ভরে গেলো। সবচেয়ে বিপদ হোলো দু-পা এগুতে না এগুতে কেবলই নালা আর নালা।—

ঘোড়াগুলো এবার দৌড়ুতে সুরু করলো। আবার বৃষ্টি আসছে। দেখতে দেখতে আমরা একটা নদীর মোহানায় এসে গেলাম। দুরন্ত বেগে নদী আছাড় খাচ্ছে সমুদ্রের ওপর; তুমুল বিক্রমে সমুদ্র মাতোয়ারা হয়ে ঢেউ থেকে ফেনা ছড়িয়ে দিচ্ছে নদীর বুকে।—সারা আকাশে গাং চিলের চিৎকার। ছুটে ছুটে পাক খেয়ে খেয়ে ওরা ঝাঁপ দিচ্ছে জলে, আর মাছ ধরছে টুপ টুপ করে।

আমরা আর এগুবো না। বৃষ্টি আবার আসছে। পুলিশ ফাঁড়ির জানালা খোলা। জানলার বাইরে রমণীয় একফালি ছবি। যদি হতাম গ্রীণসবারো, রুবেন্স, গার্দি কিংবা কন্‌স্টেবল্ এঁকে ফেলতাম শ্যামলে দীঘল, কোমলে ছলছল,—মসৃণ বিহ্বল এই ছবিটি। সামনে পাহাড়ের ঢলের গায়ে পেঁপে, ব্রেডফ্রুট, কলার বাগান। তার ধারে ধারে সুদা-পাতা জবার বেড়ার সঙ্গে ঢেউ তুলে রাঙা-পাতার পন্‌জেটিয়ার্স ফুলের কেয়ারীর ধার বেয়ে ঘন একটা আম্রবীথি। ঠিক অপর ধারে একটি তটিনী ঝাঁপিয়ে পড়ছে শিলাখণ্ড থেকে শিলাখণ্ডে। সবার শীর্ষে একটি রাঙাছাদ গির্জা। যেন হঠাৎ সুদূরে ইয়র্কশায়ারের ঢল খাওয়া জমির ওপর মনকে টেনে নিয়ে যায়। সুন্দর এমনি হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। হায় হায়, তাকে ধরে রাখা যায় না।

এ পাহাড়ের মেরুদণ্ড শেষ করে নামবো আমরা শহরে। নামতে হবে মর্নে ট্রয়ের ধার দিয়ে রুজো-শহরে। কারীব অঞ্চল শেষ হয়ে গেছে। ঘোড়া বদলালাম একটা গাঁয়ে। ঘন বনের মাঝে মাঝে নিগ্রো গাঁ। মালিকদের বাগ-বাগিচার তত্ত্ব-তালাশ করে ওরা। একটা সরু ঝোলা পুল পার হবার সময়ে বোঝা গেলো নদীর মোহানা তুমুল বিক্রমে পাহাড় কেটে নীচে নামছে। ওপারে পৌঁছুতেই ভীষণ-মনোরম, ভয়ংকর-সুন্দর, এমন একটা রূপ দেখলাম যা একমাত্র প্রকৃতিতেই সম্ভব। খাড়া পাহাড় গোল হয়ে কেটে কেটে সমুদ্রে পড়েছে। দেয়ালের গায়ে শতাব্দীর ভ্রূকুটি ছাড়া আর কিছু নেই। কার্বনিফেরাস লাইমস্টোনের থর, থরের পর থর নানা বর্ণে পৃথুলা ধরিত্রীর গায়ের ভাঁজকে প্রত্যক্ষ করে দিয়েছে। আরও গভীরে হয়তো টার্শিয়ারী এজের ট্রিয়াশিক স্যান্ডস্টোন্ রাডোলেরাইটের চামড়া দেখা যাবে। তলার দিকে খেয়ে যাচ্ছে। শত শত গর্তের ভেতরে লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া আর পাহাড়ী লব্‌স্টার ঘোরাফেরা করছে। এক-একটা লবস্টার প্রায় আড়াই তিন পাউণ্ড। একদিন এই পাহাড় খেয়ে খেয়ে তলার দিকটা অনেকটা ক্ষয়ে যাবে। তখন এই বিশাল অরণ্য সমাকুল বনভূমি হুমড়ি খেয়ে পড়বে সমুদ্রের জলে। নব ভূভাগ রচনা হবে। নতুন করে সাগর আছড়াবে কুমারী মেদিনীর বক্ষে। নতুন পদাতিক এসে দাঁড়াবে নতুন রাবার গাছের তলায়।

তফাৎ শুধু এই যে 'জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখর শ্রেণী' ডোমিনিকায় দেখাবে 'জনশূন্য বন-গহন পর্বতের শ্যাম গম্ভীর শিখর শ্রেণী'! ডোমিনিকা যে রোহিত সমুদ্রের তীর নয়।

একটি অপূর্ব গাছ দেখেছিলুম। বটানিষ্ট নই। নাম জানিনে। ওদের দেশের ভাষায় বলে 'বয়-ক্যানন্'; কেউ বলে ওর ডাল ভাঙার সময় যা শব্দ ওঠে তাই থেকে ওর নাম ক্যানন্ (কামান); কেউ বলে তা নয়, জ্বালালে তখন দুম-দাম শব্দ হয়, তাই ওই নাম; আবার আর কেউ বলে গাছটার গুঁড়ি, ডাল সবই আগাগোড়া ফাঁপা তাই ওই চোঙা গাছের চোঙ নাম, ক্যানন।। ইংরেজীভাষীরা বলে ট্রাম্পেট-উড-ট্রী। গাছটি উঠেছে তার গুঁড়ির গায়ে গোল হয়ে সাজান ডালগুলো গুটিয়ে বেঁকে বেঁকে ঝুলে আছে চারপাশে, যেন কেউ ঝাড় লণ্ঠন সাজিয়েছে। এমনি গুঁড়িও যেমন উঠেছে, থরে থরে ঝাড়ও তেমনি সাজানোর মতো অবিকল অনুপাতে দুলে দুলে গুটিয়ে ঝুলে আছে। শেষ হয়েছে কচি কচি সরু সরু পাতায়। ওরাও বড় হয়ে এমনি ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি স্তর প্রতিটি স্তরের সঙ্গে ঠেকানো। ফলে একটা সমগ্রতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শোভা বাড়ছে যখন বাতাস বইছে। পাতাগুলোর একটা দিক সবুজে গভীর, অপর দিক রুপোর মত শাদা ঝকঝকে। কাজেই বাতাস দিলেই ঝিকিমিকি। তার শোভা বোঝানো যায় না। হায়, এ শোভার তত্ত্ব নেই গাইড-বুকে।

গাইড-বুকে লেখে রুপার্ট-বে'র বাজারের ধারে রাখা মস্ত চৌকো পাথরখানা প্রিন্স রুপার্টের কবর! কোন্ ইংরাজ-ইতিহাসেই বা প্রিন্স রুপার্টের নাম নেই। কিং চার্লসের জন্য সে [illegible]
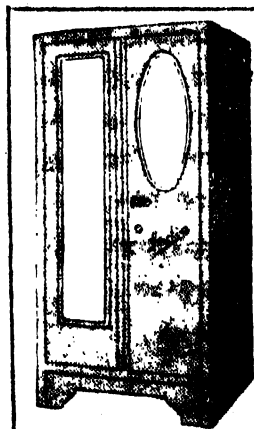
জাহাজে চড়েও ক্রমওয়েলের সমুদ্র-বহর নষ্ট করেছিল। সে রুপার্ট চার্লস-সেকেণ্ডের সময়ে ইংলণ্ডে ফিরেছিলেন। তাঁর সমাধিও ইংলণ্ডেই আজও আছে। তবু গাইড-বুক বলে এই পাথরখানা 'প্রিন্স রুপার্টস টোম্ব'।

আশ্চর্য, পথে বিশেষ জন-মনিষ্যি নেই। তবে সরকারের চোখ এড়িয়ে দুরন্ত গুন্ডো-আসামীরা নাকি এসব অঞ্চলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। এই অঞ্চলটা তাই সাবধানে চলার শান্ত হুকুম এলো। পাখী দেখি নি বড় এ জঙ্গলে। খুব গভীর স্যাঁৎ-সেঁতে জঙ্গলে পাখী থাকতে চায় না। পোকা-মাকড় হয়ত পায়। কিন্তু সাপের, বাদুড়ের ভয়ে বাসা বাঁধার হাঙ্গামা আছে। জঙ্গলে মাকড়সার জালে পাখা আটকে যাবার ভয় আছে।

তবু একটা পাখী যা পৃথিবীতে নাকি এক ডোমিনিকাতেই আছে। সাউথ-সী আইল্যাণ্ডে আছে দীর্ঘ পুচ্ছ প্যারাডাইজ পাখী। সেই পাখীর সন্ধানেই নাকি রকফেলারের ছেলে প্রাণ দিল। আমি গায়ানার জঙ্গলে পাকারাইমার ধারে অত্যন্ত কোমল, অভিনব চমৎকার ওরিওল দেখেছি, গায়ানার বার্ড অব প্যারাডাইজ, যা কাইচুর প্রপাতের ওপরেই মাত্র দেখা যায়। আর এই সিক্লোর-সন্তান — "পাহাড়ের-ফুল" পাখী। পাখীটা ডাকে মৃদু কুহু ধ্বনিতে। শীষ দেওয়ার মত করে। একটু একটু পরে দুটি করে শীষ দেবে। এই গভীর নির্জনে সেই দুটি শীষ যেন হঠাৎ অন্তরকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

দুপুরের শেষের দিকে আমরা বন পার হয়ে পাহাড়ের ঢঙে এসে পড়েছি। পুরাতন একটা অগ্নেয়গিরির গহবরে জল ভরে মস্ত এক হ্রদ। সে হ্রদের চিত্র দূর থেকে দেখা যায়। ধার এত খাড়া যে সহজে যাতায়াত দুঃসাধ্য। হঠাৎ সেই স্থির জলে পৃথিবী, অরণ্য, আকাশ, মেঘের ছায়া এক সঙ্গে দেখে ভারী ভয় লাগে। এ মহামৌন যেন চিরসমাহিত। এখানে সামান্য শব্দ করলেও যেন যোগভঙ্গ হবে। নিগ্রোরা, — বিশেষত কারীব-রা রীতিমত ভয় করে এ হ্রদকে। এর জলে নাকি পৃথিবীর আদি সৃষ্টি দুটি মহাসর্পের বাস। গভীর পূর্ণিমার নীরব আঁচলের ছায়ায় তারা নাকি এই জলে খেলা করার আগে তাদের মাথার মণি লুকিয়ে রাখে পাথরের ভাঁজে। তারপর সেই মণি মাথায় পরে দুলে দুলে যখন নাচে তখন নাকি সারা বনভূমি আলোয় আলোয় ভরে যায়। এমন কি সেই দ্যুতির আভায় ক্ষণে ক্ষণে আকাশ ওঠে চমকে। ইন্দ্রসভার মণ্ড ওঠে দুলে। আকাশ গঙ্গার নীহারিকা স্রোতে ঢেউয়ের দোলা লাগে; সে কাঁপনে সৃষ্ট হয় কোটি কোটি নতুন তারার দল।

কত পথিক ঐ মণির নেশায় নিজের অগোচরে নেমে গেছে অকুল পাথার হ্রদের বুকে। সাপেরা তাকে আর ফিরতে দেয় নি মানুষের সমাজে। ও মণি চোখে দেখার পর মানুষ আর সমাজে ফিরতে পারে না। গভীর জলের তলায় নাগরাজের মহাপ্রাসাদে সে মানুষের চিরকালের বাস নির্ধারিত হয়ে যায়। সেকালে সাদাদের নির্যাতনে পীড়িত শত শত কারীব পরম পরিতোষে বুক বেঁধে এই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সলিলসমাধি লাভ করেছে। তাদের আশা যে, নাগ-নগরীতে তারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। কোন এক এলগারনন্ সাহেবের কড়চায় লিপিবদ্ধ আছে যে এমনি ঝাঁপ-খাওয়া এক কারীব কোন আশ্চর্য উপায়ে জলের ভেতরে ভেতরে সুড়ঙ্গ পথে সারা পাহাড় অতিক্রম করে দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে সমুদ্রে এসে পড়েছিল। মনে হয় অদূরভবিষ্যতে কোন আমেরিকান জল-ডুবুরির-পোশাকে সজ্জিত হয়ে এই পথের সন্ধান করবে। তখন শেষ হয়ে যাবে মানুষের রঙীন চিন্তার আর একটি বিস্মিত সুর।

রুজো শহর আর বেশী দূরে নেই। গ্রাম দেখা যাচ্ছে। মানুষেরা ঘোরাফেরা করছে। দূরে 'এডিস', আর একটি ছোট দ্বীপ; এরা বলে 'সাদা' দ্বীপ। এত পাখী এ দ্বীপটায় যে তাদের মলের দৌলতে সমস্ত জমি, পাতা, পাথর, গাছ সাদা হয়ে আছে। পাদ্রী লাবাৎ লিখেছেন তাঁর কড়চায়—"এমন অসভ্য আর একগুঁয়ে পাখী দেখিনি কোথাও। ঠেঙা দিয়ে ঠেলা মারি, তবু নড়তে চায় না।"

রুজো শহর? হ্যাঁ শহরই বলতে হবে? কিন্তু কী জঘন্য এর হোটেল। এই ক'দিন কেটেছে একেবারে পরিচ্ছন্ন, তাজা, প্রকৃতির মধ্যে। আর শহরের এই বদাচার-কদাচার যেন মনকে শিঠিয়ে দিচ্ছিলো।

আশ্চর্য হয়েছিলাম লিজি আমার মনের ভাব লক্ষ্য করে যখন বলেছিল,—ইভ্ যেদিন আঙুর পাতার আবডাল দিয়েছিল রমণীয় রমণীদেহে সেদিনই প্রথম হোল নোংরামীর সৃজন। সবচেয়ে সাজান নগরীও উলঙ্গ প্রকৃতির মত সুস্থ নয়।...

"তাই বুঝি তোমাদের বাল্যবেলায় এত দেহের এত নিরাবরণতা!"

লিজির চোখের সেই গূঢ় গহন তিরস্কারের দীপ্তি আজও আমার চেতনায় জোয়ারের ঢেউ তোলে।—এসব ক্ষুধাতুর পাংশু নিকৃষ্ট ব্যবহার প্রাদর্শনিক-অ ব দা র্শ নি ক স্বন্দ্বের উদ্গার (anemic belchings of exhibitionistic and inhibitionistic struggles!) রোগী এরা রোগী! ভোগী বলে জাহির করে। জাহির-কারিগরীকে নিশ্চয় সুন্দরের প্রকাশ বলে ভুল করবে না। মনে পড়ে? হাডসনের গ্রীন-ম্যানসনস্-এর রীমা-কে মনে পড়ে? আয়েষা? রাইডার হ্যাগার্ডের আয়েষা? — ওরাই প্রকৃতির রূপ! শহর থেকে দূরে আছে বলেই ক্যামেরণ বংশের সৌন্দর্যবোধ ক্লিওল হয়ে যায় নি।'

আমি মৃদু হেসে বলি,—না-কি খাঁটি ক্রিওল হয়েছে।

এবার লিজির হাসার পালা। বলে,—'হ্যাঁ, তাও বলতে পারো। টম মূরের বদলেয়ারের ক্রিওল বলতে চাও বলতে পারো। শহর তোমার থাক। আমি চলি। একখানা মোটরবোট ছাড়বে। আমি ঘন্টা-তিনেকে আমার আস্তানায় পৌঁছে যাবো।'

জাহাজ ঘাটায় দাঁড়ালাম।

লিজি তার মোটরবোটে চলে গেল।

ঘোড়া দুটো নিয়ে নিগ্রো-রায়তরা তীরের পথ ধরল। সন্ধ্যার আকাশসমুদ্রের পাড়ে লাল হয়ে উঠল। এ ক্যারিবয়ান। কলরিজের ভাষায় in one leap comes the dark. আমার জাহাজ কাল সকালে। রাতটা আমাকে কাটাতে হবেই।

মনে মনে গান গেয়ে উঠি:

And when in other climes
we meet
Some isle or vale enchanting,
Where all looks flowery,
wild, and sweet,
And nought but love is
wanting;
We think how great had been
our bliss
If Heaven had but assign'd us
To live and die in scenes
like this,
With some we've left
behind us!

রাতে হোটেলে ক্যাসিপসো গানের হল্লা। ক্যালিপসো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান নিগ্রোর মন্ত্র-জপ-সাধনা - পঞ্চমুণ্ডী। ক্যালিপসো, ক্রিকেট, কালালু এবং স্টিল ব্যাণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্বর্গ। এ কথা বলার অবকাশ পাব জ্যামেয়কায়, হেইতিতে,—বিশেষ করে ত্রিনিদাদে।

সে রাতের যন্ত্রণা যত না মনে করা যায় ততই ভাল।

(ক্রমশঃ)

গৌরাঙ্গ পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭৬)

রঘুনাথ দাস গোস্বামী

হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনদাস দুই ভাই সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার—কায়স্থ সমাজের শিরোমণি। হিরণ্যদাস নিঃসন্তান। গোবর্ধন-দাসের ছেলেই রঘুনাথ।

হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল ছেড়ে চলে এসেছে চাঁদপুরে। উঠেছে বলরাম আচার্যের বাড়িতে। চাঁদপুর সপ্তগ্রামের কাছেই আর বলরাম হিরণ্য-গোবর্ধনের পুরোহিত।

রঘুনাথ তখন বালক। পাঠশালায় পড়ে আর মাঝে-মাঝে, ফাঁক পেলেই হরিদাস ঠাকুরকে দেখতে যায়। কাছে বসে তার কথা শোনে।

কে জানে কেন রঘুনাথের উপর হরিদাসের মন পড়ে। এই কৃপাই বুঝি শেষ পর্যন্ত তাকে চৈতন্যচরণ পাইয়ে দিল।

লক্ষপতির বংশধর, বিষয়ে বাল্যকাল হতেই উদাস রঘুনাথ। বাপ-জেঠা চিন্তিত, ছেলেটা এমন ছন্নমতি কেন? সবাই বললে, বিয়ে দিয়ে দাও। বিয়ে হলেই বিষয়ে আকৃষ্ট হবে।

অপ্সরার মত সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে রঘুনাথের বিয়ে হল। কিন্তু বিয়ের পরেও তার ঔদাস্য ঘুচল না। মন বসল না বিষয়ে।

কানে এল গৌরহরি সন্ন্যাসী হয়ে শান্তিপুরে এসেছেন।

রঘুনাথ পাগলের মত হয়ে উঠল। চলল শান্তিপুরে। সেও প্রভুর মত সন্ন্যাসী হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

প্রভুর কাছে অভিলাষ ব্যক্ত করল রঘুনাথ।

প্রভু তাকে নিবৃত্ত করলেন। বললেন, ঘরে বসেই ভগবদভজন করো।

ঘরে বসেই ভগবদভজন করে রঘুনাথ, কিন্তু মন সর্বক্ষণ নীলাচলে। কবে কত দিনে আবার দেখবে প্রভুকে। পাবে তাঁর চরণের প্রসাদ।

বারে-বারেই সে পালায়, প্রতিবারই ধরা পড়ে। প্রভু তাকে কেন টানছেন না? কেন ধরা পড়িয়ে দিচ্ছেন?

বংশের একমাত্র সন্তান, তার বাবা-জেঠা কিছুতেই আর শাসন শিথিল করতে প্রস্তুত নয়। ধনজন-স্ত্রী কিছুই তাকে বৈরাগ্য থেকে বিরত করতে পারল না। আবার সে বেড়ি কাটল। আবার সে ধরা পড়ল। এবার তাকে ঘরে বন্দী করা হল, খাড়া করা হল দিনরাতের পাহারা। পাঁচজন পাইক, চারজন ভৃত্য আর দুজন ব্রাহ্মণ। এগারো জন তাকে ঘিরে রইল। না, কিছু-তেই যেতে পাবে না নীলাচলে।

প্রভু রামকেলির পথে আবার শান্তিপুরে এসেছেন। রঘুনাথ বাবা-জেঠার পায়ে পড়ে মিনতি করল: অনুমতি করুন প্রভুর চরণ একবার দেখে আসি। নইলে এ দেহে জীবন আর থাকবে বলে ভাবতে পারছি না।

অনুমতি পেল রঘুনাথ। সঙ্গে অনেক লোক গেল যাতে পালাতে না পারে। গেল অনেক দ্রব্যসম্ভার, পুজোর উপকরণ।

সাতদিন প্রভুর সঙ্গে-সঙ্গে থাকল। অহোরাত্র মনের মধ্যে শুধু এই জল্পনা কেমন করে রক্ষীদের পাহারা এড়িয়ে পালাব নীলাচল?

সর্বজ্ঞ প্রভু তার মনের কথা বুঝে আশ্বাসের সুরে বললেন, তোমার সংসার-বিরক্তি দেখে আমি আনন্দিত। কিন্তু আমি বলছি লোক-দেখানো মর্কট-বৈরাগ্য না দেখিয়ে তুমি অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করো। যা লোকব্যবহার বাইরে তাই করে যাও, শুধু অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠা করো। লোককে বুঝতে দিও না তোমার মনপ্রাণ কৃষ্ণে সংযুক্ত হয়ে আছে। সময় হলে আমিই তোমাকে ডেকে নেব।

নেবেন? রঘুনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমি যখন উত্তর-পশ্চিমের তীর্থদর্শন সাঙ্গ করে ফের নীলাচলে ফিরব তখন তুমি চলে এস আমার কাছে। যথাকালে কৃষ্ণই তোমাকে ছলের উপায় করে দেবেন।

সে কবে?

অস্থির হয়ো না। ধৈর্য ধরো। সহসা কেউ ভবসিন্ধু পার হতে পারে না। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে হয়। মুগ্ধ না হয়ে বিষয়-ভোগ করাও কঠিন।

রঘুনাথ শান্ত হল। ঘরে ফিরে গেল। যথাযোগ্য কাজকর্মে মন দিল। তার পরিবর্তন দেখে তার বাপ-মা খুশি হল। আবরণ কিছুটা তাই শিথিল হল। যে ছেলে শান্ত, কর্তব্যরত, তার আর প্রহরীর দরকার কী।

ধনী হলেই তার শত্রু থাকবে। মুলুক থেকে হিরণ্য-গোবর্ধনের থোক আদায় বিশ লাখ—নবাবের ঘরে বারো লাখ রাজস্ব দিয়ে নীট আট লাখ তারা ঘরে তোলে। এই ঐশ্বর্যে এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। তারও চেয়ে বেশি, হিংসায় জ্বলতে-পুড়তে লাগল। নবাবের সেরেস্তায় গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো খবর রাখেন? আমি তদন্ত করে দেখেছি মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখেরও অনেক বেশি। কিন্তু রাজস্ব সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্যও কি বাড়বে না?

ঠিক বলেছ। তলব করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে। নবাব ফরমান দিল।

রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা? চোখ আগুন করল নবাব: রাজস্ব দ্বিগুণ করতে হবে।

এ জুলুম, এ জবরদস্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান।

কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর দু-ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিল।

নবাবের সৈন্য এসে বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। দু-ভাই আঁচ পেয়ে আগেভাগেই সরে পড়েছে।

তবে ছেলেটাকে ধরো।

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে নবাবের সৈন্য রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে চলল।

বল তোর বাপ-জেঠা কোথায়? উজির হুমকে উঠল।

তার আমি কী জানি। নির্ভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।

কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে?

আমি কী করে বলব?

তর্জনে-গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওষুধ। মার খেলেই ছেলেটা অন্ধিসন্ধি সব বলে দেবে।

কিন্তু ছেলেটার মুখে কী যেন মাখানো আছে, মারতে হাত ওঠে না। কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, মারলে ভালো হবে না পরিণাম।

আর ছেলেটার কী মিষ্টি কথা! কী বিনয়নম্রতা! কণ্ঠস্বরেই মনের কাঠিন্য নরম হয়ে আসে।

কেন অপ্রতুল হচ্ছেন? ব্যাপার তো অতি সামান্য—এ তো নির্বিবাদেই মীমাংসা করে নেওয়া চলে। অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুস্বরে, আমার বাপ-জেঠা তো আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া হয়, আবার সহজেই মিটমাট হয়ে যায়। আমি যেমন আমার বাবার ছেলে তেমনি আবার আপনারও ছেলে। আমার বাবা যদি আমার আবদার রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন?

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রঘুনাথকে।

বাবা-জেঠাকে নবাবের দরবারে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশি নাও [illegible] জমিদারি ফেরত দাও।

মীমাংসা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য-গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো স্বত্বে অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এ কী উৎপাত!

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহ-মমতা প্রবলতর হয়ে উঠল। সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্যেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মুলুক।

সংসারের সোনার শিকল রঘুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।

একদিন রাতে, চুপিচুপি পালাল ঘর ছেড়ে।

গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে, মা আকুল হয়ে বললে, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মত স্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্যও ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারব্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ হরণ করতে পারবে না।

তাই বলে যে পাগল তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না? মা কেঁদে পড়ল।

গোবর্ধন বললে, যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি নেই।

রঘুনাথের ভাবনা ধরল—বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন? তবে কি নিজের চেষ্টায় চৈতন্যচন্দ্রের কাছে পৌঁছুতে পারব না? তবে কি নিত্যানন্দের কৃপা দরকার? সংসারসমুদ্র পার করে চৈতন্যবন্দরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ?

সন্দেহ নেই, নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথ বুঝল নিতাই দরজা খুলে না দিলে চৈতন্যমন্দিরে ঢোকা যাবে না। তাই সে চলল নিতাই-সাক্ষাতে।

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল। নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটিতে আছেন, সেখানে নিত্য নাম-উৎসব চলেছে, আমি যাই দেখে আসি।

ফিরে আসবে তো? জিজ্ঞেস করল গোবর্ধন।

আসব।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্ত-পরিবৃত হয়ে বসে আছে, রঘুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, চোর! এতদিন পর ধরা দিলে?

চোর?

চোর নয়তো কী। নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় লুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার চোর। চুরির যে চেষ্টা করে সেও চোর। কিন্তু চোর হয়েও, যাই বলো, সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিতাই নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে নিজের পায়ের উপর রাখল। বললে, যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দণ্ড দেব।

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ।

আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও।

এই দণ্ড!

মহানন্দে বাড়িতে খবর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিল পানিহাটিতে মহোৎসবের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ উচিত দামে কিনে নেবে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ণ প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অঢেল, ধনে জনে কুণ্ঠা নেই কোথাও। শুধু চলে এস। উপস্থিত হও। রঙ্গ দেখে যাও।

পার্ষদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। সবাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোনে, কে হিসেব করে!

রাঘবের বাড়িতেই নিতাইয়ের আড্ডা। রাঘবকে দেখে নিতাই বললে, আমি গোপদের নিয়ে পুলিনভোজন করছি। তুমিও বসে যাও।

এ বুঝি নিতাইয়ের বলরামের ভাব। সেই যে রাখাল-সখাদের নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যমুনাপুলিনে ভোজন করেছিল এ বুঝি সেই স্মৃতি। তাই যদি, তবে কৃষ্ণ কোথায়?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল আর মহাপ্রভু অমনি আবির্ভূত হলেন।

নিতাই মহাপ্রভুকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভুকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক-এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁরা যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাই বা কে দেখে!

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। দু ভাই পাশাপাশি বসে চিঁড়ে খেতে লাগল।

এমন কে ভাগ্যবান আছে যে এ দৃশ্য দেখে।

হরি-হরি ধ্বনি তোলো। আদেশ করল নিত্যানন্দ।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের কৃপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যচরণ দান করলে।

রঘুনাথ কোথায়? সে বসেনি। নিতাইই তাকে বসতে দেয়নি। নিতাই যে তাকে গৌরহরির ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ। নিত্যানন্দের প্রসাদই তো গৌরহরির করুণার আস্বাদ দিয়ে ভরা।

রাঘবমন্দিরেও নিতাইয়ের পাশে বসে গৌরহরি ভোজন করলেন। দু ভাইয়ের অবশিষ্টপাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, তুমি চৈতন্যগোসাইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ববন্ধন ছিন্ন হল।

কোথায় চৈতন্যগোসাই? ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

তিনি নীলাচলে। তিনি আবার ভক্ত-চিত্তে, ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত, কখনো গুপ্ত। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না। সংশয়েই সর্বনাশ।

না, সংশয় করি না। রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল: কিন্তু তিনি না আসুন, আমি তাঁর কাছে যাই কী করে? চাঁদ যদি নিজে থেকে নেমে না আসে বামন তাকে ধরে কী করে? যতবার ঘর ছেড়ে পালাতে যাই, ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোরতর শাসনে বেঁধে রাখেন। আমি আর কিছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানো আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অধিকার।

নিত্যানন্দ ভক্তবৈষ্ণবদের বললে, তোমরা সব দেখ। রঘুনাথের ইন্দ্রসুখের মত বিষয়-সুখ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে এর অরুচি নেই! যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধ পায় সে ব্রহ্মলোকের সুখও অগ্রাহ্য করে।

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সস্নেহে বললে, তোমার পুলিনভবনে চৈতন্য এসে-ছিলেন, খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রান্না খেয়ে গেলেন। তুমি দুবারই তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন? তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ তোমাকে ঠিক তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য করে নেবেন।

তবে আর কথা কী। নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাণ্ডারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, এখন নয়, প্রভু যখন নিজের ঘরে ফিরে যাবেন তখন বলবে। আর শুধু প্রভুকে নয়, প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিত সকলকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাঘব প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরি করল। যাকে যা বলল তাই রঘুনাথ দিল নির্বিচারে।

আর এই সামান্য আপনার জন্যে। রঘুনাথ রাঘবকেও সোনা আর টাকা দিল। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিত্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি তাকে টেনে নেন অন্তরঙ্গ করে।

(ক্রমশঃ)

রবার্ট হুডিন

প্রভাতকুমার দত্ত

১৮৫৬ সালের ২৮শে অক্টোবর। আলজিয়ার্সের একটি বিখ্যাত রঙ্গালয়ে একজন যাদুকর যাদুর খেলা দেখাচ্ছেন। যাদুকরটি জীবনে অনেক রকম দর্শকের মুখোমুখি হয়েছেন কিন্তু সেদিন তাঁর সামনে যে দর্শকেরা বসেছিলেন তেমন দর্শকদের তিনি আগে কোনদিনই দেখেন নি। ষাটজন আরব দলপতির অধীনে অসংখ্য আরব সেদিন ম্যাজিকের খেলা দেখতে এসেছিলেন।

কয়েকটি সাধারণ খেলা দেখাবার পর যাদুকর তাঁর সেদিনের শ্রেষ্ঠ খেলা দেখাবার আয়োজন করতে লাগলেন। যাদুকর রঙ্গমঞ্চের ওপর একটি ছোট ট্রাঙ্ক এনে রাখলেন। তিনি বললেন যে ট্রাঙ্কটি খুবই ছোট এবং হাল্কা এবং যে কোন ছোট ছেলের পক্ষে এটি তুলে ধরা সম্ভব। কিন্তু তিনি যদি এই ট্রাঙ্কটিতে তাঁর যাদুর প্রভাব বিস্তার করেন তবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী লোকের পক্ষেও এটি তুলে ধরা সম্ভব হবে না। আসলে তিনি তাঁর যাদুর ক্ষমতায় যে কোন লোকের স্বাভাবিক শক্তি হরণ করে নিতে সক্ষম।

একজন বিদেশী যাদুকরের এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আরবদের মধ্যে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। তাদের শারীরিক শক্তি যে কোন লোকের পক্ষে হরণ করা সম্ভব এ কথা তারা বিশ্বাসই করতে পারলো না।

অফুরন্ত শক্তির অধিকারী বলে খ্যাত জনৈক বলিষ্ঠ আরব যুবক যাদুকরের চ্যালেঞ্জের জবাব দেওয়ার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে মঞ্চের ওপর উঠে এল।

যাদুকর তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তুমি কি নিজেকে খুবই শক্তিশালী বলে মনে কর?"

"নিশ্চয়ই—" আরবটির কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয়ের আভাস পাওয়া যায়।

"তুমি কি বিশ্বাস কর যে তোমার এই শক্তি সব সময়ে তোমারই থাকবে?"

"নিশ্চয়ই—" আরবটির সুতীব্র কণ্ঠস্বরে তার মনের জোরটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যাদুকরও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, "তুমি ভুল করছো। আমি এক মুহূর্তেই তোমার সমস্ত শক্তি হরণ করে তোমায় শিশুর তুল্য করে দিতে পারি।"

যাদুকরের কথায় আরব যুবকটির চোখেমুখে ব্যঙ্গ আর উপেক্ষার হাসি ফুটে উঠলো। সেদিকে এক পলক তাকিয়ে যাদুকর যুবকটিকে বললেন, "আচ্ছা এই ট্রাঙ্কটা তোলো তো।"

যুবকটি নীচু হয়ে ট্রাঙ্কটি তুলে ধরে বললো, "এই সামান্য বাক্সটা আমাকে দিয়ে তুলিয়ে আমার শক্তিপরীক্ষা—হাঃ হাঃ হাঃ......"

"থাম—," যাদুকরের কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ। অতঃপর যাদুকরটি তাঁর হাত পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-সঞ্চালন করে যুবকটির ওপর তাঁর যাদুশক্তি প্রয়োগ করলেন এবং বললেন, "তোমার শক্তি আমি হরণ করে নিলাম। একটা মেয়ের চেয়েও তুমি কম শক্তিশালী হয়ে গেছ। এবারে বাক্সটা তোলার চেষ্টা করতো দেখি—"

বলিষ্ঠ আরব যুবকটি অবহেলাভরে বাক্সটি তোলার চেষ্টা করতে গেল কিন্তু বাক্সটি বিন্দুমাত্রও নড়লো না। তখন সে তার সর্বশক্তি দিয়ে বাক্সটি তুলতে চেষ্টা করলো কিন্তু সেই ছোট হালকা বাক্সটি মঞ্চের ওপর যেখানে যেমনভাবে বসানো ছিল ঠিক তেমনভাবেই রইলো। এবারে আরবটি বাক্সের হ্যাণ্ডেল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল কিন্তু বাক্সটিকে সে একবিন্দুও নড়াতে পারলো না।

অনেকক্ষণ ধরে নানারকম কসরৎ করার পরও যখন কিছুই হল না তখন সে ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়ে ফিরে চললো। ফিরে যেতে গিয়েও সে যেতে পারলো না। বলশালী বলে তার খ্যাতি ছিল। বিদেশী যাদুকরের হাতে এমন নিগ্রহ, এমন অপমান সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। অপমানের তীব্র বিষে সে যেন পাগল হয়ে গেল। সমস্ত আরব এবং ইউরোপীয় দর্শকের দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো, "দাঁড়াও মরুভূমির ছেলে কি করতে পারে তা এখুনি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এইভাবে চীৎকার করার পর ছেলেটি বাক্সের কাছাকাছি এগিয়ে গেল। তার পা দুটো বাক্সের দুই প্রান্তে রেখে সে হ্যাণ্ডেলটি সজোরে ধরে বাক্সটি তুলতে গেল। তার চেষ্টার আন্তরিকতা থেকে মনে হচ্ছিল যে এবারে সে হয়তো সমর্থ হবে। তাই আরব দর্শকেরা চোখেমুখে উৎসাহ নিয়ে কি হয় কি হয় ভঙ্গিমায় উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কিন্তু এদিকে আরব ছেলেটির অবস্থা রীতিমত সঙ্গীন। সে বাক্সটির হাতল স্পর্শ করামাত্র তার মনে হল যেন বাক্সটি তাকে টানছে। এবং বিপুল শক্তিতে টানছে। ছেলেটি রীতিমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সে নিজেকে বাক্সটির বাঁধন থেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে গেল। এতে যে সে কেবলই নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না তা নয়, বাক্সটির সুতীব্র টানে সে মঞ্চের ওপরে অসহায়ের মত পড়ে গেল। কিন্তু বাক্সটির বন্ধন থেকে তবুও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না।

বলিষ্ঠ আরব যুবকটির অসহায় অবস্থা দেখে অন্যান্য আরব দর্শকেরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা বুঝলো যাদুকরের যাদুশক্তি সত্যিই অসাধারণ। যাদুকর অতঃপর একটি যাদুভঙ্গীর সাহায্যে তাঁর যাদুপ্রভাব তুলে নিলেন এবং ছেলেটিকে বাক্সের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। মুক্ত হওয়া মাত্রই আরব যুবকটি আল্লা আল্লা বলে চীৎকার করতে করতে মুহূর্তে রঙ্গালয়ের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছেলেটির চোখেমুখে যে প্রবল আশঙ্কার ছায়া অন্যান্য দর্শকেরা দেখলো তাতে তারা স্পষ্টই বুঝলো যে তার মনোবল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং তার পক্ষে পাগল হয়ে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সমস্ত দর্শকেরা বিদেশী যাদুকরকে শয়তান বলে আখ্যা দিতে লাগলো। আলজিয়ার্সের রঙ্গালয়ে সেদিন এক অভূতপূর্ব অভাবনীয় পরিস্থিতি।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন—কে এই যাদুকর? এবং কেনই বা তিনি আফ্রিকার মত বিপজ্জনক মহাদেশে জীবন বিপন্ন করে যাদুর খেলা দেখাতে গিয়েছিলেন?

এই যাদুকরের নাম রবার্ট হুডিন। ম্যাজিকের উন্নতি, আধুনিকীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্যের ওপর নির্ভর করে ম্যাজিক সৃষ্টি করার ব্যাপারে এই ফরাসী যাদুকরের অবদান অবিস্মরণীয়। যাদুকর হিসেবে হুডিনের আশাতীত

সাফল্য লক্ষ্য করেই জনৈক অখ্যাত অজ্ঞাত আমেরিকান যাদুকর তাঁর নিজের নাম পরিবর্তিত করে হুডিনি (অর্থাৎ হুডিনের মত) রেখেছিলেন। সেই হুডিনি আজ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ যাদুকরের পর্যায়ে আসীন।

কিন্তু হুডিনকে তাঁর সাধের ফরাসী দেশ ছেড়ে, প্রমোদবিলাসী নগরী প্যারিস ছেড়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার আলজিরিয়ায় আসতে হয়েছিল কেন? এর কারণ পুরোপুরি রাজনৈতিক।

ফরাসীরা আলজিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন এবং সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু আলজিরিয়ার দুর্ধর্ষ অধিবাসীরা কোনদিনই পরাধীনতাকে সহ্য করতে চায় নি। তারা বারবার বিদ্রোহ করেছে। ফরাসী শাসকেরা সে বিদ্রোহ যথাসময়ে কঠোর হাতে দমন করতো বটে কিন্তু বারবার একই রকম সংঘর্ষ ঘটার ফলে শাসকেরাও নাজেহাল হয়ে পড়লো। এই বিদ্রোহীরা নিজেদের নিগৃহীত আরবদের মুক্তিদাতা বলে ঘোষণা করতো। বিপুলসংখ্যক আলজিরিয় আরব দৃঢ় বিশ্বাস করতো যে এই বিদ্রোহীরাই ভগবানের দূত এবং তারাই বিদেশীদের শাসন থেকে তাদের মুক্ত করবে।

এই বিদ্রোহীদের ভগবানের দূত বলে মেনে নেওয়ার একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে তারা নানারকম অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাতে পারতো।

ফরাসী শাসকেরা অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে বিদ্রোহীরা জনসাধারণের কাছে নিজেদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়ার জন্য গোপনে যাদুর চর্চা করে।

আলজিরিয়ার ফরাসী-গভর্নর বুঝেছিলেন যে এই বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে গেলে ওদের চেয়েও বড় যাদুকর দিয়েই করতে হবে। ফরাসী যাদুকর রবার্ট হুডিনের কথাই তাঁর সর্বপ্রথম মনে পড়েছিল। হুডিনের যাদুর খেলা আরব যাদুকরদের খেলার চেয়ে অনেক বেশী চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর। হুডিনের যাদুর সাহায্যে আরব বিদ্রোহী বা আরব যাদুকরদেরও বোকা বানানো যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ আলজিরিয়ের মনেও শ্বেতাঙ্গ যাদুকরের ঐশী ক্ষমতার প্রমাণ গেঁথে দেওয়া যাবে।

গভর্নরের অনুমান এবং কার্যপ্রণালীর প্রশংসাই করতে হয়। হুডিনকে ফ্রান্স থেকে আলজিরিয়ায় আনিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কয়েকটি 'শো' করিয়ে তাঁর কাজ হাসিল হয়েছিল।

১৮৫৪ সাল থেকে হুডিনকে আলজিয়ার্সে আনার চেষ্টা করা হচ্ছিল কিন্তু ১৮৫৬ সালের অক্টোবরের আগে তাঁর পক্ষে আলজিয়ার্সে যাওয়া সম্ভব হয় নি। হুডিন আলজিয়ার্সে গিয়ে উপস্থিত হবার পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর আসার সংবাদ ঘোষিত হয়। কিন্তু অন্য কয়েকটি পত্রিকার সাংবাদিকেরা বললো—রবার্ট হুডিন আলজিয়ার্সে আসতেই পারে না, খবরটা গুজব মাত্র।

একটা কাগজ লিখলো—

"Robert Houdin cannot be at Algiers for we see daily announced in the Paris paper "Robert Houdin every evening at eight o' clock"

আরেকটা কাগজ তার উত্তরে লিখলো—"কেন প্যারিসে থাকাকালীন কি হুডিন আলজিয়ার্সে খেলা দেখাতে আসতে পারেন না? তিনি যে একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকেন বা থাকতে পারেন সে কি আমরা জানি না? আমরা কি এও জানি না যে এই যাদুকর প্যারিস, রোম এবং মস্কো শহরে একই সন্ধ্যায় খেলা দেখাতে পারেন?"

১৮০৫ সালের ৬ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের রোয়া নামক শহরে রবার্ট হুডিনের জন্ম হয়। ফরাসী-সম্রাট দ্বাদশ লুই এবং স্টীম-এঞ্জিন আবিষ্কারক ডেনিস প্যাপিনও এই শহরেই জন্মেছিলেন।

হুডিনের বাবা ছিলেন একজন সুদক্ষ ঘড়ি-নির্মাতা। ঘড়ি তৈরী এবং সারানো ছাড়াও তিনি বাসনপত্র তৈরী, ক্ষোদাইয়ের কাজ, কাঠের কাজ, এনামেলের কাজ প্রভৃতিও করতেন। হুডিন যন্ত্রপাতির মধ্যেই জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন। তিনি বাবার কাছ থেকেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে শিখেছেন। বার্নার্ড নামক জনৈক প্রতিবেশীও হুডিনকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে খেলনা তৈরীতে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।

হুডিন এগার বছর বয়সে অর্লিন্সের কলেজে পড়াশোনা করতে গেলেন। কিন্তু স্কুল কলেজের বন্ধ আবেষ্টনী তাঁর মোটেই ভাল লাগতো না। তিনি যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতেই ভালবাসতেন। হুডিন যদি ম্যাজিক জগতে নাও আসতেন তবু তিনি একজন সার্থক এঞ্জিনিয়ার হিসেবে নাম করতেন বলে মনে হয়। বহুক্ষেত্রে তাঁর বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরীর কাজে প্রতিভা এবং উদ্ভাবনা শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। অর্লিন্সের কলেজে পড়তে পড়তে তিনি পাখির পালক দিয়ে এক অপূর্ব পাম্প তৈরী করেছিলেন। এই পাম্পের সাহায্যে জল তোলার কায়দা দেখিয়ে তিনি তাঁর বন্ধুদের বেশ অবাক করে দিয়েছিলেন।

সার আইজাক নিউটনের মত হুডিনও তাঁর ছোটখাট যন্ত্রপাতির চালক হিসেবে ইঁদুরকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে রাত্রে ইঁদুর ধরতে বেরোতেন। একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত চেষ্টা করে হুডিন কয়েকটি ইঁদুর ধরে এনে তার জুতোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। পরের দিন সকালে ইন্সপেক্টারের সামনে জুতো পরতে গিয়ে হুডিন ধরা পড়ে যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান-শিক্ষকের কাছে নালিশ জানানো হয়। প্রধান-শিক্ষক হুডিনকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি লঘু শাস্তি দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। কিন্তু হুডিনকে কথা দিতে হয় যে তিনি আর পড়াশুনায় অবহেলা করে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে পারবেন না। হুডিন তাঁর শিক্ষককে শুধু যে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি অক্ষরে অক্ষরে তা পালনও করেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি রীতিমত পড়ুয়া ছেলেতে পরিণত হয়েছিলেন।

আঠার বছর বয়সে তার শিক্ষা সমাপ্ত হল। তিনি কলেজ ছেড়ে রোয়ায় ফিরে এলেন। কলেজ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রথম কয়েকদিন মনের আনন্দে রোয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এইভাবেই তিনি একদিন রাস্তায় একজন যাদুকরের খেলা দেখে ভীষণ মুগ্ধ হন। প্রকৃতপক্ষে সেদিনই তিনি তাঁর জীবনে প্রথম ম্যাজিক দেখলেন। এই রাস্তার যাদুকর তাঁর নিজের নাম ডঃ কার্লোসবাক বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই যাদুকরের অভিনয়-ক্ষমতা, বাচনভঙ্গী, খেলা দেখাবার কৌশল প্রভৃতির গুণে হুডিন মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

কার্লোসবাক প্রথমে নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন অষুধের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচিত করে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন যে তিনি আসলে ডাক্তার নন, তিনি একজন যাদুকর। এই কথা বলেই তিনি কয়েকটি চিত্তাকর্ষক যাদুর খেলা দেখিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি ভোল পাল্টিয়ে নিজেকে একজন লেখক বলে দাবী করে বসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ৬ পেনিতে তাঁর বই বিক্রীও করতে শুরু করে দিলেন।

অনেকের মত হুডিনও সেই ম্যাজিক-সংক্রান্ত বইটি কিনে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে বইটি পড়তে গিয়ে তিনি বুঝলেন যে বইয়ের সারমর্ম বোঝা তাঁর সাধ্য নয়। তিনি কার্লোসবাকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেন।

হুডিন খোঁজ নিয়ে জানলেন যে কার্লোসবাক বাইরে থেকে রোয়া শহরে এসেছিলেন এবং একটা হোটেলে উঠেছিলেন। সেই হোটেলে খোঁজ নিতে গিয়ে হুডিন জানলেন যে কার্লোসবাক সেই হোটেলেই উঠেছিলেন। তিনি ম্যাজিকের নানারকম সাজসরঞ্জাম দুটো ট্রাঙ্কে করে এনেছিলেন। এই দুটি ট্রাঙ্কের মধ্যে একটি বেশ বড় এবং আরেকটি সে তুলনায় বেশ ছোট ছিল। কার্লোসবাক দুদিন আগে বড় ট্রাঙ্কটা নিয়ে কোথায় খেলা দেখাতে গেছেন। আজ তাঁর ঘর খুলে হোটেলের মালিক দেখেছেন যে কার্লোসবাকের জিনিসপত্রের মধ্যে কোন কিছুই সে ঘরে নেই। এমনকি ছোট ট্রাঙ্কটাও নয়। মালিক এবং হুডিন দুজনেই বুঝলেন যে ছোট ট্রাঙ্কটার মধ্যেই কার্লোসবাকের সমস্ত সরঞ্জাম ছিল এবং সেটি বড় ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরে তিনি হোটেল-মালিককে তাঁর পাওনা না মিটিয়েই চম্পট দিয়েছেন।

কার্লোসবাকের খেলায় হুডিন খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু তার ব্যবহারে তিনি এমনই বিরক্ত হলেন যে যাদুকর বা যাদু সম্পর্কে তিনি আর কোন উৎসাহই দেখাবেন না বলে স্থির করলেন। তাঁর নিয়তি সেদিন মনে মনে নিশ্চয়ই একচোট হেসেছিলেন।

হুডিনের বাবার ইচ্ছে ছিল যে ছেলেকে তিনি সলিসিটর করে তুলবেন। এদিকে

হুডিন নিজেকে যন্ত্রবিদ হিসেবেই সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এইরকম টানাপোড়েনের মধ্যে হুডিন একটি চাকরী জুটিয়ে নিলেন। ম্যাসিয়ে রোজার নামক জনৈক আইনজীবী ভদ্রলোকের কাছে তিনি একটি কেরানীর চাকরী পেলেন।

অ্যাভারের একটা এস্টেট দেখাশোনার ভার নিয়ে রোজার যখন অ্যাভারে গেলেন তখন হুডিনকেও তিনি সংগে নিয়ে চললেন। হুডিনের কিন্তু চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ অবস্থায় কাজ-কর্ম করতে মন চাইতো না। তিনি সেখানকার লাইব্রেরীতে বোটানীর একটা বই পড়ে গাছপালা সম্পর্কে খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লেন এবং এস্টেটের বাগানে হাতে-কলমে এ ব্যাপারে শিক্ষা শুরু হল।

সারাদিন রোজারকে নানাভাবে সাহায্য করতে হত বলে হুডিন ঠিক করলেন যে ভোরের দিকেই তিনি তরুলতা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু তাতেও এক অসুবিধা হল। হুডিন ভোরে উঠতেই পারতেন না। আটটার আগে তাঁর ঘুমই ভাঙতো না। হুডিন মনে মনে চিন্তিত হলেন।

কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ চিন্তা করার পরই তিনি অদ্ভুত উপায়ে সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। তিনি প্রাসাদের যে ঘরে থাকতেন সেটি প্রধান ফটকের পাশেই ছিল। বিরাট উঁচু লোহার তৈরী প্রধান ফটকটি দরোয়ান খুব ভোরেই খুলে দিত। হুডিন একটা লম্বা দড়ি জোগাড় করলেন। তিনি সেই দড়ির একটা প্রান্ত শক্ত করে লোহার ফটকের ওপরের অংশে বাঁধলেন। দড়ির অপর প্রান্ত তিনি নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। প্রতিদিন রাত্রে শোবার সময় তিনি দড়ির এই প্রান্ত দিয়ে তাঁর পা বেঁধে রাখতেন। সকালবেলায় দারোয়ান গেট খুলতেই হুডিনের পায়ে টান লাগতো আর তাতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যেত।

ক্রমশঃ গাছপালার সঙ্গে হুডিন এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে তিনি রোজারের কাজের কোন খোঁজখবরই রাখতে পারতেন না। রোজার হুডিনকে ভালভাবে বুঝিয়ে, বললেন যে এ ধরনের কেরানীর কাজ তাঁর মনের মত নয়। তিনি মেকানিক হলেই জীবনে উন্নতি করবেন। সুতরাং তিনি রোয়ায় ফিরে গিয়ে যন্ত্রবিদ হবার চেষ্টা করলেই ভাল হবে।

রোজারের কথামত হুডিন তার বাবার কাছে ফিরে গেলেন। হুডিনের বাবার তখন বয়েস হয়েছে। তিনি তাঁর ঘড়ির দোকান বিক্রী করে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। তার নিজের পক্ষে ছেলের জন্য কোন কিছু করা সম্ভব হোল না। তার ভাইপোর যন্ত্রপাতির একটা কারখানা ছিল। রোজারের পরামর্শমত হুডিনকে তিনি ভাইপোর হাতেই অর্পণ করলেন।

হুডিন তার খুড়তুতো ভাইকে রবার্ট বলে ডাকতেন। এই রবার্টের সঙ্গে রবার্ট হুডিনের ভীষণ রকম অন্তরঙ্গতা ছিল। যাইহোক রবার্ট হুডিনকে বুঝিয়ে বললেন যে ভাল যন্ত্রবিদ হতে গেলে যন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বই পড়তে হবে। রবার্টের পরামর্শমত হুডিন একদিন বইয়ের দোকানে গিয়ে বারথোডের লেখা ট্রিটিজ অন ক্লক মেকিং-এর দুটো ভল্যুম চাইলেন। ভীষণ রকম ব্যস্ততার মধ্যেও দোকানদার খুব তাড়াতাড়ি বই দুটো প্যাক করে দিলেন।

হুডিন বই দুটো বাড়িতে নিয়ে এলেন। এই দুটো খুলে কিন্তু তিনি অবাক হয়ে গেলেন। একটা বই খুলে তিনি দেখলেন যে সেটির নাম 'সায়েন্টিফিক অ্যামিউজমেন্টস্'। হুডিন অবাক হয়ে সূচীপত্র খুলে দেখলেন যে তাতে লেখা রয়েছে—তাসের ম্যাজিক, কোন লোকের চিন্তা বলে দেওয়া, পায়রার মাথা কেটে আবার জীবনদান করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি বুঝলেন বইয়ের দোকানদার ভুল করে তাঁকে দুটো অন্য বই দিয়ে দিয়েছে। ঘড়ি তৈরী সংক্রান্ত বইয়ের বদলে তাঁর হাতে দু-খন্ড এনসাইক্লোপিডিয়া এসে হাজির। যন্ত্রবিদ হওয়া যে তার ভাগ্যের লিখন নয়। এ যেন তারই এক দৈব নির্দেশ।

হুডিন বইগুলো ফেরত না দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের নামগুলো তাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। হুডিনের জীবনে এমন অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে যেগুলি তাকে যাদুর দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। বইয়ের দোকানদারের ভুল এমনই একটি ঘটনা।

বইটি হুডিনের ভীষণ ভালো লাগছিল। বইয়ের প্রতিটি লাইন তিনি গিলতে লাগলেন। এদিকে রাত ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। হঠাৎ এক সময়ে ঘরের শেষ মোমবাতিটিও দপ করে নিভে গেল। ঘরে আর মোমবাতি ছিল না, অন্য কোনরকমভাবে আলো জ্বলানোর ব্যবস্থাও নেই। অথচ হুডিনের তখন আলোর একান্ত দরকার। বইটা পড়তে পড়তে তিনি এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে এখন পড়া থামালে মোটেই চলবে না।

পাশের বাড়ি থেকে অল্প একটু আলো আসছিল। হুডিন সেই আলোতেই বই খুলে পড়তে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে আলো এতই ক্ষীণ ছিল যে কিছুই পড়া গেল না। নিরুপায় হয়ে হুডিন ঘুমোতে গেলেন কিন্তু ঘুম এল না।

জানালা দিয়ে দেখলেন অদূরেই রাস্তার ধারে আলো জ্বলছে। তিনি রাস্তার আলোতেই পড়বেন বলে স্থির করে ফেললেন। তারপর মনে মনেই তার মত কিছুটা পাল্টিয়ে ফেললেন। রাস্তার আলোতেই পড়বেন বটে কিন্তু পড়বেন তার নিজের ঘরে। তিনি ঠিক করলেন যে রাস্তার ল্যাম্পটাকেই খুলে নিজের ঘরে নিয়ে আসবেন।

এক হাতে টুপি এবং আরেক হাতে একটা সাঁড়াশী নিয়ে হুডিন নীচে নেমে এলেন। পোষাক পরার সময় বা ধৈর্য কিছুই তার হাতে ছিল না। তিনি স্বল্পতম পোষাকেই রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। রাস্তার আলোটা যে বাক্সের মধ্যে ছিল সেটা খোলার জন্য তিন সাঁড়াশী নিয়েছিলেন। টুপি দিয়ে নিজেকে আড়াল করে এই মহৎ কাজটি করলেই ভাল হয় এই ভেবে হুডিন টুপিটাও সংগে নিয়েছিলেন।

হুডিন তার দক্ষ হাতে ল্যাম্পটা যখন প্রায় খুলে ফেলেছেন ঠিক সেই সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক হঠাৎ দরজা খুলে চৌকাঠের ওপর দাঁড়ালেন। হুডিন তাড়াতাড়ি টুপিটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটতে লাগলো। ভদ্রলোকটির নড়বার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অসাবধানতাবশতঃ হুডিনের কোট ধোঁয়া লেগে নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। হুডিন এরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর কখনও পড়ে নি।

ভদ্রলোকটি হঠাৎ বাড়ির ভেতর ঢুকতেই হুডিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হুডিন দ্রুত পালাবার চেষ্টা করতে গেলেন কিন্তু পারলেন না। কারণ ঐ প্রতিবেশী ভদ্রলোকটি মুখে পাইপ ধরিয়ে আবার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। হুডিন এতক্ষণে টের পেয়েছেন যে তাঁর কোটের লাইনিং-এ আগুন ধরে গেছে। এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে। হুডিনের পক্ষে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করাও চলে না। হুডিন বুঝতে পারলেন যে তাঁকে পালাতেই হবে। কিন্তু কিভাবে পালাবেন তা ভেবে তিনি ঠিক করতে পারলেন না। বাড়িতে যেতে গেলে ভদ্রলোকটির সামনে দিয়েই যেতে হয় কিন্তু প্রায় নিরাবরণ অবস্থায় এত রাত্রে পরিচিত লোকের সামনে দিয়ে যাওয়া যায় না। যাইহোক টুপি এবং ল্যাম্পটা নিয়ে তিনি একটা বাই লেনে ঢুকে পড়লেন। প্রায় পনের মিনিট ধরে বিভিন্ন গলি ঘুরে পেছন দিক দিয়ে হুডিন যখন তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছলেন তখন তার অবস্থা শুধু শোচনীয়ই নয় মৃতপ্রায়ও বটে।

পরের রাতে হুডিন অপর্যাপ্ত মোমাবাতি নিয়ে হোয়াইট ম্যাজিক-এর বই খুললেন। এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত ম্যাজিক তার মুখস্ত হয়ে গেল।

হুডিন বুঝে নিয়েছিলেন যে, বইতে তিনি যেগুলো পড়লেন সেগুলো হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখে না নিলে তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন হবে না। ম্যাজিকগুলো নিজে নিজে করতে গিয়ে হুডিন বুঝলেন যে কাজটা খুব সহজ নয়। তাঁর এই সময়কার অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

> 'I was in the position of a man who attempts to copy of a picture without possessing the slightest notion of drawing and painting.'

কোন শিক্ষক না থাকায় হুডিন নিজেই নিজের শিক্ষক হলেন। তিনি প্রথমে Sleight of hand শিখবেন বলে ঠিক করলেন। এবং শিখতেও লাগলেন। তিনি প্রথমে নিজে নিজেই হাতের এবং চোখের সূক্ষ্ম খেলাগুলো অভ্যাস করতে লাগলেন। এই সময়ে রোয়ায় একজন সাধারণ লস্যকর্তনকারী তার হাতের সূক্ষ্ম খেলার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। হুডিন এই লোকটির কাছ থেকে দশ ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে বল ছোঁড়া এবং লোফার

কায়দা শিখতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যেই তিনি খেলাটায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর শিক্ষকের সমকক্ষ হয়ে পড়লেন। চারটে বল নিয়ে তিনি অনায়াসে এই খেলা দেখাতে পারতেন। হুডিন নিজেই স্বীকার করেছেন যে ম্যাজিক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি বল ছোঁড়ার যে কায়দা শিখেছিলেন, দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে তার শেষ পর্বেও তিনি সেই কৌশল সম্পূর্ণ নিজের দখলেই রাখতে পেরেছিলেন। এ বিষয়ে বাঙালি যাদুকর যতীন্দ্রনাথ রায়ের সংগে তার সবিশেষ মিল আছে।

যাইহোক হুডিন এইভাবে আঙুল, হাত এবং চোখকে নিজের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হবার পর Sleight of hand বা হস্তলাঘবের খেলায় গেলেন। এই সময়ে তিনি হাতের তালুতে ছোট বড় বিভিন্ন জিনিস লুকিয়ে রাখা শিখতে লাগলেন এবং সংগে সংগে নানারকম তাসের ম্যাজিকেও হাত পাকাতে থাকেন।

হাতের তালুতে কোন কিছু লুকিয়ে রাখা বা পামিং করার জন্য ভীষণরকম অভ্যাসের প্রয়োজন। কারখানায় কাজ করে হুডিনের হাতে আলাদাভাবে এসব অভ্যাস করার কোন সময়ই থাকতো না। ফরাসী দেশে সেই সময়ে বিরাট হিপ-পকেট-ওলা কোট পরার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। কোন কাজ করার সময়ে হাতের প্রয়োজন না থাকলে হুডিন তাঁর কোটের হিপ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পামিং অভ্যাস করতেন। যখন তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেন তখন দু-হাতেই পামিং অভ্যাস করতেন। খাবার সময়ে করতেন এক হাতে। এভাবে প্রায় সব সময়েই পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখার জন্য হুডিনকে সকলেই কিছু-না-কিছু ঠাট্টা করতেন.কিন্তু হুডিন কখনোই সেগুলি গায়ে মাখতেন না।

এই সময়ে খুড়তুতো ভাই রবার্টের কারখানায় তাঁর শিক্ষানবিশি শেষ হয়ে গেল। তিনি Tours শহরে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। এখানে এসেও তিনি তাঁর পামিং করার অভ্যাস আগের মতই বহাল রাখলেন। এইভাবে দীর্ঘদিন অভ্যাস করার পর তিন ভীষণ দক্ষ হয়ে পড়লেন। তাসের ম্যাজিকেও তিনি তখন অতুলনীয়। এইভাবে কিছু সঞ্চয় করে তিনি পরিচিতদের আসরে অল্পস্বল্প ম্যাজিক দেখাতে শুরু করলেন। তুর্সে থাকাকালীন হুডিন একবার ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে তার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিছুদিন রোগভোগের পর তিনি ডাক্তারের নির্দেশ অমান্য করে তুর্স ছেড়ে ব্লোয়ার দিকে যাত্রা করলেন। তখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ হন নি। গাড়ীতে যেতে যেতে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ী থেকে পড়ে যান এবং রাস্তাতেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকেন।

জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি দেখলেন যে একটি ঘরে তিনি শুয়ে আছেন। এবং একজন ভদ্রলোক তাঁর সেবায় রত। তিনি ভদ্রলোকটির কাছে সমস্ত বিবরণ জানতে চাইলেন। কিন্তু ভদ্রলোকটি তাঁকে দু-একদিন কথা বলতে বারণ করলেন। প্রায় তিনদিন পর হুডিন ভদ্রলোকটির কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনলেন।

ভদ্রলোকটি একজন নামকরা যাদুকর তাঁর নাম টরিনি। যে ঘটনায় হুডিন শুয়েছিলেন সেটা এমন কায়দায় তৈরী যে সেটাকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি ছোটখাট রঙ্গালয়ে পরিণত করা যায়। ঘরের একটা অংশ পর্দা দিয়ে ঘেরা ছিল। সেই অংশটায়ও কিছু কৌশল ছিল। সেই অংশটাকেও দাঁড়িয়ে তার মধ্যে টরিনি তাঁর ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি রাখতে পারতেন বা রাখতেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সম্পূর্ণ ঘরটাই ছিল একটা গাড়ি। দুটি ঘোড়া খুব সহজেই সেই গাড়িটি টেনে নিয়ে যেতে পারতো।

টরিনি আর্লিন্স থেকে অ্যাঙ্গার্সে যাচ্ছিলেন। অঙ্গার্সের মেলায় খেলা দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। গাড়ি টানতে টানতে ঘোড়া দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দেখে টরিনি এক জায়গায় গাড়ি থামালেন এবং ঘোড়া দুটোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। টরিনি যেখানে গাড়ি থামালেন তারই ঠিক আগে হুডিনের অচেতন দেহ রাস্তার ওপর পড়ে ছিল। টরিনি ঐ জায়গায় গাড়ি না থামালে সেদিন হুডিনকে হয়তো গাড়ি চাপা পড়েই মরতে হত।

টরিনি হুডিনের প্রাণরক্ষা করেছেন বলে হুডিন তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানালেন। টরিনি দয়া করে সযত্ন শুশ্রূষা না করলে যে হুডিন প্রাণ ফিরে পেতেন না সে কথা স্বীকার করে হুডিন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন।

এ্যাঙ্গার্সে হুডিনকে একটা হোটেলে রাখা হল। তিনি একদিন টরিনির খেলা দেখতে গেলেন। যাদুকর হিসেবে টরিনির স্থান খুবই উচ্চে ছিল। তাঁর খেলাগুলোও সত্যিই ভীষণ রকম চিত্তাকর্ষক। টরিনি তাসের ম্যাজিকগুলো খুবই উঁচুদরের ছিল।

হুডিন টরিনির খেলা দেখে খুবই মুগ্ধ হলেন। খেলা শেষ হবার পর তিনি টরিনির কাছে গিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন। উত্তরে টরিনি বললেন—'তোষামোদ করার কোন প্রয়োজনই নেই, কারণ তুমিও তো একজন উঁচুদরের ম্যাজিসিয়ান।' টরিনির কথা শুনে হুডিন অবাক। তিনি যে সত্যিই ম্যাজিকের চর্চা করেন একথা টরিনি কিভাবে জানলেন? হুডিন তো তাঁর পূর্ব ইতিহাস কিছুই টরিনিকে বলেন নি। তবে?

টরিনি কেমনভাবে এ কথা জানতে পারলেন তা হুডিন তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইলেন। উত্তরে টরিনি জানালেন যে অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক উপায়ে তিনি এটা জেনেছেন। খেলা দেখবার সময়েই টরিনি এটা আবিষ্কার করেছেন। টরিনি জানালেন যে খেলা দেখাবার সময় নানারকম গল্প করে তিনি যখন সাধারণ দর্শকের চোখকে ম্যাজিকের জায়গা থেকে অন্যত্র নিতে সক্ষম হয়েছেন তখন হুডিনের চোখ কিন্তু দিগভ্রান্ত হয় নি, সে ঠিক জায়গাতেই আপনাকে নিবদ্ধ রেখেছিল। আর এই সামান্য ঘটনা থেকেই টরিনি বুঝে ফেললেন যে হুডিনও একজন যাদুকর। টরিনির আবিষ্কার সত্যিই প্রশংসার তুল্য।

টরিনির সংগে কিছুদিন একসংগে থাকার পর হুডিন ব্লোয়ার ফিরে গেলেন। টরিনির সংগে থাকাকালীন হুডিন অবশ্য তার কাছ থেকে অনেক নতুন এবং অদ্ভুত ম্যাজিক শিখে নিয়েছিলেন। অ্যাক্সিডেন্টে টরিনি আহত এবং অক্ষম হয়ে পড়ায় হুডিন তার প্রতিনিধি হিসেবে বহু জায়গায় যাদুর খেলাও দেখিয়েছিলেন।

ব্লোয়ার ফিরে আসার পর রবার্ট হুডিন প্যারিসের এক বিখ্যাত ঘড়ি-ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিবাহ করলেন। রবার্টের প্রাকবিবাহ নাম ছিল জিন ইউজেন রবার্ট। রবার্টের শ্বশুরের পদবী ছিল হুডিন। তিনি শ্বশুরের পদবী গ্রহণ করে নিজের নাম রাখলেন রবার্ট হুডিন। ব্যবসায়ীমহলে দ্রুত সুপরিচিত হয়ে ওঠার জন্য এবং ব্যবসায়িক সুখ-সুবিধার জন্যেই তিনি নিজের পদবী পরিবর্তিত করেছিলেন বলে মনে হয়।

ব্যবসায়ে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হবার পর হুডিন আবার যাদুচর্চা শুরু করবেন বলে ঠিক করলেন। প্যারিসে তিনি তার নিজস্ব ঘড়ির কারখানা খুলে ফেললেন এবং এই কারখানা থেকে তার যথেষ্ট আয়ও হতে লাগলো।

এই সময়ে তিনি বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদের আসরে প্রায়ই নানারকম ম্যাজিক দেখাতেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি স্থির করলেন যে তিনি পেশাদার হয়ে তার কৃতিত্ব এবং জনপ্রিয়তা বিচার করবেন।

পেশাদার যাদুকরদের সাধারণতঃ একটি রঙ্গালয় স্থির করা থাকে যেখানে তাঁরা নিয়মিতভাবে যাদু-প্রদর্শন করতে পারেন। ১৮৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি রঙ্গালয়ের জন্য জায়গা খুঁজতে বেরোলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তিনি মনের মত জায়গা পেলেন না। অতঃপর তিনি বাড়ি ভাড়া করবেন বলে ঠিক করলেন। সেখানেও অনেক রকম অসুবিধা। কোথাও জায়গার দাম খুব বেশী, কোথাও বা জায়গার দাম কম কিন্তু মালিকেরা ম্যাজিকের জন্য বাড়ি ভাড়া দিতে রাজি নন। হুডিন প্যারিসের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে ঢুঁ মেরেও কিছু করতে পারলেন না।

হুডিন এইভাবে নিরাশ হয়ে পড়ার পর তার সহকারী অ্যান্টনিও খবর নিয়ে এলেন যে Palais Hotel এর একটা বড় ঘর তিনি দেখে এসেছেন এবং সেটি সহজেই থিয়েটার হলে পরিণত করা যাবে, রবার্ট হুডিন সংগে সংগে 164 Galerie de Valois ঠিকানায় ছুটলেন। বাড়ি দেখে রবার্টের পছন্দ হল। তিনি বাড়ির মালিকের সংগে কথাবার্তা বললেন। মালিক ঘরটার কোন মেরামতির ব্যয় বহন করতে পারবেন না বললেন এবং

হুডিনের ঘরটা পছন্দ হয়েছে এটা বুঝে তিনি মোটা টাকা চেয়ে বসলেন।

হুডিন ঘরটি দীর্ঘকালের জন্য লীজ নিয়ে নিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ স্থপতির সাহায্যে রঙ্গালয়ের প্ল্যান করালেন এবং হল তৈরী করতে আরম্ভ করে দিলেন। ছুতোর, রাজমিস্ত্রি এবং অন্যান্য মজুরেরা এই বিশেষ ধরনের রঙ্গালয়টি অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরী করতে শুরু করলো। হুডিন যাদুচর্চার পুরোনো ঢঙ ছেড়ে নতুন আদব-কায়দা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সাধারণতঃ যাদুকরেরা মঞ্চকে খেলার দোকান করে তোলেন। হুডিনের তা মনোমত ছিল না। যাদুর খেলা দেখাবার সময় যে সমস্ত জিনিস অদৃশ্য করে দেওয়া হত সেগুলোর ওপর প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই একটা ধাতব আবরণী রাখা হত। হুডিন এই ব্যবস্থাও তুলে দিয়ে বিভিন্ন রকম কাচের তৈরী যন্ত্রপাতি নিয়েই খেলা দেখাবেন বলে ঠিক করলেন। ডবল-বোতাম দেওয়া বাক্স প্রভৃতি যে সমস্ত যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য সাধারণ যাদুকরেরা নিয়ে থাকেন হুডিনের তাও ভাল লাগে নি। তিনি এই ধরনের বহু-ব্যবহৃত প্রথা বন্ধ করে দিলেন। যাদুর খেলা দেখাবার সময় প্রত্যেক যাদুকরেরই কিছু কিছু নিজের লোক দর্শকদের সঙ্গে মিশে থাকে। এদের সাহায্য নিয়েও অনেক খেলা দেখানো হয়। হুডিন এই ধরনের ম্যাজিক দেখাতে ভালবাসতেন না।

হুডিনের পূর্ববর্তী যাদুকরেরা মঞ্চের ওপর হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালিয়ে একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইতেন। হুডিনের এই ব্যবস্থা ভাল লাগে নি। তিনি অস্বচ্ছ কাচের গোলকের মধ্যে গ্যাস পুরে আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

আগেকার যাদুকরেরা যে টেবল-ক্লথ ব্যবহার করতেন সেগুলি টেবলকে পুরোপুরি ঢাকা দিয়ে মাটিতে লুটোতো। হুডিন এই ব্যবস্থাও তুলে দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই যে, এইভাবে টেবল-ক্লথে সারা টেবিলকে ঢাকা দিয়ে রাখলে দর্শকেরা সব সময়েই সন্দেহ করবে যে তার তলায় কোন লোক বা জিনিস লুকোনো আছে।

আগে জবড়জঙ্গ পোশাক পরে ম্যাজিক দেখানোর খুব চল ছিল। হুডিন এর কোন সার্থকতাই খুঁজে পান নি। তিনি এই প্রথাও বন্ধ করে দিয়ে ভদ্রসমাজসম্মত সান্ধ্য-পোশাক পরেই খেলা দেখাতেন। তিনি খেলা দেখাবার সময় খুব বেশী রসিকতা করা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে অবশ্য অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাদুকরেরা তাঁর সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন।

যাইহোক যাদুচর্চার পুরনো প্রথাকে বিদায় দিয়ে নতুন পথ দেখাবার প্রতিভা এবং সাহস হুডিনের ছিল এ কথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নেওয়া ভাল। এ জন্যেই তাঁকে 'আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক' বলা হয়ে থাকে।

যাদুর খেলার কায়দা-কানুন প্রদর্শন-ভঙ্গী প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে অনেক নতুনত্ব আমদানি করতে চেয়েছিলেন বলে হুডিনকে তাঁর রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গালয়টিও বিশেষভাবে তৈরী করতে হচ্ছিল। তিনি দিনের পর দিন স্থপতি, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর মজুর প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং কখনো কখনো নিজের হাতে কাজ করে রঙ্গালয়-তৈরী প্রায় শেষ করে আনলেন।

রঙ্গালয় প্রায় শেষ হয়ে আসার পর হুডিনের সহকারী অ্যাণ্টনিও একদিন হুডিনকে বললেন—"থিয়েটার তৈরী করার জন্য পুলিশ বিভাগের অনুমতি নিতে হয়, আপনি সে অনুমতি নিশ্চয়ই নিয়ে নিয়েছেন?"

উত্তরে হুডিন বললেন, "না, এখনও নিই নি। সে অনুমতি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমি তো বাড়ির আয়তনের কোন মৌলিক পরিবর্তন করি নি।"

"তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই, কিন্তু অনুমতিটা যত তাড়াতাড়ি নিয়ে নেওয়া যায় ততই ভাল।"

দুজনে মিলে তখনই প্রিফেক্ট অফ পোলিস-এর কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন। এক ঘণ্টা বসে থাকার পর তাদের প্রিফেক্টের অধীনস্থ এক অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ভদ্রলোকটি তার পদমর্যাদা সম্পর্কে বেশ সচেতন বলেই মনে হল। কারণ হুডিন এবং এ্যাণ্টনিও তার ঘরে ঢোকার দশ মিনিটের মধ্যেও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সুযোগ ভদ্রলোকটি করে উঠতে পারলেন না। তিনি নিজের কাজের মধ্যেই ডুবে রইলেন। ইতিমধ্যে হুডিন বার তিনেক তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন।

আরো কয়েক মিনিট পরে অফিসার ভদ্রলোকটি নড়েচড়ে বসে প্রস্তুত হলেন। হুডিন আর এই সুযোগ হারাতে চাইলেন না। তিনি দ্রুত তাঁর বক্তব্য বলে ফেললেন। হুডিনের কথা শুনে পুলিশ-অফিসার নির্দ্বিধায় বলে বসলেন, "আপনি যদি ম্যাজিকের খেলা দেখাবার জন্য প্যালেস রয়েলকে পছন্দ করে থাকেন তবে জেনে রাখুন আপনাকে ওখানে থিয়েটার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।"

পুলিশ অফিসারের কথা শুনে হুডিনের মাথায় যেন বজ্রপাত হল। তিনি শঙ্কিত সুরে প্রশ্ন করলেন, "কেন বলুন তো?"

অফিসার জানালেন যে উঁচু পর্যায়ের কোন মামলার বিচারে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ওখানে নতুন কোন প্রতিষ্ঠান খোলা যাবে না।

"কিন্তু স্যর এ রকম কোন নির্দেশের খবর না জেনেই আমি ওখানে একটি ঘর দীর্ঘকালের জন্য লীজ নিয়েছি এবং রঙ্গালয় তৈরী করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। সেটি প্রায় শেষও হয়ে গেছে। এখন ওখানে খেলা দেখাবার অনুমতি না পাওয়া গেলে আমি একেবারে মারা পড়বো। আমি এখন কি করবো আপনি বলে দিন।"

হুডিনের অসহায় অবস্থা এবং কাকুতি-মাখা কণ্ঠস্বর অফিসারটিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করলো না। তিনি বিরক্তিভরে বললেন, "আপনি কি করবেন তার আমি কি জানি? আমি কোন থিয়েটারের এজেণ্ট নই।"

এই কথা বলেই অফিসারটি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি রবার্ট হুডিন এবং অ্যাণ্টনিওকে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেললেন এবং তাঁদের বিদায় জানালেন।

হুডিন অফিসারটির কথাবার্তা এবং ব্যবহারে ভীষণ রকম বিষণ্ণ এবং হতাশ হয়ে পড়লেন। ঘড়ির ব্যবসায়ে অর্জিত সমস্ত অর্থই হুডিন রঙ্গালয়ের পেছনে ঢেলেছেন। তাঁকে কিছু ঋণও করতে হয়েছে। খেলা দেখাবার অনুমতি না পাওয়া গেলে তাঁর সমস্ত অর্থই জলে গিয়ে পড়বে। তাঁর এক একবার মনে হতে লাগলো যে যাদুকর হতে চাওয়ার প্রবল ইচ্ছা বোধহয় তাকে নেশাগ্রস্ত করেছিল তাই তাঁর সমূহ সর্বনাশ উপস্থিত।

অ্যাণ্টনিও কিন্তু এতখানি মুষড়ে পড়েন নি। টরিনির শ্যালক অ্যাণ্টনিও পার্থিব জগৎ সম্পর্কে হুডিনের চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞ এবং ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে সোজা পথে হাঁটলে এ ক্ষেত্রে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। অন্য উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীতে রবার্ট হুডিন তাঁর মিস্টিরিয়াস ক্লক নামক মজাদার ঘড়িটি বেঞ্জামিন ডেলেসার্ট নামক এক ভদ্রলোককে বিক্রী করেছেন। অ্যাণ্টনিও হুডিনকে প্রশ্ন করে খবরটার সত্যতা আগে যাচাই করে নিলেন। তারপর হুডিনকে বললেন, 'অনুমতি-পত্র জোগাড় করার একটা উপায় তিনি দেখতে পেয়েছেন।'

অ্যাণ্টনিওর কথা হুডিনের কিছুই বোধগম্য হল না। অ্যাণ্টনিও তখন ভেঙে বললেন যে এই ম্যাসিয়ে ডেলেসার্ট হচ্ছেন প্রিফেক্ট-অব-পুলিশের আপন ভাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে এ ব্যাপারে কিছু সুরাহা হতে পারে।

অ্যাণ্টনিওর পরামর্শ হুডিনের মনে ধরলো। তাঁরা দুজনেই ডেলেসার্টের সঙ্গে দেখা করলেন এবং সমস্ত খুলে বললেন। একটি ব্যাঙ্কের কর্ণধার ম্যাসিয়ে ডেলেসার্ট খুবই ভদ্র এবং হৃদয়বান ছিলেন। তিনি হুডিনের যাদুবিদ্যার প্রশংসা করে বললেন যে দু-একদিনের মধ্যেই তিনি একটি পার্টির ব্যবস্থা করছেন। সেই পার্টিতে তার ভাই অর্থাৎ প্রিফেক্ট-অব-পুলিশও আসবেন। ম্যাসিয়ে ডেলেসার্ট হুডিনকেও সেই পার্টিতে এসে তার অনুপম খেলা দেখাতে বললেন। তার খেলায় প্রিফেক্ট খুশি হলে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্রটুকু আদায় করা মোটেই কঠিন হবে না।

ম্যাসিয়ে ডেলেসার্টের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে হুডিন বিদায় নিলেন। সেদিনের সেই পার্টিতে হুডিন যা খেলা দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই মনোরম এবং অনুপম।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কাকোয়ানিস

তপনকুমার দাস

কয়েকটি দৃশ্য

কয়েকটি কথা

"এই তোমরা মজুমদার বানান 'জেড' লেখ, না 'জে' লেখ"—'মহানগরের' নায়িকার চাকরির দরখাস্ত করার সময় স্বামীকে জিজ্ঞাসা। প্রচণ্ড রকমের স্বাভাবিক এবং ডেলিকেট সংলাপ।

সার্থক চলচ্চিত্র অনেকগুলি বিষয়ের মাধ্যমে সার্থক সংযোজন। সংলাপ তার একটা অত্যন্ত গভীর অংশ। সংগীত প্রকাশ করে অনুভূতিকে—আবহাওয়াকে, দৃশ্য প্রকাশ করছে পটভূমিকে—তেমনি সংলাপ প্রকাশ করছে চিন্তাকে ভাবধারার আদান-প্রদানকে এবং আরো অনেক বেশী কিছুকে। সংলাপের সূক্ষ্মতা এবং নিজস্ব কিছু সৌন্দর্য আছে। যেমন ওপরের লাইনটা। আবার অনেক সময় কিছু না বলাই বোধহয় অনেক কিছু বলা। যেমন 'নায়কে'র ইণ্টারভিউ লেখা কাগজটা যখন মেয়েটি (নায়িকা বলা যেতে পারে কি?) ছিঁড়ে ফেলে দিল, তখন নায়কের উক্তি :

"কি ব্যাপার......মন থেকে লিখবেন বুঝি?"

মেয়েটি (শার্মিলা ঠাকুর) কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

"না, মনে রেখে দেব।"

অনবদ্য সংলাপ, চুপ করে থাকা অংশটিতে যেন অনেক কিছু অব্যক্ত থেকে গেল। ছবির মূল সুরটাকে কিন্তু ধরে রেখে দিল ঐ একটা কথা—'মনে রেখে দেব'।

চিত্রনাট্য প্রসঙ্গে সত্যজিৎবাবু একবার বলেছিলেন যে লেখক এবং চিত্রনাট্যকারের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে হয়ত খুব প্রভেদ নেই। তাঁদের প্রত্যেকেই ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে থাকেন। শুধুমাত্র তফাৎ এইখানেই যে, লেখক ভাব প্রকাশ করেন ভাষাতে এবং চিত্রনাট্যকার ভাব প্রকাশ করেন ভাষা ছাড়াও দৃশ্য এবং শব্দের মাধ্যমে। এ থেকে হয়ত মনে হতে পারে চিত্রনাট্যকারের কাজ অত্যন্ত সোজা, কারণ তাঁর কাছে একাধিক মাধ্যম রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। কারণ অনেক সময় একমাত্র সংলাপই পারে ভাব প্রকাশ করতে, যা দৃশ্য বা শব্দে সম্ভব নয়। তা নাহলে আইজেনস্টাইনের পোটেমকিন-এর মত ছবিতে সাব-টাইটেল-এর দরকার ছিল না।'

কাকোয়ানিজের 'জোরবা দা গ্রীকে'র একটি দৃশ্যে নায়িকাকে হত্যা করার পর 'জোরবা' গ্রন্থকীট নায়ককে বলছে, "হোয়াই ম্যান ডাইস? হোয়াট ইয়োর বুকস টেল?"

নায়ক এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ইট টেলস ওনলি অ্যাবাউট দা অ্যাগনি।"

জোরবা—"আই স্পিট অন ইয়োর অ্যাগনি।"

এই সংলাপের গভীরতা সম্বন্ধে এটাই বলা যায় যে, বেশী কিছু বলার থেকে অনেক বেশী কিছু বলা হয়েছে ঐ কটা লাইনেই। সংলাপ ছাড়া আর কিসে এই ভাব প্রকাশ করা সম্ভব ছিল?

আন্তোনিওনির 'লা এভেন্তুরা'র একটি দৃশ্যে মেয়ে সমুদ্র বিহারে যাবে, পিতার সংগে তার আলাপের কয়েকটি মুহূর্ত—

পিতা—তাহলে কতদিন তুমি বাইরে থাকবে?

পুত্রী—চার-পাঁচ দিন।

পি— ওঃ, খুব ভাল, সপ্তাহের শেষটা আমি তাহলে একা একাই সামান্য বিশ্রাম নেব। এখন থেকেই আমার এটা অভ্যাস করা উচিত।

পু— কি অভ্যাস করা উচিত?

পি— এই ব্যাপারটাই যে শুধুমাত্র একজন ডিপ্লোম্যাট হিসাবেই নয়, একজন পিতা হিসাবেও আমি অবসর গ্রহণ করেছি।

পু— কিন্তু এরকম কথা তুমি বলছ কি করে?

পি— কারণ এটাই সত্য, তিরিশ বছর—কারো কাছে এই সত্য কথাটা বলিনি, এখন অন্ততঃ আমার নিজের মেয়ের কাছে এটা বলা উচিত।

পু— আর কি কি সত্য কথা আমাকে তোমার বলা বাকি আছে?

পি— অলরেডি সেগুলো তুমি জান।

পু— তুমি স্যানডরোর কথা বলছ? আমি তোমাকে অনুনয় করছি, দয়া করে ওই ব্যাপারটা আমার কাছে ছেড়ে দাও। যাই হোক, বিদায় ড্যাড।

পি— শোন মা, ওই ধরনের ছেলে কখনই তোমায় বিয়ে করবে না।

পু— এখন পর্যন্ত আমি নিজেই তাকে বিয়ে করতে রাজী নই।

পি— ও একই কথা। এসো, গুড-বাই ডিয়ার।

এই সূত্রে সত্যজিতবাবু আরও বলেছেন যে, কখনও কখনও চিত্রনাট্যকারদের শুধুমাত্র সংলাপের ওপরই নির্ভর করতে হয়। বিশেষ করে ছবির শুরুতে বা এমন কোনো অবস্থায় যেখানে পটভূমির আভাস বা তথ্য হাজির করতে হবে, তখন সংলাপ ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সংযত সংলাপ—ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র একটি দৃশ্যে হারানো ছেলে খুঁজে বেড়ানো বৃদ্ধা রাস্তায় লোকের কাছে মার খাচ্ছে। মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে; লোকেরা তাকে চোর বলে পুলিশের গাড়ীতে তুলে দিল। রেলিং-এর একপাশে দাঁড়িয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে-আসা ছেলেটা কয়েকবার বলার চেষ্টা করেছিল, "ও চুরি করেনি"—কিন্তু কলকাতা শহর ওর কথা শুনল না। তাই ছলছল চোখে সমস্ত দৃশ্যটা সে দেখল। পুলিশের গাড়ী চলে যাওয়ার পর হরিদাসকে (কালী ব্যানার্জী) শুধু জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা এখানে এত দুঃখ কেন?" সাংঘাতিক প্রশ্ন; চমৎকার সংলাপ।

বাস, ভট্টাচার্যের 'উসকো ফুসকো' কেমন মনে হল সংলাপবহুল। অত কথাবার্তা না

প্রেক্ষাগৃহ

কালোছায়া

ভারতীয় ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরা সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র-রাজ্যে আজ দুরন্ত অশুভ গ্রহের আবির্ভাব ঘটেছে বলে নিশ্চয়ই শঙ্কিত হয়েছেন। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে চলচ্চিত্রশিল্প কোনো-না-কোনো বিপদের সম্মুখীন। এবং এই বিপদসৃষ্টিতে আমাদের স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও কোনো কোনো রাজ্যসরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রসারিত হস্তের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মাদ্রাজ ও দক্ষিণভারত এবং বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র তথা পশ্চিমভারতে যথাক্রমে গোপাল-সেনা ও শিব-সেনার দাপটে যে সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, প্রথমে তার কথাই বলি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদানের জন্যে আইনের শরণাপন্ন হলেন, তখন অহিন্দীভাষী রাজ্য-গুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সোচ্চার ও তীব্র হয়ে উঠল। ফলে স্কুল-কলেজ বন্ধ হল, স্টেশন-পোস্ট-অফিস প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানে আগুন জ্বলল. আন্দোলন থামাবার জন্যে ধর-পাকড় হল, গুলি চলল। সশস্ত্র বাধা পেয়ে আন্দোলন ভিন্নখাতে বইতে শুরু করল। হিন্দীকে জোর করে চাপানোর প্রতিবাদে

অগ্রদূত পরিচালিত চিরদিনের চিত্রে উত্তম-কুমার ও সুপ্রিয়া দেবী। ফটো : অমৃত

অশোক মজুমদার পরিচালিত শুভ জাই কলকাতা চিত্রের একটি দৃশ্য।

তামিল-তেলেগু যাদের মাতৃভাষা, তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে তখন 'হিন্দী হটাও'-মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির বহুমুখী প্রকাশের মধ্যে একটি হল সারা দক্ষিণ-ভারতে হিন্দী ছবি বর্জনের সিদ্ধান্ত। 'হিন্দী হটাও'-আন্দোলনের বীর সৈনিক-বৃন্দ—গোপাল-সেনা সারা দক্ষিণভারতের ছবিঘরগুলির মালিকদের শাসিয়ে দিলেন—হিন্দী ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করতে হবে। এবং তাবৎ চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের সাবধান করে দিলেন—নিরুপদ্রবে যদি চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করতে চাও, তাহলে হিন্দী ছবি তৈরী করবার বাসনাকে সযত্নে পরিহার করতে হবে। এস এস ভাসান, এ ভি মায়াপ্পা চেটিয়ার, এল ভি প্রসাদ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিত্র-প্রযোজক মাথায় হাত দিলেন। প্রতিষ্ঠানগুলিকে চালু রাখবার জন্যে তাঁরা স্থির করলেন, বাঙ্গালোর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে তাঁরা হিন্দী ছবি তুলবেন। কিন্তু সে-বাসনাও তাঁদের বুঝি পূর্ণ হয় না। কারণ, দক্ষিণভারতীয় গোপাল-সেনাদের হুমকির জবাবে বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রের শিব-সেনারা আশু সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁরা ফতোয়া জারী করলেন, মাদ্রাজের তৈরী হিন্দী ছবি এ-রাজ্যে দেখানো চলবে না। ফলে দক্ষিণভারতে নির্মিত যে-সব হিন্দী ছবি বিভিন্ন চিত্রগৃহে দেখানো হচ্ছিল, সেগুলিরও প্রদর্শনী সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। কোয়েনা নগরীর ভূমিকম্পাবিধ্বস্ত নর-নারীর সাহায্যের জন্য প্রদর্শনীলব্ধ অর্থদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও এ ভি মায়াপ্পা তাঁর 'দো কলিয়াঁ'কে চালু রাখতে পারলেন না।—কিন্তু দক্ষিণভারত ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের চলচ্চিত্রজগতের এই যে বিপত্তি, এর মূলে কেন্দ্রীয় সরকারের 'হিন্দী চালাও' সম্পর্কে জঙ্গীভাবই কি কাজ করছে না? অথচ একটু স্থিরভাবে চিন্তা করলে কি এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে না, হাতের কাছে খাদ্য, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বহুতর জরুরী সমস্যা থাকতেও সহসা নতুন করে ভাষা সমস্যার সৃষ্টি করে তারই সমাধানে তৎপর হওয়ার বুদ্ধি কোন অশুভক্ষণে আমাদের কর্ম-কর্তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছিল?

এরপরে দৃষ্টি ফেরানো যাক রাজ্য-সরকারগুলির দিকে। চলচ্চিত্র-শিল্পের মতো কামধেনু বুঝি আর দুটি নেই। কাজেই রাজ্যসরকারের বাজেটের ঘাটতিপূরণের জন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ওপর প্রমোদ-কর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রায় প্রতিটি রাজ্যেরই অর্থ-মন্ত্রী করে থাকেন। কিছুদিন আগে এই ধরনের বৃদ্ধি প্রস্তাব করা হয়েছিল বিহার ও বোম্বাইয়ের বিধানসভায়। এবং এই অযৌক্তিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই দুই রাজ্যে চলচ্চিত্রপ্রদর্শনী অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করা হয়েছিল স্বর্ণশিখরপ্রসূ হংস-হত্যার বড়যন্ত্র বহু আবেদন-নিবেদনের পর কতকটা পরিত্যক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাটি আরও জটিল। এখানে শ্রম-বিরোধের ফলে গেল ১২ই মার্চ থেকে প্রথমে কলকাতার ও পরে ক্রমে ক্রমে সকল জেলাতে সিনেমাগৃহের কর্মীরা ধর্মঘট পালন করার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মোট প্রায় সওয়া তিনশো ছবিঘরের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটটি বাদে সব-গুলিরই দরজা বন্ধ। দৈনিক লক্ষাধিক টাকা প্রমোদকর আদায়ের ক্ষতি সত্ত্বেও রাজ্য-সরকারের শ্রমদপ্তর এই বিরোধ সমাধানে আজও পর্যন্ত অসহায়ভাবে অকৃতকার্যতা-কেই বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের রাজ্যের চলচ্চিত্রগৃহের মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের বিরোধ একটি বহু পুরাতন ব্যাপার। প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের এই বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা বহুবার বহুরকমে হয়েছে। এমনকি, কয়েকবার রাজ্যশ্রম-দপ্তরের মধ্যস্থতায় কয়েকটি চুক্তিপত্রে উভয় পক্ষ স্বাক্ষরও করেছেন। কিন্তু শোনা গেছে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করবার পরে, বিশেষ করে মালিক পক্ষ চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে চাননি। অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে বলব, রাজ্যসরকারের হাতে এমন হাতিয়ার থাকা উচিত, যাতে বিবদমান পক্ষদের চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য করা যেতে পারে।

এইবার আমরা আবার সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রযোজনার বৃহত্তর ক্ষেত্রে ফিরে যাই, যেখানে দেখতে পাচ্ছি, গেল ১২ই মার্চে অনুষ্ঠিত একটি যুক্ত বৈঠকে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স প্রোডিউসার্স অ্যাসো-সিয়েশন ও ফিল্ম প্রোডিউসার্স গিল্ড অব ইণ্ডিয়া একযোগে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, চলচ্চিত্রশিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে যদি চিত্রাভিনেতা-অভিনেত্রীরা, চিত্রপ্রদর্শক ও চিত্রপরিবেশকেরা ইম্পা (আই এম পি পি এ) ও গিল্ডের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহ-যোগিতা না করেন, তাহলে তাঁরা ৩১-এ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছবি তৈরী বন্ধ করে দেবেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা তাঁদের পুরোনো ছবিগুলিরও প্রদর্শনী হতে দেবেন না। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসার আগে দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, প্রমোদকর বৃদ্ধি, চিত্রগৃহের ভাড়া-বৃদ্ধি, ভাষাগত ও রাজনীতিগত বিরোধের ফলে বাজারের ক্রমসঙ্কোচন ও চিত্রনির্মাণের ক্রমব্যয়বৃদ্ধির দরুণ তাঁদের আয় আশাতীত রকম কমে গিয়েছে। তাঁরা দেখেছেন, চিত্র-শিল্পী থেকে শুরু করে দেশের সরকার, চিত্রপরিবেশক, চিত্রপ্রদর্শক পর্যন্ত কেউই চিত্র-প্রযোজকদের সঙ্গে কোনোরকম ঝুঁকি না নিয়েই অর্থোপার্জন করতে চান ও করছেন; মাত্র চিত্রপ্রযোজকরাই [illegible] রকম ব্যয়ভারপীড়িত হয়ে অন্যদের [illegible] লোটবার সুযোগ করে দিতে বাধ্য [illegible]। এই অসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের [illegible] তাঁরা ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, [illegible] অর্থ ন্যায্য [illegible] কাজে হবে।

'দি ফ্যামিলি ওয়ে' ছবিতে হেইলী মিলস্ ও হাইওয়েল বেনেট

পরিবেশকরা যেমন মিনিমাম গ্যারাণ্টি দিয়ে পরিবেশনস্বত্ব গ্রহণ করছেন, তাই করতে হবে, বড়ো বড়ো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একসঙ্গে চারখানির ছবির বেশী চুক্তিতে আবন্ধ হতে পারবেন না। তাঁদের নিয়মিত সময়ে কাজে হাজিরা দিতে হবে, চুক্তির সকল শর্ত মেনে চলতে হবে, বিশেষ কোনো রকম সুবিধা গ্রহণ করা চলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। সংগীত-পরিচালকরা কোনো গান রেকর্ডিংয়ে পঞ্চাশজনের বেশী যন্ত্রশিল্পী ব্যবহার করতে পারবেন না।

কিন্তু হিন্দী ছবির উত্তরভারতীয় পরিবেশকেরা আবার একযোগে স্থির করেছেন, অতঃপর তাঁরা কোনো প্রযোজকের সঙ্গে ন্যূনতম গ্যারাণ্টি দেওয়ার শর্তে চুক্তিবন্ধ হবেন না। তাঁরা প্রযোজককে অগ্রিম দাদন হিসেবে টাকা দেবেন এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার সময়ে ঐ অগ্রিম অর্থ ভরতুকি করে নেবেন। ন্যূনতম গ্যারাণ্টি দিয়ে তাঁরা ইদানীং বহু হিন্দী ছবির পরিবেশনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলেই তাঁরা তাঁদের এই নতুন সিম্ধান্তে অটল থাকতে চান।

বেশ দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় চলচ্চিত্র লক্ষ লক্ষ আগ্রহী দর্শক সত্ত্বেও আজ আর একটি নিরঙ্কুশ লাভজনক ব্যবসায় নয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের তামাম কাঠামোটাই বিচক্ষণ অর্থনীতিকদের দিয়ে প্রকৃষ্টভাবে পরীক্ষা করানোর প্রয়োজন আছে। চলচ্চিত্রজগতের প্রতিটি লোককেই সুখী দেখবার জন্যেই এই অনুসন্ধানের একান্ত আবশ্যকতা।—একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর যতদিন না এই শিল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে, ততদিন অশুভ গ্রহের প্রভাব থেকে একে চিরতরে মুক্ত করবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

—নান্দীকর

দেশী ছবির খবর

আলোকচিত্রশিল্পী দীনেন গুপ্ত এই প্রথম স্বাধীনভাবে চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ছবিটির নাম 'নতুন পাতা'। প্রতিভা বসু রচিত এ কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে মনোনীত হয়েছেন কাজল গুপ্ত, শম্ভু মিত্র, গীতা দে, উমানাথ ভট্টাচার্য, আরতি গাঙ্গুলী ও চিন্ময় রায়। ছবিটির দৃশ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে বলে জানা গেল। আলোকচিত্রগ্রহণ করবেন পরিচালক শ্রীগুপ্ত।

কথা-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'নিশিপদ্ম' কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে ছবিটির চিত্রগ্রহণ নিউ-থিয়েটার্স স্টুডিওর এক নম্বরে গৃহীত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে রূপদান করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, গঙ্গাপদ বসু, অসীম চক্রবর্তী, দীপিকা দাস ও সুমন মুখোপাধ্যায়। নচিকেতা ঘোষ ছবিটির সুরকার।

পরিচালক তপন সিংহ আজকের যুব-সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ নিয়ে যে নতুন ছবিটির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করে এনেছেন, তার নাম হ'ল 'আপন জন'। ইন্দ্র মিত্র রচিত এ কাহিনীর প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন ছায়া দেবী, নির্মলকুমার, সুমিতা সান্যাল, স্বরূপ দত্ত, যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, রোমী চৌধুরী, পার্থ মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ।

কালকূট রচিত 'স্বর্ণ-শিখর প্রাঙ্গণে' উপন্যাসটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন পরিচালক পীযূষ বসু। ক্যালকাটা মুভিটন স্টুডিওয় ছবিটির চিত্রগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারদা চিত্রমন্দির প্রযোজিত এ ছবির মুখ্য চরিত্রাবলীতে অংশগ্রহণ করেছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, স্বরূপ দত্ত, সুমিতা সান্যাল, দিলীপ রায়, গীতা দে, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। ইতিপূর্বে ছবির সঙ্গীতগ্রহণ বোম্বাইয়ে গৃহীত হয়েছে। শৈলেশ রায় সুরকৃত এ-ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন লতা মঙ্গেশকর, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আশা ভোঁসলে এবং মান্না দে। আর ডি বনশাল ছবিটির পরিবেশক।

অজিত গাঙ্গুলী পরিচালিত ও রচিত 'দাদু' ছবিটির চিত্রগ্রহণ বর্তমানে সুসম্পন্ন হচ্ছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওয়। শ্রীরঞ্জিতমল কাঁকারিয়া প্রযোজিত এ ছবির ভূমিকালিপিতে রয়েছেন—বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বম্বে), কল্যাণী ঘোষ, অনুভা গুপ্তা, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিবানী বসু। শ্রীরঞ্জিত পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

পরিচালক অমিত বসু তাঁর নতুন হিন্দী ছবি 'অভিলাষ'-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে গ্রহণ করলেন। এ-ছবির প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করছেন মীনাকুমারী, নন্দা, সঞ্জয়, রেহমান, কাশীনাথ, মুরাদ, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জনি হুইস্কি। রাহুলদেব বর্মণ ছবিটির সুরকার।

সম্প্রতি ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীতে সঙ্গীত পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ডিলাক্স ফিল্মসের 'সজল' ছবিটির কয়েকটি গান গ্রহণ করলেন। মোহন সেহগল প্রযোজিত ও পরিচালিত এ ছবিতে রূপদান করছেন আশা পারেখ, মনোজকুমার, সুলোচনা, শবনম, মদনপুরী, রাজ মেহেরা, ওমপ্রকাশ, জাগীরদার ও সাপ্রু।

সায়রাবানু ও মনোজকুমার অভিনীত ভর্মা ফিল্মস এণ্টারপ্রাইজের 'বলিদান' ছবিটি পরিচালনা করছেন রবি ট্যানডন। কে এ নারায়ণ রচিত চিত্রনাট্যের অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন দেবকুমার, মনমোহন, দেব-কিষণ, মুরাদ শ্যামকুমার ও নবাগতা দেবযানী। শঙ্কর জয়কিষণ ছবিটির সুরকার।

স্টুডিও থেকে

কোটিপতির একমাত্র মেয়ে ইন্দ্রাণী। স্বভাবতঃই আর পাঁচটা ঐ র‍্যাংকের মেয়ের মত সেও একগুঁয়ে, আহ্লাদী, তীক্ষ্ণ কথায় কিন্তু মনে সরল। খামখেয়ালী ইন্দ্রাণী ছোটবেলা খেলার ছলে কোন রাজপুত্তুরের স্বপ্ন দেখেছিল কি-না আজ যৌবনের জোয়ারের মধ্যে দাঁড়িয়ে তা আর মনে পড়ে না, মনে পড়ে না কবে কোনখানে নিজেকে সে হারিয়েছে? তা তার না মনে পড়ুক, হেমন্তের কোন সন্ধ্যায় পথহারা পাখীর বাসায় ফেরার একাগ্রতা নিয়ে যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তাপসের সংগে তখন সে আর স্থির থাকতে পারেনি। এতদিনের খামখেয়ালীপনার মধ্যেও যে তার আর এক সত্তা অত্যন্ত নিঃসাড়ে স্বপ্নের নতুন জাল বুনেছিল, তা সে তার আগে উপলব্ধি করতে পারেনি, সে-ই প্রথম সে শিহরন অনুভব করল দেহে ও মনে।

তাপসের অবহেলিত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে চাইল ইন্দ্রাণী। অমন গলার স্বর যার, সুরের ওপর দখল যার অত অনায়াস, সে তো সাধারণ মানুষ নয়—এটা ইন্দ্রাণী তাপসকে দেখেই বুঝেছিল। প্রথম চারচোখের মিলন যেন তাদের মধ্যে নতুন এক ভাব, নতুন এক জগতের দিক খুলে দিল।

কিন্তু তাপস তা চায়নি। মিথ্যা, মেকী প্রচারের মোহে নিজেকে বিক্রী করতে সে চায়নি। চায়নি নিজের প্রতিভাকে কোন কিছুর কাছে নত করতে। ইন্দ্রাণীকে সে চেয়েছে দেখার প্রথম দিন থেকেই, কিন্তু ইন্দ্রাণীর হাতের পুতুল হয়ে আসরে আসরে গলা বিক্রী করতে তার মানে লেগেছে।

[কিছুদিন আগে নিউথিয়েটার্স দু নম্বর স্টুডিওর ফ্লোরে ঢুকেই দেখলাম কাজ হচ্ছে ছবিটার। যে দৃশ্যটা দেখলাম তার কথাই বলি।]

খাবার ঘরে কাঁচলাগান জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাপস। মধু এসে দরজাটা খুলে ধরতেই ইন্দ্রাণী ঘরে ঢোকে। ইন্দ্রাণী তাপসের কাছে এসে দাঁড়ায়। মিড্ ক্লোজ শট্।

ইন্দ্রাণী—একি! এখনো খাওনি?

হাত ধরে টানে তাপসের।

ইন্দ্রাণী—এস, এস।

ঘরে দাঁড়ায় তাপস। এগিয়ে এসে ইন্দ্রাণী হাত ধরে টেনে আনে তাকে।

ইন্দ্রাণী—বোস। সত্যি, তোমায় নিয়ে আর পারি না। (কাট্)।

বসিয়ে দেয় ইন্দ্রাণী তাপসকে।

ইন্দ্রাণী—মধু, খাবার নিয়ে এসো।

ক্লোজ শট্, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী—কেন এমন করো বলত?

ক্লোজ শট্—কম্পোজিট, ইন্দ্রাণী ও তাপস।

অদ্বিতীয়া চিত্রের সেটে ডেইজী ইরাণী, প্রেমাংশু বোস এবং পরিচালক নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ফটো ঃ অমৃত

তাপস—ভালো লাগে না তুমি না থাকলে...

ইন্দ্রাণী—কি ভাল লাগে না?

তাপস—কিছু ভালো লাগে না; আমার বড় একা লাগে। কিছু ভালো লাগে না। কাট্।

কম্পোজিট্ মিড্ ক্লোজ শট্। তাপস ও ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী (হেসে)—তোমার যে মনটা আমার কথা ভাবে আমি ত' সবসময় তার মধ্যেই আছি। ক্যামেরা চার্জ করে ইন্দ্রাণীকে কাট্।

ক্লোজ শট্। তাপস অদ্ভুত জিজ্ঞাসু ও ভাল লাগার ভংগীতে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল আস্তে আস্তে। কাট্।

কম্পোজিট শট্। ইন্দ্রাণী ও তাপস।

তাপস আনমনে বোতলের ছিপিটা তুলে নিয়ে গেলাশ বা কাপে ঠুকে বাজাতে আরম্ভ করলো। ইন্দ্রাণী তাপসের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারে।

ইন্দ্রাণী—এই শোন, সামনের মাসে নিউ এম্পায়ারে একটা মিউজিক্যাল স্কেচে তোমায় প্রেজেন্ট করবো।

তাপস—কি লাভ?

ইন্দ্রাণী—বাঃ। আরও কত নাম হবে তোমার! চারদিক থেকে ডাক আসবে তোমার।

তাপস—সে তো ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে...

ইন্দ্রাণী—বাঃ। তাই বলে তুমি তোমার প্রচার চাও না।

সশব্দে টেবিল চাপড়ে উঠে পড়ে। একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে ফ্রেমের বাইরে চলে যায়। কাট্।

ঐ একই দৃশ্য। ক্লোজ শট্।

ক্যামেরা প্যান করে হোল্ড করে ইন্দ্রাণীকে বিগ্ ক্লোজ আপে।

ইন্দ্রাণী—আমার মুখ চেয়েও না! কাট্।

মিড্ ক্লোজ শট্। তাপস দাঁড়িয়ে আছে।

তাপস কি যেন বলতে গেল, পারল না। (শট্)।

(ডান দিক দিয়ে ধীরে ধীরে ফ্রেমে ইন্ করে তাপস)।

ক্লোজ শট্।

ইন্দ্রাণী কাছে এগিয়ে আসে তাপসের। রোমাঞ্চিত আবেগের প্রলেপ তার সারা চোখে মুখে।

ইন্দ্রাণী—প্লিজ....তাপস। কাট্।

ক্লোজ শট্।

তাপস আর যেন আপত্তি করতে পারে না। চুপ করে শুধু ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে সেই বিদ্রোহের ভাবটা নরম হয়ে আসে। কাট্।

নিউ এম্পায়ারের সেই মিউজিক্যাল স্কেচে ইন্দ্রাণীর সম্মান বাড়িয়েছিল তাপস। ইন্দ্রাণী তাপসের সাফল্যে গর্বিত। তার খেলার পুতুলের মত রক্ত-মাংসের

আবিষ্কার তাপস তাই সেদিন নিজের কাছে হারলেও আরেকজনের কাছে জিতেছিল। তার সেই জয়মাল্য এল তার গলায়। বর-মাল্য হয়ে তা এলো না। কেন? সে আর এক কাহিনী।

তবে কিনা সব বাধা বিপত্তির পাহাড় ডিঙিয়ে একদিন তারা এসেছিল কাছে। তাদের প্রাণের মাঝে যে সুর হেমন্তের বৈকালিক পুরবীর স্বরলিপিতে তান তুলেছিল—তা-কি শুধুমাত্র ইন্দ্রাণী আর তাপসের? না, নয়। তা চিরদিনের। শাশ্বতের।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা এই মিষ্টি-মধুর প্রেম-কাহিনী নিয়ে 'চিরদিনের' নামে ছবিখানা পরিচালনা করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রীবিভূতি লাহা। ক্যামেরার কাজও শ্রীলাহার। সংগীত-বহুল এ ছবির সংগীতপরিচালক শ্রীনচিকেতা ঘোষ ও গীতিকার লেখক শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

প্রধান দুটি চরিত্র ইন্দ্রাণী ও তাপসের ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন কমল মিত্র, রূপক মজুমদার ও অন্যান্যরা।

মঞ্চাভিনয়

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়মে "কবিকাহিনী":

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বাদল সরকার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। আমরা তাঁর "বড়ো পিসীমা" নাটক পড়েছি বোধ করি চার-পাঁচ বছর আগে এবং পড়ে মুগ্ধ হয়েছি তাঁর রচনার পারদর্শিতার কথা মনে করে। ঐ সময়েই আমরা কয়েকবার ভিন্ন ভিন্ন নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা তাঁর "রাম-শ্যাম-যদু" অভিনীত হতে দেখেছি এবং দেখে নাট্যকারের প্রতি অনুরাগ আমাদের আরও বেড়েছে। এরই কিছু পরে রংগসভা দ্বারা আমরা তাঁর "কবিকাহিনী" অভিনীত হতে দেখি। বিধানসভায় নির্বাচনকে ঘিরে একটি নির্বাচনীকেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে প্রচারের নামে পরস্পরের কুৎসা রটনা পর্যন্ত যে সব কর্দম নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে, তাকেই উপজীব্য করে শ্রীসরকার প্রধানত এই সিচুয়েশান কমেডিখানি রচনা করেছেন। বাঙলাদেশে অধিকাংশ হাসির নাটক যেখানে সংলাপ প্রধান এবং নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি যেখানে হাস্যো-দ্রেকের প্রধান অবলম্বন, সেখানে সুস্থ হাসির পরিবেশক এই সিচুয়েশান কমেডিটি নিঃসন্দেহে স্বাগত জানাবার বস্তু। আমরা জানি, নাটকের মাধ্যমে কাঁদানোর চেয়ে নির্মলভাবে হাসানো ঢের বেশী কঠিন কাজ। তাই নাটকের জাত-বিচারে ট্রাজিডির চেয়ে কমেডির স্থান আমরা উচ্চেই নিরূপিত করে থাকি। এবং বাদল সরকারের অ্যাবসার্ড নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ' থেকে 'কবিকাহিনী'কে হীনতর রচনা বলে মনে করি না।

সম্প্রতি বাদল সরকার সুদূরে নাই-জিরিয়া থেকে স্বদেশে ফিরে এসে "শতাব্দী" নামে নব গঠিত নাট্যসংস্থার মাধ্যমে তাঁর নিজের নির্দেশনায় স্বরচিত "কবিকাহিনী"টিকে সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করছেন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ম মঞ্চে। তিনি নিজে মঞ্চাবতরণ করে তাঁর নাট্য-প্রতিভার নিদর্শন রেখেছেন এবং বিভিন্ন পুরুষ ভূমিকায় আশ্চর্য সুঅভিনয় করিয়ে নাট্যশিক্ষকরূপেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবিক পঙ্কজ মুন্সী (সনৎ), শোভন চট্টোপাধ্যায় (অমরজিৎ), সুফল পাল (মোহন), অশোক চট্টোপাধ্যায় (অরবিন্দ), মনোজিৎ লাহিড়ী (অটল) প্রভৃতি প্রত্যেকেই এমন নিখুঁত অভিনয় করেছেন যে, মনে হয়, এঁদের প্রত্যেকেই এক একজন ঝানু অভিনেতা। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের কিছুটা হীনপ্রভ বলে মনে হল।

আমরা নাট্যরসিক মাত্রকেই বাদল সরকার লিখিত ও পরিচালিত "কবি-কাহিনী" দেখে অনাবিল হাস্যস্রোতে নিমজ্জিত হবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উত্তম পুরুষ

প্রত্যেক সৃষ্টিরই একটি মহৎ ও গভীর উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু তাকে আড়ালে রেখে নিছক তরল কিছু পরিবেশন করা হোলে, সে সৃষ্টির মর্যাদা মর্মান্তিকভাবে ব্যাহত হয়। এ সত্য সম্প্রতি 'মহাজাতি সদনে' 'শিবাজী সংঘ' প্রযোজিত দীপ্তিকুমার শীলের 'উত্তম পুরুষ' নাট্যাভিনয়ে স্পষ্টতা পেয়েছে বলে মনে হয়। হাস্যরক নাটকে থাকবে নিশ্চয়ই কিন্তু মঞ্চে যে চরিত্র আসবে তা শুধু নিছক হাসির কলরোল তোলার জন্যই সৃষ্ট হবে এ ধারণা সূক্ষ্ম বিচারে নিশ্চই ভুল। আলোচ্য নাটকে এমন ভ্রান্তির নজীর বেশ কিছু জায়গায় ধরা পড়েছে। আজকের নতুন নাট্যনিরীক্ষার যুগে এমনতর চিন্তার নাটক নিয়ে মঞ্চে পরিবেশন করার মধ্যে গভীরতর কোন সার্থকতা আছে কিনা তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

একটি বোর্ডিং এর পটভূমিকায় সমগ্র নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে, বোর্ডার শৈলেন, মৃণাল, তরুণ ও নরেনের পরিহাস-তরল কথাবার্তা ও কয়েকটি নিতান্ত হাল্কা ধরনের ঘটনার মধ্য দিয়ে 'উত্তম পুরুষ' নাটক পরিণতি পেয়েছে। সুন্দরী কুমারীর অভিভাবকত্বের চাকরী নিয়েই যা কিছু গোলযোগ এবং সব শেষে চাকরীর যোগ-সূত্রে প্রেম এবং প্রেমের পর মামুলীভাবে তার সমাপ্তি। কাহিনীর মধ্যে ভাববার কিছুই নেই; 'পাইলট', 'সমাজপতি' প্রভৃতি চরিত্র অবান্তর বলে মনে হয়েছে।

রোডস রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক মিলনোৎসবে দৃষ্টি নাটকের একটি দৃশ্য

নিছক হাস্যরসাশ্রিত এই নাটকে শিল্পীদের অভিনয় কিন্তু প্রাঞ্জল হয়েছে। সামগ্রিক অভিনয়ে শিল্পীদের দক্ষতা প্রশংসনীয়, এদিক দিয়ে নির্দেশক দীপ্তি-কুমার শীলের নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—দীপ্তিকুমার শীল, দিলীপ বসাক, সত্যনারায়ণ কুণ্ডু, মিহিরলাল চন্দ্র, বিমল দে, ডাঃ বিমল চন্দ্র, অসীম সরকার, বিশু রায়, অশোক চন্দ্র, ব্যোমকেশ ঘোষ, প্রশান্তনাথ মজুমদার, বিশু চট্টোপাধ্যায়, গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পথের দাবী

সম্প্রতি 'নর্দার্ন' এণ্ড এমপ্লয়ার্স গ্রুপের রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র নাট্য বিভাগের শিল্পী-বৃন্দ 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটক অভিনয় করেছেন। সংঘবদ্ধ অভিনয়ে শিল্পীরা উচ্চতর নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন এবং সেই সূত্রে দর্শকরাও হয়েছেন বোধহয় মুগ্ধ। 'সব্যসাচী' চরিত্রে অমিতদাস দাস স্মরণীয় অভিনয়প্রতিভার নজীর রেখেছেন এবং এই সঙ্গে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, মুকুল রায়, বিদ্যুৎ গুহঠাকুরতা, তরুণ মিত্রেরও চরিত্ররূপায়ণ প্রশংসাযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—নিতাই দে, সুকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, দীপক গঙ্গো-পাধ্যায়, অনিলবরণ রায়, রাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু সুর, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউ এন বিশ্বাস, শচীন দাস প্রভৃতি।

সুখের পায়রা

গত ১৯ মার্চ ১৯৬৮, মঙ্গলবার ফাইটন ক্লাবের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীমতী আলো দাশ-গুপ্তা রচিত "সুখের পায়রা" নাটকটি ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক সাফল্যের সংগে "কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে" অভিনীত হয়। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডাঃ এস এম সরকার। দলগত অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মাখনলাল মুখার্জী, স্বপ্না মিত্র, নৃপেন্দ্রচন্দ্র সাহা, সাধন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ শেঠ ও প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া অজয় মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেবনাথ, মণীন্দ্রনাথ সোম, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার ঘোষ, দেবিকা দাস, ইলোরা দে, রাইমোহন রায় অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীঅরুণকুমার সেনগুপ্ত কৃতিত্বের সংগে নাটকটি পরিচালনা করেন।

'শুভম'-এর মেঘমুক্তি

নাট্যকার শ্রীঅমল নাগ বাংলা নাট্য-জগতে অতিপরিচিত না হলেও অপরিচিত নন। বিভিন্ন অপেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটকের পাশাপাশি যে চিরাচরিতের প্রথাকে আঁকড়ে ধরে আরেকটা পুরোনো ধরনের স্রোত বয়ে চলেছে এবং চলবেও কিছুদিন, তারই নিদর্শন পাওয়া গেল গত ২৫শে মার্চ রঙমহল মঞ্চে সন্ধ্যায়। নতুন নাট্য-সংস্থা 'শুভম' শ্রীঅমল নাগের নতুন নাটক 'মেঘ-মুক্তি'র নাট্যায়নের মধ্য দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করলো।

সুব্রত, সুপর্ণা, কাবেরী—এ-তিন চরিত্র নিয়ে নাটকের ঘটনা বিস্তার, কাবেরীকে মহীয়সী করার জন্য অস্বাভাবিকভাবেই তার স্বামী সত্যব্রতকে সাময়িকভাবে ক্লীব করা হয়েছে। গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী বড়লোকের ছেলে সুব্রতর সংগে মধ্যবিত্ত পরিবারের সুপর্ণার সঙ্গে ভালবাসা থাকলেও বিয়ে হল না, বিয়ে হল ধনীর দুলালী, আধুনিকা সুপর্ণার সঙ্গে। জটিলতার শুরু এখান থেকে—তারপর জটিলতা শুধু বেড়েই চলেছে। আর সব-শেষে হাস্যকর তাড়াহুড়ো সমাধান সব সমস্যার। জীবন-চেতনাহীন এ- নাটকে সুব্রত বা অন্য কারও চরিত্রের কোন মানসিক জটিলতা ও সংকট প্রকাশের উদ্দেশ্য থাকলেও তা ঘটনার ঘনঘটায় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তবে নাট্যকারের সে-দুর্বলতা দলগত অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কিছুটা চাপা পড়েছে। প্রথমেই নাম করতে হয় কাবেরীবেশী মমতা চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতা ও দরদ দিয়ে চরিত্রটাতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। সুপর্ণা-বেশী বেলা রায় অতিদোষে দুষ্ট হলেও মনোগ্রাহী। প্রথম দু-একটা দৃশ্যে সুব্রত-বেশী জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আড়ষ্ট হলেও শেষের দিকে তিনি মোটামুটি স্বচ্ছন্দ। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন প্রভাত বসু, কুমারেশ দত্ত, প্রতিমা চক্রবর্তী, শচীন আঢ্য, রবীন চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা।

রোডস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মিলনোৎসব

২০শে মার্চ সন্ধ্যায় রঙমহল রঙ্গমঞ্চে রোডস্ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ১ম বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হল। শচীন বসুর পরিচালনায় এ-সংস্থার প্রথম নাট্যপ্রয়াস 'দৃষ্টি' অভিনীত হয় ঐদিন। চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন বসু, পরেশ গোস্বামী, জয়দেব রায়, প্রমোদ দাস, প্রতিমা পাল বিভিন্ন ভূমিকায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন। পরেশ গোস্বামীর পরিচালনায় বনফুলের 'নব সংস্করণে' অভিনয় করেন—অজয় রায়, পরেশ গোস্বামী, নিতাই ঘোষ, দেবপ্রসাদ ঘোষ, নীরেন্দ্রকুমার দত্ত, জহরলাল বসু, কৃষ্ণচন্দ্র সামন্ত, মীরা মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাট্য-উপসমিতির সভাপতি অসীমকুমার সেন।

শঙ্খবিষ

সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'নবরূপা' 'দাগ' নাটকের সাফল্যের পর জ্যোতু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের ভিন্নরসের নাটক 'শঙ্খবিষ' মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করার পর আগামী ৮ই এপ্রিল '৬৮, সোমবার বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে তৃতীয়বার মঞ্চস্থ করতে অগ্রণী হয়েছে। নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীবিজয় মুখার্জি ও সংগীত-পরিচালনা করছেন শ্রী রবীন ঘোষ।

নাট্য সম্মেলন

সম্মেলনের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, মার্চ মাসে অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয়, পৌর-সংস্থার অনুমতি না পাওয়ায়, নাট্য সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন আপাতত বন্ধ থাকছে।

বিবিধ সংবাদ

সুরেশ সংগীত সংসদ

আগামী ৭ এপ্রিল শ্রীরবিশঙ্করের ৪৯ বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। এই উপলক্ষে ঐদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় এক বিশেষ সাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানাবেন সুরেশ সংগীত সংসদের সভ্যবৃন্দ রবীন্দ্রসদন হলে। লক্ষণীয় বিষয় এই ঐ একই দিনে স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়েরও ৭৪তম জন্মোৎসব। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে খেয়াল গাইবেন শ্রীমতী মালবিকা কানন আর সেতার বাজাবেন চিরপ্রিয় শ্রীরবিশঙ্কর। দুজনের সংগে তবলায় থাকবেন শ্রীশ্যামল বসু ও শ্রীকানাই দত্ত। আর শ্রীমহেশ প্রসাদ থাকছেন সারেংগীতে।

সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ সরকারী চারু ও কারুকলা মঞ্চে বাৎসরিক উৎসব মনোরম পরিবেশে সাফল্যের সংগে পালন করেন কালেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান ছিলো পুরস্কার বিতরণ, মূকাভিনয় ও নাটক।

মূকাভিনয় পরিবেশন করেন প্রখ্যাত মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। অচিন্ত্য রচিত 'ঐহিক-দৈহিক-মানসিক' নাটকটি পরীক্ষামূলক নাটক। নাটকটির বিষয়বস্তু নির্বাচন ও বক্তব্যের দিক থেকে এ-নাটক নতুনত্বের দাবী রাখে।

বিশেষ করে কমল ঘোষদস্তিদারের সু-পরিচালনার গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিলো। প্রয়োগচিন্তার অভিনবত্ব ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং দলগত অভিনয়ও ছিলো নাটকের প্রধান আকর্ষণ। বিশেষ করে বাধন দাস, চিত্রলেখা গুহ ও আশীষ দত্তের অভিনয় স্মরণীয়। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা সুঅভিনয় করেন—কমল পাল, স্বপন নন্দী, সুভাষ বোস, সুচারু দাস, মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জি, খগেন মাইতি, সুপ্রিয়া সেন প্রভৃতি। ১৬ই মার্চ পুরস্কার বিতরণ ও বিখ্যাত শিল্পীসমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছিল। প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কহ্লার শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

গত ২৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় স্টুডেণ্টস হলে মধ্য কলকাতার বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত সংস্থা কহ্লার শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে একটি রবীন্দ্রসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে সংগীত পরিবেশন করে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন শ্রীমতী নীলিমা সেন। অপর শিল্পী তরুণ গায়ক শ্রীস্বপন গুপ্তের উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠ সকলকে পরিতৃপ্ত করে। সংস্থার সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

রবিতীর্থের সমাবর্তন

গত ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে রবিতীর্থের সমাবর্তন ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব শ্রীশান্তিদেব ঘোষের পৌরোহিত্যে বিশেষ সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। সুচিত্রা মিত্রের পরিচালনায় বেদ-গানের পর স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার ও অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। এরপর রবিতীর্থের উত্তর কলিকাতা শাখার ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। একক সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন ফুল্লরা মল্লিক, মঞ্জুলা বসু ও সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে রথীন চৌধুরী ও গৌর বসাকের পরিচালনায় নজরুল-গীতি ও ভজন গান পরিবেশিত হয়। সংগীতাংশে ছিলেন রঞ্জিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী দেসরকার, ইন্দ্রাণী চট্টোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, পুতুল বসাক ও মৈত্রেয়ী দাস। সংগতে ছিলেন দুলাল ভট্টাচার্য, সুনীল বসু ও কিশোর নন্দী। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধে শান্তিদেব ঘোষ একটি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনান। এরপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

'সাজ ও আওয়াজ'-এর অনুষ্ঠান

কলকাতার জনপ্রিয় সংস্থা সাজ ও আওয়াজ আগামী ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে যন্ত্র ও কণ্ঠসংগীতের এক আসরের আয়োজন করেছে। আলাদাভাবে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের মহড়া হচ্ছে যথাক্রমে ১১ই ও ১২ই এপ্রিল।

বংগীয় সংস্কৃতি সংসদের বসন্তোৎসব

গত ১৪ মার্চ ১৯৬৮ দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় বংগীয় সংস্কৃতি সংসদ পরিচালিত 'বসন্তোৎসব' উপলক্ষে সদস্যগণ কর্তৃক এক মনোজ্ঞ উচ্চাংগ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ঘোষের কণ্ঠসংগীতে উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। পরবর্তী শিল্পী শ্রীরথীন্দ্র ভট্টাচার্য 'গোপীবসন্ত' রাগে খেয়াল 'বসন্ত' রাগে হোলির গান ও পরে প্রাচীন টপ্পাংগের বাংলা গান গেয়ে শোনান। দরাজ কণ্ঠের 'গোপীবসন্তে' শিল্পী তাঁর অনন্য শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় রেখে যান। পরবর্তী শিল্পী শ্রীমনোজশংকর 'বাগেশ্রী' রাগে প্রথমে বিলম্বিত ও পরে দ্রুত লয়ে সেতার বাজিয়ে শোনান। সর্বশেষ অনুষ্ঠান ছিল শ্রীকুমারকিশোর ভট্টাচার্যের বাঁশি। বাঁশিতে তাঁর সহযোগী শিল্পী ছিলেন শ্রীনিখিলেশ রায়। শিল্পীদ্বয় প্রথমে 'মজন' রাগ ও পরে ধুন বাজিয়ে শোনান। বাঁশিতে তাঁরা যে-কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যান, তা সত্যিই দুর্লভ। তবলাসংগতে শ্রীশৈলেন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উক্ত অনুষ্ঠান শ্রোতৃবর্গকে প্রচুর আনন্দদান করে।

সাধারণ পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন

এই উপলক্ষে টালিগঞ্জ বাঁশদ্রোণীস্থিত নিজস্ব মঞ্চ অংগনে সাধারণ পাঠাগারের সভ্যগণ কিরণ মৈত্র রচিত 'বারো ঘণ্টা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। নাটকটির পরিচালনা করেন শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী।

ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতার মুহূর্তগুলি অতি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্মিলিত অভিনয় প্রচেষ্টায়।

পিতা শৈলেন নস্কর, বড়ভাই নীহার চক্রবর্তী, অন্ধযুবক ভবনাথ ঘোষ, ক্রীড়া-কুশলী বেকার যুবক প্রভাত দত্ত, কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতা কমল মুখার্জি, রূপহীনা নায়িকা মঞ্জু গুহ, শিশু কাঞ্চন দাশগুপ্ত প্রভৃতি সকলেরই অভিনয় বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

জলসা

শ্রীমতী কমলা লক্ষ্মণের নবতম সৃষ্টি

ভরত-নাট্যমে নিবেদিত শিল্পীজীবনের পঁচিশ বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে রচিত 'নৌকা-চরিতম্' নৃত্যনাট্যের পরিচয়দানকালে ভারতের শীর্ষস্থানীয় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী কমলালক্ষ্মণ বলেন, "কবি এবং মহাসাধক শ্রীত্যাগরাজের 'নৌকাচরিতম্' নাটককে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করে আমার বহু সাধের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করতে পেরেছি এজন্য ঈশ্বরের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। সেই 'নৌকাচরিতম্' অবলম্বনে রচিত সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে কিছুদিন আগে হিন্দী হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ করে অপূর্ব এক আনন্দলোকে শিল্পরসিকদের মনকে পৌঁছে দেবার গৌরব অবশ্যই দাবী করতে পারেন সংগীত-কলা-মন্দিরের সভ্য-বৃন্দ। সৃষ্টিশীল প্রতিভা কখনও স্থির থাকে না, প্রকাশচাঞ্চল্যের উদ্বেলতা তাদের নবনব সৃজনীশক্তিতে স্বতঃই উম্মুখ করে। খুব সম্ভব দু' বছর আগে সংগীত-কলা-মন্দিরের সৌজন্যেই কমলা লক্ষ্মণের 'ভরত-নাট্যম' আঙ্গিকে পরিবেশিত 'রামায়ণ' দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। ভরত-নাট্যমের বিরাট পটভূমিকায় মহাকাব্যের সে-রূপায়ণ ভোলবার নয়।

দক্ষিণভারতীয় সাধক শ্রীত্যাগরাজের কাব্যজীবনের পরবর্তীকালের রচনা 'নৌকা-চরিতম্' পূর্ণ পরিণতির ঐশ্বর্যে ও অসাধারণ সংগীত-কল্পনার দাক্ষিণ্যে যেন ঝলমল করছে।

'গোপিনীর গর্বকে নম্রকরণ'—এই আখ্যানের বিষয়বস্তু। পরমাত্মার করুণাধন্য হয়েও জীবাত্মা সবসময় অহঙ্কারমুক্ত হতে পারে না। তখন আপনার সীমাবদ্ধতা ও পরমাত্মার করুণার প্রতি তাকে সচেতন করবার জন্যই শুরু হয় পরমাত্মার লীলা। পরিণতিতে জীবাত্মার সম্বিতে জাগরণ এবং পরমাত্মার চরণে আত্মদান। মোটামুটি এই ছিল পরিবেশিতব্য বিষয়ের ভাববস্তু।

নাট্যবস্তুকে নৃত্যে রূপান্তরিত করার কাজ সহজ নয়। কারণ এই দুইবস্তুর অন্তর্নিহিত বৈষম্য একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রী শিল্প, অপরটি একেবারেই নির্ব্যক্তিক। রূপকভাষা, বিশেষ করে ভরত-নাট্যম সম্বন্ধেই কথাটি বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু এই কঠিন কাজ অনায়াসদক্ষতায় সম্পন্ন করে শ্রীমতী কমলা রসিকবৃন্দের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছেন।

নারীত্বের সুললিত সুষমা ছন্দের ভাষায়—কমলালক্ষ্মণের অভিনয়-কুশলতায়, বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত রস শিল্পসুন্দর পরিণতি লাভ করেছে।

সকলের আগে সপ্রশংস উল্লেখের দাবী রাখে 'নৌকাচরিতম্'-এর কোরিওগ্র্যাফি। সাহিত্য ও আঙ্গিকের রসসমৃদ্ধ সমন্বয় শিল্পীর গভীরবোধের সহজ আলোয় পরি-ব্যাপ্ত। ভরত-নাট্যমের বিভিন্ন আঙ্গিক নাট্যবস্তুর ভাবগুলির সুন্দর আধার হয়ে উঠেছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভের জন্য গোপিনীদের ব্যাকুলতা. 'শব্দম্'-এর আঙ্গিকে সুপরিলক্ষিত। 'নৌকাবিহার' অংশে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীদের হাস্যোল্লাস্যে ভাববিনিময়ে 'জাতিঃস্মরম্'-এর প্রভাব, কৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য ও মুদ্রার আধারে কথোপকথনে 'বর্ণম্'-এর অঙ্গের প্রয়োগকুশলতা উচ্চাঙ্গের শিল্পচিন্তার নিদর্শন।

ছন্দের ব্যঞ্জনায় শ্রীত্যাগরাজের গীতি-কাব্যের রূপায়ণে আঙ্গিক জ্ঞান, সৌন্দর্য-বোধ এবং কমলার শিল্পীজীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার চমকপ্রদ প্রকাশ অবশ্যই ঘটেছে। এই উজ্জ্বল সৃষ্টিতে শ্রীমতী কমলার ভগ্নীদ্বয়—বাসন্তী ও রাধার অবদানও উল্লেখের দাবীদার। এছাড়াও তাঁর নৃত্য-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভরত-নৃত্যালয়ের শিষ্যারাও সার্থক প্রকাশের গণ্য হয়ে উঠেছেন।

শ্রীমতী পদ্মনাভমের "ভরতনাট্যম"

সাউথ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পরি-বেশিত ত্যাগরাজ হলে তরুণ শিল্পী কুমারী চিত্রা পদ্মনাভমের 'ভরত-নাটাম' নৃত্যানুষ্ঠান গত সপ্তাহের এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান।

ইনি শ্রীমতী টি এ রাজলক্ষ্মীর শিষ্যা। বয়সে তরুণী হলেও আলারিপু, জাতি-স্মরম, শব্দম, বর্ণম, পাদম প্রভৃতি ভরত-নাট্যমের বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর দক্ষতা বিস্ময়-কর নিশ্চয়। কয়েক বছর আগে ইনি কোল-কাতায় এঁর নৃত্য প্রদর্শন করে সমালোচক-বৃন্দের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন। এবারের অনুষ্ঠান আরও রেওয়াজী এবং পরিণত। যে-কোনো শিল্পের মর্মে আবেগ-দীপ্ত অনুপ্রবেশ সার্থকতার প্রধান সম্পদ এবং এই দুর্লভ সম্পদের অধিকারিণী বলেই তাঁর নৃত্য এত আবেদনসঞ্চারী। নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকাশেও ব্যক্তি-গত প্রতিভার স্বাক্ষর সহজদৃষ্ট।

লয়ের ওপর অসাধারণ পারদর্শিতার গুণেই ত্রিশ্রম, খণ্ডকম, আদি, মিশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দের তালেও এমন সহজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পেরেছেন।

কুরাঠী নৃত্যে দক্ষিণভারতীয় জিপ্সী-জীবন ছন্দে, আনন্দে ও অনুভূতির আনন্দ-বেদনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছেন কুমারী চিত্রা।

তবু এ-কথা না বলে পারছি না, তাঁর নবরসের বিকাশ অনুশীলনীয় অপেক্ষা রাখে। সংগীতসঙ্গতে ও অর্কেস্ট্রায় (যার মধ্যে তাঁর গুরু শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীকে দেখা গেছে) আপন যোগ্যতায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ভবানীপুর সংগীত সমাজে ওস্তাদ আমীর খাঁ

সম্প্রতি ভবানীপুরে সংগীত সমাজে ওস্তাদ আমীর খাঁ একক সংগীতানুষ্ঠান তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দের আনন্দের কারণ হয়েছিল।

খাঁসাহেব শুরু করলেন 'ইমনকল্যাণ' দিয়ে। তারপর দরবারী-কানাড়া ও আড়ানা।

কল্যাণ-ঠাটের রাগ দিয়ে শুরু করে, প্রতিটি শান্ত বিস্তারে যেন পুষ্পচয়ন করে যে পূজার পরিবেশ রচনা করলেন, তা তাঁরই যোগ্য। এই শুদ্ধরাগের পটভূমিকায় 'দরবারী-কানাড়া'র নিরুদ্ধ বেদনার গাম্ভীর্য ঘনীভূত হতে দেরী হয়নি মন্দ্র ও মধ্যসপ্তকে তাঁর কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য যেমন চিত্তগ্রাহী, তারসপ্তকে ততটা নয়। কণ্ঠের এই সীমিত সঞ্চরণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত। হয়ত সেইজন্যেই এমন এক গায়নশৈলী তাঁর প্রকাশের আধার করেছেন, যা তাঁর সংযত, শিল্পচিন্তা বিকাশের অনুকূল। কিছু একঘেঁয়েমো অবশ্যই আছে। তবে আমীর খাঁ-কে গ্রহণ করতে হলে এই বৈচিত্র্যহীনতাকে মেনে নিতেই হবে। তার বদলে উপরি পাওনা হবে সুরের ওপর তাঁর স্থিতির সংযম। তার দামই বা কম কি? শ্রীচন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তবলা-সঙ্গত লক্ষ্য করবার মত।

বসন্তোৎসব

বেনীনন্দন স্ট্রীটে পুলিশ হসপিটালের রোগীদের জন্য আয়োজিত বসন্তোৎসব উদ্বোধন করেন বাংলা চিত্রজগতের শ্রীমতী কানন দেবী। ইনি উদ্বোধনী ভাষণে উদ্যোক্তাদের পক্ষ হতে পীড়িত ব্যক্তিদের আনন্দদানের মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায় এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দুদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। নাটক, যাত্রা এবং জনপ্রিয় শিল্পী পরিবেশিত সংগীত এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

—চিত্রাঙ্গদা

ওলিম্পিক ও অ্যামেচার

শঙ্করবিজয় মিত্র

বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে অ্যামেচারদের নিয়েই সব প্রতিযোগিতা, অ্যামেচারদের মস্তকেই খ্যাতির শিরোপা পরিয়ে দেওয়া হয়। পেশাদারদের এখানে কোন স্থান নেই। অবশ্য খেলাধুলোর জগতে পেশাদাররা মস্ত-বড় জায়গা দখল করে আছে। খেলাধুলোকেই তারা জীবিকা বা পেশা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ফলে একদিকে যেমন অর্থ আসে, অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি দক্ষতাও আসে। বিশেষ পেশাদার ক্রীড়াবিদদের দক্ষতা সম্ভবতঃ সাধারণের তুলনায় অনেক ঊর্ধ্বে।

সাধারণতঃ অ্যামেচার কথাটার মামুলি-ভাবে মানে হয় নবীশ, সে খেলাধুলোর ক্ষেত্রেই হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক। আবার কোন ব্যক্তি পটুত্ব বা দক্ষতা দেখাতে না পারলে কিংবা নির্দিষ্ট মানের নীচু স্তরের পারংগমতা প্রদর্শন করলে ঠাট্টা করেও আমরা তাকে অ্যামেচার বলে থাকি।

খেলাধুলোর জগতে অ্যামেচার কথাটার গুরুত্ব স্বতন্ত্র। প্রাচীন গ্রীক-সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ছিল অ্যামেচার স্পোর্টস। খেলাধুলোর প্রয়োই খেলাধুলো, প্রতিটি প্রতিযোগী স্ব স্ব বিষয়ে দক্ষতার চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করবে, তার বিনিময়ে কোনভাবেই সে কোন অর্থ ও উপহারাদি গ্রহণ করবে না। দেবতার সামনে প্রতিটি ক্রীড়াবিদকে প্রতিশ্রুতি নিতে হত—সাধ্যানুযায়ী সে সৎভাবে প্রতিযোগিতা করবে, এর বিনিময়ে সে কোন কিছু নেবে না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারণ দ্য কুবার্টিনের প্রচেষ্টায় যখন নবপর্যায়ে ওলিম্পিক আরম্ভ হল; তখনও কেবল অ্যামেচারদের মধ্যেই বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা হল, পেশাদারদের জন্য ওলিম্পিকের দ্বার রুদ্ধ।

অ্যামেচার আর পেশাদার নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে এর সীমারেখা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে। চুলচেরা বিচারে সকল ক্ষেত্রেই সঠিক কিছু নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালের দুটি ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। যুদ্ধান্তে বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হলে ১৯৪৮ সাল থেকে আবার এই মহান অনুষ্ঠান তার যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৮ সালে ওলিম্পিকের প্রস্তুতি-কালে ১৯৪৬ সালে অ্যামেচার কথা নিয়ে আবার আলোচনা হয়। বৃটিশ ও মার্কিন ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের তর্ক বেধে যায় অ্যামেচার ক্রীড়াবিদদের বিষয় নিয়ে। এদের বক্তব্য ছিল—ওলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য ক্রীড়াবিদরা যখন ওলিম্পিক অঞ্চলে থাকবেন, তার প্রস্তুতির জন্য সময়ব্যয় করবেন, যাতায়াতের জন্যও সময়ক্ষেপ হবে তখন এই সময়টার জন্য ক্রীড়াবিদদের কিছু টাকা-পয়সা দিতে হবে। তাদের ঘর-সংসার আছে, তার ঝক্কিঝামেলা আছে। তার ব্যবস্থাদির জন্য টাকা-পয়সা অবশ্যই প্রয়োজন। একে মাইনে নেওয়া বা ক্রীড়াদি দ্বারা অর্থ রোজগার বোঝায় না। ক্রীড়াবিদের স্বাভাবিক রোজগারের কিছুটা ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ টাকা-পয়সা দেওয়া দরকার হয়। প্রশ্নটার অবশ্য কোন মীমাংসা হয়নি। এবং চিরকালই এটা অমীমাংসিত থাকবে।

অ্যামেচারের সঠিক সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন দেশে এসম্পর্কে বিভিন্ন বিধান আছে, এমন কি বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলোতে এর প্রয়োগ বিভিন্ন রকমের। তবে যতই বিভিন্নতা থাক মোদ্দা কথা হচ্ছে—সেই ব্যক্তিই অ্যামেচার, যিনি অ্যাথলীট হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও দক্ষতার সুযোগ নিয়ে অর্থ উপার্জন করেন না, তাঁর দেশের ও দলের সাফল্যের জন্য তাঁর ক্রীড়াকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন এবং ক্রীড়ার প্রতি আন্তরিক অনুরাগবশতঃ ও ক্রীড়ামানের উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় তিনি ক্রীড়ায় যোগ দেন।

অ্যামেচার কথাটা এসেছে ল্যাটিন এমেটর শব্দ থেকে, যার অর্থ হল প্রেমিক। খৃষ্টযুগের প্রারম্ভকালেই সম্ভবতঃ এই কথাটা ব্যবহার হতে আরম্ভ করে। খৃষ্টীয় ৩৯২ অব্দে গ্রীসের বহুখ্যাত ওলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে প্রায় ১১০০ বছর ধরে প্রতি চার বছর অন্তর নিয়মিত-ভাবে ওলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীক ও রোমান অ্যাথলীটদের মধ্যে বিশ্বেষের ফলেই এর অবলুপ্তি ঘটে। শেষের দিকে যেসব ক্রীড়াবিদ তাঁদের শৌর্য ও ক্রীড়াখ্যাতি প্রদর্শনের জন্য পর্যটন ও তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করতেন, একনিষ্ঠ গ্রীক ক্রীড়াবিদরা তাঁদের 'অ্যামেচার' নয় বলে ঘৃণা করতেন। সম্ভবতঃ এই সময় থেকেই অ্যামেচার কথাটা প্রচলিত হয়।

গ্রীক ও রোমান ক্রীড়াবিদদের পরস্পর হিংসাদ্বেষ, মারামারি এবং ক্রুদ্ধ রোমান অ্যাথলীটগণ কর্তৃক গ্রীক অ্যাথলীটদের শিবির ভস্মীভূত হওয়ায় রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বন্ধ করার আদেশ দিলেন। সেই থেকে খেলাধুলো-জগতে অ্যামেচার কথা নিয়ে প্রায় ১৪০০ বছর কেউ আর মাথা ঘামায়নি।

প্রায় দেড় হাজার বছর পর ইংলণ্ডে কথাটার পুনরাবির্ভাব ঘটে। আর ল্যাটিন এমেটর থেকে ইংরেজি অ্যামেচার শব্দ গড়ে ওঠে। এই পুনরাবির্ভাবের কাহিনীটা বেশ রোমান্টিক। আঠার শতকে মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাকসনকে অবলম্বন করেই অ্যামেচার শব্দের নতুন জয়যাত্রা শুরু হয়। অভিজাত বংশের সন্তান জ্যাকসন কলেজে পড়বার সময়েই দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা হয়ে ওঠেন। ইংলণ্ডে এই সময় মুষ্টিযুদ্ধের খুব প্রচলন। আমাদের দেশের কুস্তির আখড়ার মত ইংলণ্ডে গড়ে ওঠে মুষ্টিযুদ্ধের আখড়া এবং অনুরাগী লোকেরও অভাব হয়নি। এই সমস্ত লোক বাজী রেখে, দুজন মুষ্টিককে লড়িয়ে দিত। লড়াইয়ের শেষে বিজয়ীর হাতে তুলে দিত বাজীরাখা টাকা-পয়সা, ও টাকার থলে। জ্যাকসনকে আহ্বান করলেই যে-কোন মুষ্টিকের সঙ্গে তিনি লড়তে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কোন টাকা-পয়সার বাজী ধরতে দিতেন না, কিংবা একটি পয়সাও তিনি নিতেন না। এর জন্য তাঁকে বলা হত 'জেণ্টলম্যান জ্যাক'। প্রিন্স অব ওয়েলস, কবি লর্ড বায়রণ তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা বলে স্বীকার করতেন। তাঁরা জ্যাকসনকে অ্যামেচার নামে অভিহিত করেন ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এবং সেই থেকে বৃটেনের ক্রীড়া-জগতে অ্যামেচারের অনুপ্রবেশ ঘটে। এই বছর তিনি বৃটেনের হেভিওয়েট মুষ্টিককে লড়াইয়ে কাৎ করেন। জ্যাকসনের শক্তি ছিল অসাধারণ এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তৎকালীন চ্যাম্পিয়ন মুষ্টিক মেন-ডোজাকে পরাজিত করে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন আখ্যা অর্জন করেন। অ্যামেচার মুষ্টিকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই গৌরব অর্জন করেন এবং এপর্যন্ত দ্বিতীয় কোন অ্যামেচার এ-খেতাব পাননি।

অবশ্য জ্যাকসনের জন্মের বহু আগে থেকেই ইংলণ্ডে ঘোড়দৌড়ের প্রচলন রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে অ্যামেচার ও পেশাদার অশ্বারোহীও রয়েছে। সম্ভবতঃ এই ঘোড়-দৌড়ের জগৎ থেকেই প্রফেসন্যাল কথাটা প্রচলিত হয় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে। কোন কোন

লোক ফি নিয়ে অপরের অশ্বের আরোহী হত এবং এটাই তার পেশা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের পেশাদার আরোহী বলা হত।

আবার অনেকে নিজেদের ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়দৌড়ে যোগ দিতেন। তাঁরা কোনরকম বাজী ধরতেন না কিংবা পুরস্কার হিসেবে কোন টাকা-পয়সাও নিতেন না। স্বভাবতই তাঁরা অ্যামেচার ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অ্যামেচার বলা হত না। তাঁদের বলা হত 'জেণ্টলম্যান রাইডার' বা 'ভদ্রলোক আরোহী'। আর পেশাদার আরোহীদের বলা হত 'জকি'।

অন্যান্য খেলাধুলোর ক্ষেত্রে 'জেণ্টলম্যান' কথাটার চলন নেই। সেখানে ক্রীড়াবিদ হয় অ্যামেচার, না-হয় পেশাদার। অ্যামেচাররা প্রশংসাপত্র, মেডেল বা ট্রফি ছাড়া আর কিছু নেন না। পেশাদারেরা মাইনে নেন কিংবা নানা ধরনের ফি, কিংবা দর্শক-দর্শনীর অংশ, কিংবা দানের টাকার অংশ ইত্যাদিও গ্রহণ করেন।

আমেরিকাতে অ্যামেচার প্রশ্নটা খেলাধুলোর জগতে আবির্ভূত হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। এখানেও ঘটনাটা বেশ মজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার নিকট একটা নদী আছে, তার নাম হচ্ছে সুইলকিল। এই সুইলকিল নদীতে একটা বাইচ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য সংগঠক সমিতি অ্যামেচার দলগুলিকে আহ্বান জানান। তখন অ্যামেচার কথাটা আমেরিকাতে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। অনেকে এর প্রকৃত তাৎপর্যটাও বুঝত না। তখন একদল লোক ছিল যারা টাকা-পয়সা বা ফি নিয়ে খেলাধুলায় যোগ দিত। এদের বলা হত পেশাদার। আর যারা এমনিতেই খেলাধুলো করত, কোন টাকা-পয়সা নিত না, তাদের বলা হত অ-পেশাদার। কাজেই সুইলকিল নদীর বাইচ প্রতিযোগিতার জন্য অল্পবিস্তর সব দলই নাম পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সংগঠক সমিতি দলের সদস্যদের নামধাম দেখে প্রতিযোগী দলের অধিকাংশেরই নাম বাতিল করে দেয়। 'কেন বাতিল করা হল' প্রশ্ন করলে সমিতি জানান যে, এই সমস্ত দল অ্যামেচার নয়। আপাততঃ অর্ধেকের মত যে দলগুলি বাকি থাকে সেই দলগুলির মধ্যেই বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতার শেষে আবার প্রশ্ন উঠল অ্যামেচার ব্যাপারটা কি তা ঠিকমত বুঝিয়ে দিতে হবে। যেসব দল প্রতিযোগিতা থেকে বাতিল হয়ে গেছল, তারা সংগঠক সমিতির ব্যাখ্যা মানতে রাজী হল না। তখন তারা নিউইয়র্কের উইলিয়ম বি কার্টিস (অ্যামেচার বাইচের জনক নামে খ্যাত) ও ফিলাডেলফিয়ার সাংবাদিক জেমস ওয়াটসনকে বিষয়টি অনুসন্ধানের ভার দেয়। তাঁরা নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করে দুটি পুস্তিকা প্রণয়ন করলেন—(১) অ্যামেচার কি? এবং (২) অ্যামেচার কে?

এতে বলা হয়, যে কেবলমাত্র খেলার উদ্দেশ্যেই বাইচে যোগ দেবে, সেই হবে অ্যামেচার। যারা অর্থলাভের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যোগ দেবে, তারা হবে পেশাদার। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রোয়িং ক্লাবসমূহের সাধারণ সভায় এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং সেই থেকে এই নিয়মের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

আমেরিকার বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে অ্যামেচার সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রচলিত। আমেরিকায় অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ইউনিয়ন বহু ধরনের ক্রীড়া তত্ত্বাবধান করে। এই সংস্থার মতে যে-লোক খেলা দেখিয়ে, খেলা শিক্ষা দিয়ে কিংবা খেলার সাহায্যে অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ করে, সে পেশাদার। আমেরিকার টেনিস অ্যাসোসিয়েশন এ-বিষয়ে ভীষণ কড়া। এই সংস্থার মতে কোন অ্যামেচার যদি পেশাদার খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলায় যোগদান করে, তাহলে সে কলঙ্কিত হয়।

কিন্তু কলেজের ফুটবল খেলায় কোন অ্যামেচারের পক্ষে পেশাদারের সঙ্গে খেলায় বাধা নেই। বেসবল ও অন্যান্য খেলাতেও তাই।

অস্ট্রেলিয়াতে অ্যামেচার সম্পর্কে ধারণা একটু স্বতন্ত্র। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টিম যখন বিদেশ পর্যটনে যায়, তখন তার দলের প্রতি খেলোয়াড়কে টাকা দেওয়া হয়। এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাটা হল—খেলোয়াড়টি যতদিন খেলা উপলক্ষে বাইরে থাকবেন, ততদিন তিনি দেশে থাকলে যা রোজগার করতে পারতেন, তারই একটা গড় হিসেবে এই টাকা দেওয়া হয়। এতে অ্যামেচারত্ব হানি হয় না।

কাজেই অ্যামেচার কে এবং কে নয় সে-প্রশ্নটা নির্ভর করছে খেলোয়াড় কি খেলেন এবং কোন দেশে তাঁর বাস তার উপর।

দেশে দেশে এমনি ধরনের নানা ব্যবস্থার প্রচলন থাকলেও, বিশ্ব ওলিম্পিক অ্যামেচার সম্পর্কে এক মহান আদর্শ ও ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীন গ্রীসে ওলিম্পিকে যোগদানের আদর্শ ছিল অতি পবিত্র। গ্রীসের যে সন্তান দেশের প্রচলিত রীতির বা মনুষ্যত্বের সম্মানের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটায়নি, কেবলমাত্র সেই সন্তানকেই এই পবিত্র ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হত। ওলিম্পিকে যোগদান ছিল মানুষের সর্বোচ্চ সম্মান। ক্রীড়াক্ষেত্রে যোগদানের প্রাক্কালে প্রতিটি ক্রীড়াবিদকে অলিম্পাস পর্বতে জিউস দেবতার মন্দিরে গিয়ে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে হত যে, বিচারকের নির্দেশ সে নির্দ্বিধায় মেনে নেবে, কোন অবস্থাতেই সে তার কোন প্রতিবাদ করবে না। তারপর দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাত, "আমি যেন শ্রেষ্ঠ স্থান নিতে পারি।" অর্থ, খ্যাতি বা সম্মানের লোভ ক্রীড়াবিদকে স্পর্শ করতে পারত না এবং এই লোভের বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটলে ওলিম্পিক অঙ্গনের পথ তার সামনে রুদ্ধ হয়ে যেত।

প্রাচীন ওলিম্পিকের এই মহান আদর্শ বর্তমান যুগে কতখানি রক্ষিত হচ্ছে, তা কে জানে।

খেলাধূলা

দর্শক
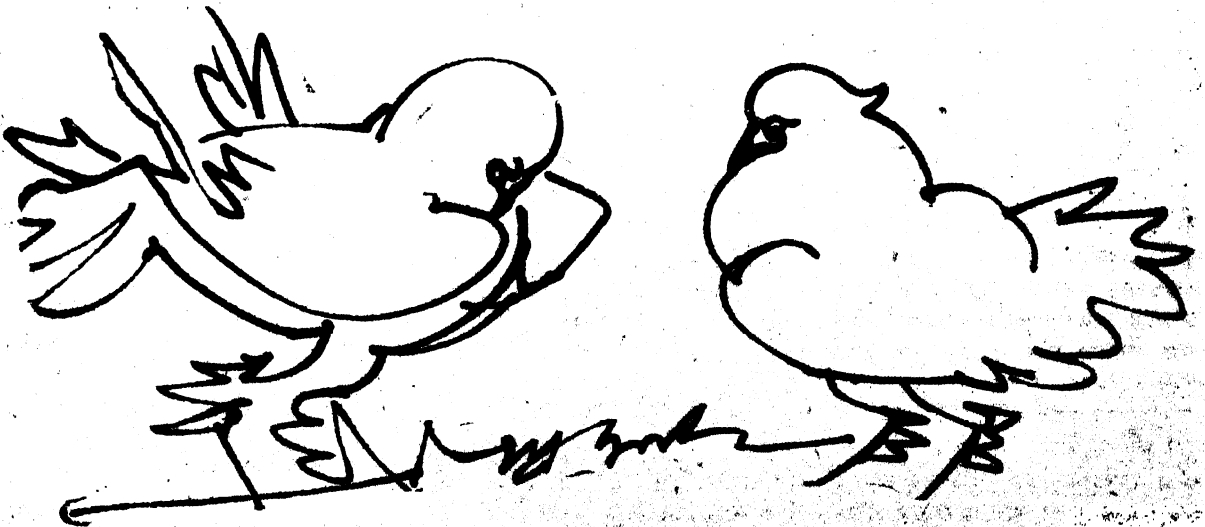
অল-ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন

১৯৬৮ সালের অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস খেতাব জয় করেছেন পূর্ব জাভার (ইন্দোনেশিয়া) ১৮ বছরের স্কুল-ছাত্র রুডি হার্টোনো। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে তাঁর থেকে কম বয়সে আর কোন খেলোয়াড় সিঙ্গলস খেতাব পাননি। আরও উল্লেখ্য, এই অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় হার্টোনোর যোগদান এই প্রথম। ফাইনালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ১৯৬৬ সালের এই প্রতিযোগিতারই সিংগলস চ্যাম্পিয়ান—মালয়েশিয়ার ২১ বছরের বিশ্ববিশ্রুত খেলোয়াড় তান আইক হুয়াং। বিজ্ঞানের ছাত্র হুয়াং ১৯৬৭ সালের ফাইনালেও খেলে শেষপর্যন্ত ডেনমার্কের আর্ল্যান্ড কপসের কাছে পরাজিত হন।

সেমি-ফাইনাল খেলা

এ-বছরের পুরুষদের সিংগলসের সেমি-ফাইনালের চারজন খেলোয়াড়ের মধ্যে ২ জন ছিলেন এশিয়া মহাদেশের এবং ২ জন ডেনমার্কের। ফাইনালে এশিয়া মহাদেশের খেলোয়াড়রাই উঠেছিলেন—একদিকে ইন্দোনেশিয়ার রুডি হার্টোনো এবং অপরদিকে মালয়েশিয়ার তান আইক হুয়াং। একদিকের সেমি-ফাইনালে তান আইক হুয়াং ১৫—৯ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে গত বছরের চ্যাম্পিয়ান ডেনমার্কের আর্ল্যান্ড কপসকে পরাজিত করে গত বছরের ফাইনালে কপসের কাছে তাঁর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন। আর্ল্যান্ড কপস অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় ৭ বার সিংগলস খেতাব জয়ী হয়েছেন। এ-বছরের অপরদিকের সেমি-ফাইনালে রুডি হার্টোনো পরাজিত করেন ডেনমার্কের সেভেন এ্যান্ডারসনকে।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনালে সুইডেনের শ্রীমতী ইভা টৌয়েডবার্গ ১১—৬ ও ১১—২ পয়েণ্টে ইন্দোনেশিয়ার কুমারী মিনার্নীকে পরাজিত করেন। আমেরিকার শ্রীমতী জুডি হাসম্যানের অবসর গ্রহণের ফলে জাপানের নোরিকো তাকাগির পক্ষে মহিলাদের সিংগলস খেতাব জয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কুমারী তাকাগি গত বছরের ফাইনালে শ্রীমতী হ্যাসম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এবার ফাইনালেই উঠতে পারেননি—সেমি-ফাইনালে ইন্দোনেশিয়ার কুমারী মিনার্নীর কাছে পরাজিত হন। অপরদিকের সেমি-ফাইনালে সুইডেনের শ্রীমতী ইভা টৌয়েডবার্গ পরাজিত করেন পশ্চিম জার্মানীর ———।
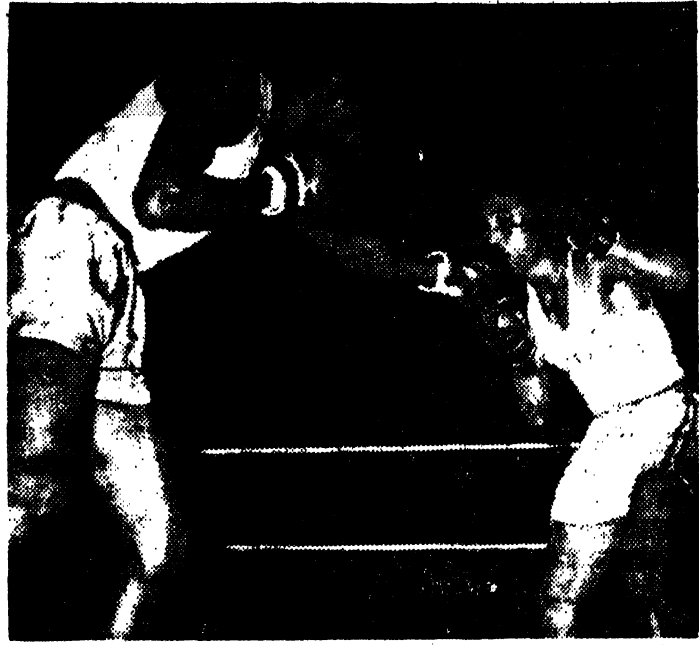
জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার লাইট ফ্লাইওয়েট বিভাগের ফাইনাল : সার্ভিসেস দলের হরফা বাহাদুর (বাঁদিকে) পয়েন্টে এ পি মূর্তিকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

১৯৬৮ সালের পাঁচটি বিভাগের ফাইনালে যাঁরা খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়রা বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেন। পুরুষ ও মহিলাদের সিংগলস এবং মহিলাদের ডাবলস ফাইনালের একদিকে ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন। মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে চারজনই ছিলেন ইংল্যাণ্ডের। মালয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা পুরুষদের সিংগলস এবং পুরুষদের ডাবলসের একদিকে খেলেছিলেন। তাছাড়া ফাইনালের একদিকে খেলেছিলেন সুইডেন (মহিলাদের সিংগলসে), ডেনমার্ক (পুরুষদের ডাবলসে) এবং জাপানের (মহিলাদের ডাবলসে) খেলোয়াড়েরা। পাঁচটি খেতাবের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া জয়ী হয় ২টি খেতাব (পুরুষদের সিংগলস এবং মহিলাদের ডাবলস)। একটি করে খেতাব পায় সুইডেন (মহিলাদের সিংগলস), ডেনমার্ক (পুরুষদের ডাবলস) এবং বৃটেন (মিক্সড ডাবলস)।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার গুরুত্ব বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার সমতুল্য। কারণ, ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নিয়ে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার কোন পৃথক ব্যবস্থা নেই। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা তার অভাব পূরণ করেছে। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে থাকেন।

১৯৬৮ সালের ফাইনাল

পুরুষদের সিংগলস : রুডি হার্টোনো (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে তান আইক হুয়াংকে (মালয়েশিয়া) পরাজিত করেন।

বার্গ (সুইডেন) ১১—৬ ও ১১—২ পয়েণ্টে কুমারী মিনার্নীকে (ইন্দোনেশিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : আর্ল্যান্ড কপস এবং হেনিং বোর্চ (ডেনমার্ক) ১৫—৬ ও ১৫—৪ পয়েণ্টে তান ঈ খান এবং এন বুন বীকে (মালয়েশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী মিনার্নী এবং কুমারী রেণ্টনো কোয়েণ্টিহা (ইন্দোনেশিয়া) ১৫—৫ ও ১৫—৮ পয়েণ্টে কুমারী নোরিকো তাকাগী এবং কুমারী হিরো আমানোকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী সুসান পাউণ্ড এবং টনি জর্ডন (ইংল্যান্ড) ১৫—৬ ও ১৫—৬ পয়েণ্টে শ্রীমতী উডকক এবং বব্ ম্যাককোইয়েকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতা

১৯৬৮ সালের জাতীয় বক্সিং প্রতিযোগিতায় গত বছরের চ্যাম্পিয়ান সার্ভিসেস দল ১০টি বিভাগেই খেতাব জয়ী হয়ে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। সার্ভিসেস দল সংগ্রহ করেছে মোট ৫০ পয়েণ্ট এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারী রেলওয়ে দল মাত্র ১৮ পয়েণ্ট।

আন্তঃ কলেজ ক্রীড়ানুষ্ঠান

ক্রিকেট : আন্তঃকলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'ল' কলেজ ১৬ রানে বিদ্যাসাগর কলেজকে পরাজিত করে অধ্যক্ষ

ব্যাডমিন্টন ঃ আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী বি ই কলেজ (শিবপুর) ৩—০ খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজ দলকে পরাজিত করে।

টেবল টেনিস ঃ আন্তঃকলেজ টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে বিদ্যাসাগর কলেজ ৩—২ খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে পরাজিত করে।

টেনিস ঃ আন্তঃকলেজ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেণ্ট জেভিয়ার্স ৫—০ খেলায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজকে পরাজিত করে।

সি এ বি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত ক্রিকেট লীগ এবং নক-আউট প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে প্রথম বিভাগের লীগ এবং সিনিয়র নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা উপলক্ষেই সমর্থকদের মত উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্ধারিত হয় দুরকমের খেলার মাধ্যমে। প্রথমে যোগদানকারী দলগুলিকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে সাধারণ লীগ প্রথায় খেলানো হয়। তারপর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দলগুলিকে নিয়ে নক-আউট পর্যায়ের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার তালিকা তৈরী হয়। নক-আউট পর্যায়ের ফাইনাল খেলার বিজয়ী দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার নক-আউট পর্যায়ের খেলা ফাইনাল স্তরে পেণছে গেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে এই ৮টি দল নিয়ে খেলা হয়েছিল ঃ কালীঘাট বনাম রাজস্থান, মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন, বি এন আর বনাম হাওড়া ইউনিয়ন এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে বনাম ইস্টবেঙ্গল। সেমি-ফাইনালের তালিকাঃ একদিকে ইস্টার্ন রেলওয়ে বনাম বি এন আর এবং অপরদিকে কালীঘাট বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। ইস্টার্ন রেলওয়ে টসে বি এন আর দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের পক্ষে এই প্রথম ফাইনাল খেলা। টসে পরাজয়বরণ বি এন আর দলের পক্ষে নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। বি এন আর প্রথম ইনিংসে ৭ উইকেটের বিনিময়ে ৪৪০ রান সংগ্রহ করে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। ইস্টার্ন রেল দলের অসমাপ্ত প্রথম ইনিংসের ৩১৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলাটি শেষ হলে খেলায় জয়-পরাজয় নির্ধারণ করার জন্যই শেষ পর্যন্ত এই টসের সাহায্য নিতে হয়েছিল। মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় স্বাভাবিকভাবে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষ ওভারে সুব্রত গুহ তাঁর চতুর্থ বল দিয়েই মোহনবাগানের নিমাই ঘোষের বিপক্ষে যে 'এল বি ডবিউ-' এর আবেদন করেন তা আম্পায়ার শেষ পর্যন্ত মঞ্জুর করেন। ব্যাটসম্যান নিমাই ঘোষ ক্রীজ ত্যাগ করতে যে সামান্য সময় ইতস্ততঃ করেছিলেন তাই থেকেই এক-শ্রেণীর দর্শকদের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তাঁরা কালবিলম্ব না করে মাঠে নেমে আম্পায়ারকে তাড়া করেন। সংবাদে প্রকাশ, আম্পায়ারের টুপি নাকি খোওয়া যায় এবং তাঁর গায়ের কোটখানা অক্ষত অবস্থায় মাঠ থেকে ফেরেনি। মোহনবাগানের ৩ রানের (১ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় দিনের খেলা ভাঙে। মোহনবাগান ক্লাবের কার্যনির্বাহক সমিতি দ্বিতীয় দিনের অপ্রিয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিকেট খেলার বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে প্রতিযোগিতা থেকে শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত থেকেও খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। ফলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। উচ্ছৃংখল আচরণের কি শোচনীয় পরিণতি হতে পারে আশা করি এই ঘটনা থেকে খেলার মাঠের দর্শক-সাধারণ উপলব্ধি করবেন এবং তাঁরা শুভ-বুদ্ধির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করবেন না।

অপরদিকের সেমি-ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ১১০ রানে কালীঘাটকে পরাজিত করে ইস্টার্ন রেলওয়ে দলের সঙ্গে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

সিনিয়র নক-আউট ক্রিকেট

সিনিয়র নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বর্তমানে সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে পেণছে গেছে। একদিকের সেমি-ফাইনালে উঠেছে মোহনবাগান ও স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং অপরদিকের সেমি-ফাইনালে কালীঘাট তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় বসে আছে। ইস্টবেঙ্গল বনাম টাউন ক্লাবের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার বিজয়ী দলেরই সেমি-ফাইনালে কালীঘাট দলের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কথা। কিন্তু এই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। কারণ, তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দিনে লাঞ্চের পরবর্তী খেলার ১০ মিনিটের মাথায় আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে যাওয়াতে একদল দর্শক সঙ্গে সঙ্গে খেলার মাঠ চড়াও করে আম্পায়ারকে প্রহার করেন। প্রহারের ফলে আম্পায়ার ভদ্রলোক খেলার মাঠ থেকে অন্তর্ধান করেন। শেষ পর্যন্ত খেলাটি পরিত্যক্ত হয়।

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

প্রথম বিভাগের হকি লীগের খেলা বেশ জমে উঠেছে। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত খেলার ফলাফলের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত তিন বছরের (১৯৬৫-৬৭) অপরাজিত হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর ক্লাব ১১টা খেলে ২০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করেছে (জয় ৯ ও ড্র ২)। বি এন আর দলের ২টি খেলা ড্র—গ্রীয়ারের বিপক্ষে ০—০ এবং ই আই আর এ এ দলের বিপক্ষে ১—১ গোলে। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ক্লাব ৮টা খেলায় ১৫ পয়েণ্ট তুলেছে। তারা পোর্টকমিশনার্স দলের বিপক্ষে গোলশূন্যভাবে একটা খেলা ড্র করেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১০টা খেলায় ২০ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে বি এন রেল দলের সঙ্গে বর্তমানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ৯টা খেলায় সংগ্রহ করেছে ১৭ পয়েণ্ট। লীগের খেলায় এখনও অপরাজিত রয়েছে এই চারটি দল—ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহনবাগান।

১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় এ পর্যন্ত 'হ্যাটট্রিক' করেছেন এই দুজন খেলোয়াড়—ই আই আর এ এ দলের বলবন্ত সিং (বিপক্ষে এণ্টালী) এবং বি এন আর দলের সুখদর্শন (বিপক্ষে পঃ বঃ পুলিশ)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

আই এফ এ-র সিদ্ধান্তে ১৯৬৮ সালের মরসুমে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় বহুকালের প্রচলিত 'ফিরতি খেলা' বন্ধ রাখা হয়েছে। অপরদিকে লীগের খেলায় 'ওঠা-নামা' তো বন্ধ আছেই। সুতরাং এই দুই সিদ্ধান্তে লীগ খেলার আসল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আই এফ এ-র এই দুই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দর্শক-সাধারণের অসন্তোষ খুবই—কিন্তু এখনও তা আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। প্রথম বিভাগের সিঙ্গল লীগে (২৮টি খেলার পরিবর্তে ১৪টি খেলা) তারা যোগদান করবে না বলে ক্লাবের সাধারণ সভায় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আই এফ এ-র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই নীতিগত লড়াইয়ে কি ফল দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য সারা দেশের লোক উদ্‌গ্রীব হয়েছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৪৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 12th April, 1968. শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৭৪ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীরজনীকান্ত চিত্রকর

পত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠিপত্র • চিঠি

কেন এই ছাত্র অসন্তোষ

অমৃতে ছাত্র-অসন্তোষের বিষয়ে কিছু লেখা পড়লাম।

ছাত্র-সমস্যাটাকে আপনারা মোটামুটি অত্যন্ত ভাসাভাসাভাবে দেখেছেন এবং সমাধান সম্বন্ধেও কোন নির্দিষ্ট পথের সংকেত দেননি বলে মনে হল।

একজন লেখক লিখেছেন যে, "ছাত্র-অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দিন দিন বৃদ্ধির দিকে।" আমার মনে হয় যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বিরাট মানবগোষ্ঠীর বুকেই অসন্তোষ আর বিক্ষোভ নিদারুণ অব্যবস্থা আর অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধির দিকে। সেই বিরাট জনসমষ্টির যুবশক্তি ছাত্র-সমাজ—তাই তাদের ওপর এই বিক্ষোভের প্রতিফলন সর্বাধিক। "ছাত্র-নেতারা সবাই মেধাবী, সিরিয়াস, আদর্শবাদী ও দেশপ্রেমিক"—আপনাদের এ মূল্যায়ন ঠিক কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিছু ছাত্র-নেতার মধ্যে এ গুণগুলি আছে; কিন্তু তার সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই মিশে আছে আবেগ বা অতি-সংবেদনশীল একটি মন। সেটা অবশ্য বাংলাদেশের মাটির এবং ছাত্রদের বয়সের ধর্ম। কিন্তু এছাড়া এমন ছাত্র-নেতার অভাব নেই যাঁরা হাততালি-বুভুক্ষু এবং আদর্শ আর দেশপ্রেম যাঁদের সজ্ঞান মনের বা অজ্ঞান মনের বহিরাবরণ মাত্র। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র-নেতাই যদি 'সিরিয়াস' এবং 'আদর্শবাদী' হতেন, তাহলে সব জায়গাতেই 'স্টাডি সার্কেল' দারুণভাবে গড়ে উঠত। কিন্তু উত্তেজনার আগুন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পোয়ানো আর সীরিয়াস হওয়া এক কথা নয়।

ফ্রান্স ও ইতালীর ছাত্র-সংস্থার কথা আপনারা বলেছেন, কিন্তু তাদের কার্যপদ্ধতির কারণ কি, সে-কথা আলোচনা করেননি।

আমি ওসব দেশে যাইনি। তবে আমার মনে হয় যে, ইতালী আর ফ্রান্সের বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষা-ব্যবস্থা আর শিক্ষকের সামাজিক সম্মান এবং ছাত্র-সংগঠনীর সামাজিক ও সরকারী সম্মানের সঙ্গে যদি আমাদের দেশের তুলনা করি, তাহলেই দু দেশের ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের কারণ আমরা পাব।

কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক আপনাদের একজন লেখককে বলেছেন যে, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছে, তারা টুকে পরীক্ষা দিতে চায়। টোকার ব্যাপারে বাধা দিলেই দাঙ্গা বেঁধে যায়। কিন্তু আরেকটা কথা বলেননি যে, কোন কোন বিদ্যালয়ে পাশের হার বাড়িয়ে নাম করার জন্যে ছাত্রদের বই খুলে লিখতে দেওয়া হয়। আপনি বলবেন যে, আপনার কথার প্রমাণ কি? দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ-দেশে কর্তৃপক্ষের অন্যায় প্রমাণ করা শক্ত। বাতাসে ভাসা জীবাণুর মত তাদের অস্তিত্ব শিশু থেকে বয়স্ক ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই জানেন কিন্তু দেখিয়ে দেওয়ার যন্ত্রটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কলকাতার ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি মুখ্য, এর জন্যে একজন লেখকের মতে এগারটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব দায়ী। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের মূলে দায়িত্বটা কার? কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ট্রাম-বাসের কল্পনাতীত ভিড়, কলেজে কলেজে ক্রমবর্ধমান ছাত্র-সংখ্যা আর বিকৃত রাজনৈতিক পরিবেশে গড়ে ওঠে। মেট্রোপলিটন শহর কলকাতার সার্বিক উত্তেজনাময় পরিবেশই তার মনের উত্তেজনা আর হতাশাকে জোরালো আকারে বহিঃপ্রকাশের অস্ত্ররূপে রাজনীতিকে আবাহন করেছে—এ সত্যটাকে ভুলে গেলে ভুল হবে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন বসু মহাশয়ের মন্তব্য অর্ধেকটা স্বীকার করা চলে। কিন্তু প্রচুর ছাত্রের পাশ করে বেকার হয়ে থাকা যদি ছাত্র-অসন্তোষের কারণ হত, তাহলে পাশ-করা ছাত্রেরাই আন্দোলনে সর্বাধিক যোগ দিত। কিন্তু আন্দোলনের প্রধান অংশ পড়ুয়া ছাত্রের দল—পাশ-করা বেকারের দল নয়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এবং পঠন-পাঠন ব্যবস্থাকে কি করে ভাল করা যেতে পারে তা নিয়ে বাস্তব প্রচেষ্টা কোথাও নেই, যা আছে তা হল বক্তৃতা আর প্রবন্ধ।

ছাত্র-জীবনের প্রাণকেন্দ্রে যে শিক্ষকরা রয়েছেন, তাঁদের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে কি দেখতে পাব। বেশীর ভাগ শিক্ষক নিজেদের শুধু আর্থিক দিক দিয়ে বঞ্চিত ভাবেন না, সামাজিক সম্মানের ক্ষেত্রেও বঞ্চিত হয়ে এক ধরনের হীনমন্যতায় আক্রান্ত। মাধ্যমিক শিক্ষকের কথা ত ছেড়েই দিলাম, কলেজের শিক্ষকও যখন তাঁর সহপাঠী কোন ডব্লু-বি-সি-এস বা আই-এ-এস-এর কথা ভাবেন, তখন অলক্ষ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। যাঁরা সমাজে সম্মানিত নন, যাঁরা নিজেদের বৃত্তিকে সম্মান করেন না (বহু ক্ষেত্রে অপমানকর মনে করেন), তাঁদের সাহচর্যে শিশুমন কখনও সুন্দর ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না। বেতন-বৃদ্ধি শিক্ষকশ্রেণীর উন্নতির একটা উপায় হলেও, প্রধান উপায় কখনই নয়। পকেটমার অনেক টাকা রোজগার করলেও, তার চারিত্রিক বিকাশ হয় না—কারণ, সমাজে তার বৃত্তি হেয়। একটি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রধান ভিত্তি সামাজিক সম্মান আর দায়িত্বভার।

শিক্ষকশ্রেণীকে নানাভাবে এই জাতীয় সম্মান রাষ্ট্র দিতে পারে, তাতে পয়সা খরচ হবে না। হাজার হাজার শিক্ষকের মধ্যে দু-চারজনকে শুধু 'রাষ্ট্রপতি পদক' দেওয়ার মত সেটা অর্থহীন হলে চলবে না—সেটা সার্বিক হওয়া চাই। সামাজিক সম্মান এবং দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখবেন শিক্ষকশ্রেণীর গুণগত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। বর্তমান শিক্ষক-শ্রেণীর শ্রেণীগত যে চরিত্র, তাতে ছাত্র-অসন্তোষ বৃদ্ধি হতে বাধ্য, ছাত্র-মন বিকৃত হতে বাধ্য।

ছাত্র-সমিতি যাতে প্রতি বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সমিতির মতামত যথেষ্ট শ্রদ্ধা নিয়ে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং সরকার পক্ষকে বিচার করে দেখতে হবে।

ছাত্রদের প্রতি বর্তমানে নানাভাবে, নানা-ক্ষেত্রে যে কত অন্যায় হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। সামান্য একটা সরকারী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করছি। মেধাবী ছাত্রদের কিছু বছর ধরে ফলাও করে মেরিট স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুরো এক বছর নিজের প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার জন্য ১৫০০।২০০০ টাকা খরচ করার পর বৃত্তির টাকা আসে। অর্থাৎ দরিদ্র মেধাবী ছাত্রের আসল বিপদ যখন উত্তীর্ণ, তখন সরকারী অনুগ্রহ তার উপর বর্ষিত হয়। অথচ মাসে মাসে বৃত্তিদানের প্রতিশ্রুতি নিয়মিত সরকারী দপ্তর ছাপেন বৃত্তির সংক্রান্ত কাগজপত্রে।

নিখিলেশ গোস্বামী,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

'দল ভাঙা, দল গড়া' প্রসঙ্গে

দেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অমৃত-এর ৪৮ সংখ্যায় সামগ্রিক বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দল ভাঙা দল গড়ার খেলায় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন রাজ্যে সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছেন। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা সে সম্বন্ধে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে পাড়ার ছেলেদের কথা। ওরা সবাই মিলেমিশে হয়তো একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মতান্তর-মনান্তরের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সে প্রতিষ্ঠান ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। একটি প্রতিষ্ঠানের জায়গায় জন্ম নেয় একাধিক। কাহিনীর সমাপ্তি কিন্তু এখানে নয়। এরপর নিজের নিজের কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য দলভারী করার খেলায় মেতে ওঠে সকলে। সমাজসেবা প্রভৃতি কথাগুলো তখন ওদের নাগালের অনেক দূরে চলে যায়।

দল ভাঙাভাঙির প্রবণতা দেখে ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতাই মনকে বেশি নাড়া দেয়। কিন্তু রাজনীতিতে ছেলেমানুষীর স্থান নেই। জনপ্রতিনিধিদের দাবী নিয়ে যাঁরা আইনসভায় যাচ্ছেন তাঁদের এদিকটা গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। তবে যদি কিছু সুরাহা হয়। অন্যথায় এর পরিণাম গড়াবে বন্দুক পর্যন্ত এবং ফলভোগ করতে হবে সবাইকে।

সুনীল আচার্য,
কলকাতা—২৬

অমৃত

আত্মধিক্কারে বন্দী মানুষ

বিশ্বাস করি, আলোকশিখা এখনও দীপ্যমান। গ্রহান্তরে যাবার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কিন্তু এ গ্রহের মানুষ তার প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তিতে ও প্রীতিতে বাস করতে পারছে না। এর চেয়ে বড় দুঃখ, গভীরতর ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে?

গত সপ্তাহে আমেরিকার নিগ্রো জননায়ক শান্তির দূত রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং-এর শোচনীয় মৃত্যু আমাদের মনে করিয়ে দিল, কী ভয়ানক পরিবেশে আমরা বাস করছি। এই দোষ শুধু আমেরিকার চরমপন্থী বর্ণ-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরাই করল না, পৃথিবীর যেখানে আছে এই ব্যবধান, এই বিদ্বেষ এবং হিংসা, সর্বত্রই রয়েছে এই পাপের বীজ। লুথার কিং আজ আর শুধু একটি নাম নয়, একটি বিশ্বাসের, আদর্শের, সংগ্রামের প্রতীক। বর্ণ-বিদ্বেষ, ধর্ম-বিদ্বেষ, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষে পৃথিবীর নানা দেশের সমাজ আজ বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন। তার মধ্যে শাদা ও কালোর বিদ্বেষ বড় বেশি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। যখন কালো মানুষের দেশ ছিল পরাধীন তখন তার মর্যাদার দিকে দৃষ্টি পড়ে নি। আফ্রিকার মুক্তিই আমেরিকার নিগ্রো জাতির নবজাগরণকে সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

লুথার কিংকে হত্যা করে যে-চরমপন্থী শ্বেতাঙ্গরা ভেবেছিল যে, নিগ্রো আন্দোলনকে তারা স্তব্ধ করে দেবে, তারা ভ্রান্ত। মার্কিন জাতির বিবেক জাগ্রত করার জন্যই তিনি প্রাণ দিয়েছেন। একটি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জাতিকে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই সংগ্রামের মূল্য শ্বেতাঙ্গরাও উপলব্ধি করতে পারবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং হিংসার পথে মানুষের শুভ নেই, এ যুগে খুব কম মানুষই একথা বলতে পারেন এবং কর্মে রূপায়িত করতে পারেন সে আদর্শ। লুথার কিং নিজের জীবনে এবং মৃত্যুতে সেই সত্য প্রদর্শন করে গেছেন।

মার্কিন সমাজের মধ্যে যে-বিরোধ আজ এমন হিংস্র আকারে দেখা দিয়েছে তা রোধ করতে না পারলে গৃহযুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। মানুষকে শুধু তার গাত্রবর্ণের জন্য, দারিদ্র্যের জন্য সমমর্যাদা দেব না, একথা যারা বলে তারা নিজের সমাজেরই শত্রু। মার্কিন সমাজকে যদি চিরকালের জন্য দ্বিধাবিদীর্ণ হতে দিতে না চায় তাহলে লুথার কিং-এর মৃত্যু থেকেই শিক্ষা নিতে হবে মার্কিন সরকারকে এবং তার সমাজনায়কদের। পারস্পরিক বিদ্বেষের পরিণাম কি তা ভারতবর্ষ জানে, গান্ধীজীর প্রাণ দিয়েও সে অশুভ শক্তির হাত থেকে পুরোপুরি যেন নিস্তার পায় নি এখনো ভারতের মানুষ।

এই বিদ্বেষের ইন্ধন দিচ্ছে আফ্রিকার দুই শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া। আমেরিকার যেমন নিগ্রোরা নিজবাসভূমে পরবাসী, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়াতেও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের তেমনি কোনো মর্যাদা নেই, অধিকার নেই। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে একথা অকল্পনীয় হলেও সত্য এবং তা সংঘটিত হচ্ছে বর্ণাভিমানী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। মানুষকে শোষণ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল ঔপনিবেশিকতা। সেই উপনিবেশ আজ প্রায় উৎচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার জের চলছে কোনো কোনো দেশে। আমেরিকার নিগ্রো সমস্যাও পুরনো ঔপনিবেশিক যুগের দাস-প্রথারই জের। আধুনিক সভ্য মানুষ তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের সর্ববিধ উপকরণ করায়ত্ত করেও তার ভাইয়ের সঙ্গে তা ভাগ করে খেতে অসম্মত, তাকে পাশে বসতে দিতে অস্বীকৃত। এই বিদ্বেষ কখনো রূপ নেয় বর্ণাভিমানের, কখনো তা ধর্মমতের, কখনো বা আঞ্চলিকতার। হিটলারের নাৎসী দল ধর্মবিদ্বেষের জন্য চল্লিশ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। সেই ইহুদীরা নিজেদের রাষ্ট্র লাভ করে আরবদের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল সাম্প্রতিক এক যুদ্ধে। হিন্দু ও মুসলমানদের বিদ্বেষ থেকে ভাগ হয়েছিল ভারতবর্ষ। আজও সেই অন্ধ বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সীমান্তের এপারে এবং ওপারে। এ থেকে বোঝা যায়, মানুষ তার আদিম স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। যে কোনো অছিলায় তা জেগে ওঠে প্রচণ্ডভাবে, মানুষ তার প্রতিবেশীকে তখন হত্যা করতে দ্বিধা করে না। এই বিরোধেরই অন্যরূপ রাজনৈতিক আদর্শের। সহ-অবস্থানের উজ্জ্বল আদর্শ মাথায় ঠেকিয়ে পরস্পরকে ধ্বংস করার উন্মত্ততায় লিপ্ত এ যুগের রাজনীতি। জননী বসুন্ধরার বক্ষ থেকে রুধির স্রোত প্রবাহিত হয়ে মানুষের স্বপ্নকে নিয়ে যাচ্ছে ভাসিয়ে। ক্রন্দনরত বিবেকের কণ্ঠস্বর রণধ্বনির প্রচণ্ড কলরবে যাচ্ছে মিলিয়ে। একজন মার্টিন লুথার কিং কিম্বা একজন গান্ধী আসবেন এবং প্রাণ দেবেন। তা দেখে হয়তো ক্ষণিকের জন্য উন্মত্ত মানুষের বিবেক থমকে দাঁড়াবে, ভাববে, অশ্রুপাতও হয়তো করবে। কিন্তু তারপর কি? অতঃ কিম্? এই জিজ্ঞাসার জ্বলন্ত অক্ষরগুলো ঘনায়মান অন্ধকারে মানুষকে দিল পথের নিশানা। আত্মধিক্কারে বন্দী মানবাত্মার মুক্তি ছাড়া সভ্যতার আলোকিত পথ আর কি ভাবে উন্মোচিত হবে?

কালীঘাট পটচিত্রের শেষ চিত্রকর

আশীষ বসু

গত ৩রা মার্চ খুব ভোরে তাঁর আকুবপুর গ্রামের বাড়ীতে মারা গেছেন কালীঘাট পটচিত্রের শেষ শিল্পী রজনীকান্ত চিত্রকর। তাঁর পুত্র শ্রীশ্রীশচন্দ্র চিত্রকর কলকাতায় এসে আমাকে জানালেন, আগের দিন অবধি তাঁর বাবা কাজ করেছেন। সন্ধ্যাবেলায় বুকে অল্প ব্যথা হয়, ব্যথা ক্রমে বাড়ে এবং ভোর রাতে রজনীকান্ত মারা যান। আরও জানালেন, মারা যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় বাবা একখানা চিঠি লিখবেন বলে বসেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগলো শুনে, চিঠিখানা তিনি নাকি আমাকেই লিখবেন বলে ওপরে নাম-ঠিকানা লিখে রেখে গেছেন। চিঠির ভিতরটুকু লিখে যাওয়া আর সম্ভব হয় নি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে আদি গঙ্গার ধারে একখণ্ড জমিতে কালীঘাটে বর্তমান কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তখন ওদিকটা ছিল একেবারে জনবসতিহীন। মন্দির প্রতিষ্ঠা হবার পর সেই মন্দিরের চারপাশে বাজার বসলো ক্রমে ক্রমে। এই বাজারে এসে ভীড় জমালেন পটুয়ারা, পাথরের থালা-বাটি-গেলাস বিক্রির দোকানদারেরা, কাঠের তৈজসপত্রের ব্যবসায়ীরা, পুতুল বিক্রেতারা এবং আরও অনেকে। পাকাপাকি একটা মেলা বসলো কালীমন্দিরের চত্বরে। এখানে এসে বসলেন চিত্রকরেরাও। তীর্থযাত্রীরা আসতো কলকাতায়। কালীমন্দির অবশ্য দর্শনীয় স্থান, জাগ্রত দেবতা সেখানে। ঘরে ফেরার পথে সেই মন্দির দর্শনের নিদর্শন হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যেতেন পটচিত্র। তখনো সস্তা ছাপা ছবির বাজার আসে নি। তাই এই চিত্রকরেরা কালীঘাটে পেলেন এক নতুন বাজার, এবং এই অর্থনৈতিক সুবিধাই জন্ম দিল কালীঘাট পটচিত্রাবলী নামক চিত্রকলার। ডবলিউ জি আর্চার লন্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের ভারতীয় শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁর 'বাজার পেইন্টিংস অব কালীঘাট' গ্রন্থে লিখেছেন প্রধানত কলকাতাবাসী ইংরাজদের চেষ্টাতেই কালীঘাট পটচিত্রের বিকাশ হয়। এ তথ্য পুরাপুরি সত্য নয় বলেই মনে হয়। কালীঘাট পট-শিল্পের সার্থক শিল্পী ছিলেন কালীচরণ ঘোষ ও তস্য ভ্রাতা নিবারণচন্দ্র ঘোষ, নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস এবং আর কয়েকজন। এই চিত্র-ঐতিহ্যের শেষ শিল্পী ছিলেন রজনীকান্ত। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কালীঘাট পটচিত্র শিল্পেরও মৃত্যু ঘটলো একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

কালীঘাটের পটচিত্রের বিষয়বস্তু অনেক। তবে বিষয়বস্তুগুলি প্রায়ই পৌরাণিক। যেমন শিবের সঙ্গীতচর্চার দৃশ্য, নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান-ভিত্তিক চিত্রসমূহ, কৃষ্ণ-বলরাম কাহিনী, নরসিংহ মূর্তি ইত্যাদি। এর সঙ্গে কালীমূর্তি ইত্যাদির ছবি তো ছিলই, তাছাড়া নানা প্রকারের পশুপাখী, বিড়ালের মুখে মাছ, সাহেবদের শিকারে যাওয়ার দৃশ্য, ইংরাজদের ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাওয়ার দৃশ্য ইত্যাদিও ছিল কালীঘাট পটচিত্রের মধ্যে।

রজনীবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়, তবে তাঁর হাতের অনেক কাজ আগেও দেখেছি। তাঁর জন্ম ১৮৯২ সালে মেদিনীপুর জেলার আকুবপুর গ্রামে, চৈতন্যপুরের নিকটে, আরও বুঝিয়ে বললে বলতে হয় বর্তমান হলদিয়া বন্দরের সন্নিকটে। তাঁর পিতার নাম উমাচরণ চিত্রকর। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর প্রথম কাজের শিক্ষা তাঁর বাবার কাছেই। পরে কলকাতায় এসে অবশ্য আরও অনেকের কাছে তিনি কাজ শেখেন।

১৯৬৪-৬৫ সালে রজনীকান্ত জাতীয় পুরস্কার পান কালীঘাট পটচিত্রের কাজের কুশলী শিল্পী হিসাবে। এর কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, এবং পরে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। এমন নিরহঙ্কার, সদালাপী, বিনয়ী ব্যক্তি খুব কম দেখেছি। পূর্বসূরীদের মতো অসামান্য দক্ষতা তাঁর যে ছিল না একথা তিনি নিজেই আমার কাছে কতবার বলেছেন, এবং তাঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা উঠলেই তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করতে দেখেছি। তবু তাঁর তুলির কাজ ছিল অসামান্য। কালীঘাট পটচিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তুলি না তুলে এক টানে পুরো ছবিটা এঁকে যাওয়ার টেকনিক্ তাতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাজ ভারতবর্ষে এমন কি ভারতের বাইরেও নানা ক্র্যাফট-মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারীতে দীর্ঘদিন সযত্নে রাখা থাকবে।

রজনীকান্তের আর একটি পরিচয় ছিল তাঁর সংগঠনী শক্তি। বঙ্গীয় জাতীয় চিত্রকর সভা বলতে গেলে তাঁরই সৃষ্টি এবং তিনিই

যশোদার কোলে কৃষ্ণ : কালীঘাটের পুরোন পট-চিত্র

ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। মৃত্যুর আগের দিন অবধি তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বসে একটি ছোট স্কীমের মারফৎ কালীঘাট পটচিত্রের কাজে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তালিম দিয়ে গেছেন।

রজনীকান্ত প্রথম জীবনে পট আঁকার প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর বাবা উমাচরণ চিত্রকরের কাছ থেকে। তাঁর বাবা উমাচরণও সেকালের একজন নামকরা চিত্রকর ছিলেন। পরে কলকাতায় এসে রজনীকান্ত সেকালের বিখ্যাত দুই কালীঘাট পটের শিল্পী কালীচরণ ঘোষ ও নিবারণচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। সাধারণ ছাত্রের মতো রজনীকান্ত তাঁদের কাছে তুলি ধরা শিখেছেন। শুনেছি কালীচরণ ঘোষের কন্যাও ভাল পট আঁকতেন এবং নিজের মেয়ের সংগে বসিয়েই তিনি রজনীকান্তকেও ছবি আঁকা শেখাতেন, রঙ ও ফর্মের বিন্যাস শেখাতেন।

কালীঘাট পটের বৈশিষ্ট্য ছিল তার সহজ সরল চেহারা। পটগুলি চৌকো। সাইজের তারতম্য আছে, তবে বেশীর ভাগ পট লম্বায় সতেরো ইঞ্চি এবং চওড়ায় এগারো ইঞ্চি মাপের। আজ অবধি সবচেয়ে বড়ো সাইজের যে পট পাওয়া গেছে, তার মাপ দৈর্ঘে কুড়ি ইঞ্চি এবং প্রস্থে তেরো ইঞ্চি। কালীঘাট পটের সবচেয়ে ভালো নিদর্শন যদি কলকাতাতে দেখতে চান তো আপনাকে ব্রতচারী গ্রামের গুরুসদয় মিউজিয়মে যেতে হবে।

১৯৩০ সালে নিবারণচন্দ্র ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষের মৃত্যুর সংগে সংগেই কালীঘাট পটচিত্র শিল্পের মৃত্যু ঘটতো যদি না রজনীকান্ত সেই চিত্রকলাকে ধরে রাখতেন। অনেক কষ্ট পেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁর কাজের স্বীকৃতিতে রজনীকান্তকে চল্লিশ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। মৃত্যুকাল অবধি রজনীকান্ত এই বৃত্তি পেয়ে গেছেন। জাতীয় পুরস্কার ছাড়াও ভারত সরকারের অখিল ভারতীয় হস্তশিল্প পর্ষদ তাঁর কাজের স্বীকৃতি নানাভাবে জানিয়েছেন। কালীঘাট পটের পুনরুদ্ধারে তাঁর মারফৎ যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তাও এই পর্ষদেরই কাজ।

পুরোপুরিভাবে ভারতীয় এই চিত্রকলার সংগে প্রচুর প্রভেদ ছিল রাজপুত বা মোগল ক্ষুদ্র-চিত্রাবলী বা মিনিয়েচারের। কালীঘাট পটচিত্রাবলীকে বরং চাইনীজ ক্যালিগ্রেফীর সংগে তুলনা করা চলতে পারে।

কালীঘাট চিত্রাবলীর একটা বড় অংশকে সেকালের সমাজ-চিত্রের দর্পণ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাবু-কালচারকে নিয়ে অনেকগুলি ছবি আঁকা হয়েছে। সেকালের বড়লোকদের গণিকালয়ে গমনের দৃশ্য, শিকারের দৃশ্য, নৌকা বিহার, বাঈজীর নাচ দেখা, বাবুর ঢেঁকিতে চালকোটার দৃশ্য ইত্যাদি অতি মনোরম। এ ছবিগুলির একটা বিশেষ বক্তব্য রয়েছে। রজনীকান্তও এ জাতীয় ছবি অনেক এঁকেছেন।

চৌকো-পট ছাড়াও রজনীকান্ত কিছু গোটানো-পটও এঁকেছেন। গোটানো-পট বা 'স্ক্রোল' এঁকে তা ঝুলিয়ে অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর ঘটনা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ভারতবর্ষে খুব প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। আগে জনশিক্ষার কাজে গোটানো-পটের বহুল ব্যবহার হ'ত।

রজনীকান্তের বয়স মৃত্যুকালে ৭৪ বছর হয়েছিল। তিনি চার পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছেন। পুত্রগণের মধ্যে শ্রীশ্রীশচন্দ্র চিত্রকরও জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, তবে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন, প্রতিমা-শিল্পের কাজের জন্য।

ভাবতে অবাক লাগে মাত্র দুশো বছর আগে যে চিত্রকলার জন্ম হয়েছিল, গত ৩রা মার্চ রজনীকান্তের মৃত্যুর সংগে সংগে তা শেষ হয়ে গেল।

কালীঘাটের পট

ধ্রুব রায়

স্বামীকে স্ত্রীর পদাঘাত : কালীচরণ ঘোষের আঁকা

উনিশ শতকে কালীঘাটে জলরঙে আঁকা দেবদেবীর বিচিত্র ছবি পাওয়া যেত। এর চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। শুধু জলরঙ কেন রেখায় টানা হাতে আঁকা ছবিও বাজার ছেয়ে ফেলেছিল। আর যারা এইসব ছবি আঁকত, মন্দিরের আশেপাশে তারাও দু-একঘর বসতি করেছিল। রাতদিন তারা শুধু ছবিই আঁকত। রঙ ছিল গাছের পাতার রস। তুলি ছিল হাতে তৈরী। অতি সাধারণ। দীর্ঘকাল এরা শিল্পসাধনা করেছে নীরবে। প্রচারের মোহ ছিল না। প্রাণ ধারণের জন্য যৎসামান্য উপার্জ্জন—এই যেন ছিল তাদের অন্যতম কামনা।

রাতের অন্ধকারে গঙ্গার বুকে যখন নৌকা চলত, তখনও ঘুম ছিল না এইসব পটুয়াদের চোখে। যাত্রীরা দেখত মাটির দেওয়াল-ঘেরা চালাঘরের দাওয়ায় বসে, কেরোসিনের স্বল্প আলোয় নিবিষ্ট পটুয়া একমনে ছবি এঁকে চলেছে। জনগণের সৌন্দর্যস্পৃহা তৃপ্তির জন্য রাতের পর রাত জেগে তারা ছবি এঁকে চলত। এই ছবিই দিনের বেলায় দেবীদর্শনের শেষে সংগ্রহ করবে পুণ্যার্থী মানুষ।

কালীঘাটে পাওয়া যেত বলে এইসব ছবিই কালীঘাটের পট হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিল। বাঙলা দেশের একেবারে নিজস্ব জিনিস এই পটের ছবি। পটশিল্পের বিকাশ কবে থেকে তা হয়ত সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু পাল রাজাদের আমলে রঙীন পটের যে প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারও আগে ছবি আঁকা হোত। সম্ভবত এঁরাই ছিলেন পূর্ব-বর্তীদের উত্তরসূরী।

বাঙলাদেশের অনেক জায়গায় বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, নোয়াখালি, ঢাকা, রাজসাহী, মৈমন-সিং প্রভৃতি জেলায় নানান ধরনের পটের প্রচলন ছিল। পটুয়াদের আঁকা এইসব ছবি পটশিল্প হিসাবে সমাদর পায়নি। একমাত্র পুণ্যার্থীরা স্মৃতি হিসাবে সংগ্রহ করে রাখতেন। আর যাঁরা সংগ্রহ করতেন তাঁদের অর্থের স্বচ্ছলতা ছিল যৎসামান্য। এক পয়সা থেকে এক আনায় বিক্রি হোত এইসব পট।

কালীঘাটের পটুয়ারা চিরকাল মাটির দেওয়াল ঘেরা চালাঘরে কাটিয়েছে দারিদ্র্যকে সঙ্গী নিয়ে। জীবনযুদ্ধে তারা ছিল চির-কাল অবহেলিত। পট আঁকাকে শিল্প হিসাবে তারা যতখানি নিতে পেরেছিল, তার থেকে বেশি ছিল জীবনধারণের প্রয়োজন।

স্বল্পমূল্যে বিক্রির জন্যে কালীঘাটের পট একটি বিশেষ ধরন নেয়। স্ক্রল বা জড়ানো পট খুব বেশী একটা আঁকা হয়নি। এগুলির দাম পড়ত বেশী; কেনবার লোক মিলত না। পটের যারা গ্রাহক তাদের কেনবার ক্ষমতা আর বিপুল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে চৌকো পটের প্রচলন হয়েছিল। শিল্পীর মাধ্যম ছিল একটুকরো কাগজ, কালো রঙ আর তুলি। শিল্পীর সংখ্যা ছিল কম। অল্পসময়ে অনেক ছবি আঁকতে হোত তাদের। কালীঘাটের পটে এজন্য রেখাচিত্রের প্রচলন এত বেশী।

পটের বিষয়বস্তুও ছিল বিচিত্র। প্রথম দিকে শিবকালী, রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা এবং ধর্মগ্রন্থাদির চিত্রই পুণ্যার্থীদের চাহিদার দিকে তাকিয়ে আঁকা হোত। পর-বর্তীকালে বহু সামাজিক ঘটনা শিল্পীর আঁকবার বিষয় হয়ে ওঠে। সামাজিক চিত্র-গুলির অধিকাংশই জলরঙে আঁকা। শিল্পীর মুন্সিয়ানার প্রকাশ ঘটেছে নিখুঁত ও সার্থকভাবে। অল্পদামের কাগজে হাতে-

পাশ্চাত্যভাবাপন্ন স্ত্রীকে প্রহার : নিবারণচন্দ্র ঘোষের আঁকা

তৈরী রঙ দিয়ে যেসব ছবি আঁকতেন শিল্পী তার মধ্যে আড়ম্বর ছিল না। যৎসামান্য উপকরণেও শিল্প হয়ে উঠেছিল অসামান্য। দাম্পত্য-কলহ, অনাচার, দুর্নীতি, সাংসারিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনা, ঘোড়দৌড়, হাতিতে চড়ে শিকার, পশুপাখি, মাছ প্রভৃতি শিল্পী যেভাবে রূপ দিয়েছিল তা আজও শিল্প-রসিকদের বিস্মিত করে।

পটশিল্পের অংকনরীতি সাবেকী। প্রথম দিকে তেমন রঙের ব্যবহার ছিল না। রেখা যেমন বলিষ্ঠ, ফর্ম তেমনি সরল। প্রথমে তুলির টানে ছবি এঁকে, তারপর রঙ দিতেন শিল্পী। সাবলীল রেখাপ্রয়োগে অসামান্য রূপসৃষ্টি যে কতদূর সার্থক হতে পারে, তা এই পটের দিকে তাকালেই সহজে বোঝা যায়। রঙীন পটে উজ্জ্বল লাল, সবুজ, নীল ও খয়েরি রঙের ব্যবহার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।

অন্যান্য ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে রেখার টানের দিক দিয়ে অজন্তা বা বাঘ চিত্রাবলীর সঙ্গে কালীঘাট পটশিল্প তুলনাযোগ্য। মোঘল বা কাঙড়া শিল্পকলার মত সূক্ষ্ম সৌন্দর্যচেতনা বা উচ্চাঙ্গের অংকনরীতি না থাকলেও মোটা তুলির টানের মধ্যে পট-শিল্প একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল শিল্পকলা। আর এই শিল্পকলাকে যাঁরা ঐতিহাসিক মর্যাদায় বরণীয় করেছেন, তাঁরা যেমন অজ্ঞাত তেমনি অবহেলিত থেকে গেছেন চিরকাল।

জনগণের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে আঁকবার জন্যে কালীঘাটের পট অনেকখানি গণশিল্পের রূপ পায়। রেখাংকনে অর্জিত নিপুণতা নেই সত্যি, কিন্তু অমার্জিত অথচ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক তুলির টান বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এদের মধ্যে গুরুগিরি ছিল না। কিন্তু বংশ-পরম্পরায় পিতৃপুরুষের অর্জিত বিদ্যাকে এঁরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছিলেন। সেইসঙ্গে এঁদের মানসিকতা যুক্ত হয়েছিল জনগণের চাহিদার সঙ্গে। তাঁদের ধ্যান-ধারণা অনায়াস নৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন শিল্পী।

কালীঘাট পটচিত্রশিল্পের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে স্বল্পমূল্যের ছবিতে যখন বাজার ছেয়ে গেল, তখন পটুয়ারা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠল না। তাছাড়া লিথোর ছবি পটুয়াদের আঁকা ছবি থেকে ছিল অনেক বেশী নয়নমুগ্ধকর। সাহায্য, সমাদর ও সহানুভূতির অভাবেই কালীঘাট পটশিল্পের মৃত্যু ঘটেছে। তবুও নীলমণি দাস, বলরাম দাস, গোপাল দাস, নিবারণচন্দ্র ঘোষ, কালি-চরণ ঘোষ থেকে রজনীকান্ত চিত্রকর পর্যন্ত ইতিহাস বাঙলাদেশের পক্ষে অনেকখানি গৌরবের।

কালীঘাট পটশিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্যকে বজায় রেখে, স্বীয় আঙ্গিকে শিল্পসৃষ্টি। রঙের ব্যবহারে তারা যে দুঃসাহসিকতার ছাপ রেখে গেছে, তা সম্ভবত এই সমৃদ্ধ শিল্পকলাকে আধুনিক শিল্পজগতের নৈকট্য দান করেছে। তাঁদের সমৃদ্ধ শৈলী কালের পরিবর্তনের সঙ্গে অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। নতুন যুগকে তাঁরা অস্বীকার করেন নি সত্যি। কালের গতিপথে পুরোন নতুনের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা পথ চলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জনসাধারণের ঔদাসীন্য যেন বর্তমান শতাব্দীতে তাঁদের পথ-পরিক্রমাকে থামিয়ে দিয়েছে মাঝপথেই।

আঠার শতকের শেষদিকে কালীঘাট পটচিত্রে ইউরোপীয় প্রভাব পড়তে থাকে। ইউরোপীয় অধিবাসীরা রঙের ব্যবহারে বৈচিত্র্য ফোটাতে থাকেন—কলকাতায় বসে আঁকা নানান ছবিতে। তাঁদের বিষয় নির্বাচনেও ছিল অভিনবত্ব। কালীঘাটের পটুয়াদের সামনে সেইসব ছবি নতুনরূপে দেখা দিল। তাঁরা পটে রঙের ব্যবহার করলেন। কিন্তু চিত্রণশৈলী পথচ্যুত হোল না। জল-রঙের ব্যবহার ও শেড প্রয়োগ করে পটের ক্ষেত্রে কিছু অভিনবত্ব নিয়ে এলেন শিল্পী। নতুন ধরনের কাগজও ব্যবহৃত হোল। অংকনরীতিতে অল্পস্বল্প বদল ঘটলেও মৌলিক কোন পরিবর্তন হোল না। কিন্তু এত চেষ্টা করেও পটশিল্পকে টিকিয়ে রাখা গেল না। রজনীকান্ত চিত্রকরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল তার প্রবহমানতা।

ত্রিবার্ষিক ললিতকলা প্রদর্শনী

অজিতকুমার দত্ত
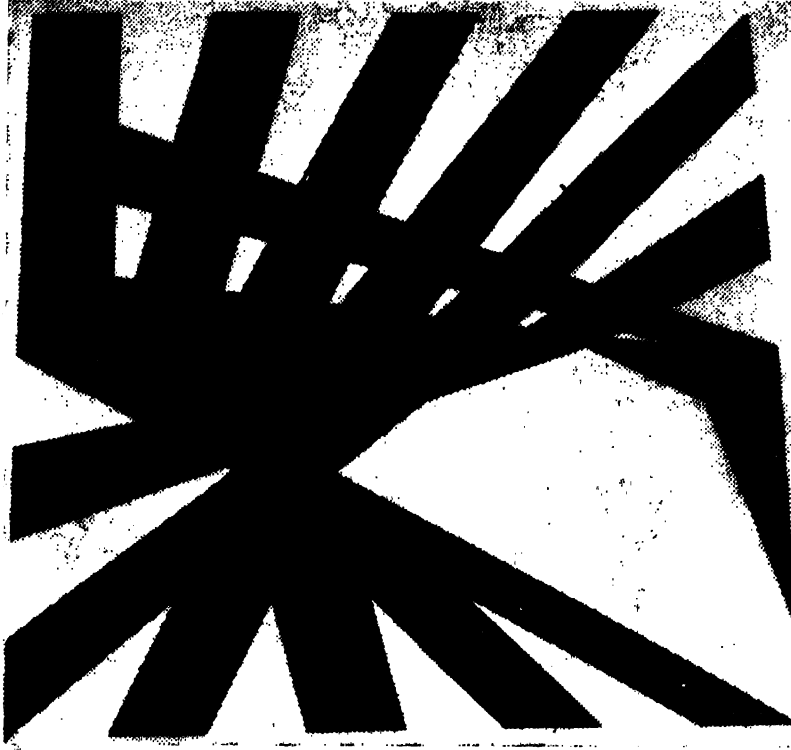
ডাচ শিল্পী পিটার স্টুয়েকেনের একটি গ্রাফিকের প্রতিচিত্র

বহু বিতর্কের ধূলিজাল সত্ত্বেও "ট্রায়ান্যাল" বা ভারতের "ত্রৈবার্ষিকী" একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আন্তর্জাতিক কোনও প্রদর্শনীতে এদেশের অংশগ্রহণ আজ আর অভিনব কিছু নয়। বিশেষত স্বাধীনতা লাভের পর সেটা বেশ বেড়েছে। আর ভারতের মাটিতেও এই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী নয়। আগেই একাধিকবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এত বৃহদাকারে সাম্প্রতিক ক'বছরের মধ্যে এধরণের কোনও প্রদর্শনী এদেশে আয়োজিত হয়নি। তাই এই প্রথম ত্রৈবার্ষিকী একটি অর্থবহ পদক্ষেপ। দিল্লীর রবীন্দ্রভবন ও জয়পুর হাউসে ললিত-কলা আকাদমী আয়োজিত এই প্রদর্শনীটি বর্তমানে চলছে।

ভেনিস, সাও পোলো এবং টোকিওর বায়ান্যাল বা দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর ছাঁচে আমাদের এই ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পিত। অন্যতম উদ্দেশ্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যাবতীয় প্রধান শিল্প-ধারার একত্র সমাবেশ। সে হিসেবে প্রথম আয়োজনে বেশ উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গেছে। প্রায় পঁয়ত্রিশটি দেশের আনুমানিক সাতশ' শিল্পকর্মের সমাবেশ ঘটেছে ট্রায়া-ন্যালে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্রান্স, বৃটেন, পোল্যান্ড, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া, রুশ সাধারণতন্ত্র, সিংহল ও ব্রহ্মদেশ।

আকার ছাড়াও, এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীটির আরেক বিশেষত্ব বলা যায় এর সমকালীনতা। সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কিছু থাকলেও, শিল্পী হিসেবে উঠতিদের ভিড়ই এখানে বেশী। তাই জ্যাকসন পোলক, কেরী রিচার্ডস ও ভিক্টর পাসমোরের সঙ্গে সঙ্গে দেখা পেয়েছি কুমি সুগাই, ম্যানুয়েল ফেলগুয়েরেজ এবং মডেস্টো কুইকসার্টের। পরবর্তী দলের এ'রা সবাই নানা বায়ান্যালে ইতিমধ্যে পুরস্কারলাভ করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। নবীনদের এই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে ট্রায়ান্যালেতেও। শ্রেষ্ঠ সম্মান গোল্ড প্লাক বা স্বর্ণফলক বিজয়ী জাপানের তরুণ কেনতারো কিমুরার বয়স ৪০। বস্তুত বৃটেনের কেরী রিচার্ডস্ ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের জোসেফ কর্ণেল (দুজনেরই জন্ম ১৯০৩ সালে) ব্যতিরেকে পদক বা সার্টি-ফিকেট প্রাপ্ত ট্রায়ান্যালের যাবতীয় বিজয়ী শিল্পীদেরই বয়স ৪০-এর কাছাকাছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এক আন্তর্জাতিক বিচারকমন্ডলীর অনুমোদন-ক্রমেই সব পুরস্কার স্থির হয়েছে। এই মণ্ডলীতে তিনজন বিশেষ আমন্ত্রণে এদেশে এসেছিলেন। এ'রা যথাক্রমে—মিঃ নর্মান রীড (লণ্ডন গ্যালারীর ডিরেক্টর), মিঃ মাসাওসী হোমা (টোকিওর জাতীয় আধুনিক শিল্প-সংগ্রহালয়ের প্রধান শিল্প-সংগ্রাহক) এবং ডঃ এ আইকিমোভিচ (ওয়ারশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-অধ্যাপক)। বাকী চারজন—ডঃ অক্টোভিও পাজ (ভারতে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ও কবি), মিঃ রুডি ফন লাইডেন, ডঃ মুলকরাজ আনন্দ ও অধ্যাপক পৃথ্বীশ নিয়োগী (হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় লিপ্ত, বর্তমানে ছুটিতে দেশে)—এদেশেরই বাসিন্দা।

আলাদা আলাদা ভাবে নানা সূত্রে সংগৃহীত হওয়ার ফলে, প্রদর্শনীতে পরিবেশিত শিল্পকর্মগুলির মধ্যে বিভিন্ন শৈলী, চিন্তা বা প্রকাশধারার ভিন্নমুখিতা সহজেই নজরে আসে। তবে সামগ্রিকভাবে বিমূর্ততা বা অ্যাবস্ট্রাকসনের প্রতিই ঝোঁক আজকালকার শিল্পীদের বেশী বলেই বোঝা যায়। তাতে রয়েছে জ্যামিতিক বা নক্সার রকমারি কারিকুরি। আছে শুধু রঙের সাহায্যে রূপ পরিস্ফুটনের চেষ্টা। প্রথমোক্ত ধরণের উল্লেখযোগ্য কাজ বৃটিশ ক'জন শিল্পীর ছবি ও সমগ্র ডাচ্ ও সুইশ সংগ্রহে দেখা গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কাজেও সে-ছাপ স্পষ্ট। রঙের নক্সায় পোল্যাণ্ডের ছবিগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাপানের বড় বড় ক্যানভাসগুলোকেও এই শ্রেণীতে ফেলা যায়। যুগোশ্লাভিয়ার কিছু কাজেও এই ধরণ লক্ষ্যণীয়। সুরিরিয়েলিষ্টিক কয়েকটি কাজের দেখা মেলে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেরিত শিল্পসংগ্রহে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও মালয়েশিয়ার বেশ কয়েকটা কাজের একটা সচেতন প্রচেষ্টা নজরে আসে। ফলে দর্শকমনে একটা ছাপ এগুলো ফেলতে পেরেছে। দেখবার প্রত্যাশা বেশী ছিল, কিন্তু তেমন কিছুই আকর্ষণীয় দেখা গেল না—এমন দেশগুলির বোধকরি অন্যতম ফ্রান্স। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনভাবে আলাদা মনে রাখার মতো বিশেষ কোনও কাজের দেখা না মিললেও, সামগ্রিকভাবে যা ছাপ ফেলে, সেটা সে দেশের অপআর্ট বা দৃষ্টির কারচুপি। তাই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে উজ্জ্বল ছোট বাল্‌ব আর তার বহুগুণিত প্রতিফলনও শিল্পসৃষ্টি হিসেবে পরিবেশিত হতে দেখা গেল।

প্রদর্শিত ভাস্কর্যের সংখ্যা বেশী নয়। তারই মধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার একটি ইম্প্রেসানিষ্টিক ধরণের কাঠের কাজ, পশ্চিম জার্মানীর কটি ধাতু ও ব্রোঞ্জের এবং জাপানের গোটা-দুয়েক গ্র্যাণিটে করা কম্পোজিসন দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রাফিকস প্রায় সব দেশই পেশ করেছে। তবে স্পেন ও চিলির কাজ মনে রাখার মতো। যুগোশ্লাভিয়াও কয়েকটি ভাল উডকাট্ পাঠিয়েছে। অবশ্য এর কয়েকটি এদেশে কিছুদিন আগে একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। নেদারল্যাণ্ডের গ্রাফিকসের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। আর উল্লেখ করা যায় ফিলিপাইন ও মেক্সিকোর কটি কাজের। শেষোক্ত দেশের জো লুই কুয়েভা ত' একটি পুরস্কারই পেলেন এই ত্রৈবার্ষিকীতে তাঁর উঁচুমানের এচিংয়ের জন্য।

ভারতের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমেই বলা যায় যে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও কিছু প্রতিভাবান তরুণের অনুপস্থিতি সহজেই অনুভূত হয়। সেসব শিল্পীর কাজ থাকলে আরও ভাল মানের সংগ্রহ সেটা হতে পারত। তবে যা পরিবেশিত হয়েছে তা-ও মোটামুটি উল্লেখযোগ্য এবং মনে রাখার মতো। হুসেনের বড় কাজ তত না নিয়ে, ছোট ছবি নির্বাচনের তাৎপর্য বোঝা গেল না। বিমল দাশগুপ্তের একখানা ছবিই স্মরণীয়। মনে হয় এ-শিল্পীর আরও এক-আধখানা কাজ রাখলে সুবিচার হত। রামকুমার বা সন্তোষের ছবি হয়ত আরও ভাল জায়গায় টাঙানো হলে খুলত বেশী। গণেশ পাইনের ছোট দুটি সুন্দর কাজ যেন বড়র ভিড়ে হারিয়ে গেছে। শর্বরী রায়চৌধুরীর (সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত) ব্রোঞ্জের শয়ান, অর্ধশয়ান স্টাডিগুলো যেন বেশী ছোট। সে-ধরনের চারটির পরিবর্তে আরেকটু বড় কম্পোজিশন কিছু হলে দৃষ্টিতে আসত সহজেই। মহেন্দ্র পাণ্ডার দীর্ঘায়ত কাঠের কাজটিও যেন স্থানের তুলনায় বেশী বড় মনে হল। গ্রাফিকস্ সব মিলিয়ে উঁচুমানের হয়েছে। এ-শ্রেণীতে কে, জি, সুব্রহ্মণ্যম্ (পুরস্কার বিজেতা) কৃষ্ণ রেড্ডি, জ্যোতি ভাট, সোমনাথ হোড় ও দীপক ব্যানার্জির কাজ উল্লেখনীয়।

সামগ্রিকভাবে যে ত্রৈবার্ষিকীটি মনে একটা ছাপ রেখে যায়, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আয়োজনে ভুল-ত্রুটিও কিছু হয়েছে। হয়ত অভিজ্ঞতার অভাবই এর কারণ। সবসত্ত্বেও এ-ধরণের আন্তর্জাতিক একটি কার্যক্রমের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ট্রায়ান্যালে আগত ফরাসী এক ভদ্রলোকের মতে আজ ভারতীয় শিল্পীর বাইরের জগতের শিল্পধারার মুখোমুখি হওয়ার একান্ত দরকার। অভিজ্ঞতা ও আত্ম-প্রত্যয় দুই-ই তাতে আসবে। আর যদি তা হয়, সেটাই হবে এই ত্রৈবার্ষিকীর সার্থকতা। কথাটা বিলক্ষণ ভাববার মতো, আর বহুলাংশে যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই।

এঞ্জেল জারাকাজা (ফিলিপাইন)-এর উডকাট

প্রদর্শনী পরিক্রমা

অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর আঁকা

ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি কয়েক বছর ধরে মহিলা শিল্পীদের একটা বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী করে আসছেন। গত ২২ থেকে ২৭ মার্চ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁরা এই বছরের বার্ষিক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করলেন। সারা ভারত থেকে আশীটির ওপর ছবি ও ভাস্কর্য তাঁরা সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু কলকাতার কয়েকজন সুপরিচিত মহিলা শিল্পীদের কোন কাজ দেখা গেল না। মূলতঃ প্রদর্শনীটির মধ্যে বেশ একটা ছাত্র-সুলভ অ্যামেচারিক ভাবটাই পরিষ্কার হয়ে দেখা দিয়েছিল। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে তেল রং, জল রং, ভারতীয় পদ্ধতির ছবি প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। আশা করা যায়, এই ব্যবস্থার ফলে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি হলে উন্নত ধরণের কাজ দেখা যাবে।

তেল রঙের কাজে অঞ্জলি দাশগুপ্তের 'মারমেড' একটু কমার্শিয়াল ঘেঁষা ছবি। কমলা ঘোষের "ওয়েসাইড স্টলস্ অ্যাট নাইট" পূর্বে তাঁর একক প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছিল। ছবিটিতে রাতের আলোর প্রতিফলনে একটা মেজাজ সৃষ্টি হয়েছিল। মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জি, মীনাক্ষী চ্যাটার্জি ও পূরবী বসুর নিসর্গ দৃশ্য ও স্টিল লাইফের কয়েকটি কাজ মন্দ নয়। রতন রামচন্দ্র ওয়াড়কের দুটি প্রতিকৃতি বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আঁকা পরিণত কাজ। অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর "সাডন্ লাইট" ছবির রং ও কম্পোজিশন মন্দ হয়নি। অঞ্জু চৌধুরীর "এক্কা ইন্ গ্রীণ" ছবিটির অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কম্পোজিশান ও রঙের হার্মনি যদিও তাঁর খুব উঁচু দরের কাজ নয়, তবু যেসব শিল্পী এই ধরনের কাজ প্রদর্শন করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হ'ল। জল রঙের কাজের মধ্যে বিজয়া দেশপাণ্ডের কম্পোজিশন উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় প্রথার কাজের মধ্যে সুবালা রায়, মায়া রায় এবং গ্রাফিকস্ বিভাগে বাণী মিত্র ও লক্ষ্মী দত্তের কাজ উল্লেখযোগ্য। রাজুল ধারিওয়ালের শায়িত মূর্তির কাঠের কাজটিও মন্দ হয়নি।

●

২৯ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের উদ্যোগে বাঙলা দেশের সমকালীন চিত্র ও ভাস্কর্যের বার্ষিক প্রদর্শনী বিড়লা অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হল। প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীর। ৩৭জন শিল্পী তাঁদের ৭৬টি কাজ প্রদর্শন করেন। এঁদের অধিকাংশই তরুণ। এই প্রদর্শনীতেও শিল্পবস্তু নির্বাচন ঠিক হয় নি। অনেক নিম্নমানের ছবি দেখা গেল যেগুলি বাদ দিলে প্রদর্শনীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হত বলে মনে হয়। তবে সোসাইটির দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। এখন তেল রং, এমনকি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট শিল্পকেও এঁরা প্রদর্শনীতে স্থান দিয়েছেন। তবে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পরীতির নিদর্শন ও তাদের মান যথাক্রমে কম এবং অনেক নিচু দেখে উৎসাহিত হওয়া গেল না। এই রীতিতে নিছক ভাল ইলাস্ট্রেশনও কাউকে করতে দেখা গেল না। অখিলেন্দু ভৌমিক, আলোক ভট্টাচার্য, বারীন বসু, স্বপনেশ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজনের কিছু পূর্ব-প্রদর্শিত তেল রঙের সু-অঙ্কিত ভারতীয় নিসর্গ চিত্র বা নগরের দৃশ্যগুলি বেশ প্রীতিপদ মনে হল। জল রঙের কাজের মধ্যে জ্যোতির্বিন্দু চৌধুরী, বঙ্কিম ব্যানার্জি, বিনোদবিহারী দাস প্রভৃতি কয়েকজনের কাজ উল্লেখযোগ্য। অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর "ফল" ছবিটি ভাল লাগল। কিন্তু সব মিলিয়ে প্রদর্শনীর মধ্যে তেমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া গেল না।

●

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ২৭ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল শ্রীমতী অরুন্ধতী

রায়চৌধুরীর একটি একক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। ১২খানি তৈলচিত্রের মধ্যে তিনি একটা ডেকরেটিভ এবং ম্যুরাল ঘেঁষা কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। এর অধিকাংশ হাল আমলের আঁকা হলেও কিছু পূর্ব-প্রদর্শিত ছবিও আছে। সাধারণতঃ একটা হাল্কা আলোকোজ্জ্বল পটভূমিকার ওপর ঘোর রঙের ছায়াময় দেহাকৃতি বা পত্র-পুষ্পের তীক্ষ্ণ রেখাময় ডিজাইন সৃষ্টি করার ঝোঁকটাই তাঁর কাজের মধ্যে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। কোথাও কোথাও আলোক রেখার তীক্ষ্ণ কিউবিস্টিক ব্যবহার কতকটা গগনেন্দ্রনাথ-ধর্মী। তবে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রঙের ও ডিজাইনের ব্যবহারের দরুণ ছবিতে বৈচিত্র্যের অভাব এসে যায়। তাঁর "মার্সি" "ডেসপেয়ার" "ইটার্ণাল ধ্যুম" প্রভৃতি ছবিগুলি অনেক সুগঠিত লাগল।

•

শিল্পায়ন গোষ্ঠির উদ্যোগে ২৫ থেকে ৩১ মার্চ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে কানাই চক্রবর্তীর ২৫খানি ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শিল্পশিক্ষা সমাপনের পর ইনি কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বিদ্যালয়ে শিল্প-শিক্ষকের কাজ করছেন।

শ্রীচক্রবর্তীর কাজে রঙের হার্মনিটাই প্রধানতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্র-সংগঠনের দিকে তিনি এখনো যথেষ্ট মনোযোগ দেননি। প্রতিটি ছবির ফিগারকে কিউবিস্ট স্টাইলে ভাঙবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁর রেখা-বিভাজন অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র রঙীন মোজাইক সৃষ্টি করা ছাড়া আর বেশীদূরে এগোয়নি। ১, ৭, ১২, ১৪, ১৫, ২২ প্রভৃতি কাজগুলি উল্লেখযোগ্য।

•

এই সময়ের মধ্যেই অ্যাকাডেমির দক্ষিণের একটি গ্যালারীতে শ্রীমতী বিজয়ম রাজগোপাল আয়েঙ্গারের ৩০খানি ছবির প্রদর্শনী করা হয়। শ্রীমতী আয়েঙ্গার কোন প্রথামত শিল্পশিক্ষা করেননি এবং প্রায় ষাট বছর বয়সে তাঁর শৈশবের পরিত্যক্ত অভ্যাস আবার শুরু করেছেন। তাঁর প্রায় সমস্ত ছবিগুলিই দেব-দেবীর মূর্তি অবলম্বনে আঁকা। লক্ষ্মী, বেঙ্কটেশ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যের মন্দির চিত্রণের রীতিতে কাজ করেছেন। দু-একটা প্রতিকৃতিও আছে। অশিক্ষিত পটুত্বের দরুণ যতটুকু প্রাপ্য দেওয়া যায়, ততটুকু তাঁকে দিতেই হয়। একটি নিসর্গ-দৃশ্য বেশ ভাল লাগল।

•

অ্যাকাডেমি স্টুডিওর স্কেচিং ক্লাবের এগারো বছর পূর্ণ হল। এদের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনী ৩০ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত উত্তরের গ্যালারীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারে প্রায় ৬০খানির মত ড্রয়িং ও পেন্টিং-এর নিদর্শন রাখা হয়েছিল। অ্যাকাডেমির স্টুডিওতে দেহাকৃতি অঙ্কনের সবরকম সুযোগের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এখনো স্টুডিওর সভ্যরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। ফিগার স্টাডির কাজগুলি যদিও প্রাথমিক শিক্ষার নিদর্শন হিসেবে মন্দ নয় তবু আরো অনেকখানি উন্নত নমুনা দেখবার আশা করা অন্যায় নয়। দু-একটি জল রঙের নমুনা এবং খান-তিনেক প্রতিকৃতির স্টাডি আশাপ্রদ।

•

পরিতোষ ব্যানার্জি শান্তিনিকেতনে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন। মুলাজোড় সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা সমাপন করে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করছেন। ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং সেই পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ৩ থেকে ৯ এপ্রিল তাঁর ২৫খানি জল রং, টেম্পারা ও তেল রং-এর যে প্রদর্শনী হল তাতে ভারতীয় রীতি, জাপানী প্রথা ও কিছুটা আধুনিক অ্যাবস্ট্রাকসান ঘেঁষা কাজের অনেকগুলি নমুনা দেখতে পাওয়া গেল। তবে শ্রীব্যানার্জির ব্যক্তিগত স্টাইলের কোন পরিণতির চেহারা এখনো বিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে বলে মনে হল না। তাঁর অনেকগুলি সাদা-কালো ওয়াশের নিসর্গ দৃশ্যে ভিজে কাগজে কাজ করার একটা বিশেষ ধারা দেখা যায় যেটা অল্পক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কয়েকটি গাছের ছবি বেশ ভাল। টেম্পারায় আঁকা ভারতীয় রীতির "রিচুয়াল ফায়ার" ছবির পটভূমিকায় রঙের ঔজ্জ্বল্য আকর্ষণীয় হলেও সব মিলিয়ে অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল, এবং কালভৈরব মূর্তিটি ঝড়ের মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত বলে মনে হল।

•

আধুনিক শিল্পকলার বিভিন্ন রীতির আন্দোলন এবং উদ্ভাবন প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপে হওয়ার ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অনেকখানি পশ্চিমী ভাব এসে যাওয়া বিচিত্র নয়। কোন কোন শিল্পী সচেতনভাবে এই পশ্চিমী ভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় মন দিয়েছেন। পাশ্চাত্য-শিল্প আন্দোলনে যে নতুন ফর্ম-এর সৃষ্টি হয়েছে তার গ্রহণীয় দিকটা অবশ্য বর্জনের চেষ্টা এঁরা করছেন না। কিন্তু ভারতীয় মাটির আমেজ, রঙের ছাপ এবং একটা পরিচিত রূপকে নতুন চোখে দেখা এবং দেখানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে পরীক্ষার একটা রাস্তা যে একেবারে নেই তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। অময়েন্দ্রলাল চৌধুরীর ৩ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত অ্যাকাডেমির মধ্যের ঘরে যে ২৩খানি ছবির প্রদর্শনী হল তাতে এই কথাটাই প্রধান বলে মনে হয়।

রতন রামচন্দ্র ওয়াড়কের আঁকা।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর নাম করতে হলেও খুব তরুণ তিনি নন। দীর্ঘকাল বিভিন্ন যৌথ-প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন ও বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পুরস্কার লাভ সত্ত্বেও এই প্রথম একক প্রদর্শনী করতে তিনি উদ্যোগী হলেন। অপেক্ষার ফল ভালই হয়েছে। কারণ প্রথম একক প্রদর্শনীতেই একটা পরিণত কাজের নিদর্শন আজকাল নিত্য দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ক্যানভাসেরই রঙ এবং ডিজাইন বেশ সুচিন্তিত। রঙ-এর দিকে শ্রীচৌধুরীর কাজে একটা বিশেষ ধরণের কোমলত্ব এবং ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, যেটা দু-একটি ক্ষেত্রে একটু বেশী মিষ্টত্ব ঘেঁষা হয়ে পড়লেও, অনেকখানি পরিণত হাতের কাজের চিহ্ন বহন করে। তাছাড়া এই রঙের ব্যাপারে আরেকটা কথা উল্লেখ করতে হয়। আমাদের দেশের জমিতে গাছেতে যে রঙের সাক্ষাৎ পাই, দেশের প্রাচীন চিত্রকলায় যে রঙের ছাপ দেখতে পাই, তার সঙ্গে একটা সাযুজ্য রাখার ফলে ছবিগুলি বেশ চেনা চেনা মনে হয়। প্যারিস কিম্বা নিউইয়র্কের এক টুকরো বলে ভুল হওয়া অসম্ভব। অথচ ফর্মের দিক দিয়ে সেকেলে হয়ে যায়নি। "ডিসমেড" ছবির উজ্জ্বল সিঁদুরে গাছের পাশে নীলাম্বরা অভিসারিকা ভারতীয় মিনিয়েচারের উজ্জ্বল রঙের ট্র্যাডিশনকেই নতুন পোষাকে বহন করছে। "এমপ্রেস" ছবির ভাস্কর্য-সুলভ উপস্থাপনা আবার কিছুটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। "ভ্যানিটি"র ময়ূরের রূপের বর্ণোজ্জ্বলতায় লোক-শিল্পের গঠন ও রঙের ঔজ্জ্বল্যের সাক্ষাৎ মেলে। এছাড়া তাঁর "দি উয়োম্যান" "প্রিন্সেস" "টেম্পট্রেস" এবং "দি লাভার্স" রং ও কম্পোজিশনের বৈচিত্র্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রঙীন কাগজ দিয়ে কয়েকটি কম্পোজ-মূর্তি ডেকরেটিভ কাজ হিসেবে চমৎকার। নতুন ছাঁদে পুরাতন রীতিকে ধরবার এই প্রচেষ্টার আশা করি আরো সু-পরিণতি দেখা যাবে।

দেবীপ্রসাদ সাহা বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত অনেকগুলি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট্ প্রদর্শন করলেন। শ্রীসাহার রঙ ব্যবহারের হাত সুপটু এবং রঙের ডেকরেটিভ প্যাটার্ণ সুন্দর। অনেকগুলি ক্যানভাসেই তিনি বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-ধরনের অ্যাবস্ট্র্যাকশনে ডেকরেটিভ দিকটির ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে তাঁর অনেক কাজের মধ্যেই টেক্স্টাইল ডিজাইনের ভাব এসে গিয়েছে। তাঁর 'ফুল' এবং 'লাভার্স" ছবিদুটি কিছুটা অন্য ধরনের হওয়ায় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী হয়েছিল।

●

রঞ্জন সেন শিল্পী অবনী সেনের কাছে শিল্পশিক্ষার প্রথম পাঠ নেন। ১৯৬৩ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ক্যানাডা ও পরে আমেরিকায় শিল্পশিক্ষা ও শিক্ষণের কাজ করেন। বিদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তিনি সম্মান লাভ করেছেন। ৬ই থেকে ১১ই মার্চ বিড়লা অ্যাকাডেমিতে তাঁর বিদেশে করা রঙীন এচিং ও পেন্টিং-এর একটি সুন্দর প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীসেনের এচিংগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বলে মনে হল। অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের কম্পোজিশনে একটি প্লেট থেকেই তিনি অনেকগুলি বৈচিত্র্যময় ছবি করেছেন। ফিগারেটিভ বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এই উভয় ধরনের কাজেই সমান দক্ষতা দেখা গেল। তাঁর ৫, ৭, ৮, ১০, ১১ প্রভৃতি ছবিগুলি একই ছবির বিভিন্ন বর্ণের প্রতিলিপির নিদর্শন। এই রীতি ৯, ৬ বা ১৩, ১৬, ১৮ প্রভৃতি ছবিতেও দেখা যায়। শেষোক্ত রমণীমূর্তি এবং ১৭ নম্বরের প্রায় রেনেসাঁস রীতির সূক্ষ্মরেখা ও প্রায় শ্লেট রঙের প্রোফাইলটি বিশেষভাবে চোখের সঙ্গে মনকেও আকর্ষণ করবার ক্ষমতা রাখে। তাঁর ছ-সাতখানি পর্দার মত ঝোলানো বড় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেন্টিং-এর মধ্যে ৫ নম্বর কম্পোজিশনটি ইন্টারেস্টিং, তবে মোটামুটিভাবে তাঁর গ্রাফিকসগুলিই আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে।

●

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে পূর্ব জার্মান বাণিজ্য প্রতিনিধি ও অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির উদ্যোগে ড্রেসডেন আর্ট গ্যালারীর অমূল্য সংগ্রহের ৬৭ খানি বড় প্রতিলিপির প্রদর্শনী হচ্ছে।

গত মহাযুদ্ধে তীব্র বোমাবর্ষণে ড্রেসডেন শহরের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত এর গ্যালারীর অমূল্য শিল্পসম্পদের থেকে প্রায় দুশখানির মত ছবি পুড়ে যায়। যুদ্ধের পর আবার নতুন করে গ্যালারী গড়ে তোলা হয় এবং জনসাধারণ আবার বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের ছবিগুলি দেখবার সুযোগ পায়।

বর্তমান প্রদর্শনীতে ইটালিয়ান, ফ্লেমিশ, জার্মান, ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি শিল্পশৈলীর বিখ্যাত শিল্পীদের ছবিগুলির প্রতিলিপি দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৪শ থেকে ১৯শ শতাব্দীর শিল্পচর্চার একটা চেহারা পাওয়া যায়। ফান এইক, পিন্টুরিচিও, ডুরার, টিশিয়ান, জিওরজিওন, রাফায়েল, রুবেনস, রেমব্রাণ্ট, ভারমেয়ার কানালেত্তো, বোলেত্তো, ওয়াতু, মেঙ্গেল, কুবের, দেগা, মোনে, ভ্যানগগ, গগাঁ, রিশটার, লিবল প্রভৃতি শিল্পীদের বিখ্যাত কাজগুলির প্রতিলিপি রাখা হয়েছে। মূল ছবির সঙ্গে প্রতিলিপির তফাৎ অনেকখানি থাকে। আর কিছু না হলেও ছবির মাপটা অনেক ক্ষেত্রে ছোট হয়ে যায়। তবু মূল দেখবার সৌভাগ্য যখন হয় না তখন একটু ভাল প্রতিলিপিতে রাফায়েলের 'সিস্টাইন ম্যাডোনা', টিশিয়ানের 'ট্রিবিউট ম্যান' জিওরজিওনের "স্লিপিং ভেনাস", রেমব্রাণ্টের 'আত্মপ্রতিকৃতি', ভারমেয়ারের "গার্ল রিডিং এ লেটার" বা বোলেত্তোর ড্রেসডেনের দৃশ্য দেখে সকলেই আনন্দ পাবেন।

●

শান্তিনিকেতনের তরুণ ভাস্কর সুবেণ ঘোষ ২০ মার্চ থেকে অ্যাকাডেমিতে ৩০ খানির অধিক ভাস্কর্য এবং অনেকগুলি ড্রয়িং ও গ্রাফিকসের প্রদর্শনী করছেন। শ্রীঘোষের কাজে রামকিংকর বৈজের কতকটা ছাপ থাকলেও নিজের ব্যক্তিত্ব ফোটাবার প্রচেষ্টা রয়েছে। কতকগুলি প্রতিকৃতির মধ্যে রামকিংকর, মনসিত সিং, চিত্রা প্রভৃতি কাজগুলির মধ্যে একটা রুক্ষ বলিষ্ঠতার সন্ধান পাওয়া যায়। মিউজিশিয়ান, সিঙ্গার, বাউল ও এক বৃদ্ধের মূর্তিতে তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। রিলিফ কাজগুলির মধ্যে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ধর্মিতার ছাপ প্রবল। এগুলির এক অংশের সঙ্গে আরেক অংশের সম্পর্ক বেশ সুচিন্তিত ও সুগঠিত। ছোট ছোট মূর্তির মধ্যে লোকশিল্পের খেলনার ভাবটাই প্রধান মনে হল। ড্রয়িংগুলি ভাস্কর্যসুলভ ত্রিমাত্রিক ছন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে করা। এক গ্রাফিকসের মধ্যেই আধুনিক রীতির সমতল ভাবের কাজের সঙ্গে সাযুজ্য দেখা যায়।

●

সম্প্রতি রেফুজি হ্যাণ্ডিক্রাফটের প্রিয়দর্শিনী গ্যালারীতে প্রথমে বরেন বসু ও পরে কিশোর চ্যাটার্জি আর অসিত চৌধুরীর চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল।

বরেন বসু কতকগুলি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার জলরঙ-এর ল্যাণ্ডস্কেপ এবং কিছু গ্রাফিক ও আধা-বিমূর্ত ড্রইং প্রদর্শন করেন। তাঁর জলরঙ-এর কাজগুলিতে কতকটা ছাত্রসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় ছিল। কাশ্মীর ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের আলোকোজ্জ্বল ছবিগুলির মধ্যে মন-ভোলানো রূপের দর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক ফর্ম নিয়ে তিনি যে কয়েকটি পরীক্ষামূলক কাজ দেখিয়েছেন সেখানে মনে হয় যেন তিনি এখনো পুরোপুরি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারছেন না।

কিশোর চ্যাটার্জি ও অসিত চৌধুরী একজন কফি চীফ ও অন্যজন জিওলজিস্ট। অবসর সময়ে চিত্রবিদ্যা চর্চা করে থাকেন। কিশোর চ্যাটার্জির কাজের মধ্যে রঙকে অযথা ঘসে ভারী করা হয়েছে, অসিত চৌধুরীর প্যাস্টেলগুলিতে তুলনায় কিছুটা স্বচ্ছন্দ ভাব আছে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই কতকটা শিশুশিল্পের প্রদর্শনীর মত চেহারা দেখা যায়।

●

অল্পদিন হল কলকাতার দুজন শিল্পী —যাঁরা বৃত্তি নিয়ে প্যারিসে অবস্থান করছেন—তাঁরা প্যারিসে তাঁদের চিত্র-প্রদর্শনী করলেন। এঁদের একজন প্রকাশ কর্মকার অন্যজন অমিতাভ সেনগুপ্ত। প্রথম ব্যক্তির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়জন কলকাতায় শিক্ষাসমাপনের পর দিল্লীতে বসবাস করতেন এবং সেখান থেকেই বৃত্তি লাভ করে বিদেশে যান। সেখানে তিনি প্রফেসর 'কুতো'র আতালিয়ারে গ্রাফিকস করছেন। তাঁর কাজে কিছুটা ভারতীয় প্রতীক নিয়ে আধুনিক ডিজাইন সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যায়।। —চিত্ররসিক

সার্কুলার রোডের উপরে বিরাট কামানী ম্যানশন। দৈর্ঘ্য, প্রস্থে, উচ্চতায় সব দিক দিয়েই বিরাট। আকাশ ছোঁয়া এই একুশতলা বাড়ির শুরু সার্কুলার রোডে, শেষ প্রায় সিকি মাইল দূরে সার্কুলার রোডের সমান্তরাল আরেক রাস্তায়। এত বড় বাড়ি শুধু এ তল্লাটে কেন, কলকাতায় আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই। আধুনিক কেতায় অগুণতি ছোট ছোট দুতিন ঘরওয়ালা ফ্ল্যাটে বিভক্ত এই কামানী ম্যানশন। সন্ধ্যের পর যখন ঘরে ঘরে আলো জ্বলে তখন ভারী সুন্দর দেখায়। মনে হয় যেন আলোকসজ্জায় সজ্জিত সমুদ্রগামী কোনো জাহাজ। কয়েকশো ফ্ল্যাটে কয়েকশো পরিবারের বাস। নানা দেশের, নানা জাতের, নানা সম্প্রদায়ের স্ত্রীপুরুষকে হরদম দেখা যায় ঢুকতে বা বেরুতে। প্রায় ছোটখাটো একটা জগৎ বলা চলে।

কামানী ম্যানশন চিরকাল আমার কাছে এক বিস্ময়। যখনি এখান দিয়ে যাতায়াত করি, মনের মধ্যে একটা অদম্য ইচ্ছে জাগে বাড়িটার ভেতরে ঢুকি। কেমন যেন মনে হয় আশেপাশের আর দশটা বাড়ি থেকে এ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে যারা বাস করে তারাও যেন ভিন্ন জগতের মানুষ। তাদের পোশাকপরিচ্ছদ আলাদা, আদবকায়দা আলাদা, এমন কি চেহারাও আলাদা। তারা যেন আশেপাশে যারা বাস করে, চলে ফিরে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, যেন তাদের দেখেও দেখে না। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে আলাপ। দুই দৌড়ের মাঝখানে একটু গলা ভিজিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বারের দিকে চলেছি। হঠাৎ কানে এল, "এ বাজি কেমন হল আপনার?" অপরিচিত কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকালাম। সাহেবী পোশাক পরা দীর্ঘদেহী পুরুষ। সুপুরুষ। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাথার চুল। একেবারে শাদা। কিন্তু শাদা মাথার নিচে মুখটা অত্যন্ত বেমানানভাবে কাঁচ। তকতকে করে কামানো বলেই বোধহয় কাঁচ ভাবটা বেশি করে চোখে পড়ে। আমার বিস্মিত দৃষ্টির প্রত্যুত্তরেই ভদ্রলোক করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমার নাম কিষেণলাল। ডক্টর কিষেণলাল। কামানী ম্যানশনে আমার চেম্বার। এ বাজিতে মন্দ আমদানী হল না। আপনার?" অবাঙালী মাত্রেই দেখেছি সপ্রতিভতায় বাঙালীকে বহুমাইল পেছনে ফেলে যায়। অনেকে অবশ্য একে গায়েপড়া ভাব বলে তাচ্ছিল্য করবেন। আমার কিন্তু ওদের কাছে নিজেকে বড় ছোট, বড় আন্-স্মার্ট বলে মনে হয়।

ঢোক গিলে জবাব দিলাম, "নাঃ, এ যাত্রা স্রেফ্ গচ্চা গেল। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম সুশেন সাহা। বালিগঞ্জে থাকি।" একটা টেবিল টেনে বসা গেল। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গালগল্প চলল। বেশির ভাগই ঘোড়া আর জকি নিয়ে। আমি কালেভদ্রে মাঠে আসি। মজা দেখতে। বাজি জেতার নেশায় আর উত্তেজনায় একমাঠ লোক মুহূর্তের মধ্যে কেমন

উন্মত্ত হয়ে ওঠে সেটা দেখতে ভারী মজা। এরই ফাঁকে ফাঁকে কখনো দু এক বাজি ধরে দেখি ভাগ্যটা কেমন! বেশির ভাগ দিনই লাভের খাতায় ঢ্যাঁড়া পড়ে, ফলে নেশা ছুটতে দেরি হয় না। ভদ্রলোক আমার ঠিক উল্টো। ব্যাপারটাকে দস্তুরমতো সিরিয়াসলি নেন। প্রতি শনিবার মাঠে আসা চাইই। কবে কোন ঘোড়া কেমন দৌড়েছিল, কোন বাজিতে কত টাকা দিয়েছিল, কোন জকি ঘুষ খেয়ে আপসেট ঘটতে দিয়েছিল, এ সব দেখলাম ওর কণ্ঠস্থ। কিষেণলাল সাহেব বক্তা ভালো। বেশ জমাতে পারেন। কথায় কথায় জানা গেল উনি কুকুরের ডাক্তার, অর্থাৎ ভেটারেনারি সার্জন।

নতুন বাজি শুরু হবে, সুতরাং উঠে পড়তে হল। যাবার সময়ে ভদ্রলোক আমার হাতে ও'র কার্ডটা গ‍ুঁজে দিয়ে গেলেন। বললেন, "যাবেন একদিন আমার ওখানে সময় পেলে। দূরে তো নয় কামানী ম্যানশন।"

কামানী ম্যানশনের বাসিন্দা। মনে মনে ভদ্রলোক সম্পর্কে একটা কৌতূহল ছাড়াও কিছুটা সম্ভ্রমও যেন অনুভব করলাম। কেনই বা করব না। আমার স্বপ্নের রাজ্য কামানী ম্যানশন, সেখানকার একজন বাসিন্দা। ওরা যে আমাদের থেকে আলাদা সে তো ও'কে দেখলেই বোঝা যায়। অমন পাকা মাথায় কাঁচা মুখ আমি তো আগে কখনো দেখিনি। তখনি স্থির করে ফেললাম ভদ্রলোকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কামানী ম্যানশনে একবার হানা দেবো। ও'কে উপলক্ষ্য করে কামানী ম্যানশনের স্বরূপ আবিষ্কার করা যাবে।

ইতিমধ্যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে আরো একবার ডক্টর কিষেণলালের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এবার অবশ্যি আমিই ডেকে কথা বলি ভদ্রলোকের সঙ্গে। প্রথমটা চিনতেই পারেননি আমাকে। ও'কে বললাম একদিন যাবো ও'র চেম্বারে। আমার কথায় উনি স্বাভাবিক ভদ্রতা রক্ষার জন্যই বললেন, "বেশ তো, বেশ তো, সে তো খুব আনন্দের কথা।" কিন্তু ও'র মুখের অত্যন্ত নিস্পৃহ ভাব থেকেই বোঝা গেল কথাটা ও'র ঠোঁটের ডগা থেকেই বেরুল, হৃদয় থেকে নয়। ভাবলাম হয়তো আমারই বোঝার ভুল। নয়তো সেদিন এত অন্তরঙ্গতা, এত উচ্ছ্বাস দেখালেন, আজ এমন কেন? নিশ্চয়ই ও'র মনে কোনো দুশ্চিন্তা ভর করেছে, সেজন্য অন্য দিকে নজর দিতে পারছেন না। ভদ্রলোকের জন্য মনে মনে সহানুভূতি অনুভব না করে পারলাম না।

ভদ্রলোকের সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হবার পর বেশ কিছুকাল কেটে গেছে। এর ভেতরে একাধিকবার মাঠে গেছি, উৎসুক হয়ে ও'কে খ‍ুঁজেছি এদিক ওদিক। কিন্তু আর ও'র সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে ব্যাপারটা। মাঠের ভিড়ে কারুর পক্ষে হারিয়ে যাওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়। কিন্তু একদিন তো নয়, পরপর কটা শনিবার। আর আমি বেশ সিরিয়াসলি খ‍ুঁজেছি ও'কে। আপনারা হয়তো ভাববেন আমারই মাথায় ছিট আছে, নয়তো একদিনের সামান্য আলাপে ও'র সম্পর্কে আমার এত মাথাব্যথা কেন? কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, আমার ঔৎসুক্য আসলে লোকটা সম্পর্কে যত নয়, তার শতগুণ বেশি উনি যেখানে বাস করেন সেই কামানী ম্যানশন সম্পর্কে। ও'র মারফৎ কামানী ম্যানশনের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হতে চলেছিল, সেটা এভাবে মাঝপথে এসে হারিয়ে যাবে এই ব্যাপারটাই আমাকে বড় পীড়া দিচ্ছিল।

কিসের যেন ছুটি ছিল সেদিন। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরের দিকে বেরিয়েছি কোনো বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একটু আড্ডা মারব ভেবে। কামানী ম্যানশনের কাছে বাস আসতেই কিছু না ভেবেই হঠাৎ নেমে পড়লাম। আকাশ ছোঁয়া অচিনদেশের কোনো রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল কামানী ম্যানশন দাঁড়িয়ে আছে। এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি প্রায় দেখা যায় না। নানা রঙের নানা ঢঙের পোশাক পরা নানা জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ শিশু বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকছে বেরুচ্ছে। সবাই ব্যস্ত, অন্য কারুর দিকে তাকাবার সময় ওদের নেই।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম বাড়িটার সামনে ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা শাদা মাথা দেখে পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। নাঃ, আমারই ভুল। ডক্টর কিষেণলাল নয়। পকেটে মানিব্যাগের ভিতরে কিষেণলালের দেওয়া কার্ডটা ছিল। সেটা বার করে ব্লক নম্বর ফ্ল্যাট নম্বর দেখে নিলাম। উনিশ তলায় এল্ ব্লকের ১১১ নম্বর ফ্ল্যাট। এল্ ব্লক খ‍ুঁজে বার করতে বেশি বেগ পেতে হল না। স্বয়ংক্রিয় লিফ্ট। দুপুর বেলা, লোকের ভিড় একটু কম। লিফ্টে ঢুকে আঠারো নম্বর বোতাম টিপতেই ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। লিফ্ট এক এক তলায় উঠছে, থামছে আবার উঠছে। এরই মধ্যে কেউ নেমে পড়ছে, কেউ নতুন করে লিফ্টে ঢুকছে আরো ওপরে ওঠার জন্য। নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ। অবস্থা কারুরই মন্দ বলে মনে হল না। অন্তত পোশাক-আশাকে সেরকমই মালুম হয়। বেশির ভাগই সাহেবী পোশাক পরা। অবশ্য শাড়ি পরা মেমসাহেবও কয়েকটি নজরে পড়ল।

আঠারো নম্বরের লাল আলো জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে লিফ্টের দরজাও নিজে থেকেই খুলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আমি একাই। লিফ্টের দরজা ছাড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই নজরে পড়ল সুন্দর পালিশ করা একপাল্লা দরজা। তাতে পেতলের ফলকে নাম লেখা—ডক্টর কিষেণলাল, ভেটেরিনারি সার্জন। দরজার একধারে কলিংবেল। মাঝখানে পিপ-হোল। কলিংবেলের বোতামে চাপ দিলাম।

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে কাটল। তারপর কার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। আমি উৎসুক হয়ে পিপ-হোলের উপর চোখ রাখলাম। পায়ের শব্দ দরজার কাছে এসে

থামল। তারপর হঠাৎ দরজার গায় কেমন একটা আঁচড়ানোর মতো শব্দ পেলাম। কেউ যেন নখ দিয়ে দরজাটা আঁচড়াচ্ছে। একটু অবাক হয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার জন্য পিপ-হোলের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিটা চালিয়ে দিলাম। হঠাৎ দুটো চোখ জ্বলে উঠল ওধারে। অদ্ভুত চোখদুটো। চোখের শাদায় লালচে ছিট। দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং ক্রূরতা মিশে কেমন যেন অমানুবিক। প্রথমটা ঠিক ঠাহর হয়নি। কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। পরক্ষণেই রহস্যটা ধরা পড়ল। চোখ দুটো মানুষের নয়। কুকুরের। বড় জাতের কোনো কুকুরের। এতক্ষণে বোঝা গেল দরজার গায় আঁচড়ানোর শব্দ কেন হচ্ছিল। ভেটেরিনারি সার্জনের বাড়িতে কুকুর থাকাটাই তো স্বাভাবিক।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সাঁৎ করে চোখ দুটো সরে গেল। দরজার কাছ থেকে একটা মৃদু পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আরো খানিকক্ষণ।

এবার শোনা গেল চটির শব্দ। দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। আর দরজার ফ্রেমে ছবির মতো যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল। এত সুন্দর যে কেউ হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। য়ুরোপীয় তো নয়ই, ভারতীয়ও নয়। হয়তো মধ্যপ্রাচ্য বা আরব্য দেশীয় কোনো অঞ্চল থেকে এসে থাকবেন। নাতিদীর্ঘ চেহারা। শাড়ি পরনে, কিন্তু পরবার ধরন অনেকটা পার্শীদের মতো। টকটকে গায়ের রঙ, যেন ফেটে পড়ছে। আগুন-রঙা শাড়িতে আরো খুলেছে। অপূর্ব টিকলো নাক। নিখুঁত ডিম্বাকৃতি মুখের ডৌল। গোলাপের পাপড়ির মতো হালকা রঙে ছোপানো ঠোঁটদুটিতে পুরুষের হৃদয়-টলানো রমণীয়তা যেমন ঝরে পড়ছে, তেমনি আবার কোথায় যেন একটা নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। সবচেয়ে মারাত্মক মহিলার নিখুঁত ফিগার। ঠিক যেখানে যতটুকু দরকার তার এক চুল এদিক ওদিক নেই কোথাও। সব মিলিয়ে সত্যিকারের মোহিনীমূর্তি।

অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রথম সংকোচ কাটিয়ে যখন মহিলা মিষ্টি হেসে আমাকে বললেন, "ইয়েস, কাকে চান আপনি?" আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। যথাসম্ভব মোলায়েম গলায় জবাব দিলাম, "ডক্টর কিষেণলালের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার নাম সুশেন সাহা। ও'র সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ঘোড়দৌড়ের মাঠে।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "দয়া করে ভেতরে এসে বসুন। উনি একটু বেরিয়েছেন। কাছাকাছি কোথাও গেছেন। ফিরবেন এখুনি। আপনাকে দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।"

অগত্যা ও'র পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলাম। সুন্দর সাজানো বসবার ঘর। সেখানে সোফা দেখিয়ে ইশারা করে বসতে বললেন। নিজেও বসলেন মুখোমুখি একটা চেয়ারে। ভদ্রমহিলার বয়স খুব বেশি হলে তিরিশের কোঠায়, তার বেশি কোনো মতেই নয়। অথচ কিষেণলাল সাহেবের পাকা চুল দেখলে তো মনে হয় তাঁর বয়স অন্তত ষাট। তবু সাহস করে বলে ফেললাম, "যদি অপরাধ না নেন, আপনিই কি ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী?"

উনি স্মিতহাস্যে সম্মতি জানালেন।

ঘরে দেয়ালময় শুধু কুকুরের ছবি। কত রকমের যে কুকুর তার ইয়ত্তা নেই। কুকুরের ডাক্তার বলেই যে ড্রয়িংরুমেও খালি কুকুরের ছবি রাখতে হবে, এ কেমন কথা! আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের কুকুরটা গেল কোথায়? তাকে তো দেখছি না?"

আমার কথায় উনি যেন একটু আশ্চর্য হলেন প্রথমটা, বললেন, "কুকুর? কোন কুকুর?"

"কেন, যেটি পিপ-হোল দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছিল, আপনি এসে দরজা খোলবার আগে? ট্রেনিং দিয়েছেন বটে কুকুরকে, প্রায় মানুষ করে তুলেছেন। আমি তো গোড়ায় মানুষ বলেই ভুল করেছিলাম।" একটু হেসে বললাম। আমার কথায় মিসেস কিষেণলাল যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর প্রায় নিজের মনে বিড়বিড় করার মতো করে বললেন, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আছে ভেতরে।"

আমি আবার ও'র কুকুরের প্রশংসা করে দু'চার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে কিষেণলাল সাহেব ফিরে এলেন। এবার আর আমাকে চিনতে ভুল করলেন না। সাহেবী করমর্দনের পর উনিও একটা চেয়ার টেনে বসলেন। কুশল প্রশ্নাদির পর ও'র স্ত্রী উঠে গেলেন চায়ের জোগাড় করতে। আমি বললাম, "আপনার স্ত্রীর কাছে আপনাদের কুকুরের প্রশংসা করছিলাম। তুখোড় কুকুর মশাই। আর বলিহারি আপনার শিক্ষা। দিব্যি মানুষের মতো দু'পায়ে ভর দিয়ে পিপ-হোল দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কে এল। আমি তো ওকে দেখে তাজ্জব বনে গেছি।"

কিষেণলাল সাহেবের মুখটা যেন বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, বললেন, "আমাদের কুকুর? কোথায় দেখলেন তাকে? আপনি তো ভারী মজার কথা বললেন। আমাদের আবার কুকুর কোথায়! এই যা দেখছেন ছবিতে, এ ছাড়া আমার ফ্ল্যাটের ত্রিসীমানায় কুকুর নেই। কুকুরের চিকিৎসা করি বটে, কিন্তু তাই বলে বাড়িটাকে একটা 'কেনেল' বানিয়ে রাখবো এমন দুর্মতি আমার হয়নি।"

"তবে যে আপনার স্ত্রী বললেন ভেতরে আছে কুকুর? আর তা ছাড়া আমি এসেই তো দেখেছি পিপ-হোল দিয়ে।" একটু জোর গলাতেই বললাম।

"কী দেখলেন পিপ-হোল দিয়ে?" কিষেণলাল নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বললাম, "চোখ, কুকুরের চোখ।"

আমার কথায় ভদ্রলোক হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। দুলে দুলে হাসছেন তো হাসছেনই। সে হাসি আর থামতে চায় না। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলছেন, "চোখ? কুকুরের চোখ দেখেছেন পিপ-হোল দিয়ে? কী মজার কথা। নেশাটেশা করেননি তো মশাই? আবার বলছেন আমার স্ত্রী বলছেন কুকুরটা ভেতরে রয়েছে। উঃ, এমন হাসির কথা আগে কখনো কেউ বলেনি। আপনাদের বাঙালীদের বাস্তবিক কল্পনা শক্তি আছে।"

ও'র হাসির দমক থেমে এসেছে, এমন সময়ে চায়ের ট্রে হাতে মিসেস কিষেণলালের প্রবেশ।

"কি গো, তুমি নাকি বলেছ আমাদের একটা কুকুর আছে এবং সেটা ভেতরে বাঁধা আছে?" স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন ভদ্রলোক।

জবাবে ভদ্রমহিলা কোনো কথা না বলে, পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে শুধু একটু হাসলেন।

"দেখলেন তো কেমন ঠাট্টা করছেন উনি আপনার সঙ্গে। আপনি অতিশয় ভালো মানুষ তাই ধরতে পারেননি।" কথাগুলো বলে কিষেণলাল সাহেব আবার হাসতে লাগলেন। তারপর পাইপে তামাক ভরে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে সেটা ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমার তখন একেবারে বিমূঢ় অবস্থা। নিজের দৃষ্টিশক্তি শুধু নয়, প্রকৃতিস্থতা সম্পর্কেই তখন রীতিমতো সন্দেহ হতে লাগল। ভদ্রমহিলা নিঃশব্দে চা ছাঁকা শেষ করে একটা পেয়ালা আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন এমন সময়ে ও'র সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বরঞ্চ বলা উচিত উনি আমার দিকে ও'র খঞ্জনীনেত্রের দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করলেন। সে দৃষ্টি আপনাদের আমি বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারব না। শুধু অন্তর্ভেদী নয়, অন্তর্দাহী সেই অপাঙ্গ-দৃষ্টি। তাতে চিরন্তনী নারীর মোহিনীমায়া যেমন ছিল, তেমনি ছিল পুরুষের মোহমুগ্ধতার প্রতি অপার তাচ্ছিল্য। আমার মনে যে সব প্রশ্ন ভিড় করে এসেছিল সেগুলি ঐ দৃষ্টিবাণের এক আঘাতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে কিষেণলাল সাহেব এসে পাশে বসলেন। তারপর চায়ের পেয়ালা টেনে নিয়ে বললেন, "মাঠে যান টান আজকাল? আমি তো বহুকাল যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। সময়ই পাই না।"

আমি তখনো ঠিক স্বাভাবিক হতে পারিনি। কোনো জবাব না দিয়ে চুপচাপ চা খেতে লাগলাম। মিসেস কিষেণলাল আবার ভেতরে গেলেন। আরো খানিকক্ষণ কিষেণলালের সঙ্গে এটা ওটা খাপছাড়া ভাবে আলোচনা করে এক সময়ে আমিও উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক দরজা অবধি আমাকে এগিয়ে দিতে এসে হঠাৎ বললেন, "দাঁড়ান, আমার স্ত্রীকে ডাকি। আপনি চলে যাচ্ছেন উনি বোধ হয় টের পাননি।"

আমাকে দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে উনি ভেতরে গেলেন। একা একা ঐভাবে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল দরজার

পায়। স্পষ্ট বধ বা ধারালো কিছু দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ সেখানে। একটা নয়, বেশ কয়েকটা। আরও কী? কুকুরের গায়ের লোমের মত পড়ে দরজার দিকে, ওগুলো কী? মেঝেতে ছড়িয়ে আছে? পেছনে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ও'রা আসছেন। কিন্তু তার আগেই আমি এক মুঠো লোম কুড়িয়ে নিয়েছি। রুমালে মুড়ে পকেটে রাখছি এমন সময়ে সস্ত্রীক কিষেণ-লাল এলেন। আবার আসতে অনুরোধ জানিয়ে ও'রা আমাকে বিদায় দিলেন।

ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যখন রাস্তায় নামলাম তখন সন্ধ্যা হব হব। গত কয়েক ঘণ্টার অভাবনীয় অভিজ্ঞতায় আমার মাথার ভেতরে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেছে। শীতকাল, তাই বাইরে ঠাণ্ডায় মাথা খানিকটা সুস্থির হল। সমস্ত ব্যাপারটা একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলাম। আজকাল তো ঘরে ঘরে কুকুর, তার কিষেণলাল সাহেব কুকুরের ডাক্তার। সুতরাং তাঁর বাড়িতে একটা কুকুর থাকবে এতে অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অথচ কর্তাগিন্নী দুজনেই স্রেফ কথাটা অস্বীকার করে গেলেন। বিশেষ করে কুকুরের কথা জিজ্ঞাসা করায় দুজনে প্রথমটা যেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তাতে মনে হয় আমারই দেখতে ভুল হয়ে থাকবে। কিষেণলালের সঙ্গে আমার পরিচয় বলতে গেলে দুদিনের। তা হলেও লোকচরিত্র চিনতে যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তবে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে ছলনা করবেন এমন মনে হয় না। আমার তো ও'কে বেশ সহজ সরল বলেই মনে হয়েছে। আর মিসেস কিষেণলালও যে আমার সঙ্গে ছলনা করেছেন, এ কথাই বা বলি কী করে। কুকুরের অস্তিত্ব তো উনি ঠিক অস্বীকার করেননি। যদিও মৌনং সম্মতিলক্ষণং-এর মতো পরে উনি স্বামীর কথাতেই যেন সায় দিলেন। এ কী ধরনের রসিকতা? এ ধরনের লুকোচুরিরই বা অর্থ কী? জানি না, কুকুরটা চোরাই মালও হতে পারে। সেজন্যেই হয়তো ও'রা চেপে গেলেন। কুকুর যে ভেতরে একটা ছিল তার প্রমাণ তো আমার হাতেই রয়েছে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এলাম।

অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্য বাইরে যেতে হল। ফিরতে সাত আটদিন কেটে গেল। কাজকর্মের ঝামেলায় কিষেণ-লালদের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন পার্ক স্ট্রীট রোড দিয়ে যেতে যেতে একটা অদম্য ঔৎসুক্যে কামানী ম্যান-শনে ঢুকে পড়লাম।

'এল' ব্লকের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি উপরে উঠব কিনা, এমন সময়ে লিফ্‌ট নেমে এল উপর থেকে। প্রথম দিন লিফ্‌ট নিজেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আজ দেখি ভেতরে একজন লিফ্‌টম্যান। এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ডক্টর কিষেণ-লাল কোন ফ্ল্যাটে থাকেন। লিফ্‌টম্যান আমাকে লিফ্‌টের ভেতরে ঢুকতে বলে বলল, "একশো এগারো নম্বর ফ্ল্যাট। সাহেব তো কিছুক্ষণ আগে বাইরে গেছেন। শুধু মেমসাহেব আছেন।"

লিফ্‌টে উপরে উঠতে উঠতে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডাক্তার সাহেবের ফ্ল্যাটে কুকুরটুকুর নেই তো আবার? আমার কুকুরে বড্ড ভয়।"

লিফ্‌টম্যান একটু হেসে আমাকে আশ্বস্ত করলে, "না, সাহেব, ও বাড়িতে ওসব ঝামেলা নেই কস্মিনকালেও। আমি তো দেখছি ক'বছর ধরে। তবু আগে অন্য সাহেবেরা তাদের কুকুর নিয়ে আসত ডাক্তার-সাহেবের কাছে চিকিৎসার জন্য। মেমসাহেব আসার পর থেকে তাও বন্ধ। মেমসাহেব নাকি কুকুর মোটে দেখতে পারেন না। ডাক্তার সাহেবের বাবুর্চির কাছে শুনেছি।"

আমি লিফ্‌টম্যানের হাতে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে বললাম, "সাহেব যখন বাড়ি নেই, তখন উপরে গিয়ে লাভ নেই নিচেই ফিরে চল।"

চিড়িয়াখানার তখনকার এক কর্তাব্যক্তি ডক্টর সান্যালকে যখন রুমালে মোড়া কুকুরের লোমগুলো দেখালাম, উনি সাগ্রহে সেগুলো পরীক্ষা করে বললেন, "কুকুরের লোম বলে তো মনে হচ্ছে না। অন্তত গৃহপালিত কুকুরের তো নয়ই। ওদের গায়ের লোম এত মোটা আর কর্কশ হয় না। তা, আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন এ জিনিস?"

আমি বললাম, "সে কথা পরে বলব। তবে এগুলো আপনার কাছেই রইল। দয়া করে একটু ভালোভাবে পরীক্ষা করে যদি কিছু হদিস করতে পারেন তবে বিশেষ বাধিত হব। আমার ফোন নম্বর দিচ্ছি—সকালে বা সন্ধ্যার পর আমাকে বাড়িতে পাবেন।" বলে ফোন নম্বর দিলাম।

পরের দিন সকালে অফিসে বেরুচ্ছি এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল। "হ্যালো, কে? মিস্টার সাহা? আমি ডক্টর সান্যাল বলছি চিড়িয়াখানা থেকে। লোমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছি। কালই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, আজ সেটাই কনফার্মড হল। ওগুলো কুকুরের লোম নয়, নেকড়ের। বিকেলে যদি একবার আসেন আপনাকে দেখিয়ে দেব। এখনি আসছেন? বেশ। নমস্কার।"

অফিস না গিয়ে সোজা হাজির হলাম চিড়িয়াখানায়। ডক্টর সান্যাল বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। আমি যেতেই ও'র অফিসে নিয়ে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা সাদা কাগজের ওপরে রাখা কতগুলো লোম, দুভাগে ভাগ করা। ডক্টর সান্যাল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "এই হল আপনার আনা স্পেসিমেন, আর ঐ হল চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী নেকড়ের লোম। দেখুন ভালো করে, হুবহু এক। আপনি পেলেন কোথায় এই লোম?"

ও'র কথার জবাব না দিয়ে আমি বল-লাম, "চলুন না, আপনাদের নেকড়েটাকে একবার দেখে আসি।"

"খাঁচার ভেতর দিকে গা ঢাকা দিয়ে ছিল নেকড়েটা। আমাদের দেখেই বোধহয় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে এল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় অ্যালসেশিয়ান কুকুর। আমি মোহাবিষ্টের মতো তাকিয়ে আছি ওর চোখের দিকে। চোখের সাদায় লালচে ছিট। প্রথম-দিন কামানী ম্যানশনে কিষেণলাল সাহেবের দরজার পিপ-হোল দিয়ে দেখা সেই চোখ। কোনো ভুল নেই, একেবারে হুবহু সেই চোখ।

ডক্টর সান্যালকে কী বলেছিলাম ঠিক মনে নেই। মন থেকে বানিয়ে কিছু একটা বলে চলে এসেছিলাম।

সারারাত প্রায় না ঘুমিয়ে কাটানোর পর, সকালে উঠে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম কামানী ম্যানশনের পথে। কিষেণলাল সাহেবকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করব রহস্যটা সম্পর্কে।

নিচে সেই লিফ্‌টম্যানের সঙ্গে দেখা। কিষেণলাল সাহেব বাড়ি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় লোকটা অবাক হয়ে বললে, "সে কি সাহেব, খবর পাননি? ডাক্তার সাহেব তো পরশুদিন—হ্যাঁ সেদিনই তো এসেছিলেন আপনি—হঠাৎ মারা গেছেন। ময়দানে বেড়া-চ্ছিলেন মেমসাহেবের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা। হঠাৎ কোথা থেকে একটা পাগলা কুকুর এসে কামড়ে একেবারে টুঁটি ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কাছাকাছি কেউ ছিল না। মেমসাহেব ওখানেই বেহুঁশ হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞান হলে যখন মেমসাহেব ডাক্তার নিয়ে ফিরে যান ততক্ষণে সাহেবের হয়ে গেছে। গলার অর্ধেকটাই খুবলে নিয়ে গেছে সেই শয়তান কুকুরটা।"

আমি ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কুকুরটা কোথায় গেল? সেটাকে ধরা হয়েছে তো?"

লিফ্‌টম্যান বললে, "পাগলা কুকুর ধরবে কে? মেমসাহেব তো তখন একলা। উনি যে নিজে বেঁচেছেন সেটাই তো তাজ্জব। না, কুকুরটার কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি।"

আমি আবার বললাম, "মেমসাহেব আছেন তো ওপরে, একবার দেখা করে আসি।"

লিফ্‌টম্যান জবাব দিলে, "সাহেবই নেই, মেমসাহেব একা কী করে এখানে থাকবেন। উনি কাল রাত্রেই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেশে চলে গেছেন। আহা, এই সেদিন সাহেব কিন্‌-দেশ থেকে শাদি করে নিয়ে এলেন মেম-সাহেবকে, এরই মধ্যে সব খতম্‌!"

তিনযুগের কথা

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে টমাস মানের স্থান অনেক উচ্চে। তাঁর মর্যাদা অসীম, তথাপি টমাস মানের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার ফলশ্রুতি তেমন পরিচিত নয়। কম মানুষই তাঁর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার সঙ্গে পরিচিত। অনেকে টমাস মানের গ্রন্থ দেখেছেন কিন্তু পড়েন নি।

এ কথা বোধকরি নিরাপদেই বলা যায় যে, টমাস মানের সমকালীন জর্জ বার্নার্ড শ ছাড়া আর কোনো মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায় না, মানের নামের সঙ্গে একসূত্রে যাঁকে দেখানো যায়। বার্নার্ড শ'র বক্তব্য কিন্তু তাঁর আপাত সরস ভঙ্গীর জন্য মানুষ হেসে উড়িয়েছে। টমাস মানের রচনায় অবশ্য হাসি ফোটেনি মুখে। টমাস মানের প্রতি মানুষের সেই শ্রদ্ধা যে শ্রদ্ধা ক্লাসিক লেখকদের প্রতি সাধারণত প্রদর্শিত হয়। টমাস মান আবার উত্তরকালে রাজনৈতিক প্রজ্ঞারও পরিচয় দিয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট জাঁকজমকের চমক দেখিয়েছেন, যা ইতিপূর্বে মানের অন্য ধারার রচনাবলীতে শুধু গুণগ্রাহী পাঠকরাই করে এসেছেন। শেষ জীবনে মান মধ্যমশ্রেণীর গ্রন্থাবলীর গ্রন্থপরিচয় লিখতেন, ফলে দি নিউ ইয়র্কার পত্রিকা তাঁকে "গ্যয়তে ইন্ হলিউড" বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন।

কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে টমাস মানের "এসেস অব থ্রি ডিকেডস্"—তিন যুগের প্রবন্ধাবলীর নতুন সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু পরে। এই প্রবন্ধাবলীতে টমাস মান সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। টমাস মান কি ও কে? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে তাঁর এই প্রবন্ধগুলিতে। বৈদগ্ধ্য ও অনুভূতি, যুক্তি ও অযুক্তির প্রসঙ্গ ধরা যাক, মানের রচনায় এ সব বস্তু আছে।

আজ যখন প্রশ্ন ওঠে, টমাস মান কিসের প্রতিনিধি? তখন দুরকম জবাব পাওয়া যায়, হয় তিনি ফ্যাসিস্ত বর্বরতার প্রচণ্ড বিরোধী, নয় যুক্তির মহামানব। কিংবা একদা তিনি অ্যান্টি-ওয়েস্টার্ন কালচুরের সমর্থন করে নিজের নাম কলঙ্কিত করেছেন।

এই সব প্রবন্ধ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে টমাস মান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর জবাব মিলিয়ে মনে হয় যে তাঁর সম্বন্ধে সব বক্তব্যই বাহ্যিক এবং বিভ্রান্তিকর। মান বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ এবং তাঁর লেখক চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটেছে ধীরে ধীরে। যখন তিনি বয়সে তরুণ ছিলেন তখন তিনি ভেবেছেন পশ্চিম য়ুরোপ যুক্তিবাদ নিয়ে মাতামাতি করেছে। পরে, যখন ফ্যাসিস্ত অযৌক্তিকতা সারা য়ুরোপে তার বাহু প্রসারিত করল—তখন মান যুক্তির স্বপক্ষে গিয়ে দাঁড়ালেন। মানুষ টমাস মানের কিন্তু পরিবর্তন ঘটল না।

টমাস মান একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দীপনার বিরল মুহূর্ত ছাড়া, কখনও ভুলে গেলেন না যে আধুনিক উদারনীতিক মন মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অন্তঃসারশূন্য। 'ট্র্যাজিক' এবং "রিলিজিয়স" এই দুটি কথার গভীর তত্ত্বের মর্ম গ্রহণে অশক্ত।

মান স্মরণ করেছেন যে উদারনীতিকদের অনেক শিক্ষার আছে, ফ্যাসিবাদ থাক আর যাক, সোপেনহওয়ার, ভাগনার, নীটসে তাঁদের অনেক কিছু শেখাতে পারেন।

মান যদি এখানেই থামতেন তাহলে তিনি জার্মান মনীষীদের বিপজ্জনক অস্পষ্টতার জালে জড়িয়ে থাকতেন। ধীরে ধীরে তিনি সেই জাল থেকে আপনাকে মুক্ত করেছেন। এগিয়েছেন জাতীয়তাবাদ থেকে রাজনৈতিক মোক্ষলাভের দিকে।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, পূর্ব-য়ুরোপীয় গণ্ডী আঁকড়ে থাকা প্রভৃতির হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করেছেন তিনি। তাঁর এই সমন্বয়কার মতবাদ "অর্ডার অব দি ডে" নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে আছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে তিন যুগ ধরে লিখিত টমাস মানের এই প্রবন্ধাবলীতে কিন্তু অনেক শিক্ষণীয় এবং দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

একজন সমালোচক টমাস মান প্রসঙ্গে বলেছিলেন :—

"Goethe was Mann's Life-belt, and Sigmund Freud threw him the rescuing rope"—

গ্যয়তে দেখিয়েছেন বৈদগ্ধ্য এবং সহজাত অনুভূতির, রাত্রি এবং আলোর সমন্বয় সাধন সম্ভব। তারপর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে যুক্তির দ্বারা অযুক্তিকে রোখা যায়, এমন কি শুধু প্রতিরোধ নয়, তার ব্যূহভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করাও যায়। তিনি বলেছেন :

"Where id was shall ego be".

উদারনীতিক আশাবাদীদের মত মান মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছেন। মৃত্যুর মধ্যে যে সত্য আছে তা তিনি অনুভব করেছেন। কিন্তু অবক্ষয়ী অযুক্তিবাদীদের মত তিনি মৃত্যু কামনা করেন নি। তিনি হানস কাসট্রপের মুখ দিয়ে বলেছেন যে মৃত্যুকে জয় করা যায় ভালোবাসার—যুক্তিতে নয়।

যে সব সমকালীন লেখক জীবনকে স্বীকৃতিদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে বোধকরি টমাস মানই অতল গভীরে ঝাঁপ দিয়ে অনন্তের সন্ধান করেছেন। যে সব সমকালীন লেখক এই গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে টমাস মানই জীবনের জয়গান করেছেন আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গীতে।

এর ফলে, গণতন্ত্রে দীক্ষিত মানকে নিয়ে উল্লাস বোধ করা কিন্তু ভুল হবে, আবার তেমনই একদা জার্মান-বুর্জোয়া বা জার্মান রোমান্টিসিজমের প্রবক্তা বলে মানকে উপেক্ষা করাও অন্যায়।

টমাস মান নিজেও জানতেন যে তাঁর ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শেষোক্ত মানুষটি প্রথমোক্ত মানুষের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে সহাবস্থান করছেন।

'গণতন্ত্রের প্রতীক' মানের কাছ থেকে আমাদের অতি সামান্য যা কিছুই জানার নেই, বরং অন্যত্র হয়ত ভালো করেই জানা যাবে। 'প্রতিক্রিয়াশীল' মানের মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে, যা তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যেও আছে, যা থেকে কিছু শেখার আছে এখনও। তাই দুটি বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে আমরা অনেক শিখতে পারি আবার কিছুই না শিখতে পারি।

এই সব থেকে বোঝা যায় যে কেন "এসেস অব থ্রী ডিকেডস্" এত আশ্চর্যরকমের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে মান স্বয়ং প্রচারবিদ নন। সামাজিক-প্রফেটের ভূমিকা নিয়ে মুরুব্বিয়ানা তিনি করেন নি। কিন্তু এই 'প্রফেটত্ব' তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়। অন্তর্লোকের না হলেও বহির্জগতের তিনি কবি, আর তিনি বলেছেন যে প্রকৃতি ও পদার্থের মধ্যে মধ্যস্থ স্থাপন করার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন। এইখানে তাঁকে এইচ জি ওয়েলসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

দুঃখের বিষয় তিনি ১৯৩৯-এর পর যা যা লিখেছেন তা এই গ্রন্থে সংকলিত হয় নি। কিংবা "পাস্ট মাস্টার্স" নামক গ্রন্থভুক্ত কোনো রচনাই এই গ্রন্থে নেই। কোনো ভবিষ্যৎ সংস্করণে যদি মান লিখিত "ফ্রয়েডস পোজিসন ইন্ দি হিস্ট্রি অব মডার্ন থট" সংকলিত হয় ত গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি হয়।

ESSAYS OF THREE DECADES : By Thomas Mann. Translated by H. T. Lowe-Porter. Publishers : A. Knoff Inc. Price : 4 Dollars only.

৫

ভারতীয় সাহিত্য

বিদেশ থেকে বই আমদানী ॥

নানা জাতের বিদেশী কাগজ আর বই কিনবার ঝোঁক আমাদের মধ্যে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নির্দেশনামা নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছেন যে, বিশিষ্ট আমদানিকারকদের ১৫০ শতাংশ কোটার ভিত্তিতে বিদেশ থেকে বইপত্র আনবার জন্যে লাইসেন্স দেওয়া হবে।

টেকনিক্যাল পত্র-পত্রিকা, খবরের কাগজ ও অ-কারিগরি কাগজপত্রের জন্যে সুনির্দিষ্ট অনুরোধের ভিত্তিতে কোটা লাইসেন্সগুলিকে অনুমোদন করবেন তাঁরা।

যতদূর জানা যায় গল্প-উপন্যাসও ভিনদেশ থেকে আমদানি করা চলবে, তবে এর পরিমাণ হবে কোটা লাইসেন্সের আসল দামের দশ শতাংশ পর্যন্ত। কিন্তু সবচেয়ে সুখবর হল যে, শিশুদের জন্যে লেখা বইপত্র আমদানীর ব্যাপারে কোনোরকম বিধিনিষেধ থাকছে না।

সাহিত্যসেবী সুধীরচন্দ্র স্মৃতিসভা ॥

বাংলা সাহিত্য জগতে সুধীরচন্দ্র সরকার ঐতিহাসিক মর্যাদা নিয়েই অবিনশ্বর হয়ে থাকবেন। গত ১ এপ্রিল এক মহতী স্মরণসভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনকালে একথা বলেন। সভার আয়োজন করেন শিশু সাহিত্য পরিষদ। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন, অপরিচিত অনেককেই সুধীরচন্দ্র সরকার সাহিত্য প্রাঙ্গণে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, আমরা সাহিত্যিকরা সকলে মিলেই সম্পূর্ণ, কেউ একলা নই। শ্রীসুধীরচন্দ্রকে হারিয়ে আমরা জীবনের একটা বড় অংশ হারিয়েছি।

মনোজ বসু বলেন, নির্লোভ, স্বল্পভাষী মানুষ সুধীরচন্দ্র সরকার নিভৃতে সাহিত্য-সেবা করে গিয়েছেন। তবুও তাঁর চরিত্রের আকর্ষণে সাহিত্যিকরা তাঁকে সব সময়েই ঘিরে থাকতেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ বলেন, একজন সাহিত্যিক হিসেবে তিনি নিজেও মৌচাক আড্ডার সভ্য ছিলেন। সুধীরচন্দ্র সরকারের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করতে তিনি শিশুসাহিত্য পরিষদের কাছে অনুরোধ জানান।

পরিষদের পক্ষে সভাপতি নরেন্দ্র দেব ও সম্পাদক পলাশ মিত্র ভাষণ দেন। এ ছাড়া আশাপূর্ণা দেবী, রাধারাণী দেবী, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবী ভাষণ দেন।

নিখিল বঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলন ॥

ঠিক একই বিষয় নিয়ে শিশুদের জন্যে লেখা বেশ কিছু বই যাতে এ-দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া যায়, তার জন্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রক এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ভারতের সবক'টি আঞ্চলিক ভাষাতেই এগুলি রচিত হবে, আর এ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেবেন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।

গত ৩০ মার্চ কলকাতায় নিখিলবঙ্গ শিশু-সাহিত্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন একথা জানান।

বিড়লা আকাদমিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, আজ যেখানে ভারতের প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ ভাষাকে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে চলেছে, সেখানে পশ্চিম বাঙলায় কোন উৎসাহই দেখা যাচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে, হিন্দীর মত কোন আঞ্চলিক ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া চলে না। বাঙলা ভাষার ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বাঙলা দেশের সমস্ত সাহিত্য-সেবীকে আন্তরিক ভাবে মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ জানান।

পরিষদের সভাপতি নরেন্দ্র দেব ভাষণ দেন।

এদিন ১৩৭২ সনের ভুবনেশ্বরী পদক দেওয়া হয় ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকে এবং ১৩৭২-৭৩ সনের ফটিক স্মৃতি পদক লাভ করেছেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। এ বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত শিশু-সাহিত্যিক শৈলেন ঘোষকেও ঐ অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন কলকাতার মেয়র, গোবিন্দচন্দ্র দে। সমাজ-জীবনে শিশু-সাহিত্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, অন্য সব দেশে শিশু-সাহিত্য বহু-কাল ধরে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজো এদেশে শিশু-সাহিত্য এবং শিশু-সাহিত্যিকেরা অবজ্ঞাত।

এই অনুষ্ঠানে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুদের জন্যে রচিত বিভিন্ন ধরনের ছড়া গেয়ে শোনান এবং ছড়া ও কবিতা পাঠ করেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মলয়শংকর দাশগুপ্ত, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণারঞ্জন বসু।

পরলোকে রথীন্দ্রনাথ রায় ॥

গত ৩১ মার্চ বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের জনপ্রিয় অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

অমৃত পত্রিকার নিয়মিত লেখক শ্রীরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ ডিগ্রী পান ১৯৪৬ সালে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও নাট্যবিচার সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্যে ডি ফিল হন ১৯৫৯ সালে। এর ঠিক দু'বছর পরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন।

তাঁর রচনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার, সাহিত্যবিচিত্রা, ছোট গল্পের কথা, বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থাবলীও তিনি সম্পাদনা করেন। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও গিরিশচন্দ্রের নাটক সম্পর্কে তথ্য সমন্বিত দুটি গ্রন্থ প্রণয়নে হাত দিয়েছিলেন।

বিদেশী সাহিত্য

পূর্ব-পশ্চিমের মিলন প্রয়াস ॥

সম্প্রতি পশ্চিম-জার্মানীর সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ ওয়াল্টার হোলেরার একটি শান্তিপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্যে মার্কিন ও রাশিয়ান সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দশটি দেশের একুশজন সাহিত্যিক এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। এদিক থেকে অধ্যাপক হোলেরার সফল হয়েছেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সোভিয়েত ইউ-নিয়নের উস্‌নেসেন্‌স্কি, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের চার্লস ওল্‌সন, গোল্যান্ডের জির্গানিড হার্বার্ট ও তাদিউজ রোসে-উইক্‌জ, যুগোশ্লাভিয়ার ভাস্কো পোপা ও মিওড্রাগ পাব্লভিক, চেকোশ্লোভাকিয়ার মিরস্লাভ হোলাব, ফ্রান্সের বনিফয় ও ফ্রান্সিস পঞ্জ, ইটালীর এডুয়ার্ড স্যাঙ্গুইনেটি এবং পশ্চিম জার্মানীর গুন্টার গ্রাস প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরুষ।

বার্লিনের অ্যাকাডেমী অব্ আর্টস-এর গৃহে এই উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দর্শকপূর্ণ অডিটোরিয়ামে দর্শাদন ধরে ভাষণ, বক্তৃতা, আবৃত্তি ও অনুবাদের অনুষ্ঠান চলে। এনজেনাস বার্জার ও দেদোঁসয়াসের মত বহু প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক অনুবাদক হিসেবে কাজ করেন। আধুনিক সাহিত্যে লিরিকের প্রয়োজন এবং সার্থকতা-বিষয়েও আলোচনা হয়। সুইডেনের লার্স গুস্টাফসন ভাষাকে মেসিনের সঙ্গে তুলনা করেন।

প্রুস্তের জীবন ও সাহিত্য ॥

প্রখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক মার্শেল প্রুস্তের জীবন ও সাহিত্যের ওপর চারটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিছুকাল আগে। ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ ডি পেইন্টার বেশ কয়েক বছর হোল 'প্রুস্ত : আর্লি ইয়ার্স' নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর 'প্রুস্ত : দি লেটার ইয়ার্স' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এটিতে লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড বলা যায়। এই গ্রন্থে মিঃ পেইন্টার প্রুস্তের জীবনের সমৃদ্ধি ও সমাপ্তিকালের বিস্তৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই পুস্তকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষ প্রুস্ত ও অতীতচারী স্বপ্নময় আদর্শবাদী প্রুস্তের পার্থক্য নির্ণয়ের দিকটি। পূর্ববর্তী জীবনীকারেরা মানুষ ও আদর্শবাদী প্রুস্তকে প্রায় সমান্তরাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে যে ভ্রান্তিতে পড়েছিলেন, এ গ্রন্থের লেখক স্বীয় বুদ্ধি ও বিচারশীল গবেষণায় তার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছেন।

ভিক্টর ই গ্রাহাম-এর 'দি ইমেজারি অব্ প্রুস্ত' গ্রন্থটিতে প্রুস্ত সম্পর্কে বহু নতুন সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। লেখক অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রুস্তের জীবন ও সাহিত্য বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। প্রুস্তের ভাবনা-চিন্তার উৎস, তাঁর ব্যবহৃত উপমা ও অলংকারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থের বিশ্লেষণে প্রাধান্য পেয়েছে।

রেমণ্ড টি রিভা লিখিত 'মার্শেল প্রুস্ত : এ গাইড টু দি মেইন রেকারেন্ট থিমস্' গ্রন্থটিতে লেখক প্রুস্ত নির্বাচিত শব্দ ও রূপকল্পের বিভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে কিভাবে তাঁর মৌলপ্রত্যয় স্মৃতি, সময় ও নিরুদ্দেশের সন্ধানে নিয়োজিত হয়েছিল—তার বিশ্লেষণ করেছেন। জন গে উড লিন-এর 'দি থিয়েটার ইন দি ফিকশন অব মার্শেল প্রুস্ত' গ্রন্থটিতে প্রুস্তের সাহিত্য-চেতনার মূলে রঙ্গমঞ্চের উপাদান বিষয়ে গবেষণামূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

নিগ্রো-মানসিকতা ॥

আধুনিক সভ্যসমাজের সঙ্গে নিগ্রো-সমাজের পরিচয় খুব অন্তরঙ্গ কিংবা বন্ধুত্বসূচক বলা যায় না। ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর অতিক্রম করে যখন পাশ্চাত্যসভ্যতার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটল, তখনই গলদ থেকে গিয়েছিল ভেতরে ভেতরে। মার্কিন দেশে নিগ্রোরা চালান হলো ক্রীতদাসরূপে, আর স্বদেশে য়ুরোপী শাসনের প্রসার ও আধিপত্যের ফলে পরস্পরের মধ্যে শাসক-শোষিতের সম্পর্কই বিজাতীয় বিদ্বেষে পর্যবসিত হলো। মার্কিন দেশের নাগরিক হয়েও নিগ্রোরা পুরোপুরি মার্কিনী-সভ্যতার অংশীদার নয়। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের সঙ্গে সাদা-কালোর পার্থক্য এই বৈপরীত্যের প্রধান কারণ। অথচ নিগ্রোরাও মানুষ। পৃথিবীর দিকে দিকে মানবীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যুগে তারাও স্থাণু হয়ে থাকতে পারে না। স্বদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনী নিগ্রো-সমাজেও প্রতিবাদী মানসিকতার জন্ম হলো। কিছুকাল আগে প্রকাশিত ফ্রান্সিস এল ব্রোডেরিক ও অগাস্ট মেইয়ার সম্পাদিত "নিগ্রো প্রোটেস্ট থট ইন টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী" নামক প্রবন্ধসংকলনটির বিভিন্ন প্রবন্ধে সেই সত্য স্বীকৃত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ মার্কিন নিগ্রো-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। নিগ্রো-মানসিকতার গঠন, চিন্তাধারা ও তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিশ্লেষণে প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই মূল্যবান।

শিশুপাঠ্য উপন্যাস ॥

বয়স অনুযায়ী গল্প কিংবা উপন্যাস লেখার রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই। সমস্ত পাশ্চাত্য দুনিয়ায় বিভিন্ন বয়সী শিশু ও বালক-বালিকাদের জন্য নানাপ্রকার বই লেখা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের প্রকাশকরাও এ-ব্যাপারে তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। হয়তো ব্যবসায়িক সাফল্য নেই বলে।

সম্প্রতি 'দি ফক্স হোল' নামে একটি শিশু-পাঠ্য উপন্যাস বেরিয়েছে নিউইয়র্ক থেকে। লেখক ইভান সাউথল। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের জন্য বইটি লেখা। অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণখনি অঞ্চল নিয়ে এটি একটি অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। অবশ্য স্বর্ণপিপাসা যখন মানুষের মনে জাগে তখন কারোর মনেই আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একটি দশ বছরের ছেলে 'কেন্' ও তার খুড়তুতো ভাই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। 'কেন্' তার আত্মীয়দের কাছ থেকে স্বর্ণখনি অঞ্চলের গল্প শুনেছে এবং তার কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এই দুঃসাহসিক কর্মে নিবৃত্ত হয়েছে। মাঝে মাঝে লেখক নরহত্যার দীর্ঘ বর্ণনা করেছেন। যে সব শিশুর মন এখনো যুক্তিনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি, তাদের কাছে বইটি ভালো লাগবে।

হাউপ্টম্যান পুরস্কার ॥

বার্লিনের পিপল্‌স থিয়েটার এবছর নাটকের জন্য হাউপ্টমান পুরস্কার দিয়েছেন পঁচিশ বছর বয়স্ক অস্ট্রিয়ান নাট্যকার পিটার হান্ডকে-কে। বেশ কিছুকাল ধরে হান্ডকের কয়েকটি নাটক য়ুরোপীয় রঙ্গ-মঞ্চসমূহে সফলতার সঙ্গে অভিনীত হয়ে আসছে। তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'ক্যাস্পার' আগামী মে মাসের ৪ তারিখে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও ওভারহৌসেন-এ অভিনীত হবে। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে হান্ডকের নাটকগুলি প্রচলিত ধারার বিরোধী এবং স্বতন্ত্র। নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ও জনপ্রিয়তা একান্তভাবে আকস্মিক ও অতর্কিত।

এই পুরস্কারের নগদ মূল্য ছ' হাজার মার্ক। এ-ছাড়াও দু-হাজার ফ্রাঙ্ক মূল্যের আরও দুটি পুরস্কার পেয়েছেন—জোকেন জিয়েম ও গেবার্ট হেরহোল্জ। তাঁদের দুজনেরই জন্ম ১৯৩২ সালে।

শিশু সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত সুধীরচন্দ্র স্মৃতিসভায় সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ভাষণ দিচ্ছেন। পরিষদের সভাপতি শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছবিতে আছেন।

নতুন বই

ভারতের ভাষা গোপাল হালদার প্রণীত। **প্রকাশক : লেখক সমবায় সমিতি। কলিকাতা-২৬। পরিবেশক : বাক্-সাহিত্য, মনীষা ও ইণ্ডিয়ানা প্রভৃতি পুস্তকালয়, কলিকাতা-১২। দাম : চার টাকা মাত্র।।**

ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তার ভাষাগত বিভেদ। এই বহুভাষিক দেশের বিভিন্ন ভাষার আদি কথা ও সাধারণ তথ্যাবলীর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানের বিখ্যাত লেখক গোপাল হালদার তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ভারতের ভাষা' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক বলেছেন, "'ভারতের ভাষা' রচনার উদ্দেশ্য বাঙালী পাঠক-সাধারণের নিকট ভারতের ভাষাসমূহ সম্বন্ধে সাধারণ তথ্য পরিবেশন করা।" যে সাধারণ জ্ঞান সুপ্রচলিত নয়, তারই সহজ পরিচয়দান করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। লেখক বলেছেন : "প্রধানত আমি চেষ্টা করেছি সহজভাবে, সহজ কথায় সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীকে ভারতের ভাষাগুলি সম্বন্ধে সুপ্রমাণিত তথ্য জানাতে এবং সে-সব নানা ভাষার রূপ ও পরস্পরের যোগাযোগ সম্বন্ধে কিছুটা তাঁদের মনে আগ্রহ সঞ্চার করতে।" লেখকের এই আগ্রহ সৃষ্টির কাজ সার্থক হয়েছে। এই গ্রন্থটিকে একটি সুন্দর 'হ্যাণ্ড বুক' বলা যায়। গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর অননুকরণীয় সহজ-বোধ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন বক্তব্যগুলি। এই গ্রন্থের সাতটি পরিচ্ছেদে - ভাষা সংক্রান্ত সাধারণ কথা, চার বংশের দেশ, অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা নিষাদ ভাষাবলী, ভোটব্রহ্মী বা কিরাত ভাষাবলী, দ্রাবিড় ভাষাবলী, হিন্দ্ আর্য ভাষাবলী—পূর্ব ইতিহাস, নব্য হিন্দ্ আর্য ভাষাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং পরিশিষ্ট অংশে 'ভারতীয় লিপির কথা' নামক একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে লিপির বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে।

ভাষা এক রহস্যময় বিষয়বস্তু। নানা জাতির নানা ভাষা। সেই ভাষার সাহায্যে তাঁরা কথা বলেন। ভাষা যদি না জানা থাকে, তাহলে অপরের কথা হাস্যকর মনে হয়, আর জানা থাকলে মনে হয় কেমন সহজ এবং সরল, এ আর কঠিন কি। কিন্তু ভাষার উৎপত্তি, বিকাশের সঙ্গে সভ্যতার বিকাশ সংযুক্ত। এই গ্রন্থের লেখক সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, তাই তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সত্ত্বেও কোথাও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। ভাষার সঙ্গে ইতিহাসও সংশ্লিষ্ট। তাই ভাষাপ্রসঙ্গে অতীত ও সমকালীন ইতিহাসের প্রসঙ্গও ইতস্তত ছড়ানো আছে। নানা ভাষার রূপ, তার উৎপত্তি, বিকাশ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে যে একটা আশ্চর্য ঐক্যসূত্র বর্তমান, লেখক তা অতিসহজ ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি সুমুদ্রিত। খালেদ চৌধুরী কৃত প্রচ্ছদপট সুন্দর।

●

বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক : [প্রবন্ধ]—**শক্তি ভট্টাচার্য। সাহিত্যশ্রী। ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দাম : আট টাকা।**

বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচিত হলেও বিষয়ানুযায়ী গ্রন্থ-রচনার ব্যাপারে বাঙালি প্রাবন্ধিকদের উদাসীনতা প্রায়শ বিস্ময়কর মনে হয়। সৃজনশীলতার তুলনায় বাঙলা সাহিত্যের বিভাগীয় আলোচনার সংখ্যাপরিমাণ নিতান্তই সামান্য। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন অনেকেই। গল্প-উপন্যাস-নাটকেরও ইতিহাস রচিত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চৌহদ্দী অতিক্রম করে সাধারণ পাঠক কিংবা সাহিত্য-জিজ্ঞাসুর মনে নতুন কোন ভাবনার উন্মোধন ঘটায় না। সেজন্যই সাহিত্যের কোন একটি বিশেষ প্রবণতা কিংবা অনুচিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কেউ গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলে খুশীই হতে হয়। অধ্যাপক শক্তি ভট্টাচার্যের 'বাঙলা ঐতিহাসিক নাটক' তেমনি একটি নতুন দিক।

বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের জন্মলগ্নে ছিল স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যের অন্তর্তাগিদে বাংলা দেশে কোনো ঐতিহাসিক নাটক রচিত হয়নি। মাইকেল, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক রচনার পর্যমূলে বাঙালির জাতীয়তা বোধের জাগরণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বিস্মৃত হননি। বরং প্রাগুক্ত নাট্যকারদের বিপুল জনপ্রিয়তার যেসব নাট্যকারের নাম বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক ও নাট্যামোদীরা বিস্মৃত হতে বসেছেন, 'গৌণ নাট্যকার' অধ্যায়ে সেইসব বিস্মৃতপ্রায় নাট্যকারদের সম্পর্কেও গ্রন্থকার আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁর সাফল্য প্রাথমিক অনুসন্ধানের সীমা অতিক্রম করে

অধিক দূরে অগ্রসর হয়নি। জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে তৎকালীন ইংরেজ সরকার বহু নাটক ও নাট্যকারের ওপর যে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন, তার ফলশ্রুতিতে অনেক মূল্যবান নাটকীয় দলিল আজ শুধু জনসাধারণের হস্তচ্যুত নয়, স্মৃতিচ্যুত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এ-ব্যাপারে অনুসন্ধান চললে হয়তো অনেক অজ্ঞাতপূর্ব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

এই গ্রন্থটির অধ্যায়-বিভাগ তাৎপর্যপূর্ণ। অবতারণা অংশে প্রবন্ধকার ইতিহাস ঐতিহাসিক নাটক ও তার সৃষ্টি-প্রেরণার উৎস ও বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তী পর্বসমূহে রয়েছে বাঙলা ঐতিহাসিক নাটকের উন্মেষ প্রগতি ও প্রসারের আনুপূর্বিক পরিচয়। পরিণতি পর্বের পরিসমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাট্যের আলোচনা সংযোজিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অধ্যাপক ভট্টাচার্য কখনো নাটক কিংবা নাট্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সমালোচনাকে নস্যাৎ করেননি। বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে তিনি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তসমূহকে বিচার করে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। নাটক ও নাট্যসাহিত্যে আগ্রহশীল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

●

Hindustan Year Book And Who's Who 1968 : Edited by S. C. Sarkar 14, Bankim Chattrjee St. Calcutta - 12 Price Paperback : Rs. 4 and Plastic bound Rs. 8.

প্রতি বৎসরের মত এবারও 'হিন্দুস্থান ইয়ার বুক ১৯৬৮' প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য পরিবেশনে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানির মূল্যবান ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। ভারত সম্পর্কে পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে আছে রাজনৈতিক সংবাদ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, বিদ্যুৎ, লোহ ও ইস্পাত, কয়লা, তৈল, শ্রম, আণবিক গবেষণা, মৎস্য চাষ, পশুপালন, বন, বনাজন্তু, বেতার, আবহাওয়া, ভ্রমণ, চলাচল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, শ্রম, রেল, ব্যবসাবাণিজ্য, জাতীয় আয়, পারমাণবিক বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য, ব্যাঙ্ক, বাজেট, জীবনবীমা, স্টক এক্সচেঞ্জ, পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ, যানবাহন, বন্দর, জাহাজ চলাচল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংবাদপত্র এবং প্রকাশন, জাতীয় সম্মান ও পুরস্কার, চলচ্চিত্র, খেলাধুলো, করভার প্রভৃতি। তাছাড়া আছে বিশ্বসংবাদ, ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যের তথ্য, রাজ্যসভা, লোকসভা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভারত-পাকিস্থান সংবাদ, মন্ত্রীদল, নোবেল পুরস্কার। তথ্যভান্ডার এই বর্ষপঞ্জী এবারও পূর্বের মতই সমাদৃত হবে আশা করি।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

কবিতা সংবাদ : পবিত্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত, দাম : ২০ পয়সা।

'কবিতা সংবাদ' প্রকৃত —কবিগোষ্ঠীর মুখপত্র। এর পর পর দুটি সংখ্যার প্রকাশ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। এই দুটি সংখ্যায় কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, কমলকুমার ভৌমিক এবং গণেশ বসু। কবিতা লিখেছেন প্রশান্ত চৌধুরী, অজয়কুমার কর, শিশির সামন্ত এবং আরো অনেকে। এছাড়া কবিতা সংক্রান্ত নানা সংবাদ পত্রিকার আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

●

Visva-Bharati News, January & February, 1968 edition. Chittapriya Mukhopadhyaya: Price 25 paise

'বিশ্বভারতী নিউজ' বিশ্বভারতীর নানাবিধ সংবাদ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘকাল। উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে এর আকর্ষণ কম নয়। বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী সংখ্যাদুটিতে আছে বৌদ্ধ উৎসব ও সমাবর্তন উৎসব সংক্রান্ত নানা তথ্য। তাছাড়া আছে আচার্য উপাচার্য, প্রধান অতিথির ভাষণ রক্ষোপযণা, সি এফ এণ্ড্রুজ এবং রবীন্দ্রনাথের চিঠি, কবিতা এবং কয়েকটি কবিতার অনুবাদ, বিভিন্ন বিষয়ে রিপোর্ট গ্রন্থপ্রকাশ প্রভৃতি।

লেখা ও রেখা (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৪)—সম্পাদক : ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। অক্ষর গ্রন্থাগার, শান্তিপুর, নদীয়া। দাম এক টাকা।

লেখা ও রেখার বর্তমান সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন নারায়ণ চৌধুরী, রমেন নাগ এবং কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। (অজিত চক্রবর্তীর কবিতা)। জাঁ-জোসেফ র‍্যাবিয়ারিভেলো এবং সেসিল ডে লুইসের কবিতা অনুবাদ করেছেন সামসুল হক এবং পল্লব সেনগুপ্ত। একটি নাটক ও একটি গল্প লিখেছেন যথাক্রমে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং বশীর আল্‌হেলাল। কয়েকটি কবিতা, গ্রন্থ সমালোচনা এবং অন্যান্য আলোচনা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

●

ক্রান্তি (প্রথম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮বি, কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম এক টাকা।

শিল্প সাহিত্য নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ক্রান্তি ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান সংখ্যায় তারাপদ লাহিড়ী, ফিদেল কাস্ত্রো, আই এফ স্টোন, এ দুআরদো গালেআনো, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জীবকুমার সরকার এবং আরো কয়েকজন লিখেছেন। পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদৃত হবে।

এ বছরের সাহিত্য পুরস্কার

বেশ কয়েক বছর ধরেই কয়েকটি বিশিষ্ট পত্রিকা সংস্থা কয়েকজন সাহিত্যিককে সম্মানিত করে আসছেন। এই পুরস্কারগুলি বরাবরই বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করে। ১৩৭৪ সালের জন্যে পুরস্কৃত কবি-সাহিত্যিক হলেন সুধীরচন্দ্র সরকার, মহাশ্বেতা দেবী, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীলচন্দ্র সরকার।

সুধীরচন্দ্র সরকার পেয়েছেন শিশিরকুমার পুরস্কার। পৌরাণিক অভিধান, জীবনী অভিধান, বিবিধার্থ অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কিছুকাল আগে তাঁর জীবন-স্মৃতিমূলক রচনা 'আমার কাল আমার দেশ' ধারাবাহিকভাবে অমৃতে প্রকাশিত হয়।

এ বছরের মতিলাল পুরস্কার লাভ করেন মহাশ্বেতা দেবী। বাঙলা সাহিত্যে অল্পকালের মধ্যেই তিনি গল্প ও উপন্যাস লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। গত শারদীয় অমৃতে প্রকাশিত তাঁর সম্পূর্ণ উপন্যাস 'জটায়ু' বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে ঘোষিত হয় প্রফুল্ল সরকার পুরস্কার। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তকের জন্যে তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পান সুরেশচন্দ্র পুরস্কার। বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতিমান কথাশিল্পী হিসেবে শ্রীমুখোপাধ্যায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

উপরোক্ত প্রতিটি পুরস্কারের আর্থিক মূল্য এক হাজার টাকা।

সুধীরচন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পুরস্কারটি আগে মৌচাক পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হত।

উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন কবি সুনীলচন্দ্র সরকার।

এই পুরস্কার দুটির আর্থিক মূল্য পাঁচশো টাকা।

গর্কী জন্ম-শতবার্ষিকী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্রভাবে রুশ-সাহিত্যের সম্পর্কে এবং তার বিশিষ্টতম প্রতিভূ হিসেবে গর্কীর কাছে আমাদের যে ঋণ রয়েছে সেই সুমহৎ এবং পরম শ্লাঘ্য ঋণকে উচ্চকণ্ঠে স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক আনন্দময় উপলক্ষ্য আজ উপস্থিত হয়েছে --ইতিহাসের বর্ষ গণনার ধারায়। মহান ম্যাক্সিম গর্কীর জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হল। এ ঋণ অবশ্য শোধ হবার নয়, পরিশোধের কথাও চিন্তা করি না। কেবল সেই ঋণকে আজ মহান লেখক গর্কীর শতবার্ষিকী উৎসবে সর্বাগ্রে পরম শ্রদ্ধার ও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ ও স্বীকার করব আমরা। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার আত্মিক ঋণের মধ্যে গুরু বা ঋষি ঋণের উল্লেখ আছে। এই ঋণকে গুরু বা ঋষি ঋণরূপে আজ এই উৎসব-অঙ্গনে সর্বাগ্রে স্বীকার করি ও শ্রদ্ধা জানাই।

বিংশ শতাব্দীর যে কালে আমাদের দেশে আমাদের প্রাচী দিগন্তে গঙ্গার দু-ধারের জনপদে, গ্রামে, নগরে, বন্দরে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ প্রভৃতি মহান লেখকদের রচনায় মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে বেদনা, আশ্বাস ও আশার ধ্বনি জেগেছিল সেইকালেই প্রতীচীখন্ডে ভোলগার তীরে গর্কীর রচনায় যে ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছিল তারও প্রতিধ্বনি বেজেছিল এই গঙ্গা-ধারা-বাহিত জীবনে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দের রচনার সঙ্গে গর্কীর রচনাকেও আমরা একান্ত আপনার বলে গ্রহণ করেছিলাম। তাতে আমরা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ করিনি, সঙ্কোচের কারণও ঘটেনি। কারণ সেদিন যে বেদনা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রতিদিন বিদ্ধ করত, ভারতবর্ষের মানুষ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও প্রেমচন্দের রচনায় যে বেদনা থেকে পরিত্রাণের আশ্বাস খুঁজত সেই বেদনাতেই গর্কীর রচনা পরিপ্লুত ছিল, তাঁর রচনা সেই বেদনা থেকেই পরিত্রাণের আশা ও আশ্বাস বহন করত। যে বেদনায় আমরা ব্যথিত, গর্কীর সমগ্র রচনায় সেই একই বেদনার ছায়া; যে পথে তার থেকে পরিত্রাণের আশা ও আশ্বাস আমরা খুঁজি সেই একই আশা ও আশ্বাস বহন করেছে গর্কীর রচনা। এই কারণেই তিনি রুশভূমির লেখক হয়েও আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের স্বজন, লেখক হিসেবে আমাদের বেদনার কথাই যেন বলেছেন বলেই তিনি আমাদেরই বেদনার কথাকার।

ভারতবর্ষের মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াও, ব্যক্তিগতভাবে লেখক হিসেবে তাঁর কাছে ঋণ আছে। অপরিশোধ্য ঋণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র সঙ্গে আমার কাছে আরও একখানি গ্রন্থ যুক্ত হয়েছিল। সেখানি গর্কীর 'মাদার'। বঞ্চিত ও পরাধীন মানুষের অপরাজেয় সংগ্রাম ও অপরাজিত মানবাত্মার কাহিনী হিসেবে 'মাদার' অন্য গ্রন্থগুলির সঙ্গে আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। পরবর্তীকালে যখন ১৯৩০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে শুধুমাত্র সাহিত্যকেই জীবনের একমাত্র কর্ম হিসেবে গ্রহণ করলাম তখন পরিচয় ঘটল গর্কীর গল্প-সংগ্রহের সঙ্গে। মানব-জীবনের অপরিসীম দুঃখ ও যন্ত্রণা ও সেই সঙ্গে অপরাজেয় প্রাণবত্তার যে পরিচয় গল্পগুলির অঙ্গে ও অন্তরে পরিব্যপ্ত তা আমাকে শুধু মুগ্ধ করেনি নূতন পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে। এই প্রবন্ধে উল্লেখ করি তাঁর প্রথম রচনা 'মাকার চুড্রা'র। এই গল্পটি যখন আমি প্রথম পড়ি সেদিন কি বিস্ময় ও কি আনন্দে যে অভিভূত হয়েছিলাম তা আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। তাঁর বিভিন্ন রচনায় যে প্রাণসার প্রবল, সহজ, অরুপন জীবন স্পর্শ, স্বার্থহীন, অকুন্ঠ ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে তা সামগ্রিক মানব-জীবনেরই বিপুল ও বিশাল মহিমা দ্বারা মহিমান্বিত এবং তার আকর্ষণ পাঠকের কাছে তরঙ্গিত সমুদ্র কি বিশাল পর্বতমালার মতই গম্ভীর ও বৃহৎ। বহু বহু যন্ত্রণার বেদনা ও নিষ্ঠুরতা, বহু তীব্র সংগ্রামের ও বীর্যবত্তার কাহিনী তাঁর রচনার অঙ্গে অঙ্গে বিধৃত। সেই সঙ্গে মানব-জীবনের শ্রেয়োবোধ, যা সমগ্রভাবেই রুশ সাহিত্যের মূল বৈভব, তা তাঁর রচনার মধ্যে সর্বত্র চন্দনগন্ধের মত পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। এইখানেই ভারতীয় দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর গভীর ঐক্য ও সাজুয্য। এই কারণেই তাঁকে ও তাঁর রচনাকে একান্ত আপন ও আপন জনের সৃষ্টি বলে মনে হয়। বোধহয় এমনভাবে আর কোন বিদেশী রচয়িতার রচনা আমাদের আপন বলে মনে হবার নয়।

গর্কীর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে নিপীড়িত মানুষের হৃদয়ানুভূতি এবং তার সঙ্গে তার থেকে পরিত্রাণের আশ্বাস

প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়ায় তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে মৌন মূক মানুষের উপর যে অত্যাচার চলছিল, সেই ধরণের অত্যাচারই তাঁর রুশ-ভূখন্ড থেকে অনেক দূরে সেই-কালেই চলেছিল আমাদের দেশে। সেই একই বেদনা, ও একই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার প্রয়াস তাঁকে আমাদের প্রাণের সংগে যুক্ত করেছিল। সেই কারণেই তাঁর জয়োচ্চারণ বার বার আমাদের দেশের মহৎ ও বৃহৎ মানুষদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। গর্কীর রচনা তাঁর দেশের মানুষকেই শুধু উজ্জীবিত করেনি, আমাদের দেশের সংগ্রামী মানুষকেও প্রেরণা জুগিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালে "ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকায় লিখেছিলেন, "১৮৯২ সনে ম্যাক্সিম গর্কীর রচিত প্রথম বইটিই এমন চমৎকার ছিল যে শীঘ্রই তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তিনি অনেক লিখেছেন; সবগুলিরই উদ্দেশ্য এক—স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জন-গণকে জাগিয়ে তোলা, কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া এবং যথাসম্ভব জনসেবা করা। জনগণের সেবা করে তিনি জেলে গিয়েছেন এবং কারাবাসকে সম্মান বলে মনে করতেন।...ম্যাক্সিম গর্কীর মত জনগণের অধিকারের এতবড় প্রবক্তা ইউরোপে অন্য কোন লেখক নেই।"

আবার এই উল্লেখের প্রায় কুড়ি বৎসর পর, ১৯২৪ সালে শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যেও অনুরূপ উল্লেখ লক্ষ্য করি। পূর্ববঙ্গে এক সাহিত্য সম্মেলনে সভা-পতির ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি মনে করি, আমাদের এই সীমাহীন দারিদ্র্য ও দুর্গতির দেশের লেখক যখন তাঁর গর্ব ছেড়ে ফেলে রুশ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজের নিম্নতম স্তরে নেমে যাবেন গরীবের বেদনা ও আশার ভাগ নেবার জন্য, তখনই তিনি সৃষ্টি করবেন এমন এক সাহিত্য যা তাঁকে শুধু স্বদেশে নয় সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যেও আসন দেবে।"

বিভিন্নকালের উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে গর্কী তাঁর জীবনকালেই আমাদের দেশে প্রেরণার জীবন্ত উৎস ছিলেন। তাঁকে আমরা আপন জনের মতই বরাবরই স্বীকার, গ্রহণ ও সমাদর করে আসছি। তাই তাঁর জন্মশত-বার্ষিকী উৎসবে তাঁকে আজ আবার একান্ত আপন জনের মতই স্মরণ করি। এবং তাঁর সম্পর্কে আমাদের অন্তরের চিরায়ত শ্রদ্ধা ও প্রেমকে আজ আবার পুনরায় সসম্মানে নিবেদন করি।

এইখানে মানুষ গর্কীর সম্পর্কে দু-একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। অতি সাধারণ মানুষের ঘরে প্রবল দারিদ্র্য ও বিরূপ পরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্ম। শুধু তাই নয়; জন্মাবধি জীবন তাঁকে নিষ্ঠুর বিরূপতার মধ্য দিয়ে ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। দারিদ্র্যের কষ্ট অনুভব করেছেন, অপ্রেমের যন্ত্রণা অনুভব করেছেন, নিঃসঙ্গতার বেদনা পেতে হয়েছে, রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তবু তাঁর মধ্যে কোথায় যেন মৃত্যুঞ্জয়ী আশা ও অমেয় প্রেমের অমৃতময় স্বর্ণকুম্ভ ছিল, যার অমৃত সিঞ্চনে সব ক্লেশ, সব দুঃখ, সব অপ্রেম সেই আশা ও প্রেমকেই দিনে দিনে উজ্জীবিত করেছে। সেই অমৃতময় প্রাণের অধিকারীকে আজ প্রণাম জানাই।

গর্কী একাধারে প্রাচীন রুশ সাহিত্য ও বর্তমান সোভিয়েট ভূমির সাহিত্যের স্বর্ণ-যোজক। তাঁর মধ্যে এই দুইকালের উজ্জ্বলতম বিশিষ্টতাগুলি বর্তমান। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট ভূমিতে তিনি নবীন সাহিত্যের গুরু ও জনক ছিলেন। কিন্তু বিগতকালের কোন বিশিষ্টতাকে তিনি বর্জন করেন নি। বিপ্লব সত্ত্বেও নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তিনি অস্বীকার করেন নি। একাধারে বিপ্লবী ও প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক গর্কীকে এই কারণে প্রণাম জানাই।

গর্কী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন নি। জীবনের বৃহৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, উপরে আকাশ, নীচে মৃত্তিকার বিপুলে বিস্তার পাঠগৃহে তিনি মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ জীবনগ্রন্থ পাঠ করেছেন। জীবন তাঁর শিক্ষাগুরু। জীবনের এই প্রত্যক্ষ ছাত্র ও শিষ্যকে, এই শতবর্ষে বর্ষীয়ান, গরীয়ান গুরু হিসাবে, একজন সত্তর বৎসরের তরুণ লেখকরূপে তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেরুবাসীদের ভীরাকোচা নামে দেবতাটি বেশ একটু অসাধারণ ও রহস্যময়।

ভীরাকোচা ইংকা সম্রাটদের আরাধ্য সূর্যদেব নন। অথচ তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আর মহিমা সূর্যদেবেরই সমান। এই দেবতাটি শুধু ভীরাকোচা নয়, পাচাকামাক নামেও পরিচিত। এই নামের একটি নগর পাচাকামাক দেবতার পীঠস্থান হিসেবে সে-যুগে বিখ্যাত ছিল। এ-নগরের অবস্থান কর্ডিলিয়েরা অর্থাৎ আন্তিজ পাহাড়ের শীর্ষদেশের কোনো মালভূমিতে নয়, পশ্চিমের সমতল সমুদ্রতীরে।

সেখানে পাচাকামাক বা ভীরাকোচার পূজামন্দিরের স্থাপত্যও ইংকা সম্রাটদের প্রতিষ্ঠিত সূর্যমন্দিরের চেয়ে অনেক বেশী পুরানো বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত।

পাচাকামাক বা ভীরাকোচা হলেন সেই দেবতা, সমস্ত সৃষ্টির যিনি প্রাণের উৎস। এ-সৃষ্টির রক্ষকও তিনি।

ইংকা সম্রাটেরা বিজয়ীরূপে দেখা দিয়ে সমস্ত পেরু রাজ্যে যে সূর্যপূজার প্রবর্তন করেন, ভীরাকোচা দেবতা হিসাবে তার অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত।

ইংকা বিজয়ীরা রাজনৈতিক সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই আগেকার দেবতাকে সূর্যদেবের সঙ্গেই সমান মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা যে-রাজ্যকে পেরু বলে জানি ইংকা সম্রাটদের কাছে জিভে গিঁঠ-পড়ানো তার একটা অদ্ভুত নাম ছিল—'তাভান্তিনসুইয়ু'। শব্দটার মানে হল, দুনিয়ার চার তরফ। এই 'তাভান্তিন-সুইয়ু'র মধ্যে 'পাচাকামাক'-এর মন্দিরের দৈববাণীর খ্যাতি ছিল অসামান্য। সমস্ত পেরু রাজ্য থেকে তীর্থযাত্রীরা আসত এই 'পাচাকামাক' বা ভীরাকোচার মন্দিরে দৈববাণীর জন্যে ধন্না দিতে। 'ভীরাকোচার' প্রাধান্য ইংকা সম্রাটদের আরাধ্য সূর্যদেব তাই খর্ব করতে পারেননি।

আগাগোড়া শ্যামলা মানুষের দেশে এই ভীরাকোচা দেবতার গায়ের রং শাদা বলে কল্পনা করা আর তাঁর মন্দির নগর ঠিক সমুদ্রকূলেই স্থাপিত থাকার মধ্যে পেরুর লুপ্ত ইতিহাসের কোনো অস্ফুট ইঙ্গিত আছে কিনা কে বলতে পারে!

এই আশ্চর্য দেবতা ভীরাকোচাই কি সত্যি এত যুগ বাদে তাঁর ভক্তদের সাহায্য করতে পৃথিবীতে নেমেছেন? এরকম কিংবদন্তী রটবার কারণ কি?

পেরু রাজ্যের প্রজারা ভীরাকোচার পুরাণ কথা স্মরণ করেই এসপানিওলদের প্রতি প্রথম সশ্রদ্ধ আকর্ষণ অনুভব করেছিল। এসপানিওলদের গায়ের রং শাদা সুতরাং সেই সুদূর পুরাণের যুগের ভীরাকোচার সঙ্গে তাদের হয়ত কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে—এইরকম একটা ধারণাই গোড়ায় গড়ে উঠেছিল তাদের মনে। তাদের এ-ভুল মর্মান্তিকভাবে ভাঙতে দেরী হয়নি অবশ্য।

নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে পেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তারা বুঝেছে, সমস্ত সৃষ্টি যাঁর কাছে জীবন পেয়েছে, জীবনের যিনি পরম রক্ষক, সেই ভীরাকোচার সঙ্গে সামান্যও একটু সম্বন্ধ থাকলে, এসপানিওলরা এমন পিশাচ কখনো হতে পারত না।

কাক্সামালকা নগরে ইংকানরেশ আতাহুয়ালপা পিজারোর হাতে বন্দী হবার কয়েকদিন পর থেকেই অত্যন্ত গোপনে প্রায় চুপি চুপি একটা কথা তাই কান থেকে কানে ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। কথাটা কি? কথাটা এই যে, গায়ের রং শাদা হলেও, এসপানিওলরা অনাদি জীবন-দেবতা ভীরাকোচার কেউ নয়। ভীরাকোচার সঙ্গে তাদের মিলটা একটা প্রতারণা। ওপরটাই তাদের শাদা, ভেতরটা একেবারে ঝুলের মত কালো।

ভীরাকোচার কাছে তাদের আসল চেহারা ত' লুকোনো নেই। তিনি তাই যুগযুগান্তর বাদে অকস্মাৎ দেখা দিয়ে পিশাচ এসপানিওলদের উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন।

পেরুর লোকেরা এরকম আজগুবি কিছু ভেবে নিয়ে সান্ত্বনা পেতে চায় ত' পাক, এ-অদ্ভুত কিংবদন্তী এসপানিওলদের মধ্যেও ছড়িয়ে একটু-আধটু ভয় জাগালেও ভাবনার কথা। পিজারোর বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি দে সটোর মনে সেই ভাবনাই হয়েছে।

ব্যাপারটা আলোচনা করবার জন্যে তিনি বেছে গানাদোর খোঁজ করছেন। এ-ধরনের ব্যাপারে তাঁর মতামতের একটা দাম আছে বলেই মনে হয়েছে দে সটোর।

গানাদোর খোঁজ দে সটো শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন, কিন্তু দিন-তিনেক চেষ্টা করার পর।

গানাদোকে পাকড়াও করবার পর সেই প্রশ্নই তিনি আগে করেছেন।

কোথায় ছিলে বল ত' হে ক'দিন?—জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো,—রোজ তোমায় খোঁজ করতে এসে পাইনি।

কখন খোঁজ করতে এসেছিলেন কাপিতান?—গানাদোর গলায় সম্ভ্রমের সুরে

একটু যেন অন্য সুরে শোনা গেছে।

দে সটো অবশ্য তা লক্ষ্য না করে বলেছেন,—কখন আবার? রোজই সন্ধ্যার পর খোঁজ করেছি তোমার ব্যারাকে। তোমায় পাইনি।

পাবেন কি করে কাপিতান,—গানাদো যেন সরলভাবেই বলেছেন,—সন্ধ্যের পর কাউকে এখন পাওয়া যায়।

কেন, পাওয়া যায় না কেন?—দে সটো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কোথায় যায় সবাই?

আজ্ঞে, কেউ যায় লুট করতে, আর কেউ লুকোতে,—গানাদো যেন দে সটোর মনের ভাবনাটা আঁচ করেই জবাব দিয়েছেন।

লুকোতে কি রকম?—দে সটো একটু চমকে উঠেই প্রশ্ন করেছেন এবার,—এসপানিওলরা সুবিধে পেলে লুট করে মানি। কিন্তু তাদের কেউ কেউ ভয়ে লুকোচ্ছে বলতে চাও? কার ভয়ে? এ-দেশের মানুষের?

শেষ কথাগুলো বলবার সময় দে সটোর গলায় উত্তেজনার সঙ্গে বেশ একটু রাগই ফুটে উঠেছে।

গানাদো কিন্তু তাতে বিচলিত হননি। এবং এবার একটু কৌতুকের স্বরে বলেছেন, —না, এ-দেশের মানুষের ভয়ে নয় কাপিতান, লুকোচ্ছে ভূতের ভয়ে।

ভূত আবার কি!—ধমক দিয়েছেন দে সটো,—স্পষ্ট করে বলো।

ভূতকে যে স্পষ্ট করা যায় না কাপিতান!—যেন দুঃখের সঙ্গে বলেছেন গানাদো, —আমাদের মনের অন্ধকার সব কোনে-কানাচেই যে তার আস্তানা।

বেদে গানাদোকে ধমক দিলে এইরকম ধোঁয়াটে ধাঁধাই যার হবে বুঝে দে সটো এবার নরম হয়ে সোজাসুজি তাঁর প্রশ্নটা জানিয়েছেন।

সত্যিই ভৌতিক কিছু ব্যাপার কাক্সামালকায় ঘটছে বলে তুমি মনে করো? ওরা যা বলে তার ভেতর কিছু সত্য আছে বলে তোমার ধারণা?

ওরা যা বলে, তা তাহলে আপনি জানেন?—এবার গানাদোর গলা গম্ভীর।

হ্যাঁ জানি।—দে সটো অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করেছেন,—সেইজন্যেই তুমি এ-ব্যাপারের কি কতটুকু জানো জিজ্ঞাসা করছি।

আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি লাভ কাপিতান!—গানাদো যেন পাশ কাটাতে চেয়েছেন, —আপনার মত আমিও ওরা যা বলে সেইটুকুই জানি।

না, না,—প্রায় অনুরোধের সুর ফুটে উঠেছে দে সটোর গলায়—আমার কাছে লুকিও না গানাদো। আমাদের সৈনিকদের মধ্যে এরকম অদ্ভুত কথা রটবার মূলে কিছু আছে কিনা আমার চেয়ে নিশ্চয় তুমি বেশী জানো। যা জানো তা বলো।

এবার খানিক চুপ করে থেকে গানাদো ধীরে ধীরে বলেছেন,—বলবার বেশী কিছু নেই কাপিতান দে সটো। এইটুকু শুধু নিজে ভেবে দেখলেও বুঝতে পারতেন যে, নেহাৎ হাওয়ার ওপর এরকম একটা অদ্ভুত ভয়ের গল্প এই ক'দিনে গড়ে উঠতে পারে না। কিছু একটা ভিত্তি তার আছেই।

সেই ভিত্তিটা কি তাই ত' জানতে চাইছি। —দে সটোর গলায় অধৈর্যের সঙ্গে বিস্ময়-বিহ্বলতা মেশানো,—ধবধবে সাদা ঘোড়ায় সাদা পোষাকে সাদা মুখোশ ঢাকা এক মূর্তি এসপানিওলদের কাউকে একা পেলে হঠাৎ যেন ভোজবাজিতে যেখানে সেখানে দেখা দিয়ে তাদের আক্রমণ করে এরকম আজগুবি কল্পনার কি ভিত্তি থাকতে পারে? তুমি নিজে দেখেছ কখনো সে-মূর্তি?

না কাপিতান।—একটু যেন ভয়ে কাঁপানো গলায় বলেছেন গানাদো,—আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এ-মূর্তি নিজের চোখে দেখার ভাগ্য আমার হয়নি। তবে সাদা ঘোড়ায় সাদা মুখোশ-ঢাকা সওয়ার দেখার ব্যাপারটা সত্য বা কাল্পনিক যা-ই বলুন না কেন, সেইরকম অদ্ভুত কোনো কিছুর করবার ছোঁয়ার মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দু-একটা নেই এমন নয়।

একটু থেমে দে সটোকে তাঁর প্রশ্নটা করবার অবসর না দিয়ে গানাদো আবার বলেছেন,—প্রমাণগুলো অবশ্য লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাই হয়েছে। যারা ভুক্তভোগী তারাই ব্যস্ত হয়েছে লুকিয়ে রাখতে। তবু রহস্যটা সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায়নি।

কি বলছ তুমি আবোল-তাবোল!—দে সটো এবার একটু বিরক্তির সঙ্গেই বলেছেন, —কি প্রমাণ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে? যারা ভুক্তভোগী তারাই বা প্রমাণ লুকোতে ব্যস্ত হয়েছে কেন?

ব্যস্ত হয়েছে প্রমাণগুলো একটু লজ্জার বলে।—গম্ভীরভাবে বলেছেন গানাদো,—আস্ত না থেকে তলোয়ার যদি কারো দু'-টুকরো হয়, তাহলে ঢাক পিটিয়ে তা জানাতে নিশ্চয় কেউ ব্যাকুল হয় না। সাহসী বীরের হাতের তলোয়ার দু'টুকরো হওয়ার কৈফিয়ৎ বানানো ত সোজা নয়। ভাঙা তলোয়ার লুকিয়ে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে যাওয়ার চেষ্টাই তাই করতে হয়। মুস্কিল হয় শুধু কপালের কলঙ্কের দাগটা নিয়ে।

ভাঙা দু'টুকরো তলোয়ার, কপালে কলঙ্কের দাগ, এসব কি হেঁয়ালি করছ গানাদো?—দে সটো রুষ্টস্বরে বলেছেন,—আমি তোমার কাছে হেঁয়ালি শুনতে চাইনি, তার জবাব চেয়েছি।

জবাবই আপনাকে দিয়েছি কাপিতান।—এবার একটু হেসে বলেছেন গানাদো,—একটু খোঁজ নিলে ভাঙা দু'টুকরো তলোয়ার আর কপালের দাগের প্রমাণ আপনি নিজেই বার করতে পারবেন। প্রথমে আরমেরিয়ায় গিয়ে অস্ত্রাগারের ভাণ্ডারীর কাছে গত এক হপ্তার মধ্যে কজন সৈনিক নতুন তলোয়ারের আর্জি জানিয়েছে খবর নিন, তারপর পারেন ত' কুচকাওয়াজে সবাইকে ডেকে কপাল পরীক্ষা করে দেখুন।

একটু চুপ করে দে সটোর বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে গানাদো আবার বলেছেন, —কপাল পরীক্ষা করাটা এসপানিওলদের পক্ষে একটু বেশী অপমান হয়ে যাবে কাপিতান। সুতরাং তার দরকার নেই। শুধু ভাঙা তলোয়ারের হিসাবটা গোপনে নিলেই বুঝতে পারবেন একটা অদ্ভুত কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই তার পেছনে আছে। সেই অদ্ভুত কিছু ঘটনার মূলে সাদা মুখোশধারী ঘোড়-সওয়ারের কিংবদন্তীর সম্পর্ক কি তার

কতটুকু, তা আপনাকে বলতে পারব না।

বেশ কিছুক্ষণ দে সটো বিস্ময়বিমূঢ় হয়েই নীরব হয়ে থেকেছেন। তারপর গভীর সংশয়েরই সুর গলায় নিয়ে বলেছেন,—ভাঙা তলোয়ারের ব্যাপারটার নির্ভুল প্রমাণ যখন আছে, তখন তার মূলে শাদা মুখোস-ধারী কোনো শত্রু ঘোড়-সওয়ারের রহস্য থাকতেও পারে তুমি মনে করো?

তা করি।—স্বীকার করতে যেন বাধ্য হয়েছেন গানাদো।

কিন্তু,—দে সটো তাঁর অবিশ্বাসের কারণগুলো প্রকাশ করেছেন—এই কাক্সা-মালকার পাহাড়ঘেরা অধিত্যকায় ওরকম শাদা ঘোড়া আর তার সওয়ার আসবে কোথা থেকে? ঘোড়া ত' এ-দেশের প্রাণী নয়। আমরা যে-ক'টি সঙ্গে এনেছি তাছাড়া একটি ঘোড়াও এই বিশাল রাজ্যে নেই। রোগে, অপঘাতে যে-ক'টা গেছে, তা বাদে ঘোড়া এখনো আমাদের যা আছে, তা গোনাগুনতি। সে-সব ঘোড়ার মধ্যেও সত্যিকার দুধে ঘোড়া যাকে বলে, তা ত' একটাও নেই যে, বলব কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে চালাচ্ছে। আমাদের কোনো ঘোড়া চুরি সত্যিই যায়নি এপর্যন্ত। তা গিয়ে থাকলেও ত' রহস্যের কিনারা হয় না। মুখোশধারী সওয়ার তার ঘোড়া নিয়ে কোথা থেকে আসে, চলে যায়ই বা কোথায়? তাহলে ব্যাপারটা কি সত্যিই ভৌতিক বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই? অশরীরী কোনো মূর্তি কি হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার শূন্যে মিলিয়ে যায়?

দে সটো শেষ প্রশ্নটা নিজেকেই যেন করেছেন। দরকার নেই বলেই বোধ হয় গানাদো তার কোনো জবাব দেবার চেষ্টা করেননি।

দে সটো আবার নিজেই অন্য প্রশ্ন তুলেছেন,—শাদা ঘোড়ার মুখোশধারী মূর্তি অশরীরী ছায়া মাত্র হতে পারে কিন্তু সে যা করে থাকে, তা ত' অলীক স্বপ্ন গোছের কিছু নয়। ভাঙা দু' টুকরো তলোয়ার আর কপালের কাটা চিহ্নের কথা যা বলছ, তা যদি ঠিক হয়, তাহলে সে ত' বিশ্রী বাস্তব সত্য। অলীক ছায়া আর এই বাস্তব সত্যে যে মেলানো যাচ্ছে না।

মেলাবার দরকার কি কাপিতান দে সটো!—এবার হেসে বলেছেন গানাদো,—দু-চারটে ভাঙা তলোয়ার আর কপালের কাটা দাগ কত আর আপনাদের ক্ষতি করবে? আপনাদের পেরু বিজয় তাতে আটকে থাকবে না।

তা হয়ত থাকবে না।—চিন্তিত-ভাবে বলেছেন দে সটো,—কিন্তু এরকম একটা রহস্যের কিনারা না হলেও ত' নয়। আস্ত তলোয়ার কেমন করে দু' টুকরো হয়, সৈনিকদের কপালে কি করে কাটা দাগ পড়ে, তার ঠিক হদিস না পেলে অজানা আতঙ্কটা রক্ষণ আরো ছড়িয়ে যাবে। ভুতুড়ে অত্যাচারটা বাড়তে বাড়তে কতদূর পৌঁছোবে? আর কখন কার ওপর পড়বে তারই বা ঠিক কি।

না কাপিতান!—প্রতিবাদ জানিয়েছেন গানাদো,—ভুতুড়ে রহস্যের মীমাংসা হবে কিনা জানি না, কিন্তু যেটুকু দেখা গেছে, তাতে এটুকু বোধহয় বলা যায় যে, ভুতুড়ে অত্যাচারটা এলোপাথাড়ী খামখেয়ালীভাবে যার-তার ওপর হয়নি ও হবে না।

তার মানে?—দে সটো সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

তার মানে, যাকে অত্যাচার বলছেন, তা এপর্যন্ত যার-তার ওপরে নয়, বাছাই-করা কয়েকজনের ওপরেই শুধু হয়েছে।

বাছাই-করা ক'জনের ওপর হয়েছে!—গানাদোর কথাটাই আবার আউড়ে দে সটো বিমূঢ়ভাবে জানতে চেয়েছেন,—কি হিসেবে বাছাই করা?

তাদের কীর্তি ধরে বাছাই-করা!—গানাদোর গলাটা একটু যেন তীব্র মনে হয়েছে,—এ-দেশের নিরীহ অসহায় স্ত্রী-পুরুষের ওপর সবচেয়ে অন্যায় অত্যাচার যারা করেছে, শুধু তাদের কয়েকজনকেই যেন ভুতুড়ে সওয়ার বেছে নিয়ে শাস্তি দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে।

তুমি ত' তাহলে এ-দেশের লোকের অন্ধ কুসংস্কারেই সায় দিচ্ছ?—গানাদোর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছেন দে সটো।

কোন অন্ধ কুসংস্কার?—জিজ্ঞাসা করে যেন সরলভাবেই মন্তব্য করেছেন গানাদো,—এদের অন্ধ কুসংস্কারের ত' অন্ত নেই।

এদের পুরাকালের দেবতা ভীরাকোচা সম্বন্ধে এরা যা বলছে, সেই অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলছি।—দে সটো ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—ভীরাকোচাই এদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে নেমেছেন বলে এদের ধারণা। তুমি তা বিশ্বাস করো?

বিশ্বাস ঠিক করি না, কিন্তু অবিশ্বাসও যা পুরোপুরি করতে পারছি কই!—গানাদো ধরাছোঁয়া না দিয়ে বলেছেন,—দেবতারা কখন কিভাবে দেখা দেন কেউ কি জানে!

এ-দেশের দেবতাও তাহলে তুমি মানো!—সাদাসিধে মানুষ দে সটোর গলাতেও একটু তিক্ত বিদ্রূপের সুর শোনা গেছে,—তুমি যে জাতে খিতানো, সেটাই আমি ভুলে গিয়ে-ছিলাম।

হ্যাঁ কাপিতান, আমি যে আসলে বেদে, সেটা আমাকেও ভুলতে দেবেন না।—বলে গানাদো একটু অদ্ভুতভাবে হেসে চলে যাচ্ছিলেন কিন্তু 'দাঁড়াও' বলে দে সটো তাঁকে থামিয়েছেন।

তারপর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—আচ্ছা, সন্ধ্যার পর ক'দিন তোমায় খুঁজে পাইনি কেন বলো ত'? তুমি-ই ত' বলেছ সন্ধ্যের পর এখন কেউ লুট করে, কেউ লুকোয়! তুমি নিজে কি করেছ? লুটের বান্দায় বেরিয়েছ, না লুকিয়েছ?

দুটোর কোনটাই করিনি কাপিতান!—একটু হেসে বলেছেন গানাদো।

তাহলে?—সন্দিগ্ধভাবে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন দে সটো।

পাছে ভেঙে যায় ভয়ে একটা স্বপ্নকে আমি পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়েছি কাপি-তান। আর সেই পাহারা দিতে গিয়ে ভীরাকোচা সত্যি কোথায় নামতে পারেন সন্ধান নিয়েছি তারও।

হতভম্ব দে সটোর এরপর অনেক কিছুই হয়ত বলবার ছিল। কিন্তু সে-সুযোগ হয়নি। ঐটুকু হেঁয়ালিটুকু ছেড়েই গানাদো সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

অঘটন যখন ঘটে এমনভাবে হঠাৎই ঘটে। বলে কয়ে নোটিশ দিয়ে ওসব ঘটে না। এপ্রিলের প্রথম দিকের দিনগুলি কী অঘটন ঘটিয়েছে তা আপনি, ভাই, ঠাহর করতে পারেন নি।

ভীতিপ্রদ নয়, রীতিমত চমকপ্রদ এই অঘটন। প্রীতিপ্রদ সেদিনটি হল বৃহস্পতি-বার, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬৮। বৃহস্পতিবার তো নয়, যেন রাঙা বেস্পতিবার।

কাকপক্ষী জানবার আগে মহানগরীর আবহাওয়াবিদেরা এই অঘটন একেবারে একস্-রে করে ফেললেন।

খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এই রাঙা বেস্পতিবারের সকালে তা হঠাৎ সতের পয়েন্ট আট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে এল। (আবার সেই কাগজের কথা ব্যবহার করছি) স্বাভাবিকের তুলনায় ছ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে।

এক বছর আগে এই দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল বাইশ পয়েন্ট নয় ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—স্বাভাবিক থেকে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। ফারাক ছ' ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেডের—বুঝুন ব্যাপারটা।

খবরের কাগজ পড়ে এমন বিপ্লবাত্মক অঘটন অবশ্য ধরা যাবে না। আসল কথা হল শতবর্ষের আবহাওয়ার ইতিহাসে এমন ঠান্ডা এপ্রিল আর আসেনি বললেই চলে। আটত্রিশ বছরের মধ্যে এ বছরের ৪ঠা এপ্রিলই এপ্রিল মাসের শীতল-তম দিন। বিশ্বাস করুন, মৌলালীতে একদল ফুটপাথবাসিন্দাকে সেই গরমের রাত্রে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আগুন পোহাতে দেখা গেছে!

আটত্রিশ বছর আগে, ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমে যায়—সতের পয়েন্ট এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। আরও তিরিশ বছর আগে, ১৯০৫ সালে তাপমাত্রা আরও কমে যায়। সেই ষোল পয়েন্ট এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। শত বছরে সেটাই হল শীতলতম এপ্রিল।

ব্যাপারটাকে দয়া করে অমন সহজভাবে দেখবেন না। দরজা জানলা বন্ধ করা ঘরে ভরদুপুরে কোনমতে ভিজে গামছা গায়ে জড়ানো যে গিন্নিবান্নির দল বনবন করে ঘোরা পাখার নিচে ঠান্ডা মেঝেয় গড়াগড়ি খান, তাঁরাও এবার রাত্রে পাখা খোলেন নি, কাচ্চাবাচ্চাদের কিছুতেই খালি গায়ে শুতে দেননি। লেপকাঁথা কম্বল না হোক, গায়ের উপর একটা চাদর না চাপিয়ে কেউ ঘুমোন নি। দিনের বেলাতেও অনেক বাড়িতে পাখা চলে নি, চললেও যিনিই শুয়েছেন, গায়ের উপর কিছু চাপিয়েছেন।

হঠাৎ গোটা শহরটাই যেন এয়ারকন্ডি-শনড হয়ে গেল। মৃতব্যক্তির পুনর্জন্মলাভের মত "অঘটন আজও ঘটে" ধরনের এমন ব্যাপারের স্বাদ আগে কবার পেয়েছেন? (দুঃখের কথা, আবহাওয়াবিদেরা বলছেন কলকাতার কপালে অত ভাল আর বেশিদিন সইবে না। একদিন ঘুম ভেঙে দেখবেন, কলকাতা আবার সেই কলকাতায় ফিরে এসেছে।)

এই নতুন এপ্রিলের সন্ধ্যাগুলোয় গিন্নিরা সন্ধ্যেবেলায় হয়তো স্নান করছেন ঠিকই, কিন্তু কর্তাদের মধ্যে যাঁরা রাত্তির করে বাড়ি ফেরেন, তাঁরা শাওয়ারের নিচে প্রাণখুলে দাঁড়াতে ঠিক সাহস পাচ্ছেন না। সাত-সকালে যে বৃদ্ধবাহিনী প্রভাতী বায়ু সেবনে বার হন, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, তাদের অনেকের গায়ের চাদরের নিচে সোয়েটার উঁকি দিচ্ছে।

কিন্তু সম্বৎসর গরমকালের দিকে হা-পিত্যেশ করে যাঁরা চেয়ে থাকেন, তাঁরা ওসব অঘটনের তোয়াক্কা করেন না। গরমের দিনগুলোতে ঠান্ডাপানি বিক্রি করা যাঁদের পেশা তাঁরা আয়োজনের ত্রুটি করেন নি। (জনৈক শরবতওয়ালা বলছেন, বৃষ্টি নামলেই আমাদের চোখে জল নামে।)

কোল্ডড্রিংকের কোম্পানিগুলো প্রতি-দিন গড়ে পাঁচ লাখ বোতল মিষ্টি জল ছাড়ছেন—সংগে সংগে কলকাতা সে-জল গিলে ফেলছে। লেমনেড, আইসক্রিম, সুইটওয়াটার, পাইন আপল, ম্যাংগো, ভিটো, ভিনো, কোকাকোলা, অরেঞ্জ—সব। নানান রঙে রঙীন রকমারী সব পানীয় গলুধাদেশের আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে!

দামটা এবার কিছু চড়াই, চল্লিশ পয়সা থেকে শুরু। দামের পরোয়া কলকাতা থোড়াই করে। দাম যত বাড়ছে বিক্রিও তত বাড়ছে। এর নামই কলকাতা!

শরবত আর লস্যির কিন্তু সে কদর আর নেই। হালফিলের বাবুরাও বিকেলে গিলেকরা ফুলকাটা লখনৌ পাঞ্জাবি পরেন। তাই বলে কোথায়ও দু দন্ড বসে ধীরে-সুস্থে কিছু গলায় ঢালবার ফুরসত কই তাঁদের? ফলে কলেজ স্কোয়ার এলাকাকে কানা করে দিয়ে ইতিহাসের পাতা থেকে একটা সরবতের দোকান উঠে গেছে।

কিন্তু কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের সেই বিচক্ষণ শরবত-বিক্রেতা চাওয়ামাত্রই যিনি গ্লাসভর্তি রকমারী শরবত এগিয়ে দেন, তাঁর দোকানের সামনে রোদ্দুরের মধ্যেও ঠিকই সারাক্ষণ লাইন পড়ছে।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ডাবপট্টিতে এবছরও প্রতিদিন সকালে লাখখানেক ডাব আসছে। সারাদিন সেখানে চলছে ডাব-ওয়ালার মুন্সিয়ানা প্রদর্শন। বাঁহাতের উপর রেখে একটার পর একটা ডাব ডানহাতের দা দিয়ে তিনি কেটে চলেছেন। এ যেন সেই 'ধরছে আর কাটছে'। কুড়ি পয়সার ডাবও একটা করে স্ট্র! বিক্রিও হচ্ছে এন্তার!

অপেক্ষাকৃত ঠান্ডার বাজারে কোল্ড কফি কিংবা কোল্ড বিয়ার ঠিকমত কাটছে না, তবে কাচ্চাবাচ্চা আর মেয়েমহল আইস-ক্রিমের বাজার সরগরম করে রেখেছে।

ফ্যাসাদে পড়েছেন শুধু ভেজাল মিষ্টি-জলের কারবারীরা। চড়া চাহিদা না হলে ওদের কপাল খুলতে চায় না। তেমন গনু-গনে হয়ে গরমই পড়ল না, চাহিদা চড়বে কি করে?

মওকা যা কুড়োবার কুড়োচ্ছেন আকাশ-বাণী আর স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ। ও'দের শীত কাটবার নয়। শীতকালীন সময়তালিকা ও'রা মোক্ষমভাবেই আঁকড়ে ধরে আছেন। রাত এগারটা বাজার পর এখনও আর বাস পাবেন না, রেডিও চলবে না!

ভাববার কথা : ১৯৩০ এবং ১৯০৫ সালে এই বঙ্গদেশে অসহযোগ আর বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের জন্য দেশের আবহাওয়া যাই থাক না কেন, রাজনৈতিক আবহাওয়া তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৮ সালেও কি তেমন কিছু হবে? এবছরে আবার নির্বাচন!

—অ, চু

মার্টিন লুথার কিং

ভিয়েৎনাম থেকে মেম্ফিসে

প্রেসিডেন্ট জনসন

"আজ সেই দিন এসেছে যখন এই প্রাচুর্যের দেশে আমাদের বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।"

—গত ৩১ মার্চ তারিখে জাতির উদ্দেশে টেলিভিসন বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন জনসন এই কথাগুলি বলছিলেন। তিনি তাঁর দেশের মানুষকে শোনাচ্ছিলেন শান্তির কথা, যে শান্তি বিদেশে যুদ্ধরত তাঁর দেশের সন্তানদের ঘরে ফিরিয়ে আনবে, যে শান্তি একদিন দক্ষিণ ভিয়েতনামে রক্তপাত বন্ধ করবে, যে শান্তি "সেখানকার মানুষকে তাঁদের নিজেদের দেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন করতে দেবে।"

—এবং যে শান্তি "আমাদের নিজেদের ঘরের ভিতরকার কাজের দিকে আরও বেশী করে মনঃসংযোগ করতে দেবে।"

প্রেসিডেন্ট জনসনের এই বক্তৃতার পর এক সপ্তাহও কাটেনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিসি রাজ্যের মেম্ফিস শহরে উন্মাদ শ্বেতাঙ্গের গুলীতে মারা গেলেন আমেরিকার নিগ্রো আন্দোলনের মহান নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিং। ভিয়েতনামে শান্তির আলোচনা শুরু হওয়ার সুলক্ষণ যখন সবে দেখা যেতে আরম্ভ করল সেই সময়েই আমেরিকার শহরে শহরে আগুন জ্বলল, সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ক্ষোভ প্রচন্ড বিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়ল।

ইতিহাসের আশ্চর্য লিখন পর পর দুটি ঘটনায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কয়েক হাজার মাইল দূরে ভিয়েত-নামের ধানক্ষেতে আর জঙ্গলে, পাহাড়ে নয়, ঘরের অনেক কাছে দক্ষিণের বর্ণ-বিদ্বেষী রাজ্যগুলিতে, উত্তরের নিগ্রো বস্তীগুলিতেই অপেক্ষা করছে প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকার জন্য অনেক বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ। খে-সানে মার্কিন সৈন্যরা অবরোধ থেকে মুক্তি পেল; কিন্তু আততায়ীর হাতে শান্তিবাদী অহিংস নেতা কিং-এর মৃত্যু দেখিয়ে দিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের ভূমিতেই অন্ধ বর্ণ-বিদ্বেষের শক্তির দ্বারা অবরুদ্ধ।

ভিয়েতনামে যুদ্ধাবসানের জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনের উদ্যোগ আর মেম্ফিসে ৩৯ বছর বয়স্ক নোবেল শান্তি পুরস্কার-প্রাপ্ত নেতা মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যা—দুইই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবান, সবচেয়ে শক্তিশালী জাতির কাছে ঘরে ফেরার ডাক। সেই ডাক সারা পৃথিবী শুনেছে। এর পর পৃথিবী আর কখনও আগের মত হবে না।

মার্টিন লুথার কিং ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেইসব বিশিষ্ট নেতার একজন যাঁরা সে দেশের কর্ণধারদের স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, আমেরিকার ক্ষমতার ঔদ্ধত্য প্রকাশের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তার ঘরের ভিতরে স্বাধীনতার দুর্গে যে ফাটল দেখা দিয়েছে তা মেরামত না করে তার পক্ষে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে যাওয়া বিচক্ষণতার কাজ নয়।

গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে লস অ্যাঞ্জেলসে একটা বক্তৃতায় কিং বলেছিলেন, "ভিয়েতনামের রণক্ষেত্রে মহান সমাজের প্রতিশ্রুতিগুলি গুলীবিদ্ধ হয়েছে।" সেই বক্তৃতায় তিনি আরও বলেছিলেন, "আমরা নিজেদের ঘর গুছোতে পারি না অথচ অন্য দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশের ঔদ্ধত্য দেখাই। আমাদের অনেক সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য ভিয়েতনামের যুদ্ধের জন্য সানন্দে লক্ষ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করেন অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে ফেরত নিগ্রো সৈনিক যাতে একটি ভদ্রগোছের বাড়ী কিনতে পারেন সেজন্য যখন 'ফেয়ার হাউজিং বিল' আনা হয় তখন এইসব সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্যই আবার উচ্চকণ্ঠে সেই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। বিদেশের রণক্ষেত্রে মানুষ মারার জন্য আমরা নিগ্রো সৈনিককে

হাতিয়ার দিই অথচ তাঁদের আপন দক্ষিণী বাসভূমিতে তাঁদেরই আত্মীয়স্বজনকে লাঞ্ছনা ও হত্যা থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ কিছুই করি না।"

ডঃ কিং, সিনেটর ফুলব্রাইট, অধ্যাপক গলব্রেইথ প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের যে কথা বোঝাতে পারেন নি সেকথা আজ ঘটনার চাপে তাঁদের তা বুঝতে হচ্ছে। ভিয়েতনামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সকল অপ্রতিহত ক্ষমতা নিয়েও সর্বশক্তিমান নয়। একদিন আমেরিকা শুধু একটা হুমকি দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার মত শক্তিশালী দেশকে কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছে, বার্লিন থেকে তার অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। প্রচন্ড জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষার সামনে আমেরিকার লোকবল, ধনবল, তার অতুলনীয় সামরিক শক্তিও অনেকখানি পরিমাণে অসহায়। উত্তর অ্যাটলান্টিক চুক্তিসংস্থা ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকান ডলারের বিপদ তার নিজের দেশের অর্থনীতির নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে অন্য দেশগুলির আস্থার অভাব সূচিত করছে।

সর্বোপরি, গত বছরের গ্রীষ্মকালের দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিশন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছেন আজকের আমেরিকার সমাজদেহ কি ভয়ংকর ব্যাধি পুষে রেখেছে এবং সেই ব্যাধির নিরাময় করা কত কঠিন। কমিশন বলেছেন, "আমাদের মূল সিদ্ধান্ত হল : আমাদের দেশ দুটি সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, একটি কাল, একটি শাদা—পৃথক ও অ-সম।" কমিশন সাবধান করে দিয়েছেন যে, ব্যয়সাধ্য ও মৌলিক প্রতিকারের ব্যবস্থা অবিলম্বে আরম্ভ করা না হলে "আমেরিকার সমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হতেই থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটবে।"

ঘটনার এইসব চাপই আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ভিয়েতনামের যুদ্ধের আঁচ কমাবার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬তম প্রেসিডেণ্ট লিন্ডন বেইনস্ জনসন যে তাঁর নিজের ঘরের সমস্যাগুলি জানেন না তা নয়। আমেরিকায় বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য তিনি তাঁর আইনসভার মারফৎ যে পরিমাণ আইন অনুমোদন করিয়ে নিয়েছেন, দারিদ্র্য দূর করার কর্মসূচীতে যে পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডি তাঁর সদিচ্ছা সত্ত্বেও ততখানি পারেন নি। ভিয়েতনামের যুদ্ধ তিনি আরম্ভ করেন নি, আজ যে তিনি সেই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা পাচ্ছেন না তার জন্য তিনি দেশের মানুষের সহানুভূতি চান। তাই টেলিভিসনের পর্দার সামনে বসে তিনি চোখের জল ফেলে ঘোষণা করেছেন যে, প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তিনি আর নির্বাচনপ্রার্থী হবেন না এবং তাঁর মেয়াদের বাকী অংশটুকু তিনি ভিয়েতনামে শান্তি আনার জন্য ব্যয় করবেন।

প্রেসিডেণ্ট জনসনের ঘোষণায় দুটি আশাপ্রদ লক্ষণ ছিল। প্রথমটি হচ্ছে উত্তর ভিয়েতনামের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখার জন্য তিনি কোনরকম পূর্বশর্ত আরোপ করেন নি। এতদিন পর্যন্ত তিনি বলে এসেছেন, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণ বন্ধ করার আগে মার্কিন সরকারের হাতে এমন তথ্য থাকা চাই যাতে তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন যে, উত্তর ভিয়েতনাম এই বিরতির সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু ৩১ মার্চের ঘোষণায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শুধু বললেন, "আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আলাপ-আলোচনা চলার সময় হ্যানয় আমাদের সংযমের সুযোগ নেবে না।" দ্বিতীয় সুলক্ষণটি হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, সৈন্যমুক্ত অঞ্চলের উত্তরে কিছু অংশ ছাড়া উত্তর ভিয়েতনামের অন্য সর্বত্র বোমাবর্ষণ বন্ধ রাখার এই ব্যবস্থা ভিয়েতনামে যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের পথে প্রথম পদক্ষেপ।

একথা ঠিক যে, প্রেসিডেণ্ট জনসনের এই ঘোষণার প্রথম প্রতিক্রিয়া ভাল হয় নি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এটা লক্ষ্য করা হয়েছে যে, এই ঘোষণার পরও উত্তর ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত, এমন কি জনবহুল শহরেও মার্কিন বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। এর ফলে আমেরিকার ঘোষণার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। চীন বলেছে, এই ঘোষণা একটা "জালিয়াতি মাত্র", সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বলেছেন যে, একমাত্র ভিয়েতনামের জনগণের উপর আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কারামা যুদ্ধে নিহত তিনজন ইস্রায়েলী সৈন্যের মৃতদেহের পরিবর্তে বারোজন জর্ডনী সৈনিক জর্ডন-ইস্রায়েল সীমান্তে অ্যালেনবি সেতুর কাছে জর্ডন কর্তৃপক্ষের হাতে প্রত্যর্পণ করা হচ্ছে।

ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে পারে। এমন কি মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান জে ডবলিউ ফুলব্রাইট বলেছেন, "বোমাবর্ষণ বন্ধের কোন দাম নেই এবং এটা নিশ্চয়ই উত্তর ভিয়েতনামকে আলোচনার টেবিলে আসতে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।"

এইভাবে যখন প্রেসিডেণ্ট জনসনের ঘোষণা মাঠে মারা যাবার উপক্রম হচ্ছিল তখন হ্যানয় রেডিওর ঘোষণা। ভিয়েতনামে শান্তি আলোচনার আশা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। হ্যানয় রেডিওর এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, "উত্তর ভিয়েতনাম জানাচ্ছে যে, আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণ ও অন্যান্য সকল সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করে যাতে আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করতে পারে সেটা স্থির করার উদ্দেশ্যে উত্তর ভিয়েতনাম তার প্রতিনিধিদের পাঠাতে প্রস্তুত আছে।"

হ্যানয় রেডিওর এই ঘোষণার ফলে ভিয়েতনামে যুদ্ধ অবসানের প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এরই মধ্যে মেম্ফিসের হত্যাকাণ্ড এবং তার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলিতে দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠার ঘটনায় প্রেসিডেণ্ট জনসনের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামস্থিত মার্কিন সামরিক অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাঁর হনোলুলুতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দরুণ তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে।

পাঞ্জাবে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা?

পাঞ্জাবে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জনতা পার্টির মাত্র তিনজন সদস্য শ্রীলছমন সিং গিলের মন্ত্রিসভার বাইরে ছিলেন। এঁরা কংগ্রেসের টিকেটে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় গিয়েছিলেন। পরে এঁরা যুক্তফ্রন্টে চলে যান এবং তার পর যুক্তফ্রন্ট ত্যাগ করে শ্রীলছমন সিং গিলের নেতৃত্বে ও কংগ্রেসের সাহায্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটান। কংগ্রেসের সমর্থনের ভিত্তিতে শ্রী গিল যখন জনতা পার্টির মন্ত্রিসভা গঠন করেন তখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এই তিনজন দলত্যাগীকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া চলবে না। গত সপ্তাহে একদিন পাঞ্জাব বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীজ্ঞান সিং রাড়েওয়ালা ঘোষণা করলেন যে, ঐ তিনজন দলত্যাগীসহ মোট ১১ জন সদস্য তাঁর দলে যোগ দিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শ্রীরাড়েওয়ালা গিল মন্ত্রিসভার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে সরাসরি কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাইছেন। শ্রীরাড়েওয়ালা নিজেও সেকথা গোপন করলেন না। কেননা, নতুন এই ১১ জন সদস্য নিয়ে কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা দাঁড়াল ৬৪। পাঞ্জাব বিধানসভায় ভোটদাতা সদস্যের সংখ্যা হচ্ছে ১০২। অর্থাৎ এই ১১ জন সদস্য যদি সত্য সত্যই কংগ্রেস দলে এসে থাকেন তাহলে এই দলই এখন বিধানসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বিপদ বুঝে মুখ্যমন্ত্রী গিল দুটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন: (১) ঐ তিনজন দলত্যাগী সদস্যকে নিয়ে রাজ্যপাল ডঃ ডি সি পাভাতের দরবারে নিয়ে গিয়ে তাঁদের দিয়ে কবুল করিয়ে নিলেন যে, তাঁরা তখনও জনতা পার্টিতে আছেন। (২) রাজ্যপালকে পরামর্শ দিয়ে বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করিয়ে দিলেন।

বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আপাতত গিল মন্ত্রিসভা বাঁচল বটে; কিন্তু তার আয়ু আর কতদিন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বিরোধী যুক্তফ্রন্ট দল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেস দল রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। এদিকে, কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীরাড়েওয়ালাকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন এখন তাড়াহুড়া করে গিল মন্ত্রিসভাকে হটিয়ে দিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা না করেন। পাঞ্জাব বিধানসভার কংগ্রেস দলের ভিতরেও শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র প্রমুখ একদল সদস্য শ্রীরাড়েওয়ালার

এই চেষ্টার বিরোধিতা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী গিলও, শোনা যাচ্ছে, তাঁর মন্ত্রিসভাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য ঐ তিনজন দলত্যাগী সদস্যকে মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

এইসব টালমাটালের মধ্যে গিল মন্ত্রি-সভার আয়ু দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে, এটাই হচ্ছে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি সম্প্রতি কইম্বাটুরে একটি অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি সকাল সাড়ে নয়টায় একটি বাড়ীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন এবং ঐদিনই রাত্রি সাড়ে আটটায় ঐ বাড়ীর উদ্বোধন করেছেন। একটি শয়নকক্ষ, রান্নাঘর সমেত এই বাড়ী তৈরীর খরচ পড়েছে ১২০০ টাকা (জমির দাম বাদে)।

৭৫ বছর বয়সের শ্রী জি ডি নাইডুর নক্সা অনুযায়ী এই বাড়ী তৈরী হয়েছে। তিনি দাবী করেছেন যে, তিনি ১৪০০ টাকায় দিল্লীতে দুই কামরার বাড়ী তৈরী করে দিতে পারেন। তাঁর "আবিষ্কারের" তালিকায় আছে : ক্যানসারের ওষুধ বহুমূত্রের ওষুধ, পরিবার পরিকল্পনার সহায়ক ওষুধ ইত্যাদি। শ্রীনাইডু কখনও স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করেন নি।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

পূর্ব ইয়োরোপের সঙ্গে বাণিজ্য

পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে যেখানে ঐ দেশগুলিতে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল মাত্র ২১ কোটি টাকা, দশ বছর পর ১৯৬৬-৬৭ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৫৭ কোটি টাকায়। অর্থাৎ এই দশ বছরে পূর্ব ইয়োরোপে রপ্তানী বেড়েছে ১৩৬ কোটি টাকার।

এই সময়ের মধ্যে ভারতের মোট রপ্তানী বেড়েছে ২০০ কোটি টাকার, ৬০০ কোটি টাকা থেকে ৮০০ কোটি টাকা। এ থেকেই বোঝা যাবে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে পূর্ব ইয়োরোপ কত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চলেছে।

পূর্ব ইয়োরোপের সংগে বাণিজ্য প্রসারের ফলে ভারতের একটা মস্ত সুবিধা হয়েছে। কারখানায় তৈরী যেসব জিনিস-পত্র আগে পশ্চিমী দেশগুলি অনাগ্রহী থাকার দরুণ রপ্তানী করা সম্ভব হত না এখন সেগুলি রপ্তানী করা যাচ্ছে। পশ্চিমী দেশগুলি ভারত থেকে প্রধানত কাঁচা মালই নিতে আগ্রহশীল।

খাদ্যের উৎপাদন

কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৭-৬৮ সালে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সাড়ে নয় কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে। এত বেশী উৎপাদন আগে কখনো হয়নি।

অনুকূল আবহাওয়া এবং নূতন উৎপাদন কৌশল সম্পর্কে চাষীদের আগ্রহ এই দুটি বিষয়কে বর্তমান বছরে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬৬-৬৭ সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৫ লক্ষ টন। এর আগে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয়েছিল ১৯৬৪-৬৫ সালে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টন।

বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনও অন্যান্য বছরের তুলনায় ১৯৬৭-৬৮ সালে বেশী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পাঁচটি প্রধান তৈলবীজের উৎপাদন হয়ত ১৯৬৪-৬৫ সালের পর্যায়ে উঠবে। ১৯৬০-৬১ সালে ৬৪ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়েছিল। সেটাই ছিল রেকর্ড। ১৯৬৭-৬৮ সালেও তা-ই হবে বলে মনে হচ্ছে। তুলার উৎপাদন গত বছরের চাইতে বেশী হতে পারে। তবে চিনির উৎপাদন হয়ত গত বছরের মতো এবারও ৯৫ লক্ষ টনই থাকবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, চাষীদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর একটা নতুন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তারা এখন নিজেরাই ক্ষুদ্র সেচের জন্যে অর্থ বিনিয়োগ করছে। রাসায়নিক সার ও নতুন কলাকৌশল প্রয়োগের দিকে তারা ক্রমশ বেশী পরিমাণে ঝুঁকে পড়েছে। এই দিক লক্ষ্য রেখেই ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, সাড়ে ছয় লক্ষ টন ফসফেট সার এবং সাড়ে ৪ লক্ষ টন পটাশ ব্যবহারের লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ব্যবহৃত হয় ১০ লক্ষ ১৫ হাজার টন নাইট্রোজেন, ৪ লক্ষ টন ফসফেট সার এবং ২ লক্ষ টন পটাশ।

ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনায় কাজে বর্তমান বছরে জোর দেওয়া হয়েছে। দু লক্ষ পাকা কুয়ো খোঁড়া হয়েছে এবং ৪২ হাজার বেসরকারী টিউবওয়েল ও ফিল্টার পয়েন্ট, এক হাজার সরকারী টিউবওয়েল ও দু লক্ষ পাম্প সেট বসানো হয়েছে। এর ফলে জলসেচের সুযোগ ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার হেক্টর জমিতে বিস্তৃত হয়েছে।

একই সংগে অধিক ফলনক্ষম বীজের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমিতে অধিক ফলনক্ষম বীজ ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬৮-৬৯ সালে ৮৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে এই ধরনের বীজ ব্যবহার করা হবে।

খাদ্যের সরবরাহ

এদিকে কেন্দ্রীয় খাদ্য দপ্তরেরও বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে দেখানো হয়েছে যে, এ-বছর বাজারে চাল, গম, ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্যের যোগান সাধারণভাবে বেড়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশে যোগান গত বছরের তুলনায় কমেছে।

সরবরাহ সাধারণভাব বাড়লেও, রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে, ১৯৬৭ সালে খাদ্যশস্যের দাম আগের বছরের তুলনায় বেশী ছিল।

রিপোর্টে এই ইংগিতও দেওয়া হয়েছে যে, ১৯৬৮ সালের অক্টোবরের মধ্যে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

১৯৬৭ সালে মোট ৮৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। ১৯৬৬ সালে সে তুলনায় আমদানী করা হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। আভ্যন্তরীণ সংগ্রহও ১৯৬৬-৬৭ সালে ৪০ লক্ষ টনের বেশী হয়েছিল।

কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৬৭ সালে মোট ১ কোটি ৮ লক্ষ টন খাদ্য পাঠানো হয়েছিল। ১৯৬৬ সালের পাঠানো হয়েছিল ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে দেশে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার রেশন ও ন্যায্যমূল্যের দোকান ছিল। ১৯৬৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩৯ হাজার। আর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ রেশনিংয়ের আওতায় ছিল ৩ কোটি ৯০ লক্ষ লোক এবং ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ লোক ছিল আংশিক রেশনিংয়ের আওতায়। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী লোক কোন না কোন ভাবে রেশনিংয়ের আওতার আছে।

নব্য সাহিত্য

মুকুন্দবিহারী মিত্র

সাহিত্যে ন্যায় ও নীতির স্থান কি হওয়া উচিত, তা নিয়ে আবহমানকাল ধরে মতবিরোধ চলে আসছে। আধুনিককালে সে-বিরোধ তীব্রতর হয়ে উঠেছে—তার কারণ নীতিবোধ (শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়) এবং সেই সঙ্গে ন্যায়ের ধারণা এ-যুগে তীক্ষ্ণ বিচারের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষের বাস্তব জীবনে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে যাকে অবিসংবাদিত নীতি বলে মেনে নেওয়া হত এবং যার উপর ভিত্তি করে ন্যায়ের মাপকাঠি রচিত হত, আজ তা যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করতে লোকে নারাজ। মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করা নীতিবিরোধী এবং যারা তা করে, তাদের শাস্তি পাওয়াই ন্যায়সঙ্গত—নীতি ও ন্যায়ের এই ধারণা সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সব অবস্থাতেই স্বতঃসিদ্ধ বলে যেমন এখন লোকে স্বীকার করে নিতে চায় না, তেমনি সাহিত্যেও যা দুর্নীতি বা অন্যায় বলে এতদিন বিনা আপত্তিতে ধরে নেওয়া হত, এখন সে-সম্বন্ধেও প্রতিবাদের সুর চড়া হয়ে উঠেছে। যে বিষয়বস্তু বা প্রকাশভঙ্গী সাহিত্যে অচল ছিল, তাকে তার বঞ্চিত আসনে বসানো আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে যেন এঁদের বিশেষ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন কেন হয়েছে, তার কারণ যেমন বহুবিধ তেমনি জটিল। শুধু আমাদের দেশেই যে এই পরিবর্তনের স্রোত এসেছে তা নয়; সব দেশেই এই ঢেউ উঠেছে—এবং তা আমাদের অনেক আগে। বাইরে থেকে, বিশেষতঃ ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে, সেই ঢেউ এসে আমাদের সমাজ ও সাহিত্য-চিন্তাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। ইতিহাসের দিক দিয়ে গতানুগতিকতা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনশীল যুগধর্মেরই অভিব্যক্তি। সব দেশেই—বিশেষতঃ যে-সব দেশে সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য অপেক্ষাকৃত উন্নত রূপ নিয়েছে—দেখা যায় যে, দৃঢ়মূল বিশ্বাস এবং দ্বিধাগ্রস্ত সন্দেহ যেন পরস্পরকে অনুসরণ করে চলেছে। সাহিত্যে এর প্রকাশ বেশ সুস্পষ্ট। ইংল্যাণ্ডে ভিক্টোরিয় যুগের সাহিত্যের ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যেখানে সন্দেহের আঘাত লাগেনি। কিন্তু সেই যুগের শেষের দিকে এই বিশ্বাসের জগৎ ক্রমশ সরে যেতে লাগলো, অথচ তার জায়গায় কোনও নতুন বিশ্বাসের আলো ফুটে উঠল না। ফলে চিন্তারাজ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হলো—মানুষ তার নির্ভরতা হারিয়ে ফেললো। সমস্ত কিছুর উপর যেন একটা নিশ্চি জিজ্ঞাসার চিহ্ন জেগে উঠলো—যে-জিজ্ঞাসার উত্তর মিললো না, তবু তাকে মুছে ফেলতেও পারা গেল না। তারপর এলো মহাযুদ্ধ—একটা নয়, পঁচিশ বছরের মধ্যে দুটো। তার সঙ্গে নতুন সমাজ-দর্শন, রাশিয়ায় রাষ্ট্র-বিপ্লব ও চিন্তারাজ্যে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব। বিজ্ঞানের চমকপ্রদ নব নব আবিষ্কারও প্রচলিত বিশ্বাসের মূলকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলো। বিভিন্ন দিকের এই বিচিত্র আঘাতে আগেকার যুগের বিশ্বাসের সৌধে ক্রমাগত ফাটল ধরতে লাগলো এবং সাহিত্যে এই জীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বাস সৌধের রূপ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠলো।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পুরনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ এ-দেশের অনেক আগেই জেগে উঠেছিল অনেকগুলো কারণে। তার মধ্যে দুটো প্রধান কারণ হচ্ছে যুদ্ধের (প্রথম যুদ্ধের) প্রত্যক্ষ আঘাত ও-দেশের উপরই পড়েছিল এবং ও-দেশের চিন্তাধারা এ-দেশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত গতিশীল এবং নতুনকে সহজভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত। এই বিদ্রোহকে একরকম সর্বাত্মক বলা যায়, যেহেতু তা বিষয়বস্তু, রূপ, প্রকাশভঙ্গী—প্রায় সবদিক দিয়েই ফুটে

উঠতে থাকে। যে-সমস্ত বিষয় (বিশেষ করে যৌন-সম্পর্কীয়) আগে সাহিত্যে একরকম অপাংক্তেয় ছিল, তাদের যেন অভ্যর্থনা করে উচ্চাসনে বসাবার স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠলো; সাহিত্যের রূপও দ্রুত বদলে যেতে লাগলো। উপন্যাসে আখ্যায়িকাকে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রায় বিদায় দিয়ে চরিত্রগুলোকে (স্বল্প সংখ্যক) বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার মধ্যে ফেলে তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করাই রীতি হয়ে উঠলো। সুসংবদ্ধ ঘটনা-পরম্পরায় (যাকে 'প্লট' বলা হয়) ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের প্রকাশ বা বিকাশ ও একটা নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছানো নব্য উপন্যাসে নগণ্য হয়ে পড়লো। কবিতায় এই গঠন পরিবর্তন রূপ নিলো যা ছন্দ বলে প্রচলিত (ধ্বনির মিল, যতি ও নিয়মিত সময়-বিভক্তি) তার বিলুপ্তিতে আর বিষয়-বস্তুর পরিবর্তন ফুটে উঠলো—বক্তব্য বা 'আইডিয়ার' নির্বাসনে। এই নতুন সাহিত্য-স্রষ্টাদের যুক্তি হলো, যে-সাহিত্য বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন এবং যার অবস্থিতি কল্পনার উপর, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। জগতে যা-কিছু ঘটে—তা সুন্দর হোক, কুৎসিত হোক, প্রকাশ্য হোক, অপ্রকাশ্য হোক—সবই সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে এবং হওয়া উচিত। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যখন আমাদের বা প্রাচীনপন্থীদের অভীপ্সিত পথে না চলেও দুর্নীতিদুষ্ট হয় না অথবা সৌন্দর্য হারায় না, তখন সাহিত্যও কতকগুলো কৃত্রিম নিয়ম মেনে না চলে প্রকৃতির মত স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্যে যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাকে বিশৃঙ্খল, নীতিবিহীন বা অসুন্দর বলে গণ্য করা কেন হবে? কবিতায় গতানুগতিক ছন্দের বিরুদ্ধেও তাঁদের যুক্তি এই যে, ঐরকম শৃঙ্খলাবদ্ধ ছন্দ স্বাভাবিক নয়—মানুষেও নয়, প্রকৃতিতেও নয়; সুতরাং তা অস্বাভাবিক ও বর্জনীয়। আর বক্তব্য বা 'আইডিয়া'? তার প্রয়োজন কি? কবিতা তো কবির মনের কথা বা তার 'আইডিয়া' প্রকাশের বাহন নয়—এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ দেওয়া এবং কথায় ধ্বনির আঘাতে (ছন্দোবদ্ধ কথারও দরকার নেই) সেই আনন্দের তরঙ্গ পাঠকের মনে খুব ভালোভাবেই তোলা যায়।

নব্য সাহিত্যের এই নতুন রীতি বাঙলা সাহিত্যেও জেঁকে বসবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তবে সে চেষ্টা এখনও নব্য সাহিত্যিকদের রচনায় আশানুরূপ সাফল্য-লাভ করে উঠতে পারেনি। এখন স্থিরভাবে এই সাহিত্যের মূল্যায়নের সময় এসেছে। বিষয়বস্তু, রূপ ও প্রকাশভঙ্গীকে সমস্ত রকম বিধি থেকে মুক্ত করে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য, আর কাজ আনন্দ দেওয়া—এ-সম্বন্ধে নতুন ও পুরনোর মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। তবে সৌন্দর্য বলতে সত্যি কি বোঝায় আর তা সৃষ্টি করবার কোনও বাঁধাধরা পথ আছে কিনা তাই নিয়ে যত বিরোধ। সাহিত্যের সৌন্দর্য রসাভিষিক্ত, তার অনুভূতি সংবেদনশীল মনের সূক্ষ্ম উপলব্ধিতে। যাকে আমরা বাস্তব জীবনে অসুন্দর বা কুৎসিত বলে মনে করি সাহিত্যে তা অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে ফুটে উঠতে পারে এবং মনকে প্রকৃত আনন্দরসে সিক্ত করতে পারে। উদাহরণ অনেক দেওয়া যায়—যেমন, পথের ধারে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ভিখারী দেখলে সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে মন শিউরে ওঠে; কিন্তু নিপুণ শিল্পীর তুলিতে যখন সে রূপ নেয়, তখন সেই গলিত, বিকৃত কুষ্ঠরোগীই মনকে আনন্দে অভিভূত করে। যে ঘটনা বা দৃশ্যের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সৌন্দর্য বা আনন্দ কল্পনাও করা যায় না, সাহিত্যে তাই গভীর আনন্দের উৎস হতে পারে। কেন এমন হয়, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত আছে। এরিস্টট্‌ল বলেছেন (তাঁর বক্তব্য নাটক সম্বন্ধেই বিশেষ প্রযোজ্য) যাকে আমরা বাস্তব জীবনে পরিহার করে চলতে চাই, শিল্পের মাধ্যমে যখন তা-ই উপস্থিত হয়, তখন আমাদের মনে তার ওপর যে বিরুদ্ধ ভাব অবচেতন অবস্থায় রয়েছে, তা সক্রিয় হয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় এবং এই নিষ্ক্রমণের (catharsis) যে আনন্দ তাই শিল্প-রসাস্বাদনের আনন্দরূপে অনুভূত হয়। এরিস্টট্‌লের ব্যাখ্যা ঠিক হোক বা না হোক, এটা ঠিক যে, সত্যিকারের সৌন্দর্যানুভূতি বা রসাস্বাদনের জন্য মনের এমন একটা অবস্থার দরকার, যাতে যেটা ঘটছে বা যা দেখছি তার সঙ্গে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, এই বোধ মনের পট-ভূমিকায় অবচেতনভাবে উপস্থিত থাকে। কারণ যাই হোক বা সাহিত্য রসাস্বাদনের জন্য যে মানসিক অবস্থার প্রয়োজনই হোক, সৌন্দর্য-সৃষ্টি নির্ভর করে কিসের উপর—উপাদান না গঠননৈপুণ্য বা প্রকাশভঙ্গী? ম্যাথু আর্নল্ড-এর মতে উপাদান ও গঠন-নৈপুণ্য প্রকৃত সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ—High seriousness ও Architectonic এর অভাব যে সাহিত্যে, তার কোনও স্থায়ী মূল্য নেই। এ মতবাদ কতদূর যুক্তিযুক্ত তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। Architectonic অবশ্য প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে প্রয়োজন, কিন্তু উপাদানে (subject matter) high seriousness না থাকলে যে তা দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না—এ-কথা সম্ভবত সত্য নয়। এখানে বোধহয় আধুনিকেরাই ঠিক কথা বলেন। অ্যাথার ক্লিফর মতে Euclid -এর Fifth Theorem ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে এবং তিনি খুব মিথ্যা কথা বলেননি। সাহিত্যের সৌন্দর্য বা রস নির্ভর করে প্রধানত—বোধহয় সম্পূর্ণভাবে গঠন-নৈপুণ্য (architectonic) ও প্রকাশভঙ্গীর উপর। যে উপাদান অজ্ঞ শিল্পীর হাতে বামনের মূর্তি গ্রহণ করে, তাই আবার শক্তিমান প্রতিভার হাতে শিবের রূপ ধারণ করে।

এখন কথা হচ্ছে, এই গঠন আকারহীন (formless) হতে পারে কিনা—যেমন আধুনিক উপাখ্যান-বিবর্জিত (বা উপেক্ষিত) উপন্যাস ও ঐক্য-ধ্বনিহীন কবিতা। তাতে কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না, কারণ আকার যে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। ধরাবাঁধা আকারের ব্যতিক্রমকেই নতুন এক আকার বলে গ্রহণ করতে আপত্তি কি? এতে দৃঢ়-মূল সংস্কার হয়তো আঘাত পেতে পারে কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেলে বিরূপ ভাব আস্তে আস্তে কেটে যাবে। সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য হলো রসসৃষ্টি করা। সে-কাজে যে-কোনও উপাদান, যে-কোনও গঠন-প্রণালী ব্যবহারে আপত্তি হওয়া উচিত নয়, যদি সাহিত্যিক তাঁর মনের রসে সিক্ত করে নিপুণভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন—অর্থাৎ রূপ দিতে পারেন—যাতে সে-রস তাঁর সৃষ্ট রূপের মাধ্যমে পাঠকের চিত্তে গিয়ে পৌঁছায়। এখানে প্রচলিত নীতি বা ন্যায়ের কোনও স্থান নেই। যৌন বিষয় বা অনুরূপ অন্য কোনও বিষয় যাকে সামাজিক জীবনে নীতি-বিগর্হিত বলা হয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও তাকে দুর্নীতিদুষ্ট বলতে হবে, তারও কোনও কারণ নেই। বিবস্ত্র নারী বা পুরুষ সামাজিক নীতির বিচারে চরম কুরুচির পরিচায়ক। কিন্তু নগ্ন নারী ও পুরুষের প্রস্তরমূর্তি গ্রীক ভাস্কর্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি; তাতে নীতি-দুর্নীতির ধারণা অপূর্ব সৌন্দর্যের আলোয় বিলীন হয়ে যায়, আর রসানুভূতির আনন্দে সে-ধারণা অতি সঙ্গোপনেও মনে উঁকি দেবার সুযোগ পায় না। ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। বাস্তব জীবনের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সাহিত্যে অচল—সেখানে একমাত্র Poetic justice -এর স্থান, অন্য কোনও justice -এর নয়। তার অর্থ এই যে, এখানে ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর হত্যা বা 'রামায়ণে' ঊর্মিলার উপেক্ষা ন্যায় কি অন্যায় হয়েছে, তার বিচারের ভিত্তি হবে এই যে, সাহিত্যরস ও সৌন্দর্য-সৃষ্টির জন্য এর দরকার ছিল কিনা; যদি তা ছিল এবং ছিল যে তা অনস্বীকার্য—তবে নিশ্চয়ই সাহিত্যের দৃষ্টিতে তা ন্যায় বিচার (Poetic justice) হয়েছে—লৌকিক দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন। সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নের মাপকাঠিও সেই সনাতন মাপ-কাঠি—বিষয়বস্তু, গঠন, ন্যায় বা নীতির মানদণ্ড নয়, রস ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তার সফলতার পরিমাপ। সেই মাপকাঠিতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের কিছু কিছু এমন স্তরে যাতে খুশী হবার কোনও কারণ নেই। ধার-করা সাজ পরে ও পরের বুলি অনুকরণ করে কলরব সৃষ্টি হয়তো করা যেতে পারে, কিন্তু প্রাণের দীনতা ও শক্তির অভাবকে ঢাকা দেওয়া যায় না।

আরো জলদস্যু

অজিত চট্টোপাধ্যায়
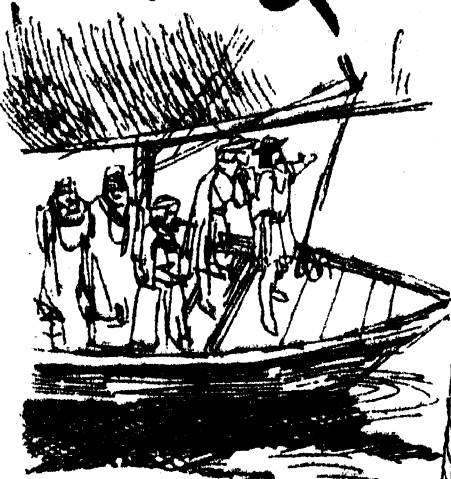
উত্তর আফ্রিকার দুর্দান্ত দস্যুকুল উৎখাত এবং নির্মূল হয়েছিল উনিশ শতকে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। তোলন বন্দর থেকে বিশাল এক নৌবাহিনী পাঠিয়েছিল ফরাসীরা। অভিযানের সঙ্গে সাঁইত্রিশ হাজার সৈন্য। অশ্বারোহী এবং স্থল গোলন্দাজ বাহিনী। মে মাসের শেষে রওনা হলেন অ্যাডমিরাল। প্রথম আক্রমণ অ্যালজিয়ার্সের উপর। এখানের ডে হলেন জলদস্যুদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং পালের গোদা। আলজিয়ার্সের মাটিতে সৈনা-বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া হল। সমস্ত শহরটি ঘিরে ধরল ফরাসী বাহিনী। মুররা সবকটি যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। দুর্গ অধিকৃত—বারুদ-ঘর সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডে'কে সপরিবারে বন্দী করে পাঠানো হল নেপলসে। আলজিয়ার্সের পর সৈন্যদল গেল টিউনিসে। ধীরে ধীরে সমস্ত অঞ্চলটি ফরাসী সম্রাটের অধিকার স্বীকার করে নিল। জলদস্যুর বিভীষিকা দূরে গেল ভূমধ্যসাগরের বুক থেকে।

কিন্তু এ তো উনিশ শতকের কথা। অথচ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকান কনসাল মিঃ ইটন টিউনিস থেকে গিয়েছিলেন আলজিয়ার্সে। উদ্দেশ্য ছিল ডে'কে চারটি আমেরিকান জাহাজ উপহার দেওয়া: আলজিয়ার্সের ডে এতে খুশী হবেন, এবং আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজগুলি জলদস্যু অধ্যুষিত ভূমধ্যসাগরের উত্তর আফ্রিকা উপকূলের নিকট দিয়ে কতকটা নির্ভয়ে যাতায়াত করবে। আলজিয়ার্সে পৌঁছে ইটন সাহেবের চক্ষু ছানাবড়া। ডে'র এত খাতির এবং প্রতিপত্তি তার জানা ছিল না। দুঃখ করে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সরকারের কাছে ইটন চিঠি লিখলেন,—"আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারেন যে এই জলদস্যু বর্বরকে ইউরোপের সাতজন রাজা, দুটি সাধারণতন্ত্র, নিয়মিত রাজকর জুগিয়ে চলে? অথচ এই লোকটার যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা দুটি পাঁচিশও নয়।" তবু পরের বৎসরই আলজিয়ার্সের ডে'র পাওনার ধাঁজ রীতিমত ভারী হয়ে উঠল। মোট পঞ্চাশ হাজার ডলার, আঠাশটি বন্দুক, দশ হাজার কামানের গোলা। এ ছাড়া বারুদ ইত্যাদি তো আছেই।

আলজিয়ার্সের ডে'র প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আর একটা কাহিনী বলা যেতে পারে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আলজিয়ার্সের ডে সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে দশটি কামান কিনলেন। এগুলি নিয়ে এসে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হল আলজিয়ার্সে। প্রথম কামানটিতে বারুদ দিয়ে অগ্নিসংযোগ করার সময় একটি দুর্ঘটনা হল। কামানটি ফেটে গিয়ে দুজন মুর গোলন্দাজ মৃত্যুবরণ করল। অনেকে আহত হল। দুর্ঘটনা অবশ্যই জলদস্যুদের অসাবধানতার ফল। তবু সুইডিশ কনসালকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হল। একজন জলদস্যুর নাক গিয়েছিল উড়ে। নাকের বদলে নরুন নয়—ডে দাবী করলেন পাঁচশত লিভার মুদ্রা। সাকুল্যে সুইডিশ সরকারকে সাত হাজার লিভার ক্ষতিপূরণ দিয়ে নাকে খত দিতে হল।

জলদস্যুদের বর্বরতা কিরূপ আকার ধারণ করত সে সম্বন্ধেও একটা কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে একটি ফরাসী অভিযান এল আলজিয়ার্সে। জলদস্যুদের এবং আলজিয়ার্সের ডে'কে উচিত শিক্ষা দিতে। ফরাসী জেনারেলের ইচ্ছে ছিল তোপের মুখে আলজিয়ার্স বন্দরটি উড়িয়ে দিতে। সর্বসমেত ছ' হাজার গোলা বর্ষণ করল ফরাসীরা, এবং আট হাজার লোক প্রাণ হারাল আক্রমণে। অসংখ্য বাড়ী ঘর ভেঙে পড়ল। আলজিয়ার্সের জনতা প্রায় ক্ষেপে উঠল। তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল শাসক ডে'র উপর। উন্মত্ত জনতার হাতে ডে মারা পড়লেন। এক জলদস্যু ক্যাপ্টেনকে জনগণ ডে'র শূন্য পদে বসাল। লোকটার নাম হাসান। হাসান রীতিমত ক্রূর এবং দুর্দান্ত জলদস্যু। প্রতিশোধ নিতে সে এক ফন্দী আঁটল। দূত মুখে খবর পাঠাল হাসান—যদি ফরাসী জেনারেল অবিলম্বে কামানের মুখ আলজিয়ার্সের দিক থেকে না তুলে নেন তবে আলজিয়ার্সের ডে পাল্টা ব্যবস্থা নেবে। অন্য কিছু নয়। আলজিয়ার্সের ফরাসীদের এক এক করে তোপের মুখে বসিয়ে গোলার সাহায্যে পাঠিয়ে দেবেন ফরাসী জেনারেলের জাহাজে। কি সাংঘাতিক ব্যবস্থা! হাসানের অবশ্য যা কথা তাই কাজ। প্রথম ধরে আনা হল ফরাসীদের এক পুরোহিতকে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক,—নাম জাঁ লো ভাসে। দুহাত বেঁধে ভদ্রলোককে বসান হল কামানের মুখে। তারপর গোলার সাহায্যে ছুঁড়ে দেওয়া হল ফরাসী জাহাজের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ফরাসী জেনারেল এতে দমলেন না। যতদিন বারুদ ছিল, গোলা-বর্ষণ বন্ধ করেনি ফরাসীরা। ফলে এক এক করে আরো অনেক ফরাসীকে প্রাণ দিতে হল কামানের মুখে। সর্বশেষ গেলেন আলজিয়ার্সের ফরাসী কন্সাল। প্যারিসের এক মিউজিয়ামে আলজিয়ার্সে পাওয়া একটি কামান রয়েছে। এটির মুখে বসিয়ে ফরাসী কন্সালকে গোলার সাহায্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল বলে দাবী করা হয়।

জলদস্যুদের অত্যাচার বেড়ে চলল। আলজিয়ার্সের ডে, টিউনিসের বে, ত্রিপলির শাসক, মাঝে মাঝে চুক্তি করেন। আবার চুক্তি ভাঙেন। এক শতাব্দীরও বেশী বাণিজ্য পঙ্গু হয়ে রইল। পণ্যবাহী জাহাজ শিকার হল জলদস্যুর হাতে। অর্থ গেল মানুষজন বন্দী হল ক্রীতদাসরূপে। জঘন্য দাসজীবন কাটাতে লাগল পৃথিবীর এক কোণে।

অবশেষে তরুণ এক রাষ্ট্র জলদস্যুদের উৎখাত করতে এগিয়ে এল। সমস্ত জনমত গঠিত হল জলদস্যু দমনের স্বপক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আদেশ দিল উপযুক্ত এক নৌবাহিনী প্রস্তুত করতে। কথাটা আলজিয়ার্সের ডে'র কানে গেল। একটু মোলায়েমসুরে ডে একটা প্রস্তাব পাঠালেন। —আহা! আমেরিকানরা মিছেমিছি এত রাগ করছে কেন? প্রেসিডেন্ট যদি অন্তু-শস্ত্র এবং বারুদভর্তি একটি ফ্রিগেট তাকে উপহার দেন তাহলে আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজের উপর আলজিয়ার্সের ডে আর হামলা করবেন না।' টিউনিসের বে'ও পিছিয়ে থাকবার পাত্র নন। তিনি লিখলেন যে, যদি গোটা চল্লিশ কামান এবং বেশ কিছু অস্ত্র-টস্ত্র তাকে না পাঠানো হয়, তবে শান্তি চুক্তি আর বেশিদিন পালন করা সম্ভব নয়। মরক্কোও দাবী জানাতে কসুর করল না। শুধু ত্রিপলির ইউসুফ আর চিঠিবাজী করলেন না। তিনি সরাসরি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন।

যুক্তরাষ্ট্র এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে এগিয়ে এল। কমোডর এডওয়ার্ড প্রিবলকে নতুন যুদ্ধজাহাজগুলি দিয়ে পাঠানো হল জিব্রাল্টারে। এদের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া এবং ভিক্সেন নামক দুটি জাহাজকে ত্রিপলি অবরোধ করতে প্রেরণ করা হল।

ফিলাডেলফিয়া জাহাজটি একটি জল-দস্যু জাহাজকে বন্দর ছেড়ে পালাতে দেখে তাড়া করে। দুর্ভাগ্যের কথা, জাহাজটি কম জলে চড়ায় আটকে যায়। নাবিকরা অনেক চেষ্টা করেও ফিলাডেলফিয়াকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট নৌকোয় জলদস্যুর দল এসে ঘিরে ধরল ফিলাডেল-ফিয়াকে। জাহাজের ক্যাপ্টেন রেইনব্রীজ দেখলেন, পরাজয় অনিবার্য। শুধু শুধু আমেরিকান সৈন্যক্ষয়। রেইনব্রিজ জাহাজের পতাকা নামিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলদস্যুর দল ফিলা-ডেলফিয়ার অধিকার গ্রহণ করল।

কথাটা গেল কমোডর প্রিবলের কানে। ফিলাডেলফিয়াকে উদ্ধার করে আনতে এক দক্ষ সেনাপতিকে নিযুক্ত করলেন তিনি। তরুণ সেনাপতির নাম স্টিফেন ডেকাটর। পাঁচজন অফিসার এবং মাত্র সত্তরজন সৈন্য নিয়ে ডেকাটর এক দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। ঝড়ে জলে বহু বাধা-বিপদ এড়িয়ে ডেকাটর ছোট্ট জাহাজটি নিয়ে এলেন ত্রিপলির কাছে। গাঢ় অন্ধকারে ত্রিপলি বন্দরে ঢুকে ডেকাটর দেখলেন, ফিলাডেলফিয়া জাহাজটি নোঙ্গর বাঁধা অবস্থায় অপেক্ষা করছে। দূরত্ব এক মাইলেরও কম। ধীরে ধীরে নিজের জাহাজটিকে ফিলাডেলফিয়ার কাছে নিয়ে এলেন ডেকাটর। ছোট্ট জাহাজটির ডেকে অল্প কয়েকজন আমেরিকান সৈন্য দাঁড়িয়ে। তাদের অঙ্গে মাল্টার লোকেদের পোশাক। মুর জলদস্যুরা বজ্রগর্জনে প্রশ্ন করল—তারা কে? কোথা থেকে আসছে? ডেকের নাবিকরা ত্রিপলির ভাষায় জবাব দিল যে, ঝড়ে তাদের নোঙ্গর খোয়া গেছে। কাজেই জাহাজটিকে তারা ফিলা-ডেলফিয়ার পাশে বেঁধে রাখতে চায়,—প্রয়োজন মত রাত্রে তারা যুদ্ধজাহাজটির ডেকের উপর উঠতে পারে।

মুর জলদস্যুরা সম্পূর্ণ প্রতারিত হল। হঠাৎ অপ্রস্তুত জলদস্যুদের চীৎকার শোনা গেল—আমেরিকান, আমেরিকান। কিন্তু ততক্ষণে ডেকের উপর উঠে ইয়াংকি সৈন্যরা লড়াই শুরু করে দিয়েছে। দশ মিনিটের মধ্যে ডেকাটর ফিলাডেলফিয়ার দখল পেলেন। ত্রিপলি ছেড়ে অন্ধকারে ভেসে চলল ফিলাডেলফিয়া। কিন্তু ততক্ষণে বন্দর থেকে তাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হয়েছে। ডেকাটরের কপাল ভালো। ফুর-ফুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল অনুকূলে। ডেকাটর গোলার পাল্লার বহু দূরে চলে গেলেন অল্প সময়ের মধ্যে।

পরের বৎসর কমোডর প্রিবল ত্রিপলি আক্রমণ করে বসলেন। পর্যুদস্ত জলদস্যুর দল চুক্তি করতে বাধ্য হল। আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজের উপর তারা আর হামলা করবে না। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ত্রিপলির ইউসুফ চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

আলজিয়ার্সের ডে হঠাৎ আদেশ দিয়ে বসলেন যে, ব্রিটিশ আশ্রিত বোনা এবং ওরানের সমস্ত ইতালীয়কে বন্দী করা হোক। কিন্তু রাজা আদেশ দিলেন ধরে আনতে, তো সেনাপতি বেঁধে আনে। ব্যাপারটা তাই হলো। বোনা এবং ওরানের শতাধিক ইতালীয়কে কচুকাটা করল মুররা। আরো একশত ব্যক্তি আহত হল এবং আটশত ইতালীয়কে বন্দী করে কারা-গারে পাঠান হল।

এবার ইংল্যাণ্ড এবং ডাচদের একটি সম্মিলিত নৌবাহিনী এল আলজিয়ার্সে। আগস্ট মাসের শেষদিকে এই নৌবাহিনী আলজিয়ার্স বন্দরের কাছে এসে দাঁড়াল। লর্ড এক্সমাউথ দাবী জানালেন যে, অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। না হলে আলজিয়ার্সের উপর তিনি আক্রমণ শুরু করবেন কিন্তু ডে নীরব। এই হুমকি তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

লর্ড এক্সমাউথ গোলাবর্ষণের আদেশ দিলেন। বিকেল তিনটে থেকে শুরু করে রাত্রি দশটা পর্যন্ত একটানা গোলাবর্ষণ করল ইউরোপীয়ানরা। যখন গোলাবর্ষণ বন্ধ হল, তখন বন্দরের অনেক জাহাজ সমুদ্রতীরের ঘরবাড়ী আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলছে।

পরদিন আলজিয়ার্সের ডে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। বন্দীরা মুক্তি পেল তার আদেশে এবং সর্বসমক্ষে শাসক ডে ব্রিটিশ কন্সাল মিঃ ম্যাকডোনেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। মাত্র কিছুদিন আগে এই ভদ্র-লোককে ডে বন্দী করে শৃংখলিত অর্ধনগ্ন অবস্থায় কারাগারে পাঠিয়েছিলেন।

কিন্তু ডে'র উপর আলজিয়ার্সের লোকেরা আর আস্থা রাখে নি। গলা টিপে ডে'কে তার অকর্মণ্যতার জন্য হত্যা করা হল। নতুন ডে হলেন আলী খোজা। এই লোকটি নাকি সাহিত্যের অনুরাগী,—কিন্তু আসলে পূর্বের সেই ডে'র চেয়ে অনেক বেশী শয়তান। নতুন ডে'র সঙ্গে বিদেশী কন্সালরা যখন প্রথম দেখা করলেন, আলী খোজা তখন বহুমূল্য পোশাকে সজ্জিত হয়ে মনোযোগসহকারে একটি পুস্তকের দিকে চেয়েছিলেন।

আলী খোজা শুধু সাহিত্যের অনু-রাগী নন। সুন্দরী রমণীর এক অনুরাগী ভ্রমরও। লর্ড এক্সমাউথের এই আক্রমণের

পর ডে'র হারেমে শাদা চামড়ার সুন্দরী মেয়ে পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। নতুন ডে আলী খোজা নিত্যনতুন সুন্দরী রমণী-পদেপর ঘ্রাণ না পেয়ে বুভুক্ষু বাঘের মত মরীয়া হয়ে উঠলেন।

ইংরেজ সৈন্যরা চলে যাবার পর সমুদ্রে লুঠপাট আবার শুরু হয়েছিল। কিন্তু লুঠপাট করে অর্থসম্পদ মেলে। সুন্দরী শাদা চামড়ার মেয়ে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। উপায়ান্তর না দেখে আলী খোজা নতুন পথ ধরলেন। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

রোসা পোনসোমবিও নামক একটি সার্ডিনিয়ার মেয়ে ভারী সুন্দরী। মেয়েটির বিয়ের ঠিকঠাক। একদিন সন্ধ্যায় সে তার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল ফরাসী কন্সালের অফিসে। ফেরবার সময় কে বা কারা তাকে অতর্কিতে দেহের উপর কাপড় ফেলে ধরে নিয়ে আসে। রোসা পরদিন দেখল সে রয়েছে আলী খোজার হারেমে। তাকে ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করা হল। ইউরোপীয় পোশাকের বদলে সে মুসলমানী বেশ ধারণ করতে বাধ্য হল।

রোসা পোনসোমবিও নিজের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সে জানত তার জীবন কাটবে এই হারেমে। আলী খোজার শয্যা-সঙ্গিনী হওয়াই তার একমাত্র কাজ হবে। তবু সুযোগ পেয়ে রোসা একদিন ব্রিটিশ কন্সালকে উদ্দেশ করে একটি চিঠি লিখল। চিঠিটি সে ছুঁড়ে দিয়েছিল হারেমের প্রাচীরের বাইরে। ভাগ্যক্রমে সেটি ঠিক জায়গায় পৌঁছল। ব্রিটিশ কন্সাল সভায় পড়লেন রোসার লেখা সেই চিঠি-খানি। চিঠি তো নয়,—এ রোসার সাবধান-বাণী। তার ভাগ্যে যা ঘটেছে তা মুছবার নয়। তবে ব্রিটিশ কন্সালকে সাবধান থাকতে উপদেশ দিয়েছে রোসা। তার মেয়ের দিকে নজর রয়েছে আলী খোজার। শুধু তার নয়। ডাচ কন্সাল এবং স্পেনের কন্সালের মেয়ে দুটির উপরও ভারী লোভ আলী খোজার। শাদা চামড়ার মেয়েদের উপর অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে এই বর্বর দস্যুটা।

রোসার কথা যে ঠিক তা প্রমাণিত হতে দেরী হয় নি। ডে'র মৃত্যুর পর তার একটা রোজনামচা বা আত্মকথা পাওয়া গিয়েছিল। ডে সেখানে লিখেছেন এক স্থানে।...মিঃ ম্যাকডোনেলের মেয়েটা বেশ ডবকা এবং খুবসুরত। ওকে আমার হারেমের জন্য চাই। স্পেনের কন্সালের মেয়েটা তত সুন্দরী নয়। ও থাকবে আমার পেয়ারীর সখী হয়ে। বিদেশী কনসালরা যদি প্রতিবাদ করে, তাহলে আমি তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করব।

শ্রীমতী রোসা পোনসোমবিওর পরি-ণতি কিন্তু খুব দুঃখজনক। অনেকে চেষ্টা করেছিলেন হারেমে বন্দী এই সুন্দরী এই শ্বেতাঙ্গ রমণীকে উদ্ধার করে আনতে। স্যর সিডনী স্মিথ এবং একজন ফরাসী মন্ত্রী মঁসিয়ে রিশেলিউয়ের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

আরো অনেক রমণীর সঙ্গে আলী খোজাকে সন্তুষ্ট করতে হয়েছিল রোসাকে। রাতের পর রাত এই কুৎসিত হারেমের জীবন পৌনঃপুনিক দশমিক অঙ্কের মত বার বার নেমে এসেছে। এর হাত থেকে যেন মুক্তি নেই।

না, মুক্তি এসেছিল। প্লেগ এসে মুক্তি দিয়েছিল তাকে। হারেমে অনেকে মারা পড়েছিল প্লেগে। রোসা পোনসোমবিও তাদেরই একজন।

আফ্রিকার উত্তর উপকূলের কথা বাদ দিলে, পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুর উপদ্রব প্রায় ছিল না বললেই চলে। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে বাণিজ্য জাহাজগুলি বেশ নিরাপদেই পর্তুগাল এবং পূর্ব দেশ-গুলির মধ্যে যাতায়াত করত। পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুর উৎপাত শুরু হল আঠার শতকের শেষদিকে। সম্ভবত উত্তর আফ্রিকার জলদস্যু অধ্যুষিত উপকূলের লোকেরা উপর্যুপরি আক্রমণে ওখানে আর সুবিধে করে উঠতে পারছিল না। জল-দস্যুদের মধ্যে উৎসাহী কেউ কেউ, তাই কর্মভূমি পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। আঠার শতকে তারাই এল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে যেসব জলদস্যুর নাম আতংক এবং ত্রাসের সঞ্চার করেছে তাদের মধ্যে বেনিটো ডে সোটোর নাম অন্যতম। ডে সোটো উনিশ শতকে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন এক পর্তুগীজ জাহাজের মেট। জাহাজটি বুয়েনস এরিস থেকে ফিরছিল গিনি উপ-কূলে। তখন নভেম্বর, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ। দক্ষিণ আমেরিকায় জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জনচল্লিশ লোক নিতে হয়েছিল। ক্যাপ্টেন জানতেন না এদের মধ্যে অনেকেই ছিল পলাতক জলদস্যু। বেনিটো ডে সোটো এদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। অভিসন্ধি বুঝে এক চক্রান্তের জাল পাতলেন তিনি। জানুয়ারী মাসে জাহাজ এল গিনির উপ-কূলে,— মিনা নামক একটা জায়গায় এসে নোঙর করল। জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং অন্যান্য অনেকে তীরে গিয়েছেন। বেনিটো ডে সোটো এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করে সঙ্গীদের সাহায্যে জাহাজটি দখল করে বসলেন তিনি। গিনির উপকূল ত্যাগ করে জাহাজটি ভেসে চলল। এখন তার নতুন নাম—ব্ল্যাক যোক।

বেনিটোর নাম ছড়িয়ে পড়ল মর্নিং-স্টার নামক জাহাজটি শিকারের পর। এটি ফিরছিল সিংহল থেকে ইংলণ্ডে। ডে সোটো জাহাজটি দখল করলেন। ক্যাপ্টেন সাউলেকে গুলী করে মারা হল এবং জাহাজের প্রত্যেককে হত্যা করবার আদেশ দিলেন বেনিটো। জলদস্যুর আদেশ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় নি। কারণ যারা জাহাজের খোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, উন্মত্ত জলদস্যুর দল তাদের আর খুঁজে বের করতে অগ্রসর হয় নি।

মর্নিং স্টার সম্পূর্ণ লুণ্ঠিত হল। অর্থসম্পদ, খাদ্যদ্রব্য যা কিছু ছিল সব তোলা হল ব্ল্যাক যোকে। এবার জাহাজের পাঠাতেন ছিদ্র করে জাহাজটিকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করল জল-দস্যুরা। ভগ্ন মাস্তুল অবস্থায় মর্নিং স্টার সমুদ্রের শীতল তলদেশে যাওয়ার পূর্বের মুহূর্তগুলি গুনতে শুরু করল।

ধীরে ধীরে ব্ল্যাক যোক জাহাজটি মিলিয়ে গেল দিকচক্রবালে। মর্নিং স্টারে যারা লুকিয়ে ছিল, এবার তারা বেরিয়ে এল। অল্প কয়েকজন পুরুষ এবং অনেক-গুলি মেয়ে। মেয়েদের একটা কেবিনে বন্ধ করে রেখেছিল বেনিটো। মর্নিং স্টার তখন ডুবতে শুরু করেছে। অমানুষিক পরিশ্রম করল জাহাজের অবশিষ্টরা। পাম্প করে জল বের করে কোনো মতে টিকিয়ে রাখা হয়েছে জাহাজকে। কিন্তু ঈশ্বর টিকিয়ে রাখলে মারে কে? পরদিন সকালে আর একটি ব্রিটিশ জাহাজ মর্নিং স্টারকে দেখতে পায় এবং যাত্রীদের উদ্ধার করে।

বেনিটো ডি সোটো ধরা পড়েছিল ক্যাডিজ বন্দরে। লুঠের মাল এত বেশী জমেছিল যে একটা বন্দরে গিয়ে সেগুলিকে বিক্রী করা ছাড়া উপায় ছিল না। ক্যাডিজে গিয়ে বন্দরের অফিসারদের একটা বানানো গল্প বলল জলদস্যুরা। তারা সৎ ব্যবসায়ী। ঝড়ের মুখে পড়ে জাহাজের ক্যাপ্টেন মারা গিয়েছেন। ঝঞ্ঝাতাড়িত হয়ে তারা এসেছে ক্যাডিজ বন্দরে। এখন অনুমতি পেলে জাহাজের মালপত্র বেচাকেনা করতে পারে।

বন্দরের অফিসাররা অনুমতি দিলেন। বেনিটোর ভাগ্য ভালো। একটা ভালো খরিদ্দারও জুটে গেল। জাহাজের সব মালই সে কিনে নেবে। হাজার দুই ডলার দিতে রাজী। মুস্কিল হল মাল বুঝিয়ে দেবার সময়। বেনিটো এবং অন্য জলদস্যুরা যা বলেছিল জাহাজের মালের সংগে তার ঠিক মিল নেই। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বেনিটো ডে সোটোকে নিয়ে আসা হল থানায়।

গভর্ণর স্যর জর্জ ডন বেনিটোকে প্রাণদণ্ড দিলেন।

ডে সোটো ফাঁসির দিন মঞ্চের উপর উঠে নিজেই মাথা বাড়িয়ে দিয়েছিল দড়ির ফাঁসের মধ্যে। চাকা ঘোরানো হচ্ছে দেখে সে চীৎকার করে বলল—'বিদায় বিদায়। প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি।'

বাহামা দ্বীপপুঞ্জ এবং মাদাগাস্কারে জলদস্যুর দুটি সুন্দর আড্ডা গড়ে উঠেছিল। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন উডস রজার্স একটি সাফল্যমণ্ডিত অভিযানে কুখ্যাত বাহামা জলদস্যুদের সমূলে উৎখাত করেন। অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ পেয়েছিল সম্রাটের ক্ষমা। কিছু-সংখ্যক জলদস্যু পালিয়ে এসেছিল মাদাগাস্কারে।
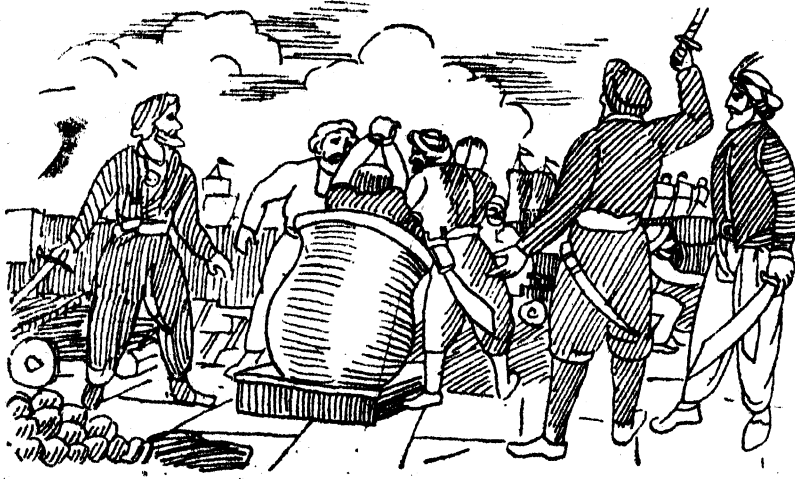
দুহাত বেঁধে ভদ্রলোককে বসান হোল কামানের মুখে

বন্দরের অফিসাররা ছজন জলদস্যুকে বন্দী করলেন। ডি সেটো এবং অন্য একজন জলদস্যু পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

ডি সেটো আশ্রয় নিলেন জিব্রাল্টারে। একটা হোটেলে বেশ আমিরীচালে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। জমকালো পোশাক,—মাথায় শাদা টুপি। পরনে সিল্কের মোজা এবং নীল রংয়ের ফ্যাশান কোট। একমাথা কোঁকড়ান কালো চুল ছিল বেনিটোর। পথ দিয়ে হেঁটে গেলে একটা কেউকেটার মত মনে হত তাকে।

প্রথম সন্দেহ হল হোটেলের ঝিটার। সে আসত ডে সেটোর ঘর পরিষ্কার করতে। বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিতে। ঝি দেখল বালিশের নীচে কেমন অদ্ভুত একটা ছোরা রাখে লোকটা। ঝি গিয়ে হোটেলের ম্যানেজারকে বলল। ম্যানেজার খবর দিল পুলিশকে। পুলিশ এসে ট্রাংক তল্লাসী করে নানা বস্তু বের করল। মর্নিং স্টার জাহাজের এক আরোহীর পোশাক। ক্যাপ্টেন সাউজের লেখা একটা ডায়েরীবই।

বছর তিনেক পরে মাদাগাস্কারেও অভিযান পাঠানো হল। কমোডর ম্যাথুসের নেতৃত্বে। ম্যাথুস লোকটা দুঃসাহসী নাবিক। কিন্তু ঐ পর্যন্তই,—তার সাধারণ জ্ঞান ছিল কম। ভালো কথাবার্তা বলতে পারত না এবং পৃথিবীর সম্বন্ধে পুরো-পুরি ধারণা তার মনে গড়ে ওঠে নি। এছাড়াও ম্যাথুস ছিল অসভ্য এবং অসৎ।

মাদাগাস্কারে এসে ম্যাথুস থামলেন কিন্তু জলদস্যুরা কই? বিরক্ত হয়ে টমাস ম্যাথুস চলে গেলেন। এমন কি তার পিছু পিছু অন্য যে দুটি জাহাজ আসছিল তার জন্য প্রতীক্ষাও করলেন না। ম্যাথুস এসে উঠলেন বোম্বাইয়ে। কিন্তু মাদাগাস্কার ছেড়ে আসবার আগে তিনি নিজের অভি-যানের উদ্দেশ্য, কাহিনী ইত্যাদি সম্বলিত একটি পত্র স্যালিসবেরীর ক্যাপ্টেন কক-বার্ণের নামে লিখে স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছে দিয়ে এলেন। ম্যাথুস চলে যাবার পরই একজোড়া কুখ্যাত জলদস্যু এসে হাজির হল সেখানে। এদের নাম টেলার এবং লা বুশে। ম্যাথুসের চিঠিটি পড়ে এই দুই দস্যু উপকূলের নিকটবর্তী সমস্ত জল-দস্যুকে সাবধান করে গেল।

বোম্বাই থেকে টমাস ম্যাথুস ফিরলেন এক বৎসর পরে। সেখানে তার বনিবনাও হয় নি স্থানীয় গভর্ণরের সংগে। নানা ঝগড়াঝাটি বিবাদ,—অবশেষে টমাস ম্যাথুস আবার মাদাগাস্কারের পথ ধরলেন। তার মনে পড়ল যে মাদাগাস্কারের জলদস্যুদের উৎখাত করার কাজটা তখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

কার্পেন্টার উপসাগরে এলেন ম্যাথুস। মরিশাসের নিকটে, ক্যাপ্টেন কার্পেন্টারের সমাধিস্তম্ভের গায়ে কে যেন কালো কয়লা দিয়ে লিখে গেছে—তোমার জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করে রইলাম টমাস। ক্লান্ত হয়ে আমরা চল্লাম ডফিন কেল্লার দিকে।

টমাস ম্যাথুস বুঝলেন যে, এ লেখা সেই জলদস্যুদের কাজ। তিনি তখনই আদেশ দিলেন জাহাজের মুখ সেদিকে ফেরাতে। সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে টমাস ম্যাথুস এলেন সেণ্ট মেরী দ্বীপে। এখানে কোনো জলদস্যুকে তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না। অনেক ভগ্ন বাণিজ্য-জাহাজ তীরে এসে পড়ে আছে। চীনামাটির নানা তৈজসপত্র মাটিতে গড়াচ্ছে। কোথাও কোথাও স্তূপের মত উঁচু করে দারচিনি, এলাচ এবং লবংগ অবহেলায় পড়ে রয়েছে। এ সমস্ত জিনিসই বাণিজ্যপোতগুলিতে এসেছিল। এখন অনাদরে মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে—।

টমাস ম্যাথুসকে দেখতে এলেন সেণ্ট মেরী দ্বীপের অধিবাসীদের রাজা। সংগে তার দুই তরুণী কন্যা। প্রথমত ক্যাপ্টেন ম্যাথুসের সংগে দুই কন্যার বিবাহ দিতে চাইলেন রাজা। প্রস্তাব শুনে টমাস ম্যাথুসের চক্ষু চড়কগাছ। একেবারে একজোড়া বউ। এই কালো গৃহিণীদের বিলেতে নিয়ে গিয়ে তুললে সেখানকার শ্বেতাঙ্গিনী ঘরণী যে একেবারে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য শুরু করবেন।

টমাসকে বাঁচালেন অন্য দুই অফিসার। মেয়ে দুটিকে তারা গ্রহণ করতে রাজী। বলাবাহুল্য দুই তরুণীকে অফিসার দুজনের হাতে সমর্পণ করে স্থানীয় রাজা কন্যাদায় থেকে মুক্তি পেলেন।

অন্য একজন লোকও এসেছিলেন টমাসের সংগে দেখা করতে। লোকটা শ্বেতাঙ্গ,—কিন্তু একজন জলদস্যু। ভদ্র-লোকের নাম জেমস প্ল্যানটেন। জলদস্যু প্ল্যানটেনের গল্পটাই এবার শুরু করব। টমাসের কাছে প্ল্যানটেন নিজের পরিচয় দিলেন রেণ্টার বে নামক স্থানের রাজা বলে। অবশ্য জেমস প্ল্যানটেন বেশ খানিকটা জায়গা জমির মালিক ছিলেন। লোকে তাকে রেণ্টার বে'র রাজা বলেই ডাকত।

জেমস প্ল্যানটেনের হাতেখড়ি এক দুর্দান্ত দস্যুর কাছে। এর নাম জন উইলিয়াম—টেরিবল নামক দস্যু-জাহাজটির ক্যাপ্টেন বা দলনেতা। জেমস প্ল্যানটেন দস্যুদলের সংগে চলেছিলেন গিনি। গিনিতে এসে আরো দুই দস্যু-জাহাজের

সঙ্গে দেখা হল তাদের। একটির কর্তা ক্যাপ্টেন ইংলণ্ড,—অন্যটির নায়ক দুর্দান্ত জলদস্যু রবার্ট বার্থোলোমিউ।

হঠাৎ নিজেদের মধ্যে বিবাদ হল দস্যুদের। কে কোন দলে থাকবে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা। জেমস প্ল্যানটেন ফ্যান্সী নামক জাহাজটিতে করে এলেন মাদাগাস্কারে। মাদাগাস্কার থেকে তারা গেলেন জোহানায়। সেখানে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুটি জাহাজ। ক্যাসান্দ্রা এবং গ্রীণউইচ। দুটি জাহাজে বোম্বাই এবং সুরাটে নিয়ে যাবার জন্য প্রচুর অর্থ নেওয়া হয়েছিল।

কোম্পানী জাহাজ দুটির ক্যাপ্টেন ম্যাক্রি এবং কিরবি অন্য জাহাজদুটিকে আক্রমণ করতে স্থির করলেন। পরদিন সকালে যুদ্ধ শুরু হল। ক্যাপ্টেন ম্যাক্রি প্রথম লড়াইয়ে নামলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা! তার সংগী গ্রীণউইচ জাহাজটি ধীরে ধীরে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কাজেই ক্যাপ্টেন ম্যাক্রিকে একাই লড়াই করতে হল। দুটি দস্যুজাহাজের সঙ্গে একা পেরে ওঠা কঠিন। ম্যাক্রি বুঝলেন যে, তার হার অবশ্যম্ভাবী। ক্যাসান্দ্রা জাহাজের অনেকে নিহত,—আহত প্রায় সকলেই। ম্যাক্রি তার সক্ষম অনুচরদের নিয়ে সাঁতার কেটে তীরে এসে উঠলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের সমাদরে গ্রহণ করল এবং কিছুতেই জলদস্যুদের হাতে প্রত্যার্পণ করতে রাজী হল না।

অবশেষে ফ্যান্সী জাহাজটি ফিরিয়ে

দেওয়া হল ম্যাক্সিকে। ইচ্ছে করলে অনুচরদের নিয়ে সে এতে করে ভেসে যেতে পারে। এই প্রস্তাব পাশ করতে দস্যুদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি। রক্তপিপাসু দুরন্ত জলদস্যু টেলার কিছুতেই ম্যাক্সিকে ছাড়তে রাজী নয়। অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করা হল।

আরো কিছুদিন জলদস্যুর কাজ করে জেমস প্ল্যানটেন একটু সাংসারিক হতে চাইলেন। হাতে বেশ টাকাকড়ি জমে গেছে। একটা কেল্লা নির্মাণ করে কিছু জায়গাও কিনে ফেললেন জেমস। নিজেকে ঘোষণা করলেন রেণ্টার বে'র রাজা বলে। এবং তার কৃষ্ণকায় প্রজাদের নিয়ে বেশ সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন।

অনেকগুলি পত্নী ছিল জেমসের। আদর করে তাদের ইংরেজী নামে ডাকতেন তিনি। কারো নাম কেটি, কারো নাম মলি, কেউ বা সুই, কারো নাম হল পেগী। খুব দামী সিল্কের পোশাক ভিন্ন অন্য বস্ত্র রাণীরা কেউ পরিধান করত না। কারো কারো গলায় হীরার কণ্ঠহার শোভা পেত।

এতগুলি পত্নী থাকা সত্ত্বেও জেমস প্ল্যানটেনের মনে কিন্তু সুখ ছিল না। মেসালেজ'এর রাজার নাতনী সুন্দরী এলিনরা ব্রাউনকে তিনি মনে মনে কল্পনা করতেন। এলিনরার বাবা একজন ইংরেজ জলদস্যু। সেজন্যই মেয়ের গায়ের রং হয়েছিল ধবধবে শাদা। জেমসের পত্নীদের ইংরেজী নাম দিলে কি হবে? আসলে তো প্রত্যেকেই কালো। ঘরে একটা শাদা বউ না থাকলে কি মন ভরে?

একদা মেসালেজের রাজার কাছে প্রস্তাব পাঠালেন জেমস। এলিনরাকে তিনি বিয়ে করতে চান। কিন্তু রাজা ডিক্ সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না। সংবাদ শুনে জলদস্যুর টগবগে রক্ত আবার ফুটে উঠল জেমসের ধমনীতে। মেসালেজ আক্রমণ করলেন জেমস। রাজা ডিক সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন। তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন জেমস। এলিনরা ব্রাউনকে আনা হল তার সামনে।

কিন্তু বিধি বাম। এলিনরা ব্রাউন বললেন তিনি অন্তঃসত্ত্বা। যে ইংরেজদের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়েছিল, তাকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

ব্যাপারটা ভাবলেন জেমস। সেই ইংরেজ নাবিক জেমসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। কাজেই এই অবস্থায় এলিনরা ব্রাউনকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়? জেমস প্ল্যানটেন দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন।

এলিনরা হলেন জেমসের পাটরানী। জেমস প্ল্যানটেন তাকে ঘর-গেরস্থালির ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। অন্য পত্নীর দল—মলি, কেটি এবং পেগীরা হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগল। কিছুকাল পরে জেমস প্ল্যানটেন সম্পূর্ণ মাদাগাস্কারই অধিকার করে বসেছিলেন। এই উপলক্ষে মস্ত এক ভোজসভা হল রাজধানীতে। পুরোনো জলদস্যুরা এসেছিল জেমসের সঙ্গে দেখা করতে।

তাদের মধ্যে এসেছিলেন ক্যাপ্টেন ইংলণ্ড—তত দিনে তিনি বেশ বৃদ্ধ। মনে মনে নাকি তিনি পুরোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছিলেন।

কিন্তু জেমস প্ল্যানটেন মাদাগাস্কারে থাকতে পারেন নি। তলে তলে কৃষ্ণকায়রা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। একথা তিনি টের পেয়েছিলেন। একদিন সকালে উঠে জেমস প্ল্যানটেন মাদাগাস্কার ছেড়ে চলে গেলেন মালাবারের দিকে। পশ্চিম ভারতের মালাবার উপকূল। সেখানে আংগ্ররা জলদস্যুরা তখন প্রবল প্রতাপান্বিত। জেমসকে তারা সাদরে গ্রহণ করলে।

সঙ্গে শুধু একজনকে নিয়ে ছিলেন জেমস। না, পত্নী এলিনরা ব্রাউন নন। তিনি থেকে গেলেন মাদাগাস্কারে। জেমস প্ল্যানটেন সঙ্গে নিয়ে গেলেন অন্য একটি মেয়েকে। তার আর একটি বউ। কৃষ্ণকায় এই মেয়েটিকে নাম দিয়েছিলেন জেমস। নেলী,—নেলীকে শুধু ভালবাসতেন না জেমস, বিশ্বাসও করতেন। শেষ বয়সে শুধু ভালবাসায় হয় না। বিশ্বাস চাই,—জেমস তা বুঝেছিলেন।

* * *

পৃথিবীর তিনভাগ জল,—একভাগ মাত্র স্থল। কাজেই জলদস্যুর সংখ্যাও অনেক,—অসংখ্য হওয়াই স্বাভাবিক। হাজার হাজার বৎসর ধরে যে নিষ্ঠুর দস্যুবৃত্তি উন্মত্ত নীল দরিয়ায় বার বার সংঘটিত হয়েছে তার শেষ ঘাঁটি মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং সন্নিকটস্থ দরিয়া। মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে জলদস্যুর দলকে নির্মূল করবার পরই জলদস্যুবৃত্তি একরকম পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের নাম না জানা অনেক দ্বীপে, এবং এটলে তখনও কিছু কিছু শ্বেতাংগ জলদস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করেনি। তবে এরা সংখ্যায় কম....তেমন সংঘবদ্ধ নয়, এবং এদের শক্তিও নগণ্য। বলা বাহুল্য এদের সকলেই সভ্যতার দৃষ্টিতে অপরাধী চিহ্নিত হয়ে সভ্যসমাজ ছেড়ে চলে আসে, কেউ অস্ট্রেলিয়ার পলাতক কয়েদী, কেউ বিদ্রোহী নাবিক, আবার কেউ বা তিমি-শিকার করতে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে জলদস্যুর দলে নাম লিখিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বুলি হায়েসের কাহিনী এবং তার পরিণতি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক এবং বিচিত্র মনে হতে পারে। বুলি হায়েস লোকটা নিষ্ঠুর জলদস্যু হবার আগে ছিল সুরের ভক্ত। নিউজিল্যাণ্ডে হায়েস এসেছিল একটা ছোট্ট কনসার্ট পার্টির বাজনাদার হয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করত হায়েস। লোকে তাই শুনত তন্ময় হয়ে। কিন্তু সুর বেশীদিন চলল না। হঠাৎ মাওরী যুদ্ধ শুরু হল। সুর ছেড়ে হায়েস এবার অসুর তৈরী হবার পথে পা বাড়াল। বুলি হায়েস নাম লেখাল যুদ্ধে।

যুদ্ধ শেষ হবার পর এক নতুন ব্যবসা ধরল বুলি হায়েস। হঠাৎ কোনো আদিবাসী অধ্যুষিত দ্বীপে হানা দিয়ে কিছু শাদামাটা মানুষকে ফাঁদ করে কিংবা বন্দী করে জাহাজের ডেকে তুলত হায়েস। তারপর আর কি? জাহাজ ভেসে চলত নীল সমুদ্রের বুকে। স্যামোয়া কিংবা এমনি কোনো দ্বীপে প্ল্যাণ্টার্সদের শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। বুলি হায়েস প্ল্যাণ্টার্সদের কাছে বিক্রী করে দিল আদিবাসীদের। জিনিস নয়, সামগ্রী নয়—মানুষ বেচে টাকা। মাঝে মাঝে অবশ্য জলদস্যুর উপদ্রবও চলতে লাগল। টুকটাক হাতের কাছে যা আসে। বুলি হায়েস বেশ বহাল তবিয়তে দিন কাটিয়ে যাচ্ছিল।

অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি হল হায়েসের। অস্ট্রেলিয়া থেকে সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত। সরকারী লাল খাতায় নাম উঠল বুলি হায়েসের। শুধু তাকে বন্দী করবার অপেক্ষা মাত্র। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বুলি হায়েস ধরা পড়ল। স্পেনীয়রা তাকে ম্যানিলায় নিয়ে এল বন্দী করে। বুলি হায়েস উন্মুক্ত নীল দরিয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। স্বল্প পরিসর কারাগারে বসে বিচারের দিনগুলির প্রতীক্ষা করতে লাগল সে।

শুধু প্রতীক্ষা নয়। কারাগারে বসে পড়াশুনো শুরু করল হায়েস। রীতিমত সাধনা। সুরের নয়—নানা ধর্মপুস্তকে

মনোনিবেশ করে রইল। একটি খাঁটি ক্যাথলিকের মত তার ঈশ্বরবিশ্বাস। ম্যানিলার বিশপ তো আশ্চর্য! পাপীকে এমন সুমতি দিয়েছেন ভগবান। বিশপ নিজে চেষ্টা করলেন। তার প্রভাবে বুলি হায়েস মুক্তি পেল। বিশপ ভাবলেন লোকটা এবার সৎ নাগরিকের জীবন যাপন করবে। ঈশ্বরে মতি হবে ওর।

কিন্তু আশা এক, বাস্তব অন্য। মুক্তি পাবার পর বুলি হায়েস ঈশ্বর সম্বন্ধে তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করল না। বরং সমুদ্র তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ম্যানিলা ছেড়ে পালাল বুলি হায়েস। সেই উন্মুক্ত দরিয়ায়,—তার পুরাতন ব্যবসায়ে।

দ্বিতীয়বার বুলি হায়েস ধরা পড়ল স্যামোয়াতে। ব্রিটিশ কন্সাল তাকে বন্দী করলেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে জাহাজ আসবার অপেক্ষা মাত্র। তাহলেই বুলি হায়েসকে পাঠান হবে সেখানে। বিচারের জন্য। ইতিমধ্যে বুলি হায়েসকে দ্বীপেই ছেড়ে রাখা হয়েছিল। চারপাশেই তো দুস্তর সমুদ্র। বুলি হায়েসের পলায়ন প্রায় অসম্ভব।

এমন সময় স্যামোয়া দ্বীপে নতুন এক আগন্তুক এসে হাজির হল। লোকটার নাম ক্যাপ্টেন বেন পীজ। দক্ষিণ সমুদ্রে এরও খ্যাতীর্বাধ। পীজের সঙ্গে হায়েসের অনেক আগে থেকেই চেনা-জানা। হায়েস দিন কাটাচ্ছিল পিকনিক ইত্যাদি নানা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়া থেকে যতদিন জাহাজ না আসে ততদিন ফুর্তিটুর্তি না করা যায়। কিন্তু বেন পীজ এসেছে শুনে বুলি হায়েস উঠে দাঁড়াল।

প্রথম সাক্ষাতে যা হল তাতে স্যামোয়াবাসীরা অবাক। দুজনে হাতাহাতি এবং মারামারি। যাক স্যামোয়ার কন্সাল নিশ্চিন্ত হলেন। দুজনের ভাবসাব হলেই বরং চিন্তার কারণ হ'ত। বেন পীজ কয়েকদিন পরে স্যামোয়া ছেড়ে চলে গেলেন। তার জাহাজ দূরে দিকচক্রবালে মিলিয়ে যাবার পরই বুলি হায়েসের খোঁজ পড়ল স্যামোয়ায়। কিন্তু হায়েস কই? অনেকক্ষণ পরে স্যামোয়ার ব্রিটিশ কন্সাল বুঝলেন ব্যাপারটা। এ আর কিছু নয়। মিঞা-বিবির বাদ-বিসম্বাদ। বুলি হায়েসের আর কোনো পাত্তা পাওয়া যাবে না।

হায়েসকে আর বন্দী করা যায়নি। নিজের দলের একজন লোকই তাকে মেরে ফেলেছিল। লোহার রডের এক আঘাতে হায়েসের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। সমুদ্রের অতলতলে হায়েস শুয়ে রইল চিরনিদ্রায়।

সবশেষে যে মানুষটি জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ফাঁসির দাঁড়তে প্রাণ বিসর্জন দেয় তার নামটি জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। এই লোকটির নাম নাথানিয়েল গর্ডন। দাস ব্যবসা রহিত করে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় একটি আইন প্রণয়ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে দাস আমদানী করা বেআইনী এবং এই কাজ জলদস্যুবৃত্তির সামিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু আইনটা বহুদিন পর্যন্ত ঠিক চালু হয়নি। কাগজে কলমে ছিল এবং সেই পর্যন্তই। আসলে দাস আমদানী করার ব্যবসায় মোটা লাভ। শুধুমাত্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দেই প্রায় পনের হাজারের মত কৃষ্ণকায় নিগ্রো দাসকে আমেরিকায় আমদানী করা হয়।

কিন্তু আব্রাহাম লিংকন প্রেসিডেন্ট হবার পরই এ ব্যাপারে সরকার কঠোর হলেন, যুক্তরাষ্ট্রে দাস আমদানী করার অভিযোগে ধরা পড়লেন নাথানিয়েল গর্ডন। গর্ডন পোর্টল্যান্ডের লোক। পাঁচশত টনের একটি জাহাজ তার সম্পত্তি। এই 'এরি' জাহাজে গর্ডন সাকুল্যে চারবার অভিযান করেছেন, শেষবার তিনি ধরা পড়লেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে,— আমেরিকান জাহাজ মাহিকানের কাছে। গর্ডনের জাহাজে তখন ন'শত সাতষট্টি জন নিগ্রো দাস। হাঁস-মুরগীর মত ঠাসবোঝাই মানুষ। জাহাজশুদ্ধ গর্ডনকে নিয়ে আসা হল আমেরিকায়। কিন্তু 'এরি' জাহাজের তিনশত নিগ্রো দাস এই ঠাস-বোঝাই অবস্থায় প্রাণ হারাল। বন্দরে জাহাজ বাজেয়াপ্ত হল। গর্ডনকে নিয়ে যাওয়া হল নিউইয়র্কে। জলদস্যুবৃত্তির
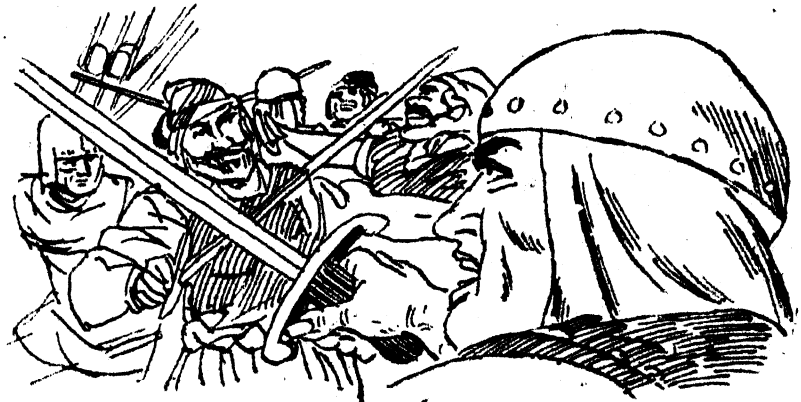
কিন্তু ততক্ষণে ডেকের উপর উঠে...

অভিযোগ আনা হল গর্ডনের বিরুদ্ধে। নাথানিয়েল গর্ডনের বিচার শুরু হল।

সমস্ত নিউইয়র্কে হৈ-চৈ পড়ে গেল। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর ধরে যে আইন ব্যবহার হয়নি, আজ কেন তার উন্মত্ত প্রহার হবে একাকী গর্ডনের উপর? দাস ব্যবসা করে কত লোকই তো ইতিমধ্যে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে। তবে কেন এই বিচারের প্রহসন? শুধু গর্ডনের উপর কেন এই গর্জন?

জনমত গঠিত হল নিউইয়র্কে। শহরে বড় বড় পোস্টার পড়ল।...'বিচারের নামে হত্যা হতে চলেছে। নিউইয়র্কের নাগরিকবৃন্দ এগিয়ে আসুন সাহায্য করতে। এক অব্যবহৃত মৃত আইনকে সজীব করে তোলা হয়েছে নাথানিয়েল গর্ডনকে সংহার করতে।.....'

তবু গর্ডনের ফাঁসি হল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ টুম্বস কারাগারে নাথানিয়েল গর্ডনকে ফাঁসি দেওয়া হল। অনেক পুলিশ প্রহরীর ব্যবস্থা করতে হয়েছিল চারপাশে। কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ভিতরে। উন্মুক্ত নীল দরিয়ায় জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগে প্রাণ দিলেন গর্ডন। শ্বেতাংগ নাথানিয়েল গর্ডন।

সম্ভবত এই পৃথিবীতে অতীতের সেই জলদস্যুবৃত্তির পুনরাবির্ভাব এক অসম্ভব ব্যাপার। এই এরোপ্লেন, বেতার, এবং রকেটের যুগে জলদস্যুর ব্যবসায় তেমন কোনো আকর্ষণ। নেই। ব্যবসায়িক মূলধনটাই ষোল আনা খোয়া যাবার সম্ভাবনা বেশী। এবং টাকাটা উঠে আসবার ব্যাপারটা খুবই অনিশ্চিত।

জলদস্যুরা নিঃসন্দেহে অতীতেরই বস্তু। বর্তমানে তাদের অস্তিত্ব কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। জলদস্যু নেই ঠিকই। কিন্তু সেই দুঃসাহসী মনটি রয়েছে। আজকে যারা এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ডাকাতি করে বেড়ায়, আত্মগোপন করে গহন গিরিকন্দরে, রিভলবার প্রয়োগ করে ব্যাংকের টাকা লুঠ করে মুহূর্তে লুকিয়ে পড়ে, অতীতে জল-গ্রহণ করলে তারা নিশ্চয়ই হ'ত নীল দরিয়ায় দুর্ধর্ষ জলদস্যু।

সভ্য সমাজের বুকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরা একটি জলদস্যুর চিত্র রীতিমত বিসদৃশ এবং আতংকজনক। নিশ্চিন্ত জলপথকে জলদস্যুর আনা-গোনা থেকে মুক্ত করাই জাতির কর্তব্য। নৃশংস এবং খুনী একটি জলদস্যুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তবু আর একটা দিকও রয়েছে।

যে মানুষ সভ্য নাগরিক জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সুস্থ জীবনের পরিবর্তে আশ্রয় খুঁজেছে নীল দরিয়ায়, দুই কঠিন রোমশ বাহু সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছে ভাগ্যের সন্ধানে এবং প্রায়ই একটি দুঃখজনক পরিণতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে,— তার কথা মনে হলে সভ্য মানুষের অন্তরে এককোঁটা করুণা সৃষ্টি হওয়া কি একান্ত অসম্ভব?

মরা পাহাড়ের নীচে রাম বসু

ঝিরঝির মিহি পাকদণ্ডী
নীল আলো শুকতারার
অপরিমিতের ভার
আমার বুকের কাছে
সৈকতের শুভ্র গায়ে
হাওয়া মরে মাথা কুটে কুটে।

মরা এক পাহাড়ের নীচে
এক ফালি জল, দুরন্ত জল
শিকড়ের জট জটিলতা
উদ্ভিদের দূর অভিজ্ঞতা
স্মৃতি-বিস্মৃতির সেই তো সম্বল
মরা এক পাহাড়ের নীচে।

উজ্জ্বল কণায় পূর্ণ
হে মুখ আমার, জানি
জল প্রবাহের গাঢ়তম বাণী
বিশাল অতৃপ্তে নগ্ন
দাহহীন বিভায় নিমগ্ন
প্রেমিকার মতো স্নিগ্ধ ও নিকুঞ্জ।

যে কেউ এলে ।। তুলসী মুখোপাধ্যায়

এখন যে কেউ এলে
দুহাত বাড়িয়ে আমি ঘরে তুলে নেব
ধবধবে চাদর মেলে বলব—
আরাম করে বসুন

এখন যে কেউ এলে
দুহাত বাড়িয়ে বুক জড়িয়ে ধরব।

এখন যে কেউ এলে
শেষ কপর্দকে আমি উৎসব লাগাব
গানের মতন স্বচ্ছ গলা খুলে দেব
মানুষের মুখ, আহা, মানুষের ভাষা
কতোকাল আমি দেখিনি, শুনিনি।

এখন যে কেউ এলে বলব
আমায় একটু ঘুমুতে দিন
দোহাই, আজকের রাতটা থাকুন
বিনিময়ে
সমস্ত জীবন পিছন থেকে ছুরি মারলেও
আমি দুঃখ পাব না।

এখন যে কেউ এলে
আতর জলের মতো শরীর কাটিয়ে যাব : আসুন।

পরলোকে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী লান্দাউ
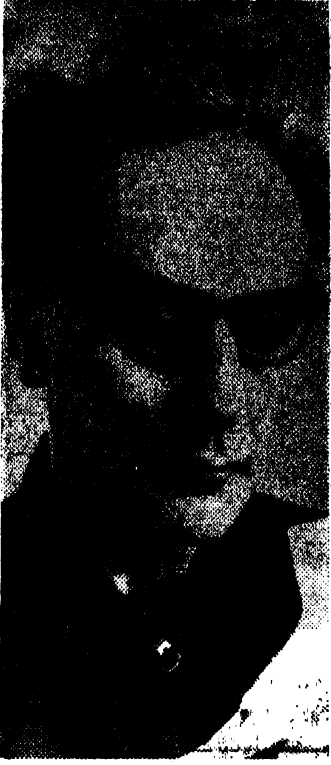
বিশ্ববিশ্রুত রুশ পদার্থবিজ্ঞানী অ্যাকাডেমিশিয়ান লেভ লান্দাউ গত পয়লা এপ্রিল মস্কোতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৬ বছর আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হন এবং তারপর থেকে এতদিন শয্যাশায়ীই হয়ে ছিলেন।

১৯০৮ সালে লেভ লান্দাউ-এর জন্ম। শৈশবেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়। ১৩ বছর বয়সে তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্যে তিনি চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স কম হওয়ায় তাঁকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না। ফলে একবছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৪ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন এবং একসঙ্গে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্র তিনটি বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে বেরিয়ে আসার আগেই মাত্র ১৮ বছরে তাঁর 'কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা' সম্পর্কিত প্রথম গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিজ্ঞানী মহলে লান্দাউকে নিয়ে একটা সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁকে ঘিরে এক নতুন বিজ্ঞানীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

২১ বছর বয়সে লান্দাউ উচ্চতর গবেষণার জন্যে ইউরোপে চলে যান এবং সে সময়কার প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী হাইজেন-বার্গ পাউলি, পেলারসোম, বোর প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯৩২ সালে ২৪ বছর বয়সে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় আসেন এবং খারকোভ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর অনন্য গবেষণার স্বীকৃতিতে ১৯৩৪ সালে তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি খারকোভ থেকে মস্কোয় চলে আসেন এবং সেখানকার ইনস্টিটুট্যুট অফ ফিজিক্যাল প্রবলেমস্-এর সংগে যুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী রুমার-এর সংগে যুক্তভাবে 'ইলেকট্রন কণিকার ধারাবর্ষণ' সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে পদার্থ-বিজ্ঞানের জটিল বিষয়বস্তু ইলেকট্রন গ্যাসের আচরণ সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জীবনের শেষদিকে লান্দাউ বিস্ময়কর তরল পদার্থ 'হিলিয়াম-২' সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আগে কেউ এই পদার্থটির বৈশিষ্ট্য ভালো-ভাবে উদ্ঘাটন করতে পারেননি। তরল হিলিয়াম সংক্রান্ত তাঁর অনন্য গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে তাঁকে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু সে সময় তিনি মর্মান্তিক মোটর দুর্ঘটনায় পতিত হন এবং হাসপাতালে রোগশয্যায় শুয়ে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন।

আধুনিক তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞানে লান্দাউ-এর অবদান অবিস্মরণীয়। এরই স্বীকৃতিতে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে অজস্র সম্মান ও উপাধি পেয়েছেন। ব্রিটেনের রয়েল সোসাইটি, ডেনমার্কের বিজ্ঞান অ্যাকাদেমি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাঁকে নানা সম্মাননায় ভূষিত করেন। তিনি তিনবার স্ট্যালিন পুরস্কারও লাভ করেন। আর এই বছরের গত ২২ জানুয়ারী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'অর্ডার অফ লেনিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

লান্দাউ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা। ইয়াগেনী লিফ-শিফটের সহযোগে রচিত তাঁর 'দ্যা কোর্সেস অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিকস্' গ্রন্থখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। 'আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কি' শিরোনামায় তাঁর একটি মনোজ্ঞ লোকরঞ্জন বিজ্ঞান পুস্তিকাও আছে।

প্রাণের উৎস সন্ধানে (১)

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল থেকে যে পরম রহস্য তার মনে আজও দোলা দিয়ে আসছে, তা হল—প্রাণ কি এবং প্রাণের উৎসই বা কি? এই পরম রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনে সত্য-সন্ধানী মানুষ নিরন্তর অনুসন্ধান করে চলেছে, যদিও এর সঠিক সদুত্তর আজও মেলেনি। তবে প্রাণের উৎস সন্ধানে বিজ্ঞান-সাধকেরা আজ এমন সব সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন যার সাহায্যে জীবন-রহস্যের অনেকখানি মর্মভেদ করা গেছে এবং কৃত্রিম উপায়ে জীবনসৃষ্টির সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমরা আজ এ-কথা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি—আমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি হয়েছে একটিমাত্র গোলাকার কোষ থেকে, যার ব্যাস হচ্ছে এক ইঞ্চির এক ভাগের তিন-শতাংশ মাত্র। এটিই হচ্ছে মানুষের নিষিক্ত ডিম্বকোষ। এই কোষের জৈবিক বংশানুক্রমের বৈশিষ্ট্য আমাদের জনক ও জননীর কাছ থেকে লব্ধ হয়ে থাকে। কোষের কেন্দ্রস্থল নিউক্লিয়াসে "ক্রোমোসোম" নামে অভিহিত উপাদানে বংশগতির বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হয়। জনক ও জননী প্রত্যেকের কাছ থেকে ২৩টি করে ক্রোমো-সোম আসে। ক্রোমোসোমের মধ্যে থাকে বংশানুক্রমের মূলাধার "জিন"। ৪৬টি ক্রোমোসোমে একই রকম জিন থাকে না, থাকে প্রায় এক লক্ষ বিভিন্ন রকম জিন।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ডিম্বকোষ থেকে আমরা কিভাবে গড়ে উঠব, তার 'নির্দেশবাক্য'

অন্তর্নিহিত থাকে সমষ্টিগতভাবে এই জিনগুলির মধ্যে। ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুতের জন্যে যেমন নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়, তেমনি মানুষ তৈরীর উপকরণ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার জিন। মানুষের গড়ে ওঠার প্রণালী অনেকটা কেক তৈরীর প্রণালীর মতো। কেক তৈরী করতে হলে বিভিন্ন উপকরণ যথোপযুক্ত পরিমাণে মেশাতে হবে এবং কোনটার পর কোনটা দিতে হবে তা যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে, নইলে কেক ঠিকমতো তৈরী হবে না। এছাড়া, যথোপযুক্ত উষ্ণতাও বজায় রাখতে হবে। তেমনি মানুষ তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি যথোপযুক্ত পরিমাণে, যথাযথ পর্যায়ে এবং যথোপযুক্ত পরিবেশে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। কথাটা যত সহজে বলা হল, প্রকৃত ব্যাপারটা কিন্তু তত সরল নয়। কেক তৈরীর তুলনায় মানুষ তৈরীর প্রণালী অনেক জটিল।

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের জীবনের মূলাধার হচ্ছে জিন। এখন কথা হল, মানুষ তৈরীর ব্যবস্থাপত্র জিন কিভাবে লিখে দেয়? বিজ্ঞানীরা বলেন, জিনের ভাষা অতীব সরল। চার অক্ষরের একটি বর্ণ থেকে গঠিত কয়েক ডজন তিন-অক্ষরের শব্দ দিয়ে জিনের এই ভাষা লিখিত হয়। অবশ্য এই অক্ষরগুলি আমাদের বর্ণমালার অক্ষরগুলির মতো হুবহু একরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি-এন-এ নামে অভিহিত দীর্ঘ অণুর ইউনিট বা একক। ডি-এন-এ অণুগুলি আবার চার প্রকার উপ-একক বা সাব-ইউনিট দিয়ে গঠিত। বর্ণমালার নানা অক্ষর দিয়ে যেমন নানা শব্দ গড়ে তোলা যায়, তেমনি প্রাণের মূল উপাদান এই চারপ্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড 'অক্ষরের' মতো নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাবিধ 'নির্দেশ-বাক্য' হয়ে দাঁড়ায় এবং এই নির্দেশনার ফলেই সৃষ্টি হয় ব্যাকটিরিয়া, গাছপালা জন্তু বা মানুষ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে ও উপযুক্ত পরিবেশে একটি ডিম্বকোষ থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর জন্যে কত বড় নির্দেশ বাক্যের প্রয়োজন হয়? গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, যে ডিম্বোকোষ থেকে আমাদের সৃষ্টি তাতে এবং আমাদের দেহের প্রতিটি কোষে প্রাথমিক অবস্থায় ৫ হাজার কোটি মূল উপাদান বা অক্ষর থাকে। এই অক্ষর-গুলি দিয়ে ১৭০ কোটি শব্দ তৈরী করা যায়। এই শব্দগুলি দিয়ে যদি ইংরেজীতে একটি বই ছাপা হয়, তা হ'লে ৫০০ শব্দের প্রতি পাতা নিয়ে ৬০০ পাতার এক হাজার বই ছাপা যাবে। প্রত্যেক মানুষ তৈরীর জন্যে জিনগত নির্দেশবাক্যের এই হচ্ছে আকার।

কিন্তু এই আকার যে কত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম তা শুনলে অবাক হতে হয়। যদি এই ৫ হাজার কোটি ডি-এন-এ অক্ষর জুড়ে একটি মাত্র অণুতে বাঁধা হয় এবং একটি আলপিনের ডগায় বিছিয়ে দেওয়া হয়, তা হলে সেটি পিনের মাথার একশো ভাগের এক-ভাগেরও অর্ধেক হবে। বস্তুত, আজকের পৃথিবীর সমস্ত লোকের (প্রায় তিন হাজার কোটি মানুষ) ডি-এন-এ নির্দেশনা যদি সারিবদ্ধ করে রাখা যায়, তা হ'লে তার সামগ্রিক উচ্চতা হবে এক ইঞ্চির আট ভাগের একভাগ মাত্র। এই ডি-এন-এ অক্ষর দিয়ে যদি গ্রন্থ রচনা করা যেত, তা হ'লে সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যত গ্রন্থ রচনা করেছে তার মোট সংখ্যার চেয়েও ডি-এন-এ রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি হত।

সমুদ্রতলে গবেষণার ডুবোজাহাজ অ্যাডিটেক

আমরা তা হ'লে দেখতে পাচ্ছি, ডি-এন-এর আণুবীক্ষণিক একক দিয়েই মানুষ তৈরীর নির্দেশনা লিখিত হয়ে থাকে। এরপর প্রশ্ন আসে কোষ বিভাজনের সময় এই নির্দেশনা কিভাবে অনুসৃত হয়? বিজ্ঞানীরা বলেন, দ্বৈত অণুতে এই নির্দেশনা লিখিত হয় এবং একটি হচ্ছে অপরের পরিপূরক। যে পর্যায়ে নির্দেশনা সাজানো হয়, তা হচ্ছে ১ অক্ষরটি সর্বদাই ২ অক্ষরের বিপরীতে থাকবে, ২ অক্ষর থাকবে ১ অক্ষরের বিপরীতে, ৩ অক্ষর থাকবে ৪ অক্ষরের বিপরীতে, ৪ অক্ষর থাকবে ৩ অক্ষরের বিপরীতে। এইভাবে শব্দশৃঙ্খল রচিত হয়। প্রত্যেকটি অক্ষর তার যোগ্য অংশীদারকে বেছে নিতে পারে। এর ফলে যখন কোন কোষ বিভক্ত হয় এবং দ্বৈত অণুগুলি পৃথক হয়ে যায়, তখন প্রতিটি বিভক্ত অংশ নিজেই একটি নতুন উপযুক্ত অংশীদাররূপে কাজ করে। আমরা জানি, এরূপে পৃথকীকরণ ও পুনর্গঠনই হচ্ছে সকলপ্রকার জৈবিক প্রজননের আণবিক ভিত্তি।

আমরা আরও জেনেছি, জীবন গঠনের মূলে রয়েছে প্রোটিন। এই প্রোটিনই হচ্ছে মূল পদার্থ যা দিয়ে জীবন্ত দেহতন্তু তৈরী হয়। প্রোটিনের গঠন নিয়ন্ত্রিত হয় নিউক্লিক অ্যাসিডের দ্বারা—ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ অর্থাৎ রিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড। সজীব দেহকলা (টিসু) গঠনের এরাই মূল উপাদান। ডি-এন-এ পাওয়া যায় জীব কোষের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের অভ্যন্তরে এবং আর-এন-এ পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসের বাইরে সাইটোপ্লাজমে। বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বাস করেন, সকল গাছপালা ও জীব-জন্তুর বংশগত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণের মূল চাবিকাঠি রয়েছে নিউক্লিক এ্যাসিড-গুলির মধ্যে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ডি-এন-এ হল মূল ছাঁচ যার সাহায্যে বংশগতির বৈশিষ্ট্য এক পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে সঞ্চারিত হয়। জিনসমূহের মধ্যে এই বস্তুটিই সকল জীবের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে গুণাগুণগুলি এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয় তা জিনসমূহই নিয়ন্ত্রণ করে। আর-এন-এ হল প্রোটিন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত ডি-এন-এ মূল উপাদানের একটি প্রতিরূপ। আর-এন-এ রাসায়নিক নির্দেশ গ্রহণ করে ডি-এন-এর কাছ থেকে এবং দেহের প্রতিটি অংশে তা সঞ্চারিত করে।

নিমাই ভট্টাচার্য

(৯)

দোলাবৌদি,

তোমার চিঠি পেয়েছি। একবার নয়, অনেকবার পড়েছি। তুমি হয়ত আমার মনের খবর ঠিকই পেয়েছ। কিন্তু আমার মনে অনেক দুঃখ থাকলেও আক্ষেপ নেই, বেদনা থাকলেও ব্যর্থতার গ্লানি নেই। তার দীর্ঘ কারণ আজ বলব না, হয়ত তুমিও বুঝবে না। আমার এই কাহিনী যখন লেখা শেষ হবে, সেদিন আশা করি সবকিছু দিনের আলোর মত স্পষ্ট হবে।

তবে হ্যাঁ, আজ এইটুকু জেনে রাখ আমি জীবনে যে প্রেম-ভালবাসার ঐশ্বর্য পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। হয়ত আরো অনেকে এই ঐশ্বর্য পেয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ঐশ্বর্যের কোন তুলনা করার মাপকাঠি আমার জানা নেই, প্রয়োজনও নেই। তবে এইটুকু নিশ্চয়ই জানি আমি পূর্ণ, পরিপূর্ণ হয়েছি। আর জানি আমার এই ঐশ্বর্যের সঙ্গে পৃথিবীর কোন ধনীর কোন ঐশ্বর্যের তুলনা হয় না। ধনী একদিন সমস্ত কিছু হারিয়ে দরিদ্র, ভিখারী হতে পারে, সে ঐশ্বর্যের হস্তান্তর হতে পারে, অপব্যয়, অপব্যবহার হতে পারে কিন্তু আমার প্রাণ-মনের এই অতুলনীয় সম্পদ কোনদিন হারাবে না, হারাতে পারে না। যতদিন আমি এই পৃথিবীতে থাকব, ততদিন ঐ ঘন কালো টানা টানা গভীর দুটি চোখ আমার জীবন-আকাশে ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই পৃথিবীর পঞ্চভূতের মাটিতে একদিন আমি মিশে যাব, আমার সমস্ত খেলা একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে, সবার কাছ থেকে আমি চিরতরে হারিয়ে যাব, কিন্তু আমার মেমসাহেব কোনদিন হারিয়ে যাবে না। আমার এই চিঠিগুলি যতদিন থাকবে, মেমসাহেবও ততদিন থাকবে। তারপর সে রইবে তোমার ও আরো অনেক অনেকের স্মৃতিতে। তারপরও ভারতবর্ষের অনেক শহরে-নগরে গ্রামে গেলে মেমসাহেবের স্মৃতির স্পর্শ পাওয়া যাবে। উত্তর বঙ্গের বনানীতে, বোম্বাই'এর সমুদ্রসৈকতে, বরফে-ঢাকা গুলমার্গের আশেপাশে নিস্তব্ধ রাত্রে কান পাতলে হয়ত মেমসাহেবের গান আরো অনেকদিন শোনা যাবে।

দোলাবৌদি, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না, লিখতে পারব না আমার মেমসাহেবের সবকিছু। জানাতে পারব না আমার মনের ভাব, ভাষা, অনুভূতি। পৃথিবীর কত দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, কত অসংখ্য উৎসবে কত অগণিত মেয়ে দেখেছি। তাদের অনেককে কাছে পেয়েছি, নিবিড় করে দেখেছি। কতজনকে ভালও লেগেছে। কিন্তু একজনকেও পেলাম না যে আমার কাছে আমার মেমসাহেবের স্মৃতিকে ম্লান করে দিতে পারে।

তুমি তো জান আমি বাচবিচার না করেই সবার সঙ্গে মেলামেশা করি। সমাজ-সংসারের নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করেই মিশেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। রক্তকরবীর মত তাঁদের অনেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অনেকের রূপ-যৌবন-লাবণ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে, শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ভাল লেগেছে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আমার প্রাণের মন্দিরে নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিনি। হেসেছি, খেলেছি, ঘুরেছি অনেক মেয়ের সঙ্গে। আমার এই হাসি-খেলা নিয়ে তুমি হয়ত অনেকের কাছে অনেক কাহিনী শুনবে। দিল্লী ইউনিভার্সিটির বনানী রায়কে নিয়ে আজো ডিফেন্স কলোনীর অনেক ড্রইংরুমে আমার অসাক্ষাতে সরস আলোচনা হয়, আমি তা জানি। আমি জানি আমাদের লণ্ডন হাই কমিশনের থার্ড সেক্রেটারী অতসীকে নিয়ে আমার ব্রাইটন ভ্রমণকে কেন্দ্র করে অনেক আরব্য উপন্যাসের কাহিনী বিলেত থেকে কলকাতার কফি হাউস পর্যন্ত গড়িয়েছে।

আমি কি করব বল? আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থাই এমন যে স্বামী-স্ত্রীর একটু স্বাধীন আচরণ আজও বহুজনে বরদাস্ত করতে পারেন না। সমাজ অনেক এগিয়েছে। সারা পৃথিবীর বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে আমরা অনেকেই মেলামেশা করছি কিন্তু রক্তের মধ্যে আজও অতীত দিনের সংস্কারের বীজ রয়ে গেছে। তাইতো ভাটপাড়ার কূপমণ্ডূক সমাজ থেকে হাজার মাইল দূরে বসেও দিল্লীর সফিসটিকেটেড বাঙালী গৃহিণীরা বনানীকে দুর্গাপূজার প্যাণ্ডেলে দেখলে আলোচনা না করে থাকতে পারেন না।

একটু কান পাতলে শোনা যাবে মিসেস দত্ত বলছেন, এই চন্দ্রিমা, দ্যাখ, দ্যাখ, বনানী এসেছে।

'কই? কই?'

'ঐ তো!'

'একলা?'

'তাইতো দেখছি।'

চন্দ্রিমা একটু এদিক-ওদিক দেখে বলে, ঐতো সাদা হেরল্ড। রিপোর্টার সাহেব নিশ্চয়ই এসেছে।

বলাকা সরকারও প্রায় ছুটে চলে আসে। চন্দ্রিমার কানে কানে বলে, দেখেছিস, মিসেস রিপোর্টার এসেছে।

'অনেকক্ষণ দেখেছি।'

বনানী এগিয়ে যায় প্রতিমার কাছে। হাত জোড় করে প্রণাম করে। ইতিমধ্যে আমি পাশে এসে দাঁড়াই। বনানী গাড়ীতে পার্সটা রেখে এসেছে; আমার কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে প্রণামী দেয়।

বলাকা, চন্দ্রিমা, মিসেস দত্ত ও আরো অনেকে তা দেখেন। আরো অনেক নবীনা প্রবীণা দেখেন আমাদের।

বলাকা বলে, বাই বলিস ভাই, দুজনকে বেশ ম্যাচ করে কিন্তু!

মিসেস দত্ত বলেন, ম্যাচ করলে কি হবে! ওরা তো আর বিয়ে করছে না, শুধু খেলা করছে।

চন্দ্রিমা বলে, না, না। নিশ্চয়ই বিয়ে করবে। তা নাহলে দুজনে মিলে এমন করে ঘোরাঘুরি করে।

আমরা দুজনে প্যান্ডেল থেকে বেরুবার জন্য এগিয়ে চলি। বনানীর সাইড-ভিউ বোধহয় বলাকার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাইতো চন্দ্রিমাকে ফিসফিস করে বলে, বাই বলিস সী হ্যাজ এ ভেরী অ্যাট্রাকটিভ ফিগার?

বনানীর প্রশংসায় মিসেস দত্ত মুহূর্তের জন্য নিজের ফিগার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েন। শাড়ীর আঁচলটা আর একটু টেনে শাড়ীটাকে দেহের সঙ্গে একটু বেশী নিবিড় করে জড়িয়ে নেন। মনে মনে বোধহয় একটু ঈর্ষাও দেখা দেয়। তাইতো বনানীকে ছোট করার জন্য আমাকে একটু বেশী মর্যাদা দেন। বলেন, রিপোর্টারও তো কম হ্যান্ডসাম নয়।

দূরে এক পুরোন বন্ধুকে দেখে বনানী নজর না করেই ডান দিকে ঘুরতে গিয়ে এক ভদ্রলোককে প্রায় ধাক্কা দিতে গিয়েছিল। আমি ওর হাত ধরে চট করে টেনে নিলাম।

বনানী শুধু বলল, থ্যাঙ্কস্।

সান-প্ল্যাসের মধ্য দিয়ে দৃষ্টিটা একটু ঐ কোণার দিকে নিতেই বেশ বুঝতে পারলাম বনানীর হাত ধরার জন্যে অনেকের হার্ট অ্যাটাক্ হতে হতে হয়নি।

এসব আমি জানি। কি করি বল? সবার সঙ্গে আমি মিশতে পারি না। কিন্তু যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি, তাদের সবার সঙ্গেই এমনি সহজ, সরল, স্বাভাবিকভাবেই মিশে থাকি। বনানী, অতসী ও আরো অনেকেই একথা জানে। মেমসাহেব তো জানেই।

এই যে অতসী! যাঁরা জানেন না তাঁরা কত কি কল্পনা করেন আমাদের দুজনকে নিয়ে।

তুমি কি অতসীর কথা শুনেছ? ও যে জাস্টিস রায়ের একমাত্র কন্যা সে কথা নিশ্চয়ই জান। তারপর ওর মা হচ্ছেন অভারতীয়, আইরিশ মহিলা। সুতরাং সংস্কারের বালাই নেই, নেই অর্থের অভাব। লেখাপড়া শিখেছে পাবলিক স্কুলে, পরে বি-এ পাশ করেছে অক্সফোর্ড থেকে। এখন তো ফরেন সার্ভিসে।

অতসী যখন অক্সফোর্ডে পড়ে তখনই আমার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয়। তার পরের বছর ও যখন দেশে ফেরে, তখন আমিও ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরছি। একই প্লেনে দুজনে লন্ডন থেকে রওনা হই। পথে দুদিন বেইরুটে ছিলাম।

সেই দুটি দিন আমরা প্রাণভরে আড্ডা দিয়েছি। দিনের বেলায় বীচে বসে, সন্ধ্যার পর সেন্ট জর্জ হোটেলের বার বা লাউঞ্জে বসে একটু আধটু ফ্রেঞ্চ ওয়াইন খেতে খেতে গল্প করেছি। দিল্লী রওনা হবার ঠিক আগের দিন গভীর রাত্রে অতসীর মাথায় ভূত চাপল। বলল, চলুন, নাইট ক্লাব ঘুরে আসি।

'এত রাত্রে?'

'হোয়াটস্ দি রঙ?'

'কাল সকালেই তো আবার রওনা হতে হবে। তাই আর কি!'

'নাইট ক্লাবগুলো তো গভর্ণমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার অফিস নয় যে দশটা-পাঁচটায় খোলা থাকবে! নাইট ক্লাব তো রাত্রেই খোলা থাকে।'

অতসী আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজী নয়। বলে, কাম অন! ফিনিশ ইওর গ্লাস।

চক্ষের নিমেষে বাকি শ্যাম্পেনটুকু গলা দিয়ে ঢেলে দিল অন্তরের অজানা গহ্বরে। ইচ্ছা ছিল না কিন্তু বাধ্য হয়ে আমিও শেষ করে উঠলাম। চলে গেলাম 'ব্ল্যাক এলিফ্যান্ট'!

পালামে মেমসাহেব এসেছিল আমাদের রিসিভ করতে। অতসী ওকে কি বলেছিল জান? বলেছিল, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর একজন জার্ণালিস্ট যে এত কনজারভেটিভ হয়, তা আমি ভাবতে পারিনি।

মেমসাহেব একটু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কেন কি হয়েছিল?

'মাই গড! কি হয়নি তাই জিজ্ঞাসা কর। অতসী রায়ের ইনভিটেশনে নাইট ক্লাবে যেতে চায় না!

মেমসাহেব হাসতে হাসতেই একবার আমাকে দেখে নেয়। অতসী বলে, তুমি আর হাসবে না! যে অতসী রায়ের সঙ্গে লন্ডনের ছোকরা ব্যারিস্টাররা এক কাপ কফি খেতে পেলে ধন্য হয়, সেই আমার সঙ্গে বেইরুটের 'ব্ল্যাক এলিফ্যান্টে' বসে শ্যাম্পেন খেতে দ্বিধা করে তোমার এই অপদার্থ প্রসপেকটিভ্ গার্ডিয়ান!

মেমসাহেব বাঁকা চোখে এক ঝলক আমাকে দেখে নিয়ে বলে, আই অ্যাম সরি অতসী। আই প্লীড গিল্টি......

মেমসাহেবের গাল টিপে দিয়ে অতসী বলে, অত ভালবেসো না। ছোকরাটার মাথাটা খেলে!

যাইহোক সেবার ঢাকা থেকে লন্ডন যাবার পথে প্রথমে কলকাতা, পরে দিল্লী এলো। কলকাতা থেকে সে যে মেমসাহেবকে নিয়ে এসেছে, তা জানতাম না। দিল্লী আসার খবরটাও আগে পাইনি। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় অতসীর টেলিফোন পেয়ে চমকে গেলাম।

'কি আশ্চর্য! আসার আগে একটা খবর দিলে না?'

অতসী দুঃখ প্রকাশ করে, ক্ষমা চায়। শেষে একবার জরুরী কারণে জনপথ হোটেলে তলব করে।

আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লারিজে হাজির হই। দোতলায় উঠে করিডর দিয়ে একবারে কোণার দিকে চলে যাই। দরজা নক্ করি।

কোন জবাব পেলাম না। আবার নক্ করলাম।

এবার উত্তর পাই, যাস্ট এ মিনিট।

দু'এক মিনিটের মধ্যেই অতসী দরজা খুলে অভ্যর্থনা করে। আদর করে ভিতরে নিয়ে যায়।

'কি ব্যাপার? এবার যে একটা খবরও দিলে না?

'বিলিভ মী, ইট অল হ্যাপেনড্ সাডেনলী। তাছাড়া কলকাতা থেকে বুকিং করতেই বড্ড ঝামেলা পোহাতে হলো।'

'কদিন কলকাতায় ছিলে?'

'তিন দিন।'

'ডিড ইউ মীট মেমসাহেব?'

'মাই গড! মেমসাহেব ছাড়া কি কোন চিন্তা নেই আপনার মনে?'

'নিশ্চয়ই আছে। তবে আফটার মেমসাহেব।'

হাত দিয়ে আমার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে অতসী জানতে চায়, আমিও তাই?

'তুমি তো অন্য ক্যাটাগরীর।'

অতসী কেমন যেন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। বলে, কেন, আমি কি আপনার মেমসাহেবের জায়গায়......

আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। শুধু বলি, অতসী, আমার অনেক কাজ আছে। এখন চলি, পরে দেখা হবে।

অতসীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়। দু'হাত দিয়ে আমার দুটো হাত চেপে ধরে। বলে, না, তা হবে না। আপনি এখন আমার কাছেই থাকবেন।

আমি অবাক হয়ে যাই। ভেবে কুল-কিনারা পাই না অতসীর এই বিচিত্র পরিবর্তনের কারণ। মুহূর্তের মধ্যে নারী-চরিত্রের বিচিত্রধারার নানা সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে নিলাম। ভাবলাম, মনের টান, না দেহের দাবী? বড়লোকের মেয়ের খামখেয়ালী নাকি......

অতসীকে নিয়ে আমার অত শত চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম না। যা ইচ্ছে তাই হোক। আমি ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লেই হলো।

আরো একটু চিন্তা করি। ডিপ্লোম্যাট হয়ে ডিপ্লোম্যাসী করছে না তো?

আমি বললাম, অতসী, ঘোড়ার গাড়ীর একটা কোচোয়ানের হাতে ইম্পালা দিয়ে খেলা করতে তোমার ভয় হচ্ছে না?

'ওসব হেঁয়ালী ছাড়ুন। আই অ্যাম ফিলিং লোনলি, উড ইউ গিভ মী কম্পানী অর নট?'

'হোয়াই নট হ্যাভ বেটার কম্পানী?'

'আমার খুশী।'

'কিন্তু আমার তো খুশী নাও হতে পারে?'

এক ঝলক অতসীকে দেখে নিলাম। দু'হাত দিয়ে অতসীর ডান হাতটা টেনে [illegible] বললাম, [illegible] যাই।

আমি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে কানে ভেসে এলো, শোন!

থমকে দাঁড়ালাম কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে যাবার ভয়ে পিছন ফিরলাম না। মনের ভুল?

'শোন'।

আমার জীবন-রাগিণীর সুরকারের ঐ কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার শোনার পর যার নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। পিছন ফিরলাম।

কি আশ্চর্য! মেমসাহেব।

অতসীর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে হাসতে মেমসাহেব ডাক দিল, কই শোন!

আমি প্রায় দৌড়ে গেলাম। মেমসাহেব আমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, তুমি!

সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, মিষ্টি গলায় মেমসাহেব বলল, কি করব বল, অতসী জোর করে নিয়ে এলো।

তুমি বেশ কল্পনা করতে পারছ তারপর ক্লারিজ হোটেলের ঐ কোণার ঘরটায় কি কাণ্ড হলো! প্রথমে আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আমি অতসীকে জড়িয়ে ধরে বললাম, টেল মী অতসী হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

অতসী বলল, বেশী কিছু চাইব না। শুধু অনুরোধ করব আগামী সাত দিন এদিকে এসে দুটি যুবতীকে বিরক্ত করবেন না।

'প্রতিজ্ঞা করছি বিরক্ত করব না, তবে তোমাদের আনন্দ দেবার জন্য, সুখী করার জন্য নিশ্চয়ই আসব।'

মেমসাহেব টিপ্পনী কেটে বলল, অতসী ওসব কল্পনাও করিস না। পুরুষদের যদি অত সংযম থাকত তাহলে পৃথিবীটা সত্যি পাল্টে যেত।

আমি মেমসাহেবকে বলি, বিশ্বামিত্রের মত কাজকর্ম নিয়ে আমি তো বেশ ধ্যানমগ্ন

ছিলাম কিন্তু তুমি মেনকা দেবী এক হাজার মাইল দূরে নাচতে এলে কেন?

তারপর ঐ ঘরে বসেই তিনজনে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলাম। মেমসাহেব বলল, জান, অতসীর সঙ্গে আমার কি বাজী হয়েছে?

'কি?'

অতসী বলে, না, না, কিছু না।

আমি বলি, থাক মেমসাহেব, এখন বলো না। অতসী ঘাবড়ে গেছে।

অতসী কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বলল, তাহলে আমিই বলি শুনুন। বাজী হয়েছিল যে আমি যদি আপনাকে ভোলাতে পারি তাহলে কাজলদি আমাকে একটা শাড়ী প্রেজেন্ট করবে। আর আমি হেরে গেলে আমি কাজলদিকে একটা শাড়ী প্রেজেন্ট করব।

এতক্ষণে বুঝলাম অতসী কেন আমার সঙ্গে অভিনয় শুরু করেছিল।

আমি বললাম, অতসী, তোমার কাজলদিকে তোমার শাড়ী কিনে দিতে হবে না। তুমি যে তোমার কাজলদিকে টেনে আনতে পেরেছ, সেজন্য তুমিই তো প্রথমে শাড়ী পাবে।

আমি দুজনকেই শাড়ী কিনে দিয়েছিলাম। দুজনেই খুশী হয়েছিল। আমিও খুশী হয়েছিলাম। একটা সপ্তাহ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

অতসী আমাদের দুজনকে সত্যি ভালবাসে। ও মেমসাহেবকে কাজলদি বলে কেন জান? অতসী বলত মেমসাহেবের চোখ দুটিতে স্বয়ং ভগবান সযত্নে কাজল মাখিয়ে দিয়েছেন। সেজন্যই অতসী মেমসাহেবকে কাজলদি বলত। ভারী চমৎকার নাম, তাই না?

যাইহোক এদের আমি ভালবাসি, আমি এদের কল্যাণ কামনা করি। ওরাও আমার মঙ্গল কামনা করে। আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু মেমসাহেবের স্মৃতিকে ম্লান করতে পারে না কেউ। পারবে কেন বল? আমার ভবিষ্যতের জন্য মেমসাহেব যে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল, তার কি কোন তুলনা হয়? হয় না।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। আমার জীবনের সেই অমাবস্যার রাতে শুধু মেমসাহেবই এসেছিল আমার পাশে। প্রেম দিয়েছিল, ভালবাসা দিয়েছিল, অভয় দিয়েছিল আমাকে। নিজের প্রাণের প্রদীপের মঙ্গল-আলো দিয়ে আমাকে সেই তিমির রাত্রি থেকে প্রভাতের স্বারদেশে এনে দিয়েছে আমার সেই মেমসাহেব। তাইতো আর সে স্মৃতিকে ম্লান করার ক্ষমতা শত সহস্র বনানী বা অতসীর নেই।

সেবার বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর মেমসাহেব আমাকে বলল, তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে নতুন কিছু ভাবনি?

'ভেবেছি বৈকি।'

'কি ভেবেছ?'

'ভেবেছি যে কলকাতার মায়া কাটিয়ে একটু বাইরে চেষ্টা করব।'

'তবে করছ না কেন?'

'কিছু অসুবিধা আছে বলে।'

মেমসাহেব ছাড়ার পাত্রী নয়। তাছাড়া আমার জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকা আজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাইতো একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে মেমসাহেব আমার হাতে দু'শো টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, একবার দিল্লী বা বোম্বে থেকে ঘুরে এসো। হয়ত একটা কিছু জুটেও যেতে পারে।

প্রথমে টাকাটা নিতে বেশ সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমার কল্যাণই ওর কল্যাণ। সুতরাং আমার জন্য শুধু দু'শো টাকা কেন আরো অনেক কিছু সে হাসি মুখে দিতে পারে। তাছাড়া আমার কল্যাণ-যজ্ঞে তার আহুতি প্রত্যাখ্যান করার সাহস আমার ছিল না। তবুও টাকাটা হাতে করে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মেমসাহেব জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছ?

'না কিছু না।'

'তবে এমন চুপ করে রইলে?'

'এমনি।'

মেমসাহেব আমার হাতটা টেনে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল, আমি বলব তুমি কি ভাবছ?

'বলো।'

'সত্যি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার টাকা নিতে তোমার লজ্জা করছে, অপমানবোধ হচ্ছে। তাই না?'

'না, না, তা কেন হবে।' আমি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি।

মেয়েদের মন আমাদের চাইতে সতর্ক, অনেক হুঁসিয়ার। তাইতো মেমসাহেব বলে, স্বীকার করতে লজ্জা করছে?

আমি কোন উত্তর দিই না। চুপ করেই বসে থাকি। মেমসাহেবও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, তুমি এখনও আমাকে ঠিক আপন বলে ভাবতে পার না, তাই না।

আমি তাড়াতাড়ি মেমসাহেবের কাছে এগিয়ে যাই। ওর মাথার হাত বুলাতে বুলাতে বলি, ছি ছি, মেমসাহেব, ওকথা কেন বলছ?

একটু থামি।

আবার বলি, তোমার চাইতে আপন করে আর কাউকেই তো পাইনি।

'আপন ভাবলে আজ তোমার মনে এই দ্বিধা আসত না।'

আমি আরো কিছু সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু একটু পরে খেয়াল করলাম মেমসাহেবের চোখে জল।

তাড়াতাড়ি মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে টেনে নিলাম। চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। একটু আদরও করলাম। শেষে ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো চেপে বললাম, পাগলী কোথাকার!

মেমসাহেব আমার কোলের মধ্যে শুয়ে রইল কিন্তু তবুও স্বাভাবিক হতে পারল না। কিছু পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, তোমার এত কাছে এসেও তোমাকে পাব না, তা কল্পনা করতে পারি নি।

'লক্ষ্মীটি মেমসাহেব আমার। তুমি দুঃখ করো না।'

মেমসাহেব উঠে বসল। একটু স্থির দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। মুহূর্তের জন্য চিন্তার সাগরে ডুব দিয়ে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। তারপর বলল, আমাদের জীবনে সংস্কারের একটা বিরাট ভূমিকা আছে, তাই না?

'হঠাৎ একথা বলছ?'

ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি এনে মেমসাহেব বলে, অপরিচিত দুটি ছেলে-মেয়েকে কলাতলায় বসিয়ে একটু মন্ত্র পড়লেই তারা কত আপন হয়। ঐ সংস্কারটুকু ছাড়া যত কাছেই আসুক না কেন, দুটি ছেলেমেয়ে ঠিক আপন হতে পারে না।

তারপর আমার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করে, তাই না?

'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? আমাকে অপমান করছ?'

'ছি, ছি, তোমাকে অপমান করব। শুধু বলছিলাম যে আমি যদি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী হতাম তাহলে আমার গয়না বিক্রী করে তোমার মদ্যপান বা যত্রতত্র গমনের অধিকার থাকত কিন্তু......।'

আমি তাড়াতাড়ি ওর মুখটা চেপে ধরে বলি, আর বলো না। মন্ত্র না পড়লেও তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্বামী।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। একটু পরে গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

চাঁদটা হঠাৎ একটু মেঘে ঢাকা পড়ল। আর সেই অন্ধকারের সুযোগে আমি—।

মেমসাহেব সঙ্গে সঙ্গে দাবড় দিয়ে বলল, আবার অসভ্যতা!

হেস্টিংস থেকে এগিয়ে এসে আউট্রাম ঘাটের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে আমরা আবার মিশে গেলাম নগর কলকাতার জনসমুদ্রে।

কিন্তু জান দোলাবৌদি, সে রাত্রে আনন্দে আর আত্মতৃপ্তিতে ঘুমুতে পারিনি। তোমার জীবনেও তো এমনি দিন এসেছিল। এবার কলকাতা গেলে সেদিনের কাহিনী না শোনালে তোমার মুক্তি নেই।

—তোমাদের বাচ্চু

মাথা ঠিক রেখে চলুন

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

হাল আমলের নানাবিধ সমস্যার আক্রমণে আমরা এমনই বিব্রত হয়ে পড়ছি যে, আমাদের অনেকেরই পক্ষে মাথা ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। হয়ত রাঁচীর পাগলা-গারদে দলে দলে ভর্তি হচ্ছি না, কিন্তু আমাদের দিনের আচার-আচরণগুলো যদি যাচাই করে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব, যে জিনিসটি করার পেছনে কোন যুক্তি নেই, তা নিয়েই আমরা মাথা খারাপ করে চলেছি। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মাথা ঠিক রেখে চললে আমাদেরই আখের ভালো হয়, এ ধরনের উপদেশ বাক্য আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কি ভাবে যেন ভুলে বসে আছি।

অবাক হচ্ছেন? না, না 'খ' বনে যাবার কোন কারণ নেই। আমি হলফ করেই বলতে পারি আমাদের মাথা যে ঠিক নেই তার প্রমাণ যে-কোন দিন অফিসগামী বা অফিস-ফেরত যাত্রীবাসে নিজেকে দিয়ে বা অপর সহযাত্রীকে দিয়ে আপনি সহজেই পেতে পারেন। ক্ষণস্থায়ী সামান্য একটু অসুবিধে উপলক্ষ করে যে ধরনের তিক্ত অনভিপ্রেত, সময় সময় তীব্র কটাক্ষসমন্বিত বাদানুবাদে আমরা প্রবৃত্ত হই, তাতে আমাদের মস্তিষ্ক যন্ত্রটির যে মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বস্তুতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অস্তিত্বের যে সর্বনাশা সংকট, তা আমাদের মানসিক অবস্থাকেও শুধু বিপর্যস্ত করছে না, আমাদের ভবিষ্যত জীবনকেও অন্ধকার আবর্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কি করে ধীরস্থির ভাবে এই সংকটকে পর্যুদস্ত করতে পারব আমরা। লড়াই করতে হলে সবচেয়ে যা প্রয়োজন, তা হল একটি ধীর-স্থির মস্তিষ্ক। কিন্তু প্রতিটি সমস্যার হাতে নিজেকে কোণঠাসা হতে দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে যদি আমরা লঘু করে ফেলি তাহলে আমাদের গোটা জীবনটাই ত অকূলে ভেসে যাওয়া দড়িছেঁড়া ভাঙা নৌকোর রূপ ধারণ করে।

সমস্যার গুরুত্ব যতখানি তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমরা মাথাকে বেঠিক চলতে দিলে সমস্যা ত তাতে মেটেই না, বরং ঈপ্সিত ফলের বিপরীতই ঘটে। আমরা কি চাই, সে সম্বন্ধে সঠিক চিন্তা করবার মত ধীরতা স্থিরতাকে যদি আমরা পাশ কাটিয়ে চলি, তাহলে ফল যে শূন্যই হবে এতে দ্বিমতের অবকাশ নিশ্চয়ই নেই। খ্যাতনামা হাসির গল্পের লেখক জেমস থারবার একটি বেশ মজার গল্প লিখেছেন, জনৈক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কথা-বার্তা প্রসঙ্গে। উনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন বটে, কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যে একটা সঙ্কোচের জড়তা। থারবার লিখছেন যে কথাগুলো তিনি বলেননি, অথচ কথা-গুলো তিনি কথা বলতে বলতে ভাবছিলেন নিজের মনে। সে কথাগুলো এমনই উল্টোপাল্টা সেগুলো যদি বাক্যে উচ্চারিত হত তাহলে তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে কারোই দেরী হবার নয়।

কিন্তু উপায় কি, মাথা ঠিক রাখার সরলীকৃত কোন পন্থা আছে কি? বলা বাহুল্য, এ গুণ জন্মদত্ত নয়, মানবিক অন্যান্য গুণাবলীর মত এটিও অর্জন সাপেক্ষ। এবং মাথা ঠিক রেখে যাঁরা চলার অভ্যাসটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছেন, তাঁরা আমাদের মত দিশাহারাদের কাছে ঈর্ষণীয়ও বৈকি।

প্রতিষ্ঠা না হলেও, আমারও চাই নিজের ছোট মাপের জীবনেও সুখ-শান্তি। আর তা পেতে গেলে বহু সমস্যার নদী আমাকেও পেরোতে হবে। তাহলে আমার কর্তব্য কি হবে? এ ক্ষেত্রেও আপনার আমার জন্যে মনোবিজ্ঞানীরা কিছু উপদেশ নিয়ে তৈরী। শুনে রাখতে দোষ নেই, কাজে লাগাই আর নাই লাগাই। যেমন—

...১, একটু রগড় করতে শেখা নাকি আমাদের খুবই দরকার। মন যখন ভার ভার, তখন চলে যান আড্ডায়। মাথায় হাত দিয়ে বসে না থেকে অপরের হাসির কথায় যোগ দিন, টিপ্পনী কাটুন। দেখবেন মন কখন দিব্যি ঝরঝরে হয়ে গেছে।

২, টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটবেন না, ঘাঁটা-ঘাঁটিতে পড়বার ভাতে সম্ভাবনা বেশী। কত তাড়াতাড়ি ভেবে ঠিক করতে পারি এ ধরনের আত্মপ্রসাদের চাইতে, সময় দিয়ে ভাবার ফলই ভাল।

৩, অপরের ওপর নিজের মতামত চাপাতে চাইবেন না। নিজে যা ভেবেছেন, তা নিয়ে তাকে ভাবতে দিন।

৪, বাসের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইদানীং আমরা তুচ্ছ কারণে ফুঁসে উঠি, কিন্তু আমাদের সেই ফুঁসে ওঠার পেছনে সত্যিই কোন কারণ আছে কিনা আমরা তা বুঝতেও চাই না। ধরুন আপনার সহ-যাত্রীর অনিচ্ছাকৃত পাই পাতে আপনার পা একটু পিষ্ট হতে, সে বেচারী ভদ্রলোক সত্যিকার লজ্জিত হয়েই দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু আপনি তাকে ব্যঙ্গ করলেন তীক্ষ্ণ একটি বাক্য প্রয়োগে। নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন সে সন্ধ্যাটি আপনাদের দুজনেরই খারাপ যাবে।

৫, অকপট সারল্যের দাম সত্যিই ফুরোয়নি। সত্যি কথা বললে ব্যক্তিত্ব খাটো হয়ে যায় না, বরং সব ক্ষেত্রেই একটা হৃদ্য পরিবেশ সৃষ্ট হয়ে তা আপনার অনুকূলেই যায়।

৬, পরিশেষে, জেলে কর্তৃক মাছ ধরবার কথা শুনে যে মৎস্যটি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পুকুর ছেড়ে চলে গেল বা মাথা না ঘামানোর জন্য জালে ধরা পড়ল তাদের চেয়ে যে মৎস্যটি মাছ ধরার সময় মরা সেজে পড়ে রইল সেইই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। সমস্যা ছেড়ে পালানো যেমন বোকামি, তেমনি সমস্যা সম্বন্ধে নির্বিকার থাকাও অসম্ভব।

এক পথ আমাদের সামনে খোলা তা হল সমস্যার সামনে 'মাথা ঠিক রেখে' তাল ঠুকে দাঁড়ানো।

তা যদি না দাঁড়াতে পারি, তাহলে তাতে শুধু আমাদের মনই ভাঙবে না, নষ্ট হবে আমাদের দেহটিও। মানসিক অস্থিরতার মত আর কোন বড় ব্যাধির কথা চিকিৎ-সকেরা ভাবতেও পারেন না।

সুখ কি তার কোন সংজ্ঞা হয়ত আমা-দের জানা নেই কিন্তু যিনি বিপদে ও সমস্যায় মাথা স্থির রেখে কাজ করে চলে যেতে পারেন, তিনি নিশ্চিত সুখ নামক বস্তুটির প্রীতিজনক সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

• বিদেশী নিবন্ধ সূত্রে।

অংগনা

প্রমীলা

সান ফ্রান্সিসকো—ন'টি ছেলেমেয়ের জননী ৪৫ বছর বয়স্কা মিসেস আইলিন হোয়াইট ও আটটি পুত্রকন্যার পিতা মৃতদার দমকল-কর্মী ফ্র্যাংক ম্যাকহাগ জেমার্সে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে সংকল্প করেছেন। এঁদের সঙ্গে দুজনের মোট ১৭টি পুত্রকন্যাকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে। আটখানা ঘর আছে এইরকম একটা বাড়ির সন্ধানে এঁরা এখন ব্যস্ত আছেন।

বিদেশিনীর চোখে বাঙলা দেশ

আলাপ হচ্ছিল মিচিগান স্টেট ইউ-নিভারসিটির ছাত্রী মিসেস মেরী জেনস্ বীচ এবং তাঁর স্বামী রবার্ট পল বীচের সঙ্গে। অদূরে মেঝের উপুড় হয়ে বসে একটা বড়ো খাতার পাতা ভর্তি করে পেন্সিল দিয়ে একমনে কত-কিছু এঁকে চলেছে রবী। মিস্টার ও মিসেস বীচের দুই ছেলে—কিমী ও রবী। রবী ছোট।

মিস্টার বীচ বাংলা জানেন না। জানালেন, ছেলেরাও জানে না। রবী সে সময় [illegible] [illegible] আঁকা ছবিগুলো দেখাতে এসেছিল। সে তৎক্ষণাৎ বাবার কথার প্রতিবাদ করে জানালো, না না তার বেলা এ-কথা খাটে না। দাদা মাত্র দুটো বাংলা শব্দ জানে। কিন্তু সে দাদার থেকে অনেক বেশি জানে। বলেই উৎসাহের সঙ্গে বাবাকে তার আঁকা ছবিগুলো দেখাতে লাগল। তারপর রবী একের পর এক ছবিগুলোর নাম বলে যেতে লাগল।

মিসেস বীচ সমাজ-বিজ্ঞানের ওপর গবেষণা করছেন। এই গবেষণার সূত্রেই তিনি বাংলা দেশে এসেছেন। তাঁর বিষয় বারো-তেরো থেকে উনিশ-কুড়ি বছরের

ছেলেমেয়েদের নানান সমস্যা, তাদের মানসিক গতি-প্রকৃতি। গত এক বছর ধরে হাওড়া, উত্তর-কলকাতা এবং দক্ষিণ-কলকাতার একটা বস্তিতে তিনি সমীক্ষা চালান। তাঁর প্রশ্নগুলো ছিল : এইসব ছেলে-মেয়েদের শখ কী? পড়াশুনায় তাদের আগ্রহ কী রকম, তারা হাত-খরচের পয়সা কোথায় পায়? অবসর কী করে কাটায়, পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে কে বেশি প্রিয়—মামা, কাকা না অন্য কেউ। মা-বাবার পছন্দ মতোই বিয়ে করা পছন্দ করে না নিজেরাই পছন্দসই ঘর বাঁধে ইত্যাদি।

মিসেস বীচ বললেন : ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় আগ্রহ বেশ। কিন্তু নানান অসুবিধায় তারা পড়াশুনা করতে পারে না। মধ্যবিত্ত পরিবারের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েই ট্যুইশ্যানি করে, বা অবসর সময়ে কাজকর্ম করে নিজেদের হাতখরচ চালায়। কমবয়সের ছেলেমেয়েরা মা-বাবার পছন্দমতোই বিয়ে করা পছন্দ করে। কিন্তু বেশি বয়সের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশ নিজেদের পছন্দ মতো বিয়ে করার পক্ষপাতী।

একটু থেমে আবার তিনি বললেন, আর-একটা বিষয় আমি জানতে চাই। আপনাদের 'তাই তাই মামাবাড়ি যাই' ছড়াটা কতদূর সত্যি? ছেলেমেয়েরা এখনো মামা-বাড়ি যায় কি না, তাদের ওপর মামার প্রভাব কতখানি?

আমি হেসে বললাম, 'আজকাল আর সেই আম-কাঁঠাল কোথায়, দুধ-ক্ষীরই বা কোথায় যে ছেলেমেয়েরা মামাবাড়ি যাবে। সে রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই। কিন্তু আপনি সমীক্ষায় কী দেখলেন?'

'আমি এখনো গুনে দেখিনি। অনেকে বলেছে তার মামাকে সবচেয়ে ভালো লাগে, কেউ কেউ বলেছে কাকাকে, কেউ-বা পিসিকে।' ধীরে ধীরে নির্ভুল চমৎকার বাংলায় কথাগুলো বল্লে গেলেন মিসেস বীচ।

মিসেস বীচকে তাঁর সমীক্ষার কাজে সহায়তা করছেন শ্রীমতী সবিতা ভট্টাচার্য। তাঁর কাছেই প্রথম মিসেস বীচের কথা শুনি। তিনি আগেই বলেছিলেন, মিসেস বীচ সুন্দর বাংলা জানেন। কিন্তু এতটা যে ভালো জানে ভাবতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'মিসেস বীচ, আপনি এত সুন্দর বাংলা কোত্থেকে শিখলেন? এখানে এসে?'

—না, আমেরিকাতেই শিখেছি। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বাংলার ক্লাস হয়।'

একটু চুপ থেকে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মিসেস বীচ, এত

সর্বত্র সাফল্য

সাধনার শুরু সেই চার দশকের পদপাতে। সেই থেকে প্রাণপাত যত্ন আর অবিরাম চেষ্টা। এর মধ্যে যাকে কথায় বলে—রাঁধা আর চুল বাঁধা তাও আছে—আছে ছাত্রীজীবনের বিবিধ দায়িত্ব, স্বপ্নসাধ, মধ্যবিত্ত বাঙালী মেয়ের নানান দায়-দায়িত্ব, চিন্তা-ভাবনা। এর মধ্যেই সব দিক বাঁচিয়ে যেন প্রাণায়াম করে যাওয়া—অপ্রাপনীয়কে পাবার তপস্যায় মগ্ন হওয়া। কত বাধার প্রাচীর দু হাতে ঠেলে, কত ভয়াল ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে, কত নিন্দা-পরিবাদে ভেঙে না পড়ে 'একক' হওয়ার দুরন্ত বাসনায় 'একা' পথ চলা। নিজ লক্ষ্যে স্থির ও সাধনায় অতন্দ্র ছিলেন বলেই আজকে আমাদেরই একজন চ্যানেল-বিজয়িনী, গিরিশৃংগবিজয়িনী বোনেদের মতই প্রমোদরঙ্গের এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাঙালী মেয়েদের শ্রেষ্ঠত্বের পতাকা প্রোথিত করেছেন। মেয়েরা সব পারে—বিশেষ করে বাঙালী মেয়েরা। 'নিষিদ্ধ এলাকা' বলে বৃহত্তর জীবনের রন্ধ্র রন্ধ্রে ভয়ঙ্কার স্থান-গুলি থেকে আজ আর মেয়েদের দূরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাদের মনের গোপন কোণে গুনগুনিয়ে ফিরছে 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে'-র বীজমন্ত্র, প্রকাশ্যে অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিজ্ঞাপূরণের সেই বুদ্ধ-বাণী : ইহা সনে শুষ্যতে মে শরীরম...নিজেদের অভি-নিবেশের পরিশ্রমের দৃঢ় মননের ও সংকল্পের আলোয় তারা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংগ্রামী-সাধিকার ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

পুরুষ-অধ্যুষিত প্রমোদ অঙ্গনের একটি বিশেষ ক্ষেত্রের রুদ্ধদ্বার সম্প্রতি কুমারী উমা দাশগুপ্ত উন্মোচন করেছেন 'একক' 'শোম্যানশিপে'র শ্রেষ্ঠতায়, পরিবেশন-প্রদর্শনকুশলতার লাবণ্যপুষ্পিত আঙ্গিকে বিষয়বস্তুকে শিল্পরূপে ও উপভোগ্যতায় জারিত করে। নিউ এম্পায়ারের প্রেক্ষাগৃহে 'একক' ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে তিনি যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন ইতিমধ্যে আর কোন ভারতীয় মহিলার পক্ষে তা সম্ভব হয় নি যদিচ সহকারী হিসেবে মহিলাদের এ জগতে পদার্পণ নতুন নয়। 'সহকারী' শব্দটি যেন একটি কথার কথা—বস্তুত ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে পুরুষের ভূমিকাই ছিল প্রধান। আর মহিলারা? তাদের ভূমিকা একান্তভাবে গৌণ—অতি তুচ্ছ। কুমারী দাশগুপ্ত কিন্তু 'একক' ইন্দ্রজালের আসর কলকাতার শ্রেষ্ঠ রঙ্গভূমিতে বসিয়ে প্রমাণ দিলেন মেয়েরাও পারে—এবং পারে শ্রেষ্ঠত্বের সার্থকতা অনায়াস ভঙ্গিতে আনতে।

অথচ কত সাধারণ তিনি। একেবারে সাদামাটা অতি সাধারণ মেয়ে। আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ে থেকে তাঁকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের বৃহৎ পটভূমিকায় দর্শকসাধারণের সামনে তাঁর শিল্পীসত্তার আত্ম-উন্মোচন ঘটে। এক আশ্চর্য উন্মাদনার বন্যা নামে তাঁর সর্ব অবয়বে। ধীর, শান্ত সংহত, ধ্যানমগ্না সাধিকা যেন, আর তখনই তিনি হয়ে ওঠেন অনন্যা এবং অদ্বিতীয়া। বুদ্ধিদীপ্ত পরিহাস-পরিশীলিত বাচন ভঙ্গিতে পরিবেশন-প্রদর্শনের দুর্লভ চাতুর্যে সে অনন্যতা ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

জাদু-প্রদর্শনের হাতেখড়ি হয় চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর দাদা প্রখ্যাত শৌখীন ইন্দ্রজালবিদ ও সুখ্যাত ডাক্তার এস আর দাশগুপ্তের কাছে। প্রথম 'একক' প্রদর্শনীতে নামেন ১৯৪৫-এ। বেথুন কলেজে ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় একক প্রদর্শনী। সবগুলিই মাঝারি মাপের আসর। এই বেথুন কলেজ থেকেই স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরের বছর সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা পান। নাচে, গানে এবং অভিনয়েও (শৌখীন নাটকে দলে ও বেতারে) তিনি কুশলী। লেখেন মাঝে মধ্যে। নিউ এম্পায়ার মঞ্চে তাঁর প্রথম অবতরণ তাঁর গুরু ও দাদা ডাঃ দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে। এটি তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। এর পরে প্রায় দশটি সাহায্য প্রদর্শনীর ইন্দ্রজালের আসরে তিনি সহকারী হিসেবেই ইন্দ্রজালের নানা কারুকলা প্রদর্শন করে দর্শকদের অজস্র সাধুবাদ ও অভিনন্দন কুড়িয়েছেন

জায়গা থাকতে বাংলা দেশে এলেন কেন আপনার সমীক্ষার জন্যে?'

'আমি দেশে থাকতেই—বাংলা শিখবার সময়ে এদেশের সাহিত্য, নাটক, সংগীত এবং সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের কথা শুনি। ওখানে আমার সঙ্গে কিছু বাঙালি ছাত্রের পরিচয় ছিল। তাদের মুখে এ-দেশের কথা এত শুনেছি যে অনেকদিন থেকে বাঙলা দেশ দেখবার ইচ্ছে ছিল,—তাই এলাম।' মিষ্টি করে থেমে থেমে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি।

'আপনার কাছে এদেশের সবচেয়ে কী ভালো লেগেছে?'

একটুও না ভেবে জবাব দিলেন, 'মানুষ।'

বললাম, 'তা তো বটেই', মানুষ দিয়েই তো দেশের পরিচয়। লোক ভালো হলেই দেশ ভালো। তা কী দিয়ে এদেশের মানুষ আপনার মন জয় করল?'

'ব্যবহার। এরা খুব ভালো। সরল। আমি যখন আমার কাজে তাদের কাছে গেছি, অনেকে আমাকে চা খেতে ডেকেছে। অনুরোধ এড়াতে না পেরে অনেক সময় চা খেতে হত। একবাড়িতে ভাতও খেয়েছি।'

'বাংলা দেশের আর কী ভালো লাগে?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'মিষ্টি—সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়েস। দইও ভালো লাগে। রোজ খাই। দেশে ফেরার সময় রসগোল্লা নিয়ে যাব।' খুশি-খুশি মুখে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি।

'পায়েস করতে জানেন?'

'শিখে নিয়েছি।' বলে একটু হেসে ফেললেন। 'একটু বসুন আসছি।' বলে ভিতরে চলে গেলেন।

মিস্টার বীচ এতক্ষণ মুখে টপাটপ কাজু বাদাম ফেলছিলেন। তার দিকে চেয়ে বললাম, 'শুনলাম কাল পার্টিতে গিয়েছিলেন।'

'না না—বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে এক ফ্রেন্ডের বাসায় ফোক সঙ শুনতে গিয়েছিলাম।' বোধহয় কাজুবাদাম খাওয়ার তালে খেয়াল ছিল না যে, তিনি বাংলা জানেন না।

'কী ব্যাপার মিস্টার বীচ,—এই যে বললেন বাংলা জানেন না।'

আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে বললেন, 'একটু একটু বুঝি।' কথায় কথায় তিনি দুচারটে বাংলা শব্দ আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

মিসেস বীচ চায়ের কাপ হাতে ঢুকলেন। বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি পরা। খয়েরি রঙের শাড়ি। তাতে সাদা সাদা বড়ো বড়ো ফুলের ছাপ। গলায় একছড়া মালা। দুহাতে দুগাছ বালা। একেবারে বাঙালি। নাম মেরী না মীরা হলেই যেন মানাত বেশি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'সবির কাছে শুনলাম, তার মাসির বিয়েতে রাণাঘাট গিয়েছিলেন। বাঙালি হিন্দু-বিয়ে কেমন লাগল?'

'খুব ভালো।' মৃদুস্বরে বললেন কথাটা। মুখে লজ্জা-নম্র হাসি।

বীচ-পরিবার '৬৭-এর জানুয়ারীতে এখানে এসেছেন। আগামী মে-তে চলে যাবেন।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেছে। নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়লাম। দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে স্বামী-স্ত্রী একযোগে বললেন, 'নমস্কার। আবার দেখা হবে।'

'কী করে? আপনারা কি আবার আসবেন?'

'নিশ্চয়। এ-দেশ আমাদের খুব ভালো লেগেছে।'

—গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

এই মঞ্চে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন শহরে তিনি 'একক' প্রদর্শনী করেছেন। সংগৃহীত সব অর্থই অর্পিত হয়েছে সমাজসেবার নানান সাহায্য ভাণ্ডারে। ১৯৬৫ সালটি তাঁর জীবনে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। আর সহকারী ভূমিকা নয়। 'একক' আসর বসল নিউ এম্পায়ারে—এই প্রথম 'প্রধান' ভূমিকা তাঁর, একান্তভাবে 'একক' অনুষ্ঠান তাঁর আমজনতার দরবারে: স্মরণীয় ঘটনা বৈকি। মনে রাখবার মতও। প্রথম 'একক' আয়োজনের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে আবার দর্শকের অভিবাদন জানালেন ১৯৬৬ সালে নিউ এম্পায়ারের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রশংসা সাফল্য খ্যাতির যেন ঝড় বয়ে গেল।

কুমারী দাশগুপ্ত দীর্ঘদিন পরে আবার দর্শকদের অভিবাদন জানান নিউ-এম্পায়ারেই বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার সকালে। এ আসরেও তিনিই 'প্রধান'। প্রত্যেক বছর নতুন কিছু উপহার তিনি দেন প্রমোদপ্রিয় দর্শকদের। ইন্দ্রজালের পুরোন অনেক অবাক-করে-দেয়া অনুষ্ঠান—'এক্স-রে আই', 'থট রিডিং' 'ফ্লোটিং এ ইয়াং লেডি', 'স্যয়িং এ গে গার্ল' প্রভৃতির সঙ্গে এ আসরে তিনি দর্শকদের উপহার দিলেন সম্প্রতি উদ্ভাবিত রহস্য-রোমাঞ্চভরা দুটি খেলা—'ভানুমতির খেলু' ও '[illegible]'।

পুস্তক বিক্রয়ের শিক্ষা কোর্সে ভারতীয় সদস্য হিসেবে বাঙালী মহিলা

ইংলন্ডে পাইকারী ও খুচরা পুস্তক বিক্রয় ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইংলন্ডের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে তুলনামূলক উদ্দেশ্যে বৃটিশ কাউন্সিল একটু শিক্ষাকোর্সের প্রচলন করেছেন। ১৯৬৮ সালে এই শিক্ষা কোর্স শুরু হয়েছে ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে। ইংলন্ড ছাড়াও পৃথিবীর বহু দেশ থেকে অনেক প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেছে। এই শিক্ষা কোর্সে ভারতের প্রতিনিধি হলেন পাঁচজন। এঁদের মধ্যে একমাত্র মহিলা সদস্য হলেন শ্রীমতী মীরা ঘোষ (গুহ)।

মীরা ঘোষ

শিক্ষা বিষয়ক কাজে শ্রীমতী ঘোষ ১৯৬৫ সাল থেকেই ইংলন্ডে আছেন। তিনি রয়াল সোসাইটির কলা বিভাগের সদস্যা। তিনি ইনষ্টিটিউশনাল ম্যানেজমেন্টেরও সহযোগী সভ্যা। এ ছাড়াও তিনি শিক্ষা বিষয়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ইংলন্ডে অবস্থানকালে শ্রীমতী ঘোষ শিক্ষা বিষয়ক প্রকাশনা সম্পর্কে [illegible] [illegible]।

চাইছে—সে ওরই পরিচিত, ওরই ভাইয়ের বন্ধু।

কিন্তু রাজাবাবুর কাছে কথাটা পাড়ামাত্র তিনি যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'কৈ, কোথায় সে? কবে আসবে? কাল? কখন আসবে বলে গেছে? খুব ভাল হয় আমার—ওর মতো একটি ছেলে পেলে।'

'কেন বলো দিকি?' সুরো একটু অবাক হয়ে যায়, 'তাকে তো চোখেও দ্যাখো নি। তাকে দিয়ে তোমার এমন কী উপকার হবে?'

'চোখে দেখিনি কে বললে? দেখেছি বৈকি!' প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দেন রাজাবাবু।

'তুমি আবার তাকে কখন দেখলে?' আরও অবাক হয় সুরবালা।

'অন্তরকমায়। তোমার চোখে দেখেছি যে তোমার মুখে তার অনেক কথাই শুনেছি সেই তো দেখা হয়ে গেছে। তুমি তাকে স্নেহ করো, বিশ্বাস করো—ভদ্রলোক জমিদারের ছেলে, সত্যিকার পরোপকারী—আর কি চাই নিজের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখলেই কি বেশি দেখা হত?'

'ও, এই!' সুরবালা হেসে ফেলে, 'কখন আসবে তা তো জানি না। আজ তো এসেছিল সেকটা নাগাদ।'

'কাল আমি এবেলাতেও থাকতুম! ভালই হল। এলেই আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও।'

কৌতূহল হয় সুরবালার, 'কী কাজ গা?'

'সে তোমার জেনে কি হবে? তুমি কি কাজ করবে?' হেসে গাল টিপে দেন ওর রাজাবাবু।

তখনও কিছু বুঝতে পারে নি সুরবালা, কী কাজের প্রস্তাব করবেন। একেবারে কিরণ আসতে ব্যাপারটা ভাঙলেন রাজাবাবু। বললেন, 'দ্যাখো, আপিসের কাজ তোমাকে দিয়ে তো লাভ নেই—যা শুনলুম সেখানেই যেতে হবে তোমাকে একদিন। আর সত্যিই, নিজের অত বিষয়-সম্পত্তি থাকতে পরের দোরে চাকরিই বা করতে যাবে কেন? তার চেয়ে আমি বলি কি, তুমি এখানেই থাকো। সকালে আসবে—সারা দিন থাকবে বাগান-টাগানে মালীগুলো কি করে না করে দেখবে একটু সময় মতো, দিদিকে দেখাশুনো করবে, ও'র কিছু দরকার হলে বাজার-হাট করে দেবে—সন্ধ্যেবেলা তোমার থিয়েটারের সময় বুঝে তার আগে চলে যাবে। বাঁধাধরা কিছু নেই—রিহার্সাল-টাল থাকলে দুপুরে বা বিকেলে যখন দরকার চলে যেও, তাতে আটকাবে না। নিজের কোন দরকার থাকলেও যেতে পারবে। যখন যাবে দিদিকে বলে যেও আমার মুখ চেয়েও থাকতে হবে না।.. দুপুরবেলা এখানেই খেও, তাছাড়া পঁচিশ টাকা দোব তোমাকে—মাইনে হিসেবে নয় ওটা হাতখরচ বলেই ধরে নিও। দ্যাখো পোষাবে তোমার?'

প্রস্তাব শুনে সুরবালা যত অবাক কিরণ তার চেয়েও বেশী। তবে দুজনের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ দু রকমের। কিরণের মুখ দেখে মনে হল—এ প্রস্তাব তার কাছে অভাবনীয় শুধু নয়—সুদূর কল্পনার অতীত কোন সৌভাগ্য। বোধহয় তাকে তখন অন্য কোন এক শ টাকা মাইনের চাকরির কথা বললেও এতটা ভাগ্যবান মনে করত না নিজেকে। সে কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবে তাই যেন খুঁজে পেল না—একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

রাজাবাবু অবশ্য তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তার স্পষ্ট সম্মতিরও না। মুখ দেখেই উত্তরটা বুঝে নিলেন। বললেন, 'তাহলে ঐ কথাই থাকল। তুমি কাল থেকেই কাজে লেগে যাও। সকালবেলা—তোমার সময় মত চলে এসো। একটা সময়ের মধ্যে যে আসতেই হবে তার কোন মানে নেই, নটা-দশটা যখন হোক এলেই হবে!'

রাজাবাবু চলে যেতে সুরবালা কিরণকে বলল, 'এ কাজ নিয়ে তোমার লাভটা কি হল? যেতে-আসতে গাড়ি ভাড়াতেই তো সব বেরিয়ে যাবে। পঁচিশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা তো যাবেই। মিছিমিছি এই টানা-পোড়েন, সারা দিনের দায়িত্ব নিতে গেলে কেন? কী বোকা তুমি!'

কিরণের মুখখানা অকস্মাৎ যেন টকটকে লাল হয়ে উঠল। আমতা-আমতা করে বলল, 'না, তা কেন? একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকা, সারা দুপুর তো বসেই থাকি। এ তো তবু তোমার সঙ্গে গল্প করেও খানিকটা সময় কেটে যাবে। খাওয়ার খরচাটাও বাঁচবে একবেলার—সেটাও ধরতে হবে বৈকি!'

'হ্যাঁ, তোমার ওখানে লোক আছে দুবেলা রান্না হচ্ছে—তার খরচ আসছে বাবার কাছ থেকে—সেখানে একবেলা তুমি না খেলে ভারী সাশ্রয় হবে!'

'না—লাভ যেমন হবে না, তেমনি লোকসানও তো কিছু হচ্ছে না। আমার থিয়েটারের কাজটা তো রইলই, কোন ক্ষতি করে তো আর এ কাজ নিচ্ছি না!'

রাত্রে রাজাবাবুর কাছেও বলে সুরবালা, 'এটা কি হল? মিছিমিছি খানিকটা খরচ! ও এখানে কী কাজ করবে?'

'কিছুই না, তোমার সঙ্গে গল্প করবে কাছে কাছে থাকবে—সে-ই তো বড় কাজ আমার কাছে!' হেসে জবাব দেন রাজাবাবু, 'না, তুমি বুঝছ না, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলুম—দুপুরবেলা একা-একা থাকো—এত বড় বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগে একজন কেউ থাকলে ভাল হয়। অথচ কাকে রাখব, যাকেই রাখব মাইনে-করা লোক—সে ঠিক তোমার সঙ্গে বন্ধুর মত থাকতে পারবে না। মানে তেমন কোন লোক—ভদ্দরলোকের মেয়ে এত দূর নির্জন বাড়িতে আর একজনকে আগলাতে এসে থাকবেই বা কেন? একে যেন ঠাকুরই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন তোমার চেনা, তোমার কাছে থাকলে খুশী থাকবে অথচ সঙ্কোচ করবে না — ঠিক যেমনটি চাইছিলুম!'

সুরো স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'তাই—? না, আমাকে পাহারা দেবার জন্যে রাখছ ওকে?'

হাসলেন রাজাবাবু, স্নিগ্ধ ক্ষমা-সুন্দর হাসি—বললেন, 'পাগলী! তাই যদি হবে, যদি সেই সন্দেহই করব তো ওকে রাখব কেন? যে ভক্ষক হতে পারে অনায়াসেই তাকে রক্ষক করে দেব? তোমাকে পাহারা দিতে হবে না—সে আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। তুমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, শ্রীমতীর দান। তুমি আমাকে ত্যাগ করবে না কোনদিন।'

সুরো বলে, 'ওকে দিয়ে যে ভয় নেই তা তুমি বেশ জানো, ছোট ভাইয়ের বন্ধু—'

আবারও হাসেন রাজাবাবু, 'ভাইয়ের বন্ধু, কিন্তু ভাই নয়। তবে তুমি এসব বুঝবে না, আশীর্বাদ করি বুঝতেও না হয়। সংসারের এসব নোংরা পাঠ না তোমাকে নিতে হয় জীবনে—'

যত দিন যায় কিরণের চাকরি করার ব্যাপার দেখে অবাক লাগে সুরবালার। সে যেখানে থাকে সেখান থেকে প্রতিদিন এসে পেঁছিতেই প্রায় ছ-সাত আনা গাড়িভাড়া লাগে। ওদিকে ট্রাম গাড়িতে আসে কিন্তু শ্যামবাজারের মোড় থেকে শেয়ারের গাড়ি ভরসা। তাও এদিকটা এত নির্জন লোকজনের আনাগোনা এত কম যে একটু বে-টাইম হলে গাড়ি শেয়ারে আসতে চায় না। তখন পুরো গাড়ি নিয়ে আসতে হয় এমন যে হয় মধ্যে মধ্যে তা ওর কথাতেই ধরা পড়ে যায়। সে ভাড়াও খুব কম নয়—বারো আনা চোদ্দ আনা—কোন কোন দিন এক টাকাও লাগে।

কিন্তু শুধু গাড়িভাড়ার প্রশ্ন হলেও অত কথা ছিল না। প্রতিদিনই আসে কিছু না-কিছু জিনিস নিয়ে, কোনদিন ফুল কোনদিন ফল বা আনাজ। কোন কোনদিন মাছও। সুরবালা যা যা ভালবাসে—এর আগে থেকেই জানত সে, এখনও কথায় কথায় বার করে নেয় মধ্যে মধ্যে অসতর্ক মুহূর্তে—দেখে দেখে সেই সব জিনিসই আনে। বাধা দিলে অনুযোগ করলে কাকুতি-মিনতি করে। বলে, 'সত্যিই বলছি তুমি রাগ করো না—মোড়ে গাড়ি ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি ফিরিওলা নিয়ে যাচ্ছিল, দেখে তোমার কথা মনে পড়ল, তাই—। আর সত্যি কি সস্তা, তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না হয়ত—মোটে এক পয়সা নিয়েছে আমারসটা।'

'থাক, আর কতকগুলো মিথ্যে বলতে হবে না এই সকালবেলাই।'

'ঐ তো, তুমি আমার কথা একটাও বিশ্বাস করতে চাও না।'

কোনদিন বা বলে, 'এমনিই শখ হল বাজারে ঢুকে পড়লুম। সামনেই দেখি ইলিশ মাছ। টাটকা গঙ্গার ইলিশ। তাই নিয়ে এলুম। তা বেশ তো বাপু, তোমার যদি এতই অপছন্দ হয়—তুমি আমাকে দাম দিয়ে দিও, তাহলেই তো হবে?'

ওর ভাবভঙ্গীতে হাসিই পায় সুরবালার, হেসে বলে আমি সত্যিই দিতুম। তা তো তুমি নেবে না। মিছিমিছি,

জাতও যাবে পেটও ভরবে না—ওতে লাভ কি!'

কোন কোনদিন ভয় দেখায়, 'এমন করলে আমি কিন্তু রাজাবাবুকে বলে ছাড়িয়ে দোব তোমাকে। এ বিনি পয়সার চাকরিতে আর দরকার নেই।...না, আমার বড় বিরক্ত লাগে সত্যি সত্যিই!'

সেও পারে না অবশ্য। হাতে-পায়ে ধরতে আসে কিরণ। খুব ভয় দেখালে হয় তো দু-একদিন চুপ করে থাকে, আবার যে-কে সেই!

শুধু কি উপহার আনা! সুরো কোন ফরমাশ করলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। ত্রিভুবন ঘুরে সে জিনিস যোগাড় করে আনে হয়ত—গাড়িভাড়া নিতে চায় না। বলে ট্রামে ট্রামে ঘুরেছি, ট্রাম ভাড়ার প্রশ্ন তুললে বলে, একবারই পয়সা লেগেছে, ভিড়ের মধ্যে দুবার টিকিটই নিতে আসে নি কেউ।

ক্রমে ক্রমে এ সংসারের বাজার সরকারের পুরো ভার এসে পড়ে, সেই সঙ্গে বাগান-বাড়ির তদারকিও। আগে রাজাবাবুর ওখানকার যিনি সরকারমশাই, তিনিই লোক দিয়ে এখানকার বাজার-হাট উটনোর মাস সব পাঠিয়ে দিতেন, সেই লোকই জেনে যেত আর কি চাই, না চাই। কিন্তু সে ফর্দের মাল আসত পরের দিন, তাতে বেশ অসুবিধে হত মধ্যে মধ্যে। এখানে পাড়ায় কোন বাজার নেই, হাট বসে—দোকান যা আছে তাও নামমাত্র, সে সব জায়গায় এঁদের রুচিমত মাল পাওয়া সম্ভব নয়। এখন কিরণ আসাতে সে অসুবিধাটার প্রতিকার হল খানিকটা। কখন যে একটু একটু করে সরকার-মশাইয়ের সব দায়িত্বটাই কিরণের ওপর এসে পড়ল—তা কেউই তেমন লক্ষ্য করল না। এমন কি সুরোও না। জিনিস চাওয়া মাত্র পেলে সকলেই খুশী হয়, সেও হবে—এ আর আশ্চর্য কি! বাড়ি বাগানের তদারকিও এতদিন খোদ ম্যানেজারবাবুর হাতে ছিল তিনি আসতেন কদাচিত, সপ্তাহে একদিন হয়ত। লোক মারফৎই কাজ চলত, তাও যে করত সে অবসর সময়েই করত কতকটা। এখন কিরণকে পেয়ে তাঁরাও সে-দায় নামিয়ে দিলেন। ফলে যা আরামের চাকরি বলে মনে হয়েছিল, তা ক্রমশ সারাদিনের কাজ হয়ে উঠল। এক-একদিন নাইবার-খাবার সময় থাকত না কিরণের, কোন কোন দিন হয়ত ভাত খেতে বেলা চারটে বেজে যেত। কিন্তু কিরণ একটি প্রতিবাদও করত না। কিম্বা বেতন বৃদ্ধির প্রশ্নও তুলত না। বরং কাজের চাপ যত বাড়ে, ততই যেন সে খুশী হয়ে ওঠে। এই বাড়ির কাজ এই সংসারের কাজ যেন তার তপস্যার মতো মনে হয়—এমনই নিষ্ঠার সঙ্গে করে সে।

সুরোও আগে যতটা বকাবকি করত, এখন আর ততটা করে না। একটু একটু করে হাল ছেড়েই দিয়েছে সে। ব্যাপারটা সয়েও গেছে কতকটা। এখন এই সেবাটা আর অস্বাভাবিক লাগে না, সঙ্কোচও বোধ হয় না তত। শুধু থিয়েটারের দিনগুলোয় সে সন্ধ্যের আগে তাড়া দিয়ে নিয়মিত পাঠিয়ে দেয়, কবে রিহার্স্যাল আছে জানলে, সেদিনও। খরচের কথাটাও তোলে মধ্যে মধ্যে। গাড়িভাড়ার হিসেব করতে বসে। বেগতিক দেখলে নানা প্রসঙ্গে কথাটা ঘুরিয়ে দেয় কিরণ, ট্রামভাড়ার কথা উঠলে হয়ত বলে বসে, 'জানো, আমার বাবা কলকাতায় এলে কখনও ট্রামে চড়েন না। আমাদের ওপরও বারণ আছে। ট্রামে চড়ছি জানলে যাচ্ছেতাই করবেন। বলেই রেখেছেন ঘোড়ার গাড়িতে চড়বি, দরকার হয়, বেশী খরচ হয়ে যায় টাকা চেয়ে নিবি—কিন্তু খবরদার, ট্রামে চড়বি না।'

স্বভাবতই কৌতূহল বোধ করে সুরবালা, 'কেন? ট্রামে আবার কি হল?'

'সে আর বলো না, উনি নাকি একবার কলকাতায় এসে ট্রামে চেপেছিলেন, আপিসের সময় সেটা, কেরানীতে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, ঘোড়াগুলো টানতে পারছিল না, চাবুক মারতে তারা মুখো-মুখি আড় হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, হাজার মার খেয়েও নড়ল না এক-পা। বাবা ড্রাইভারের ঠিক পেছনে বসেছিলেন, সবই দেখেছেন। কিছুতে ওদের বাগ মানাতে না পেরে ড্রাইভারটা করল কি পকেট থেকে কী জিন মদ আছে তাই বার করে কনডাকটারকে কি বললে, সে নেমে এসে দুহাতে ঘোড়াগুলোর মুখ হাঁ করিয়ে ধরল, ড্রাইভারটা বোতল থেকে খানিকটা করে সেই মদ ঢেলে দিল ওদের গলায়। তার দু-পাঁচ মিনিট পরেই—নেশাটা জমে উঠতে আবার বোধহয় একটু গায়ের জোর ফিরে পেল, গাড়ি টানতে শুরু করে দিল ঘোড়াগুলো। বাবা জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেম—এ ওদের হামেশাই করতে হয়—কোম্পানী থেকেই এই মদ দিয়ে দেয় ওদের কাছে। সে-ই ও'র কেমন ঘেন্না হয়ে গেল, বললেন, নিরীহ পশুগুলোকে ধরে এই অত্যাচার যারা করে—তাদের গাড়িতে পয়সা দিয়ে চড়ব না।...টানতে পারছে না বেচারীরা—তাদের মদ খাইয়ে মাতাল করে সেই ভার টানানো মানে তো তাদের পরমায়ু ক্ষইয়ে দেওয়া। ...বাতিক আর কি!'

কথার পৃষ্ঠে কথা ওঠে। সুরবালা বলে, ঐরকম হয়ে যায় এক-একজনের—চিরকালের মতো অছেদ্দা কি ভয় হয়ে যায়। মাসী—মানে আমার মতিমাসীর কথা বলছি—মাসী একবার নাকি অনেকদিন আগে রেলগাড়িতে চেপেছিল। গাড়িতে আলো নেই, কলঘর নেই, বসবার বেঞ্চি-গুলোও সরু সরু, কোমরে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। সেই যে নাককান মলেছিল—আর কিছুতেই চাপতে চায় না। এখন নাকি গাড়িতে আলোটালো শুধু নয়, সবকিছুই রয়েছে—কিন্তু মাসী সে-কথা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ওসব আমি

বুঝে নিয়েছি. রেলগাড়ি তো নয়—মানুষ-মারা কল”।’*

*১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম এদেশে রেলপথ খোলা হয়. কিন্তু ১৮৬৮ সালের আগে ট্রেনের কোন কামরাতেই আলো জ্বালা হত না। ১৮৯১ সালে প্রথম তৃতীয় শ্রেণীতে পাইখানার ব্যবস্থা হয়। প্রথম-দিকে নাকি চতুর্থ শ্রেণীও ছিল একটা—এখনকার লাগেজ-ভ্যানের মতো। ১৮৬২ সালে কিছু কিছু দোতলা কামরাও চালু করা হয়, তবে সে বেশীদিন চলেনি।

এইভাবেই আসল সেই গাড়িভাড়ার প্রশ্নটা চাপা পড়ে যায়—প্রশ্নকর্ত্রীর নিজেরও মনে থাকে না।

তবু, কিরণের চাকরি যে এতখানি জমে উঠেছিল, তা ওরা কেউই অত বুঝতে পারেনি, কিরণ তো নয়ই। বুঝিয়ে দিলেন একদিন ওর বাবা রামকমলবাবু এসে পড়ে।

রামকমলবাবু প্রথম এসে নিজেদের বাড়িই গিয়েছিলেন, সেখানে চাকরের মুখে যে-খবর শোনেন, তাতে খুব আশ্বস্ত হতে পারেননি, দুশ্চিন্তা বেড়েই গিয়েছিল। দাদাবাবু কোথায় থাকে, কি করে, তা সে জানে না, তবে ভোরে উঠে কোনমতে মুখে চোখে জল দিয়েই বেরিয়ে যায়—ফেরে কোনদিন রাত দশটায়, কোনদিন এগারোটায় —থ্যাটার থাকলে রাত দুটো-তিনটে বেজে যায়। দিনে ফেরেও না, খায়ও না। রাতেও সবদিন খায় না। খাবার যেমন ঢাকা দেওয়া তেমনি পড়ে থাকে। কোথায় নাকি কি চাকরি নিয়েছে, সেইখানেই নাকি খায়। কি খায় তা কে জানে—শরীর তো দিন দিন কালি হয়ে যাচ্ছে। দিনকতক পরে বাবু বোধহয় তাকে চিনতেও পারবেন না দেখলে।

এখবর শোনার পর আর—ছেলে কখন গভীর রাত্রে ফিরবে, সেজন্যে অপেক্ষা করতে পারেননি রামকমলবাবু, ছুটে গিয়েছিলেন থিয়েটারে। দৈবক্রমে সেখানে নানুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, পরিচয় পেয়ে নানুই তার নতুন চাকরির জায়গাটা বলে দেয়—ঠিকানাটাও জানিয়ে দেয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বলে যে, রামকমলবাবুর খুব একটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মেয়েছেলের কাছেই থাকে বটে, সেখানেই সারাদিন কাটায় এও ঠিক, চাকরিতে লাভও বিশেষ কিছু নেই —তবু এসব ক্ষেত্রে যা মনে করা চলত, যা মনে করে মানুষ সাধারণত—সে-ভয় যেন উনি না করেন। কারণ সে-মেয়েকে ভাল করেই জানে নানু, তার দ্বারা ও-ধরনের কোন অনিষ্ট হবে না কিরণের।

কিছুটা আশ্বস্ত হলেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেননি রামকমলবাবু। হাজার হোক নানুও থিয়েটারের লোক, যোগসাজস কিছু থাকা বিচিত্র নয়। চোর-ডাকাতরাও নিজের দলের লোকের নামে চুকলি খায় না সহজে।...সাতপাঁচ ভেবে তিনি সেই কোরামূর্তিই একখানা গাড়ি ভাড়া করে এসে হাজির হলেন একেবারে রাজাবাবুর বাগানে।

কিরণ তখন ওখানে ছিল না, কি একটা কাজে বড়বাজার গিয়েছিল—এদেরই কী একটা কাজে। গাড়ির শব্দ পেয়ে সুরবালা ভাবল, সে-ই বুঝি ফিরেছে গাড়ি করে। তাই প্রথমটা কোন ঔৎসুক্য বোধ করেনি। অবশ্য এত তাড়াতাড়ি বড়বাজার থেকে ফেরার কথা নয়—যাতায়াতে অন্তত ঘণ্টা-দুই আর একঘণ্টার মতো কাজ—মোট তিনঘণ্টা সময় লাগা উচিত। গেছে তো মোটে একঘণ্টা আগে। তবু হয়ত কোন কারণে যাওয়া হয়নি, শ্যামবাজারের মোড় থেকে ফিরে এসেছে—এই ভেবেই নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু বিস্ময়ের সীমা রইল না—যখন দারোয়ান এসে খবর দিল, কে একটি বাবু এসেছেন, কিরণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান। বলছেন তিনি কিরণবাবুর বাবা, তিনি কখন ফিরবেন জানতে চাইছেন।

কিরণবাবুর বাবা! সেকি!

বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল সুরবালার সংবাদটার পূর্ণ মর্ম বুঝতে। তারপর ছুটে এসে জানলায় দাঁড়াল। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে একটু অসহিষ্ণুভাবেই পায়চারি করছেন। মধ্যবয়সী, বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। হঠাৎ দেখলে একটা আদলও টের পাওয়া যায় কিরণের সঙ্গে। সে দারোয়ানকে বলল, ‘ওপরে এনে বৈঠকখানা ঘরে বসাও। আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে।’...

রামকমলবাবু দু-একবার ক্ষীণ আপত্তি জানিয়ে অতিসহজেই ওপরে এসে বসলেন। তিনি জানতেই এসেছেন, জানতে ও দেখতে—পুত্রের অধঃপতনের পরিমাণ। দেখলেনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরের চারিদিক, আসবাবপত্র। ধনী জমিদার বা ব্যবসায়ীর বাগানবাড়িতে নাচঘর যেমন হয় —ঠিক তার সঙ্গে না মিললেও, বাগান-বাড়ির বৈঠকখানা যে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-বাড়িতে যে স্ত্রীলোক বারোমাস বাস করে, তার পরিচয় সম্বন্ধেও কোন সংশয় থাকা উচিত নয়।

কতকটা সেই কারণেই, সুরো এসে প্রণাম করে দাঁড়াতে রামকমলবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, বোধ-করি নবাগতার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে পূর্বের হিসেবটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন। দুই আর দুইয়ে চারের মতো সে-হিসেব মিলেও গেল। মনে হল ছেলের এখানে এমনভাবে পড়ে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেয়েছেন। ফলে তাঁর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হয়ে মুখ কালো হয়ে উঠল।

সুরো অতটা ঠিক বুঝতে পারেনি প্রথমে। সে বিনতভাবেই নিজের পরিচয় দিল, ‘আমি গণেশের দিদি।’

‘গণেশের—? অ, তুমিই সেই কেত্তন-উলী?’

সুরো চমকে উঠল, ভালো করে তাকিয়ে দেখল এবার রামকমলবাবুর মুখের দিকে। তাঁর অন্তরের বিষ আর উষ্মা অপ্রকাশ নেই—এতক্ষণ ঠাওর করে দেখেনি বলেই দেখতে পায়নি। কিন্তু সে নিজে বিচলিত হল না, বেশ ধীর বিনম্রভাবেই বলল, ‘হ্যাঁ।’

‘কিরণ কোথায়?’ বিরসকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন রামকমলবাবু।

‘সে বোধহয় বড়বাজারে গেছে একবার।’

‘কখন ফিরবে?’

‘দেরি হবে। এই সবে ঘণ্টাখানেক আগে গেছে।’

‘হুঁ। তা সে এখানে কি চাকরি করে? বাজারসরকারী?’

রামকমলের কণ্ঠে তিক্ততা চাপা থাকে না। রাখার চেষ্টাও করেন না বোধকরি।

‘চাকরি কেন বলছেন মেসোমশাই চাকরির তার দরকারই বা কি?...আমি একা থাকি বলে একটু দেখাশুনো করে। তাও আমি বারণ করেছি কতবার, কিরণ বলে, সময় কাটে না। সারা দুপুর তো বসেই থাকতে হয়—তাই!’

‘তাই!’ ভেংচি কেটে ওঠার মতো শব্দ করেন রামকমলবাবু, ‘ওখানে আমার বিষয়সম্পত্তি সব নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে—উনি এখানে সময় কাটে না বলে মেয়েমানুষের বাড়ি বাজারসরকারি করছেন! করাচ্ছি আমি—আসুক একবার!’

বারবার এক ধরনের খোঁচায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটবারই কথা। তবু সুরো নিজেকে সামলেই রাখল। শুধু উত্তর দেবার সময় প্রয়োজন বুঝেই কণ্ঠস্বরের পূর্ববিনম্রতা পরিহার করল। বেশ একটু জোর দিয়েই বলল, ‘দোষ তো আপনারই মেসোমশাই। এত যদি বিষয়-সম্পত্তি দেখার দরকার ছিল তো আপনি ছেলেকে এই শহরে একা—একটা বাড়ি আর চাকর ব্যবস্থা করে টাকা-পয়সা দিয়ে ফেলে রেখেছেন কেন? থিয়েটার করে সে—করতে চায়, জেনেই তো পাঠিয়েছেন। ...সেখানে কাদের সংসর্গ করে তা জানেন না? তারা কি সব খড়দার মা-গোঁসাই?... অল্প বয়স, সুন্দর চেহারা, হাতে পয়সা আছে— এমন ছেলেকে কলকাতা শহরে একা রাখাই তো একমাত্র ছেলেকে ডাইনীর হাতে সঁপে দেওয়া।’

ঠিক এ-ধরনের কথা আশা করেননি রামকমলবাবু। যাকে এতক্ষণ অপরাধিনীর স্তরে রেখে বিচার করছিলেন, সে যে এমন করে তাঁকেই অভিযুক্ত করবে—তা ভাবেননি। তিনি বিস্মিত হয়ে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। সুরবালার ভাবে-ভঙ্গীতে কোথাও অপরাধিনীর ছাপ নেই। মেয়েমানুষ বা কেত্তনউলী বলে উনি যে-ধরনের স্ত্রীলোক বোঝাতে চেয়েছেন এতক্ষণ—সে ধরনের লাস্যময়ী নষ্ট মেয়েমানুষের চিহ্নমাত্র পেলেন না এর মধ্যে। এবার তাঁর সুর কিছুটা নরম হয়ে এল অগত্যাই। বললেন, ‘হ্যাঁ—তা অবশ্য বটে। দোষ আমারই।

ভেবেছিলুম দিনকতক একটু আমোদফূর্তি করে নিক, এরপর তো সেই জোয়ালে কাঁধ দেওয়া চিরদিনের মতো—'

'সেও সেই কথাই বলে। আমি যথেষ্ট বকেছি ওকে, বারবার বলেছি দেশে ফিরে যাবার কথা, সে বলে, বাবা সময় দিয়েছেন এক বছর, তারপর তো ফিরতেই হবে, এখন থেকে আর আগবাড়িয়ে জোয়াল কাঁধে নিই কেন?...আপনি একটা সোমত্থ ছেলেকে আমোদফূর্তি করবার জন্যে শহরে রেখেছেন—তবে আবার অত ব্যস্ত হয়ে উঠছেন কেন? এই ধরনের জমিদারের ছেলেদের আমোদ-ফূর্তি করা বলতে এখানে আমরা সকলেই বুঝি মদ আর মেয়েমানুষ।...আপনিই কি তা জানেন না—না শোনেননি কখনও? নেহাৎ আপনার ভাগ্য ভাল যে, ছেলে এখনও সেদিকে টলেনি। আপনি এখানে যে সম্পর্কটা মনে ভাবছেন—সে সম্পর্ক নেই বলেই, আর এখানেই সারাদিন আটকে থাকে বলেই বেঁচে গেছেন। আমার শাসনে চোখে চোখে আছে বলে বক্ষে, নইলে ও-ছেলে আর কোনদিনই ফিরিয়ে নিতে পারতেন না।'

এবার রামকমলবাবুর গলার আওয়াজ আরও নরম হয়ে আসে। তাঁর আরক্ত মুখে স্বেদবিন্দু জমে ওঠে দেখতে দেখতে; সেটা অপমানে, না অপরাধবোধে, না উদ্বেগে তা কে জানে! তিনি বেশ একটু বিনতভাবেই বলেন, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে মা, তোমার সঙ্গে ওভাবে কথাটা বলা। তোমার গল্প অনেক শুনেছি খোকার মুখে। তা নয়।— গত দু' মাসে একখানা চিঠিরও জবাব পাইনি, তার ওপর ঐ চাকর ব্যাটার বাঁকা কথাতেই আরও—কেমন যেন রক্তটা চড়ে গিছল মাথায়।...হ্যাঁ, ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়াটা খুবই ভুল হয়েছে। পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়ে যায় বলে লোকে—তাই হয়ে পড়েছিলুম আর কি!...আরও ওর গর্ভধারিণীর জন্যেই—ছেলে যত না বলে তিনি ওর হয়ে আরও বেশী বলেন। বিশেষ বিয়ে-থা হয়ে গেছে—এখন আর ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি।'

'বিয়ে-থা হয়ে গেছে! কিরণ বিয়ে করেছে? সেকি। কৈ, বলেনি তো—'

এবার সুরবালারই বিস্মিত হবার পালা। এতদিন এত গল্প করেছে, একবারও বলেনি তো, কেমন চেপে রেখেছে দ্যাখো কথাটা! কিন্তু এত লুকোছাপার মানেই বা কি?

রামকমলবাবুও কম অবাক হন না। 'বিয়ের কথা বলেনি? সেকি! বোধহয় লজ্জাতেই বলেনি। বিয়ে করতে তো খুবই আপত্তি ছিল। বিষম লজ্জা ওর। কলকাতার কোন বন্ধু-বান্ধবকে জানাতে দেয়নি।... সেই জন্যেই তো আরও ছুটে আসা। ছোট মেয়ে তো—বিয়ের পর এতকাল বাপের বাড়িতেই ছিল। বেয়াই হঠাৎ চিঠি দিয়েছেন পুনর্বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে, জামাইকে চাই। এদিকেও নাকি সামনের মাসের ছ' তারিখের পর দ্বিরাগমনের দিন নেই—সামনে প্রায় চারমাস অকাল। তার মানে একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি।...চিঠি লিখব, ও তার জবাব দেবে, হয়ত কোন কাটান মন্তব্য ঝাড়বে, আবার আমি লিখব কি লোক পাঠাব—সে বিস্তর দেরি হয়ে যাবে বলেই নিজে চলে এলুম।'

'তাহলে একেবারে সঙ্গে করেই নিয়ে চলে যান, এখানে আর ফেলে রাখবেন না একদিনও।' সুরবালা দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

'এখানে ওর থিয়েটারে দু'-একদিন সময় দেওয়া দরকার না? ও যে পার্টটা করে—সেটার জন্যে নতুন লোক গড়ে না নেওয়া পর্যন্ত—'

'ও যে পার্ট করে—তাতে অন্য যে-কোন লোকই নামাতে পারবে ওরা। তার জন্যে ওদের বইয়ের কোন ক্ষতি হবে না। রাজা রাজা বিনে রাজ্য আটকায় না—এ তো তুচ্ছ একটা অ্যাকটিং-এর ব্যাপার। এমন কিছু বড় অ্যাকটার নয় আপনার ছেলে। পার্টও কিছু বড়গোছের নয়। আছাড়া ঈশ্বর না করুন, ওর যদি একটা অসুখই হয়ে পড়ে—ওদের বই কি বন্ধ হয়ে যাবে? না না, ওসব কোন কথা শুনবেন না আপনি। এসেছেন যখন—এমনি আপনার দু-একদিন কোন কাজ থাকে, সে আলাদা কথা—নইলে আমি তো বলি আজই নিয়ে চলে যান।'

এরপর আর রামকমলবাবুর বিদ্বেষ থাকা সম্ভব নয়, রইলও না। তিনি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করতে লাগলেন তাঁর পূর্ববিদ্বেষের জন্যে। নানা রকমে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি—মধুর সম্ভব আগেকার আঘাতটার বেদনা দূর করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন।...থিয়েটারের সেই লোকটা ঠিকই বলেছিল, এ-মেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র ধরনের, এর জাত আলাদা।

আর তার ফলেই, ব্রাহ্মণ রান্না করে দিলে তিনি এখানে স্নানাহার করতেও রাজী হয়ে গেলেন। কিরণ যখন ফিরল, তখন রামকমলবাবু খাওয়া-দাওয়া সেরে মেরজাই গায়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে বেশ জমিয়ে গল্প করছেন সুরবালার সঙ্গে বহুদিনের পরিচিতের মতো, সুরবালা বসে পাখার বাতাস করছে।

কিরণের মুখ শুকিয়ে গেল—বলা বাহুল্য। এভাবে সকলের কাছে ধরা পড়ে যাবে একসঙ্গে—বাবার কাছে এই চাকরির কথা এবং সুরবালার কাছে বিয়ের কথাটা একই সঙ্গে ফাঁস হয়ে যাবে তা ভাবেনি।

তবু যাওয়ার ব্যাপারে মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল কিন্তু সুরবালার নির্দেশেই রামকমলবাবু সে-সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে পরের দিন ভোরবেলাই ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। সুরবালা নিজেই থিয়েটারে জানিয়ে দেবার ভার নিয়েছিল নানুর মারফৎ। সে-কারণেও দেরি করবার আর কোন অজুহাত রইল না।...

যতক্ষণ কিরণ যায়নি, ততক্ষণ তার মঙ্গলের দিকটা চিন্তা করেই সুরো প্রাণ-পণে কঠিন হয়ে ছিল। এমনকি কিরণকে সে বেশ রূঢ়ভাবেই তিরস্কার করেছে। করতে বাধ্য হয়েছে—কিন্তু কিরণ চলে যেতে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এই ক'মাসে বড় বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল সে—আত্মীয়ের অধিক অন্তরঙ্গ। এখন আবার ও একা পড়ল, বরং আরও বেশী একা মনে হতে লাগল। বেশী ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল সারাদিনের নির্জন জীবন-যাত্রাটা। সাহচর্যের প্রশ্ন ছাড়াও ইদানীং অনেক কাজও সে করত। সে-সেবাটা যেন একরকম অভ্যাসেই পরিণত হয়ে গেছে এতদিনে। হয়ত মাইনে-করা লোক দিয়েও তা হতে পারবে এরপর কিন্তু সে ঠিক এমনভাবে করবে না, কিরণ যেভাবে করত। নিজের কাজ বলে আর কেউ ভাববে না—কিরণের মতো।...

কিরণ চলে যাওয়ার পর যেন একটু একটু করে বুঝতে লাগল সুরবালা যে, চাকরির কথাটা, সময় কাটানোর কথাটা কিরণের ওজর মাত্র। আসলে সুরবালার সান্নিধ্যেই তার লোভ, সুরবালার সেবাটাই তার লক্ষ্য ছিল।

আরও কিছুদিন পরে—এই সংশয় ও ধারণাটা প্রত্যয়ে দাঁড়াতে মনে মনে সে ঠাকুরকে ধন্যবাদই দিল। আরও বেশী ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই কিরণকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন বলে। নিজের জন্যে তার কোন চিন্তা ছিল না, এখনও নেই—কিরণেরই ক্ষতি হত বেশী। হয়ত তার সুখশান্তি নষ্ট হত, ভবিষ্যৎ হত বিড়ম্বিত, বিঘ্নিত। বড় সরল, বড় ভাল ছেলেটা। সে তার নিজস্ব জীবনে বাপ-মা-স্ত্রী এবং আসন্ন পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে থাক, শান্তিতে থাক—সুরবালার জন্যে না তাকে কোনদিন কোন অশান্তি ভোগ করতে হয়, তার না কোন অনিষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

(৭৬)

রঘুনাথদাস গোস্বামী

(খ)

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামন্ডপে পড়ে থাকে। সেই-খানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণ-সুযোগ।

গৌড়ের ভক্তেরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত। কিন্তু সেই পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ ধরে চলে যাওয়া যায়?

চারদন্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মন্ডপে যদুনন্দন আচার্য এসে হাজির। যদুনন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যদুনাথকে দন্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

আমার যে পূজুরী ছিল সে আর পুজো করতে আসছে না। বললে রঘুনন্দন, তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখনিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, বেশ তো, আমাকে আপনি আদেশ করুন, আমি যাই।

যদুনাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, যাও।

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞা পেয়েছে, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। প্রহরীরাও জেগে উঠে শুনল সব, ভাবল পূজারীকে নিয়ে ফিরে আসবে রঘুনাথ। যদুনাথ বা প্রহরী, কেউ কল্পনাও করতে পারল না এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক, পৌঁছুনো নিয়ে কথা। সন্দেহ কী, স্বয়ং কৃষ্ণই এই ছলনা রচনা করে পাঠিয়েছেন।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে তাই ছুটে চলেছে। ত্বর সয় না, ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যদুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলা-চলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁচেছে রঘুনাথ।

চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাওনি মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করল গোয়ালা, দুধ খাবে?

ধনীর দুলাল রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা দুধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পূব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পত্র পৌঁছুল। কোথায় রঘুনাথ? কই আমাদের সঙ্গে আসেনি তো। কাকে ফেরাব?

গোবর্ধনের লোকই দিশপাশ না পেয়ে ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো রন্ধন, কখনো দুগ্ধপান, কখনো বা নিরম্বু উপ-বাস। জীবনের অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কবে?

বারো দিন পরে—বারো দিনের মধ্যে তিন দিন মাত্র ভোজন করেছে—রঘুনাথ পুরুষোত্তমে পৌঁছুল।

এই যে রঘুনাথ এসেছে। রঘুনাথ নিজেই ঘোষণা করল।

এসেছ? এস। প্রভু উঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, কৃষ্ণকৃপা সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে তা বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

রঘুনাথ বললে, আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।

এর বাপ আর জেঠা বিষয়বিষকেই সুখ-সেব্য বলে মনে করে। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, এদের অনেক দানধ্যান কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্যা কৃষ্ণ-ভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে। এমন কর্ম করায়, যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কী রকম কৃশ হয়ে গিয়েছে, মুখখানি ম্লান! স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছাত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল 'স্বরূপের রঘুনাথ'। বলে রঘু-নাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, তাই হবে।

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো। রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন: তুমি যাও, সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথ দর্শন করে এস।

পাঁচ দিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেটভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর-যত্নেই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াসে খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আত্ম-সুখলিপ্সাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গোবিন্দকে, বললে, ভিক্ষে করে খাব।

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে, খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, রঘুনাথ আর খাচ্ছে না আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে।

এই তো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু আনন্দিত হয়ে বললেন, খুব ভালো করছে।

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়-সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে—দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্ষান্নই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষান্নেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ।

বলুন আমার কী কর্তব্য। প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন—তাঁর উদ্দেশ্য কী?

প্রভুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ জিজ্ঞেস করলে, রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, স্বরূপকে তোমায় উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ সুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসেনি। কোথায় আছে কী করে বলব। কী করে জানব তুমি আগেই এখানে এসে হাজির হয়েছ।

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌড়ভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি কোনো খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন?

দেখলাম বইকি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

সে কি বাড়ি ফিরবে?

মনে হয় না। বললে শিবানন্দ, তাকে বৈরাগ্য আশ্রয় করেছে। তার ভক্ষ্য-পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশ দণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, নয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।

চোখে জল, গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ, কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌঁছুবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন আবার যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তেরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। দুই চাকর, এক ব্রাহ্মণ আর চারশো টাকা।

যথারীতি সকলে পৌঁছুল নীলাচল। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে প্রভুকে মাসে দু দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হলেন। মাসে দু দিন।

দু দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আট পণ মাত্র কড়ি লাগে। ঠিক সেই আট পণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট গণ্ডা।

টানা দু বছর এ ভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ।

তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

কী ব্যাপার? স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?

স্বরূপ বললে, রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।

কী বিচার?

বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুর সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তাতেই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁর প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।

প্রভু হাসলেন। বললেন, বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিতে চাইনি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে এই আমার আনন্দ।

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

হ্যাঁ হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

কে দেবে কে না দেবে এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।

ঠিক করেছে। প্রভু সমর্থন করলেন: সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো। সেখানে আর মনে মনে আশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই। অনন্ত মনে-প্রাণে কৃষ্ণনাম করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।

শঙ্করারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে উপহার দিয়েছিল। লীলা-স্মরণের সময় ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় ধরতেন কখনো বুকে, কখনো তার ঘ্রাণ নিতেন আর কখনো এক দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। তিন বছর এই শিলা-মালা ধারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাত্ত্বিক পুজো করো। এক পাত্র জল নাও আর নাও আটটি তুলসী-মঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমধন পেয়ে যাবে।

স্বরূপই সব জোগাড় করে দিল। শিলার বসবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পুজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাম্বুতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পুজোর যত সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর ষোড়শোপচার পুজোর নেই। আর এ শিলা

কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এসে দাঁড়িয়েছেন।

স্বরূপ বললে, আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। ধনীর দুলাল রঘুনাথ সর্বস্ব ত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই শ্রীবিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে গিরি-গোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জামালা দিয়ে রাধিকার চরণে।

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর।

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ! কোথাও এতটুকু সময় ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমন নির্ধুম তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন-রাত্রির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্যে বরাদ্দ মোটে চার দণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনোদিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া কাঁথা-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে। আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণ-পণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন। ঘুরে ফিরে আমারও এখন এই আত্মসেবা!

রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে।

কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্ম-চারী ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তারই জন্যে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে। সুতরাং এই চাঞ্চল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না। তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্নের এমন দুরবস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদান্নই রঘুনাথ মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত শক্ত ভাতকটি নুন দিয়ে মেখে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে, না দুর্গন্ধ হয়? প্রসাদ তো চিদবস্তু, সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না। সে চিরন্তন অমৃত-স্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুষার কি কখনো উষ্ণ হয়? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিবিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদবিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই প্রাকৃতজনের কাছে যাই হোক, রঘু-নাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘু-নাথের প্রসাদ খাওয়া।

আমাকে কিছু দাও। স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

সে কী? নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে।

নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন? বলেই ত্বরিতে এক গ্রাস মুখে পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, স্বরূপ বাধা দিল। বললে, না এ তোমার যোগ্য নয়।

প্রভু বললেন, কী যে বলো তার অর্থ নেই। যত প্রসাদ খেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো খাইনি।

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন, নিজের বুকের গুঞ্জাহার আর গোবর্ধন-শিলা উপহার দিলেন, সঁপে দিলেন স্বরূপ গোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ করুন।

রঘুনাথ আর কী করে? রাত্রিকালে সকলের অগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। চৈতন্যচন্দ্র অস্তমিত হলে স্বরূপও কিছু-দিনের মধ্যে নিত্যলীলায় প্রবেশ করল। স্বরূপের অন্তর্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে চলে এল, ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

রূপ-সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলাবিহার বর্ণনা করো। এতদিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে সব চিত্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্ন-জল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্যকথন। আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। দীর্ঘমন্থনের পর নবনীতবিহীন তিন ছটাক মাত্র মাঠাই তার সারাদিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানসসেবা। আট প্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই ভজন আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তাও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মগ্ন থাকে সে দিন তার ঘুমই ঘুম যায়।

বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডে রঘুনাথের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কৃষ্ণদাসের রঘুনাথই 'সারগুরু'। জীব গোস্বামীরও আরাধ্য রঘুনাথ।

তারপর শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর শ্যামানন্দ যখন বৃন্দাবনে তখন তাদেরও অনুগ্রহ করল রঘুনাথ। তখন রঘুনাথের শরীর ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে, তবু তার একবিন্দু নিষ্ঠাভঙ্গ নেই। 'যদ্যপিহ শুষ্কদেহ বাতাসে হেলয়। তথাপি নির্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয়।।' রামচন্দ্র কবিরাজও বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথের প্রসাদ পেল। জাহ্নবী দেবী যখন দ্বিতীয়বার বৃন্দাবনে এলেন তখন রঘুনাথ এত বৃদ্ধ যে তাকে আর চেনা যাচ্ছে না। বীরচন্দ্র প্রভু এসে আর তাকে দেখতে পেল না।

(ক্রমশঃ)

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গালফ্ অব মেক্সিকো একটি আঁকশির মধ্যে ধরা। তার দক্ষিণ দাঁড়া য়ুকাটান আর উত্তর দাঁড়া ফ্লরিডা। ফ্লরিডা থেকে পোর্টো-রিকো পর্যন্ত পশ্চিম-পূবে রাশি রাশি দ্বীপ মালার মতো বেড়ে আছে। দু ছড়া মালা। প্রথম ছড়া উত্তরে; খুঁদে খুঁদে দ্বীপের সারি নিয়ে বেহামাজ দ্বীপপুঞ্জ,—পুঞ্জই বটে। আর ঠিক তারই দক্ষিণে কুবা, জ্যামায়কা, হেইতি এবং পোর্টোরিকো জগদ্দল জগদ্দল দ্বীপের চাংড়া। বুঝতে কষ্ট হয় না ফ্লরিডা থেকে ত্রিনিদাদ পর্যন্ত একটাই ভূভাগ ছিলো। কোনো প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মহা-বিপ্লবে তামাম দেশটা জলে ডুবেছে। পাহাড়ী টিকিগুলো জেগে আছে দ্বীপ হয়ে। এ অঞ্চলের সব দ্বীপই পাহাড়ী। এবং বেশীর ভাগ দ্বীপেই আজও আগ্নেয়গিরি আছে। দ্বীপের অনেক আগ্নেয়গিরির নামই তাই "গন্ধকের পাহাড়" অর্থাৎ "সু ফেয়েরে"।

সারা ক্যারিবিয়ানের পিলে চমকানো বিপদ তিনখানা। নং ১—হ্যারিকেন, অর্থাৎ প্রভঞ্জন-ঝঞ্ঝা যা জীবজগতকে ঝনঝনিয়ে ছাড়ে; নং ২—আগ্নেয়গিরি, যা আগুনের উদ্‌গার দিয়ে জীবনকে দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের মতো নিমেষে ফুঁকে দেয়। নং ৩—ভূমিকম্প।

হারিকেনের মধ্যে আমি দেখেছি 'ফ্লরা'। এরা প্রত্যেক বছরেই প্রতি হারিকেনের নাম দেয়। প্রতি বছরের প্রথম হারিকেনের নাম A দিয়ে শুরু। তারপর যেমন চলে। সাধারণতঃ কোনো নাম দু'বার পালটায় না। ১৯২৬-এর Bartha ১৯২৭-এ Bartha না হয়ে Belly হবে। এমনি নামকরণে বিভাগের সুবিধে হয়। 'ফ্লরা' যখন তোবাগো এবং তোকোর ওপর দিয়ে চলে গেলো আমরা তখন সকলে মিলে রেডিওর ধারে বসে বসে সরকারী ঘোষণা শুনেছি। 'দুই দ্যালের ভাঁজে ঢোকো;' 'শার্সীতে গঁদ দিয়ে কাগজ লাগাও'; 'পেরেক ঠোকো; বন্ধ করে দাও দরজা জানালা; ছবি-ছাবা নামাও......' সে সতেরোশো রকমের নির্দেশ। সারা আকাশ হঠাৎ মন্থর, পিঙ্গল। ১৯৫৭তে ক্যারিবিয়ানে এসে ১৯৬৩তে এই প্রথম জগঝম্প। একদা আমাকে সার ভিনসেণ্ট রথ বলেছিলেন যে তাঁর সহকারীকে নিয়ে তিনি গায়নার জঙ্গলে জরীপের কাজে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই জঙ্গলের মধ্যে সুপ্রশস্ত আধা মাইল-ব্যাপী পরিষ্কার পথ। বড়ো বড়ো গাছ লম্বা শুয়ে। সহকারী বলে—এখানে পথঘাট তৈরী হচ্ছে, জানতাম না তো! ভাবছিলাম কুমারী ধরণীর দেহের মাপজোখ আমরাই প্রথম করছি। এতো দেখছি রীতিমতো ধর্ষিতা, কর্ষিতা, অবলুণ্ঠিতা। সার ভিনসেণ্ট তাঁর ভূয়োদর্শন প্রসাদাৎ অর্বাচীন জরীপনবীশকে সমঝিয়ে দিলেন—ও কিছু নয়। গত রাত্রে হারিকেনের ঝাপটা বয়ে গেছে।

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম তোকোর তুঙ্গের আর তোবাগোর গোরস্থানে। তোবাগোর ধনী ব্যবসায়ী মদীয় বন্ধু মিঃ ম্যাকটন সয়েব-বাচ্চা। তিনি তাঁর জমিজমা বাড়ী সব ইন্সিওর করিয়েছিলেন। দাঁও পিটে নিলেন। কিন্তু তখন আসলি তো বাগোর অবস্থা আমার নীপসীমার মাথার মতো। গন্ধ তেল ভেবে সারা মাথায় তিনি বেশ করে 'বাল-উড়ানেকা-তেল' আধ ঘণ্টা মালিশ করে চান-ঘর থেকে বেরুবার সময় হাউমাউ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। মাথাটি বিলকুল বেল হয়ে গেছে। নীপসীমার মাথার ওপর যেন ক্যারিবিয়ান হারিকেন বয়ে গেছে। তোবাগো দ্বীপে একটি নারকোল গাছ খাড়া নেই। কদলী-বন নিশ্চিহ্ন। বাড়ী ঘর দোর সবই চল্লিশ মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভে বিলীন। জনসংখ্যা? পাহাড়ের আড়ালে পালিয়ে তারা কিছু কিছু বেঁচে গিয়েছিলো। ইউনাইটেড নেশনস ইংরেজ সরকার এবং আমেরিকার সরকার আবার তোবাগো-পত্তনে লেগে-ছিলেন। ...সে কম্মো আজও শেষ হয়নি। অথচ এই সবে রেডিওতে শুনেছি এসে গেছে হারিকেন ক্যানেট। বেগ তার ১৫০ মাইল। সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

সেই চাঁচাছোলার ফলে তোবাগোতে এখন Planned শহর হচ্ছে, Planned হোটেল হচ্ছে; এবং বৃহৎভাবে, সুবৃহৎ মাপে কৃষি হচ্ছে। তোবাগোকে করা হচ্ছে ত্রিনিদাদের Food basket অবশ্য এই তক্কে আমেরিকান টুরিস্ট বেড়ে গেছে তোবাগোতে। ১৮ ডিগ্রী অক্ষরেখা থেকে ১৫·৫ ডিগ্রী অক্ষরেখার মধ্যে এই হারিকেন জন্ম নিয়ে ঘণ্টায় ১০০, ১২০, ১৫০ মাইল বেগে উলটো-ঘড়ি পাক খেতে থাকে। তারপর মারে চোঁ-চাঁ দৌড়। ফ্লরিদা থেকে কুবা পর্যন্ত যে জগঝম্প করে ছাড়ে। কুবার সর্বনাশ করেছে 'ফ্লরা' ১৯৬৩তে; এবার ১৯৬৬তে ফ্লুরিদা কান ঘেঁষে বেঁচে গেছে। প্রতি বছর প্রভঞ্জন নিয়মিত আসেন যান। গলফ্ অব মেক্সিকোয় পেঁছে দৌড়ের গতি হয়ে যায় ঘণ্টায় তিনশো মাইল। সেই চর্খীপাকের ভেতরের মণ্ডলে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগ এক নাগাড়ে আধ ঘণ্টাও থাকে। মাপজোখ নেওয়াই যায় না। Aerometre নিজেই তচনচ্ হয়ে যায়। ১৯২৬-এ মায়ামী-বীচের Aerometre ১৩৮ মাইল বেগ নিকেশ করার পর নিজেই নিকেশ হয়ে গেছিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উচ্ছল হয়ে ওঠে। ঢেউ ওঠে পাহাড়ের মতো তুঙ্গ, পাতালের মতো অথৈ। যতক্ষণ হারিকেন ততক্ষণ আকাশ ভেঙে ভূতলে আছড়াবে, সাগর কোনায়ে পৃথিবী ভাসাবে, বাজ পড়বে, বিদ্যুৎ হানবে। ফেঁড়ে, চিরে আকাশ-পাতালে রবারবা উঠবে বিকট। প্রথম একচোট 'হৈ হৈ রব, ঐ ভৈরব'; তারপর মহাকালের শঙ্খের এক ফুঁ থেকে অন্য ফুঁয়ের মাঝের সময়ে একটু বিরাম পাওয়া যাবে। তারপর আবার মহাবিপ্লব; কিন্তু এবারের চোট বিপরীত দিক থেকে। ১৩৬৩তে ফ্লোরা কুবাকে থেঁৎলালো সাতদিন ধরে, তারপর চারদিন স্বস্তি; তারপরে আবার তিনদিন ধরে চললো 'আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে হট্টগোল!' অবশ্য ইউনাইটেড নেশনস বা আমেরিকা কুবাকে সাহায্য করেনি। কুবা তো তোবাগো নয়। মানুষ?—ছোঃ! রাজনৈতিক নীতিই যদি না মিললো তবে আবার মানুষ কি? দু-পেয়ে হলেই যদি মানুষ হয়, তাহলে তো পাখীও মানুষ! কম্পাশও মানুষ!

হারিকেনের সঙ্গে ভূমিকম্প? সে সোনায় সোহাগা। এমন ঘটনা ১৭২২ থেকে ১৯০৩ পর্যন্ত বার দশেক হয়েছে, এবং এক ডোমিনিকা, জ্যামায়কা এবং গুয়েদা-লুপেই ৬ বার। ১৯৩৩এ কুড়িবার এমন ঝড় বয়েছে! ১৪৯৫ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত ৮৬ বার সর্বনেশে ঝড় বয়ে গেছে ক্যারিবিয়ানে। ঝড়ের চেয়ে তুফানেই বেশী সর্বনাশ। তুফানের চেয়ে অগ্নিবর্ষায় আরও বেশী। সে সর্বনাশ সত্যি সত্যি সর্ব-নাশ! বেলিজ, সান্তাক্রুজ, সেণ্ট পীয়েরের, হাভানা এ-ধরনের সর্বনাশ পুইয়েছে।

ভূমিকম্পের তল্লাট ক্যারিবিয়ান। ভূমি-কম্পের ফলেই এতোগুলো দ্বীপ। ভূমি-কম্পের ফলেই ক্যারিবিয়ান সাগর। জ্যামায়কার রাজধানী পোর্ট রয়্যাল ১৬৯২র ভূমিকম্পে লোপাট হয়ে গেছে। জ্যামায়কার বর্তমান রাজধানী কিংসটন। ১৯০২এর আগে পরে অনেকগুলো দ্বীপেই ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়েছিল। মণ্টসীয়াট ভুগেছে ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ঘন ঘন।

এমনি ভূমিকম্পে জ্যামায়কার প্রাক্তন রাজধানী পোর্টরয়াল ১৬৯২তে আধখানা সমুদ্রে ঢুকে যায়। ক্যারিবিয়ানের বহু দ্বীপে কিম্বদন্তী শোনা যায় এমনি জলের তলায় ঢুকে যাওয়া শহর সম্বন্ধে। ক্যারিবিয়ান সাগরে আমেরিকান সৌখীন ডুবুরীরা ঝাঁকে ঝাঁকে কিলবিল করে এই গেণ্ডুয়া খেলার উন্মাদনায় মত্ত হবার পিয়াসে।

কাজেই চিরবসন্তের দেশ ক্যারিবিয়ান এতো নিরীহ, নিলীম, নিথর-নিলয় নয় যতোটা বোধ হয় এর শ্যামলে, ছবিতে, নীলে, প্রবালে মেলানো চেহারা দেখে। ক্যারিবিয়ানের রুদ্ররূপ করাল, কুৎসিত, ক্রুর।

গ্রীনেডা-ত্রিনিদাদ নব্বই মাইল দূরেও নয়। মেছো বোট আকছার যাতায়াত করছে, স্মাগলিংও দিব্যি চলে। ত্রিনিদাদে তেল, পীচ-লেক, চিনি, কোকো—কাজেই ত্রিনিদাদ শাঁসালো দেশ। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ টাকা কোটি থেকে অর্বুদ-অর্বুদ খাটছে। কিন্তু তার পাশে গ্রীনেডা ভারী দরিদ্র দেশ। ত্রিনিদাদের নিগ্রোরা গ্রেনাডীয়ান নিগ্রোদের রীতিমত হতচ্ছেদ্দা করে। 'হতচ্ছেদ্দা' এক ধরনের ধর্ম এবং বর্মও। হতচ্ছেদ্দা করতে না পেলে মানুষ বোধ করি তার শাঁসালো-পনার ঠেকারে গম্-গম্ করতে পায় না।

গ্রীনেডার পরিধি মোটামুটি ১২০ বর্গমাইল। ছোট দ্বীপ। রাজধানী সেণ্ট জর্জেস। মোটামুটি সুন্দর দ্বীপ। ভালো ভালো সৈকত থাকার দরুণ আনা-গোনা যাত্রী কারবার প্রশস্ত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস এর নামকরণ করেন কন্সেপসিয়ঁ। কিন্তু ইংরেজরা নব নামকরণ করলেন গ্রীনেডা। প্রথম প্রথম পর্তুগীজ এবং স্পানিশরা গ্রীনেডা অধিকার করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ছোট্ট দ্বীপেই তুলকালাম যুদ্ধ বাধায় কারীবরা। জারিজুরি ভেঙে যায় সভ্য শাদাদের। তাদের 'দাঁত খট্টা' হয়ে যায়। য়োরোপীয়েরা দূরে থেকে প্রণতি জানিয়ে সরে পড়ে। গ্রীনেডা দখল হয় না।

কিন্তু ইংরেজ ছাড়ার পাত্তর নয়। ডাচ পীটার মীনুইট চব্বিশ ডলার মূল্যের আয়না, পুঁথি আর ছুরির বিনিময়ে আজকের নিউ-ইয়র্ক কিনেছিলো,—নাম ছিলো ম্যানহাটান দ্বীপ। গোটা কাশ্মীর দেশটাও কেনা-বেচা করার ফলেই স্যর হরি সিংয়ের ইজারায় পরিণত হয়েছিল। মহামতি সেসিল রোডস্ বেচুয়ানাল্যাণ্ডের রাজা মাতাবেলের কাছ থেকে কারসাজি করে হড়প করেছিলো আজকের রোডেশিয়া, —শাদা-বিক্রমের দেশ। ১৮১৯এ সিংগাপুর, ১৮৩৯এ এডেন, ১৮৪২এ একধারে সিন্ধ অন্যধারে হংকং বাগিয়ে ইংরেজ রাজনীতি যে হাতসাফাই দেখিয়ে গিয়েছে, তারই অন্য সংস্করণ গ্রীনেডা। ১৬২৯এ কিছু কুড়ুল ছুরি, রঙীন কাপড় আর পুঁতির বদলে দ্বীপখানা অধিকার করে বসে ইংরেজ। অবশ্য আইনতঃ প্রমাণ করে 'কিনেছে'। যেমন সেদিন রোডসও প্রমাণ করেছিলো। ইংরেজ আইনপ্রিয় জাত, নিঃসন্দেহ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে কে এক কৃতবিদ্য লুঠেরা আর্ল অব কার্লাইলকে ইংরেজ রাজ তামাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ স্রেফ লিখিত-পঠিত দানও করে ফেল্লেন। উড়ো-খৈ পড়লো গোবিন্দের ভাগ্যে। গ্রেনেডা অধিকারে আনতে আনতে বহুকাল কেটে গেলো। বহু রক্তক্ষয়, বহু মিথ্যা, বহু শঠতা। ১৭৬৪ ট্রীটি অব প্যারিসেই প্রথম ইংরেজরা গ্রেনাডা আইনতঃ পেলো।—এই সর্তে যে—গ্রেনেডায় ক্যারীবরা 'বসবাস' যেমন করছে করবে। কারীব দ্বীপ বলতে গ্রেনাডা যেমন আছে থাকবে।

কিন্তু থাকবে কেন? থাকতে পাবে কেন? তবে ইংরেজ বলেছে কেন? ফরাসীরা যখন গ্রেনাডা ইংরেজদের ছেড়ে দিলো তখন ফরাসী নিগ্রো ক্রীতদাসরাও মুক্তি ও স্বাধীনতা পেলো। ইংরেজদের আমলে তাদের পুনশ্চ 'ধরবার' এবং ধরে 'ব্যবসায়' করবার প্রচেষ্টা চলে। ফলেই বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহে কারীবরা নিগ্রোদের সাহায্য করে। বহু কষ্টে ল্যাজ সামলে ইংরেজ তখনকার মতো পালা, গুটোলো।

কিন্তু বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা; ইংরেজ ছুঁলে আটানব্বই ঘা;—আমেরিকা ছুঁলে কতো,—এখনও ঘা চলছে কি-না তাই পরিসংখ্যান-কর্তৃপক্ষ জানতে দিচ্ছেন না। পরম কারুণিক ইংরেজরা তখন 'ব্যবস্থা' করতে লেগে গেলেন। ভবিষ্যতে গ্রীনেদার শাদা-কর্তারা কেউ যাতে কালো জমিতে ভাগ বসিয়ে হাঙ্গামার সৃষ্টি না করতে পারেন—মাত্র এই শুভ ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েই জমি জরীপ করতে গিয়েছিলেন। অবশ্য সঙ্গে কিছু সৈন্য-গোলা-বারুদ ছিলো। তা থাকবে বৈকি। কুকুরের কামড় আছে, বাঘের থাবা, সাপের ছোবোল,—আর শাদা জরীপ-কর্মীদের কিছু থাকবে না। কিন্তু মন্দমতি কারীবরা সেই জরীপদলকে ঘেরাও করে। মারধোর না করে ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরতে বলে। (সে তো আমাদের হোলকার-নরেশও বলেছিলেন আরগাঁওয়ের লড়ায়ে ঘায়েল হওয়া ইংরেজদের।) ইংরেজ-প্রথানুসারে ওরা ফিরেওছিলো।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে 'কমিশন' গঠিত হোলো। ভবিষ্যতে শাদা-কালোর দ্বন্দ্ব আর যাতে না হয়। সৎ-বুদ্ধি ছাড়া আর কী! ক্যারীবদের বোঝানো হোলো এই সীমা-রেখার মধ্যে 'তাদের', এর বাইরে 'শাদাদের'। অর্থাৎ পরবর্তী যুগে স্মাটস এবং ভেরহুড এবং ইয়ান-স্মিথ যে কম্মো আফ্রিকায় করেছেন,—তাই। কেবল জুলুমবাজী।

কিন্তু কিছু কিছু করিৎকর্মাদের তুষ্টি তখনও তাতেও হোলো না। মেম সায়েবদের ভারী ভয় তাঁদের বরাঙ্গ দর্শনে অকস্মাৎ যদি কৃষ্ণকায় মহাঘোর চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দক রাহু-কেতুরা ধাবমান হয় তখন সেই গ্রহণ থেকে মুক্তিস্নান হবে কী করে।

> "How could a civilised white lady bred in the advanced societies be expected to suffer the perpetual presence of these half monsters!"

তাবৎ কারীবদের ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে ছেড়ে আসার প্রস্তাবও হয়েছিলো। (আমাদের দেশে, দিল্লীর বাঁদরদের হিমালয়, বিন্ধ্যগিরিতে ছাড়ার প্রস্তাবও জৈন-সজ্জনেরা হিং-টিংছট্ উচ্চারণ করেছিলেন। পুষ্কর হ্রদের কুমীরদের কচ্ছ উপসাগরে কালাপানি করা গেলো যখন তখন যে কেন সে চিৎকার ওঠেনি, জানা নেই)।

কারীবরা অসভ্য। শাদাদের সেই ঠ্যেঠামি সহ্য করতে পারেনি। ১৭৭২-এ তুলকালাম লড়াই। কারীবরা ঘায়েল হোলো; কিন্তু যে মার খেলো সাহেবরা তা আর ভুলবার নয়। লেফটানেন্ট গবর্ণর পটল তুললেন; বেশীর ভাগ শাদা গ্রীনেদার মাটিতে মিশে গেলো। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, হেরে যাবার পর যা এরা চিরকাল করে, সেই সন্ধি করলো। অবশ্য 'সন্ধি' এক ধরণের অভিসন্ধি। মোকা তালাশ করার অবসর মাত্র। এর পরের ভাষা আমার বিদ্যায় এবং মেজাজে কুলুবে না। তুলে দিচ্ছি হুবহু স্যর এলেন বার্নস্-এর হিস্ট্রি অব ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে।

> "....but a treaty of peace was finally agreed upon in February, 1773, a considerable area of land being guaranteed to the Caribs in perpituity (ব্যাপার বুঝুন! কারীরদের দেশ; অথচ ভাষার কেরামতিতে গলা ফাটিয়ে এজাহার কপ্‌চাচ্ছেন যেন বুদ্ধদেব-যীশু বেটে খেয়ে পরম দাক্ষিণ্য সহকারে কারীবদের প্রতি বদান্যতা দেখাচ্ছেন! Guaranteed! মনে থাকে যতোই যা জমিজমা দিন্, সমুদ্রের তীরে বাছা বাছা জায়গাগুলো নিজেরা হড়প করে, কারীবদের দিচ্ছে বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে খেদিয়ে; অথচ কারীবদের প্রধান উপজীব্য মাছ: জীবনের প্রধান অঙ্গ সমুদ্র! দুঃখে বেদনায় বহু কারীব যে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ খেয়ে সমুদ্রে ডুবে মরেছে, সেই পরম আত্মোৎসর্গময় তীর্থটি এখন আমেরিকান পর্যটকদের অবশ্য দর্শনীয়। বুজরুকী যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তার নাম হয় ডিপ্লম্যাসী! যাক! উদ্ধৃতিটি শেষ করা যাক)—on condition that they laid down their arms and recognised the King of Great Britain as sovereign of the island. (কী চমৎকার ডিপ্লম্যাসী! রুশ যদি একম্মো করতো জার্মানদের ওপর কী কাণ্ড হোতো!...বুজরুকী এখানেই শেষ নয়।) The military operations against the Caribs were denounced in the House of Commons as being disgraceful to His Majesty's arms' and the action of the Government in this matter was severely criticised".

আরও আছে!! His Majesty ভাঙেন, তো মচকান না।

> 'A St. Vincent Act was disallowed by the King in 1773 as it aimed at taking away the Carib lands 'which they hold upon His Majesty's sufferance and cannot alienate wtihout license. (Acts, Privy Council Vol V 1766-83 pp 352-5)

(ক্রমশঃ)

রবার্ট হুডিন

প্রভাতকুমার দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বলা বাহুল্য এর পর অনুমতিপত্রটুকু পেতে হুডিনের কোন কষ্টই হয় নি। অনুমতিপত্রটুকু নিয়ে আসার জন্যে তাকে প্রিফেক্টের অধীনস্থ পূর্বোক্ত অফিসারের কাছেই যেতে হয়েছিল। হুডিন তার ঘরে এবারে প্রবেশ করা মাত্র তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং একগাল হেসে বিনয়-সুলভ ভঙ্গীতে বললেন,—"আরে আসুন, আসুন। আপনারা হলেন গিয়ে উঁচুস্তরের লোক। কখনো কখনো ছদ্মবেশে আসেন বলে আপনাদের ঠিক চেনা যায় না। কিন্তু এখন চিনে ফেলেছি। আপনারা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য যাদুকর, আমাদের প্রিফেক্টের এক টেবিলের ইয়ে মানে......এই যে আপনার অনুমতিপত্রটা একেবারে রেডি হয়ে আছে স্যর।"

অবশেষে হুডিনের মুখে হাসি ফুটলো। রঙ্গালয় নির্মাণ শেষ হল এবং তার খেলা দেখানো শুরু হল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তিনি পেশাদার যাদুকর হিসাবে সর্বপ্রথম জনসমক্ষে নিজেকে উপস্থিত করলেন।

এইভাবেই হুডিনের জয়যাত্রা শুরু হল। সন্ধ্যা আটটার প্যারিস এবং হুডিনের ম্যাজিক পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে যে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল তার কিছু নমুনা আলজিরীয় সাংবাদিকের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

এইভাবে হুডিনের জয়যাত্রা শুরু হল। বটে কিন্তু একদিনেই তিনি জনপ্রিয় বা যশস্বী হতে পারেন নি। তাকে দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গে যাঁরা তাল রেখে চলেন তাঁদের শুধু বুদ্ধিমানই বলা চলে। হুডিন সময়ের আগে আগে চলতেন, তাই তিনি প্রতিভাধর।

পেশাদার যাদুকর হবার পরও তিনি ঘড়ির ব্যবসা তুলে দেন নি। এদের সঙ্গে সঙ্গে একটি পত্রিকার সম্পাদনা-ভারও তাঁর কাঁধে চাপানো ছিল। 'Cagliostro' নামক একটি কমিক জার্নালের তিনি সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে যাদুর চর্চা করতে পারলেই তিনি যথার্থ সুখী হতেন। নিত্য-নতুন খেলা আবিষ্কার করার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে মূলধন করেও তিনি বহু খেলা বার করেছেন।

রবার্ট হুডিনের শ্রেষ্ঠ খেলাগুলির মধ্যে দিব্যদৃষ্টির খেলাটি অন্যতম এবং বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই খেলাটি আজকের দিনেও বহু খ্যাতনামা যাদুকর দেখিয়ে থাকেন। রবার্টই খেলাটির আবিষ্কারক।

এই সেকেণ্ড সাইট বা দিব্যদৃষ্টি নামক খেলাটির উৎপত্তি একটু মজার। হুডিনের দুই ছেলে একদিন ড্রয়িং-রুমে বসে খেলা করছিল। ছোট ছেলেটি তার দাদার চোখ পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল এবং তারপর চোখ-বাঁধা অবস্থায় বড় ভাইকে বিভিন্ন জিনিস স্পর্শ করে বলে দিতে হচ্ছিল যে সেটি কি জিনিস।

এই সামান্য শিশুসুলভ খেলাটিই হুডিনের মনে এক অসামান্য চিন্তা বয়ে নিয়ে এল। এইভাবেই দিব্যদৃষ্টি খেলাটির জন্ম। হুডিন মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, খেলাটি কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তিনি অবশ্য ইতিমধ্যেই স্থির করে ফেলেছিলেন যে, তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে তিনি ঐ খেলাটি দেখাবেন। খেলাটি দেখাবার জন্য তিনি একটি 'কোড' বা গুপ্তভাষা বার করে ফেললেন। এই ভাষা তিনি এবং তাঁর ছেলে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারতেন না। খেলাটি দেখাবার সময় যে পিতা-পুত্রের মধ্যে কোন গুপ্ত-ভাষায় কথাবার্তা হয় তাও কোন দর্শকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব ছিল না। সাধারণ প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই এই গুপ্তভাষা লুকিয়ে থাকত। সেজন্য কোন দর্শকের পক্ষে কোন সন্দেহ করার সুযোগই কখনো ঘটত না।

এই একটি সার্থক খেলা তৈরী করার জন্য হুডিনকে যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা ভাবাই যায় না। প্রথমত একটি গুপ্তভাষা বার করা। দ্বিতীয়ত তাকে গ্রীক, হিব্রু, রাশিয়ান, চাইনীজ, তুর্কী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা শিখতে হয়েছিল। তৃতীয়ত তাকে বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতির নাম, রত্ন পাথরের নাম, খনিজ পদার্থের নাম প্রভৃতিও জানতে হয়। প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাকে বহু বই পড়তে হয়েছিল। নানারকম অদ্ভুত এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিস সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল হতে হয়েছিল। এ ব্যাপারে অবশ্য তাকে তার প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু Artistide la Carpentier যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

হুডিনের এই দিব্যদৃষ্টির খেলাটি তাকে একবার এক জটিল পরিস্থিতির বাঁধন থেকে কিভাবে মুক্ত করেছিল সেই কাহিনীটিই বলি।

রবার্ট হুডিন যাদুকর হিসাবে বিখ্যাত হবার পর একদিন বেলজিয়ামের ব্রুসেলস শহরের এক থিয়েটার-এজেন্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করে খেলা দেখাবার জন্য এক কণ্ট্র্যাক্ট করেন। হুডিনকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, এই কন্ট্রাক্টের ফলে তিনি অত্যন্ত অল্পসময়ে লক্ষাধিক ফ্রাঙ্ক লাভ করবেন। হুডিনকে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে লিখে দিতে হয়েছিল যে, তিনি যদি নির্দিষ্ট তারিখে ব্রুসেলসে গিয়ে হাজির হতে না পারেন তবে তার কয়েক হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা বাবদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

নির্দিষ্ট সময়ে হুডিন তার বিপুল লটবহর নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন। পথে Quievrain শহরে পৌঁছে তাদের ব্রুসেলসে যাবার জন্য ট্রেন ধরার কথা। কিন্তু সেখানেই এক বিপদ দেখা দিল। সেখানকার কাস্টমসের লোকেরা তার কাছে তার মালপত্রের জন ছাড়পত্র চেয়ে বসলেন। ব্রুসেলসের থিয়েটার-এজেন্ট তাকে বলে-ছিলেন যে, তিনি ম্যাজিক দেখাবার যন্ত্রপাতি নিয়ে যাচ্ছেন এই কথা বললেই তাঁর ছাড়পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এত সহজে জের মিটল না। শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীটি হুডিনকে জানালেন যে, যেহেতু তার কাছে তার মালপত্রের জন্য ছাড়পত্র নেই অতএব তাকে তার বাক্স, তোরঙ্গ সব কিছু খুলে মালপত্র দেখাতে হবে। মাল-পত্রের মোট মূল্যের পঁচিশ শতাংশ শুল্ক-কর হিসাবে দেবার পরই হুডিনকে ব্রুসেলসে যেতে দেওয়া হবে।

হুডিন উত্তরে তাকে জানিয়েছিলেন যে, তার পক্ষে কর্মচারীর নির্দেশ মত কাজ করা সম্ভব নয়। কর্মচারীটি তার কারণ জানতে চাওয়ায় হুডিন জানালেন যে, তার মালপত্র বিক্রেয় পণ্যদ্রব্য হিসাবে ধরা চলবে না। তিনি এগুলো নিয়ে ব্রুসেলসে কয়েক দিন যাদুর খেলা দেখাতে যাচ্ছেন এবং

খেলা দেখাবার পর তিনি এগুলো ফেরত নিয়ে আসবেন।

হুডিনের কথায় কর্মচারীটি কর্ণপাত করলেন না। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন যে, কর না আদায় করে তিনি আইনত কাউকেই যেতে দিতে পারেন না। তবে হুডিন যদি বেলজিয়ান মন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে পারেন তবে তাকে যেতে দেওয়া হবে।

হুডিন ইচ্ছা করলে এই পথ অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু মন্ত্রীর উত্তর আসার অপেক্ষায় বসে থাকলে তিনি নির্দিষ্ট দিনে ব্রুসেলসে হাজির হতে পারবেন না বলেও বুঝে নিলেন। সেক্ষেত্রে তাকে হাজার হাজার ফ্রাংক জরিমানা দিতে হবে।

হুডিন একে একে শুল্ক বিভাগের সমস্ত অফিসারদের সঙ্গেই দেখা করলেন কিন্তু তারা প্রত্যেকেই জানালেন যে, এ ব্যাপারে তাদের কিছুই করণীয় নেই। অগত্যা হুডিন কাস্টমসের ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করলেন। অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁদের কথাবার্তা হতে লাগল। হুডিন যতবারই তার বক্তব্য বলতে যান ডিরেক্টর ততবারই তাকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যান। এক সময়ে তিনি হুডিনের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন, "আপনি একজন যাদুকর, তাই না?"

'হ্যাঁ', হুডিন উত্তর করলেন।

"খুব ভাল কথা; আমি অনেক যাদুকরের খেলাই দেখেছি। এই সমস্ত খেলা দেখে আমি খুবই আনন্দ পাই।"

ডিরেক্টরের কথা শুনে হুডিনের মনে এক প্ল্যান খেলে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডিরেক্টর আবার হুডিনকে প্রশ্ন করলেন, "আপনার সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক খেলাটি কি?"

"হঠাৎ আমার পক্ষে সোট বলা মুস্কিল। কিন্তু আপনি যদি একটা খেলা দেখতে চান তাহলে আমি এখুনি একটা আপনাকে দেখাতে পারি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখবো! নিশ্চয়ই দেখবো—" ডিরেক্টরের কণ্ঠে ঔৎসুক্য ঝরে পড়ল।

রবার্ট হুডিনের বড় ছেলে কিছু দূরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা ইঁটের টুকরোকে ফুটবল করে একা-একাই খেলছিল। রবার্ট হুডিন তাকে হাঁক দিলেন, "এমিলি, এই ভদ্রলোকের পকেটে কি আছে তা তুমি বলতে পারো?"

দূরে খেলা করতে করতেই ছেলেটি জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। ঐ ভদ্রলোকের পকেটে একটা নীল ডোরাকাটা রুমাল আছে।"

ডিরেক্টর ছেলেটির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। তারপর তিনি প্যান্টের দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেটের জিনিসগুলোকে আরো ভেতরের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "বাঃ বাঃ, বেশ বেশ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ছেলেটা যে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়েনি তা কি করে বুঝবো?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, "আচ্ছা আমার রুমালের তলায় কি আছে তা ঐ ছেলেটি কি বলতে পারে?"

হুডিন এমিলির উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, "এই ভদ্রলোকটি তার রুমালের তলায় কি আছে তা জানতে চাইছেন।"

দূর থেকেই ছেলেটি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, "ওঁর রুমালের তলায় সবুজ মরক্কো চামড়ার চশমার খাপ আছে।"

"এ তো বড়ই তাজ্জব ব্যাপার দেখছি।" —ডিরেকটর স্বগতোক্তি করে উঠলেন। তারপরে তিনি বললেন, "আচ্ছা চশমার খাপের তলায় কি আছে তা কি ছেলেটি বলতে পারে?"

রবার্ট হুডিন আবার ছেলের উদ্দেশে হাঁক দিলেন। এমিলি ফুটবল খেলতে খেলতে দূর থেকেই জবাব দিল, "কফির কাপ থেকে বাঁচানো একতাল চিনি ওঁর চশমার খাপের তলায় রয়েছে।"

ডিরেকটর বিস্ময়ে বোবা বনে গেলেন। বলা বাহুল্য এরপর বাক্স-প্যাঁটরা না খুলেই রবার্ট হুডিন ব্রুসেলসের পথে যাত্রা করতে পেরেছিলেন।

রবার্ট হুডিন কি ভাবে এই অসাধ্য সাধন করলেন তা জানতে চাওয়ার কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। তিনি পকেটমারা বিদ্যায় ওস্তাদ ছিলেন। এই বিদ্যার প্রয়োগ করে ডিরেকটরের পকেটে কি আছে তা তিনি আগেই জেনে নিয়েছিলেন। অতঃপর সেকেন্ড সাইট বা দিব্যদৃষ্টি খেলার মূল-সূত্র অনুযায়ী কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি সেগুলি তার পুত্রকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

যাদুকর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনাও আছে। একটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

একদিন একটি তরুণী রবার্টের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাকে অভিজাত-বংশীয়া বলেই মনে হোল। তার মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকলেও হুডিন বুঝতে পারলেন যে, তিনি অত্যন্ত সুন্দরী। ভদ্রমহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিন্ত হলেন যে, সেই ঘরে যাদুকর হুডিন এবং তিনি ছাড়া আর কেউই নেই ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আসনই গ্রহণ করলেন না। মহিলাটি আসন গ্রহণ করবার পর হুডিনও বসলেন এবং তার বক্তব্য শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা কয়েক মুহূর্ত কিছু বলতেই পারলেন না। তাকে খুবই অভিভূত বা ব্যাকুল বলে মনে হচ্ছিল। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন, "আমার এখানে আসার ব্যাপারে আপনি কি ভাবছেন জানি না।" অল্পক্ষণের জন্য চুপ করে থেকে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আপনার কাছে যে ঠিক কি চাইতে এসেছি তা আপনাকে বোঝানো আমার দুঃসাধ্য।"

রবার্ট ভদ্রমহিলার কথা শুনে অবাক হলেন। মহিলাটি বলে চললেন, "আমি একজনকে ভালবাসতাম এবং সেও আমাকে ভালবাসতো। কিন্তু পরে সে আমায় নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করেছে।"

কথা ক'টি বলার পর মহিলাটি মাথা তুললেন এবং তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভীরুতাকে জয় করে দৃঢ়স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে এবং আমি সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।"

রবার্ট খুবই বিব্রতভাবে বললেন, "এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

ভদ্রমহিলা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "না না আমায় ফিরিয়ে দেবেন না; দয়া করুন, আমায় দয়া করুন।"

হুডিন হাসবেন না কাঁদবেন তা ভেবে পেলেন না। কিন্তু রহস্যময় ব্যাপারটার পটভূমিকা জানার জন্য তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, "আপনি এত উত্তেজিত হবেন না, আবেগ সংবরণ করে পুরো ব্যাপারটা আমায় খুলে বলুন। দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না।"

"একি বলছেন আপনি? আপনার অসাধ্য কী আছে? আর এ তো অত্যন্ত সহজ কাজ।"

হুডিন বললেন, "বেশ বলুন, আমায় কি করতে হবে?"

"আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।" মহিলাটি জানালেন।

"প্রতিশোধ? প্রতিশোধ কি রকম ভাবে নেবেন?"

"সে আমি কি জানি! আমি তো আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু শেখাতে পারি না। আপনি এত বড় প্রতিভাধর যাদুকর।"

"আমি প্রতিশোধ নেব?" রবার্ট হুডিন বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, আপনিই তো নেবেন। আপনার মত যাদুকরের পক্ষে এ তো অত্যন্ত সহজ কাজ।"

মহিলাটির স্পষ্ট উত্তরে রবার্টের হাসি পেল কিন্তু তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, "এক ধরনের যাদুকরেরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতির কাজ-কারবার করে বটে, কিন্তু আমি সে ধরনের যাদুকর নই। ওসব ব্যাপার আমার কিছুই জানা নেই।"

মহিলাটি হুডিনের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। হুডিন বারবার তার বক্তব্য পেশ করতে থাকলে মহিলাটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগনিরুদ্ধকণ্ঠে বিড়-বিড় করে কি বলে চললেন। অতঃপর তিনি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে হুডিনের দিকে এগিয়ে এসে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "ও, আপনি সে ধরনের যাদুকর নন। বেশ, ভাল কথা। এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত তা আমি জানি।"

হুডিন ব্যাপারটার আকস্মিকতায় চমকিত হলেন। ভদ্রমহিলার এ রকম ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে ভদ্রমহিলা ততক্ষণে বজ্রনির্ঘোষে বলতে শুরু করেছেন, "আপনাদের মত যাদুকরদের কাছে অনুরোধ করে যখন প্রার্থিত বস্তু মেলে না, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করতেই হয়। দাঁড়ান আপনাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা দেখাচ্ছি।" এই বলে মহিলাটি তার

গায়ের পোশাকটা তুলে ধরে কোমরের কাছে গোঁজা একটা ছোরার বাঁটে হাত দিলেন। সংগে সংগে তার মুখ-ঢাকা কাপড়টা খুলে ফেললেন। তার চোখেমুখে রাগ এবং পাগলামির চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে রবার্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু এক ভালবাসা-ভিক্ষুণী সুন্দরী তরুণীর সংগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হবে দেখে তিনি দুঃখ পেলেন। সংগে সংগে অন্য একটি উপায়ের কথা তার মনে হোল। তিনি মোলায়েম সুরে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন। বেশ বলুন, আপনার জন্য আমায় কি করতে হবে।"

"আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি প্রতিশোধ চাই, এবং..." কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন। তার মধ্যে কোমলতা এবং লজ্জা ফিরে এল। তিনি তার কথা শেষ করতে পারলেন না।

হুডিন বললেন, "এবং কি বলুন?"

"আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না যে, আমি ঠিক কি চাই। তবে আমার মনে হয় মানুষকে মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে বশ করা যায় এবং আপনারও সেই রকম মন্ত্র জানা আছে।"

হুডিন বললেন, "বুঝতে পেরেছি। আপনি কি চান, তা এতক্ষণে আমার কাছে পরিষ্কার হল। মধ্যযুগীয় যাদুকরেরাই এই সব মন্ত্রতন্ত্র খুব বেশি প্রয়োগ করতো। যাই হোক, আপনার ভাববার কিছু নেই, আমি আপনার বাসনা পূরণ করবো।"

এই বলে হুডিন তার লাইব্রেরীর সব-চেয়ে মোটা বইটা হাতে তুলে নিলেন। হুডিন বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা নির্দিষ্ট পাতায় এসে থামলেন এবং যাদু-যোগীর ভঙ্গিমায় বিশেষভাবে উচ্চারণ করে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন।

তরুণীটি বিস্ময়ের সংগে হুডিনের কাণ্ড দেখছিলেন। মন্ত্র পড়ার মধ্যেই হুডিন সুন্দরী তরুণীটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বললেন, "যাকে বশ করতে চাইছেন মন্ত্রের মধ্যে তার নাম থাকা চাই। অতএব দয়া করে আপনার প্রেমিকের নাম বলুন।"

তরুণীটি মৃদুকণ্ঠে বললেন, "জুলিয়ান।"

হুডিন গম্ভীরভাবে একটি জ্বলন্ত মোমবাতির মধ্যে একটি পিন ঢুকিয়ে দিলেন এবং গম্ভীরভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তার ভাবভঙ্গী সবই মধ্যযুগীয় যাদুকরের মত ছিল। অতঃপর এক সময়ে তিনি মোমবাতি নিভিয়ে দিলেন এবং তরুণীটির দিকে ফিরে বললেন, "আমি আমার যাদুশক্তিতে আপনার বাসনা পূর্ণ করেছি।"

"ওঃ, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।" তরুণীটির কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর জড়ানো। তরুণীটি টেবিলের ওপরে প্রচুর পরিমাণ অর্থ রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হুডিন তার একজন লোককে তরুণীটির বাড়ি পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে বললেন এবং তার সম্পর্কে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে আনতে বললেন। হুডিন পরে জানতে

পারলেন যে, তরুণীটি একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ। অল্প কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছেন। এই মৃত্যু তাকে ভীষণ আঘাত হানে এবং তার মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়। পরের দিন হুডিন তরুণীটির বাড়ি গেলেন। তরুণীটির আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে হুডিন তাদের পুরো ঘটনাটা জানালেন এবং টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেন।

হুডিন যখন প্যারিসের প্যালেস রয়েল নামক রঙ্গালয়ে তার যাদুর খেলা দেখাতেন সেই সময়ে প্যারিসের Gallery Choiseul য়ে কমটে নামক এক প্রতিভাধরও খেলা দেখাতেন এবং খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কমটে অবশ্য শুধু ম্যাজিকের খেলাই দেখাতেন না। তার খেলা দেখাবার বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন এবং ব্যাপক। তিনি সাধারণতঃ পাঁচ ছয় সাত বছরের শিশু-অভিনেতাদের নিয়ে খেলা দেখাতেন। তার খেলায় ম্যাজিক, কৌতুক এবং আরো অনেক কিছুই থাকতো। সেগুলি সাধারণতঃ বিচিত্রানুষ্ঠান বা ভ্যারাইটি পারফরমেন্স হিসেবেই চলতো। কমটের কৌতুকপ্রিয়তা এবং সূক্ষ্ম হাস্যরস সৃষ্টিই তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

কমটের সঙ্গে হুডিনের পরিচয় হয় এবং অল্পকালের মধ্যেই তা বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই দুই প্রতিভাধর শিল্পীর জীবনে অনেক মজার ঘটনা ঘটেছিল। এই ধরনের একটি ঘটনার কথা বলবো। কিন্তু তার আগে কমটের কথা অল্প বলে নিই।

কমটে তার ম্যাজিকে সরসতা আমদানি করতেন বলে তার জনপ্রিয়তা গগনচুম্বী ছিল। হস্তলাঘবের খেলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দি বার্থ অফ দি ফ্লাওয়ার্স বা ফুলের জন্ম নামক খেলায় তিনি মুহূর্তের মধ্যেই গোলাপ গাছ এবং গোলাপ ফুল সৃষ্টি করে বেছে বেছে সুন্দরী মহিলা দর্শকদের উপহার দিতেন।

কোন খেলায় হয়তো তিনি একটি হরতনের টেক্কা কোনও সুন্দরী মেয়ের কাছে পাস করে দিয়ে তাকে বলতেন, "আপনার হৃদয়ের ওপর আপনার হাতটা একটু রাখবেন কি? আপনার হৃদয় তো একটাই তাই না? দেখুন এর বেশী হলে আপনার পক্ষে অসুবিধা হবে: কোন্ হৃদয়ের ওপর তখন হাত রাখবেন তা ভাবতে হবে....."

এই ধরনের কথাবার্তা বলার পর তিনি Ace of Heart বা হরতনের টেক্কাটি বার করে সবাইকে জানাতেন—'দেখুন ভদ্রমহিলার আরো একটি হৃদয় রয়েছে।'

সুন্দরী মহিলারাই যে কমটের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত হতেন তা নয়। কখনো কখনো পুরুষ দর্শকদেরও তিনি নাজেহাল করে ছাড়তেন। কখনও হয়তো কোন টাকমাথাওয়ালা লোকের কাছ থেকে তার টুপিটা কমটে খেলা দেখাবার সময় ধার নিলেন। কমটে টুপিটা থেকে পরচুলা বার করে বলতেন, "ওহো আপনি পরচুলা ব্যবহার করেন দেখছি।" অতঃপর টুপিটা থেকে ক্রমান্বয়ে মোজা, সেমিজ, ফ্রক, ব্লাউজ, বিব প্রভৃতি বার করে কমটে বলেন, "আপনি দেখছি একেবারে ঘোর সাংসারিক লোক মশাই, পুরো সংসারটাকেই এই ক্ষুদ্র টুপির মধ্যে নিয়ে এসেছেন। পরিবারটিও হয়তো এর ভেতরেই রয়েছেন। যাক তাঁকে সর্বসমক্ষে বার করে আপনাকে আর লজ্জা দিতে চাই না......"

অষ্টাদশ লুইয়ের সামনে একবার কমটে খেলা দেখাচ্ছেন। তিনি লুইকে তাসের প্যাকেট থেকে যে কোন একটি তাস বেছে নিতে বললেন। কমটে সেই তাসটি বার করে দেবেন। লুই প্যাকেট থেকে একটি তাস তুলে নিয়ে দেখলেন যে, সেটি হরতনের সাহেব বা King of Hearts। এরপর কমটের এক অনুচর একটা খালি টেবিলের ওপর একটা ফুলদানিতে কিছু ফুল রেখে দিল। অতঃপর কমটে একটি গুলিভরা পিস্তল নিয়ে তাতে লুইয়ের পছন্দ করা তাসটি না দেখে পুরে ফেললেন। তিনি লুইকে জানালেন যে, তিনি পিস্তল চালালেই লুইয়ের পছন্দ করা তাসটি ফুলদানির ওপরে দেখা যাবে। সুতরাং লুই যেন অনুগ্রহ করে ফুলদানির ওপরে তাঁর চোখ নিবদ্ধ রাখেন।

লুই তাঁর চোখ ফুলদানির ওপর রাখলেন। উপস্থিত উৎসুক দর্শকদের হাজার হাজার চোখ সেই একই জায়গায়। এক দুই তিন। কমটে পিস্তল চালালেন। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল ফুলদানির ওপরে অষ্টাদশ লুইয়ের ছোট্ট মর্মরমূর্তি।

মাথা থেকে বুক পর্যন্ত তৈরী নিজের মর্মরমূর্তির দিকে চেয়ে লুই কিছুটা অবাক হলেন বটে কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কমটেকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি যে বললেন, আমার পছন্দ করা তাসটাকে ফুলদানির ওপর দেখা যাবে; কই তা তো আমরা দেখতে পেলাম না।"

কমটে বিনীতভাবে বললেন, "ক্ষমা করবেন আমার ঔদ্ধত্যকে। আমি আমার কথা রেখেছি বলেই মনে করি। আপনি King of Hearts পছন্দ করেছিলেন আর ফুলদানির ওপর দর্শকেরা যা দেখছেন, সেটাও King of all hearts এখানে যত ফরাসী দর্শক আছেন, তাঁদের হৃদয়ের রাজা কি আপনি নন?"

খেলাটি দেখে দর্শকেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ১৮১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বরের "Royal Journal"-এ এ সম্পর্কে নীচের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল :—

"The whole audience exclaimed, in reply to M. Comte, — 'We recognise him — it is he — the king of all hearts! — the beloved of the French — of the whole universe — Louis XVIII, the augustus grandson of Henri Quatre!"

অষ্টাদশ লুইও কমটের এই খেলাটি দেখে খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি কমটেকে বলেছিলেন,

"Live many years for yourself, in the first place, and then for us."

এই যাদুকর, কৌতুকাভিনেতা সুরসিক কমটের সঙ্গে হুডিনের বন্ধুত্ব হবার পর কমটে প্রায়ই Palais Royal-এ হুডিনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। একবার কমটে এইরকম হুডিনের সঙ্গে দেখা করতে প্যালেস রয়ালে এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে দুই কৃতী শিল্পীর মধ্যে নানারকম আলোচনা ও গল্পগুজব হল। অতঃপর কমটের বিদায় নেবার সময়ে হুডিন তাঁকে প্যালেসের সিঁড়ির নীচে অবধি এগিয়ে দিতে এলেন। কমটে এক সিঁড়ি আগে আগে যখন নেমে যাচ্ছিলেন, তখন হুডিন অনুভব করলেন যে কমটের জামার পকেট তাঁর আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। হুডিনের কমটের ওপর চালাকি করবার ইচ্ছে হল। তিনি বেমালুম কমটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তাঁর রুমাল এবং সোনার তৈরী নস্যির কৌটো তুলে নিলেন।

হুডিন অতঃপর যখন মনে মনে ভাবছিলেন যে, এইবার কমটের জিনিসগুলো কমটেকে ফেরত দিতে গেলে কি মজাই না হবে ঠিক সেই সময়ে, দোতলার বক্স-অফিসের কর্মচারীটি হুডিনকে চীৎকার করে ডাকলেন। তিনি বললেন, "মাঁসিয়ে রবার্ট হুডিন, আপনি দয়া করে একবার ওপরের বক্স-অফিসে আসুন; আপনার সঙ্গে একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শ রয়েছে।"

হুডিন কমটেকে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বলে ওপরে উঠে গেলেন। তিনি কর্মচারীটিকে বললেন, "কি ব্যাপার, এমন জরুরী তলব করার মানে কী?" কর্মচারীটি হুডিনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। কর্মচারীটি বিনীতভাবে বললো, "কই আমি তো আপনাকে এখন ডাকি নি।"

"আপনি এক্ষুনি আমাকে ওপরে আসতে বলেন নি?"

"না তো।"

হুডিন চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন। আশেপাশে কেউই ছিল না। কারুর থাকার কথাও নয়। দু'এক মুহূর্ত ভাবতে ভাবতেই হুডিন কে তাকে ডেকেছিল, তা বুঝে ফেললেন। তিনি বুঝলেন কমটেই তাঁকে বোকা বানিয়েছেন। তাঁর মনে পড়ে
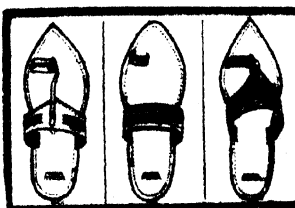
গেল কমুটে ventriloquism বা শব্দ-বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি কোন লোকের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এমনভাবে কথা বলতে পারেন যাতে পাশের লোকটির মনে হবে সেগুলি দূরে থেকেই ভেসে আসছে।

বোকা বনে গিয়ে হুডিন বিষণ্ণ মনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। তাঁকে দেখে কমুটে ভালমানুষের মত প্রশ্ন করলেন, "ওপরের ভদ্রলোকটি ডাকছিলেন কেন?"

রবার্ট হুডিন জবাব দিলেন, "আপনার তো তা জানা উচিত ছিল বলে মনে হয়।"

"আমার? না না আমি কি করে জানবো?"

হুডিন বললেন, "ওপরের লোকটি একটি অনুতপ্ত চোর। আপনার পকেট থেকে এই জিনিসগুলো ও হাতিয়েছিল।"

রুমাল এবং নস্যির কৌটো এগিয়ে দিতে দিতে হুডিন বললেন, "এই যে এগুলো নিন।"

কমুটে হাসতে হাসতে জিনিসগুলো ফেরৎ নিয়ে বললেন, "এইভাবে আমাদের দুজনের খেলা শেষ হওয়ায় ভালই হল। দুজনেই দুজনের ওপর টেক্কা মারলুম, কি বলেন! আমাদের বন্ধুত্বে আর কখনও বিচ্ছেদ ঘটবে না বলেই বোধহয়।"

সত্যি সত্যিই কমুটে এবং হুডিন চির-কালই পরস্পরের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

কমুটে মাঝে মাঝে অদ্ভুত এবং উদ্ভট কাণ্ড ঘটিয়ে আমোদ অনুভব করতেন। টুর্স শহরে এক তালাবন্ধ বাড়ির সামনে তিনি অসংখ্য পথচারীকে জড় করিয়েছিলেন। তাঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পেলেন যে বাড়ির ভেতর থেকে একজন ক্ষুৎ-মুমূর্ষুর গোঙানি ভেসে আসছে। জনতা উদ্দাম হয়ে উঠে বাড়ির দরজা ভাঙতে শুরু করলো। গোটা কয়েক দরজা ভাঙার পরও আটক লোকটির সন্ধান পাওয়া গেল না। কমুটে যে ventriloquism-য়ে ওস্তাদ তা তো এই পথচারীদের জানা ছিল না।

আরেকবার কমুটে একটা কোচগাড়িতে করে রাত্রে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। সেই গাড়িতে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে আরো অনেক যাত্রী ছিল। গাড়ী চলাকালীন প্রায় দশ-বারোজন ডাকাতকে গাড়ীর বাইরের দিকে সজোরে করাঘাত করে কর্কশ স্বরে বলতে শোনা গেল—'হয় টাকা দাও, নয় মর।'

ভয়ার্ত যাত্রীরা সবাই অলংকার, অর্থ, ঘড়ি ইত্যাদি একত্র করে ফেললেন। কমুটে সেগুলো নিয়ে গাড়ীর বাইরে ডাকাতদের দিতে যাবার ভার নিজেই অযাচিতভাবে নিয়ে নিলেন। ডাকাতেরা বহু মূল্যবান দ্রব্য এবং আশাতীত অর্থ পেয়ে কারুর কোন ক্ষতি না করেই চলে গেল। যাত্রীরাও নিজেদের প্রাণরক্ষা করতে পেরে আনন্দিত হলেন।

পরের দিন সকালে কমুটে সবাইকে জানালেন যে গত রাত্রে কোন্ ডাকাতেরাই তাঁদের গাড়ি ছেঁকে ধরে নি, তিনিই তাঁর শব্দানুকরণবিদ্যার সাফল্য পরীক্ষা কর-ছিলেন তখন সবাই রীতিমত অবাক হয়ে গেল। কমুটে প্রত্যেকের অর্থ অলংকার ইত্যাদি ফেরত দিয়ে সবাইকে হাজার গুণ খুশি করে তুললেন।

একবার Macon- এর মেলায় একটি গ্রাম্য স্ত্রীলোক একটা শুকর বিক্রী করতে এনেছিল। কমুটেও সেই মেলায় গিয়েছিলেন। কমুটে স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শুকরটার দাম কত?"

"এর দাম একশো ফ্রাংক, অবশ্য যদি আপনি কিনতে চান।"

"আরে আমি তো কিনতেই চাই, তবে একশো ফ্রাংক তো দিতে পারবো না। মাত্র দশ ফ্রাংক দিতে পারি।"

"আমার একশো ফ্রাংকই চাই। তার বেশীও নয়, আর কমও নয়। নিতে হয় নাও, না নিতে হয় যাও।"

আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে লক্ষ্য করে কমুটে বললেন, "ওহো, আমার দরটা তোমার খুব কমই মনে হচ্ছে তাই না! তোমার চেয়ে তোমার শুকর বেশী যুক্তিনিষ্ঠ বলে আমার মনে হয়। আচ্ছা আমি ওকেই জিজ্ঞাসা করছি। বল তো বাপু মিঃ শুকর, তোমার কি একশো ফ্রাংক দাম হওয়া উচিত?"

"একশো ফ্রাংক তো অনেক বেশী হয়ে গেল। আমার অসুখও আছে। আমার মালিক তোমাকে ঠকাতে চাইছে।" —বিকৃত এবং অস্বাভাবিক কণ্ঠে শুকরটা জবাব দিল।

আশেপাশে যারা ভীড় করেছিল তারা ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লো। সবাই ভাবলো শুকরের ওপর প্রেত ভর করেছে।

কমুটে তার হোটেলে ফিরে পুরো ব্যাপারটা অন্য লোকেদের কাছে ডালপালা সহকারে শুনলেন। তিনি আরো শুনলেন যে কয়েকটি সাহসী লোক শুকরটাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে প্রেতকে বার করে দিয়েছে।

একবার সুইজারল্যাণ্ডের Fribourg নামক এক জায়গায় কমুটে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাষাদের কাছে তার কয়েকটি যাদুর খেলা দেখাবার পর তারা তাকে শয়তান বলে ঠাউরে নেয় এবং তাকে মেরে ফেলার জন্য লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চাষীরা তাকে ধরে একটা চুনাপাথর গলাবার চুল্লীতে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। চুল্লীতে ফেলার পূর্বমুহূর্তে কমুটে এমন এক ventriloquism-এর প্রয়োগ করলেন যে চুল্লীর ভেতর থেকে একটা ভয়ংকর শব্দ শোনা গেল। ঐ শব্দ শুনেই চাষারা কমুটেকে ফেলে পালিয়ে গেল। এইভাবেই সেদিন কমুটের প্রাণ রক্ষা হয়েছিল।

কমুটে হুডিনের কাছে তার জীবনের এই সমস্ত মজার মজার ঘটনার গল্প করতেন। হুডিনও পরিবর্তে তাঁর জীবন-কাহিনী বন্ধুকে শোনাতেন।

হুডিন মাত্র দশ-বারো বছর যাদুকর হিসেবে খেলা দেখিয়েছিলেন এবং অত অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৮৫৬ সালে আলজিরিয়ায় খেলা দেখাবার পর তিনি আর বড় একটা খেলা দেখান নি। তার আগের বছর অর্থাৎ ১৮৫৫ সালেও তিনি খুব বেশী খেলা দেখান নি। সেই সময়ে বিদ্যুৎ এবং চৌম্বকের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কয়েকটি বিচিত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে-ছিল। হুডিন সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর ওপর নির্ভর করে কতকগুলো যন্ত্রের মডেল তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এই জন্যেই ১৮৫৫ সালে তাঁর পক্ষে আল-জিরিয়ায় যাওয়া সম্ভব হয় নি। ঐ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত Universal Exhibition-য়ে তিনি ইলেকট্রিসিটি এবং মেকানিজম-এর প্রয়োগ সম্পর্কে কতকগুলি অপূর্ব মডেল দেখিয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁকে যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

কোন নরম লোহার তৈরী চোঙের ওপরে তামার তার জড়িয়ে সেই তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে লোহাটা চুম্বকে পরিণত হয় এবং প্রবাহ বন্ধ করে দিলে তার চৌম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়—এই বর্তমানের সর্বজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটুকু তখন সবে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং বিজ্ঞানী মহলেই সীমিত ছিল। রবার্ট হুডিন সেই সময়েই এই তত্ত্বটুকু জেনে ফেলে এর সাহায্যে তাঁর বিস্ময়সৃষ্টিকারী তোরঙ্গের
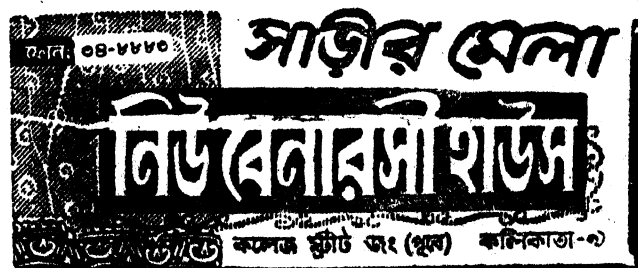
খেলাটা চালু করলেন। শক্তি-হরণকারী খেলা বলেও এটি কখনো কখনো উল্লিখিত হয়।

যাদুকর মঞ্চের ওপরে যেখানে লোহার তোরঙ্গটি রাখেন তার ঠিক তলায় একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক রেখে দিতে হবে। সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ যখন কোন প্রবাহ থাকবে না তখন লোহার তরঙ্গটি যে কেউ উঁচু করে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু যাদুকরের ইঙ্গিতে তাঁর সহকারী যদি সুইচ টিপে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালু করে দেন তবে বৈদ্যুতিক চুম্বকটি তখন লোহার তোরঙ্গটিকে এমন সজোরে আকর্ষণ করবে যে পৃথিবীর যে কোন শক্তিশালী মানুষের পক্ষেও তখন তোরঙ্গটি তুলে ধরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। প্রয়োজনবোধে তোরঙ্গের সঙ্গে বিদ্যুৎ-চুম্বকের সংযোগ-স্থাপন করে যাদুকর শক্তিশালী লোকেদের শক খাইয়ে জব্দও করতে পারেন।

আলজিরিয়ায় হুডিন এই ধরনের আরো কয়েকটি খেলা দেখাবার পর বিদ্রোহী আরব-সর্দারেরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে হুডিন তাঁদের চেয়েও বড় যাদুকর। তাঁরা খুশি হয়ে হুডিনকে একটি প্রশস্তি-পত্র দিয়েছিলেন। প্রশস্তিপত্রে লেখা ছিল:—

Homage offered to Robert Houdin, by the chiefs of the Arab tribes, after his performances given at Algiers on the 28th and 29th October, 1856.

Glory to God.

Who teaches us what we know not, and enables us to express the treasures of the mind by the flowers of eloquence and the signs of writing.

Generous-handed destiny has sent down from above, in the midst of lightning and thunders, like a powerful and fertilising rain, the marvel of the moment and the age, him who cultivates the surprising arts and marvellous sciences — the Sid—Robert-Houdin.

"Our country has seen no one comparable with him. The splendor of his talent surpasses the most brilliant productions of past ages. Our age is the more illustrious because it has possessed him.

"He has known how to stir our hearts and astonish our minds, by displaying to us the surprising facts of his marvellous science. Our eyes were never before fascinated by such prodigies. What he accomplishes cannot be described. We owe him our gratitude for all the things by which he has delighted our eyes and our minds; hence our friendship for him has sunk into our hearts like a perfumed shower, and our bosoms preciously conceal it. We shall in vain attempt to raise our praises to the height of his merit; we must lower our brows before him and pay him homage, so long as the benevolent shower fertilises the soil, so long as the moon illuminates the night, so long as the clouds come to temper the heat of the sun.

"Written by the slave of God,
"ALI-BEN-EL-HADJI MOUSSA

এর বাংলা অনুবাদ করলে অনেকটা নীচের মতই দাঁড়াবে:—

১৮৫৬ সালের ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর আলজিয়ার্সে রবার্ট হুডিন খেলা দেখাবার পর আরব সর্দারগণ কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত প্রশস্তি:—

"যা আমরা জানি না তা যিনি আমাদের শিখিয়ে দেন এবং যাঁর কল্যাণেই আমরা কথার ফুলঝুরি এবং লেখার সংকেত-এর সাহায্যে আমাদের মনের ভাব-সম্পদ প্রকাশ করি সেই ঈশ্বর মহিমান্বিত হন। মহানুভব-ঈশ্বর বজ্র এবং বিদ্যুতের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী এবং উর্বরা বর্ষার মত রবার্ট হুডিনকে আমাদের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইনি সেই রবার্ট হুডিন যিনি বিস্ময়কর কলাশাস্ত্রসমূহ এবং অত্যদ্ভুত বিজ্ঞানশাস্ত্র চর্চা করে এ যুগের বিস্ময়ে পরিণত হয়েছেন। আমাদের দেশে হুডিনের মত কোন লোক আমরা আজ পর্যন্ত দেখি নি। অতীতের সমস্ত বিস্ময়কর খেলাই তাঁর প্রতিভাদ্যুতিতে ম্লান হয়ে যায়। আমাদের যুগ তাঁকে লাভ করে মহিমান্বিত হয়েছে।

"অনুপম বিজ্ঞানের আশ্চর্যজনক খেলা দেখিয়ে কিভাবে আমাদের হৃদয়ে দোলা লাগাতে হয় এবং কিভাবেই বা আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করতে হয় তা তাঁর জানা আছে। এই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে আমাদের চোখ আজ যেভাবে বিমুগ্ধ এবং তৃপ্ত হল তেমন এর আগে আর কোনদিনই হয় নি।

"তাঁর অদ্ভুত খেলা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমাদের চোখ এবং হৃদয়কে তৃপ্তি এবং আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি যা দেখালেন তার জন্য আমরা তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"সুগন্ধি জলধারার মত আমাদের পারস্পরিক সখ্যতা আমাদের হৃদয়ের তলায় ডুবে রয়েছে এবং আমাদের হৃদয় অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু হিসেবেই এটিকে লুকিয়ে রেখেছে।

"হুডিনের উৎকর্ষ, তাঁর গুণাবলী এমনই অভ্রংলিহ যে আমাদের প্রশস্তি ততদূর পর্যন্ত পৌঁছে দেবার সাধ্য আমাদের নেই। শুধু এই বলি যে যতদিন কল্যাণময়ী বর্ষা ভূমিকে উর্বরা করবে, চাঁদ রাত্রিকে আলোকিত করবে এবং সূর্যের তাপ কমাবার জন্য মেঘেদের দেখা যাবে, ততদিন আমরা গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি আমাদের মস্তক অবনত করবো।"

ঈশ্বরের দাসানুদাস,
আলি-বেন-এল-হাদজি-মুসা
কর্তৃক লিখিত।

সত্যি সত্যিই হুডিনের প্রতিভা, কৃতিত্ব এবং সাফল্যের জন্য সর্বযুগের যাদুকরেরাই তাঁদের মস্তক হুডিনের উদ্দেশে অবনত করার জন্য বাধ্য থাকবেন। আধুনিক যাদু-বিদ্যার জনক হিসাবে হুডিনের অবদান অবিস্মরণীয়। হুডিনির মত পরবর্তী-কালের জনপ্রিয় এবং সফল যাদুকরেরা হুডিনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ম্যাজিকের ইতিহাসে হুডিনের অবদান চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রেক্ষাগৃহ

সলিল দত্ত পরিচালিত অপরিচিত চিত্রের সেটে অপর্ণা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

এতো বড় রঙ্গ, জাদু!

নাটক-পাগল বলে বাঙালীর প্রসিদ্ধি চিরদিনের। ভারতের যেখানেই বাঙালী গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করেছে—সে দিল্লীই হোক, আর লাহোরেই হোক,—সেখানেই তারা প্রতিষ্ঠা করেছে একটি কালীবাড়ী, আর ঐ সঙ্গে স্থাপন করেছে একটি ড্রামাটিক ক্লাব বা নাটুকে দল। 'অন্যে পরে কা কথা', স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু পর্যন্ত নাট্যাভিনয়ে মেতে উঠেছিলেন এবং সে বড়ো আজকের কথা নয়! এও জানা কথা, সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা নগরীতেই অন্তত পঁচানব্বই বছর ধরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো সান্যাল ভবনে ধর্মদাস সুর পরিকল্পিত সাধারণ রঙ্গমঞ্চে "নীলদর্পণ" নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায় যে-পাদপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তার দীপ্ত গৌরবশিখা উত্তর কলকাতার হাতীবাগান থেকে বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত অঞ্চলকে আলোকসমুজ্জ্বল করে রেখেছে আজও অবধি। নাট্যরসিকদের এ-কথাও অবিদিত নেই যে, আজ এই কলকাতা নগরীতে এমন একটি দিনও যায় না, যে-দিন এর বিভিন্ন অঞ্চলে কমপক্ষে দশটি মঞ্চাভিনয় না হচ্ছে। শুধু তাই কেন, আজ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে নাট্যাভিনয়ের প্লাবন বয়ে চলেছে। একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা এবং নাট্য সম্মেলন হামেশাই লেগে রয়েছে শহরে, শহরতলীতে, মফস্বলে ও শিল্পনগরীগুলিতে। আজ সরকারী বা বেসরকারী—হেন কর্মপ্রতিষ্ঠান নেই, যার রিক্রিয়েশন ক্লাব বছরে অন্তত একবার নাট্যাভিনয় নিয়ে আসর সরগরম করে না।

অথচ শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, নাট্যাভিনয় নিয়ে বাঙালীর এই যে আবহমানকালের ক্ষ্যাপামি, বহু বিদগ্ধজনের মতে তার নাকি মূলে কিছু নেই। অর্থাৎ যাকে উপলক্ষ করে আমাদের এত মাতামাতি, নাচানাচি, সেই বিশেষ বস্তুটিই হচ্ছে প্রচণ্ডভাবে ফোঁপরা বা শূন্যগর্ভ। তাঁরা বলেন, 'সার্থক বাঙলা নাটক এ যাবৎ একখানিও রচিত হয়নি'। মাথা নেই, তার মাথাব্যথার এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কি হতে পারে? সেই যে তারাচাঁদ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" থেকে শুরু করে আজ একশো বিশ বছরের কাছাকাছি সময় ধরে বাঙালী নাট্যকারেরা এত যে রাশি রাশি নাটক লিখেছেন ও লিখছেন এর কোনোটিই নাকি ভদ্দরলোকের পাতে দেবার মতো নয়, অর্থাৎ জগৎনাট্যসভায় বাঙালী নাট্যকার রচিত একখানিও নাটক সম্মানের আসনলাভের অধিকারী নয়। বাঙলা বহু নাটকই বাঙালী দর্শককে দুরন্তভাবে খুশী করতে পারলেও তাদের মধ্যে একখানি নাটকেরও আবেদন নাকি চিরন্তন নয় এবং তার বিষয়বস্তুর সার্বজনীনতা নেই। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' বা ভাসের 'উত্তররাম চরিত' বহুশতাব্দী পূর্বে রচিত হয়েও আজ বেঁচে আছে, ইংরাজ নাট্যকার শেক্সপীয়রের নাটকাবলী চারশো বছর ধরে ইংরাজী ভাষাভাষীদের দ্বারা আদৃত হয়ে আসছে, নরউইজান নাট্যকার ইবসেনের 'ডল্‌স্ হাউস', 'গোস্ট্', 'পিলার্স অফ সোসাইটি', 'এনিমিজ্ পিপল্' প্রভৃতি নাটক ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমেও জগৎব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', গিরিশচন্দ্রের 'জনা' 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'পাণ্ডব গৌরব' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'সিরাজদ্দৌলা', 'প্রফুল্ল', 'শাস্তি কি শান্তি', দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম', 'পাষাণী', 'প্রতাপ-আদিত্য', 'রঘুবীর', 'আলমগীর' 'নরনারায়ণ' প্রভৃতি বিভিন্ন নাটকের মঞ্চাভিনয় একদা দর্শকবৃন্দকে যত পরিতৃপ্ত করেই থাকুক না কেন, ওরা দেশ-কাল-পাত্রের অতীত হয়ে শাশ্বত সার্বজনীন মহিমা লাভের অধিকারী নয়।

নাটক জীবনের প্রতিরূপ, এ-কথার অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, যে-কোনো মানুষের দৈনন্দিন চলমান জীবনের যে-কোনোও অংশ নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে। 'বাস্তব জীবনের এলোমেলো, বিশৃঙ্খল ও পারম্পর্যহীন ঘটনার একত্র সংকলনের' ফলে নাটক জন্ম নেয় না। নাটকের মধ্যে থাকবে একটি কাহিনী—যে-কাহিনী হবে কতকগুলি ধারাবাহিক ঘটনার সমষ্টি এবং এই ঘটনাগুলি হবে পরস্পরের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কবিশিষ্ট। কাহিনীতে থাকবে কয়েকটি বিপরীত [illegible] ঘাত-

প্রতিঘাত। অধিকাংশ কাহিনীতেই কোনো কেন্দ্র চরিত্র তার জীবনের একটি কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে শুরু করে ঘটনাবলীর ক্রমান্বয়ী ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে বিবর্তিত অপর কোনো চরম অবস্থায় উপনীত হয়। নাটকের কাহিনী বা প্লটে থাকবে আদি, মধ্য এবং অন্ত। আদি বলা হবে তাকেই, যা কোনো কারণের কার্য নয়, কিন্তু পরবর্তী কার্যসমূহের কারণ; আর প্লটের অন্ত হবে সেখানেই, যেখানে পূর্ববর্তী কারণসমূহের স্বাভাবিক পরিণতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং যার পরে আর কোনো কার্যের সম্ভাবনা থাকে না। নাটকের পক্ষে আবশ্যিক হচ্ছে এর অনিবার্যতা অর্থাৎ নাটকের আরম্ভ থেকে এর বিকাশ ও পরিণতি যেন অনিবার্যভাবে স্পষ্ট কার্য-কারণ শৃঙ্খলে বিধৃত হয়।

পণ্ডিতদের অভিযোগ, আমাদের নাটকগুলিতে নাকি এই অনিবার্যতাগুণের অত্যন্ত অভাব। ধরুন, 'প্রফুল্ল' নাটকের নায়ক যোগেশ। প্রথম দৃশ্যেই দেওয়ান পীতাম্বরের মুখে 'ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে' শোনবার পর থেকেই সে যেন নিয়তির হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে কোনো রকম সংগ্রামের প্রবৃত্তি তার মধ্যে দেখা যায় না। 'জনা'র জনা শুধু মুখেই 'জনা চলে প্রতিবিধিৎসিতে'; আসলে সে মা-গঙ্গার প্রতিবিম্ব মাত্র, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে তার কোনো কিছু করবার ক্ষমতা মাত্র নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলি তো অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনাবলীতে পূর্ণ; ভূরি ভূরি মেলোড্রামাটিক পরিস্থিতিতে ভরপুর। 'কৃষ্ণকুমারী'র ভীম সিংহ ঘটনাবলীর নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র, সক্রিয় স্রষ্টা নন। যে-গত্যন্তরহীন পরিস্থিতিতে কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তার সংঘটনে তার নিজের হাত কতটুকু? স্বর-পুরের নবীনমাধব বলশালী, নীলকরের লাঠির আঘাত যেন মাথা পেতে বরণ করে নিল; এর ফলে মৃত্যু তার জীবনে অনিবার্য ছিল না।

কিন্তু পশ্চিমী নাটক সম্পর্কিত বিচার-প্রণালী আমাদের নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার আগে বাঙালীর জীবনদর্শন যে ইংলণ্ডীয় বা ইয়োরোপীয় জীবনদর্শন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের, এ-কথা আমরা ভুলি কি করে? আমরা পরলোকে বিশ্বাসী। আমাদের ইহলোকে স্নেহ, প্রেম, আশা, আকাঙ্ক্ষার যে অপূর্ণতা দেখা যায়, তা পরলোকে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে। মৃত্যুতেই আমাদের জীবনের চরম সমাপ্তি ঘটে না, মৃত্যুকে অতিক্রম করেও আমাদের জীবন প্রসারিত। এ-ছাড়া আছে আমাদের ঈশ্বরপ্রীতি ও ধর্মবিশ্বাস। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সমাজে কানু রূপে খেলা করে, হর-পার্বতী আমাদের বাঙালীঘরের মেয়ে-জামাই। ধরণী ও স্বর্গের মাঝে ব্যবধান অতি সামান্যই। আমাদের সমাজে চরম পাষণ্ডেরও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, পরম পতিতেরও আশ্রয় আছে। তাই আমাদের 'জনা' গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েও ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করে, বারাঙ্গনা চিন্তামণিও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে ধন্য হয়। এবং সেই কারণেই আমাদের নাটকগুলি অন্য ছকে বাঁধা; ইংরাজী বা গ্রীক নাটকের পরিণতির সঙ্গে আমাদের নাটকের পরিণতির মিল নেই, মিল থাকতে পারে না। আমাদের বাঙলা নাটকগুলির সঠিক বিচারের জন্যে আমাদের জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যসূত্রাবলী রচিত ও গ্রথিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তা না করে আমরা যদি প্রতীচীর নাট্যরীতির মাপকাঠিতে আমাদের নাটকগুলিকে নস্যাৎ করবার প্রয়াস পাই, তাহলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিধান অনুসারে ইয়োরোপীয় নাটকাবলীও তো নাটক নামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে? মনে পড়ে, বহুদিন পূর্বে জনৈক কৃতবিদ্য অধ্যাপক বলেছিলেন, সংস্কৃত নাট্যকারেরা তাঁদের রচনাবলীতে স্বর্গের কল্পলোক সৃষ্টি করে গেছেন, আর ইয়ো-রোপীয় নাট্যকারেরা আমাদের দেখিয়েছেন বীভৎস নারকীয় লীলা। আমরা কেন গ্রীক

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত আঁধার পেরিয়ে চিত্রে রীণা ঘোষ এবং মৃণাল মুখোপাধ্যায়

বা ইংরাজী ভাষায় কথা বলি না, এ যেমন নিরর্থক প্রশ্ন, ঠিক তেমনই নিরর্থক হচ্ছে আমাদের নাটকগুলি গ্রীক, ইংরাজী বা নরওয়ের নাটক হয়ে ওঠেনা কেন? আমাদের রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য আছে, অথচ নাটক নেই—এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু! —নান্দীকর

বিদেশী ছবির খবর

আমেরিকার অস্কার পুরস্কারের মত জাপানের 'কিনেমা জুন্‌পো' পুরস্কার প্রায় সমপর্যায়ের। 'কিনেমা জুন্‌পো' ছাড়াও অন্যান্য ইগা হয়োরন্‌, জিন্দাইনোমি, জাপান টাইমস্‌ প্রভৃতি পত্রিকার বিচারে গত বছরের জাপানের শ্রেষ্ঠ দশটি ছবি হোল 'নিনজো বুগিচো' (নাগিচা ওসিমা), 'দি অরিজিন অফ সেক্স' (কানেতো সিন্ডো), 'কুড্‌স্‌ আাট সানসেট' (মাসাহিরো সিনদো), 'লংগিং ফর লভ' (কোরিয়সি কুরাহারা), 'ফ্লেম এ্যান্ড এ ওম্যান' (ইও-শিশিগি ইওশিদা), 'ক্রায়িং ফর দি সান' (সিগো ফুজিতা), 'এ ম্যান ভ্যানিশেস' (শোহিই ইমামুরা), 'মুরিসিহিনজু নিপ্পন নো নাৎসু' (নাগাসি ওসিমা), 'দি এ্যাফেয়ার' (ইওশিশিগা ইওশিদা) ও 'পোয়েম ফ্রম দ্য কোলিড' (কোতা মরি)। এ'দেরই বিচারে গত বছরের শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি কটা হোল 'পারসোনা' (সুইডেন), 'এল মেমেন্তো দেলা ভেরিতা' (ইতালী), 'পিয়ের লাফু' (ফ্রান্স), 'লা গ্লরি ইসত ফিনি' (ফ্রান্স), 'দি ব্যাটল অফ আল-জিরিয়া' (ফ্রান্স), 'দি ব্লোআপ' (ইংল্যান্ড) 'বেল দ্য জুর' (ফ্রান্স)। এগুলো ছাড়াও তালিকায় ছিল 'লা ভেলর', 'দি লভড ওয়ান', 'হু'জ অ্যাফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উলফ', 'ওয়ার অ্যান্ড পীস', 'ইন দি হিট অফ দি নাইট' ইত্যাদি ছবি।

বহু আলোচিত বিখ্যাত সুইডিশ ছবি 'আই অ্যাম কিউরিয়াস' আমেরিকার শুল্ক বিভাগ অশ্লীলতার দায়ে দুষ্ট বলে ছবিটিকে ছাড়েনি। তবে পরিবেশক গ্রোভ প্রেস ছবিটির মুক্তির ব্যাপারে চেষ্টা করছে সাধ্যমত। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের সকল খ্যাতনামা পত্রিকার কর্তাব্যক্তিদের ছবিটি দেখিয়ে তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে, সম্ভবতঃ আদালতে তাঁদের এই মতামতকে কাজে লাগান হবে।

আন্তর্জাতিক চিত্র সংগ্রহশালা সংস্থার চব্বিশ বৎসর পূর্তি আসন্ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে লণ্ডনে ২৩শে মে থেকে ২৯শে মে পর্যন্ত। এবারের সম্মেলনের আহ্বায়ক উদ্যোক্তা হচ্ছে ব্রিটেনের ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ্‌। প্রথম দিনে টেমসের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত ন্যাশনাল ফিল্ম থিয়েটারে রাণী মার্গারেট এ সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। ব্রিটেনের ন্যাশনাল আর্কাইভের কিউরেটর মিঃ আর্নস্ট লিণ্ডগ্রেন বলেছেন—'দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীতে যে এই চলচ্চিত্র সংগ্রহশালার ব্যাপারে বিপুল আলোড়ন ও উন্নতি হয়েছে, তার প্রধান কারণ হল মানবিক উন্নতিতে চলচ্চিত্র, টি-ভির অনবদ্য দান।'

মঞ্চাভিনয়

আগন্তুকের ছয়টি নাটক

গত সপ্তাহের তিনদিনের এক নাট্যোৎসবের রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে উপস্থাপিত করল 'আগন্তুক' শিল্পীদল। ভিন্নধর্মী ছয়টি নাটকে যথেষ্ট নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া গেল। হাজারো মানবিক চিন্তার মাঝে জীবনবোধের যে আত্মিক উপলব্ধি—তার বিভিন্ন রূপ দেখাতে চেয়েছে এই নাটকগুলিতে। প্রতিটি নাটকের নাট্যকার ইন্দ্রনাথ মৌলিক রচনা আর দেশী-বিদেশী নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তাঁর বক্তব্য-বিষয়। মৌলিক নাটকগুলির ভিতর 'আয় খেলবি আয়' আর 'স্তব্ধ অতীত' রচনা আর প্রয়োজনার দিক থেকে সার্থক। আর অন্যান্য নাটকগুলির উপস্থাপনাও প্রশংসনীয়। শেষ দিনের অভিনীত 'আকাশ ও মাটি' নাটক হিসাবে ভাল। তবে সম্পাদনায় দুর্বলতা আর আঙ্গিকপ্রধান হওয়ায় একঘেঁয়ে লেগেছে। উৎসবে অভিনীত নাটকগুলির বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে সু-অভিনয়ের জন্য যাঁরা প্রশংসা পাবেন, তাঁরা হলেন বাউল ঠাকুর (হরপ্রসাদ), দেবেন বর্মন (পরিতোষ), দিব্যেন্দু সরকার (রমা), শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় (জলধর), সুজাতা সেনগুপ্ত (সরলা), শ্যামলী চক্রবর্তী (সীতা), শৈলেন ঘোষ (রঞ্জন), শম্পা দাশগুপ্ত (রতন), শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় (জয়), সুস্মিতা সেন (সান্ত্বনা), অনুপা দাশগুপ্তা (কণিকা) ও গীতিকা ঘোষ (রাবেয়া)। আলোকসজ্জায় ও মঞ্চসজ্জায় কনিষ্ক সেন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

নিশাচর

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের কর্মচারীবৃন্দ ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্য নাটক 'নিশাচর' অভিনয় করেন রঙমহল মঞ্চে। রহস্যধর্মী নাটক মঞ্চে উপস্থিত করতে গেলে আঙ্গিকগত কলাকৌশল দেখাতে হয় সে সম্পর্কে নাট্যনির্দেশক সচেতন থাকলেও আলোকসম্পাতে রহস্যময় পরিবেশ সব সময়ে ফুটে উঠতে পারে নি। কিন্তু অভিনয়ে মোটামুটি প্রাণ এনেছেন শিল্পবৃন্দ, দলগত অভিনয় এই দিক দিয়ে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন শেখর বসু, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা বসু, প্রজ্ঞানন্দ চট্টোপাধ্যায়, মণিভিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুলিপ্রতাপ রায়, পঞ্চানন মিত্র, শ্যামলকুমার চ্যাটার্জি।

বিবিধ সংবাদ

বাৎসরিক উৎসব

পাঠভবনের বাৎসরিক উৎসব এবার অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা এপ্রিল বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের পর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের স্বচ্ছন্দ অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে "বাল্মিকী প্রতিভা" মনে রাখার মতন। নৃত্যনাট্যের কোরিওগ্রাফার শ্রীলা চ্যাটার্জি, মিউজিক ডিরেক্টর বিশ্বজিৎ রায়, সুপর্ণা চৌধুরী প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। নৃত্যনাট্যে যারা অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সুরজিৎ দাশগুপ্ত, সমিতা মিত্র, চন্দনা সেন ইত্যাদি।

মূকাভিনয়

আগামী শুভ নববর্ষে নোতুন পৃথিবীর প্রযোজনায় মূকাভিনয় পথিকৃত শ্রীযোগেশ দত্ত মহাজাতি সদনে সন্ধ্যায় একক মূকাভিনয় প্রদর্শন করবেন এবং ঐ সঙ্গে প্রভাতীগোষ্ঠীর শিশুশিল্পী সমন্বয়ে "ইয়েমা ও নচিকেতা' নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানটিরও আয়োজন করা হয়েছে।

তরুণ সঙ্গীতশিল্পী সম্মেলন

শহর কলকাতায় আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের চরিত্র ও রূপটি অত্যন্ত আড়ম্বর এবং জাঁকজমকপূর্ণ। শরৎ থেকে হেমন্ত পর্যন্ত এ ধরনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ খ্যাতনামা ও পেশাদারী গাইয়েরা। শিল্পীদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের পরিচয় করানোর জন্যে এক নব-পরিকল্পনা নিয়েছেন দিশারী গোষ্ঠী। এ'রা আগামী জুন মাসে তরুণ সঙ্গীতশিল্পী সম্মেলন নামে একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন করার উদ্যোগী হয়েছেন। এ আসরে যে-সব নবাগত প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী যোগ দিতে চান তাঁদের দিশারীর সম্পাদক রমেন ঘোষের সহিত ৯।৪এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলকাতা-১৪ এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের ছয় রবিবারের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসছে মহাজাতি সদনে সকাল ন'টায়। এদিনেও নতুন প্রতিভা ছাড়া, রবিরূপের অবাক জলপান আর প্রাচাবাণী (ব্যারাকপুর) কর্তৃক ভারতীয় লোকনৃত্য। এছাড়া বড়দের গলায় ছোটদের গান গাইবেন শ্রীঅনুপ ঘোষাল।

অহোরাত্রব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

নাট্য সম্মেলন ও মহাজাতি সদন ট্রাস্ট বোর্ডের উদ্যোগে এবছরও ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বিরতিহীন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হবে, ২৫শে বৈশাখ (৮ই মে '৬৮) মহাজাতি সদনে ভোর পাঁচটা থেকে।

পূর্ব বৎসরের মত এবারেও অনুষ্ঠান-সূচীতে পেশাদার এবং অপেশাদার শিল্পী ও সংস্থার গান, আবৃত্তি, নাটক, নৃত্যনাট্য, যন্ত্রসঙ্গীত, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ছাড়াও শিশুদের অনুষ্ঠানও দ্বিপ্রহরে পরিচালিত হবে।

যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যার্থে নাট্যানুষ্ঠান

আগামী ১৬ই, ১৭ই ও ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার পরিচালিত যক্ষ্মা হাসপাতালগুলির সাহায্যার্থে রবীন্দ্র সদনে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইংগিত গোষ্ঠির "শেষ থেকে সুরু", ১৭ই এপ্রিল বুধবার সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় রূপকার গোষ্ঠীর "চলচিত্ত-চঞ্চরী ও ব্যাপিকা বিদায়" ও ১৯শে এপ্রিল শুক্রবার মঞ্চ ও চিত্রজগতের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে কবিগুরুর "চিরকুমার সভা" অভিনয় মঞ্চস্থ হবে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন—সবিতাব্রত, অনুপকুমার, সরযুবালা, মিতা চ্যাটার্জি, হারাধন ব্যানার্জী, তপতী ঘোষ, নীলিমা দাস, বাসবী নন্দী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, নির্মল চ্যাটার্জি প্রভৃতি। টিকেটের জন্যে ভাণ্ডারের প্রধান কার্যালয় ৬৫-২বি বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ও রবীন্দ্র সদনে যোগাযোগ করতে পারেন।

বঙ্গ নাট্য সাহিত্য

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা আয়োজিত বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের দশম বার্ষিকী অধিবেশন শুরু হচ্ছে ১১ই এপ্রিল থেকে চলবে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত। অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি হল : এক বছরের নাটক ও অভিনয়, আধুনিক যাত্রা নাটক, উদ্ভট নাটক, সমাজ পরিবর্তনে নাটকের দায়িত্ব ইত্যাদি। এ সকল পর্যায়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, রাসবিহারী সরকার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সতু সেন, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, মন্মথ রায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডাঃ অজিত ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় বসুরায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বপনবুড়ো, সুধী প্রধান, সেবাব্রত গুপ্ত, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও আরও অনেকে।

চ্যালেঞ্জের জবাব

ক্ষেত্রনাথ রায়

খেলার রাজা যে ক্রিকেট সে সম্বন্ধে কোন অতিশয়োক্তি নেই। বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহ, উত্তেজনা, শিহরণ এবং সর্বোপরি খেলার ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চয়তাই ক্রিকেটকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে। ক্রিকেট খেলার মতই তার রকমারী তথ্যও রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। ব্যাট-বল বাদ দিলে তা যেমন ক্রিকেট হয় না, তেমনি তথ্য বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলা উপভোগ এক অস্বস্তিকর ব্যাপার—বিরাট শূন্যতা থেকে যায়। বর্তমানের খেলার খবরের পাশাপাশি অতীতের তথ্য এবং নজির আসবেই। যেমন ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের গত চতুর্থ টেস্ট খেলার কথাই ধরা যাক। এই খেলার শেষ দিনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৯২ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে ইংল্যাণ্ড খেলার বাকি ১৬৫ মিনিট সময় পূর্ণ হওয়ার তিন মিনিট আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান তুলে দিয়ে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক জয়। ইংল্যান্ডের এই জয়-লাভের গুরুত্ব দেখাবার উদ্দেশ্যে অতীত দিনের তিনটি নজির টেনে এনে বলা হয়েছে—টেস্ট ক্রিকেট খেলায় একদলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণার পর সেই দলের বিপক্ষদল শেষ পর্যন্ত জয়-লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে জয়ী হয়েছে এমন নজির সারা টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র ৪ বার হল। বর্তমানের তথ্যলিপ্সু ক্রিকেট অনুরাগীরা স্বভাবতই আগের তিনটি ঐতিহাসিক নজির সম্পর্কে উৎসুক হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থে অতীতের তিনটি ঐতিহাসিক টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথম নজীর

১৯৩৫ সালের ৮ই জানুয়ারী ব্রিজ-টাউনে ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট খেলা সুরু হল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক রবার্ট ইলিয়ট স্টোর্ষি ওয়াট টসে জয়ী হয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ভিজে মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে প্রথম ইনিংস খেলতে বাধ্য করলেন। ওয়াটের মনের বাসনা ষোলকলায় পূর্ণ হল—মাত্র ১০২ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংস পড়ে গেল। জর্জ হেডলে ১২০ মিনিট বোলারদের আক্রমণ সমানে ঠেকিয়ে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ৪৪ রান করেন। ফার্নেস মাত্র ১৫ রানে প্রথম চারজনের উইকেট পান। পেন পেলেন ১৪ রানে ৩টে এবং হোলিজ ৩৬ রানে ২টো। ইংল্যাণ্ডও প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে নাজেহাল হল—প্রথম দিনের খেলায় ৫টা উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮১ রান দাঁড়ালো।

এদিকে রাত্রির বৃষ্টিতে দ্বিতীয় দিনে পীচ আরও শোচনীয় আকার ধারণ করে। ফলে দ্বিতীয় দিনে চা-পানের আগে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রথম ওভারেই হিলটনের বলে হ্যামণ্ড এবং হোমস আউট হলেন। পীচের অবস্থা খুবই সঙ্গীন বুঝে অধিনায়ক ওয়াট কালবিলম্ব না করে ৮১ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন। তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ১০২ রানের থেকে ইংল্যাণ্ড ২১ রানের পিছনে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক জ্যাক গ্র্যান্ট ইংল্যান্ডের অধিনায়কের চাল বুঝে আর এক চাল দিলেন—তিনি তলার দিকের খেলোয়াড়দের প্রথমে ব্যাট করতে পাঠালেন। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে দেখা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে মাত্র ৩৩ রান দাঁড়িয়েছে।

বৃষ্টিও এদিকে শত্রুতা করতে ছাড়ে নি। রাত্রিতে আরও বৃষ্টি হল। তৃতীয় দিনের খেলা সাড়ে তিনটের আগে আরম্ভ হয়নি। চা-পানের আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের আরও ৩টে উইকেট পড়ে। স্মিথ মাত্র ১৫ রান দিয়ে ৫টা উইকেট পান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের ৫১ রানের (৬ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। ফলে খেলায় জয়লাভ করতে ইংল্যান্ডের মাত্র ৭৩ রানের প্রয়োজন হয়। চারদিনের বরাদ্দ খেলা, সুতরাং হাতে প্রচুর সময়।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ওয়াট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই চ্যালেঞ্জে পিছু হটলেন না। দলের 'ব্যাটিং অর্ডার' বদলে দিয়ে ফার্নেশ এবং স্মিথকে দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করতে পাঠালেন। ইংল্যাণ্ডকেও চরম সঙ্কটে পড়তে হল—৬টা উইকেট খুইয়ে ৪৯ রান পুঁজি। শেষ পর্যন্ত হ্যামণ্ড (২৯ নট আউট), হেনড্রেন (২০ রান) এবং ওয়াট (নট আউট ৬) দলকে জয়ের পথে নিয়ে যান। খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ৭৩ রানের প্রয়োজন ছিল। সেখানে ঘটনাচক্রে তারা ৭৫ রান (৬ উইকেটে) তুলে ৪ উইকেটে জয়ী হয়। হ্যামণ্ড ২৯ রান এবং অধিনায়ক ওয়াট ৬ রান করে অপরাজিত থেকে যান। হ্যামণ্ড ওভার বাউণ্ডারী মেরে খেলার যবনিকাপাত করেন।

ডন ব্র্যাডম্যান

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ১০২ রান (জর্জ হেডলে ৪৪ রান। ফার্নেস ৪০ রানে ৪ এবং পেন ১৪ রানে ৩ উইকেট)

ও ৫১ রান (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। স্মিথ ১৫ রানে ৫ উইকেট)

ইংল্যাণ্ড : ৮১ রান (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হ্যামণ্ড ৪৩ রান। মার্টিনডেল ৩৯ রানে ৩ এবং হিলটন ৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ৭৫ রান (৬ উইকেটে। হ্যামণ্ড ২৯ নট আউট এবং ওয়াট ৬ নট আউট। মার্টিনডেল ২২ রানে ৫ উইকেট)

দ্বিতীয় নজির

১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই লিডস মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলার আসর বসেছে। ডন ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ১ম টেস্টে ৮ উইকেটে এবং ২য় টেস্টে ৪০৯ রানে জয়ী হয়ে এখানে খেলতে এসেছে। ম্যাঞ্চেস্টারের ৩য় টেস্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি—খেলা ড্র।

প্রথম দিনের খেলায় ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ২৬৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ২য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং ওয়াসব্রুক দলের ১০০ রান সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনে ৪৯৬ রাণের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে অস্ট্রেলিয়া খেলার বাকি সময়ে ১ উইকেটের বিনিময়ে ৬৩ রাণ সংগ্রহ করেছিল। ইংল্যান্ডের ৩য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং বেডসার মূল্যবান ১৫৫ রান যোগ করেন।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৪৫৭ (৯ উইকেটে)।

দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় নীল হার্ভে (বয়স ১৯) সেঞ্চুরী (১১২ রান) করেন—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী এবং তাঁর টেস্ট খেলোয়াড় জীবনের ২য় সেঞ্চুরী। প্রথম সেঞ্চুরী (১৫৩ রান) করেন ভারতবর্ষের বিপক্ষে (মেলবোর্ন, ১৯৪৮)।

চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৪৫৮ রানের মাথায় প্রথম ইনিংস শেষ হলে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৩৬২ রান তুলে ৪০০ রানে এগিয়ে যায়।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক নর্ম্যান ওয়াল্টার ইয়ার্ডলি দলের ৩৬৫ রানের (৮ উইকেট) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে অস্ট্রেলিয়াকে যে চ্যালেঞ্জ দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান তার সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন। খেলার এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভের জন্যে ৪০৪ রানের প্রয়োজন ছিল এবং হাতে ছিল ৩৪৫ মিনিট সময়। অস্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসের সূচনা ভাল হয়নি—৫৭ রানের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ে যায়; দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে আর্থার মরিস এবং ডন ব্র্যাডম্যান খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে দলের ৩০১ রান তুলে দেন। ৩ উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলে দেয় এবং ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে বিপক্ষ দলের চ্যালেঞ্জ নসাৎ করার দ্বিতীয় নজির সৃষ্টি করে। ব্র্যাডম্যান ১৭৩ রান করে নট আউট থেকে যান। খেলা ভাঙ্গার ১৫ মিনিট আগে দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় নীল হার্ভের ব্যাট থেকে জয়সূচক রানটি উঠেছিল।

নীল হার্ভে

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ইংল্যাণ্ড : ৪৯৬ রান (ওয়াসব্রুক ১৪৩, এডরিচ ১১১, বেডসার ৭৯ এবং হাটন ৮১ রান। লকসটন ৫৫ রানে ৩, লিণ্ডওয়াল ৭৯ রানে ২ এবং আয়ান জনসন ৮৯ রানে ২ উইকেট)

ও ৩৬৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাটন ৫৭। ওয়াসব্রুক ৬৫, এডরিচ ৫৬ এবং কম্পটন ৬৬ রান)

অস্ট্রেলিয়া : ৪৫৮ রান (হার্ভে ১১২; মিলার ৫৮, লকসটন ৯৩ এবং লিণ্ডওয়াল ৭৭ রান। বেডসার ৯২ রানে ৩, ল্যাকার ১১৩ রানে ৩, পোলার্ড ১৪০ রানে ২ এবং ইয়ার্ডলি ১১৩ রানে ২ উইকেট)

ও ৪০৪ রান (৩ উইকেটে। মরিস ১৮২ এবং ব্র্যাডম্যান ১৭৩ নট আউট)

তৃতীয় নজীর

১৯৪৯ সালের ৫ই মার্চ। পোর্ট এলিজাবেথে ইংল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলার আসর বসেছে। এই সিরিজে ডারবানের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড ২ উইকেটে জয়লাভের সূত্রে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ৫ম টেস্ট খেলার আসরে নেমেছে। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের ৩৭৯ রানের উত্তরে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৯৫ রান তুলে মাত্র ১৬ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার শেষ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক আর্থার নোর্স দ্বিতীয় ইনিংসের ৩ উইকেটের বিনিময়ে দলের ১৮৭ রানের মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন। তখন খেলা শেষ হতে মাত্র ৯৫ মিনিট বাকি ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৭২ রানের। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক এফ জি ম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার চ্যালেঞ্জ দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করেন; কিন্তু একাধিকবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় ঘনিয়ে আসে। ১৫৩ রান সংগ্রহ করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ডের ৭টা উইকেট পড়ে যায়। খেলার এই অবস্থায় ৮ম উইকেটে জুটি বাঁধেন দুই ন্যাটা খেলোয়াড় ক্র্যাপ এবং ওয়াটকিন্স। খেলার একসময়ে হিসাব নিয়ে দেখা গেল, জয়লাভের জন্যে আরও ১৯ রানের প্রয়োজন। এদিকে খেলা শেষ হতে মাত্র ১০ মিনিট বাকি। ইংল্যাণ্ডের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করতে ক্র্যাপ শেষ পর্যন্ত প্রধান ভূমিকা নেন। এক সময়ে উপর্যুপরি ৩টি বল পিটিয়ে তিনি ১০ রাণ সংগ্রহ করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ১ মিনিট আগে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের থেকে ২ রান বেশী তুলে ইংল্যাণ্ড ৩ উইকেটে জয়ী হয়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা : ৩৭৯ রান (ডবলউ ওয়েড ১২৫, বি মেচেল ৯৯ এবং এ ডি নোর্স ৭৩ রান। বেডসার ৬১ রানে ৪, জেঙ্কিন্স ৫৩ রানে ৩ এবং গ্লাডউইন ৭০ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৮৭ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। মিচেল ৫৬ রান)

ইংল্যাণ্ড : ৩৯৫ রান (এফ জি ম্যান ১৩৬ নট আউট, ডেনিস কম্পটন ৪৯ এবং লেন হাটন ৪৬ রান। রোয়ান ১৬৭ রাণে ৫ এবং ম্যান ৯৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৭৪ রান (৭ উইকেটে। সি ওয়াসব্রুক ৪০ এবং ডেনিস কম্পটন ৪২ রান। রোয়ান ৬৫ রানে ৩ এবং ম্যান ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ৪১৪ রান (সোবার্স ১৫২ এবং কানহাই ১৫০ রান। স্নো ৮২ রানে ৪ এবং লক ৬১ রানে ২ উইকেট)

ও ২৬৪ রান (সোবার্স নট আউট ৯৫ এবং নার্স ৪৯ রান। স্নো ৬০ রানে ৬ এবং পোকক্ ৬৬ রানে ২ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৩৭১ রান (বয়কট ১১৬, লক ৮৯ এবং কাউড্রে ৫৯ রান। সোবার্স ৭২ রানে ৩, কিং ৭৯ রানে ২, হল ৭১ রানে ২ এবং হলফোর্ড ৫৪ রানে ২ উইকেট)

ও ২০৬ রান (৯ উইকেটে। কাউড্রে ৮২ এবং নট ৭৩ নট আউট। গিবস ৬০ রানে ৬ এবং সোবার্স ৫৩ রানে ৩ উইকেট)

জর্জ টাউনের বোর্দা ওভাল মাঠে ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি—খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলার মধ্যে চারটি খেলা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম) ড্র যায় এবং ইংল্যান্ড শুধু ৪র্থ টেস্টে জয়লাভ করার দৌলতে 'রাবার' জয়ী এবং সেই সূত্রে 'উইসডেন ট্রফি' জয়ী হয়েছে। ইংল্যান্ডের পক্ষে এই প্রথম ট্রফি জয়।

ইংল্যান্ডের কাছে ১৯৬৮ সালের টেস্ট সিরিজে পরাজয়ের ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুধু 'উইসডেন ট্রফিই' হাতছাড়া হল না, বিভিন্ন দেশের বিপক্ষে উপর্যুপরি পাঁচটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজে 'রাবার' জয়ের সূত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের যে বিজয়মুকুট পেয়েছিল তাও মাথা থেকে নেমে গেল। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৮ সালের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল আগের দলগুলির তুলনায় ছায়ামাত্র। বর্তমানে দলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়—অধিনায়ক গ্যারী সোবার্স এবং তিনিই দলের প্রধান ত্রাণকর্তা। ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হল এবং গ্রিফিথের বলে আগের ভয়ঙ্কর চেহারা নেই। গত দশ বছর ধরে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল ছিল চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার উজ্জ্বল প্রতীক এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আসরে আদর্শ, আজ তারা খুবই নির্জীব। ওরেল এবং সোবার্সের নেতৃত্বে তাদের যে স্বর্ণযুগ গড়ে উঠেছিল, অনেকের ধারণায়, আজ তার অন্তিম অবস্থা। অপরদিকে কলিন কাউড্রের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলার আসরে তার হৃতগৌরব ফিরে পেয়েছে। বিদেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে কাউড্রে সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে শেষপর্যন্ত দলকে জয়যুক্ত করেছেন। ভাগ্যদেবীও অকৃপণহাতে তাঁকে করুণাবর্ষণ করেছিলেন। ইংল্যান্ড দলের ৩৮ বছরের ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লকের কথাই ধরা যাক। গত ৫ বছর তিনি ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট দলে স্থান পাননি। তিনি যে আর কোনদিন ইংল্যান্ড দলে স্থান পাবেন—এমন আশা তাঁর অতি বড় শুভার্থীও করেননি। কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি তাও পেলেন। বর্তমান ইংল্যান্ড দলের নির্বাচিত খেলোয়াড় ফ্রেড টিটমাস এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে খেলা থেকে বাদ পড়লেন। অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী টনি লক জরুরী বার্তা পেয়ে টিটমাসের শূন্যস্থান পূরণ করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে উড়ে আসেন এবং ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ খেলে সমালোচকদের মুখনাড়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন। টেস্ট সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ ৫ম টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসে টনি লকের ত্রাণকর্তার ভূমিকা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়—তাঁর ৮৯ রান এবং ৯ম উইকেটের জুটিতে লক এবং পোককের ঐতিহাসিক ১০৯ রান—ইংল্যান্ডের খেলা ড্র করতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। পোর্ট অব স্পেনের ৪র্থ টেস্টে ইংল্যান্ডের ৭ উইকেটে জয় ইংল্যান্ডের পক্ষে যতখানি কৃতিত্বের পরিচয়, তার থেকে বেশী দুর্ভাগ্যের পরিচয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। কারণ পঞ্চম দিনের ১৬৫ মিনিট খেলা বাকি থাকতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদের ৯২ রানের (২ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে এবং খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র ৩ মিনিট আগে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২১৫ রান পূর্ণ করে ৭ উইকেটে জয়ী হয়। এই অপ্রত্যাশিত জয়ের সূত্রেই ইংল্যান্ড শেষপর্যন্ত টেস্ট সিরিজে ১-০ খেলায় (ড্র ৪) ওয়েস্ট ইন্ডিজকে পরাজিত করে 'রাবার' এবং উইসডেন ট্রফি জয় করেছে। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

প্রথম দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটের বিনিময়ে ২৪৩ রান সংগ্রহ করে। লাঞ্চের সময় ছিল—৯৪ রান (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৮৭ রান (৩ উইকেটে)। কানহাই ১১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন। ২২৪ মিনিটে তাঁর শতরান (বাউন্ডারী ১৬) পূর্ণ হয়েছিল। চলতি সিরিজে তাঁর উপর্যুপরি ২য় সেঞ্চুরী—সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ১২তম সেঞ্চুরী। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কানহাই (১১৩ রান) এবং অধিনায়ক সোবার্স (৭৫ রান) দলের ১৭১ রান সংগ্রহ করে প্রথম দিনে অপরাজিত থেকে যান।

দ্বিতীয় দিনে ৪১৪ রানের মাথায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এইদিন তাদের ৭টা উইকেট পড়ে ১৭১ রান যোগ হয়। কিন্তু শেষ ৬টা উইকেট পড়েছিল মাত্র ২৯ রানে। ৪র্থ উইকেটের জুটিতে কানহাই এবং সোবার্স দলের ২৫০ রান তুলেছিলেন। কানহাই দলের ৩২২ রানের মাথায় আউট হন। কিছু কম ৭ ঘন্টার খেলায় তিনি তাঁর ১৫০ রানে ২১টা বাউন্ডারী করেছিলেন। সোবার্স ৭ ঘন্টা ২০ মিনিট খেলে তাঁর ১৫২ রানে

টনি লক (ইংল্যান্ড)
পঞ্চম টেস্টের ত্রাণকর্তা

১৮ বার বাউন্ডারীতে বল পাঠিয়েছিলেন। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের এই নিয়ে ১৯টি সেঞ্চুরী দাঁড়ালো। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই নিয়ে তাঁর নবম সেঞ্চুরী—ওয়েস্ট ইন্ডিজের অপর কোন খেলোয়াড় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর সমান সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

দলের ৩৮৫ রানের মাথায় সোবার্স খেলা থেকে বিদায় নিলে (৫ম উইকেটের পতন) ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পতনও শুরু হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি ৩৮ মিনিট সময়ে ইংল্যান্ড ১ উইকেট খুইয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির দরুণ পুরো সময় খেলা হয়নি। খেলার ১৬৫ মিনিট সময় নষ্ট হয়। চা-পানের পর খেলা আরম্ভই হয়নি। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ১৪৬ (১ উইকেটে)। বয়কট ৯৩ রান এবং কাউড্রে ৪৩ রান করে নটআউট থাকেন। বয়কট এইদিন তাঁর ৫০ রান পূর্ণ করার সূত্রে টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ২০০০ রান পূর্ণ করার গৌরব লাভ করেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের রান দাঁড়ায় ৩৫২ (৮ উইকেটে) এইদিন ইংল্যান্ডের ৭টা উইকেট পড়ে গিয়ে ২০৬ রান যোগ হয়। ২য় উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং কাউড্রে দলের ১৭২ রান তুলেছিলেন। দলের ২৫৯ রানের মাথায় ৮ম উইকেট পড়ে যায়। ৯ম উইকেটে জুটি বাঁধেন পোকক এবং টনি লক। ইংল্যান্ডের তখন অতি শোচনীয় অবস্থা—ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৪১৪ রানের থেকে ১৫৫ রান পিছনে এবং হাতে জমা মাত্র দুটো উইকেট। শেষপর্যন্ত টনি লক ত্রাণকর্তার সার্থক ভূমিকা নিলেন। ৯ম উইকেটের জুটি টনি লক (৭৬ রান) এবং পোকক (৭ রান) দলের ৯৩ রান তুলে অপরাজিত থাকেন।

টনি লক নির্ভয়ে পিটিয়ে রান সংগ্রহ

করেন। এক সময়ে দেখা গেল, ৩ ওভার বল খেলে ২১ মিনিটে তিনি ২৪ রান তুলেছেন। অপরদিকে পোককের ভূমিকা ছিল প্রাণপণ করে উইকেট পাহারা দেওয়া। পোকক ৮২ মিনিট অপেক্ষার পর তাঁর প্রথম রান করেন।

পঞ্চম দিনে ভাগ্যের মোড় ঘুরে যায়। ৩৭১ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। লক এবং পোককের ৯ম উইকেটের জুটিতে শেষ পর্যন্ত ১০৯ রান উঠেছিল—এই রান উভয় দলের পক্ষে ৯ম উইকেট জুটির নতুন রেকর্ড। পূর্ব রেকর্ড ৮৯ রান (পি জে সার্প এবং টনি লক, বার্মিংহাম, ১৯৬৩)। লক ১৩৯ মিনিটে তাঁর ঐতিহাসিক ৮৯ রান (বাউন্ডারী ১৩) করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংসের খেলায় ইংল্যাণ্ডের থেকে ৪৩ রানে অগ্রগামী থেকে ২য় ইনিংস খেলতে নামে। পঞ্চম দিনের খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়। জন স্নোর মারাত্মক বোলিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের এই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়। অধিনায়ক সোবার্স ৯৫ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। স্নো ৬০ রানে ৬টা উইকেট পান। দুই ইনিংসের খেলায় তিনি মোট ১০টা উইকেট পান ১৪২ রানে। পঞ্চম দিনের খেলার প্রতিটি মিনিট ওভাল মাঠের দর্শকদের শরীর রোমাঞ্চিত করেছিল। এই দিন দর্শকরা ২৮৩ রানে ১২টি উইকেট পড়তে দেখেন—ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৯ রানে ২টো এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২য় ইনিংসের ২৬৪ রানে ১০টা।

বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার গারফিল্ড সোবার্স তাঁর নট আউট ৯৫ রানের মধ্যে ৩৬ রান সংগ্রহ করার সূত্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড-জীবনে ৬০০০ রাণ পূর্ণ করার গৌরব অর্জন করেন। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে সোবার্সকে নিয়ে এ পর্যন্ত মাত্র ৭ জন খেলোয়াড় ৬০০০ রান করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেছেন।

৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ দিনের শেষ বলটির পর্যন্ত যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। শেষ বলটি খেলার পরই ইংল্যাণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। অবস্থার বিচারে শেষ বলটি খেলা না হওয়া পর্যন্ত খেলার ফলাফল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। বিশেষ করে যেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ফিল্ডিং করছে।

৬ষ্ঠ অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড যখন দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করে তখন হাতে খেলার সময় ছিল ৩৩০ মিনিট এবং খেলায় [illegible] করতে ইংল্যাণ্ডের ৩০৮ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লাঞ্চের সময় ইংল্যাণ্ডের খুবই শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায় —৫টা উইকেট পড়ে মাত্র ৬৮ রান। ইংল্যাণ্ডের ৩৩ রানের মাথায় ১ম এবং ৪১ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। মাত্র ২৭ মিনিটে এ অঘটন ঘটে যায়। গিবসের বোলিংয়েই ইংল্যাণ্ডের এই দশা হয়েছিল। খেলার এক সময়ে দেখা গেল, গিবস মাত্র ৪ রান দিয়ে ৪টে উইকেট পেয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের এই চরম সংকটে কেন্ট কাউন্টি ক্রিকেট দলের দুই খেলোয়াড়—কলিন কাউড্রে এবং এলান নট ৬ষ্ঠ উইকেটে জুটি বেঁধে ইংল্যাণ্ডকে শেষ পর্যন্ত খেলা অমীমাংসিত রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। চা-পানের সময় ইংল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ১৫৩ (৫ উইকেটে)—কাউড্রে ৭৫ এবং নট ৩১ রান করে অপরাজিত ছিলেন। ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটি কাউড্রে এবং নট প্রায় ৩ ঘণ্টা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখেন। চা-পানের বিরতির ১৮ মিনিট পর গিবসের বলে কাউড্রে এল বি ডবলিউ হয়ে খেলা থেকে বিদায় নেন। দলের চরম সংকটকালে তাঁর ব্যক্তিগত ৮২ রান এবং নটের সহযোগিতায় ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ১২৭ রান—কাউড্রের ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনের এক অবিস্মরণীয় ইনিংস। কাউড্রের বিদায়ের পর একমাত্র এলান নটই যা দলকে পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার করতে মরণপণ করেছিলেন। নট শেষ পর্যন্ত ৭৩ রান করে নটআউট থেকে যান। দলের ১৬৮ রানের মাথায় কাউড্রের বিদায়ের পরই ইংল্যাণ্ডের খেলায় পুনরায় বিপর্যয় দেখা দেয়। ৭ম উইকেট ১৯৮ রানে, ৮ম উইকেট ২০০ রানে এবং ৯ম উইকেট ২০৬ রানের মাথায় পড়ে যায়। দুটো বল দিলেই গিবসের ওভার শেষ হবে—খেলার এমন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের ৯ম উইকেট (পোকক) পড়ে। পোককের শূন্য উইকেটে ইংল্যাণ্ডের শেষ খেলোয়াড় জোন্স খেলতে নেমে গিবসের শেষ বলটা ঠেকিয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। অপর দিকের উইকেটে এলান নট যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সোবার্সের বল খেললেন, কিন্তু গিবসের মুখ থেকে জোন্সকে সরিয়ে আনতে পারলেন না। সুতরাং বেচারা জোন্সকেই পঞ্চম টেস্ট খেলার শেষ ওভারটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে খেলতে হল।

পঞ্চম টেস্টের শেষ ওভারের খেলায় গিবসের বলের সম্মুখীন হয়েছেন ইংল্যাণ্ডের বোলার জোন্স। কল্পনা করতে কষ্ট হয় না, সমগ্র ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে গিবসের দিকে তাকিয়ে আছে—শুধু একটি উইকেটের প্রার্থনা। শেষ দিনের খেলায় গিবসই তো 'হিরো'—খেলার এক সময়ে মাত্র ৪ রানে ৪টে উইকেট নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের কি হাঁড়ির হালই না করেছিলেন! অপর দিকে আর একটি চিত্র—জোন্সকে ঘিরে সমগ্র ইংল্যাণ্ড তার কোটি কোটি চক্ষুর আড়াল দিয়ে দুর্গ রচনা করেছে। তাদের কোন রানের নিবেদন নয়, শুধু এই শেষ ওভারের খেলায় নিজের উইকেটটা জিইয়ে রাখা, তাহলেই 'রাবার' জয়। জোন্স শেষ পর্যন্ত কোন রকমে তা করেছিলেন এবং বোধহয় কামনাও করেছিলেন এ অবস্থা শত্রুরও যেন কোন দিন না-আসে।

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ইংল্যাণ্ড ওঃ ইন্ডিজ খেলা

স্থান	খেলা	জয়ী	জয়ী	ড্র
ইংল্যাণ্ড	২৮	১২	৯	৭
ওঃ ইন্ডিজ	২৭	৬	৭	১৪
মোট :	৫৫	১৮	১৬	২১

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

গত সপ্তাহে (১ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল) প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় যে ১৭টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ১১টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৬টি খেলা ড্র।

গত তিন বছরের অপরাজেয় লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর দল আলোচ্য সপ্তাহে মাত্র একটা ম্যাচ খেলেছে—পোর্ট কমিশনার্স দলের বিপক্ষে ২—০ গোলে জয়। ফলে ১২টা খেলায় তাদের পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ২২ (জয় ১০ ও ড্র ২)। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান ৭—০ গোলে জাভেরিয়ান্স এবং ৩—০ গোলে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দলকে পরাজিত করে ১০টা খেলায় ১৯ পায়েন্ট সংগ্রহ করেছে (জয় ৯ ও ড্র ১)। গতবছরের তৃতীয় স্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দলের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য সপ্তাহে জাভেরিয়ান্স দলকে ৩—১ গোলে পরাজিত করার সূত্রে তারা ১১টা খেলায় পুরো ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। লীগ তালিকায় তারাই বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। এ বছরের লীগের খেলায় জাভেরিয়ান্স দলের কাছেই ইস্টবেঙ্গল দল প্রথম গোল খায়। বিপক্ষ দলকে গোল দিয়েছে ২৩টা। লীগের খেলায় এখনও পরাজয় স্বীকার করে নি এই চারটি দল—ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং (১০টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৫০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 19th April, 1968. শুক্রবার, ৬ই বৈশাখ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ পাইন

'শতবর্ষ' পরে প্রসঙ্গে

১৫ই মার্চের 'অমৃত'-তে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ১লা মার্চের 'অমৃত'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'শতবর্ষ পরে' সম্পর্কিত আলোচনা পড়ে আবার 'শতবর্ষ পরে' প্রবন্ধটি পড়লাম। শ্রীসুব্রত ঘোষ প্রবন্ধটি ভুল বুঝেছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

"শতবর্ষ পরে" প্রবন্ধটি পড়লেই বোঝা যায় যে অন্নদাশঙ্কর আধুনিকতা বলতে বুঝিয়েছেন নব-নব সৃষ্টির প্রেরণা— প্রবন্ধটির দশম অনুচ্ছেদে অন্নদাশঙ্করের অভিধেয় আধুনিকতার অর্থ সুস্পষ্ট। উপাধ্যায় শ্রীঘোষ যে-প্রশ্ন তুলেছেন তা অবশ্যই অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু আধুনিকতা আর সাম্প্রতিকতা যে এক জিনিস নয় এ-কথাটা তাঁর মতো চিন্তাশীল পাঠকের বুঝতে কেন ভুল হলো? ইংরেজিতে মডার্নিজম ও কনটেম্পোরারিজম বলে দুটো শব্দ ব্যবহার করে একালের হুজুগেপনা থেকে আধুনিকতাকে আমরা আলাদা করে দেখি, কিন্তু বাংলাতে আধুনিকতা বললে কেন তার সঙ্গে হুজুগেপনাকে জড়িয়ে ফেলব? মডার্নিজম বলতে যদি নির্দিষ্ট অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তির সমমূল্যের স্বীকৃতি ও প্রত্যেক ব্যক্তির যথার্থ বিকাশে বিশ্বাস বুঝি তাহলে কেন ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদকেও আধুনিকতার একটা দিক মনে করব? শ্রীঘোষ নিজেই বলেছেন যে কেউ কেউ 'পরিকল্পনা পদ্ধতি ও যন্ত্রাদির নির্বিচার প্রয়োগকেই আধুনিকীকরণের সমার্থক বলে জেনেছেন,' অর্থাৎ তা যে সত্যিই সমার্থক নয়, আধুনিকীকরণ যে একটা নির্দিষ্ট অর্থেই বিধৃত এবং যাঁরা ওভাবে সমার্থক বলে জেনেছেন তাঁরা যে হয় অজ্ঞ নতুবা ভন্ড সে-বিষয়ে আলোচক নিজেই পরোক্ষে তাঁর চেতনা প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং অন্নদাশঙ্কর আধুনিকতার সমস্যার সরলীকরণ করেন নি, তিনি বিশেষ একটি বিধিবদ্ধ অর্থেই আধুনিকতা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেহেতু আমরা সবকিছুকেই শিথিল ও অনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাই, শ্রীঘোষের দাবি বরং এরকম হোক যে আধুনিকতার বিশেষ অর্থটি অন্নদাশঙ্করের মতো স্বীকৃত চিন্তানেতার হাতে বিশদরূপে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন, এটা আমাদের মুখ চেয়ে তিনি করুন।

'অমৃত'-র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
দার্জিলিং

বেকার ইঞ্জিনীয়ার প্রসঙ্গে

'অমৃত' পত্রিকার ৪৭ সংখ্যায় কল্যাণ বসুর লেখা 'বেকার ইঞ্জিনীয়ার : সঙ্কট ও সমাধান' শীর্ষক লেখাটি পড়লাম। লেখাটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। সমাধান প্রসঙ্গে লেখক সরকারী প্রচেষ্টা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এই লাইনের লোক হিসাবে বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমার একটি প্রস্তাব ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও মেডিক্যাল গবেষণা ইত্যাদির জন্য বহু আধুনিক যন্ত্রপাতির দরকার হয় এবং সেগুলি বিদেশ থেকে রাশি রাশি বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে আনতে হয়। সেগুলি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা অসম্ভব।

কিছুসংখ্যক মেধাবী ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রকে যদি ঐসব দেশ থেকে ঐসব বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে আনানো যায়, তবে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যাপকদের সহযোগিতায় ও সরকারী অর্থসাহায্যে আমাদের দেশেই ঐ-সব যন্ত্রপাতি তৈরী সম্ভব। যেসব ক্ষেত্রে বিদেশে ট্রেনিং-এর সুযোগ পাওয়া যাবে না, সেসব ক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, আমাদের দেশের অধ্যাপকরা যদি বিশেষভাবে সচেষ্ট হন, তবে অনুরূপ যন্ত্রপাতি বিদেশী সহযোগিতা ছাড়াই আমরা তৈরী করতে পারব। এইসব ক্ষেত্রে বহু সদ্য পাশ-করা ইঞ্জিনীয়ারকে তালিম দিয়ে উচ্চমানের যন্ত্র তৈরী সম্ভব। সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারদের শিক্ষাও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগবে। এ-কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ডঃ মেঘনাদ সাহার সময় এই ধরনের কয়েকটি প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ-বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

তরুণকুমার চক্রবর্তী,
কলিকাতা-৯।

বাঙালীর বেশভূষা প্রসঙ্গে

পোষাক-পরিচ্ছদ সভ্যতার জয়স্তম্ভ। দিনে দিনে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তাল রেখে তার বহিরাবরণে পরিবর্তন ঘটে। এর প্রভাব এত বেশি যে একে এড়িয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হয় না। অবশ্য বিশেষ যুগে বিশেষ পোষাক খ্যাতিলাভ করলেও কোন যুগই শেষ পর্যন্ত চলতি ফ্যাশানের মধ্যে আটকে থাকে না। পরিবর্তনের ধারা চলতেই থাকে এবং ফ্যাশান বারেবারেই বদলায়।

আজকে শুনলে হাসি পাবে যে সেলাই করা জামা পরার রেওয়াজ ভারতবর্ষে এককালে ছিল না। এখন দিকে দিকে সেলাই করা জামার জয়-জয়কার। সেলাইয়ের রকমফের নিয়ে সবাই ব্যস্ত। বিশেষ দর্জি আজ সভ্যতার অবশ্য অঙ্গ এবং দর্জির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতারও অন্ত নেই। কিন্তু একসময়ে এদেশে দর্জির প্রয়োজন হতো না। নারীর পরিচ্ছদ ছিল শাড়ী এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁরা শীতকালে বড়জোর চাদর ব্যবহার ক'রতেন। ঠিক বিশ শতকের শেষাশেষি দাঁড়িয়ে একথা ভাবতে হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু শহরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে গ্রামে গেলে এমন অনেক মহিলার খোঁজ আজও পাওয়া যাবে যাঁরা শাড়ী সম্বল করেই দিন কাটাচ্ছেন। তার অর্থ এ নয় যে, দারিদ্র্যের জন্য এঁদের পক্ষে শাড়ীর অতিরিক্ত আর কিছু ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বরং বলা চলে এঁরা প্রাণপণে সেই পুরোন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন বা ধরে রাখতে চাইছেন। এই প্রচেষ্টা যে বেশিদিন স্থায়িত্বলাভ করবে না সেকথা বলা চলে সহজেই।

পোষাকের ক্ষেত্রে আমরা যার যার প্রভাবিত হয়েছি। বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে। মুসলমান সভ্যতা এদেশ কায়েম হওয়ার পর রাজশক্তির অনস্বীকার্য প্রভাবে আমাদের পোষাক একপ্রস্থ রূপান্তরিত হয়েছে। অনেক কিছু ভালোমন্দ ছেড়ে আমরা গ্রহণ করেছি আর কিছু ভালোমন্দ। কিন্তু সেটাও সম্পূর্ণ নয় আসলে, আগেই বলেছি, পোষাক জিনিসটা কোনদিনই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে উঠতে পারে না, সব সময়ই যেন আরেকটা পরিবর্তনের সুযোগের জন্য উঁচিয়ে থাকে।

তাই দেখা যায়, মুসলমান সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন রাজশক্তির পত্তন করলো ইংরেজ। আর তারই ফলে আমাদের চিন্তাজগতে এলো বিরাট পরিবর্তন। সঙ্গে সঙ্গে ওদের বহিরাবরণের প্রভাব আমাদের মন ভোলাল। প্রতিবাদ নিশ্চয়ই উঠেছিল এবং প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একদলের বিদ্রোহও স্বাভাবিক। যথারীতি সে বিদ্রোহ ক্রমে জয়যুক্ত হয়েছে। এবং সেটাই স্বাভাবিক।

তারপর দিনে দিনে এ পথেই পোষাকের ক্রম বিবর্তন ঘটেছে। আজকে দেশ জুড়ে যে ফ্যাশানের বিরাট বান ডেকেছে তাও এ রীতির ব্যতিক্রম নয়। তবে এপ্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় মহিলাদের বৃহদংশের ফ্যাশানে শাড়ী আজও স্থায়ী প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে। এইসঙ্গে অন্য অনেককিছুর আমদানী হয়েছে সত্যি কথা কিন্তু শাড়ীর জায়গা সম্পূর্ণ অধিকার করে নেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে শাড়ীর এই মহিমা অক্ষুণ্ণই থাকবে। কারণ ভারতীয় শাড়ী দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিদেশী ললনাদেরও মনোরঞ্জন করছে। এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ আশার কথা। এবং পোষাকের ক্ষেত্রে এখানেই বিশ্বের দরবারে আমাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সিরাজুল হক
হুগলী

অমৃত সম্পাদকীয়

নির্বাচনের চিন্তা

বাংলাদেশে একটা মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের প্রয়োজন হয়েছে বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের সীমাবদ্ধতার জন্য। যদি গত সাধারণ নির্বাচনে কোনো একটি পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত, তাহলে এই মাঝ-সময়ের নির্বাচনের কোনো দরকার হত না। নির্বাচকরা এমনভাবে ভোট দিলেন যে, এতদিন যাঁরা শাসন করছিলেন, তাঁদের তো প্রত্যাখ্যান করলেনই, অথচ এতদিন যাঁরা বিরোধীপক্ষে ছিলেন, তাঁদেরও পুরোপুরি মেজরিটি দিলেন না। তার ফলে ছোট-বড়-মাঝারি দলগুলো নির্বাচনের পর একসঙ্গে বসে একটা বোঝাপড়া করল। কিন্তু দেখা গেল এই ব্যবস্থায় পশ্চিমবাংলার মতো জটিল ও স্পর্শকাতর রাজনৈতিক কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে সরকার গঠন ও তা চালনা করা সম্ভব নয়। এও দেখা গেল যে, কংগ্রেস অনেকদিনের পুরনো ও বিরোধীদের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় অন্য দলের পিছু পিছু গিয়ে সরকার গঠন করেও তা রক্ষা করতে পারল না।

অপরিহার্যভাবেই রাষ্ট্রপতির শাসন নেমে এল। রাজনৈতিক খেওখেওয়ি কমেছে এ-কথা চিন্তা করে সাধারণ মানুষ হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছে। কিন্তু পরিষদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন নিয়ম নয়, ব্যতিক্রম। রাজ্যপালের বকলমে আমলারা রাজত্ব করবে, এটা কখনো কাম্য হতে পারে না। দেশের মানুষের অভাব-অভিযোগ যেমন ছিল তেমনি আছে, সংকট কমেনি, বেকারীত্ব কমেনি। কমেছে শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর কলহ, বিধানসভার ভেতরে ও বাইরে অভিনয় সব দৃশ্য। কিন্তু অতঃ কিম্? এরপর কি?

মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় আগামী নভেম্বর। বিভিন্ন শিবিরে তার প্রস্তুতি শোনা যাচ্ছে। সব দেখেশুনে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু মনে হচ্ছে না। কারণ, কংগ্রেসই বলুন, বিরোধীপক্ষই বলুন তাদের নিজেদের মধ্যে খেওখেওয়ি চলছে। গত নির্বাচনের আগে থেকেই কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল। তার ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল নির্বাচনের ভোট-বাক্সে। এতদিনের শাসকদলকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য দলকে বা দলসমূহের কোয়ালিশনকে সরকার তৈরী করতে দিল জনসাধারণ। কিন্তু আমাদের আশংকা হচ্ছে মধ্যবর্তীকালীন নির্বাচনেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের আশঙ্কার কারণ, পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলের বাহুল্য। এত বেশী দল থাকলে ভোটাররা বিভ্রান্ত হয়, কোনো দলের পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন অসম্ভব হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি, ফ্রান্সে চতুর্থ রিপাবলিকের আমলে এই দল-বাহুল্যের জন্য প্রায় প্রতিমাসে একটি করে মন্ত্রিসভার পতন ঘটত। তখনকার ফ্রান্সের রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে রীতিমত ঠাট্টা-তামাসা চলত। দ্য গল এসে সেই চাকা ঘুরিয়ে দিলেন। আমাদের দরিদ্র দেশে যখন-তখন মন্ত্রিসভা বদলের এই বিলাসিতা পোষায় না। আমরা চাই স্থায়ী সরকার, যাঁরা তাঁদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আইনের শাসন রক্ষা করে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু চৌদ্দ দলের কোয়ালিশনের আশায় যাঁরা নির্বাচন লড়ছেন, তাঁরা কি এই ভরসা দিতে পারবেন যে, একটা সুসংবদ্ধ, স্থায়ী এবং সুদৃঢ় সরকার তাঁরা গঠন করতে পারবেন? এখনি নানান দল নানান বায়না তুলেছে। আসন নিয়ে বাঁটোয়ারা একটা বড় সমস্যা। অথচ খুচরা দলগুলো দুটো-চারটে আসন পেয়ে বড় দলগুলোকে বেগই দিতে পারবে, এবং তাদের দায়িত্বহীন বড় বড় বুলি ও প্রোগ্রামের চাপে পড়ে বড় দলগুলোর পক্ষেও ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা সম্ভব হয় না। এই অভিজ্ঞতা দেখেই আমরা বলছি, দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব তথা স্থায়ী সরকার গঠন করতে হলে জনসাধারণের রাজনৈতিক বোধ স্বচ্ছ ও দূরদর্শী হওয়া দরকার। সরকারী দল ও বিরোধী দল যদি প্রায় সমকক্ষ না হয়, তাহলে একের বিকল্প অপর দল হতে পারে না। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যও নির্ভর করে এই পার্টি-শৃঙ্খলা ও শক্তির ওপর। মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন, তাঁদের এ-কথা ভেবে দেখতে বলি। এবং ভোটদাতা জনসাধারণও যেন নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের আগে এই দল-বাহুল্যের বিড়ম্বনা সম্পর্কে অবহিত হন।

রবিবার ঘুম থেকে উঠে প্রভাতী আলোর স্বর্ণরঞ্জন চোখে পড়তেই মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

আজ রবিবার। কাজ নেই। অখন্ড অবসর। পুরো দিনটা আমার হাতে। কী আরাম! যেন নতুন খেলনাপাওয়া বাচ্চুর মত চিত্তটা বাতাসে ডানা মেলতে চাইল।

কাজ থেকে অবসর মিললে কে না খুশি হয়। কালও দেখেছি পাশের চেয়ারে এলায়িত হয়ে প্রণবেশ ঝিমুচ্ছে। পাশে তার প্রত্যক্ষ কাজের মূর্তিমান ফাইলগুলো পাহাড় হয়ে জমে আছে। বললুম প্রণবেশকে কাল ত রবিবার ঝিমুবার ঘুমোবার যথেষ্ট সময় পাবে আজ কাজটা সেরে ফেললে পারতে—

সে বলে ওঠে, কালকের কথা আর বলবেন না। রবিবার হ'লে কি হয়। এক-রাশ কাজ রয়েছে বাড়িতে—

তা হোক, বাঁধা কাজ থেকে ছুটি পাওয়ার আনন্দ আছে। আজ খুশির আমেজ কাটতেই ভাবতে থাকি কি কি করবার আছে আজ আমার। মনে মনে তালিকা করি কাকে কাকে কথা দিয়েছি আমার সাপ্তাহিক leisure টুকুর ভাগ দেব ব'লে। দেখি প্রকান্ড তালিকা। সময় নিয়ে সত্যিই টানাটানি। হায়! ঐ ফ্রকপরা বাচ্চা মেয়েটার মত লাফ দিয়ে ঘুরতে পারতুম ঐ ফাল জামতার ঘাসের ওপর। কিম্বা শুয়ে পড়তে পারতুম খোলা মাঠে আকাশের নীচে।

কাজের নিরেট গাঁথুনি দিয়ে ভরেছি জীবনের সবকটা মিনিটগুলোকে। সত্যিই কটা মিনিট আর আমার হাতে আছে যা খুশি করবার জন্যে?

কাজের ফাঁকে ফাঁকে যে সময় তার নাম দেওয়া হয়েছে leisure। এই লিজার নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে অন্য দেশে। যেখানে কাজ ক'রে ক'রে মানুষ পাগল হতে বসেছে, যেখানে লিজারকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়েছিল এককালে সেখানে আজ অবসরের দাম বেড়েছে। দাম যেমন বেড়েছে সমস্যাও বেড়েছে প্রচুর।

কিন্তু এই কাজ নিয়ে মাতামাতি কি চিরকাল ধরে চলেছে?

না। ওদেশের ইতিহাস খুললে দেখি, কিছুদিন আগেও গ্রীকসভ্যতার যুগে কাজকে রীতিমত ঘৃণা করা হত। গ্রীক-সভ্যতা বলত, আরে ছি, কাজ ত হল ছোট-লোকের। স্লেভরা রয়েছে কি জন্যে? যা কিছু শ্রমসাধ্য, যা কিছু গায়েগতরে খাটবার যা কিছু গলদঘর্ম হয়ে করবার সব করবে ঐ স্লেভরা, আর করবে মেয়েরা। ভদ্রলোক আবার খাটবে কি? আভিজাত্য ত বসে থাকায়।

অ্যারিস্টটল বলেছেন Leisure is freedom from the necessity of being occupied কর্ম করার প্রয়োজন থেকে মুক্তিই হল অবসর। অবশ্য তিনি আরো বলেছেন। অবসরসময়ের জন্যে schooling চাই। উন্নত কর তোমার চরিত্র। নিজেকে তৈরী কর। দাসদাসী স্লেভরা শারীরশ্রমে নিযুক্ত থাক আর সভ্যতার ধারকবাহক যারা তারা করবে উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াকৌশল, চর্চা করবে রাজনীতি, পাঠ করবে দর্শনশাস্ত্র, সাধনা করবে শিল্পকলা। এইটাই আভি-জাত্য, এইটাই হবে সভ্যতার উচ্চ আদর্শ। সাংস্কৃতিক শুচিতা দিয়ে জীবনযাত্রার এক বিশেষ বাধা গড়ে তুলবে বিত্তবান প্রতিপত্তি-বান অভিজাতরা...

এই ছিল গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গি। কর্ম আর অবসর নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না তখন। দাসদাসীর পক্ষে অবসর যেমন দুর্লভ অভিজাতজীবনে তেমনি ছিল অখন্ড অবকাশ।

এরপর এই চিন্তাধারার উপর এল দুটি সংঘাত। একটি আনল প্রোটেস্টান্টরা. সেটা অবশ্য তেমন জোরদার হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় আঘাত হানল যন্ত্রযুগ। যন্ত্রযুগে শ্রম একটা শিল্প হয়ে দাঁড়াল। এই যুগ তারস্বরে ঘোষণা করল কর্মের মাহাত্ম্য। কর্ম বসল দেবযোগ্য আসনে। লেবার পেল ডিগনিটি।

যন্ত্র কাজ করছে মানুষও কাজ করছে। মানুষের সহকর্মী যন্ত্র। চমক লাগল লোকের

মনে। নেশা লাগল কাজের। কাজের সুযোগ বাড়ল অভাবিতরকম। দলে দলে লোক ছুটল কলকারখানায়। যেন নতুন একটা দর্শন। খাটলে অভাব ঘোচে। বেশি খাটলে বেশি পয়সা—অফুরন্ত কাজ। শিল্প-মালিকরা পঞ্চমুখ হয়ে কাজের মহিমা প্রচার করে। মুনাফার ভরে ওঠে তাদের দু'হাতের মুঠো।

কাজ একদিকে যেমন মর্যাদা পেল তেমনি আবার কর্ম আর নৈষ্কর্ম দুটো ভাগ হয়ে গেল। কাজ আর ছুটি তফাৎ হল। কঠোর শ্রম আর কর্মহীন অবসরের মাঝখানে পড়ল একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা।

আমরা আজও এই যুগের আওতায় বাস করছি। সবাই খাটছি যার যেমন কাজ এবং সবাই পাচ্ছি কর্মবিরতি, কিছু না কিছু অবসর। এই অবসর মানে খানিকটা সময় যেটা ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারি ক্লান্তি অবসাদ মুছে ফেলতে, শরীর বিশ্রাম দিতে, মনকে তাজা করতে। তবেই না আগামী-দিনের কর্মের জন্যে তৈরী হওয়া যাবে।

কাজ করলে তবেই বাঁচার উপকরণ জোটে, বাঁচলেই আবার কাজ। কার্যকারণের অন্তহীন এই চক্র। এই চক্রবাহিত হয়ে চলে জীবনযাত্রা। এইখানে মানুষ পুরোপুরি যেন একটি যন্ত্রে পরিণত হল।

একটা গল্পে আছে, একজন মজুর মাটি কাটছিল। সেখান দিয়ে আর একজন যেতে যেতে তাকে জিগ্যেস করে, কি করছ তুমি?

উত্তর এল, মাটি কাটছি।
কিসের জন্যে?
আজ্ঞে, রোজ পাব বলে।
রোজ নিয়ে কি হবে?
চাল ডাল খাবার কিনব।
তারপর?
গায়ে জোর হবে হুজুর।
গায়ে জোর হলে কি করবে?
আবার মাটি কাটব।

প্রাণ রাখতেই যেন প্রাণান্ত। কর্মের মধ্যে একটা মর্যাদা আছে, মহৎ কিছু আছে এ ছিল একদিন মানুষের প্রত্যাশা। ছোট হোক বড় হোক যে কোনো কর্মের একটা নৈতিক মূল্য আছে। কাজ করার মধ্যে দিয়ে হয়ত জীবনের কোনো সার্থকতা মিলবে এমন একটা ধারণা সভ্যমনে স্বভাবতই এসে পড়ে। কিন্তু হতাশ হতে হয় তাকে। কর্ম যেন বাধ্যতামূলক হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে। তার একঘেয়েমির জোয়াল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য। যন্ত্রের মত তাকে খাটতে হবে, ঘুরন্ত চাকার মত বিরাম-হীন ঘুরবে সে। সেখানে চমক নেই। সুতরাং তৃপ্তি নেই, আনন্দও নেই। মানুষের মনের কোনো ক্ষুধাই স্পর্শ করে না সে। মেকানাইজড একঘেয়েমির যন্ত্রশালায় চলে শুধু একটি ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন পিছন থেকে অহরহ তাড়না করে আমাদের। খাটুনির জয়গান গেয়ে লেগে পড়তে হয় কাজে। কুড়েমিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কিন্তু কুড়েমি যে একটা পাপ এটাও স্বীকার করা যায় না। স্বল্পকর্ম বিত্তবানকে দেখে কার না মনে হয়, ওরা অনেক সুখী?

নিম্নবিত্তের কাছে কুড়েমি একটা ব্যয়-বহুল বিলাস। একটি অপচয়িত মুহূর্তের জন্যে তাকে দ্বিগুণ শ্রমস্বীকার করতে হয়। অভাবের দন্ড সদা উদ্যত তার পশ্চাতে। উচ্চবিত্তের পশ্চাতেও যে দন্ড উদ্যত রয়েছে সেটা কল্পিত অভাবের। সেটা উচ্চাশার। সেটা আরো অর্থলাভের। আরো উচ্চমান জীবনের। অধিকতর প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতা-প্রাপ্তির।

তাই সবাই ছুটেছি আমরা কাজের পিছু পিছু। কাজ দিয়ে নিরন্তর ভরাট করছি জীবনের সবটা সময়। প্রতিটা মিনিট ঘন্টা দিন মাস বছর নিশ্ছিদ্র নিরন্ধ্র হয়ে উঠছে। ব্যস্ততার নিরেট ইঁট দিয়ে ভরাট করছি জীবনের ইমারৎ। ফোকরগুলোকে মনে করি লোকসানের ফাঁক। তাই একটু থামলেই মনে

হয়, সব গেল বুঝি। একটু ফালতু গল্প করতে গেলে কি একটু ফালতু পড়তে গেলে অমনি অভ্যাস তার চলতি শাসনদন্ড তুলে ধরে। একটু আনমনা হতেই ভয় হয়। একটা প্রজাপতির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকালেই অনুতপ্ত হয়ে পড়ি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুঝি মিস্ করলাম। কাজ যেন তার অস্থির লেজে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমায়। ধান্দার ভূত চেপেই আছে ঘাড়ে।

আবার হঠাৎ কানে আসে এমনও কথা : 'বিকালটায় কি করা যায় বল তো?'

সেদিনই ত শুনেছিলাম রেলিংয়ে ঠেস দেওয়া কয়েকটি তরুণের মুখে। লেখাপড়ার শেষধাপ পার হয়েছে যারা অথচ আছে জব-রাজ্যের দেউড়ির বাইরে—তাদের কাছেই হয়ত শোনা যাবে, বিকেলটা কি করা যায়?

সময় কাটানো তাদের কাছে একটা সমস্যা। বেকারের এই সমস্যা। এ সমস্যা রিটায়ার-করা বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধের। এ সমস্যা অসুস্থের। এমন আবার অনেকে আছেন যাঁদের কাছে রবিবারটা আতঙ্কের দিন। ছুটি পেলেই তাঁরা শিউরে ওঠেন। 'কি করব সারাদিন?' তাই হয়ত বেগার খাটতেও ছোটেন তাঁরা।

কাজ নিয়ে পৃথিবীতে যেমন বিপুল সমস্যা দেখা দিয়েছে কাজের ফাঁক বা অবসর নিয়েও বিপুলতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক খুঁজে ফিরছেন কার কার কাছে অবসর একটা সমস্যা? কার অবসর নিয়ে জনসাধারণের মাথাব্যথা হওয়ার কথা? কে দায়ী এর জন্য? অবসর যেখানে অপব্যয়িত সেখানে কোনো কল্যাণমূলক কাজের প্রবর্তন করা যায় কিনা? প্রমোদ-ধর্মী কর্মতৎপরতা দিয়ে মানুষকে অবসর যাপন সুযোগ দেওয়া যায় কেমনভাবে? বর্তমান যুগের এই যে ক্ষিপ্রগতি জীবনের অতিব্যস্ততার অবক্ষয় তা থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়ে তাকে সার্থক করে তোলা যায় কিনা? এরকম হাজার প্রশ্ন আজ সমাজ-বিদদের চিন্তাকে নাড়া দিচ্ছে।

অবসর মিললেও অবকাশ কোথা?

লেকের ধারে ময়দানের ঘাসে-বসা দুজনের যখনই আলাপগুঞ্জন শুনি তখনই মনে হয় তারা ঐ প্রশান্তির আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ বেমানান। সেখানে তারা বসে আছে স্থিরভূমিতে, টলটলে জলের ওপর পড়েছে সন্ধ্যা আকাশের প্রশান্ত মহিমা, কিন্তু তাদের মন হাঁটছে নানা দুশ্চিন্তার সড়ক বেয়ে হয়ত টেরিটিবাজারে নয় আপিসপাড়ায় নয় সংসারের দায়িত্বজর্জর ঘিঞ্জিতে, নয় ফুটবল মাঠের দলাদলিতে, নয় কোনো বিলাসিনী প্রসঙ্গের কানাগলিতে আর নয় পলিটিক্সের মারমুখী মতবাদের কুরুক্ষেত্রে...যেখানে শুধু উত্তেজনার স্নায়ুযুদ্ধ।

তাই যখন পড়ি

> Lie down and listen to the
> crabgrass grow
> The faucet leak, and learn to
> leave them so
> Feel how the breezes play about
> your hair
> And sunlight settles on your
> breathing skin.
> ...... Yourself, be still—
> There's no living when you're
> nagging time
> And stunting every second with
> your will.

তখন বুঝতে পারি না এর ঠিক অর্থ। বুঝলেও মনে হয় এ যুগের কবির কথা নয় এটা। মনে হয়—এই দর্শন এ যুগে অর্থ-হীন। সময়টা কাজে লাগালে তবেই না কিছু অর্থ বহন করে আনে। যিনি লিখেছেন এই কাব্য কেমন রয়্যালটি পেয়েছেন তিনি কে জানে?

বাতাস ঠিকই বয়ে যাচ্ছে। আমার চুল-গুলোকে নিয়ে চলছে তার খেলা। রৌদ্র ঠিকই তার আতপ্তচুম্বন স্পর্শ দিচ্ছে আমার অঙ্গে কিন্তু আমি হয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছি অন্ধকার গলিতে গলিতে। কিম্বা স্যাঁতসেতে একটা ছোট্ট ঘরে প্রকাশকের টেবিলের সামনে হুমড়ি খেয়ে বসে আছি। কিম্বা হয়ত ক্যালিফাস নিয়ে বোল্টুর ডায়ামেটার মাপছি।

তাই দেখি অবসর শান্ত দেহের মগজেও অবকাশের লেশ নেই। ছুটি নেই চিত্তের।

> অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত
> চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল
> আমার অসীমের অবকাশকে খন্ড খন্ড
> ক'রে
>
> ভিড় করে আছে তারা
> উৎকন্ঠ কোলাহলে।

কবির আত্ম-বিশ্লেষণ। সবার আত্ম-বিশ্লেষণ। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদের দুর্বিষহ এই আত্মচিন্তা।

লাও-সের একটা কথা আছে, গাড়ির চাকার বেড়টাই তার সব কিছু নয়। কেন্দ্র-বিন্দু আর বেড়টার মাঝে মাঝে যে ফাঁকের টুকরোগুলো আছে তাদেরও দাম আছে।
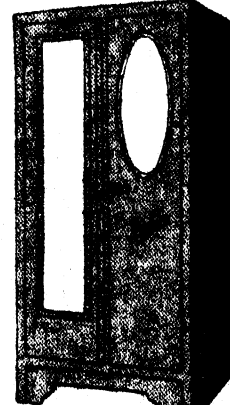
রবীন্দ্রনাথ আরও ভাল করে বলেছেন, একটা পেয়ালার মূল্য তার ভরাট অংশটার মধ্যে যতখানি তার চেয়ে অনেক বেশি তার ফাঁকটুকুর মধ্যে। ঐ ফাঁকটাই হল অবকাশ। কবি ছিলেন অবকাশপ্রেমিক।

কংক্রীটের নিরবকাশ ভরাটত্বে বীজ অংকুরিত হয় না। অংকুরোদ্গমের জন্যে চাই ফাঁক চাই অবকাশ। বাড়ির পর বাড়ি তুলে শহর হতে পারে কিন্তু শহরের স্বাস্থ্য থাকবে শহরের মধ্যে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ সবুজ পার্ক ও বাগিচার খোলা অবকাশের মধ্যে। বাঁশির ফাঁকটাই না বেজে ওঠে সুর হয়ে।

এ যুগের মানুষ যে মন্ত্র জপ করে তা হ'ল, time is money। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে money is power পাশ্চাত্যের এই মন্ত্রে সর্বদেশই এখন দীক্ষিত। গ্রীষ্মপ্রধান ট্রপিক্যাল এই দেশে যেখানে অখন্ড ছিল অবসর, বিস্তীর্ণ ছিল বিরামক্ষেত্র, যেখানকার অবারিত মাঠ আর অবারিত আকাশনীলে প্রশান্তি ছিল বিকীর্ণ সেখানে মানুষ এখন বসবার সময় পাচ্ছে না। ছুটছে আর হাঁফাচ্ছে। ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটছে। কাজ যেন হাজার-হাত অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে তাকে। জনসংখ্যা বাড়ছে, নানা সমস্যা গজাচ্ছে, তার চাই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, তার চাই পরিপূর্ণ জীবন। তাই তার না ছুটে উপায় নেই। কিন্তু মানুষ ত ছোটবার যন্ত্র নয়।

কাজের যুগের মানুষের যেমন কাজ থেকে নিষ্কৃতি নেই তেমনি তার অবসরেরও প্রয়োজন থাকবেই। এবং অবসরের পরিমাণ বাড়ানোতেই ত এখনকার যন্ত্রবিজ্ঞানের বাহাদুরি। কিন্তু অবসর হলেই চলবে না। অবসর যাপনের যে একটা আর্ট আছে তাও তাকে আয়ত্ত করতে হবে। দেহ স্নায়ু ও চিত্তকে বিশ্রাম দিতে হবে।

তাই ভাবছি আজকে আমার রবিবারের অবসরটুকু যদি সত্যিকার অবকাশে ভরাতে পারতুম! কর্মের বিরতি দিয়ে শুধু নয় কর্মের বৈচিত্র্য দিয়ে যাতে ক্লান্তি ধুয়ে যেত আর চিন্তার প্রশান্ত ঐশ্বর্যে ঝলমল করে উঠত ঐ প্রত্যুষরৌদ্রের সোনাঝরা মুহূর্ত-গুলো।

উজ্জয়িনী

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
অমল সেনগুপ্ত

মেঘকে দূত করে পাঠাবার সময়ে কালি-দাস বলে দিয়েছিলেন ঃ যদিও উজ্জয়িনী যাবার উত্তর দিকের পথ বেশ বাঁকা, তবুও, সেখানকার সৌধশ্রেণীর শোভা দর্শনের মায়া ত্যাগ করা খুবই কঠিন।......তারপর উজ্জয়িনীর সেই অপরূপ প্রশস্তি। অতএব মেঘ, তুমি উজ্জয়িনী যেতে ভুলো না।

এখনকার উজ্জয়িনী দেখে অবশ্য সুদূর অতীতে এ-শহরের রূপ কি ছিল কল্পনা করা সত্যি কষ্টকর। নাগ-রিক আধুনিকতার অন্যতম অঙ্গ হিন্দী সিনেমার গান আর চলন্ত, ব্যস্ত লোকজন, যানবাহন—এ-সবের মাঝখান থেকে মনটাকে হঠাৎ সেই কোন কালিদাসের যুগে উধাও করে নিয়ে গিয়ে মেঘের উদ্দেশে কালি-দাসের উক্তিগুলি স্মরণ করা নেহাৎ সহজ কথা নয়।

কিন্তু এখনো উজ্জয়িনী যেতে ভুল হবার কথা নয়। কারণ ইতিহাস তো এখানে কথা বলে।

এখনো যে উজ্জয়িনী নামটি প্রচলিত তার উল্লেখ পাওয়া যায় স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখন্ডে। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাদেবের জয়ী হওয়ার পর কি করে এ-স্থানের নামকরণ হলো উজ্জয়িনী তার বর্ণনা আছে সে-গ্রন্থে। এবং এককালে এ-ভূখন্ডের নাম ছিল অবন্তিদেশ আর তার রাজধানী বর্তমান উজ্জয়িনী অঞ্চলের নাম ছিল অবন্তি। গৌতম বুদ্ধের সময়েও তাই ছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে অবন্তি দেশকে চারটি বৃহৎ শক্তির অন্যতম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অবন্তিরাজ প্রদ্যোতের কন্যা বাসব-দত্তা ও কৌশাম্বীরাজ উদয়নের প্রণয়কাহিনী বৌদ্ধসাহিত্যের চিরায়ত সৃষ্টির বিষয়। দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত অবন্তি নাম বর্তমান ছিল। এমনকি দশম শতাব্দীর অনু-শাসনেও অবন্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতিহাসে প্রথম উজ্জয়িনী উল্লিখিত মৌর্য সাম্রাজ্যের সময় থেকে। পিতার রাজত্বের সময়ে কিছুকাল অশোক এখান-কার শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৫—৪১৩ খৃঃ) সময়ে উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিক্রমাদিত্য-কাহিনীর উদ্ভব হয় সেই সময়ে এবং এমন ধারণা করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই কিংবদন্তীর বিক্রমা-দিত্য। যদিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র তবুও উজ্জয়িনীর আকর্ষণ এতই প্রবল ছিল যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বেশীর-ভাগ সময়ে এখান থেকেই শাসনকার্য চালাতেন।
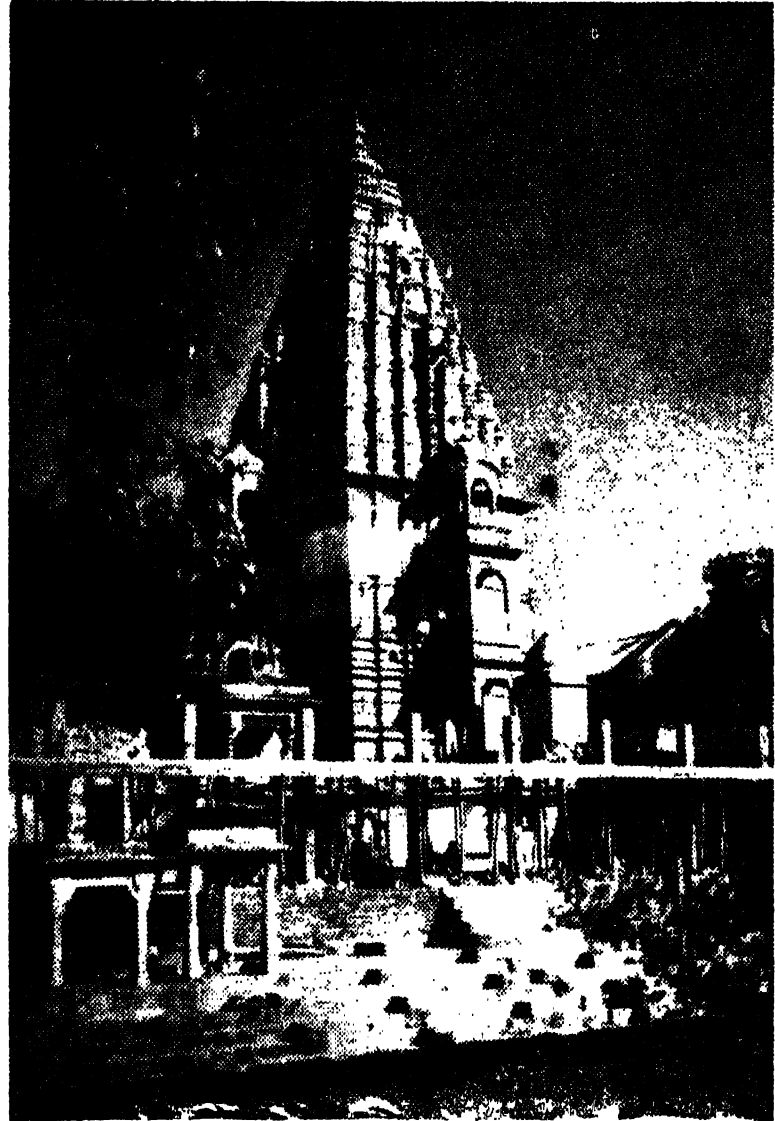
অবশ্য এ-সবেরও আগের খানিকটা ইতিহাস আছে। প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রপ অধিপতি চামতনের অধীনস্থ রাজ্যগুলির রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রীসীয় 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে ওজেনকে (উজ্জয়িনী) এক বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। নাবিক ও বণিকদের উপযুক্ত তথ্য সরবরাহের জন্যে মিশর থেকে পূর্ব আফ্রিকা ঘুরে ভারত পর্যন্ত সমুদ্রপথের বিবরণ উপরোক্ত গ্রন্থে আছে।

মহাকাল মন্দির

টলেমীর (১২১-১৫১ খৃঃ) ভূগোলে উজ্জয়িনীর নামতনই ওজেনের তিয়াস-তেনোস। অর্থাৎ তখনই উজ্জয়িনীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ একসময়ে পশ্চিম উপ-কূল থেকে আগত উৎপন্ন ভোগ্যবস্তুগুলির প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। দাক্ষিণাত্য থেকে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী যাবার পথে উজ্জয়িনীতে না এসে পারা যেত না।

ভারতের যে বিস্তীর্ণ ভূখন্ডকে এক-সময়ে মালব বলা হত উজ্জয়িনীর অবস্থান ঠিক তার মাঝখানে। শিপ্রানদীর ডানদিকে। নদীর ধারে ধারে ঘাট ও মন্দির। পশ্চাদপটে গাছপালায় ভর্তি পাহাড়। প্রাচীন শহরটি বর্তমান শহর থেকে দু-চারমাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। শহরটি যে কি-করে ধ্বংস হয়ে যায় তা সঠিক জানা যায় নি। সম্ভবতঃ কোনো এক ভয়ংকর বন্যা বা ভূমিকম্পে শহরটি বিধ্বস্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শহরটির চারদিকে একটি প্রাচীর দেওয়া ছিল।

হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খৃঃ) রাজত্বের সময়ে উজ্জয়িনী কনৌজের অন্ত-র্গত ছিল। তারপর নবম শতা-ব্দীতে পরমারদের হস্তগত হয়। উজ্জয়িনী পরমারদের রাজধানী ছিল। এ-সময়ে উজ্জয়িনী বৈভবের প্রাচুর্যের জন্য ক্রমাগত চালুক্য, কলচুরি, চান্দেলস, রাষ্ট্রকূপ এবং অন্যান্য প্রতিবেশী শক্তিগুলি উজ্জয়িনী আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাদশ শতক পর্যন্ত পরমারদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। একাদশ শতকের শেষে পরমারদের পতনের পর তোমার ও চৌহানদের অধীনস্ত হয় উজ্জয়িনী।

এরপর ইতিহাসের অমোঘ গতিতে উজ্জয়িনীতে হিন্দুদের আধিপত্যের যুগ শেষ হল। শুরু হল মুসলমান যুগ। ১২৩৫ সালে ইলতুৎমিশ উজ্জয়িনী আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দেন। তারপর একাদি-ক্রমে মুসলমানেরা আঠার শতক পর্যন্ত উজ্জয়িনীর শাসনাধিকার বজায় রাখেন। ১৩০৫ সালে আলাউদ্দীন খিলজী মালব-বিজয়কালে উজ্জয়িনী জয় করেন। ১৫৩১ সালে গুজরাটের রাজা বাহাদুর শাহ মালব আক্রমণ করেন ও উজ্জয়িনী সহ সমস্ত অঞ্চল দখলে আনেন। ১৫৬২ সালে আকবর উজ্জয়িনী বিজয় করেন।
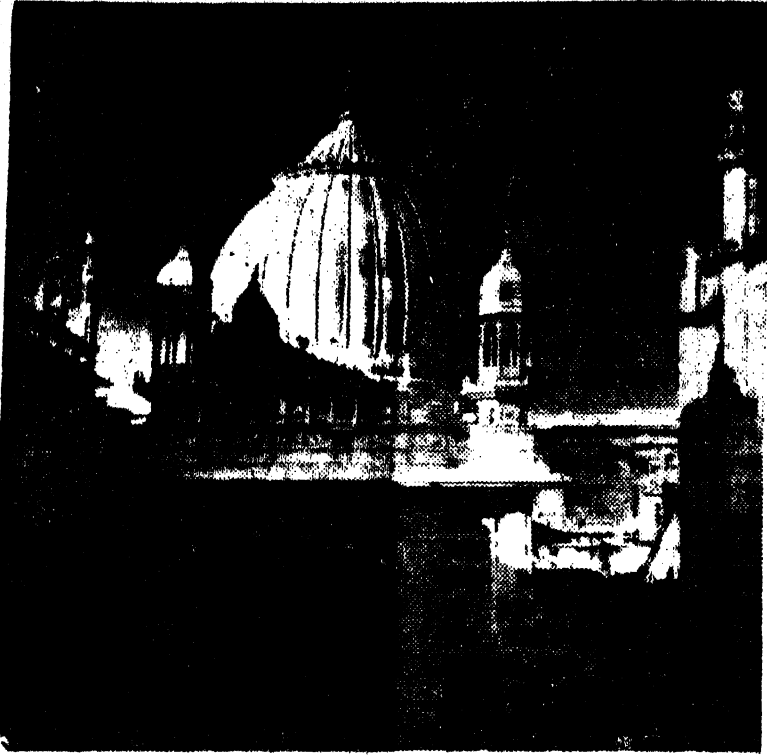
মোহ্‌রৌ-কা-রউজা

শিপ্রা নদীর তীরবর্তী ঘাট। এখানেই কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উজ্জয়িনী আবার হিন্দুদের হাতে ফিরে আসে ১৭৩৭ সালে যখন মহম্মদ শাহ মালবের উপ-শাসক পেশোয়া বাজীরাওকে মালব অঞ্চলের রাজনৈতিক অধিকার অর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁর কাছ থেকে গোয়া-লিয়রের রণোজী সিন্ধিয়া (১৭২৬-১৭৫০ খৃঃ) উজ্জয়িনীর শাসনক্ষমতা হাতে পান। ১৮১০ সাল পর্যন্ত গোয়ালিয়র রাজ্যের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। সিন্ধিয়াদের শাসন চলে ইংরেজদের আগমন পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ১৭৯২ সালে প্রথম তুকোজী রাও হোলকার উজ্জয়িনী আক্রমণ করে শহরটির কিছু অংশ ভস্মীভূত করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মধ্যভারতে উজ্জয়িনী একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মালবাঞ্চলের মরুসুবাহ বাবা আপ্তিয়া এখান থেকে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদের কাছে গোপন নির্দেশ পাঠাতেন। বিদ্রোহীদের পরাজয় ও পশ্চাদপসারণের পর ইংরেজ সৈন্যরা উজ্জয়িনী বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত করে দিয়ে যায়।

হিন্দুদের সাতটি পবিত্র শহরের ও একান্নটি শাক্তপীঠের অন্যতম উজ্জয়িনী। তিনবৎসর অন্তর কুম্ভমেলা যে চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় উজ্জয়িনী তার মধ্যে একটি। এখনো নিয়মিতভাবে এখানে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির অঙ্গস্বরূপ আরো অনেক মেলার মধ্যে তিনটি বড় মেলা হয়

যন্তর মহল

শিবরাত্রি, বৈশাখী ও কার্তিকী পূর্ণিমা উপলক্ষে।

বিগত ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত কুম্ভ-মেলাটিতে অংশগ্রহণ করার জন্যে দশ লক্ষেরও বেশী লোকের সমাগম হয়েছিল। আশা করা যেতে পারে যে ১৯৬৯ সালে যে কুম্ভমেলা হবে তার জন্যে শিপ্রানদীর তীরে আবার কয়েক লক্ষ মানুষের আগমন হবে।

উজ্জয়িনী একসময় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য এবং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এক প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হতো। হিন্দু জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী ও ভৌগোলিকেরা উজ্জয়িনীর ওপর দিয়ে সৌরমন্ডলের মধ্যরেখা গণনা করতেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম গুপ্ত যুগের শেষের দিকের উজ্জয়িনীর জনজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত।

বৌদ্ধধর্মেরও অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে প্রায় চল্লিশ হাজার শিষ্যসহ একজন বৌদ্ধশ্রমণ উজ্জয়িনীর দক্ষিণাগিরি মঠ থেকে সিংহলদ্বীপে গমন করেন। সাতশ বছরেরও বেশী পরে ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মহাপন্ডিত পরমার্থ এখান থেকে যাত্রারম্ভ করে চীন পরিদর্শন করেন ও সত্তরটি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। বোধহয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই বর্তমানে এখানে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যার নামকরণও হয়েছে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের নামে—বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়।

ইলতুৎমিশ যখন উজ্জয়িনী আক্রমণ করেন তখন তিনি আর সব মন্দিরের সঙ্গে বিখ্যাত মহাকাল মন্দিরটিকেও ধ্বংস করে দিয়ে যান। এবং শিবলিঙ্গটিকে দিল্লীতে নিয়ে যান। কোনো ঐতিহাসিক মহাকাল মন্দিরটিকে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মন্দিরটি একসময়ে প্রচুর ঐশ্বর্যমন্ডিত ছিল। বোধহয় সে ঐশ্বর্যের লোভেই এবং মন্দিরের ঐতিহ্যের কথা ভেবে ইলতুৎমিশ মন্দিরটিকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে এত উৎসুক ছিলেন। এ-মন্দিরটির প্রাচীনতা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে মেঘদূতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কবি মেঘকে এ মন্দিরের সন্ধ্যারতি দেখে আসতে বলেছেন।।

এখন যে মহাকাল মন্দিরটি উজ্জয়িনীতে বর্তমান তা পরে সিন্ধিয়াদের আমলে তৈরী। মন্দিরটি পাঁচতলা। অলিন্দের দেয়ালে এবং এখানে-ওখানে ছড়ানো পুরোনো মূর্তি ও ভাস্কর্য এখনো কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট স্তম্ভের শ্রেণী। বারান্দাগুলির ছাদের গঠনশৈলী রাজপুত ধাঁচের। বারটি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য মন্দিরগুলির মধ্যে অন্য-তম অতি প্রাচীন মহাকাল মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত বৃদ্ধমাকালেশ্বর মন্দির, ইন্দোর যাবার পথে শিপ্রা ও অন্যান্য দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত নবরত্ন মন্দির, হরসিদ্ধি মন্দির ও গোপাল মন্দির। হরসিদ্ধি মন্দিরটির সামনে দুটি কৌণিক স্তম্ভের গায়ের সঙ্গে আটকানো আছে অসংখ্য প্রদীপ। উৎসবের রাত্রে যখন প্রদীপগুলি জ্বলতে থাকে তখন এক মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি হয়।

বাজারের দোকান-পাটের মধ্যে অবস্থিত বলে জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ কর্তৃক নির্মিত গোপাল মন্দির সাধারণতঃ চোখ এড়িয়ে যায়। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার ও কৃষ্ণমূর্তিটি রূপোর তৈরী। মন্দিরটি সম্ভবতঃ আঠার শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় জয়সিংহ উজ্জয়িনীতে আঠার শতকে একটি মানমন্দিরও (যন্তরমহল) নির্মাণ করেন। একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে এটি অবস্থিত। সিঁড়ির ধাপের ওপর সূর্যের ছায়া দেখে স্থানীয় সময় নির্ণয় করা হত। এছাড়া সূর্যায়ণ এবং চন্দ্র-সূর্যের-গ্রহণ গণনার ব্যবস্থাও ছিল। মোগল সম্রাট বাবর মনে করতেন উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্যের সময়েও মানমন্দির ছিল।

উজ্জয়িনী ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যায় বোহরোঁ-কা-রউজা না দেখলে। এটি শিয়া মতাবলম্বী মুসলমান বোহরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মসজিদ। এ'রা মুসলমান যুগ থেকে উজ্জয়িনীতে বসবাস শুরু করেন। মসজিদটি অপূর্ব সুন্দর। শ্বেতপ্রস্তরে খোদাই করা, জালিকরা দেয়াল। ওপরে নিটোল গম্বুজ। সাইপ্রেস গাছের সারি ও পুকুর। আর সবচেয়ে বেশী যা মনকে ভরিয়ে দেয় তা এখানকার শান্ত পরিবেশ। বিশেষ করে, গোপালমন্দিরের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে ভেঙে দেওয়া বাজারের গোল-মালের পর বোহ্‌রোঁ-কা-রউজার প্রগাঢ় শান্তি নিঃসন্দেহে মনে রাখবার মত।

বর্তমান শহরের ছ' মাইল উত্তরে একটি সুন্দর দ্বীপের ওপর কালীয়দহ প্রাসাদ। এটি প্রথমে ছিল সূর্যদেবতার মন্দির। পরে মুসলমান আমলে প্রমোদ-ভবনে রূপান্তরিত করা হয়। একটি বিরাট সেতুর ওপর দিয়ে প্রাসাদটিতে যেতে হয়। সেতুটির দেয়ালে হিন্দুযুগের প্রস্তর খোদাই-এর নিদর্শন এখনো রয়েছে।

এর দু-মাইল দক্ষিণে একাদশ শতাব্দীর একটি শিবমন্দির আছে। ভর্তৃহরির গুহা নামেই এটি বেশী পরিচিত। কয়েকটি স্তম্ভের গায়ে খোদাইকরা ভাস্কর্যের চিহ্ন এখনো চোখে পড়ার মত। অনেক চড়াই-উৎরাই ভেঙে এখানে আসার একটা সার্থকতা আছে। এরই কাছাকাছি প্রাচীন উজ্জয়িনীর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের জন্যে খননকার্য চালানো হচ্ছে।

এর ফলে হয়তো একদিন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলোকের উজ্জয়িনীর কিছু পরিচয় অতীত রজনীতে লুপ্ত অন্ধকারে একাকার অবস্থা থেকে বর্তমানের দিবালোকে স্পষ্ট-তর হয়ে ফুটে উঠতে পারে।

(এই প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি অমল সেনগুপ্ত কর্তৃক গৃহীত।)

পাঞ্জাবী ভাংড়া নৃত্য

[illegible]

প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তারা রাজধানীতে আসে। কুচকাওয়াজে ওদের আবির্ভাব ঘটলেই জনতার উল্লাস বাঁধ ভেঙে আছড়ে পড়ে রাজপথের ওপর। পরে স্টেডিয়ামে লোকনৃত্য অনুষ্ঠানে মাইকে পাঞ্জাবী ভাংড়া নাচ ঘোষণা করা মাত্র করতালিতে ফেটে পড়ে স্টেডিয়াম। ভাংড়া আজ পাঞ্জাবী অপাঞ্জাবী সকলের কাছে সমান প্রিয়। রাজধানীতে অবাঙালী বিবাহ অনুষ্ঠানে দেখা যাবে পেশাদার ভাংড়া পার্টির পিছু পিছু নাচতে নাচতে চলেছে বরযাত্রীরা।

ভাংড়া পাঞ্জাবী লোকনৃত্য। সোনালী ফসল ঘরে তোলার উচ্ছল খুশীর উদ্দাম প্রকাশ হল ভাংড়া নাচ। বিরাট ঢোলের তালে তালে নাচে পা, দোলে সারা শরীর। তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর পড়তে থাকে ঢোলে কাঠি আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সর্বাঙ্গ নাচে বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী কৃষকের।

কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসে যাদের দেখি তারা মাটির কাছের মানুষ নয়। তারা বেশীর ভাগই কলেজের ছাত্র বা সরকারী কর্মচারী। স্বতঃস্ফূরিত ভাংড়া নাচ এ নয়, বহু আয়াসে বহু দিনের কঠোর সাধনার লব্ধ

পরিমার্জিত ও সংস্কৃত এই নাচ। তাহলেও এর মূলে আছে সেই গ্রাম-জীবনের দুর্বার আকর্ষণ, আছে সেই ফেলে আসা জীবনকে আবার ফিরে পাবার দুর্দাম কামনা।

আজকের ভাংড়া ভারতীয় পাঞ্জাবের শহর মানুষের অবদান। ভাংড়ার প্রচারের পেছনে আছে এক তিক্ত করুণ ইতিহাস। ভাংড়া কেন বেশীরভাগ পাঞ্জাবী লোক-নৃত্যের জন্মস্থান আজ পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ভাংড়া হচ্ছে প্রধানত শিয়ালকোট জেলার নাচ, 'ঝুমর' আর 'বার' লায়ালপুরের 'ধারেস' আর 'ধামাল' অবিভক্ত পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও মুলতানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 'লুড্ডি'ও পশ্চিম পাঞ্জাবের কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাচ। মোটকথা, ভাংড়া নাচের বিশিষ্ট ছন্দ, মুদ্রা প্রভৃতি যে সমস্ত নাচ থেকে এসেছে সেগুলি সমস্তই বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত ছিল।

এল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের সেই রক্তাক্ত দিনগুলো। লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া মানুষ ভারতে আশ্রয় পেল। আশ্রয় অবলম্বন পাওয়ার পর বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী নিজেকে খুঁজে পেল। লায়ালপুরের লোক, মুলতানের লোক, শিয়ালকোটের লোক—নাচ তাদের মজ্জায় মজ্জায়। ঢোলে কাঠি পড়লেই তারা উঠে দাঁড়ায়, অঙ্গ দোলে তালে তালে।

বিভক্ত ভারতে ভাংড়া নাচ প্রথম শুরু হয় ১৯৫২ সালে নীলোখেরিতে। সরকারী উদ্যমে বাস্তুহারা পুনর্বাসনের বিরাট প্রকল্প নিলোখেরি। দুই ভাই গুরবচন সিং আর মনোহর সিংয়ের সঙ্গে যোগ দিল রাণা। রাণা ভাংড়া নাচ-প্রধান অঞ্চল থেকে এসেছে, ভাল নাচে। আর গুরবচন সিং ও মনোহর সিং লায়ালপুরের লোক। রাণা আর মনোহর নাচত আর গুরবচন বাজাত ঢোল। এই হল শুরু। দিল্লীর অদূরে আজার কাছে জাঁদস' গ্রামে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ভাদস' পাইলট এক্সটেনশন প্রজেক্টের উদ্বোধন উপলক্ষে এই রুরী ভাংড়া নাচ দেখায়। সেই নাচ দেখে উদ্বাস্তু কৃষকদের মনে পড়ল তাদের শৈশবের কথা, হারান মন ফিরে পাওয়ার আনন্দে উল্লসিত হল তারা। শুরু হল ভাংড়া নাচ নাভাতে, নাভার আশেপাশে গ্রামগুলিতে।

নাভাতে এক্সটেনশন ট্রেনিং সেন্টার খোলা হল এবং সেখানে গড়া হল প্রথম নিয়মিত ভাংড়া দল। সেন্টারের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের এই নাচ শেখান হত। অনেকের হয়ত মনে আছে যে কয়েক বছর আগে বিরাট গুম্ফশোভিত এক বলিষ্ঠ ভাংড়া নর্তকের ছবি বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে, ডায়েরি ইত্যাদিতে দেখা গিয়েছিল। তিনি হলেন অমরজিত সিং—এই সেন্টারের জনৈক শিক্ষার্থী।

ভাংড়া নাচের বহুল প্রচারে পাতিয়ালার মহেন্দ্র কলেজের বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। এই কলেজে নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা হয়। এই কলেজের ছাত্রদল প্রথম আমন্ত্রিত হয় রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসে অংশ-গ্রহণের জন্য। তাদের নাচ রাজধানীতে প্রবল শিহরন জাগায়।

শুরু হল ভাংড়া নাচ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শহুরে মানুষের পরিকল্পনায় গ্রামীন নাচ দিন দিন মার্জিত হতে থাকল। নানা নাচ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তৈরী হয়েছে আজকের ভাংড়া। সেই উদ্দামতা আছে, উচ্ছলতা আছে কিন্তু কোরিয়াগ্রাফির শৃঙ্খলে বাঁধা। পোষাক তাও পরিকল্পিত। লোকনৃত্য হলেও রাজধানীতে আজ যে ভাংড়া নাচ দেখি তার মধ্যে শোম্যানশিপ অনেকখানি অনুপ্রবেশ করেছে। তাহলেও ভাল লাগে যখন দেখি ঐ বলিষ্ঠ দেহগুলো ঢোলের কাঠির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠছে, নাচছে, লাফাচ্ছে, এলিয়ে পড়ছে। প্রবল উল্লাস কেমন ছন্দবদ্ধ হতে পারে তার নিখুঁত প্রমাণ এই ভাংড়া।

মাটি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

*

দেওয়ালের ওপাশে প্রথমে ফিসফিস করে ডাকছিল—মাটি চাই, মাটি! তারপর যেন শূন্য কুম্ভের ভিতর গমগম করে বলে উঠেছিল—মাটি, মাটি! এবং শেষে একটা চাপা হিংস্র আর ভৌতিক গর্জনে উচ্চারিত হচ্ছিল—মাটি, মাটি, মাটি! যেন তাকে ফেলে রেখে, তার উপর পা মাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল শব্দগুলো—বন্ধ জায়গায় আটকেপড়া পাখির ডানা-ঝাপটানির মত নিষ্ফল চেষ্টা চলছিল। বাইরের ওই আলোড়ন টের পাবার সময় কোথায় শুয়ে আছি বুঝতে পারছিলুম না। নিরেট অন্ধকারে ঠাসা চারপাশটা। কোথাও একটা মৃদু, ক্ষীণ টিকটিক শব্দ। আমি এখানে কেন?...পাশ ফেরার চেষ্টা করে চুপি-চুপি প্রশ্ন করলুম—আমি এখানে কেন?

সেই সময় হঠাৎ চোখের সামনের অন্ধকার কেটে গেল। চতুষ্কোণ আলোর উজ্জ্বলতা স্থির হল সামনে। একটা হলুদ খসখসে থাম দেখা যাচ্ছিল। আমার ছেলে টুটুলকে দেখলুম সেখানে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে।—টুটুল, এদিকে আয়। আমি ডাকলুম। টুটুলকে কেমন ভীত দেখাচ্ছিল। সে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিল। ফের বললুম—শিগগির আয়!

ও কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেতনার ওপর থেকে কী ঝড়ের গতি সব ধুলোবালি মুছে দিল। বুঝতে পারলুম, আমার ঘরেই আমি শুয়ে আছি। আমার গায়ের উপর লেপ চাপানো। শীতের দুপুরে ছুটির দিনের ঘুমটা সঙ্গে নিয়ে কোথায় ছিল আমার পর্যটন?...জীবনে পাহাড় দেখবার বড় সাধ ছিল আমার। একবার মাত্র সরকারী কাজের সূত্রে মাইথন যেতে হয়েছিল। সেই প্রথম ও হয়ত শেষ আমার পাহাড় দেখা। সেগুলো আসল পাহাড় মোটেও নয়, আমার কলিগ রবি বলেছিল। —আসল পাহাড় হিমালয়ে।...সে কি আর আমি জানিনে? পাহাড় নিয়ে লেখা বিস্তর ভ্রমণকাহিনীও কি আমার পড়া নেই?... মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অদ্ভুত শান্ত সব অরণ্য-ঢাকা পাহাড়তলীর পথে যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটবার সুখ কল্পনা করেছি। সেইসব পাহাড়ী মানুষগুলোও ছিল বড় মিশুকে আর বন্ধুবৎসল। আমি তো নিজেকে অন্য এক জন্মের পাহাড়ী

মানুষ ভেবে পাহাড়তলীর মেলায় দেখে-ফেরা যাত্রীদের মধ্যে ফোকলার সাথে মাদল ও বাঁশি বাজিয়ে হেঁটেছি। এবং শীতের দুপুরের লেপের ভিতর থেকে আজ আমি চুপি-চুপি তাই কি বেরিয়ে পড়েছিলুম কোন পাহাড়তলীর দিকে, টুটুলদের ফেলে রেখে, আমার চাকরিবাকরির ধরনধারণ সকল দায়-ঝক্কি ফাঁকি দিয়ে? কিন্তু দেখছিলুম, পাহাড়েও সুখ অবাধ নেই। এদিককার পোড়ো জমির মত অবসন্ন শূন্য নিস্তব্ধ পাথরের চত্বরে জলের ফোঁটার শব্দ শুনতে শুনতে আমি পালাচ্ছিলুম। তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে কে বলল—মাটি চাই, মাটি!...

—টুটুল, আমাকে ছোঁও। আমি বললুম। টুটুল ভয়ে-ভয়ে আমাকে ছুঁল। কিন্তু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করছিল হয়ত আমার মুখে।—টুটুল, আমার গা কি গরম লাগছে?

—না তো! টুটুল বলল। তুমি ভীষণ ঠাণ্ডা, জলের মত।

আমি হাসলুম।—তাই নাকি? তোমার মা কোথায়?

—পুতুলদের নিয়ে ডলিদের বাড়ি গেছে।

—তোমাকে বুঝি পাহারা দিতে বলে গেছে?

টুটুল একটু হাসল নিঃশব্দে।

—হ্যাঁ রে, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছিল এতক্ষণ?

—শব্দ? টুটুল যেন অবাক হল এ প্রশ্নে। দশ বছর বয়সী ছেলের চোখের এমন অবাক হওয়া কেমন অশ্লীল দেখায়। সে বলল—শব্দ তো অনেক হচ্ছিল। বিয়ের বাজনা গেল একদল। তারপর, সানুদের ছাদে মাইক দিয়েছে না? বুলুর বিয়ে যে!

—ও। একটু চুপ করে থেকে বললুম। —আচ্ছা টুটুল, তুই কি শুনেছিস, কেউ মাটি মাটি বলে চিৎকার করছিল?

টুটুল লাফিয়ে উঠল হঠাৎ।—বাবা! সেই মাটিওলাটা আজ এসেছিল না? মা মাটি চেয়েছিল, উনুন বানাবে।...ওকে ওবেলা আসতে বলেছি।

মাটি চাই, মাটি। অদ্ভুত এই ডাক। গলির পথে হঠাৎ কখন যেন গর্জে ওঠে, মাটি মাটি! হাসতে গিয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছি। এখানে কোথাও মাটি নেই। সব পোড়ামাটি ঢাকা—যেখানেই পা রাখি। তাজা সোঁদা গন্ধভরা আসল আগমার্কা বিশুদ্ধ মাটি কতদিন দেখিনি! সেই লোকটির কাছে যে মাটি থাকে, সে মাটি কি তেমনি বিশুদ্ধ সত্যিকার মাটি? এখানে সবই তো ভেজাল কৃত্রিম আর বিষবৎ! লোকটিও নিশ্চয় সত্যযুগের আদমপুরুষ নয়।...আমার মধ্যে তীব্র একটা আকূতি নিষ্ফলবেগে ছোটাছুটি করতে লাগল। ও যদি আমার ছেলেবেলার দেখা সেই সত্যিকার মাটি দিতে পারে, কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ ছলছল করে উঠবে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—ওকে আমার পরম বান্ধব বলে মানব।...আর যদি তা না হয়, যদি না হয়!

ওই লোকটাকে আমি খুন করে ফেলব।

অদ্ভুত ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে আমি লেপ উল্টে দিলুম পায়ে ঠেলে। ধড়মড় করে উঠে বসলুম। কার উপর ক্রোধ আমি জানি নে; অথচ এখনই একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

বাইরে বারান্দায় এসে দেখলুম, সূর্যের আলো এখনও ফুরিয়ে যায় নি শহর থেকে। উঁচু ঘরবাড়ির দেয়ালে বিকেলের নরম রোদ ঝুলে আছে। ছাদে কোথাও কেউ বা কারা বসে আছে, তাদের দেখাচ্ছে সুখী রাজপুত্রদের মত—পৃথিবীর সব রকম আপদ পায়ে মাড়িয়ে ওরা অনেক উপরে পোঁছে গেছে। আর দূরের আকাশে কোথাও চিরকালের এক নীলকণ্ঠ পাখি বসেথাকা দেখছে ওরা। ফিরে এসে নাতিপুতিদের সে গল্প শোনাবে। গল্প চলবে বংশপরম্পরা—পৃথিবী যত দিন বেঁচে থাকবে। বড় হেরে যাচ্ছি আমি—এই দুঃখে ঝটপট উঠোনের খোলা সিঁড়ি বেয়ে একতলা ঘরের ছাদে চলে গেলুম। কোথাও কোন রোদ নেই। চারপাশের উঁচু দেয়াল সব ঢেকেছে সেখানে। কেবল একফালি রোদ আকাশের এক টুকরো ঝরাহাসির মত কোণে পড়ে আছে—যেমন করে ছেলেবেলায় গাছের নীচে মিয়ানো শেষ ফুলটিকে ধুলো থেকে দ্রুত কুড়িয়ে নিতুম, তেমনি দ্রুত আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। অথচ অবিশ্বাস আমার চোখে হাতচাপা দিচ্ছিল পিছন থেকে। এ কি সত্যিকার রোদ? আঃ, গঞ্জের নদীতীরে মাঠের বুকে পড়ে থাকা সেই উজ্জ্বল সতেজ রোদ কতদিন আমি দেখিনি!

*

অনেক ছুটির দিনে গড়ের মাঠে হেঁটেছি। মসৃণ ঘাসের উপর বসেছি। গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছি। গঙ্গার ধারে জল নৌকো ও জাহাজগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে গেছি। তখনও এমনি করে অবিশ্বাস পিছন থেকে দুষ্টুমি করে আমার চোখে হাত রেখেছে। সব মিথ্যা, মেকী আর বানানো দেখনি না কি? এই শহরে অধুনা প্লাস্টিকশিল্পের উৎকর্ষ ও সমাদর প্রবল। এই শহরের পথে ফেরিওয়ালাদের হাতে বিস্তর নকল ফুল। একদিন আমার স্ত্রী টুনু একটা রজনীগন্ধার মালা কিনেছিল—সেটা প্লাস্টিকের। আমি বলেছিলুম—সামনে মাসের পয়লা তোমাকে একটা খাঁটি রজনীগন্ধার মালা কিনে দেব। মনে পড়ছে, দিয়েছিলুম কিনে। অথচ সারা রাত তার খোঁপায় জড়ানো রজনীগন্ধার সব গন্ধ ও স্পর্শ আমাকে সহজ বিশ্বাসের সুখ দেয় নি! মনে হচ্ছিল—এর চেয়ে আরো খাঁটি আরো টাটকা রজনীগন্ধা ফুটত আমাদের গঞ্জের সেই গ্রাম্য উঠোনে।—তুমি খুব সন্দিগ্ধ! টুনু বলেছিল। সে গজগজ করেছিল, সব তাতেই তোমার খুঁতখুঁতেমি। খুব ভালো জিনিস দেখেও বলবে, আরো ভালো আছে...ঠিক তাই। আরো ভালো, যাকে বলে, চরম ও পরম ভালো—তা তো আছেই কোথাও। এবং এর ফলে টাকে কি বাদে, কিংবা হেঁপটা বেড়ে যেতে যেমন আশ্চর্য জিনিস আমি দেখেছি এ শহরে, আরো পাঁচটা বানানো জিনিসের মধ্যে তাদের কোন পার্থক্য থাকে না। এমন কি একবার ব্ল্যাকআউটের রাতে সাকুলার রোডের পুবে গোল চাঁদ দেখে আমি চমকে উঠে ভেবেছিলুম, বিদেশী উপগ্রহ নাকি!

একথা সত্য, খুঁতখুঁতে মন নিয়ে কিছু বিচার করা কঠিন। মাঝে মাঝে নিজের এই খুঁতখুঁতেমির প্রতি ভীষণ বিরক্ত হই। ‘অনেক ভালো’র তীব্র আলো সম্ভবত কবে কোথাও দেখেছিলুম; সেই আমাকে খেল। ‘কিছু ভালো’ আমার চোখে পড়ে না। এ পৃথিবীতে আমার যাত্রা ছিল সেই অনেক ভালোর দিকে। কোথায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলুম, কে জানে। মাঝে মাঝে ডেকে বলি, মাতলি, তোমার সন্তাপবাহিত পুষ্পক জাহান্নমের দুয়ার ঘেঁষে চলেছে যে!

একটা বিশ্বাস থাকলে তাতে পরগাছার মত অনেক অবিশ্বাস গজিয়ে ওঠে। অনেক অবিশ্বাস ঢেকে ফেলে বিশ্বাসের মসৃণ কাণ্ডটা। কোথাও অপরিমিত সুখ আছে? ...খাঁটি জিনিস আছে, ন্যায্য দর সঠিক ওজন নির্ভেজাল? আহা, কোথায় কোন বাজারের চৌমাথায় সেই সমবায় ভাণ্ডার, নির্দ্বিধায় যার সত্য হতে পিছপা হব না? জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষায় চরম সুখের প্রজাপতি-ফসকেযাওয়া রঙের ছোপ লেগে গিয়েছিল, হাতের চিটচিটে রঙছোপভরা তালু মুঠোয় লুকিয়ে আমাকে পথ চলতে হচ্ছে। গঞ্জের স্টেশনে দাঁড়িয়ে একদা ভাবতুম, সব রেলগাড়িই যায় সুখের দেশে—ইচ্ছাপূরণের অতিকায় সব স্কাইস্ক্রেপার যে শহরে দাঁড় করানো, বুঝি সেখান থেকেই বাবা এনে দিতেন পশমী নীল মাফলার, গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত, লাল পেন্সিল, সবুজ সার্ট! উপরতলার বড়সাহেব-ছোটসাহেব বড়বাবু-ছোটবাবুর দরজায়...মাতলি তোমার সন্তাপবাহিত পুষ্পক কোথায় এল হে? ...এবং একদিন বেলা দুটোয় লেডি টাইপিস্টের চোখে যেন ইন্দ্র কর্তৃক নগর ধ্বংসের প্রাচীন প্রজ্জ্বলন দেখে চিৎকার করে উঠেছিলুম, মাতলি তোমার প্রভুকে মনে পড়ে না?

*

রাত এগারোটায় রেডিও শেষ হলে টেবিলল্যাম্পের সুইচে হাত দিয়ে টুনু হঠাৎ বলল—দেখ, আমার বড় ভয় হচ্ছে।...

চমকে উঠে বললুম—কেন? কিসের ভয়?

ঘরের স্তব্ধতায় চাপা কণ্ঠস্বর দিয়ে দুঃখের ভাঁজ ফেলে ও বলল—কদিন থেকে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে। বমিভাবও আছে। আবার নাকি...

বাধা দিয়ে হাসলুম—ধেৎ! আবার কী? ব্যবস্থা তো করা হয়েছে।

আমার ছেলে টুটুল ভীষণ কৌতূহলী এবং সে তখনও কী কারণে জেগে ছিল

ল্লেপের আড়ালে। হঠাৎ মুখ বের করে সে বলে উঠল—কিসের ব্যবস্থা বাবা?

নির্বিকারভাবে বললুম—তোমার কোন ভাই-বোন আর যাতে না হয়। এবং টুনু আমার হাতটা খামচে ধরল।

—কেন হবে না বাবা?

—হলে মানুষ করতে পারব না।

—মানুষ হওয়া কী বাবা?

—জানি না। এবার ঘুমোও। ভোরে স্কুল আছে।

টুনু চাপাক্রোধে কী মতলব ভাঁজছিল সম্ভবত। একটু চুপ করে থেকে টুটুল বলল—আমি,...আমরা মানুষ হবো?

—হবে...বলেই আমার বাবার মত ভুল করা উচিত নয় ভেবে পরক্ষণে গলা ঝেড়ে ফের বললাম—কী জানি।

—আমি মানুষ হব না।

—কী হবে?

—ড্রাইভার।

—কেন?

—গাড়ি চালাতে আমার ভালো লাগে। আর পুতুল কি বলে জানো? ওর কিছু হতে ভালো লাগে না। কেবল শ্বশুরবাড়ি যেতে খুব ভালো লাগে।

আমরা স্বামী-স্ত্রী ভীষণ হাসছিলুম একথা শুনে, যদিও রাত এগারোটা বেজে গেছে এবং গলির মোড়ে কেলুবাবু মাতাল হয়ে ফিরে রিকশোওলাকে দেশ-জাত তুলে গাল দিচ্ছিলেন। শেষে বললুম—আর মিঠুলের কী ভালো লাগে জানো?

—পুলিশ হতে।

বড় চমৎকার ছিল এসব কথাবার্তা। শেষে টুনু বলল—আমরা ছেলেমেয়েদের দিকে বেশী মনোযোগ দিই নে, খুব ভুল হচ্ছে। এবার ওদের একটু দেখাশুনা করবে কি?

কেন, তুমি তো রয়েছ!

—আহা, কী থাকা! ঘরকন্নার দায় কাঁধে, একটা ঝিও নেই, দুবেলা নিশ্বাস ফেলার যো নেই...

—আচ্ছা টুনু, ছেলেবেলায় সবারই একটা করে ইচ্ছে থাকে, সে কী হবে। তোমার কী ছিল?

—সে আর শুনে কী হবে।

—আহা বলই না শুনি।

—কী জানি ভুলে গেছি!

টুটুল ব্যস্তভাবে বলে উঠল—আমি জানি বাবা। তুমি যখন ঘরে নেই, মা বলে—কত সাধ ছিল...

এই সময় মা উঠে তার ছেলেকে ঠাস-ঠাস করে চড় মারতে থাকলে আমি খুবই অসহায় বোধ করছিলুম। আমার শরীরের ভিতরে বাড়ছে শুধু ক্ষোভ—যা পিতৃক্ষোভ ছাড়া কিছু নয় এই আমার ধারণা আস্তে আস্তে ক্যান্সারকোষে পরিণত হচ্ছিল। দুঃখ ও পরাজয়ের গ্লানিতে স্যাঁতসেঁতে অপরিচ্ছন্ন হচ্ছিল মন, এবং আর কোনদিনও ছেলে-পুলের বাপ হতে পারবো না—ভাবতে ভাবতে দেখছিলুম, আমার অজাত সন্তানেরা অসম্ভবের তীব্র স্রোতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ভেসে চলেছে নরকগামী, এবং মাতলি হে, তোমার পুষ্পক আর কোনদিনও স্বর্গে ফেরার পথ খুঁজে পাবে না, একথা নিশ্চিত জেনো।

*

আমি যখন খুবই ছোট ছিলুম, দেবতাদের সেই বন্ধুবৎসল রাজার কথা শুনেছিলুম। তিনি পৃথিবীর বন্ধুদের তাঁর স্বর্গরাজ্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে পুষ্পক-রথ পাঠান, যার সারথির নাম মাতলি।

কতকাল তার প্রতীক্ষায় ছিলুম! আমার দুয়ারে কবে তার চাকার ধ্বনি বাজবে, পারিজাতসৌরভে আমোদিত হবে আমাদের ছোট্ট বাড়িখানি! সন্ধ্যায় শঙ্খ বাজলে চমকে উঠে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছি। আকাশের দিকে তাকিয়েছি ব্যাকুল অন্বেষী চোখে। পাংশু আকাশে কোথাও কয়েক পোঁচ লালচে রঙ, কোথাও জাগছিল কালপুরুষের ধনুর্বাণের শেষ বিন্দুতে উজ্জ্বল নক্ষত্রটি শিরীষগাছের শীর্ষদেশ পেরিয়ে উড়ে আসছিল নিঃসঙ্গ কোন পাখি। আর, মন্দিরে-মন্দিরে ঘণ্টা বাজছিল গাভী ডাকছিল। যারা বাইরে ছিল সবাই ঘরে ফিরে আসছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়; এবং তারপর অন্ধকার ঘন হয়ে এলে পার্থিব সকল দৃশ্য ও বাস্তবতা যত্ন করে যেন ঢেকে দেওয়া হল অপবিত্র বস্তুপুঞ্জের মত—কেন না মাননীয় অতিথি এখনই এসে পড়বেন যেকোন মুহূর্তেই দেখ, মাথার উপর কারুকার্যখচিত চন্দ্রাতপ, ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে, ফুলের গন্ধ ছুটেছে পথে-পথে, তুমি প্রস্তুত হয়েছ তো?

এমনি করেই আমার রথারোহণ ঘটেছিল।

অথচ পথ ভুল করল পুষ্পক। স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে পারলুম না আমরা। যে-পথে যাই নরকের দুয়ার, অতিকায় যমদূত, দুঃখের পথের দুপাশে ভীষণ শব্দে শেল ফাটে; সুতরাং চক্ষে যা অবিশ্রাম ক্ষরিত, তা অশ্রু বলে ভুল করো না মাতলি হে! তোমার দেবশরীর অনশনে শীর্ণ দুশ্চিন্তায় মস্তিষ্ক উত্তপ্ত, তোমার দেবকান্তি নিষ্প্রভ—আজ তুমি আমার মত নরকবাসের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট।

এবং এখন আমরা মধ্যদেশে। আমাদের পায়ের নীচে মাটি নেই। রথের চাকা শূন্যে ভাসে। হাতের পারিজাতে বহু নরকের পূতিগন্ধ ও অন্ধকার পুঞ্জীভূত ক্রমান্বয়ে। তুমি সবিনয়ে জানতে চাইলে, বলব—ফেলে দাও পারিজাত, আমরা কেউ আর অমৃতে অভিলাষী নই। এখন যা দরকার, তা পুণ্য-দেশ নয়, মাটি। আঃ কতকাল আমি মাটি ছুঁই নি। সোঁদাগন্ধ মাখা নরম হৃদয়বান মাটি—যে অবিরত জন্মদান করে, পালন করে এবং ফের অজস্র জন্মদান করে।

*

মাটি চাই, মাটি! হঠাৎ গলির মোড়ে ডাকল সেই মাটিওলা ঝটিতে বেরিয়ে লোকটাকে দেখতে গেলুম। প্রায় উলঙ্গ তার শরীর। কোমরে একফালি ন্যাতা পেঁচানো, মুখে একরাশ দাড়িগোঁফ, চোখের কোণে পিচুটি। অথচ কী হিংস্র আর জ্বলজ্বলে ওই দৃষ্টি! দুয়ার থেকে দুয়ারে সে ঘুরছিল। ঘরে ঘরে স্টোভ প্রেসারকুকার; তাই হয়ত ওকে ফিরতে হচ্ছে নিষ্ফল—আমার ধারণা হল। এবং ও এক বিনাপুঁজির ব্যবসায়ী—কর্পোরেশনের লোকেরা শহরের শরীর খুঁড়ে দেখবার সময় হয়ত বাগে পেয়ে কিছু সংগ্রহ করেছে। ঘুষ দিতে হয়েছে কি ওকে? আমি ডাকলাম। হিংস্রভাবে চিৎকার করে ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে—মাটি, মাটি!

আমার পিছনে আমার স্ত্রী ও ছেলে-পুলেরা এসে ভীড় করেছিল। মাটিওলা ঝুলি ও খুরপী নামিয়ে হাঁটু দুমড়ে বসল। বড় অদ্ভুত তার মুখের হাসি। সে বলল—এলাকাও এক মুঠিও পাবেন না বাবু...

টুনু ধমকাল—রাখো! কই দেখি, কেমন মাটি তোমার!

উঁকি মেরে মাটি দেখার চেষ্টা করছিলুম। সে কি এই, সে কি সেই, সনাতন জনক মাটি—যা থেকে আমরা ফুলের গাছ পেতে পারি, ফলাতে পারি পরিকল্পনামত ঘরে-ঘরে, টবে-টবে খাদ্যশস্য, কুমড়ো লাউ বরবটি ফুলকপি পালংশাক বা বেগুন? টুটুল ঠিক তাই বলেছিল। বুলুদের ছাদে কী সব ফলেছে, নান্তুর বাবা কী সব ফলাচ্ছেন, এই রকম অজস্র উদাহরণ সে দিচ্ছিল অনবরত।

টুনুর ফ্যাকাসে হাতের তালুতে কালচে মাটিগুলো দেখে বললুম—বিজ্ঞানীরা বলেন, মেয়েদের হাতেই নাকি কৃষির আবির্ভাব।

টুনু চোখ পাকিয়ে জবাব দিল—কৃষি-ফৃষি বাদ দাও সবটা নেবো?

—অত কী হবে?

—ভাঙা বালতি আছে দুটো। টবও কেনো। ওবেলা নার্শারী থেকে কিছু বীজ এনো কয়েক রকম...টুটুল সোৎসাহে হাত-তালি দিল।—ফুল ফুটবে, ফুল ফুটবে!

পুতুল বলল—নাঃ, বেগুন।

মিঠুল বলল—না, না, মুলো। আমি মুলো খেতে খুব ভালবাসি বাবা।

আমি বললুম—এখন তো বসন্তকাল পড়ে যাচ্ছে...

বাসররাতের টুনু ফিরে এসে বলল—বেশ তো, ফুলের চাষই করবে। বসন্তে কী ফুল ফোটে গো?

মাটিওয়ালার হৃদয় গলে পড়ছিল।—বাবু, মাটির কদর কেউ আর বোঝে না!

আমি খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে শুঁকলুম। যেমন করে একদিন গঞ্জের মাঠে সরিষার ক্ষেতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে নাক রাখতুম—ঠিক তেমনি। পরক্ষণে যেন চাবুক খেয়ে শিউরে উঠলুম। একটা উৎকট তীব্র ঝাঁঝালো দুর্গন্ধে আমার বমি এসে গেল। দ্রুত মাটি ফেলে দিয়ে নাকে হাত রাখলুম। রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললুম—মাটিওলা, সত্যি বলো, এ মাটি কোত্থেকে এনেছ?

—বিশ্বাস করেন বাবু, অনেক দূরের এ মাটি...

—মিথ্যুক কোথাকার। এ মাটি এখানের নর্দমা থেকে তোলা পচা...

—বাবু, অনেক কষ্টে আনা মাটি, আমার খরেপীটা দেখুন।

টুনু বলল—চেঁচামেচি করে কী হবে? কলকাতার নীচেটা তো এই। ওর কী দোষ? কলকাতার নীচেটা এই।...কথাটা নতুন করে যেন জানা গেল। আরে তাই তো, তাই তো! মাটিওয়ালার দিকে আঙুল তুলে বললুম—যাও, ভাগো!

—বাবু, আপনার পায়ে পড়ি, অনেক ঘুরেছি। পেটে দানাপানি নাই...

—ভাগ্ ব্যাটা জুয়োচোর!

—মাটি নেবেন না বাবু?

টুনুও বলল—না। কোনদিন আসল মাটি আনলে নিতে পারি।

মাটিওলা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। আড়ষ্টভাবে সে ডাকছিল—মাটি, মাটি। তারপর ক্লান্ত উলঙ্গ তার শরীর চলতে চলতে হঠাৎ থামল। সে পিছন ফিরে এগিয়ে এল। বলল—বাবু কথা দিলাম, আপনার জন্যে আসল মাটি একদিন এনে দেবো। নেবেন তো?

—নেবো।

—এই থলে ভরতি মাটি আনব। পলাশডাঙা চেনেন বাবু, পলাশডাঙ্গা? সেখান থেকেন আনব। দাম কিন্তু একটু বেশীই লাগবে...আমতা হাসল সে। সবিনয়ে মুখ নীচু করল।

বললুম—যা চাও দেবো।

—পলাশডাঙা আমার বাড়ি ছিল বাবু। আহা, অমন মাটি ভু-ভারতে নাই। গেছেন কখন ওদিকে? কতরকম ফসল ফলে, আহা, মা বসুমতী বুক উজোড় করে সব দিয়েছেন সেখানে। শুধু আমিই এক হতভাগা...

চোখ মুছতে মুছতে ও চলে গেল। আমার পরিবারে একটা বিপুল প্রতীক্ষা রেখে সে এগিয়ে গেল। স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সেই মাটিতে কী কী ফলাবে, তাই নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছিল।

আমি ভাবছিলুম, ওই মাটি পেলে আমি কি পারিজাত ফোটাতে পারি, যে পারিজাতের গন্ধ দূর শৈশবে আমাকে বিপন্ন করেছে?

*

আমাদের প্রতীক্ষায় রেখে যে চলে গেল, সে আর ফিরল না। কত গভীর রাত অবধি আমরা তার কথা বলাবলি করতুম পরস্পর। আর আমি শোনাতুম, ছেলেবেলার অজস্র গল্প—গঞ্জের মাটিতে যে ছেলেবেলা কেটেছিল আমার। টুটুল বলত, সে একটা আশ্চর্য ফুল ফোটাবে। টুনু বলত—উনুন করে কী হবে! বরং একটা লাউবীজ পুঁতে দেবো। পিসিমার বাড়ি দেখেছি, মাচানে ঝোলে সব—কী সুন্দর না লাগে, যেন ইয়ের মত।

আমি বলতুম—ছেলেপুলের মত কি?

—যাও! বয়স হয়েছে, এখনও অসভ্যতা।

আমি ওকে আকর্ষণ করতুম। ও ফিসফিস করে বলত—ওরা ঘুমোয়নি।

—টুনু! আমি ডাকতুম।

—উঁ?

বলতে গিয়ে থেমে যেতুম। কারণ, কথাটা আমার কাছেও স্পষ্ট নয়। আমার মধ্যে দিনেদিনে অদ্ভুত একটা ভয় বাড়ছিল। পলাশডাঙার মাটির কথা ভাবছিলুম। আমি কত ব্যর্থ হয়ে বেঁচে আছি এই শহরের নিস্ফলা বন্ধ্যা মাটির মত—পচা আব দুর্গন্ধভরা! আমি আর ছেলেপুলের বাপ হতে পারব না। প্রকৃতি খুব ভিতর থেকে আমার পোড়ো জমিতে হলকর্ষণ করছে তুখোড় চাষার মত। অজস্র প্রজন্মের নিঃশব্দ কান্না তার ভাঁজে-ভাঁজে! মাতলি, স্বর্গরাজ্যে কোথায় জন্মায় পারিজাত তরু? মাটি তো চাই-ই, অন্যরকম হোক্ না সে মাটি! এবং সে-মাটি জন্মদান করে। অসংখ্য পারিজাতে ভরে ওঠে নন্দনকানন। মাতলি হে, শূন্যে বড় জ্বালা। স্বর্গরাজ্যের পথ ভুলে জাহান্নামের দরজায়-দরজায় উঁকি মারে তোমার পুষ্পকরথ। দেখ, তার ধ্বজাধারী চূড়া কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে! আর কতকাল মহাশূন্যে পাড়ি দিতে হবে জন্মহীন অন্ধকার পথেপথে, কতকাল?

তারপর একদিন আপিস ফেরার পথে দেখি রাজভবনের প্রাঙ্গণে বিশাল শিমুলগাছ লাল ফুলে ভরে গেছে। দক্ষিণের হাওয়া ছুটেছে গঙ্গার প্রান্ত ঘেঁষে। পাথের উপর শুয়ে আছে এক রোগী, তার শিয়রে খাঁচায় রাখা সবুজ টিয়াপাখি, তার উপাধান হয়েছে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ। দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে এগোতেই কে ওপাশে ফিসফিস করে উঠেছিল—বাবু, বাবু!

বললুম সবিস্ময়ে—আরে তুমি! এখানে যে? শুয়ে আছ কেন— কই, কোথায় তোমার পলাশডাঙার মাটি?

অনেক শুয়েথাকা লোকের মধ্যে একজন লোক সেই মাটিওয়ালা বলল—'কাল' আমাকে খেল বাবু, আমার আর যাওয়া হল না।

যাওয়া হল না! তবে কে আনবে সেই পবিত্র সোঁদাগন্ধমাখা ফলনশীল মাটি? প্রতীক্ষায় আমরা বংশ-পরম্পরা বুড়ো হতে হতে বুড়ি হতে হতে মরে যাবো!

আর, চকিতে পাশে চেয়ে দেখি, সারথিবিহীন রথ দাঁড় করানো, ভগ্নচক্র-ধ্বজা বিশাল পুষ্পক। মাতলি, তুমি অবশেষে মাটিওয়ালার বেশে শুয়ে আছো অনেক শুয়ে থাকা লোকের পাশে—যারা নানারকম পার্থিব ও স্বর্গীয় মাটির অন্বেষণে যাত্রা করেছিল। মাতলি, অপেক্ষা করো, আমাকেও তোমার পাশে যেতে হবে। ওই ঘর-ছাড়া পরিবারের মত আমার স্ত্রী টুটুল-পুতুল-মিঠুল আমার পরিবার, ফুটপাতে এসে শুয়ে থাকব। আমরা কোনরকম মাটি আর ফিরে পাবো না। সারথিবিহীন যাত্রীবিহীন শূন্য ভগ্নবপু রথে মরচে ধরে একটু একটু করে ভেঙে গুঁড়ো হতে থাকবে দিনের পর দিন।

ওদিকে স্বর্গের রাজা আমাদের প্রতীক্ষা করে। তার প্রেরিত প্রিয় রথের অপেক্ষা করে।
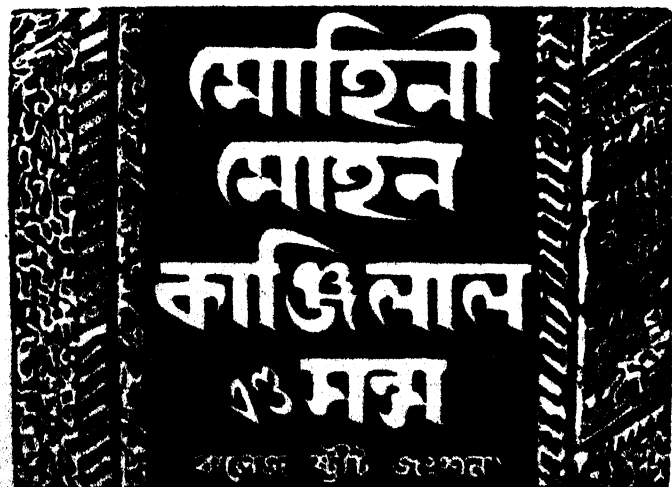
আমরা কি ও কে

খ্যাতনামা ব্রিটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ ডাঃ ডেসমণ্ড মরিসের মতে—

"Man is a naked ape - naked not in the sense of being nude but in the sense that he is the least furry of all primates."

১৯৩ প্রকারের বানর আছে (ইংরাজীতে মর্কট এবং এপ),—অর্থাৎ তাদের জীবন্ত নমুনা পাওয়া যায়, মানুষ তাদের মধ্যে অন্যতম, তবে, মানুষকে সহজেই চেনা যায়। তার গায়ের লোমের পরিমাণ অনেক কম। মানুষ এবং তার বিবর্তন বিষয়ে ডাঃ মরিস একজন সুপণ্ডিত। তাঁর রচনার ভঙ্গী সরল ও সরস। ডাঃ মরিস বলেছেন শুধু যে গায়ে লোমের পরিমাণ কম তাই নয় (সেই কারণে, দি নেকেড এপ) আরও অনেক লক্ষণ আছে, এবং সেই সব লক্ষণ তিনি প্রাণীতত্ত্ববিদের দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন।

ডাঃ মরিসের এই বিচার পদ্ধতি স্বেচ্ছা নির্বাচিত। তাঁর মতে স্বকৃতনাম-ধারী homo sapiens.কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেহলক্ষণ থাকা সত্ত্বেও মানুষও একটি 'এনিম্যাল' বা জন্তুবিশেষ। ডাঃ মরিস অতঃপর এই মানুষ নামক জন্তু-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

'This unusual and highly successful species spends a great deal of time examining his higher motives and an equal amount of time studiously ignoring his fundamental ones."

ডাঃ মরিস বলেছেন যে, প্রত্নজীব-বিশারদরা এবং নরপ্রকৃতিতত্ত্ববিদরা আমাদের প্রথম উৎপত্তি বিষয়ে একটা সাধারণভাবে স্বীকৃত সিদ্ধান্তের কথা বলেন। আদিম মানুষ যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তারা কীট-পতঙ্গভুক প্রাণী থেকে উদ্ভূত। কালক্রমে তারা ফলমূল, বাদাম ইত্যাদি যে সব দ্রব্য আরণ্য-পরিবেশে পাওয়া যেত তা খেতে শিখেছেন। ক্রমে চোখ ঠিকরে আসতে লাগল, হাতগুলি পুষ্টি লাভ করল, তখন প্রাক্-বানর দেহ গড়ে উঠল এবং প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ লক্ষ বছর আগে প্রকৃত বানরের জন্মলাভ ঘটল।

পনর লক্ষ বছর পূর্বে যে অরণ্যভূমিতে এইসব বানর বাস করত তার পরিধি হঠাৎ হ্রাস পেল। তখন অরণ্যবাসী বানরদের যেটুকু বাসস্থান তখনও অবশিষ্ট ছিল তার মধ্যেই জুলে থাকতে না উন্মুক্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে হল। যারা নিজ বাসভূমি এবং পরিবেশ আঁকড়ে বৃক্ষশাখা অবলম্বন করেছিলেন তাঁরাই একালের শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রকৃতির পূর্ব-পুরুষ। মুখ্যত এদের তেমন বিবর্তন ঘটেনি। এদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে।

মানুষের পূর্বপুরুষরা উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ে অন্যান্য ভূমিজ প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন।

এতকাল অরণ্যভূমিতে ফল তৃণ আহরণ-কারী আমাদের নগ্ন-বানর পূর্বপুরুষদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নতুন পরিবেশে এসে তা তাদের অরণ্যস্থ বাসভূমির সমস্যার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই পর্বে, অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের শেষ লক্ষ বছরের ইতিহাসে অনেক অভূতপূর্ব বিপর্যয়কারী ও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল। মানুষ শিকারী পশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিকার করতে শিখল, উন্মুক্ত প্রান্তরের এই প্রতিযোগিতায় তাকে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হল। নগ্ন-বানর অধিকতর ঋজু ভঙ্গী অবলম্বন করল এবং ক্রমশ দ্বিপদ প্রাণীতে পরিণত হল।

এখন থেকে এই নগ্ন-বানরের হাত অস্ত্র ধারণের উপযোগী হয়ে উঠল। যেহেতু ব্যাঘ্র বা নেকড়ের মত তীক্ষ্ণ নখরের অভাব, নগ্ন বানরকে কৃত্রিম হাতিয়ার এবং অস্ত্রাদি তৈরী করতে হল। এর অর্থ এই যে নগ্ন-বানরকে গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে সমাজবদ্ধ প্রাণী হিসাবে কাজ করতে শিখতে হল। এই কাজে চাই সামাজিক সহযোগিতা। এই-ভাবে মুখ্যত বানর হলেও নরগণ দ্রুততালে পরিবর্তনের মধ্যে রূপান্তরিত হলেন। প্রথমে হলেন শিকারী বানর। পরে সহযোগী শিকারী বানর।

আমাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত এই বিতর্কহীন সিদ্ধান্ত থেকেই ডাঃ মরিসের গ্রন্থ 'দি নেকেড এপে'র সূত্রপাত। অতঃপর তিনি অন্যান্য বিজ্ঞানীর সঙ্গে মতের দিক থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। যে সব প্রাণী-বিজ্ঞানী এই বিষয় নিয়ে গবেষণামগ্ন, তিনি তাদের কাছ থেকে সরে এসেছেন।

ডাঃ মরিস বলছেন মানবজীবনে যে বহুবিধ সাংস্কৃতিক বিস্ফোরণ ঘটেছে তার ফলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানুষ শিকারী বানর থেকে সাংস্কৃতিক বানরে পরিণত হয়েছে। ডাঃ মরিস কিন্তু যুক্তি প্রয়োগে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের মূলগত প্রবণতা কিন্তু জৈবিক।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে মানুষকে একটা জীবতাত্ত্বিক বিস্ময় বলে স্বীকার করতে হবে। এই কাজটুকু করার জন্য মানুষের পুরোনো সন্ধানে তার আদিমতম আচার ব্যবহার ও পরিবেশ বিবেচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রয়োজন নেই। কি ছিল আদিম রীতি-নীতি, কেমন ছিল আচার ব্যবহার এসব বিচার বাহ্য।

পুরোকালের প্রত্নবিদরা ঠিক এই কাজই করতেন। প্রাচীন আদিবাসী যাঁরা ঠিক মত রূপান্তরিত হতে পারেননি, অর্থাৎ সাফল্যলাভ করেন নি, তাঁরাই এক হিসাবে এই নগ্ন বানরের প্রতিনিধি। সেই কারণে, আদিবাসী সমাজ যদিও এই গবেষণায় সহায়ক তথাপি তাঁদের দেখে নগ্ন বানরদের বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন আচরণ বিষয়ে যে খুব বেশী জানা সম্ভব তা বলা যায় না।

এই সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় যদি সকল শ্রেণীর সমাজের আচরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

"all the ordinary, successful of the major cultures — the mainstream specimens who together represent the vast majority —"

এতদ্দ্বারা অবশ্য লেখক বর্তমান সময়ে যে সব মানুষ পশ্চিম জগতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তাদের কথাই ইঙ্গিত করেছেন।

এই নির্দেশিকা সামনে রেখে ডাঃ মরিস ভিত্তিগত মানবিক বাসনা-কামনা, আচার-আচরণ, অভ্যাস এবং প্রবণতা নিয়ে এক বিস্ময়কর বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে অনেক প্রশ্নের জবাব আছে, যে প্রশ্ন আমরা নিজেরাই অনেক সময় ভেবে আকুল হয়েছি তার উত্তর দিয়েছেন ডাঃ মরিস। কেন আমরা নগ্নতা ঢেকে রাখি, কেন আমরা বিবাহ করি এবং একদার গ্রহণ পছন্দ করি, কেন আমরা লড়াই করি, হারি ও জিতি; কেন আমরা যুদ্ধে যাই—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ডাঃ মরিস এ বিষয়ে সচেতন যে, তাঁর পরিবেশন রীতির মধ্যে সারল্যের পরিমাণ বেশী।

লড়াই সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি পরিবার পরিকল্পনার উদ্যোক্তা এবং অস্ত্র সংবরণ সমিতির পক্ষে বিশেষ কৌতূহল সৃষ্টি করবে। ডাঃ মরিস মাঝে মাঝে কিন্তু এমনই মোটা রং চড়িয়েছেন তাঁর বক্তব্যের কোনো কোনো অংশে যে, অনেক সাধারণ মানুষের পক্ষেও অসন্তোষ বর্ধনের কারণ ঘটতে পারে।

গ্রন্থটি অতিশয় মনোরম ও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু এর গুরুত্বপূর্ণ দিকও কিছু আছে। এর অনেক মন্তব্য নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং মনোবিজ্ঞানীর মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে। আবার যে সব মানুষ তাঁদের প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত পশুভাবটা অগ্রাহ্য করতে চান তাঁরা হয়ত অনেক মন্তব্য পাঠে অসুখী হবেন, তবে শেষ পর্যন্ত না পড়ে কেউ বইটি ছাড়তে পারবেন না।

—অভয়ংকর

THE NAKED APE: BY DESMOND MORRIS : Published by — Jonathan Cape (London). Price - 30 Shillings only.

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ভারতীয় সাহিত্য

সিন্ধি ভাষায় অনুবাদ ॥

সিন্ধি সাহিত্যকে অ-সিন্ধিভাষীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য সম্প্রতি কয়েকটি সিন্ধিভাষা থেকে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সিন্ধি ছোট গল্পের একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন শ্রীহাসো কেওয়াল রামানি। শ্রীমতিলাল জোতওয়ানী সম্পাদিত 'সিন্ধি কি শ্রেষ্ঠ কাহানীয়া' প্রকাশিত হয়েছে হিন্দিতে। এছাড়াও সাহিত্য আকাদামি হিন্দিতে সিন্ধি গল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতী লীলা রায় সিন্ধি কবি এইচ আই সদারাঙ্গনীর অনেক কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এর কয়েকটি 'বেঙ্গলী লিটারেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীহাশু কেওয়াল রামানি সম্পাদিত গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে ২১টি ছোট গল্প। এর লেখকরা সকলেই তরুণ। শ্রীমতিলাল জোতয়ানী সম্পাদিত গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে ১২টি গল্প। সাহিত্য আকাদামি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে ২৬টি বই সংকলিত হয়েছে।

এই গ্রন্থ তিনটি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ।

য়ুরোপে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনুশীলন ॥

সাম্প্রতিককালে সমগ্র য়ুরোপে প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষতঃ পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সংস্কৃত-সাহিত্য নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে আসছেন। এখনো সেসব দেশে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে ব্যাপক অনুশীলন চলছে। কয়েকদিন আগে, প্রাচীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান-অর্জনের জন্য পশ্চিম জার্মানীর গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হেনজ বেচার্ট ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তার আগে তিনি ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সফর শেষ করেছেন। ডঃ বেচার্ট ভারত সফরকালে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জার্মানীতে পুরাতত্ত্বের চোদ্দটি চেয়ার রয়েছে। তাঁর দেশের মানুষ ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগ্রহশীল। তাঁর বিশ্বাস, এইসব গবেষণার ফলে য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। সংস্কৃত ও প্যালিভাষায় ভারতীয় বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এইসব গ্রন্থ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে খুবই আদৃত হয়েছে। জাপান এবং সিংহল সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

পরলোকে মালয়ালাম কবি

গত ৬ এপ্রিল প্রবীণ মালয়ালাম কবি ও সমালোচক কে কে রাজা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

কে কে রাজা যখন কবিতার আসরে আসেন, তখন মালয়ালাম সাহিত্যে সাহিত্যকারের আধুনিকতা দেখা দেয়নি। ত্রিচুরের অন্তর্গত ইরাভিমঙ্গলমে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেটা ১৮৯৩ সাল। কে কে রাজা যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই সাহিত্যের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। প্রথম দিকটায় তিনি লুকিয়ে লুকিয়েই কাব্য চর্চা করতেন, বাড়ির কেউই টের পায়নি তাঁর এই লেখার ব্যাপারটি। অবশ্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি কোনোদিনই।

স্কুল ও কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে কে কে রাজা শিক্ষকতার চাকুরি গ্রহণ করলেন। ১২ বছর আগে তিনি চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেন।

তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা হল আট। প্রথম কাব্যগ্রন্থ বলপঞ্জলি বেরিয়েছিল ১৯২৯ সালে। এই কাব্যগ্রন্থ দিয়েই মালয়ালাম সাহিত্যে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করলেন। বলাবাহুল্য, তাঁর রচনা-শক্তি সেদিন অনেককেই চমকে দিয়েছিল। পাঠকেরা নতুনের স্বাদ পেলেন। এরপর আরো কয়েকটি কবিতার বই বেরোলো। তার মধ্যে ভেলিত্তিন (১৯৩২) এবং হর্ষাঞ্জলি (১৯৩৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে বেরোয় তাঁর মন্নুমে ভিন্নুম কাব্যগ্রন্থটি।

সমালোচক হিসেবেও কে কে রাজা মালয়ালাম সাহিত্যে বিশিষ্টতা লাভ করেন। তাঁর মধুরায়াম গ্রন্থটি এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

উজবেকিস্তানে ভারতীয় সাহিত্য

বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। শুধুমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে যেভাবে ভারতীয় লেখকদের বইয়ের চাহিদা বাড়ছে তা অবাক হবারই মতো। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি খবরে জানা যায়, উজবেকিস্তানে ভারতীয় লেখকদের বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই একরকম প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। গত কয়েক বছরে সেখানে তিন লাখেরও বেশি ভারতীয় লেখকদের বই বিলি হয়েছে।

উজবেক-ভারতবিদ শ্রীমতী শ্বেতলানা ইয়ারমাকোভা ভারতীয় লেখিকা সুভদ্রা-কুমারী চৌহানের রচনা সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন।

অন্যান্য সোভিয়েত-ভারতবিদ যে সমস্ত ভারতীয় লেখকের গ্রন্থ অনুবাদ করে সম্প্রতি উজবেক ভাষায় প্রকাশ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রেম চন্দ, আলি সর্দার জাফরী, ভবানী ভট্টাচার্য, খাজা আমেদ আব্বাস প্রমুখ। আরো কিছু বই এখান থেকে বেরুবে বলে শোনা যাচ্ছে।

একটি হিন্দি কবিতাগ্রন্থ ॥

শ্রীমতী কিরণ জৈন তরুণ হিন্দি কবিদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর একটি নতুন কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "স্বর পরিবেশ কে"। দিল্লির "অক্ষর প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ" থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত।

শ্রীমতী জৈনকে বলা যায় শহর-জীবনের বর্তমান নগর সভ্যতার বিকৃত দিনগুলি তাঁর কবিতায় ব্যাপকভাবে ফুটে উঠেছে। রোমান্টিকতাকেও তিনি একেবারে ত্যাগ করতে পারেন নি। আলোচ্য গ্রন্থের 'নয়া যুগবোধ', 'জেনারেল স্ট্রাইক', 'প্রগতি', 'রাতকে অন্ধেরে মে' 'অস্তিত্ববোধ' ইত্যাদি কবিতাগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করি।

পরলোকে শ্রীবাস্তব ॥

গত ২৯ মার্চ তেলুগু সাহিত্যের খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক শ্রীবাস্তব পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

তিনি নয়াদিল্লীস্থ অল ইণ্ডিয়া রেডিও স্টেশনের অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর ছিলেন।

শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাঁর দুটি বই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কৃত গ্রন্থ 'বুজ্জো বুজ্জো পুলু' এবং 'টেলিভিশন কথা' ভারতীয় শিশু-সাহিত্যে মূল্যবান সংযোজন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ সাহিত্য আকাদামি পুরস্কার লাভ করেন 'শারদাম্বাজাম' এবং 'ঊষা কিরণলু' গ্রন্থ দুটির জন্য।

শ্রীবাস্তবের আসল নাম ইয়ান্দামুরি সত্যানারায়ণ রাও।

বিদেশী সাহিত্য

উপন্যাসে গুরুবাদ ॥

সম্প্রতি মার্কিনী ঔপন্যাসিক জো দাভিদ ব্রাউন 'গ্লিমস অব্ এ স্ট্রেঞ্জার' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। ভারতীয় গুরুবাদকে আশ্রয় করে উপন্যাসটি লেখা। কয়েক বছর আগে বীট কবিরা ভারতীয় তান্ত্রিক আচারে মুগ্ধ হয়ে গাঁজা-সিদ্ধি প্রভৃতি নেশায় অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করেছিল। অনেকের ধারণা, তাদেরই পরোক্ষ প্রভাবে উপন্যাসটি রচিত। তবে কেউ কেউ এ ব্যাপারে হিপ্পি সম্প্রদায়কে প্রত্যক্ষ উৎসাহদাতা বলে মনে করেন।

হিপ্পি সম্প্রদায়ের প্রায় সব সদস্যই কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক-যুবতী। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করার কথাও তাদের নয়। সম্ভবতঃ পাশ্চাত্ত্য জীবনাচরণের প্রতিক্রিয়ায় এদের আবির্ভাব। ভারতীয় তান্ত্রিক আচার ও বৈষ্ণবীয় মুক্তবিবাহের বিষয়টি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা প্রথমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চান নি। ইদানীং তাঁরাও বিচলিত হয়ে উঠেছেন। জনৈক সমালোচক এই উপন্যাসটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে দুঃখিত মন্তব্য করেছেন, "জননী ভারতবর্ষ বহু ভবঘুরে মানুষকে নিয়ে খেলা করছেন। বীটল আইসার উড ও মিয়া সিনাত্রা এরূপ দুটি নাম। প্রত্যেক বছরই তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।"

এ উপন্যাসের নায়ক পল ফেজ্জার একজন চিত্র-নাট্যকার, দীর্ঘদেহী, নীল-চক্ষুবিশিষ্ট, প্রৌঢ় ও ভবঘুরে প্রেমিক পুরুষ। জীবনের বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে সে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রতি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট হয়। একবার সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসে। এখানে সে ভঙ্গজী নামে একজন ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরুর সন্ধান পায় ও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই সময়ে গুরুদেব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হন। এই আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। মৃত্যুর পূর্বে ভঙ্গজী তার সমস্ত বিশ্বাস ও সাধনাসম্পদ পলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে যান। পলের মনেও তখন নানা জিজ্ঞাসার সূত্রপাত হয়। গুরুর বিধবা পত্নী বলেন, "সাধনার ব্যাপারটি সব সময় ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।"

ব্রাউন এই উপন্যাসটি লেখার আগে 'কিংস গো ফোর্থ' ও 'স্টার্স ইন মাই ক্রাউন' নামে দুটো সাংবাদিকতাশ্রয়ী উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর মতে, এই উপন্যাসটিও অনুরূপ সত্য ঘটনার ভিত্তিতে রচিত।

সমরসেট মম তাঁর 'রেজার্স এজ' উপন্যাসে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ তিনি বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যান। তাঁর তরুণ আমেরিকান নায়কও ভারতে আত্ম-মুক্তির সন্ধান করেছিল। কিন্তু মম কখনো তাঁর উপন্যাসে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কোন ব্যাখ্যা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য সমালোচকেরা ব্রাউনের দুঃসাহসে শুধু বিস্মিতই হন নি, গুরুর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

মানবসভ্যতার পরিণতি ॥

প্রথম মহাকাশচারী গাগারিন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, 'কী সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী!' তারপর মহাকাশ অভিযানের বিপুল মহড়ায় রাশিয়া-আমেরিকা বহুবার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু তাতে মানবসমাজের পারস্পারিক সৌহার্দ বিন্দুমাত্রও বাড়ে নি। বরং পূর্ব-পশ্চিমের বাঘা বাঘা রাজনীতিকের দল কখনো আদর্শের খাতিরে, কখনো ব্যক্তিস্বার্থের প্রয়োজনে পৃথিবীকে হাজার টুকরো করার আয়োজনে মেতেছেন। মিস বারবারা ওয়ার্ড তার 'স্পেস শিপ আর্থ' নামক গ্রন্থে এই অতিসাম্প্রতিক সমস্যাটির প্রতি সমগ্র মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লন্ডনের 'হ্যামিশ হ্যামিলটন' কোম্পানী গ্রন্থটির প্রকাশক।

মিস বারবারার মতে, মানবসমাজ এখন ভারসাম্যহীন এক উত্তেজিত অবস্থায় বাস করছে। আমাদের সামাজিক ঐক্যবোধ বর্তমানে নৈতিক-ঐক্যবোধের ধারণা থেকে বহু দূরবর্তী। আমরা পরস্পর এক সঙ্গে থেকেও কেউ কারো আত্মীয় নই। পৃথিবীতে আর জাতীয়তাবাদের উপযুক্ত মর্যাদা নেই। এখন পৃথিবী মানবজাতির কাছে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। মহাকাশ অভি-যানের পর আমাদের ক্ষুদ্রতা বোধও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুল পরিমাণে।

লেখিকার মতে, মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম কোন জাতিই আর প্রতিবেশীর সামান্য ক্ষতিও করতে পারছে না। বৃহত্তম শক্তিসমূহের পাশাপাশি ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র-গুলিও গড়ে উঠেছে। তথাপি, তা দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সমাজসংহতি তৈরী হচ্ছে না। হয়তো, দু একটি কঠিন বিপর্যয়ের ধাক্কা খেলে আমরা সকলেই প্রতিবেশী হয়ে উঠতে পারতুম। এখনো, আমরা সকলেই এক একটি বিচ্ছিন্ন সমাজের বাসিন্দা।

তারপর তিনি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রেক্ষাপট ও নাগরিক জীবনা-চরণের চারিত্রিক সাদৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, এমন কি সর্বাত্মক ধ্বংস-কামীতায়ও আমরা নিকটবর্তী। শুধু আমরা এখনো উপলব্ধি করতে পারি নি যে আনবিক ধ্বংসলীলায় কেউ বাঁচতে পারে না—কেউ বাঁচবে না—সাম্যবাদী ও অসাম্যবাদীদের সেখানে বাছ-বিচার নেই, ক্রীতদাস কিম্বা স্বাধীন মানুষের মস্তকেও তার অভিশাপ সমানভাবে বর্ষিত হবে। তখন সকলেই নৈরাজ্যের ঐক্যে সহোদর হতে পারে।

সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। মার্কস সম্পর্কেও তিনি রহস্যজনক মন্তব্য করেছেন। তবু তাঁর সিদ্ধান্ত, এই পৃথিবীতে বাঁচতে হলে পরস্পরের সহযোগিতা চাই। কেননা, বিভেদ চিরকাল ধ্বংসেরই অনুগামী। তিনি লিখে-ছেন, আমরা মাটির একটি ছোট্ট প্রান্তদেশের ওপর নির্ভর করে আছি, আর জীবনের জন্যে রয়েছে আবহমণ্ডলের বহুত্তম লেফাফা। উভয়েরই ধ্বংস হতে পারে। সে জন্যেই আমাদের নিজের সম্পর্কে ভাবতে হবে। আমরা সকলেই একটি ক্ষুদে জাহাজের যাত্রী। এখন সংযত আচরণই পুনরুজ্জীবনের একমাত্র শর্ত।

তরুণ গল্পকার এড়ুয়ার্ড শিম

সোভিয়েত দেশের তরুণ গল্পকারদের মধ্যে এড্য়ার্ড শিম একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নাম। তাঁর জন্ম হয় ১৯৩০ সালের লেনিন-গ্রাদে। যুদ্ধের সময়ে বিধ্বস্ত শহর থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এবং তিনি মানুষ হন একটি অনাথ আশ্রমে।

যৌবনে লেনিনগ্রাদে ফিরে আসেন একজন শ্রমিক হিসেবে। এখানে তিনি একটি স্থপতি বিদ্যালয়ে পড়াশোনাও করেন। তারপর তিনি একটি অঙ্কন ব্যুরোতে ও পরে সামরিক বিভাগে কাজ করেন।

১৯৫১ সালে তাঁর প্রথম বই 'সামার অন দি কার্বা' প্রকাশিত হয়। বইটি ছোট-দের জন্যে লেখা। গত ১৫ বছরে তাঁর দশটি গল্পের বই বেরিয়েছে। ১৯৬৩ তাঁর 'দি কুইন অ্যাণ্ড হার সেভেন ডটার্স' নামে একটি গল্প ইংরেজীতে অনূদিত হয়। গত জানুয়ারী মাসে তাঁর 'দি বয় ইন দি ফরেস্ট' উপন্যাসটি মস্কো থেকে ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন বই

পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ

ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রকাশক— রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা-৭। দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

বৈষ্ণব পদাবলী ও রাধাকৃষ্ণের দ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অনেক আছে, কিন্তু পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখিত গ্রন্থ বোধ করি দুর্লভ। এছাড়া যে কোনো আলোচনার মধ্যে যদি ভক্তিরসের প্রাধান্য থাকে এবং যুক্তি বিচার গৌণ হয় তাহলে তার ভক্তিনিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী মূল বক্তব্যের অনেকখানি হানি ঘটায়। এই বিষয়ে সহজ জীবননির্ভর এবং সাহিত্যরস সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর 'পদাবলীর তত্ত্ব সৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটিতে লেখক সনাতন শাস্ত্রীয় দৃষ্টির সঙ্গে সাম্প্রতিক কবিদৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতিতে তত্ত্বসৌন্দর্য প্রকাশ পরিচয়ের একটা রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন।

রাধা-কৃষ্ণ মূর্তির সনাতন ও সর্বভারতীয় রূপ সম্পর্কিত প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক রাধাতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং সেই সূত্রে রাধা ও কৃষ্ণতত্ত্ব, উপনিষদ ও রাধাকৃষ্ণ, পুরাণ ও রাধাকৃষ্ণ, তন্ত্র ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে বৈষ্ণবতা ও রবীন্দ্রনাথ, হ্লাদিনী শক্তি ও রবীন্দ্রনাথ এবং পদাবলী ও রবীন্দ্র কাব্যের সাহিত্যমূর্তি। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়টি বিশেষ মূল্যবান। গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে কবিচিত্তে শাশ্বত-নারী রাধা, রাধা প্রেমের বিচিত্ররূপ ও রবীন্দ্র কবিপ্রতিভায় তার প্রতিফলন এবং পদাবলীর রাধাভাব ও রবীন্দ্র কাব্যের মিষ্টিসিজম প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছেন তা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে অনুপম। এই বক্তব্য নিয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন, কিন্তু লেখকের কৃতিত্ব যে অল্প কথায় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তিনি সহজ ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা তত্ত্বের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, লেখক সেই দুরূহ কর্ম অনায়াসে সাধন করেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন। ইদানীং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনা বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার বেশীর ভাগ বইয়েরই আঙ্গিক এবং বক্তব্য প্রায়ই একের পুনরুক্তি নরত ছক বাঁধা স্কুল-পাঠ্য ব্যাখ্যার সমতুল। লেখকের রচনার মধ্যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় আর সেই কারণেই তাঁর এই গ্রন্থটি সাফল্য লাভ করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রভারতীর উপাচার্য লিখেছেন—"এইভাবে এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের দুটি মধুরতম ধারার একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে বঙ্গ সরস্বতীর জন্য এক অভিনব নৈবেদ্য রচনা করেছেন।" এই উক্তিটির মধ্যেই গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বর্তমান।

বিষুবে রৌদ্রের ডালপালা : (কাব্যগ্রন্থ)—তুলসী মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। ১৯, পণ্ডিতিয়া টেরেস। কলকাতা—২৯। প্রাপ্তিস্থান : সিগনেট বুক শপ। দাম : আড়াই টাকা।

তুলসী মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখছেন বেশ কিছুকাল ধরে। তাঁর কবিতা আপাত শ্রমশীল মার্জিত মনের বহিঃপ্রকাশে স্বতন্ত্র। পূর্বসূরীদের বাঁধা-ধরা পথ ধরে তিনি এগোননি। শব্দ ব্যবহারে ও বাক্যগঠনে তিনি কিছুটা গদ্যধর্মী, কিছুটা কর্কশ, কিন্তু ভেতরে ভেতরে রোম্যান্টিক। স্মৃতিচারণা ও প্রতীকী ব্যবহার তাঁর কবিতার আবহ-নির্মাণের প্রধানতম উপকরণ। সর্বপ্রকার আবেগধর্মী ভাবালুতাকে বর্জন করে প্রায়শ তিনি আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্ম-বিশ্লেষণে বিব্রত। মাঝে মাঝে এঁকে বিপর্যস্ত নাবিকের মতো মনে হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে মোট চৌত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি কবিতাই তাঁর আত্ম-দর্শনের হাহাকারে মুখর। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটটি সুন্দর ও ভাবব্যঞ্জক। তরুণ কবিদের কাছে তাঁর কবিতা সমাদৃত হবে।

নদী জপমালা (ভ্রমণকাহিনী)—**জ্যোতি চৌধুরী। ছাত্রশিক্ষা নিকেতন। ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : ছয় টাকা।**

'নদী জপমালা' — একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল গ্রন্থ। গ্রন্থটির ভূমিকায় লেখক প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুচ্চারণে রোমান্টিক আর্তি প্রকাশ করেছেন। আমাদের ধর্ম ও সত্যানুসন্ধানের মৌল প্রেক্ষাপটের কথাটি লেখক বিস্মৃত হননি। গঙ্গা ও যমুনার উৎসস্থলে তিনি গিয়েছেন কিছুটা বিশ্রাম ও মুক্তির আশায়, কিছুটা পর্যটক ও আবিষ্কারকের নেশায়। লেখকের বর্ণনাগুণে শুধু তাঁর যাত্রাপথটিই নয়, সমগ্র পরিবেশটিই আশ্চর্য সজীব ও হৃদ্য হয়ে উঠেছে। কোনপ্রকার বিরূপতা কিম্বা তিক্ততা নিয়ে তিনি তাঁর পথে অগ্রসর হননি। বরং মানবীয় ভালবাসা ও রসবোধ নিয়ে তিনি প্রকৃতি-পর্যটন করেছেন। তাঁর যাত্রা সার্থক হয়েছে।

সতেরোটি এক রঙ ও দুইটি বহু রঙ ছবি এবং ব্রহ্মপুত্রীর দিকনির্দেশক একটি মানচিত্র গ্রন্থটির মূল্যবৃদ্ধির পরিচায়ক। পরিশিষ্টে ভ্রমণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদের ও সাজ-সরঞ্জামের একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। লাইনোতে ছাপা। প্রচ্ছদ মনোরম।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

উত্তরসূরী (১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ও ১৫শ বর্ষ ১ম সংখ্যা)। **সম্পাদক— অরুণ ভট্টাচার্য। ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলকাতা—৫০। দাম— দু' টাকা।**

উত্তরসূরীর এই যুগ্ম সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ হলো শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেকগুলি মূল্যবান আলোচনা। শরৎ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অমিয়ভূষণ মজুমদার, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ পোদ্দার, সুধীন্দ্র দাশগুপ্ত, গুরুদাস ভট্টাচার্য, অজয় দাশগুপ্ত ও অরুণ ভট্টাচার্য। তাছাড়া, জোসেফ উড ক্রচের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কবিতা লিখেছেন মণীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, লোকনাথ ভট্টাচার্য রত্নেশ্বর হাজরা, তুলসী মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

সীমান্ত (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—**সম্পাদক : তরুণ সান্যাল ও মৃগাঙ্ক রায়। পি৩৮৮ বাঁশদ্রোণী পার্ক। বাঁশদ্রোণী, ২৪ পরগণা। একটাকা।**

সীমান্তের বর্তমান সংকলনে কবিতা লিখেছেন, বিষ্ণু দে, মৃগাঙ্ক রায়, চিত্ত ঘোষ, আশিস সান্যাল, চিন্ময় গুহঠাকুরতা, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, শঙ্কর রায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত ও তুষার চট্টোপাধ্যায়। একটি কাব্য নাটক লিখেছেন মণীন্দ্র রায়। আলোচনা লিখেছেন রাম বসু ও তরুণ সান্যাল।

অন্বিষ্ট (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা)—**সম্পাদক : অরুণ চক্রবর্তী, দেবু কস্তুরী, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমিতাভ চক্রবর্তী। ৯/১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা—৩। দাম : দেড় টাকা।**

অন্বিষ্ট-র বর্তমান সংখ্যায় গল্প ও নিবন্ধ লিখেছেন—অজিত মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়চৌধুরী ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। কবিতা লিখেছেন—পবিত্র মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল দেব, অরুণ চক্রবর্তী, অমিতাভ চক্রবর্তী, গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং আরো অনেকে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এসপানিওলদের কাছে যিনি গানাদো আমাদের সেই ঘনরাম দে সটোর কাছে সব শোনে যা বলেছিলেন তা কি সত্যিই নেহাৎ অর্থহীন হেঁয়ালি ছাড়া আর কিছু নয় ? না, তার ভেতর অন্য কোনো গূঢ় ইঙ্গিত ছিল ?

পাছে ভেঙে যায় ভয়ে একটা স্বপ্নকে আমি পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়েছি কাপিতান।—তিনি বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বলেছিলেন—আর সেই পাহারা দিতে গিয়ে ভীরাকোচা সত্যি কোথায় নামতে পারেন সন্ধান নিয়েছি তারও।

দুটো উক্তিরই ওপর থেকে বিচার করলে কোনো মানে আছে বলে মনে হয় না। শুধু যেন একটু ধোঁয়াটে ধাঁধা তৈরী করবার জন্যেই তা বলা।

'গানাদো' মানে এসপানিয়ার বেদেদের ওরকম একটু আধটু মিথ্যে হেঁয়ালি দিয়ে বাহাদুরী করা যে স্বভাব তা দে সটোর অজানা ছিল না। শেষ পর্যন্ত কথা দুটোকে তাই তিনি তেমন আমল দেন নি। গানাদোর কাছে এসপানিওল সৈনিকদের আরমেরিয়া থেকে ভাণ্ডার বদলে নতুন তলোয়ার চাওয়ার ব্যাপারটা যা শুনেছেন তা কতখানি ঠিক যাচাই করাই তাঁর কাছে বেশী জরুরী মনে হয়েছে।

যাচাই করে যা জেনেছেন তা সত্যিই তাঁকে রীতিমত ভাবিত করে তুলেছে। একজন দুজন নয় প্রায় সাতজন সৈনিক এ ক'দিনে নতুন তলোয়ার অস্ত্রাগার থেকে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা খোদ কাপিতান জেনেরাল পিজারোর কানে তোলবার মত। তবে তার আগে আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

সেই চেষ্টায় অস্ত্রাগারের ভাণ্ডারীর কাছে নতুন তলোয়ার যারা বদলী নিয়েছে দে সটো তাদের নাম জানতে চেয়েছেন। কিন্তু সঠিকভাবে তা জানা সম্ভব হয়নি। সত্যিকারের কেতাদুরস্ত আরমেরিয়া ত' নয়, নেহাৎ ঢিলে ঢালা ব্যাপার। সৈনিকদের নিজেদের সঙ্গে যা থাকে তার ওপর বাড়তি অস্ত্রশস্ত্রের একটা সঞ্চয় অভিযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে বওয়া হয়। সকলে যার যখন যা দরকার হয় তা থেকে নেয়। নামকা ওয়াস্তে একজন ভাঁড়ারী আছে, সে খাতাপত্র কিছু রাখে না বললেই হয়।

আর খাতাপত্র থেকে পাওয়াই বা যাবে কি! বেশীর ভাগই ত মুখখু। নাম লেখার বদলে ঢেরা কাটে মাত্র। সেরকম কয়েকটা ঢেরাই শুধু খাতায় পাওয়া গেছে। সই দিতে যারা জানে তারাও ধরা না পড়বার জন্যে ঢেরা কেটেছে কিনা কে জানে।

অস্ত্রাগারের ভাঁড়ারীর নাম সোটেলো। এই অভিযানেই প্রথম যোগ দিয়েছে। একটু আনাড়ি। দে সটোর তাগাদায় তলোয়ার যারা নিয়েছে তাদের একজনের নাম অতি কষ্টে সে মনে করে বলতে পেরেছে। দে সটোর ধমকে তার অপ্রস্তুত ধরণধারণে বোঝা গেছে যে এ' কদিন লুটপাটের উত্তেজনায় সে নিজেও এমন মেতে ছিল যে আর কোনো কিছুর হুঁস রাখে নি।

একটিমাত্র যে নাম পেয়েছেন দে সটো তাই দিয়েই শুরু করেছেন তাঁর সন্ধান। খবর দিয়ে সৈনিকটিকে ডেকে পাঠিয়েছেন অতিথিশালায় তাঁর নিজের ঘরে।

সৈনিকের নাম গাব্রিয়েখো। ঠিক কাবালিয়েরো মানে ভদ্রবংশের না হলেও একেবারে হেঁজিপেঁজি ইতর সাধারণ থেকে সেনাদলে নাম লেখায় নি। লম্বাচওড়া বলিষ্ঠ চেহারায় একটু বড় ঘরোয়ানার ছাপ আছে। চালচলনে একটা উগ্র দাম্ভিকতাও। শরীরের শক্তি সত্যিই অসুরের মত, অন্য সৈনিকরা দুচারবার ঠেকে শিখে তাকে একটু সমীহ করে চলে বলেই আস্ফালনটা একটু বেশী।

দে সটো অনেক ওপরওয়ালা কাপিতান। তবু গাব্রিয়েখো তার সামনে একটু যেন ব্যাজার মুখেই এসে দাঁড়িয়েছে। সে নিজে অন্য একজন সেনাপতির অধীন বলেই বোধহয় দে সটোর ডাকে আসতে বাধ্য হওয়াটা তার পছন্দ নয়।

বিরক্তিটুকু দে সটোর নজর এড়ায় নি। কিন্তু তখন অন্য একটা কারণে ভেতরে ভেতরে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। বাইরে তবু সেটা দমন করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যথাসাধ্য শান্তভাবেই,—তোমার নাম ত গাব্রিয়েখো ?

হ্যাঁ,—দে সটোকে যেন কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই অতিরিক্ত পরিচয় দিয়ে বলেছে,—দে কান্দিয়া আমাদের দলপতি।

অযাচিত এ অতিরিক্ত খবরটুকু দেওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত নিশ্চয় এই যে দলপতি ছাড়া আর কারুর কোনো সৈনিককে এভাবে তলব করা ঠিক দস্তুর নয়।

দে সটো এ ইঙ্গিত বোঝেন নি এমন নয়, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে এবার একটু কঠিন গলায় জানতে চেয়েছেন—তুমি

আরমোরিয়া থেকে নতুন তলোয়ার নিয়েছ কেন?

নতুন তলোয়ার! প্রথমটায় চমকে ওঠার পর এক মুহূর্তের মধ্যে গাল্লিয়েথোর মুখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে।

কে বললে আমি নতুন তলোয়ার নিয়েছি। গলার স্বরেই বোঝা গেছে যে বেশ একটু কষ্ট করেই তাকে নিজেকে সামলাতে হচ্ছে।

আমি বলছি!—গাল্লিয়েথোর দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বলেছেন দে সটো,— তাড়াতাড়ি জবাব দাও আমার প্রশ্নের। নতুন তলোয়ার কেন তোমার দরকার হল?

গাল্লিয়েথো খানিকক্ষণ চুপ করে থেকেছে। তার চোখ মুখের ভাব দেখে এমন সন্দেহও একবার হয়েছে যে সে হয়ত হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে সেনাদের অবশ্য বাধ্যতার অলঙ্ঘ্য আইনটাই ভেঙে বসবে।

কিন্তু তা সে করে নি। সম্ভবতঃ প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝেই এবার অন্য ভঙ্গি নিয়েছে। একটু চাপা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যেন সহজভাবে জবাব দিয়েছে,—নতুন তলোয়ার যে জন্যে দরকার হয় সেই জন্যেই নিয়েছি। আগেরটা ভেঙে গেছে বলে।

আগেরটা ভাঙল কি করে? দে সটোর সেই বজ্রগম্ভীর স্বর।

গাল্লিয়েথো আবার খানিক চুপ করে থেকেছে। বোধহয় ভাববার সময় নেবার জন্যেই। জিভের ডগায় তার যে উত্তরটা আপনা থেকে উঠে এসেছে, সেটা খুব বিনীত বোধহয় নয়। সেটাকে একটু বদলে তাই সে প্রশ্নের আকার দিয়েছে।

কি করে ভাঙল তার কৈফিয়ত দিতে হবে? আগে ত কখন হ'ত না।

আগে না হলেও এখন দিতে হবে। গাল্লিয়েথো সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে দে সটো কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছেন, —আগে কখনো তোমার তলোয়ার ভেঙেছে কি?

না, ভাঙে নি। গাল্লিয়েথোর গলায় ঔদ্ধত্যটা সম্পূর্ণ চাপা থাকে নি, ভেঙেছে এইবারই। তলোয়ার কি কারুর কখনো ভাঙে না!

নিশ্চয়ই ভাঙে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলেছেন দে সটো,—সুতরাং কি করে ভেঙেছে বলতে তোমার এত আপত্তি কেন!

আপত্তি!—গাল্লিয়েথো যেন অবাক হয়ে অস্বীকার করে বলেছে—আপত্তি থাকবে কেন? ব্যাপারটা বলার মত কিছু নয় তাই বলতে চাইনি। খোলা তলোয়ার নিয়ে এ দেশী কটা হতভাগাকে বরুণামহল থেকে তাড়িয়ে বার করছিলাম। হঠাৎ ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ায় তলোয়ারের ফলাটা একটা পাথরের থামে লেগে দু টুকরো হয়ে যায়।

কৈফিয়তটা বেশ সাজানো গোছানো। খুঁত ধরবার কিছু নেই।

সেই জন্যেই কি দে সটো চুপ করে গিয়ে শুধু একটু ভ্রুকুটিভরে গাল্লিয়েথোর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তা যে নয় তা তাঁর পরের কথাতেই বোঝা যায়। তীক্ষ্ণ তীব্র বিদ্রূপের স্বরে গাল্লিয়েথোকে শুধু নয় ঘরটাকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তিনি বলেন,—আর তাইতেই তোমার কপালের মাঝখানে ওই দুটো ঢ্যারা দাগ আপনা থেকে কেটে বসল! খোলো তোমার ও মাথার বাহারে ফেটি। দাগ দুটো আমি ভাল করে দেখতে চাই।

একেবারে চুপ হয়ে গেছে এবার গাল্লিয়েথো। আর মুখ চোখ তার রাগে লাল নয় বেশ একটু ফ্যাকাশে।

মাথার বাহারে ফেটি খোলবার জন্যে হাত সে তোলে নি বটে কিন্তু দে সটোর কথার কোনো প্রতিবাদও করে নি। নীরবে ফ্যাকাশে মুখে কেমন একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

কই? খুলবে তোমার মাথার ফেটি! না তার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে?

দে সটোর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গাল্লিয়েথো আর দেরী করে নি। মাথার চারিধারে জড়ানো ইংকা নরেশের 'বোর্লা'র ধরনের ফেটিটা ধীরে ধীরে খুলে ফেলেছে। ফেটিটার নিচে সামান্য যে কাটাটুকু লক্ষ্য করে দে সটো সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন, তা এবার স্পষ্ট দুটি ঢ্যারার মত কাটা দাগ বলে বোঝা গেছে। দে সটোর অনুমান সুতরাং ভুল হয় নি।

—কাটা দাগ তোমার কপালে হল কি করে? কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো,—কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না। বলো কেউ কি এ দাগ দিয়েছে?

হ্যাঁ দিয়েছে! গাল্লিয়েথোর গলা দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বার হয়েছে এবার। তবে তার জ্বলন্ত রাগের লক্ষ্য এখন আর দে সটো নন।

তখুনি পেলে যেন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এমনি হিংস্র আক্রোশে সে আবার বলেছে,—এ যার কাজ, সে যদি শয়তানের খাস সাগরেদ কি স্বর্গের দেবদূতও হয় তবু এই দাগের শোধ আমি নেবই। তলোয়ারের ডগায় তার দুটো চোখ আমি উপড়ে নেব। একটা একটা করে হাতের পায়ের সমস্ত আঙুল আমি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাটব তারপর......

তারপর হাতের সুখ যা করবে তা আরো ভালো করে পরে ভেবে নিও। কঠিন হলেও এতক্ষণে তার সঙ্গে একটু কৌতুক মেশানো অবজ্ঞার সুরে দে সটো ধমক দিয়ে গাল্লিয়েথোকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন,—এখন লোকটা কে বলো ত? তোমার তলোয়ারও কি সেই ভেঙেছে?

হ্যাঁ কাপিতান। গাল্লিয়েথো এবার দে সটোর যোগ্য সম্মান দিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে বলেছে,—তলোয়ার সে-ই ভেঙেছে। তা যদি না ভাঙত, যদি তলোয়ার নিয়ে আমার সঙ্গে লড়ত......

তাহলে তার দুটো চোখ তুমি উপড়ে নিতে তা জানি। আবার বাধা দিয়ে গাল্লিয়েথোকে থামিয়ে দে সটো বলেছেন,—কিন্তু লোকটা কে তাই আগে জানতে চাই।

তা আমি জানি না কাপিতান। সে কোন জাতের কি রকম মানুষ তাও আমি জানি না।

জানো না কি রকম! গানাদোর কথা-গুলো মনে করেই বোধহয় দে সটোর গলায় উদ্বিগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠেছে,—যে তোমার তলোয়ার ভাঙল, তোমার কপালে দাগ দিল, সে লোকটার কিরকম চেহারা তাও বলতে পারো অন্ততঃ!

না, তাও পারি না। ক্ষুব্ধভাবে মাথা নেড়েছে গাল্লিয়েথো, —তার মুখ আমি দেখতে পাইনি। শুধু দেখেছি তার মুখোশ।

শুধু মুখোশ দেখেছ? শাদা মুখোশ? দে সটোর গলাটা আপনা থেকে ধরে গিয়ে যেন বুজে এসেছে,—আর তার ঘোড়া যা ছিল তার রঙও শাদা?

হ্যাঁ কাপিতান! সংশয়বিমূঢ়তার সঙ্গে তীব্র আক্রোশ মেশানো স্বরে বলেছে গাল্লিয়েথো,—রাতের অন্ধকারে যেন প্রেতমূর্তি বলে মনে হয়।

ভূত প্রেত বা সত্যি মানুষ যাই হোক, রাত্তিরবেলা তাকে তুমি দেখেছ তাহলে?

দে সটোর কণ্ঠস্বর আবার তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ তলোয়ার ভেঙে তোমার কপালেই বা সে দাগ দিতে গেল কেন। আচমকা অকারণে কি তোমার ওপর এসে চড়াও হল?

গাল্লিয়েখোর উত্তর দিতে কয়েক মুহূর্ত এবার দেরী হয়েছে।

অধৈর্যের সঙ্গে দে সটো তাকে ধমক দিতে যাচ্ছেন এমন সময় নিজে থেকেই হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠে সে মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছে। লজ্জাসঙ্কোচের বালাই না রেখে বিষঢালা গলায় বলেছে,—কারণ যদি বলতে হয় তাহলে একটাই ত' খুঁজেপেতে ধরা যায়। দিনের বেলা জানলায় একটা মুখ দেখে শহরের একটা বাড়ি চিহ্নিত করে রেখেছিলাম। রাত্রে সে বাড়িতে হানা দিয়ে দরজা ভেঙে বার করে আনছিলাম মেয়েটাকে। ঘোড়াটা বাইরে বাঁধা ছিল। আটকাতে যে দু চারটে হতভাগা এসেছিল তাদের হাত-পাগুলো উড়িয়ে দিয়ে দামী মালটা টেনে হিঁচড়ে ঘোড়ার পিঠে তুলতে যাব এমন সময় ঘোড়াটাই চিঁহি করে বিকট ভয়ের ডাক ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে তখন চেয়ে দেখি ওই এক অদ্ভুত মূর্তি। শাদা ঘোড়া শাদা পোশাক মুখে শাদা মুখোশ। এর আগে কানাঘুষায় এরকম মূর্তির কথা শুনেছিলাম। বিশ্বাস করিনি। এবার স্বচক্ষে দেখলাম। ভয় আমি কিন্তু পাই নি। মওড়া নেবার জন্যে আমি তখন প্রস্তুত।

হ্যাঁ তুমি খুব সাহসী সবাই জানে।—তিক্ত গম্ভীর স্বরে বলেছেন দে সটো,—কিন্তু এদেশের লোকেদের ওপর হামলা করা, তাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা যে গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা কি তুমি জান না!

অপরাধ বলে ঘোষণা! কথাটা নেহাৎ আজগুবি মনে হয়েছে বলে এবার দে সটোর মুখের ওপরই হেসে উঠতে গাল্লিয়েখোর বাধে নি,—আমরা সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে জীবনমরণ তুচ্ছ করে এদেশে এসেছি কি গির্জের ব্রহ্মচারী পাদ্রী হব বলে? এ দেশের লোকের গায়ে যাদুর হাত বুলোব, মেয়েদের দেখলে চোখ বন্ধ করে থাকব, এই আমাদের কাছে আশা করেন? না কাপিতান। ও সব ঘোষণার মানে আপনিও জানেন আমরাও জানি। লোক-দেখানো ও সব ভড়ং একটু করতে হয় বলে সত্যি কিছু দাম ওর আছে না কি!

গাল্লিয়েখো যা বলেছে তাই যে বেশীর ভাগ সৈনিকের মনের কথা তা জেনে দে সটো তীব্র প্রতিবাদ আর কিছু করতে পারেন নি। সামান্য একটু ভর্ৎসনার সুরে শুধু বলেছেন—পাদ্রী হতে কাউকে বলা হয়নি কিন্তু এ দেশের মানুষের ওপর যা খুশী অত্যাচার ত করতে পারো না। জন্তু-জানোয়ার হলেও তা করা যায় না।

এরা জন্তু-জানোয়ারের অধম। বেপরোয়া হবার পর ক্রমশঃ যেন মনের আর গলার জোর পেয়ে বলেছে গাল্লিয়েখো,—এদের ওপর অত্যাচারের আবার জবাবদিহি আছে নাকি! তার জন্যে যদি ওই মূর্তি দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ভূত, প্রেত, শয়তানের বাচ্চা যাই হোক তার সঙ্গে আবার আমার মোকাবিলা হবেই, আর তখন শোধ কি করে নেব তা আমি জানি।

কিন্তু শোধ নেবার দরকারই বা হচ্ছে কেন? তীব্রভাবেই বিদ্রূপ করে বলেছেন দে সটো,—প্রথম দেখা হবার সময় কোথায় ছিল তোমার বীরত্ব। তখন তলোয়ারই বা ভাঙল কেন আর দাগই বা পড়ল কেন কপালে? তখন লড়তে পারো নি?

না, পারি নি বলেই ত আফশোষ। প্রচণ্ড জ্বালা ফুটে উঠেছে গাল্লিয়েখোর গলায়,—শয়তানি চালাকিতে আমায় ঠুঁটো পঙ্গু করে দিয়েছে আগেই। তলোয়ার আমি ধরতেই পারি নি।

তার মানে! এবার সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো,—তোমার সে মূর্তির সঙ্গে লড়াই-ই হয় নি? কি শয়তানী চালাকি সে করেছে?

গাল্লিয়েখো এবার যা বিবরণ দিয়েছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে দে সটোর।

গাল্লিয়েখো বলেছে শাদা মুখোশধারী মূর্তিকে দেখেই হুঁশিয়ার হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। শাদা মুখোশধারীও তখন তার ঘোড়া থেকে নেমেছে। কোমরে ঝোলানো তলোয়ার তখনও কিন্তু সে খুলে হাতে নেয় নি। গাল্লিয়েখোর হাতে তখন খোলা তলোয়ার। সেই সুবিধেটা কাজে লাগাবার জন্যে গাল্লি-য়েখো মূর্তিটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে এবার ছুটে যায়। মূর্তিটা খাপ থেকে তলোয়ার খুলতে খুলতে গাল্লিয়েখো তাকে বেকায়দায় পেয়ে যাবে। কিন্তু সে সুযোগ আর মেলে না। হঠাৎ দড়ির মত একটা বাঁধনে জড়িয়ে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তলোয়ারটা ছিটকে যায় হাত থেকে। তলোয়ারটা কুড়োবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে টের পায় যে অদ্ভুত একটা দড়ির ফাঁসে হাত পা তার জম্পেস করে বাঁধা হয়ে গেছে। এ বাঁধনটা যে মূর্তিটারই কারসাজি তা বুঝতে দেরী হয় না। তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে যাবার সময় মূর্তিটাকে অন্ধকারে মাথার ওপর হাত তুলে কি যেন একটা করতে দেখেছিল। কিন্তু সেটা যে এই শয়তানি ফাঁস ছোড়া তা কল্পনা করতে পারে নি।

রাগে সমস্ত শরীর জ্বললেও তখন কিছু করবার নেই। হাত পা বাঁধা পঙ্গু অবস্থায় শুধু চেয়ে দেখতে হয় যে শাদা মুখোশ ঢাকা মূর্তিটা এগিয়ে আসছে।

মূর্তিটা কাছে এসে প্রথমে গাল্লিয়েখোর তলোয়ারটা কুড়িয়ে নেয়। তাই দিয়ে তাতেই ঘোড়ার বাঁধনটা প্রথমে কেটে সেটাকে ছুটিয়ে দেয় খোলা প্রান্তরে। তারপর তলোয়ারটা নিয়ে গাল্লিয়েখোর কাছে এসে দাঁড়ায়।

যার জন্যে এত কাণ্ড সেই মেয়েটা ভয়েই এতক্ষণ বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে সাড় ফিরে পেয়ে সে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে তার বাড়ির দিকেই ছুটে পালায়। তলোয়ারটা তুলে সে দিকে দেখিয়ে মূর্তিটা হঠাৎ তলোয়ারটা গাল্লিয়েখোর কপালের ওপর দুবার কাঁপায়। গাল্লিয়েখো একটু অস্ফুট চিৎকার না করে উঠে পারে না। চিৎকারটা শুধু কপালের কাটার জ্বালায় জন্যে নয় অক্ষম রাগের জন্যেও বটে। তার চোখের ওপরই মূর্তিটা তার তলোয়ারটা হাঁটুর ওপর দুমড়ে এক ঝটকায় তখন ভেঙে ফেলেছে। ভাঙা টুকরোগুলো মাটির ওপর দূরে ছুঁড়ে দিয়ে মূর্তিটা তারপর তার শাদা ঘোড়ায় চড়ে চলে যায়।

মূর্তিটা আর তার শাদা ঘোড়া তাহলে তুমি স্পষ্ট দেখেছ? গাল্লিয়েখোর বিবরণ শেষ হবার পর দে সটো তাঁর কাছে সবচেয়ে যা অবিশ্বাস্য সেই বিষয়টা সম্বন্ধেই আগে প্রশ্ন করেছেন।

হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছি কাপিতান। বলেছে গাল্লিয়েখো,—আর দ্বিতীয়বারও দেখব বলে আশা রাখি।

কিসের ওপর এ আশা? সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করেছেন দে সটো।

সত্যিই এদেশের মানুষের সহায়, অবলা সরলার বিপদতারণ হ'লে মানের দায়ে সে মূর্তিকে যাতে আসতে হয় সেই ব্যবস্থা করছি বলে। হিংস্র আনন্দের সঙ্গে যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে বলেছে গাল্লিয়েখো, আমার হাত-ফসকানো সুন্দরীকে এখন কোথায় লুকোন হয়েছে তার পাকা খবর পেয়েছি। সেখান থেকেই তাকে জ্যান্ত বা মরা লুঠ করবই। মুখোশওলার সঙ্গে মোলাকাৎ সেইখানেই হবে আশা করছি।

শোনো গাল্লিয়েখো! অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন দে সটো,—তোমায় আমি সাবধান করে দিচ্ছি আগে থাকতে। তোমার বিরুদ্ধে এরকম কোনো অত্যাচারের নালিশ যদি আমার কানে আসে তাহলে আমি নিজে হাতে তোমায় কোতল করব।

তাই করবেন। কিন্তু আপনার কানে নালিশ এলে ত!— গাল্লিয়েখো এখন একেবারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে বলেছে,—নালিশ করতে আসছে কে?

জবাবে কিছুই যে বলবার নেই তা বুঝে দে সটোকে বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে। সত্যিই গাল্লিয়েখোকে এতক্ষণ যে জেরা করেছেন তাই যথেষ্ট, তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করবার মত কোনো অভিযোগ ত' নেই। এই কাক্সামালকা শহরের নিরীহ অসহায় স্ত্রী-পুরুষের ওপর যত বড় অত্যাচারই সে করুক হাতে হাতে ধরা না পড়লে এসপানিওল সৈনিক বলে কেউ তার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে সাহস করবে না, কোনো শাস্তিও তাকে দেওয়া যাবে না তাই।

শাস্তি কিন্তু গাল্লিয়েখো পেয়েছে। অবিশ্বাস্য শাস্তি। কাক্সামালকা শহরে একদিন সকালে হৈ-চৈ পড়ে গেছে। শহরের বড় রাস্তার ওপরই একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা এক এসপানিওল সৈনিক। তার কপালে শুধু নয় দুই গালেও ঢ্যাঁরা কাটা দাগ।

(ক্রমশঃ)

নিহত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথারের স্মরণে গত ৮ই এপ্রিল মেম্ফিসে যে পদযাত্রা হয় তাতে ডঃ কিং-এর মেয়ে ইয়োলান্দা (বাঁদিক থেকে), পুত্র তৃতীয় মার্টিন ও ডেক্সটার এবং মিসেস কিং-কে দেখা যাচ্ছে।

দেশে বিদেশে

শান্তির আশা আবার স্তিমিত

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে-আশা দপ করে জ্বলে উঠেছিল, দ্বিতীয় সপ্তাহেই সেই আশা আবার স্তিমিত হয়ে এসেছে। কারণ, শান্তির আলোচনা কোথায় বসে হবে—সেটাই এখন পর্যন্ত ঠিক করা যায়নি।

গত ৩১ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন যখন ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ সংকুচিত করবার আদেশ দিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি চান উত্তর ভিয়েৎনাম সরকার ইতিবাচক সাড়া দিয়ে শান্তির জন্যে আলোচনায় বসুক, তখন দুনিয়ার শান্তিকামী [illegible]ানুষ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। [illegible]দিন পরে, ৩ এপ্রিল, হ্যানয়ের কাছ [illegible] ইতিবাচক সাড়া এসেছিল। উত্তর [illegible]নাম জানিয়েছিলেন, বোমাবর্ষণ পুরো-[illegible] বন্ধ না হওয়ায় তাঁরা মোটেই সন্তুষ্ট [illegible] তবু মার্কিন সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত [illegible]ায়ে প্রাথমিক আলোচনা চালাতে তাঁরা [illegible] আছেন। ঘটনার এই গতি লক্ষ্য করে [illegible] অনিশ্চয়তার পর ভিয়েৎনামে শান্তি [illegible]ার একটা বাস্তব সম্ভাবনার কথা [illegible] করে পৃথিবীর মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। হ্যানয়ের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে আলোচনায় রাজী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ তার বরাবরের দাবী ছিল এই যে, উত্তর ভিয়েৎনামের সর্বত্র বোমাবর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি আলোচনা আরম্ভের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত হ্যানয়ের কাছ থেকে সাড়া পাবার পর এগারো দিন কেটে গেছে, তবু প্রাথমিক আলোচনাই আরম্ভ করা গেল না। উত্তর ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে আলোচনার স্থান হিসেবে প্রথমে কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন ও পরে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'র নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন। অপর পক্ষে মার্কিন সরকার যে নামগুলির উল্লেখ করেছিলেন (প্রথমে জেনিভা, পরে ভিয়েণ্টিয়েন, নয়াদিল্লী, রেঙ্গুন ও জাকার্তা) উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারও সেগুলি অগ্রাহ্য করেছেন।

ফলে স্থান নির্বাচনের মতো একটা সামান্য প্রশ্ন নিয়ে পৃথিবীর এই মুহূর্তের সবচেয়ে অগ্নিগর্ভ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের একটা মূল্যবান সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এ-কথা বলা যেতে পারে যে, হ্যানয়ের পক্ষেও পর পর আমেরিকার সবগুলি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা উচিত হয়নি। কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, উত্তর ভিয়েৎনামে আমেরিকাই আক্রমণকারী পক্ষ, এবং সেই আমেরিকা তার আক্রমণ পুরোপুরি বন্ধ করেনি। তা সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েৎনাম আলোচনায় রাজী হয়ে প্রকৃতপক্ষে অর্ধেকের চাইতে অনেক বেশী পথ এগিয়ে এসে আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা তার পক্ষে একটা বিরাট স্বার্থত্যাগ। এখন এই হাতের সঙ্গে হাত মেলানো না-মেলানোর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার। আমেরিকা যদি ঐ দায়িত্ব পালন না করে স্থান নির্বাচনের ব্যাপারেও হ্যানয়ের ওপর নিজের পছন্দ চাপিয়ে দিতে চায়, তবে সেটা খুবই অন্যায় হয়। হ্যানয় তার আগের দাবী থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছে। এখন আমেরিকাও তার মনোভাবকে একটু নরম করবে এটাই প্রত্যাশিত।

দুনিয়ার যে শান্তিকামী জনসাধারণ প্রেসিডেণ্ট জনসনের ৩১ মার্চের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিল, তারা আমেরিকার এই মনোভাব কিছুতেই সমর্থন করতে পারবে না। তাছাড়া তারা আমেরিকার শান্তির আগ্রহের আন্তরিকতা সম্পর্কেও সংশয় প্রকাশ করতে বাধ্য হবে। কারণ স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট জনসনই তাঁর সান অ্যাণ্টোনিও বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, উত্তর ভিয়েৎনাম যদি চায় তাহলে তিনি যে কোন সময় যে-কোন জায়গায় প্রতিনিধি পাঠাতে রাজী আছেন। বর্তমান আচরণের সঙ্গে তাঁর ঐ ঘোষণার কোন সঙ্গতি নেই। তাছাড়া যদি মনে রাখা যায় যে, প্রস্তাবিত আলোচনা রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের প্রাথমিক আলোচনা ছাড়া আর কিছু নয়, তাহলে এই আচরণ আরও বেশী বিসদৃশ ঠেকবে।

এবং স্থান নিয়ে এই কূটনৈতিক লড়াই অনেকাংশে অর্থহীনও বটে। রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে বসে আমেরিকা যদি কম্যুনিস্ট চীনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, তাহলে ওয়ারশ'য় উত্তর ভিয়েৎনামের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আপত্তির কারণ কি?

ক্রান্তি দলে ক্রান্তি?

বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসত্যাগী ব্যক্তিদের দল নিয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয় ক্রান্তি দলের পত্তন হয়েছিল। দলের ইন্দোর অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, এই দল কোন অবস্থাতেই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। প্রকৃতপক্ষে একাধিক রাজ্যে এই দল কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রণ্ট গঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর-প্রদেশে দলের নেতারাই ফ্রণ্টেরও নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

সেই ক্রান্তি দলের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখন পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গত ৭ এপ্রিল নয়াদিল্লীতে দলের কার্যনির্বাহক কমিটির তিনদিনব্যাপী বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, যে-সমস্ত যুক্তফ্রণ্টে কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িক দলের অস্তিত্ব রয়েছে, সেইসব ফ্রণ্ট থেকে ক্রান্তি দলের বেরিয়ে আসা উচিত।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এবং বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ এই প্রসঙ্গে জানান যে, ঐ দুটি রাজ্যে কম্যুনিস্ট ও সাম্প্রদায়িক দলগুলির সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের পদে পদে বাধা পেতে হয়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতেও যে এই ধরনের দলের সঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে তা মনে হয় না।

৮ এপ্রিল বৈঠকে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্য ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেন গণতন্ত্র-বিরোধী ও বিজাতীয় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করে। "চীনের আক্রমণের সুযোগে আমরা দেখতে পেয়েছি যে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক দেশাত্মবোধ এতখানি হারিয়ে ফেলেছিল যে, তারা চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দিতেও রাজী হয়নি।" প্রস্তাবে বলা হয় এই লোকগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

প্রস্তাবের কড়া ভাষা লক্ষ্য করে মনে হয়, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্যে যে-কোন দলের সঙ্গে হাত মেলানোর যে-নীতি ক্রান্তি দল আগে গ্রহণ করেছিল তার পরিবর্তন করা হয়েছে। ক্রান্তি দল এখন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি, জনসংঘ প্রভৃতি দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই বেশী জোর দিয়েছে।

"প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকার শক্তির আবির্ভাবে দুঃখ ও উদ্বেগ" প্রকাশ করে প্রস্তাবে পার্টি ইউনিটগুলিকে ক্ষমতার দখলের রাজনীতির বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রস্তাবের আলোকে ৯ এপ্রিল ক্রান্তি দলের জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটি পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটকে এই নির্দেশ দেন যে, এই ইউনিট যেন একটি পৃথক সত্তা হিসেবে কাজ করে যায়। সেই সঙ্গে সাধারণভাবে এই অভিমতও প্রকাশ করা হয় যে, বিহার ইউনিট যেন বর্তমান পাসোয়ান মন্ত্রিসভায় যোগদান না করে। তবে এই ব্যাপারে শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহকে তিনি যেমন ভালো মনে করেন সেইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

আরেকটি প্রস্তাবে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংঘবদ্ধ হবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। বলা হয় যে, ডান ও বাম প্রতিক্রিয়াশীলদের কার্যকলাপে যে-বিপদ দেখা দিচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে গান্ধীবাদ, গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং দেশের ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাসী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে গভীরভাবে সবকিছু চিন্তা করে দেখতে হবে। এই দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে প্রগতিশীল দলগুলি কিছু তো করতে পারবেই না বরং ডান ও বাম প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করবে।

বৈষয়িক প্রসঙ্গ

স্বয়ম্ভরতার পথে পূর্ব পাকিস্থান ?

সম্প্রতি কতকগুলি তথ্য পাওয়া গেছে যার থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনীতি প্রধান প্রধান বিষয়ে শীঘ্রই স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে সমর্থ হবে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানের স্বয়ম্ভরতা অর্জনের এই আশা যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে ঘটনাটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে পরিগণিত হবে।

পূর্ব পাকিস্থানের অর্থনীতির একটি প্রধান দুর্বলতা এই ছিল যে, তার কয়লা নেই। কিন্তু সম্প্রতি বগুড়াতে কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ায় সেদিক থেকে একটা নতুন আশা দেখা দিয়েছে। বগুড়ার এই কয়লা তোলার জন্য আগামী দশ বছরে এক শ কোটি টাকা লগ্নী করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে, সেখান থেকে যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাবে তাতে পূর্ব পাকিস্থান শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণই হবে না, সে কয়লা রপ্তানীও করতে পারবে।

বগুড়ার কয়লা এবং তিতাস, রসিদপুর ও হরিপুরে সম্প্রতি যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সূত্র আবিষ্কার করা গেছে, এই সব মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্থানের জ্বালানী ও বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আর একটি বড় খবর এই যে, পূর্ব পাকিস্থান আর দুই এক বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত বছর পূর্ব পাকিস্থানে ১ কোটি ৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে। পাকিস্থানের খাদ্যশস্যের চাহিদা ১ কোটি ১২ লক্ষ টন, একথা মনে রাখলেই বোঝা যাবে, আমাদের এই প্রতিবেশী দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যের কত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। "নিবিড় চাষ" পরিকল্পনার ৮৩ হাজার একর জমিতে ধানচাষ করার কথা আছে। এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে পূর্ব পাকিস্থানের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের দ্বারা তার নিজের চাহিদা মিটিয়েও রপ্তানীর জন্য কিছু উদ্বৃত্ত পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাকিস্থান তার বহির্বাণিজ্যের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে তার তিন চতুর্থাংশই আসে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানী থেকে। আর পাকিস্থানের এই পাটের সবটাই আসে পূর্ব পাকিস্থান থেকে। পূর্ব পাকিস্থানের পাটের উৎপাদন গত কয়েক বছরে বেশ বেশ কিছুটা বেড়েছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে যেখানে পূর্ব পাকিস্থানে পাটের ফলন ছিল ৫৩ লক্ষ গাঁট (মেস্তা বাদে) সেখানে ১৯৬৫-৬৬ সালের ফলন ৬৩ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁট। ১৯৭০ সাল নাগাদ এই ফলন ৮৩ লক্ষ গাঁটে গিয়ে পৌঁছবে বলে অশা করা হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্থানে এখন ১৭টি চটকলে মোট ৪২৫০টি তাঁত আছে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় ২২০০টি নতুন তাঁত যোগ করার কথা আছে।

পূর্ব পাকিস্থানে এখন আটটি চিনিকল আছে। এই আটটি চিনিকলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ১২ হাজার টন। এটা পূর্ব পাকিস্থানে চিনির জন্য বর্তমান মোট চাহিদার চেয়ে ১২ হাজার টন বেশী।

পূর্ব পাকিস্থানে লবণের মোট চাহিদা বছরে ৮৩ লক্ষ টন। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সেখানে বছরে লবণের মোট উৎপাদন ৪০ লক্ষ টনের বেশী ছিল না। কিন্তু এখন আর কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্থান তার চাহিদা মিটিয়ে নেওয়ার মত লবণ উৎপাদন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানায় এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলি পেপার মিলে পূর্ব পাকিস্থান বছরে ৫৪ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট তৈরী করছে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ নিউজপ্রিন্ট তৈরী হয় এটা তার চেয়ে বেশী।

পাকিস্থান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য আখতারুদ্দীন একবার দেখিয়েছিলেন যে, পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার বছরে যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেন তার ৬০ শতাংশ আসে তার পূর্বাংশ থেকে অথচ পাকিস্থানের বাজেটে পূর্ব পাকিস্থানের জন্য ব্যয়ের বরাদ্দ মাত্র ১৯ শতাংশ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের এই অবিচার দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ এই অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। পূর্ব পাকিস্থান অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য অর্জনের পথে সম্প্রতি যেসব বৃহৎ পদক্ষেপ করেছে সেগুলি তাকে এই সংগ্রামে সাহায্য করবে।

ভিয়েতনামে যুদ্ধ থামলে পর

ভিয়েতনামের যুদ্ধে যে মার্কিন ডলার ঢালা হয়েছে সেটা এতদিন ধরে এশিয়ার কতকগুলি দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রাখতে সাহায্য করেছে। এখন আলোচনা শুরু হয়েছে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামলে পর এইসব দেশের উপর কি ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। যেমন, থাইল্যাণ্ডে এখন মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য রয়েছে এবং এইসব ঘাঁটি তৈরীতে গত দু বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩০ কোটি ডলার খরচ করেছে। প্রতিদিন প্রায় এক হাজার ভিয়েতনাম-ফেরত মার্কিন সৈন্য থাইল্যাণ্ডে আসে "বিশ্রাম ও স্ফূর্তি"র জন্য। গত বছরে আমেরিকানরা থাইল্যাণ্ডে প্রায় ১১ কোটি ডলার লগ্নী করেছেন। ভিয়েতনামের যুদ্ধ বন্ধ হওয়া মানে থাইল্যাণ্ডের ডলার উপার্জনের এইসব সূত্রই অকস্মাৎ এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ভিয়েতনামের লড়াই দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ সাহায্য করেছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সঙ্গে তার রপ্তানী বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানী বাণিজ্যের এই বাড়বাড়ন্ত বন্ধ হতে বাধ্য।

ভিয়েতনামে শান্তি হংকং, ফরমোজা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের রপ্তানী পণ্যের শিল্পগুলিকে আঘাত করবে। হংকং-এর পোষাক তৈরীর ব্যবসা, মালয়েশিয়ার রবার, সিঙ্গাপুর বন্দরের আয় ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে মার খাবে।

সবচেয়ে বেশী আঘাত আসবে জাপানের অর্থনীতির উপর। জাপানের ব্যাংকাররা হিসাব করেছেন যে, তার রপ্তানী বাণিজ্যের আয়ের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি ডলার আসে ভিয়েতনাম যুদ্ধের চাহিদা থেকে। তাছাড়া হাজার হাজার ভিয়েতনাম-ফেরৎ মার্কিন সৈনিক জাপানে প্রচুর পরিমাণ ডলার খরচ করে।

ভিয়েতনামে শান্তির এই মূল্যগণনা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাতাসে অলকা চুল খোলে ॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বাতাসে অলকা চুল খোলে
তীব্র জিভ পিপাসার শেষে
ফিরেছে স্বদেশে
শান্ত জল গূঢ় কলরোলে
বাতাসে অলকা চুল খোলে।

প্রদর্শনী, সাবানের ফেনা
বাগানের ক্লিষ্ট হাসনুহেনা
সমস্ত বিফল
গূঢ় কলরোলে শান্ত জল
...দোলে
বাতাসে অলকা চুল খোলে।

তাৎক্ষণিক, হোক তাৎক্ষণিক
সাঁতারে প্রবৃত্তি কেন্দ্রাতিগ
...হ'লে
বাতাসে অলকা চুল খোলে।।
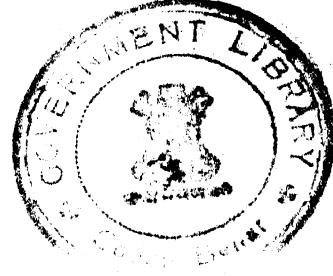
গভীর ছায়ায় ॥

শংকর রায়

নিমগ্নতার অন্তরালে বিপুল সুদূর
শব্দবিহীন ডাকছে আমায় অনন্তকাল,
বুকের ভিতর চিত্রপ্রতিম দোদুল্যমান
মুখের করুণ প্রতিচ্ছবি ভেসে বেড়ায়
গোপন ভাষায় :
সকল দুয়ার বন্ধ এখন, কেমন করে
বাইরে যাব অহর্নিশই ভেবে মরি,
ঘুরি ফিরি।
বিজন গহন গভীর নিশীথ চতুঃসীমায়,
হৃদয় জুড়ে ঘনান্ধকার
ভীষণ আকার।
এক নিমেষে বৃষ্টিসজল নির্জনতা
স্মরণচারী, শ্রাবণজালা অমানিশা
সর্বনাশা।
ঝড়ের নখর দুপুর হতে রুদ্ধ ছিল,
লুপ্ত সেসব অনুভূতির চিহ্নগুলি :
থাকল আমার বিপুল সুদূর নির্জনতায়
[illegible]।

মালয়ী ও ডায়াক জলদস্যু
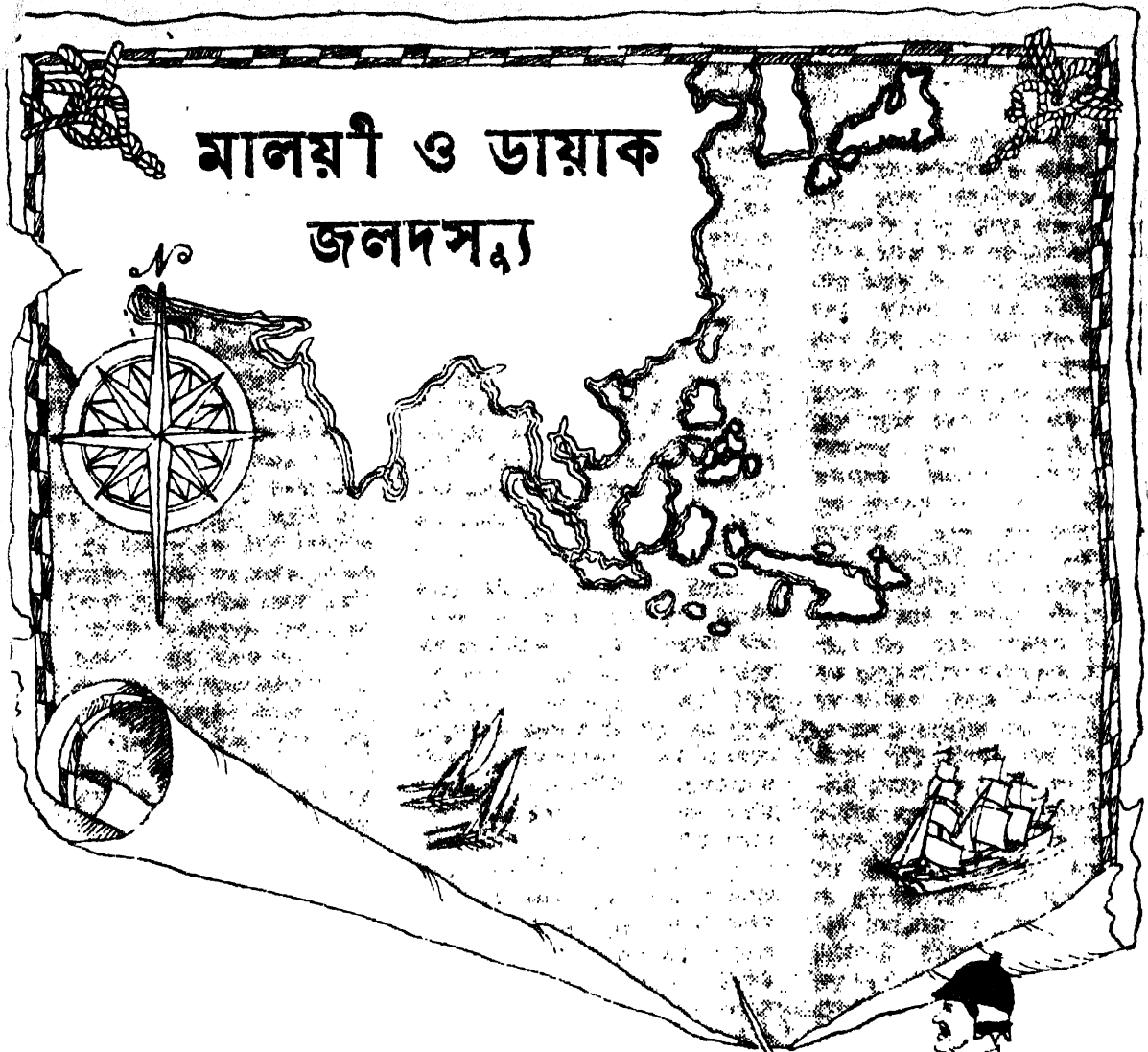
নীলদরিয়ায় (৬)

অজিত চট্টোপাধ্যায়

...পৃথিবীর মানচিত্রের একটি দিকে ...রাখলে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ, ঊর্মিমুখর নীল সমুদ্র, কর্কটক্রান্তি ...বিষুবরেখার কিছুটা অংশ নজরে ...ব। জায়গাটা চীন ভূখণ্ড এবং অস্ট্রে-...র মধ্যবর্তী। দ্বীপপুঞ্জগুলির মধ্যে ...কিছু দ্বীপ কম বেশী আমাদের প্রায় ...ই জানা। বিষুবরেখার উপর ...র রয়েছে কালিমান্তান বা বোর্নিও। এর একপাশে আন্দালাস বা সুমাত্রা অন্যদিকে সুলাওয়েসি বা সেলিবিস। উত্তরে সারাওয়াক এবং উত্তর বোর্নিও। এছাড়া মিণ্ডানাও, মোলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ, সান্দাজার, বুত্তোন দ্বীপ, বুরু সুম্বাওয়া ইত্যাদি জানা অজানা নানা দ্বীপের সমুদ্রে প্রসার। এদের মধ্যে রয়েছে সুলু সাগর, সেলিবিস সাগর, ম্যাকাসার প্রণালী, মোলুক্কা প্রণালী প্রভৃতি মহাসাগরের অংশবিশেষ।

জলদস্যুর উপদ্রব এ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে বেশ কিছু সময় পরে। অন্তত সতের শতকেও এই দরিয়ায় যে জলদস্যুর মার মার রবে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হয়ে ওঠেনি তার পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেছে। উইলিয়ম ড্যাম্পিয়ার নামে এক ভদ্রলোক ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সুলু দ্বীপে এসে প্রায় ছ' মাসকাল কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বাস করেছিলেন ইল্লানুন উপজাতিদের মধ্যে। ড্যাম্পিয়ার লিখেছেন যে এই উপজাতির লোকেরা খুব ভদ্র এবং শান্ত। অথচ মাত্র একশত বৎসর পরের লেখা নথিপত্র থেকে জানা গেছে যে ইল্লানুনেরা দস্যুবৃত্তিতে এবং নরহত্যার ব্যাপারে প্রায় সমকক্ষহীন। কেবলমাত্র বালানিনি উপ-

জাতির লোকরাই এই মরণোৎসবের প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে কিছুটা পাল্লা দিতে পারত।

যাই হোক বোর্নিও দ্বীপ এবং কাছাকাছি দ্বীপপুঞ্জ ও সন্নিকটস্থ দরিয়ায় যে জলদস্যুর দল একাধিপত্য বিস্তার করে ভয়ের হিম এবং ত্রাসের তুষার বাসিন্দাদের মনে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারা আগত মালয়ী এবং এই অঞ্চলের আদিবাসী ডায়াক জলদস্যুর সমষ্টি। মালয়ের লোকেরা যখন বোর্নিওতে এসে বসবাস শুরু করল তখন তারা জলদস্যুর বিদ্যা বা জ্ঞান, সুলুক-সন্ধান আয়ত্ত করে বসে আছে। কাজেই জলদস্যুর উৎপাত বোর্নিওর সমুদ্রে শুরু হতে দেরী হয়নি। কিন্তু ডায়াকদের ব্যাপারটা আলাদা। ডায়াকরা এখানকার আদিবাসী। সবুজ শ্যামল বৃক্ষপত্রে ঘেরা তাদের গ্রামগুলিতে শান্ত তরঙ্গহীন স্রোতের মত জীবন নিরুদ্বিগ্ন এবং নিশ্চিন্ত প্রয়াসে সুন্দর কাটছিল। শুধু একটা মাত্র হবি। আমাদের কাছে ভয়ংকর মনে হলেও ডায়াকদের কাছে ওটা মজার এবং গর্বের বস্তু। আধুনিক মানুষের কত হবি। ডাকটিকিট সংগ্রহ, নানা জাতের অর্কিড সাজিয়ে রাখা, অটোগ্রাফ বা স্বহস্তলিপি সংগ্রহ করা ইত্যাদি, হবি অনেক ধরনের। খাতার পাতায় নানা ধরনের ডাকটিকিট সাজিয়ে আধুনিক মানুষ গর্ববোধ করে। বন্ধুবান্ধবদের কাছে তা সগর্বে প্রদর্শন করে। ডায়াকদের আচরণটা তার সঙ্গেই তুলনীয়। বিভীষিকা বলে ওরা তা আদপেই মনে করে না। অন্য কিছু নয়। হবিটা হল নরমুণ্ড সংগ্রহের। ডায়াকদের মধ্যে এ ব্যাপারটা বহুদিনের। নরমুণ্ড সংগ্রহ করে কিংবা শিকার করে মানুষ মেরে সেই মুণ্ডুটা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বাড়ীর সামনে টাঙিয়ে রাখা রীতিমত গর্বের ব্যাপার। আর একটা দুটো নরমুণ্ড নয়। নানা দেশের নানা জাতির নরমুণ্ড সব। কে কতগুলি সংগ্রহ করতে পেরেছে তাই নিয়ে রীতিমত তর্কের আসর। শ্রেষ্ঠত্বের আসনের দাবী অনেকেরই।

মালয়ীদের জলদস্যুবৃত্তির কাহিনী ডায়াকরা ধীরে ধীরে জানল। ভেবে চিন্তে তারা দেখল ব্যাপারটা মন্দ নয়। নরমুণ্ড সংগ্রহ করবার জন্য দ্বিতীয়বার কোনো অভিযান পরিচালনা করবার প্রয়োজন নেই। জলদস্যুর নৌকো নিয়ে ভেসে পড়লেই হল। এ যেন সেই এক ঢিলে দুই পাখি মারা। শিকার সংগ্রহ হলে সোনাদানা, ধনরত্ন, বস্ত্র আহার্য তো আছেই। বাড়তি লাভ হল নরমুণ্ডগুলি। রথ দেখা এবং কলাবেচার একত্র সমাবেশ। এমন সুবিধাজনক একটি বৃত্তি ডায়াকরা সহজেই গ্রহণ করল। ধীরে ধীরে শান্ত উপজাতিরা হয়ে উঠল দুর্ধর্ষ জলদস্যু। কাছাকাছি যে সব জলপথ ছিল বিঘ্নহীন, নিশীথ রাত্রির মত শীতল ও নিরুপদ্রব, তাই হয়ে উঠল বিভীষিকাময় মরণগহ্বর।

ডায়াকরা দস্যুবৃত্তির জন্য যে নৌকো বা জলযান ব্যবহার করত তার নাম দিয়েছিল প্রাহু। প্রাহু বলতে অবশ্য সাধারণ নৌকো বোঝায় না। লম্বায় প্রায় নব্বই ফুটেরও বেশী এই নৌকোগুলি শতাধিক ক্রীতদাস দাঁড়ের সাহায্যে দ্রুত বাইত। অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে প্রাহুকে সাজানো হত অজেয় করে। প্রায় রণতরীর সাজ। গলুইয়ের কাছে থাকত লম্বা নলের বন্দুকও। ধারে ধারে ছোট ছোট কামান বন্দুক বসিয়ে প্রাহুকে জোরদার করে তুলতে এরা সচেষ্ট হয়েছে। নৌকোর দুপাশে ক্রীতদাস মাল্লাদের আসনের খানিকটা উপরে লম্বা লম্বা পাটাতন বসিয়ে জলদস্যুরা দাঁড়াত আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে। গায়ে তাদের বিচিত্র বর্ণের পোশাক। টকটকে লাল রঙের পরিধেয়,—ঊর্ধ্বাংগে লৌহবর্ম, মাথায় পালকের টুপী। শুধু আগ্নেয়াস্ত্র নয়—দস্যুদের হাতে থাকত লম্বা একটা বর্শা। কোমরে জুংসই তরবারি আর ছোরা গোঁজা।

আগেই বলেছি যে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনরত্ন লুণ্ঠন করা ছাড়াও বন্দী মানুষগুলিকে পরে হাটেবাজারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া জলদস্যুদের একটি বিশেষ লাভের কাজ। নিউগিনির পাপুয়ানরা ছিল এই অঞ্চলের জলদস্যুদের সহজলভ্য শিকার। পশমের মত নরম চুলের পাপুয়ান মেয়ে আর শিশুদের বাজারে বেশ চাহিদা। অন্তত অচিন (বা অকিন) দেশের রাজার কাছে নিয়ে গেলে পাপুয়ান মেয়েগুলি বেশ ভালো দামেই বিক্রি হত। আবার দক্ষিণ বোর্নিও থেকে যাদের ধরা হয়েছে তাদের নিয়ে যাওয়া হত ব্রুনেইয়ের হাটে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল দাম মিলত সারাঙ্গানির বাজারে। সারাঙ্গানি দ্বীপটি মিণ্ডানাউ দ্বীপের দক্ষিণে। আবার সুন্দরী বন্দিনীদের এ সব কোথাও পাঠান হত না পণ্য হিসেবে। তাদের নিয়ে যাওয়া হত বাটাভিয়ার বাজারে। সেখানে চীনা ক্রেতারা সুন্দরী মেয়েদের জন্য প্রচুর ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এর অবশ্য একটি সঙ্গত কারণও রয়েছে। দেশের নিয়ম অনুযায়ী কোনো চীনাই পরিবার কিংবা অন্য কোনো রমণীকেই চীনদেশের বাইরে নিয়ে যেতে অনুমতি পেত না। ফলে প্রবাসের নারীসঙ্গবিহীন জীবনগুলিকে সুন্দরীর সাহচর্যে ভরিয়ে তুলতে তাদের আসতে হত বাটাভিয়ার বাজারে। আর বাটাভিয়া মানেই সুন্দরী মেয়েদের হাট। পণ্য সওদা করা নিয়ে সেখানে রীতিমত প্রতিযোগিতা।

এই অঞ্চলের প্রথম নাম করা জলদস্যুটির সংবাদ পাওয়া গেল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে। এর নাম জলদস্যু রাগা। সতেরো বৎসরেরও বেশী সময় রাগা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে এখানকার দরিয়ায়। মাকাসার প্রণালীতেই ছিল তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মাকাসার প্রণালীর এক পাশে বোর্নিও এবং অন্যদিকে সুলাওয়েসি বা সেলিবিস দ্বীপ। দুর্দান্ত জলদস্যু রাগা এ অঞ্চলে অল্পদিনেই কুখ্যাত হয়ে উঠল। তার শেয়ালের মত চতুর বুদ্ধি, কসাইয়ের মত নির্দয়তা এবং অসমসাহসিক অভিযানগুলিতে সাফল্যলাভের পর রাগা হয়ে উঠল জলদস্যুদের সেরা বা জলদস্যুদের রাজা। অঞ্চলের সর্বত্রই তার গতিবিধি, সর্বত্রই তার গুপ্ত অনুচর। জলদস্যু রাগার সংগঠন খুব দুর্বল ছিল না।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাগা বৃহৎ শিকরগুলি হজম করতে মনোনিবেশ করল। সে বছরই তিনটি ইংলণ্ডের জাহাজ তার কবলে এল। দুর্দান্ত রাগা নিজের হাতে ক্যাপ্টেনদের মুণ্ডু কাটলেন। জলদস্যুকে দমন করতে ইংলণ্ড দুটি ছোট রণতরী পাঠাল। বাটাভিয়ার ডাচদের কাছ থেকে আগেই আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল যে জলদস্যু রাগাকে দমন করতে তারাও সাহায্য করবে।

ইংরেজদের জাহাজ দুটির একটির নাম এলক্। একদা এলক্ এসে নোঙর করল বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে। সে রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। চতুর্দিকে কুয়াশার মত ঘন আস্তরণ। দৃষ্টি প্রায় প্রতিহত হয়। কিন্তু জলদস্যু রাগার এক অনুচর এলক্‌কে ঠিক চিহ্নিত করল। অবশ্য রণতরী হিসেবে নয়। প্রাহুর সেই ক্যাপ্টেন বা দলপতি ভাবল ওটি বাণিজ্য জাহাজ মাত্র। নিশ্চয়ই নানা পণ্যে জাহাজের খোল পূর্ণ করে ওটি ভেসে চলেছে কোনো বন্দরের উদ্দেশ্যে। অতএব আর দেরী করা ঠিক নয়। সদাগরী জাহাজটি দখল করে আনা চাই। যা চিন্তা তাই কাজ। ক্ষিপ্রগতিতে প্রাহু ছুটে চলল এলকের কাছে। মাঝিমাল্লারা জেগে উঠে কোনো বাধা দেবার আগেই জাহাজ দখল করে ফেলা চাই।

কিন্তু এলকের নাবিকেরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়নি। মুহূর্তে গর্জে উঠল ইংরেজদের কামানগুলি। গোলা এসে পড়তে শুরু করল প্রাহুর উপর। অল্পক্ষণ মাত্র লাগল। ভারী গোলার আঘাতে প্রাহু ডুবে গেল দরিয়ার জলে। জলদস্যুরা মারা পড়ল প্রায় সকলেই। কপালজোরে মাত্র পাঁচজন বেঁচে গেল। তারা চারদিন ধরে জলের উপর ভেসে বেড়িয়েছে ভাঙা কাঠের অংশকে অবলম্বন করে। চারদিন পরে দেশী লোকেদের একটি নৌকো এদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে।

সর্বনাশের এই কাহিনী রাগার কানে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। গভীর ক্ষোভে রাগা উঠল বিষম রেগে। কোনো ইউরোপীয়ানের তার হাত থেকে আর নিস্তার নেই একরকম প্রতিজ্ঞা করে বসল রাগা। সে পর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে পালন করেছে। প্রায় চল্লিশটি ইউরোপীয় জাহাজ তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সাহস ধৃত জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিককে দেওয়া করা হয়েছিল। শুধু ক্যাপ্টেনের মুণ্ডু করেন জলদস্যু রাগা স্বহস্তে। সেলিবিস দ্বীপের সুদীর্ঘ উপকূলে একরকম তারই আধিপত্যে। যে কোনো সময়ে সংকেত নির্দেশে প্রায় পঞ্চাশ থেকে একশত প্রাহু বন্দর কিংবা খাড়ির মুখ থেকে বেরিয়ে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বিলম্ব করত না। উঁচু পাহাড়ের উপর বসে থাকত রাগার অনুচরেরা। কোনো জাহাজ দৃষ্টিপথে এলেই তৎক্ষণাৎ সে সংবাদ জানিয়ে দেওয়া

চ। দিনের বেলায় এ কাজ হত পতাকা আন্দোলন করে। রাতে প্রজ্জ্বলিত মশাল নাড়িয়ে সংবাদ আদান-প্রদান হত সংকেতের সাহায্যে।

কিন্তু এই দুর্দান্ত জলদস্যুর খাস নিবাসে এক ইংরেজ পর্যটক গিয়ে হাজির হলেন। ভদ্রলোকের নাম ডাল্টন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডাল্টন সাহেব পেরাগোট্টান নদীর মোহনায় জলদস্যু রাগার আস্তানায় গিয়ে পেঁছলেন। পর্যটকের কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ডাল্টন সমস্ত জায়গাটা ঘুরে দেখলেন। অবশ্য ইচ্ছেমত সব জায়গায় তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। তবু ডাল্টন সাহেব বাজারে গিয়ে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দেখে আসতে পেরেছিলেন। পণ্যের মধ্যে কয়েকটি বস্তু তাকে বিস্মিত করেছিল। গোটা চারেক বাইবেল তিনি দেখতে পেলেন। এগুলি বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় লেখা। পোশাক, বাইনোকুলার, টেলিস্কোপ, জাহাজের ভাঙা অংশ, কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পণ্যের মধ্যে ছিল। বেড়াতে বেড়াতে ডাল্টনের নজরে এল আরো কিছু বস্তু,—মেয়েদের ব্যবহার করা মোজা, গোটা কয়েক সেমিজ এবং লাল ফ্লানেলের অন্তর্বাস। শেষোক্ত বস্তুটি একমাত্র শীত-প্রধান দেশের মেয়েদের জন্যই। পর্যটক ডাল্টন একদিন জলদস্যু রাগার বাড়ীর পিছন দিকে ইতস্তত বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তার কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে একটি য়ুরোপীয় মেয়েকে অল্পক্ষণের জন্য দেখলেন তিনি। ডাল্টন ভাবলেন ওকে কাছে ডাকবেন। কিন্তু আশ্চর্য! তাকে দেখে মেয়েটি দ্রুত পালিয়ে গেল। সোজা ঢুকল জলদস্যু রাগার অন্তঃপুরের মধ্যে।

পর বৎসর একটি আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজের উপর জলদস্যু চড়াও হল। জাহাজটির নাম—ফ্রেন্ডশিপ। মরিচের পণ্য-বাহী এই জাহাজটিতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তেমন জোরদার ছিল না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূলে কুয়ালাবাটুতে জাহাজটি নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় কিছু লোক সহজভাবে যাতায়াত করছিল এর কাছ দিয়ে। হঠাৎ একটা হৈ চৈ এবং চীৎকার। রে রে রব। অনেকক্ষণ পরে জাহাজের ...কেরা বুঝল তাদের উপর জলদস্যুরা ... হয়েছে। নিরস্ত্র নাবিকদের অনেকেই ...ধ্যে কচুকাটা। জলদস্যুরা জাহাজটি ... করে দেখল মাত্র জন ছয়েক প্রাণ নিয়ে ...তে পেরেছে। কিন্তু জলদস্যু রাগা ...এ খুশী হতে পারেনি। তার দুঃখ ...অন্য কথা ভেবে। জাহাজের ...নকে এবার আর নিজের হাতে সে ...দিতে পারল না। ক্যাপ্টেন এণ্ডিকোট ...টি একটি নৌকোয় বিশ্বস্ত কজন অনুচরকে নিয়ে চম্পট দিয়েছেন—।

খবরটা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কানে পেঁছতে বিলম্ব হল না। তখনই ফ্রিগেট্ পোটোমাককে পাঠান হল প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। অধিনায়ক হয়ে চললেন কমোডর ডাউনেস। রণতরীটি এসে নোঙর করল কুয়ালাবাটুতে। একটি সদাগরী জাহাজের ছদ্মবেশে। তীর থেকে স্থানীয় যে লোকেরা এসেছিল পোটোমাককে দেখতে তাদের আর ফিরে যেতে দেওয়া হল না। বন্দী করে রাখা হল জাহাজের অভ্যন্তরে। লোকগুলি সম্ভবত ভাবছিল যে জীবনের পরিসর এবার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ লুপ্ত হতে সামান্য কিছু সময়ের অপেক্ষা। গভীর রাতে পোটোমাক জাহাজ থেকে প্রায় তিনশত সৈন্য বেরিয়ে অবতরণ করল তীরে। ভোর হবার আগেই সমস্ত শহরটি বিপর্যস্ত। আমেরিকানদের কাছে দুর্গের পতন হয়েছে।
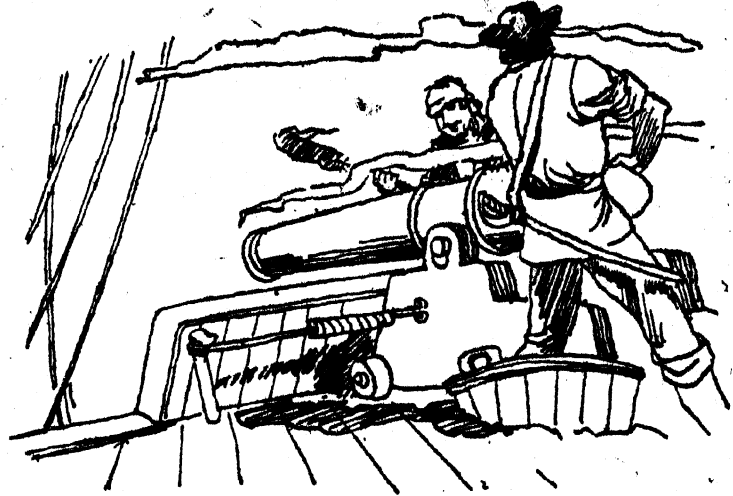
...গর্জে উঠল ইংরেজদের কামানগুলি

কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তবু যুদ্ধ শেষ হতে দেয়নি। মেয়ে পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়েছে। বন্দী হবার আগে বন্দুকের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে—।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে জেমস ব্রুক হলেন সারাওয়াকের রাজা। ব্রুক দেখলেন দেশের অবস্থা সঙ্গীন। জলদস্যুরা থাকতে বোর্নিওর কোনো প্রকার উন্নতি সম্ভব নয়। বাণিজ্য পঙ্গু, কৃষি বিপর্যস্ত। অগ্রগতি অসম্ভব।

জলদস্যুদের দুটি শাখাই তাকে চিন্তিত করছিল। এক দলের আস্তানা সারেবাস নদীর ধারে। অন্য দলটি বাস করত সাকারান নদীর তীরে। সারেবাস নদী-তীরের জলদস্যুদের দলে প্রায় কয়েক সহস্র লোক,—মালয়ী এবং ডায়াক জলদস্যুর সমষ্টি। এদের দিকেই ব্রুক প্রথম মনো-নিবেশ করলেন। অনেক চিন্তা করে উপযুক্ত এক নৌবহর তৈরী করলেন তিনি। অসংখ্য য়ুরোপীয় এবং মালয়ী সৈন্য সংগ্রহ করা শেষ হলে জেমস ব্রুক ক্যাপ্টেন হেনরী কেপেলের শরণাপন্ন হলেন। ইংলন্ডের রাজকীয় রণতরী ডিডো যদি তাকে এই অভিযানে সাহায্য করে তবে তিনি সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। যাই হোক হেনরী কেপেলের সাহায্য পাওয়া গেলে জেমস ব্রুকের নৌবহর সারেবাস নদীর উপর দিয়ে ভেসে চলল। জলদস্যুদের আস্তানা নজরে পড়লেই আর রক্ষে নেই। অবশ্য জলদস্যুর দল তাদের নেতার অধীনে মরণপণ করে লড়ল। কিন্তু জেমস ব্রুকের নৌবহরকে হটাতে পারল না।

পর বৎসর রাজা ব্রুক সাকারান নদী-তীরের জলদস্যুদের সমুচিত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করলেন। ক্যাপ্টেন কেপেল তখন চীনদেশে। অনুরোধ পাঠানো হল তার কাছে। ক্যাপ্টেন যদি এবারও অভিযানে সঙ্গী হন। সাকারান নদীতীরের জলদস্যুরা আরো ভীষণ। তাদের শক্তিতে অসংখ্য মানুষ। প্রায় দেড়শত প্রাহু দলনেতা সেরিফ সাহেবের আদেশের প্রতীক্ষায় রয়েছে।

১৮৪৪ সাল। আগস্ট মাস। জেমস ব্রুকের নৌবহর এগিয়ে চলল। বিভিন্ন ধরনের নৌযানের সমষ্টিতে পরিপুষ্ট নৌ-বহরটির সামনে প্যাডল স্টীমার ফ্লেগিথন। তার পিছনে ইংলণ্ডের নৌবাহিনীর রণতরী ডিডো। পশ্চাৎ দেশে ছোট বড় সাম্পান এবং প্রাহু। দেশী সারাওয়াক সৈন্যেরা আসন্ন লুণ্ঠনের স্বাদ স্পর্শ করতে অধীর। নর-মুণ্ড সংগ্রহ নিশ্চয়ই বাড়তি পাওনা।

পরদিন নৌবহরটি ঢুকল বাতাংলুপার নদীতে। খানিকটা এগোলেই সাকারান জলদস্যুদের ঘাঁটি পাটুসেন শহর। প্রচন্ড যুদ্ধের পর জলদস্যুরা নতিস্বীকার করল। পাটুসেন শহরটি গোলায় এবং আগুনে প্রায় ভস্মীভূত। আরো এগিয়ে দেখা গেল দস্যুসর্দার সেরিফ সাহেবের গ্রাম। জেমস ব্রুকের সৈন্যদল সেটিকেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করল। পরাজিত, পর্যুদস্ত, অপমানিত সেরিফ সাহেব গভীর জঙ্গলে ঢুকে আত্মগোপন করে প্রাণ বাঁচালেন।

জেমস ব্রুকের অভিযান বেশ সাফল্য-মণ্ডিত। প্রায় পাঁচ সহস্র জলদস্যুর আস্তানা সম্পূর্ণ নষ্ট করা হয়েছে। চারটি ছোট বড় দুর্গ বা ঘাঁটি বিধ্বস্ত। শতাধিক নৌকো এবং [illegible] কামান বন্দুক

ব্রুকের দখলে এসেছে। জেমস ব্রুক ভাবলেন জলদস্যুর অভিশপ্ত ছায়া বোধহয় এবার দেশ থেকে অন্তর্হিত হল।

অবশ্য কিছুদিন তাই ঘটল। জেমস ব্রুক সর্বশক্তি নিয়োগ করে শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করলেন। ফলে উপজাতীয়রা মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে রইল। বিষ দাঁত তো আগেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কাজেই কুলোপানা চক্কর মেলবার শক্তি নিঃশেষ।

কিন্তু এই নীরবতা এবং শান্তি সামান্য কিছুদিনের। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজা ব্রুক ইংলন্ডে গিয়েছিলেন। জলদস্যুরা তার এই অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে উদ্যোগী হল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রায় সত্তর আশীটি প্রাহুতে আরোহী হয়ে সারেবাস জলদস্যুর দল সাড়ং নদীর বুক ধরে এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন, হত্যা এবং অগ্নিসংযোগ। এদের দলপতি কাকসিমানা নামে এক দুর্দান্ত জলদস্যু। এই সময় চাষীরা গিয়েছে মাঠে। কৃষিকার্য পুরোদমে চলেছে। অরক্ষিত গ্রামগুলিতে শুধু নারী এবং শিশুর দল। কাকসিমানার সাঙ্গোপাঙ্গেরা কিন্তু একটি কৃষিখামারকেও রেহাই দেয়নি। লুঠপাঠ চালাতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি। কারণ দস্যুদের বাধা দেবে যারা, সেই পুরুষের দলই কাজ করছে দূরের সব মাঠে এবং ক্ষেতে। তবু কোনো একটি কৃষিখামারে সাতাশজন পুরুষ অন্য কি কাজে ব্যস্ত ছিল। জলদস্যুর দলকে আসতে দেখে তারা গুলি ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য—প্রথম তিন দস্যু মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। আশ্চর্য! কাপুরুষের দল সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করল। পলায়ন এবং জীবন-রক্ষাই যেন তাদের তখনকার সমস্যা।

জলদস্যুরা জানত যে পুরুষদের চেয়ে মেয়ে এবং শিশুদের উপর হামলা করাই সুবিধের কাজ। নদীপথে ফিরবার সময় এরা স্থানীয় বাসিন্দাদের পোশাক পরে, চাষীর টুপীতে মাথা ঢেকে ছোট ছোট নৌকোয় তীরের কাছে এসে দাঁড়াত। সাড়ং নদী অঞ্চলের ভাষায় চীৎকার করে মেয়েদের ডাকত,—'যারা লুকিয়ে আছ, নির্ভয়ে বেরিয়ে এস, এই নৌকোতে করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হবে। জলদস্যুরা চলে গেছে, বেরিয়ে আসতে দেরী কোরো না।...'

চাতুরী না বুঝে বোকা রমণী সহজেই ফাঁদে পা দিল। দস্যুর নৌকোয় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দিনী। পরিচিত পথঘাট, গাছপালা, গ্রাম, দূরে ফেলে রেখে নৌকো ভেসে চলল বহুদূরে এক গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে।

সারেবাস জলদস্যুদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত মানুষ এসেছিল। লোকটা আসলে মালয়ী,—পরে ডায়াক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, নরমুণ্ড সংগ্রহ ইত্যাদি গ্রহণ করে। লোকটার নাম ডুং-ডং। তার দলবল যখন একটা খামার লুণ্ঠন করছিল, ডুং-ডং একটি সুন্দরী মেয়েকে কিছুটা দূরে দেখে ভীষণ আকৃষ্ট হল। মেয়েটি কিন্তু ডুং-ডংকে দেখেই ভয়ে আধমরা—। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল। ঘন জঙ্গলের দিকে। ডুং-ডংও ছুটতে শুরু করল। কিন্তু হাতে একটা ভারী বর্শা থাকার জন্য দস্যুর ছুটতে অসুবিধা হচ্ছিল। একস্থানে দাঁড়িয়ে ডুং-ডং বর্শাটা মাটিতে বিঁধিয়ে রাখল। আগে সুন্দরীকে আয়ত্ত করে বর্শাটা ফিরবার পথে তুলে নিলেই হবে। মেয়েটি অবশ্য বেশীদূর যেতে পারেনি। দুর্দান্ত ডুং-ডং একটা ধান-ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ওকে ধরে ফেলল। রমণীকে কাঁধের উপর ফেলে ডুং-ডং হাসছিল। বিকট হাসি। বীরদর্পে পা ফেলে ফিরে আসছিল তার সেই বিশাল বর্শাটার কাছে। কিন্তু হায়! বর্শাটা তো সেখানে নেই। ডুং-ডং আশ্চর্য হল। চারদিকে চাইল। তার বর্শাটা নিতে কে সাহস করল তাহলে? ডুং-ডং দু' পা এগিয়ে খোঁজ করতে চাইল সেই তস্করের। ঠিক তখনই হল অঘটন। কোথা থেকে বর্শাটাই এসে তাকে সম্পূর্ণ বিঁধে ফেলল। কোন অদৃশ্য স্থান থেকে আততায়ী সজোরে বর্শা ছুঁড়ে ডুং-ডংকে মেরে ফেলেছে।

জেমস ব্রুক সারাওয়াকে ফিরে জল-দস্যুদের এই দুষ্কার্যের কাহিনী শুনলেন। এমনিতেই অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। জেমস ভাবলেন আর দেরী করা উচিত নয়। সারেবাস জলদস্যুদের একটা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এবারে বিশাল এক নৌবহর সাজানো হল। ইংলন্ডের রাজকীয় নৌ-বহরের একটি রণতরী এল ব্রুককে সাহায্য করতে। এটির নাম—'রয়েলিস্ট'। তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি স্টীমারও পাওয়া গেল এই অভিযানে। তার নাম নিমেসিস। অসংখ্য সাম্পান এবং প্রাহু তো রয়েছেই। জেমস নিজে চললেন সবচেয়ে বড় প্রাহুতে আরোহী হয়ে। সেটির নাম সিংহরাজা। এতে উঠে সত্তরজন সৈন্য এবং মাল্লাও ভেসে চলল। সাকুল্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার লোক এবং ষাট সত্তরটি প্রাহু যোগ দিল এই দস্যু নির্মূল করবার অভিযানে।

বাতাং নদীর মুখে এসে ব্রুক শুনলেন যে জলদস্যুদের একটি বিরাট দল সমুদ্রের দিকে ভেসে গিয়েছে। সম্ভবত নতুন কোনো শিকারের সন্ধানে। জেমস ঠিক করলেন যে দস্যুদের ফিরবার মুখে কৌশল করে ঘিরে ধরতে হবে। ব্যূহের মধ্যে ঢুকে নির্গমনের পথ যেন আর না খুঁজে পায়। তিন দিন তিন রাত্রি কাটল। দলবল নিয়ে রাজা ব্রুক প্রহরীর মত রয়েছেন। জলদস্যুদের বিরাট বাহিনীটা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া পথ নেই। গুপ্তচরেরা সংবাদ আনল জলদস্যুদের সঙ্গে প্রায় দেড়শটি প্রাহু। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া গাদা বন্দুক এবং অন্য আগ্নেয়াস্ত্রও রয়েছে। শোনা গেল নদীর উত্তর দিকে লুঠপাঠ শেষ করে তারা ফিরে আসছে। দুটি সিঙ্গাপুরী বাণিজ্য তরী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। লুণ্ঠন সমাপ্ত হলে জলযান দুটিতে তারা অগ্নিসংযোগ করে দেয়।

তিন রাত্রি অতিক্রান্ত হবার পর স[illegible] এল যে জলদস্যুর দল ফিরে আস[illegible] সন্ধ্যের দিকে একটি ছোট্ট পর্যবেক্ষ[illegible] নৌকোতে অনুচরেরা খবর নিয়ে এল যে জলদস্যুর নৌবহর এবার খুবই নিকটে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। এবং তার পরই দাঁড়ের ছপাছপ ধ্বনি কানে এসে পৌঁছল।......

সামান্য কিছু সময় পরেই ওদের প্রাহুগুলি নদীবক্ষে দেখা দিল। ওরাও দেখল জেমস ব্রুকের বিশাল নৌবহর তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ একটা ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল কানে। তারপরই নিস্তব্ধতা। জেমস ব্রুক বুঝলেন জলদস্যুর দল পরামর্শ করতে বসেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে নেতাদের পরামর্শ সভায় আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু তখন চারপাশে আলকাতরা রঙের জমাট কালো অন্ধকার। প্রাহুগুলি ঠিক কোথায় রয়েছে তাই বুঝে ওঠা কঠিন।

সহসা একটা জয়ধ্বনির মত চীৎকারে আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে উঠল। ব্রুক বুঝলেন যে পরামর্শসভায় আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জলদস্যুর দল আক্রমণ শুরু করল। গাদা বন্দুক থেকে গর্জে উঠল আগুন। প্রাহু-গুলি তীরবেগে ছুটে এল শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করতে। কিন্তু ততক্ষণে জেমস ব্রুক নিজের সৈন্যদের সাজিয়ে নিয়েছেন। প্রায় অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি এক ব্যূহের আকারে স্টীমার, প্রাহু এবং সাম্পান ও অন্যান্য নৌযানগুলি সাজানো হয়েছে। সংঘর্ষে জলদস্যুরা ভীষণভাবে হারল। পরদিন ভোর হলে দেখা গেল প্রায় ষাটটি প্রাহু তীরে এসে ভেঙে পড়েছে। খোঁজাখুঁজি করে আরো আশীটি প্রাহুকে কান্ডারীহীন অবস্থায় পাওয়া গেল। আটশতেরও বেশী জলদস্যু সে রাত্রে যুদ্ধে নিহত হয় কিংবা জলে ডুবে মারা গিয়েছে। বন্দীর সংখ্যা বেশী নয়—কারণ জলে ঝাঁপ দেবার সময়ও দস্যুর দ[illegible] তরবারি ছাড়েনি। নরমুণ্ড সংগ্রহ যাদে[illegible] নেশা, তাদের শরীরে দয়ামায়া কি[illegible] প্রাণভিক্ষা চাওয়ার মত ইচ্ছা না থাকাই [illegible] স্বাভাবিক।

কিন্তু জেমস ব্রুক তখনই [illegible]ানো না। জলদস্যুদের সম্পূর্ণভাবে [illegible] করাই তার মনের ইচ্ছা। আরো দু'পর দলবল নিয়ে জেমস ব্রুক সেখানেই র[illegible]তে তীরে উঠে যে সব জলদস্যু আ[illegible] করবার চেষ্টা করেছিল তাদের কি সাহস ধরা পড়ল। ভাঙাচোরা প্রাহুগু[illegible]ওয়া আদেশে অগ্নিদগ্ধ করা হল। সকালে সৈন্যদল চলল সারেবাস নদীর [illegible] ধরে। সম্মুখে রাণী নামক স্টীমারটি পথ-প্রদর্শকের মত এগিয়ে চলেছে। পিছনে পিছনে অসংখ্য সাম্পান এবং প্রাহু তাকে অনুসরণ করছে। কিন্তু নদীতীরের ডায়াক জলদস্যুরা এবার বাধা দিতে বদ্ধপরিকর। প্রতি মাইল অতিক্রম করবার আগেই নতুন বাধা। নদীর উপর দস্যুর দল বড় বড় গাছ

স রেখে গিয়েছে। শুধু ফেলে রেখেই ন্ত হয় নি। কর্তিত গাছটির দুটি প্রান্ত নদীর দুই তীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা আছে যাতে স্রোতে গাছটি না ভেসে যেতে পারে। কিন্তু রাজা ব্রুক এবার কঠিন কঠোর। সমস্ত বাঁধ ভেঙে চুরে অগ্রসর হতেই হবে। জলদস্যুর নাম উত্তর বোর্ণিও এবং সারা-ওয়াকের লোকেরা যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। দলের লোকজন গাছ সরিয়ে পথ পরিষ্কার করল। তীরের যে সব দস্যু বাধা দিয়েছে তাদের হত্যা করে জেমস ব্রুক নির্মম হতে চাইলেন। যারা পালিয়ে গেল, তাদের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে ফেলতে আদেশ দিলেন তিনি। বাড়ীগুলিতে অবশ্য সেই একই দৃশ্য। নরমুণ্ড সাজান রয়েছে। কিছু কিছু খুবই সাম্প্রতিক কালে সংগৃহীত হয়েছে বলে মনে হল।

এবারের অভিযানে জেমস ব্রুক চরম সাফল্য লাভ করলেন। নদীতীরের উপ-জাতীয় নেতারা এবং গ্রামের চাঁই মাতব্বরেরা তীরে এসে তার কাছে নানা শপথ করে গেল। ভবিষ্যতে কোন জলদস্যুকেই তারা প্রশ্রয় দেবে না। সর্বতোভাবে রাজাকে সাহায্য করবে। পুনরায় জলদস্যুর দল লুঠতরাজ শুরু করলে তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিকার করতে প্রয়াসী হবে।

যে সকল জলদস্যু ধরা পড়ল তারা

প্রত্যেকেই সুগঠিত স্বাস্থ্য এবং অদ্ভুত সাহসের অধিকারী। এক মাথা লম্বা কালো চুল এবং দেহের নানা অংগে,—কানে, হাতে পায়ে গোল গোল রিং পরা এই মানুষগুলিকে দেখবার জন্য কৌতূহলী জনতার কম ভীড় হয় নি। বোর্ণিওর উপকূলে বহুদিন পর্যন্ত একটি সাবধান বাণী প্রচারিত ছিল, জলপথে যেতে যেতে যদি কোন মানুষকে দেখতে পাও,—যার লম্বা মাথার চুল, হাতে, পায়ে এবং কানে গোল গোল রিং তাহলে জানবে যে সেই মানুষটি জলদস্যুর দলের একজন। এবং তৎক্ষণাৎ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সচেষ্ট হবে।

আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জেমস ব্রুক আবার সেই নদীর মুখে ফিরে এলেন। এবার তিনি চললেন কানোইত ডায়াকদের শাস্তি দিতে। কানোইতরা হল ডায়াক জলদস্যুদের শেঠ সওদাগর। লুণ্ঠিত মাল পাচার করতে এরাই সাহায্য করত। এদের কাছেই লুঠের জিনিস বিক্রী করত জলদস্যুরা।

মস্ত উঁচু এক স্তূপের উপর কানোইতদের বড় বড় বাড়ী। প্রচুর লুঠের মাল এবং হাজারখানেক লোককে অনায়াসেই এর মধ্যে আশ্রয় দেওয়া যেত। আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে কানোইতরা ব্রুকের কাছে আত্মসমর্পণ করল। শাস্তি হিসেবে লুঠের সমস্ত মাল দিতে হল কানোইতদের। পরে এগুলি নীলামে বিক্রী করে যা টাকা পাওয়া গেল, তা সৈন্যদের পুরস্কার হিসেবে দিলেন ব্রুক। অবশ্য একটি শর্তে। জলদস্যুকে জীবন্ত এবং অক্ষত অবস্থায় যারা বন্দী করে এনেছে পুরস্কার শুধু তাদেরই জন্য। বলা বাহুল্য নরমুণ্ড সংগ্রহ করা যাদের নেশা, তাদের কাছে মাথা কেটে আনার চেয়ে মাথা শুদ্ধ জ্যান্ত মানুষটাকে ধরে আনবার জন্য একটা লোভনীয় প্রস্তাব পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন রাজা।

সম্ভবত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বোর্ণিও, সারাওয়াক, এবং এই সব অঞ্চলের কুখ্যাত জলদস্যুদের আর পুনরাবির্ভাব ঘটে নি।

জলদস্যুবৃত্তির অপরাধে দণ্ডিত হয় নি এমন জাতের মানুষ বোধহয় নেই, কিম্বা খুবই কম। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জলদস্যুর দল ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে অদ্ভুত সব চরিত্রের মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই প্রসংগে আমেরিকান জলদস্যু এলি বগ্‌সের কথা বলা যেতে পারে। এলি বগ্‌সের নামের সংগে চেহারার খুব অমিল। এলি বগস বলতে যদি কেউ মনে করেন একটা হোঁৎকা লোক, যার দৃষ্টি ক্রূর, চোখ দুটো সর্বদাই টকটকে লাল, সিপাহীদের মত মস্ত এক চুমরানো গোঁফ,......যাকে দেখলেই একটা বদমাইস খুনী ছাড়া আর কিছু মনে হয় না, তারা বগ্‌সের উপর খুবই অবিচার করবেন। একটা চিত্র-বিচিত্র পাখনা মেলা প্রজাপতিকে যদি কেউ মোটা একটা গুবরে পোকা বলে মনে করেন তবে এলি বগ্‌সের বেলাতেও ব্যাপারটা তেমনি গোছের হবে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এলি বগ্‌সের বিচার শুরু হয়েছিল। নরহত্যা এবং জলদস্যুবৃত্তির অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। সরকারী কৌঁসুলী বললেন যে, বগ্‌সকে জলদস্যুদের নেতা হিসাবে একাধিক বার দেখা গেছে। বাণিজ্যতরী এবং অন্যান্য জলযানকে আক্রমণ করবার সময় এলি বগ্‌স স্বহস্তে অনেককে খুন করেছেন। এমন এক অপরাধীর ফাঁসিই হল যোগ্য শাস্তি।

টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা কিন্তু এলি বগ্‌সকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখে চমকে উঠেছিলেন। সখেদে তিনি লিখেছিলেন—বিশ্বাস করা শক্ত। এমন সুন্দর রূপবান এক যুবার বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগের সত্যতা থাকতে পারে! বগ্‌সের কোঁকড়া কোঁকড়া এক মাথা চুল। চোখ দুটি শান্ত, উজ্জ্বল। মুখখানিতে সব সময়ই হাসি লেগে আছে। মেয়েদের মত মিষ্টি মুখ, হাত দুটি সরু সরু। দুর্দান্তপনার কোন সাক্ষ্য দেহের মধ্যে নেই। এমন মানুষ খুন-জখম করবে এ কথা কে বিশ্বাস করে?

অবশ্য বগ্‌সের সুন্দর চেহারা দেখে জুরীরা টললেন। এই সুশ্রী রমণীসুলভ কমনীয় দেহে খুন-জখম করবার বাসনা কেমন করে হতে পারে? আর এ কথা তো সত্যি। এলি বগ্‌সকে তো কেউ নিজের চোখে খুন করতে দেখেনি। কাজেই জুরীরা বগ্‌সকে নরহত্যার অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন। তবে জলদস্যুর দলে তো ছিলেন বগ্‌স। আর সে কাহিনী এলি বগ্‌স সাহসের সংগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করেছে।

কাজেই দয়ালু জুরীদের অনিচ্ছাতেও শাস্তি দিতে হল। তবে মৃত্যুদণ্ড নয়। যাবজ্জীবন কারাবাস।

হাসিমুখে এলি বগ্‌স শাস্তি ভোগ করতে এগিয়ে গেলেন।

কালিমাস্তান, সারাওয়াক এবং উত্তর বোর্নিও ছাড়িয়ে আরো উত্তরে অগ্রসর হলেই টাইফুন লাঞ্ছিত চীন সাগরের সুনীল প্রসার। সম্ভবত ইতিহাস লেখা শুরু হবারও অনেক আগে থেকেই এখানের উন্মুক্ত দরিয়ায় দস্যুবৃত্তি চলে আসছে। লুণ্ঠন, অত্যাচার এবং হত্যালীলার এই কাহিনী কোন ইতিহাসেই সম্পূর্ণভাবে লেখা হয় নি। আর লিখিত হলেও চীনা ভাষায় লিপিবদ্ধ জলদস্যুদের সেই সব রোমাঞ্চ ও লোমহর্ষক কাহিনীর খুব সামান্য অংশই ইংরেজী কিম্বা অন্য কোন বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। নারী জলদস্যু শ্রীমতী চিংয়ের অসমসাহসিক অভিযানগুলির কথা, আমরা আগেই বলেছি। য়ুং লুন য়ুয়েনের লেখা কাহিনী চার্লস নিউম্যান তার 'History of the Pirates who infested the China sea' গ্রন্থে অনুবাদ না করলে শ্রীমতী চিংকে হয়ত আমরা জানতেই পারতাম না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চীন সাগরে দীর্ঘকাল ধরে যে জলদস্যুর দল আধিপত্য বিস্তার করে লুণ্ঠন এবং নরহত্যার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তাদের সকলেই চীনা নয়। জাপানী এবং য়ুরোপীয় জলদস্যুর দলও এদের বেশ কিছুটা অংশ। মধ্যযুগে তার প্রতিবেশী জাপান এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের তুলনায় চীন বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। ফলে পীতসাগর অতিক্রম করে জাপানী জলদস্যুর দল চীনের সুদীর্ঘ উপকূলে বার বার হানা দিয়েছে। কখনও কখনও উপকূলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে লুঠপাঠ, হত্যালীলা এবং বন্দী ধরে নিয়ে যেতেও তারা চেষ্টা করে। দু হাতে দুই তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে জাপানী জলদস্যুর দল চীনাদের আক্রমণ করত। বলা বাহুল্য পীতসাগর অতিক্রম করে যারা চীন ভূখণ্ডে এসে হানা দিত তারা দুঃসাহসী তো বটেই — নৃশংসতায় কাপালিক। চীনারা লড়াইতে এদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে একটা জাপানী অন্তত দশটা চীনার মহড়া নিত এবং অধিকাংশ সময়েই এই দশটাকে সাবাড় করে তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে ফিরে যেত তার বন্ধুবান্ধবের সংগে। অবশ্য ধরা পড়লে চীনারা ছেড়ে কথা কয় নি। বন্দী জাপানী জলদস্যুকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তারা নিক্ষেপ করত একটা ফুটন্ত গরম জলের বিরাট আধারে। যন্ত্রণায় কাতর চিৎকার করতে করতে বেচারা পুড়ে মরত সেদ্ধ হয়ে। সম্ভাব্য এই পরিণতির কথা চিন্তা করে জাপানীরা হয়ে উঠত আরো দুর্দান্ত। আক্রমণ করতে গিয়ে আঘাত পেয়ে মৃত্যুও ভাল। বন্দী হয়ে সেদ্ধ হয়ে মরা কখনও কাম্য নয়। ফলে জাপানী দস্যুর দল কোন সময়েই আত্মসমর্পণ করত না।

ইয়াজিরো নামক এক জাপানী জলদস্যুর কাহিনী জানা গেছে। একটা দুর্ঘটনায় পড়ে ইয়াজিরোকে উন্মুক্ত দরিয়ায় জলদস্যুর জীবন মেনে নিতে হল। এমন দুর্ঘটনার কাহিনী অবশ্য অনেক জলদস্যুর জীবনেই পাওয়া যাবে। রাগের বশে হঠাৎ কাউকে খুন করে কিম্বা জালিয়াতি বা এমনি ধরনের কোন অপরাধ করে দেশ বা সমাজ ছাড়া হয়েছে। পরে নীলসাগরের বুকেই ঘুরে বেড়িয়েছে এই সমাজচ্যুত দুর্ভাগারা। যাই হোক ইয়াজিরো এসেছিল মালাক্কায়। সেখানে পাদ্রী ফ্রান্সিস জেভিয়ার তখন ধর্মপ্রচার করছিলেন। ইয়াজিরো তারপর খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে ইয়াজিরো এল জাপানে তার গুরুদেব ফ্রান্সিস জেভিয়ারের সংগে, দুঃসাহস একরকম নাবিক ইয়াজিরোই চালনা করে নিয়ে এল। জাপান ত্যাগ করবার আগে ফ্রান্সিস সাহেব ইয়াজিরোকে জাপানের প্রতিষ্ঠিত চার্চের প্রধান পদ দিয়ে গেলেন। কিন্তু জাপানের পর্তুগীজ খৃষ্টানেরা একটা দেশী লোককে প্রধান বলে মেনে নিতে রাজী হল না। ওদের হিংসে আর ষড়যন্ত্রের কথা আঁচ করে ইয়াজিরো জাপান এবং সেই চার্চের প্রধান পদ ত্যাগ করে নীলসমুদ্রে ভেসে পড়ল। তার সেই পুরোন

দস্যুর বৃত্তি আবার নতুন করে শুরু হল। জানা গেছে যে, চীনের ভূখণ্ডে একবার হানা দেবার সময় ইয়াজিরো সংঘর্ষে মারা যায়।

কিন্তু চীনসাগরে শুধু জাপানী কেন, য়ুরোপীয় জলদস্যুও কিছু কম অত্যাচার করে নি। সর্বপ্রথম যে য়ুরোপীয় জলদস্যুটি চীনসাগরে আত্মপ্রকাশ করে তার নাম সাইমন ডি আন্দ্রাজা। লোকটি পর্তুগীজ। এসেছিল সওদাগর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু সদাগরী করে কবে ভাগ্য ফিরবে তার জন্য সে অপেক্ষা করতে রাজী হয় নি। তার চেয়ে লুঠপাট করে ধন-রত্ন গুছিয়ে নেওয়া কত সহজ। চীনে ছেলেমেয়েদের বন্দী করে দাস হিসেবে বিক্রী করলেও দুটো পয়সা আসে......আর একজন পর্তুগীজ সৈন্যাধ্যক্ষও পরে জলদস্যু হয়েছেন। এই লোকটির নাম অ্যান্টনিও ডি ফরিয়া। ১৫৪০ খৃস্টাব্দে গুজরাটের কাছে এক জলদস্যুর নৌবহরের সংগে তার সংঘর্ষ হয়। তারপর ফরিয়া নিজেই হলেন এক জলদস্যু। চীনসাগরে এলেন ভাগ্য অন্বেষণ করতে।

কিন্তু চীনসাগরের য়ুরোপীয় জলদস্যুদের মধ্যে মেন্দে পিন্টোর চেয়ে কেউ বেশী খ্যাতি পান নি। পিন্টো শুধু জলদস্যু নয়,—এক হিসেবে ভূ-আবিষ্কারক পর্যটক এবং একটি গ্রন্থের লেখকও। পিন্টোর সংগে কোয়া এিকম নামক এক মালাবার জলদস্যুর সংঘর্ষের কাহিনী জানা গেছে। কোয়া এিকমের সম্মুখীন হবার আগে পিন্টো এক চীনা জলদস্যুর সংগে মিতালী করেন। এই লোকটির নাম গুইয়া প্যানিয়ান। উল্লুক্ত পরিখায় প্রথম প্রথম যখন দুই দলের দেখা হল তখন তো উভয়ের মারামারি হবার উপক্রম। কিন্তু পিন্টো ও তার দলবল ভাবে-ভংগিতে প্রকাশ করলেন যে, তারা মারামারি চান না। দুই নেতা মিলে মিত্রতা চালিয়ে যেতে রাজী। অংশীদার হিসেবে কাজ করতেও কারো আপত্তি নেই। তাই হল। চীন সাগরে উভয়ের তরী পাশাপাশি ভেসে চলল। এক দিন পরে পিন্টোর দৃষ্টিতে একটি ...ন চিহ্নিত হল। এতে প্রায় ত্রিশজন মৃত্যুর দিন গুনছে। পিন্টো ...লোকগুলি পর্তুগীজ। ওদের কাছ জানা গেল যে, কোয়া এিকম নামক ...র এক জলদস্যু তাদের জাহাজ ... করে প্রায় দেড়শ লোককে মেরে ...। গভীর রাত্রে এই ত্রিশজন লোক প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে।

...টো তখনই চললেন কোয়া ... সন্ধানে। কয়েকদিন পর এক ...য় দলবল নিয়ে পিন্টো এসে পৌঁছুলেন একটি নদীর মোহনায়। অনুচরেরা পরদিন সংবাদ আনল সামান্য কয়েক মাইল দূরে নদীর উপর কোয়া এিকম দলবল নিয়ে বিশ্রাম করছে। অন্ধকার রাত্রিতে শিকারী মার্জারের মত নিঃশব্দে পিন্টো এসে হাজির হলেন সেখানে। কোয়া এিকমের
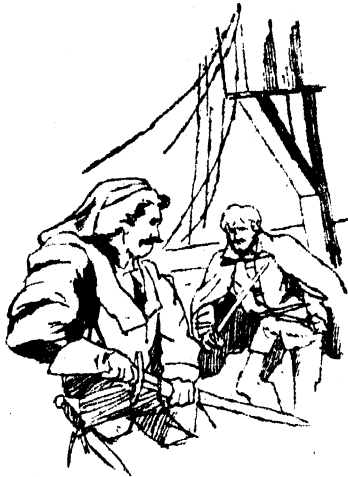
শুরু হল হাতাহাতি লড়াই

লোকেরা ওদের দেখে বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। সংগে সংগে শুরু হল ভীষণ লড়াই। বন্দুক আর বারুদের গন্ধ, আগুনের লেলিহান শিখা, জলদস্যুদের পৈশাচিক চীৎকার সমস্ত নদীবক্ষে এক বীভৎস পৃথিবীর সৃষ্টি করল। শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। কোয়া এিকমের দল তখন হারতে বসেছে। দুটি নৌকো পুড়ে ছাই,—শতাধিক দস্যু লড়াইয়ে নিঃশেষ। কোয়া এিকম এবার নিজে এলেন রণাঙ্গনে। নিজের লোকদের উৎসাহ দিতে দিতে। কিছুক্ষণের জন্য ঘোরতর লড়াই চলল। পিন্টো আর কোয়া এিকম দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ। তুমুল যুদ্ধ হল দুজনের মধ্যে। হঠাৎ পিন্টোর তরবারির আঘাতে কোয়া এিকমের লোহ টুপী ভেঙে দুটুকরো। শুধু মাথার টুপী নয়। টুপীর সংগে মাথাটাও গুঁড়ো।

জাপানী জলদস্যুদের হাতে এক বিখ্যাত মেরু পর্যটনকারী প্রাণ হারিয়েছেন। ইনি জন ডেভিস। ডেভিস শুধু পর্যটনকারী ছিলেন না, একজন দক্ষ কুশলী নাবিকও। ১৬০৪ খৃস্টাব্দে জন ডেভিস বেরিয়েছিলেন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশ্যে। টাইগার নামক জাহাজটিতে বহু দিন সমুদ্রবাসের পর ডেভিস এসে পৌঁছলেন সিঙাপুরের কাছে বিনটাঙে। এই দ্বীপটির সামান্য কিছু দূরে একটি অশক্ত বড়গোছের নৌকো সমুদ্রে মোচার খোলার মত ভাসছিল। এতে বেশ কিছু জাপানী লোককে দেখা গেল। লোকগুলির কাছে খাদ্যদ্রব্য রসদপত্র ইত্যাদি প্রায় কিছুই ছিল না। ইংরেজরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওদের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সাহায্য করল। টাইগার জাহাজের নাবিকদের সংগে জাপানীদের বেশ সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব হল। জাপানীদের সেই নৌকোটির পাশে ইংরেজদের জাহাজটি নোঙর করে রইল।

কিন্তু জাপানী লোকগুলি আসলে ছিল জলদস্যু। গভীররাতে হঠাৎ এক সময় বন্ধু ইংরেজদের তারা আক্রমণ করে বসল। উদ্দেশ্য ইংরেজ নাবিকদের সাবাড় করে জাহাজটি নিয়ে ভেসে পড়া। প্রথম আক্রমণে ইংরেজরা পর্যুদস্ত। উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে পঁচিশজন জাপানী চড়াও হয়েছে। ইংরেজদের অনেকেই তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন।

অবশ্য দস্যুদের মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি। আক্রান্ত হয়ে প্রথমটা হারলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজরা পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। শেষ জাপানীটির হাত থেকে যখন তরবারি খসে পড়ল, তখন ইংরেজ নাবিকদের মধ্যে আর কেউ অক্ষত নেই। জাহাজকে বাঁচাতে সকলকেই রক্ত দিতে হয়েছে—।

শুধু রক্ত নয়। কেউ কেউ প্রাণও দিলেন। পর্যটনকারী জন ডেভিস তাদেরই দলে। জাপানীরা প্রথম আক্রমণেই ডেভিসকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছিল।...... রক্তাপ্লুত অবস্থায় জন ডেভিস পড়ে গেলেন জাহাজের উপরেই। দেহ যখন ধীরে ধীরে দুর্বল এবং অশক্ত হয়ে উঠল, প্রাণবায়ু বইছিল ক্ষীণ মৃদুগতিতে, ডেভিস তখন ভাবছিলেন তার জীবনের পিছনে ফেলে আসা নানা দেশের কথা—।

কত দেশই তো পেরিয়ে এলেন ডেভিস,—দুর্গম উত্তরমেরুতে পর্যন্ত তার পায়ের চিহ্ন পড়েছে। আরো কত দেশ দেখবেন ভেবেছিলেন—।

আর কিছুই দেখা হল না।

মেমসাহেব

নিমাই ভট্টাচার্য

(দশ)

দোলাবৌদি,

তুমি তো জান জীবনের এক একটা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষেরও এক একটা রূপ, চরিত্র দেখা দেয়। যে ছেলেমেয়েরা রাত ন'টার পর ঘুমে ঢুলতে থাকে, পরীক্ষার আগে তারাই নির্বিবাদে রাত দেড়টা-দুটো অবধি পড়াশুনা করে। বিয়ের আগে যে মেয়েরা রাত জাগতে পারে না, শুনেছি বিয়ের পর তারা নাকি ঘুমুতেই চায় না। তাই না? কেন সন্তানের মা হবার পর? ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও মায়ের দল জেগে থাকেন। দেহটা ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু মন? অতন্দ্র প্রহরীর মত সারা রাত সে সন্তানকে পাহারা দেয়। সামান্য কটি মাসের ব্যবধানে কিভাবে একটা প্রমত্তা কুমারী শান্ত, স্নিগ্ধা, কল্যাণী জননী হয়, সে কথা ভাবলেও আশ্চর্য লাগে।

মানুষের চরিত্রের আরো কত বিচিত্র পরিবর্তন হয়। সে পরিবর্তনের ফিরিস্তি দিতে গেলে মানব সভ্যতার একটা ছোট-খাট ইতিহাস লিখতে হবে। তাছাড়া মনুষ্য-চরিত্রের এসব মামুলি কথা তোমাকে লেখার কোন প্রয়োজনও নেই। সেদিন গঙ্গার ধারে মেমসাহেবের কথা শুনে আর চোখের জল দেখে আমারও এক আশ্চর্য পরিবর্তন হলো। ঘর-কুনো মধ্যবিত্ত বাঙালীর ছেলে হয়ে কলকাতার ঐ গন্ডী-বদ্ধ জীবনের মধ্যে বেশ ছিলাম। মেম-সাহেবের প্রেমের নেশায় নিজের কর্মজীবন সম্পর্কে বেশ উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম।

সেদিন অকস্মাৎ মেমসাহেবের ভাল-বাসার চাবুক খেয়ে আমি চিন্তিত না হয়ে পারলাম না। ধুতি-পাঞ্জাবি আর কোলা-পুরী চটি পরে জামাই সেজে মেমসাহেবের সঙ্গে প্রেম করলেই যে জীবনের সব কিছু প্রয়োজন মিটবে না, মিটতে পারে না, সেকথা বোধ হয় সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম। তাছাড়া আর একটা উপলব্ধি হলো আমার। মেমসাহেব আমাকে ভালবাসে, আমাকে প্রাণমন দিয়ে কামনা করে। সে জানে একদিন আমারই হাতে তার সিঁথিতে সীমন্তিনী সিন্দুর উঠবে, আমার দীর্ঘায়ু কামনায় হাতে শাঁখা পরবে; সে জানত আরো অনেক কিছু। জানত, সে একদিন আমার সন্তানের জননী হয়ে সগর্বে পৃথিবীর সামনে দাঁড়াবে।

সারা দুনিয়ার সমস্ত মেয়ের মত সেও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল তার স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু যৌবনের কাল-বৈশাখীর ধুলি ঝড়ে মেমসাহেবের স্বচ্ছ দৃষ্টি হারিয়ে যায় নি, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বাস্তবের মাটি ছেড়ে আরব্য উপন্যাসের অলীক অরণ্যে হারিয়ে যায় নি। তাইতো সে চেয়েছিল তার ভালবাসায় আমার জীবন ভরে উঠুক। সে চায়নি পৃথিবীর অসংখ্য কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘ তালিকায় শুধুমাত্র আর দুটি নামের সংযোজন।

তাইতো সেদিন ফেরার পথে মেমসাহেব আমাকে অন্যমনস্ক দেখে ডাকল, শোন।

আমি নিরুত্তর রইলাম। মেমসাহেব আমার পাশে এসে হাতটা ধরে ডাকল, শোন।

'বল'।

'রাগ করেছ?'

'রাগ করব কেন?'

'আমাকে ছেড়ে তোমাকে বাইরে যেতে বললাম বলে।'

'না, না।'

আমরা দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম।

মেমসাহেব আবার শুরু করে, 'আমার সর্বস্ব কিছু দিয়েও যদি তোমার সত্যকার কল্যাণ করতে না পারি, তাহলে আমি কি করলাম বল!'

একটু থামে। আবার বলে, তুমি শুধু আমার স্বামী হবে, শুধু আমিই তোমাকে মর্যাদা দেব, ভালবাসব, তা আমি চাই না। আমি চাই তুমি আমাদের দুজনের গন্ডির বাইরেও অসংখ্য মানুষের ভালবাসা পাও, তাঁদের স্নেহ-ভালবাসা পাও, তাঁদের আশীর্বাদ পাও।

আবার একটু থামে, একটু হাসে। তারপর ফিস ফিস করে বলে, কত মেয়ে তোমাকে চাইবে অথচ শুধু আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে পাবে না!

হাত দিয়ে আমার মুখটা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ভাবতে পার তখন আমার কি গর্ব কি আনন্দ কি আত্মতৃপ্তি হবে?

কি উত্তর দেব? আমি শুধু হাসি।

বাসায় ফিরে অনেক রাত অবধি অনেক কিছু ভাবলাম। পরের ক'টা দিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে নিজেও কিছু টাকা জোগাড় করলাম। বাইরের খবরের কাগজ সম্পর্কে কিছু কিছু খবরও জেনে নিলাম।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই আমি মাদ্রাজ মেলে চড়লাম। মেমসাহেব আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল। বলল, আমার মনে হয় তোমার নিশ্চয়ই কিছু হবে। তবে না হলেও ঘাবড়ে যেও না। সারা দেশে তো কম কাগজ নেই। আরো দু-চার জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে কোথাও না কোথাও চান্স পাবেই।

আমি নিরুত্তর রইলাম। সামনের লাল আলো, সবুজ হলো, গার্ড সাহেবের বাঁশি বেজে উঠল।

মেমসাহেব বলল, সাবধানে থেকো। যেখানে সেখানে যা তা খেও না।......চিঠি দিও।

আমি মুখে কিছু বললাম না। শুধু মেমসাহেবের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম।

মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে হঠাৎ পুরানো দিনের এসব কথা মনে হলো।...

রবিবার সকাল। আটটা কি সাড়ে আটটা বাজে। ঘুম ভেঙে গেলেও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে তখনো চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। আমাদের সিনিয়র সাব-এডিটর শিবুদা এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই নির্বিবাদে চাদরটা টান মেরে বললেন, ছি, ছি, এখনও ঘুমুচ্ছিস।

আমি বললাম না, না, ঘুমুচ্ছি কোথায়! এমনি শুয়ে আছি।

শিবুদা উপদেশ দেন, এত বেলা অবধি ঘুমোলে কি জীবনে কিছু করা যায়।

ওরে রে! আমি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ি। বলি, আচ্ছা শিবুদা, কর্পোরেশনের যেসব কর্মচারীরা শেষ রাত্তিরে উঠে গ্যাসপোস্টের আলো নিবিয়ে বেড়ায় আর রাস্তায় জল দেয়, তাদের ভবিষ্যত কি খুব উজ্জ্বল?

শিবুদা দাবড় দেয়, তুই বড্ড বাজে বকিস। এই জন্যই তোর কিছু হচ্ছে না।

'একটু আগে বললে, বেলা করে ঘুমুবার জন্য, এখন বলছ বেশী কথা বলার জন্য আমার কিছু......'

'আঃ তুই থামবি না শুধু শুধু তর্ক করবি?'

উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরী হয়ে খোকার দোকান থেকে দু'কাপ চা নিয়ে শিবুদার সম্মুখে হাজির হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর শিবুদা, কি ব্যাপার? হঠাৎ এই সাত-সকালে?

শিবুদা নীল সুতোর লম্বা বিড়ি[illegible] একটা টান মেরে সারা ঘরটা দুর্গন্ধে [illegible]ক দিল। বলল, 'চল, একটা ইন্টা[illegible]ট [illegible]নো লোকের কাছে যাব।' [illegible]লকা

'কার কাছে?'

'আগে চল না, তারপর দেখবি।' [illegible]পর

শিবুদার সঙ্গে তর্ক করা [illegible]তে [illegible]বলে সুতরাং অযথা সময় নষ্ট না করে [illegible]সাহস অনুসরণ করলাম। ট্রাম-বাসে [illegible]দেওয়া নামলাম। ক'বার মনে নেই, তবে দু[illegible] তো হবেই। তারও পরে পদব্রজে অ[illegible] দিয়ে বেশ খানিকটা। আর একটু এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই মহাপ্রস্থানের পথ পেতাম কিন্তু সেই মুহূর্তে শিবুদা বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, আর এগিয়ে যাস না।

একটা ভাঙা পোড়োবাড়ীর মধ্যে ঢুকেই শিবুদা হাঁক দিল, মধুদা!

উপরের বারান্দা থেকে একটা ছোট্ট

য় জবাব দিল, শিবুকাকু। বাবা উপরে।
আমরা সোজা তিনতলার চিলেকোঠায় উঠে গেলাম।' মধুদাকে দেখেই বুঝলাম, তিনি জ্যোতিষী কিন্তু পেশায় ঠিক সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

মধুদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবুদা।

মধুদা কাগজপত্র সরাতে সরাতে বললেন, এর মধ্যেই একটু কষ্ট করে বসুন ভাই।

বসলাম। শিবুদা-মধুদা প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে শনি-মঙ্গল-রাহু-কেতু নিয়ে এমন আলোচনা করলেন যে, আমি তার এক বর্ণও বুঝলাম না।

ঘন্টাখানেক পরে শিবুদার অনুরোধে মধুদা আমার জন্ম সন-তারিখ ইত্যাদি ইত্যাদি জেনে নিয়ে চটপট একটা ছক তৈরী করে ফেললেন। একটু ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, বেশ ভাল।

শিবুদা প্রশ্ন করেন, ভাল মানে?

মধুদা মনে মনে হিসাব-নিকাশ করতে করতেই জবাব দেন, ভাল মানে ভাল; তবে বেশ কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

নাকে একটু নস্য দিয়ে কর গুনতে গুনতে বলেন, তাছাড়া একটু বিলম্বে উন্নতির যোগ।

শিবুদা ছকটার পর ঝুঁকে পড়ে বলেন, হ্যাঁগো, মধুদা, এর যে ত্রিকোণে মঙ্গল!

'তবে নবমে নয়, পঞ্চমে। তবুও বেশ ভাল ফল দেবে।'

মধুদা সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। আজ সবকিছু মনে নেই। তবে ভুলিনি একটি কথা। বলেছিলেন, শুক্র স্থানটি বড় ভাল। কোন মহিলার সহায়তায় জীবনে উন্নতি হবে।

সেদিন কথাটি বিশ্বাস করিনি কিন্তু আজ মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে কথাটা মনে না করে পারলাম না। আগে কোন দিন কল্পনা করতে পারি নি আমার জীবনের ...ক্ষ প্রান্তর মেমসাহেবের স্রোতস্বিনী ...ায় ধন্য হবে। নাটক-নভেলে এসব ...ভব হতে পারে কিন্তু আমার জীবনে? ...ন নৈব চ।

...মাদ্রাজ মেলের কামরায় বসে মনে ম... মেমসাহেবের স্বপ্ন, সাধনা, ভালবাসা আ... একেবারে ব্যর্থ হতে পারে না। লোক... ...ার মাদ্রাজ যাওয়া ব্যর্থ হলো না। এখানে ... এক্সপ্রেসের এডিটর বললেন, হয়, ...পেসের বড় অভাব। কলকাতার ... স্টোরি ছাড়া কিছু ছাপার স্পেস কিছুই... মুস্কিল। তাইতো কলকাতায় চেয়ে। ...ইম লোকের দরকার নেই।
ব্যাপার... মনে মনে দশ হাত তুলে মাকে ... শতকোটি প্রণাম জানালাম।
...স দেড়শ' টাকা। আনন্দে প্রায় ...হারা হয়ে পড়লাম। দৌড়ে মাউন্ট রোড টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে মেমসাহেবকে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম, মিশন সাকসেসফুল রিমেমবারিং ইউ স্টপ স্টার্টিং টুমরো মাদ্রাজ-মেল।

হাওড়া স্টেশনে মেমসাহেব আমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আর বেশী আড্ডা দেবে না। মন দিয়ে কাজ করবে।

'নিশ্চয়ই, তবে—'।

বাঁকা চোখে মেমসাহেব বলে, তবে মানে?

'সাত দিন পরে কলকাতা ফিরেই কাজ শুরু করবো?'

'তবে কি করবে?'

'একটা দিন অন্তত তোমাকে......'

মেমসাহেব হাসতে হাসতে বলে; এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা.........................

শুধু আমার নয়, মেমসাহেবেরও তো ইচ্ছা করে আমার কাছে আসতে, প্রাণভরে আমাকে আদর করতে। তাছাড়া এই ক'দিনের অদর্শনের জন্য তাঁর মনের মধ্যে অনেক ভাব, ভাষা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার এই জেলখানার বাইরে একটু মুক্ত আকাশের তলায় আমাকে নিবিড় করে কাছে পাবার জন্য ওর মনটাও আনচান করছিল। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল আমার নতুন জীবনের দ্বারদেশে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। তাইতো আমার কাছ থেকে একটু ইঙ্গিত পেয়েই বিনা প্রতিবাদে প্রস্তাবটি মেনে নিল।

'জানি তোমার মাথায় যখন একবার ভূত চেপেছে তখন কিছুতেই ছাড়বার পাত্র তুমি নও,' মেমসাহেব মন্তব্য করে।

'তাই বুঝি', আমি বলি। 'তোমার যেন কোন কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কোন কিছু নেই।'

একটি দিনের জন্য আমরা দুজনে আবার হারিয়ে গেলাম। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের কেউ জানল না গঙ্গা যেখানে সাগরের দিকে উন্মামবেগে ছুটে চলেছে, যেখানে সমস্ত সীমা অসীম হয়ে গেছে, বন্ধন যেখানে মুক্তি পেয়েছে, সেই কাক-দ্বীপের অন্তহীন মহাশূন্যে আমাদের দুটি প্রাণবিন্দু বিলীন হয়ে গেল।

মেমসাহেব আমার বুকের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করে বলল, আমি জানি তুমি এমনি করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে।

'তুমি জান?'

'হ্যাঁ'।

'কেমন করে জানলে?'

'খবরের কাগজ বলতে তুমি যে পাগল সে কথাটা কি আমি জানি না?' তারপর বেশ গর্ব করে মেমসাহেব বলল, খবরের কাগজকে না ভালবাসলে এমন পাগল কেউ হতে পারে না।

'তাতে কি হলো?'

'কিচ্ছু হয়নি। মেমসাহেব বোধ করি আর আমার প্রশংসা করা সমীচীন মনে করে না।

একটা দমকা ঝড়ো হাওয়া এলো। সামনের সমুদ্রমুখী ভাগীরথীর অনন্ত জলরাশি ফুলে ফুলে নাচানাচি শুরু করে। ভাগীরথী যেন আরো তেজে, আরো আনন্দে সমুদ্রের দিকে দৌড়াতে লাগল।

মেমসাহেব উঠে বসে বলে, এই শান্ত গঙ্গা হিমালয়ের কোল থেকে প্রায় হাজার দেড়েক মাইল চলবার পর সমুদ্রের কাছা-কাছি এসে কত বিরাট, কত বেশী প্রাণ-চঞ্চল। মানুষও ঠিক এমনি। সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে বৃহত্তর জীবনের কাছে এলে মানুষ অনেক উদার, অনেক প্রাণচঞ্চল হয়। তাই না?

আমি চুপ করে থাকি। কোন কথা না বলে মেমসাহেবের উদার গভীর চোখ দুটোকে দেখি।

মেমসাহেব খোঁপাটা খুলে আমার কাঁধের পর মাথাটা রেখে দেয়। সামনে বুকের পর দিয়ে তাঁর দীর্ঘ অবিন্যস্ত বিনুনি লুটিয়ে পড়ে নীচে।

আমি বলি, আচ্ছা মেমসাহেব, তুমি তো আমার উন্নতির জন্য এত ভাবছ, এত করছ কিন্তু আমি তো তোমার জন্য কিছু করছি না।

'আমার জন্য আবার কি করবে? আমার জন্যই তো তুমি তোমাকে তৈরী করছ।'

'কিন্তু তবুও—'

'এতে কোন কিন্তু নেই। হাজার হোক আমি মধ্যবিত্ত বাঙালীঘরের মেয়ে। যতই লেখাপড়া শিখি না কেন, স্বামী-পুত্র নিয়েই তো আমার ভবিষ্যত।'

মেমসাহেব থামে। দৃষ্টিটা তার চলে যায় দিগন্তের অন্তিম সীমানায়। মনটাও বোধহয় হারিয়ে যায় ভবিষ্যতের অজানা পথে। আমি বেশ বুঝতে পারি বর্তমান নিয়ে মেমসাহেব একটুও চিন্তা করে না। তার সব চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা আগামী দিনগুলিকে নিয়ে।...সে স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন? না, না, স্বপ্ন কেন হবে? সে স্থির ধারণা করে নিয়েছে চাকরি-বাকরি ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে সে মনপ্রাণ দিয়ে শুধু সংসার করবে, আমাকে সুখী করবে, আমার কাজে সাহায্য করবে। তারপর? তারপর, সে মা হবে।

ইদানীংকালে মেমসাহেব একবার নয়, বহুবার স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করার কথা বলল। ওর ছেলে কি করবে, মেয়ে কেমন হবে, সে-কথাও বলেছে বেশ কয়েকবার। শুনতে ভালই লাগে। প্রথমে সারা মন আনন্দে, আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায়, কিন্তু একটু পরে কেমন যেন খটকা লাগে। হাজার হোক মানুষের জীবন তো! কোথা দিয়ে কি হয়ে যায়, কে বলতে পারে? আমি বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছি, দেখেছি অনেক মানুষ অনেক রকম স্বপ্ন দেখে কিন্তু ক'জনের জীবনে সে স্বপ্ন সার্থক হয়? তাইতো মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আনন্দ পাই কিন্তু তার ভবিষ্যত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনলে আমার বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে।

সেদিন সমুদ্রগামী চঞ্চলা আত্মহারা ভাগীরথীর পাড়ে বসে মেমসাহেবের কাছে আবার স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার করার কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে ওর কপালে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বললাম, তুমি কি জান তুমি স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী হবেই?

ঐ লম্বা ভ্রু দুটো টান করে চোখ ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, নিশ্চয়ই।

'নিশ্চয়ই?'

মেমসাহেবের ঠোঁটের কোণায় একটু বিদ্রুপের হাসি দেখা দেয়। বলে, কেন, তুমি কি আর কাউকে নিয়ে সুখী হবার কথা ভাবছ?

'মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কিন্তু তুমি কি ঘাড় থেকে নামবে?'

'আমি তোমার ঘাড়ে চেপেছি, না তুমি আমার ঘাড়ে চেপেছ?' একটু থামে আবার বলে, আর কেউ এসে দেখুক না! মজা দেখিয়ে দেব।

'তাই বুঝি?'

'তবে কি? তোমাকে পূজো করব?'

'আগেকার দিনে পতিব্রতা স্ত্রীরা স্বামীকে সুখী করার জন্য বহু বিবাহে কোন দিন আপত্তি করতেন না, তা জান?'

'শুধু আগেকার দিনের কথা কেন বলছ? আরও একটু এগিয়ে প্রাগৈতিহাসিক দিনে, যখন জঙ্গলে বাস করতে তখন তো তোমরা পুরুষেরা আরো অনেক কান্ড করতে। সুতরাং এখনও তাই কর না!'

একটু ঠান্ডা মিঠে হাওয়া বয়ে যায়। মেমসাহেব এক মুহূর্তে বদলে যায়। দু'হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে বলে, আমি জানি তুমি আর কাউকে কোন দিন ভালবাসতে পারবে না।

'জান?'

'একশ'বার, হাজার বার জানি।'

'কেমন করে জানলে?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'বুঝব না?'

'তুমি যদি মেয়ে হতে তাহলে বুঝতে।'

'তার মানে?'

'সন্তানের মনের কথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি স্বামীদের মনের কথাও আমরা জানতে পারি।'

দোলাবৌদি, তুমি তো মেয়ে। তাই বুঝবে কত গভীরভাবে সারা অন্তর দিয়ে ভালবাসলে এসব কথা বলা যায়।

সাদার্ন একসপ্রেসের কাজ শুরু করে দিলাম বেশ মন দিয়ে। মাঝে মাঝে মন চাইত ফাঁকি দিই, মেমসাহেবকে নিয়ে আড্ডা দিই, স্ফূর্তি করি কিন্তু পারতাম না। ওকে ঠকাতে বড় কষ্ট হতো। যার সমস্ত জীবন-সাধনা আমাকে কেন্দ্র করে, যে আমার মঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে নিজের কল্যাণ দেখতে পায়, তাকে মুহূর্তের জন্যও বঞ্চনা করতে আমার সাহস বা সামর্থ হয় নি।

ঝড়ের বেগে না হলেও আমি বেশ নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলেছিলাম। মেমসাহেবকে বুকের মধ্যে পেয়ে আমি আমার জীবন-নদীর মোহনার কলরব শুনতে পেতাম।

মাস কয়েক পরে আমি আবার বাইরে বেরুলাম। এবার লক্ষ্ণৌ। কিছুকাল ক্রনিকেলের এডিটরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং সে পরিচয়ের সূত্র ধরেই তার কাছে হাজির হলাম। বললেন, কলকাতায় করসপন্ডেন্টের দরকার নেই তবে সপ্তাহে একটা করে ওয়েস্টবেঙ্গল নিউজ লেটার ছাপতে পারি।

এডিটর মিঃ শ্রীবাস্তব খোলাখুলিভাবে জানালেন, বাট আই কান্ট পে ইউ মোর দ্যান পঁচাত্তর হানড্রেড।

আমি বললাম, দ্যাটস অল রাইট। লেট আস মেক এ বিগিনিং।

আমার জীবনে এই পরম দিনগুলিতে মেমসাহেবকে স্মরণ না করে পারি নি। তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যেত। আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলেই বৃষ্টিপাত হয় না। সে কালো মেঘে জলীয়-বাষ্প থাকা প্রয়োজন। একটি ছেলের জীবনে একটি মেয়ের উদয় নতুন কিছু নয়। আমার জীবনেও হয়ত আরো কেউ আসত কিন্তু আমি স্থির জানি পৃথিবীর অন্য কোন মেয়েকে দিয়ে আমার কর্মজীবনের অচলায়তনকে বদলান সম্ভব হতো না।

তাছাড়া মেয়েরা একটু আদর পেতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। একটু সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, একটু বৈশিষ্ট্য প্রায় সব মেয়েরাই কামনা করে। সেই সুখ, সেই স্বাচ্ছন্দ্য পাবার জন্য অপ্রয়োজন হলে কোন মেয়ে আত্মত্যাগ করবে? খুব সহজ সরল চিরাচরিত প্রথায় মেমসাহেবের জীবনে এসব কিছুই আসতে পারত কিন্তু সে তা চায় নি। সে চেয়েছিল, নিজের প্রেম-ভালবাসা, দরদ-মাধুর্য অনুপ্রেরণা দিয়ে নিম্নবিত্ত বাঙালীঘরের একটি পরাজিত যোদ্ধাকে আবার নতুন উদ্দীপনায় আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তুলতে।

আমি জানতাম, আমার কর্মজীবনের এই সাময়িক সাফল্যের কোন স্থায়ী মূল্য নেই, নেই কোন ভবিষ্যত। কিন্তু তা হোক। এইসব ছোটখাট অস্থায়ী সাফল্যের দ্বারা আমার হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আমি ফিরে পেলাম। নিজের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে একটু আস্থা এলো আমার মনে।

সর্বোপরি একথা আমি উপলব্ধি করলাম যে, শুধু কলকাতাকে কেন্দ্র না করেও আমার ভবিষ্যত সাংবাদিক জীবন এগিয়ে যেতে পারবে। বরং একবার মাথা নাম স্মরণ করে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ রঙ্গমঞ্চে বেরিয়ে পড়লে ফল আরো ভাল হবে।

তুমি বেশ বুঝতে পারছ আমি কেন ও কার জন্য একদিন অকস্মাৎ কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লী চলে এলাম। আজ আমার জীবন কত ব্যস্ত, কত বিস্তৃত। সাংবাদিক হয়েও সেই উত্তরে দার্জিলিং, পূর্বে গৌহাটি, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর ও পশ্চিমে চিত্তরঞ্জন-সিন্দ্রীর মধ্যে আজ আমি বন্দী নই। বাংলাদেশকে আমি ভালবাসি। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আপনজন মনে করি কিন্তু সমস্যাসংকুল ও নিত্য নতুন চিন্তায় জর্জরিত হয়ে বাঁচবার কথা ভাবতে গেলে ভয় হয়। যদি আনন্দ করে বাঁচতে না পারলাম, যদি এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-মাধুর্য উপভোগ করতে না পারলাম, তবে শুধু পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত মিউজিয়ামের জীবন কাটাবার মধ্যে মানসিক শান্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু স্বর্গ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে না।

আজ যত সহজে এসব কথা [illegible] ব্যাপারটি তত সহজ নয়। যে [illegible] জন্মেছি, যে পরিবেশে মানুষ হয়ে [illegible] জীবন শুরু করেছি, সেখানকার [illegible] সীমিত ছিল। আজ জীবিকার [illegible] বহুজনকে বহুদিকে ছড়িয়ে পড়তে [illegible] কিন্তু সেদিন জীবিকার জন্য, [illegible] সাহস জন্য আমার পক্ষে সোনার বাংলা [illegible] করা অত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল [illegible] কিন্তু আমি সেদিন হাসিমুখেই হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেলে চড়েছিলাম।

থাক সেসব পরে বলব। সমস্ত কাহিনী শুনলে তুমি চমকে যাবে।

খোকনদাকে চিঠি দিতে বলো।

তোমাদের বাচ্চু
(ক্রমশঃ)

এলোমেলো কলকাতার স্থান মাহাত্ম্য

গোপেন্দ্র সরকার

অযোধ্যায় গেলে রাম হওয়ার কথা যদিও শোনা যায় না তবে লংকায় গিয়ে রাবণ বনে যাওয়ার খবর প্রায়ই কানে আসে। গ্রামের ভালমানুষ জবুথবু ছেলেটি কলকাতায় লেখাপড়া করতে এসে যে কলকাতার রামেদের আগে রাবণদের খপ্পরে পড়বে, এ আশংকা গ্রাম্য অভিভাবকদের বহুকালের। এরকম ঘটেছেও প্রায় এবং তাই নিয়ে কতই অপরূপ উপন্যাস রচিত হয়ে গেছে। অনেকে বলবেন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিই এর প্রকৃষ্ট কারণ। হয়তো তাই, কিন্তু কলকাতার স্থান-মাহাত্ম্য যে একেবারে নেই একথা হলপ করে বলা যায় না। নচেৎ ১৬৯০ সালের ২০শে আগস্ট জব চার্ণকের নেতৃত্বে যে কয়েকজন ইংরাজ প্রায় পরিব্রাজকের মনোভাব নিয়েই নিজেদের জীবন বিপন্ন জেনেও সুতানুটির ঘাটে পদার্পণ করেছিলেন তাঁদেরই বা হঠাৎ এমন কি দুর্বলতা দেখা দিতে পারে যে সংগে সংগে তাঁরা হয়ে উঠলেন এমনই দুর্নীতিপরায়ণ যে তিন বছর কাটতে না কাটতেই ভারতে তৎকালীন প্রধান ইংরাজ কেন্দ্র মাদ্রাজ থেকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পাঠাতে হল স্যার জন গোল্ডসবরাকে সুতানুটিবাসী ইংরাজদের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, অনাচার ও রুচি-বিকার রোধ করতে? এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপীয় সমাগম বা কলকাতা পত্তনের আগে জনবিরল সুতানুটি ও সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসী মুষ্টিমেয় গৃহস্থ পরিবারকে সারাক্ষণ প্রাণ হাতে করেই বাস করতে হত, যার প্রধান দুটি কারণ হল, প্রথম, সে অঞ্চল জুড়ে ছিল দুর্দান্ত ঠ্যাঙাড়ে ডাকাত দলের প্রাদুর্ভাব আর দ্বিতীয়, সেখানে মানুষের চেয়ে বাস [illegible]ল বেশী হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ও [illegible]মধর সরীসৃপ এবং কীট-পতঙ্গের।

কলকাতাবাসীর আন্দোলনপ্রবণতায় কলকাতার স্থান-মাহাত্ম্যের অবদান [illegible]র নেই বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় [illegible] প্রসংগে সত্যিই ভাববার বিষয় [illegible]ে মাদ্রাজ নয়, বোম্বাই নয় খোদ [illegible]তা নিবাসী ইংরাজদের আয়োজিত [illegible]নের চাপে পড়ে ভারতে ইংরাজদেরই [illegible]কোম্পানী-সরকার ব্যতিব্যস্ত হয়ে [illegible]? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত বেশ [illegible] পর ১৭৭৩ সালে কলকাতায় [illegible]কোর্ট ও জেলাগুলিতে দেওয়ানী ও [illegible]জদারী ব্রিটিশ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু স্থানীয় ইংরাজদের বিচারের ক্ষমতা আইন করেই জেলা আদালতগুলির আওতার বাইরে রাখা হয়। তারপর ১৮৩৬ সালে ৯ই মে বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড এই আইন সংশোধন করে ইংরাজদের জেলা দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন করেন। এই নতুন আইনকে "ব্ল্যাক অ্যাক্ট" বা কালা-কানুন আখ্যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে কলকাতার ইংরাজরা এক তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিলেন। টাউন হলে বসেছিল জনবহুল প্রতিবাদ সভা যাতে স্থানীয় বে-সরকারী ইংরাজকুল ছাড়াও যোগ দিয়েছিলেন দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়গণ (যার সমর্থনযোগ্য কারণ পরে বর্ণিত হচ্ছে) আর ইংলণ্ডেও পাঠানো হল পিটিশনের পর পিটিশন। যাতে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছিল যে স্থানীয় কোম্পানী-সরকার একটা বিধি বহির্ভূত গর্হিত অনধিকার চর্চা করে বসেছেন। স্বনামধন্য টমাস ব্যারিংটন ম্যাকলে (পরে লর্ড ম্যাকলে) সাহেব তখন ভারতের ব্রিটিশ বড়লাটের আইন সচিব (তিনিই এই পদ সর্বপ্রথম লাভ করেন) পদে অধিষ্ঠিত। তিনি নতুন ব্যবস্থার সমর্থনে ভারতে কোম্পানী-সরকারের তরফ থেকে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষ সমীপে যে মন্তব্যগুলি পেশ করেন তাতে তিনি লিখেছিলেন, "এখানকার মফঃস্বলের ও মাদ্রাজ-বোম্বাই-এর ইংরাজ অধিবাসীরা এই নতুন আইনে সন্তুষ্ট; কেবল কলিকাতাবাসী ইংরাজেরা ইহার বিপক্ষে। আর যদি তাহাদের আন্দোলন সফলতা লাভ করে তাহা হইলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। তবে ইংলণ্ডে কোম্পানীর কোর্ট ও পার্লামেন্ট মহাসভার উপর আমার এত অধিক বিশ্বাস আছে যে আমি জানি ইহা কিছুতেই সফলতা লাভ করিবে না। আমি আশা করি যে নতুন আইনটি এইবার এমনভাবে সমর্থিত হইবে যে ভারতবর্ষের সাধারণ মঙ্গলের জন্য যখন আইন করা হইবে তাহাতে সে সময়ে এবং উত্তরকালে কলিকাতার আন্দোলন উপেক্ষা করা যাইবে।'

সে যাই হোক, এইবারকার মতন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই নতুন আইনের যথাযথ আলোচনার পর ম্যাকলের অভিমত বিপুল সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও কিন্তু কলিকাতা-বাসী ইংরাজদের আন্দোলন-প্রবণতা বিন্দু-মাত্রও হ্রাস পায়নি। বরং অদূর ভবিষ্যতে—১৮৪৯ সালে—তাদের আন্দোলন এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে, তাকে উপেক্ষা করা দূরে থাক ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তার সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়।

ঐ বছর তদানীন্তন বড়লাটের আইন-সচিব ড্রিংকওয়াটার বীটন বা যেভাবে তিনি বাংলাদেশে সাধারণ্যে বিখ্যাত 'বেথুন'—কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজ এঁরই নামাঙ্কিত—একটি প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়া প্রকাশ করেন যার মারফৎ স্থানীয় ইংরাজদের মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতেরও বিচারাধীন করতে চাওয়া হয়। আর যায় কোথায়—কলকাতার বে-সরকারী ইংরাজ মহল যেন জ্বলে উঠলো। দেওয়ানী আইন প্রবর্তনের সময় যেরকম আন্দোলন হয়েছিল এবার হল তার সহস্র গুণ বেশী
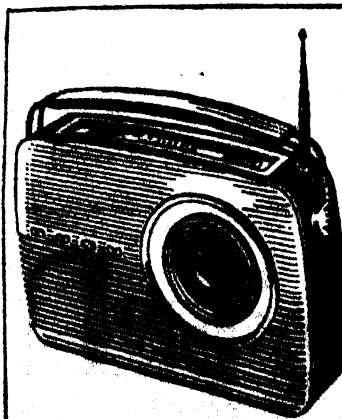
জোরদার। ইংরাজেরা টাউন হলে তো সভা করলেনই তাছাড়া স্বদেশ ইংলণ্ডেও এই নিয়ে আন্দোলন করার জন্য নিজেদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ষাট হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করে ফেললেন। এইখানে এই আন্দোলনগুলির বিষয়ে—'সংবাদ প্রভাকর'-এ ২রা মার্চ ১৮৫২ সালে 'বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে যা লিখিত হয়েছিল তা উধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—

“ইংরাজেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করেন একারণ এতদ্দেশে প্রবাসি হইয়াও উত্তম নিয়মের অধীনে আছেন। প্রদেশীয় জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের এমত ক্ষমতা নাই যে কোন অপরাধি ব্রিটিশ প্রজার প্রতি দন্ড বিধান করিতে পারেন। যদিও এই নিয়ম নিতান্ত রাজনীতি বিরুদ্ধ। অধিবাসি ও প্রবাসিদিগের নিমিত্ত পৃথক পৃথক নিয়ম করাই অন্যায়। তথাচ বহুকালাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। বিজ্ঞবর ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত তামস বেবিংটন মেকালি সাহেব ঐ অন্যায় নিয়মের উচ্ছেদের জন্য সুনিয়মের সূচনা ও তদ্বিষয়ে অতি বাহুল্যরূপে আপন অভিমত ব্যক্ত করাতে সাহেবরা একেবারে দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আপত্তি করিয়াছিলেন। টৌন হালে ও অন্যান্য স্থানে বড় বড় সভা হইয়াছিল বক্তৃতার ধূমধামের সীমা ছিল না, সকল স্থানে চাঁদার অনুষ্ঠান হইয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল। কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা এইরূপ ধূমধামে ভীত হইয়া ঐ ব্যবস্থা সকল প্রকাশ করিতে পারেন নাই, কৌন্সেলের আলমারিতে রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে মেং বেথুন সাহেবও ঐ নিয়মাবলি পুনঃ প্রকটন পূর্বক তন্নির্ধারণে যত্নবান হইয়া সেই প্রকার আপত্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধেও টৌন হালে ও প্রদেশীয় অনেক স্থানে সভা হইয়াছিল, মেং ডিকেন্স সাহেব টেবিলের উপর চেয়ার দিয়া তাহার উপর দন্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, প্রাগুক্ত নিয়মের প্রতি সাহেবদিগের আপত্তির কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় নাই।”

দ্বিতীয় কালা-কানুনে বিরোধী আন্দোলনের সময়ে ইংরাজ বণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র “বেঙ্গল হরকরা”র ও “ইংলিশম্যান”এর স্তম্ভগুলি প্রস্তাবিত খসড়া আইনের সমালোচনায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল—কোম্পানী-সরকারও তাদের কঠোর সমালোচনা ও কটূক্তি থেকে রেহাই পায়নি।
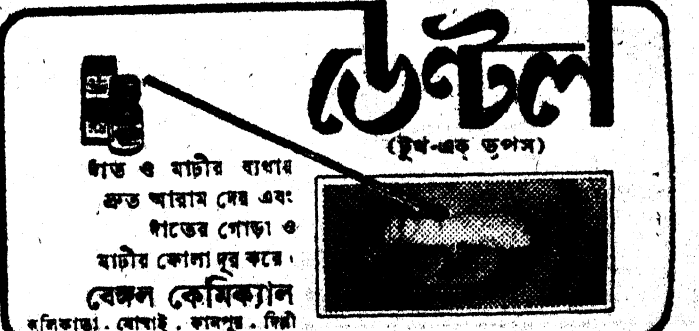
আগেই বলা হয়েছে যে প্রথমোক্ত কালা-কানুন বিরোধী আন্দোলনের সময় কলকাতার বেসরকারী ইংরাজদের—যাদের দলনেতা ছিলেন টার্টন ও ডিকেন্স—সঙ্গে দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়রা হাত মিলিয়েছিলেন। এঁদের যুক্তির মধ্যে সারবস্তু যথেষ্ট মাত্রাতেই ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন ইউরোপীয়রা যাতে অধিক সংখ্যায় এদেশে বসবাস করে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে ভারতের শিল্পোন্নতিতে সহায়ক হয়। তারা চেয়েছিলেন ভারতের আধুনিক ধারায় অগ্রগতির পথ সুগম করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে। ইউরোপীয়দের অসুবিধায় ফেলে অসন্তুষ্ট করলে তারা যে কতটা এদেশে বসবাস ও শিল্প-প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রহী হবেন সে বিষয়ে দ্বারকানাথরা যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন। পরবর্তীকালে কিন্তু দেখা গেছে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কালো ও সাদা চামড়ার আইনগত সমতা রক্ষার ক্ষীণ প্রচেষ্টা এদেশে ইউরোপীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের পথে কিছুমাত্র অন্তরায় হয়নি তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, ক্ষেত্রবিশেষে আইনের চোখে কাগজে-কলমে এই সমতা স্বীকৃত হয়ে থাকলেও অসাধু ও স্বজাতীয় বণিক-অন্তরঙ্গ ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেটদের কল্যাণে কার্যকরীভাবে তার প্রায় অস্তিত্বই ছিল না। যেভাবেই হোক ইউরোপীয়দের দ্বারা এদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও প্রসার যে শেষ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে হয়েছে একথা বলতেই হবে।

ব্রিটিশ আমলের মাঝামাঝি একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই ছিল যে সেকালে দেশীয় শিক্ষিত সমাজের মতামতের উপর, কি ভারতে কি ইংলন্ডে, ব্রিটিশ সরকারীমহলে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত। যেমন রেল লাইন প্রবর্তনের সময়ে তেমনি শিক্ষানীতি নির্ধারণ বা নতুন আইন প্রণয়নের সময়েও দেশীয় নেতাদের অভিমত কার্যকরী ভাবেই অনেক ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে। “কালা-কানুন” বিরোধী বে-সরকারী ইংরাজ মহলেও তাই দেশীয় শিক্ষিত সমাজের সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

বেথুনের খসড়া আইন প্রকাশের সময় ভারতীয়দের অবিসম্বাদী নেতা ছিলেন বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। “ঘোষ কেলসেল কোম্পানীর” অংশীদার রামগোপালের তখন সরকারী ও বেসরকারী ইংরাজ মহলে অশেষ প্রতিপত্তি—ইংরাজ ব্যবসায়ীরা তাঁকে রবার্ট বলে ডাকতেন। টার্টন, ডিকেন্সরা উঠে পড়ে লাগলেন তাঁর সমর্থন লাভ করতে কিন্তু রবার্ট হ্যাঁ বলেন না না-ও বলেন না। একদিন 'হরকরা'য় একটি (উড়ো) খবর ছাপা হ'ল যে, বেথুনের 'কালা-কানুন'টির সমর্থন করবার জন্য বহু সংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোক সেরিফ সাহেবের কাছে একটি সভা ডাকবার আবেদন করেছেন এবং তাঁদের নেতৃত্ব করছেন নাকি স্বয়ং রামগোপাল ঘোষ। এমনকি 'হরকরা'র পরবর্তী এক বিশেষ সান্ধ্য সংখ্যায় ছাপা হ'ল এই খবরটির উপর ভিত্তি করে গভীর দুঃখ প্রকাশ ও রামগোপালের এক মৃদু সমালোচনা। এর উত্তরে রামগোপাল ১৮৫০ সালের ৫ই জানুয়ারী 'ইংলিশম্যানে' একটি চিঠি লিখে জানালেন যে যদিও তথাকথিত কালা-আইনের সমর্থনে এদেশবাসীরা সরকারের নিকট আবেদন করলে এবং সেটি তার অনুমোদিত হ'লে তাতে তিনি স্বাক্ষর অবশ্যই করবেন কিন্তু এরূপ কোনও কাগজে তিনি তখনও স্বাক্ষর করেননি আর এরূপ আবেদন প্রস্তুত হয়েছে কিনা তাও তিনি জানেন না। রবার্টের এই অস্পষ্ট উক্তি বেসরকারী ইংরাজ মহলকে মোটেই খুশী করেনি। যদিও তাঁরা মেনে নিলেন যে সেরিফের কাছে আবেদনটি তিনি দেখেননি বা তাতে সই করেননি তবু রামগোপালের প্ররোচনাতেই যে বারোশো দেশীয়দের মধ্যে অনেকেই তাতে সই দিয়েছিলেন সে সন্দেহ তাদের দৃঢ়মূল হয়ে গেল যখন রবার্ট বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও বেথুনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটি কথা বললেন না। ইংরাজদের কাগজে রাম-গোপালের সমালোচনা মৃদু থেকে কা[illegible] পরিণত হয়েছিল এবং অবশেষে [illegible] গালাজে।

রামগোপালকে অপদস্থ করার [illegible]নো চলতে লাগলো বেসরকারী ইংরাজ[illegible] ১৮৫০ সালের ১০ জানুয়ারী এ[illegible] কালচারাল সোসাইটির বার্ষিক [illegible] অন্যায়ভাবে রামগোপালকে সহ[illegible]সাহস পদ থেকে অপসারিত করা হয়। [illegible]ওয়া মহানন্দে 'ইংলিশম্যান' যা লিখে[illegible] অর্থ এই যে, যে প্রতিষ্ঠানে এতগুলি [illegible] সভ্য রয়েছেন সেখানে যিনি তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত কালা-কানুনের সমর্থক, তিনি ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকবার অধিকারী নন। ভারতবর্ষে কৃষির বিস্তার ও উন্নতি সাধনই এই সোসাইটির উদ্দেশ্য, কিন্তু বীটনের ব্ল্যাক-অ্যাক্ট সেই উদ্দেশ্যই পন্ড করে দেবে (কি করে তা অবশ্য বলা হয়নি!) তাই এই আইনের সমর্থক এই সোসাইটির সহ-

...পতি হতে পারেন না। কিন্তু এই ঘটনা ...য়ে দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষিত মহলে ...য আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা ব্যবসায়ী ইংরাজ মহলের অনুমানের অতীত ছিল। বেথুন সাহেব তো সোসাইটির কার্য-নির্বাহক কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেনই, তাঁর সঙ্গে পদত্যাগ করলেন সিসিল বীডন, যিনি পরে বাংলার ছোটলাট হন, ও বাংলা সরকারের সেক্রেটারী অ্যালেন সাহেব। তাছাড়া আটজন দেশীয় সভ্যও পদত্যাগের অভিপ্রায় জানান। এই সোসাইটির তখনকার সভাপতি চীফ জাস্টিস স্যর লরেন্স পীল মন্তব্য করেন যে, এই ঘটনাটি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ফল এবং তিনি সেই সভায় উপস্থিত থাকলে কখনই এরূপ ঘটতে দিতেন না। এমনকি প্রস্তাবিত আইনের বিরোধী সংবাদপত্র 'স্টার্ণ স্টার' মন্তব্য করেন যে, "এইরূপ লজ্জাজনক ঘটনা এর আগে কলিকাতায় আর কখনও ঘটেনি।" এর মাসখানেক পর রামগোপাল পুনরায় প্রতিষ্ঠানটির কাউন্সিলার পদে এবং তৈল, তৈলবীজ এবং শস্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

রামগোপালের সমর্থন লাভের আশা অসম্ভব বুঝে বেসরকারী ইংরাজমহল তখন অন্য সূত্রে ভারতীয়দের সহানুভূতি লাভে সচেষ্ট হন। প্রথমে যদিও বেথুন সাহেবের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের যাঁরা বিরোধী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এই আইনের প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন এবং গোঁড়া হিন্দুদের ইংরাজী মুখপত্র কলকাতার "হিন্দু ইনটেলিজেন্সার" ও মাদ্রাজের "ম্যাড্রাস ক্রেসেন্ট"এ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ইংরাজ বণিকদল হতাশ হয়েছিলেন।

উপরন্তু বেসরকারী ইংরাজ নেতারা সরাসরি দেশীয় জনসাধারণের কাছেও সমর্থনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা যে মোটেই কার্যকরী হয়নি তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কারণ তার ভাষা ছিল গর্বিতের, যুক্তি ছিল অসার এবং তার ...ধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল শ্লেষ, কটাক্ষ ও ভীতি-...ার। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া ...—ডিকেন্স সাহেবের সে-সময়ে প্রকাশিত ...টি ইংরাজী প্রবন্ধে, যাতে তিনি ভারত-...সীকে 'ফেলো সাবজেক্টস অফ দি ইম্পি-...য়াল ক্রাউন" বলে সম্বোধন করে লেখেন যেহেতু তিনি ভারতীয়দের অধিকার ও বিস্তৃতির জন্য রামমোহন রায়, ...কানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরদের ...ঙ্গে একত্রে সংগ্রাম করেছেন সেই হেতু ভারতবাসীকে উপদেশ দেবার অধিকার তাঁর আছে। ডিকেন্সের মতে ইংরাজদের নিম্ন-স্তরে এনে ভারতবাসীর উন্নতি হতে পারে না। ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথে চলতে হবে। জ্ঞান, বুদ্ধির ও পরিশ্রমের সর্বাপেক্ষা মহান ফল স্বায়ত্ত-শাসন, তার তার দেবার পক্ষে ভারতীয়রা নিতান্ত অনুপযুক্ত। ইংরাজরা যদি এদেশ ছেড়ে চলে যান তো অচিরেই এদেশের মহিমান্বিত সূর্যকিরণে আফগান, রোহিলা ও আরবদের তরবারি, গুর্খাদের কুকরি, ও পিনডারী ও মারাঠাদের দীর্ঘ বর্শা-ফলক আবার ঝক্-ঝক্ করে উঠবে আর ভারতীয়দের ব্যর্থ অপরিণত উচ্চাভিলাষের বহ্নি শোনিতাশ্রু-সিক্ত হয়ে নির্বাপিত হবে। জেলা আদালতে বিচার হ'লে ইংরাজ বিচারাধীনদের জেলা-হাজতেই থাকতে হবে আর সেই কলেরা ও জ্বরে পূর্ণ 'কলেরাবাদ' ও 'ফিভারপুর'-এ বাস করতে হলে তাদের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে—যে সম্ভাবনা স্থানীয় আবহাওয়ায় অভ্যস্ত এদেশবাসীর নেই! স্পষ্টই বোঝা যায় যে বঙ্গবাসীদের উদ্দেশ করেই ডিকেন্স সাহেব 'ভারতীয়' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। তবে ইংরাজ প্রধানটির হয়তো মনে ছিল না যে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় কিন্তু ঐ নীলকর সাহেবদের ঐসব কলেরাবাদ ও ফিভারপুরেই শেকড় গেড়ে বসবাস করার পথে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করেনি এবং প্রধানতঃ এই সব কুঠিয়াল সাহেবদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে অসহায় দরিদ্র নীলচাষীদের হাতে সুলভ ও সহজ আইনগত প্রতিকার লাভের ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই বিচক্ষণ বেথুন সাহেব এই আইনের প্রস্তাবটি প্রণয়ন করেছিলেন। সে সময়ে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে গিয়ে মামলা চালানোর জন্য চাষীকুলের না ছিল স্বচ্ছলতা না মনের অবস্থা। আগেই বলা হয়েছে বেথুন প্রস্তাবিত আইনটি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল—কোম্পানী-সরকার কলকাতার ইংরাজদের আন্দোলন উপেক্ষা করতে পারেননি। দূর-দর্শী মেকলের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয় যখন ১৮৫৯ সালে অত্যাচারে জর্জরিত সেই নিরীহ ও সহায়-সম্বলহীন বাংলার নীল-চাষীকুলই এর ফলে অত্যা-চারীর বিরুদ্ধে 'রণং-দেহি' মূর্তিতে নেমে এসেছেন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের পরই নীল-বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও ভয়াবহ রূপ দেখে অনেক ইংরাজের মনেই সেদিন গভীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে তাদের নবীন সাম্রাজ্যের বুঝি আর বেশীদিন মেয়াদ নেই! টিঁকে গিয়েছিল তা অবশ্য আরো ৮৮ বছর, কিন্তু সে অন্য কথা।

কলকাতার প্রথম সরকার-বিরোধী আন্দোলন কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ এবং তাও আবার শহরবাসী ইংরাজদের দ্বারাই। তখন সবেমাত্র ক্লাইভ ছলে-বলে ও কৌশলে নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে কলকাতা কেড়ে নিয়ে পলাশী প্রান্তরে ব্রিটিশ বিজয়-নিশান উড়িয়েছেন এবং তখনই ইংরাজদের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের শিশু-সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু কলকাতার স্থান-মাহাত্ম্য কি তা হবার যো-টি ছিল! অজুহাত ছিল সামান্য। কলকাতা পাকাপাকিভাবে তাদের দখলে আসার পর ইংরাজ কর্তৃপক্ষমহল সেখান-কার স্বাস্থ্যোন্নয়ন ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের দরুণ প্রস্তাব করেন বাড়ীপ্রতি সামান্য ট্যাক্স বসাতে। কলকাতায় তখন ৫০০ 'পাক্কা' বাড়ী যার বেশীরভাগ ইউরোপীয়দের ও ১৪০০ 'কাচা' বাড়ী যার প্রায় সবগুলিই ছিল দেশীয়দের। স্বাভাবিক ভাবেই কোম্পানী-সরকার ভেবেছিলেন যে এই কর যথাযথ আদায় হলে কাজ চালাবার মতন যথেষ্ট টাকাই আয় হবে। কিন্তু তা হবার ছিল না—জনৈক ক্যাপ্টেন ডুরাণ্ডের নেতৃত্বে ভন-ভনিয়ে উঠলো কলকাতার ইংরাজদের প্রতিবাদ-গুঞ্জন। কিভাবে আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল তা সঠিক জানা না গেলেও এটুকু জানা যায় যে, তা এতই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত কোম্পানী-সরকারকে এই ব্যবস্থা রদ করতে হয়। হয়তো 'মক্ষিরাণী' ক্যাপ্টেন ডুরাণ্ড হোমড়া-চোমড়াদের দু'একজনার গায় হুলও ফুটিয়েছিলেন, কারণ প্রস্তাবিত কর-ব্যবস্থা রদ করা হলেও তাকে ঔদ্ধত্য ও অশালীন ব্যবহারের জন্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। নির্বাসিত হন তিনি স্বদেশে—ইংলণ্ডে। এটাও কি কলকাতার স্থান-মাহাত্ম্য নয়—যে সেকালে কলকাতা-নিবাসী ইংরাজদের জন্য অন্যতম শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ছিল স্বদেশে নির্বাসন?

মীরা চৌধুরী

শিল্পশ্রী নতুন রূপে

সেই শুরুতেই ফিরে আসা। অনেকটা বৃত্ত পরিক্রমার মত। ১৯৪৪ সালের পর চব্বিশ বছর কেটে গেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠান শিল্পশ্রী পরিবর্তনের অনেক উথালপাথাল ঢেউ প্রত্যক্ষ করেছে। বাটিক এবং প্রিণ্ট প্রদর্শনী থেকে শুরু করে 'হোম ফার্নিসিং ইন জুট' পর্যন্ত। অনেক লোকের আনাগোনায় প্রদর্শনী কক্ষ গমগম করে উঠেছে। প্রশংসাও জুটেছে সেই পরিমাণে। শুধু দেশ নয়, বিদেশ থেকেও। কিন্তু প্রশংসায় কখনো ফুলেফেঁপে নিজের কর্তব্য ভুলে যায়নি এই শিল্প প্রতিষ্ঠান। আর দশজনের সংগে এখানেই তার পার্থক্য এবং নিঃসন্দেহে বিরাট পার্থক্য। তাই আজও সে নতুন কথা ভাবে এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে। সে ভাবনার সূত্র ধরে হয়তো ফিরে যায় গোড়ার কথায়। স্মৃতির থৈ থৈ ভিড়ে খানিকক্ষণ ডুব দিয়ে থাকে। তারপর সেই রূপেই আত্মপ্রকাশ করে সকলকে চমকে দেয়। তখন আর নয়ন না সরে। পুরনো রূপে সে নতুন হয়ে ধরা দেয়।

এবারের বার্ষিক প্রদর্শনীতেও তাই হয়েছে। নতুন কথা ভাবতে ভাবতে শিল্পশ্রী এবার পুরনো বেশে নতুন হয়ে ফিরে এসেছে। কাথিওয়াড়ী সূচীশিল্পের কাজে এবার সে অনন্য। শিল্পশ্রীর শুরুর ইতিহাসে আছে এই শিল্পের কথা। বলতে গেলে এই শিল্প নিয়েই শিল্পশ্রীর জয়যাত্রার শুরু। পুরনো দিনের একটা আমেজ যেন সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিল।

সুন্দর সুন্দর জামাগুলি বর্ণবৈচিত্র্যে এবং শিল্পের ম্যাচিং কম্বিনেশনে ক্রেতার মনোহরণে বেশ ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন বলে মনে হলো। অধিকাংশই বিক্রি হয়ে গেছে। ব্লাউজপিস, ডায়েরী, নোট বুক, অটোগ্রাফ খাতা প্রভৃতির কারুকার্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। টাইগুলি বেশ চমৎকার লাগছিল। ব্যাগ, টিকোজীর চাহিদাও মন্দ নয়। চটে তৈরী টেবিল ল্যাম্প কভার দিয়ে আলোর ঝিলিক এক অপূর্ব মায়াজাল বিস্তার করে ঘরের শোভা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা শ্রীমতী মীরা চৌধুরী নানা কথার ফাঁকে

...লেন, প্রতিটি দর্শকই কিছু না কিছু ...ছেন, আর রোজই অসংখ্য জিনিষের ...র্ডার পাচ্ছি।
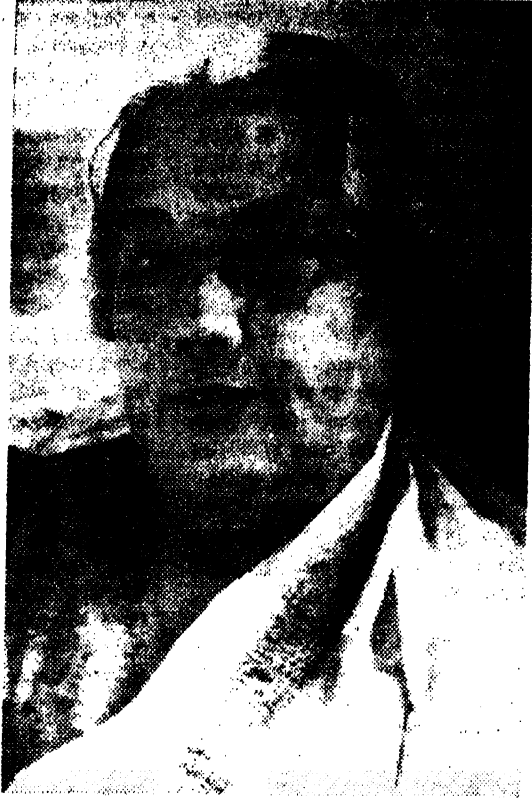
কথা শেষ করে উঠে পড়েছি। এমন সময় কানে এলো একটি কচিকণ্ঠের আক্ষেপ, এমন সুন্দর প্রদর্শনী ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে তখন ভাবছি, মেয়েটির পক্ষে যা আক্ষেপের, শিল্পশ্রী ও শ্রীমতী চৌধুরীর পক্ষে তাই সবচেয়ে বড় পাওনা।

এ সম্পর্কে শ্রীমতী চৌধুরী সচেতন। শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা আজও তাই তাঁর অক্ষুণ্ণ। আর এসবের মূলে রয়েছে তার সমাজসেবী মন। দুঃস্থ এবং অভাবী মানুষের বেদনা উপলব্ধি করেই শিল্পশ্রীর পরিকল্পনা এবং সূচনা। বয়সের ভারকে দূরে সরিয়ে শিল্পসাধনার মাধ্যমে সমাজ-সেবা করে চলেছেন তিনি। অনেক কর্মী এখানে কাজ করে আর্থিক স্থিতি লাভ করেছেন। নিশ্চিন্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে তারা বেঁচে গেছেন।

শিল্পশ্রীর কর্ণধার শ্রীমতী মীরা চৌধুরী সমাজসেবার কোন অনধিকারী নন বরং পুরোপুরি উত্তরাধিকার নিয়েই এক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাবা ডঃ ডি এন মৈত্রের কাছেই তাঁর সমাজসেবার হাতেখড়ি। বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লীগের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মৈত্র তখনকার দিনের স্মরণীয় সমাজসেবী। পিতৃকুলের পর শ্বশুরকুলে তিনি সমাজসেবার পাঠ নিয়েছেন শাশুড়ী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী রায়চৌধুরীর কাছে, যাঁর সম্পাদনায় মহিলা বিষয়ক প্রথম পত্রিকা 'সুগৃহিণী' প্রকাশিত হয়।

সমাজসেবায় শ্রীমতী চৌধুরীর আত্ম-প্রকাশ কিঞ্চিৎ বিলম্বিত বলা চলে। এ জন্য দায়ী অবশ্য স্বামীর বদলির চাকরি। ...ই মধ্যে তিনি একবার রাঁচীতে মেয়েদের ... একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ... পঞ্চাশের মন্বন্তর থেকেই তিনি ...জসেবার সকল সময়ের কর্মী। সেদিনের ...র্ভিক্ষপীড়িত আর্ত মানুষের সেবায় ... নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। চার-...থেকে সাহায্য সংগ্রহ করে লঙ্গরখানা ... করেন। আর তখন থেকেই গঠন-...মূলক কিছু করার চিন্তা মনে দানা বাঁধতে থাকে।

তারপরই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এই প্রতিষ্ঠান। দুঃস্থ মহিলাদের সাহায্যের উদ্দেশ্য নিয়েই শিল্পশ্রীর শুরু। এখানে কাজ করে প্রতিটি মেয়েই কিছু না কিছু আয় করে, যা তাদের পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট সহায়। শ্রীমতী চৌধুরীর নির্দেশিত অনুযায়ী মেয়েরা কাজ করে। কর্মী সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মেই কখনো বেড়েছে, কখনো কমেছে। কিন্তু তাঁর অফুরন্ত উদ্যমে তা বলে ভাঁটা পড়েনি।

শিল্পশ্রীর কাজের ফাঁকে কিছুদিন তিনি রিফিউজী হ্যান্ডীক্রাফটস-এর পরি-চালনাভার গ্রহণ করেছিলেন। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ও মেডিকাল বোর্ডের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং কিছুদিন প্রেসিডেন্সী জেলের ভিজিটরও ছিলেন।

সব কিছু থেকে অবসর নিয়ে আজ তিনি শিল্পশ্রী নিয়ে একান্ত নিমগ্ন। বয়সের ভার তাঁর কাছে হার মেনেছে। ষাট বছরের ঊর্ধ্বে আজও তিনি অক্লান্তকর্মী। শিল্পশ্রীকে ঘিরে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন এবং এখান থেকেই তিনি সমাজ-সেবার নতুন দিগন্তে উত্তীর্ণ হবেন এ আশা করা অন্যায় হবে না।

॥ ২৩ ॥

মানুষ যখন কোন জিনিস একাগ্রভাবে কামনা করে তখন—বিশেষ যদি তা মূল্যবান, আয়ত্তের বাইরের কোন জিনিস হয়—ভেবে রাখে যে কোন দিন তা হাতে এলে সে নিজেই, একান্তে একা সে জিনিসটা ভোগ করবে, কাউকে তার কণামাত্রও ভাগ দেবে না। কিন্তু দুর্লভ বস্তু পাওয়ার একটা গৌরব আছে, অহঙ্কার আছে—সে অহঙ্কারের নেশাও বড় কম উগ্র নয়—সেই অহঙ্কারই শেষ পর্যন্ত তাকে নিভৃতে গোপনে সে বস্তু উপভোগ করতে দেয় না, প্রাপ্তির গৌরবটা জনসমাজে প্রচারিত না হওয়া পর্যন্ত অস্থির করে তোলে।

রাজাবাবুরও—যখন সুরবালার প্রেম তাঁর কাছে কল্পনারও অতীত বস্তু ছিল, কামনা করেছেন কিন্তু আশা করতে সাহস করেন নি, তখন—মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন যে, দেবদুর্লভ এই কন্যা যদি সত্যিই কোন দিন তাঁর করায়ত্ত হয় তো—একান্ত নিভৃতে তার প্রেমাস্বাদন করবেন, শুধু তিনি আর সে, কারও স্থূল লালসা বা উপস্থিতিকে তাঁদের ধারে কাছে আসতে দেবেন না। সেই কারণেই আরও— মনে মনে তাঁর দোহার-বাজনদারের দল জীইয়ে রাখার খুব আপত্তি ছিল। সুরবালা রাখতে চাইলে হয়ত বাধা দিতেন না—তবে অস্বস্তি বোধ করতেন এটা ঠিক। ওরা থাকলে বাইরে যাবার, গাইতে যাবার পথ খোলা থাকবে, আর তা হলেই বহু লোকের লোলুপ দৃষ্টিতে পড়বার সম্ভাবনাও বজায় থাকবে।...কে জানে তেমন কোন দৃষ্টি এর দৃষ্টিতে কোনদিন প্রশ্রয় পাবে কি না—

কিন্তু এখন—এই বহু ঈপ্সিতা নারী সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর—তাঁর করায়ত্ত ও বশীভূত হওয়ার পর—কেবলই মনে হতে লাগল যে তাঁর এই সৌভাগ্যের কথা যদি কেউ জানতেই না পারল, ঈর্ষিতই না হল তো—কি লাভ হল তাঁর ? পরের ঈর্ষাতেই নিজের বিজয় গৌরব সার্থক হয়।

অর্থাৎ সুরবালাকে এবার একটু আধটু বাইরে নিয়ে যেতে চান তিনি। বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশে—মাইফেলে, গার্ডেন পার্টিতে—দেখাতে চান এই অল্পবয়সী সুন্দরী সুগায়িকা মেয়েটি নাম যশ খ্যাতি ভবিষ্যৎ—অধিকতর বিত্তবান লোকের আশা ছেড়ে কী উন্মত্তভাবেই না তাঁকে ভালবেসেছে। তাদের ঈর্ষার আলোতে নিজের এই সৌভাগ্য-গৌরবটা ভাল ক'রে দেখে নিতে চান নিজেও—যাচাই ক'রে দেখতে চান।

কিন্তু কাজটা যে খুব সহজ হবে না তাও তিনি জানেন। সুরবালার কাছে কথাটা পাড়া যাবে না। সে যতটা সরল ততটা অনভিজ্ঞ নয়। এই যাওয়ার কি অর্থ সে জানে। কারও 'মেয়েমানুষ' বা রক্ষিতা উপপত্নী হয়ে কোথাও যেতে চাইবে না সে সহজে। এইখানে তার অভিমানবোধ অত্যন্ত প্রবল। এমনিতেই সে যখন তখন বলে, 'তুমি কি কম সেয়ানা, আমার সব কূল সব দিক ঘুচিয়ে দিয়েছ, তুমি ছাড়া আমার গতি রাখোনি। কীর্তনওয়ালী বলো আর যা-ই বলো—এতকাল নিজে মনে জানতুম তো আমি পরিষ্কার আছি। মেয়েছেলের যা আসল জিনিস সেটা খোচোনি, যে কোন জায়গায় গিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারতুম। সেই উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেছে। আমিই করেছি অবশ্য—তোমাকে দোষ দিতে চাই না—তবে লোকালয়ে কোথাও যাওয়া-আসার পথ বন্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।'

'কেন ?' হয়ত শুধোন রাজাবাবু।

'কেন আর কি ! কোথায় কার বাড়ি যাবো বলো ?...রাজাবাবুর মেয়েমানুষ—বাঁধা রাঁড়। এই তো পরিচয় এখন আমার। সে পরিচয়ে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?'

হাল্কাভাবেই বলে অবশ্য, কণ্ঠে কোন অনুযোগ কি আক্ষেপ বিশেষ প্রকাশ পায় না। তবু এটা যে তার গভীর ব্যথার স্থান একটা গভীর ক্ষত—তা বুঝতে পারেন রাজাবাবু। প্রসঙ্গ উঠলে তখনকার মতো এটা-ওটা নানা কথায় ভুলিয়ে দেন। চাপা দিয়ে দেন কথাটা।

তবে হালও ছাড়েন না একেবারে। কোন বিষয়েই হালছাড়ার অভ্যাস নেই তাঁর, নইলে কারবার ক'রে এত পয়সা করতে পারতেন না। ধৈর্য ধরে লেগে থাকাই ওঁর সাফল্যের মূল কথা এটা তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন। এক্ষেত্রেও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই—শুধু একটু সন্তর্পণে ধৈর্য ধরে অগ্রসর হ'তে হবে মাত্র।

সেইভাবেই অগ্রসর হ'তে লাগলেনও।

কখনও কখনও—নিতান্তই সাধারণভাবে হয়ত, কথাপ্রসঙ্গেই কথাটা তোলেন, [illegible]

...ক বন্ধু, বড় ব্যারিস্টার—একবার দাঁড়ালে ...ত শ' গিনি ফী—সে তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল একেবারে!'

কিম্বা. বলেন, 'অমুক মহারাজকুমার—ঐ যে গো, খুব নামডাক পোলো খেলায়, সায়েবরা পর্যন্ত পেরে ওঠে না—বড্ড পেড়াপীড়ি করছে তার পার্টিতে একদিন নিয়ে যাবার জন্যে'—পরক্ষণেই হয়ত সুরবালার কঠিন ভ্রূভঙ্গী লক্ষ্য ক'রে সামলে নেন. আবার, 'আমি অবিশ্যি বলেই দিয়েছি—সে সুবিধে হবে না, বাগানবাড়িতে কি মাইফেলে নিয়ে যাবার মানুষ সে নয়।'

অনেক সময় তাতেও সুরবালার মুখ প্রসন্ন হয় না. শুধোয়, 'তা তারা সব আমার কথা জানল কি করে? তুমিই নিশ্চয় গল্প করো বসে বসে—' কণ্ঠে তার অনুযোগ ও তিরস্কারের সুর চাপা থাকে না।

'পাগল!' আকাশ থেকে পড়েন রাজাবাবু, 'তোমার মতো একটা গাইয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল বাজার থেকে—একি একটা চাপাপড়ার মতো কথা? এ নিয়ে হৈচৈ হয়নি—না আলোচনা হয়নি। তাছাড়া আমাদের বন্ধুবান্ধবদের সমাজে সকলেই সকলকার হাঁড়ির খবর রাখে। বাঁদি চাকর-বাকর তো আছে প্রত্যেকেরই।'...

শেষে এই ধৈর্য ধরা আর লেগে থাকারই সুফল ফলে। একটু একটু ক'রে নরম হয় সুরবালা। কে জানে. তারও এই নিঃসঙ্গ জীবন, এই অরণ্যের মধ্যে নির্জনবাস—ক্রমশ কারাবাসের মতোই তার মনে তার চিন্তায় ভারী হয়ে চেপে বসছিল কি না। তাকে বললে সে হয়ত স্বীকার করত না, করতে পারত না—কিন্তু ইদানীং যে কোন মতে, যে কোন উপলক্ষে একটু বাইরে বেরোবার জন্যে, দুটো বাইরের মানুষের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছটফট করছিল। রাজাবাবুকে পেয়ে সে জগৎ ভুলেছে সত্য কথা—কিন্তু যখন তাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কাল-... গুলোয় সেই জগৎই তার সমস্ত রূপ রস গন্ধ ...বর্ণ, তার সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত কুশ্রীতা, তার অপরিমেয় মহত্ত্ব ও অপরিসীম নীচতা নিয়ে ওর মনের দুয়ারে ঘা দেয়, অহরহ ...ইরের দিকে টানে। সেই আকর্ষণেই তার ...ন অভিমানবোধ আর জন্মগত ...সংস্কার, তার সহজাত আত্মসম্মান-...দুর্বল হয়ে আসে একটু একটু ক'রে। ...মধ্যে তার শিক্ষা ও পরিবেশ-...যে প্রাচীরটা অলঙ্ঘ্য বলে বোধ ...তার উচ্চতাও ক্রমে কমতে থাকে। ...খুবই ধীরে ধীরে চলে পরি-...এই প্রক্রিয়া—এত ধীরে যে সুরবালা ...তা টেরও পায় না।

কিন্তু সে না পেলেও আর একজন পায়। রাজাবাবুর অভিজ্ঞ দৃষ্টি এই পরিবর্তনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করে। হিমকঠিন তুষারশীলা কেমনভাবে অল্পে অল্পে উষ্ণ ও আর্দ্র হয়ে ওঠে—সে ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশও তাঁর অজ্ঞাত থাকে না।

তবু, তখনই কোন তাড়াহুড়ো করেন না তিনি। আরও অপেক্ষা করেন কিছুদিন। তিনি বিষয়ী লোক, তিনি জানেন যে মামলায় জিততেও সব সময়ে তখনই ডিক্রিজারী করতে নেই। বিশেষ দাম্পত্য মামলায় সর্বদা এই নীতিই আচরণীয়। তাই প্রথমেই ওকে বাইরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব না তুলে বাইরের লোকই এক আধজন ওখানে আনতে শুরু করলেন। তাও, কোনদিন যেন দৈবাৎ এসে পড়েছে, এইভাবে। এ'দের সামনে বেরুনোতেও যে সুরোর আপত্তি না ছিল এমন নয়। গৃহস্থ ভদ্রঘরের কোন মেয়ে বাইরের পরপুরুষের সামনে বেরোয় না—স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সামনেও না। খুব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আড়াল থেকে কথাবার্তা হয় হয়ত। সুরবালা অবশ্য অতটা আইন মেনে চলতে পারেনি, বৃত্তির খাতিরে অনবরতই বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে, কিন্তু এখানে সে প্রশ্ন নেই। এখানে সোজাসুজি অপর পুরুষের সামনে বেরিয়ে কথা বলা মানেই—সে যে কুলনারী নয়, কুলটা—সেই কথাটা স্বীকার ক'রে নেওয়া। রাজাবাবু কি তাঁর এই সব বন্ধুদের নিয়ে নিজের অন্তঃপুরে হাজির হতে পারতেন, না স্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারতেন এদের সঙ্গে কথা বলতে?

প্রথম যেদিন রাজাবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ব্যারিস্টার তারক দত্ত আসেন—সেদিন এই প্রশ্নটাই করেছিল সুরবালা। হেসে হেসেই করেছিল অবশ্য—তবু তার কণ্ঠস্বরে সূক্ষ্ম একটা বিদ্রূপ এবং সূক্ষ্মতর বেদনার সুরটি একেবারে প্রচ্ছন্ন থাকে নি।

রাজাবাবু অপ্রতিভ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'থাক তবে। আসল কথা কি জানো, ব্যারিস্টার মানুষ, বহুদিন বিলেতে ছিল, এখনও পুজোর ছুটি পড়লেই বিলেতে পালায় ফী বছর—ওদের অত জ্ঞানই নেই। আমাদের এই আব্রু আর পর্দা ওদের ঠাট্টার জিনিস। এ ওকে বোঝানো যাবে না। ওর খুব শখ তোমাকে দেখবে একবার। মানে কি দেখে আমি এত মজেছি, কাজ কারবার সব ভাসিয়ে দিতে বসেছি—সেইটেই দেখতে চায়। বলে, তিনি তো এতকাল পাঁচ শ' হাজার লোকের সামনে বেরিয়ে গান গেয়ে এলেন—এখন এক আধজনের সামনে বেরোতে এত আপত্তি কেন? আর একেবারে তো নেহাৎ সেকেলে পর্দানশীন ঘোমটা দেওয়া মুখ্যু মেয়েছেলে না—শুনেছি একটু আধটু লেখাপড়াও জানেন, তাঁর তো এ রকম কুসংস্কার থাকা উচিত নয়।...মরুক গে, আমি বলে দিই—শরীর খারাপ। মাথা ধরেছে—উঠতে পারছে না।'

'থাক! আর এই ভরসন্ধেবেলায় এক ঝুড়ি মিছে কথা বলতে হবে না তোমাকে।...যাচ্ছি আমি। পয়সা খরচ করে বাঁধা মেয়েমানুষ রেখেছ, এতবড় বাগানবাড়িতে এনে তুলেছ—ইয়ারবকসী এনে ফূর্তি না করলে চলবে কেন! আমারই বোঝার ভুল!'

সুরবালার গলাটা এবার স্পষ্টই অভিমানে বিকৃত হয়ে ওঠে।

রাজাবাবু আরও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ওর হাত দুটো ধরে বলেন, 'না, না—থাক। মিছে কথা নয়—আসল কথাই ওকে বলছি। তুমি এই ধারণা করবে জানলে একথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতুম না—বিশ্বাস করো। গোবিন্দর নাম নিয়ে বলছি।...দেখাবার শখ আমারই বেশী—স্বীকার করছি। কিন্তু সে বাঁধা মেয়েমানুষকে নয়, শেষ জীবনে রাধারাণীর যে প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ লাভ করেছি, যে বর পেয়েছি—সেইটেই দেখাতে চেয়েছিলুম সুরো, তুমি আমার সম্ভোগের জিনিস নও—সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য আমার জীবনে, মাথায় ক'রে রাখার জিনিস।'

গলা কেঁপে যায় রাজাবাবুরও।

আর তাইতেই নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে ওঠে সুরবালা। নিজের ইচ্ছা বলতে, নিজের চিন্তা বলতেও আর কিছু রাখবে না—সেই প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে যায়। কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা অবশ্য তখনই কাটানো যায় না সম্পূর্ণ। কিন্তু মুখে হাসি ফোটে। সে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'অমনি অভিমানে ঠোঁট ফুলে গেল বাবুর—খোকাছেলের মতো? আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি যাচ্ছি! তোমাকে অপমান হতে দেব না—এ তুমি বেশ জানো, আর সেই জোরেই তো বন্ধুকে নিয়ে এসেছ!...তুমি যাও, আমি আসছি!'

ব্যারিস্টার তারক দত্ত যতই যা ভেবে এসে থাকুন, ঠিক এমনটি দেখবেন তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তাঁর চিন্তা বাঈজী, নর্তকী, টপউলী—এই পথ ধরেই চলেছিল; সেই জিনিসই বড় জোর একটু উন্নত সংস্করণের কিছু দেখবেন—এই ভেবে রেখেছিলেন। একেবারে সম্ভ্রান্তঘরের গৃহস্থবধূর মতো ঈষৎ ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় জলখাবারের থালা হাতে যখন ঘরে এসে ঢুকল সুরবালা তখন তার অলোকসামান্য রূপ, তার সলজ্জ মধুর হাসি—তার চলার অপূর্ব ভঙ্গীটি—সব জড়িয়ে নিমেষে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তারক দত্ত।

এবং এই অভাবনীয় আবির্ভাবে—আবির্ভাব বলেই মনে হ'ল তার সেই মুহূর্তে—তিনি যেন বিষম বিচলিত হয়ে উঠলেন। একটা বিলিতী অভ্যাস তাঁর মজ্জাগত হয়ে গেছে—দিনরাত মদ্যপান করা। মাতাল হন কদাচিৎ—কোন পার্টি বা মাইফেলে যোগ দিলে মাত্রা বেড়ে যায় তখন। কিন্তু মদটা চলে সব সময়েই। সে বিলাতী সুরার গন্ধ ঢাকা যায় না, ঢাকার চেষ্টাও করেন না। তবে সে বেপরোয়া ভাবটা থাকে বন্ধুমহলে কি মক্কেলদের মহলে। যতই সাহেব হোন, ভদ্র গৃহস্থঘরের অন্তঃপুরে যে মদ খেয়ে যাওয়া যায় না, যাওয়া উচিত নয়—এ জ্ঞান তাঁর আছে। আজ হঠাৎ, এই মুহূর্তে—সুরবালার এই অপরূপ শ্রীমণ্ডিত আবির্ভাবে, সে যে তাঁর বন্ধু বা মক্কেলের রক্ষিতা—এ কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, তাঁর সঙ্কোচ ও লজ্জার অবধি রইল না। তাড়াতাড়ি বিব্রতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একটা অভিবাদনের ভঙ্গী ক'রে বলে উঠলেন, 'আ—আপনি আবার এ সব কষ্ট করতে গেলেন কেন বৌঠাকরুণ। আমি—আমি অনেক খেয়ে এসেছি এখনই—'

কথাটা বলতে বলতে—সুরবালা যেমন একটু একটু ক'রে তাঁর সামনেকার পাথরের টেবিলটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল তারক দত্তও তেমনি একটু একটু ক'রে পিছিয়ে যেতে লাগলেন—উভয়ের মধ্যকার দূরত্বটা বজায় রাখার চেষ্টায়। সুরাপানের প্রমাণটা কিভাবে এই মালিন্যস্পর্শহীন মেয়েটির কাছে গোপন রাখা যায়—সেইটেই তখন তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। আর অত বড় তীক্ষ্ণধী—ব্যবহারজীবীও সেই মুহূর্তে মনের কাছে বার বার মাথা খুঁড়েও সরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায়ের কথা ভাবতে পারলেন না।

তাঁর এই কুণ্ঠা ও বিব্রতভাব দেখে রাজাবাবুর খুসীর সীমা রইল না। খুশী হ'ল সুরবালাও। সব চেয়ে 'বৌঠাকরুণ' এই ডাকটির জন্যে তারক দত্তের কাছে কৃতজ্ঞ-বোধ করতে লাগল। ফলে বিনা প্রয়াসে বা পরিকল্পনাতেই রাজাবাবুর এদিক দিয়ে খানিকটা সুবিধে হয়ে গেল। মুগ্ধ তারক-বাবু অনভ্যাস সত্ত্বেও অসময়ে সুরবালার আনা খাবার কতকগুলো খেয়ে নিলেন—সুরবালাকে খুশী করতে ও নিজে খানিকটা সহজ হ'তে। কিছু কিছু গল্পও হ'ল—সাধারণ প্রসঙ্গ ধরে সাধারণ কথাবার্তা। তাতে আরও বিস্মিত হলেন তারকবাবু। 'বাজারের মেয়েছেলে' বলতে যাদের বোঝায় এমন অনেককে দেখেছেন—আবার সম্ভ্রান্তঘরের গৃহস্থ কন্যা সম্বন্ধেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে তাঁর; এই কলকাতাতেই তাঁর বাড়ি, আত্মীয়-স্বজনও কম নেই এখানে— আর তার বেশির ভাগই অবস্থাপন্ন ও অভিজাত; কিন্তু—সে দু শ্রেণীর কোনটাতেই ফেলা যায় না সুরবালাকে। প্রথম শ্রেণীর বাচালতা বা প্রগলভতা—গায়েপড়া ভাব নেই একেবারেই, ন্যাকা তা নয়ই—আবার গৃহস্থঘরের জড়-পুঁটলিও নয়। পরিষ্কার কথাবার্তা— বিনম্র ও ভদ্র, কিন্তু অকারণ কুণ্ঠা কি জড়তা নেই...

আধ ঘণ্টার বেশী থাকেন নি তারক দত্ত। থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। কেবলই ভয়—নেশার ব্যাপারটা বুঝি ধরা পড়ে যায়। তাহলে আর লজ্জার শেষ থাকবে না বৌঠানের কাছে। যাবার সময় অবশ্য বারবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন, 'একদিন আমাদের পার্টিতে আসুন না, খুব আমোদ পাবেন!'......

এই লোকটিকে নিয়ে আসাতেই যথেষ্ট কাজ হয়েছিল। এই এক চালেই মাৎ করে দিয়েছিলেন রাজাবাবু। সুরবালাকে দেখে তারক দত্ত যতটা মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন—তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর ব্যবহারে সুরবালাও তার চেয়ে কম হয় নি। ওর যে কুণ্ঠা—ওর যে ভয়—রাজাবাবুর বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বেরনো বা তাদের সঙ্গে মেশায় ওর যে প্রবল আপত্তি—সেটা অনেকখানিই কেটে গিয়েছিল। এর পর আর দু-একজনকে এইভাবে নিয়ে আসার পর বাইরে যাবার কথাটা ভরসা করে তুলতে পেরেছিলেন রাজাবাবু, সুরবালার তরফ থেকেও তেমন কোন প্রবল প্রতিবাদ ওঠে নি আর।

কিন্তু এটা যে কতবড় ভুল—সুরবালারও, রাজাবাবুরও — তা প্রথমদিন বেরিয়েই বুঝতে পারলেন ও'রা। সুরবালার অবশ্য আগে জানবার কথা নয়, কিন্তু রাজাবাবু জানতেন। জানতেন সুরবালার কি প্রতিক্রিয়া হবে। তবু এতখানি সম্পদ—সম্পদ ভোগ করার সৌভাগ্য—দেখাবার লোভটা সামলাতে পারেন নি কিছুতেই।

রাজাবাবু অবশ্য বেছে বেছে যা সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত 'মাইফেল' বলে মনে হয়েছে, তাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। মহারাজা খেতাবধারী এক ধনী জমিদারের বাগান-বাড়ি — তাও পাড়াগাঁয়ের কোন অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত জমিদার নয় — খাস কলকাতার নামকরা জমিদার—উচ্চশিক্ষিত গুণী—সারা বাংলা দেশের লোক একডাকে চেনে এমন পরিবার তাঁদের। সে মাইফেলে এসেও ছিলেন বাছাই-করা লোক—জজ ব্যারিষ্টার, অ্যাটর্ণী, বড় ডাক্তার রাজা, জমিদার, বিলেতফেরৎ বড় সরকারী কর্মচারী, দু-একজন ধনী মহাজনও ছিলেন, তাঁরাও শিক্ষিত, বিশিষ্ট ব্যক্তি সব, সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

আহার ও পান — এইটেই লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষ। 'মাইফেল' নামটার মর্যাদা রাখার জন্যই মাত্র দরকার সেটা। তবু সেদিকেও আয়োজনের কোন ত্রুটি হয় নি। বড় বাইজী এসেছিলেন একজন গাইতে, দুজন তরযাউলী, নাচউলীও, একজন ওস্তাদ গাইয়েও এসেছিলেন—যদিও তাঁর গানের অবসর মেলে নি শেষ পর্যন্তও, একজন ম্যাজিক দেখাবার লোক—একজন ভাঁড়—ক্যারিকেচার না কি করবে যেন, সুরবালা কথাটার অর্থ জানত না—এখানে এসে দেখল ভাঁড়ামিই, তবে ভাঁড়ামির ভাষাটা ইংরেজী এই যা।... দু-একজন সুরবালার গান শোনবার প্রস্তাবও তুলেছিলেন — কিন্তু সুরবালা আগেই রাজাবাবুকে বলে রেখেছিল—সে কিছুতেই এই সব আয়োজনের মধ্যে গাইবে না, তরযাউলী নাচউলীর পর্যায়ে নামতে রাজী নয় সে—রাজাবাবুই কাটিয়ে দিলেন তার হয়ে প্রস্তাবটা।

কিন্তু শুধু নাচগান ভাঁড়ামি বা ইন্দ্র-জালই নয়, মনোরঞ্জনের অন্য আয়োজনও ছিল। কিছু কিছু অন্য মেয়েও আমদানি করা হয়েছিল। তাদের কাউকে কাউকে চেনেও সুরবালা। থিয়েটারের মেয়ে। সবাইকে নাম ধরে চেনে না হয়ত—তবে দেখেছে, মুখচেনা। থিয়েটারের মেয়ে ছাড়াও ছিল কেউ কেউ। খুবই নিচুস্তরের, খোলার ঘরের মেয়ে যাদের বলে—সেই ধরনের। এরা—সুরবালা ছোটবেলায় দেখেছে—তাদের মাটির ঘরের দাওয়াতেও উঠতে সাহস করত না। কুন্ঠিতভাবে উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা বলত। হয়ত তাদেরই কারও মেয়ে বা নাৎনী হবে—এই মেয়েগুলো, কে জানে।

এই সব দেখেই মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল সুরবালার। রাজাবাবুও কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে তিনি নিজে খুব একটা এই সব পার্টি বা মাইফেলে যোগ দেন না—তাঁর সময়ই অল্প। গেলেও অল্পক্ষণ থেকে চলে আসেন, এই সব পার্টির শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি হয় সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও নেই।

অবশ্য বাগানের মালিক মহারাজা বা অন্য বাবু ও 'সাহেব'রা এসে যখন আলাপ করলেন সুরবালার সঙ্গে তখন ও'কে যে তাঁরা একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সম্ভ্রমের চোখে দেখছেন—সেটা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। হয়ত সেটা আগে থেকেই বলা ছিল। রাজাবাবুই সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাঁদের। সুরবালাও তাতে কিছুটা প্রসন্ন হল। আরও নিশ্চিন্ত হল দেখে যে বাকী সব মেয়েরা কেউ গায়ে-পড়ে তার সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল না। থিয়েটারের যে সব মেয়েরা এসেছিল, তারাও না। তা[illegible] সুরবালার এই বিশিষ্ট মর্যাদায় য[illegible] ঈর্ষিত বোধ করলেও— সেই সম্[illegible]নো গন্ডী লঙ্ঘন করতে সাহস করল না। [illegible]কা

বাগানবাড়িতে অতিথিরা এসে জ[illegible]য়, হয়েছিলেন সকাল দশটার মধ্যেই। [illegible]তে ছিল যে, প্রভাতের জলযোগ থেকে [illegible]লে শুরু হবে, একেবারে রাত্রের খাওয়া [illegible]হস করে তবে সকলে ফিরবেন। সেই [illegible]ওয়া আয়োজন ছিল। হালুইকর বামুন [illegible] মুসলমান বাবুর্চির বিচিত্র সমাবেশে—ভোজের ব্যবস্থাটাও যতদূর সম্ভব সাড়ম্বর করে তোলা হয়েছিল। পাছে কেউ সমাপ্তির আগেই রসভঙ্গ করে চলে যান—সে জন্যে যার যার গাড়ি সব মালিককে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল, বলে দেওয়া হয়েছিল রাত্ত নটার পর আবার আসতে।

রাজার নিজের অনুরোধ এটা—সুতরাং কেউই জেদ করেন নি। অবশ্য মহারাজার নিজের দুখানা গাড়ি হামেহাল মজুত থাকবে—বিশেষ দরকারে যখন খুশি পাওয়া যাবে তা—সে আশ্বাস মহারাজা দিয়ে রেখেছিলেন সকলকে।...সারা দিনব্যাপী আনন্দ আমোদের অবিরাম স্রোত বয়ে যাবে—যার যেমন খুশি সেইভাবে উপভোগ করবে—মহারাজার এই ছিল পরিকল্পনা।

সকালের জলযোগ শেষ হতে কিছু কিছু গান-নাচ ক্যারিকেচার, ইন্দ্রজাল দেখান হল। দোতলার নাচঘরে এই সব অবসর-বিনোদনের আয়োজন হয়েছিল। কেউ বা ঢালা ফরাশে বসেছিলেন—কেউ বা গদী আঁটা বিলিতি চেয়ারে। প্রথম দিকে অতিথিরা মধ্যে মধ্যে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে মদ খেয়ে আসছিলেন। সম্ভবত সুরবালার জন্যেই এই আবডালের ব্যবস্থাটুকু করা হয়েছিল। কিন্তু দামী বিলিতি মদের তেজস্কর নেশা খানিকটা চড়ে ওঠার পর আর সে সতর্কতা রাখা সম্ভব হল না। বোধ হয় বার বার উঠে যাওয়ার অবস্থাও ছিল না অনেকের। বেয়ারাদের ঐখান থেকেই ডাকাডাকি শুরু হল—সুরা ও সোডার বোতল প্রকাশ্যেই আসরে এসে জাঁকিয়ে বসল।

সুরবালা এসবে অভ্যস্ত নয়। এ ধরনের 'বাগান পার্টি'র কথা গল্প শুনেছে মাত্র মতির মুখে—মতির বোন বোনঝিদের মুখে। কিন্তু শোনা আর চোখে দেখায় অনেক তফাৎ। মদের গন্ধেই তার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল—এখন প্রকাশ্যে বোতল গ্লাস ডিকেন্টার নিয়ে বেয়ারাদের আসতে দেখে অসহ্য হয়ে উঠল। কেমন যেন অপমানিত বোধ করতে লাগল নিজেকে। যে সম্ভ্রম ও মর্যাদার বাষ্পাবরণ এতক্ষণ ঘিরে ছিল ওকে—তা এই মাতলামির বাতাসে উড়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। ঠিক কী চোখে ওকে দেখে সবাই—সে সম্বন্ধে কোন সংশয় রইল না আর।......প্রবল আত্মধিক্কারে তার চোখে জল এসে যেতে লাগল বার বার। আত্মধিক্কার প্রধানত এখানে আসতে রাজী [...]ওয়ার জন্যে। বোঝা উচিত ছিল তার, [...]রকম যে হবে—তা ভাবা উচিত ছিল।...

[...]বু এখনই এ স্থান ত্যাগ করা সম্ভব [...]গাড়ি নেই যে চলে যাবে। জেদ ধরলে, [...]াগ করলে—একটা নাটকীয় কাণ্ড-[...]ামা বাধিয়ে তুললে হয়ত যাওয়া যায়। [...]জাই গাড়ি দিতে বাধ্য হবেন তখন—[...]তাতে এই সব সম্ভ্রান্ত বন্ধুদের [...]রাজাবাবুকে কিছুটা অপ্রস্তুত হতে [...]তার ক্ষতি হওয়াও বিচিত্র নয়। এদের অনেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায় সম্পর্ক আছে, সেটা এতদিনে খানিকটা বুঝেছে। যতই যা হোক—রাজাবাবুকে বিব্রত করতে বা হাস্যাস্পদ করতে ও পারবে না। তাঁর খুব একটা দোষও নেই—তিনি জেনেশুনে ওকে এ ব্যবস্থায় ফেলেন নি—তাকে একটু চিনেছে ও। ঠিক এই রকম অবস্থা দাঁড়াবে তা তিনি নিশ্চয়ই জানতেন না। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা।......

দিন যত বাড়তে লাগল তত এদিকের আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে উঠল। মধ্যাহ্নভোজনের ডাক পড়ল যখন — তখন বেলা চারটে বাজে। আয়োজন বিপুল—সুরবালা ওপর থেকেই দাঁড়িয়ে দেখল অবশ্য—ওর মনে হল রাক্ষস ছাড়া এত রকমের খাদ্য একটুখানি করেও মুখে তোলা সম্ভব নয় সব। অথচ তখন অনেকেরই আর খাওয়ার মত অবস্থা নেই। নিচে যাওয়ারই সাধ্য নেই অনেকের। কিছু কিছু বিলিতী খানা—চপ-কাটলেট ইত্যাদি—আগেই ওপরে এসেছিল, সুরার উপাদান হিসেবে তা খাওয়া হয়েছে। তাতেই পেট ভরে গেছে অনেকের। কেউ ইতিমধ্যেই বমি করে এলিয়ে পড়েছেন তাকিয়া ঠেস দিয়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত খুব কম লোকই গিয়ে খেতে বসলেন। মহারাজা নিজে এসব কিছুই খাবেন না—তাঁর ব্রাহ্মণত্বের বড়াই আছে বেশ একটু—তিনি পৃথক ব্যবস্থায় আগেই খেয়ে নিয়েছেন। তবে তিনি দাঁড়িয়ে এদের খাওয়ালেন। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাটটা আসনে চৌদ্দ-পনেরোজনের বেশি বসাবার লোক পাওয়া গেল না। তারাও কেউ সব আহার্য একবার করে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারলেন না। একটু-আধটু তুলে মুখে দিলেন, বেশির ভাগই অস্পর্শিত অনাস্বাদিত রইল। প্রচুর খাবার ফেলা গেল। সুরবালার মনে হল যা এখানে পড়ে রইল পাতায় পাতায়, শুধু তার খরচেই একটা দরিদ্র পরিবার এক বছর সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারত—মধ্যে মধ্যে ভাল-মন্দ খেয়েও। এর অধিকাংশই একেবারে নষ্ট হবে; এ অঞ্চলে বসতিই কম — কাঙাল গরীব যা দু-চারজন এসে সঙ্কোচে ও সভয়ে ফটকের বাইরে বসে আছে—তারা বাদে ভীড় করে আসার মত লোক এখানে নেই। আর খাদ্যও—যা পরিবেশিত হয়েছে এখানে তা সমগ্র আয়োজনের ভগ্নাংশ মাত্র। আরও অনেক খাবার ফেলা যাবে। হয়ত

ভাড়া করা ঠাকুর-চাকর ও বেয়ারা বাবুর্চিরা কিছু কিছু নিয়ে যাবে। তাও, তারা কি সে রকম ব্যবস্থা নিজেদের জন্যে আগে থেকেই করে রাখে নি?

রাজাবাবু অবশ্য সে পংক্তিতে খেতে বসেছিলেন, তবে তাঁরও খোরাক কম—প্রভাতের গুরু জলযোগই তাঁর পক্ষে যথেষ্টর বেশী। তিনি লোকদেখানো একবার বসলেন মাত্র। সুরবালা নিচে নামে নি, সে কিছুই খাবে না বলেছিল—মহারাজা সে কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে একরাশ মিষ্টি দই পায়েস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মিষ্টির আয়োজনও অন্য বিভাগের চেয়ে খাটো যায় না—মানানসই করেই করা হয়েছিল বোধ হয়। ধনেখালির খইচুর, বেলডাঙার মনোহরা, খাগড়ার ছানাবড়া, নাটোরের রাঘবশাহী, কেষ্টনগরের সরভাজা সরপুরিয়া, গোটপাড়ার গুড়ো সন্দেশ, বর্ধমানের সীতাভোগ খাজা থেকে শুরু করে সিমলের সন্দেশ, বাগবাজারের রসগোল্লা পর্যন্ত—তার সঙ্গে কাঁসারিপাড়ার সরের দই—অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না কোথায়ও। সুরবালার তখন কিছু খাওয়ার অবস্থা নয়—দৈহিক মানসিক কোন দিক দিয়েই—তবু মহারাজার অসম্মানের ভয়েই সামান্য একটা কি তুলে নিল শুধু।......

বিকেলের দিকে অসভ্যতা ও বেলেল্লাগিরি আরও বাড়ল। সুরবালার তখন *সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। বাধ্য হয়েই রাজাবাবুকে জানাতে হল যে তার শরীর খুব খারাপ লাগছে—এ 'রহট' তার অভ্যাস নেই কোনকালে—ভীষণ মাথা ধরে উঠেছে, সে এখনই বাড়ি যেতে চায়।* রাজাবাবুর নিজেরও আর ভাল লাগছিল না, কিন্তু তিনি মহারাজাকে সে কথা জানাতে চাইলেন না, সুরবালাকে আর আধ ঘন্টা ধৈর্য ধরতে বলে—বকশিসের লোভ দেখিয়ে ওখানকারই একটা বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিলেন নিজের বাগানে—কোচোয়ানকে তখনই গাড়ি জুতিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে। তাঁর বাগান এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়—জোরে হেঁটে গেলে পনেরো মিনিটেই পৌঁছতে পারবে।

সারা দিনের তুলনায় আধ ঘন্টা সময় কিছু না—কিন্তু সুরবালা তখন আর এক মিনিটও থাকতে পারছে না—এমনি অবস্থা। মাথা ধরার কথাটাও মিথ্যা নয়। অপেক্ষা যদি করতেও হয়—এখানে বাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারবে না।...সে পায়ে পায়ে যতটা সম্ভব সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বাগানে নেমে এল।

আঃ! তবু এখানে অনেক শান্তি। বেলা তখন আর বিশেষ নেই—অপরাহ্নের আলো গাছের মাথায় কিছু কিছু লেগে থাকলেও নিচের দিকটা বেশ ঘোর ঘোর হয়ে এসেছে। আগেকার দিন হলে—শহরের মেয়ে সে—এ সময়ে এই রাক্ষুসে বেলায় এত বড় বাগানে একা ঘুরে বেড়াতে ভয় করত, কিন্তু গত বছরখানেক এই নির্জনতা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, ভয় তো করেই না বরং ভাল লাগে আজকাল। নাম-না-জানা সে আতঙ্কটা অনেক কমে গিয়েছে। ভয় এখনও আছে—বদ প্রকৃতির মানুষকে, তা সে ভয় ওখানে বিশেষ নেই—বন্দুকধারী চৌকীদার ঘোরে বাগানে পাহারা দিয়ে। এখানেও নেই নিশ্চয়, অন্তত আজ নেই। বহু লোক এসেছে, বহু সম্ভ্রান্ত লোক—তাছাড়া তাদের ভৃত্যে-পরিজনে, পাচকে-বাবুর্চিতে, বেয়ারায় দাসীতে—অতিথির চতুর্গুণ লোক এসেছে। চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে তারা, এই পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যেই। একটা হাঁক পেলেই ছুটে আসবে।

সুরবালা নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বাঁধান বকুল গাছের তলায় বসল। চারিদিকে বিস্তর ফুল ঝরে পড়ে আছে, গাছের শাখায় শাখায় ফুলের সমারোহ। বকুলের গন্ধ বড় তীব্র, কেমন যেন নেশা লাগে—তবু, বোধহয় তার এতক্ষণের গ্লানি কাটানোর জন্যে এমনি তীব্র গন্ধেরই প্রয়োজন ছিল—উত্তেজিত উত্যক্ত স্নায়ুতে সুরভির এই আঘাত। সে বসে বসে যেন বুক ভরে প্রাণ ভরে আঘ্রাণ করতে লাগল মাদকের মত সেই সুগন্ধ।

কিন্তু শুধু বকুলই নয়। আরও কত কি ফুলের গন্ধ চারিদিকে। ফুলের গন্ধ আর পাখির ডাক। কত কি পাখী ডাকছে—জানা-অজানা, সারা দিনের আনন্দ উৎসব শেষ করে এবার এই সব পত্র-পল্লবের আচ্ছাদনের নিচে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে এসেছে। তাদের মিলিত ডাকে কানও জুড়িয়ে গেল সুরবালার। মনে হল এ গানের তুলনা নেই। মনে হল বৃথাই এত দিন গান শিখে মরেছে—তার, তাদের সাধ্য নেই এই পাখীর গানের সঙ্গে পাল্লা দেয়। ঐ যে বিখ্যাত বাইজীটি সকালে অতক্ষণ ধরে গাইল—অত কসরৎ দেখাল—তারও না।...বাবা বলতেন 'তির্যগযোনি'—পাখী পশুর বহু জন্ম পেরিয়ে বহু ভাগ্যে তবে মানুষ মানব জন্ম লাভ করে। কিন্তু মানবের দেহ ধারণ করলেই মানুষ হওয়া যায় না, ভগবানের নাম করে সাধনা করে তবে মানুষ মানুষ হয়। সেই শ্রেষ্ঠ মানুষকেই ও'রা 'মানুষ' বলেন, কর্তা বলেন। কথাটা আজ মনে পড়ে গেল। কে বলেছে বহু ভাগ্যে প্রাণীরা মানব দেহ ধারণ করে। তির্যগযোনির এই সব প্রাণী, ইতর প্রাণী বলে মানুষ যাদের অবজ্ঞা করে—মানুষের চেয়ে ঢের ঢের ভাগ্যবান। অন্তত এই মুহূর্তে সুরোর তাই মনে হচ্ছে, সে রীতিমত ঈর্ষাই বোধ করছে ওদের সম্বন্ধে। বাধা নেই, বন্ধন নেই—মুক্ত জীবন, দায়-দায়িত্ব দুশ্চিন্তা কিছু নেই, মনের আনন্দে অসীম শূন্যে পাখা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাদ্য ভগবানই জুগিয়ে রেখেছেন, ভগবানই ওদের কণ্ঠে দিয়েছেন চিরআনন্দের সুর, দিয়েছেন সুমধুর গান—সেই গান গেয়ে বেড়াচ্ছে যেমন খুশি। শিকার প্রয়োজন নেই, মজুরোর জন্যে ভাবতে হয় না, প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। ওদের চেয়ে সুখী, ওদের চেয়ে ভাগ্যবান কে?......

আগের সে ক্লান্তি আর গ্লানি চলে গেছে, কেমন যেন এক মুগ্ধতার মধ্যে দিবাস্বপ্নে ডুবে গেছে সব চেতনা আর চিন্তা। কিন্তু বেশীক্ষণ সে সৌভাগ্য ভোগে এল না। দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল রূঢ় বাস্তবের আঘাতে। ফুলের গন্ধে ও পাখীর গানে যে পবিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল ওর চারপাশে তা ইতরেতর প্রাণী মানুষের কলুষিত কামনার কদর্যতায় দূষিত ও কলুষিত হয়ে উঠল।

দেখা গেল যে, 'সাহেব'রাও কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছেন বাগানে, এই আধো অন্ধকারকে কাজে লাগাতে। তাঁরা এসেছেন তাঁদের বাতাবরণ নিয়েই। মানুষের চাপা কথা চাপা হাসি, মাতালের জড়িত কণ্ঠ—আগেই শোনা উচিত ছিল তার, কানেও গিয়েছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে নি, সতর্ক হয় নি। মন তখন মশগুল হয়েছিল যেন—হঠাৎ আবিষ্কার করা প্রকৃতির এই বিপুল ঐশ্বর্যে। তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের এই বিভূতি অনুভব করছিল। যখন অবহিত হল সে—যখন সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে উপায় রইল না—তখন আর সতর্ক হয়ে কোন লাভ নেই—তখন উঠে অন্য কোথাও চলে যাওয়া সম্ভব নয়। কদর্য দৃশ্যটা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। ওদের লজ্জা নেই—কিন্তু যে দেখছে তার লজ্জা আছে, সে সময় নিঃশব্দে নিশ্চল হয়ে বসে থাকাই বুদ্ধির কাজ। সে যে সেখানে আছে সে সম্বন্ধে ওরা না সচেতন হয়, তাকিয়ে না দেখে।

আঘাতটা যদি শুধুই কোন কুৎসিত জঘন্য দৃশ্য দেখারই হত—তাহলেও অতটা মন খারাপ হত না—এক্ষেত্রে যতটা হল। যে মানুষটি এই দৃশ্যের নায়ক আর যাই হোক ঠিক তাকে এ অবস্থায় দেখবে ম[illegible] করে নি সুরবালা। সেই জন্যেই আর[illegible] কষ্টকর, আরও দুঃসহ বোধ হল। স্ব[illegible] দত্তসাহেব—তারক দত্ত, এক হাতে মদে[illegible] গ্লাস ধরে—প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় একটি মেয়ের পিছনে ছুটছেন—টলতে টল[illegible] হোঁচট খেতে খেতে। মেয়েটিকেও [illegible] সুরবালা, থিয়েটারে দেখেছে। এ [illegible] এককড়ি। শ্যামাঙ্গী কিন্তু সুরূপা। কষ্টি কালো রঙে এমন রূপ কদাচিত দেখা যায়। দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, নিখুঁত মুখশ্রী। ঝকঝকে সাজান দাঁত — হাসিটিও ভারী মিষ্টি। সবচেয়ে আকর্ষণ হল তার চোখের, আয়ত চোখের গভীর দৃষ্টিতে কী যেন আছে——সে চাহনি ভোলা শক্ত।

আকর্ষণ আছে যথেষ্টই—বহু লোকই নাকি ইতিমধ্যে তার জন্যে [illegible]

অস্থির হয়ে উঠেছে। তাই বলে তারক দত্ত! মেয়েটি এসেছে একেবারে খোলার ঘরের বস্তি থেকে, ওর মা দু দিন আগেও লোকের বাড়ি বাসনমাজার কাজ করেছে—একেবারেই লেখাপড়া জানে না—অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত নেই। পার্ট অপরকে দিয়ে পড়িয়ে মুখস্থ করে। সম্প্রতি কী একটা বইতে খুব নাম হয়েছে—যে চরিত্রে সে অভিনয় করেছে তার নাম 'কাঞ্চন'—তাই অনেকেই ওকে কাঞ্চন বলে ডাকে, দত্ত-সাহেবও 'কাঞ্চী' 'কাঞ্চী' বলে ডাকতে ডাকতেই তাড়া করেছেন। মদ এককড়িও কিছু খেয়েছে—অন্তত তার চোখের ঢুলু-ঢুলু ভাবে আর স্খলিত গতিতে তাই মনে হল সুরবালার। তবে সে মাতাল হয় নি। বেশ বুঝে হিসেব করেই খেলাচ্ছে দত্ত-সাহেবকে, তাঁকে কামনাতুর করে তুলেছে। এই মেয়েটির ভাগ্যই ভাল, যে বাবু একে বাঁধা রেখেছেন তিনি বিখ্যাত ঠাকুরবাড়ির দৌহিত্র, ধনী সুশিক্ষিত সুপুরুষ। তাঁকে বাবু পাওয়া এর মত মেয়ের পূর্ব জন্মের সুকৃতি বলেই মনে করা উচিত—তবু তাঁকেও ঠকিয়ে এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। হয়ত বাগানবাড়িতে আসার কথা তিনি জানেন—কিন্তু অপর পুরুষের সঙ্গে এই বেলেল্লাগিরির কথা জানেন না নিশ্চয়।

তিক্ততায় ও গ্লানিতে যেন আকণ্ঠ ভরে গেল সুরবালার। তারক দত্ত অবশ্যই ওকে লক্ষ্য করেন নি, সে অবস্থাও ছিল না তাঁর কিন্তু এককড়ি করেছিল। সে খিল খিল করে হেসেও উঠল ওর দিকে চেয়ে—বিজয় গর্বেরই হাসি কতকটা, তারক দত্তের মত পাকা সাহেব ব্যারিস্টার তার পায়ে পায়ে ঘুরছে—গর্ব করার মত ঘটনা বৈকি!

সে হাসির শব্দে দত্তসাহেবও ফিরে চাইলেন এদিকে—সম্ভবত এককড়ির দৃষ্টি অনুসরণ করেই। সেই ঘোর উন্মত্ত অবস্থাতেও কিন্তু তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন, সুরা-জড়তার মধ্যেও তাঁর কণ্ঠে সত্যকারের কুণ্ঠা ফুটে উঠল, 'আম সোরি ম্যাডাম!...আমি, আমি ভারী দুঃখিত—'ীভ মি!...আ-আপনাকে এখানে দেখব করি নি।...এই অবস্থায় আপনার —সো সরি।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টলতে লাগলেন। বিমূঢ়ের মত একবার এককড়ির আর একবার সুরবালার দিকে লাগলেন।

...রবালার আর সহ্য হল না। তার ...ক্ততা ষোলকলা ছাপিয়ে গেছে। বিশেষ করে ঐ নির্লজ্জ হাসি যেন তার সর্বাঙ্গে—বিছের কামড়ের মতই—একটা বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে আর কোন দিকে না চেয়ে কিছু না ভেবেই সেখান থেকে উঠে হাঁটতে শুরু করল—বাগানের পায়ে-চলা পথ ধরে—যে কোন এক দিক লক্ষ্য করে।

সৌভাগ্যক্রমে সে বাইরে যাবার দিকটাই ধরেছিল—ফটকের দিকটা। আর কেউ অত লক্ষ্য করে নি, হয়ত সুরবালা যে বাইরে যাচ্ছে তাও বোঝে নি—কিন্তু ফটকের দারোয়ান লক্ষ্য করেছিল ওর এই উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেরিয়ে যাওয়াটা। সে এগিয়ে কাছে এসে প্রশ্ন করল, 'আপনার গাড়ি লাগবে না দিদিবাবু?...গাড়ি কিছু আসবে বাহারসে—না হামাদের গাড়ি বোলিয়ে দিব?'

সুরবালা কোন উত্তর দিল না, তার দিকে চাইলও না ভাল করে—সেইভাবেই রাস্তায় পড়ে হন হন করে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে—কোথায় যাচ্ছে, কোথায় গিয়ে পড়বে, ওদের বাড়িটা কোন দিকে—কোন হিসেব না করেই।

(ক্রমশঃ)
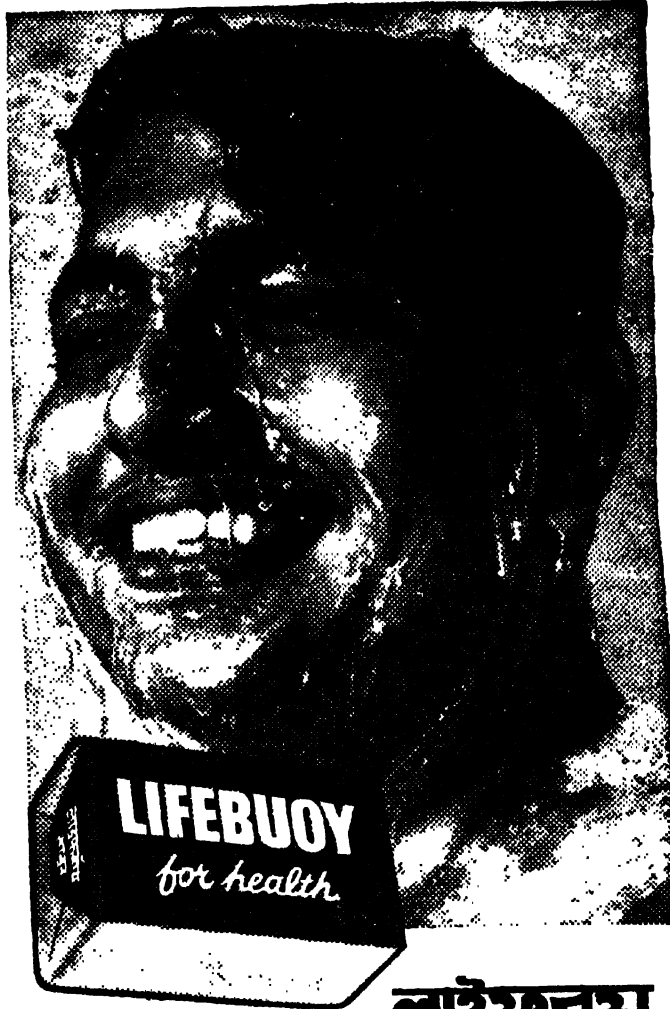
কলকাতা

কলকাতার প্রবীণ চিকিৎসক, দেশে-বিদেশে সমান যশস্বী, সামনে পেয়ে বললাম, "কী কেলেঙ্কারী বলুন তো!"

"কেলেঙ্কারী? কিসের কেলেঙ্কারী?" আমার প্রশ্নে এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে তিনি বললেন, "তাহলে শুনুন একটা গল্প। এখানকার এক বড় হাসপাতালের এলাকার ভিতর ফুটবলে লাথি দিচ্ছে এক ছোকরা। হঠাৎ একবার বলটা গিয়ে লাগলো একটা ওয়ার্ডের দরজায়। হাসপাতালের জনৈক ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠলেন, কী হচ্ছে খোকা, এটা হাসপাতাল নয়? বাবড়াবার ছেলে খোকাবাবু নন, জবাব দিলেন, হাসপাতাল তো হয়েছে কি? এই হাসপাতালে আমার জন্ম, এখানে আমার জন্মগত অধিকার আছে, যা খুশী করবার। সোজা কথা নয়, বার্থ রাইট। অধিকার দিয়েছেন, এখন ঠেলা সামলান।"

অধিকার দেওয়া হয়েছে শুধু ওই বালকটিকে নয়, গোটা শহরের মানুষকে অধিকার দেওয়া হয়েছে হাসপাতাল নোংরা করবার। আজ টীটেনাসের ধনুষ্টঙ্কারে টনক নড়েছে তবে হুঁশ হয়েছে। হাসপাতালের ভিতরে বে-আইনী ঘরবাড়ী উঠেছে একদিনে নয়, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে, কর্তৃপক্ষের নাকের উপরে। কেন রুখতে পারেনি? অধিকার দেওয়া হয়েছে বলে।

তাঁর মতে, আজ একশ তিরিশ বছর ধরে এদেশে পাশ্চাত্ত্য মতে চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণ করা হয়ে আসছে, এই একশ তিরিশ বছরে যাঁরা হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখতে শিখলেন না, তাঁদের চিকিৎসা শিক্ষা কেন?

"কোনও দিন একবার দাঁড়িয়ে দেখেছেন ওই যেখানে পনের হাজার টাকা খরচ করে স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে?" সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে স্বাস্থ্য-সপ্তাহ প্রদর্শনীর কথা তিনি বলছিলেন। "দেখুন, ভিতরে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী, আর তার বেড়ার ঠিক বাইরেই গায়ে লাগানো মলমূত্রের কারখানা, যার দুর্গন্ধে প্রদর্শনীতে ঢুকতে গিয়েও ফিরে আসতে হয়। ওর কয়েক গজ দূরেই পার্কের কোণায় আবর্জনার স্তূপ।"

ও'র কথায় মনে পড়ল, এক স্বনামধন্য বিদগ্ধ ভারতীয়ের লেখনীনিঃসৃত একটি উক্তি, যার তাৎপর্য হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা জাতির সভ্যতার মাপকাঠি। চিকিৎসার জন্য তিনি ইউরোপের কোন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, সেই হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা দেখে ওই কথা তিনি লিখেছিলেন।

"বেআইনী ঘরবাড়ীর কথা ছেড়েই দিন," সেই প্রবীণ চিকিৎসক বললেন, "এদেশে হাসপাতাল পরিষ্কার রাখবেন কী করে? আপনাদের হাসপাতালে যে যখন খুশী রুগীর ঘরে ঢুকবেন, মানা করতে পারবেন না, রুগীর বিছানায় চার পাঁচজন বাইরের লোক বসে পড়বেন, মানা করতে পারবেন না, মেঝেতে থুথু ফেলবেন, কাগজ ফেলবেন, ফলের খোসা ফেলবেন, মানা করতে পারবেন না। কার কতটা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি আপনি জানেন না। সাফ করে আর কত সারবেন?"

"আজ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে, বেআইনী ঘরবাড়ী ভাঙতে গিয়ে চোলাই মদ বেরিয়ে পড়েছে—জল গড়িয়ে অন্যদিকে যাচ্ছে, কতদূর যাবে কে জানে, কিন্তু একটা সহজ প্রশ্নের জবাব দিন তো—না, জবাব দিতে হবে না, আমার প্রশ্নেই জবাব খুঁজে নিন। হাসপাতালে নোংরা উৎস নির্মূল করতে হবে সে অন্য কথা—কিন্তু টীটেনাস হবে কেন বলুন তো?"

প্রশ্নটা ধাঁধার মত মনে হল, কিন্তু জবাব সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম। "যত নোংরাই থাক না কেন, ডাক্তার সাবধান হলে টীটেনাস কখনও হতে পারে না।"

বিশেষজ্ঞ নই, কাজেই নীরবে বিশেষজ্ঞের মত শুনে যাই। "আমার বাড়ীর চারদিকে তো নোংরা, কিন্তু তার ভিতরেই আমি ইঞ্জেকসন দিই, রক্ত নিই। জীবাণু তো সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। কিন্তু ডাক্তার সব রকমে সাবধান হলে অপারেশনের সময় জীবাণু সংক্রামিত হতে পারে না।

"ধরুন টীটেনাস। সূর্যের আলোতে টীটেনাসের জীবাণুর কোষ মরে যায়। পরিষ্কার জায়গায় মরে যায়। অটোক্লেভ করলে মরে যায়। অতি সহজে টীটেনাস দমন করা যায়। অপারেশনের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জাম এবং অপারেশনের সময় যাঁরা থাকেন তাঁদের পোশাক, দস্তানা ইত্যাদি অটোক্লেভে স্টীম দিয়ে জীবাণুমুক্ত করলে ও পরিষ্কার রাখলে সংক্রামণের ভয় থাকে না।

"কাজেই, হাসপাতালের ভিতরের নোংরা তো সরাতে হবেই, কিন্তু ডাক্তাররাও ভুল স্বীকার করুন।"

এই সম্পর্কে কলকাতার হাসপাতালের ভিতরে যাঁরা কাজ করেন এমন দায়িত্বশীল লোকের মুখে যা শুনি তা বলছি। কোন বেডে রুগী মারা গেলে সেই বেডের ভারপ্রাপ্ত এমন ডাক্তারের কথা জানা যায়, যিনি ওই বেডে সঙ্গে সঙ্গে নিজের অন্য রুগীকে ভর্তি করাতে এমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন, যে সে বেডের তোষক বালিশ দূরের কথা যে চাদরে আগের রুগী মারা গেছে সে চাদর ও বালিশের ওয়াড় পর্যন্ত বদলাবা তর তাঁর সয় না। তারপর, এক রুগ অপারেশনের পর সেই অস্ত্রপাতি অপ রুগীর উপর প্রয়োগ করতে হলে সেগুলি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করতে একটা সব সময় দিতে হয়। তাড়াতাড়ি অপ সারবার জন্য (কারণ সময় মানে টাক সময়টুকু অনেকেই দিতে চান না।

অনেকে পয়সার জন্য আউটডো নিজের রুগী টেনে এনে, তার সেই পোশাকে, নোংরা শরীরে অ থিয়েটারে চাপিয়ে দেন। কৈফি শুনবেন, "ব্লাড স্যাম্পল নিচ্ছি।" তিনি করতে পারেন না। "মা ডাক্তারবাবুর সোজা হয়ে যাবে," ব প্রবীণ চিকিৎসক।

"কেন হাসপাতাল পরিষ্কার রাখা যাবে না?" জোর গলায় তিনি বললেন। "এই দেশেই, এই শহরেই সম্পূর্ণ ভারতীয় ডাক্তার ও ভারতীয় কর্মচারী দিয়ে পরিচালিত হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে মেঝেতে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়, একটা দেশলাইয়ের কাঠি বা কাগজের টুকরোও

সেখানে খুঁজে পাবেন না।" তিনি বলছিলেন মিলিটারী হাসপাতালের কথা। সেখানে কম্যান্ডিং অফিসার, নার্স ও চতুর্থ-শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার্স নিয়মিত পরিদর্শন করেন। সেখানে তাদের জীবন-যাত্রা ও পরিবেশ যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখেন ও তাদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে নিয়মিত উপদেশ দিয়ে থাকেন। বে-সামরিক হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কি পরিবেশে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পারেন। বাড়ীর ভিতরের অপরিচ্ছন্নতা সে ছাড়া কাপড়ের মত বাড়ীর ভিতরে রেখে এসে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে ঢুকবে এমন আশা করা অন্যায়। "তাদের নিজের ঘরে পরিচ্ছন্ন থাকতে দিন, থাকতে শেখান তাহলে হাসপাতালে নোংরা ওয়ার্ড বড় দেখতে পাবেন না।"

এখানে তাঁর বক্তব্য মিলিটারী হাস-পাতাল ট্রেড ইউনিয়নের আওতামুক্ত বেসামরিক হাসপাতাল নয়। কিন্তু হাস-পাতালে ট্রেড ইউনিয়নের বক্তব্য হাসপাতাল কর্মচারীরা তাদের কর্তব্য পালন করতে পারে এমন অবস্থায় বাস করবার অধিকার তাদের আছে, কিন্তু সে অধিকার কতটুকু তারা পেয়েছে? পায়নি যে, সে স্বীকৃতি প্রবীণ চিকিৎসকের কথায় আছে। তবুও তিনি হাসপাতালকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার পক্ষপাতী।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে একবার থমকে দাঁড়ালাম। উপরের একটা খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল এক পড়ুয়ার কণ্ঠস্বর। "মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি।" [illegible] মারী নিয়ে ঘর করি! এমন বীরের জাত হঠাৎ এক ধনুষ্টঙ্কারের আক্রমণে এমন কাতর হয়ে পড়বে, এ বড়ই দুঃসংবাদ, দারা।

*

রসগোল্লার আবিষ্কর্তা বাগবাজারা-বতংশ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দাস মশাইয়ের বাংলা দেশের তথা সারা ভারতের মিষ্টান্ন-শিল্পে অমূল্য ও অতুলনীয় দানের কথা কে না স্বীকার করবেন। বিশেষ আজকে ওই দেবভোগ্য খাদ্যের শতবর্ষ পূরণের দিনে সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করছেন। সেই সঙ্গে তাঁর আরও একটি দানের কথা আসুন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। সে দান মিষ্টান্নশিল্পে নয়, বাংলা ভাষায়। 'রসগোল্লা' শুধু মিষ্টি নয়, সেকথা স্কুল-কলেজের পরীক্ষার্থী মাত্রেই (সবেদনে) জানেন। নবীনচন্দ্র দাস মশাই মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন একটি অতি সরস ইডিয়ম দিয়ে।

আপত্তির কিছু থাকতে পারে না যদি বলা হয় রসগোল্লার জনক নবীনচন্দ্র মিঠাইয়ের শেকস্‌পীয়র ছিলেন। শেকস-পীয়রের কত না উক্তি কত ইংরেজ অ-ইংরেজ হামেশা ব্যবহার করছেন কথায় লেখায় প্রবাদবাক্যের মত, স্বপ্নেও না জেনে যে তাদের জনক শেকস্‌পীয়র। প্রতিটি মৌলিক ইংরাজী শব্দ বা প্রবাদ বাক্যের মত তারা যেন ইংরেজ জাতির লৌকিক চেতনা থেকে, তার সমষ্টিগত হৃদয় থেকে উদ্ভূত। রসগোল্লাও আজ বাঙালীর এমনি এক খাদ্য যা বাংলা লোকশিল্পের অন্ত-র্গত। নবীন ময়রার রসগোল্লার কথা অনেক বাঙালী জানেন এই হিসাবে যে রসগোল্লা নামধেয় বাঙালীর জাতীয় মিষ্টান্নটি নবীন-চন্দ্র নামধেয় শিল্পীর হাতে ভাল উৎরাতো। কিন্তু তিনি যে ওর সৃষ্টিকর্তা একথা তাঁরা জানেন না, বা তাঁর শতবার্ষিকী উপ-লক্ষে প্রকাশিত তথ্যপাঠের আগে অবধি জানতেন না।

রসগোল্লা হল রসগোল্লা, চুপিসারে কখন সে নবীনচন্দ্রের নামের সঙ্গে এক করা বন্ধনী থেকে মুক্ত হয়ে সোজা বাঙালীর হৃদয়ে স্থান নিয়ে নিয়েছে তা কেউ টের পায়নি। মানুষ মনে রেখে মানুষকে মহৎ করে, কিন্তু কখনো কখনো ভুলে গিয়ে তাকে মহত্তর করে। নবীনচন্দ্রের দৃষ্টান্ত থেকে এ তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। হয়ত এ ব্যাপারে তিনি একক দৃষ্টান্ত নন। রসগোল্লার শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচারিত তাঁর বংশধরদের কথায় জানা যায়, রসগোল্লা আবিষ্কার করে তিনি তাকে নিজ পরিবারের ভিতর বন্দী করে রাখতে চাননি, বরং বিশ্বময় দিয়েছেন তারে ছড়ায়ে যার ফলে রসগোল্লা আজ টিনে ভর্তি হয়ে সারা পৃথিবীর মানুষের দুয়ারে পৌঁছেছে। দুর্ভাগ্য আজ টিনের চাদরের অভাবে (চিনিরও) সে বাহনাবরহিত পৃথিবী পরি-ক্রমার অর্ধপথে পঙ্গু।

বাগবাজারে নবীনচন্দ্রের আদি দোকান আজ তিন বৎসর বন্ধ দুয়ার। সে দুয়ার খুলবে না, কিন্তু রসগোল্লা আছে থাকবে সহস্র অপর দোকানে, কলকাতায় কল-কাতার বাইরে। এখানেই নবীনচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভার সার্থকতা।

তাঁর পৌত্র সারদাচরণবাবু পিতামহের শতবার্ষিক তর্পণ উপলক্ষে জানিয়েছিলেন, নবীনচন্দ্র পুরাণ মন্থন করে যে তথ্য উদ্ধার করেছিলেন তাতে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় মিষ্টান্নশিল্পী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত, উত্তরকালে 'পতিত'। সে তথ্যের ভিত্তিতে একটি বইও লিখেছিলেন 'মোদ-কোৎপত্তি' নাম দিয়ে। কিন্তু সেটা শুধুই তথ্যের খাতিরে, জীবনে তিনি "ময়রা" নামে পরিচিত হওয়াটাই বেশী গৌরবের মনে করতেন।

তা করুন, আমরা বলব, রসগোল্লার যিনি স্রষ্টা, আপন দাবীতে কোনও দলিলের অপেক্ষা না রেখে তিনি দ্বিজোত্তম। স, সে
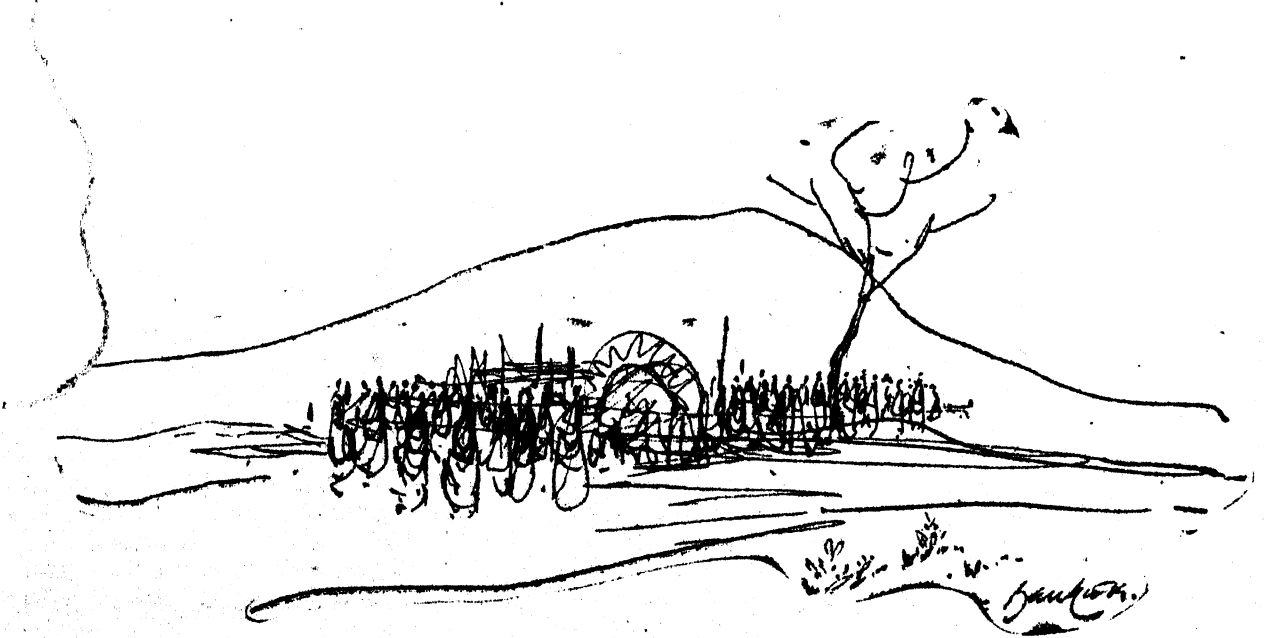
গৌরাঙ্গ-পরিজন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(৭৭)

কমলাকর পিপলাই

কমলাকর ধনী জমিদারের ছেলে, জন্ম সুন্দরবনের কাছে খালিজুলি গ্রামে। জাতিতে ব্রাহ্মণ। বাল্যকাল থেকেই বীত-রাগ।

গৌরাঙ্গের অনুগত। প্রায়ই নবদ্বীপে যায় কীর্তন শুনতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সকলেই কাঁদে, কমলাকরের চোখে জল নেই।

কমলাকরের মনে ধিক্কার জাগে। কীর্তনের চেয়ে ক্রন্দন শ্রেষ্ঠ। না কাঁদলে হৃৎকমল বিকশিত হবে কী করে? হৃৎকমল বিকশিত না হলে সেখানে রাধা-কৃষ্ণ এসে দাঁড়াবেন কেন?

চোখের জলেই তো চোখের দোষ কাটবে। চোখ অদোষদর্শী হলেই তো সর্ব-ভূতে কৃষ্ণদর্শন সম্ভব হবে।

সেদিনও কীর্তনকালে কমলাকরের চোখে জল এল না। শত চেষ্টায়ও না। খেপে গেল কমলাকর। কোত্থেকে কতকগুলো পিপুলের গুঁড়ো এনে দু চোখে ঘষতে লাগল।

আর যায় কোথা! দুচোখে অবিশ্রাম জল ঝরতে লাগল।

প্রভু খুশি হলেন। পিপুল দিয়ে অশ্রু বার করেছে বলে নাম রাখলেন পিপলাই। কমলাকর পিপলাই।

আর প্রভুর দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন কমলাকরের ভাবভক্তি তো নিরর্গল হবেই।

প্রভুর আরেক প্রিয়পাত্র ধ্রুবনান্দ ব্রহ্মচারী। নিষ্কিঞ্চন, গ্রন্থিহীন। অনেক তীর্থ ঘুরে নীলাচলে গিয়েছে, জগন্নাথ তাকে আদেশ করলেন তুমি মাহেশে যাও, সেখানে আমি বলরাম ও সুভদ্রার সঙ্গে বিরাজ করব।

ধ্রুবানন্দ মাহেশে ছুটে এল। মাহেশে এসে আবার আদেশ পেল, গঙ্গাতীরে আমরা আছি, আমাদের নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠিত করো।

গঙ্গাতীরে তিন বিগ্রহ প্রকট হল। ধ্রুবানন্দ মন্দির তৈরি করে তিন বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠিত করল।

তারপর ধ্রুবানন্দ বৃদ্ধ হলে ভাবনা হল আমার অবর্তমানে কে জগন্নাথের সেবা করবে?

তোমার ভাবনা করতে হবে না। স্বপ্নে আবার জগন্নাথ আদেশ করলেন, খালি-জুলির কমলাকর পিপলাইকে খবর দাও, সে এসে আমাদের সেবা করবে।

খবর পৌঁছুল কমলাকরের কাছে। কোন জিজ্ঞাসা নেই, কাউকে কিছু না বলে, কারু সঙ্গে পরামর্শে না বসেই কমলাকর গৃহত্যাগ করল। স্ত্রী পর্যন্ত জানল না।

জগন্নাথ তাঁর সেবায় আমাকে ডেকেছেন—আমি পরমনির্বাচিত — এর বাইরে আর প্রশ্ন কী! কমলাকর সোজা মাহেশে এসে উপনীত হল।

কী হবে ধনে-জনে বৈভবভোগে যদি না জগন্নাথ সেবায় তা উৎসর্গ করি? যিনি দিয়েছেন তাঁকেই আবার সব ফিরিয়ে দেব, সঙ্গে আরো একটু উদ্বৃত্ত দিয়ে দেব—সে হচ্ছে আমার অনুরাগ, আমার চোখের জল।

কমলাকরকে পেয়ে ধ্রুবানন্দ উদ্বেল হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কী, কমলাকরের ছোট ভাই নিধিপতিও যে এসে উপস্থিত। তুমি কেন? তুমি কী চাও?

আমি দাদাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি। কত দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোনো খবর নেই কোনোখানে। শেষে ঘুরতে-ঘুরতে মাহেশে এসে ধরতে পেলাম।

তবে আর কথা কী, বেঁধে টেনে নিয়ে যাও।

নিধিপতি অনেক সাধা-সাধনা করল, কমলাকর এক তিল নড়ল না। মাহেশ ছেড়ে, মাহেশের জগন্নাথ ছেড়ে আমি যাব না সংসারে।

তবে সংসারই এখানে চলে আসুক।

খালিজুলির সমস্ত সংসারকেই মাহেশে স্থানান্তরিত করা হল। ধ্রুবানন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল।

কমলাকরের মেয়ে রাধারাণী আর নিধিপতির মেয়ে রমা। খড়দহের কামদেব পন্ডিত রাধাকে আর যোগেশ্বর পন্ডিত রমাকে বিয়ে করে। এদেরই অনুরোধে কমলাকর নিত্যানন্দকে নিয়ে আসে খড়দহে।

কামদেবের প্রপৌত্র চাঁদ শর্মা যশোরে রাজা প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিল। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করে নিয়ে গেলে চাঁদ রাজার রাধাকান্ত বিগ্রহ খড়দহে নিয়ে এসে স্থাপন করল।

এদিকে মাহেশে কমলাকরের বংশধর রাজীবলোচনের সময় অর্থাভাবে জগন্নাথ সেবার অসুবিধে ঘটে। জগন্নাথই জানেন কী করবেন, খাবেন না উপবাসে থাকবেন।

মুর্শিদাবাদের নবাব নদীবক্ষে বিপদে পড়ল। স্বয়ং জগন্নাথ তাকে রক্ষা করলেন, আশ্রয় দিলেন মন্দিরে। জগন্নাথের সেবার জন্যে নবাব এক হাজার বিঘেরও বেশি জমি দান করল। আর কোথাও ক্লেশ-কৃচ্ছ্র থাকল না।

দ্বাদশ গোপালের একজন, কমলাক.. একাত্তর বছর প্রকট থেকে বৃন্দাবনে লীলা-সংবরণ করল।

(৭৮)

দ্বাদশ গোপালের আরেকজন রামদাস অভিরাম। খানাকুল কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। বিবাহিত স্ত্রীর নাম মালিনী।

সর্বদা সখ্যপ্রেমের আবেশে উন্মত্ত, অভিরাম গৌরাঙ্গের নবদ্বীপলীলায় যোগ দিয়েছে। সেই সবচেয়ে বেশী ভাবগ্রস্ত, ঈশ্বর কথা ছাড়া তার আর কোনো বাক্য নেই। একবার তো এমন কৃষ্ণাবেশ হল তিন মাসেও তা গেল না।

প্রভু নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে গৌড় পাঠিয়ে দিলেন সংসারে থেকে নাম-প্রচারের জন্যে। সঙ্গে যে কজন সহচর ঠিক করে দিলেন তাদের মধ্যে একজন অভিরাম।

পথিমধ্যে রামদাসের মধ্যে গোপাল-ভাব প্রকাশ পেল। তিন প্রহর ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাহ্যজ্ঞান নেই, সে কী অপূর্ব প্রেমাবেশ! 'মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া। আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া।'

নিত্যানন্দের নৃত্য-কীর্তনের প্রধান সঙ্গী, স্থানে-স্থানে ঘুরে বেড়ায় অভিরাম। পানিহাটিতে রঘুনাথ যখন দধি-চিড়ার উৎসব করল সেখানে অভিরামও নিমন্ত্রিত।

তেজস্বী, প্রকান্ড শক্তির অধিকারী অভিরাম। একদিন নিত্যানন্দের সঙ্গে নাচছে, প্রেমাবেশে অভিরাম বলে উঠল: আমার বাঁশি কই?

এখানে বাঁশি পাবে কোথায়? ঐ দেখ এক খন্ড কাঠ পড়ে আছে।

কাঠ তো নয়, প্রকান্ড গুঁড়ি একটা। এত ভারী যে তুলতে বত্রিশজন লোক লাগে। সেই বত্রিশজন বহনযোগ্য কাষ্ঠ-খন্ডকে অনায়াসে তুলে নিল অভিরাম। শুধু তাই নয়, দুই হাতে তাকে মুখের বাঁশির মত করে ধরল।

অভিরামের একটা চাবুক আছে। ত.. নাম জয়মঙ্গল—সকল মঙ্গলসিদ্ধ চাবু.. এই চাবুক দিয়ে অভিরাম যাকেই ম.. করে তারই মধ্যে ভক্তি-শক্তি উথলে ও..

শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে যাবার আগে.. খানাকুল কৃষ্ণনগরে, অভিরামের ত.. নিতে।

আপনার চাবুক দিয়ে আমাকে .. করুন।

অভিরাম হাসল। সহ্য করতে.. তো?

শ্রীনিবাসের অঙ্গে তিন-তিনব.. মারল অভিরাম। আবারও মারতে যাচ্ছি, মালিনী ছুটে এসে স্বামীর হা.. চেপে ধরল। বললে, ঠাকুর, স্থির হও। শ্রীনিবাস বালক, ওকে আরো বিহ্বল করে কাজ নেই।

হ্যাঁ, এতেই হবে। এতেই শ্রীনিবাস বৈরাগ্য-প্রেমিক হয়ে উঠতে পারবে।

শ্রীনিবাস আছে অভিরামের ঘরে, গোপীনাথের পদচ্ছায়ে। অভিরামের বাড়ির

পূর্বদিকে রামকুন্ড নামে পুকুর, সেই পুকুর খুঁড়েই পাওয়া গেছে বিগ্রহ। সে বিগ্রহের সামনে নামকীর্তনে কী সীমাহীন আনন্দ।

অভিরাম খবর দিল পাশেই কোন ধনীর বাড়িতে বিবাহোৎসব হচ্ছে—তুমি সেইখানে গিয়ে আহার করো ও দক্ষিণা নাও। সেই দক্ষিণাতেই তোমার বেশ কিছু-দিন চলে যাবে।

শ্রীনিবাস রাজি হল না।

কেন, রাজি হচ্ছ না কেন?

দরকার নেই। আমার কাছে এখনো পাঁচ গন্ডা কড়ি আছে।

অভিরাম অবাক মানল। ঐ স্বল্প সম্বলে এত তেজ!

গোপনে সংবাদ নিল অভিরাম। শুনল শ্রীনিবাস ষোল কড়ার তন্ডুল, এক কড়ার খোলা, দুই কড়ার কাঠ আর বাকি কড়ার লবণ কিনে দ্বারকেশ্বর নদীর পারে ভোগ চড়িয়েছে।

দুজন বৈষ্ণবকে সেখানে পাঠিয়ে দিল অভিরাম। বললে, সেখানে গিয়ে শ্রীনিবাসের অতিথি হও।

অতিথি দেখে কোথায় কুন্ঠিত হবে, শ্রীনিবাস উল্লসিত হল। সে অন্ন দিয়েই মহাপ্রসাদ বানিয়ে অতিথিদের খাওয়াল, নিজেও প্রসাদ পেল। কোথাও অল্প নেই, অভাব নেই, সর্বত্র পর্যাপ্ত, সর্বত্র প্রচুর।

অভিরাম শুধু প্রেমদ্রব নয়, প্রতাপ-প্রচন্ড। তার প্রণামের তেজ বিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্য কোনো বিগ্রহ সহ্য করতে পারে না। প্রণাম করলে অন্য বিগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

শ্রীপাট খানাকুল কৃষ্ণনগরে। শ্রীপাটে এসে অভিরাম বসল এক বকুলগাছের নীচে। সেখানেই 'সিদ্ধ বকুল কুঞ্জ'।

(৭৯)

রামচন্দ্র খান

বেনাপোল অঞ্চলের জমিদার, বৈষ্ণবদ্বেষী।

হরিদাসকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্যে নিযুক্ত করল লক্ষহীরাকে। রাত্রিকালে হরি-র কুটিরে যাও, তার চরিত্রে দোষ-সৃষ্টি

হীরাই লক্ষচ্যুত হল। দ্বারে বসে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়।

আর নামসংখ্যা এখনো পূর্ণ হয়নি। হরিদাস, তুমি বসে বসে আমার নাম-শোনো। সংখ্যাপূর্ণ হলেই তোমার ...ত অভিলাষ তা পূর্ণ করব।

...শেষ হয়ে গেল তবু হরিদাসের ...ন শেষ হল না। লক্ষহীরা ব্যর্থ ...করে গেল।

এমনি পর-পর তিন রাত।

নাম শুনে শুনে লক্ষহীরা মধুমতী হয়ে গেল। সেও রসনায় নামস্মরণ করতে লাগল।

লক্ষহীরা লক্ষেশ্বরী হয়ে গেল। যে দিনে এক লক্ষ নাম করে সেই লক্ষেশ্বর।

লক্ষহীরার পরিবর্তন হলেও রামচন্দ্র খানের পরিবর্তন হল না।

নিত্যানন্দ নীলাচল থেকে গৌড়ে ফিরছে, সশিষ্য রামচন্দ্রের ঘরে এসে উপস্থিত হল।

বললে, আমাদের থাকবার জায়গা করে দাও।

রামচন্দ্র তার ভৃত্যকে বললে, বলে দাও গোয়াল ঘরে থাকবে।

ভৃত্য পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

রামচন্দ্র গর্জন করে উঠল : ওসব বৈষ্ণব সাংগোপাঙ্গদের গোয়াল-ঘরই উপযুক্ত স্থান।

নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। শিষ্যেরাও তাকে অনুগমন করল। এই অসম্মান অসহনীয়।

সত্যি এই ঘর আমাদের যোগ্য নয়। বললে নিত্যানন্দ, এখানে একদিন ম্লেচ্ছ এসে গোবধ করবে।

বৈষ্ণবদল চলে গেলে রামচন্দ্র ভৃত্যদের আদেশ করল, যেখানে ওরা বসেছিল সেখানকার মাটি চেঁছে ফেল। তারপর সমস্ত উঠোন—মন্দিরপ্রাঙ্গণ— গোবরজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করো।

তাই হল। রামচন্দ্র স্বস্তিতে ঘুমুতে গেল।

কিন্তু কতক্ষণের ঘুম!

রাজকর বাকি পড়েছে সেই অপরাধে রাজার ম্লেচ্ছ উজির রামচন্দ্রের ঘরে এসে হানা দিল। টাকা বার করো শিগগির। যতক্ষণ তা না করছ, আমি আর আমার অনুচরেরা বসছি তোমার দুর্গামন্ডপে। আমাদের খাওয়ার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমরা নিজেরাই রেঁধে নিতে পারব।

দুর্গামন্ডপেই তারা অবধ্যবধ করে রান্না করে খেল।

দাবির টাকা রামচন্দ্র বার করতে পারল না।

আর কথা নেই। সস্ত্রীক রামচন্দ্রকে বেঁধে ফেলল উজির। তারপর তার গৃহ ও গ্রাম লুট করে সর্বস্বান্ত করল।

রামচন্দ্র বুঝল, হাড়ে-হাড়ে মর্মে-মর্মে বুঝল, মহতের কাছে অপরাধের এই বিষময় ফল।

(ক্রমশঃ)
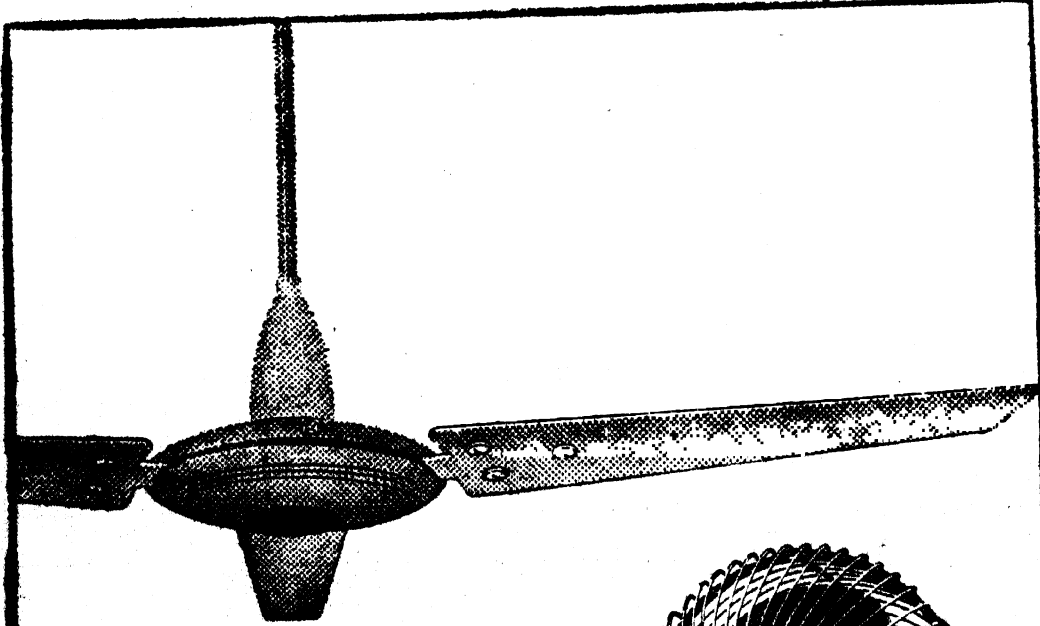
দেশে ও বিদেশে
ভারতের সর্বাধিক
বিক্রীত ফ্যান
উষা
কেনা ভাল সবার ভাল উষা ফ্যান
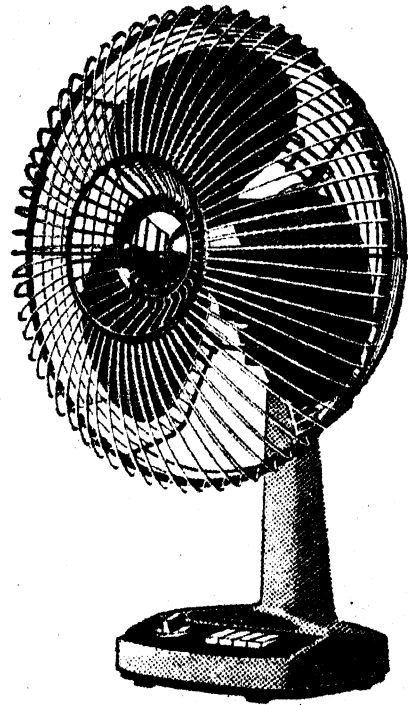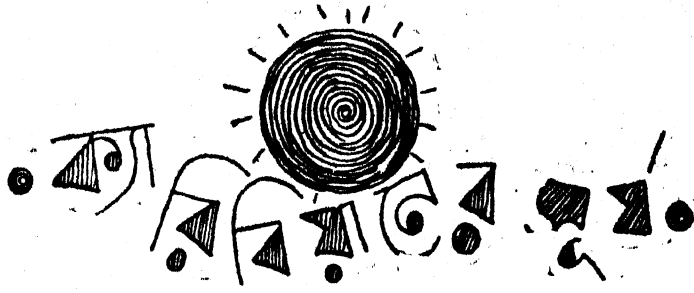
ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাগ্যি আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন ইংরেজদের এই বেড়া কেটে বাইরে এসেছিলেন; তাই বিনা বাধায় সারা আমেরিকায় কানাডায় 'ইণ্ডিয়ান'দের কোতল-জবাই করে 'পকেট-এ পকেট-এ' গুদামজাত করে রেখে সারা আমেরিকা ভোগ করছে।

নৈলে ইংরেজ সরকার বাদ সাধতেন। তা ও'রা বরাবরই সাধেন। হেষ্টিংসের বিচার হোলো; কৈ—আউধ তো ফিরিয়ে দেওয়া হোলো না! ক্লাইভের বিচার হোলো; কৈ বাংলা তো স্বাধীন হোলো না! রালের জেল হোলো, শিরচ্ছেদ হোলো,—কৈ গুয়ানা তো ইংরেজ ছাড়েনি! গ্রীনাদার সরকার ধমক খেলো; কৈ গ্রীনাদা তো ইংরেজ কারীবদের ফিরিয়ে দেয়নি!

দেবে কী করে? সেই এলিজাবেথের সময় থেকেই রাজপরিবার স্বয়ং এই লুঠ-তরাজের শরীকদার ছিলো যে! বাহ্যিক একটা মুখোশ খাড়া করে 'কালো-মেষ' কোতল করে, তারপর নৈবেদ্যে ভাগ বসানো,—এই তো শাদা-বণিকশাহীর চিরকালের ডিপ্লম্যাসী। ওদের 'স্বাধীনতা' এবং 'সভ্যতা'র অর্থ ওদের মধ্যেই সীমিত। যারা শাদা নয়, তাদের সম্বন্ধে ও দুটো শব্দের প্রয়োগ অব্যবহার্য।

ফরাসীরা গ্রীনাদা জয় করতে না পেরে ওদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে-... সে অত্যাচারের তুলনায় ইংরেজরা ভালো,—যেমন ভালো হাঁপানীর চেয়ে ... কলিকের চেয়ে ক্যান্সার। Morne de Sauteurs গ্রীনাদার গিরি-শিখর। ঝুঁকে আছে গভীর ... ওপর। তলার দিকে তাকালে মাথা ...।—রাশি রাশি পাথুরে চাঁই মহা-... দাঁতের মতো খিঁচিয়ে আছে। ...নী নামটির বাংলা তর্জমা বোধকরি "লাফিয়ে-র ঢিবি"। শাদাদের নিরন্তর যন্ত্রণায় আত্মাবমাননে বিড়ম্বিত ক্যারিবরা হাজারে হাজারে স্ত্রী-পুত্র পরিবার, বালক বৃদ্ধ যুবাসহ এখান থেকে লাফিয়ে আত্ম-মর্যাদা বজায় রেখেছে। সভ্য য়োরোপে কোথাও এমন একটি জোহর-ব্রত উদ্‌যাপনের কথা শোনিনি। ক্রুজেডস?—ছোঃ! ক্রুজেডস্-কে ধর্মযুদ্ধ বলার দিন আর নেই। ইতিহাস সে ভাঁওতাকে চপেটাঘাতে জব্দ করেছে। তবু সত্য ফরাসীরা কুড়ুল দিয়ে নর-নারী শিশু কারীবদের কোতল করতো শ্রেফ,

> to amuse their otherwise uneventful and monotonous life in these desolate and disconsolating islands."

মর্ণ-দ্য-সান্তোর-এর শান্ত সমাহিত পরিবেশে বসে আজ সেদিনের কথা প্রায় ভাবা যায় না। আকাশ-ছোঁয়া সীডারের মাথার ওপর দিয়ে শাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায়। পাহাড়ের ভাঁজের পর ভাঁজে নানা জাতের ফার্ণ মনোহর মায়া বুলিয়ে দেয় শ্যামল-মনা পিপাসার অন্তস্তলে। কারীবদের গাঁয়ে কেউ গীটার বাজাচ্ছে। তার শান্ত সংহত সুর উধাও করে দেয় মনকে; রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় চির-ব্যাপক, অনন্ত একটা নৈর্ব্যক্তিক পরমার্থতায়।

প্রকৃতি এনেছে ঝড়ের পর ঝড়। গুঁড়িয়ে দিয়েছে, মাড়িয়ে দিয়েছে, পিষে দিয়েছে গ্রীনেদাকে! ইতিহাস এনেছে স্বর্ণলুব্ধের ঝড়। পিষেছে, জ্বালিয়েছে, শেষ করে দিয়েছে মানুষের বুকের আশা, মনের স্বপ্ন। তবু যেন সর্বংসহা প্রকৃতি আবার গড়ে দিয়েছে গ্রীনেদার শ্যামল রূপ। যতো বেগে সংহার, তার চেয়ে দ্রুত প্রকৃতির পুনর্বাসন। এ পৃথিবীর কাছে জীবনের অখন্ড অক্ষয় ঋণ! মানুষ তা বুঝতে চায় কৈ!

গ্রীনেদা হোলো মশলার অফুরন্ত ভান্ডার। যুগের পর যুগ মানুষ যত্নে, ক্লেশে, পরিশ্রমে, অধ্যবসায়ে গ্রীনেদার মাটিতে বাগান করেছে দারুচিনির, লবঙ্গের, জায়ফলের, তেজপাতার, এলাচির; গ্রীনেদার জায়ফল সারা পাশ্চাত্য গোলার্ধে বিখ্যাত। এসব বাগানের মালিকরা বড়ো বড়ো ফার্ম রচনা করে মাঝে মাঝে বসতবাটী গড়েছে। পাহাড়ের গায়ে সেইসব বিত্ত-চিত্ত-পরিপুষ্ট বর্ণাঢ্য বাংলোগুলো ছবির চেয়েও অবাস্তব লাগে। সারি সারি নিগ্রোরা মাথায় ফেল্টের কিংবা ঘাসের টুপী পরে কাজ করছে। ওদের পরিশ্রমের ফসল বন্দরে চলে যাবে। ব্যাঙ্কের মারফৎ পৌঁছুবে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের বিপণীতে; লীমা, জুমোজে, এরার্জ; বলিভিয়া, বোস্টন, টরন্টো, লন্ডনের বাজারে। ব্যাঙ্কের অঙ্ক এক খাতা থেকে অন্য খাতায় উঠে আসবে। ওরা যেমন কাজ করার করবে; আজও করবে, কালও করবে।

পাহাড়ের তলায়, ঝর্ণার ধারে সারি সারি ওদের 'লোজী' কাঠের ঘর। মুর্গী, শোর, ছাগল, গরু—ওদের চিরকালের জঠরের ধন। একসঙ্গে এক পরিবারে থাকবে ওরা। রবারের হাঁটু-অবধি উঁচু জুতো, কাটআস, জলের বোতল, লাঞ্চের থলে,—এই নিয়ে ওরা ১৬৪০-এ ঘুরেছে মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে; আজও ঘোরে। তখন পেতো দৈনিক পাঁচ থেকে দশ সেন্ট! এখন পায় দৈনিক পাঁচ ডলার। একশো গুণ বেশী পয়সা। কিন্তু এখন ওরা খায় কেনা মদ। কেননা বাড়ীতে মদ করা পাপ—বে-আইনী। এখন ওরা সায়েব কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা কলাই বা চায়নার থালা-বাটীতে খায়, প্লাস্টিকের পর্দা ঝোলায়; স্প্রীংয়ের খাটে স্প্রীংয়ের গদিতে শোয়; রেডিও রাখে; জুয়া খেলে; ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়; ফ্যাশানেবল্ জামা-কাপড় পরে;—অর্থাৎ সেই একশোগুণই আবার দস্যুদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যেমন কপর্দকহীন ছিলো, তেমনি থাকে।

গির্জা আছে। তারই সঙ্গে প্রাইমারী শিক্ষা আছে; যীশু-কাহিনী, কলম্বাসের মহান্ আবিষ্কার, ইংলন্ডের রাণীর করুণাময়তা : ইংরেজ জাতের মনীষা এবং নিগ্রো অসভ্যদের সভ্যকরণের ইতিহাস পড়ে। পরীক্ষা দেয় মথিলিখিত সুসমাচার সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে পড়ে আমেরিকান কমিক ম্যাগাজিন, যাতে প্রত্যেক আফ্রিকানই জংলী; প্রত্যেক কারীবই নরখাদক; প্রত্যেক রেড ইন্ডিয়ানই মহাবর্বর ও নৃশংস; এবং প্রত্যেক ভারতীয়ই ম্যাজিক-ম্যান। এই খোরাক হজম করার পরও যদি 'ব্রেণ-ওয়াশ' না হয়, তখন স্কলারশিপ দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান য়ুনিভার্সিটিতে চালান করানো হয়। অতঃপর তারা ফিরে এসে দেশের ডেমক্রাসী রক্ষা করেন বিদেশের বাণিজ্যকে সুরক্ষিত রেখে।

সাধারণ লোকের পক্ষে গ্রিনেদাতে বেড়াতে যাবার কোনো অর্থ নেই। এসব দেশে অগাস্ট মাসটাকে 'হলিডে' মাস ধরা হয়। আমাদের যেমন পুজোর ছুটি। মাস্টার মশায়দের যেটা গরমের ছুটি সেটাকে তো সত্যি ছুটি বলা যায় না; কারণ সেই দারুণ গরমের সময়ে ছুটিকে 'উপভোগ' করার সামর্থ্য শরীরের কোথায়? সিমলা-দার্জিলিং কজনাই বা যেতে পায়?

কিন্তু য়োরোপ আমেরিকার 'সামার' একটা মস্ত রকমের ছুটির অবসর। সবাই ছুটিতে যাচ্ছে। এর মধ্যে 'যাওয়া'টাই বড়ো। সম্প্রতি একটা কার্টুনে দেখলুম সায়েব এসেছে মুচিখানায় জুতো মেরামৎ করাতে। মুচি বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন: গাড়াকর প্রতি ... ।

জ্যাক বলে, "কী মানিক; জনুতো জোড়া মেরামৎ করে যাও!"

মুচি খবরের কাগজে চোখ লেপটে রেখেই জবাব দেয়,—"নেহী! আমি ছুটিতে গেছি!"

"গেছি? সে কি বাৎ গো? দিব্যি তো বসে আছো দেখতে পাচ্ছি!"

"থাকলেই বা। তা বলে ছুটিতে যেতে নেই? অগাস্ট মাস এটা। থাকতো, যেতাম। নেই, যেতে পাচ্ছি না। তাতে ছুটির কী দোষ? ছুটি ছুটিই। পয়সা নেই বলে ছুটিতে "যাওয়া" কথাটাও বারণ নাকি?"

এদেশে বেড়াতে "যেতে" হবে ছুটিতে। তার কতকগুলি আবশ্যিক উপকরণ আছে। আমেরিকার পক্ষে য়োরোপ, জাপান, ইন্ডিয়া। য়োরোপের পক্ষে স্টেটস্, ডাউন সাউথ, আফ্রিকান সাফারি, মেডেটিরানিয়ান্,—ইত্যাদি। ভালো হোটেল, ক্যাসিনো, নাইট ক্লাব। মুজিয়ম, আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার। রেস কোর্স, সুইমিং পুল, টার্কিশ বাথ। ইত্যাদি। মাঝে মাঝে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, শিলালিপি এবং ভাঙা ইমারত দর্শন করে বিজ্ঞ সাজা।

কিন্তু ক্যারিবিয়ানে তো এসব নেই। এখানে বেড়াতে যাঁরা আসেন তাঁরা নগ্ন প্রকৃতি, আদিম সভ্যতা, বন্য উপাদান, আরণ্যক পরিবেশ, আদিম আঙুরপাতা-ঢাকা ঈভ ও আদমের নরনপাত, ফার ফ্রম দি ম্যাডেনিং ক্রাউড্, তোফা সৈকত-চত্বর, তুঙ্গ গিরিশিখর, প্রচ্ছন্ন শৈলনির্ঝর,—এবং বনিয়াদী হোটেল, অভিজাত সুরা-সাকী, ড্যান্স, ক্যাবারে,—এই সবই খোঁজেন। সঙ্গে করে পত্নী যাঁরা আনেন তাঁদের সংজ্ঞা 'মূর্খ' "As foolish as bringing a wife to Paris"— ওদের দেশের এক প্রসিদ্ধ বয়েৎ।

গ্রীনাদাই শুধু নয়, তামাম ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলো এখন সাজগোজ আরম্ভ করেছে। এই সব ব্যবস্থা শুধু আমেরিকান রাঘব-বোয়ালদের জন্য—চার ফেলা আর কি! ফাঁসালেই ডলার। রেন্ কম্, বমাঝম্। উপস্থিত গ্রীনাদা ২৫০ একর জমির ওপর এক স্বপ্নপুরী গড়ছে। নাম "ট্রু ব্লু"। বাসিন-সি-এন্ডারসন ভেনেজুয়েলার ব্যবসায়ী চাই। ট্যুরিস্ট বিজনেস তার কর্ম। সে কোম্পানী করে এই "ট্রু ব্লু" এলাকা স্থাপনা করছে। এতে প্রত্যেকে নিজের বাড়ী করবে ২৫০০০ স্কয়ার ফীটের ওপরে। পথ-ঘাট, বিদ্যুৎ-জল-টেলিফোন এসব তো থাকবেই; গলফ্ রিং, ঘোড়-দৌড় বাচ্চাদের খেলার মাঠ, সুইমীং পুল, এ সবও থাকবে। গ্রীনাদার ধনকুবের 'আঙ্কল্ জনী' সেই সঙ্গে ফেঁদেছে আঙ্কল জনীজ্ ফার্ম। টাটকা দুধ, পাখী, মাংস, ডিম, চড়বার জন্য ঘোড়া,—সব পাবে। রোবার্তো বার্ল মার্কস্ পৃথিবীর একজন বিখ্যাত নগর-স্থপতি। বিশ্ববিখ্যাত মেক্সিকো সিটী তাঁর কীর্তি। তাঁকে লাগানো হয়েছে ট্রু ব্লু'র রচনায় সমৃদ্ধি এবং রুচি এনে দেবার কাজে।

এ শহরে ঢোকার কোনো ব্যবস্থা নেই। কোনো ছোটো সাইজের লোক বা গাড়ী এখানে ঢুকবে না। এর মধ্যে তারাই যাবে যারা এর বাসিন্দা।

সমগ্র ক্যারিবিয়ানে এমনি অলকাপুরী রচনার একটা হিড়িক পড়েছে। প্রায় প্রত্যেক দ্বীপে এই নিভৃত বাসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। নগরে বড়ো কোলাহল। কোলাহল বাদ দিয়ে নগর, পরিবার বাদ দিয়ে ফূর্তি, ঝামেলা বাদ দিয়ে ছুটি,—এই এখন এদিককার খুব শাঁসালো ব্যবসা।

তবুও ছুটি বলে গ্রীনাদায় গিয়েছিলাম অন্য কারণে। আমাদের পরিচিত গঙ্গা-বিষ্ণু সতেরো বছর ঈভার সঙ্গে ঘর করে সহসা তাকে বর্জন করে বসে আছে। ঈভা এসে কদিন কাঁদাকাটা করে গেছে। করবেই। ঈভা এখন বিগতযৌবনা। বাচ্চা-কাচ্চা হয়ই নি। যখন গঙ্গাবিষ্ণুর প্রেমে বিহ্বল হয়েছিলো তখন জানতো না গঙ্গাবিষ্ণুর বিয়ে আছে; দুই ছেলে, দুই মেয়ে আছে। যখন জেনেছে তখন আর কোনো গতি নেই। ঈভা তখন জানতো ভালোবাসার ভাষা মাঝে মাঝে ভুল বকে; কিন্তু ভাষাটা ভোলা যায় না।—

গঙ্গাবিষ্ণু বলে,—তা বটে; কিন্তু ছেলেমেয়েরা বড়ো হোলো। বয়সও আর নেই। বৌটা যেমন পাগল ছিলো, তাই আছে। ঘর করা যায় না সত্যিই। কিন্তু মেয়েদের বিয়ে, ছেলেদের ব্যবস্থা করার জন্যে এ তামাশা ভাঙতে হয়।

তামাশা?—ঈভা চমকায়। বলেন কি মাস্টারমশায়। সতেরো বছর ধরে তামাশা? ওর বাচ্চাদের তো চিরকালটাই আমি দেখা-শুনো করেছি। বাড়ীখানা করেছি আমারই বাবার টাকায়। তা-ও তো ওরাই পাবে। মেয়ের বিয়ে? দুনিয়া জানে আমি ওকে ছাড়া মনিষ্যি জানি না। একুশ থেকে আজ আমার আটত্রিশ হোলো,—সমস্তটা যৌবন যার পায়ে ঢেলে দিলুম, আজ তার এটা তামাশা? দুই বৌ কী কারুর হয় না? তা ছাড়া ওর বৌতো আজও পাগল। আসল কথা আর একটা মেয়ে জুটিয়েছে।......

কাঁদে ঈভা। গ্রীনাদার মেয়ে আমি। বাপ মারা গেছে বাল্যকালে। ভায়েরা বার বার বারণ করেছিলো। তখন সব জলাঞ্জলি দিয়েছিলুম একমাত্র বুকের ডাকে। আজ আমি যে কারুর কাছে দাঁড়াবো সে ঠাঁইও নেই। ভাই-বৌরা লাথিঝেঁটা মারবে। সে সমাজ ছি ছি করবে। এখানেই বা আমি থাকি কোন্ ভরসায়?

ওর ভাই এসে ওকে নিয়ে গেলো। আমিও গেলুম। সেই গ্রীনাদায় যাওয়া। মনোরম নয়। শুধু যাওয়া। ওরা থাকতো গ্রীনাদার রাজধানী এবং বলতে গেলে একমাত্র শহর সেন্ট জর্জে। সেন্ট জর্জ তার বন্দরের জন্য প্রসিদ্ধ। গোটা আগ্নেয়গিরি সলিল সমাধি হয়ে তবে গ্রীনাদা। আজ যে যে জায়গা আমরা 'বে' অর্থাৎ উপসাগর বলছি, প্রায় প্রত্যেকটাই ফুরিয়ে যাওয়া আগ্নেয়গিরির গহ্বর। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের বলয় আছে। তা পার হলে তবে গভীর জল। অন্যান্য উপসাগরে তাই বন্দর হতে পারেনি। সেন্ট জর্জের 'রীফ্', এই বলয়ের একটা দিকে কী করে খানিকটা ফাঁক। বাস্। সেই পথ বেয়ে ঢুকে পড়লেই গভীর নীল জল। তার পরে বলয়ের পাড় ধরে ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে গেছে শহর, গির্জা, কোর্ট কাছারি, স্কুল, হাসপাতাল। কারিনাদের বাড়ীঘরদোর আজও উনবিংশ শতাব্দীর লকড়ী-স্থাপত্যকে মনে করিয়ে দেয়।

শহরটার মাঝ দিয়ে একটা পাহাড়ী শিরদাঁড়া। শহরটাকে দু' ভাগে ভাগ করেছে। পাহাড় ভেদ করে সেকালের একটা টানেল। তার এধার ওধার বন্দর। প্রাচীন বন্দর, আধুনিক বন্দর। মার্কেট প্লেস এবং ওল্ড্ ফোর্ট জর্জ যোগাযোগ রাখছে একটা পথ। ধারে ধারে বাগান বেছানো বাড়ী; সেন্ট জর্জের ব্যবসায় কেন্দ্র, বিপণি সম্ভার, এবং ফ্রাঙ্গাপানী গাছের পাড়। শাদা এবং লাল ফুলের গন্ধে সারা পথই সুরভিত। পায়ে হেঁটে ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সেন্ট জর্জ ফুরিয়ে যায়।

তখন কী? ঐ সমুদ্রসৈকত আর প্রকৃতি। দক্ষিণে গ্রান্ড আনসে, দুই মাইল-ব্যাপী ধবধবে শাদা বালিতে ঢাকা সমুদ্র-বেলা। সত্যিই মনোরম। কিন্তু এতো বেশী রকম নোংরা করে রাখে আমেরিকান ট্যুরিস্টরা যে মাঝে মাঝে রাগ হয়। যখ থাকে না তখনকার নোংরামী সহনীয়; কিন্ত যখন ওরা কিলবিল করে তখনক নোংরামী অসহনীয়।

একটি দিন আমার মনে থাকবে। ঈভার দাদা গোয়ালবক্স গাড়ী করে একটা হ্রদ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। উঠেছে আঠারোশো ফুটের মাথায়। গোড়া পথটা ট্রপিকাল জঙ্গলে ঢাকা। তারপরে সবুজে-নীলে-ফিরোজায় একখানা কিংখাবী সৌন্দর্য-বেষ্ট দেখলুম। তার তুলনা দিতে যাচ্ছি জেনেভার সঙ্গে, লুসার্ণের সঙ্গে, তাতে যেন দর্জিগিরি বড়ই প্রকট। তুলনা দিতে যাচ্ছিলাম উইনিপেগের সঙ্গে, অন্টারিওর সঙ্গে,—সে যেন থ্যাবড়া-বুকে, চ্যাপ্টা-নাক মঙ্গোলিয়ান বুড়ী, একটু-আধটু সাজগোজ করে বসে আছে আটোর কলের ধারে। ক্যানাডার স্টেটে—কিছুতেই 'ইন্ডালী' তোলা যায় না। সর্বাঙ্গকে 'মুজেকুল' করে তোলায় তাদেরই প্রবল ওদের।

এখানে তা নয়। এখানে এসে মনে হোলো সেই লাইন ঃ

আমারই চেতনার রঙে পান্না হোলো সবুজ,
চুনি উঠলো রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর,—
সুন্দর হোলো সে।
তুমি বলবে এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।

কে তুমি কবি; ক্ষণে ক্ষণে, দিকে দিকে, রূপে রূপে, কেবলই তুমি তোমার ছন্দ দিয়ে, মন দিয়ে, দেখার মাধুরী দিয়ে পরশ করে যাও। যা দেখি তাকে শতভিষা করে তোলো; যা আঁকি তাকে শতরূপা করে তোলো। এ-মনটা যে তোমার সত্তার চরণে এতোভাবে ঋণী প্রকৃত সুন্দরকে দেখার কালেই তা মনে হয়। একা যেন কিছু দেখতে পারি না, বুঝতে পারি না। অমোঘ তুমি, ঠিক এসে তোমার প্রাপ্য অংশ তুমি মেপে নেবেই।

সরকারী লেক-হাউস আছে। আনলায়া-দম্পতিরা মধুবাসর কাটাবার অবসর খোঁজে এখানে। প্রায় তের একরব্যাপী ভূঁতের মতো ঘন নীল শান্ত জল টলমল করছে কবেকার কোন্ আগ্নেয়াগিরির গভীর গহ্বরে। সেই জলে ছায়া পড়েছে নীল আকাশের, শাদা মেঘের, দীর্ঘ ফার্ণের, সারি সারি দেবদারুর। জল যেন আয়না; মন যেন মুকুর; চৈতন্যের গুপ্তলোকে কে যেন বন্ধ দরজায় আঘাত হানছে; দাও খুলে দাও দ্বার; আমাকে বেরুতে দাও।

ঠিকই হয়েছে। এখানে বধ নিষিদ্ধ। পশুপাখী নির্ভয়ে খেলা করে। ফুলের বীজ সাবধান-অসাবধানতার সঙ্গে ছড়ানো। রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না। মোড়ে মোড়ে অর্কিড। ছুঁয়ো না। নিষেধ। একটা স্বপ্নলোক; ব্যথাতুর, পরশকাতর, সজল লোক। এখানে এলে শুধু মনে হয়,—কেন ফিরতে হয়, কে জানে!

এনাণ্ডেল ফলস উজ্জ্বর প্রপাতের কাছে কিছুই না। জোনা ফলসও ঢের ভালো এর চেয়ে। কিন্তু পয়েন্ট সেলাইন ভারি মজার ব্যাপার। দুটো পর পর চাঁদ-পারা উপসাগর, মাঝে একটা ব্রীজ। কিন্তু একটায় যেমন শাদা চকচকে বালি, অন্যটায় তেমনি কালো কুচকুচে বালি। গায়ে রং ধরায় না কোনটাই, কিন্তু মনে? হ্যাঁ, তা ধরায়।

গোয়ালবল্সরা জায়ফলের ব্যবসা করে। ওদের মস্ত বাগান আছে গ্রেনভিলে। ব্যবসার পোস্তা গুয়াডে শহরে। কিন্তু জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, এলাচি—এসবের কারখানা গ্রেনভিল শহরে। গ্রেনভিলে মস্ত মাছের বাজার। তরি-তরকারী, বিশেষতঃ ফলের বড়ো বাজার গ্রেনভিলেই। শনিবার শনিবার হাট হয়। সেদিন গ্রেনভিলের যেন অন্য চেহারা। ঝলমল করে যেন গ্রেনভিল। নানা ভাষা, নানা বেশ, নানা কথার আনাগোনা, নানা গুজবের লেনদেন,—সব এই-খানে।

সারা সপ্তাহে এই একটা দিন গ্রিনাদায় মানুষগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। একটু এধার-ওধার লক্ষ্য করলেই চিমনীর পর চিমনী দেখা যাবে। ওসব ফ্যাকটরিতে মশলা শুখোনো, মশলা-নির্যাস নিংড়ুনো, মশলা গুঁড়োনো, মশলা টিনে ভরে প্যাককরা করা,—এইসব চলছে। ১৯৫৫-তে ঝড়ে সারা গ্রিনাদার মশলা গাছ একেবারে ছত্রখান হয়ে গিয়েছিলো। এখনও সামলে ওঠেনি। কিন্তু গোয়ালবল্সরা সেই থেকেই ধনী হয়ে গেলো।

ওরা বলে হনুমানের ঝাণ্ডী।
বিশ্বাস এমনি জিনিস!

গোয়ালবল্সের ধারণা, এই মশলার দৌলতেই গ্রীনাদায় মানুষকে বেশী দিন 'পরাধীন' থাকতে হয়নি। গোয়ালবল্স অবশ্য 'পরাধীনতা' বলতে 'মুচলেকা-লেখা শ্রমিক'-দের কথা বলছে। ভারতবর্ষ থেকে কুলী আমদানী তো ঢের পরে। তার আগে নিগ্রো বিদ্রোহ হয়; তারপর মাল্টা থেকে, মদীয়া-দ্বীপ থেকে শাদা পর্তুগীজ শ্রমিক আনানো হয়। তারাও পারে না ক্যারিবিয়ানের সূর্য-তাপ সহ্য করতে। যে-যার ব্যবসাপত্তরে লেগে গেলো। বেশীর ভাগ পালিয়ে গেলো পাহাড়ে। তখন আরম্ভ করলো তারাই এই মশলা গাছ পোঁতা। বেশী খাটুনি নেই। একবার গাছ পুঁতে দিলে বহুকাল ফল দেবে। চিনির মতো নিত্যদিনের ঝামেলা নেই। চিনির ব্যবসা গ্রিনেদা থেকে প্রায় উঠেই গিয়েছে।

নিগ্রো বিদ্রোহ সম্বন্ধে গোয়ালবল্স দিব্যি ওয়াকিবহাল। "মাঝে মাঝে বই পড়ি। আমার বাতিক এই কালাগুলোর খবর জানি।—

"...একটা মজাদার খবর পেলাম।—সেটা সতেরোশো সাতানব্বই খৃষ্টাব্দ। মাস বোধ করি অক্টোবর। রাতের আঁধারে এক মস্ত জাহাজ এগুতে লাগলো গুয়াডের দিকে। তা—সে সময়কার কথা ভাবুন। সতেরোশো সাতানব্বই। ফরাসী আর ইংরেজ তো খাওয়াখাওয়ি। সবাই ভাবলো এসেছে ফরাসী জাহাজ লুঠতরাজ করতে। ডেঙ্গা থেকে দেগে দিলো এক কামান সেই অন্ধকারে ল্যাপটানো বিশাল নীরব নির্বাক জাহাজ-খানার ওপর।

"ব্যস্, আর যাবে কোথা! জাহাজ থেকে বর্ষাতে লাগলো কামান। গুড়ুম্! গুড়ুমের পর গুড়ুম। আক্কেল গুড়ুম। ব্যস। আর কিস্সু বলা নয়, কওয়া নয়; যে-যার নিজের নিজের মালপত্তর গুটিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়। কেউ সেণ্ট জর্জের দিকে, কেউ পাহাড়ের দিকে।

"সকালে সব হেসে বাঁচে না। ইংরেজ কাপ্তেন ইংরেজ জাহাজেই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসেছিলো। কিন্তু যখন তারই জাতভাইরা তাকে কামান মেরে ঘায়েল করার ব্যবস্থা করে, তখন সে দিলে দেগে কয়েক গোলাভো!

"তা-সে, সে-সব সময়ে অমন সব আকছার হোতো।"

অন্ধকারে বারান্দায় আমরা বসে। গোয়ালবন্দ সিপ্‌ সিপ্‌ করে রাম খাচ্ছে। সিগারেট ফুঁকছে। এল্যুমিনিয়াম ফ্রেমে বোনা প্ল্যাস্টিক ফিতের পা-ছড়ানো চেয়ারে বসে শুনছি। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে মিটি মিটি আলো। মাঝে মাঝে মোটরের হেড লাইটের আভা পড়ছে ব্রেডফ্রুট গাছের মাথায়।

গোয়ালবন্দ বলতে লাগলো—"কিন্তু আসল ঘটনা ঘটেছিলো ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে। গুয়েদালুপে পর্যন্ত গিলোটিন লাগিয়ে রয়ালিস্টদের কোতল করা হলো। তারপর ঠিক হলো ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর নাম করে ইংরেজদের খেদিয়ে দাও মার্তিনীক, সেন্ট ল্যুসিয়া আর গ্রিনেদা থেকে। ভিকতর হিউজ ছিলো এই গড়বড়ির আসল আড়-কাঠি। সে খুঁজে বার করলো গ্রিনেদায় এক আড়কাঠি—জুলিয়েঁ ফিদোঁ! জলজ্যান্ত নিগ্রো। সে তাতিয়ে তুললো বিদ্রোহ।—ও ঘটনা যা বললাম সত্তেরশো সাতানব্বই তো! এ তার আগে—পঁচানব্বই। মার্চ মাস। গ্রেনভিলে প্রথম শুরু। রাতের পহরে ঝাঁপিয়ে পড়লো কালা-দল ঘুমন্ত শাদাদের ওপর। সমানে কোতোল আর কোতোল। লালে লাল হয়ে গেল পাহাড়ের গা, শহরের পথঘাট। শাদা আর কেউ রইলো না বলতে গেলে। পুলিশ, সৈন্য—বেশীর ভাগই তো কালো। সকাল হতে না হতে তামাম লুটের মালপত্র নিয়ে ফিদোঁর দল গিয়ে লুকুলো পাহাড়ের ডগায়। সেই গ্রান্দ্‌ ইতাংগের ধারে কোয়া-কোঁয়া গাঁয়ে বিদ্রোহীরা থানা গেড়ে বসলো।

"এদিকে লেফটানেণ্ট গবর্নর জন পণ্ডাশ সাহেব-মেম নিয়ে তাঁর পাহাড়ী আমেজের জায়গায় গেছিলেন ফুর্তি করতে। সেখানে খবর পৌঁছুলো। বিদ্রোহীদের হাতেনাতে ধরার ফন্দি করে শায়েস্তা করার আশায় তিনি ধরলেন সমুদ্রের পথ। পাহাড়ের অন্ধকার থেকে নেমে তিনি এসে উঠলেন গুয়াভে শহরে। কিন্তু তখন গ্রেনভীলের দেখাদেখি গুয়াভেতেও তুল-কালাম। একান্নজনকেই বেঁধেবুধে চড়ানো হোলো গ্রান্দ্‌-ইতাংয়ের কোয়া-কোয়াতে। জানানো হলো যদি ফিদোঁর ওপর কোনো আক্রমণ চালানো হয়, একটি একটি করে একান্নজনকেই মারা হবে।

"একদিন ত্রিনিদাদে খবর গেলো। তখন মিঃ চাকন ত্রিনিদাদের গবর্নর। তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠান তিনি। পাঠালে কী হবে, তুমুল বর্ষা। পাহাড়ে ওঠে কার সাধ্য। পাহাড়ের চারধারে ঘেরাও করে সৈন্য সমাবেশ করা হোলো।

"পরের দিন শোনা গেলো ফিদোঁর ভাই গুলি খেয়ে মারা গেছে। ব্যস্‌, ফিদোঁ হুকুম দিলো প্রত্যেক বন্দীকে কোতল করো। সমস্ত লোকজনের সামনে নিজের হাতে ফিদোঁ সেই একান্নটা মাথা ধড় থেকে খসিয়ে ফেলেছিলো।

'তখন সেন্ট ভিনসেন্টে কারীব বিদ্রোহ; সেন্ট লুসিয়ায় মারুনদের বিদ্রোহ। এক ত্রিনিদাদ! স্প্যানিশ হয়েও মিঃ চাকন নিজে সৈন্য পাঠিয়ে মাস তিনেকে গ্রীনেদায় ইংরেজ ঝাণ্ডা ওড়াতে সাহায্য করেছিলো।

"কিন্তু হায়, তখন কী চাকন জানতো যে দু-বছর পরে নিজের হাতে ত্রিনিদাদকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে তাকে? নিয়তির পরিহাস! ইতিহাসের বিড়ম্বনা।

"বিদ্রোহ দমন করা হোলো। আইন হোলো বিদ্রোহী ধরলে যে-কেউ সনাক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীর ফাঁসি হবে। তবুও কিন্তু গবর্নর হাউসটন সে আইনকে বিশেষ পাত্তা দেন নি। মোট ফাঁসি হয়েছিলো আট-ত্রিশ জনের। বিলেতে তা নিয়ে ধন্য ধন্য হলো বটে;—কিন্তু কলোনীর শাদারা গবর্নরকে কেবল গাধা বলতে বাকী রেখেছিলো।

"কিন্তু মজার কথা কী জানেন, সেই আটত্রিশজনের মধ্যে ফিদোঁ ছিলো না। ফিদোঁর পাত্তাই কেউ পায়নি। কেউ কেউ বলে ফিদ ক্যানুতে চড়ে পালাতে গিয়ে ডুবে মরে। কিন্তু কালোরা ভাবে ফিদোঁর জন্যে স্বর্গ থেকে রথ এসেছিলো। আজও কালোরা ফিদোঁকে মহামান্য বলে প্রণতি জানায়।"

একখানা সাইকেল জোগাড় করে যৎ-সামান্য কাপড়জামা পরে এবং মাথায় এতদ্দেশীয় পানামা-হ্যাট জাতীয় এক শিরোপা চাড়িয়ে কিঞ্চিৎ তত্ত্ব-মন্থনে যাত্রা করা গেলো। সেন্ট জর্জের উত্তরের পথ ধরে যেখানে পৌঁছুলাম মনে করিয়ে দিলো বার্বাডোজ, গুয়েদালুপে, সেন্টস আইল্যান্ড। সেই পুওর হোয়াইটস, সেই রেডলেগস্‌। তবে এরা যেন স্বতন্ত্র। সুস্বাস্থ্য, দৃঢ়তর এবং সহজ। ছেলে-মেয়েরা ব্রেডফ্রুট গাছের তলায় খেলা করছে। সব রং শাদা নেই। কিছু কিছু বাদামী রং ধরেছে। সেটা সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচয়। আপোষে বিবাহ করতে করতে বংশের অপকৃষ্টি ক্রমশঃ সঞ্চরমান হতে থাকে; কৃষ্টি হ্রাস ঘটতে থাকে ক্ষীণ এবং সংকীর্ণ পরিসরতার প্রভাবে। উভয়তঃ ক্ষতিকারক হবার ফলে ক্রমাগতঃ সংকীর্ণ পরিসর ও গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বাহ-বন্ধন বিকৃত-মনা জাতকের কারণ হয়। তা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ করার উপায় রক্ত-মিশ্রণের ক্ষেত্র প্রসারিত করা। উদ্বাহ-বন্ধনের বাহিরে যে মিশ্রণ তা মানসিক বৃত্তিকে আরও অপ-হৃত করে। আধুনিকতম ইতিহাসবেত্তা সমাজ-প্রকৃতির এই বহিরঙ্গ বিচার করার ফলে এও বলেছেন যে, পরস্পরের নিকট-বর্তিতা আপাতঃ-অনধিগম্য দুই সমাজ-শাখার মধ্যে অগোচরেই বন্ধন এনে দেবে; এবং তার ফলে সংকটের সৃষ্টি অনিবার্য হবেই। এই সাংকর্য কেবল শোণিতিক সীমাতেই আবদ্ধ থাকবে না। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই সাংকর্যের প্রভাব অনুভূত হবে।

যে সমর্থ ও জাগ্রত সমাজ এই অনি-বার্য মিশ্রণকে ধার্মিক আশ্রয় দিয়ে সামাজিক শ্রী মন্ডিত করে তোলার সাহস রাখে, সেই সমাজই ইতিহাসে সুস্থ সমাজ বলে বিবেচিত হবে। আজও শাদা হয়েও লাতিন আমেরিকার সমাজ খাঁটি য়োরোপীয় সমাজের চেয়ে মনীষায়, রুচিতে এবং কৃষ্টিতে অনেক নীচে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সমাজের মধ্যে আপেক্ষিক অনগ্রসরতার কারণও তাদের ঐতিহাসিক বিসৃষ্টির এবং সঞ্চারের মধ্যে নিহিত। একই সমাজে বাস করেও আমেরিকান নিগ্রো এবং আমেরিকান শাদার রুচি, প্রকৃতি, ধারা বিভিন্ন। বোম্বেটে এবং লুঠেরা যদি রাজাও হয়, হবে বোম্বেটে-রাজা।

প্রথম থেকেই যে সমাজ এমন সর্বনাশ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে, সেই সমাজই দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করে। ভীষ্মদেব জেনেশুনেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-ব্যাসকে বীজ সংক্রমণ করার আদেশ দিয়েছিলেন খাঁটি আর্যিক জোরে। এবং অনুরূপ ক্ষেত্রজ এবং অক্ষেত্রজ সংকরতা মনুতে তো বিহিতই।—উত্তরমনু স্মৃতিকারদের মধ্যে, কেবল স্মৃতিতে এবং গৃহ্যসূত্রেও অনুমোদিত। না-ই যদি হোতো তবে রাজপুতদের, শিখদের, কায়স্থদের বহু শাখার ইতিহাস স্তব্ধ থাকতো। উত্তর-গ্রীক, উত্তর-শক, উত্তর-হুন,—এমনকি উত্তর-মামুদ, উত্তর-ঘোরী ভারতের সমাজে এমন প্রতিভাধর ক্ষাত্রবীর্য, বৈশ্যচাতুর্য, শূদ্র-কুশলতার দাবী করতে পারতো না; সমগ্র মথুরা-গান্ধার শিল্পকলা থেকে নিয়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য, চেদী, চোল, চালুক্য, সুঙ্গ কীর্তির বদলে [illegible] কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রস্থান ঘটতো।

এদের দেখে তাই মনে হোলো এরা সুস্থ মাথায় বিচার করেছে। নতুন সমাজ সংরক্ষণে বিপত্তির সৃষ্টি না করে স্বকীয় প্রতিভায় এগিয়ে যাচ্ছে। অনিবার্য পরিণতিকে সুস্থ-সবল সুষমা দানের প্রয়াস করেছে। এরা বেশীর ভাগ ধার্মিক এবং রাজভক্ত স্কচ ছিলো। কিছু কিছু আইরিশ; কিছু কিছু দক্ষিণ ইংলণ্ডের। কিন্তু বেশীর ভাগই স্কচ। এরা সব ডিউক অব মনমাথের সমর্থক ছিলো। দুর্দান্ত জাজ জেফ্রীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতেই এরাও চলে আসে। বোম্বেটে নয়; সমৃদ্ধ নয়। শুধু ধর্ম, রাজভক্তি এবং নিষ্ঠার খাতিরে যারা গৃহ-সমাজ-পরিবার সব ত্যাগ করতে পারে, আজ তারা 'পুওর' হলেও তাদের রক্তধারায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলোই।

লম্বা, শক্ত, জোয়ান লোকগুলো স্কটিশ টুটড এবং টুইডপন্থী কাপড়ে হাইল্যাণ্ড-সুলভ প্যাণ্ট শার্ট পরে কাজ করছে। মাঝে মাঝে দু-একটা পানামা হ্যাট দেখা যায় বটে। কিন্তু সমস্ত পরিবেশটা যেন ইংলণ্ডনের স্কটল্যাণ্ডের। Kerr, Campbell, Alexander, Crawshaw, Kirkpatrich, Kilburn —এসব নাম আকচার; অবশ্য গ্রীভস, এডুয়ার্ডশ্, ডাউডেন এ-সব নামও নেই তা নয়।

লিলিয়ান একটি বছর-ছয়েকের মেয়ে। এক গাদা হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সঙ্গে দুটো কাল-কুকুর। মস্ত বড়ো একটা জলা। পাহাড়ী নদী পাক খেয়ে থেমে আছে নিজের ভঙ্গীতে নিজেই বিহ্বল হয়ে। এপার-ওপার ঝুঁকে পড়েছে মস্ত একটা চেস্টনাট গাছ। তার তলায় এসে মেয়েটা নিজের মনে মাটি কুড়ুতে লাগলো। মাঝে মাঝে পাকা ফল হাত দিয়ে মুছে চোখে। আমাকে গ্রাহ্যই নেই। সাইকেল থামিয়ে আমি ওকে দেখতে থাকি। যখন ও বসলো শান্ত হয়ে, তখন আমি ওর দিকে এগুতেই কুকুরদুটো ওর দুধারে বসে পড়লো।

কিছুতেই কথা কইবে না। কিছুতেই চকোলেটের বারটা নেবে না। আমি অনেক ধরনের চেষ্টা করি; ও ক্রমাগত লাজ হয়, একগাল হাসে, আর বলে "নো, থ্যাঙ্কু!"

একটা ঘোড়ায়টানা গাড়ী এক গাদা খড়-শুদ্ধ এগিয়ে আসছে। গাড়ীর তলায় একটা এ্যাল্‌শেশিয়ান দু-চাকার মাঝে দৌড়ুচ্ছে। গাড়ীটা আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলো।

বুড়ো কিলবার্ণ মুখের পাইপ নামিয়ে বললো—"হ্যালো মিস্তা, লিলিয়ানের সঙ্গে ভাব করছো। সহজে কি ও ভাব করবে? আমিই ওকে সাধ্য-সাধনা করে পাই না।"

বুড়ো নামলো। হাত বাড়ালো। "আমি কিলবার্ণ।"

"আমি বাতাশারিয়া।"

"ভারতবর্ষ?"

"হ্যাঁ।"

"চকোলেটটা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?"

আশ্চর্য, লিলিয়ান এর মধ্যে একটুও নড়েনি। কিন্তু ওর দাদু ওকে যখন এক-টুকরো চকোলেট দিলো, নিলো। তবে প্রথম দেখে নিলো দাদু খাচ্ছে। আমিও একটুকরো পেলুম।

কিলবার্ণ আমাকে গল্প শোনাতে লাগলো ওদের স্বর্ণযুগের কাহিনী। প্রিন্স রুপার্ট-এর আত্মত্যাগ। কিন্তু মনমাথের কথা বলতে বলতে প্রায় কেঁদে ফেলে বুড়ো। ভায়ের জন্য মানুষ নিজের ছেলেকে ছেলে বলে অস্বীকার করে, এই কি ধর্ম? হল্যাড-এর মেয়ে লুসী ওয়ালটার্স। তখন রাজা দ্বিতীয় চার্লস নিজেই পলাতক। পেলে ক্রমওয়েল চার্লসকে ছিঁড়ে ফেলে। তখন লুসী প্রাণ দিয়ে, ভালোবেসে, সেবা-যত্ন করে চার্লসকে তার সেই কঠিন দিন-গুলো ভুলিয়ে রাখলো। তখন তো লুসী বিয়ে করেছিলো চার্লস নামক একটি তরুণকে। সে-যে রাজকুমার তা লুসী জানতোও না। অবশেষে চার্লস রাজা হোলো ইংলণ্ডের। ভুলে গেলো লুসীকে; ভুলে গেলো লুসীর গর্ভজাত অপরূপ শিশু-পুত্রকে। বিয়ে করলো এ্যানী স্কটকে। রাজার নাম রইলো। থাকুক; ভগবান কারুকে মাপ করে না। রাজার আর কোনো ছেলেই হয়নি। কাজেই ঐ লুসীর ছেলেই রাজার একমাত্র ছেলে। প্রথম প্রথম রাজা বলতেন, লর্ড ক্রফ্‌টের ছেলে। লর্ড ক্রফট্‌ই ছেলের অভিভাবক ছিলেন। কিন্তু রাজা হবার পর সবাইকে রাজা স্পষ্ট বলেই দেন যে, মন্‌মাথ্‌ রাজারই ছেলে। বারবার ইংলণ্ডের হয়ে মনমাথ্‌ যুদ্ধ করেছে। ইংলণ্ডের সেনাপতি ছিলো সে। কিন্তু জেমসের চক্রান্তে সেই ছেলে বিষ হোলো। কারণ আর কিছু নয়। জেমস নাকি ক্যাথলিক, আর মনমাথ্‌ তাঁর মায়ের প্রোটেস্টাণ্ট ছেলে। লর্ড আর্জাইল চেষ্টা করলেন; সারা স্কটল্যাণ্ড চেষ্টা করলো। কিন্তু দুরাত্মা জেমস্‌ রাজ্য পেয়ে খাঁটি পোলিশ-পিশাচের মতো ভাইপোকে হাতকাটে ফেলে হত্যা করলো। সেই পাপ-ভূমি ত্যাগ করেছি কোনো দুঃখ নেই আমাদের। সর্বেশ্বর ভগবান আমাদের সুখে রেখেছেন, মর্যাদায় রেখেছেন।

ওরা দরিদ্র, মানে টাকা নেই। সুখী, মানে খেটে খায়। নিজেদের জমিজমা, চাষ-বাস, ক্ষেত-আবাদ। সবাই মেকানিক্যাল কাজ শিখছে। গির্জা আছে, স্কুল আছে। অন্যান্য দ্বীপের পুওর হোয়াইটস্‌ নয়।

গ্রীনেদার বাড়ীঘরদোর বেশ ছিমছাম। বেশীর ভাগ বাড়ী চুন-শুরকির। এমন সুঠাম গবর্ণর হাউস কম দেখেছি। যেন ছোটো দ্বীপটির সঙ্গে সর্বাবয়ব ছন্দ রেখে সুসামঞ্জিত একটি শিল্পকর্ম। এমনি একটি স্থাপত্যকর্ম সেভেন-ডে এডভেন্টিস্ট চার্চ। শাদা ধবধবে বাড়ীটি যেন নিখুঁত একটি ছবি। ঘন সবুজের প্রচ্ছদে মানিয়েছে চমৎকার।

সন্ধ্যায় বোট ছাড়বে। আগে ভাগে বন্দরে এসেছি। এই একটি বন্দর যেটি বন্দর বলে মনে হয় না। একেবারে তীরে এসে জাহাজ লাগে। গভীর নীল জল। বন্দর মানেই শহরের নোংরা-জঞ্জাল ভাসবার জায়গা। গ্রীনেদায় তা নয়। গ্রীনাদায় শহর যেন ঠিক 'কী'-এর ওপর দিয়েই উঠে গেছে। মাইন করে এঁকেবেঁকে বিজলীর থাম পথ আগলাতে আগলাতে উঠে গেছে। বাতাসে এলাচি, দারুচিনি, জায়ফলের গন্ধ। জলের বুকে বিজলীর ছায়া। আলোর ঝলমল করছে শান্ত জল। জাহাজের আলো পড়ে সমস্ত জলভাগ যেন হয়ে উঠেছে দাঁজেস কি দেগাস্‌-এর একখানা ছবি।—

গ্রীনেদা ছোটো; তবু যেন এর একটা আত্মা আছে। হয়তো এ-কথা সত্য কুদে গ্রীনেদা থলে হাতে করে সভ্যতার বাজারে সওদাগরী করে; হয়তো সত্য রামাধর মালণ্ডের মালাকার এই মশলা-দ্বীপটির মধ্যে 'দেখবার' কিছু নেই। কিন্তু এও সত্য, 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' করার ক্ষেত্র ছোট্টো গ্রীনেদা। পরে করে 'ব্রু-ব্রু' গ্রীনেদার আব্রুকে বেআব্রু করবে। গ্রীন ম্যানশনসের রীমাকে বিকিনি পরিয়ে দেবে। কিন্তু আমি গর্ব করবো আমি নিরাবরণ বক্ষ এবং নিরাভরণ দেহের মহৎ গরিমা দেখেছি। গর্ব করবো ব্রু-ব্রু-র মিথ্যা জাঁকজমক আমাকে দেখতে হয়নি।

খবরে পড়ছি গ্রীনেদাও statehood পাচ্ছে। খবরে পড়ছি গ্রীনেদায় নিগ্রো-শাসন ইতিহাসের পুনরাবর্তমর্যাদাকে স্বীকৃত করছে। ত্রিনিদাদে বসে আপাততঃ এই আমার আনন্দ!

(শেষ)
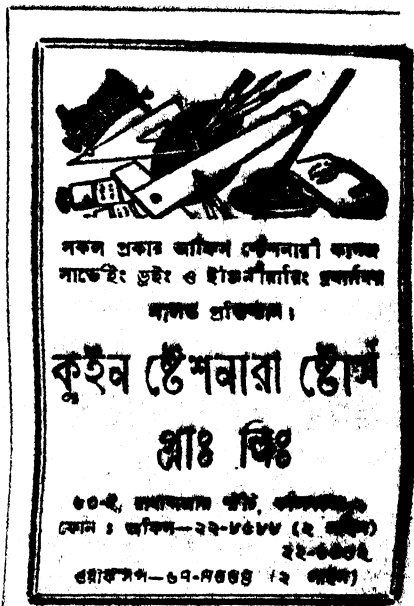
বাদাবনের বাঘ

সুখেন্দু দত্ত

সুন্দরবন। নাম শুনলেই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে গহন বনের দৃশ্য। বাইন, সুন্দরী, কেওড়া, গড়ান আর তবলায় গভীর অরণ্য, অসংখ্য নদীনালায় পূর্ণ। বাংলার একেবারে শেষ সীমানায় নোনাজল আর নোনামাটির দেশ। দক্ষিণের মানুষ বলে 'বাদাবন'।

এ-বনে মানুষ অবাঞ্ছিত। মানুষ এখানে মরে বাঘের হাতে, সাপের ছোবলে, কুমীর-কামটের ধারাল দাঁতে। কিন্তু তবু তাকে আসতে হয়। না এসে উপায় নেই। বাদা কেটে আবাদ পত্তন করেছে মানুষ। নদীর এক পাড়ে বাদা, অন্য পাড়ে আবাদ। ছোট নদী, নদীর এপার থেকে ওপারের বন স্পষ্ট দেখা যায়। বাঘের রাজ্য আর মানুষের রাজ্যের এই সীমানা কিন্তু কেউ মানে না। মানুষের কাছে এই সীমানা যেমন কিছু নয়, বাঘের কাছেও এই সীমানা তেমনি কোন বাধা নয়। ক্ষুধার্ত বাঘ এক-একদিন হয়তো রাতের অন্ধকারে ল্যাজ তুলে নোনা গাং সাঁতরে পার হয়ে আসে লোকালয়ে, গরু-বাছুর নিয়ে যায় হানা দিয়ে। বনসীমা পার হয়ে মানুষও বনের মধ্যে বহুদূরে চলে যায় বনের কাঠ, হরিণ আর মধুর সন্ধানে। আর তাই করতে গিয়ে অনেক সময় 'বড় মিঞা'র সামনে পড়ে তারা। বড় মিঞা, মানে বাদাবনের বাঘ। সুন্দরবনের আসল রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আবাদের মানুষ সভয়ে বলে, বাবা দক্ষিণ রায়ের বাহন। বনবিবির বাহন!

এ-বছরও সুন্দরবনে মধু কাটতে গিয়ে ডজনখানেক মানুষ গেছে বাঘের পেটে। বেতের ধামা আর মধু কাটবার সরঞ্জাম নিয়ে মৌমাছির পিছনে পিছনে ছোটে মানুষ মধুর চাকের সন্ধানে। আর অলক্ষ্যে তাদের পিছনে ছোটে ধূর্ত বাঘ। তারপর এক সময় বাঘের হুঙ্কার আর মানুষের আর্তনাদ একই সঙ্গে মিশে যায়। বড় সাবধানী আর শয়তান জানোয়ার এই বাদাবনের বাঘ। যেমন শক্তি, তেমনি সে ধূর্ত। আর হিংস্র তো বটেই!

আগের চেয়ে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা এখন কমে গেছে। একে তো জঙ্গলের একটা বড় অংশ কাটা পড়েছে, তার উপর প্রতি বছরই মারা পড়ছে বাঘ। সরকারী হিসাবে পাকিস্তানের অংশ নিয়ে গোটা সুন্দরবনে এখন আছে দেড়শ'র মত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আবাদের মানুষের কাছে এই বাঘের সাহস, শক্তি আর ধূর্ততার অনেক গল্প শোনা যায়। তার কোন কোনটা আজগুবী মনে হলেও সত্যি।

সে-বছর বাদাবনে 'গাছালে' গিয়েছিল পানু। গাছাল মানে জঙ্গলে গাছে চড়ে শিকার। পানু আবাদের হরিণ-শিকারী। তবে শিকারী বলতে যা বোঝায়, ব্রীচেজ আর হান্টিং বুট-পরা, কাঁধে দোনলা বন্দুক আর হাতে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ, তেমন শিকারী নয় পানু। তার সম্বল বলতে শুধু একটা দেশী গাদা বন্দুক। তাও বে-পাশি বন্দুক! সেই গাদা বন্দুকে জালের কাঠি পুরে হরিণ শিকার করে সে। বন্দুকের লাইসেন্স তারা পায় না, এদিকে বনে না গিয়ে তাদের অন্নের সমস্যাও মেটে না। চাষের কাজে বারো মাস তাদের পেট ভরে না, তখন বনে গিয়ে হরিণ মেরে হাটে মাংস বিক্রি করে দিন চালাতে হয়। তাছাড়া সাপ, বাঘ আর কুমীরের সঙ্গে ঘর, বন্দুক ছাড়া তাদের চলেও না। সুন্দরবনের মানুষ তাই লোহার তার জড়িয়ে এক ধরনের গাদা বন্দুক তৈরী করে আসছে গোপনে বহুকাল থেকে।

অতএব শিকারে যাবার জন্য তোড়জোড় করবার বেশি কিছু নেই পানুর। বন্দুকের তো এই ব্যবস্থা! তারপর ঘাটে তো কারও না কারও ডিঙি পাওয়া যাবেই। সেই ডিঙিতে চেপে বোঠের দু'খোঁচ দিলেই গহন বন।

নদীর এপারে এসে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে ডিঙিটা লুকিয়ে ফেলল পানু। বাঘের চোখে যাতে না পড়ে বোট, পিটেল বোটের নজরে না আসে। দুটোই তার পক্ষে সমান বিপদ। তারপর বন্দুকটা নিয়ে চরের উপর নামল সে।

সকালবেলা গাছের ডালে তখন হাজারো পাখীর ডাক, ডালে ডালে লালমুখো বাঁদরের 'হুপ-হাপ'। কিন্তু চরে একটা বাঁদরও দেখা যাচ্ছে না। সকালের রোদে নদীর চরে দলে দলে বাঁদর আসে। পলিমাটির চরে কাঁচ ঘাসের মধ্যে খুঁজে বেড়ায় তারা। সুন্দরবনে যেখানে বাঁদর আছে, বুঝতে হবে সেখানে বাঘ নেই।

গাছাল শিকারে অসুবিধা বিশেষ কিছু নেই। বন্দুক হাতে একটা গাছের উপরে উঠে বসতে হবে। জঙ্গলে হরিণের সঙ্গে বাঁদরের খুব খাতির। বাঁদর কেওড়া গাছের ডালে-ডালে লাফায়, ফল-পাতা ছিঁড়ে নিচে ফেলে আর 'হুপ-হাপ' ডাকে। আর সেই ডাক শুনে হরিণেরা গাছের নিচে আসে। শিকারীরাও তাই গাছে উঠে অবিকল বাঁদরের মত ডাকে, পাতা আর ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলে। গাছের তলায় পাতা খাওয়ার লোভে হরিণ এলে গুলী করে গাছের উপর থেকে। চার হাত উপরে নাকি হরিণের দৃষ্টি যায় না।

যথারীতি একটা গাছ বেছে নিয়ে তার উপর চড়ে বসল পানু। সামনেই একটা কেওড়া গাছের মাথায় কতগুলো বাঁদর বসে কচিপাতা চিবোচ্ছিল। বাঁদরগুলো পানুর এই বেয়াদবি যেন সহ্য করতে পারল না। আমাদের রাজত্বে আবার তুমি কেন গোছের ভাব আর কি। মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে মুখভঙ্গী করে ডাকতে লাগল তারা, ডালে ডালে 'হুপ-হাপ' দাপাদাপি শুরু করে দিল। তারপর এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফালাফি আরম্ভ করে দিল।

উঁচু গাছের ডালে বসে পানু এবার বাঁদরের ডাক ডাকতে আরম্ভ করল, 'হুপ! হুপ! হুপ!' সামনের কেওড়া গাছ থেকে এক বাঁদর-দম্পতি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে। পাতা আর ফল ভেঙে নিচে ফেলতে লাগল পানু। আর সেইসঙ্গে থেমে থেমে বাঁদরের ডাক।

অনেকক্ষণ পরে গোটাকয়েক হরিণ বোধহয় তার সাড়া পেয়েই গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। পাতা, ফল যা ভেঙে ফেলেছে পানু, তাই তারা খেতে লাগল। মাথার উপরে যে মৃত্যু, সেদিকে তাদের খেয়াল নেই! নিশ্চিন্ত মনে খাচ্ছে।

বড় শিঙেল হরিণটা একেবারে হাতের কাছে এসে পড়েছে। উৎসুক উৎকর্ণ হয় পানু। আর একটুখানি। বন্দুকটা নিয়ে তৈরী হয় সে, সাবধানে একটু ঘুরে বসে। তারপর কানের কাছে বন্দুক নিয়ে টিপে আঙুল দেয়।

হঠাৎ তার বাঁদিকে গাছের উপর বাঁদরগুলো সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল হয়ে ডাকতে শুরু করে, 'খ্যোক-খ্যোক-খোখোক!' ভয় ঘৃণা আর বিরক্তিমিশ্রিত অদ্ভুত সে-ডাক। দূরে থেকে বাঘ দেখতে পেলেই তারা এমনি করে ডাকে। সঙ্গে সঙ্গে ভীতকণ্ঠে হরিণের 'টিউ-টিউ'। পরমুহূর্তেই বাঘের গর্জনে কেঁপে উঠল সারা বন।

গাছে গাছে পাখীরা তখন ভয় পেয়ে ডেকে উঠেছে, ভয়ার্ত বাঁদরগুলো ডাকতে ডাকতে ডালে ডালে ছুটে পালাচ্ছে। চোখের পলকে হরিণগুলোও অদৃশ্য।

মুহূর্তে মধ্যে হুড়মুড় করে ঝোপঝাড় ভেঙে একটা বাঘ লাফিয়ে এসে পড়ল। বাঁদরের ডাকে সতর্ক হরিণের দল তার আগেই অদৃশ্য হয়েছে।

শিকার নেই। মাথা উঁচু করে বাঘ হিংস্র দৃষ্টিতে এবার তাকাল তার মাথার উপরে গাছের ডালগুলোর দিকে। একটু আগেই বাঁদরগুলো এই ডালে হুপ-হাপ করছিল। হরিণগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে তারা এখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে পালিয়েছে।

এপাশের কেওড়া গাছের উঁচু ডালে বসেই পানু দেখতে পেল, কালো ভাঁটার মত চোখদুটো উঁচু করে গাছের ডালের দিকে চেয়ে আছে বাঘটা। শিকার হাতছাড়া হওয়ায় তার দুচোখে রাগ আর বিরক্তি। কি বিশাল ডোরাকাটা বাঘটা! একেবারে সুন্দরবনের আসল রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

হরিণ আর বাঁদরগুলো তো পালিয়ে গেছে, তবু বাঘটা কেন নড়ে না? মুখ তুলে গাছের ডালে কি যেন সে একটা লক্ষ্য করছে। তবে কি পানুর উপস্থিতি টের পেয়েছে সে? না, তাও তো সম্ভব নয়। কারণ পানুর ডালে তার নজর নেই!

ওদিকের গাছের ডালটায় ভাল করে নজর করতেই চমকে উঠল পানু। একি! দুটো বাঁদর যে আটকা পড়েছে গাছের ডালে! গাছের নিচে বাঘটা এক-একবার সরে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। পরমুহূর্তে এসে মাথা তুলছে। আর থেকে থেকে তার হাঁকারে কে'পে উঠছে সারা বন।

বাঘের সেই ভয়ংকর মূর্তির সামনে পানু যেন পাথর হয়ে গেল। বাঘ তাকে দেখতে পাবে কিনা, দেখতে পেলেই বা সে কি করবে চিন্তা করবারও শক্তি তার নেই। যেভাবে বসেছিল সে, সেইভাবেই বসে রইল।

ভয়ার্ত বাঁদরদুটো গাছের নিচের দিকে তাকিয়ে 'খ্যোক-খ্যেখোক' করে দু'-একবার ডাকল, কিন্তু কাছাকাছি কোন ডাল না থাকায় তারা পালাতেও পারছিল না। বাঘটাও লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাদের দিকে। এক-একবার সরে যাচ্ছে এদিক-ওদিক, পরমুহূর্তেই এসে আবার মাথা তুলছে। চোখের পাতাও পড়ছে না তার, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ডালের দিকে।

এদিকের গাছের ডালে বসে পানুর তো ভয়ে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে, দেহেও যেন আর কোন শক্তি নেই। ভয় হচ্ছে, জোরে নিশ্বাস নিতে গেলেও না জানি তাকে দেখে ফেলে বাঘ!

খানিকক্ষণ এমনি গেল। 'গ-র্-র্-র্' করতে করতে বাঘটা এবার গাছটাকে এসে আঁচড়াতে শুরু করল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি তার ডালের দিকেই। বাঁদরদুটো এবার ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে শুরু করল। তবে পানুর অবস্থাও বাঁদরদুটোর চেয়ে কিছু ভাল নয়। সে অনুভব করল, ধীরে ধীরে তার দেহ যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে। গাছ থেকে সে না জানি পড়েই যায়!

বাঘটা এবার গাছের গুঁড়িটাকে আরও জোরে জোরে আঁচড়াতে শুরু করল। মুখে তার চাপা গোঁ-গোঁ গর্জন। বাঁদরদুটো এবার ভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল।

আঁচড়ান বন্ধ করে বাঘ এবার সামনের একটা থাবা গাছের উপর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর খানিক বাদে গাছের গায়ে জোরে জোরে তার থাবার ঘা মারল, 'ধপ-ধপ'। থর-থর করে কে'পে উঠল অতবড় গাছটা সেই থাবার ঘায়ে। বাঘের এক-এক থাবায় নাকি আঠারো মানুষের বল ধরে! ভাবতেও অবাক লাগে, অমন তুলতুলে নরম থাবায় কি করে তা সম্ভব হয়।

নিষ্ঠুর মৃত্যু হাত বাড়িয়েছে তাদের দিকে, বাঁদরদুটোর কিচির-মিচির এবার একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। গাছের ডালে আতঙ্কে জমাট বে'ধে আছে তারা। 'ধপ-ধপ' করে আরও কয়েকবার জোরে ঘা মারে বাঘটা গাছের গায়ে। গোটা গাছটা থর-থর করে কে'পে ওঠে।

'ধপ' করে প্রচণ্ড জোরে থাবার আর একটা ঘা পড়তেই গাছটা বিষম নাড়া খেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বাঁদর ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে। হুংকার দিয়ে বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। 'গক্‌' করে সেটাকে কামড়ে শূন্যে তুলে ধরল। তারপর আবার মাটিতে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে ছি'ড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল সেটাকে। তারপর অবশিষ্ট বলতে তার আর কিছু রইল না।

ডালের উপর বসে অন্য বাঁদরটাও দেখল সেই দৃশ্য। খাওয়া শেষ করে বাঘ আবার সেই গাছের গোড়ায় এসে থাবার গোটাকয়েক ঘা মারতেই সেটাও এবার ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘও ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

গাছের ডালে বসে বিস্ফারিত চোখে পানু দেখল বাঁদরদুটোর মৃত্যু। আর দেখল বাঘের শিকার ধরার কৌশল, তার চাতুরি আর হিংস্রতা। সেই ভয়ংকর দৃশ্য সে দেখতে চায় না, কিন্তু তবু তাকে দেখতে হয়। হাত-পা কাঁপতে থাকে তার, বুকে হৃৎকম্প হয়, নড়বার শক্তিও যেন থাকে না। সর্বনাশ! সেও কি তবে গাছের ডাল থেকে পড়ে যাবে? কোনমতে গাছের একটা মোটা ডাল জড়িয়ে ধরে বসে থাকে পানু। তার ভয় হয়, বাঁদরদুটোর মত সেও না আতঙ্কে নিচে পড়ে যায়!

খাওয়া শেষ করে বাঘটা এক সময় ধীর পদক্ষেপে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয়েছে, এবার তার গতি মন্থর। ভীত ও বিহ্বলচিত্তে তারপরও অনেকক্ষণ গাছের ডালে বসে রইল পানু, চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখল। না, বাঘের আর কোন চিহ্ন নেই। চরের উপর এতক্ষণে আবার দু'-একটা বাঁদর দেখা দিয়েছে। তবু ভরসা কি! সাবধানে গাছ থেকে নেমেই দম বন্ধ করে একছুটে নদীর চরে এসে থামল সে। তারপর ডিঙিতে উঠেই এক ধাক্কায় একেবারে মাঝ-নদী।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অণু-পরমাণু চিন্তা

অরুণরতন ভট্টাচার্য

বস্তুর অতি সূক্ষ্ম আকৃতি অণু (molecule) সূক্ষ্মতর আকৃতি পরমাণু (atom)। উন্নত বিজ্ঞানের কল্যাণে এ-যুগে বিভিন্ন পদার্থের অণু-পরমাণুর আকার প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে আজ থেকে সহস্রাধিক বছর পূর্বে অনুন্নত বিজ্ঞানের যুগে বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা, তার আকৃতি নির্দিষ্ট করা, তার পরিমাণ গণনা করার মধ্যে যে বিস্ময় তাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বস্তুর আকৃতি নির্ণয়ের সময়ে দৈর্ঘ্যের একটি সূক্ষ্মতম পরিমাপ ছিল এসরেণু।
সেটি কি?

গবাক্ষের ছিদ্রপথে সূর্যের যে আলো সরাসরি ঘরের মধ্যে এসে পড়ে, তাতে যে ধূলিকণা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, তার মধ্যে সূক্ষ্মতম একটি পদার্থের আকৃতির বিস্তৃতিই এই এসরেণু।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় গণিতবিদ বরাহমিহির সূর্যের আলোয় প্রত্যক্ষ করা সূক্ষ্মতম এই এসরেণুকে পরমাণু নামে অভিহিত করেছেন।

পরমাণুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি একটি তালিকা স্থির করেন। তালিকাটি নিম্নরূপ :

৮ পরমাণু = ১ রজ, ৮ রজ = ১ বালাগ্র, ৮ বালাগ্র = ১ লিক্ষা, ৮ লিক্ষা = ১ যূকা, ৮ যূকা = ১ যব, ৮ যব = ১ অঙ্গুলি, ২৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত।

দৈর্ঘ্যের তালিকাটিতে হস্তকে একটি একক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে এ-ক্ষেত্রে পরমাণুর বিস্তৃতি নির্ণয় করা কঠিন নয়। আমরা সকলেই জানি, পরিণত মানুষের হাতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ ইঞ্চির সমান। সে-হিসেবে পরমাণুর বিস্তৃতির যে-পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়, তা হলো ১/৩৪৯৫২৫ ইঞ্চি।

বরাহমিহিরের চিন্তাপ্রসূত এই পরমাণুই সূর্যের আলোয় প্রত্যক্ষ করা সূক্ষ্মতম ধূলিকণা—অর্থাৎ তা এসরেণুর সমান।

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে বরাহমিহিরের চিন্তার থেকে আরও উন্নত চিন্তার পরিচয় দেন এবং এসরেণুর চেয়ে আরও সূক্ষ্মতম এককের কথা চিন্তা করেন। এই বিশেষ এককটির নামও পরমাণু। এটি বরাহমিহিরের পরমাণুর পরিমাণ থেকে কনিষ্ঠতর এবং ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান জগতে বিস্তৃতির সূক্ষ্মতম পরিমাপ।

প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, একটি এসরেণুর আয়তনের ভিতরে ৩০টি পরমাণু অবস্থান করছে।

এসরেণুর আয়তন কত?

এসরেণুর বিস্তৃতি নির্ণীত আছে —ফলে এসরেণুর আকৃতি বা আয়তন সহজেই বের করা চলে। এ-যুগের বিজ্ঞানীরা এসরেণুর আয়তন বের করলেন এবং তাকে ৩০ দিয়ে ভাগ করে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে একটি পরমাণুর আকৃতি স্থির করলেন।

স্থিরীকৃত পরমাণুর আয়তন এ-যুগের বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি পরমাণু তার আকৃতিগত পরিমাপের দিক দিয়ে এ-যুগের সূক্ষ্মতম এবং লঘুতম হাইড্রোজেন অ্যাটমের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য বজায় রাখে।

অবাক হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে—অণু-পরমাণুর জগতে হাইড্রোজেন অ্যাটম সূক্ষ্মতম বলে এ-যুগেও তার আকার আয়তন নির্ণয় করা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য। প্রাচীনকালের ভারতবাসীরা যদি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সূক্ষ্মতম আকৃতি বলতে এমন একটি পদার্থ বুঝিয়ে থাকেন, যেটি আয়তনের দিক থেকে সূক্ষ্মতম হাইড্রোজেন অ্যাটমের কাছাকাছি, তাহলে এই মিলকে নেহাৎ আকস্মিক বলে এর গৌরবের ব্যাপারকে কমিয়ে দেখা উচিত কিনা চিন্তা করার অবকাশ আছে।

অণু-পরমাণুর বিভিন্ন গুণাগুণও প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তাবিদেরা উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

পরমাণু যে বৃত্তাকার, এ-কথা তাঁরা অনুধাবন করেন। ফলে পরমাণুর আকৃতিকে অন্য কোন সাধারণ নামে নির্দিষ্ট না করে বৃত্তাকার বুঝোনোর জন্যে তাঁরা পরিমণ্ডল কথাটির ব্যবহার করেছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আরও মনে করতেন যে, পরমাণুই পদার্থের সূক্ষ্মতম বিভাগ—তাকে আর ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করা চলে না। সে শাশ্বত, চূড়ান্ত, অবিভাজ্য এবং কনিষ্ঠতম।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই চিন্তা বহু পরবর্তীকালে বিখ্যাত রসায়নবিদ ডালটন কর্তৃক নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করে।

আজ বিজ্ঞান বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেছে যে, অ্যাটমও বস্তুর চূড়ান্ত পরিণতি নয়। সেও ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনে বিভক্ত এবং তাদের সাহায্যে নিজের আকৃতি সম্পূর্ণ করে।

কিন্তু অ্যাটম বিশ্লেষণের কথা এখানে নয়, এখানে শুধু এটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডালটন সাহেবের যে আবিষ্কার, সাহেবের সম্মানার্থে সমগ্র পৃথিবীতে ডালটনস্ অ্যাটমিক থিওরি নামে একদিন অভিহিত হয়েছিল, সহস্রাধিক বছর পূর্বের ভারতীয় বিজ্ঞানে সেই একই চিন্তা, শুধু ভারতীয় বলে নয়, বিষয়গত গুণেও নিশ্চয় গভীরভাবে অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

আজ বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে, আমরাও পরমাণু বিজ্ঞানের যুগের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। একদিন যে পরমাণু চিন্তায় আমাদের আদি যুগের পূর্বপুরুষেরা উন্নত জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে পরমাণু বিজ্ঞানের যুগে আমরা তার ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাকে রক্ষা করতে পারবো বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সংগে গৌরীপুরে মাঝে মাঝে যোগাযোগের সুবিধা আমার হতো। সেখানে তাঁর বাজনা শোনবার সংগে সংগে শিক্ষারও সুযোগ পেতাম। গৌরীপুরে প্রথম তাঁর দরবারী কানাড়ার আলাপ আমি শুনেছিলাম। দরবারী কানাড়া রাগ সেনী ঘরানার মধ্যেও একাধিক পদ্ধতিতে প্রচলিত ছিল। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব ও পরে উজির খাঁ সাহেবের পুত্র নজীর খাঁ সাহেব এই রাগে সারংগের তান প্রয়োগ করতেন। আলাউদ্দিন ও কেরামতউল্লা খাঁ সাহেব দেশী রাগের অংগে দরবারী কানাড়া বাজাতেন। আলাউদ্দিনের নিকট দরবারী কানাড়ার তালিম আমি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিনি; তাঁর ভৈঁরো রাগের আলাপ আমার নিকট সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ছিল। একদা প্রভাতে গৌরীপুর গেস্ট হাউসে তিনি কয়েক ঘণ্টা ভৈঁরো রাগ বাজিয়েছিলেন; হঠাৎ আমার নিকট সংবাদ এলো যে তাঁর বাজনার সময় এক ঝাঁক পাখী তাঁর উপরে উড়ে এসে পড়ে। আমি গেস্ট হাউসে গিয়ে দেখলাম,—পাখীগুলি নানা সুরে সুমধুর কলরব সুরু করেছে। খাঁ সাহেব তখন বিলম্বিত ও জোড় আলাপ শেষ করে ঝালা শুরু করেছেন। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে ভৈঁরো রাগের আলাপ ভাল করে শিখেছিলাম। গৌরীপুরে তিনি তিলক-কামোদের তালিমও আমাকে দিয়েছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের তখন বাজনার চূড়ান্ত উন্নতির যুগ; আলীআকবর তখন শিশুমাত্র। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের নিকট বেহাগের আলাপ সম্পূর্ণরূপে আমি শিক্ষালাভ করেছি। তাই আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবকেও আমি বেহাগ বাজাতে প্রায়ই অনুরোধ করতাম। উভয়ের পদ্ধতিতেই সৌন্দর্য ও কলা-কৌশল অনবদ্য ছিল। তবে রাগের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও রীতির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিল। মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব ঐ সময় কণ্ঠসংগীতেরই অধিক চর্চা করতেন। রবাব, সুরশৃংগার ও সেতার যন্ত্রেও মাঝে মাঝে নানা রাগের আলাপ পরিবেশন করতেন। আলাউদ্দিনেরও কণ্ঠসংগীতে ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট ছিল; যদিও মহম্মদ আলীর ন্যায় সুরেলা ও মধুর [illegible] আলাপ আমি কখনো কোনো গায়কের কণ্ঠে শুনিনি। মহম্মদ আলী রবাবী [illegible] ছিলেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে এই রবাবী ঘর তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর বংশধরদের ঘর। মুখ্যতঃ কণ্ঠসংগীতেই এঁদের অধিকার ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণিকতা ছিল। কিন্তু তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় সদারঙ্গ ও অন্যান্য বীণকারদের সংগে প্রতিযোগিতার জন্যই এঁরা প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে কণ্ঠসংগীতের সংগে সংগে রবাব ও পরে সুরশৃংগার যন্ত্রের বাদ্যপদ্ধতি প্রচলিত করেছেন। যে সকল রাগ মহম্মদ আলী ও আলাউদ্দিন উভয়ের নিকট শোনবার ও শিক্ষা করবার সুযোগ আমি পেয়েছি,—সেগুলি থেকেই উভয় ঘরানার পার্থক্য আমার নিকট ভালরূপেই পরিস্ফুট হয়েছে। মহম্মদ আলী কণ্ঠালাপে বিলম্বিত তানের বিস্তার যথেষ্ট প্রদর্শনের পর মধ্য তানের সময় অফুরন্ত নতুন নতুন পথে বিস্তারের সৌন্দর্য প্রকাশ করতেন; তবে তাঁর রীতিতে গৌড়হার বাণী ও কিছু ডাগরবাণী প্রকাশিত হতো। কিন্তু তিনি খাণ্ডার বাণীর পদ্ধতিতেই বিমুখ ছিলেন। তাঁর রবাব ও সুরশৃংগারে বিলম্বিত কয়েকটি তানে রাগ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি মধ্য ও দ্রুত লয়ের অজস্র লড়ী জোড়ের বিস্তার দেখাতেন। তারপর ঠোক ঝোলা, লড়ী লড়গুথাও ও লড়লপেট বাজাতেন। তার পড়নের সময় মৃদংগের সহিত সংগতেও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আলাউদ্দিন কণ্ঠে ও যন্ত্রে বিলম্বিতে ডাগরবাণী ও মধ্যলয়ের সময় খাণ্ডার ও নৌহারবাণীর স্থান প্রদর্শন করতেন। কিন্তু বিলম্বিতে তিনি যতটা বিস্তার দেখাতেন,— জোড়ের সময় তা সংক্ষিপ্ত হতো। তারপর ঝালা, লড়ী প্রভৃতি অংগে তিনি খুব কঠিন বোল ব্যবহার করতেন। অবশ্য আলাউদ্দিনের বাজনা শুনে উজির খাঁ সাহেবের সম্পূর্ণ বিদ্যা যাচাই করা চলে না। উজির খাঁ আলাউদ্দিনকে সরোদ যন্ত্রেই বীণার আলাপের বিলম্বিত ও মধ্য তান শিখিয়েছিলেন। আলাউদ্দিন নিজে উত্তম মৃদংগী ছিলেন তাই রবাবের বোলের কাজ মৃদংগ সংগতে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে বিশেষ কঠিন ছিল না। রবাব-সুরশৃংগারের বিলম্বিত ও জোড়ের কাজ হাফিজ আলী কতকটা আমাদের দেখিয়েছেন, তাঁর তালিমও উজির খাঁর নিকটেই প্রাপ্ত। তবে বিস্তারে আলাউদ্দীন হাফিজ আলীর চেয়ে অনেকটা বেশী সময় নিতেন। আলাউদ্দীন বিস্তারের সময় বীণার ন্যায় খণ্ডমেরুর কাজ দেখাতেন; হাফিজ আলী শুদ্ধ ডাগরবাণীতে আওচার অংগের কয়েকটি তানে রাগ খুলে দিতেন। মহম্মদ আলীর গানে ও বাজনায় খণ্ডমেরুর স্থান বিশেষ ছিল না—আওচার বিস্তারেই তিনি ছিলেন সুদক্ষ। বলা বাহুল্য খণ্ডমেরুর পদ্ধতি বীণার একটি প্রধান অংগ। পক্ষান্তরে রবাব ও সুরশৃংগারে আওচার পদ্ধতির রাগ-আলাপের জন্য বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়।

যাহোক মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের সংগে সংগে দাদা আলাউদ্দিনের কাছে আলাপ শিক্ষা করবার সুবিধা আমি দুই-তিনবার পেয়েছিলাম; কিন্তু ব্যক্তিগত কাজ-কর্মের জন্য উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা আমি করে উঠতে পারিনি। আলাউদ্দিনের প্রসংগে আমার আরো বহু কিছু লেখবার আছে। হাফিজ আলী খাঁ সাহেবের সংগেও নানা সময় নানাভাবে কাটিয়েছি,—যা কখনো ভোলবার নয়; তবে গৌরীপুরে হাফিজ আলীর যখন আগমন হয়, তখন তিনি তাঁর বাদ্যকলার চরম উন্নতির শিখরে অবস্থিত। দুই তিনবার তিনি আমাদের ভদ্রাসনে এসেছিলেন,—কিন্তু একবারের কথা আমার স্মৃতিপটে চিরন্তন হয়ে থাকবে। সেবার ধর্ম উৎসবের সংগে সংগীতের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছিল। বিখ্যাত বৈদান্তিক গুরু মুক্তানন্দ বা ওঁ বাবা সেবার মুক্তাগাছার রাজদরবারে কুমার জীতেন্দ্রকিশোরের নিমন্ত্রণে শুভাগমন করেছিলেন। রাজা জগৎকিশোর কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত ছিলেন এবং নিজ কৌলিক ধর্ম অনুযায়ী সাধন-ভজন করতেন। আমাদের ময়মনসিংহে নানা জমিদার ঘরের ন্যায় মুক্তাগাছা ঘরও শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জীতেন্দ্রকিশোর বেদান্ত আলোচনায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; তাই মুক্তানন্দকে আসাম থেকে নিমন্ত্রণ করে মাঝে মাঝে নিজ ভবন মুক্তাগাছা রাজবাড়ীতে নিয়ে আসতেন। রাজা জগৎকিশোর ও কুমার জীতেন্দ্রকিশোর উভয়েই উচ্চাংগ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যুৎপত্তির জন্য সারা ভারতে বিখ্যাত হয়ে গেছেন। রাজা জগৎকিশোর গোবরডাংগার জমিদার জ্ঞানদাপ্রসন্নবাবুর (মনুবাবু) একজন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ ছিলেন। উভয়েই অতিউদার চরিত্রের লোক; ব্যায়াম ও শিকারে সর্বাবিখ্যাত এবং অধিকাংশ সময়েই কলকাতায় ও মুক্তাগাছায় একত্রে কাল কাটাতেন। বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীরা এঁদের আশ্রয়ে কলকাতায় ও মুক্তাগাছায় দিনযাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সেতার-সুরবাহার বাদক মহম্মদ খাঁ, ভারতের অদ্বিতীয় আগ্রা ঘরানার গায়িকা শ্রীজান ও তাঁর স্বামী ছোটে খাঁ মৃদঙ্গীর নাম আজও সকল গুণীবৃন্দ স্মরণ করে থাকেন। যাহোক এঁরা উভয়েই ধ্রুপদেরও বিশেষ ভক্ত ছিলেন ও বেতিয়ার বহু গায়ক এঁদের দরবারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। মনুবাবুর পরলোকগমনের পর রাজা জগৎকিশোর পূর্বের ন্যায় স্বয়ং সংগীতসাধনা না করলেও সংগীত প্রসংগেই তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হতো। কুমার জীতেন্দ্রকিশোর পিতার ন্যায়ই সংগীতরসিক ও উত্তম

সংগীতসাধক ছিলেন আবাল্য শ্রীজ্ঞানের নিকট শিক্ষালাভের ফলে। তিনি ছিলেন আগ্রা ঘরানার খেয়াল ও ধামারে বিশেষ পারদর্শী।

পিতার কাছ থেকে সম্পত্তি পরিচালনার ভার পাওয়ার পর জীতেন্দ্রকিশোর মুক্তাগাছায় ও অন্যান্য কেন্দ্রে বড় বড় গুণীদের আমন্ত্রণ করে এনে সঙ্গীতের জলসার আয়োজন করতেন। অধিকাংশ জলসায় বৃদ্ধ রাজাও উপস্থিত হয়ে শুনতেন। যেবার মুক্তানন্দ স্বামী মুক্তাগাছায় কিছুদিন অবস্থানের জন্য শুভাগমন করেন, সেবার আনন্দ উৎসবের জন্য কুমার জীতেন্দ্রকিশোর সরোদী হাফিজ আলী খাঁ সাহেব, রামপুরের গায়ক আসফাক হোসেন খাঁ সাহেব ও বিখ্যাত তবলাবাদক আজিম খাঁ সাহেবকে মুক্তাগাছায় আহ্বান করেন। মুক্তাগাছায় কিছুদিন ধরে মুক্তানন্দের উপস্থিতিতে পূর্বোক্ত তিন সঙ্গীতগুণীর সঙ্গীত পরিবেশন খুবই জমেছিল। অবশেষে এঁদের সবাইকে নিয়ে জিতেন্দ্রকিশোর তাঁর ভাগিনেয় কালীপুরের জমিদার ও দিল্লীর আইনসভার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকান্ত লাহড়ী চৌধুরীর বাগানে সদলবলে এসে উপস্থিত হলেন। কালীপুর ঠিক গৌরীপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং কালীপুরের দাদা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়. সকাল-সন্ধ্যা সর্বদাই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকত। তাঁর বাগানেই হাফিজ আলী ও অন্যান্য ওস্তাদদের অবস্থানের জন্য একটি তাঁবু খাটান হয়েছিল, তবে হাফিজ আলী ও আজিম খাঁ সে যাত্রা শুধু কালীপুরে নয় গৌরীপুরেও জলসায় বাজিয়ে গিয়েছেন। সপ্তাহব্যাপী অবস্থানের মধ্যে হাফিজ আলী আমাকে শেখাতেও আসতেন প্রায় প্রতিদিন সকালে। মুক্তাগাছার রাজা তাঁকে শাল-দুশাল.সহ প্রায় সহস্র মুদ্রা পারিতোষিকরূপে দিয়েছিলেন। আমি আমার ঠাকুরমার প্রদত্ত একটি হীরার আংটি ও কয়েকশত টাকা তাঁকে দক্ষিণাস্বরূপে দিয়েছিলাম। সে যাত্রা হাফিজ আলীর সরোদ সুর-লয়ের যে অপূর্ব সমন্বয় দেখেছি, বিশেষত আজিম খাঁর সঙ্গে সঙ্গতের সময় ঐরূপ বাজনা তাঁর হাতে আর কখনো শুনি নি। ঐরূপ সঙ্গতও জীবনে খুব কমই শুনেছি। কালীপুরের বৈঠকখানায় মুক্তানন্দজীর দরবার জমত, সেখানে স্বয়ং জীতেন্দ্রকিশোর, ধীরেনদা ও স্বামীজীর কয়েকজন বিশিষ্ট শিষ্য উপস্থিত থাকতেন। মুক্তানন্দ সকালে ধর্মোপদেশ দিতেন ও সন্ধ্যার পর সঙ্গীত শুনতেন। বীরাসনে উপবিষ্ট এই সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর চেহারা ও কথাবার্তার বেশ মিল ছিল। তাঁর প্রত্যেক উপদেশ যেমন দৃঢ়প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি অতিসহজভাবে সকলের বোধগম্যরূপে তিনি তাঁর কথা বলতেন। জ্ঞান-ভক্তি ও কর্ম এই তিন বিষয়েই তিনি বেদান্ত ও গীতার মর্ম সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি নেংটিপরা হত শুষ্ক বৈরাগী ছিলেন না। তাঁর খাদ্য চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নানা উপকরণে উপস্থিত থাকত।

নিরামিষের তিনি ধার ধারতেন না. সব রকম মাংসই খেতেন, তবে তাঁর মহৎ গুণ ছিল, তিনি একলাই খেতেন না—আত্মীয়দের জন্য প্রসাদ বিতরণের বৃহৎ আয়োজনও তাঁর ছিল। সংগীত ও সাহিত্যে তাঁর পরম অনুরাগ ছিল। সান্ধ্য আসরে তিনি যেমন খাঁ সাহেবদের সঙ্গীত একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করতেন তেমনই খাঁ সাহেবদের চিত্তে সঙ্গীতের প্রেরণাও জাগাতে পারতেন যথেষ্ট। হাফিজ আলী খাঁ সাহেব আমাকে বলতেন—সাধু মহারাজকে বাজনা শুনাতে তাঁর বড়ই ভাল লাগে। এমন শ্রোতা পাওয়াও সৌভাগ্যের বিষয়। আসফাক হোসেনরও সর্বোৎকৃষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত তখনই আমি শুনেছি। একটি নৈশ জলসায় মুক্তানন্দ মহারাজ, কুমার জিতেন্দ্রকিশোর, ধীরেনদা ও আমাদের শ্রোতারূপে পেয়ে হাফিজ আলী খাঁ সাহেব পূরিয়া রাগে আধ ঘণ্টা ধরে এক আশ্চর্যজনক আলাপ বাজিয়েছিলেন। মীড়, গমক ও ঝালার সমন্বয়ে তাঁর স্বরোদের সুর চারিদিকে এক যাদু ছড়িয়ে দিয়েছিল। এর পর তিনি কিছুক্ষণ মালকোষে আলাপ ও গৎ বাজান ও আড়ানার দুনী গতে বাজনা শেষ করলেন। তার পরে উক্ত আড়ানা রাগেই আসফাক হোসেন 'ডরত লঙ্কা—যে লঙ্কা' ইত্যাদি পদযুক্ত বিখ্যাত সাদ্রা গেয়ে শোনালেন। সেদিন আজিম খাঁর সঙ্গতের সঙ্গে বাজনা ও গান এত জমেছিল যে, আজও তা ভুলতে পারি নি। মহারাজজীর আসর ছাড়াও আমাদের গৌরীপুরের বৈঠকখানায় আজিম খাঁর তবলাসহ হাফিজ আলীর স্বরোদ বাজনা অনুষ্ঠিত হত, তখন শুধু আমরাই যে পরিতৃপ্ত হতাম, তাই নয়, আমাদের কর্মচারিবৃন্দ এবং ভৃত্যরাও বৈঠকখানার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাফিজ আলীর অদ্ভুত যন্ত্রসংগীত নীরবে শুনত। একদিনকার জলসার কথা মনে আছে, সেদিন খাঁ সাহেব তিলক কামোদ ও পাহাড়ী ঝিঁঝিট বাজিয়েছিলেন। আলাপের শেষে দুনী গতে তোড়ার কাজ শেষ করে তিনি অবিশ্রান্তভাবে ঠোক্‌ঝালা ও সোড়ীর স্রোত বইয়ে দিলেন, তখন তাঁর অপূর্ব সুরের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের বাহার সকলকেই মাতিয়ে দিলেন। আজিম খাঁর তবলার তালের সঙ্গে সঙ্গে হাফিজ আলীর স্বরোদে সুর ও ছন্দের এমন এক সমন্বয় সাধিত হল যে, প্রত্যেক শ্রোতা সেই ছন্দে মাথা দোলাতে আরম্ভ করল — সমঝদার অসমঝদার, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আত্মীয় কর্মচারী এবং বেয়ারারা পর্যন্ত সুরের ছন্দে মাথা দোলাতে আরম্ভ করল। এক ঘণ্টা ধরে যে সঙ্গত চলল, এরূপ সঙ্গত গৌরীপুরের বৈঠকখানায় খুব কমই শোনা গেছে। আমাদের বাড়ীতে হাফিজ আলীর এটিই শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক অনুষ্ঠান এই কথা জোর করে বলতে পারি। এনায়েৎ খাঁও যথেষ্ট সুরেলা ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আজিম খাঁর মত তবলচি এনায়েৎ খাঁ পান নি। অবশ্য হাফিজ আলী ও এনায়েৎ খাঁর সংগীতমহিমা তখন সমভাবেই উন্নতির শিখরে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব-প্রীতির সম্বন্ধ চিরদিনই বজায় থেকেছে। তালিম বিভিন্ন হলেও সুর ও ছন্দের দিক দিয়ে উভয় কলাকারই বাংলা দেশে তখন সঙ্গীতের এক অভূতপূর্ব আবহাওয়ার সৃষ্টি করে গিয়েছেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রচ্ছদ চিত্র ঃ মাধবী মুখোপাধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহ

হিন্দী ছবি তৈরী বন্ধ কেন?

আগেকার দিনে রেওয়াজ ছিল, যাঁরা স্টুডিওর মালিক, তাঁরাই হতেন ছবির প্রযোজক। আমাদের কলকাতায় যেমন ছিল নিউ থিয়েটার্স, কালী ফিল্মস্, রাধা ফিল্মস্, ইস্ট ইণ্ডিয়া, শ্রীভারতলক্ষ্মী, অরোরা ফিল্মস্, দেবদত্ত ফিল্মস্ প্রভৃতি চিত্র-প্রযোজনা সংস্থা, তেমনই বোম্বাই শহরে বোম্বে টকীজ, শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স, মিনার্ভা মুভীটোন, মেহবুব প্রোডাকসন্স, প্রভাত সিনেটোন (পুণা) প্রভৃতি প্রযোজনা সংস্থা ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব স্টুডিও তো ছিলই, উপরন্তু ছিল মাস-মাইনে করা শিল্পীগোষ্ঠী, পরিচালক, সঙ্গীত-পরিচালক, বাদ্যযন্ত্রশিল্পী, কলা-কুশলী ও বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মিবৃন্দ। প্রত্যেকের নিজস্ব রসায়নাগার ছিল। এই-ভাবে এক-একটি স্টুডিওকে চালু রাখতে মালিকদের বহু অর্থ লগ্নী করতে হ'ত। আমরা জানি, মাত্র মাসিক মাহিনা খাতে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও একসময়ে ব্যয় করতেন ন্যূনাধিক এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা। এ'দের ছবির পরিবেশনা স্বত্ব যাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁদের মনে থাকত প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটি সুগভীর আস্থা; কারণ, তাঁরা জানতেন, প্রতিটি সংস্থাই স্টুডিও, তার ল্যাবরেটরী, তার আপিস, তার কর্মচঞ্চল কর্মিবৃন্দকে নিয়ে এমন একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান, যা তাঁদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ ক'রে রাতারাতি শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে না। পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করা হ'ত সাধারণত টিকিট বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে প্রদর্শকের প্রাপ্য অংশ বাদ দিয়ে প্রযোজকের যে অংশ থাকে, তারই থেকে পরিবেশনার দায়িত্ব বহন করবার জন্যে কয়েক শতাংশ কমিশন প্রাপ্তির বিনিময়ে এবং একটি মোটা টাকা—একটি সাদা-কালো হিন্দী ছবির জন্যে লাখ-দেড়-দুই টাকা—অগ্রিম দাদন স্বরূপ দিয়ে। পরিবেশকের কমিশন কেটে নেবার পরে প্রযোজকের যে অর্থ প্রাপ্য হ'ত, তার থেকে প্রথমেই পরিবেশক তাঁর অগ্রিম দাদনের টাকাটা বেশীর ভাগ সময়েই পুরোপুরি, আবার কখনও কখনও চুক্তিমত আংশিকভাবে উসুল ক'রে নিতেন। যদি দৈবাত কোনো একটি ছবি জনপ্রিয়তা লাভে অকৃতকার্য হওয়ার দরুণ পরিবেশক তাঁর অগ্রিম দাদনের টাকা সম্পূর্ণ উসুল করতে অসমর্থ হতেন, তাহ'লে তাঁর ভরসা থাকত, প্রযোজকের পরবর্তী ছবি থেকে তিনি তাঁর বাকী টাকাটা ফিরে পাবার সুযোগ লাভ করবেন।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছু পরেই যখন কাঁচা ফিল্ম আমদানীর পরিমাণ সীমিত হওয়ায় সম্ভাব্য চিত্র-প্রযোজকদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে ফিল্ম বণ্টনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাঁচা-ফিল্ম লাইসেন্সিং প্রথার প্রবর্তন হ'ল, তখন আবার অপরদিকে যুদ্ধের

চেনা-অচেনা : সুস্মিতা সান্যাল ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

কল্যাণে বহু অসাধু ব্যবসায়ীর পকেটে কালোটাকা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠায় ঐ কাঁচা-ফিল্ম লাইসেন্স অসদুপায়ে সংগ্রহ করা নিয়ে ছুটোছুটি, রেশারেশি ও কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। এবং তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল স্টুডিও ভাড়া করে চিত্র-প্রযোজনা করবার রেওয়াজ। এবং স্বাধীন চিত্র-প্রযোজকরা শুধু একখানি কাঁচা-ফিল্ম লাইসেন্স লাভের জন্যে লক্ষাধিক কৃষ্ণ-টাকার সদ্ব্যয় ক'রেই ক্ষান্ত থাকলেন না, তাঁরা বিভিন্ন স্টুডিওর মাস-মাইনে করা পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও প্রভূত অর্থের প্রলোভনে বশীভূত করলেন। শুরু হয়ে গেল ফ্রি-লান্সিং বা কোনো চিত্র-প্রতিষ্ঠানে মাসিক অর্থপ্রাপ্তির বিনিময়ে তিন, পাঁচ বা দশ বছরের জন্যে, এমন কি কখনও কখনও কর্মক্ষম থাকা পর্যন্ত বরাবরের জন্যে নিযুক্ত না থেকে এক-একটি ছবির জন্যে একটি থাউকো মোটা টাকা লাভের সর্তে চুক্তিবন্ধ হওয়া। যেখানে একজন শিল্পী বা পরিচালক একটি প্রতিষ্ঠান থেকে মাসে হয়ত এক হাজার টাকা পারিশ্রমিক পেয়েই খুশী ছিলেন, সেখানে ঐ 'হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা' স্বাধীন প্রযোজকেরা তাঁকে একখানি ছবি ছ'মাসের মধ্যে সমাপ্ত করা হবে, এবং নায়ক বা নায়িকার ভূমিকা-গ্রহণকারী শিল্পীকে মোট কুড়ি বা ত্রিশ দিনের বেশী শুটিং করতে হবে না, এই সর্তে এককালীন কুড়ি বা তিরিশ হাজার বা তারও বেশী অর্থ দিতে চুক্তিবন্ধ হতে থাকলেন। ছবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বরাবরই একটা অনিশ্চয়তার ভাব থাকে ব'লে স্টুডিওর মালিকেরাও ধীরে ধীরে নিজেদের চিত্র-প্রযোজনার কারবারকে গুটিয়ে ফেলে ঐ স্বাধীন চিত্র-প্রযোজকদের দৈনিক হারে স্টুডিও-ফ্লোর ভাড়া দেওয়া ঢের বেশী নিরাপদ ও সেই হেতু সমীচীন জ্ঞান করলেন। নিউ থিয়েটার্স, মিনার্ভা মুভীটোন প্রভৃতি যে-গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠান এই নতুন ব্যবস্থায় গা না ভাসিয়ে নিজেদের চিত্র-প্রযোজনার ব্যাপারটাকে চালু রাখতে চাইলেন, তাঁরাও জনপ্রিয় শিল্পী বা পরিচালকদের বাঁধা মাস-মাইনেতে ধ'রে রাখতে পারলেন না এবং স্বাধীন প্রযোজকদের বেপরোয়া প্রতিযোগিতার কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার ক'রে নিজেদের দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

'হঠাৎ-গিজিয়ে-ওঠা' স্বাধীন প্রযোজকেরা ক্রমে জনপ্রিয় শিল্পী, সংগীত-পরিচালক, গীতিকার, নেপথ্য-কন্ঠশিল্পী প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে বিবেচনাহীনভাবে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেওয়ার ফলে চিত্র-প্রযোজনার ব্যয় অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল। হিন্দী ছবির জগতে জনপ্রিয়তার প্রথম সারির শিল্পীরা পঞ্চাশ-ষাট হাজার থেকে আরম্ভ ক'রে আজ দশ-পনেরো লাখে তাঁদের পারিশ্রমিক ধার্য করলেন, সঙ্গীত-পরিচালক দাবি করছেন তিরিশ-চল্লিশ হাজারের পরিবর্তে চার-পাঁচ লাখ, গীতিকার এক-একখানি গান রচনার জন্যে একশো টাকার জায়গায় দু' থেকে পাঁচ হাজার টাকা এবং নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী একখানি গান গেয়ে একশো টাকা পারিশ্রমিক নেবার জায়গায় নিচ্ছেন দু' থেকে পাঁচ হাজার মুদ্রা। ফলে একখানি সাদা-কালো হিন্দী ছবি তৈরীর খরচ দু' লাখের জায়গায় গিয়ে উঠেছে তিরিশ-চল্লিশ লক্ষে। স্বাধীন প্রযোজকেরা হিসাব ক'রে দেখলেন, একটি সাদা-কালো ছবির নির্মাণ-ব্যয় যখন তিরিশ-চল্লিশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেচে, তখন ওর ওপর আরও লাখ-দশেক খরচ করলে ছবি ম্যাড়মেড়ে সাদা-কালো না হয়ে জমকালো রঙীন হয়ে উঠে দর্শক আকর্ষণে ঢের বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ হয়ে উঠবে। তারা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ছবিকে মনোলোভা ক'রে তোলবার অভিপ্রায়ে কাশ্মীর, কুলুভ্যালী, দার্জিলিং থেকে আরম্ভ করে সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি জায়গায় পাড়ি দিতে লাগলেন। ছবি তৈরীর খরচ ক্রমে স্ফীত হয়ে লাখ ছেড়ে কোটীকে গিয়ে স্পর্শ করল।

শোনা যায়, কালো টাকাকে শাদা করবার জন্যে হিন্দী চলচ্চিত্র প্রযোজনা একটি প্রশস্ত রাজপথ। এবং সেই কারণেই নাকি আজ চিত্র প্রযোজকের সংখ্যা এমন অগণিত। কিন্তু কালোকে শাদা ক'রে সেই শাদা টাকাকে সিন্দুকজাত করবার মধ্যেই না বাহাদুরী! তাই বিরাট বিরাট রঙীন ছবি তৈরী করবার তোড়জোড় স্বরূপ এক-জোড়া জনপ্রিয় শিল্পী, একজন খ্যাতনামা সুরকার এবং সুখ্যাত গীতিকার-সংলাপ-লেখকের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা স্ক্রীণ পত্রিকাতে একটি পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন দেন এবং তার পরেই দিল্লী, পূর্ব-পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও মধ্যভারত, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম, মহীশূর, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চলের পরিবেশনা স্বত্ব হয় বিক্রয় করে দেবার জন্যে কিংবা ন্যূনতম অর্থ-অংগীকারের (মিনিমাম গ্যারান্টির) শর্তে বিলি করবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। প্রথম প্রথম এদিক দিয়ে তাঁদের প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিতও হয়েছিল। ফলে মাত্র লাখ দশেক টাকা লগ্নী করে তাঁরা কয়েকজনের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চাশ-ষাট লাখ টাকা বাজার থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে সেই টাকাতে ছবির শুটিং শুরু করতেন এবং অনেক সময়ে দেখা যেত, সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশকদের অর্থে ছবি সম্পূর্ণ হ'ত এবং ছবি মুক্তি পাবার আগেই ছবির প্রযোজক ঐ ছবি থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করে নিয়েছেন।

পরিবেশকরা এই যে আঞ্চলিক স্বত্ব-লাভের বিনিময়ে একটা মোটা অংক মিনিমাম গ্যারান্টি বা ক্রয়মূল্য বাবদ ব্যয় করতেন, তার বেশীর ভাগটাই তাঁরা সংগ্রহ করতেন ছবিঘরের মালিকদের কাছ থেকে। ছবি যদি ভাগ্যক্রমে জনপ্রিয় হয়ে আর্থিক সাফল্য লাভ করে, তাহলে এ ব্যবস্থা চালু থাকায় কারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিপদ বাধল বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাঁকজমকওলা ছবিগুলি এক এক ক'রে পর পর বক্সঅফিসের জানলায় হুমড়ি খেয়ে মৃত্যুবরণ করায়। ছবিঘরের মালিকেরা ছবি পাবার জন্যে যে-বিরাট টাকা দাদন দিয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার এক দশাংশও ফিরে না আসায়। টনক নড়ল বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশক সংস্থাগুলির প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বা অ্যাসোসিয়েশনগুলির। ফলে এক এক ক'রে তাঁরা ছবির পরিবেশন স্বত্ব সংগ্রহের ব্যাপারে আত্মরক্ষামূলক আইন-কানুন চালু করলেন। ১৯৬৬ সালের ২৬এ জুলাই সেন্ট্রাল সার্কিট সিনে অ্যাসোসিয়েশন এ সম্পর্কে প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরে ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী দিল্লী মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ১৯৬৮র ৬ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাঞ্জাব মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশনও প্রায় অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ

করে এই সিম্ধান্তে আসেন যে, অতঃপর পরিবেশক প্রতিষ্ঠান হিন্দী ছবির পরিবেশনার জন্যে কোনো মিনিমাম গ্যারান্টি দেবেন না বা স্বত্ব ক্রয়ও করবেন না। তাঁরা ছবি অনুযায়ী মাত্র অগ্রিম অর্থ দেবেন ছবির মুক্তির তারিখ থেকে মাত্র দশ মাস বা এক বৎসরের মধ্যে সেই অর্থ ফেরত পাবার শর্তে। অর্থাৎ ছবি যদি জনপ্রিয় না হয়, তা' হ'লে তার আর্থিক অসাফল্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে চিত্রপ্রযোজককেই বহন করতে হবে এবং অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা আর চলবে না। ফলে বোম্বাইয়ের তথাকথিত স্বাধীন প্রযোজকরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন এবং সম্ভবত আত্মসমীক্ষার জন্যেই চিত্র প্রযোজনা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন গেল ৩১-এ মার্চ তারিখ থেকে।

—নান্দীকর

অগ্নিযুগের কাহিনী : পরিচালক ভূপেন রায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়।

দেশী ছবির খবর

পরিচালক স্বদেশ সরকার স্বাধীনভাবে যে নতুন ছবিটি পরিচালনা করছেন তার নাম 'শাস্তি'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে এটির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। প্রধান চরিত্রে রূপদান করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যসফল কাহিনী 'শেষ থেকে শুরু'র চলচ্চিত্রায়ন শুরু করেছেন চিত্রসাথী গোষ্ঠী। সম্প্রতি এ ছবির সংগীত গ্রহণ করেন সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, কিশোরকুমার, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত দত্ত। এ ছবির মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন ইঙ্গিত গোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ। সাহা স্ক্রিনিং ছবিটির পরিবেশক।

প্রযোজক-পরিচালক এইচ এস রাওয়েল তাঁর রঙিন ছবি 'সংঘর্ষ'-এর বহির্দৃশ্য সম্প্রতি ওয়েস্টার্ণ ঘাটের ওয়াই অঞ্চলে গ্রহণ করলেন। ছবিটির সম্পূর্ণ চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নোশাদ সুরকৃত এ ছবির প্রধান চরিত্রাবলিতে রূপদান করেছেন দিলীপকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, বলরাজ সাহনি, সঞ্জীবকুমার, দেবেন বর্মা, ইফতিখর, সাপ্রু, উল্লাস, সুন্দর, দুর্গা খোটে সুলচনা ও অঞ্জু মহেন্দ্রু।

পরিচালক দুলাল গুহ সম্প্রতি পূর্ব আফ্রিকায় 'সাফরি' ছবির সম্পূর্ণ বহির্দৃশ্য গ্রহণ শেষ করে বোম্বাইয়ে সদলবলে ফিরে এসেছেন। এটি ভারতীয় প্রথম ছবি যা বন্য-পরিবেশে গৃহীত হল। প্রধান দুটি চরিত্রের শিল্পী ধর্মেন্দ্র এবং শর্মিলা ঠাকুর। এই বহির্দৃশ্য গ্রহণে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল ছবিটির সুরকার।

প্রযোজক-পরিচালক দেবেন্দ্র গোয়েল 'এক ফুল দো মালি' ছবিটির একটানা আঠারো দিন ধরে দৃশ্য গ্রহণ শেষ করলেন। ছবিটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন সাধনা, সঞ্জয়, বলরাজ সাহনি, শবনম, ডেভিড, দুর্গা খোটে ও শিশুশিল্পী মাশুমা। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন রবি।

পরিচালক দেবেন ভর্মা 'আকিন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ শুরু করেছেন। শংকর জয়কিষণ সুরকৃত এ ছবির মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর, আনোয়ার হুসেন এবং গৌতম।

চারুচিত্র প্রযোজিত রঙিন বাংলা ছবি 'কমললতার' প্রথম পর্যায়ের বহির্দৃশ্য গ্রহণ গত কয়েকদিন যাবৎ বারাসতে চলে। সুটিং-এ অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, নির্মল-কুমার ও পাহাড়ী সান্যাল। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ইতিমধ্যে সংগীত গ্রহণ হয়েছে ছবির একাংশের। ছায়াবাণী পরিবেশিত এ ছবির পরিচালক হরিসাধন দাসগুপ্ত।

গত শুক্র ও শনিবার (২৯—৩০) টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে দীনেশ চিত্রম-এর প্রথম সংগীতবহুল চিত্র "পান্না-হীরে-চুণী"র সংগীত গ্রহণ-এর কাজ শেষ হল চিত্রজগতের সর্বকনিষ্ঠ তরুণ সংগীত পরিচালক অজয় দাসের পরিচালনায়। ব্রজেন দে, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরকার রচিত মোট ১১ খানি গানে কণ্ঠদান করেছেন—শ্যামল মিত্র, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, তাপস চট্টোপাধ্যায় মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সলিল মিত্র। দেবনারায়ণ গুপ্ত চিত্রনাট্যায়িত ছবিটি পরিচালনা করছেন তরুণ পরিচালক অমল দত্ত। এই সংগীত-প্রধান চিত্রের ভূমিকালিপিতে আছেন — অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, নিরঞ্জন রায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গীতা দে, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, অনু দত্ত, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, শিশির বটব্যাল, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুটি আকর্ষণীয় চরিত্রে থাকছেন—সুখেন দাস ও যুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশে আছেন যথাক্রমে শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ যোশী ও সঞ্জিত সেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজস্থানের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় একমাস যাবৎ পূর্ণিমা পিকচার্সের "গুপী গায়েন বাঘা বায়েন" ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ ক'রে সত্যজিৎ রায় কলিকাতা ফিরে এসেছেন। জয়সলমীর, বুন্দি, যোধপুরে প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক দুর্গ ও প্রাসাদের পটভূমিকায় গুপী ও বাঘার বিচিত্র অভিযান-কাহিনী এবং একটি সংগীত চিত্রায়িত করা হয়েছে। এই চিত্রগ্রহণে ছবির নির্বাচিত শিল্পীদের সঙ্গে কয়েক সহস্র একস্ট্রা' ও কয়েকশত উটও অংশ গ্রহণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গভীর তুষারাচ্ছন্ন কুফ্রির অঞ্চলেও এ ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা হয়।

শ্রীরায় বর্তমানে এন টি এক নম্বর স্টুডিওতে একটানা চিত্রগ্রহণের পরিকল্পনা করেছেন। স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায় রচিত সর্বজনপ্রিয় শিশু কাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী হল্লা, শুণ্ডী ও বাংলাদেশের তিনজন রাজার প্রাসাদের দৃশ্যাবলী বর্তমানে গৃহীত হবে। শিল্পনির্দেশক বংশীচন্দ্র গুপ্ত এই কাল্পনিক প্রাসাদগুলির রূপদানে ব্যস্ত রয়েছেন এবং প্রযোজক ইতিমধ্যেই এই বায়বহুল সকল দৃশ্যপট নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

করেছেন। নবাগত তপেন চট্টোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, [illegible] রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত কবি [illegible] রাজনীতিবিদ হারীন্দ্রনাথ [illegible] এ ছবির প্রধান চরিত্রগুলিতে [illegible] করছেন।

[illegible]মিত্র জুটি নিয়ে অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের বহুপঠিত উপন্যাস '[illegible] ফুল'-এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন 'ইকনস্ ফিল্মস্'। এ ছবির চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তরুণ পরিচালক ইন্দর সেন, যিনি এতদিন মৃণাল সেনের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন। সংগীত পরিচালনা : সুধীন দাশগুপ্ত, চিত্রগ্রহণ : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও শিল্প-নির্দেশনা : রবি রায়চৌধুরী। ছবিটির পরিবেশনায় থাকছেন রমা পিকচার্স।

পয়লা বৈশাখ শুভমহরৎ দিয়ে ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সুরু হ'ল টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে।

অজয় কর পরিচালিত চিত্রলিপি ফিল্মস্-এর 'পরিণীতা' ছবির জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ছ'খানি গান বাণীবন্ধ হল। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত, প্রতিমা ও আরতি। গানগুলির মধ্যে ছিল একটি রবীন্দ্রসংগীত, একটি অতুলপ্রসাদের ও অপর ক'টি প্রণব রায়ের লেখা। আগামী ১৯শে এপ্রিল থেকে ছবির দ্বিতীয় পর্যায়ের স্যুটিং শুরু হবে এবং আশা করা যায় ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হবে তখন।

বিদেশী ছবির খবর

মার্টিন লুথার কিং-এর আকস্মিক মৃত্যুতে অন্ধকার উৎসব পিছিয়ে গিয়েছিল দু' দিন। গত এগারই এপ্রিল সান্টা মনিকায় উৎসব শেষ হয়েছে। এবারের ফলাফল নিম্নরূপ :—শ্রেষ্ঠ ছবি 'ইন্ দি হিট অব দি নাইট'. শ্রেষ্ঠ পরিচালক—মাইক নিকলস্ 'দি গ্রাজুয়েট' ছবির জন্য, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—রড স্টিগার (ইন্ দি হিট অব দি নাইট), শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী—ক্যাথারিন হেপবার্ন (গেস হু'জ কামিং), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—জর্জ কেনেডি (কুল হ্যান্ড লিউক), শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রী—এস্টেল পার্সনস্ (বনি এন্ড ক্লাইড)। এবারে শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের সম্মান পেয়েছে চেকো-শ্লোভাকিয়ার জিরি মেঞ্জেল কৃত 'ক্লোজলি ওয়াচ্‌ড ট্রেনস্'. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য গতবারেও এ পুরস্কার চেক ছবি 'শপ্ অন দি মেন স্ট্রীট' লাভ করেছিল।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ছবি নিয়ে আসছে শরৎকালে তাসখন্দে এক আন্তর্জাতিক চিত্রোৎসব হবে বলে জানিয়েছেন সোভিয়েত চলচ্চিত্র সমিতির ডেপুটি চেয়ারম্যান ভ্লাদিমির বাস্কাকভ। এ প্রসঙ্গে বাস্কাকভ্ আরও জানিয়েছেন যে, এবছর চল্লিশটা আন্তর্জাতিক উৎসবে রাশিয়া যোগদান করবে এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে পঞ্চাশের অধিক রুশ-ছবির উৎসব ও সিম্পোসিয়াম জাতীয় আলোচনার ব্যবস্থা করবে। ইতিমধ্যে গোর্কি জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গোর্কি সাহিত্যাশ্রয়ী ছবির ব্যাপক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে।

ফরাসী চিত্র-পরিচালক মার্সেল ক্রেন-এর মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি 'দি ইয়ং উল্ভস্'-এর নায়িকা এলিজাবেথ টিসের আমেরিকান ছবি 'ক্যাসল্ কিপ্'এর অন্যতম চরিত্রের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এটাই অবশ্য টিসের্-এর প্রথম আমেরিকান ছবি নয়, এর আগে সে জেন্ ফন্ডার সঙ্গে 'দি কোয়্যারী', শার্লি ম্যাকলীনের সঙ্গে 'ওম্যান টাইমস্ সেভেন' প্রভৃতি কয়েকটি ছবি করেছে। ফ্রান্সের অন্যতম জনপ্রিয় এই তন্বী ফ্যাশন মডেল প্রায় আধডজন ফরাসী ছবিতেও অভিনয় করেছে ইতিমধ্যে। এ ছবিতে টিসের্-এর বিপরীতে আছেন বার্ট ল্যাংকাস্টার। ছবির পরিচালক সিডনী পোলক্।

পৃথিবীর অন্যতম চিরায়ত চিত্র 'প্যাসন অফ্ জোয়ান আর্ক' ছবির স্রষ্টা কার্ল ড্রেয়ার গত সপ্তাহে কোপেনহেগেনস্থ বাস-ভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল উনাশি। প্যারিসে (১৯২৭-২৮) তোলা এ ছবিতে কবি অ্যান্তন আর্তো অভিনয় করেছিলেন। কলকাতায় ছবিটির ব্যাপক প্রদর্শনী হয় কয়েক বছর আগে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি চিরায়ত চলচ্চিত্র উৎসবের সময়। কার্ল ড্রেয়ার পৃথিবীর চিরকালের শ্রেষ্ঠ দশজন পরিচালকের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকেন।

কয়েক মাসের টানা-পোড়েনের পর ক্যারি গ্র্যান্ট ডায়ান ক্যাননের বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার শেষ হয়েছে। ডায়ানার প্রায় সব দাবীই আদায় হয়েছে। ওদের সন্তান জেনিফার মার কাছে থাকবে একথা বলা হয়েছে শুনানীতে। তবে মাসে দেড় হাজার ডলার সন্তানের ভরণ-পোষণের খরচ হিসাবে দিতে হবে ক্যারিকে, তাছাড়া স্ত্রীর ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক মোটা অংকের টাকা দিতে হবে তাকে নিয়মিত।

উত্তরমেরু অভিযানের দুর্ধর্ষ কাহিনী চিত্রায়ণের কাজ ইতিমধ্যে ডিভাস্ সিনে-মাটোগ্রাফির প্রযোজনায় অগ্রসর হচ্ছে নিয়মিত। কয়েক কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এ-ছবির পরিচালক মিখাইল কালাটোজভ্ লেনিনগ্রাদ, মস্কো, বাজকাল প্রভৃতি জায়গায় আউটডোর লোকেশনের কাজ সেরে রোমের দিনো দি লরেন্তিস্ স্টুডিওর অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ শুরু হবে খুব শিগগির. রুশ-ফরাসী যুগ্ম-প্রযোজনায় তোলা এই 'দি রেড টেন্ট' ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে আছেন পিটার ফিঞ্চ ও ক্লদিয়া কার্দিনাল্।

'আমি জাঁ মোরার ছবিগুলো দেখার পর থেকেই ওকে নিয়ে একখানা ছবির কথা ভাবছিলাম'। চরিত্রের অনুভূতি ও বেদনার প্রকাশে ওর মুখের বোধশূন্য ভাব দেখার মত।' কথা কটি বলে জাঁ রেনোয়া জানিয়েছেন—'আমার আগামী ছবি 'দি ওয়ান্ডারার' এর নায়িকা হবে জাঁ মোরো।' 'লা মার্সাই'এর কাজ এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, এর পরেই হাত দেবেন এ ছবিতে। ওয়ান্ডারারের চরিত্রের সঙ্গে বর্তমান যুগের হিপিদের সঙ্গে আংশিক মিল থাকায় রেনোয়া এই কাহিনীকেই বেছেছেন।

স্টুডিও থেকে

কিছুদিন আগে এনটিন্ন এক নম্বর স্টুডিওর দু'নম্বর ফ্লোরে গিয়েছিলাম কি ছবির কাজ হচ্ছে দেখতে। পরিচালক ভূপেন রায় তখন নিউ এরা পিকচার্সের ব্যানারের নতুন ছবি 'অগ্নিযুগের কাহিনী'র একটি দৃশ্য গ্রহণ করছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পশ্চিমবঙ্গের শহরে গ্রামে বহু বিদ্রোহী দল গড়ে উঠেছিল। এমনি এক দলেরই রক্তক্ষরী কাহিনী নিয়ে ছবির চিত্রনাট্য বিস্তৃত। চিত্রনাট্য লিখেছেন বিপত্তপালক বসু। দৃশ্যটির কথা বলি।

একটা ভাঙ্গা পোড়া বাড়ী। তবে দেখলেই বোঝা যায় লোকের চলাচল আছে এ বাড়ীতে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দিলীপ রায় ও মাধবী মুখার্জি।

মিড্ শট। দিলীপ ও মাধবী দুজনের কম্পোজিট শট্।

দিলীপ—এখন কি করবে? মীরা, অজয় কি ব্যবস্থা করেছে আমি ঠিক জানি

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত পঞ্চগোলাপ চিত্রের মহরতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। ফটো ঃ অমৃত

[illegible] ও [illegible] সংগীত গ্রহণ ঃ পরিচালক অরুন্ধতী দেবী, অমর পাল ও পলাশ [illegible]। ফটো ঃ অমৃত

না। শুনেছি কেন [illegible] তোমাকে নিয়ে [illegible]।

ক্লোজ শট্। [illegible]

দিলীপ—[illegible] আমার হাতে [illegible] একেবারে [illegible] যাবে। ক্লোজ শট্। মাধবী।

মাধবী (অবাক)—[illegible]?

ক্লোজ শট্। দিলীপ।

দিলীপ—তুমি অনেক বদলে গেছ দেখে!

কম্পোজিট শট্। মাধবী ও দিলীপ।

মাধবী—বদলে গেছি?

দিলীপ—বদলে গেছ বৈকি। আমারই হয়ত ভুল হয়েছিল মীরা। তোমাকে আমি যা ভেবেছিলাম......

মাধবী—কি ভেবেছিলে

দিলীপ—যাক্ সে কথা।

[আরও কিছু সংলাপ ছিল, তা দিলাম না।]

কম্পোজিট শট্। দিলীপ ও মাধবী।

মাধবী (এগিয়ে এসে)—দাঁড়াও সমীরদা, কি বলতে চাও তুমি?

দিলীপ—কি বলতে চাই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ মীরা।

মাধবী—তুমি আমাকে অপমান করছ!

দিলীপ—অপমান?

মাধবী—নয়ত কি? আমার সম্বন্ধে কতটুকু জান তুমি?

দিলীপ—যা জানি, তাই কি যথেষ্ট নয়?

মাধবী—না, তাহলে তুমি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারতে না......

[সংলাপ বাদ দিলাম কিছু আবার।]

ক্লোজ শট্। দিলীপ।

দিলীপ—তোমার কোন কথারই কোন দাম নেই আজ আমার কাছে।

মাধবী এগিয়ে আসে দিলীপের দিকে। ক্যামেরাও এগিয়ে যায়।

ক্লোজ শট্। মাধবী।

মাধবী (বিস্ময়ের সুরে)—সমীরদা!

ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হল ওদের দুজনের মধ্যে। দিলীপ মাধবীকে যেদিন প্রথম দেখেছিল মেদিনীপুরে তখনও তার মধ্যে এক আগুনের স্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করেছিল। তাই সে তাকে নিয়ে এসেছিল তার দলে। ইতিমধ্যে মাধবীর পরিবর্তন হয়েছে হয়তো কিছু বা। যা হারিয়েছে সে, তাই হয়তো বা উৎসাহে উদ্দীপনায় সাময়িক ভাটা পড়েছে তার।

দিলীপ তাকে ভুল বুঝে থাওয়ায় সে মানসিকভাবে বিচলিত হয়েছে। কিছুদিন তার কোন খবর না পেয়ে দূরে আর থাকতে পারেনি। ছদ্মবেশে লুকিয়ে এসেছে একদিন তাদের পুরোন আড্ডায়। মাস্টারদার কাছে খবর নিতে এসেছে। ঐ দৃশ্যগ্রহণের দিনও উপস্থিত থাকায় দৃশ্যটিকে তুলে দিচ্ছি।

মিড্ লং শট্। কম্পোজিটে আছে বিকাশ রায় ও মাধবী। বিকাশ রায় এদিক ওদিক যাতায়াত করায় ফ্রেমের মধ্যে আউট

পরিণীতা : মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক অজয় কর, শমিত ভঞ্জ, রোমী চৌধুরী। ফটো : অমৃত

হচ্ছেন আবার ইন হচ্ছেন। মাধবী স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বিকাশ রায় প্রথমে এগিয়ে এল, তার পেছনে মাধবী। তার পোষাকটা অতি সাধারণ নীচু শ্রেণীর মেয়েদের মত।

বিকাশ—সমীরের খবরের জানবার জন্য তোমার এভাবে এখানে আসা উচিত হয় নি মীরা। এ বাড়ীর ওপর পুলিশের নজর আছে।

মাধবী—কিন্তু মাস্টারমশাই—সমীরদা আমাকে ভুল বুঝে গেছে। আমায় মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী করে গেছে। তাকে সব কথা জানাতে না পারলে আমি যে শান্তি পাব না।

বিকাশ—দেখ মীরা, ছোটখাট ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোন সময়ই বেশী মাথা ঘামাবে না। আমাদের সামনে এখন অনেক কাজ।...... যে মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেছ তার মধ্যে দেশের কল্যাণ ছাড়া আর কোন হৃদয়াবেগের স্থান নেই।

ক্লোজ শট। মাধবী।

মাধবী—আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনি যা চান পাবেন।

দৃশ্যটির গ্রহণ পর্যায় তখনকার মত শেষ হলেও আরও বাকি ছিল অনেক। মাস্টার-মশাইএর কথা অনুযায়ী মাধবী আর দিলীপের কোন খবর নেয় নি। তবে কিনা তাদের এই ভুলবোঝাবুঝির শেষ হয়েছিল একদিন জীবনের চরম মূল্য দিতে হয়েছিল তাদের।

শুধুমাত্র সমীর, মীরা নয়, বড়লোকের ছেলেমেয়েরাও অংশগ্রহণ করেছিল সক্রিয়-ভাবে এ আন্দোলনে। মহিলা সমিতি জাতীয় সংস্থাগুলো টাকা পয়সা ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করেছিল এ বিপ্লবী দলকে। তারপর এল স্বাধীনতা, পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্তি পেল দেশ। তবে এর জন্য যে কত সুধাংশু, সমীর, মীরার চোখের জল, বুকের ব্যথা আর আশাহত কান্নার রোল জড়িয়ে আছে তার শেষ নেই। ইতিহাসের পাতায় কিছু সাক্ষী আছে তার।

এমনি এক স্বাধীনতা আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী কাহিনী নিয়ে ছবিটির প্রযোজনা করছেন শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু। ক্যামেরায় আছেন অনিল গুপ্ত। উপরোক্ত দৃশ্য কাটিতে সমীর মীরা ও সুধাংশুর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে দিলীপ রায়, মাধবী মুখার্জি ও বিকাশ রায়। এছাড়া ছবির অন্য আরও দুটি বিশেষ চরিত্রে আছেন অজয় গাঙ্গুলী ও সুলতা চৌধুরী।

পরিচালক ভূপেন রায় কিছুদিন আগে দীঘা থেকে ফিরলেন আউটডোর এর কাজ করে। মুক্তিপ্রতীক্ষিত এছবির সুরকার গোপেন মল্লিক।

মঞ্চাভিনয়

আজকের নাটক

সম্প্রতি 'স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদে'র শিল্পিবৃন্দ সুশীল মুখো-পাধ্যায়ের নতুন নাটক 'আজকের নাটক' সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন 'রঙ-মহলে'র মঞ্চে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাস্তবভিত্তিক রসোত্তীর্ণ এই নাটকটি রচিত হয়েছে। নাট্যকার আধুনিক সমাজ-জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন হাস্যকৌতুকের কল্লোলের মধ্য দিয়ে। নিছক হাস্যরস সৃষ্টিই নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, আজকের সমাজ-জীবনের বহুবিধ সমস্যাকে জড়িয়ে অনেক ভাবনাচিন্তাও প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে আছে এ-নাটকে। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নাট্যকার স্বয়ং। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে আন্তরিকতা থাকায় সামগ্রিক অভিনয় সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এসেছিল। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপ দেন —সুশীল মুখোপাধ্যায় (হিরন্ময়), বিমান গুপ্ত (নীরেন), অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যামল), কেয়া চক্রবর্তী (যূথিকা), তুষারিকা চক্রবর্তী (সুরমা), অমর বন্দ্যো-পাধ্যায়, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মহান চক্র-বর্তী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু গঙ্গোপাধ্যায়, রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় আভা দাস।

নদী বয়ে যায়

'বৃহস্পতির আসরে'র শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি 'নদী বয়ে যায়' নাটকটি [illegible]

সঙ্গে অভিনয় করলেন 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে। সংঘবদ্ধ অভিনয়ের উৎকর্ষতাই এই নাট্যপ্রযোজনাকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। নটবর, জয়নারায়ণ ও জ্ঞানরঞ্জন চরিত্রে অসামান্য অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন জিতেন সেনগুপ্ত, অসিত রায় ও গোপাল শীল। অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন শিপ্রা সাহা, সবিতা মুখার্জি, শঙ্করনারায়ণ, রঞ্জিত মুখার্জি, অসিত মুখার্জি, বিজয় গাঙ্গুলী, অশোক মিত্র, দিবাকর চ্যাটার্জি, জগন্নাথ দে, সুশান্ত কাঞ্জিলাল, সানু রায়, ইলা মিত্র, শৈলবালা।

ফিঙ্গার প্রিণ্ট

'ধানবাদের চাসনালা ক্লাবের' শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি স্থানীয় এক মঞ্চে অভিনয় করলেন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর রহস্যঘন নাটক 'ফিঙ্গার প্রিণ্ট'। রহস্য নাটকের মঞ্চরূপায়ণে যে কলা-কৌশলের ব্যবহার প্রয়োজন হয়, তার উপস্থিতি এই নাট্য-প্রযোজনায় ছিল। শিল্পীদের আন্তর নিষ্ঠা ও চরিত্র সম্পর্কে সচেতনতা অভিনয়ে গতি এনেছে। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন— ইতি গুপ্তা, বিধানকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি পাল, সোমেশচন্দ্র লাহিড়ী, আশিসকুমার সেনগুপ্তা, সুশীলকুমার দাশগুপ্ত, অনুরাধা হালদার, তাপস রায়চৌধুরী, সুনীলকুমার মণ্ডল, সুশান্তকুমার মণ্ডল।

অমাবস্যায় আলো

অপেশাদার অফিস নাট্যসংস্থাগুলিও যে কখন কখন প্রগতিশীল নাটক মঞ্চস্থ করে, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল বিগত ৫ই মার্চ, ৬৮ স্টার থিয়েটারে ৮নং হেয়ার স্ট্রীট ইউনিট, পি এণ্ড টি রিক্রিয়েশন ক্লাব, ক্যালকাটা টেলিফোনস-এর 'অমাবস্যার আলো' নাটকটি মঞ্চস্থ করায়।

শ্রীঅরুণ দত্ত রচিত এই নাটকটিতে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় অপহৃতা এক নারীর দুঃসহ জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। সভাপতিত্ব করেন ক্যালকাটা টেলিফোনসের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীবামাকান্ত।

বিদেশী

উত্তর শহরতলীর নবগঠিত নাট্যসংস্থা 'হঠাৎ' এর সদস্যারা তাদের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উদযাপন করেন সংস্থার নিজস্ব মঞ্চে। ঐদিন 'হঠাৎ' নাট্যসম্প্রদায় তাঁদের প্রথম নাটক শ্রীশৈলেন গুহ নিয়োগী রচিত 'বিদেশী' মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান রতন নন্দী (কমল), ভোলানাথ সোম (দেবু), শিবকুমার নাথ (অনিল), নিত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য (সমর), কার্তিক হাজরা (মোহিত), গোরাচাঁদ মান্না (মিঃ দত্ত) ও অসিত চক্রবর্তী (পুলিশ ইন্সপেকটর)। নাট্যনির্দেশনায় ছিলেন নিত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

উল্কা

কালীপুর রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রযোজনায় সম্প্রতি স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোল নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চ সফল নাটক 'উল্কা'। শিল্পীদের স্বচ্ছন্দ অভিনয়

'প্রথম কদম ফুল' মহরতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তনুজা, ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু রায় ও পরিচালক ইন্দার সেন। ফটো : অমৃত

সেদিনকার নাট্যানুষ্ঠানে প্রাণ এনেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন বিমলকুমার বসু, চুনীলাল মণ্ডল, রথীন বোস, অরুণ ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ হালদার, অসীম বিশ্বাস, রনেন সেনগুপ্ত, কানাইলাল দত্ত, নিমাই মোদক, জ্যোতিভূষণ গুহ, গোপীনাথ দে, সন্তোষ নাথ, অমল সেনগুপ্ত, সবিতা মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া কুণ্ডু, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী।

প্রফুল্ল

মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক (হাওড়া শাখা) এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ সম্প্রতি হাওড়া ই আর রঙ্গমঞ্চে গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। রণজিৎ দত্তের পরিচালনায় নাট্য-প্রযোজনাটি মোটামুটি উপভোগ্যই হয়ে ওঠে। অভিনয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন — মৃত্যুঞ্জয় দত্ত (ভজহরি), সমর বসু (কাঙালীচরণ), শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায় (যোগেন), জিতেন দত্ত (সুরেন), অরুণ চম্পটি (মদন), শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় শিবনাথ)।

অবচেতন

সম্প্রতি 'কুশীলব' নাট্য সম্প্রদায় 'মুক্ত অঙ্গনে' অভিনয় করলেন আশিষকুমার সান্যালের রহস্যমূলক নাটক 'অবচেতন'। এ নাটকের যা কিছু রহস্য তা উন্মোচিত হয়েছে মনস্তত্ত্বের পটভূমিকায়। তাই অন্যান্য রহস্য নাটকের সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। নাট্যনির্দেশক শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নাটকীয় কৌতূহল শেষ পর্যন্ত অটুট রাখতে পেরেছেন। সামগ্রিক অভিনয় নাটকীয় গতিকে শেষ পর্যন্ত পরিণতির পথে এগিয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন — নীরেন ঘোষ, আশিষ সান্যাল, কমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেশ ঘোষ, সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সৌম্যেন মিত্র, তুলসী চৌধুরী, বুলা সেনগুপ্তা, অলোক ভট্টাচার্য, পান্না দত্ত, অরুণ দাস, অমিয় দাস।।

বহ্নি

ইয়োথ সোসাইটির সদস্যরা সম্প্রতি তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে অভিনয় করলেন সমীরকুমার ঘোষ রচিত 'বহ্নি' নাটক। সমাজজীবনের বাস্তব পটভূমিকায় রচিত এ নাটকের মঞ্চরূপায়ণে শিল্পীদের নিষ্ঠার কোন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি, তাই ঘাতপ্রতিঘাত সমৃদ্ধ এ নাটকের পরিবেশন সেদিন সার্থক হয়েছিল, এ কথা বলতে হবে। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন, তাঁর প্রয়োগ পরিকল্পনায় নতুন ধরনের শিল্পাত্মক লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান

করেন—রাধাকমল দাস, নির্মল সাহা, জ্যোতিষ সেন, প্রতাপ ভট্টাচার্য, সেবা দাস, তাপসী মুখোপাধ্যায়, সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়, সোমনাথ চৌধুরী, মৃণাল রায়, স্বপন ঘোষ, সমরেশ ভট্টাচার্য, সনৎ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক ধর, দুলাল চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় দাস, মাখনলাল চক্রবর্তী, ফণীন্দ্রনাথ দাস, সনাতন মল্লিক।

সাজাহান

সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশন রিক্রিয়েশন ক্লাবের পঞ্চম বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে অভিনীত হোল দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত নাটক 'সাজাহান'। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ নাটকের অভিনয় উপস্থিত প্রায় সবাইকেই হয়তো তৃপ্তি দিয়েছে। প্রয়োগ-পরিকল্পনায় কিছু নতুনত্বের স্বাক্ষর আছে এবং সেই সূত্রেই নির্দেশকের সূক্ষ্ম চিন্তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পেরেছে। পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য (সাজাহান), সুবল দত্ত (ঔরংজীব), আশীষ সেনগুপ্ত (দিলদার), পুলিন রায়চৌধুরী (দারা) অসামান্য অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন—ডি কে রায়, আর টি এম ব্রহ্মচারী, রামনাথ লস্কর, বি এস চ্যাটার্জী, ফণিভূষণ অধিকারী, জি এন সাহাভৌমিক, বিভূতি সাহা, সুতপা ভট্টাচার্য, সবিতা সমাদ্দার।

'গৃহপ্রবেশ'
'প্রত্যাবর্তন'

সম্প্রতি 'গোপালনগর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের' ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষ্যে 'গৃহপ্রবেশ' ও 'প্রত্যাবর্তন' নাটক দুটি অভিনয় করেন। অভিনয়ে অংশ নেন—ইরাণী চক্রবর্তী, টুলটুল সরকার, প্রতিমা পাল, রাণী জোয়ারদার, অঞ্জলি সাহা, গৌরাঙ্গ সাহা, অমরেশ সরকার, ধীরেন বর্ধন, তরুণ সান্যাল।

ইউনাইটেড এণ্টারপ্রাইজ কর্তৃক নাট্যোৎসব

গত ৮, ৯, ১০ এপ্রিল দমদমে "ইউনাইটেড এণ্টারপ্রাইজ" তিন দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করেন। তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের প্রথমদিনে অংশ গ্রহণ করেন কানন দেবীর তত্ত্বাবধানে "মহিলা শিল্পী মহলের" "কবি"। এতে অংশ নেন বাংলা চিত্র ও মঞ্চের প্রখ্যাতনামা অভিনেত্রীবৃন্দ। দ্বিতীয় দিনে অংশ গ্রহণ করেন "বহুরূপী" গোষ্ঠী। এ'রা মঞ্চস্থ করেন কবিগুরু রচিত "রক্তকরবী"। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত প্রখ্যাত নাটক "সাজাহান"। এতে অংশ গ্রহণ করেন মহেন্দ্র গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, ঠাকুরদাস মিত্র, রবীন মজুমদার, গীতশ্রী দেবী ও সরযূবালা।

রামানুজ

গত ১৩ মার্চ গিরিশ নাট্য সংসদ শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'রামানুজ' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। রামায়ণের লক্ষ্মণ বর্জনের বেদনা-বিধুর কাহিনী এই নাটকের অন্তর্নিহিত বিষয়। শ্রীসতীশ দত্তের নির্দেশনা আকর্ষণীয়। অভিনয়াংশে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ধীরেন চক্রবর্তী, সুরেন পাল, সমীর ব্যানার্জী, দীপ্তেন সরকার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গৌরচন্দ্র পাল, শৈলেন ব্যানার্জী, সুব্রত রায়, সলিল নিয়োগী, নিমাই দে, দেবব্রত দাস, কেল্ট সিংহ ও শশাঙ্ক চ্যাটার্জী। ব্যবস্থাপনায় শ্রীশশাংককুমার মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পাহাড়ী ফুল

কাস্টমস রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কিছুদিন আগে 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'পাহাড়ী ফুল' নাটক পরিবেশন করেছেন। সমগ্র নাট্য-প্রযোজনাটি সেদিন আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছিলেন—নির্মল সেন, ভূপেন সেনগুপ্ত, দিলীপ ভট্টাচার্য, অমল বিশ্বাস, বিভূতি গঙ্গোপাধ্যায়, উৎপল দাশগুপ্ত, শ্যামল চন্দ্র, রাধাচরণ সাহা, প্রদ্যোৎ বসাক, প্রীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন মজুমদার, তৃপ্তি দাস, হিমানী গঙ্গোপাধ্যায়। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

'অ্যাণ্টনী কবিয়াল'-এর ৩০০তম স্মারক অভিনয় :

৪ঠা এপ্রিল মানিকতলার কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নান্দিক সম্প্রদায়ের সাফল্য-মণ্ডিত নাটক "অ্যাণ্টনী কবিয়াল"-এর তিনশততম স্মারক অভিনয় উৎসব পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীরের সভাপতিত্বে এবং কানন দেবীর প্রধান অতিথিত্বে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বহুদিন অনুপস্থিত থাকবার পরে এই রাত্রির অভিনয়ে জহর গাঙ্গুলী তাঁর "ভোলা ময়রা"র ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে দর্শকদের আনন্দবর্ধন করেন।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের 'পথের দাবী'

গত ১৩ই মার্চ সন্ধ্যায় "রংমহল" মঞ্চে পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রমোদ সংস্থা কলকাতা বিভাগের ৩য় বার্ষিক উৎসব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত। পরিশেষে সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" মঞ্চস্থ করা হয়। অভিনয়াংশে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন সর্বশ্রী সুনীল চক্রবর্তী, সন্তোষ দত্ত, রতন চট্টোপাধ্যায় ও বিজয় কুণ্ডু। অনান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেন সর্বশ্রী নীলকান্ত পাঠক, নিমাই ঘটক, গোষ্ঠ দাশ গৌর হাজরা, বিমল গাঙ্গুলী, অমিত রায় ও রাম দত্ত প্রভৃতি। স্ত্রীভূমিকায় শ্রীমতী শিপ্রা সাহার অভিনয় সকলের প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী যূথিকা ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী ছবি ঘোষ।

১০ম বার্ষিক বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন :

গেল ১১ই থেকে ১৪ই এপ্রিল, এই চারদিন ধরে চারটি সান্ধ্য অধিবেশনের মাধ্যমে বিশ্বরূপা নাট্যউন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত ১০ম বার্ষিক বঙ্গ নাট্যসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বরূপা থিয়েটার প্রাঙ্গণে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে 'যাত্রা নাটক', 'উদ্ভট নাটক', 'সমাজ পরিবর্তনে নাটকের দায়িত্ব আছে কি?' ইত্যাদি নানা বিষয়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগদান করেন ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিত ঘোষ, ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুধী প্রধান, মন্মথ রায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত দত্ত প্রভৃতি সুধীবৃন্দ।

অনামী প্রযোজিত 'প্রতিচ্ছবি'

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার 'অনামী' নাট্যগোষ্ঠী মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নীলোৎপল দে-র 'প্রতিচ্ছবি' নাটকটি অভিনয় করছেন। বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনে আঙ্গিকের আতিশয্যে নাট্যমোদীরা কিছুটা উত্যক্ত হয়ে উঠেছেন। বৈদ্যুতিক কৌশলে মঞ্চে বন্যা, খনি বিস্ফোরণ ইত্যাদি দেখিয়ে দর্শককে প্রলুব্ধ করা যায় কিন্তু প্রগতি থেকে যায় দূরে, মোটকথা, জীবনবোধ ও মানবিকতা এখন নাট্যকারকে বেশী চিন্তিত করে না। ঠিক সেই সময় আঙ্গিকবর্জনের সংকল্প নিয়ে কোনো নাট্যকার প্রয়াসী হলে তিনি সাধুবাদ পেতে পারেন। বর্তমান নাট্যকার 'প্রতিচ্ছবি' নাট্যাভিনয়ের নির্দেশকও। 'প্রতিচ্ছবি'র মুকুর একটি পুলিশ থানা। মফস্বলের কয়েকটি চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটকে। কেউ বেকারত্বের জ্বালায় স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে। কেউ পকেটমার, কেউ অসুখী দাম্পত্যজীবনের মাঝে স্ত্রীকে হত্যা করে পুলিশের কাছে বলে যে, তার স্ত্রী আত্মঘাতী, কেউ গুণ্ডা ও পতিতালয়ের দালাল—এদের নিয়েই পুলিশের জীবনযাত্রা। জীবনের আবৃত সত্য অনাবৃত হয়ে যায় এদের চোখের সামনে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে নানা ঘটনা ঘটে যায়, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। নাট্যকারের সংলাপরচনায় দক্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু পকেটমারকে দিয়ে বিবেকে খোঁচা দেওয়া বা গুণ্ডাকে দিয়ে সমাজের চরিত্র উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা মেলোড্রামার পরিচায়ক। শেষে, যেন হঠাৎ যবনিকা টানার তাড়ায়, কয়েকটি কোয়েনসিডেন্স নাটককে ব্যর্থতার দিকে নিয়েই গেছে। আর একটা কথা, আঙ্গিক প্রগতির অন্যতম লক্ষণ; তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার মধ্যে গৌরবের পরিচয় নেই—একথা কোন আধুনিক নাট্যকারের বিস্মৃত হওয়া অনুচিত।

অভিনয়াংশে সেকেণ্ড অফিসারের চরিত্রাভিনেতা বিশু চট্টোপাধ্যায়ের নাম প্রথমেই মনে আসে। ইনি নিঃসন্দেহে একজন শক্তিমান নট, বিশেষ করে তাঁর অতি-নাটকীয়তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি এবং মাত্রাজ্ঞান প্রশংসনীয়। লিটারেট কনস্টেবল-এর ভূমিকায় সুধাংশু চক্রবর্তী তাঁর টাইপ চরিত্রটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে

জাহমীর চিত্রে শশীকলা

ভুলেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে থার্ড অফিসার চরিত্রাভিনেতা নীলোৎপল দে, প্রফেসারের ভূমিকায় মন্টু গোস্বামী ও চম্পার ভূমিকায় রাণু রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। দলগত অভিনয় সুসংবদ্ধ।

সঙ্গীতাংশ দুর্বল, আলোক সম্পাতও রেখাপাত করে না।

শেষ থেকে শুরু

জুলজিক্যাল সার্ভে রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি রঙমহলে তাঁদের কণ্ঠ নাট্যোৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ করলেন "শেষ থেকে শুরু"। হাস্যরস দিয়ে ঢাকা করুণ এই নাটকটি উপস্থাপনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান নাটকের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীরা। নানা বিভিন্ন চরিত্র-চিত্রণে 'টীম ওয়ার্ক' এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে অনেকের দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। রমেন্দ্র মুন্সী, সন্তোষ দাস, সুকুমার ব্যানার্জি, আলপনা ব্যানার্জি, জীতেন দত্ত, সুরেন সিনহা, চিত্ত সাহা, শুভেন্দু সাহা, সুজিত চক্রবর্তী, রঞ্জিত বিশ্বাস, রঞ্জিত ভদ্র, গণেশ পাল, দীপেন চন্দ্র, কার্তিক খাসকেল, গুণীন সাহা ইত্যাদির নাম সুঅভিনীত চরিত্রের জন্য বিশেষভাবে মনে আসে।

"শৌভিক"-এর নতুন নাটক

খ্যাতনামা নাট্যগোষ্ঠী "শৌভিক" "একটি চিঠি" "নির্বাক প্রহরী" ও 'পাকেচক্রে' নাটক তিনটি অভিনয়ের পর তরুণ নাট্যকার ও পরিচালক নীলয় চৌধুরীর 'কান্না' নাটকটি নিয়ে জনসমক্ষে অবতীর্ণ হচ্ছে। নির্দেশনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন নীলয়

চৌধুরী এবং কার্তিক কুমার—বসন্ত কুমার। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন চিত্রা চ্যাটার্জি, দীপক চৌধুরী, মনোজ ভৌমিক, প্রণব চৌধুরী, সন্ধ্যা আঢ্য, তপন চৌধুরী, অজিত রায়, জয়ন্ত থ্যাকার, সঙ্গীত মিশ্র ও গণেশ দাস এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জয়ন্তী মুখার্জি (নৃত্য শিল্পী), পূর্ণিমা ব্যানার্জি।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, "কান্না" নাটকটির জন্য তিনখানি গান লিখেছেন শ্রীজয়েশ ব্যানার্জি কার্তিককুমারের সুরে। কণ্ঠ মেলাবেন বেতার শিল্পী বলরাম দাস, সুচিত্রা ভট্টাচার্য ও কুমারী কল্পনা চক্রবর্তী। আবহ-সংগীত ও যন্ত্রসংগীতে থাকবেন মথুরা দাস ও সঙ্গীৎ মিশ্র। আগামী মে মাসে এক বিশেষ প্রদর্শনীর পর থেকে নিয়মিত নাটকটির অভিনয় পরিবেশিত হবে।

পাটনায় বিশ্বনাট্য দিবস

ইণ্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের (ইউনেস্কো) বিহার শাখা 'বিহার আর্ট থিয়েটারে'র উদ্যোগে গত ২৭শে মার্চ পাটনায় মহাসমারোহে ৭ম বিশ্বনাট্য দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে যোগদান করেন নিউইয়র্ক সিটি কলেজের থিয়েটার আর্টসের অধ্যাপক ডাঃ জেমস্ হ্যাচ্। এই উপলক্ষে পাটনার আমেরিকান কালচারাল সেণ্টারে সকাল-বেলায় আর্থার মিলারের সুবিখ্যাত নটক 'ডেথ অফ সেলসম্যান' নাটকটির মঞ্চ-প্রযোজনা সম্পর্কে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। ডাঃ হ্যাচ্ এই নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে গভীর তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। আগামী ২০শে ও ২১শে এপ্রিল এই নাটকটি বিহার আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ইংরেজী ও বাংলায় অভিনীত হবে।

ডাঃ হ্যাচ 'কারেণ্ট ট্রেণ্ড ইন আমেরিকান থিয়েটার' সম্পর্কে একটি প্রাঞ্জল বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বের নাট্যআন্দোলনে আমেরিকান থিয়েটারের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। তারপর শুরু হয় থিয়েটার সেমিনার, এই সেমিনারে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এস বি মিশ্র। পাটনার বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতৃগণ এবং অগণিত নাট্যানুরাগি-বৃন্দ এই সেমিনারে উপস্থিত থাকেন। ডাঃ হ্যাচ সেমিনারের উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, আমেরিকায় ফিল্ম ও টি ভি'র অতিপ্রচারের ফলে মনে হয়েছিল একদিন যে সেখানকার থিয়েটার হলগুলো বুঝি বন্ধ করে দিতে হবে, কিন্তু আজ তার বিপরীত হয়েছে, থিয়েটার আমেরিকানদের জীবনে যেন একটি অত্যাবশ্যক সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিটি জায়গায় কমিউনিটি থিয়েটার গড়ে ওঠার ব্যাপারেই এই সত্য প্রমাণিত।

নাট্যপ্রযোজনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সন্তোষ সরকার, ডাঃ টি বি মুখার্জি, ডাঃ নীহারিকা ব্যানার্জি, এন এইচ ডোনাল্ডী, ডি কে মিত্র, শক্তি দাস এবং আরো অনেকে। সভাপতির ভাষণে বিচারপতি শ্রীমিশ্র বলেন, আজকের ক্লিন্ট মানুষকে থিয়েটারই পথ প্রদর্শন করতে পারবে। সেমিনারের শেষে ডাঃ হ্যাচ ও বিশিষ্ট অতিথিদের মডেলের দ্বারা বিহার আর্ট থিয়েটার আবিষ্কৃত 'প্যানো-রামিক স্টেজ' দেখানো হয় এবং আমেরিকান থিয়েটারের ওপরে কয়েকটি ডকুমেণ্টারী ফিল্ম দেখানো হয়।

জামসেদপুরে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

টেলকোস্থিত সবুজ কল্যাণ সংঘ আয়োজিত সাত দিন ব্যাপী ২য় বর্ষ একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় দশটি সংস্থা যোগদান করেন—বার্ড'স (বিষ্টুপুর), সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (জামসেদ-পুর), ইউনাইটেড সেণ্টার (পরশুডি), প্রান্তিক (টেলকো), রং-বেরং (টেলকো), মিলনী (বিষ্টুপুর), যাত্রিক (সিদগোড়া), পুনশ্চ (টি আর এফ কলোনী), নাটাদূত (টেলকো), সবুজ কল্যাণ সংঘ, মহিলা বিভাগ (টেলকো)।

প্রধান বিচারপতির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীঅজিত গংগোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ অভিনীত নাটকের প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন রং-বেরং (টেলকো) অভিনীত নাটক 'ঝি' ঝি' পোকার কান্না'। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন পুনশ্চ (টি আর এফ কলোনী) অভিনীত নাটক 'ইতিহাসের কাঠগড়ায়'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন 'যশপালের' ভূমিকায় শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত (ইতিহাসের কাঠগড়ায়)এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন 'রঞ্জনার' ভূমিকায় শ্রীমতী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় (বার্ড'স অভিনীত তাহার নাম'টি রঞ্জনা)। অভিনেতা অভিনেত্রীদের উৎসাহ দানের জন্য কয়েকটি বিশেষ পুরস্কার ও মানপত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রতিযোগিতার শেষ দিনে শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায় একটি মনোজ্ঞ ভাষণে নাটক সম্পর্কিত বহু বিষয়ে আলোকপাত করেন। শ্রীমতী সন্ধ্যা গঙ্গোপাধ্যায় (অজিতবাবুর স্ত্রী) পুরস্কার বিতরণ করেন।

'মেঘে ঢাকা তারা'

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (শ্যামবাজার) কাল-চারাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রযোজনায় সম্প্রতি 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি মঞ্চস্থ হোল 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। সংগ্রামক্লান্ত মানুষের সীমাহীন বিপর্যয় ও যন্ত্রণা যা এই নাটকটির মধ্যে ভাষা পেয়েছে, শিল্পী-দের সংঘবদ্ধ অভিনয়ে তাই যেন নিটোল হয়েছে অন্তরজোড়া কারুণ্যের স্তব্ধতায়। নাটকের অন্তর্নিহিত প্রাণধর্মের সংগে শিল্পীদের অনুভবের এই নিবিড় মিলন সেদিনকার নাট্য প্রযোজনাকে এক সমুন্নত মর্যাদা দিয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্পীদের অভিনয়ে নাট্যকাহিনী এগিয়েছে বেদনায় একটি সকরুণ মূর্ছনায়। নির্দেশনায় অজিত চট্টোপাধ্যায় অনেক মুহূর্তে স্বকীয় শিল্পচিন্তার নজীর রেখেছেন। অলোক বাগচীর গান ও রবীন পালের আবহসংগীত সৃষ্টি একটি সুক্ষ্ম ছন্দ এনেছে নাটকে।

প্রতিটি শিল্পীই প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। গীতা দে'র 'নীতা', লতিকা দাশগুপ্তের 'গীতা', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা', শচীন অধিকারীর 'শংকর', অশেষ ঘোষের 'সনৎ' উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য কয়েকটি চরিত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভি-নয় করেছেন মেঘনাথ বসু, মুরারী গোস্বামী, ভূপতি ভাটিয়া, প্রেম কাপুর, রঞ্জন মিত্র, দীপক ভট্টাচার্য, মনতোষ পাল, গৌর মিত্র, লক্ষ্মণ ঘোষ, প্রভা চৌধুরী।

চলতি চাকার ছন্দ

সম্প্রতি আই ই টি সি রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ অমরেশ ঘোষ রচিত 'চলতি চাকার ছন্দ' নাটকটি অভিনয় করে-ছেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নেন নাট্যকার স্বয়ং। সুঅভিনীত এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দেন—অমিয় ভট্টাচার্য, সত্য মৈত্র, তরুণ রায়, কমল দে, অশোক সেন-গুপ্ত, অজিত ঘোষ, অনিল পাল, সুনীল মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, জয়শ্রী কর।

সম্রাটের মৃত্যু

'বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র শিল্প-বৃন্দ সম্প্রতি 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি পরি-বেশন করেছেন নেতাজী সুভাষ ইন-স্টিটিউট মঞ্চে। অমিতাভ অধিকারী নির্দে-শিত এ নাটকের সামগ্রিক অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছে। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সীমাহীন জীবনযন্ত্রণার পটভূমিকায় রচিত এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন : নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্যামাপ্রসাদ চক্র-বর্তী, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ দে, অজিত ভট্টাচার্য, অমিতাভ অধিকারী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় চক্রবর্তী, নয়ন চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন মুখোপাধ্যায়, চিত্ত মজুমদার, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, সবিতা মিত্র, আলো মজুমদার।

কাঞ্চনরঙ্গ

সম্প্রতি বাড'স কোল রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ 'রঙমহল' মঞ্চে শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত ব্যঙ্গনাটক কাঞ্চনরঙ্গ অভিনয় করেছেন। প্রতিটি শিল্পীর প্রাণঢালা অভিনয়ে সৌখিন নাট্য-প্রযোজনাটি বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত হয়ে উঠেছিল।

'পাঁচু' ও 'তরলা' চরিত্রে কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় ও বীণা দেবী স্বচ্ছন্দ অভিনয় করে সবাইকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন রবীন গঙ্গোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব ভট্টাচার্য, অনিলকৃষ্ণ ঘোষাল, ডলি মুখোপাধ্যায়, সুজাতা চট্টোপাধ্যায়, মেনকা দাস। নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়।

কেরানীর জীবন

দুর্গাপুর প্রোজেক্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পিবৃন্দ সম্প্রতি 'বিশ্বরূপা' রঙ্গমঞ্চে 'কেরানীর জীবন' নাটকটি সার্থকভাবে পরিবেশন করেছেন। নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যাভরা জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির প্রেক্ষাপটে রচিত এই নাটকের কয়েকটি ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন—অলক ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবল আঢ্য, ভোলানাথ ঘোষ, সান্ত্বনা ঘোষ, সবিতা মুখোপাধ্যায়, পুতুল চক্রবর্তী ও লতিকা দাশগুপ্তা।

নীলার বুকে রক্ত

সম্প্রতি 'কিন্নর' নাট্যসংস্থার শিল্পিবৃন্দ অশোক চৌধুরীর নতুন নাটক 'নীলার বুকে রক্ত' অভিনয় করলেন 'শিশির মঞ্চে'। অপরাধমূলক ঘটনার পটভূমিকায় রচিত এ নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন রমেন মুখোপাধ্যায়। সুপ্রযোজিত এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নেন—প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, রবীন পাল, রমেশ মুখোপাধ্যায়, শংকর ভট্টাচার্য, সুবীর ভট্টাচার্য, রবীন চক্রবর্তী, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, মুকুল লাহিড়ী, মৃণাল মুখোপাধ্যায় ও ঋত্বিকা ভট্টাচার্য।

বিবিধ সংবাদ

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১০ই মার্চ ঝাউবাগান স্ট্রীটে 'বিচিত্রিতা'র শিল্পিবৃন্দ বসন্ত উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে 'প্রেম ও প্রকৃতি' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সঙ্গীতাংশে ছিলেন সর্বশ্রী মলয়া চক্রবর্তী, মীরা রুদ্র, আরতি বসু, মণিমালা দাশগুপ্ত, রমা ঘোষাল, গোপা সেন, কাকলি দাস, বিশাখা গুপ্ত, শ্রীলেখা মিত্র, সীমা দত্তগুপ্তা, প্রিয়ব্রত মুখোপাধ্যায়, বারীন সরকার, অনিল ভট্টাচার্য, অসিত ঘোষাল ও দীপ্তিকুমার মিত্র; আবৃত্তিতে সর্বশ্রী বাসবী মৈত্র ও প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত; যন্ত্রসংগীতে সর্বশ্রী সলিল মিত্র, রূপেন ঘোষ, অসিতকুমার ঘোষাল ও সুবীর রায়। সংগীত পরিচালনা করেন শ্রীমলয়া চক্রবর্তী

সোদপুর হাউজিং এস্টেটে নববর্ষ উৎসব

সোদপুর হাউজিং এস্টেটে তরুণ সংঘের পরিচালনায় গত ১লা বৈশাখ বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিকল্পিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মাধ্যমে যথারীতি "বর্ষ-বরণ" উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনাসহ পালিত হয়। এই উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলনেতাদের পরিচালনায় প্রভাত ফেরীতে যোগ দেওয়ার পর এস্টেটের সেন্ট্রাল পার্কে সমবেত হয়। পতাকা উত্তোলন ও অভিবাদন শেষে শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন। নববর্ষের সংকল্প পাঠ, দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের সমষ্টি ব্যায়াম, ডাম্বেল ব্যায়াম এবং ব্রতচারী প্রদর্শনী স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভূত আনন্দ দেয়। খড়দহ সারদামণি সংঘের বোনেদের ব্রতচারী প্রদর্শনীও এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত ফুটবল কোচ শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ। শ্রীঘোষ তরুণ সংঘের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করে বক্তৃতা করেন। এস্টেটের অধিবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর হয়।

বৈকালিক অনুষ্ঠানে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রই ভারতের উন্নতির পথ প্রশস্ত করতে পারে'—এই বিষয়ের ওপর এক মনোজ্ঞ বিতর্ক সভা অ্যাডভোকেট শ্রীরাধানন্দ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন বঙ্গীয় বিতর্ক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ। প্রস্তাবের পক্ষে নেতৃত্ব করেন শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত, বিরোধী দলের নেতৃত্ব করেন অধ্যাপক প্রশান্ত দাশগুপ্ত। বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপনায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হন অধ্যাপক বিমলানন্দ বারি, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র নাথ প্রমুখেরা।

চারঘাটে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর জন্মস্থান চারঘাটে যোগেশ সংস্কৃতি কলাকেন্দ্রের উদ্যোগে একটি পক্ষকালব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে: ৩০শে চৈত্র যোগেশচন্দ্রের জন্ম দিন থেকে ২৫শে বৈশাখ পর্যন্ত নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। কলকাতার প্রখ্যাত শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করছেন। এক পক্ষকাল ধরে তর্জা জারি, কীর্তন, বাউল, পল্লীগীতি, যাত্রা ও থিয়েটার অনুষ্ঠিত হবে।

অর্ঘ্য

রবীন্দ্রসদনে ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল—অমলাশঙ্কর পরিচালিত উদয়শঙ্কর কালচারাল সেণ্টারের নৃত্যশিক্ষার্থীদের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। মাত্র এক বছর আগে এই একই মঞ্চে "পরিচয়" অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদের যে উজ্জ্বল 'পরিচয়' ব্যক্ত হয়েছিল তাই যেন দৃঢ়তর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রী অথবা কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পীর অভাব নেই। কিন্তু দেখবার উপযুক্ত নৃত্যানুষ্ঠানের একান্তই অভাব। এ-অভাব অন্ততঃ এই প্রতিষ্ঠানের সুশিক্ষিত ভাবী শিল্পীর দল পূরণ করে চলেছেন তাঁদের ক্রমবর্ধমান অনুষ্ঠান সংখ্যায় একথা অনস্বীকার্য।

প্রথম অনুষ্ঠান শঙ্করদম্পতির পুত্র আনন্দশঙ্করের সেতার। রাগ মালকোষ। সঙ্গতে ছিলেন বেনারসের সুখ্যাত তবলিয়া পন্ডিত সারদা সহায়। বেনারসে পন্ডিত লালমণি মিশ্রের কাছে চার বছর শিক্ষার পর কলকাতার মঞ্চে এই তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। মাত্র চার বছরের শিক্ষার্থীর কাছে যেটুকু আশা করা যায় তারচেয়ে কিছু বেশীই পাওয়া গেল আনন্দশঙ্করের কাছে। স্বচ্ছ রাগরূপায়ণ ছাড়াও লয়ের ওপর দখল এবং আত্মবিশ্বাস সত্যিকারের প্রশংসাযোগ্য।

কথাকলি ও উদয়শঙ্করী ধারার যুগল-সৃষ্টি "অর্ঘ্য"। কতকটা রঙ্গপ্রণামের মতই। "অর্ঘ্য" দিয়ে শুরু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। "অর্ঘ্য" ছাড়াও "সারী" "পান্থাদি" নৃত্যে শুদ্ধ "কথাকলি" নৃত্যের আঙ্গিকেই পরিবেশিত। ভারতীয় নৃত্য-সংস্কৃতিতে "কথাকলির" একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই নৃত্যের উদ্ভাবন-কর্তা সতের শতকের ভিরা কেরালা ভামা। মহাকাব্য এবং অন্যান্য লোককাব্যের বীরগাথা এই নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশিত হোত। উপেক্ষিত এবং প্রায়লুপ্ত এই নৃত্যের বিপুল নাটকীয় সম্ভাবনা প্রথম জীবনে উদয়শঙ্করের চিত্তকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁর ব্যালেতে কথাকলির প্রভাবই সমধিক। অতএব কথাকলির প্রতি জোর দিয়ে শ্রীমতী শঙ্কর উদয়শঙ্করের ভাব-কল্পনার প্রতিই সম্ভ্রম জ্ঞাপন করেছেন।

"সারী" এই অনুষ্ঠানসূচীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। রমণীশিল্পীদের 'লাস্য' নৃত্য। প্রতিটি চাউনীর অভিব্যক্তি বিচিত্র এবং আটমাত্রার মধ্যে বিভিন্ন ছন্দের পদনিক্ষেপ আকর্ষণীয় দক্ষতায় পরিবেশন করেছেন প্রতিটি শিল্পী। চমক, আনন্দ ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে এই নৃত্যে কেন্দ্রস্থলের শিল্পী শ্রীমতী শঙ্করের মার্কিনী শিষ্যা স্যালী ট্র্যামিল। রস ও ভাবপ্রকাশের নৈপুণ্যে একে ভারতীয় বলে ভ্রম হচ্ছিল। শ্রীমতী স্যালীর একক নৃত্য 'প্রতীচী'। প্রতীচ্যের এই নৃত্যের অন্তর্ভুক্তি অনুষ্ঠান-রচয়িতার ব্যাপক ও উদার দৃষ্টির পরিচয়বাহী। সজ্জারচনায় বর্ণসমন্বয় ও অলঙ্কারের বাহার নৃত্যকেও অলঙ্কৃত করেছে।

'ভরতনাট্যম' অঙ্গের 'জাতিঃস্বরম' আগের চেয়ে অনেক পরিশীলিত।

গোপিনীদের সমব্যথার সঙ্গতে শ্রীরাধার আনন্দ ও বেদনার সুন্দর ছবি মণিপুরী নৃত্য।

"আনন্দ" নৃত্যে শিশুশিল্পীদের আনন্দের উচ্ছল প্রকাশ সারা প্রেক্ষাগৃহকে আনন্দমুখর করে তুলেছে।

তবলা-তরঙ্গে কমলেশ মিত্রের "আহিরী ভৈরব"এ সঙ্গীতময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে দেরী হয়নি।

'নমো যন্ত্র' কবিগুরুর ভাবধারার পট-ভূমিকায় উদয়শঙ্করের নৃত্যব্যঞ্জনার এক অপূর্ব আলেখ্য। অহঙ্কারদৃপ্ত শক্তি ও নিরুপায় বেদনার নিষ্ফল কান্নার এক শিল্পসুন্দর রূপ এই নৃত্যে সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে।

জাভেরী সিস্টার্সের মণিপুরী নৃত্য

সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টো-পাধ্যায় গঠিত ওরিয়েণ্ট আর্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম উপহার জাভেরী সিস্টারসের মণিপুরী নৃত্য মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ হয়। উৎসব সূচনা করেন স্বয়ং উদয়শঙ্কর। পৌরোহিত্যকালে শ্রীসুকুমারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে আবেগগভীর কণ্ঠে সংগঠক-দ্বয়ের এই মহৎ প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "ইম্প্রেসারিও" বলতে যা বোঝায় তা এদেশে নেই বললেই চলে। স্বর্গত হরেন ঘোষই তাঁর ঐকান্তিক শিল্পানুরাগের তাগিদে এই প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন। তখন ভারতের নৃত্যগীতকলার এক উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ রসিকমনকে উদ্বেলিত করে আপন দেশের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ শিল্প-কলার প্রতি তাঁদের সচেতন করেন। তারপর বহুকাল দীর্ঘ নীরবতা। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কিছু কিছু নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান দেখা গেলেও ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পীদের সাধনা ও শিল্পচিন্তার নমুনা পেশ করবার মত তেমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। এদিক দিয়ে বিচার করলে ওরিয়েণ্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ সাধুবাদ ও স্বাগত আহ্বানের দাবী রাখে। সাধারণত দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরেই শিল্পীদের আনাগোনা, উপস্থাপনের কাজ চলে। কিন্তু গ্রামান্তরেও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শিল্পকে উজ্জীবিত রাখতে হলে অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামেও এর রসমাধুর্য ছড়িয়ে দিতে হবে। সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টো-পাধ্যায় তাঁদের ভাষণে এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল।

এর পর শুরু হয় বর্ণসমুজ্জ্বল ভাবসমৃদ্ধ মণিপুরী নৃত্যের অনুষ্ঠান।

মণিপুর, কৃত্রিম জগতের থেকে অনেক দূরে নির্জন পাহাড়ের সহেলী দেশ। মাথার ওপর উদারবিস্তৃত নীলাকাশ, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়। প্রকৃতির কাছে পাওয়া গভীর বোধের সহজ আলো এদের হৃদয়ে অনায়াসব্যাপ্ত। তাই বুঝি অনুভব এদের এমন অতলসঞ্চারী, প্রকাশব্যঞ্জনা এমন সাবলীল, নয়নাভিরাম। শ্রীমতী নয়না, রঞ্জনা, দর্শনা-শান্তি জাভেরী ভগ্নীদের মণিপুরী নৃত্য ভারতীয় নৃত্যকলার এক ললিতমধুর রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাল।

ধর্ম বা আধ্যাত্মিকবোধ ভারতীয় নৃত্যে ও সঙ্গীতের উৎস। মণিপুরের অধিবাসীরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী, তাই মধুর রসনায়ক মাধবের উপাসনাই এঁদের ধ্যানে, জ্ঞানে, শিল্পে, উৎসবে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবনে মাধবের চিন্তা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক উৎসবের দিনেও আপনাপন সাধনালব্ধ শুদ্ধ চিত্তের নির্মল অর্ঘ্য মন্দিরপ্রাঙ্গনে নৃত্যের ভাষায় এঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করেন। রাসের দিনে রাসলীলা, দোলের দিনে হোলিখেলা এদের উৎসবের অঙ্গ। ধর্ম ও উৎসব এঁদের কাছে এক হয়ে গেছে।

স্তব-মিলন, ললিতধাতা নর্তন, নাটোয়ারা বর্ণন মৃদঙ্গ বাদন, অভিসারিকা, শতঙ্গ নর্তন, মঞ্জুরা ইত্যাদি মণিপুরী আঙ্গিকের বিভিন্ন নৃত্যে মহানায়িকা শ্রীরাধা ও গোপিনীবৃন্দের মিলনের আকুতি, বিরহ-বেদনা, মান-অভিমান, হাস্যলাস্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা। এলায়িত লীলায়িত সুষমায়, দেহভঙ্গির অনিন্দ্য-সুন্দর লাবণ্যে বর্ণসমুজ্জ্বল সজ্জাসমারোহে মধুরের মাধবারতিতে এঁরা যেন মেতে উঠেছিলেন। সংযমের বাঁধনেই বুঝি অসংযত উচ্ছ্বাসের আকুলতা অমন করে ফুটে উঠতে পারে। সাদঙ্গনর্ত। কখনও সাত, কখনও বার, কখনও তিন, কখনও ছয় মাত্রার বিভিন্ন তালফেরতায়—পদক্ষেপের মাধুর্য ও তারুণ্যের উচ্ছল আনন্দে মনকে ভরিয়ে তোলে।

নৃত্যসঙ্গতে বেজেছে বাঁশী, বেজেছে মৃদঙ্গ, বেহালা, সরোদ—কিন্তু কীর্তনাশ্রয়ী মণিপুরী নৃত্যে শ্রীখোলের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে সে কথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন সঙ্গীতশিল্পীরা। বাদ্যের তুলনায় কণ্ঠসঙ্গীত দুর্বল। আর এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান অতিথিশিল্পী কমলেশ মিত্রের 'তবলাতরঙ্গে' 'কিরবাণী' রাগ।

এই সুন্দর অনুষ্ঠানটির জন্য ওরিয়েণ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও মিহির চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ।

—চিত্রাঙ্গদা

ক্রিকেটার আইভ্যান

কমল ভট্টাচার্য

চৌরঙ্গীর মোড়। চৈত্রমাসের দুপুর বেলা। রাস্তায় লোকজন কম। কিন্তু লোকজন কম হলে কি হবে সার সার বাস ও মোটরগাড়িতে রাস্তা জ্যাম হয়ে আছে। পার হয় কার সাধ্য। ট্রাফিক পুলিশের হাত আর নামে না। বিরক্ত হলেই এগিয়ে পড়লাম। হঠাৎ একটা কাল রংয়ের অ্যামবাসাডার গাড়ির হর্ন বেজে উঠল বেশ জোরে। চমকে সরে দাঁড়ালাম। গাড়ির চালক মুখ বাড়িয়ে এক মধুর সম্ভাষণে নিকট আত্মীয়তা জ্ঞাপন করলো। গাড়ির চালককে দেখে হেসে ফেললাম। আর হাত তুলে ঘুঁসি পাকালাম। প্রত্যুত্তরে সেও গলা বাড়িয়ে বুড়ো আঙুল ওপরের দিকে তুলে একচোখ টিপে বলল— "এই কমলা।" মুখেচোখে তার দুষ্টুমির হাসি। গাড়িটা গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। মানুষটাকে চিনতে কষ্ট হয়নি।" সহজে তাকে ভোলবার নয়। বিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেও যা দেখেছিলাম আজও তাই। একটুও বদলায়নি।

দিন পঁচিশ আগেকার কথা বলছি। চৌরঙ্গীর মোড়ে সেদিনের সেই গাড়ির চালক আইভ্যান সুরিটা। দেশের প্রশাসনিক ব্যাপারে তার খুব নামডাক। কিন্তু এইটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। অন্য পরিচয়ে তিনি একজন জাত খেলোয়াড়। সাতাশ-আটাশ বছর আগে তিনি ছিলেন কলকাতার মাঠে অন্যতম সেরা উইকেট কীপার। এটা আমার কথা নয়। তখনকার ক্রিকেট সমালোচকরাই বলতেন, আইভ্যানের সমজুটি উইকেট কীপার সারা ভারতেও ছিল না। তবে একথা কোন পাঁজিপুঁথিতে লেখা নেই। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ সালের কলকাতার ক্রীড়া-রসিকরা অবশ্যই আইভ্যানকে চিনবেন। তাঁর উইকেটকীপিং নিয়ে আজও সেদিনের লোকেরা কথা পাড়েন। বলেন—আইভ্যান যেন দলের আধখানা শক্তি দখল করে থাকত। আইভ্যানের নিপুণতার গুণেই কমল ভট্টাচার্য, সুঁটে ব্যানার্জির বোলিং পারদর্শিতা বাড়ত। সুঁটে ব্যানার্জির ফাস্ট বোলিংয়েও তিনি উইকেটের ওপর দাঁড়িয়ে উইকেট কীপিং করতেন। এ দুঃসাহস ক'জনের থাকে! চেহারারই বা বাহার কি! যেন রাজপুত্তুর। চোখদুটো নীল। মাথার চুলগুলো কাল কুচকুচে। মোটাসোটা চেহারা হলে কি হবে ক্যাচ ধরতে মাটিতে আছাড় খেতে কসুর করতেন না। সেদিনের লোকেরা একথাও জানতেন আইভ্যান বাংলায় কথা বলত। তাঁর ভাঙা বাংলার গল্প বেশ জমত। শুধু কি তাই, তাঁরা আরও বলেন—আইভ্যান নাকি খেলার দিনে মালি একাদশীর কাছ থেকে মা কালীর প্রসাদ চেয়ে খেত। আর আলতো করে কপালে সিন্দুরের টিপ পরত। হাতজোড় করে প্রণাম করে বলত— হে মা কালী ম্যাচ জেতাও। স্পোর্টিং ইউনিয়নের কার্তিক-গণেশের দাপট সহ্য হয় না। কার্তিক-গণেশ বসুর স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলই ছিল সেদিনের এরিয়ানের মস্ত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। দলকে জেতাবার জন্যেই তাই তাঁর এই আকুল প্রার্থনা। আফশোস্ এই যে উনচল্লিশের যুদ্ধ না বাঁধলে আইভ্যান ক্রিকেট মাঠ তোলপাড় করে দিতেন। যুদ্ধই আইভ্যানের খেলা ছাড়াল। মাঠের গুজব, পেটে বুলেট ঢুকলে কি আর কেউ খেলতে পারে। বেঁচেছে এই কত না।

এত ক্লাব থাকতে আইভ্যান সুরিটা এরিয়ান ক্লাবকেই বেছে নিলেন কেন? যেখানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টিমগুলো আইভ্যানকে লুফে নিতে পারত। সেই কথাই বলি।

ইউনিভারসিটি খেলায় আইভ্যানের সঙ্গে সুঁটে ব্যানার্জির খুব হৃদ্যতা হয়। গলায় গলায় বন্ধুত্ব আর কি। বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এরিয়ান ক্লাবে নিয়ে আসেন সুঁটে ব্যানার্জি। আইভ্যানের চোখ ফুটে যায় ক্লাবের হালচাল দেখে। ক্লাবের কিছু নেই—একমাত্র ক্রিকেট খেলা ছাড়া। ক্রিকেট পাগল সবাই। ধীরে ধীরে বন্ধু সুঁটের কাছে আইভ্যান সবকথা জানতে পারে। কন্টেসিন্টে ক্লাব চলে। 'স্যারে'র মন্ত্রে দীক্ষিত তারা। স্যার দুখীরাম মজুমদারের অসম্ভব কীর্তি-কলাপের কথা শুনে আইভ্যান স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বুঝতে কষ্ট হয় না এই ক্লাবটি অন্যান্য ক্লাব থেকে বেশ স্বতন্ত্র। এদের ক্ষমতা আছে। ক্রিকেটের শিষ্টাচারও তারা জানে। তাই আইভ্যান বন্ধুর সঙ্গে হাত মেলাল। এরিয়ান ক্লাবে খেলার ইচ্ছা জানাল। সুঁটে ব্যানার্জি বন্ধু আইভ্যানকে হাত ধরে নিয়ে গেল ক্লাবের সেক্রেটারী বিচে মিত্তিরের কাছে। সেক্রেটারীর হাবভাব দেখে আইভ্যান খুব খুশী। সেক্রেটারীর প্রশ্ন ছিল : 'এরিয়ান ক্লাব আপনার ভাল লেগেছে।' উত্তরে আইভ্যান বলেন— 'খুব।' 'কারণ।' আইভ্যান জবাব দেন—'আমি সত্যিকারের একটি দলে খেলতে চাই। যে দলে সুঁটে ব্যানার্জি আছে, আছে সুশীল বোস, কমল ভট্টাচার্য, হীরেন সাধুর মত বিচক্ষণ খেলোয়াড়। আমি এ দলে খেললে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'ফ্রেন্ড' বলে সবাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল আইভ্যান। কথা কও। গল্প কর। আমি যে তোমাদেরই একজন। আব্দার জুড়ল, বাংলা শেখাও। ঘরে নিয়ে চল। তোমাদের ঘরবাড়ি দেখব।

ক্লাব সেক্রেটারী বিচে মিত্তির খেলার আগের দিন নিজের বাড়িতে খেলোয়াড়দের এনে রাখতেন। উদ্দেশ্য টিম স্পিরিট বাড়ান। পাশেই আমার বাড়ি। আইভ্যান ছুটে এল আমার বাড়িতে। ব্রাহ্মণের বাড়িতে আচার-বিচার যায় কি! মা ব্যাপার দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। কিন্তু আইভ্যানকে দেখে সব ভুলে গেলেন। আইভ্যানের মুখে 'মা' ডাক শুনে আরও গলে পড়লেন। আব্দার বাড়ল— ভাত খাব, যা আছে তাই খাব। ভাত, শুক্তে, ডাঁটার চচ্চড়ি খেয়ে তবে আইভ্যান ছাড়ল।

ক্লাবের খেলোয়াড় রমেন চ্যাটার্জি'র (প্যাগি) বিয়ে। খেলোয়াড়েরা সবাই নিমন্ত্রণ পেল। নিমন্ত্রণে আইভ্যান সুরিটাও বাদ পড়েনি। নিমন্ত্রণ চিঠি পাওয়া আর জলপাইগুড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা সহজ কথা নয়। কন্যাপক্ষ অবাক হলেন আইভ্যান সুরিটাকে দেখে। বরপক্ষ আইভ্যান বাঙালী সাজ সেজেছে। ধুতি চাদর আর পায়ে নাগরা জুতো। তার বেশ দেখে কেউ সেদিন চোখ ফেরাতে পারেনি।

মাঠে খেলার সময়েও তাই। বল ধরা, স্ট্যাম্প করা, আছাড় খেয়ে দুরূহ ক্যাচ ধরা সবকিছুর মধ্যে আইভ্যানের একটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। প্রতিটি ম্যাচই ছিল তার কাছে গুরুত্বে সমান। নির্ভরযোগ্য উইকেট কীপার যে ম্যাচ জেতাতে পারে সেকথা আইভ্যানের খেলা দেখে অকপটে স্বীকার করেছিলাম। বলতে দ্বিধা নেই, আইভ্যানের ক্রীড়াচাতুর্য গুণেই আমার বোলিং সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। দলকে জেতাবার জন্যে আইভ্যানের মরণপণ লড়াই ছিল দেখবার মত। বলের দারুণ আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়েও তিনি মাঠ ছেড়ে যাননি। নিজের প্রতি এই আত্মবিশ্বাস সে কখনও হারায়নি। বরং একথায় নিজেকে গর্বিত বোধ করত। দলের প্রতি একনিষ্ঠ ছিল বলেই সে কখনও হারকে সহজে স্বীকার করত না। জ্বর গায়ে নিয়ে মাঠে হাজির হয়েছে। নিজে অপারগ সে কথা জানাতে। বদলে আমার ছেটভাই নির্মলের হাতে উইকেট কীপিং দেওয়া হোক এই অনুরোধ সবাইকে জানায়। বলে নির্মলের ক্লাবের প্রতি ভালবাসা প্রচুর।

দলের জয় সুনিশ্চিত করতে আইভ্যান 'নো বলে' রান করতে গিয়ে রান আউট হল। 'নো' বলের এক রানেই জিত হত উন্মাদনার বশে সেকথা আর খেয়াল হয়নি। সেদিন লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারেনি। ব্যাট চালিয়ে খেলতে অভ্যস্থ আইভ্যান। খেলতে নামতো শেষের দিকে। কিন্তু প্রয়োজনে শক্ত হাল ধরতে কসুর করতো না সে। যখন যে অবস্থায় হোক আইভ্যান সবসময়ে রাজী ব্যাটিং করতে। না সে বলতো না, কোন অবস্থাতেই নয়।

রাজপুতানা দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে যাব সেকথা শুনে আইভ্যান ছুটে এল। বললে—'কমলা খুব খুশী হয়েছি রে।' একটু ভেবে নিয়ে বলল—'দ্যাখ তোকে খুব চালু হতে হবে। সেখানে গিয়ে কি বেকুব বনবি? তোকে ত জানি—।' আইভ্যান পিঠে একটা কিল মেরে ফিক ফিক করে হেসে উঠল। লজ্জায় রাঙিয়ে উঠলাম আইভ্যানের কথা শুনে। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললাম—'আমায় কি করতে বলছিস্।' কিছু না। মাত্র দু সপ্তাহ বাকি। ওতেই হবে। তুই শালা আজ থেকে রোজ আমার সঙ্গে ঘুরবি। ঠিক তো—প্রমিস্।' আইভ্যান হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে

ধরল। বললাম—'প্রমিস'। 'ব্যস সব ঠিক হয়ে যাবে।'—আশ্বাস দিয়ে আইভ্যান ফিরে গেল।

দু সপ্তাহ আর কতটুকু সময়। কিন্তু আইভ্যান ঐ সময়ের মধ্যেই আমাকে একটা খাঁটি সাহেব বানিয়ে ছাড়ল। কথা বলা, সম্বোধন করা, বিদায় নেওয়া প্রভৃতি কায়দা-গুলি আইভ্যান হাতেনাতে শেখাল। শুধু কি তাই, হোটেল-রেস্তোরায় নিয়ে গিয়ে হালচাল শেখাল। লাঞ্চ ও ডিনার টেবিলের যাবতীয় আদব-কায়দাও সে শিখিয়েছিল। বলত—"আমার ক্লাবের ছেলে বিদেশে গিয়ে ঠকবে এ কিছুতেই সহ্য করব না।" চুপিচুপি বলত—"কমলা, আমার কথাগুলো ডেপোমি লাগছে বটে তবে একথাও বলে রাখলাম ভাল খেললেই বড় ক্রিকেটার হওয়া যায় না। ক্রিকেটের জাত আলাদা। ক্রিকেট হল লর্ডস গেম।" এবার তবু বলার মত কিছু পেলাম—বললাম : "লর্ডস সাজবার ক্ষমতা আমাদের কোথায়?" আইভ্যান তেড়ে উঠে বলল : "আদবকায়দা শিখতে কি পয়সা লাগে। তবে হ্যাঁ, সাজপোষাক করতে পয়সা লাগে বৈকি!" মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আইভান বলল : "স্বীকার করি সাজপোষাকে খরচ আছে। তবে তুই সব প্যারিস।" কথাটা বলতে গিয়ে আইভ্যান হেসে গড়াগড়ি দিল। ইঙ্গিতটা কিসের সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তাই আমিও না হেসে পারলাম না। আইভ্যান কথাটা বলেই ছাড়ল। বলল "ধন্য ক্রিকেটার তুই বাবা। বেঁচে থাক তোর মার পুজোর ফল। আর তোর গরম ঘটি দিয়ে ইস্ত্রী করা জামা প্যান্ট। তার ঠেলাই সামলায় কে?'

এমন বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী ক'জনের ভাগ্যে জোটে? হয়তো অনেকের জীবনে আসে কিন্তু আমার জীবনের দু'একজনের মধ্যে আইভ্যান ছিল একজন। দিন পঁচিশ আগে, জনবহুল চৌরঙ্গীর মোড়ে যখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তখন যদি জানতে পারতাম এই দেখাই শেষ দেখা, কোনদিন আর তার সেই আদরের সম্বোধন শুনতে পাব না—তাহলে সেই মুহূর্তে অনেক কথার ফাঁকে অন্ততঃ এই কটি কথা বলতাম, 'আইভ্যান তোমার ঋণ জীবনে ভুলতে পারবো না।'

খেলাধুলা

দর্শক

ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা

কলকাতার ইডেন উদ্যানে এন সি সি'র ইনডোর স্টেডিয়ামে ইস্ট ইন্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। ১৯৬৮ সালের এই প্রতিযোগিতায় সর্ব-ভারতীয় পাঁচজন খেলোয়াড়—দীনেশ খান্না, সুরেশ গোয়েল, দীপু ঘোষ, রমেন ঘোষ এবং সতীশ ভাটিয়া অংশ গ্রহণ করে-ছিলেন। এই আসরেই এই পাঁচজনের মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং নিউ-জিল্যাণ্ডের আমন্ত্রণমূলক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা পরীক্ষা করে ঘোষণা করা হয় যে, কোন খেলোয়াড়ই উত্তীর্ণ হ'তে পারেননি। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, ভারতীয় খেলোয়াড়দের যাতায়াত, বাসস্থান এবং খাওয়া-দাওয়ার দায়দায়িত্ব আমন্ত্রণকারী দেশগুলিই নিয়েছিল।

আলোচ্য প্রতিযোগিতায় দীপু ঘোষ পুরুষদের সিংগলস এবং ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে 'দ্বিমুকুট' সম্মান পেয়েছেন। একটানা চারবার সিংগলসের ফাইনালে খেলে তাঁর এই প্রথম জয়। এবারের ফাই-নালে তিনি ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েন্টে দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করে পূর্ব পরাজয়ের (১৯৬৬ সালের ফাইনালে) প্রতিশোধ নিয়েছেন। প্রথম খেলাটির নিষ্পত্তি হয় ১৩ মিনিটে এবং দ্বিতীয় খেলাটির ১০ মিনিটে। প্রথম খেলার বিভিন্ন সময়ে দীপু ঘোষ এইভাবে এগিয়ে ছিলেন ৯—১, ১৩—৫ ও ১৪—১১ পয়েন্টে। দ্বিতীয় খেলার এক সময়ে দেখা গেল দীপু ঘোষ বিরাট ব্যবধানে (১৩—১ পয়েন্টে) এগিয়ে আছেন। খেলোয়াড়দের যোগ্যতার ক্রমপর্যায় তালিকায় দীপু ঘোষের স্থান ছিল ২য় এবং খান্নার ৩য়। দীপু ঘোষের কাছে খান্নার পরাজয় এই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় তিনি দুবার পরাজিত হয়েছেন। দীনেশ খান্না এক সময়ে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ছিলেন।

সিংগলসের সেমি-ফাইনালে দীনেশ খান্না ১৫—৮ ও ১৮—১৫ পয়েন্টে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান এবং ১নং বাছাই সুরেশ গোয়েলকে পরাজিত করেছিলেন। অপর দিকের সেমিফাইনালে দীপু ঘোষ ১৫—১১ ও ১৫—৫ পয়েন্টে তাঁরই ভাই রমেন ঘোষকে পরাজিত করেন।

ডাবলসের ফাইনালে জয়ী হন গত তিন বছরের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষ।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলসে বিজয়ীর পুরস্কার

ফাইনালের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

পুরুষদের সিংগলস : দীপু ঘোষ ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েন্টে দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েন্টে সুরেশ গোয়েল এবং সি ডি দেওরসকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী দীপা চ্যাটার্জি এবং সতীশ ভাটিয়া ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েন্টে কুমারী তুলসী ব্যানার্জি এবং অনিল সোন্ধীকে পরাজিত করেন।

প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ

১৯৬৭-৬৮ সালের প্রথম বিভাগের ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতার নক আউট পর্যায়ের ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথম ইনিংসের রানে অগ্রগামী হওয়ার সূত্রে ইস্টার্ণ রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে তৃতীয়বার মেহেরা ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরেই (১৯৫৩-৫৪) মোহনবাগানের সঙ্গে যুগ্ম-বিজয়ী হয়। একক দল হিসাবে স্পোর্টিং ইউনিয়ন লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ২ বার ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে। স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের এই লীগ বিজয়ের ফলে মোহনবাগান দলের একটানা পাঁচবার লীগ জয়ের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হল। এর জন্য এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল দর্শকই দায়ী। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য, মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের কোয়ার্টার-ফাইনাল খেলার দ্বিতীয় দিনে মোহন-বাগানের বিপক্ষে আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে একদল দর্শক মাঠে নেমে পড়ে আম্পায়ারের সঙ্গে যে অশোভন আচ-রণ করেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন। তখন খেলার ফলাফল ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের প্রথম ইনিংসের
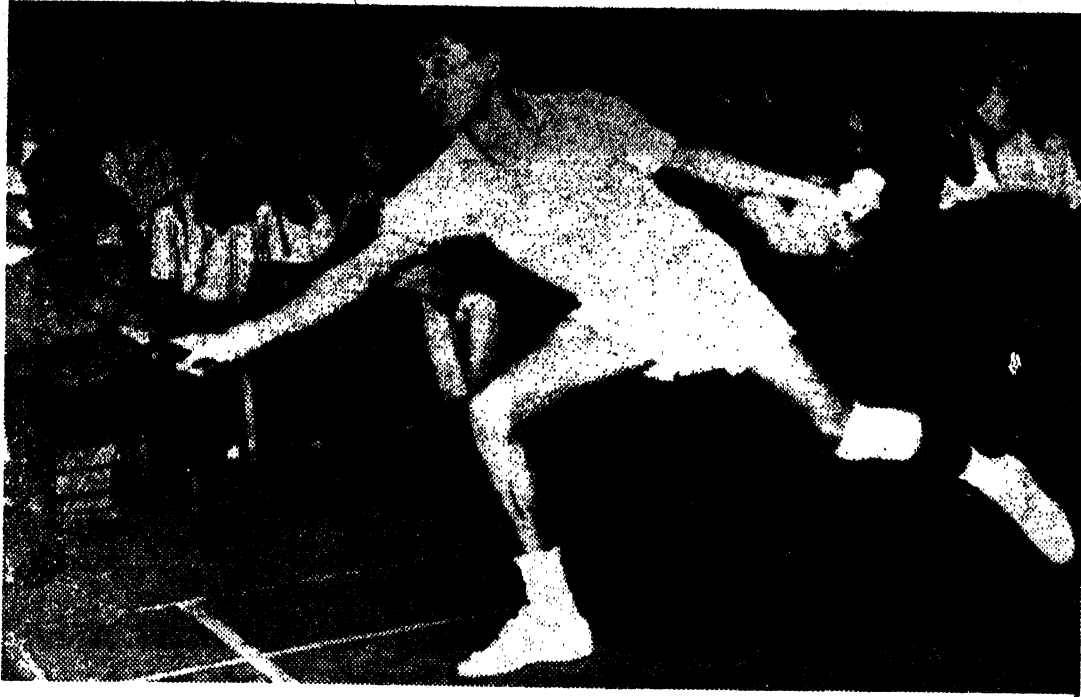
ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস বিজয়ী দীপু ঘোষ।

...১০ রানের (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ...উত্তরে মোহনবাগান দলের এক উইকেট ...পড়ে ৩ রান।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন বনাম ইস্টার্ণ ...রলওয়ে দলের ফাইনাল খেলার প্রথম দিনে ...স্টার্ণ রেল দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ...৭৮ রান সংগ্রহ করেছিল। দ্বিতীয় দিনে ...-পানের ২০ মিনিট পর ২৯৯ রানের ...াথায় রেল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ...খেলার বাকি ৭৫ মিনিট সময়ে স্পোর্টিং ...উনিয়ন ২১ রান (কোন উইকেট না পড়ে) ...সংগ্রহ করেছিল।

তৃতীয় দিনে স্পোর্টিং ইউনিয়নের ...ত্র ২টো উইকেট পড়ে ২৬৭ রান ...াঁড়ায়। জয়লাভের জন্য তখন তাদের মাত্র ...আর ৩৩ রানের প্রয়োজন হয়, হাতে জমা ...থাকে ৮টা উইকেট। তৃতীয় উইকেটের ...জুটিতে পঙ্কজ রায় এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ...অম্বর রায় ২৪৯ মিনিটের খেলায় ১৯১ ...রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। ...পঙ্কজ রায় তাঁর নট আউট ১০৫ রানে ...টা বাউন্ডারী করেন। অম্বর রায়ের ...ট আউট ৮১ রানে ৯টা বাউন্ডারী ছিল।

চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনের ৫০ মিনিটে ...স্পোর্টিং ইউনিয়ন জয়লাভের প্রয়োজনীয় ...৩০০ রান পূর্ণ করে (৩ উইকেটে) প্রথম ...ইনিংসের খেলায় অগ্রগামী হওয়ার সূত্রে ...লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। আবার তাদের ৭ ...উইকেটে জয়ী বলা যায়। তৃতীয় উইকেটের ...জুটিতে অম্বর রায় (৯১ রান) এবং পঙ্কজ ...রায় (নট আউট ১২৫ রান) দলের ২০৩ ...রান সংগ্রহ করেছিলেন।

পূর্ব বিজয়ী

১৯৫৩-৫৪ মোহনবাগান এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৫৪-৫৫ রাজস্থান
১৯৫৫-৫৬ কালীঘাট
১৯৫৬-৫৭ কালীঘাট
১৯৫৭-৫৮ স্পোর্টিং ইউনিয়ন
১৯৫৮-৫৯ এলবার্ট স্পোর্টিং
১৯৫৯-৬০ মোহনবাগান
১৯৬০-৬১ মোহনবাগান
১৯৬১-৬২ কালীঘাট
১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৬-৬৭ মোহনবাগান

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

গত সপ্তাহে (৮-১৪ এপ্রিল) প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় যে ২২টি খেলা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ফলাফল: ১৪টি খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি এবং ৮টি খেলা ড্র।

গত তিন বছরের (১৯৬৫-৬৭) অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর দল আলোচ্য সপ্তাহে তিনটি খেলায় যে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে তার মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে তাদের ১—০ গোলে জয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বি এন আর ১৫টি খেলে লীগের তালিকায় বর্তমানে ২য় স্থানে আছে—জয় ১৩, ড্র ২ এবং পয়েন্ট ২৮। মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়াতে ইস্টবেঙ্গল এ সপ্তাহের ৪টি খেলায় ৭ পয়েন্ট পেয়েছে। ইস্টবেঙ্গল বর্তমানে বি এন আর দলের সমান ১৫টা ম্যাচ খেলে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে—জয় ১৪, ড্র ১ এবং পয়েন্ট ২৯। মোহনবাগানের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল দলের খেলা ড্র—এ বছরের লীগে একটানা ১৪টা ম্যাচ জেতার পর প্রথম পয়েন্ট নষ্ট। গত বছরের রানার্স-আপ মোহনবাগান বর্তমানে ৩য় স্থানে আছে—১৩টা খেলায় ২৪ পয়েন্ট (জয় ১১ ও ড্র ২)। মহমেডান স্পোর্টিং ০—১ গোলে বি এন আর দলের হাতে পরাজিত হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের লড়াই থেকে বর্তমানে অনেকটা পিছনে পড়ে গেল—১৩টা খেলায় ২১ পয়েন্ট (জয় ৯, হার ১ এবং ড্র ৩)।

লীগের খেলায় মাত্র এই তিনটি দল অপরাজিত আছে—ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর এবং মোহনবাগান। প্রথম বিভাগের মোট ২০টি দলের মধ্যে একমাত্র মোহনবাগানই এখনও কোন গোল খায়নি—তারা অপরদিকে ৩৫টা গোল দিয়েছে।

মেক্সিকো অলিম্পিক বর্জন

আগামী মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের সাফল্য মোটেই আশাপ্রদ নয়। এই আসরে বর্ণ-বিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের অনুমতি লাভে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদের যে তীব্র ঝড় উঠেছে তার মীমাংসা হওয়ার আগেই আর এক কাণ্ড ঘটে গেছে—জনৈক অজ্ঞাতনামা শ্বেতকায়ের গুলীতে বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো নেতা ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের মৃত্যুবরণ। এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা আমেরিকা জুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বেধে যায় এবং সেই সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড, নরহত্যা, সৈন্যতলব, কারফু প্রভৃতি মিলিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সে এক বীভৎস চেহারা [illegible]

পত্রিকার সিটি অফিসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রণমূলক ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য প্রদর্শনী খেলার পরিকল্পনা ঘোষণা করছেন (পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য)।

প্রেক্ষিতে আমেরিকার শতকরা নব্বুই জন নিগ্রো অ্যাথলীট এবং খেলোয়াড় আগামী অলিম্পিক গেমস বর্জন করবেন।

বছরের পাঁচজন সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড়

১৯৬৮ সালের বিশ্ববিখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জীর (১০৫তম সংস্করণ) 'বছরের পাঁচজন সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড়' পর্যায়ে নির্বাচিত হয়েছেন—ভারতবর্ষের পতৌদির নবাব (মনসুর আলী), ইংল্যান্ডের কেন হিগস (ল্যাংকাসায়ার কাউন্টি) ও জিম পার্কস (সাসেক্স কাউন্টি) এবং পাকিস্থানের হানিফ মহম্মদ ও আসিফ ইকবাল। ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদের থেকেই এই পাঁচজনকে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে মনোনীত করা হয়। তবে যাঁরা একবার এই সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের বাদ দেওয়া হয়। ১৯৬৮ সালের নির্বাচিত পাঁচজনই নিজ নিজ দেশের পক্ষে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-লাভ করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, পতৌদির নবাব মনসুর আলী এবং হানিফ মহম্মদের পক্ষে উইসডেনের এই খেতাব লাভ বংশগত ব্যাপার। মনসুর আলীর পরলোকগত পিতা ইফতিকার আলী ১৯৩২ সালে এবং হানিফ মহম্মদের অগ্রজ মুস্তাক মহম্মদ উইসডেনের পাতায় অনুরূপ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

'উইসডেন' বর্ষপঞ্জী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই পুস্তকের 'বছরের পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়' অধ্যায়টি ক্রিকেটঅনুরাগীদের কাছে পরম আকর্ষণীয়। প্রতিবছর এই অধ্যায়ে

পতৌদির নবাব

থাকে মনোনীত পাঁচজন খেলোয়াড়ের ছবি এবং তাঁদের খেলোয়াড়-জীবনের বিশেষ নিবন্ধ। এই অধ্যায়ে স্থান পাওয়ার গুরুত্ব বিশ্ব খেতাব জয়ের সমতুল্য।

বিশেষ উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত এই ৬জন ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় উইসডেনের 'বছরের পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়' অধ্যায়ে স্থান পেয়েছেন : ১৮৯৭ সালে কে এস রঞ্জিৎ সিংজী, ১৯৩০ সালে কে এস দলীপ সিংজী, ১৯৩২ সালে পতৌদির নবাব ইফতিকার আলী, ১৯৩৩ সালে সি কে নাইডু, ১৯৩৭ সালে বিজয় মার্চেন্ট, ১৯৪৭ সালে ভিনু মানকাদ এবং ১৯৬৮ সালে পতৌদির নবাব মনসুর আলী।

বাংলা রাজ্য লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

শ্যামবাজার টেনিস ক্লাব লনে আয়োজিত ১৯৬৮ সালের বাংলা রাজ্য লন টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডাবলস খেতাব জয়ের সূত্রে গৌরব মিশ্র 'দ্বিমুকুট' সম্মান লাভ করেছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গৌরব মিশ্রের পিতা —ভারতীয় ডেভিস কাপ খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র এই প্রতিযোগিতায় দু'বার (১৯৪ এবং ১৯৪৯) সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়েছিলেন। জুনিয়র বিভাগের সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হন সুবীর মুখার্জি।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ
৪র্থ খণ্ড

৫২শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 3rd MAY, 1968. শুক্রবার, ২০শে বৈশাখ, ১৩৭৫ 40 Paise.

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ পাইন

নিশাচর কলকাতা প্রসঙ্গে

অমৃতের একান্ন সংখ্যায় প্রকাশিত অনিল ভট্টাচার্যের 'নিশাচর কলকাতা' অনেককেই ভাবিয়ে তুলবে। রঙ্গময়ী কলকাতার বিচিত্র রঙের আর শেষ নেই। এর অন্তরে কত যে রহস্য লুকোনো আছে তা জানা বা আঁচ করা রীতিমত দুরূহ। মুহূর্তে মুহূর্তে এর রূপ বদলায় এবং সৌরভও। দিনের কলকাতা ব্যস্তসমস্ত, লাখো মানুষের ছোটাছুটির অন্ত নেই। সবাই ব্যস্ত, সবাই ছুটছে। তখন মনে হয় সত্যি কলকাতা দেশের হৃদপিণ্ডবিশেষ। ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদান, লেন-দেন সে এক এলাহি ব্যাপার। সদ্য বাইরে থেকে কেউ এসে সব কিছু দেখে একেবারে তাজ্জব বনে যাবে। কাজের এমন ব্যাপক বিস্তৃতি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ক্রমে বেলা বাড়তে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসে। কর্মব্যস্ততায় সেদিনের মত এবার ছেদ পড়বার সময়। সন্ধ্যার ব্যবস্তায় বিকেলের যাই যাই আলো নগরবাসীর বেশিক্ষণ মনোরঞ্জন করতে পারে না। সন্ধ্যার অন্ধকারের বুকে হাজার বিজলি বাতির রোশনাইয়ে কলকাতা তখন যৌবন-পরিপুষ্ট অভিসারিকা।

অভিসারিকা কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজপথে কত না রঙ্গিণীর ভিড়! এদের কেউ হয়তো কলকাতার, আবার কেউ হয়তো অনেক দূরের। কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের এক। উদ্ধত যৌবনের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন। বার, রেস্তোরাঁ, চায়ের ভাঁড় আর বেলফুলের মালায় ক্রেতা-বিক্রেতার আসর তখন জমজমাট। ঢুলুঢুলু নয়নে কামাতুর মানুষ অভিসারিকার যৌবনের নন্দনকানন পুরোপুরি লুটেপুটে নিতে ব্যস্ত। এদিকে পসারিণীও ব্যস্ত। একাধিক ব্যক্তির মনোরঞ্জন করার দায়িত্ব তার। সন্ধ্যার রঙীন ঘোর কাটতে না কাটতেই সে তার কাজ সারতে চায়। মোটা টাকার অঙ্কে কেউ কেউ আবার একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট। নারীদেহ কেনাবেচায় কলকাতার তখন আর এক অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। তারপরও আছে বারবনিতা পল্লীর রঙীন জীবন। তার হাতছানিতেও নারীদেহ লোভীর দল সেখানে ভিড় জমায় কাতারে কাতারে। দালাল আর বারবনিতায় সে পল্লীর জীবন তখন স্বতন্ত্র।

কলকাতার এই নৈশ জীবন যেমন উগ্র তেমনি মোহময়। এর বাঁধনে আটকা পড়লে ছাড়া পাওয়া বড় কঠিন। অথচ বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া শক্ত। জহুরী ছাড়া জহর চেনা প্রায় অসম্ভব। বারবনিতা পল্লীর কথা বাদ দিলে রাস্তা-ঘাটে (কলকাতার বিশেষ অঞ্চলে) ভ্রাম্যমাণ মেয়েদের দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এরা দেহপশারিণী। কিন্তু যাচাই করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।

কলকাতার জীবনে আকস্মিক দুর্ঘটনা অনেক। কিন্তু এসব দেহপশারিণী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। এরা সাধারণত ট্যাক্সিতে করে কোথাও গিয়ে দেহদান পর্ব সমাধা করে অথবা ময়দানের গোপন অন্ধকারে।

'নিশাচর কলকাতায়' শ্রীভট্টাচার্য শুধু এরকম ভ্রাম্যমাণ দেহপশারিণীদের জন্য একটি জায়গার কথা বলেছেন। আর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে কলকাতার অধিকাংশ পার্ক, বাস স্টপে এদের উদ্দেশ্য-হীন পায়চারি। ট্যাক্সি বা রিকসা সেখানেও ঠিক হাজির। আসলে গোটা শহরের অনেকগুলো অঞ্চলই এখন দেহ ব্যবসায়ের এক বিরাট পাপচক্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে দিনের আলো ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। কতোদিনে আমরা এ বিপদের বিষয়ে অবহিত হব কে জানে!

অরুণ কর,
কলকাতা—২৭।

অবলুপ্ত অবকাশ প্রসঙ্গ

অবকাশ কথাটা এখন আমরা পাই অভিধানে। জীবনের অভিধান থেকে এই কথাটি ছুটি নিয়েছে অনেকদিন। ইতিহাস পড়ে জেনেছিলাম প্রাচীন গ্রীসে নাকি অফুরন্ত অবকাশ ছিল জীবনযাপন তথা প্রাণধারণের সবচেয়ে বড় উপায়। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। সেজন্যে হাতপা ছড়িয়ে হাপুস নয়নে কান্নাকাটি কেউ করেন না। তবুও হৃদয়ের গভীর থেকে কোন এক অজানিত মুহূর্তে দু' একবার দীর্ঘশ্বাস হয়তো বেরিয়ে আসে। সত্যি এমন সুন্দর 'অবকাশ' বস্তুটি হারিয়ে যাওয়ার চিন্তা একবার মাথায় ঢুকলে আর সহজে নামতে চায় না। ইতিহাস যেন আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, এই সেদিনও ছিল অথচ আজ আর নেই। ইতিহাস যেন আরো ইংগিত করছে, এজন্য আমরাই দায়ী। এই অবকাশ বস্তুটিকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে দেবার দায়িত্ব কার বা দায়ী কে সেকথা ভেবে লাভ নেই। এজন্য সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব যার সে হচ্ছে বর্তমান যুগ। যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ এবং অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই এক একটি যন্ত্র বনে গেছি। এটা হয়তো হয়েছে যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। মানুষ এবং যন্ত্র কে কত বেশি যন্ত্র হতে পারে এরকম প্রতিযোগিতার কথা একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। অবশ্য সবটাই মানসিক ব্যাপার এবং একতরফা।

তাই আজ আর অবসর নেই। যন্ত্রযুগ আমাদের অনেক করুণা করেছে। তার মধ্যে দূরকে নিকট এবং পরকে ভাই করার কৃতিত্ব সবসময়েই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। এখানে সেখানে যাতায়াতও আমাদের অনেক বেড়েছে। কিন্তু মানুষ হলো কেজো কাজের কাজী। তাই সে অবসর কোথাও খুঁজে পায় না। অথচ কাজের প্রয়োজনেই আজকের তাকে ছুটির সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। এই ছুটিটুকু অবশ্য মানুষকে আরো কর্মক্ষম রাখার জন্য। তাই কাজের চিন্তা সর্বদা তাকে তাড়া করে ফিরছে। ছুটির মুহূর্তটি এই চিন্তায়ই হয়তো কারো কারো কেটে যায়। তাই যথার্থ ছুটির স্বাদ নেওয়া আর হয় না। ছুটির আনন্দে বিভোর হয়ে চোখ বুজে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আরেকটি কাজের দিনের চোখরাঙানি এসে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য তাগাদা দিচ্ছে। এরকম অবস্থায় মনের শান্তি বিদায় নিয়েছে এবং অবসর সুখের স্বাদটুকু। আবার ছুটির দিনে তো আমাদের বেশি কাজ—সেদিন অনেকের নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকে না। অথচ মনে রাখতে হবে যে, সেটা ছুটির দিন। এর পেছনে যুগের তাগিদ যতটা আছে তারচেয়ে বেশি আছে ব্যক্তিমনের অস্থিরতা। এরই ফলে সে কোথাও গিয়ে শান্তি পাচ্ছে না। অবসর বিনোদন যে কি বস্তু তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারছে না। তাই অবসরের সুরমা মুহূর্তেও সে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে।

কাজল ব্যানার্জি,
লক্ষ্ণৌ।

এ কি সংকট ?

আজ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, মানুষ কি বৃত্তপরিক্রমা সমাপ্ত করে আবার গুহাজীবনে ফিরে যাবার অভিলাষী? যদি তাই না হবে, তবে বিশ্ব জুড়ে বিটল ও হিপ্পিদের এই তান্ডব নর্তনের উদ্দেশ্য কি? অমৃত-এর ৪৮ সংখ্যায় প্রকাশিত আলোকচিত্র দেখে অন্তত তাই মনে হলো। সেখানে বলা হয়েছে যে, বসন্ত ঋতুকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে সানফ্রান্সিসকোর দু' হাজার হিপ্পির এক বিরাট সমাবেশে অনেকেরই কোন আবরণের বালাই ছিল না। সম্প্রতি আরো শঙ্কিত হচ্ছি এই ভেবে যে, হিপ্পি-দের প্রভাব সাত সমুদ্র পেরিয়ে আমাদের দেশেও অনুভূত হচ্ছে। বিশেষ করে মহর্ষি মহেশ যোগীর যোগাভ্যাসে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে হিপ্পি এদেশে আড্ডা গাড়ছে এবং এসব বিটল-হিপ্পি চূড়ামণিদের নিয়ে হৃষীকেশে তুমুল কান্ড চলছে।

ইতিপূর্বে বিটল চতুষ্টয়ের মধ্যমণি জর্জ হ্যারিসন যখন বোম্বাইয়ে রবিশঙ্করের কাছে সেতার শিক্ষার জন্য আসেন তখন সেখানকার উঠতি ছেলেমেয়েরা যে মনো-ভাবের পরিচয় দিয়েছিল তা বিটল-হিপ্পিদের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সব দেশেই এই হিপ্পিসুলভ জীবনবিমুখ এবং শ্লীলতার রীতিবিরুদ্ধ মনোভাব জোরদার হচ্ছে। আর এই পাপাচারের ঘাঁটি হিসেবে আমাদের দেশ ব্যবহৃত হচ্ছে একথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

প্রতুল রায়
বর্ধমান

অমৃত

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য বহুকাল থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের রাজনীতি এবং তার সমাজ জীবনের প্রধান দুর্বলতার কারণ ছিল এই অসদ্ভাব। তার জন্য কম মূল্য দিতে হয়নি আমাদের। এর সুযোগ নিয়ে বিদেশী শাসক দেশভাগ করে দিয়ে গেছে। তার জের এখনো চলছে। যে-সাম্প্রদায়িক শক্তি সমাজের মেরুদন্ড ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল তারা একটি রাষ্ট্র হাতে পেয়ে এই উপমহাদেশে বিরোধের আগুন জিইয়ে রেখেছে গত দুই দশক ধরে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেও প্রতিবেশীর সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কেননা সম্প্রীতি বজায় রাখা শুধুমাত্র সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তার জন্য প্রয়োজন সজাগ পাহারা। দুঃখের বিষয় একটি ধর্মান্ধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাপে পড়ে ভারতবর্ষ বারবার সাম্প্রদায়িকতার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

কোনো উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের আঘাত গুরুতর। বিশেষত ভারতবর্ষে সমস্যা প্রচুর। তার প্রাদেশিকতা, তার রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং নানাপ্রকার জাতি-সংঘাত রাষ্ট্রনায়কদের মনে গভীর চিন্তার কারণ হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাও যুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে। সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। সংখ্যালঘুদের রক্ষার দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, যেমন তাকে গ্রহণ করতে হয় রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের রক্ষার ভার। সাম্প্রদায়িকতা একটি পুরনো ব্যাধি। শুধু শান্তি কমিটি করে আর সর্বধর্মের প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠান করে তার সমাধান করা সম্ভব নয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠী আছে। গোলযোগের সময়ে তারা নানারকম গুজব ও উত্তেজনা ছড়িয়ে সংকট ঘনীভূত করে তোলে। সেদিকে নজর রাখতে হলে শুধুমাত্র প্রশাসনিক স্তরে কর্মসূচী নিবন্ধ রাখলে চলবে না—শিক্ষাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ও মনোগত ঐক্যস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

যে কারণেই হক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, তা সংখ্যাগুরুই হক কিংবা সংখ্যালঘুই হক, পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা আশানুরূপ নয়। তার ফলে শুধু যে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতিই আমাদের দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করছে তা নয়, প্রাদেশিকতার সংঘাতও সমাজকে করে তুলছে হীনবল। এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই চালাতে হবে এক নিরন্তর সংগ্রাম।

সংখ্যালঘুদের বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির কোনো কোনো সদস্য বলেছেন যে, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা তাদের মনে অসন্তোষ ও নিরাপত্তাহীনতাবোধের অন্যতম কারণ। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সরকারী কাজকর্মে তারা প্রতিনিধিত্ব পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি নিশ্চিতই সরকারের সজাগ মনোযোগ দাবী করতে পারে। যদিচ এ কথাও সত্য যে ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক দুরবস্থায় ভাগ্যহীন বেকারের কোনো ধর্মাধর্ম ভেদ নেই। সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু উভয়েরই দুর্দশা। তবে মুরুব্বি ও তদ্বিরের জোরের অভাবে সংখ্যালঘুদের অবস্থা আরও খারাপ। এর জন্য সকলেরই উদ্বেগ বোধ করা উচিত। কারণ, সমাজের একটি অংশ অবহেলিত ও উপেক্ষিত থাকলে তা কালক্রমে গোটা সমাজের ওপরেই অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমেরিকার স্বচ্ছল সমাজও অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অধঃপতিত নিগ্রোদের হতাশার বিস্ফোরণ থেকে বাদ যায়নি। সে তুলনায় ভারতীয় সমাজ এমনিতেই নড়বড়ে, তার গায়ে সহস্র ছিদ্র। সুতরাং সামাজিক অসাম্য যাতে ধর্মীয় স্তরে গিয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি না করে সেদিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

সাম্প্রদায়িক অশান্তি যারা সৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে কোনোরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করা চলবে না। সরকার এ বিষয়ে সজাগ হয়েছেন। কংগ্রেস পার্টিও সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সংকল্প নিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্রকারীদের মতলবের দিকে কড়া নজর রাখার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে প্রহরী-কমিটি তৈরীর সিদ্ধান্তও সময়োপযোগী হয়েছে। এ সবই সাধু উদ্যম। তবে সরকারী স্তরে প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী সামাজিক উদ্যোগ যথেষ্ট না হলে এর অনেকখানিই ব্যর্থ হবে। সুতরাং এত বড় জরুরী একটি সমস্যা যেন শুধুমাত্র শৈথিল্য ও অনাগ্রহের জন্য অমীমাংসিত না থাকে। কারণ, এর প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বস্তরেই অনুভূত হবে এবং তার ফল কখনোই শুভ হতে পারে না।

অশ্লীলতার অভিযোগে যে গল্পগুলি সারা পৃথিবীতে পরিচিত, সেগুলির এবং অনুরূপ কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের সংক্ষেপিত কাহিনী এই বিভাগে প্রকাশ করা হবে প্রতি সপ্তাহে। পাঠকগণ অশ্লীলতার বিষয়ে নিজেদের ধারণার সঙ্গে এই কাহিনীগুলি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

মাদাম

হেনরী মিলার

[হেনরী মিলার ১৮৯১ খৃীস্টাব্দে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিরিশের দশকে তিনি ইংলণ্ডে এসে বসবাস করেন কিন্তু যুদ্ধের জন্য ১৯৪০-এ আবার যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান। হেনরী মিলারের বিখ্যাত উপন্যাস দুটির নাম 'ট্রপিক অব ক্যানসার', 'দি ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ণ'। 'এয়ার কন্ডিশ্যাড নাইটমেয়ার' এবং 'দি কসমোলজিক্যাল আই' গ্রন্থ দুটিও জনপ্রিয়। র‍্যাবোর জীবনী নিয়ে তিনি লিখেছেন "টাইম অব দি অ্যাসাসিনস"। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়াবাসী। এই কাহিনীটি হেনরী মিলারের 'দি উইসডম অব দি হার্ট' থেকে সংক্ষেপিত]

আগে যখন গল্পটি লিখতে শুরু করি, তখন এই বলে আরম্ভ করেছিলাম যে, মামজেল ক্রুড একটি পাকা বেশ্যা। ক্রুড বেশ্যা নিশ্চয়ই, আমিও সে কথা অস্বীকার করার চেষ্টা করছি না, তবে ক্রুডকে যদি বেশ্যা বলি তাহলে আর যে সব মেয়েদের আমি জানি তাদের সংজ্ঞা কি হবে? এই বেশ্যা কথাটি তেমন যথেষ্ট নয়। মামাজেল ক্রুড বেশ্যার চেয়ে অধিকতর কিছু। কি বলে যে তাকে উল্লেখ করি জানি না, বরং বলা যাক, মামজেল ক্রুড। তাই হোক—

প্রতিটি রাত্রে তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে তার মাসী। সত্যি কথা বলতে কি আমার পক্ষে এই কাহিনী হজম করা কঠিন। মাসী না হাতি! হয়ত কোন ভালবাসার লোক আছে। তবে, সেও এমন এক ব্যাপার যা নিয়ে সে ছাড়া আর কারো মাথা ঘামানোর কিছু নেই...সে যাই হোক, আমার কিন্তু বিরক্তি হত—একটা দালাল হয়ত ওর অপেক্ষায় থাকে — হয়ত ও যদি ঠিক সময়ে না ফিরে যায় তাহলে ঠেঙানী দেবে। মেয়েটা যতই কেন ভাল হোক (সত্যি, ভালোবাসার খেলা কি করে দেখাতে হয় তা ক্রুড জানত), সব সময়েই ওর পিছনে সেই রক্তপোশাক মানুষটার মূর্তি ভেসে উঠত, বেটা ছোটলোক বেজন্মা সব ক্ষীরটুকু মেরে দেয়, চাঁচিটা থাকে আমার জন্য। যাই হোক বেশ্যাকে নিয়ে খোকামি করার কোন প্রয়োজন নেই — যদি ওরা খুব ভদ্র এবং বাধ্য হয়, যদি তুমি ওদের জন্য হাজার হাজার ফ্রাঁ ব্যয় করো (কে আর তা করবে সত্যি সত্যি?)—সব সময়ে সব কালেই আড়ালে একজন থাকে, তুমি শুধু পাবে ছোবড়া, শাঁসটুকু তার। এটা সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে।

তবে, এ সবই। অপচয়িত ভাবাবেগ। পরে, আবিষ্কার করেছি।

ক্রুডের জীবনে অন্য ভালবাসার লোক ছিল না। আমিই তার প্রথমতম প্রেমিক। প্রেমিকই বা বলি কি করে — আমিও দালাল। দালাল কথাটাই উপযুক্ত। আমিই এখন ওর দালাল—ঠিক আছে।

প্রথম যখন ওকে ঘরে নিয়ে এসেছিলাম সেই কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে — কি গাধামোই না করেছিলাম। মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমি চিরদিনই এমনই গাধামি করে এসেছি। মুশকিল এই যে, মেয়েদের আমি পূজা করি, কিন্তু মেয়েমানুষ পূজ্য হতে চায় না। ওরা চায়—যাকগে, সেকথা, এখন সেই প্রথম রাতের কথা বলি, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। আমি এমনই কাণ্ড করে বসলাম, যেন জীবনে কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে ঘুমোই

নি। আজও ভেবে পাই না কেন এমন হয়েছিল—কিন্তু, এই কাণ্ডটাই ঘটেছিল।

ওর পোশাক-টোশাক খোলার আগেই, আমার মনে আছে, সে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ডটা দেখছিল, আমি কি করি যেন তার অপেক্ষায় ছিল। মনে হয়, আমি কাঁপছিলাম। কাফে থেকে বেরিয়ে অবধি আমি কাঁপছিলাম, আমি একটা কামড় দিলাম, মনে হয় ওর ঠোঁটেই কামড়েছিলাম—হয়ত বা ওর ভ্রূ চুম্বন করেছিলাম — আমি যা ছেলে, ঐ রকম একটা কাণ্ডই করেছিলাম। মেয়েদের সঙ্গে আমার আচরণটাই এমন। যে কোনো কারণেই হোক, আমার মনে হয়েছিল যে মেয়েটি আমার প্রতি অহেতুক করুণা করছে। পাকা বেশ্যাও অনেক সময় এমন একটা অনুভূতি মনে জাগাতে পারে। তবে, ক্লড ত আর পাকা বেশ্যা নয়, একথা আমি আগে বলেছি।

মাথার টুপিটা খোলার আগেই ক্লড জানালার কাছে গিয়ে সেটা বন্ধ করে, পর্দাটা টেনে দিয়েছিল। তারপর আমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে কাপড়চোপড় খুলে ফেলা সম্পর্কে কি যেন বিড়বিড় করে বলল। ও যখন ঘুরে বেড়াতে লাগল আমি তখন জামা-কাপড় খোলার কাজে লাগলাম। সত্যি বলতে কি, আমি কেমন নার্ভাস হয়ে গিছলাম। আমি ভেবেছিলাম, যদি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে হয়ত লজ্জা পাবে, তাই আমি আমার টেবলের ওপরকার কাগজপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকি। দু-একটা অর্থহীন কথা লিখে রাখি—টাইপরাইটারের ঢাকনাটা চাপিয়ে দিই। যখন ফিরে তাকালাম তখন দেখি চৌবাচ্চার কাছে সেমিজ গায়ে ও দাঁড়িয়ে। জল নিয়ে পা দুটি ধুয়ে ফেলছে।

ও বলল—'নাও তাড়াতাড়ি বিছানায় এসো—বিছানাটা গরম করো।' আর এই কথা বলে ও আমার গায়ে মৃদুভাবে কয়েকটা টোকা দিল।

সব জিনিসটা এমনই বিশ্রী রকমের স্বাভাবিক যে, আমার অস্বচ্ছন্দ-ভাবটা কাটতে লাগল। সেই সঙ্গে নার্ভাস ভঙ্গীটাও। দেখলাম বেশ সাবধানে ওর মোজা দুটি গুটিয়ে রাখল। ওর কোমরে কি সব সাজগোজ বাঁধা ছিল সেগুলি খুলে চেয়ারের পিছনে টাঙিয়ে রাখল।

ঘরটা সত্যি খুব ঠাণ্ডা। আমরা দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে কিছুক্ষণ নীরবে শুয়ে রইলাম, পরস্পর শরীরটাকে গরম করে নিতে থাকি। আমার একটা হাত ওর গলায়, আর একটা হাত দিয়ে ওকে আরো টেনে নিয়েছি। ও আমার দিকে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যখন ঘুমে ঢুকে-ছিলাম তখনও ওর চোখে এই দৃষ্টি লক্ষ্য করেছি। আমার কাঁপুনি আবার শুরু হল। আমার ফরাসী বুলিও অস্পষ্ট হয়ে আসে।

মনে নেই, তখনই, সেই মুহূর্তে ওকে বলেছিলাম কিনা যে আমি তোমাকে ভাল-

বাসি। হয়ত বলেছিলাম। যাই হোক, যদি বলেই থাকি, তাহলেও ও নিশ্চয়ই তখনই তা ভুলে গেছে। ও যখন চলে যাচ্ছে তখন আমি ওকে এক খণ্ড অ্যাফ্রোদিতে দিলাম। ও আমাকে বলেছিল যে, বইটা পড়ে নি। আর এক জোড়া সিল্কের মোজাও দিয়ে-ছিলাম। এ মোজা অন্য আর একজনের জন্য কিনেছিলাম।

ওর সঙ্গে আবার যখন দেখা হল তখন আমি হোটেল বদলিয়েছি। ও তার দ্রুত, সতর্ক এবং আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চারপাশে দেখে বুঝে নিল যে, হাওয়া তেমন সুবিধের নয়। ও আমাকে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রশ্ন করল খাওয়া-দাওয়া যথেষ্ট হচ্ছে কিনা।

মেয়েটি আমাকে বলল—'এখানে বেশী দিন থেকো না। এখানকার সব কেমন দুঃখময়।' 'দুঃখময়' কথাটি ঠিক বলেছিল কিনা মনে নেই। তবে ঐ রকম একটা কথা যে বলতে চেয়েছিল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

দুঃখময় ত বটেই। ফার্নিচার সব ভেঙে পড়ছে। জানালার কাঁচ ভাঙা। কার্পেট ছেঁড়া এবং মলিন। আর তা ছাড়া বাড়িতে কলের জল নেই। আর আলো অতিশয় ম্লান। ধূসর মৃদু আলো বিছানার চাদরে পড়ে কেমন যেন একটা ঝাপসা দেখতে হয়েছে।

সেই রাতে কি কারণে জানি না, যা হয় একটা অছিলায় ও একটু ঈর্ষার ভাব দেখাল। বলল, "নিশ্চয়ই আর কেউ আছে তোমার ভালবাসার পাত্রী।"

আমি বললাম, "না না, সে হতেই পারে না। আর কেউ নেই।"

আমার গলাটা বেশ আদরভরে জড়িয়ে ধরে বলল, "তাহলে আমাকে চুমো খাও।" ওর দেহটা বেশ উত্তপ্ত, যেন ফুটছে। ওর দেহের দাহে আমি যেন সাঁতার কাটছি।—না, ঠিক সাঁতার নয়, ডুবে যাচ্ছি। গভীরে ডুবছি আনন্দের সাগরে।

এর পর আমরা পায়ের জোতি ও ইস্তাম্বুল সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ও

বলল আমি একদিন ইস্তাম্বুলে যাবো। আমি বললাম, আমারও যাবার বাসনা। তারপর ও বলে উঠল, আমার মনে হয় ও বলল, "তুমি একজন আত্মাবান মানুষ।" আমি কোন আপত্তি করার চেষ্টা করিনি। মনে হয়, আমি খুব আনন্দে ছিলাম তখন। যখন কোনো বেশ্যা বলে যে, তোমার আত্মা আছে, তুমি হৃদয়বান, তখন তার অর্থ আরো অনেক কিছু। বেশ্যারা সাধারণত আত্মাটাত্মা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এর পর আর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ও কিছুতেই টাকা নিতে চাইল না। ও বলল, "টাকার কথা চিন্তা করো না। আমরা এখন দুজনে কমরেড। তুমি অতিশয় দরিদ্র।"

ও কিছুতেই আমাকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দিল না। আমি সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, ও রাজী হল না। ওর ব্যাগ থেকে কয়েকটা সিগারেট বার করে বিছানার পাশের টেবলটায় রাখল। আমার মুখে একটা সিগারেট দিয়ে ওর ব্রোঞ্জ লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল। লাইটারটা কেউ ওকে উপহার দিয়েছে। তারপর আমাকে গুড নাইট বলে চুমো খাওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়ল।

আমি ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম, "ক্রুড—তুমি প্রায় দেবদূতী।"

ও অতি দ্রুত বলে ওঠে—না-না তা নয়। ওর মুখে-চোখে একটা বেদনার ছাপ।

মনে হয় ঐ যে 'প্রায়' কথাটি যেন ক্রুডকে পীড়া দিচ্ছিল। আমি তখনই বুঝেছি। এর পর আমি ওকে যে চিঠিখানি দিয়ে ছিলাম, আমার বিশ্বাস আমার জীবনের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিঠি। অবশ্য আমার ফরাসী ভাষায় ত্রুটি ছিল। আমরা একত্রে চিঠিখানা পড়লাম, যে কাফেতে আমরা সাধারণত এসে মিলতাম, সেখানে বসেই পড়লাম। যা বলেছি, আমার ফরাসী জ্ঞান একেবারে উদ্ভট। তবে দু-একটা প্যারা সুন্দর ছিল, সেই সব প্যারাগ্রাফ পল ভ্যালেরির লেখা থেকে বেমালুম নেওয়া। এই অংশটুকুতে পোঁছে ও একটু থেমে বলে উঠল, "ভারী চমৎকারভাবে বলা হয়েছে কিন্তু।" "ভারী চমৎকার।" তারপর আমার দিকে আড়চোখে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর আবার পড়ে যায়। না, ও ভ্যালেরীতে ভোলে নি। মোটেই নয়। ভ্যালেরীর সাহায্য না নিয়েই আমি পারতাম। আসলে ঐ দেবদূতী কথাটিতেই ওকে পেয়ে বসেছে। আমি আবার ঐ কথাটি ব্যবহার করলাম। যথা-সম্ভব মোলায়েম ও মধুর করে। প্রায় শেষাশেষি এসে আমি কেমন অস্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম। আমি অবশ্য বলতে চাই না যে, আমার আন্তরিকতার অভাব ছিল। আমার সেই স্বতোৎসারিত ভঙ্গীর পর কি যে লিখেছিলাম আমি জানি না, তবে সাহিত্য করেছিলাম। কিন্তু সমস্ত জিনিসটা বেশ বিশ্রী। এর পরে ও যখন বিছানায় বসে আবার চিঠিটা পড়তে থাকে তখন আমার ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলি দেখাল। ওই জোর করে চিঠিটা পড়তে চাইল। আমি বোধহয় একটু অসহিষ্ণু হয়েছিলাম, তাতে ও ক্ষুণ্ণ হল।

ও খুব খুশি হয়েছিল। বলল—চিঠি-খানা যত্ন করে চিরদিন কাছে রেখে দেবে।

ভোরের দিকে ও কেটে পড়ল। সেই মাসির যন্ত্রণা। আমিও ঐ মাসির ব্যাপারটা প্রায় সইয়ে নিয়েছিলাম। এ ছাড়া, যদি মাসি নাই হত, তাহলে আমি জানতে পারতাম। ক্রুড তেমন মিথ্যা বলতে পারে না—তারপর ঐ দেবদূতী প্রয়োগ—তাতেই একেবারে ঠাণ্ডা।

আমি শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভাব-ছিলাম। মেয়েটা আমার পক্ষে রীতিমত ভালই জুটেছে। ভালবাসার লোক। তার কথাও ভেবেছি—তবে বেশী ভাবি নি। আমি আর এ নিয়ে এখন মাথা ঘামাই না। এখন কেবল ক্রুডের কথা ভাবি, কিভাবে তাকে খুশি রাখব সেই আমার চিন্তা। স্পেন-কাপ্রি-ইস্তাম্বুল। যেন সেই উজ্জ্বল সূর্যালোকে ও যেন অলসভঙ্গীতে ঘুরছে, কিম্বা পায়রাকে দানা খেতে দিচ্ছে—কিম্বা তাদের স্নান করা দেখছে, কিম্বা দোলায় শুয়ে আছে, হাতে একখানি বই। যে বইটা আমিই ওকে পড়তে বলেছি। আহা বেচারা, জীবনে হয়ত ভার্সাই-এর বেশী কখনো যায় নি। ট্রেনে ওঠার সময় ওর মুখের ভঙ্গী দেখি তারপর দেখি ফোয়ারার ধারে দাঁড়িয়ে আছে — মাদ্রিদ বা সেডাইনে। অনুভব করি, ও আমার পাশে পাশে চলেছে। বেশ গা ঘেঁষে। সব সময়ই গা ঘেঁষে, কারণ, ও জানে না একা-একা কি করবে, বোবা হলেও এই আইডিয়াটা আমার ভাল লাগে। একটা সুন্দর দৃশ্য অনেক ভাল। একটা হতভাগা ছিনাল রমণীর চেয়ে অনেক ভাল। পাশে শুয়ে থেকেও ওরা সব সময় ভাবছে কি-ভাবে আরো টাকা আদায় করবে। না ক্রুড সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত। পরে হয়ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে...পরে—পরে।

আমি ওকে শিকার করে খুশী হয়েছি। বেশ্যা। বিশ্বস্ত, সাধ্বী বেশ্যা। সাধ্বী বেশ্যা! হা যীশু! আমি জানি লোকে আমার মুখে একথা শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়বে। বেশ্যার আবার সতী-সাধ্বী।

আমি বেশ বিস্তারিতভাবে পরিকল্পনা করি, কোথায় কোথায় আমরা থাকব, ও কি পোশাক পরবে—কি কথা আমরা বলব—সব—সব কিছু। আমার মনে হয় মেয়েটা ক্যাথলিক—তাতে আমার কি এসে যায়। প্রকৃতপক্ষে, আমার বরং ভালই লাগে। স্থাপত্য সৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে গির্জায় গিয়ে সর্বজনীন প্রার্থনা শোনা অনেক ভাল।

ও যদি চায়, আমিও না হয় ক্যাথলিক হব।—চুলোয় যাক। ও যা চাইবে আমি তাই করব, যাতে ও আনন্দ পায় তাই করব। আমার এখন ভাবনা হয়, কোনখানে ওর ছেলেপুলে রাখা নেই ত! অনেকেরই ত থাকে। ভেবে দেখ, ক্রুডের বাচ্চা। তা আমি সে বাচ্চাকে আমার নিজের সন্তানের চেয়ে বেশী করে ভালবাসব। না, নিশ্চয়ই ওর সন্তান থাকা উচিত—ক্রুড। তা পরে দেখা যাবে। মাঝে মাঝে, বারান্দাওলা বড় ঘর চাই—ঘরটা একেবারে নদীর ওপর, ঘর থেকে নদী দেখা যায়। জানালায় ফুল ফুটে থাকবে, পাখিরা গান করবে। (আমি কল্পনানেত্রে দেখি পাখির খাঁচা বগলে করে বাড়ি ফিরছি। ঠিক আছে। যাতে ও খুশিতে থাকে তাই করতে হবে।)

কিন্তু নদী—হাঁ নদী চাই। আমার নদী ভাল লাগে। একবার মনে আছে রটারডামে—। ভোরে ঘুম ভাঙা, জানালা দিয়ে সূর্যালোক ঝরে পড়ছে, পাশে বেশ্যা শুয়ে আছে, সে তোমাকে ভালবাসে। তোমার বুদ্ধিবৃত্তি ভালবাসে — পাখি গান করছে। টেবলে খাদ্যদ্রব্য সাজান—ওদিকে মেয়েটি গা-হাত ধুয়ে মাথার চুল আঁচড়াচ্ছে আর যত পুরুষের সঙ্গে কাটিয়েছে এবং বর্তমানে মাত্র তুমি—সেই কথা ভাবছে। পাখি গান গায়, নৌকা পাল তুলে জলে ভেসে যায়, তার মাঝি, তার দাঁড়। জীবনের সমস্ত তরঙ্গ তোমার দেহে প্রবাহিত। তোমার মধ্য দিয়ে ওর দেহে সঞ্চারিত। তোমার আগেকার সব পুরুষ এবং বর্তমানে তোমার মারফৎ—এবং ভবিষ্যতের পুরুষের হয়ত—পাখি, ফুল, সূর্যালোক, সেই সুরভিতে তোমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। ও ভগবান! আমাকে এমনই একটি বেশ্যা দাও। সর্বকালের জন্য এই বেশ্যা চাই!

আমি ক্রুডকে বলেছিলাম আমার সঙ্গে থাকো। ও কিন্তু প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমার কাছে তা আঘাতস্বরূপ। আমি জানি, আমি দরিদ্র বলে নয়। ক্রুড আমার টাকাকড়ির সম্বল জানে। আমি যে বইটি লিখছি তার কথাও জানে। না, অন্য কোন গভীরতর কারণ বর্তমান। তবে সে কথা ও প্রকাশ করবে না।

তরপর আর একটা ব্যাপার আছে, আমি আবার সাধুর মত আচরণ শুরু করেছি। আমি একা একা অনেকখানি পথ হাঁটি। এখন আমি যা লিখেছি তার সঙ্গে আমার নতুন বইটির কোন সম্পর্ক নেই। ভাবটা, আমি যেন এই বিশ্ব চরাচরে একান্ত একা। আমার জীবনটা সম্পূর্ণ, আমার জীবন স্বতন্ত্র। যেন একটা পাথরের মূর্তি। আমি আমার স্রষ্টার নাম ভুলে গেছি, বাপের নাম ভুলে যাওয়া। আমার মনে হয় আমি যেন এই পৃথিবীতে শুধু সৎ কর্ম করার জন্যই জন্মেছি। কারো কাছে কোন অনুমতির অপেক্ষা রাখি না।

ক্রুডের কাছ থেকে আর কোন দান আমি নিতে চাই না। ওর যা পাওনা তার প্রতিটি আধলার হিসাব রাখি। ইদানীং ওকে বিব্রত দেখায়। মাঝে মাঝে আমি যখন

ওর কাছ দিয়ে চলে যাই, শপথ করে বলতে পারি ওর চোখে জল দেখেছি। মেয়েটা এখন আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও ছাতের আলিসায় বসে থাকে। আমি অনেক সময় ওর সঙ্গে যাই কারণ ওর বিষণ্ণ মুখ আমি দেখতে চাই না—ওকে এমন সব সময় প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখতে পারি না, আমার সয় না। ঐ রকম একা একা সব সময় বসে কি ভাবে কে জানে?

মনে মনে ভাবি, একদিন যদি সোজা ওর কাছে গিয়ে হাতে একখানি হাজার ফ্রাঁর নোট গুঁজে দিই। যখন ঐ রকম বিষাদভরা দৃষ্টি মেলে বসে থাকে, তখন যদি ওর কাছে গিয়ে হাজির হই—আর বলি—দেখো। কেন তুমি এমন আচ্ছন্ন হয়ে আছো?

অনেক সময় আমরা যখন একত্রে শুয়ে থাকি, যখন সেই সুদীর্ঘ নীরবতার মুহূর্তে—ও আমাকে বলে ওঠে—কেন তুমি এমন উদ্বিগ্ন হয়ে আছো? আর আমি সব সময় বলি—না না, ও কিছু নয়। কিন্তু সবচেয়ে মজা এই আমিও বলতে চাই, তুমি কেন এত উন্মনা? প্রেমের এ এক বিচিত্র গতি।

ও যখন আমার কাছ থেকে চলে যায়, তখন ঘণ্টা বাজে উত্তাল হয়ে। ও আমার জন্য সব কিছু ঠিক করে যায়। আমি বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকি—আর ওর দেওয়া মিঠে সিগারেট টানি। আমার নড়াচড়া করার প্রয়োজন নেই, আমার মুখে যদি প্লেট রাখা সম্ভব হত, তাহলে ও নিশ্চয়ই বিছানার পাশে এক গ্লাস জল গড়িয়ে রেখে যেত। দেশলাই, এলার্ম ঘড়ি—আর সব কিছু। আমার ট্রাউজার সযত্নে ভাঁজ করা—আর আমার হ্যাট-কোট দরজার কাছে আলনায় টাঙানো। সব যে যার জায়গায় ধরা আছে। চমৎকার! এমন একটি বেশ্যা পাওয়া আর মূল্যবান রত্ন পাওয়া একই ব্যাপার—

আর এর মধ্যে ভাল এই যে, মধুর অনুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ এক রহস্যময় অনুভূতি—আর মরমী হওয়া মানে জীবনের ঐক্য অনুভব করা। আমি সাধু কি সাধু নই, সে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাই না। সাধুর লড়াই অনেক বেশী। আমার মধ্যে আর কোন লড়াই নেই, কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। আমি এখন মরমী। আমি যা সৎ, শান্তিময় এবং কল্যাণকর তাই বিতরণ করি। আমি ক্রুডের জন্য এখন অনেক লোক জোগাড় করে আনি। ওর মুখে আর সেই বিষণ্ণ ভাবটা নেই। আমরা দুজনে রোজই প্রায় একত্র খাওয়া-দাওয়া করি। ও আমাকে নিয়ে ব্যয়বহুল জায়গায় যাওয়ার জেদ ধরে। তাতে যদি ক্রুড খুশি হয়—হোক—

কেন তুমি এত বিষণ্ণ! প্রথমটা আমি কিছু বলি নি। একটু লজ্জা হচ্ছিল। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে চমৎকার।

দ্বিতীয়বার—সেই ইতস্ততঃ ভাব এসেছিল কি? না অসতর্কতা? যাই হোক ও কিছু নয়, বলার নেই কিছু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মধ্যে আমি একটু বোধহয় অবিশ্বাসের কাজ করেছি। আমি বুলভার্দের ওপর এক রাত্রে একটু মত্ত অবস্থায় উঠেছিলাম—একটা মোটাসোটা কুৎসিত স্ত্রীলোক যার গায়ে আমি মূত্রত্যাগ করতেও ঘৃণা করি। এসে আমায় ধরল। বিশ্রী ব্যাপার। প্রতি মিনিটে আমাদের দোরে রাতের অতিথিরা এসে দোর ঠেঙায়। বাজে স্ত্রীলোক—ত্রিশ ফ্রাঁ পেলেই সন্তুষ্ট—এ সেই মেয়ে। ভারী অদ্ভুত! ভারী মজার রাত্রি। এর পর, দু-একদিন পরেই শুরু হল জ্বালা, চুলকানি।

উদ্বেগ। আমেরিকান হাসপাতালে দৌড়াই। ভয় হয়েছিল খুব। যাক শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু নয়। একটা উদ্বেগ মাত্র।

এই ঘটনাটা যখন ক্রুডকে বললাম তখন সে আমার দিকে সবিস্ময়ে তাকাল। আমি বলেছিলাম, "আমি জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করো ক্রুড, কিন্তু—"

এ সব ব্যাপারে ক্রুড একটি মিনিটও অপচয় করতে চায় না। জেনে-শুনে কোন স্ত্রীলোকের অঙ্গে এই ব্যাধি যে দান করবে সে দুর্বৃত্ত। অন্তত ক্রুড সেইভাবেই জিনিসটা দেখল। সে বলল, "সত্যি বলছ?"

সত্যি কথা তা আমি বললাম। যাই হোক, ব্যাপারটা চাপা পড়ল। যে মানুষই এই কাজ করুক না কেন সে নিঃসন্দেহে দুর্বৃত্ত।

প্রতিদিন সকালে আমি যখন প্যারাফিন তেল গ্রহণ করি তখন তার সঙ্গে একটা কমলালেবু মিশিয়ে নিই — ভাবি, জেনে-শুনে যারা স্ত্রীলোকের দেহে এই বিষ সঞ্চারিত করে তারা অপরাধী। প্যারাফিনের তেলে চামচটা বড় চটচটে হয়। ভাল করে ধোয়া দরকার। আমি ছুরি, চামচ সব বেশ ভাল করে ধুই। সব বেশ সতর্কতার সঙ্গে—এ আমার বরাবরের স্বভাব। আমার মুখ মোছা হলে তোয়ালের দিকে তাকাই। হোটেলওলা সপ্তাহে তিন বারের বেশী তোয়ালে দেয় না। মঙ্গলবারের ভেতর সবগুলি ময়লা হয়ে যায়। আমি ছুরি ও চামচ একটি তোয়ালে দিয়ে মুছে, বিছানার চাদরে মুখ মুছি। মুখে ঘষি না, ধীরে ধীরে বিছানার চাদরের ধার দিয়ে মুছি।

হিম্লোলয়েট মানড্রনের রাস্তাটা আমার কাছে অতি কদর্য মনে হয়। যত সব নোঙরা, শীর্ণ, বাঁকাচোরা গলিপথ আমার দু চক্ষের বিষ। বিশেষ করে তার নামটা যদি আবার রোমান্টিক হয়। প্যারিস আমার কাছে বিরাট ক্ষতের মত মনে হয়। রাস্তাগুলি যেন ক্ষতের মত। সকলেরই আছে, আর কিছু-না হলে সিফিলিস। সারা য়ুরোপ ভুগছে ব্যাধিতে—আর এই ফ্রান্স য়ুরোপকে সেই ব্যাধি দিয়েছে। ভলতেয়ার, র‍্যাবেলাকে শ্রদ্ধা করার এই ফল। আমার মস্কো যাওয়া উচিত ছিল। আগে সেই বাসনাই ছিল। রাশিয়ায় যদি রবিবার নাই থাকে, কি এসে যায়? এখন রবিবারও যা অন্য বারও তাই—শুধু রাস্তায় ভিড়টা বাড়ে। অনেক বেশী ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ—পরস্পরকে রোগদুষ্ট করে। মহাসংক্রমণ।

মনে রেখো। আমি ক্রুডের কথা কিছু বলছি না। ক্রুড একটি রত্ন। ওর মধ্যে বেশ্যা-সত্তা নেই। জানালার বাইরে একটা পাখির খাঁচা। ফুলও আছে—তবে মাদ্রিদ বা সেভাইল নয়—ফোয়ারা নেই, পায়রা নেই।

না প্রতিদিন ক্লিনিকে যেতে হয়। ও একটা দোরে ঢোকে আমি আর একটায়। আর সেই ব্যয়বহুল হোটেলে যাতায়াত নেই। সিনেমায় যাও, আর ছটফট করা বন্ধ করো। আর ডোমের দৃশ্য ভাল লাগে না।

এই সব বেজন্মারা সব কেমন পরিচ্ছন্ন ভঙ্গীতে অলিন্দে বসে আছে, কেমন স্বাস্থ্যবান, কেমন ভাঁজওলা কোট, বেশ মাড় দেওয়া গায়ে ওডি কলোনের গন্ধ। ক্রুডের তেমন দোষ নেই। আমি ওকে এই সব ভদ্র চেহারার বেজন্মাদের সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছিলাম। কিন্তু ওর ছিল আত্মবিশ্বাস — ইঞ্জেকসন ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার। তারপর যে কোন ব্যক্তি—কিছু—।

যাকগে এই ব্যাপারই ঘটল। বেশ্যার সঙ্গে বসবাস করা, মানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেশ্যার সঙ্গে থাকার মানে—গোলাপ শয্যায় থাকা নয়। লোকের সংখ্যাটা কিছু নয়, ওটা সয়ে যায়—ওই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপার, সতর্কতামূলক বিধিনিষেধ, প্রতিষেধক, পরীক্ষা করান, উদ্বেগ এবং আতঙ্ক। আমি কিন্তু ক্রুডকে বলেছিলাম—"ওই সব বড়লোক কাপ্তেন সম্পর্কে সাবধান!"

না, যা ঘটে গেল তার সম্পূর্ণ দোষ আমার। শুধু সাধু হয়ে তৃপ্ত না হয়ে আমি চেষ্টা করেছিলাম প্রমাণ করতে যে, আমি একজন সাধু! মানুষ যে মুহূর্তে বুঝতে পারে যে, সে সাধু হয়ে গেছে, তার সেখানে থামা উচিত। সামান্য বেশ্যার কাছে সাধুপনা করার অর্থ পিছনের দরজা দিয়ে স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা। ও যখন আমাকে আদর করে, তখন যেন আগের চেয়েও অনেক বেশী ভালবাসে। আমি যেন একটা মাইক্রোব—বীজাণুর মত ওর দেহে সঞ্চারিত, ওর আত্মায়। আমি অবশ্য ভাবি যে যদিও একজন দেবদূতীর সঙ্গেই বসবাস করি তবু অন্তত নিজেকে যেন মানুষ করে তুলতে পারি। মানুষের মত মানুষ হতে পারি। এই নোঙরা কুয়া থেকে বেরিয়ে সূর্যালোকে গিয়ে দাঁড়াই। যেখানে আলো আছে, যেখানে ঘরের জানালা দিয়ে নদী দেখা যায়, ফুল ফোটে, জীবন প্রবাহিত—আর শুধু সে আর আমি—আর কিছু নয়, আর কেউ নয়। শুধু আমরা দুজনে জীবনতরঙ্গে প্রবহমান।

ইন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত ও সংক্ষেপিত।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

মানুষ ও জীব জগৎ

পাঁচ লক্ষ বছর আগে, মানুষ যখন প্রায় পশুরই সামিল ছিল তখন থেকেই পশুদের সঙ্গে তার শত্রুতার ও মিত্রতার প্রয়োজনের ও অনিষ্টের, ভয়ের ও আনন্দের এক বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মানুষ পশুকে তার সঙ্গী ও বন্ধু করেছে। তার দুধ ও মাংস খেয়েছে, হাড় দিয়ে হাতিয়ার গড়েছে, তা গুঁড়ো করে জমির উর্বরতা বাড়িয়েছে, চামড়া দিয়ে পোষাক, তাঁবু তৈজস বানিয়েছে, ঢাক-ঢোল ও ডুকডুগি বাজিয়েছে। তাদের দিয়ে চাষ করিয়েছে, গাড়ী টানিয়েছে, বাহন বানিয়েছে। নিজেদের মধ্যে সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হত্যাকান্ডের সময় অর্থাৎ যুদ্ধে ব্যবহার করেছে। তাদের দিয়ে খেলা দেখিয়েছে অর্থাৎ নিজেদের অনুকরণ করে রঙ্গ দেখাতে বাধ্য করেছে। তাদের ওপর বাজি ধরেছে। পুজো করেছে। নিজেদের আধি-ব্যাধির চিকিৎসার পদ্ধতি ও প্রতিকার আবিষ্কারের জন্যে তাদের দেহে ব্যাধি সঞ্চার করেছে, জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ করেছে।

প্রথম লাখ দুই বছর মানুষ ও পশুর মধ্যে শক্তির অনেকটা ভারসাম্য ছিল। বরং ক্ষেত্র বিশেষে পশুরাই দলে ভারী, ক্ষিপ্রতর অধিকতর শক্তিমান এবং প্রকৃতিদত্ত আয়ুধে আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় অব্যর্থ ও নিপুণ। শ্বাপদদের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সম্পর্কটা ছিল 'মরো কিম্বা মারো'। যে হারবে তাকে জয়ীর জঠরে যেতে হবে। আর তৃণভোজীদের মাংস নিয়ে ছিল শ্বাপদ ও মানুষের প্রতিযোগিতা। কিন্তু তখনকার তৃণ-ভোজীরা ছিল সংখ্যায় অনেক গুণ বেশি, অরণ্যাবৃত পৃথিবীর প্রায় সমগ্র স্থলভাগটাই তাদের অধিকারে। শিঙ্, দাঁত, বিষ, চাট কিম্বা পায়ের দৌড় আদিম মানুষের আক্রমণে পাল্টা দেওয়া ও পলায়নে সহায়ক।

বস্তুতপক্ষে নব্যপ্রস্তরযুগে চাষ-আবাদের আবিষ্কারে যাযাবর মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলবার আগে পর্যন্ত পশুদের প্রকৃতিদত্ত আয়ুধের চেয়ে অব্যর্থ অস্ত্র উদ্ভাবনেই মানুষের প্রায় সমগ্র সৃজনী নিয়োজিত ছিল এবং সেই উদ্ভাবনের অগ্রগতিই তাকে অন্যান্য পশুদের থেকে বিশিষ্ট ও বলশালী করে তুলেছিল। তবু সেই অতিদূর অতীতের নব্যপ্রস্তরযুগ থেকে আরম্ভ করে প্রায় ষোলশ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চতুষ্পদ জীবেরা দ্বিপদ জীবেদের কাছে সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করেনি। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠেনি। ক্রমাগত জঙ্গল কেটে মানুষের বসতির আয়তন বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুদের বসবাসের স্বাভাবিক এলাকা সংকুচিত হয়ে পড়ছিল, তবু তাদের পেছু হটার জায়গা ছিল। মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাংসের প্রয়োজন বাড়ছিল। কিন্তু তার প্রধান যোগান ছিল বর্ধিষ্ণু পালিত পশু। অরণ্যের পশু শিকার ক্রমশ আমীর-ওমরাহদের বিলাস এবং সাধারণের বিশেষ উদ্যোগ কিম্বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ছিল। তার প্রধান কারণ ছিল উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব। বন্যজন্তুদের মধ্যে যারা মানুষের এলাকায় অনধিকার কিম্বা অনবধান প্রবেশ করতো তাদের হয়তো তীর কিম্বা বর্শার ফলকে হত্যা করা কিম্বা ফাঁদে ফেলা যেত। কিন্তু তার বাইরে অরণ্য এলাকায় শিকার ছিল যূথবদ্ধ অস্ত্রসজ্জিত অভিযানের ব্যাপার। নয়তো তা ছিল সমূহ বিপদজনক।

ইতিমধ্যে এলো আগ্নেয় অস্ত্র। একদিকে তা ক্রমশ লঘু, সহজ ব্যবহারসাধ্য বন্দুকে রূপান্তরিত হয়ে মারণ-ক্ষমতায় লাঠি, পাথর, গুলতি, ফাঁস-ফাঁদ, তীর-বর্শাকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করলো। অন্যদিকে নানাকারণে সেদিনের যন্ত্র ও নৌবিদ্যায় অগ্রসর ইউরোপীয় জাতিদের জানা-অজানা নানা দেশ-মহাদেশে অভিযান শুরু হলো। সৃষ্টির উদয়কাল থেকে আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, আফ্রিকার এবং মেরু অঞ্চলের যে জীবজন্তুরা নিঃশঙ্কায় ও নিরাপত্তায় বাস করছিল, অকস্মাৎ তারা বন্দুকধারী মানুষের নিঃসীম লোভ ও হিংস্রতার সম্মুখীন হলো। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে যে বিচিত্র জীবজগৎ চির-তুষারাবৃত মেরু, অরণ্যসমাকীর্ণ বিশাল বিশাল বনভূমি, পাহাড় ও উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিল, তা কয়েক শ' বছরের মধ্যে, কোথাও মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হলো বা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেই ঔপনিবেশিকদের বেশির ভাগ গিয়েছিল বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে। যেখানে মানুষের আক্রমণে বীভ্যার নামে উভচর লোমশপ্রাণী, যার লোমশ চর্মে দস্তানা, গলবস্ত্র প্রভৃতি তৈরী হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শেষ বনবরাহ সপ্তদশ শতাব্দীতে শিকারীর গুলিতে প্রাণ দেয়। ইংলন্ড ও ওয়েলশ থেকে ষোড়শ এবং স্কটল্যান্ড থেকে

অন্টম শতাব্দীতে নেকড়ে বাঘ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। হরিণ হয়তো তেমনিভাবেই অবলুপ্ত হতো। কিন্তু ডিউক ব্যারণ লর্ডদের সংরক্ষিত বনভূমিতে তারা সেই মহাজনদের শিকার খেলার জন্যে বেঁচে রইলো। কিন্তু তবু বৃটেনাগত ঔপনিবেশিকদের অপর দেশে গিয়ে বেপরোয়া বন্যপশু হত্যাকান্ডের সময় একবারও মনে হয়নি যে, সেই নতুন দেশের জীবজন্তুরাও তাদের আক্রমণ ও লোভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে!

বরং স্বদেশে যা ছিল ধনীর বিলাস, নতুন ঔপনিবেশগুলিতে এখন তাই হয়ে দাঁড়ালো অতিসাধারণ ভাগ্যান্বেষীর অনায়াস আয়ত্ত অফুরন্ত সুযোগ। দ্বিতীয়ত, সেই প্রথমদিকের ঔপনিবেশিকেরা ছিল দুরন্ত, দুঃসাহসী, নির্মম। বন্দুকবাজীতে তাদের অপার উল্লাস। তৃতীয়ত, তখনকার দিনের ধারণা অনুযায়ী তারাও ভাবতো বন্যজন্তুর সংখ্যাবৃদ্ধির কোন শেষ নেই, তারা অফুরন্ত। সুতরাং নিধনপর্ব চলল অপ্রতিহত অসংযত। কখনো মাংস সরবরাহের প্রয়োজনে, কখনো তা চামড়া, লোম, দাঁত, শিঙ, চর্বি-হাড়ের ব্যবসার লোভে, কখনো তা স্রেফ গুলি করে হত্যার মত্ততায়। কখনো বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

আমেরিকায় ব্যাপক নিধনপর্ব

নতুন মহাদেশের প্রথম উল্লেখ্য ঔপনিবেশক পিলগ্রিম ফাদার্সের দল যখন আমেরিকায় উপনীত হলো তখন তাদের সামনে ৯শ' মিলিয়ন বা নব্বুই কোটি একর আদিম অরণ্য। অচিরে শত-সহস্র কুঠারের আঘাতে সেই অরণ্য সংকীর্ণতর হয়ে পড়তে লাগলো আর সেই সঙ্গে বন্যপশুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে লাগলো। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন জেমস আওডুবন নামে এক অরণ্য-জীবনের শিল্পী স্বাভাবিক পরিবেশে জীবজন্তু চিত্রণের আশায় আমেরিকায় যান। তিনি দেখলেন যে সে দেশের পূর্ব উপকূল ততদিনে প্রায় অরণ্যহীন হয়ে গেছে। অতএব তিনি গেলেন ল্যাব্রাডরে। ল্যাব্রাডর তখনকার দিনে মহাদেশের দূর-দুর্গম অঞ্চল বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু সেখানেও প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ফার-ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে লোমশপ্রাণীর হত্যাকান্ড চালিয়ে আসছিল। তাই আওডুবন লিখে গেছেন, "লোমশ প্রাণী সংখ্যায় খুবই কম। তবু কিছু কিছু বীভ্যার ওটার, আরো সামান্যসংখ্যক মার্টেনস্, শৃগাল ও লেনকস্ ধরা পড়ে, যদিও তাদের সংখ্যা প্রতি বছরই কমে আসছে। একথা বলা চলে, যেসব দুর্গম, বন্য এবং বাসদুঃসাধ্য আবহাওয়া মানুষের শুধু স্বর্ণলোলুপতার জন্যেই যাওয়া সম্ভব, সেখানেও ফার কম্পানী নিধনযজ্ঞের হোতা। অকলুষিত ও অধর্ষিত প্রকৃতির পরিচয় লাভের জন্যে আর কোথায়ই বা আমি যাবো?"

শ্বেত ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকায় বসতি স্থাপনের আগে সেখানে অনুমান ১০ কোটি

উনিশ শতক শুরু হওয়ার আগেই উত্তর আমেরিকার বাইসনরা নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হয়। তবু শিকারীদের হাতে তাদের নিষ্কৃতি ছিল না।

বীভার ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হাডসনস্ বে কম্পানী বছরে ৫০,০০০ হাজার মত বীভারের লোমশ-চর্ম চালান দিত। কোন নতুন বীভার ব্যাধকে কোম্পানীর কাছে রাইফেল কিনতে হলে তাকে মূল্যস্বরূপ দিতে হতো, রাইফেলটির কুঁদোর উচ্চতার সমান বীভ্যার চর্মের থাক। বীভ্যার শিকারের অধিকার নিয়ে রেডইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কয়েকটা লড়াই পর্যন্ত হয়ে গেছে।

আওডুবন হুপিং ক্রেন নামে বৃহদাকার সুদর্শন সারসগোষ্ঠীর নিধনপর্ব দেখেও খেদ করে গেছেন। ঋতু পরিবর্তনের সময় আকাশে হর্ষ জাগিয়ে সেই সারসদের অগণ্য বলাকা আমেরিকা মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দেশান্তরে যেতো। কিন্তু তাদের মাংস ও পালকের লোভে ব্যাধব্যাপারীরা তাদের প্রায় নিঃশেষ করে দেবার উপক্রম করে। আজ তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে গোটা তিরিশে। যদিও আজ তারা আইনের দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু তাদের অবলুপ্তি প্রায় নিশ্চিত।

আওডুবনের মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে আমেরিকায় ব্যাপকভাবে বাইসন নিধন আরম্ভ হলো। মানুষের নির্দয় ও নির্বোধ পশু-হত্যার ইতিহাসে সেই হত্যাকাণ্ড তুলনাহীন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর আমেরিকার বাইসনের সংখ্যা ছিল ছ' কোটি। পৃথিবীতে আর কোথাও কখনো অত বিপুল পরিমাণে জান্তব আমিষ কেন্দ্রীভূত হয়নি। প্রথমে মাংস, চামড়া ও হাড়ের লোভে, পরে নিছক হত্যার উল্লাসে যূথবদ্ধ ও দুর্ধর্ষ সেই শৃঙ্গীদের যন্ত্রণাকাতর অসহায় মৃত্যু দেখার মত্ততার, সর্বশেষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিতে ঐ শতাব্দী শেষ হবার আগেই বন্য বাইসনরা নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। ঐ বন্য প্রাণীদের লুপ্তবংশ করার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা ছিল তাদের ওপর খাদ্য ও পরিচ্ছদের জন্যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল রেডইণ্ডিয়ানদের উপজীবিকাহীন করে অনাহারে মারা।

ফ্রান্সিস পার্কম্যান নামে এক ব্যক্তি লিখে গেছেন যে, তিনি কোথাও কোথাও দিগন্তবিস্তৃত বাইসনদের শটিত শব পড়ে থাকতে দেখেছেন। কেবলমাত্র তাদের দেহের সবচেয়ে স্বাদ ও বিক্রয়যোগ্য অংশ,—জিভগুলি কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ক্রমে ৬ কোটি বাইসন যখন মাত্র কয়েক শুজনে এসে দাঁড়ালো, তখন সরকারের টনক নড়লো। কোন প্রকারে টিঁকে যাওয়া শেষ কটি বাইসনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কানাডার একটি সংরক্ষিত বনে ছেড়ে দেওয়া হোল। আজ আবার তারা একটি বৃহৎ পালে পরিণত হয়েছে।

মানুষের জীব-নিধনপর্বের কোন কাহিনীই অবশ্য আমেরিকার 'প্যাসেঞ্জার পিজন' বা যাযাবর পারাবতদের নিশ্চিহ্ন করার কাহিনীর সঙ্গে তুলনা হয় না। এই দীর্ঘপুচ্ছ পারাবতেরা লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে, প্রচন্ড গতিশীল বিশাল মেঘের সামিয়ানার মত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনো বা কয়েকটা দিন আকাশ আবৃত করে দেশান্তরে যেতো। ১৮৭৬-৭৭ সালে একজন শিকারী লিখে গেছেন, তিনি ২৮ মাইল লম্বা এবং ৩-৪ মাইল চওড়া একটি যাযাবর পায়রার ঝাঁক দেখেছেন। সেই যাযাবর পাখিদের ঝাঁক যখন হঠাৎ কোন বনভূমির ওপর অজস্র ধারায় নেবে আসতো তখন সেই বনভূমির কোন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় আর তিল-ধারণের স্থান থাকতো না। এদের অযত্নে অযত্নে দল বাঁধা ছিল এক এলাহী ব্যাপারে, আটাশ-তিরিশ মাইল দীর্ঘ বনভূমির প্রত্যেকটি শাখা-উপশাখা এদের বাসায় আবৃত হয়ে যেত।

এরা যখন একটি বিশাল অরণ্য আবৃত করে কোথাও আশ্রয় নিত তখন মানুষ এসে লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে মারতো। কখনো বা তাদের ভারে কোন ডাল ভেঙে পড়লে তাদের খপাখপ কুড়িয়ে নিত। এদের সংখ্যা এতই বিরাট, বিশাল ছিল যে প্রথম প্রথম এত ব্যাপক হত্যাতেও এদের বিশেষ কিছু এসে যেতো না। হয়তো শুধু লাঠিবাজি

কিম্বা বন্দুকবাজি করেও এদের শেষ করা যেতো না। কিন্তু হত্যার সঙ্গে সঙ্গে চলল বনভূমি উৎখাৎ করে তাদের নির্বংশসাধন। শেষ যাযাবর পারাবতটির মৃত্যু হয় ১৯১৪ সালে সিনসিনাটির চিড়িয়াখানায়।

১৯১৪ সালের মধ্যেই আমেরিকায় ল্যাব্রাডর হাঁস, গ্রেট অক্, হীথ হেন বা মেঠো মুরগী, করলিনা, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখি শেষ হয়ে যায়। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শেষ হয় আরিজনা এল্ক, পূর্বী এল্ক ক্যালিফোর্নিয়া, টেকসাস ও সমতলভূমি 'গ্রীজি'-ভাল্লুক, পূর্ব অরণ্যের বাইসন, ধূসর নেকড়ে, পূর্বী পুমা বা বিড়াল জাতীয় প্রাণী, বেডল্যান্ড 'বিগহন' এবং বৃহদাকৃতি সমুদ্র সিংক প্রভৃতি।

অস্ট্রেলিয়া

শুধু বন্দুকবাজি নয়, বনভূমির বিনাশ সাধন, নদীর গতিপরিবর্তন, জলাভূমির ভরাটসাধন, দেশান্তরের গাছপালা ও জীবজন্তু এনে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করেও যে দেশ-মহাদেশ বিশেষের আদিম জীব-জগতের কী মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া।

প্রায় ১৫ কোটি বছর ধরে দুস্তর সাগর ব্যবধান বিচ্ছিন্ন এই মহাদেশে জীবজগতের বিবর্তন তার বিচিত্র ও বিশিষ্ট ধারায় প্রায় অব্যাহত প্রবাহিত ও প্রবর্তিত হয়ে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন কুক এই বিচিত্র মহাদেশের খবর ইউরোপে নিয়ে আসার পরই এই মহাদেশে ইউরোপীয় বিশেষ করে বৃটিশ জাতির উপনিবেশ সুরু হলো।

ইতিপূর্বে বলেছি যে, এই মহাদেশের বিচিত্র জীব বিবর্তন 'প্রায়' অব্যাহতভাবে প্রবাহিত ছিল। 'প্রায়' এই জন্যে ইউরোপীয়দের অস্ট্রেলিয়া বসতি স্থাপনের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে কৃষ্ণাঙ্গ আদিবাসীরা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তারা সঙ্গে আনে ডিঙ্গো নামে এক জাতের মারাত্মক বাঘা কুকুর। ডিঙ্গো অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারু ও অন্যান্য জীবদের কম ক্ষতি করেনি। ইউরোপীয়রা প্রধানত শিকার ও সখের জন্যে নিয়ে এলো শিয়াল ও খরগোস। তাদের বংশবৃদ্ধি হলো অতি দ্রুত। তাছাড়া এলো গরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু। আর সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার আদি বিচিত্র জীবজন্তুরা উপেক্ষিত ও নগণ্য হয়ে পড়লো। খেত-খামার ও চারণভূমির প্রসারে তাদের বাসযোগ্য স্থান সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগলো। নানা ধরনের গাছপালা ও ঘাস এলো। গৃহপালিত জন্তুদের পক্ষে তা প্রয়োজনীয়। কিন্তু আদি জীবদের পক্ষে ক্ষতিকর।

আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল

উত্তর আমেরিকার জীব নিধনপর্বের সঙ্গে তুলনীয় হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জীবন-নিধনের রক্তঝরা কাহিনী। উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র-সীমান্ত কেপ অঞ্চল থেকে যতই ঔপনিবেশিকেরা উত্তরে এগোতে লাগলো ততই তারা নির্বিচারে অরণ্য-প্রাণীদের হত্যা সুরু করলো। এ হত্যার তান্ডব শুধু মাংসের লোভে নয়, মারণের উল্লাসেও। তারপর ছিল অরণ্য ও অরণ্য-প্রাণীদের উৎখাত করে চাষ ও গৃহপালিত জন্তুর চারণ-ক্ষেত্রের বিস্তার। ১৮০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে তাদের হত্যা উল্লাসের ইন্ধন যোগাতে ব্লু-বাক নামে অ্যান্টিলোপেরা শেষ হয়ে গেল। আজ তাদের শেষ নিদর্শন হচ্ছে প্যারিস, লেডেন, স্টকহল্‌ম, উপসালা ও ভিয়েনার যাদুঘরে পাঁচটি খড়-গাদা চামড়া। বন্টেবক নামে আরেক জাতের এ্যান্টিলোপও নিঃশেষ হয়ে আসছিল। কিন্তু তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ক্রুগার ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে একটি ঘোষণায় বেপরোয়া বন্যপ্রাণী হত্যা বন্ধ করে দিলেন। বন্টেবকেরা আর নিশ্চিহ্ন হলো না। কিন্তু আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে, শিকারের নেশায়, দাঁত, চামড়া ও মাংস আহরণের পেশায় হাতী, গন্ডার, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ ও সিংহ বধ প্রায় অব্যাহত গতিতে চলল। গন্ডারের শিঙজাত ওষুধ আবার পুরুষত্বহীনতার মহৌষধ বলে কুসংস্কার থাকায় তা মহার্ঘ। আজ সমগ্র আফ্রিকায় কালো গন্ডারের সংখ্যা হাজার বারো এবং শাদা গন্ডারের সংখ্যা হাজার চারেক। নিধনের সঙ্গে আবাদের প্রয়োজনে নিরণ্যকরণও আফ্রিকার অরণ্য-প্রাণীদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে লাগলো। সম্প্রতি অবশ্য বহু সংরক্ষিত বনাঞ্চল ও জাতীয় উদ্যান করে আফ্রিকার গৌরব সব অরণ্য-প্রাণীদের বাঁচাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই জাতীয় উদ্যান ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল আজ বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিরাট আকর্ষণ এবং কেনিয়া উগান্ডা প্রভৃতি দেশগুলির বৈদেশিক মুদ্রার্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু স্থলভূমিতেই নয়। সমুদ্রের বুকেও মানুষের লোভ ও হত্যার উল্লাস বহু সমুদ্র-প্রাণীর অস্তিত্ব সংশয়াপন্ন করে তুলেছে। যেমন মেরু অঞ্চলের সিন্ধুঘোটকদের দুর্ভাগ্য যে, তাদের দেহের চর্বি ও চর্মই শুধু মানুষের প্রয়োজন নয়, তাদের দাঁতও মূল্যবান। তাই তারা অতীতে হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে, আজো দিচ্ছে। ধনী রমণীদের কোট তৈরীর প্রয়োজনে শীলদের নির্বিচার নিধনপর্ব আজো অব্যাহত।

রাশিয়ান, নরউইজিয়ান ও জাপানীরা বহুদিন পর্যন্ত পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অতি-লাভজনক নীল তিমি শিকার করে এসেছে। এই তিমিরা প্রায়ই একশ ফিট পর্যন্ত লম্বা এবং ওজনে হয় শ'খানেক টন। মানুষ এত বৃহৎ জন্তু আর কখনো দেখেনি। প্রধানত পূর্বোক্ত ঐ তিনটি

জাতির লোভে সেই বিশাল সমুদ্র-প্রাণীদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির উপক্রম হওয়ায় আন্তর্জাতিক তিমি কমিশন রাশিয়া, নরওয়ে, ও জাপানকে তিমি শিকার দারুণভাবে কমিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেয়। রাশিয়া ও নরওয়ে সে নির্দেশ মেনে নিতে রাজি। কিন্তু জাপান বিশেষ কোন সাড়া দেয়নি। তার কারণ তিমি শিকারের জন্যে বিশেষ ধরনের জাহাজ প্রভৃতির জন্যে রাশিয়া ও নরওয়ে যে টাকা লগ্নী করেছিল, তা তারা প্রায় তুলে নিয়েছে। কিন্তু জাপান তা এখনো পারেনি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা আশংকা করেন যে ঐ ব্যাপারে অচিরে কোন জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে নীল তিমিরা আদিকালের অনেক অতিকায় জন্তুর মতই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

সমুদ্র-প্রাণীদের রক্ষা করার একটা অসুবিধা হচ্ছে সমুদ্র হল আন্তর্জাতিক দখলে। যেসব জাতি নিজের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে জীবজন্তু সংরক্ষণে রীতিমত আগ্রহশীল তারাও দূর সমুদ্রের জীব-রক্ষায় নির্মমভাবে উদাসীন। এই উদাসীনতার জন্যে অতীতে নানা জাতির জাহাজ সমুদ্রে অসাবধানে চলে, কিম্বা অব্যবহৃত তেল ফেলে লক্ষ লক্ষ সমুদ্র-পাখির জীবন বিপন্ন করতো। কারণ জাহাজ থেকে অল্প পরিমাণে তেল ফেললেও তা ঢেউয়ে ঢেউয়ে দূরব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। সেই তেল পাখিদের পাখায় একবার লাগলে, তা জট-পাকিয়ে ও চটচটে হয়ে যায় ও ক্রমে তারা অবসাদগ্রস্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে, ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং স্বল্পকালের মধ্যেই দলে দলে অসহায় মৃত্যুবরণ করে। বিষয়টা এমনি ব্যাপক হয়ে পড়ছিল যে, ১৯২৬ সালে ওয়াশিংটনে এর প্রতিরোধকল্পে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে বৈঠকে যোগদানকারী জাতিসমূহ নিজ দেশের জাহাজ কোম্পানীসমূহকে নির্দেশ দেবে তারা যেন তীরভূমির পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তেল না ফেলে। তার কয়েক বছর আগেই ১৯২১ সালে বৃটেনে অনুরূপ একটি আইন গৃহীত হয়। তৎসত্ত্বেও অনেক সময় নির্দেশ ও আইন অমান্য করে বহু অবিবেচক জাহাজকর্মচারী সমুদ্রে তেল ফেলে সাগরপাখিদের প্রাণ সংশয় করে। তার ওপর দুর্ঘটনা ও তেলের জাহাজ ডুবি তো আছেই।

সম্প্রতিকালে কৃষিতে কীট ও আগাছা-নাশক নানা রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে বহু পাখির মৃত্যু ঘটেছে এবং কয়েক জাতের ক্ষয়িষ্ণু পাখির বন্ধ্যাত্ব ঘটেছে। তাছাড়া কয়েক জাতের নয়নাভিরাম প্রজাপতি ও পতঙ্গের মড়ক লেগেছে। সম্প্রতি বৃটেনে তাই নিয়ে খুব সরগোল হয়ে গেছে। কারণ পাখি জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার কিম্বা বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্যেই প্রয়োজন নয়, প্রকৃতির ভারসাম্য রাখাও মানুষের স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যেমন পতঙ্গদের ফুলে ফুলে পরাগ বহন করে ফলোৎপাদনের সহায়তার কথা কিম্বা কীটদের মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কথা সবাই জানেন। রাসায়নিক ব্যবহার করে তাদের নিশ্চিহ্ন করাও যেমন বিপদজনক, আবার তাদের অব্যাহত বৃদ্ধিও ক্ষতিকর। তাই তাদের সংখ্যার সমতা রক্ষার জন্যে প্রকৃতি যেন পাখিদের নিয়োজিত করে ছিল। তারা শুধু পূর্বোক্ত কীট-পতঙ্গের সংখ্যা সমতাই রক্ষা করে না, গাছপালার পক্ষে অনেক ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গদের নাশ করে।

অরণ্য ও জলচর প্রাণীদের প্রতি নির্বুদ্ধি অবহেলা, নির্মমতা এবং স্বার্থপর লোভে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের কী অপরিমাম ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনাসাপেক্ষ। একশৃংগী গন্ডার, কালো-বাঘ প্রভৃতি নির্বংশ হওয়ার কথা হয়তো অনেকেই জানেন। গিরের সিংহরা কিভাবে অবলুপ্ত হতে হতে বেঁচে যায় সে কাহিনীও হয়তো নতুন নয়। তবু সেই সকরুণ কাহিনী আবার সুন্দরবনের রয়াল-বেঙ্গল টাইগার নানা জাতের বন্য-মার্জার জাতীয় প্রাণী, বিচিত্র হরিণ, সাজারু, সাপ ও বহু পাখির ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। এ বিষয়ে জনসাধারণ ও সরকার এখনই সতর্ক না হন তবে ভারতের মহিমান্বিত প্রকৃতির অনেক অনুপম সম্পদ চিরতরে ক্ষইয়ে ফেলার জন্যে ভাবীকালের কাছে আমরা দায়ী হবো।

[প্রবন্ধটির বহু উপাদান ও ছবির জন্যে লেখক লন্ডনের রবিবাসরীয় অবজারভার পত্রিকার নিকট ঋণী।]

উত্তর আমেরিকার গ্রিজি ভালুকেরাও মানুষের হাতে শেষ হয়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আমরা এই স্তম্ভে অনেকবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে, ভারতের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্য বিদেশে যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে না, তার কারণ, উৎকৃষ্ট ইংরাজী অনুবাদের অভাব। ইংরাজী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে কোনো এক বিশেষ অঞ্চলের রচনা অন্য প্রান্তের লেখক ও পাঠকের জানার সুযোগ হয়।

ইদানীং কালে লক্ষ্য করা গেছে যে, বোম্বাই ও দিল্লীর কিছুসংখ্যক সুপ্রতিষ্ঠ হিন্দি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র বাংলাদেশের গল্প ও কবিতার অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। শুধু বাংলা নয়, সেই সঙ্গে অন্য প্রান্তের সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদের দিকে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে, বাংলা, গুজরাতি, তামিল, মালয়ালী, ওড়িষী, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় রচিত কিছু কিছু রচনার অনুবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপের প্রচারের তেমন সুবিধা নেই।

আধুনিক বাংলা কবিতার অনুবাদ 'বেঙ্গলী লিটারেচার' নামক ত্রৈমাসিক পত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাংলা গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশের কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। শারদীয় উৎসবের সময় দু-একখানি ইংরাজী দৈনিকের বিশেষ সংখ্যায় দু-একটি গল্প ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তার হয়ত বেশী প্রচার হয় না। উপযুক্ত অনুবাদকের যে অভাব আছে তা মনে হয় না, অভাব উপযুক্ত মাধ্যমের, যার মারফৎ বাংলা সাহিত্য বাইরে প্রচার করা সম্ভব।

সম্প্রতি গঠিত ট্রান্সলেটারস সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, আগে যার নাম ছিল ট্রান্সলেটারস ক্লাব, তাঁরা এই কাজটির ভার নিয়েছেন। এঁরা ভারতীয় ভাষা থেকে বিদেশী ভাষায় এবং বিদেশী ভাষা থেকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাঁরা পেশা হিসাবে অনুবাদের কাজ করবেন, তাঁদের এই প্রতিষ্ঠান উৎসাহ দেবেন।

নিঃসন্দেহে এই প্রতিষ্ঠানটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে অভিনন্দিত হবে। কিন্তু প্রয়োজনের অনুপাতে এইসব প্রচেষ্টা অনেক সামান্য।

বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের স্বভাবতই গর্ব বোধ করার কিছু আছে। ভারতের আঞ্চলিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম এই বাংলাভাষা অনেক সমৃদ্ধ এবং বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মের মান অনেক উঁচে। বাংলা সাহিত্যে সমশক্তিসম্পন্ন একাধিক সাহিত্যিক আছেন যা অন্যত্র নেই।

কিন্তু পূর্বে যে-কথা উল্লেখ করেছি, সেই কথার জের টেনে বলি, আজ আমাদের এই বিরাট সাহিত্যকর্মের কোনো পরিচয় বাইরে নেই। বিদেশে যে-সমস্ত রাষ্ট্রদূতেরা আছেন এবং তাঁদের সেইসব দপ্তরে যাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁদের বাংলাভাষা কেন, নিজেদের মাতৃভাষা বিষয়েও বোধহয় উপযুক্ত জ্ঞান নেই। ফরেন সার্ভিসের কৌলীন্যপ্রাপ্ত এইসব ভাগ্যবানরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য কিছুকাল আগে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের মাইকেল মধুসূদন সংক্রান্ত অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বাংলাভাষায় গবেষণাকর্মে নিযুক্ত অনেক আমেরিকান, জার্মান, ফরাসী এবং রুশ ছাত্র এবং অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে যে, বাংলাভাষার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে ভারতীয় দূতাবাস থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় না।

এর ওপর আছে স্বদেশের কিছু কিছু বিভীষণমার্কা লেখক। এঁরা ইংরাজী লিখতে পারেন, এবং সেই সূত্রে ভারতবাসীর চরিত্র, ইতিহাস, সমাজজীবন ইত্যাদি বিষয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করে, জাতীয় চরিত্রের ব্যঙ্গ করে কিপ্‌লিঙী ঢঙ-এ কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস লিখে পশ্চিমের বাজারে সুলভে নাম কিনে ফেলেন। এবং যেহেতু বিদেশে তাঁদের গ্রন্থাদির প্রচার হয়, সেই হেতু ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন হলে বিদেশী সম্পাদকরা এঁদের হয়ত অনুরোধ করেন, কিংবা এঁরা নিজেরাই হয়ত তদ্বির-তদারক করে ফ্রীল্যান্স জার্নালিস্ট হিসাবে চুটকী নিবন্ধ লিখে থাকেন। এইসব লেখক বিদেশের হাততালি এবং প্রসাদ লোভে স্বদেশের যে কিরকম ক্ষতি করেন, তার পরিচয় দিয়েছেন পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র সরকার একটি প্রবন্ধে। প্রবন্ধকার ইংরাজী ও বাংলা উভয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং যে-কজন মুষ্টিমেয় বাঙালী বর্তমান কালে ইংরাজী ভাষায় বাংলা সাহিত্যের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় দানে ব্রতী তিনি তাঁদের অন্যতম।

শ্রীযুক্ত সরকার দুটি লেখকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে—এঁদের একজনের নাম খুসবন্ত সিং, আর অপরটির নাম আর কে নারায়ণ। উভয় লেখকই সাম্প্রতিক কালে ইংরাজী ভাষায় গল্প-উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সুতরাং বিদেশীর চোখে তাঁরা ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক এবং সেই কারণে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে মতামত দানের অধিকার তাঁদের আছে এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়।

শ্রীযুক্ত সরকার লিখেছেন যে, ১৯৬০ খৃস্টাব্দে মিঃ খুসবন্ত সিং 'নিউ স্টেটস্‌ম্যানে' লিখেছিলেন যে, ভারতীয় কোনো ভাষায় আজ পর্যন্ত কোনো 'নভেল' লিখিত হয়নি। শ্রীযুক্ত সরকার এর প্রতিবাদে যে-পত্র পাঠান, সেই পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক তা ছাপেননি।

শ্রীযুক্ত সরকার তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন যে, পাঁচ বছর পরে মিঃ সিং আবার পুনরুক্তি করেছেন, 'মডার্ন ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' নামক তাঁর একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে 'এশিয়া—এ হ্যাণ্ডবুক' নামক বৃহদায়তন একটি গ্রন্থে। (এই গ্রন্থের প্রকাশক—এণ্টনি বণ্ড—লণ্ডন, দাম সাত পাউণ্ড সাত শিলিং)।

ক্ষুব্ধ হয়ে শ্রীযুক্ত সরকার লিখেছেন, এই রচনাটিও একদেশদর্শী উক্তিতে পরিপূর্ণ, অনেক অসত্য কথা এই প্রবন্ধে আছে এবং তার সমুচিত উত্তর দিতে হলে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন। এরপর তিনি ভারতীয় লেখকদের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

বাঙালী সাহিত্যিকদের বিদেশী ভাষায় লিখিত জ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সরকার। তাঁর প্রবন্ধে তিনি আর কে নারায়ণ লিখিত ও বোম্বাই থেকে প্রকাশিত টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রবন্ধে নারায়ণ বলেছেন যে, ভারতের কোনো ভাষাতেই উত্তম উপন্যাস রচিত হয়নি। এবং চিরন্তন ত্রিভুজ সম্পূর্ণ অনুশীলিত। লেখক এর যে প্রতিবাদ পাঠান, সেটি অবশ্য প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'; রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'; শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়া আরো কত যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস আছে তার ইতিহাস কে দেবে? শ্রীযুক্ত সরকার একটি গুরুতর সমস্যার ইঙ্গিত করেছেন এই প্রবন্ধে। বাঙালী লেখকদের কি কিছুই করণীয় নেই?

—অভয়ঙ্কর

কাণ্ডজ্ঞানহীন সমালোচনা

ভারতীয় সাহিত্য

পরলোকে দাদাঠাকুর ॥
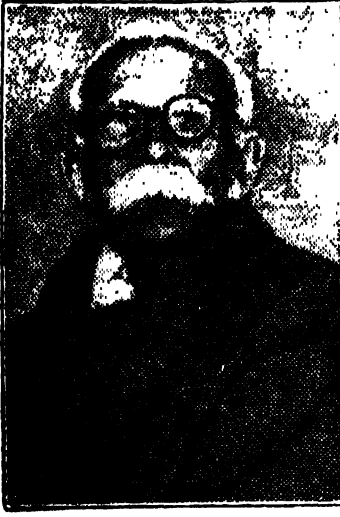
—'দাদাঠাকুর' নামে বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত, শরৎচন্দ্র পন্ডিত মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরে মারা গেছেন। ৮৭ বছর তাঁর বয়স হয়েছিল।

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ॥

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এবার পাঁচ বছরে পড়বে। লক্ষ টাকা নগদ অর্থ-মূল্যের এই পুরস্কার ১৯৬৬ সালে প্রথম পেয়েছিলেন মালয়ালাম কবি শ্রীজি শংকর কুরুপ এবং তার পরের বছরে পান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কারের কথা শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। বলা বাহুল্য, চতুর্থ বৎসরের জন্যও প্রস্তুতি চলছে।

পঞ্চম বার্ষিক পুরস্কারের জন্য এবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন ভারতীয় জ্ঞানপীঠ। ভারতীয় ভাষাভাষী যে কোন সাহিত্যিক এতে যোগদান করতে পারেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর পাওয়া যাবে: ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, ৯, আলিপুর পার্ক প্লেস, কলকাতা-২৭।

আধুনিক কবিতা ও কবিকথা ॥

'আধুনিক কবিতা ও কবিকথা' বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ। এই প্রচেষ্টাটি সত্যই অভিনব। কবিতাকে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টায় এঁদের এই উদ্যোগ সকলের অভিনন্দন লাভ করবে বলে আশা করি।

গত বৃহস্পতিবার এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীমতী লীলা রায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহেমচন্দ্র গুহ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়।

একটি মালয়ালম গল্পগ্রন্থ ॥

শ্রীপরমেশ্বরম পিল্লাই তরুণ মালয়ালম গল্পকারদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁর ছটি গল্পের একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পগুলির একটা ভিন্ন স্বাদ আছে। লেখক এই গল্পগুলির কাহিনী সংগ্রহ করেছেন তাঁর শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। শিশু-মনস্তত্ত্ব নিয়ে তাঁর লেখা গল্পগুলি সত্যিই অভিনিবেশের দাবী রাখে। এই গল্পগুলি পাঠ করলে স্পষ্টতঃই অনুভব করা যায়, সাম্প্রতিক মালয়ালম সাহিত্য নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে।

কবি সম্মেলন সম্পর্কে ॥

সম্প্রতি কলকাতার রবীন্দ্রসদনে তিনদিনব্যাপী যে সারা ভারত কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র থেকে কয়েকটি বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সম্মেলনের সম্পাদক শ্রীআশিস সান্যাল জানান—"একমাত্র রাজ্য সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা সাহায্য ছাড়া এই সম্মেলন কোনও সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও সাহায্য পায়নি। এমনকি রেলওয়ে কনসেসন পর্যন্ত এই সম্মেলন পায়নি। বেশ কিছু টাকার ঋণে এখনও সম্মেলন আবদ্ধ।" সম্মেলনের আয়-ব্যয়ের হিসেব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অডিট হবার পরেই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হবে।

পরলোকে সংস্কৃত সাহিত্যিক ॥

ওড়িশার প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যিক শ্রীকরুণাকর কর কয়েকদিন আগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কটকে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। ১৯৫৩ সালে তিনি রেভেনশ কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ওড়িশার শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবনমালী পট্টনায়ক, সমাজ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধানাথ রথ লেখকের বাসভবনে এসে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

প্রাচীন তামিল কবিতা ॥

তামিল কবিতার প্রাচীন যুগ যে খুবই সমৃদ্ধ সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবু ঐ যুগের বিস্তৃত বিবরণ পাবার কোনও সুযোগ আমাদের ছিল না। সম্প্রতি এ অভাব আমাদের মিটিয়েছেন শ্রীজেভিয়ার এস থানি নায়াগম।

শ্রীনায়াগম বর্তমানে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। 'তামিল সংস্কৃতি' নামক ইংরেজি ত্রৈমাসিক পত্রিকারও তিনি সম্পাদক। ইংরেজিতে লেখা তাঁর এই গ্রন্থটিতে প্রাচীন তামিল কবিতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। "ক্লাসিক্যাল তামিল কবিতা ও প্রকৃতি" নামক প্রবন্ধটি খুবই সারগর্ভ হয়েছে। সঙ্গম যুগের তামিল সাহিত্য পৃথিবীর যে কোনও সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেতে পারে। লেখক বলেছেন, তখন তামিলে সংস্কৃত প্রভাব সম্বন্ধে কবিরা খুব সচেতন ছিলেন। সেই যুগের প্রায় এক হাজার পংক্তি কবিতা পাওয়া গেছে। সেই পংক্তিগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ।

লেখক এই গ্রন্থটি রচনার জন্য ভারতীয় সাহিত্যরসিকদের অভিনন্দন লাভ করবেন। ভারতবর্ষের মত বিচিত্র এবং বহুভাষী দেশে অনুবাদ একান্ত প্রয়োজন। এই অনুবাদ প্রথম অবস্থায় পরোক্ষ হবে, যেমন পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে হচ্ছে। অনুবাদে মূলের স্বাদ থাকে না সত্য, কিন্তু ভারতে এছাড়া আর কি পথ আছে?

একটি সাহিত্য সভা ॥

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসরই নবীনচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার আয়োজন করে থাকেন। এ বৎসর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ঊনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন—"মাইকেল মধুসূদনের অভ্যুদয় কালকে অনেকে প্রাচীন সাহিত্যের শেষ ও আধুনিক সাহিত্যের আরম্ভ বলে মনে করে থাকেন। এই ধারণা ঠিক নয়। কেননা, সাহিত্য হচ্ছে একটি বহমান নদীর মত। তাই কোনও একটি বিশেষ যুগকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সাহিত্য আলোচনার উপযোগী নয়।"

প্রসঙ্গতঃ তিনি নিধুবাবুর টপ্পা, কবিয়ালদের তরজা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত ও বিহারীলালের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখান যে, বাংলা সাহিত্যের মূল ক্ষেত্র গীতি-কবিতা। গতিধর্মতাই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ। মাইকেলও এই প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর রচিত মহাকাব্যগুলিতেও এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য তো এই গীতিময়তার উজ্জ্বল নিদর্শন। তাই এই দুই কালকে বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা চলে না।

এই আলোচনা সভায় পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীঅজিত দত্ত।

বিদেশী সাহিত্য

সাহিত্যের জন্য রাজ্য পুরস্কার॥

এ বছরের শুরুর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রাজ্যে সাহিত্যের জন্য বেশ কিছুসংখ্যক লেখক-লেখিকাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাজিকিস্তানে রুদাকি পুরস্কার পান বোকি রখিম-জাদে (কবিতার জন্য), ফজলিদ্দিন মুখাম্মাদিয়েভ (বিদ্রূপাত্মক গল্প রচনার জন্য), ভ্লাদিমির দেরজাভিন এবং সেমিয়ন লিপকিন (অনুবাদের জন্য)। উজবেকিস্তানের খামজা পুরস্কার দেওয়া হয় কামিল ইয়াসেনকে তাঁর নাটক 'দি গাইডিং স্টার' ও 'নুরখন-এর জন্য। উগানকে তাঁর 'লাইফ কলস ফোর্থ' ও 'স্প্রিং ইন মাই হার্ট' কাব্যগ্রন্থের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। কাজাখ যুক্তরাজ্যের আ্যাবাই পুরস্কার পান সাবিত মুকানভ ও আনোয়ার আলিমজানভ। তুর্কমেনিয়ার মখনতুমকুলি পুরস্কারে সম্মানিত হন বেরেদি কের্বাবায়েভ তাঁর ছোট উপন্যাস 'দি স্টীম উইল ব্রেক থ্রো' গ্রন্থের জন্য; নরিমান জুমায়েভ এবং বেদি খুদাইয়ানাজারভও উপন্যাসের জন্য পুরস্কার লাভ করেন। মোলদাভিয়া রিপাবলিকান পুরস্কার পান আন্দেই লুপান (কবিতার জন্য), ইয়ন দ্রুতা (উপন্যাসের জন্য)। ইস্তোনিয়ান গদ্য লেখক আদু হিন্ট 'দি সোর অব উইণ্ডস' উপন্যাসের জন্য পুরস্কৃত হন।

পরলোকে আন্নেত্তে কোলব॥

পশ্চিম জার্মানির মহিলা সাহিত্যিক আন্নেত্তে কোলব বিরানব্বই বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন সম্প্রতি। ১৮৭৫ সালে তিনি মিউনিকে জন্মগ্রহণ করেন। গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বহুবার বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিতা হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে তাঁকে গোটে পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন জার্মান উদ্যানপালক ও ফরাসী পিয়ানোবাদকের কন্যা। সারাজীবন তিনি উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত হয়েছেন। দু-দুবার তিনি জার্মান-ফরাসী যুদ্ধের সময়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নিউইয়র্কে থাকতে বাধ্য হন। ১৯৪৫ সালে তিনি ইউরোপে ফিরে আসেন। এবং তখন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুইচ সীমান্তের নিকটবর্তী বাদেউলার-এ কিংবা প্যারিসে পালাক্রমে বসবাস করে আসছিলেন।

প্রাক্-যৌবনের জটিলতা॥

উইলিয়াম গোল্ডিং-এর নতুন উপন্যাস 'দি পিরামিড' একটি ত্রিবৃত্ত কাহিনী নিয়ে গঠিত। এ উপন্যাসের গঠনমূলে রয়েছে তিনটি স্বতন্ত্র উপকাহিনীর সক্রিয়তা। উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত হওয়ায় এই কাহিনীগুলি কোনরকমে সংযোগ বজায় রেখে একটি গ্রন্থভুক্ত হতে পেরেছে। অবশ্য কাহিনী তিনটির স্থানীয় পটভূমি এক। ইংলণ্ডের 'স্টিলবোর্ন' নামে একটি গ্রাম তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে। মিঃ গোল্ডিং নায়কের জীবনের বিকাশধারাটিকে উপেক্ষা করেননি। তার নাম অলিভার। গ্রামবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে তারও দেহমনের পরিবর্তন হয়েছে। অলিভার দেখেছে কিভাবে গ্রামের মানুষেরা বেড়ে উঠেছে, মারা গেছে, পীড়িত হয়েছে কিংবা গ্রাম থেকে অন্যত্র চলে গেছে। একটি আদর্শ ইংরেজ গ্রাম থেকে স্টিলবোর্ন ক্রমে একটি কুৎসিত ছোট্ট শহরে পরিবর্তিত হয়েছে। কৈশোরের সঙ্গীতময় গভীরতা থেকে এই উপন্যাসের কাহিনী বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে মধ্যবয়সী সিনিক্যাল বিদ্রূপের বুদ্বুদরূপে নিষ্ক্রান্ত ও সমাপ্ত হয়েছে।

কমনওয়েলথ পুস্তক প্রদর্শনী॥

গত ১৮ই এপ্রিল লন্ডনের অস্ট্রেলিয়া হাউসে অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার স্যর আলেকজান্ডার ডাউনার কমনওয়েলথ পুস্তক-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এবারের প্রদর্শনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিদেশী গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। শিল্প ও কলাবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাই অবশ্য বেশি: এই বিভাগে প্রদর্শিত ২৫০টি গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই বৃটেন কিংবা কমনওয়েলথের অন্যান্য অঞ্চলের গ্রন্থকারদের রচনা। শিশু, বর্তমান কমনওয়েলথ, কমনওয়েলথের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প এবং বাণিজ্য-বিভাগে মোট আট শতাধিক গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য জনসাধারণকে কমনওয়েলথের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত করানো এবং তাঁদের সাহিত্য-কৃতির মধ্য দিয়ে কমনওয়েলথের সার্থকতা প্রতিপন্ন করা।

একটি হিব্রু উপন্যাস॥

প্রখ্যাত হিব্রু ঔপন্যাসিক এস ওয়াই অ্যাগনন রচিত 'এ গেস্ট ফর দি নাইট' নামে একটি গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন মিশা লুভিস।

অ্যাগনন-এর বর্তমান বয়স ৭৯। ১৯৬৬ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। মেজাজের দিক থেকে তিনি শান্ত, শব্দোচ্চারণে বিনীত, মানসিকতায় দার্শনিক ভাবাপন্ন লেখক। তাঁর লেখায় এই দৃশ্যমান জগতের ব্যস্ততা কিংবা জটিলতা স্থায়ীরূপ দিতে পারেনি। বরং তিনি শুদ্ধতর জীবন-চেতনার সন্ধানে প্রায়শ আত্মমগ্ন। তাঁর মানসিকতার নির্মাণে ও গঠনে যে দার্শনিক দৃষ্টি কাজ করেছে, তার মধ্যে নবতর ভ্রাম্যমান ইহুদী সমাজের জীবনাচরণের প্রবহমানতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই উপন্যাসটি ইহুদী সমাজের স্থির অতীত ও অস্থির বর্তমানের দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে লেখা। যুদ্ধ, অস্থিরতা, নাগরিক জীবন, যুগযন্ত্রণা, প্রেম ও মানবতা—সবই তাঁর কাহিনীনির্মাণে সাহায্য করেছে।

শেকসপীয়র জন্মদিন॥

গত ২৩ এপ্রিল শেকসপীয়রের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ট আপ অন অ্যাভনে পৃথিবীর ৭১টি দেশের শত শত মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রাও বের হয়েছিল। এতে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিবিদগণ অংশ নেন। বলা-বাহুল্য, ভারতীয় হাইকমিশনারও বাদ ছিলেন না। আন্তর্জাতিকতার প্রতীক হিসেবে শহরের রাস্তায় ১৪৪টি দেশের জাতীয় পতাকা উড়তে দেখা যায়। উৎসব আরম্ভ হবার আগে বিদেশী প্রতিনিধিরা রয়েল শেকসপীয়র থিয়েটারে মিলিত হন। এখানে শেকসপীয়রের নাটক নিয়মিত অভিনীত হয়।

গলব্রেথের উপন্যাস॥

জন কেনেথ গলব্রেথের প্রথম উপন্যাস 'দি ট্রায়াম্প' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর কাহিনী নির্মাণ ও ঘটনা-সংস্থাপন একটু বেখাপ্পা ধরনের বলা যায়। লেখক সব-সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেন নি। ফলে পাঠক উপন্যাসের রসগ্রহণে বারবার বাধাপ্রাপ্ত হন। পাশ্চাত্য সমালোচকরা, একে আদৌ উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান না। তাঁদের মতে লেখক এই গ্রন্থে উপন্যাসের কাঠামোয় মার্কিনী পররাষ্ট্রনীতিরই প্রচার করেছেন।

লরেন্স ডুরেলের উপন্যাস॥

লরেন্স ডুরেলের একটি উপন্যাস সম্প্রতি বেরিয়েছে। এই উপন্যাসের নায়িকার মেজাজ কিছুটা নিউরোটিক, মাথায় ঘন সোনালি চুল, অন্তরে গণিকা। সে তার নাচ-ঘরের দেয়ালের কাচে প্রতিফলিত নিজের প্রতিচ্ছবির ওপরে গুলি চালায়। এই প্রাক-নিরূপিত ঘটনায় নায়িকার মানসিক সঙ্কট ও প্রতীকী মৃত্যুর বিষয়টি অত্যাধুনিক বহু উপন্যাসের উপজীব্য বলে গৃহীত হয়েছে। 'দর্পন' আজকের উপন্যাসে বহু-ব্যবহৃত একটি প্রতীকচিত্র। ডুরেল তাঁর উপন্যাসে এই প্রকার শব্দ ও চিত্রকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেও কোন প্রকার অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে পারেন নি।

নতুন বই

রম্যানি বীক্ষ্য : কোশল পর্ব [ভ্রমণোপন্যাস]— সুবোধকুমার চক্রবর্তী।। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।। ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভ্রমণের নেশা মানুষকে পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত করে। সুবোধকুমার চক্রবর্তী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অঞ্চল ও শহরগুলির ইতিহাস জানেন। তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষসূত্রে জড়িত। মানসিকতার দিক থেকে প্রায়শঃ উদাসীন ও নিরাসক্ত। অনুভবের সঙ্গে উপভোগের এবং দর্শনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্মিলিত ও স্বয়ংগঠিত দৃষ্টিকোণের প্রবর্তক বলা না গেলেও অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা বলা যায়। তাঁর রম্যানি বীক্ষ্য প্রথম পর্ব প্রকাশের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠক নতুন রসাস্বাদে বিস্মিত হয়েছিলেন। পরবর্তী পর্বগুলির চাহিদা এই অভিনবত্বের জন্যই অব্যাহত থাকে।

রম্যানি বীক্ষ্য (কোশল পর্ব) সম্পূর্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্ত নয়। ভ্রমণের সঙ্গে কাহিনীযুক্ত হওয়ায়, বিশ্বাসযোগ্যভাবেই তা উপন্যাসধর্মী; স্থানকালের যোগাযোগে পাঠকের মনে যুগপৎ ভ্রমণ ও উপন্যাসের মিশ্রক্রিয়া সঞ্চারিত করে। এই গ্রন্থের স্থানীয় পটভূমি হিসেবে রয়েছে কাশী, কোশল, অযোধ্যা, এবং হিমালয়ের শৈলাবাস, তীর্থস্থান ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি। আধুনিক ভারতের সমৃদ্ধ নগর, ও জাতীয় কর্মকান্ডের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির পরিচয় দিতে লেখক বিস্মৃত হননি। বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনের পরিবেশ, জন ও জনতার সংবাদ এবং বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাও তিনি বলেছেন। আর কাহিনী অংশে রয়েছে লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় গোপাল নামক একজন যুবকের প্রচ্ছন্ন প্রেমার্তি ও উদাসীন পর্যটকের নিয়তিতাড়িত উপাখ্যান। এই অংশের প্রধান নারীচরিত্র তাঁর প্রায়-নিঃসম্পর্কিত মামাতো বোন স্বাতি। এই ঘটনার সমান্তরালপ্রায় স্থাপিত হয়েছে অপর একটি কাহিনী—চাওলা নামক একজন পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে মিত্রা নাম্নী অপর এক বাঙালি যুবতীর সুস্থ পরিণয় ও সফল পরিণতির উপাখ্যান। মাঝে মাঝে স্মৃতিচারণা উপন্যাসের ছিন্নসূত্রকে পুনঃস্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, এ গ্রন্থে ভ্রমণ ও কাহিনী একাত্ম হয়ে মিলে যেতে পারেনি। মনে হয়, লেখক স্বতন্ত্র দুটি গ্রন্থের জোড় একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

ইদানীং সমকালীন রাজনীতি, অতীতচারী ইতিহাস ও জার্নালধর্মী বিষয়কে অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হচ্ছে। সুবোধকুমার চক্রবর্তী এদিক থেকে নতুন পথের যাত্রী। আমাদের বিশ্বাস, তিনি তাঁর রচনার দ্বারা পাঠকের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন।

ডাম্বর দিগন্ত (উপন্যাস) ব্রজমাধব ভট্টাচার্য। প্রকাশক : অরুণা প্রকাশনী, ৭, যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৭। পরিবেশক : জিগনেট বুকশপ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—১৬·০০।

বাংলাভাষায় বিপুলায়তন উপন্যাস আজকাল বেশ সুলভ। সবাই উপন্যাসের কলেবর বাড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য যে সুবিস্তৃত পটভূমির প্রয়োজন হয়, সে-কথা এসব উপন্যাস পড়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না। অথচ উপন্যাসের আয়তন এবং পটভূমির বিস্তার যদি সঙ্গতি রেখে চলে, তাহলেই যথার্থ মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলতে দ্বিধা নেই, শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্যের সম্প্রতি প্রকাশিত উপন্যাস 'ডাম্বর দিগন্ত' একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে এর কাহিনী শুরু, আর শেষ হয়েছে ১৯৪৭-এ, ভারতের স্বাধীনতার দিনে। দু-দুটো মহাযুদ্ধের সময়সীমা ছাড়া এর কাহিনীর বিস্তার ঘটেছে ভারত ও ইউরোপের নানা প্রান্ত জুড়ে।

উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যাবে নেটিভ স্টেটের রাজকুমার-রাজকুমারীদের সেই বিলাত-প্রীতির ভাববন্যা। বিলাতে পৌঁছে তারা তখনো বুঝে উঠতে পারছে না দেশটা সত্যি সত্যি মাটির, না অন্য-কিছুর। তাই নিজের দেশের সঙ্কট অপেক্ষা সে-দেশের আকর্ষণ তাদের কাছে অনেক বেশি। উৎকট সাহেবীপনা এবং বে-হিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতায় তারা তখন ভেসে চলেছে। এমনি একটি নেটিভ স্টেটের রাজকুমারী অনুপ্রভা এসেছেন বিলাতে। আর সাতারার দেওয়ানের ছেলে অচিন্ত্য গোস্বামীও এলেন বিলাতে। প্রথমজনের উদ্দেশ্য ছিল হয়তো বিদেশে বিলাসী জীবনযাপন। কিন্তু অন্যজনের লক্ষ্য স্থির, বিজ্ঞানের সাধনায় ডুবে রইলেন তিনি। প্রথম দর্শনেই বিজ্ঞান-সাধকের প্রেমে পড়লেন অনুপ্রভা। পরিণত প্রেমে ওঁরা বিয়ে করলেন। কিন্তু তারপরই শুরু হলো সংঘাত। রাজরক্তের অহমিকা ও জন্যতা এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও মনীষায় বিরোধ দেখা দিল। ক্রমে কাহিনী এগিয়েছে, পট পরিবর্তন হয়েছে।

উপন্যাসে সবচেয়ে ভাল লাগে লেখকের গল্প বলার ভঙ্গি। সুন্দরভাবে গল্পটি তিনি বলে গেছেন। কোথাও অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করেননি। উজ্জ্বল আন্তরিকতার স্পর্শে উপন্যাসটি মনোরম। চরিত্রচিত্রণের মধ্যে তাঁর স্বকীয়তা নজরে পড়ে। চরিত্রকে তিনি উপযোগী মর্যাদা দেবার প্রচেষ্টায় বেশ সফল হয়েছেন, যা সচরাচর নজরে পড়ে না।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

বেঙ্গলী লিটারেচার — (অল ইণ্ডিয়া পোয়েটস্ কনফারেন্স স্পেশ্যাল নাম্বার—১৯৬৮) — সম্পাদক—আশিস সান্যাল, অতিথি সম্পাদক — জগন্নাথ চক্রবর্তী ও শান্তি লাহিড়ী। ৫৩, বিধান পল্লী, কলিকাতা-৩২। দাম— তিন টাকা মাত্র।

বেঙ্গলী লিটারেচার পত্রিকার এই সংখ্যাটি রচনাগৌরবে ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে মূল্যবান। অজিত দত্ত, আলোক সরকার, অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, অরুণ সরকার, অরুণ মিত্র, অরবিন্দ গুহ, আশিস সান্যাল, অতীন্দ্র মজুমদার, বিমল ঘোষ, ভাস্কর চক্রবর্তী, বেলাল চৌধুরী, বাসুদেব চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, চিত্ত ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, দীনেশ দাস, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ বসু, গোপাল ভৌমিক, জীবনানন্দ দাশ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিরুল সিংহ, কেতকীকুশারী ডাইসন, কৃষ্ণ ধর, লোকনাথ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, মৃণাল দত্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায়, মনীশ ঘটক, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল রায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, তারাপদ রায়, তরুণ লাহিড়ী প্রভৃতি কবিগণের শতাধিক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই সংখ্যাটিতে সংযোজিত। বিশিষ্ট অনুবাদকবৃন্দ অনূদিত বাংলার কবিতার এই সাম্প্রতিক নমুনার বহুল প্রচার হওয়া উচিত।

বাক্‌পত্র (এপ্রিল-জুন ১৯৬৮)—সম্পাদক : বিনয় সেন। স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, যশোহর রোড, বনগ্রাম। দাম ৫০ পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় হরপ্রসাদ মিত্র, অলোক রায় এবং শেখর ঘোষের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি কবিতাও আছে।

কিশোর কিশোরী

বীরেন্দ্র দত্ত

শরতের রোদ চুপি চুপি সরতে সরতে সকালের ছায়াকে কোণঠাসা করেছে বাগানের ওদিকটায়। লেবুগাছের ঘন পাতার ঝোপে রোদ ছড়ানো, কেয়ারি-করা ঘাস আর বাহারে পাতার গাছ ছুঁয়ে বিচিত্র রং-বেরং-এর কয়েকটা প্রজাপতি উড়ছে। ঘাসপোকার চিঁ-চিঁ শব্দ কানে এল। করমচা গাছ চোখে পড়ল। পাশাপাশি বেল, আম, কামরাঙা, গাব গাছের ছায়ায় ও-দিকটা শীতল, একটু নিঃসাড়। গাছ-গুলির গা ঘেঁষে রাং-চিতার বেড়া গেছে বরাবর। জয়া চিবুক তুলে দূরে বেড়ার সীমা বরাবর চোখ বুলোল।

গীটারের ক্লাশ করে এই ফিরছে জয়া। কখন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে বাগানের গেটে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। বাগানটা চোখ বুলিয়ে দেখল। অলস ভঙ্গিতে গীটারটা হাতবদল করল। সঙ্গে সঙ্গে এক দমকা হাওয়া বাগানকে যেন নিমেষের মধ্যে

উড়িয়ে-ছাড়িয়ে দিল। কপালের ওপর কয়েকটা চুল শিরশির করে কাঁপল জয়ার। জয়া আকাশ দেখল। আজ প্রথম একটা নতুন বুনো গন্ধ পেল চারপাশ থেকে। শরীরের ভিতরটা আচমকা এক রকমের চাপা সুড়-সুড়ি দেওয়ার মতন কেঁপে উঠল।

কদিন ধরেই এরকম একটা অনুভূতি ওর শরীরের সঙ্গে গোপন এক খেলায় মেতেছে যেন। জয়া অকারণ হাসল। তার-পর বাগানে ঢুকে গেট বন্ধ করে বাড়ির দিকে ধীর পায়ে এগোতে লাগল। মাঝে মাঝে জোর হাওয়া বইছে। তবু রোদের জ্বালা কমেনি। জয়া বাড়ি ঢুকে দালানে পা দিয়ে রুমাল ঘষে কপাল মুছল।

'ও মা! এই তো এসে গেছিস! এই মাত্র তোর কথা বলছিলাম।' জয়ার মা রান্নাঘর থেকে একটু জোরে বলল কথাগুলো।

'কেন মা!' রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল জয়া।

'তোর আজ এত দেরী কেন রে!' আনাজ কোটা না থামিয়েই কথা বলল জয়ার মা।

'ইস্, বাসে যা ভিড়! তার ওপর বেল-গাছিয়ার পুলের ওপর জ্যাম।'

মা মেয়েকে দু'চোখ ভরে দেখল। মুখ-চোখ, চেহারা, কথাবার্তায় জয়া অত্যন্ত সপ্রতিভ। এক মাস হতে চলল শ্যামবাজারে গীটারের ক্লাশে ভর্তি করে দিয়েছে মেয়েকে। বোধ হয় স্কার্ট পরা আর গীটার হাতে ফুটফুটে মেয়েকে দেখে স্নেহের সঙ্গে চাপা খুশি ও একধরনের তৃপ্তি বোধ করল।

'আজ তোর মিনুমাসি আর অসীম এসেছে।'

জয়া ভুরু কোঁচকালো। চোখে-মুখে অবাক হবার মতন একটা নরম ভঙ্গি করল।

'ও অসীম,' জয়ার মা চেঁচিয়ে অসীমকে ডাকল। 'এদিকে এসো। জয়াকে দেখবে যে!' হাসতে হাসতে জয়ার কাঁধের পাশ দিয়ে দূরের ঘরে দৃষ্টি ফেলল।

জয়া পিছন ফিরে তাকাল। দু'চোখের চাপা বিস্ময় তখনো যায় নি। উদাসীন ভঙ্গিতে তাকিয়ে অসীমকে দেখল। জয়ারই সমবয়সী হবে একটি ছেলে। হাতে একটা বই নিয়ে ঘরের দরজার চৌকাঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্যান্ট পরা, গায়ে ধবধবে শাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। মাথাভর্তি কালো কোঁকড়ানো চুল। একটু ময়লা রং অসীমের। টানা চোখ দু'টো ঝকঝক করছে। মুখে, চেহারায়—কোথাও যেন ভয়-ডর নেই। স্বাস্থ্য বেশ ভাল। 'ইস্, মুখখানা কি মিষ্টি!' হঠাৎ মনে মনে বলল জয়া। মায়ের দিকে মুখ ফেরাল। দু'চোখে প্রশ্ন, ও কে মা?

মা বলল, 'ওকে বোধ হয় মনে করতে পারছিস না! অনেকদিন আগে একবার দেখেছিলি। তোর মিনুমাসির ছেলে রে! কালিকাপুরে বাড়ি। আমরা একদিন গিয়ে-ছিলাম! তোকে কত আদর করল মিনুমাসি, মনে পড়ছে না?'

কালিকাপুরের মিনুমাসিকে জয়ার মনে পড়ল। মায়ের অনেক পুরনো বন্ধু। এখানেও কয়েকবার দেখেছে। বেশ ভাল। তবে অসীমকে কিছুতেই মনে পড়ছে না ওর। গলায় চাপা উল্লাস মিশিয়ে বলল, 'মিনুমাসি কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'পাতিপুকুরে ওর এক বোনের বাড়ি গেছে। অসীমকে এখানে রেখে গেছে। সন্ধ্যের পর আসবে। আজ এখানে থেকে কাল কি পরশু বাড়ি যাবে।' জয়ার মা অসীমের দিক থেকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলল, 'তুই যা এখন। জুতো-মোজা ছাড়, হাত-পা ধুয়ে নে। ওর খাওয়া হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে খেলা কর, গল্প-গুজব কর। ও বেচারা বড় একা পড়ে গেছে। অনেকবার তোর কথা জিজ্ঞেস কর-ছিল।' জয়ার মা হাসল।

জয়া আর একবার অসীমকে দেখে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে এগোল গীটার রাখার জন্যে।

অসীম এতক্ষণ দেখছিল জয়াকে। জয়াকে ওর ঘরের দিকে এগোতে দেখে ও এ ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসল। পুলুমাসির শেষ কথা মনে হতে নিজে নিজেই ঠোঁটে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। হাতের বইটার প্রথম পাতা খুলল। জয়ার নাম চোখে পড়তেই ছুঁড়ে পাশে খাটের ওপর ফেলে দিল। 'হুঃ বয়ে গেছে ওর কথা বলতে। একবার না দুবার জিজ্ঞেস করেছি, তাতেই অনেকবার হয়ে গেল। পুলুমাসিটা কি যেন!' অসীম মনের মধ্যে গজগজ করল।

পুলুমাসির ওপর রাগ হল অসীমের। মায়ের ওপরও। কি দরকার ছিল ওকে এখানে রেখে যাওয়ার! মেয়েটার আবার ডাঁট কি! কেমনভাবে তাকায়! কি একেবারে দেখতে! আজ সকালেই মা আর পুলুমাসির কথাবার্তায় শুনেছিল, মেয়েটা ওর থেকে ছ' মাসের ছোট। মেয়েটা তা হলে চোদ্দয় পড়েছে! ধ্যেৎ আরও বেশী!' কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অসীম চুপ করে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে জয়া ঘরে ঢুকল। পায়ে পায়ে ওর পোষা বেড়ালটা। অসীম মাথা নিচু করে একটা কাঁচি দিয়ে কাগজ কাটছিল। জয়ার দিকে মুখ না ফিরিয়ে পা দেখেই বুঝল, মেয়েটা ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে ঘরে ঢুকেছে। অসীম ওর দিকে না তাকিয়ে একভাবে কাগজ কেটে যেতে লাগল।

জয়া অসীমকে দেখল। 'ছেলেটা যেমন বোকা, তেমনি ভীতু। গাঁয়ের ছেলে তো! আলাপ করতে জানে না।' মনে মনে বলে জয়া হাসল। ঘরের মধ্যে দু'তিনবার ঘুরে শব্দ করে কয়েকটা জিনিস-পত্তর অকারণ নাড়াচাড়া করার পর বেরিয়ে গেল। পোষা বেড়ালটা চুপ করে বসে রইল ঘরের এক কোণে।

অসীম দরজার বাইরে তাকাল। হুঃ, খুব ডাঁট! ওদের বাড়ি এসেছি, আমিই বা আগে কথা বলব কেন? বয়ে গেছে আমার!' ঘাড় শক্ত করে কাগজ কাটায় মন দিল।

এক সময়ে দরজায় জয়ার ছায়া দেখল অসীম। আবার এসেছে মেয়েটা। অসীম এবার বাঁ দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের একটা ছবি দেখতে লাগল। 'ওর সঙ্গে যে আমি কথা বলতে চাইছি না, মেয়েটা এবার বুঝুক।' অসীম মনে মনে বলল।

চৌকাঠ ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে এসে জয়া বলল, 'এই, তোমার নাম অসীম?' অসীম মুখ ফিরিয়ে জয়াকে দেখল।

জয়া হাসল। 'এই নাও, তোমার জন্যে পেয়ারা এনেছি। খুব মিষ্টি। আমাদের গাছের।' জয়া আরও এগিয়ে এসে একটু নুয়ে অসীমের সামনে পেয়ারা ধরল।

অসীমের বড় আপন মনে হল জয়াকে। ওর গলার স্বর নরম আর মিষ্টি। কথার মধ্যে তো সেই ডাঁট নেই! অসীম জয়ার পুতুলের মতন মুখটা দেখল। গায়ের জংলা ছিটের টি-শার্ট চোখে পড়ল। বাইরে থেকে এসে এইমাত্র জামা বদলেছে। মায়ের সঙ্গে সকালে এ বাড়িতে ঢোকার আগে বাগানে একটা প্রজাপতি দেখে তাকে তাড়া করেছিল অসীম। এই মুহূর্তে প্রজাপতিটাকে মনে পড়ল। অসীম মাথা নিচু করে জয়ার হাঁটু, পা দেখল। পায়ে সোনালি লোম চক্-চক্ করছে।

জয়া খুকখুক করে হেসে ফেলল। 'লজ্জা করছে বুঝি? নাও না, আমাদের গাছের তো! এই দেখ, আমিও একটা খাচ্ছি।' জয়া বাঁ হাতের মুঠোয় ধরা ওর পেয়ারাটা দেখাল।

অসীম মুখ তুলে জয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এই মাত্র পেড়ে আনলে?' হাতে নিল পেয়ারাটা।

'না, কাল পেড়ে দিয়েছিল আমাদের বাগানের মালী।' জয়া সরে গিয়ে খাটের গায়ে ঠেস দিয়ে একটু আরাম করে দাঁড়াল। হাতের পেয়ারায় কামড় দিল। 'খাও।'

অসীম কামড়ে খানিকটা পেয়ারা মুখে পুরল। জয়া অসীমকে দেখতে লাগল। ঝক-ঝকে পরিষ্কার দাঁত অসীমের। ঘন টানা ভুরুর নীচে চোখদু'টো দেখে বুঝল, একটু আগে ওর রাগ বা ভয় হয়েছিল। এখন কিছুই নেই।

'তুমি কোন্ ক্লাশে পড়?' জয়া জিজ্ঞাসা করল।

'ক্লাশ নাইনে। তুমি?'

'সামনের বছর নাইন হবে।' জয়া জানালা দিয়ে চিবানো পেয়ারার ছিবড়ে ফেলে দিয়ে উত্তর দিল। অসীমকে একভাবে পেয়ারা চিবোতে দেখল। বলল, 'তুমি বুঝি সব সময়েই বই পড়ো?'

'কেন?'

'এই যে দেখলাম, তুমি হাতে বই নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে!'

'দূর! ও এমনি।' গলায় হাসির শব্দ করল অসীম। আমার পড়তে বসতেই ইচ্ছে করে না।' উঠে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে চিবানো পেয়ারার অংশটা বাইরে ফেলল। 'আমি খেলতে ভালবাসি। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, ভলি—সব খেলা জানি।' পেয়ারা খানিকটা কামড়ে নিয়ে জয়াকে দেখল। 'তুমি তো ক্লাশে ফার্স্ট হও!'

'আহা! কে বলল?' জয়া একটু লজ্জা পেল।

'পুলুমাসি আমার মাকে বলছিল। আমি শুনেছি।'

'মায়ের এক কথা।'

'আমার ইচ্ছামত আমি পড়তে বসি। ফার্স্ট হওয়ার জন্যে পড়তে বসি না।' মুখে তাচ্ছিল্যের ভংগি।

'জানি, তুমি খুব বদমাইশি করো। তাই তোমাকে আজ নিয়ে যায় নি মিনুমাসি।' জয়া হাসল।

'কে বলল?' অসীম জয়ার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল।

'আমার মা।'

'মা পুলুমাসিকে সব বলে গেছে। দাঁড়াও, মা একবার আসুক।' অসীম যেন একটু রাগ করল। অন্যমনস্কের মতন তাকাল জয়ার দিকে।

জয়া হেসে উঠল। 'ছেলেদের দুষ্টুমি তো ভাল। আমার খুব ভাল লাগে।' একটু থেমে মুখের ছিবড়েটা বাইরে ফেলে দিয়ে বলল, 'আমার এক পিসতুতো ভাই আছে, ওর দশ বয়স। উঃ, কি যে দুষ্টু, তা ভাবতেই পারবে না! আর এত সুন্দর দেখতে! যত দুষ্টুমি করে, আমার তত তাকে ভাল লাগে।' বলতে বলতে জানালার ধারে গিয়ে বাইরের বাগানে চোখ রাখল।

অসীম গেঞ্জির প্রান্ত দিয়ে মুখ মুছল। জয়ার দিকে তাকাল। হঠাৎ মনে হল, মেয়েটার যতটা ডাঁট আছে বলে একটু আগে ভেবেছিল, ততটা নয়। বেশ ভাল মেয়েটা। দুটো বেণী করে চুল বেঁধেছে। চুল যেমন কালো, তেমনি ফর্সা গায়ের রং। টি-শার্ট পরায় ভাল দেখাচ্ছে। পায়ের দিকের খোলা অংশে চোখ পড়ল। চামড়া কি নরম!

জয়া বাগানের দিক থেকে মুখ ফেরাল। অসীমের দিকে চোখ পড়তে হাসল।

'এখন ঘরে চুপ করে বসে থাকতে একটুও ভাল লাগছে না।' অসীম জানালার রেলিং ধরে বলল। মুখে-চোখে চাপা বিরক্তি।

'আমার ঘরে এসো, লুডো খেলব! লুডো না ভাল লাগলে, ক্যারামও আছে, খেলা যাবে।' জয়া ঘরের বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগোল। অসীম পিছু পিছু অসীমও বেরিয়ে এল।

ঘরে এসে জয়া বলল, 'আমরা মেঝেয় বসে খেলব। কি বল?' সুইচ টিপে পাখা খুলল।

মাদুর পাততে যাচ্ছিল জয়া, অসীম বলল, 'কিচ্ছু দরকার নেই। এমনি বসব।' অসীম মেঝেয় বসে পড়ল। 'লুডোই খেলব।' বলে জয়াকে দেখতে লাগল।

জয়া লুডো খুঁজতে লাগল ঘরের এখানে-ওখানে। কোথাও পাচ্ছে না। অসীম জয়াকে দেখছে। জয়া না পেয়ে একবার অসীমকে দেখছে, আর হাসছে। 'তুমি ভাবছ বুঝি, খুঁজে পাব না? ঠিক পাব!' বলে চেয়ারে দাঁড়িয়ে আলমারীর মাথা হাতড়াতে লাগল।

অসীম উঠে দাঁড়াল। 'নেমে এসো, আমি দেখছি।' জয়ার দু' হাঁটুর নীচে দু' হাত দিয়ে ধরল।

'আহা! তুমি বুঝি আমার থেকে লম্বা!' জয়া পিছন ফিরে অসীমকে দেখল। 'এই পা ছাড়ো। পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?'

অসীম লজ্জা পেল। পা ছেড়ে দিল সংগে সংগে।

জয়া চেয়ার থেকে নামল। অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আর উঠতে হবে না। মনে পড়েছে, কাল আমি, মা আর বাবা খেলে ও ঘরেই রেখেছি।' হাসতে হাসতে জয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

এ ঘরে এসে জয়া বড় কাচ দেওয়া আলমারীর মাথায় হাত দিতে লুডোটা পেয়ে গেল। হাতে নিয়ে দাঁড়াতেই আর্শিতে নিজের চেহারা চোখে পড়ল। চকিতে একবার বুক দেখে কি ভেবে জামার কোমরের কাছে একটু এ-পাশ ও-পাশ সরিয়ে আলগা করে দিল। এ ঘরে চলে এল।

কিছুক্ষণ লুডো খেলার পর অসীমের বিরক্তি লাগল। জয়া মাথা নিচু করে এক মনে ঘুঁটি চাল দিয়ে যাচ্ছে। অসীম জয়াকে দেখল। মাথার চুল ঘন জয়ার। জামাটা একটু চেপে বসানো গায়ের সংগে। স্কার্টটা ময়ূরের পেখমের মতন মেঝেয় ছড়ানো। হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত নরম অনাবৃত অংশে আবার সোনালী লোম অসীমের চোখে পড়ল।

'দূর, একটুও খেলতে ভাল লাগছে না।' লুডোটা হাত দিয়ে একটু ঠেলে অসীম সোজা হয়ে বসল। জানালা দিয়ে বাইরে বাগানে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

জয়া অসীমকে দেখে হাসল। অসীমের মুখটা খুব চতুর। বিরক্তির ভাবটা ভাল লাগছে জয়ার। 'আমারও কেন যেন, আজ একটুও খেলার মন বসছে না!'

'চল না, তোমাদের বাগানটা বেড়িয়ে আসি। ওদিকে একটা পুকুর আছে না?'

'যাবে?' জয়া চোখ বড় করল। 'তাই বরং চল, খুব মজা হবে!' জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি রাখল। 'রোদ থাক, ছায়াও অনেক আছে। খুব যখন রোদ লাগবে, ছায়ায় বসে গল্প করব। বেশ মজার লাগবে না?' জয়ার দৃষ্টি কৌতুকে নাচল।

অসীম ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'তাই চল।' বলে সুইচে হাত দিয়ে পাখা বন্ধ করল।

জয়া লুডো তুলে রাখল। পোষা বেড়ালটা পায়ে পায়ে জড়াচ্ছিল। পাশে সরিয়ে রেখে অসীমের সংগে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাড়ির চারপাশ ঘিরে বড় বাগান। সামনের দিকে বাগান পেরিয়ে গেলে একটা পাড়-উঁচু পুকুর। শান-বাঁধানো ঘাট। পুকুরের পাড়ে কয়েকটা বড় বড় গাছ লাগানো। ওপাশে এক কোণে ছোট একটা বাঁশবনের মতন। তারও ওপাশটায় জলা-ভূমি। সবেমাত্র ধানের সবুজ চারা পোতা হয়েছে। জায়গাটা বাগুইআটি হলেও যশোর রোড থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে পড়ে। এদিকের চারপাশ তাকালে হঠাৎ গ্রামও মনে হতে পারে।

বাগানে পা দিয়ে জয়া দূরে একটা প্রজাপতির দিকে তাকিয়ে অসীমকে বলল, 'তুমি প্রজাপতি ধরতে পার?'

অসীম নুয়ে একটা ছোট শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যখন ছোট ছিলাম, তখন খুব ধরতাম। আমার খুব প্রজাপতি ধরার শখ ছিল। রং-বেরং-এর প্রজাপতি ধরে পরিষ্কার শিশিতে পুরে স্কুলে নিয়ে যেতাম। কত মরে যেত। একটা প্রজাপতির
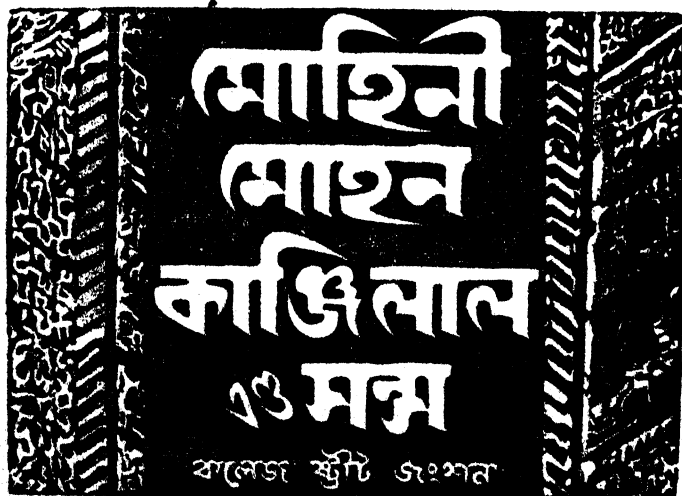
ওপর দৃষ্টি রেখে বলল, 'এখন আর ধরি না।'

'ছেলেরা খুব নিষ্ঠুর হয়।'

অসীম জয়াকে দেখল। হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার জামাটা দেখে আমার একটা প্রজাপতিকে মনে পড়ে যায়।'

'আহা!' জয়া মুখে-চোখে একটা ভঙ্গি করল। ফর্সা মুখ ঈষৎ লাল।

'সত্যি!' আজ সকালে প্রথম যখন তোমাদের বাগানে ঢুকি, ঠিক এই জামার মতন একটা রং-চং-এ প্রজাপতি দেখে পিছু পিছু দৌড়লাম ধরার জন্যে। কিছুতেই ধরতে পারলাম না। খুব শয়তান ওরা।'

জয়া অসীমের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বলল, 'ধরে কি মারতে?'

'নাঃ, আজকাল আর মারতে ইচ্ছে করে না। যে নরম প্রজাপতি, আমার শুধু হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে!'

জয়া খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

অসীম থমকে দাঁড়াল। আচমকা বুনো গন্ধ নাকে লাগল। জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হাসছ কেন? আমি কি ভুল বললাম।'

'না, মা।' জয়া একটু চেঁচিয়ে উঠল। 'তোমার কথা বলা দেখে আমার হাসি পেল। তবে কথাটা তুমি ভাল বলেছ।' একটু থামল। 'তুমি কিন্তু বেশ ভাল কথা বলতে পার।' ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে ভঙ্গি মধুর করল।

অসীম জয়ার কথায় কান না দিয়ে সামনের বুনো গাছে হাতের সরু ডালটা দিয়ে জোরে মারল। 'তোমাদের বাগানে অনেক গাছ। আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমাদের বারো মাস আম হয়—এরকম গাছও আছে।'

'তুমি পাকা গাব খেয়েছ?' অসীম একটা গাছকে গাব গাছ মনে করে জয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'নাঃ!' ঘাড় নাড়ল জয়া। 'পাকা ফলও দেখি নি।'

'খুব মিষ্টি। আমি কত খেয়েছি। আর দেখতে ঠিক তোমার গায়ের রং।'

জয়া অসীমের মুখ দেখে চকিতে নিজের হাতের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল। অসীম ওকে দেখছে বুঝতে পারল। জয়া কথা ঘোরাতে চাইল। ওরা হাঁটতে হাঁটতে পেয়ারা গাছের নীচে এসে গেছে। জয়া বলল, 'এই আমাদের পেয়ারা গাছ।' গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল জয়া।

জয়ার বলার আগেই গাছটা অসীমের চোখে পড়েছিল। হাতের ডালটা ফেলে একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিল। 'গাছে উঠব?' জয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, পড়ে যাবে! মা ভীষণ বকবে আমায়।'

'ইস্, পড়লেই হ'ল আর কি? আমাদের গ্রামের সব গাছে আমি উঠেছি।'

'তা হলে আর কি? এখানে ওঠার দরকার নেই।' অসীমকে গাছের গুঁড়ির দিকে এগোতে দেখে বলল, 'মাকে এবার বলব কিন্তু।'

অসীম থমকে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকাল। জোরে একটা ঢিল ছুঁড়ল। একটা ডাঁসা পেয়ারা শব্দ করে নীচে পড়ল। আর ইঁটটা ডালে লেগে দু'টুকরো হয়ে এক টুকরো জয়ার কপালে লাগল। জয়া কপাল চেপে বসে পড়ল।

অসীম হঠাৎ ভয় পেল। কি ভেবে এগিয়ে এল। 'লাগল নাকি? দেখি!' জয়ার কপালে চাপা দেওয়া নরম হাতটা সরাল। 'ইস্, কিছুই লাগে নি। অমনি কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল!' অসীম হাসল। 'খুব চালাক তুমি!'

'আহা! গুণ্ডাদের কাছে তো এসব কিছুই লাগে না!' অসীমের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিল জয়া। ঠোঁট ফুলিয়ে মুখভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছে।

অসীম অবাক হয়ে জয়াকে দেখছিল। মুখ লাল হয়ে গেছে জয়ার। ওর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে দেখে অসীমের মজা লাগল। হেসে বলল, 'আমি কিন্তু সত্যি গুণ্ডা, সাবধানে থেকো!' বলেই ডাঁসা পেয়ারাটা তুলে নিল মাটি থেকে। হাতের মধ্যে নিয়ে ক্রিকেটের বল করার মতন ঘুরিয়ে জোরে ছুঁড়ল দূরে লেবু-ঝোপের মধ্যে। কিচ কিচ শব্দ করতে করতে কয়েকটা পাখি এপাশ-ওপাশ উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল। হাওয়া জোরে বইতে শুরু করেছে।

অসীম জয়ার দিকে না তাকিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল। জয়া কপালে হাত বুলোতে বুলোতে এগোল। মালীর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। বুড়ো মালী আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। ওদের দেখতেই পেল না। জয়া এক সময়ে মালীর ঘরের পিছনে অসীমকে নিয়ে এল। 'এখানটা তোমার কেমন লাগছে?'

অসীম এপাশ-ওপাশ তাকাল। সড় নির্জন এদিকটা। কোথা থেকে যেন মিষ্টি গন্ধ আসছে। জোর হাওয়া বইল। শিউলি গাছ চোখে পড়ল অসীমের। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে জয়াকে দেখল। জয়া হাসছে অসীমের দিকে একভাবে তাকিয়ে। অসীম জয়ার মুখ দেখল। রোদে সারা মুখ লাল। মাথার চুলে গাছের গুঁড়ো গুঁড়ো পাতা আটকে আছে। কপালের ইঁট লাগা জায়গাটা ঈষৎ ফোলা।

অসীমকে একভাবে তাকিয়ে দেখতে দেখতে জয়া হাসল। নির্জন জায়গায় শুকনো পাতা কাঁপার মতন গা শির-শির করল। মাথা নিচু করল।

অসীম বলল, 'বড় রোদ, চল ও ছায়াটায় গিয়ে কিছুক্ষণ বসি। পরে পুকুরের দিকে যাব।'

জয়া কোন কথা না বলে অসীমের পিছু পিছু এসে আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপের নীচে বসল। মাটির ওপর ছোট ছোট শুকনো পাতা বিছানো। এখানে-ওখানে বুনো গাছ কয়েকটা। বন-তুলসীর ঝোপ একটু দূরে। ওরই পাশে কয়েকটা বুনো ওল গাছ। কাছাকাছি ছোট ছোট হাতীশুঁড় গাছ চোখে পড়ল। অসীম বসেই একটা গাছে হাত বোলাল।

'তুমি সাঁতার জানো?' জয়া মাটির ওপর বসে অসীমের দিকে তাকাল।

'খুব ভাল জানি। তুমি জান না বুঝি?' অসীমের দৃষ্টি ও মুখের ভাব বিজয়ীর।

হ্যাঁ, জানি। পুকুর পার করতে পারি।'

'তা হলে তো ভালই হ'ল। আজ যখন পুকুরে স্নান করব আমরা, যত রকম সাঁতার জানি দেখাবো, দেখো।'

জয়া হাসল। 'আমি তো জলে নামব না।'

'কেন? পুকুরে স্নান করবে না?'

'আগে করতাম। এখন মা বারণ করেছে। আমি বাড়িতে বাথরুমে স্নান করি।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে অসীম জয়াকে দেখছিল। মাথা নীচু জয়ার ভঙ্গি দেখে কি যেন মনে হ'ল। চুপ করে বসে থাকল অসীম। একটু যেন ভয় পেল অকারণ।

মাথার ওপর ছায়া থাকলেও জয়ার মনে হ'ল, রোদের উত্তাপ ওর চুলে এখনো লেগে আছে। দূরে কোন্ গাছে একভাবে ঘুঘু-পাখি ডেকে চলেছে। লেবু-ঝোপে আবার শালিখ পাখিগুলো ভিড় জমিয়েছে। মাটি থেকে ভিজে-ভিজে গন্ধ নাকে এল। জয়া অসীমের দিকে একবার তাকাল। অসীম দূরে পুকুরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। মুখখানা দেখতে বড় ভাল লাগছে জয়ার। নিজের খোলা পা-এর দিকে চোখ পড়তেই স্কার্ট টেনে পা ঢাকল অকারণ। দ্রুত অথচ অতি সন্তর্পণে বুকের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। মাথা নিচু করে ঘাস ছিঁড়ল।

অসীম হঠাৎ বলল, 'তোমাদের পুকুরটা খুব একটা বড় নয়। এক নিঃশ্বাসে পার হতে পারি।'

জয়া চোখ তুলে বলল, 'জল আছে বেশ।'

'তাতে কি হয়েছে!' অসীম একটু কি ভাবল। 'জান, আমি সাঁতার কাটার পোষাকও সঙ্গে এনেছি।'

'তোমার আবার পোষাক আছে নাকি?' জয়া ভুরু তুলে হাল্কা করে বলল।

'নিশ্চয়ই! মা বলেছে, আর একটু বড় হলে বালিগঞ্জের লেকে সাঁতার শেখার জন্যে ভর্তি করে দেবে। আমাদের ওদিকটা ইলেকট্রিক ট্রেন হয়ে গেছে তো? বালিগঞ্জে আসতে বেশী সময়ও লাগবে না।'

জয়া হাসল। 'ঠিক আছে, আজ তা হলে তোমার সাঁতার দেখব।'

অসীম উঠে দাঁড়াল। 'চল, এবার পুকুরের দিকে যাই।'

জয়া উঠে দাঁড়াল। রাং-চিতার বেড়ার গা ঘেঁষে ওরা হাঁটতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। অসীম হাত দিয়ে বেড়ার গাছ এক এক করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোচ্ছে। এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে। দূরে একটা ঝোপের মতন। বড় ঝোপটার ওপর একটা লতা গাছ ঝোপটাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে দিয়েছে। লতার কয়েকটা শীর্ষ এপাশ-ওপাশ ছড়িয়ে। একটা অংশ পাশের তালগাছের গা বেয়ে ওপরে উঠে গেছে। অসীমের মজা লাগছে ওটা দেখতে। ঝোপ পেরিয়ে গেলেই পুকুরের পাড়। অসীম চোখের সামনে যে গাছ পড়ছে, এক ধরনের খেলার মতন গাছের নাম বলতে বলতে এগোচ্ছে। 'এটা

সুন্দর, ওটা জাম, ওপাশেরটা সজনে ডাঁটার গাছ, ওই দূরে আমলকি। পাশে একটা কুলগাছ। তাই না?'

জয়াও কেমন যেন অসীমের বলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ দেখা আর প্রত্যেকটার নাম শোনার খেলায় মেতে গিয়েছিল। ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। ওটাতে যা বড় বড় কুল হয় না!' মুখে একটা টক্ করে লালা-টানার শব্দ করল। 'তুমি সরস্বতী পুজোর সময় এসো, খাওয়াবো। এখন তো হয় নি!'

অসীম জয়াকে দেখতে দেখতে বলল, 'দেখলে তো, আমি সব গাছের নাম জানি! গ্রামে থাকলে এসব নাম জানা যায়। তোমরা অনেক গাছেরই নাম জান না। তা' ছাড়া আমাদের বায়লজি বইতে এ-সব আছে।' অসীম একটু অভিজ্ঞের মতন গলা ভারি করল।

'আমাদের বাগানে যা আছে, সব গাছের নাম তুমি বলতে পারবে!' অবাক হয়ে জয়া অবিশ্বাসের কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অসীমকে। একবার থমকে দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে দূরে ঝোপটার মাথায় একটা গাছের শীর্ষভাগ দেখতে পেল। 'বল তো, ওটা কি গাছ?' আঙুল দিয়ে দেখাল।

'কোন্‌টা?' অসীম সোজা তাকাল। শীর্ষের দিকে চোখ রেখে একটু একটু করে এগোতে এগোতে বলল, 'হুঁঃ, ওটা তো অশ্বত্থ গাছ।'

'মোটেই নয়, দেখলে তো, হেরে গেলে! ওটা পাকুড় গাছ।'

অসীম হারবার ছেলে নয়। গাছটার দিকে দৃষ্টি রেখে এগোতে গিয়ে সামনের একটা কাঁটালতায় ওর গেঞ্জি-প্যান্ট জড়িয়ে গেল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ইস্, কাঁটা-গাছে জড়িয়ে গেল যে!' বলে পাশে তাকিয়ে দেখল, সেই ঘন লতায় ঢাকা ঝোপটা।

জয়া একটু দূরে পড়ে গিয়েছিল। এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'একটুও [illegible]না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি এক করে ছাড়িয়ে দিচ্ছি।' জয়া অসীমের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাঁটা ছাড়াতে লাগল। 'যারা বদমাইশ হয়, তাদের গায়েই এসব লাগে।' হাসতে লাগল জয়া।

অসীমের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। অসীম জয়াকে দেখতে লাগল। নরম হাত, কাঁধ বুকের ওপর ফেলে রাখা বিনুনী, জংলা ছিটের জামা, জয়ার হাসির শব্দ সব কিছু অসীমের মধ্যে কেমন যেন এক বেগ এনে দিল। একটা লতা জয়ার পিঠের জামার অংশে আটকে দিয়ে বলল, 'তুমিও বাদ যাবে না। এই দেখো, তোমার গায়েও লেগেছে।'

ততক্ষণে জয়া অসীমের কাঁটা সব ছাড়িয়ে দিয়েছে। অসীম দ্রুত সরে গেল জয়ার কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় কাঁটালতার কয়েকটা শীষ জয়াকে কামড়ে ধরল। মাথার চুলে, স্কার্টের গায়ে। অসীম হাততালি দিয়ে উঠল। 'কেমন মজা!'

জয়া এক-একটা করে ছাড়াতে গিয়েও পারছে না। একটা ছাড়ায় তো আর একটা জড়িয়ে ধরে। ফর্সা মুখ লাল হয়ে গেছে জয়ার রোদে। গুঁড়ো গুঁড়ো ঘাম জমেছে কপালে। জয়াকে কেমন অসহায় মনে হ'ল। 'তোমার জন্যেই হ'ল। ছাড়িয়ে দাও এখুনি। আমার বিচ্ছিরি লাগছে।'

অসীম দেখছে আর হাসছে। খুব মজা লাগছে ওর। জয়াকে এখন কেন যেন দেখতে খুব ভাল লাগছে। দুষ্টুমি করার ইচ্ছে হ'ল। এগিয়ে এসে স্কার্টটা ধরে একবার টান দিয়ে জয়াকে কাঁপিয়ে দিল। পর-মুহূর্তে বেণীটা ধরে টানল। থুতনিটার কাছে চিমটি কাটল। একবার নিচু হয়ে বসে হাঁটুর পিছনে সুড়সুড়ি দিল শুকনো পাতা দিয়ে। লাল টসটসে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি আমাকে হারাবে যে!'

জয়ার কাজলটানা সুন্দর চোখ ছলছল করছে। অসীমের কাছে অপ্রস্তুত বোধ করছে। কিছুতেই নড়তে পারছে না। 'আহা! তোমার কাঁটা সরালো কে?' অসীমকে এগিয়ে আসতে দেখে জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'এই, এখনি কাঁটা ছাড়িয়ে দাও, না হলে মাকে সত্যি সত্যি বলে দেব। চেঁচাব এক্ষুনি।' অসীমের ঝকঝকে চোখ আর শাদা দাঁতের সারি দেখতে দেখতে বলল, 'সাধে কি আর গুণ্ডা বলেছে তোমার মা তোমাকে!' অভিমান আর রাগের একটা ভঙ্গি করল জয়া।

জয়াকে চীৎকার করতে দেখে অসীম একটু ভয় পেল। দেখল, জয়ার পাতলা ঠোঁট দুটোও কেমন লাল হয়ে গেছে! কি মনে হল, হঠাৎ বলল, 'দাঁড়াও, আমি গেঞ্জিটা খুলে কাঁটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। যা হাওয়া দিচ্ছে, গেঞ্জি পরে খুলতে গেলে আমিই আবার আটকে যাব।' কথাগুলো বলতে বলতে গেঞ্জি খুলে মাটিতে রাখল। এগিয়ে এল জয়ার সামনে। আস্তে আ[illegible] কাঁটা ছাড়াতে লাগল।

জয়া অনেকটা আশ্বস্তের [illegible] অসীমের মুখ, খালি গা, হাত, [illegible] লক্ষ্য করতে লাগল। মুখের ওপর [illegible] নিঃশ্বাস লাগছে।

'কি হল রে জয়া? [illegible] কেন? ঝগড়া করছিস বুঝি?'

ওরা দুজনে তখন কাঁটা[illegible] থেকে সরে এসে মুখোমুখি দাঁড়ি[illegible] মায়ের গলার স্বর কানে আসতেই [illegible]র দিকে তাকিয়ে জয়া হেসে উঠল। অ[illegible]ও জয়াকে দেখে হাসল।

'অসীমকে নিয়ে আয়, এবার ও স্নান করবে।' পুণ্যমাসির গলা শুনল অসীম। গেঞ্জিটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি পুকুরধারে যাচ্ছি। পুণ্যমাসিকে বলবে, আমি পুকুরেই স্নান করব। তুমি আমাদের কিডব্যাগ থেকে স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে আসবে। তোমাদের বড় ঘরটায় আছে। পারবে তো?'

কাঁটাঝোপ থেকে মুক্ত হওয়ার পর জয়ার রাগ, অভিমান ক্রমশ ভিতরে ভিতরে শান্ত হয়ে আসছিল। জোর হাওয়ার কপালের চুল কাঁপছিল ওর। জয়া বাতাসের মধ্যে আবার সেই বুনো গন্ধটা পেল। অসীমের কাছ থেকে এক-পা এক-পা করে সরতে সরতে বলল, 'তুমি যাও, আমি সব গুছিয়ে নিয়ে এখুনি আসছি।' বাড়ির দিকে মুখ করে দৌড়ল জয়া।

অসীম জয়ার দৌড়ানো দেখল। দেখতে দেখতে চিড়িয়াখানায় দেখা একটা বিচিত্র বর্ণের মধুরকণ্ঠী পাখিকে মনে পড়ল। চিড়িয়াখানায় বড় দীঘির জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখিটা উড়ছিল। পাখিটাকে খুব ভাল লেগেছিল অসীমের। জয়া বাড়ির আড়াল হতেই অসীম ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘে ঢাকা নীল আকাশ দেখল একমুহূর্ত। অসীমের কেন যেন মনে হল, এখনি সে দৌড়ে বাগান মাঠ পেরিয়ে যেতে পারে। স্কুলের স্পোর্টসে শেখা হাইজাম্প দিয়ে ঝোপটাকে একবারে লাফাতে পারে। জলে ঝাঁপিয়ে এক ডুবে তলা থেকে মাটি তুলে আনতে পারে। অকারণ হাসল। ঝোপের পাশ কাটিয়ে পুকুরের দিকে দৌড়তে লাগল একসময়ে।

পুকুরটা চারকোণা, বড়। পানা নেই, তবে শালুক ফুল আর পাতায় কয়েকটা কোণ ভর্তি। এক কোণে বড় একটা গাছের শুকনো ডাল জলে ডোবানো। কিছুটা জলের ওপরে জেগে আছে। বুনোলতা আর কলমিশাকের ঝাড় একটা স্তূপ তৈরী করেছে ওর ওপর। কয়েকটা পাখি কিচকিচ করে উড়ছে ওখানে। দূরে ডুমুরের ডালে একটা মাছরাঙা পাখি চুপ করে বসে আছে। দুটো বক জলের ধার ধরে আস্তে আস্তে হাঁটছে। পানকৌড়ি কোথাও ডাকছে বুঝি। পুকুরপাড়ের জল ঘেঁষে সবুজ ঘন শ্যাওলা। অসীম সাঁতারের পোশাক পরে পাড় থেকে শানবাঁধানো ঘাট ধরে নামতে নামতে এসব দেখছিল। নিজের গ্রামের

পুকুর, তার পরিবেশ মনে পড়ছিল। এ সব ওর চেনা, প্রিয়, অতি-পরিচিত।

অসীম জলে লাফ দিতেই জয়া বলল, 'বেশীক্ষণ থেকো না জলে। মা বারণ করেছে। আর বেশী দূরে যেও না যেন।' বলতে বলতে ঘাট ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে পুকুরের একদিকের পাড়ে বসল।

অসীম গলাজলে ভাসতে ভাসতে মুখ-ভর্তি জল ওপরে ছুঁড়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল। 'মেয়েদের যত ভয়। দেখো না, কতবার পুকুরটা এপার-ওপার হই।'

জয়ারও যে ভাল লাগছিল না, তা নয়। কিছু না বলে উঁচু পাড়ের ওপর একটা বাতাবি গাছের ছায়া দেখে বসে পড়ল। বাড়ি থেকে আসার সময় সঙ্গে কয়েকটা বড় বড় কাগজ এনেছিল। অসীমের সাঁতার কাটা দেখতে দেখতে একসময় কয়েকটা কাগজের নৌকা বানিয়ে ফেলল। অসীম কয়েকবার এপার-ওপার করে জয়ার সামনে পুকুরে বুকজল করে দাঁড়াল। জয়া কাগজের নৌকাগুলো হাতে নিয়ে ঢালু পাড় ধরে জলের কাছে নেমে এল। 'এই দেখ, কত নৌকা করেছি। সব এক এক করে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঢেউ দিতে দিতে একেবারে পুকুরের মাঝখানে দিয়ে এস। দেখতে যা মজার হবে না!' জয়া জলের ধারে বসে এক এক করে নৌকা ভাসাতে লাগল।

একটানা সাঁতার কেটে অসীম ক্লান্তি বোধ করছিল। জয়ার কথা শুনে অসীমের রাগ হল। মনে হল, এতক্ষণ সে যে সাঁতার কেটে পুকুরটা চারবার এপার-ওপার হল, বুক-সাঁতার, চিত-সাঁতার, ডুব-সাঁতার দিল, তার কিছুই দেখেনি জয়া। জলের পাঁকে পা রেখে একভাবে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি বুঝি ক্লাশ ফোরে পড়? এখনো কাগজের নৌকা করছ?'

জয়ার চোখ-মুখ খুশীতে ভর্তি। অসীমের কথায় তেমন কান দিল না। ওর দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে নৌকাগুলো দেখতে লাগল। 'কি সুন্দর যাচ্ছে! তুমি একটু ঢেউ দাও। জান, আমি পাল-তোলা নৌকাও তৈরী করতে পারি।'

অসীম জলে ঝাঁপিয়ে নৌকাগুলোর কাছে এসে নিমেষের মধ্যে সব মুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

জয়ার মনে হল, অসীমের রাগ হয়েছে। হঠাৎ রাগের কারণ বুঝতে পারল না। চোখ পাকিয়ে বলল, 'কি হল ওগুলো নষ্ট করে? গেঁয়ো ভূত, এসব তুমি বুঝবে কি? তার ওপর আবার গুণ্ডা।' জয়ার কথাগুলোতেও ঈষৎ রাগ মেশানো।

অসীম জয়াকে দেখছিল। জয়া আগের পোশাক বদলে স্নানের পোশাক পরেছে। পাতলা শাদা ফ্রক। চুল ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। দেখতে দেখতে মাথায় দুষ্টুমি চাপল অসীমের। হাসতে হাসতে একটু একটু করে এগিয়ে এসে হাঁটু জলে দাঁড়াল। জয়া ভুরু কুঁচকে ওকে দেখছে। হঠাৎ দুহাতে জল নিয়ে ছুঁড়তে লাগল জয়ার দিকে। জলের গুঁড়ো ফুলঝুরির মতন চিকচিক করে উঠল রোদে। অসীম একটানা জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল, 'কি, আর গুণ্ডা বলবে?' অসীম একটু পরে থামল। রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

শরতের রোদের মধ্যে গায়ে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ ভাল লাগছিল জয়ার। তবু আজ তাকে মা বারণ করেছে স্নান করতে। শুধু গা মুছতে বলেছে। অথচ অসীম তাকে একেবারে স্নান করিয়ে দিল। দেখলেই মা বকবে। কি বলবে মাকে? রাগ হল জয়ার। 'ঠিক আছে, দাঁড়াও, আমি এখুনি মাকে গিয়ে বলছি', বলেই তরতর করে ঢালু পাড় বেয়ে ওপরে উঠে এল। পাড় ধরে এগোতে লাগল ঘাটের দিকে।

জয়ার কথা অসীমের কানে এল বটে, কিন্তু গুরুত্ব দিল না। বেশী করে জয়াকে দেখছিল। কি দেখছে, কেন দেখছে, এই মুহূর্তে তার কিছুই বুঝতে পারছে না। তবু জয়াকে এখন দেখতে ওর ভাল লাগছে। পাতলা ফ্রকের সামনের দিকটা একেবারে ভিজে গেছে। মুখ, চোখ, গলা জলের গুঁড়োয় ভেজা। গায়ের রঙ যেন ফ্রক ছাপিয়ে চোখে পড়ছে। কয়েকটা চুলের গোছা বুকের ওপর হাওয়ায় ঘষছিল। অসীম অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। জলে গা ডোবানো থাকলেও শরীরটা হঠাৎ শিরশির করল। বাতাস জলের বুক ছুঁতেই অসীমের মনে হল, এখনি ও এক ডুবে ওপারে গিয়ে উঠতে পারে। গা ওর খুব গরম। বুকের মধ্যে কখন যেন অনেক নিঃশ্বাস জমে গেছে।

[illegible]টা ঘোরে কাটাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল, [illegible] সত্যি সত্যি বাড়ির দিকে যাচ্ছে। ভয় [illegible] চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বেশ, তুমি যাও, [illegible]মিও তা হলে জলে ডুবে যাব।' জয়া [illegible] চলেছে দেখে অসীম যেন অসহা[illegible]মতন আবার বলল, 'জানি তো, আমার [illegible] বন্ধু নেই; কেউ আমাকে ভালবাসে [illegible] আমার মা-ও না। তাই, [illegible] পড়লে [illegible]বার বলি ডুবে যাব, কেউ [illegible] পারবে না। যা বলি আমি, ঠিক [illegible] করি। এই ডুবলুম।' জয়াকে এবার [illegible] ওর দিকে তাকাতে দেখেই টুপ করে [illegible] গেল।

জয়া [illegible] দাঁড়িয়ে মাছরাঙা পাখির মতন ভঙ্গি[illegible] অসীমের ডোবার জায়গায় চোখ রাখল। ভিতরে রাগ থাকলেও অসীমের কথায় বেশ মজা পাচ্ছিল। একটু সময় দাঁড়িয়ে থেকে জলের সমতলে চোখ বুলিয়ে পুকুরের চারপাশ দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। যেখানে অসীম ডুবেছে তারই সামনে পাড়ের ওপর দাঁড়াল স্থির হয়ে। কিছু সময় গেল, জলের ওপর ছোট দু' একটা মাছের ঘাই ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না। চার-পাশ নিস্তব্ধ। দূরে তালগাছের মাথার কাঠঠোকরা পাখি ঠক ঠক শব্দ করছে। ঘুঘুটা নতুন করে ডাকতে শুরু করল। দুটো কাক চীৎকার করতে করতে উড়ে গেল। জোর বাতাস জলের ওপর সরু সরু ঢেউ-এর রেখা তৈরী করল। আকাশের নীল, রোদের উত্তাপ আর স্থির জলরেখা জয়াকে যেন ভয় দেখাল। হঠাৎ ছোট বাঁশবন থেকে দমকা হাওয়ায় পাতা নড়ার ফিসফিস শব্দ কানে এল। কি ভেবে দৌড়ে পুকুরের পাড়ে নেমে এল জয়া। পুকুরের চারপাশে সন্তর্পিত দৃষ্টি বুলিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকল, 'অসীম!' কোন সাড়া নেই। আবার ডাকল, 'অসীম, এই অসীম'। পর পর বেশ কয়েকবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুকের শব্দ বেড়ে গেল। চোখ ছল ছল করে উঠল। গলার স্বর ভারী হয়ে এল। অসহায়ের মতন কাঁদ-কাঁদ গলায় বলল, 'আমি খুব ভয় পাচ্ছি অসীম। তুমি কোথায়! আমি মাকে কিছু বলব না, সত্যি বলব না। এই দেখ, আমি ফিরে এসেছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার বন্ধু।' দু' চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে জয়ার।

দূরের বুনো লতা আর কলমির ঝোপ-ঢাকা ডালপালার মধ্যে থেকে হঠাৎ অসীমকে বেরিয়ে আসতে দেখল জয়া। কয়েকটা শালুক ফুল ছিঁড়ে মাথার কাছে ভাসিয়ে সাপের মতন সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে জয়ার দিকে। জয়া অপ্রস্তুত বোধ করল। জলে টসটসে চোখ দ্রুত মুছে ফেলল। হাসতে হাসতে অসীম সামনে দাঁড়াতেই জয়া বলল, 'যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর কোনদিন কথা বলব না।' নাক ফুলছে জয়ার। 'শুধু শুধু আমায় ভয় দেখালে! উঃ, কি যে ভয় পেয়েছি আমি।' জয়া বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

জয়ার ভিজে ফ্রক শুকিয়ে গেছে। জয়াকে দেখতে দেখতে হাসল অসীম। শালুক ফুলগুলো একটা লম্বা ডাঁটা দিয়ে তোড়ার মতন বাঁধা ছিল। জয়ার সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে বন্ধু বলেছ, ভালবাসো বলেছ, তাই তোমাকে এগুলো দিলাম। নাও।'

জয়া লজ্জা পেল। একবার [illegible] দেখে নিয়ে চোখের পাতা নামাল। তোড়াটা কুড়িয়ে নিল মাটি থেকে। 'এই, উঠে পড়। মা এবার বকবে। অনেকক্ষণ পুকুরে রয়েছ।'

জয়ার কথা বলার মধ্যে [illegible] স্নানের ভঙ্গির মতন ডুব দিয়েছিল। ওপর মাথা তুলতেই জয়া খুব [illegible] তাকাল। অসীমকে দেখেই হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল। অসীম আবার জল [illegible] পারে ভেবে পুকুরের উঁচু [illegible] উঠে এল। একটানা হেসে [illegible] মাঝে হাসির দমকে নুয়ে প[illegible] ভাল লাগছে অসীমের।

জয়ার হঠাৎ এত হাসির [illegible] বুঝতে না পেরে বোকার মতন [illegible] থেকে অসীম বলল, 'কি, এত হাসছ কেন?'

হাসির ধাক্কায় গলা কাঁপাতে কাঁপাতে জয়া বলল, 'তোমার মাথায় একটা ফুল, দু' কানে দুটো শ্যাওলা দুলের মতন ঝুলছে। গোঁফ আর থুতনি কি কালো! ইস, যেন শিবঠাকুর স্নান করছে!' কথা শেষ করেও হাসতে লাগল জয়া।

হাসিতে সারা শরীর কাঁপছে জয়ার। জোর বাতাসে ফ্রক উড়ছে। বুকজলে দাঁড়িয়ে থেকে অসীম মাথার ফুল, কানের শ্যাওলা সরাল। গোঁফ আর থুতনির ওপর আঙুল

ঘুরে যাই। বার্মার স্টলটাও বা বাকি থাকে কেন। চাষ-আবাদের সুবিধের জন্যে ব্যবহার করা কলকব্জা এই স্টল আলো করে ছিল। কিন্তু তাতে কোন কাগজের সম্পাদক মুখ কালো করে বলেছিলেন, একি অন্বেষণ কাণ্ড। হচ্ছে বাঙলা দেশের একজিবিসন, বেঙ্গলে, মাদ্রাজ থেকে পশুপ্রাণী, উৎপন্ন এনে দেখাবার কারণ কি? বিদেশী যন্ত্র-পাতির প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপনের জন্য বলা হয়েছিল—এটা হচ্ছে 'দি একজিবিট ইংল্যান্ড ইন বেঙ্গল!'

তবে ছিল না, ছিল না করেও সুবে বাঙালার বেশ কিছু সামগ্রী কৃষিমেলার কোলজুড়ে ছিল। এদের মধ্যে ডাফ ইস্কুলের মেয়েদের হাতে-বোনা নক্সা-করা কার্পেটের কথা এসেই পড়ে। বিশ্বনাথ লাহা কোম্পানীর স্টলে ছিল আমদানিকরা মস্ত খড়কাটা কল, পাছড়ানো যন্ত্র ও হোসপাইপ সমেত পাম্প। এই লাহাবাবুদের স্টলেই ত আমরা দেখলাম সেই আদ্যিকালে ভারত-বর্ষের বাজার নিয়ে ব্রিটিশ আর মার্কিন রপ্তানি দ্রব্যের লড়াই। সেদিনের ভিড়ের মধ্যে আমরাও দেখেছি বিলিতি ঘোলমওয়া-যন্ত্র কেন মার্কিন যন্ত্রের চেয়ে অনেক ভালো! গয়ার এক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছিলেন বলদে-টানা সেচযন্ত্র। তুলো পরিষ্কারের কল। নতুন ধরনের একটা লাঙল। জুলেজুলে করে তাকিয়ে সব চাষী-ভুষীর সঙ্গে চলুন, আমরাও ব্যাপারটা দেখে যাই।

তবে মুঙ্গের থেকে বেশ কয়েকটা জিনিস এসেছিল তারিফ করার মত। হর-বল্লভ সিং-এর ভাগলপুরী গাইবাছুর, এক-জোড়া খুব তেজী বাছুর সমেত স্ত্রী ও পুরুষ মহিষ, বাসমতী চাল, জুসালি গম, তিল, তামাক, এমনকি নীল আর নীলবীজ যে দেখেছে সেই বাহবা দিয়েছে। চট্টগ্রামের জিনিসগুলোও খুব চমকদার হয়েছিল। পোয়াং-এর রাজার তিন বছরের গিয়াল ষাঁড় আপনার আমার মত বহু লোকেরই প্রশংসা কুড়োয়। বললে, অনেকের প্রত্যয় হবে না, শুধু চট্টগ্রাম থেকে চালই এসেছিল কমসে কম পঁচিশ রকম। এদের মধ্যে কিউ-দমি চৌধুরীর চালই ছিল বার প্রকারের।

আবার এদিকে বেঙ্গল একজিবিসনে যেমন মাদ্রাজ থেকে ম্যাঞ্চেস্টার, বিলেত থেকে বার্মার কিছুর জিনিসপত্র বাদ যায়নি, তেমনি কৃষিমেলায় বেশ কয়েকটা 'ইন্ডাস্ট্রিও' কয়েকটা স্টল দিয়েছিল। এবং আরও দুঃখের কথা, এ'দের কেউই বাঙালী নন। সবাই সাহেব। যেমন চলুন ঐ টি ই টম্পসন সাহেবের ইঁট তৈরীর মেশিনটা একবার দেখে আসি। উড্রো সাহেবের জল তোলার কলের কথা ত শুনেছেনই। ডাক্তার বেরীর তিসি মাড়ায়ের কলটাও ত দেখে চোখ জুড়োয়। ব্রাউন ও কেপেজ কোম্পানী ত কলেরই একটা মেলা বসিয়ে ফেলেছিল। আরে, ঐ খানটা অত ভিড় কেন? ওটা একটা ময়দা ভাঙা কল। শুনছেন না, কানাকানি করে দেহাতী মানুষজন সব বলাবলি করছে, 'উপরসে গেঁহু দেতা হ্যায়, নীচেসে ময়দা নিকলতা হ্যায়।' সেদিনের বেঙ্গল এক-জিবিসনে এ সবই ছিল।

নাঃ, আপনার বেশ একটু অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারছি। আপনি শহুরে মানুষ। এখান ওখান থেকে আপনি খুঁজছেন একটা ক্যাটলগ। মেলায় দ্রষ্টব্য কি কি আছে, তা নিয়ে একটা ক্যাটলগ হলে আপনি খুব খুশী হতেন। মন ঠিক করে, কোথায় কোথায় যাবেন ঠিক করতে পারতেন। সুবিধে হত। তাছাড়া আপনি শুনেছেন, আঠারশ' একান্ন সালে ইংলন্ডে যে বিখ্যাত প্রদর্শনী হয়—যাতে নাকি ভারতবর্ষের কোহিনুর দেখান হয়েছিল, মহারানী ভিক্টোরিয়া যা স্বয়ং দেখতে এসে-ছিলেন, এবং যে মেলা থেকে এই বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল একজিবিশনের প্রেরণা পেয়েছিলেন বীডন সাহেব, তাতে কত সুন্দর সুন্দর ক্যাটালগ বানান হয়েছিল, আর আলিপুরের কৃষিমেলায় তার একখানাও নেই, একি কম দুঃখ! শুধু আপনি নন, সেকালের কাগজেও এ নিয়ে লেখা হয়েছিল।

তবে অসুবিধার কথা যখন উঠল, তখন শুনুন। ক্যাটালগ না থাকার জন্যে অসুবিধে আপনার আর কি হয়েছিল। অসুবিধে হয়েছিল মেলার সাহেবদের। যাকে বলে বৃহৎ কর্মের ঝঞ্ঝাট। ঠিক ছিল কর্তৃপক্ষরা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালু করে তা' থেকে শক্তিসঞ্চার করে কৃষিমেলার বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় মডেল দেখাবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই স্টিম ইঞ্জিন আর চলল না। লেপেজ কোম্পানী, ড্যাকার-স্টিন কোম্পানী তাঁরাও তাঁদের মডেলের কেরামতি দেখাতে পারলেন না। ডাক্তার বেরীর যে চোখজুড়োন তিসি মাড়াই করার কলটা দেখে এলাম একটু আগে, ঐ ইঞ্জিন চললে দেখতেন বেরী সাহেব একেবারে তিসি মাড়াই করে দেখান। কিন্তু বেরী সাহেব কপাল চাপড়ালেন, তাঁর সে আশায় ছাই! কিন্তু সবাই কিছু মেলার কর্তাদের ওপর ভরসা করে ছিলেন না, তাই বাঁচোয়া। আমরা কয়েকটা চালু যন্ত্র দেখেছিলাম। ঐ যে টমসন কোম্পানীর ইঁট তৈরীর কল ঘট......ঘট করে চলছে। ঐ যে ঐদিকে স্টিমের লাঙলে মাটি চষা দেখান হচ্ছে—ও'রা সব—আপনা হাত জগন্নাথ, নিজেরাই নিজেদের আয়োজন করেছিলেন। স্বয়ংম্ভর, তাই ভরাডুবি থেকে বেঁচেছিলেন!

হুতুম মুখুজ্জে মশায় তাঁর সমাজ-কুচিত্রের নক্সায় ত বলেছেন 'দর্শকদলে মেলাস্থল পুরে গ্যাচে'—কিন্তু দর্শনী লেগেছিল কত? আপনারা আমরা না হয় অনেক দেখেশুনে পরে পশ্চাতে গেছি, সোমবার অর্থাৎ উদ্বোধনের দিন টিকিটের দাম ছিল পাঁচ টাকা। পরের দিন এক টাকা। এবং ক্রমে ক্রমে শেষে দাঁড়ায় এক সিকি। প্রথম দিন ছাব্বিশ হাজার টাকার টিকেট বিক্রি হয়েছিল। সাত-দিন চলার পর একালেও যা হয় 'দর্শকসাধারণের অনুরোধে' মেলা আরও সাতদিন চালু রাখা হয়। যাঁদের 'সিজন' টিকেট ছিল, তাঁদের অবিশ্যি এই বাড়তি সপ্তাহের জন্যে কোন টিকেট লাগেনি। কয়েকদিন নাকি 'ফ্রি' দেখান হয়েছিল। বহু জমিদার মশায়েরা নিজেরা পাল্কী, ঘুড়িগাড়ী করে এসেই ছিলেন, তাদের খাস তালুকের প্রজাদের জন্যেও বিনামূল্যে মেলার টিকেট কিনে দিয়েছিলেন।

না, মেলাতলায় বেশ খানিকটা ঘোরা গেছে, সেই এসেছিলেন, বেলা তখন মাথায়, আর এখন রোদ পড়ে এল, শীতের বিকেল, গায়ে ঠান্ডাও কম লাগছে না, ছেলেদের ত পা-ব্যথা করতে শুরু করেছে, ওরা সব পিছিয়ে পড়েছে। আপনি যতই তাড়া দিন না কেন, এরা আর পারছে না। আসুন না, ঐ পুকুরধারে একটু বসা যাক। ওখানে ত ঘাসের ওপর ভাঙা চেঙ্গারি ও তেকাট্টা চড়া খোট্টা হোটেল খাপ খুলে সর্বাদাই হাজির।' কচুরি, ফুলুরি, লঙ্কা ও প্যাঁজ ভাজার গন্ধে মেলা ম' ম' করছিল—সে গন্ধ আপনার নাকেও এসেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কি ভাবছেন বলুন ত? পকেটে রেস্ত আছে বুঝি। সাহেবী খানার লোভ হয়েছে? তা' ভাববার কি আছে, চলুন না, ঐ ত ঐদিকে খাস 'উইলসন' সাহেব হোটেলের 'ব্রাঞ্চ' খুলেছে। স্পেন্সেস হোটেলও দোকান দিয়েছে এখানে। বাদ কি আছে বলুন?

তা' খাওয়াদাওয়া যখন হ'ল, তখন চলুন বাড়ী ফেরা যাক। ঐ দখিনে লাট-সাহেবের বাড়ীর গাছগাছালির ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, আলিপুরের কোণ ঘেঁষে অন্ধকার নেমেছে, আপনি ঘরের দিকে পা বাড়াবেন বৈকি। তা' যাবার আগে একটা মজার গল্প শুনে যান। না, না, দাশুরায়ের খেউড় বা কলকাতার নবীন নাগর রসের সাগরদের কেচ্ছার কথা ত নয়। সে এই মেলার গল্প। সোমবার ত মেলা খুলল। অর্থাৎ বাইশে জানুআরি ঠিক হ'ল মেলার সেদিন মহিলা-রজনী। 'লেডিজ নাইট'। ঢাকঢোল পিটিয়ে বিকেল সাড়ে ছটার পর প্রদর্শনীর দরজা পুরুষদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। রাত্রি বারটা পর্যন্ত মেলার পুরুষ কর্মচারীরা পর্যন্ত মেলায় ঢুকতে পায়নি! সে একেবারে প্রমীলার রাজ্য! পর-দিন কাগজে ফলাও করে ছাপালে মেলায় বাঙালী ললনার ভিড়ের খবর। কমসে কম হাজার দশ মহিলা নাকি সে রাতে মেলা দেখতে এসেছিলেন। ভাবছেন, এ আর গল্প কি? না গল্প এখানে শুরু। কাগজের রিপোর্টার ত আর নিজে দেখেন নি ভিড়। তাঁর ত কর্তৃপক্ষের মুখে ঝাল খাওয়া। আর তাই ক'দিন পরেই এই প্রচারের বেলুন একেবারে চুপসে গেল। এবং এর জন্যে দায়ী মিশনারীদের ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া। তাঁরা লিখলেন মহিলা-রজনী একেবারেই বহ্বা-রম্ভে লঘুক্রিয়া। মাত্র আঠারজন মহিলা—এইট্টিন ভেইলড বিউটিজ—তাঁদের অব-গুণ্ঠনের পর্দা না সরিয়ে এই মেলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

একজিবিশনের পর পুরস্কার বিতরণ করা হয়নি? অবশ্যই অবশ্যই। বহু স্টলের ভাগ্যেই পুরস্কার জোটে।

(৮৩)

রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী

তপন মিশ্রের পুত্র ওই রঘুনাথ।

পূর্ববঙ্গে দেখা হলে প্রভু তপনকে বলেছিলেন, তুমি কাশীধামে গিয়ে বাস করো। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে।

সপরিবারে কাশীতে চলে এল তপন। দু বছর পরে রঘুনাথ আবির্ভূত হল।

নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাচ্ছেন প্রভু, ঝাড়খণ্ডের পথে, কাশীতে এসে পৌঁছুলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে মধ্যাহ্ন-স্নান করছেন, তপনের সঙ্গে দেখা হল। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল তখন তো প্রভু গৃহস্থ, আজ এ যে দিব্য সন্ন্যাসী! প্রভুর পায়ে পড়ে উল্লসিত হৃদয়ে তপন কাঁদতে লাগল। প্রভু তাকে বুকে তুলে নিলেন, নিয়ে গেলেন বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধবের মন্দিরে।

পরে তপন তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে এল। সবংশে তাঁর পাদোদক খেল। তাঁর শেষান্নও খেল সবংশে। ভিক্ষা-অন্তে প্রভু শয়ন করলে কিশোর রঘুনাথ তাঁর পা টিপতে বসল।

এমনি দশ দিন প্রভু থাকলেন কাশীতে। অবস্থান চন্দ্রশেখর বৈদ্যের আবাসে কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণ তপনের আলয়ে। আর সেখানে এলেই রঘুনাথের সেবা। প্রভুর প্রসাদগ্রহণ, পাত্রমার্জন আর পাদসম্বাহন। যতক্ষণ প্রভু চক্ষুর অগোচরে ততক্ষণ মানসপূজা।

বৃন্দাবন থেকে ফেরবার পথে প্রভু আবার দু মাস অপেক্ষা করলেন কাশীতে। আবার সে দুই মাস রঘুনাথ প্রভুর সেবা করল। সেই বাসনমাজা আর পা-টেপা। আর সর্বক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকা কতদিনে প্রভুর সর্বক্ষণের সেবক হন।

প্রভু যখন নীলাচলে যাচ্ছেন তপন আর রঘুনাথ দুজনেই বললে, আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।

প্রভু তাদের নিবৃত্ত করলেন। বললেন, আমি একা-একা ফিরব। যদি কেউ যেতে চাও, পরে এস, এখন নয়।

ক্রমে-ক্রমে রঘুনাথ বড় হল ও একদিন সমস্ত কাজকর্ম ফেলে নীলাচল যাত্রা করলে। প্রভুর ভোগের জন্যে নানা উপকরণ দিয়ে ঝালি সাজিয়ে নিলে। সেবক তা মাথায় করে নিয়ে চলল।

পথে রামদাস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা। রামদাস সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্য-প্রকাশ নামে অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক। শুধু তাই নয়, সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী। সবচেয়ে বড় কথা—বৈষ্ণব, রামচন্দ্রের উপাসক, অষ্টপ্রহর রাম-নাম জপ করে। সে কিনা রঘুনাথকে দেখে আকৃষ্ট হল। বললে, তোমার ঐ ঝালি তোমার ভৃত্য বহন করবে না, আমি বহন করব। বলে ভৃত্যের মাথার ঝালি নিজের মাথায় তুলে নিল।

রঘুনাথ সংকুচিত হল। বললে, সে কি, তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত, তুমি সামান্য ভারবাহীর মত কেন এ বোঝা মাথায় নেবে? এ তোমাকে মানায় না। তুমি ঝালি ছেড়ে দাও।

না, আমি শুনব না, আমাকে তোমার কিঞ্চিৎ সেবা করতে দাও। রামদাস ঝালি ছাড়ল না।

তোমার সঙ্গ পেয়েছি এই তো আমার যথেষ্ট ভাগ্য। বললে রঘুনাথ, একসঙ্গে সদালোচনা করে পথ হাঁটব এই তো পরম সুখ। ঝালি বইবার দরকার কী।

রাজপুরুষ রামদাস তবু নিরস্ত হল না। বললে, তুমি কুণ্ঠিত হয়ো না। তোমার সেবাতেই আমার হৃদয়ে উল্লাস হচ্ছে। তুমি আমার মাথার দিকে তাকিয়ো না, পথের দিকে তাকাও।

জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।

নীলাচলে পৌঁছে রঘুনাথ প্রভুর চরণে দণ্ডপ্রণাম করল।

রঘুনাথ? কত আগে দেখেছেন, প্রভু এক পলকে চিনতে পারলেন। বললেন, ভালোই হল তুমি এসেছ। কমললোচন জগন্নাথকে দর্শন করে এস, আমার এখানেই প্রসাদ পাবে।

গোবিন্দকে দিয়ে আলাদা বাসা পাইয়ে দিলেন। মিলিয়ে দিলেন ভক্তদের সঙ্গে। সুনিপুণ রান্না করতে পারে রঘুনাথ, প্রায়ই খাওয়াতে লাগল প্রভুকে। তার রান্না অমৃতময়, রঘুনাথ জানে সে অমৃতময়তা শুধু প্রভু খাবেন বলে।

কিন্তু রামদাসের প্রতি প্রভু বদান্য নন কেন?

যেহেতু রামদাস ভক্তিকামী নয়, সে মুক্তিকামী। তাছাড়া তার মনে বিদ্যাবত্তার অহংকার। সর্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভুর আর জানতে বাকি নেই।

কী আর করবে রামদাস? সে গোপীনাথ পট্টনায়কের ছেলেদের কাব্যপ্রকাশ পড়াতে লাগল।

নীলাচলে আটমাস থাকল রঘুনাথ। বিদায় নেবার সময় প্রভু বললেন, শোনো, বিয়ে কোরো না। বৃদ্ধ মা-বাপের সেবা করো। কোনো বৈষ্ণবের কাছে ভাগবতের পাঠ নিয়ো। আর—আর একবার নীলাচলে এস।

নিজের কণ্ঠমালা প্রভু রঘুনাথকে পরিয়ে দিলেন। প্রেমগদগদনেত্রে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

পিতা-মাতার সেবাই মহৎ আদর্শ। রাম, কৃষ্ণ, আর গৌরাঙ্গ সবাই এই পথের পথিক। 'মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি। সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।।'

ভক্ত পিতা-মাতার সেবা করলে ভগবান সেই পিতৃ-মাতৃ-ভক্তের প্রতি আপনিই কৃপা করেন।

বিট্‌ঠলনাথের কাহিনী মনে করো:

পুণ্ডলীক ভক্ত সন্তান, শুধু বাপ-মায়ের সেবাই তার একমাত্র জীবিকা। তার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং নারায়ণ মুগ্ধ। ইচ্ছে হল একবার দেখে আসি ভক্তকে।

ভীমা নদীর তীরে পাণ্ডরপুর গ্রাম, সেইখানে পুণ্ডলীকের বাড়ি। দ্বারকা থেকে

বেরিয়ে নারায়ণ পুন্ডলীকের গৃহদ্বারে এসে পৌঁছুলেন। পুন্ডলীককে ডেকে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পুন্ডলীক বললে, আমার সময় নেই, আমি এখন পিতা-মাতার সেবায় ব্যস্ত।

শোনো, আমি দ্বারকাধীশ; দ্বারকা থেকে এসেছি। বললেন আগন্তুক। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

দ্বারকা থেকেই আস বা গোলোক থেকেই আস, আমার দাঁড়াবার সময় নেই। যদি আলাপ করতে চাও তো অপেক্ষা করতে হবে।

তাই করব। কিন্তু কতক্ষণ?

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমি আমার বাবা-মার সেবা করি। তাঁদের খাওয়াবার পর তাঁদের যখন বিশ্রাম করতে পাঠাই তখনই আমার কিঞ্চিৎ অবসর মেলে।

বেশ, আমি ততক্ষণই অপেক্ষা করব। কিন্তু আমি বসব কোথায়?

বসবে কোথায়? পুন্ডলীক দুখানি ইঁট সংগ্রহ করে আনল। বললে, এর উপরে বোসো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না—আমি যাই।

গৃহ-অভ্যন্তরে চলে গেল পুন্ডলীক। বাবা-মাকে নাইয়ে-খাইয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়ে ছুটি পেল। ছুটি পেয়ে বললে, দ্বারকাধীশ এসেছেন, আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাইরে।

বাবা-মা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। কী বলছিস তুই? দ্বারকাধীশ এসেছেন?

হ্যাঁ, তাই তো বললে, বললে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

কোথায় তিনি? বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

দরজার গোড়ায় দুখানি ইঁট পেতে বসতে দিয়ে এসেছি। সেইখানেই বসে আছেন হয়তো।

এতক্ষণ বলিসনি কেন?

কখন বলব? সেই সকালবেলা এসেছে। আমি তো সারাক্ষণই তোমাদের সেবায় ব্যস্ত। কখন বা তোমাদের বলি, তার সঙ্গে বা আলাপ করি।

চল চল দেখি গে। আছেন না চলে গেছেন?

পুন্ডলীক ও তার বাবা-মা ব্যাকুল হয়ে বাইরে ছুটে এল। এসে দেখল দুখানি ইঁটের উপর চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে দ্বারকায় সোরগোল পড়ে গিয়েছে মন্দিরে বিগ্রহ নেই। পুন্ডলীকের বাড়িতে লীলা সাঙ্গ করে নারায়ণ যখন দ্বারকায় ফিরে গেলেন তখন মন্দিরের দরজা খুলে পূজারী দেখল বিগ্রহ বিরাজিত।

আর পান্ডুরপুরের লোকেরা দেখল সেই দুখানি ইঁটের উপর নারায়ণের পদাঙ্ক মুদ্রিত হয়ে আছে।

ওদেশের ভাষায় ইঁটকে বিট বলে। বিটকে স্থল করে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ঠাকুরের নাম হল বিটঠল-দেব। আবার কেউ কেউ বলেন ইঁটের উপর বৈঠতে বা বসতে বলেছিল বলে বিটঠল-ঠাকুর।

সেই বিটঠল-ঠাকুরকে স্বচক্ষে দেখে গেছেন মহাপ্রভু।

তাৎপর্য কী? যে সন্তান একনিষ্ঠ হয়ে বাবা-মার সেবা করে সে কৃষ্ণলাভ করে। আর তার গুণে তার বাপ-মাও কৃষ্ণের দর্শন পায়।

গৃহে চার বছর থাকল রঘুনাথ। অনন্য নিষ্ঠায় পিতা-মাতার সেবা করল। বৈষ্ণব পন্ডিতের কাছে পড়ল ভাগবত। তারপর পিতা-মাতার দেহান্ত হলে উদাসীন হয়ে নীলাচলে ফিরে এল।

এবারও প্রভুর সঙ্গে আট মাস কাটল। ভক্তসঙ্গ করে আর দুই ব্রহ্ম, দারুব্রহ্ম ও জঙ্গম ব্রহ্ম, নিত্য দর্শন করে। কিন্তু প্রভু একদিন অন্যরকম বিধান করলেন। বললেন, যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গ করো। ভাগবত পড়ো আর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম নাও। বলে আলিঙ্গন করলেন। মহোৎসবে জগন্নাথের প্রসাদী চোদ্দ হাত লম্বা যে তুলসীর মালা পেয়েছিলেন আর যে পানের খিলি, তাই রঘুনাথকে উপহার দিলেন। সেই উপহারের স্পর্শে রঘুনাথের মধ্যে শক্তিসঞ্চার হল। ইষ্ট-ভক্তিতে রঘুনাথ নিবিষ্ট হয়ে রইল।

চলে এল বৃন্দাবন। রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবত। আর 'ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় মন'—অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হয়। এমন পিককন্ঠ কেউ শোনেনি আগে। এক-একটি শ্লোক বিভিন্ন রাগরাগিণীতে কীর্তন করে। আর যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আসে তখন আত্মহারা হয়ে পড়ে। কী যে দেখছে কী যে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। বোঝবার দরকারই বা কী। গোবিন্দচরণে আত্মসমর্পণই একমাত্র বস্তু। গোবিন্দচরণই তার একমাত্র প্রাণধন, একমাত্র প্রাণারাম।

রঘুনাথের অনুরোধে এক ধনী শিষ্য গোবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে, কুন্ডলে, বংশীতে। রঘুনাথ গ্রাম্যবার্তা বা বৈষয়িক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না—কৃষ্ণকথা পূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কোনো বৈষ্ণব-নিন্দাও তার কানে আসে না। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কন্ঠে ধরে থাকে।

ভাগবতেই রঘুনাথের অসামান্য অধিকার। যেমন মধুর গম্ভীর কন্ঠস্বর তেমনি উচ্চারণের নির্মলতা। তেমনি আবার সঙ্গীতকৌশল। মহাপ্রভুর মতে বেদান্ত-দর্শনের প্রাঞ্জল ভাষ্যই ভাগবত—রঘুনাথের ব্যাখ্যায়ও সেই মতেরই অনুসরণ।

নিজে কোনো গ্রন্থ লেখেনি রঘুনাথ। তার একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন আর ভাগবত-পাঠ। যখন অপ্রকট হবার সময় হল প্রভুর দেওয়া প্রসাদমালা গলায় পরে নিল রঘুনাথ।

(৮৪)

ভূগর্ভ গোস্বামী

ভূগর্ভ গোস্বামী গদাধর-পন্ডিতের শিষ্য। সন্ন্যাস নেবার আগে প্রভু যখন লোকনাথ চক্রবর্তীকে বৃন্দাবনে পাঠাতে চান, তখন ভূগর্ভ বললে, আমিও যাব।

প্রভু অনুমতি দিলেন। বললেন, তোমরা দুজনেই যাও। লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করো। দুই বন্ধু বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হল। 'তনু মন এক ইথে কিছু ভিন্ন নয়। পরম অদ্ভুত এই দোঁহার প্রণয়।'

বৃন্দাবনের প্রথমাগতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূগর্ভ আর লোকনাথ। দুজনেই আজন্ম ব্রহ্মচারী, মহাবিবিক্ত, লোকবিরল বৃন্দাবনের বনে-বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোথায় কী তীর্থ আছে তার সন্ধানের সূত্র খোঁজা আর ভজন-আনন্দে কাটানো এই তাদের ব্রত। ব্রজধামের পুনরাবিষ্কারের প্রথম সূত্রধর এই দুই বন্ধু, অভিন্নাত্মা, সকল সমাজের মাননীয় ও বন্দনীয়। যে এসেছে সেই এই দুই নিত্যপরিকরের কাছে প্রণত হয়েছে।

ভূগর্ভ রূপগোস্বামীর সঙ্গী, জীব গোস্বামীর প্রণম্য। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও পরে রামচন্দ্র কবিরাজ সবাই বৃন্দাবনে ভূগর্ভের অভিনন্দন পেয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত লেখবার অনুমতি চাইতে গেলে ভূগর্ভ বললে, লেখ, কিন্তু আমার নামের যেন উল্লেখ না থাকে।

লোকনাথ বললে, আমিও যেন বাদ পড়ি।

ছয় গোস্বামী—রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। নরোত্তম আরো তিনজনের নাম যুক্ত করল—স্বরূপ, ভূগর্ভ আর লোকনাথ।

স্বরূপ, সনাতন, রূপ রঘুনাথ, ভট্টযুগ
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল অর্ধ
আর কিসে পুরিবেক সাধ।।

(ক্রমশঃ)

শতবর্ষ পূর্বের বিজ্ঞাপন পদ্ধতি

সন্তোষকুমার দে

পণ্যপ্রচারের জন্য যত প্রকার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন তার মধ্যে মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে বলা চলে। এটা সারা দুনিয়ার নিয়ম, ভারতবর্ষেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তাই দেখতে পাই, অমৃতবাজার পত্রিকা যখন বাংলা সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হত, তখন থেকেই তাতে সংবাদের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনও স্থান পেয়েছে। তবে সেই শতবর্ষ পূর্বের বিজ্ঞাপনে এ-যুগের ছলাকলার অভাব ছিল, এমনকি হরেক রকম হরফ ব্যবহারের সুবিধা ছিল না, ব্লকও যা ব্যবহৃত হত, তাও কাঠ কুঁদে তৈরী, তাতে বর্তমানে ব্যবহৃত ব্লকের সূক্ষ্ম চারুতা আনা সম্ভব ছিল না।

অমৃতবাজার পত্রিকা ইংরাজি সাপ্তাহিক এবং পরে দৈনিক হওয়ার পরেও যে বিজ্ঞাপনদাতা বাংলায় বিজ্ঞাপন দিতে চাইতেন, তাঁর বিজ্ঞাপন বাংলাতেই বেরত।

২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮২ সালে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য :

নতুন কাব্য।
"দশমহাবিদ্যা"।
সুপ্রসিদ্ধ কবি।
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিরচিত।
মূল্য ৷৵৹ আনা ডাকমাশুল অর্ধ আনা।
কলিকাতা, ২৪৯নং স্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে
প্রাপ্তব্য।
আই সি বসু কোং।

লেখায় প্রতিটি পংক্তির শেষে 'দাঁড়ি' চিহ্ন, ঠিকানা আগে দিয়ে প্রকাশকের নামটি পরে দেওয়া। আর ছয় আনা মূল্যের এই বিস্মৃতপ্রায় কাব্যখানির রচয়িতা স্বয়ং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্তমানে কোনও বাংলা কাব্যের, এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই রকম বিজ্ঞাপন কি ইংরাজি দৈনিকে প্রকাশিত হয়?

কোথাও কোথাও এই রকম হরফ সাজিয়ে তৈরী বিজ্ঞাপন হয়ত কোন সংবাদের তলায় শুরু হয়েছে এবং সবটা এক কলামে না ধরায় সেটি পরবর্তী কলামের মাথায় চলে এসেছে—ফলে একই বিজ্ঞাপনের মুড়ো আর ল্যাজার মধ্যে দুস্তর ফাঁক রয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে দেখা দূরে থাক, সেটি বিজ্ঞাপন কি সংবাদ তাই জানাই শক্ত।

যেমন একটি বিজ্ঞাপনের নিম্নোক্ত অংশ একটি কলামের তলায় গিয়ে থিতিয়ে পড়ল—

মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে উপদেশ।
শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র এবং নানাবিধ ধর্ম যোগ ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণাদি সম্বলিত।

মূল্য ১৷৷৹ ডাকমাশুল /১০ দেড় আনা। পরের কলামের মাথায় চলে গেল বিজ্ঞাপনের এই শেষাংশ :

শ্রীগিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত কলেজের প্রোফেসর। অপার সারকুলার রোড। কলিকাতা।

গিরীশ বিদ্যারত্ন লেন নামে এখন যে রাস্তাটি হয়েছে, ওখানেই নিশ্চয় তিনি থাকতেন, কিন্তু তখনও বাড়ির নম্বর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল না। এই বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল ২, ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ তারিখে।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা' গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপন ইংরেজিতে বাংলায় মিশিয়ে বেরিয়েছিল। সেটি এই—বেরিয়েছিল ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২

Just Published
হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।
Part I Third Edition Price 1 Rupee Postage 1 anna. To be had of Chundernath Bose, 2 Obncy Chunder Ghoshe's Lane, Shampukur, Calcutta
Part II In the press

একই দিনে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের এবং রসরাজ অমৃতলালের নাটক বাংলায় বিজ্ঞাপিত হয় এইভাবে :

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকসকল ১৩নং বসুপাড়া লেন বাগবাজার ও ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রাপ্তব্য। ডাকমাশুল লাগিবে না।
"আনন্দে রহো"। ঐতিহাসিক নাটক ১ টাকা।
"রাবণ বধ"। পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক দৃশ্যকাব্য। ১ টাকা।
"অভিমন্যু বধ" ঐ ঐ ১ টাকা।
"মায়াতরু" ৷৵৹
"মোহিনী প্রতিমা" ৷৵৹
বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত
"তিল তর্পণ" নাটক ।৹
"চোরের উপর বাটপাড়ি"

সমসাময়িক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রও বিজ্ঞাপন মাধ্যমেই পাওয়া যায়। ১৩ এপ্রিল ১৮৮২ সালের অমৃতবাজার পত্রিকায় চাকুরী খালি বিজ্ঞাপনের একটি নমুনা এইরূপ :

অত্র জেলার অন্তর্গত রায়পুর বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি স্কুলের জন্য একজন পণ্ডিত আবশ্যক। মাসিক বেতন ২০ টাকা। বাসা খরচ ইত্যাদি কিছু লাগিবেক না। ব্রাহ্মণের আবেদন সমধিক আদরণীয়। আবেদনকারীর ইংরাজিতে সামান্য জ্ঞান না থাকিলে প্রার্থনা করার আবশ্যক নাই।
রংপুর
২৭শে মার্চ ১৮৮২ | শ্রীকিনু সিংহ রায়

পূর্বেই বলেছি, এই সময়েও নানা প্রকার বিজ্ঞাপনে অমৃতবাজার পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরা থাকত। ১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখটির কাগজ খুললে দেখা যাবে এই সব বিজ্ঞাপন—

১। অ্যাব্রেচ কোম্পানীর চাবিহীন পকেট ঘড়ি

২। এইচ বোসের 'কুন্তলীন' সুগন্ধী কেশতৈল

৩। পত্রিকা কার্যালয়ে প্রাপ্তব্য 'নয়শো রুপেয়া' প্রহসন নাটিকা

৪। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের আয়ুর্বেদীয় ওষুধ—কর্ণরোগান্তক তৈল, চ্যাবনপ্রাশ প্রভৃতি (তিনতলা বাড়ির ছবিসহ)

৫। এডওয়ার্ডস পেপিয়া এসেন্স্ (পেপে গাছের ছবিসহ)

৬। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড ম্যানেজিং এজেন্টস্—কিলবার্ণ এন্ড কোং (আলোর জন্য প্রতি ইউনিট আট আনা। যন্ত্রপাতি চালনায় পাওয়ার হিসাবে প্রতি ইউনিট পাঁচ আনা। বছরে তিন হাজার ইউনিটের বেশী ব্যবহারে কিছু বিশেষ কমিশন ঘোষিত হয়েছে।)

এই সময়ে নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনগুলিও দেখা যেত :

৭। বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ (তখনও লিমিটেড হয়নি।)

কনসালটিং কেমিস্ট এণ্ড এনালিস্ট—
পি সি রায় ডি-এস-সি (এডিনবরা।)
কনসালটিং মেডিক্যাল এডভাইসার—
ডাঃ নীলরতন সরকার এম-এ, এম-ডি,
ওষুধ—এলিকসার পেপেইন, কোকা ওয়াইন, কোলা ওয়াইন, সিরাপ ফসপো গ্লিসারিন অব লাইম।
প্রসাধনী—গোলডেন ক্যানথারাইডিন অয়েল।

৮। মহৎ আশ্রম (বোর্ডিং হাউস)
৯। এলেকজান্ডার রলটার—এসিটিলিন ল্যাম্প এবং জরির পোষাক (রাজা মহারাজাদের জন্য জরির পোষাক এরাই দিতেন)
১০। স্কটস ইমালসান
১১। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা-র পূর্ণ-পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন
১২। 'বৃন্দাবন ওয়াচ'—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির ডালা দেওয়া পকেট ঘড়ি
১৩। থ্যাকার স্পিংক এন্ড কোং
ব্যাঙ্কিং এবং এজেন্সী বিভাগ
কমপক্ষে ৩০০ টাকা দিয়ে কারেন্ট একাউন্ট' খোলা যায়।
(লণ্ডন করেসপনডেন্ট—ডবল্যু থ্যাক'র এণ্ড কোং)
১৪। ডাঃ বি এম সরকারের "এরোমা অগাস্টাস" (নারীরোগের ওষুধ)
১৫। হিন্দু আশ্রম এন্ড ক্যালকাটা সরাই
১৬। ডাঃ ডবল্যু সি রায়ের পাগলের ওষুধ
১৭। 'ওয়ানডারফুল অয়েল'
১৮। এন সি ঢোল এণ্ড কোং-র শিব মার্কা সুগন্ধী গোলাপী নারিকেল তেল এবং আরো অনেক পণ্য।

এই সময়ের বিজ্ঞাপিত কত পণ্য আজ লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অনেক পণ্য আজও টিকে আছে। তালিকাটি পড়ে গেলে এ যুগে সুপরিচিত বহু কোম্পানী এবং তাদের পণ্যের মধ্যেও চোখে পড়বে।

এই সময়ের বিজ্ঞাপনে প্রশংসাপত্র ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। কবিরাজি এবং ডাক্তারি ওষুধের বিজ্ঞাপনে অনেকগুলি করে প্রশংসাপত্র জুড়ে দেওয়া হত। এমনকি কুন্তলীন এবং কেশরঞ্জন তেলের বিজ্ঞাপনেও অনেক প্রশংসাপত্র ছাপা হত। কুন্তলবৃষ্য তৈল নামক একটি কেশ-*তৈলের বিজ্ঞাপনে স্বয়ং মহাকবি গিরিশ-চন্দ্রের প্রশংসাপত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এইচ বোস পারফিউমার-এর আর একটি ব্যবসায়* ছিল—সাইকেলের। সাইকেলের বিজ্ঞাপনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশংসাপত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

এই সময়ে মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রমুখ ইস্কুল থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহের চেষ্টা চলত, যেমন আজকাল অনেক টিউ-টোরিয়াল হোম এবং কমার্শিয়াল কলেজ থেকে করা হয়। তখন তো টাইপরাইটার সবে আবিষ্কৃত হচ্ছে, তাই টাইপ শেখাবার এত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তথাকথিত এনজিনিয়ারিং কলেজও তখন হয়নি।

ওষুধের বিজ্ঞাপনের সংখ্যাই ছিল সব-চেয়ে বেশী। থিয়েটারের এবং সার্কাসের বিজ্ঞাপনও নিয়মিত থাকত। চাকুরির বিজ্ঞাপন খুব অল্পসংখ্যক থাকত, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনও অল্পস্বল্প বেরুত। কিন্তু এই সব 'ওয়ানটেড' (wanted) মার্কা বিজ্ঞাপন তখনও যে লোকে সাগ্রহে পড়ত তা বোঝা যায় ওষুধের বিজ্ঞাপনেও 'ওয়ানটেড' বিজ্ঞাপনের পোষাক পরানোতে। একটি নমুনা দিই

> "Wanted — Asthmatic sufferers of the season to make haste for a supply of our Asthma Mistura. The only balm in their critical moment. Nerves instantly relief (relieved?) in five dose (s?) with lasting effects. No case however worst (!) is hopeless to our unique remedy. A trial suffice (!) Price Rs. 2|- Apply Manager B. C. Works, Kidderpore, Calcutta.

(এটি কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন নয়, খিদিরপুরের কোনও ব্রিটিশ কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এর।)

১৮৮২ সালের আর একটি মজাদার বিজ্ঞাপন দিয়ে আজকের প্রসঙ্গ শেষ করি। এটিও অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

তখন হারমোনিয়াম সবে এদেশে আমদানি হচ্ছে, হারমোনিয়াম নামটা তখনও চালু হয়নি। সেই সময়ে ৩নং ডালহৌসী স্কোয়ারে হ্যারলড এন্ড কোং তাদের মিউজিকাল বক্স-এর বিজ্ঞাপন এইভাবে দিয়েছিলেন :

> **HAROLD & CO. 3 Dalhousie Sq., Calcutta.**
> **Musical Boxes**
> *Harold & Co. beg to invite* the attention of the native Nobility and Gentry of Calcutta and the Mofussil to a superb invoice of musical boxes playing Bengali tunes, and Hindustanee composed by Rajah Dr. Tagore.
> Prices on Application
> 3 octaves
> can be placed
> on the knee or
> on a table
> **Prices**
> in case complete
> from 50 Rs.
> each
> Harold & Co. have these instruments specially made for India and have published an Instruction Book, so that any person, without the least knowledge of music, after a few minutes' practice, can play any of the tunes contained in this work, which includes several of the noted Hindustanee and Bengalee airs
> Harold & Co., Calcutta

এতে যে Raja Dr. Tagore-এর কথা বলা হয়েছে, তিনি কি সঙ্গীতসাধক রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর?

হ্যারলড কোম্পানীর ভাষায় মনে হয়, হারমোনিয়াম জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁরা স্বরলিপি পুস্তকও প্রকাশ করেছিলেন।
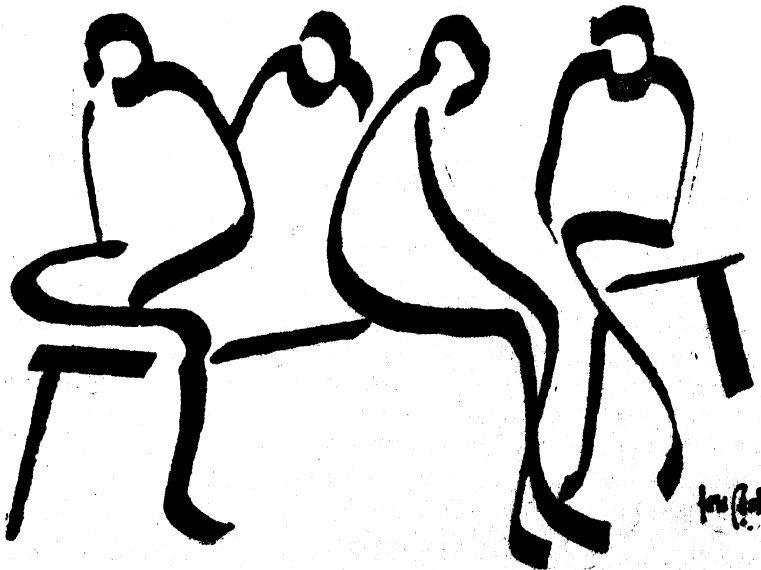
কলকাতা

কলকাতা

কলকাতা

মেষ থেকে মোষ—ব্যবধান শুধু একটি স্বরবর্ণের। ব্যাকরণ মানতে হলে "মেষের" সঙ্গে জাত মিলিয়ে বলতে হয় "মহিষ", তাতে তফাৎটা আর একটু বেড়ে যায়। কিন্তু এসব অবান্তর। খাদ্যতত্ত্বের বিচারে রুচির মাপকাঠিতে দুয়ের ভিতর দুস্তর দূরত্ব। বিশেষতঃ রুচিটা যখন বাঙালীর, যার রাসন অনুভূতি সূক্ষ্মতায় বিশ্বের বিস্ময়।

কিন্তু সত্যিই কি বিশ্বের বিস্ময়? সন্দেহের অবকাশ, আসুন মেনে নেই, আছে। মানতে ইচ্ছা না হয়, স্মরণ করুন এই সেদিনের সেই সংবাদটি, কলকাতার প্রায় সব দৈনিকের মারফৎ যেটি পরিবেশিত হয়েছিল।

কলকাতার অনেক হোটেল-রেস্তোঁরায় যা "মটন" বলে খেয়ে থাকি তা নাকি "মটন" নয়, "বাফেলো" অর্থাৎ মোষ। বিশেষ করে যাকে বলা হয় চপ ও কাটলেট, এবং কাবাব, তা নাকি স্রেফ মোষের মাংস।

তথ্যটি প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক পদস্থ কর্মচারী। এ সম্পর্কে কিছুকাল আগে কলকাতার হোটেল রেস্তোরাঁগুলিতে একটি সরেজমিন তদন্তও নাকি হয়েছে, যাতে এই সত্যটি উদঘাটিত হয়েছে।

ছোট্ট খবরটি, কিন্তু কী সাংঘাতিক। অন্য কোনও কারণে সাংঘাতিক নয়। কলকাতার ভোজনরসিক বাবুরা এতকাল ধরে খেয়েও টের পাননি শুধু এই কারণে। এর পর আর কেউ বাঙালীর ভোজন-বিলাসিতার বাবদে সুনাম বা বদনাম করতে পারবেন না। এখানে ভাত মুখে দিয়েই যে শবগন্ধ পেয়ে খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়েছিল সেই ভোজন-বিলাসীর কথা মনে করছি।

জানবার পর অনেকেরই নাকি অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসছিল। কোন কোন বিশিষ্ট নাগরিকের মুখে শুনেছি, তাঁদের উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা, যারা হোটেলে রেস্তোরাঁয় খেয়ে খেয়ে শরীরের বারটা বাজাবার উপক্রম করেছিল, সহস্র বারণ ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করেও যাদের নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি, তারাও নাকি এর পর দোকানে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। একটা প্রচন্ড শিরঃপীড়া এত সহজে আরাম হওয়াতে অনেক বাবা-মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন।

এটা অবশ্য একটা দিকের ছবি। খবরটা শুনে যত লোকে বিরক্ত হ'য়েছেন তার সমান সংখ্যা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন। এমনি করেই আসে বিপ্লবের হাওয়া। রুচিতেও বিপ্লব চাই বইকি! কেউ বলেছেন, "ভারী একটা নতুন খবর দিলেন! সেই হাফপ্যান্ট পরা বয়স থেকে খেয়ে আসছি বাফেলো-কারী, আপনিও খেয়েছেন। কেন, আপনি কি এতদিন মটন ভেবে খাচ্ছিলেন?" আবার কেউ বলছেন, "বেশ তো, মোষ খেয়ে যদি আমাদের প্রোটিন-দুর্ভিক্ষ দূর করা সম্ভব হয়, ক্ষতি কি তাতে? কিন্তু তাই বলে প্রতারণাকে প্রশ্রয় দিতে হবে? মটন বলে মোষ খাওয়ায় যে সে প্রতারক, তার শাস্তি চাই।"

যদি জানতে চান মোষের মাংস হোটেল রেস্তোরাঁয় আসে কোথা থেকে। কলকাতা করপোরেশনের ট্যাংরা বধ্যভূমিতে প্রত্যহ নিয়মিত মোষ কাটা হয়, তাদের সংখ্যা আনুমানিক ১৫০, এবং এথেকে মোট প্রায় ৫০০ মণ মাংস দৈনিক পাওয়া যায়। এর সামান্য অংশ চিড়িয়াখানায় মাংসাশী পশুর খাদ্য হিসাবে যায়। আর বেশীর ভাগ যায় বাজারে যেখানে মানুষের খাদ্য হিসাবে এর চাহিদা আছে। মিউনিসিপাল মার্কেট, পার্কসার্কাস বাজার ও লোয়ার সার্কুলার রোডের মাংসের স্টলগুলিতে সাধারণতঃ মাংস সরবরাহ হয়ে থাকে। পাঁচ বছরের নীচের ও ১৫ বছরের উপরের বয়সের জানোয়ারগুলি কাটা হয় না। দামে অতি সস্তা —২ টাকা থেকে আড়াই টাকা কে জি— অথচ পুষ্টিকর। আর স্বাদ? কিমা বানিয়ে ঝাল-মশলা দিয়ে রান্না করে দিলে কেউ ধরতে পারা দূরের কথা, তার গন্ধে মাংসাশী মানুষ মাত্রেরই জিভে জল আসতে বাধ্য।

পুষ্টির প্রশ্ন যদি তোলা হয়, তবে খাদ্যগুণ বিশারদের মতে মোষের মাংস অন্য যে-কোন মাংসের চেয়ে খাদ্যগুণে দরিদ্র নয়। বরং এত বেশী সমৃদ্ধ যে তার জন্য এই মোষেরই এক জাতি আমেরিকায় লোপ পেতে বসেছিল। এককালে আমেরিকা মহাদেশের বন্য অঞ্চলগুলিতে তারা অবাধে বিচরণ করেছে, তখন সংখ্যায় ছিল তারা অগুনতি। তখনও আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গের পায়ের দাগ পড়েনি। স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ানদের প্রধান খাদ্য ছিল "ওয়াইল্ড বাফেলো"। ("বাফেলো" বলা হলেও আসলে ওরা ঠিক মোষ নয়। যাই হোক ওই নামেই ওরা চলে এসেছে এবং আমেরিকার একটি বিখ্যাত শহর ওই

নামানুসারে বাফেলো)। প্রধান খাদ্য হলেও রেড ইণ্ডিয়ানরা "বাফেলো" খেয়ে কোনদিনই শেষ করতে পারত না। ওদের কাল এল শ্বেতাংগ আগমনের পর। রেল রাস্তা তৈরী করতে আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ কর্মী যখন আমদানী করা হল, তখন তাদের খাদ্য-সমস্যা দেখা দিল গুরুতর আকারে। সমাধানও হাতের নাগালের ভিতরেই ছিল। একদিকে জংগল কেটে লাইন পাতা হতে লাগল, আর একদিকে "বাফেলো" নিধন যজ্ঞ চলল। এক-একটা জানোয়ার কেটে ৬।৭ মণ মাংস পাওয়া যেত। এতে শ্রমিকদের খাওয়াবার সমস্যা মিটল, কিন্তু 'বাফেলো" বংশ প্রায় লোপ পেল। সংরক্ষণের ফলে আজকে তারা আবার সংখ্যাবৃদ্ধি করছে।

কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমাদের প্রোটিনের ঘাটতি আছে বলেই যা-তা মাংস দিয়ে তা পূরণ করা চলবে না। একথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলি, মোষের মাংস যা-তা মাংস, অর্থাৎ হিন্দুর অখাদ্য নয়। কলকাতার বাজারের মোষের মাংস যাঁরা কিনে বাড়ী নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু।

বলা বাহুল্য শাস্ত্রে নিষেধ নেই বলেই প্রোটিন সমস্যার সমাধান এত সহজে হবার নয়। বরাহ-ভোজনও হিন্দুর নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তাই বলে বরাহ মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করতেও কাউকে দেখা যায় না। রুচির প্রশ্নটাই বড়। সেখানে বেশী লাভের জন্য রুচি-বিরুদ্ধ শস্তা মাংস না জানিয়ে খাইয়ে বেশী দাম আদায় করাকে প্রতারণাই বলতে হবে। কলকাতার বহু ভোজনালয়ে এই প্রতারণা কতদিন থেকে চলে আসছে, তা কে বলতে পারে। হাঁস বা মুরগীর ডিমের ওমলেট চেয়ে কুমীরের ডিমের ওমলেট খেয়ে কজন ধরতে পেরেছেন? অথবা ভেটকি ভাজা চেয়ে বোয়াল ভাজা খেয়ে? আর ধরতে পারলেই যে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে এমন অপবাদও কেউ দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।

হোটেল রেস্তোরাঁতে স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত খাবার পরিবেশন করা হয় কিনা সেদিকে নজর রাখার ভার মুখ্যত কলকাতা করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের। স্বাস্থ্য-বিভাগ থেকে দোকানগুলি নিয়মিত পরিদর্শনও করা হয়, কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রতি দোকান থেকে প্রতিটি খাদ্যের নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার কোন ব্যবস্থা নেই। ভেজালের অভিযোগ পেলে তাঁরা অভিযুক্ত দোকানে হানা দিয়ে সেই বিশেষ খাদ্যটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন. কিন্তু ভেজাল প্রমাণ করার সেরকম অব্যর্থ কোন প্রক্রিয়া তাঁদের আয়ত্তে আছে বলে মনে হয় না। প্রমাণ হলেও কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করবার আইনানুগ ক্ষমতা তাঁদেরও সীমিত, একথা জানান কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক মুখপাত্র। অনেক বছর আগে একবার কোন দোকানে মুরগীর মাংস বলে গোলা পায়রার মাংস চালাবার খবর পেয়ে তাঁরা একটি ব্যাপক অভিযান শুরু করেছিলেন। তাতে কিছু ফল হয়েছিল, কিন্তু খুবই সাময়িক।

কাজেই মেষবংশের মোষ হয়ে আত্মপ্রকাশের সংবাদ যতই চাঞ্চল্যকর হোক না কেন, (অনেকেই চাঞ্চল্যকর বলে মনে করছেন না) একে বন্ধ করবার আশা ছেড়েই দিতে হয়।

●

কলকাতার কথোপকথনের ভাষার বিবর্তনে উৎসাহী এক বন্ধু সেদিন হিসাব করছিলেন, গত পঁচিশ বছরে এক-একটি ভাবের প্রকাশে পাঁচটি বা ততোধিক হারে শব্দ জন্মলাভ করেছে ও মরে গিয়ে পরবর্তী শব্দকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেখালেন, উৎকর্ষ বোঝাতে পাঁচটি শব্দ মুখে মুখে তৈরী হয়েছে। চল্লিশ দশকে শব্দটি ছিল 'দুর্দান্ত'। আজ 'দুর্দান্ত' কদাচিৎ কাউকে ব্যবহার করতে শোনা যায়, কি যায় না। তারপর এল 'কড়া'। কড়াও এখন বিশেষ শোনা যায় না। কড়ার পর 'র‍্যাণ্ডম'। ইংরেজী 'র‍্যান্ডম' শব্দের সংগে উৎকর্ষের কি সম্পর্ক বলা দুষ্কর। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম সাধারণ বিজ্ঞানের নিয়মের সংগে সামঞ্জস্য রেখে চলে না। ছবিটা, বা বইটা 'র‍্যাণ্ডম' হয়েছে—'র‍্যাণ্ডম' অভিনয় করেছে—ইত্যাদি তখন শোনা যেত। আজ যায় না। এরপর এল 'হেভি'। ইংরেজী 'হেভি'র সংগে উৎকর্ষের আত্মীয়তা খুঁচিয়ে বার করা হয়ত নিতান্ত দুঃসাধ্য নয়। 'হেভি' লিখেছে. 'হেভি ইন্টারেস্টিং' ইত্যাদি। ক্রমবিকাশে 'হেভি' উৎকর্ষ ছেড়ে আধিক্যের জায়গা নিল। যেমন 'হেভি' বকুনি ইত্যাদি। আরও পরের বিশেষণ 'দারুণ'। 'দারুণ' শব্দটি তেমন চিত্তচমৎকারী নয়, একটি পুরোন শব্দকে অর্থ প্রায় অপরিবর্তিত রেখে নতুন জীবন দেওয়া হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক' ছবির নায়কের সংলাপে স্থান পেয়ে তার মর্যাদা আরও খানিকটা বেড়ে গেছে।

চালিয়াতির 'চাল' বিবর্তন লাভ করেছে 'গুল', 'ভ্যাম্প' 'তাল' 'রেলা' এইভাবে। স্থানাভাবে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা গেল না। লিখিত ভাষা অনেকটা স্থাণু। কথিত ভাষা জীবন্ত, সচল। কলকাতার কথিত ভাষা একটু বেশী জীবন্ত. বেশী সচল। সময়ান্তরে এর আলোচনা করা যাবে। —স, সে

নিমাই ভট্টাচার্য

(১২)

দোলাবৌদি

বহুজনকে দীর্ঘদিন তৈলমর্দন করেও কলকাতার কোন পত্রপত্রিকায় যখন কোন চাকরি জোটাতে পারলাম না, তখন এক্সপ্রেস আর ক্রনিকেলের ঐ সামান্য অস্থায়ী কাজও বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু কতকাল? মেমসাহেবকে নিয়ে আমার জীবনের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা ছিল না। কর্মজীবনে সে অনিশ্চয়তা আমাকে এবার ধীরে ধীরে উদ্বিগ্ন করতে লাগল।

দৈনন্দিন রিপোর্টিং ছাড়া প্রবন্ধ-ফিচার ইত্যাদি লেখা ঠিকই চলছিল। কখনও এ কাগজে, কখনও সে কাগজে এসব লেখা ছাপাও হচ্ছিল। কোন কোন লেখা অমনোনীতও হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দশ-পনের-বিশ টাকার মণিঅর্ডার বা চেকও পাচ্ছিলাম। মন্দ লাগছিল না। কিন্তু সাংবাদিক ফেরিওয়ালা হয়ে তো জীবন কাটাতে পারি না! এই অনিশ্চয়তার মধ্যে মেমসাহেবকে তো টেনে আনতে পারি না! তাছাড়া আমাকে পাশ কাটিয়ে অনেক পরিচিত নতুন ছেলেছোকরার দল অলি-গলি দিয়ে কর্মজীবনের রেড রোড ধরে ফেলল। নিজেকে বড়ই অপদার্থ, অকর্মণ্য মনে হলো।

মেমসাহেবকে আমি কিছু বলতাম না। নিজের মনে মনেই অনেক কথা চিন্তা করতাম। একবার ভাবলাম চুলোয় যাক জার্নালিজম! যদি খেতে পরতে না পেলাম তবে আবার জার্নালিজম-এর শখ কেন? দুর্বল মুহূর্তে অন্য চাকরিবাকরি নেবার কথাও ভাবলাম। কিন্তু পরের মুহূর্তে নিজের মনকে শাসন করেছি। বুঝিয়েছি, না, তা হয় না। এতবড় পরাজয় আমি মেনে নিতে পারব না। যৌবনেই যদি কর্মজীবনের এত বড় পরাজয় মেনে নিই, তবে ভবিষ্যতে কি করব? কি নিয়ে লড়ব?

আবার ভেবেছি কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাই। দিল্লী, বোম্বে বা লণ্ডন চলে যাই। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া বললেই তো আর পালিয়ে যাওয়া যায় না। বিলেত যেতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আমার ছিল না। তাছাড়া বিলেত গিয়ে কি করতাম। বিলেতে গিয়ে কেরানীগিরি বা বাস কণ্ডাকটর হয়ে এ্যাংলিন সাহেব হবার শখ কোনদিনই আমার ছিল না। কয়েকটা দেশী কাগজের কাজ নিয়ে বিলেত যাবার পরিকল্পনা অনেক দিন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিল কিন্তু তার জন্যও দেশের মধ্যে অনেক ঘোরাঘুরির প্রয়োজন ছিল। আমার পক্ষে তাও সম্ভব হয়নি। রাসবিহারী এভিন্যুর পোস্টাফিসে মেমসাহেবের কিছু টাকা ছিল। আমার কল্যাণে ইতিমধ্যেই তাতে দু'একবার হাত পড়েছিল। সুতরাং ওদিকে হাত বাড়ানোর কথা আর ভাবতে পারলাম না।

দু'একবার অত্যন্ত আজেবাজে চিন্তাও মাথায় এসেছে। ভেবেছি মেমসাহেবকে কিছু না জানিয়ে অকস্মাৎ একদিন যেখানে হোক উধাও হয়ে যাই। যৌবনে প্রাণবন্ত সব ছেলেমেয়েরাই প্রেমে পড়ে। ক'জন সে প্রেম আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে?

আমিও না হয় পারলাম না। কি হয়েছে তাতে? মেমসাহেব দুচারদিন কান্নাকাটি করবে, দু'এক বেলা হয়ত উপবাস করবে। কেউ কেউ হয়ত কয়েকদিন উপহাস করবে, কেউ বা হয়ত কিছু কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করবে। কিন্তু তারপর? নিশ্চয়ই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ডেভলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আমেরিকা ফেরত ফিসারি এক্সপার্ট সুবোধবাবু নিশ্চয়ই মেমসাহেবকে অপছন্দ করবেন না। তারপর শুভদিন শুভক্ষণে বুড়ো সাজ্জাদ হোসেনের সানাই বেজে উঠলে সুবোধবাবু জামাই বেশে হাজির হবেন। কিছু পরে মেমসাহেব বধূ বেশে কলাতলার সুবোধকে মালা পরাবে, পুরোহিত মন্ত্র পড়ে সম্পত্তি ট্রান্সফার পাকাপাকি করবেন। তারপর বাসর। একটু হাসি, একটু ঠাট্টা, একটু তামাসা। লোকচক্ষুর আড়ালে হয়ত একটু স্পর্শ, একটু অনুভূতি। দেহমনে হয়ত বা একটু বিদ্যুৎ-প্রবাহ!

আমার মাথাটা একটু ঝিমঝিম করল। তবে সামলে নিলাম। পরের দিনটার জন্য খুব বেশী চিন্তা হয় না। কিন্তু তার পরের দিন। ফুলশয্যার কথা ভাবতে গিয়েই মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। রজনীগন্ধা দিয়ে সাজান ঐ ফোমড রবারের শয্যায় মেমসাহেবের একচ্ছত্র অধিপতি-রূপে সুবোধ। তিলে তিলে ধীরে ধীরে যে মুকুল চব্বিশ-পঁচিশ বসন্তে পল্লবিত হয়ে আমার মানস-প্রতিমা মেমসাহেব হয়েছে, যার মনের কথা, দেহের উত্তাপ বুকের স্পন্দন শুধু আমি জেনেছি, পেয়েছি ও অনুভব করেছি, সেই মেমসাহেবের অঙ্গে সুবোধের স্পর্শ! অসম্ভব। তাছাড়া যে মেমসাহেব তার জীবনসর্বস্ব দিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে আমাকে সুখী, সার্থক করতে চেয়েছে, তাকে এভাবে বঞ্চিত করে পালিয়ে যাব? না, না, তা হয় না।

তবে?

তবে কি করব, তা ভেবে কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। মনে মনে অবশ্য ঠিক করেছিলাম কলকাতায় আর বেশী দিন থাকব না। খবরের কাগজের রিপোর্টার হবার দৌলতে বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠাবান লব্ধপ্রতিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল।

দুর্ভাগ্য!

হ্যাঁ দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য নয়ত কি বলব বল? কলকাতার ময়দানে মনুমেন্টের নীচে লক্ষ লক্ষ মানুষ এঁদের বক্তৃতা শোনে, হাততালি দেয়, গলায় মালা পরায়। প্রথম প্রথম এঁদের কাছে এসে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। শিক্ষা-সংস্কৃতির ধ্বজা উড়িয়ে যাঁরা সিনেট হল—ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট—মহাবোধি সোসাইটি হল গরম করে তুলতেন, তাঁদের সবাইকেও ঠিক শ্রদ্ধা করে উঠতে পারলাম না। সাড়ে তিন কোটি বাঙালী নারী-পুরুষ-শিশুর দল যাদের মুখ চেয়ে বসে আছে, যাঁদের বক্তৃতা আমরা নিত্য খবরের কাগজের পাতায় ছাপছি, তাঁদের স্বরূপটা প্রকাশ হওয়ায় আমি যে কি দুঃখ, কি আঘাত পেয়েছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কি কি কারণে এঁদের আমি শ্রদ্ধা করতে পারিনি, সে-কথা লেখার অযোগ্য। বিদ্যাসাগরের বাংলাভাষা দিয়ে এঁদের কাহিনী লিখলে বিদ্যাসাগরের স্মৃতির অবমাননা করা হবে, বাংলাভাষার অপব্যবহার করা হবে। তবে যদি এইসব মহাপুরুষদের কথা লিখতে পারতাম, যদি সে-ক্ষমতা আমার থাকত, তবে বাংলাদেশের কিছু মানুষ নিশ্চয়ই বাঁচতে পারত।

তুমি ভাবছ আমি বাচালতা করছি। তাই না? সত্যি বলছি দোলাবৌদি, আমি একটুও বাচালতা করছি না। ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রাডিশন, তা তো বাঙালীর আছে। শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ও দেশপ্রেমের অভাব তো বাংলাদেশে নেই। গ্রামে গ্রামে দরিদ্র গৃহিণীরা আজও ক্ষুধার অন্ন দিয়ে অতিথির সেবা করতে কার্পণ্য করেন না। উদার বাংলা বুক পেতে সারাদেশের মানুষকে আসন বিছিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের দিগ্‌দিগন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এসেছেন বাংলাদেশে। কিন্তু কই আর কোন প্রদেশের মানুষ তো এমনি করে সারাদেশের মানুষকে নিয়ে সংসার করবার উদারতা দেখাতে পারেনি। রাজনীতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শিল্পে-সংগীতে বাঙালীর ঔদার্য অতুল-

নীয়। অতীতের ইতিহাস ওল্টাবার কোন প্রয়োজন নেই। ইদানীং কালের ইতিহাসই ধরা যাক। প্রমথেশ বড়ুয়া, কুন্দনলাল সায়গল, লীলা দেশাই বাঙালী নন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে এঁদের অকলঙ্কিত আসন চিরকালের জন্য রইবে। বড়ে গোলাম আলি খাঁ-র গান শোনার জন্য একমাত্র বাংলাদেশের অতি-সাধারণ মানুষই সারা রাত্তির রাস্তার ফুটপাতে বসে থাকে। টি আও, আপ্পা রাও, মেওয়ালাল বা লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলিকে বাঙালীর ছেলেরা যা ভালবাসা দিয়েছে, তার কি কোন তুলনা হয়? হয় না দোলাবৌদি। হবেও না।

শিক্ষা-দীক্ষা-আদর্শ ও সর্বোপরি হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও বাঙালী কেন মরতে চলেছে? বাঙালীর ঘরে ঘরে কেন হাহাকার? কান্না? সারাদেশের মানুষ যখন নতুন প্রাণস্পন্দনে মাতোয়ারা, তখন বাঙালীর এ-দুরবস্থা কেন? সাড়ে তিন কোটি বাঙালীর মুখ থেকে হাসি কেড়ে নিল কে? কেন সারা জাতটা সর্বহারা হলো?

আগে সবকিছুর জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতাম। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আশা করতাম ময়দানে মনুমেন্টের তলায় নেতাদের গলায় মালা পরালে, তাঁদের বক্তৃতা শুনলে, হাতে তালি দিলে বাঙালীর সর্বরোগের মহৌষধ পাওয়া যাবে। রিপোর্টারী করতে গিয়ে বড় আশা নিয়ে এঁদের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু হা ভগবান! মনে মনে এমন ধাক্কাই খেলাম যে তা বলবার নয়।

ব্যক্তিগত জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা নিশ্চয়ই খুব জরুরী ব্যাপার। কিন্তু সাংবাদিকতা করতে গিয়ে সমাজ-জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা অসম্ভব। তাই তো সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষয়রোগ দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। তাই তো কলকাতার জীবন আমার কাছে আরো তেতো মনে হতে লাগল।

এইসব নানা অশান্তি মনকে তোলপাড় করে তুলছিল। মুখে কিছুই প্রকাশ করছিলাম না। বন্ধুবান্ধব সহকর্মীদের কেউই কিছু জানতে পারছিল না। আমার মনের মধ্যে কত চিন্তা-ভাবনার যে কি বিচিত্র লড়াই চলছিল, সে-খবর কেউ জানতে পারল না। তবে মেমসাহেবকে ফাঁকি দিতে পারিনি।

সেদিন দুজনে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। নোটস নেওয়ার কাজ শেষ করে একটা গাছতলায় এসে বসলাম দুজনে। আমি বোধহয় দৃষ্টিটা একটু অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন দেখছিলাম। মেমসাহেব বললো, ওগো, চিনেবাদাম কিনে আনবে?

আমি গেটের বাইরে থেকে দু' আনার চিনেবাদাম আর দুটো ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম কিনে আনলাম। আইসক্রীম, চিনেবাদাম খাওয়া শেষ হয়েছে। মেমসাহেব তখনও একটু একটু ঝাল-নুন খাচ্ছে আর জিভ দিয়ে রসাস্বাদনের আওয়াজ করছে। ওর কখন ঝাল-নুন খাওয়া শেষ হয়েছে, কখন আমার কাছে রুমাল চেয়েছে, তা আমি খেয়াল করিনি।

মেমসাহেব হঠাৎ আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, ওগো, রুমালটা দাও না!

আমি রুমাল দিলাম। রুমাল দিয়ে হাতটা মুখটা মুছে আবার আমাকে ফেরত দিল, এই নাও।

রুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার রুমাল কি হলো?

'সর্বমঙ্গলার নির্মাল্য বেঁধে তোমাকে দিলাম না!'

'ও! তাইতো!'

মেমসাহেব প্রশ্ন করল, একটা কথা বলবে?

'কেন বলব না?'

'কি এত ভাবছ আজকাল?'

'কই? কিছু না তো!'

ও একটু হাসল। বললো, আমাকে ছুঁয়ে বলতে পার তুমি কিছু ভাবছ না?

কথা শেষ হতে না হতেই ও আমার হাতটা টেনে নিয়ে বুকের পর রেখে বলে, বল।

আমি হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলি, কি ছেলেমানুষী করছ!

মেমসাহেব একটু হাসে, একটু ভাবে। বোধহয় আমার কথায় একটু দুঃখ পায়। ঐ ঘন কালো গভীর দুটো চোখ যেন শ্রাবণের মেঘের মত ভারী হয়ে উঠে। আমি এক ঝলক দেখে নিয়ে দৃষ্টিটা সরিয়ে নিই।

মেমসাহেবের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। আমি দৃষ্টিটা আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। জানতে চাই, 'কি এত ভাবছ?'

'জেনে তোমার লাভ?'

আমি ভেবেছিলাম সহজ সরলভাবে মেমসাহেবকে এড়িয়ে যাব। কিছু বলব না। কিন্তু গভীর ভালবাসায় ওর দৃষ্টিটা এত স্বচ্ছ হয়েছিল যে, আমার মনের গভীর প্রদেশেরও কোন কিছু লুকান সম্ভব ছিল না। ও স্থির জেনেছিল আমার মনটা একটু বিক্ষিপ্ত আছে। কিন্তু কি কারণে মনটা বিক্ষিপ্ত তা জানতে না পারায় মেমসাহেবের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। সে-কথা উপলব্ধি করেও ওকে ঠিক সত্য কথাটা বলতে আমার বেশ কুণ্ঠা হলো।

দু'চার মিনিট দুজনেই চুপচাপ রইলাম।

তারপর মেমসাহেব ডাকে, শোন।

'বল'।

'তুমি কি আজকাল এমন কিছু ভাবছ যা আমাকে বলা যায় না।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ!'

'তবে বলছ না কেন?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বললাম, 'কি বলব মেমসাহেব! নতুন কিছুই ভাবছি না। ভাবছি নিজের কর্মজীবনের কথা। আর কতকাল এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকব তাই খালি ভাবছি।'

মেমসাহেব উড়িয়েই দিল আমার কথাটা। বললো, তা এত ভাববার কি কি আছে? কেউ একটু আগে, কেউ বা একটু পরে জীবনে দাঁড়ায়। তুমি না হয় দু' বছর পরেই জীবনে দাঁড়াবে, তাতে কি ক্ষতি হলো?

'ভাবব না? হকারের মত ফিরি করে রোজগার করতে আর ভাল লাগে না। হাজার হোক বয়স তো হচ্ছে!'

মেমসাহেব তাড়াতাড়ি আমাকে কাছে টেনে নেয়। দু' হাত দিয়ে আমার মুখটা তুলে ধরে বলে, ছি, ছি, নিজেকে এত ছোট ভাবছ কেন?

'ছোট ভাবতাম না তবুও যদি ভদ্দরলোকের মত রোজগার করতে পারতাম।'

'তোমার কি টাকার দরকার?'

'না, না, টাকা আবার কি দরকার!'

'বল না! আমি তো মরে যাইনি।'

মেমসাহেব বড়ই উতলা হলো আমার কথায়। জানতে চাইল, আর কি ভাবছ?

'বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

ভাবছি আমার এই অনিশ্চয়তার জীবনে তোমাকে কেন টেনে আনলাম। একটা আধা-বেকার জার্নালিস্টের সংসারে তোমাকে এনে কেন তোমার জীবনটা নষ্ট করব, তাই ভাবছি।'

মেমসাহেব রেগে ওঠে, চমৎকার! হাততালি দেব?

'কেন ঠাট্টা করছ?'

'তোমার কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারছি না। তোমার টাকা না থাকলে আমি তোমার কাছে ঠাঁই পাব না? তুমি আমাকে এত ছোট, এত নীচ ভাব?

পাগল কোথাকার! তোমাকে আমার সংসারে এনে যদি সুখ, শান্তি, মর্যাদা দিতে না পারি তবে......

ও আর এগুতে দিল না, 'তুমি দু'-পাঁচশ' টাকা রোজগার করলেই আমার শান্তি? টাকা হলেই বুঝি সবাই সুখী হয়?'

'না তা হবে কেন? তবুও ভদ্রভাবে বাঁচবার জন্য কিছু তো চাই।'

'আমার বা আমার সংসারের চিন্তা তোমার করতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে যাও তো।'

কথায় কথায় বেলা যায়। সূর্যটা আস্তে আস্তে নীচে নামতে থাকে, গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। বেলভিডিয়ারের সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ সূর্যরশ্মির বিদায়-বেলায় মিষ্টি আলোয় ভরে যায়।

মেমসাহেব আমার কাঁধে মাথা রাখে 'ওগো, বল তুমি এসব আজেবাজে কথা ভাববে না। আজ না হয় ভগবান নাই দিলেন কিন্তু একদিন তিনি নিশ্চয়ই ভরিয়ে দেবেন তোমাকে।'

'তুমি বুঝি সবকিছু জান?'

'একশ'বার! ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর মনুমেন্টের মিটিং কভার করেই তোমার জীবন কাটাতে হবে না।'

'তবে কি করব?'

'কি না করবে তাই বল। তুমি ক

দেশদেশান্তরে ঘুরবে, কত বড় বড় লোকের সংগে তোমার পরিচয় হবে, তুমি কত কি শিখবে......

'তারপর?'

মেমসাহেব আমার গাল টিপে বলে, তারপর আর বলব না। তোমার অহঙ্কার হবে।

আমার হাসি পায় মেমসাহেবের প্রলাপ শুনে। 'তুমি কি বোম্বে যাচ্ছ?'

ও অবাক হয়ে বলে, আমি কেন বোম্বে যাব?

'হিন্দী ফিল্মের স্টোরি লেখার জন্য।'

'অসভ্য কোথাকার।'

সেদিন আমি শুধু একটা মোটামুটি ভাল চাকরির স্বপ্ন দেখতাম। আর? আর ভাবতাম অফিস থেকে আমাকে একটা টেলিফোন দেবে। আমি অফিসের গাড়ী করে রাইটার্স বিল্ডিং, লালবাজার যাব, পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াব। চীফ মিনিস্টারের সংগে দার্জিলিং যাব। রাইটার্স বিল্ডিং-এর সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারীরা আমাকে উইস করবেন, পুলিশ কমিশনার ভীড়ের মধ্যেও আমকে চিনতে পারবেন, শ্যামপুকুর থানার ও-সি আমাকে কাটলেট খাওয়াবেন।

স্বপ্ন দেখারও একটা সীমা আছে। তাইতো আমি আর এগুতে পারতাম না। আজ সেসব দিনের কথা ভেবে হাসি পায়। কোনদিন কি ভেবেছি আমি নেহরু-শাস্ত্রী-ইন্দিরার সংগে পৃথিবীর পঞ্চ মহাদেশ ঘুরে বেড়াব? কোনদিন কি কল্পনা করতে পেরেছি বছর বছর বিলেত যাব? কোনদিন কি ভাবতে পেরেছি প্রাইম মিনিস্টারের সংগে এয়ার ফোর্সের স্পেশ্যাল প্লেনে দমদমে নামব? রাজভবনে থাকব? রাজভবনের গাড়ী চড়ে ঐ কলকাতার পরিচিত রাজপথ দিয়ে ঘুরে বেড়াব? আরো অনেক কিছু ভাবিনি। ভাবিনি ভারতবর্ষের টপ-লীডাররা আমার সংগে রাজনীতি নিয়ে গোপন আলোচনা করবেন, হুইস্কি খেতে খেতে অ্যাম্বাসেডরদের সংগে ইণ্টার-ন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স ডিসকাস্ করব।

মেমসাহেব বোধহয় এসব ভাবত। কোথা থেকে, কেমন করে এসব ভাবনার সাহস সে পেত, তা আমি জানি না। তবে আমার কর্মজীবনের কৃষ্ণপক্ষেও সে-আশা হারায়নি। তাইতো যতবার আমি নিরাশায় ভেঙে পড়েছি, যতবার আমি পরাজয় মেনে নিয়ে কর্মজীবনের পথ পাল্টাতে চেয়েছি, ও ততবার আমাকে তুলে ধরেছে। আশা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, ভালবাসা দিয়েছে। কখনও কখনও শাসনও করেছে।

'সবই বুঝি মেমসাহেব। কিন্তু এই কলকাতায় পরিচিত মানুষের দ্বারে দ্বারে আর কৃপাপ্রার্থী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছি না।'

মেমসাহেব স্পষ্ট বললো, কলকাতাতেই যে তোমায় থাকতে হবে, এমন কি কথা আছে। যেখানে গিয়ে তুমি কাজ করে শান্তি পাবে, সেইখানেই যাও।

এক মুহূর্ত চুপ করে আবার বললো, আমি তো তোমাকে আমার আঁচলের মধ্যে থাকতে বলি না।

মেমসাহেব জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করেছিল। সে-লক্ষ্য ছিল, আমার কল্যাণ, আমার প্রতিষ্ঠা। আর চেয়েছিল প্রাণভরে ভালবাসতে, ভালবাসা পেতে।

মধ্যবিত্ত সংসারের কুমারী যুবতীর পক্ষে এমন অদ্ভুত লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। মেমসাহেবের পক্ষেও সহজ হয়নি। বাধা এসেছে, বিপত্তি এসেছে, এসেছে প্রলোভন। এইত সুবোধ-বাবু আমেরিকা থেকে ফেরার পর যখন ইংগিত করলেন মেমসাহেবকে তাঁর বেশ পছন্দ, তখন বাড়ীর অনেকেই অনেক দূর এগিয়েছিলেন।

মেমসাহেব কি বলেছিল জান? বলে-ছিল, মেজদি, মা-কে একটু বুঝিয়ে বলিস রেডিমেড জামা-কাপড় দেখতে একটু চক্-চক্ করে কিন্তু বেশীদিন টেকে না। তার চাইতে ছিট কিনে মাপমত নিজের হাতে তৈরী করা জিনিস অনেক ভাল হয়, অনেক বেশী সুন্দর হয়।

মেজদি ইংগিত বুঝেছিল। তবে আমার সংগে ঘুরেফিরে বেড়ান নিয়ে মেমসাহেবের আত্মীয় মহলেও গুঞ্জন উঠেছিল। অপ্রিয় অসংযত আলোচনাও হতো মাঝে মাঝে। ও সেসব গ্রাহ্য করত না। 'দেখ খোকনদা, আমি কচি মেয়ে নই। একটু-আধটু বুদ্ধিসুদ্ধি আমার হয়েছে। কিছু কিছু ভালমন্দও বঝতে শিখেছি।'

সব মিলিয়ে কলকাতার আকাশটা বেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। মেমসাহেবও ধীরে ধীরে উপলব্ধি করল আর বেশীদিন কল-কাতায় থাকলে দুজনেরই মাথাটা খারাপ হয়ে উঠবে।

'ওগো, সত্যি তুমি এবার কোথাও যাবার ব্যবস্থা কর। আশপাশের কতকগুলো অপদার্থ মানুষের ভালবাসার ঠেলায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?'

'পারব। তবে যখন যেদিন দুজনে মিলবো, সেদিন তো আর কেউ বিরক্ত করতে পারবে না।'

আত্মীয়বন্ধুর দল কেউ জানতে পারলেন না। ধীরে ধীরে আমি দিল্লী যাবার উদ্যোগ আয়োজন শুরু করলাম। গোপনে গোপনে কিছু কিছু কাগজপত্রের অফিসে গিয়ে আলোচনা করলাম। শেষে একদিন অকস্মাৎ এক অপ্রত্যাশিত মহল থেকে এক নগণ্য সাপ্তাহিকের সম্পাদক বললেন, দিল্লীতে আমার একজন করস্-পনডেণ্টের দরকার। তবে এখন তো একশ' টাকার বেশী দিতে পারব না।

কুচপরোয়া নেই। একশ' টাকাই যথেষ্ট।

কথা দিলাম, ঠিক আছে আমি যাব।

'কবে থেকে কাজ শুরু করবেন?'

'আপনি যেদিন বলেন।'

'অ্যাজ আর্লি অ্যাজ ইউ ক্যান গো।'

মেমসাহেব পরের শনিবার ভোরবেলায় আমাকে নিয়ে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিল, প্রসাদ দিল, নির্মাল্য দিল। 'এই নির্মাল্যটা সব সময় কাছে রেখো।'

সন্ধ্যেবেলায় দুজনে মিলে ডায়মণ্ড-হারবারের দিকে গেলাম। বেশী কথা বলতে পারলাম না কেউই।

মেমসাহেব বললো, আমার মন বলছে তোমার ভাল হবেই। আমার যদি ভালবাসার জোর থাকে, তাহলে তোমার অমংগল হতে পারে না।

আমি শুধু বললাম, তোমার দেওয়া নির্মাল্য আর তোমার ভালবাসা নিয়েই তো যাচ্ছি। আমার আর কি আছে বল?

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল এবার যাই।

ও উঠল না। বসে রইল। ডাকল, শোন।

'বল।'

'কাছে এস। কানে কানে বলব।'

কানে কানে কি বললো জান? বললো, আমাকে একটু জড়িয়ে ধরে আদর করবে?

আবছা অন্ধকার আরো একটু গাঢ় হলো। আমি দু'হাত দিয়ে মেমসাহেবকে টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে অনেক আদর করলাম।

তারপর মাথার আঁচল দিয়ে ও আমাকে প্রণাম করল। 'আশীর্বাদ করো আমি যেন তোমাকে সুখী করতে পারি।'

যুধিষ্ঠির রাজত্ব ও দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাশা খেলেছিলেন। আমার রাজত্ব ছিল না। তাই নিজের জীবন আর মেম-সাহেবের ভালবাসা পণ রেখে আমি কর্ম-জীবনের পাশা খেলতে যুধিষ্ঠিরের স্মৃতি-বিজড়িত অতীতের ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্তমানের দিল্লী এলাম।

ভালবাসা নিও।

—তোমাদের বাচ্চু

উদ্ভট নাটক

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত দশম বার্ষিক বঙ্গ-নাট্যসাহিত্য সম্মেলনের ১৩ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছিল : **উদ্ভট নাটক**। উদ্ভট নাটক কথাটি যে ইংরাজী শব্দ-নিচয়ের অনুসরণে এবং অনুকরণে গঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে : থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড। ১৯৫০ দশকের কয়েকজন ইয়োরোপীয় ও মার্কিন নাট্যকার সম্পর্কেই এই কথা কয়টি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ'রা সকলে মিলে একজোটে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত না হলেও সৌরজগতে মানুষের দুর্ভাগ্যপূর্ণ অসহায় অবস্থা বিষয়ে এ'রা সকলেই কতকটা সমান ধারণা পোষণ করেন। অ্যালবার্ট কামু তাঁর 'মিথ অব সিসিফাস' গ্রন্থে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্যহীনতা এবং সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ্য জীবনসংগ্রামের ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কোনো দিনই পৌঁছুতে পারবে না, একথা জেনেও পর্বতচূড়ার দিকে সিসিফাসের একটি পাথরকে ক্রমাগত ঠেলে তোলার চেষ্টার মতোই আমরা যা কিছু করি, তাই নিরর্থক, এই জ্ঞান আমাদের অবচেতন মনে যে বিষণ্ণতার সৃষ্টি করে, তাই হচ্ছে থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড-এর লেখকদের প্রধান উপজীব্য। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে স্যামুয়েল বেকেট, ইউজীন আয়োনেস্কো, আর্থার অ্যাডমভ, জাঁ জেনেট এবং হ্যারল্ড পিন্টার সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। এ'দের লেখার বিশেষত্ব এই যে, এ'দের বিশেষ চিন্তাবৃত্তি এ'দের নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি —কনটেন্ট ও ফর্ম—উভয়কেই প্রভাবিত করেছে। নাট্যরচনা ব্যাপারে পঞ্চ সন্ধি বা অ্যারিস্টোটল প্রদত্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী নাট্যকাহিনীকে এ'রা যুক্তিপূর্ণ কার্যকারণ সম্পর্ক মেনে চিরাচরিত প্রথায় দৃশ্য এবং অঙ্কের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যান নি। যুক্তিযুক্ত নির্মাণরীতি এবং মস্তিষ্কগ্রাহ্যভাবে কল্পনাপ্রসূত ঘটনাগুলিকে পরপর সাজানোর যৌক্তিকতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এ'রা এ'দের অবচেতন মনের চিন্তাভাবনাকে—যাকে এ'রা এ'দের তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করেছেন—যথেচ্ছ এলোমেলোভাবে মঞ্চের ওপর তুলে ধরেছেন। এ'দের কল্পনাও যেমন উদ্ভট, প্রকাশভঙ্গীও তেমনই সমান উদ্ভট। এই সৌরজগতে মানুষের অস্তিত্ব নিরর্থক, সে ব্যর্থ, তার জীবন ব্যর্থ, সে তার চতুর্দিকের কোনো কিছুর সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না এবং সেই কারণেই মনের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ এবং একাকী—এই চিন্তা এ'দের মনকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই করা যেতে পারে। একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে যে, উদ্ভট দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীসম্পন্ন এই নাট্যকারদের মধ্যে অধিকাংশেরই বাসস্থান হচ্ছে ফ্রান্স এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্সের সামাজিক অবস্থাকে তাঁরা ঘনিষ্ঠ, ওতপ্রোতভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা অগণিত তরুণ-তরুণীকে এই সংসার-সমুদ্রে বাত্যাতাড়িত, দৃঢ়ভিত্তিহীন, ভাসমান দ্বীপের মতো বিচরণ করতে দেখেছেন; এদের জীবনে কোনো প্রত্যয়-বোধ নেই, এদের কাছে জীবনটা একটা দারুণ জিজ্ঞাসা, একটি নঞর্থক পরিহাসে ভরা; প্রচলিত সামাজিক মূল্যায়ন এদের কাছে অর্থশূন্য; এদের রুচি নেই, নীতি নেই; যতকিছু অশালীন, তারই প্রতি এদের আসক্তি, যৌনব্যাপারে এরা বিকারগ্রস্ত, ঐতিহ্যকে এরা স্বীকার করে না; যা-কিছুকে মানুষ এতকাল সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করেছে, তার প্রতি এদের অবজ্ঞার সীমা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগের ইয়োরোপীয় তরুণ-তরুণীরাই এই উদ্ভট নাট্যকারদের পাত্রপাত্রী। এরাই স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো'র ট্র্যাম্প চরিত্রে প্রতিফলিত, যারা ঈশ্বরকে মানে না, অথচ এক রহস্যাবৃত 'গোডো'র (তাদের কাছে গড্ গোডোয় রূপান্তরিত) আকস্মিক আবির্ভাবের জন্যে সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে যে গোডো নাকি এক মুহূর্তেই পৃথিবীর সবকিছু জঞ্জালকে সাফ করে দিয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটাবে। আয়োনেস্কোর 'রাইনোসরাস'-এর নায়ক দেখেন, পৃথিবীর সকল মানুষই মমতাহীন গণ্ডারে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে; মাত্র তিনি নিজে যখন চেষ্টা করেও তা হতে পারছেন না, তখন তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব পালনে তৎপর হলেন।

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত **তিন অধ্যায়** চিত্রের সেটে সন্ধ্যা রায় ও সুপ্রিয়া দেবী।
—ফটো : অমৃত

মার্কিনী উদ্ভট নাটকের রচয়িতাদের মধ্যে এডওয়ার্ড অ্যালবীর নাম সমধিক পরিচিত। প্রাচুর্যের মুলুক মার্কিন দেশে এই উদ্ভট নাটকের জন্ম আপাতবিস্ময়কর হলেও অসম্ভব নয় যে-কারণে, সেটাই বিবৃত করছি। ওখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে সহজতর করে তোলবার সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে করতে ওখানকার

বহু তরুণ-তরুণীর মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই জড়-জীবনের সুখ-সুবিধা লাভই কি মানুষের একমাত্র কাম্য? দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরেও কি অন্য কিছু নেই? এই চিন্তার ফলেই তাদের মধ্যে জেগেছে জীবনজিজ্ঞাসা; তাদেরও মনে প্রশ্ন উঠেছে : এই পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কি? এরই ফলে এক-দিকে তারা যেমন মহেশযোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নামকীর্তন ও যোগসাধনায় মেতে উঠেছে, অপর দিকে অনুভব করছে অসহ-নীয় নিঃসঙ্গতা ও জীবনের অর্থহীনতা। তাই দেখি, অ্যালবীর 'জু স্টোরি'র নায়ক জেরি নিজের নিঃসঙ্গতাকে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাও করতে পারে না, অপরি-চিতের হস্তধৃত ছুরিকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রার্থিত মৃত্যুকে সহজলভ্য করতে পেরে ধন্য হয়।

মানুষের অবচেতন মনের ব্যর্থতার ইঙ্গিতপূর্ণ 'থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড' বা উদ্ভট নাটক পরিশীলিত মনের কাছে সম্পূর্ণ একটি অচিন্ত্যনীয় জগৎ উদ্ভাসিত করে, যে জগৎ নিরানন্দময় ও বিষণ্ণ।

—নান্দীকর

বিদেশী ছবির খবর

পরিচালক জন হাস্টনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে শুধুমাত্র পরিচালক হিসাবেই নয়, তিনি যে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা তা অবশ্য আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 'দি বাইবেল' ছবির নোয়া চরিত্র তার জ্বল-জ্বলে উদাহরণ। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, হাস্টনের বাবা ওয়াল্টার হাস্টনও অভিনয় করতেন। এখন শোনা যাচ্ছে, হাস্টন তাঁর ষোড়শী কন্যা অ্যাঞ্জেলিকাকেও সিনেমায় নামাচ্ছেন। কন্যার প্রথম চিত্রা-বতরণ ঘটবে বাবার ছবিতেই। হান্স কনিন-বার্জারের লেখা 'এ ওয়াক উইথ লভ্ এন্ড ডেথ' উপন্যাস অবলম্বনে হাস্টনের পর-বর্তী ছবি তৈরী হচ্ছে। ফ্রান্সেই ছবির কাজ প্রথম শুরু হবে। অ্যাঞ্জেলিকা এ ছবিরই নায়িকা।

ফ্রান্সের মহিলা পরিচালক নাদিন্ ত্রিন্তিগাঁ তাঁর 'মাই লভ্ মাই লভ্' ছবি করার পর বছর দেড়েক প্রায় চুপচাপ ছিলেন। এখন আবার ফিরে এসেছেন। জনৈকের সাফল্য অসাফল্যের ওপর এর কাহিনী বিস্তার। ছবির নাম 'এ ক্লাইর অ্যা সেক্যুর এন সেক্রেত্'। প্রধান চরিত্রে থাকছেন তাঁর স্বামী জনপ্রিয় অভিনেতা জাঁ লুই ত্রিন্তিগাঁ।

ইনগ্রিড বার্গম্যান এত দিন বাদে একটা মনোমত চরিত্র পেয়েছেন। চরিত্রটা হোল জনৈকা মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকের প্রেমসংক্রান্ত সমস্যা ও তার সমাধান। তবে ব্যাপারটা হল এই যে, বার্গম্যানকে কিন্তু চিত্রনাট্যে বর্ণিত চরিত্রটির মত অত বেশী বয়সের বলে মনে হয় না। ইনগ্রিড যেন আরও একটু বেশী 'তরুণী'। তা যাই হোক, ও চরিত্র করতে তাঁর কোন অসুবিধেই হবে না। ইসবেল্ লিওনার্ড এর চিত্রনাট্যায়িত ছবিটার নাম 'দি নির্ডয়েল পোস্ট'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই ইসবেল লিওনার্ড চিত্রনাট্য রচনার জন্য ইতিপূর্বে একাধিকবার অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত।

ইতালীর গিউসিপ্পি পাএলি গ্রিফি নাট্যকার হিসাবে সর্বজনপ্রিয় বললে অত্যুক্তি হবে না। এঁর বহু নাটক শুধুমাত্র রোমেই নয়, সারা ইউরোপের বহু মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। পাএলি গ্রিফির অন্যতম বিখ্যাত নাটক 'ওয়ান ডাইজ অফ লভ্'কে চিত্রায়নের মনস্থ করেছেন এডওয়ার্ড দামিত্রিক। কোন এক ইতালীয়ান প্রযোজক সংস্থার পতাকাতলে নির্মিত এ ছবির প্রধান দুটি চরিত্রে থাকছেন জর্জ পেপার্দ ও রোসানা স্কিফিয়ানো।

কার্লো লিম্পানির নতুন ছবি 'অ্যাসা-সিনেশন্ অ্যাট সেরাজভো'র কাজ শুরু হচ্ছে শিগ্গির। ভিয়েনার ইম্পিরিয়্যাল রাজপ্রাসাদ এবং সেরাজভোতেই ছবির বেশীর ভাগ কাজ হবে। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকছেন রড স্টিগার (আর্চডিউক), গ্লেন ফোর্ড (কর্ণেল কনরাড), পিটার উস্তিনভ্ (ফ্রানজ্ যোশেফ) ও অন্যান্যরা। তবে আর্চ ডিউকের স্ত্রী-চরিত্রে অর্থাৎ ছবির নায়িকা কে হচ্ছেন তা এখনও ঠিক হয় নি।

মুষ্টিযোদ্ধা জো গঞ্জালেস-এর জীবনী অবলম্বনে ক্লদ লেলুশ তাঁর নতুন ছবির কাজ শুরু করবেন খুব শিগ্গির। ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেলুশ বলেছেন—'আমি এখনও ঠিক জানি না ছবিটা পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের হবে না স্বল্প দৈর্ঘ্যের হবে? কে জানে কি হবে? ইয়োরোপিয়ান চাম্পিয়ান-শিপের জন্য জো রোমে যখন লড়াইয়ে নামবে তখন কি রকম খেলাটা জমে তার ওপরই নির্ভর করছে। লড়াইয়ের সময় রিংয়ের পাশেই ক্যামেরা আমার রেডি থাকবে দৃশ্যগুলো তোলার জন্য...'

ব্রাণ্ডো এখন চিত্র-প্রযোজনার ক্ষেত্রে নেমেছেন। ছবির নাম 'ক্যাণ্ডি'। পরিচালক ক্রিশ্চিয়ান মার্কান্দ। এ ছবির বিভিন্ন চরিত্রে থাকছেন মার্লন ব্রাণ্ডো, রিচার্ড বার্টন, বিটল্দের রিঙ্গো স্টার, এখন আবার শোনা যাচ্ছে মার্সেলো মাস্ত্রোয়ানি ও অ্যানা ম্যাগনানির নাম।

ইন্দর সেন পরিচালিত প্রথম কদম ফুল চিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা। ফটো : অমৃত

মঞ্চাভিনয়

সাজ ও আওয়াজ

প্রতিটি মনের অনুভবে সমুদ্রের দোলা দিয়ে যে অনন্ত সম্ভাবনায় ভরিয়ে দেয় জীবন, সেই রূপকারের মৃত্যু নেই। মৃত্যুর তমিস্রা এই মহিমান্বিত শিল্পীর শরীরী অস্তিত্ব মুছে দেয় ঠিক, কিন্তু মানুষের অন্তরের মণিকোঠায় তাঁর জন্য যে আসন প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে ম্লান করে দিতে পারে না। ১৩৭৪-এর কোন এক বিষণ্ণ মুহূর্তে আকস্মিক দুর্ঘটনা যাঁদের জীবনে নিয়ে এসেছিল সকরুণ সমাপ্তি, সেই অরুণাভ মজুমদার, মলয় মুখার্জী, রতন গাঙ্গুলী সুশান্ত মুখার্জী বাংলা দেশের প্রতিটি শিল্পানুরাগীর মনে মৃত্যুহীন মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। নববর্ষের সূচনায় (গত ২রা বৈশাখ) 'সাজ ও আওয়াজ' কর্তৃক 'মহাজাতি সদনে' আয়োজিত একটি বেদনাস্নিগ্ধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই গভীরতম সত্যই রূপ লাভ করেছে। এই তরুণ চারজন শিল্পীর স্মরণে এই নিষ্ঠা-জড়িত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'সাজ ও আওয়াজে'র সদস্যবৃন্দ সবার অন্তর স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শান্তশ্রী অটুট ছিল। গীতা থেকে চারটি শ্লোক উচ্চারণের পর এই পবিত্র অনুষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। তারপর পর্দা ওঠে বহু শিল্পীর সমবেত কণ্ঠসংগীতের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের নামী ও অনামী বহু শিল্পীর দরদভরা কণ্ঠে একটি অখণ্ড ঐকতান ওঠে, যা সেদিনকার আসরে সজীব প্রাণের প্রতীক হয়েছিল। প্রায় কুড়িজন মূকাভিনেতা একসঙ্গে যে মূকাভিনয় প্রদর্শন করে তা পরিকল্পনায়, পরিবেশনে অপূর্ব হয়ে ওঠে। 'সাজ ও আওয়াজে'র শিল্পীরা 'দোসরা বৈশাখ' নামে একটি কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানটিতে স্বর্গতঃ শিল্পীদের প্রতি আন্তর ভালোবাসা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অমিতাভ মজুমদারের মূকাভিনয়ে ও পলাশ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠসংগীতে একটি অন্তরগূঢ় বেদনা গুমরে যেন কেঁদে উঠেছে। সব শেষে অগণিত শিল্পীর সমন্বয়ে যন্ত্রসংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এতে বহু প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

এই বিষণ্ণ অনুষ্ঠানটি চোখে জল এনেছে, কিন্তু মন সেই স্বর্গত শিল্পীদের উদ্দেশ্যে বলে উঠেছে—'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নেরও মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই'।

দুই পুরুষ

সম্প্রতি 'নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবে'র সদস্যবৃন্দ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন 'রঙমহলে'। রমেশ রায়চৌধুরী নির্দেশিত এ নাটকের সামগ্রিক অভিনয় সেদিন নাট্যানুরাগীদের প্রত্যাশা মিটিয়েছে। 'নুটবিহারী', 'মহাভারত' ও 'সুশোভন' চরিত্রে আন্তরিক নিষ্ঠার সংগে অভিনয় করেছেন ভবেশ চক্রবর্তী, সরোজ সেনশর্মা ও নির্দেশক রমেশ রায়চৌধুরী। রাণু রায় ও ডলি মুখোপাধ্যায়ের 'কল্যাণী' ও 'বিমলা' দুটি স্বচ্ছন্দ চরিত্রচিত্রণ। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন দ্বিজেন চক্রবর্তী, মনীষ হোম রায়, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান সুদীপ, নীহার দত্ত, কিশোরী বন্দ্যোপাধ্যায়, সরল বসু, গোপাল সরকার, ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ গোস্বামী, নরেন চৌধুরী, কবিতা গঙ্গোপাধ্যায়, অঞ্জলি সরকার, খুকু ভট্টাচার্য।

বহ্নিশিখা

সম্প্রতি মুকোনেট লিমিটেড অফিস স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ 'বহ্নিশিখা' নাটকটি পরিবেশন করেছেন নেতাজী সুভাষ মঞ্চে। শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত এ নাটকের সংঘ অভিনয় মোটামুটি সার্থক হয়ে উঠে বলা যায়। কয়েকটি চরিত্রে সুন্দর অভি করেছেন ক্ষিতীশ চক্রবর্তী, রতন রবীন চট্টোপাধ্যায়, অশোক মল্লিক, প্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৃ সেনগুপ্ত, গীতা নাগ, অজন্তা কর, অ গঙ্গোপাধ্যায়।

আবাদ

'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে'র শিল্পীসদস্যবৃন্দ রঙ্গমঞ্চে পরিবেশন করেছেন মনো বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটক। কৃষিজীবী ও আবাদী জমি সমস্যার পটভূমিকায় এ নাটকটির নির্দেশনার দায়িত্ব বহন ইন্দ্রজিৎ সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ করেন—লক্ষ্মীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, স মুখোপাধ্যায়, নীতীশ ঘোষ, তরুণ বসু, নরেন দত্ত, ননীগোপাল প্রামা ভূপাল বসু, সুকর্ণ বসু, সুধেন্দু মুরারি চক্রবর্তী, তরুণ সেনগুপ্ত, বসু, সূর্য সান্যাল, সচ্চিদানন্দ ম পাধ্যায়, রবীন মান্না, চণ্ডীচরণ চট্টোপা অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমর বন্দ্যোপ ইন্দ্রজিৎ সেন, রাণু রায়, সুজাতা গ পাধ্যায়, জয়শ্রী কর।

ও স্বর্গে যাবে না

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শাখা অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে তাদের বাৎ উৎসব উপলক্ষ্যে 'ও স্বর্গে যাবে না' না পরিবেশন করেছেন। প্রদ্যোৎ বন্দ্যো ও কল্যাণ সেনগুপ্ত নির্দেশিত এ না কয়েকটি ভূমিকায় রূপ দেন—কৃষ্ণচন্দ্র

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধীর মিত্র, দেবনারায়ণ দত্ত, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, লীলা দত্ত, মিতা ঘোষ, লতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সেনগুপ্ত।

ফেরারী ফৌজ

উত্তরপাড়ার 'ভারতী নাট্যপরিষদে'র শিল্পীবৃন্দ সম্প্রতি পরিষদের অষ্টাবিংশ বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে উৎপল দত্তের 'ফেরারী ফৌজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্য-নির্দেশনায় দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নত শিল্পপ্রতিভার ছাপ রেখেছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন —দীনেন মুখোপাধ্যায়, রাজেন মুখোপাধ্যায়, অমর গোস্বামী।

মেঘনাদ বধ

ভবতোষ সরকার প্রযোজিত লোকনাথ চিত্রমের প্রথম বাংলা পৌরাণিক ছবি 'মেঘনাদ বধ'-এর কাজ সমাপ্তপ্রায়। শ্রীশান্তি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির সংলাপ রচনা করেছেন শ্রীমন্মথ রায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কয়েকখানি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন শ্যামল মিত্র, আরতি মুখার্জী, গীতা মুখার্জী ও শিপ্রানী মুখার্জী। সুরারোপ করেছেন রমেশ নাইডু। একমাত্র পরিবেশক : লোকনাথ চিত্রম্।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে

বহুরংগ সাংস্কৃতিক সংস্থা সম্প্রতি প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে শ্রীসুধীর সরকার রচিত 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' একটি পরিচ্ছন্ন হাসির নাটক। এই নাটকটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন বহুরংগ সম্প্রদায়। নাটক নির্বাচনে, দলগত অভিনয়ে এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু নাট্য ও সংগীত পরিচালনায় বহুরংগের এই নবতম নাট্য-প্রয়াস সর্বাংগীন সফলতা অর্জন করেছিল।

সুন্দর 'টীমওয়ার্ক'। বিশেষ করে হরিপ্রসাদ দাস, কল্যাণ বাগচী, দিলীপ সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ ঘোষের অভিনয় অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। আর স্ত্রী চরিত্রে সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুতপা ভট্টাচার্যের অভিনয় সার্থক ও সুন্দর।

এই নাটকের অন্যতম আকর্ষণ সংগীত। সুন্দর সংগীত পরিকল্পনা। সংগীত পরিচালনায় ও নাট্য নির্দেশনায় সুবীরকুমার সরকার অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নটীর পূজা

সম্প্রতি ডুয়ারসের ধূপগুড়ি শহরের বৈরাতিগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম জন্ম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালন করা হল। এই উপলক্ষে গত ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় ছাত্রীরা নিবেদন করলেন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা'। অভিনয়াংশে প্রথমেই সাধুবাদ পেয়েছেন শ্রীমতীর ভূমিকায় মানসী ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর মনোরম নৃত্যছন্দিমা ও সাবলীল অভিনয়ে নাটকের মুখ্য চরিত্রটি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেন প্রতিভা ভৌমিক, কণা সরকার, রেণু বসু, সবিতা দাস, নন্দিতা সাহা, স্বাগতা বশিষ্ঠ ইত্যাদি। সংগীতপরিচালনার দায়িত্ব শ্রীমতী চায়না রায়ের।

দীপক গুপ্ত পরিচালিত 'মহাবিপ্লবী অরবিন্দ' চিত্রে দিলীপ রায় ও শ্রীমতী ভিগনাম্। ফটো : অমৃত।

বিবিধ সংবাদ

চেকোশ্লোভাকিয়ার আধুনিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী :

ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগে কয়েকটি আধুনিক চেকোশ্লোভাকিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ভারতের বিভিন্ন শহরে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় ১০ই এপ্রিল নয়াদিল্লীস্থ বিজ্ঞানভবনে। দিল্লীর পরে হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরেও ছবিগুলির প্রদর্শনী পূর্বে নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ইংরাজী ছবির জন্যে নির্দিষ্ট ছটি প্রেক্ষাগৃহ ছাড়া কলকাতার অপর চিত্রগৃহগুলি বন্ধ থাকায় এই শহরে এই বিশেষ প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই অবস্থায় সিনেক্লাব অব ক্যালকাটা চেক কনসালের সহযোগিতায় তাঁদের সভ্যদের জন্যে এই

ছবিগুলির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন বলে ধন্যবাদার্হ। ১লা থেকে ৭ই মে পর্যন্ত সাত দিন ধরে তাঁরা সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে যে পাঁচখানি ছবি দেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। সেগুলি হল : (১) ক্লোজলি গার্ডেড ট্রেন, (২) দি এঞ্জেল অব দি ক্রিশ-কুল ডেথ, (৩) দি হোমকামিং অব প্রডিগ্যাল সন, (৪) সেভেন ডেজ এ উইক এবং (৫) রোমান্স ফর এ বিউগল্। এদের সঙ্গে দেখানো হবে কতকগুলি স্বল্প দৈর্ঘের ছবি।

পশ্চিমবঙ্গে আরও বেশী সিনেমা হাউস নেই কেন?

প্রতি পঁচিশ হাজার লোকের জন্যে একটি করে সিনেমা হাউস নির্মিত হতে পারে—এই হিসেবে নাকি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১,৪০৪টি চিত্রগৃহ থাকতে কোনো আইনগত বাধা নেই। অথচ তার পরিবর্তে আছে মাত্র ৩২০টি শোহাউস। কলকাতাতেও ১১৮টির জায়গায় আছে মাত্র ৭৫টি। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, কলকাতা, দুর্গাপুর প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে সিনেমাগৃহ তৈরী করবার উপযোগী জায়গা মেলা দুষ্কর। আর পল্লীঅঞ্চলে চিত্রগৃহ নির্মাণ করবার জন্যে অর্থব্যয় করতে কেউই রাজী নন। প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন : সরকার আরও বেশী চিত্রগৃহ প্রতিষ্ঠিত দেখবার জন্য উৎসুক; কারণ এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্রশিল্প ও জনসাধারণের সঙ্গে সরকারও লাভবান হবেন।

সাদা-কালোর ঝগড়া নিবারণে মার্কিন চিত্র :

সাদা-কালোর বৈষম্য দূরীকরণের সিভিল রাইট্‌স প্রতিষ্ঠার জন্যে ঋষিতুল্য মানুষ মার্টিন লুথার কিংকে এই সেদিন আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমী অব মোশান পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের সভাপতিরূপে গেল ১১ই এপ্রিল সান্টা মোনিকার অস্কার পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত অভিনেতা গ্রেগরী পেক সমবেত সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, মার্কিন সমাজের ওপর সদ্য পরলোকগত মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার)-এর প্রভাব কত বেশী, শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে গণ্য হবার জন্যে পাঁচখানি সুপারিশপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে দু'খানিই নিগ্রো ও শ্বেতকায়ের মধ্যে সমঝোতার কাহিনী অবলম্বনে গঠিত হয়েছে, এই তথ্যটুকু জানার মাধ্যমে তা বোঝা যায়। শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে পুরস্কৃত 'ইন দি হিট অব দি নাইট' ছবিটি শ্বেতকায়দের মন থেকে কৃষ্ণবর্ণের প্রতি বিদ্বেষ কেমনভাবে অন্তর্হিত হচ্ছে, তার একটি উজ্জ্বল দলিল। এতে শ্বেতকায় পুলিশ-চীফরূপে অভিনয় করে রড স্টাইগার শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন ক্যাথারিন হেপবার্ণ যে-ছবিতে অভিনয় করার জন্যে, সেই 'গেস্ হু ইজ কামিং টু ডিনার'ও শ্বেতকায়ের সঙ্গে নিগ্রোর বিবাহ-কাহিনী নিয়ে রচিত। মিস হেপবার্ন যে শ্বেতকায় মায়ের ভূমিকায় দরদী অভিনয় করে সম্মানিত হয়েছেন তারই মেয়ে একটি নিগ্রোকে বিবাহ করতে উন্মুখ। এতেই স্পেন্সার ট্রাসী তাঁর জীবনের শেষ অভিনয় করে গেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, 'ইন দি হিট অব দি নাইট' এবং 'গেস্ হু ইজ কামিং টু ডিনার'—এই দু'খানি ছবিরই অন্যতম অভিনেতা হচ্ছেন সিডনী পয়টার।

সিনে ফোরাম

গত রবিবার ২১ এপ্রিল প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীঋত্বিককুমার ঘটকের তত্ত্বাবধানে অ্যাকাদামি অফ ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে 'সিনে ফোরাম' নামে একটি চলচ্চিত্র সংস্থার শুভ উদ্বোধন হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিনহা মানুষ এবং দেশের প্রয়োজনে সিনেমার উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনার কথা বলেন। প্রধান অতিথি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সভ্যদের সত্যিকারের ভাল ছবি বেছে নিতে বলেন। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বসু সভাপতির ভাষণে চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্য দর্শক সমাজ এবং চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একযোগে এগিয়ে আসতে বলেন।

এই অনুষ্ঠানে একটি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আলোচনায় যোগদান করেন প্রখ্যাত পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য, সমালোচক-অধ্যাপক ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য এবং পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী।

আলোচনার প্রথম বক্তারূপে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেন ছবিটির অসাফল্যের জন্য হয় চলচ্চিত্র মাধ্যমের ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব অযোগ্যতা অথবা আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-বোধের অনুধ্যানের মধ্যকার কোন তারতম্যই দায়ী। এরপর বাসু ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত সুন্দর বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেন যে কতিপয় নির্বাচিত মানুষকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সর্বপ্রকার ছবি দেখে সাধারণ দর্শকগণকে তার মধ্যে কেবল উন্নত মানের ছবি দেখায় আগ্রহী করা। সর্বশেষ বক্তা হিসেবে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য কবিতা নাটক এবং সিনেমার মধ্যে শিল্পসত্তার খোঁজে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তার সত্যিকার মূল্যায়ন করতে বাংলা দেশের সমস্ত দর্শকদের অনুরোধ করেন।

ফোরামের সভাপতি শ্রীঘটক তীব্রভাষায় বর্তমান চলচ্চিত্র-শিল্পে যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তার সমাধানে এগিয়ে আসতে বলেন।

বক্তৃতাশেষে সভ্যদের পূর্ণেন্দু পত্রী 'স্বপ্ন নিয়ে' ছবিটি দেখান হয়।

আনন্দানুষ্ঠান

কালীঘাট মিলনচক্রের উদ্যোগে অ... ব্যানার্জি ও পূর্ণ পালের পরিচালনায় গ... ২০ এপ্রিল সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ সংগীতা... নুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চিত্রনাট্যকার শ্রীমণি বর্মা। কণ্ঠসঙ্গীত ও হাস্যকৌতুকে বাংলার প্রখ্যাত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শমি... বিশ্বাস ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের গুণীজন সম্বর্ধনা ও বর্ষবরণ উৎসব

গত ৭ বৈশাখ পাথুরিয়াঘাটাস্থ মন্মথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে বর্ষবরণ উৎসব ও গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু ও অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন র... শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন। অনুষ্ঠানে বর্তমান বৎসরে আনন্দ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত বিজ্ঞান-লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পরিষদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বর্ষবরণ উৎসবে পরিষদের ছেলেমেয়েরা নৃত্য, গীত ও রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটিকা পরিবেশন করে। সংগীতে অংশ গ্রহণ করে শান্তা দত্ত, পলি ভট্টাচার্য, কবি... পাল, দেবযানী সরকার, পূরবী ও ম... সাহা; আবৃত্তিতে সজল ভট্টাচার্য, দেবযা... দাস, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য ও ইলা দাস; নৃ... শিপ্রা দাস, প্রতিমা ব্যানার্জি ও দেবযান...

বর্তমান সংখ্যার ১০৭৭ পৃষ্ঠায় মু... ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর বি... আলোকচিত্রটি শ্রীসুকুমার রায় ক... গৃহীত।
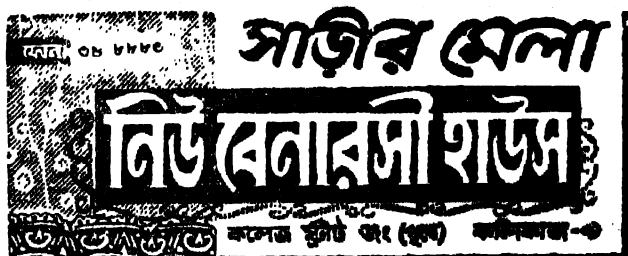
ব্যাডমিণ্টন সংগঠনে বাংলার দান

শঙ্করবিজয় মিত্র

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশানের পরিচালনায় পূর্ব ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অবশ্য আন্তর্জাতিক নামটা এবার অন্তরালেই রয়ে গেল, কারণ ভারতের বাইরে কোন খেলোয়াড় এবারকার প্রতিযোগিতায় যোগ দেননি। বাইরের খেলোয়াড়েরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, প্রত্যাশাও ছিল, শেষ পর্যন্ত তাঁরা উদ্যোক্তাদের নিরাশ করেছেন। তবে খেলার মান বেশ উন্নতই ছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাও জোর হয়েছিল। পুরুষদের সিঙ্গলসে এবার রেলের দীপু ঘোষ ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করে ১৯৬৬ সালের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন। দীপু ঘোষকে এবার ভাগ্যবান বলতে হবে, কারণ একটানা চারবার ফাইন্যালে উঠলেও এইবারেই তিনি প্রথম বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পেয়েছেন। আর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্নাকে পরাজিত করার কৃতিত্বও তাঁর কম নয়। ডাবলসের খেলাতেও দীপু ঘোষ ও রমেন ঘোষ (দুই ভাই) জুটি সুরেশ গোয়েল ও সি বি দেওয়াস জুটিকে ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে পরাজিত করেছে। মিশ্র ডাবলসে এবার দীপা চ্যাটার্জি ও সতীশ ভাটিয়া জুটি ১৫—১২ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে কুমারী তুলসী ব্যানার্জি ও অনিল সৌধিকে পরাজিত করেছেন।

এবারকার প্রতিযোগিতা থেকে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টের আভিজাত্য ও ঐতিহ্যকে ঠিক চেনা যাবে না। এই টুর্নামেণ্টের নিজস্ব গুরুত্ব ও গৌরব আছে। এই টুর্নামেণ্ট কেবল ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রধানী টুর্নামেণ্টই নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীনতম প্রতিযোগিতা। এর আদি নাম শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশান এবং প্রতিযোগিতার স্থান ছিল শোভাবাজারের ঐতিহ্যময় রাজবাড়ী। এই এসোসিয়েশনেরই আমন্ত্রণে ১৯৪০-৪১ সালে মালয়েশিয়ার তৎকালীন বিশিষ্ট খেলোয়াড় মিঃ চী চুন কে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন। তারপর থেকে ভারতের ও বিদেশের খ্যাতনামা বহু খেলোয়াড় এই টুর্নামেণ্টে যোগদান করে এর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। তখন এই টুর্নামেণ্টের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব ভারত টুর্নামেণ্ট নাম দেওয়া হয়। সেই থেকে এই টুর্নামেণ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং ভারতের এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নামকরা বহু খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে আসছেন।

ভারতে ব্যাডমিণ্টন খেলার প্রবর্তন, প্রচার ও প্রসারে কলকাতার দানই সর্বাধিক। কলকাতাতেই একদিকে নিখিল বঙ্গ সংস্থা ও অপরদিকে সর্বভারতীয় সংস্থা গঠিত হয়ে ব্যাডমিণ্টনের জনপ্রিয়তা ভারতের দিকে দিকে প্রসারিত করে। ১৯৩৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। ব্যাডমিণ্টন তখনও বিশেষ প্রসারলাভ করেনি, ক্লাবের সংখ্যাও কম ছিল। তবু সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করে সেদিনের কর্মকর্তারা যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তারই ফলে ব্যাডমিণ্টন ভারতের সর্বত্র দ্রুত প্রসারলাভে সমর্থ হয়েছিল। শ্রীশরৎকুমার মিত্র এই সংস্থায় প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালেই নিখিল ভারত চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা খোলা কোর্ট ও পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বছর থেকে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়। উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাব থেকে প্রতিযোগীরা যোগ দিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে মহিলা এবং মিশ্র অনুষ্ঠান প্রতিযোগিতায় স্থান পায়। এই জাতীয় প্রতিযোগিতাগুলি প্রথম পাঁচ বছর কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতার সময় পাঞ্জাব টুর্নামেণ্ট পরিচালনার জন্য অগ্রণী হয় এবং লাহোরের ইনডোর কোর্টে ষষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিষ্পন্ন হয়। বাংলার খেলোয়াড়েরা লাহোরের ইনডোর কোর্টে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তখন জর্জ লুই-এর সমকক্ষ কোন খেলোয়াড় দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি একনাগাড়ে চারবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ জয়ী হন। অনেকের মতে লুই সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়।

সপ্তম জাতীয় ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং বিদেশী খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিযোগিতা পরিচালনায় নানা অসুবিধার উদ্ভব হয়। তখন বোম্বাইতে জাতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং এইভাবে পশ্চিম ভারতে ব্যাডমিণ্টন প্রসারলাভ করে।

ভারতের ব্যাডমিণ্টন জনপ্রিয়তার পথে অগ্রসর হতে থাকে। ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশান অব ইণ্ডিয়ারও শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। আজ ১৭টি সংস্থা এই এসোসিয়েশানের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৪৪ সালে মাত্র রহিমতুল্লা ট্রফি নিয়ে আন্তঃ রাজ্য টুর্নামেণ্ট প্রবর্তন করা হয়। পরে আরও দুটি ট্রফি আসে এবং এই টুর্নামেণ্ট তিন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—পুরুষদের জন্য রহিমতুল্লা কাপ, মহিলাদের জন্য চাধা কাপ এবং জুনিয়রদের জন্য নারাং কাপ ঘিরে টুর্নামেণ্ট।

ব্যাডমিণ্টন খেলার একটা মস্তবড় সুবিধা যে ইনডোর, আউটডোর দুরকম ভাবেই খেলা যায়, শীত, গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই খেলা চলে। সাধারণের পক্ষে দেহ-চালনা, ব্যায়াম ও অবসরবিনোদনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবেও এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। আর কৃতী খেলোয়াড়দের শারীরিক পটুতা, ক্ষিপ্র গতিবেগ, ও নৈপুণ্য বৃদ্ধির পরম সহায়ক এই ব্যাডমিণ্টন। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য এবং দক্ষতা প্রদর্শনের খেলা হিসেবেও এই খেলার একটা বড় আকর্ষণ রয়েছে। দলগত সংহতির প্রশ্নটা এখানে একেবারেই গৌণ। যে খেলোয়াড় যতখানি ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হবেন তিনি ততখানি সাফল্যের অধিকারী হতে পারবেন। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যাডমিণ্টন বহু খেলোয়াড়কে আকৃষ্ট করে।

ব্যাডমিণ্টনে ভারত প্রথম থেকেই বিশ্ব প্রতিযোগিতায় সম্মানজনক স্থান গ্রহণ করেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে পুরুষদের জন্য টমাস কাপের খেলায় এবং মহিলাদের জন্য উবের কাপের খেলায় ভারতের খেলোয়াড়েরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। জর্জ লুই, দবিন্দরমোহন, টি এন শেঠ, অমৃতলাল দেওয়ান, নান্দু নাটেকার প্রভৃতি এবং মহিলাদের মধ্যে দেওধর ভগিনীদ্বয়, মিসেস মমতাজ লোটওয়ালে, সুশীলা কাপাদিয়া, প্রেম পরাশর, মিস মীনা সিং প্রভৃতি বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সারিতে স্থান পেয়েছে। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ব্যাডমিণ্টনে ভারত প্রথম তিন দেশের মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং উবের কাপে তার প্রবর্তনের সময় থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মহিলারাই এশীয় অঞ্চলের খেলায় চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়ে এসেছে।

বর্তমানে যে সকল তরুণ খেলোয়াড় ভারতের সুনাম রক্ষায় এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে দীনেশ খান্না, সুরেশ গোয়েল, দীপু ঘোষ, রমেন ঘোষ, সতীশ ভাটিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীনেশ খান্না এশিয়ান ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রথম সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান। একথা বলতেই হবে, ভারত তার পূর্ব সুনাম বজায় রাখতে আজ পারছে না। ব্যাডমিণ্টন এবং আরও কয়েকটি খেলায় প্রাচ্য দেশগুলির প্রাধান্য আজও বজায় রয়েছে। অন্যান্য খেলাধুলার ক্ষেত্রে পশ্চিমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। ব্যাডমিণ্টনে প্রাচ্য দেশগুলির মধ্যে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত,

থাইল্যান্ড এবং সম্প্রতি জাপান তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। জাপান এতদিন ব্যাডমিন্টনে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। ক্রমে ক্রমে তারাও এগিয়ে এসেছে এবং ব্যাডমিন্টনকে জাতীয় ক্রীড়া হিসেবে গ্রহণ করে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির পাশে স্থান করে নিয়েছে।

তবে প্রাচ্যের এই প্রতিপত্তি আর কতকাল বজায় থাকবে বলা শক্ত। পশ্চিমের দেশগুলিকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। ডেনমার্ক বেশ কিছুকাল ধরে ব্যাডমিন্টনে বিশেষ স্থান করে নিতে সচেষ্ট হয়েছে। ডেনমার্কের আর্ল্যান্ড কপস, ফিন কোবেরো, হামারগার্ড হ্যানসেন, এন্ডার্সন প্রভৃতি খেলোয়াড়েরা এবং মহিলাদের মধ্যে মিসেস উলা স্ট্র্যান্ড, মিসেস জোর্গেনসেন প্রভৃতি বিশ্বের ব্যাডমিন্টন অনুরাগীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ব্যাডমিন্টনে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতাকে বেসরকারীভাবে (ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ক্ষেত্রে) বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ পর্যায়ে গণ্য করা হয়ে থাকে। কপ্‌স্ এই প্রতিযোগিতায় সাতবার বিজয়ী হন। ডাবলসে ফিন কোবেরো অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃত, তার মত স্টাইলিস খেলোয়াড় আজও জন্মায়নি। অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে তিনি মোট ১৩ বার বিজয়ী হয়েছেন। ডেনমার্কের এই কৃতিত্ব কার না চোখে পড়বে! এ ছাড়া জার্মানী, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রয়েছে। শেষোক্ত দেশের মিসেস জুডি হ্যাসম্যানের নাম আজ সারা বিশ্বে সুবিদিত। এই মহিলা অল ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসে ৯ বার বিজয়ী হয়েছেন। তাঁর এ রেকর্ড আর কেউ স্পর্শ করতে পারবে বলে মনে হয় না। উবের কাপের সূচনা থেকে গত বছরের আগে পর্যন্ত প্রতিটি প্রতিযোগিতায় এই মহিলাই বিজয়ী হতেন। কেবলমাত্র গত বছর তিনি পরাজিত হয়েছেন এক জাপানী মহিলার হাতে এবং জাপান গত বছরই এ প্রতিযোগিতায় প্রথম অবতীর্ণ হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপানের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে অক্লান্ত সাধনা, দেশের সুনাম স্থাপনে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগ। দক্ষ কোচের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খেলোয়াড়দের রীতিমত তৈরী করে তুলতে না পারলে আধুনিক বিশ্বে কোন ক্ষেত্রেই আর প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভবপর হবে না। ভারতের খেলোয়াড়েরা চাতুর্যে বা দক্ষতায় আজও কোন দেশের খেলোয়াড়দের তুলনায় হীন নয়। তবে তাঁদের শারীরিক সামর্থ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রীতি ও ঐকান্তিকতার অভাব খুবই। খেলোয়াড়দের এসব গুণ না থাকলে বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। ভারতের ক্রীড়াবিদদের এই কথাগুলি সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

ব্যাডমিন্টনের গোড়ার ইতিহাস বড় মজার এবং সবচেয়ে আনন্দের কথা, এই খেলার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষই। কয়েক শতাব্দী আগেও এই খেলা ভারতে পুণা খেলা নামে পরিচিত ছিল। বৃটিশ সেনাবিভাগের কয়েকজন অফিসার এই খেলা দেখে মুগ্ধ হন এবং ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে এই খেলা তাঁরা গ্রহণ করেন। ১৮৭১-৭২ সালে ইংলণ্ডে এই খেলার মহড়া শুরু হয়। আর্মি অফিসারদের বন্ধুবান্ধব মহলে খেলা চলতে থাকে বেশ উৎসাহ সহকারেই। ১৮৭৩ সালে ডিউক অব বোফোর্ট তাঁর ব্যাডমিন্টন পল্লীপ্রাসাদে (গ্লুস্টারশায়ার) এক পার্টি দেন এবং এই পার্টিতে খেলাটি বিশিষ্ট দর্শকদের সমক্ষে মহাউদ্দীপনায় অনুষ্ঠিত হয়। তখন খেলাটির কোন নাম ছিল না। ব্যাডমিন্টন প্রাসাদে অনুষ্ঠিত হয় বলে খেলাটির নাম দেওয়া হয় ব্যাডমিন্টন। সেই থেকে ব্যাডমিন্টন নামেই খেলাটি পরিচিতি লাভ করে। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় খেলার বিধিনিয়ম অনুযায়ী খেলাটি পরিচালিত হত। এরই মধ্যে খেলাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং বাথ ব্যাডমিন্টন ক্লাব নামে একটি সংস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের মন ও রুচি অনুযায়ী পুরাতন বিধিগুলিকে নতুন ছকে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। মূল নিয়ম অনুযায়ী এখনও ব্যাডমিন্টন পরিচালিত হলেও ১৮৯৫ সালে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশান অব ইংলণ্ড ব্যাডমিন্টন খেলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করে এবং এসোসিয়েশান প্রবর্তিত নিয়মানুসারেই আজও সমগ্র বিশ্বে ব্যাডমিন্টন পরিচালিত হয়ে থাকে।

দেখতে দেখতে নতুন খেলার জনপ্রিয়তা হু হু করে বেড়ে চলে। ১৮৯৯ সালে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রবর্তিত হয় শুধু পুরুষদের জন্য। পরের বছর (১৯০০ সাল) মহিলা বিভাগ যুক্ত হয়। ১৯১০ সালে ইংলণ্ডে প্রায় তিনশো ব্যাডমিন্টন ক্লাব স্থাপিত হয় এবং ১৯৩০ সালে এই ক্লাবের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচশোর মত।

ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তা ইংলণ্ডের সীমানার বাইরে দ্রুত প্রসারিত হয়—আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংরাজিভাষী দেশগুলিতে। ব্যাডমিন্টনের জয়যাত্রা শুরু হয়ে যায়।

ভারতেও নবকলেবরে ব্যাডমিন্টন ফিরে আসে, তার পুণা নামের পুণ্যময় স্মৃতিটুকুও মুছে যায়। এবারে এর আগমন নতুন পথে। সম্ভবতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণনগর ও ব্যাণ্ডেলের খৃস্টান ধর্মযাজকরা বিকেলের দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই খেলার প্রবর্তন করেন। হাওড়া ও কলকাতায় খেলাটি আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালে এণ্টালির গির্জায় উন্মুক্ত প্রান্তরে ইংরেজদের খেলা দেখতে লোকে বেশ ভিড় করতেও থাকে। তখনকার দিনের রেওয়াজ ছিল ইংরেজরা কিছু করলে বড় (ধনী) লোকেদেরও তা করতে হবে। তাই বাংলায় ধনী পরিবারগুলির মধ্যে ব্যাডমিন্টন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হাওড়ার কলভিন কোর্টে ১৯১৭ সালে প্রথম ব্যাডমিন্টন টুর্নামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে ব্যাডমিন্টন বাংলার বড় বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার দেখাদেখি ঢাকা শহরেও টুর্নামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে বাংলাদেশে সবশুদ্ধ ছ'টি টুর্নামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়—তিনটে কলকাতায়, একটা হাওড়ায়, একটা চুঁচুড়ায় এবং একটা ঢাকায়। কলকাতার গ্রে স্ট্রীটে, শোভাবাজার, ঠনঠনে, বহুবাজারের ক্লাব গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালের মধ্যে ব্যাডমিন্টনের জনপ্রিয়তা এতটা প্রসারলাভ করে যে, কলকাতায় ও হাওড়ার কয়েকটি স্কুলেও এই খেলা প্রচলিত হয়। ঠনঠনে ক্লাব ১৯২৫ সালে বেশ বড়রকমের এক টুর্নামেণ্টের আয়োজন করে। ১৯২৭ সালে অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য ভারত থেকে যে দু'জন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডে যায় সে দু'জনই ছিলেন বাঙালী।

কলকাতার কলেজগুলিতে ব্যাডমিন্টন খেলাকে ফুটবল হকির পাশেই স্থান দেওয়া হয়। বহু তরুণ এই খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে থাকে এবং ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আন্তঃ কলেজ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেণ্ট অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলার ক্রীড়াবিদগণ ব্যাডমিন্টনকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন এবং তারই ফলে ১৯৩৪ সালে ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশান অব ইণ্ডিয়া ও পাশাপাশি ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশান অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে ভারত একটা বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিতে সমর্থন হয়।
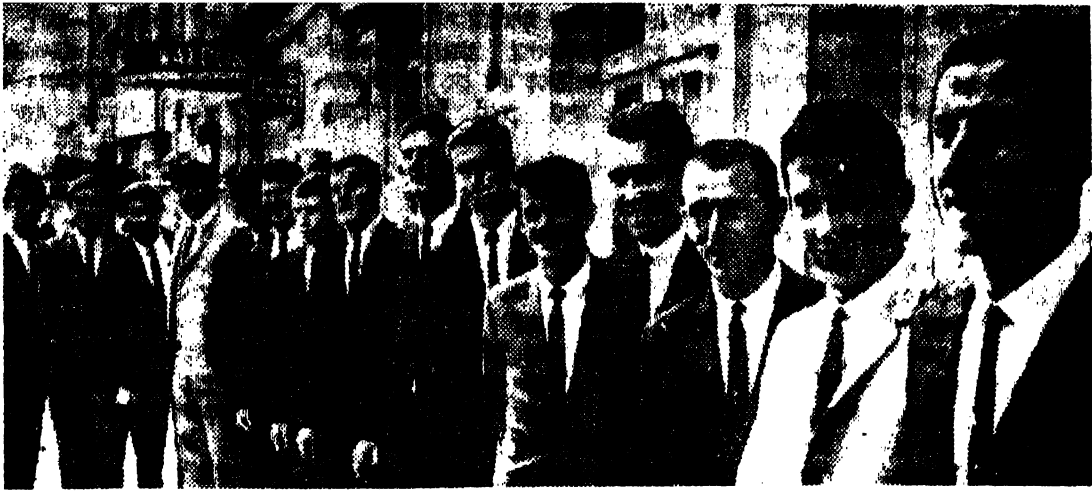
১৯৬৮ সালের ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

খেলাধুলা

দর্শক

প্রথম বিভাগের হকি লীগ

১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল দল অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সূত্রে মোট ৫ বার খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে তারা যে চারবার (১৯৬০-৬১, ১৯৬৩ ও ১৯৬৪ সালে) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে তার মধ্যে দু'বার (১৯৬১ ও ১৯৬৩) যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছিল (কাস্টমসের সঙ্গে)। ১৯৬৮ সালের প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল দলের ১৯টা খেলায় ৩৭ পয়েন্ট উঠেছিল। মোহন-বাগানের সঙ্গে খেলা ড্র করে তারা একটা পয়েন্ট হাত-ছাড়া করে। আঠারটি দলকে তারা ৪২টি গোল দিয়ে ২টো গোল খেয়েছে। অপরদিকে মোহনবাগান ১৯টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে উপর্যুপরি ৬ বার রানার্স-আপ হয়েছে। এই ৬ বারের মধ্যে তারা উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৬৬-৬৮) খেলায় অপরাজিত থেকে যায়। মোহনবাগান প্রথম বিভাগের হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মোট ৮ বার (১৯৩৫, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৫-৫৮ ও ১৯৬২)। গত তিন বছরের অপরাজিত হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান বি এন আর দল তালিকায় ৩য় স্থান পাওয়াতে (১৯টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট) রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭), কাস্টমস (১৯৩৬-৩৯) এবং মোহনবাগানের (১৯৫৫-৫৮) সমান উপর্যুপরি ৪ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান-শীপের দুর্লভ সম্মান থেকে বঞ্চিত হল।

ইস্টবেঙ্গল তাদের লীগের শেষ দ্বন্দ্বপূর্ণ খেলায় যখনই ২—১ গোলে বি এন আর দলকে পরাজিত করে তখনই লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায়। এই খেলার ১১ মিনিটে ইস্ট-বেঙ্গল দলের পক্ষে প্রথম গোল দেন নাগরাজ। এর ১১ মিনিট পর বি এন আর দলের কুশলকুমার গোল শোধ দিয়ে খেলার ফলাফল সমান করেন। দ্বিতীয়ার্ধের খেলার [illegible] মিনিটের মাথায় ইস্টবেঙ্গল দলের কামার [illegible] পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে দলের জয়-সূচক গোল করেন। রেফারীর এই পেনাল্টি স্ট্রোক দেওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে বি এন আর দল প্রতিবাদ জানায় এবং কোন সুফল না-পেয়ে খেলার মাঠ ত্যাগ করে চলে যায়। পরে খেলায় অংশগ্রহণ করলেও দলের মনোবল বলে কিছু ছিল না। গোল পরি-শোধের যথেষ্ট সময় হাতে পেয়েও তার বিশেষ চেষ্টা তারা করেনি। খেলার পর রেফারীর খেলা পরিচালনার দোষত্রুটির উল্লেখ করে বি এন আর দল বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং পুনরায় খেলার দাবি করেছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যোগ্য দল হিসাবেই যে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের এই লীগ জয়ের মূলধন ছিল—খেলোয়াড়দের অটুট মনোবল, সংহতি এবং জয়লাভের অদম্য জিদ।

১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় শেষ দুটি স্থান পেয়েছে পাঞ্জাব স্পোর্টস (৭ পয়েন্ট) এবং মেসারার্স (৬ পয়েন্ট)। আগামী বছর এই দুটি দল দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে এবং তাদের শূন্যস্থানে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান আলেকজান্ডার রেমন্ড এবং রানার্স-আপ আর্মেনিয়ান্স প্রথম বিভাগে খেলবে। ১৯৬৮ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ প্রতিযোগিতায় বি এন আর দলের সুদর্শন সিং ২৪টি গোল দিয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর পরই উল্লেখযোগ্য গোল—মোহনবাগানের গোবিন্দ সিংয়ের ১৫টি এবং ইস্টবেঙ্গল দলের নাগরাজের ১২টি গোল। 'হ্যাটট্রিক' করেছেন বি এন আর দলের সুদর্শন সিং (পঃ বঙ্গ পুলিশ এবং জেভেরিয়ান্সের বিপক্ষে), ই আই আর এ এ দলের কলবন্ত সিং (বিপক্ষে এন্টাজী), খালসা স্পোর্টসের বন্দা সিং (বিপক্ষে খালসা ব্লুজ) এবং ই আই আর এ এ দলের ডি কে ঘোষ (বিপক্ষে জেভেরিয়ান্স)।

উল্লেখযোগ্য রেকর্ড

প্রথম চ্যাম্পিয়ান : বি ই কলেজ (১৯০৫)

সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ান : ১৮ বার—কাস্টমস

উপর্যুপরি ৪ বার চ্যাম্পিয়ান : রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭), কাস্টমস (১৯৩৬-৩৯) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৮)

উপর্যুপরি ৩ বার অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান : বি এন আর (১৯৬৫-৬৭)

মেক্সিকো অলিম্পিক

দক্ষিণ আফ্রিকার মুখের ওপর আসন্ন মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসের সিংহদ্বার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা আর মেক্সিকোর ১৯তম অলিম্পিক গেমসে যোগদান করতে পারবে না। গত ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেনবোলের (ফ্রান্স) ৮ম উইন্টার গেমসের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা ইন্টার-ন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির কাছ থেকে মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে যোগদানের যে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল তা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সোরগোল পড়ে যায়। প্রতিবাদের হুঙ্কারে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া অসহ্য গরম হয়ে ওঠে। রাশিয়াকে নিয়ে ৫০টি দেশ মেক্সিকো অলিম্পিক গেমস বর্জনের হুমকি দেয়। ভারতবর্ষও এক্ষেত্রে অলিম্পিক গেমস বর্জনের পক্ষে ছিল। এদিকে ১৯তম অলিম্পিক গেমসের উদ্যোক্তা মেক্সিকো মহা ফাঁপরে পড়ে যায়। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার যোগ-দানের পক্ষে তারা নয়। মেক্সিকো অলিম্পিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিমন্ত্রণপত্রও দেয়নি। চারিদিকের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিক গেমসে যোগদান প্রসঙ্গে ২১ ও ২২শে এপ্রিল তারিখে সুইজারল্যান্ডের লুসানেতে ইন্টারন্যাশনাল

অলিম্পিক কমিটির 'একজিকিউটিভ বোর্ড'-এর এক জরুরী সভা ডাকা হয়। ন'জন সদস্যবিশিষ্ট এই কার্যনির্বাহক বোর্ডের জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে অলিম্পিক গেমসে যোগদানের নিমন্ত্রণ করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। সুতরাং বোর্ড চারিদিকের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির ৭১টি সদস্য-দেশের কাছে জরুরী বার্তা পাঠিয়ে এই বিষয়ে তাদের মতামত আহ্বান করেন। এই লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়, ৪৬টি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিক গেমসে যোগদানের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে ৩৬টি ভোটের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং নিম্নতম প্রয়োজনের থেকে অনেক বেশী ভোট দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের বিপক্ষে পড়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মিঃ আভেরী ব্রান্ডেজ মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদান ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মুরুব্বী ছিলেন। লুসানে আয়োজিত কার্যনির্বাহক বোর্ডের জরুরী সভায় যোগদানের পথে মিঃ ব্রান্ডেজ দক্ষিণ আফ্রিকায় নেমে সেখানের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে খানাপিনা এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেন। এই সময়েই তাঁর হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার মনোনীত খেলোয়াড়দের একটা খসড়া তালিকাও ধরিয়ে দেওয়া হয়। লুসানের জরুরী সভার প্রাক্কালে মিঃ ব্রান্ডেজ বিবৃতি দিলেন, তাঁর হাতে এমন সব সাক্ষীসাবুদ এবং অকাট্য নথিপত্র আছে যে, মেক্সিকো অলিম্পিক গেমসে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগদানের পথ রুদ্ধ করার মত শক্তি এখন আর কারও নেই। বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক গেমস বর্জনের হুমকি একেবারেই ধাপ্পা। তাঁর ভাবটা এই রকম, নিয়মতান্ত্রিকভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে সিদ্ধান্তটা আরও পাকা করার জন্যেই যেন জরুরী সভা ডাকা হয়েছে। কিন্তু কার্যনির্বাহক বোর্ডের সুপারিশ এবং ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ভোটে দক্ষিণ আফ্রিকাদরদী মিঃ ব্রান্ডেজের মনের সাধ-আহ্লাদ সম্পূর্ণ চুরমার করে দিয়েছে। তবুও তিনি ভাঙেননি। বলেছেন, অলিম্পিক গেমস বর্জনের হুমকির কাছে কখনই মাথা নত করা হয়নি। বিশ্ববিশ্রুত নিগ্রো জননায়ক ডঃ মার্টিন লুথার কিংয়ের হত্যাকান্ডের ফলে আমেরিকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নরহত্যার ঘটনা বোর্ডের সদস্যদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে খুবই প্রভাবান্বিত করেছে। কার্যনির্বাহক বোর্ডের সর্বসম্মত সুপারিশ এবং অলিম্পিক কমিটির সদস্যদের সংখ্যাধিক্য ভোটে মিঃ ব্রান্ডেজ যে খুবই মর্মাহত হয়েছেন তা তিনি শেষ পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করেন এবং বলেন, নিমন্ত্রণপত্র প্রত্যাহার করার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা কত যে মনে আঘাত পেয়েছে সে কথা ভেবে তিনি খুবই বিচলিত।

আমেরিকার কোটিপতি মিঃ ব্রান্ডেজ তাঁর এই ৮০ বছর বয়সে যে-ভাবে বিশ্ব-শুদ্ধ লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন তারপরও তাঁর পক্ষে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সভাপতি পদ আঁকড়ে থাকা কি শোভা পায়?

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে খেলাধুলোর একই আসরে শ্বেত এবং অশ্বেতকায় খেলোয়াড়দের অংশ গ্রহণ সেখানকার সরকারী আইনে নিষিদ্ধ। অথচ অলিম্পিক গেমসের সনদে কোন জাতি, ধর্ম বা বর্ণভেদ নেই। অলিম্পিক গেমস বিশ্বভ্রাতৃত্বের মিলনক্ষেত্র। খেলাধুলোর আসরে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কুখ্যাত বর্ণবৈষম্য নীতি অলিম্পিক গেমসের অনুসৃত আদর্শের পরিপন্থী বলেই গত ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে যোগদান সম্ভব হয়নি। তবু তারা হাল ছাড়েনি। তাদের প্রধান মুরুব্বী ছিল স্বয়ং সভাপতি মিঃ ব্রান্ডেজ। কিন্তু অলিম্পিকের আঙ্গিনায় খিড়কি দরজা দিয়ে তাদের প্রবেশের সব চেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়ে গেল।

ভূতের মুখে রামনাম

ভোটযুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এখন অন্য পথ ধরেছে। খবরে প্রকাশ, গত ফেব্রুয়ারী মাসে যোগদানের অনুমতি পেয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিক গেমস খাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এ পর্যন্ত ব্যয় করেছে তার খেসারত হিসাবে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির কাছে একটা বিল পাঠিয়ে দেবে। আরও মজার কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার অলিম্পিক কমিটির সভাপতি বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্ত অবৈধ, নীতি এবং সংবিধানবিরুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কুখ্যাত বর্ণবিদ্বেষী নীতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষকের মুখে এসব কথা—ভূতের মুখে রামনামের মতই শোনাচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

বিল লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটি ইংল্যান্ডে পেণছে গেছে। ১৯৬৪ সালের পর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলের পুনরায় ইংল্যান্ড সফর। ক্রিকেট খেলার বিশেষজ্ঞদের মতে, আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটি ব্যাটিং এবং পেশ বোলিংয়ে খুবই শক্তিশালী করে গড়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগ ক্রিকেট খেলার সমালোচকেরা মনে করেন, খেলার নিরাপত্তার দিকটা বেশী নজর রেখে দল গঠন করা হয়েছে। দলের নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে এই ৮ জন খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান আছেন—লরী, রে[illegible] কাউপার, সিহান, ওয়াল্টার্স, চ্যা[illegible] ইনভেরারিটি এবং জসলিন। দলের নামা পেশ বোলার হলেন—ম্যা[illegible] রেনেবার্গ, কনোলী, হক এবং ১৯৬৪ সালের শেষ ইংল্যান্ড সফ[illegible] অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলটি গিয়েছি[illegible] এই ৭ জন খেলোয়াড় বর্তমান সফ[illegible] ভুক্ত হয়েছেন—লরী, রেডপাথ, ক[illegible] হক, জার্মান, ম্যাকেঞ্জী এবং কনোলী। সাতজনের মধ্যে কনোলী এবং [illegible] কিপার জার্মান ১৯৬৪ সালের সফরে টেস্ট ম্যাচ খেলেননি। দলের নি[illegible] খেলোয়াড়দের মধ্যে চারজন খেলে[illegible] সিহান, ইনভেরারিটি, ওয়াল্টার্স জসলিনের ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে এই [illegible] বিদেশ সফর। বর্তমান দলের ২ খেলোয়াড়—ইনভেরারিটি এবং ম্যা[illegible] ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট স্থান পাননি। খেলোয়াড়দের গড় বয়স বছরের কিছু বেশী।

১৯৬৮ সালের ইংল্যান্ড স[illegible] অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল তাদের উদ্বো[illegible] ম্যাচ খেলতে নামবে আগামী ৪ঠা ডিউক অব্ নরফোক দলের বিপক্ষে।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ : বিল [illegible] (বয়স ৩১)—অধিনায়ক, ব্যারী জ[illegible] (৩২)—সহ-অধিনায়ক এবং উইকেট-কি[illegible] পল সিহান (২১), আয়ান রেডপাথ ([illegible] আয়ান চ্যাপেল (২৪), ডেভ রে[illegible] (২৫), ব্রায়ান টাবার (২৭)—উইকেটকি[illegible] এ্যাসলী ম্যালেট (২২), ডগ ওয়াল[illegible] (২২), বব কাউপার (৩২), এ্যালান কন[illegible] (২৮), গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জী ([illegible] ইনভেরারিটি (২৪), নীল [illegible] এরিক ফ্রিম্যান (২৩), জন [illegible] এবং লেন জসলীন (২০)।

ডেভিস কাপ

গোহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠি[illegible]জিত ১৯৬৮ সালের আন্তর্জাতিক ডেভি[illegible] কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার পূর্ব[illegible] ঞ্চলের সেমি-ফাইনালে ('খ' বিভা[illegible] ভারতবর্ষ ৩—২ খেলায় সিংহল[illegible] পরাজিত করে পূর্বাঞ্চলের ইন্টার-জো[illegible] ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে[illegible] ভারতবর্ষ আগেই ৩—০ খেলায় জয়লাভে[illegible] সূত্রে ফাইনালে উঠেছিল। সুতরাং শেষ দুটি সিঙ্গলসে সিংহল জয়ী হয় [illegible] গুরুত্ব ছিল না। ভারতবর্ষের [illegible] খেলেছিলেন—জয়দীপ মুখার্জি, মিনোত্রা, গৌরব মিশ্র এবং অমৃতরাজ।

এখানে উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের বি[illegible] ডেভিস কাপের খেলায় সিংহল সময়ই জয়ী হয় নি। পূর্বাঞ্চ[illegible] ইন্টার-জোন ফাইনালে ভারতবর্ষের বি[illegible] খেলবে 'ক' বিভাগের বিজয়ী দেশ (জ[illegible] অথবা ফিলিপাইন)।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।